অগ্নিযুগ

দ্বাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রথম হাঙ্গার স্ট্রাইক

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

তখন মর্টেগুর আসবার সময় হয়ে গেছে। আর, বিভিন্ন জেলে খবর পাঠিয়ে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করবার সুযোগ নেই। অথচ, সবাই যেন একটা কিছু করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

দিনরাতে আলোচনা চললো। রাতের তেমন সুযোগ হয় না। কথাটা গোপন রাখতে হবে—রাতের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন সেলে বন্ধ থাকি, ডাকাডাকি ক'রে কথা বললে পাছে জানাজানি হয়ে যায়, তাই ইসারায় ইঙ্গিতে কথা চলে। দিনের বেলায় তিনবার চালাকি ক'রে যতো জন পারি, একত্র হই। তাছাড়া এখানে ওখানে দুইতিন জনের কমিটি মিটিংও চলে।

এর আগে অবশ্য একটা ছয় দিনের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক হয়ে গেছে মেদিনীপুর জেলে—হেমেনদা তার পরই মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। কিন্তু আমরা যে হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের আলোচনা করছি, তার হেতু বহু ব্যাপক—আমাদের কথা বিনাবিচারে আটক রাখা চলবে না—আর, আটক রাখলে, ব্যবহার সর্বদিক দিয়ে ভদ্র করতে হবে সব জেলে সব বিনাবিচারের বন্দীদেরই প্রতি।

এরকম হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে গবর্ণমেণ্ট সহজে নতি স্বীকার করবেন না, কাজেই দুপাঁচজনের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। তার দায়িত্ব তো সহজ নয়। সবাই অবশ্য নিজের নিজের দায়িত্বেই উপবাসের পণ করবে। কিন্তু শুধু হঠকারিতার বশে কোনো সহকর্মী বন্ধুর নিষ্ফল মৃত্যু হবে, তার গ্লানি তো সমস্ত জীবনেও নিজের মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

তাছাড়া, সবাইকে এক সঙ্গে ওরা রাখবে না—বিভিন্ন জেলে একা একা হয়তো পাঠিয়ে দেবে। সংবাদ সংকল্প বজায় রাখতে হবে। কষ্ট-নিষ্ঠা খবর ওরা বলবে—হয়তো জানাবে, অপর সবাই ছেড়ে দিয়েছে, তুমি একাই না খেয়ে মরছ! এই ধরণের খবর পেয়ে অথবা নিজের মনে দুর্বলতা এসে বিভিন্ন জেলে যদি দুপাঁচজন ছেড়ে দেয়, যারা তখনও টিকে থাকবে, তাদের দুঃখভোগ আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। এই সব নিয়ে আশা-নিরাশার অনেক কথাই হ'ল। নিরাশার দিকেই পাল্লা ভারী।

পরের কথা—বয়স্ক ও কম বয়সী

তাঁরা পিছপাও কিছুতেই হবেন না। অনেক সাধ্যসাধনার পর স্থির হ'ল, দেওয়ান সিং তিন দিন না খেয়ে থাকবেন, তারপর খেতে শুরু করবেন। অন্য যে চার পাঁচজন ছিলেন, তাঁরা যখন খুশি, ষ্ট্রাইক ছেড়ে দিতে পারেন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি সম্পর্কে আমাদের সংকোচ ছিল, সেসম্বন্ধে কথা হ'ল, আমাদের জিজ্ঞেস করলে আমরা সবাই বলব, বিশেষ ক'রে আন্দিপুর জেলের ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই।

১লা ডিসেম্বর মর্টেও কলকাতায় আসবেন। ৩০শে নবেম্বর থেকে আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক শুরু হবে। স্থির হ'ল হাঙ্গার ষ্ট্রাইক আরম্ভ হবার পূর্বে বাইরে যতো লোককে পারি, আমাদের সংকল্প ও রাজবন্দীদের সমস্ত অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হবে। বাংলার নরম গরম দলের নেতৃস্থানীয় তখন রবীন্দ্রনাথ, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, সি. আর. দাস, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, মতিলাল ঘোষ, ফজলুল হক, আবুল কাশেম, হীরেন দত্ত, রামানন্দ চাটার্জি, বি. সি. চাটার্জি, অশ্বিনী দত্ত, অম্বিকা মজুমদার, অনাথ বন্ধু গুহ, যাত্রামোহন সেন, বৈকুণ্ঠ সেন, প্রীশ চাটার্জি—এঁদের সবাইকে, এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজন—যাঁদের খবর দিলে একটু লোক জানাজানি হ'তে পারে, স্থানীয় আন্দোলন হ'তে পারে—তাঁদের সবাইকে চিঠি দেওয়া স্থির হ'ল।

দীর্ঘ চিঠি—বিনা বিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, দালান্দা হাউসে, কীড্ ষ্ট্রীটে ও অন্যত্র অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, রাজবন্দীদের প্রতি অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—প্রায় আট-পাতা চিঠি। লিখিলেন জিতেন লাহিড়ি। আমরা চার পাঁচজন রাত্রে-আত্রে ঘরে ব'সে, আমাদের হাতের লেখা ধরতে না পারে, এমন ক'রে নকল করলাম।

বিয়াল্লিশ খানা চিঠি। ২৯শে তারিখে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ডাকে দেবার ব্যবস্থা করলেন বীরেন চাটার্জি। ৩০শে বেলা ১০টা আন্দাজ সোভলার বারান্দায় গৌরীন ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিলেন। যেমন জানা গেল চিঠিগুলো ডাকে দেওয়া হয়েছে, অমনি আমাদের উপবাস শুরু হ'ল। জেল আফিসে জানিয়ে দেওয়া হ'ল, আমরা সেই মুহূর্ত থেকে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করছি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন—জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে চ'লে গেলেন, কেন ষ্ট্রাইক করছি। তাঁর জেলের বা ব্যবহারের বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ নেই যখন জানলেন, তখন আমাদের বলবার তাঁর বিশেষ কিছু ছিল না। তবু ঘরে ঘরে গিয়ে বললেন, এতে লাভ কি হবে? তোমরা খাও, আমরা বললাম, না। আমাদের দৃঢ়তা বুঝে আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না।

রায়ান সাহেবকে পাঠিয়ে দিলেন। রায়ান পাঁচজনের ডেকে ঘরে ঘরে খাবার পরিবেশন করালেন। আমাদের দুর্গাবাবু রোজ একাজটি করতেন। তাঁর সঙ্গে রায়ানের একটা হৃদ্যতা ছিল, খুব হাসিঠাট্টাও চলতো। তিনি যখন বাংলায় বললেন, ওগুলো নষ্ট করবে কেন সাহেব, কয়েদিদের ডেকে দিয়ে দাও, রায়ান মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর যখন আমাদের ঘরে ঘরে তালা লাগিয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। আমার ঘরের সামনে এ'সে জিজ্ঞেস করলাম, কেন অমন করছেন? শিশুর মতো কেঁদে ফেললেন। রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে চ'লে গেলেন। সত্যেনদা অনেক বুঝাতে চেষ্টা করলেন।

পরের দিন। আলিপুর জেলের মাঝখানে একটা গির্জা আছে। তার ভিতর টেবিল চেয়ার সাজিয়ে বসেছেন তখনকার বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী ষ্টীফেনসন, টেবিলের দুইপাশে বসেছেন ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌স্ বুকানন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মুলভেনি।

একে একে আমাদের ডাক পড়লো। সবাইকেই প্রায় একই ধরণের প্রশ্ন—কেন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছি? আমাদের নালিশ কি?—ইত্যাদি।

আমাকে বিশেষ প্রশ্ন করলো, তুমি ত সেদিন এসেছ, তোমার কি নালিশ থাকতে পারে? আমি বললাম, আমার ব্যক্তিগত নালিশ আর কি থাকতে পারে? তোমরা বিনাবিচারে ধ'রে রাখবেই বা কেন? আর প্রেসিডেন্সি জেলে যা দেখে এলাম রাজবন্দীদের সঙ্গে সে রকমব্যবহারই বা করবে কেন?

আমার যখন অবানবন্দী চলছে, তখনই দুর্গ থেকে গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজে জানিয়ে দিল, মর্টেও আর চেম্‌সফোর্ড এসে হাওড়ায় পৌঁছাল। ষ্টীফেনসন আমায় জিজ্ঞাসা করে, এই দিনেই হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করার পরামর্শ তোমাদের কে দিল? আমি বলি, পরামর্শ আবার কে

দেবে? বেচারীর তো ধারণা, আমরা খবরের কাগজ পড়তে পাই না!

মনোরঞ্জনদা খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। মেজদাকে (চন্দননগরের বসন্ত ব্যানার্জি) যেমন বলেছে, তুমি কি মনে কর, তুমি আত্মহত্যার ভয় দেখাবে, আর সেই জবরদস্তিতে গবর্ণমেণ্ট তোমায় ছেড়ে দেবে, মেজদা ফেটে পড়লেন, বললেন, না যদি দেয় তো বুঝব, Government have committed nothing but murder, murder, murder on me."

এ পর্ব শেষ হ'ল। নিজেদের জায়গায় ফিরে এসে পরস্পরের নোট মিলিয়ে বোঝা গেল, কপালে দুঃখ আছে। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ছড়িয়ে পড়তে হবে। তখন কি করা হবে, না হবে—আর একবার ক'রে সবার সংকল্প দৃঢ় ক'রে নেওয়া হ'ল।

পরে শুনেছি, ঐ দিন রাত্রে লাটভবনে এক কনফারেন্স হয়। তখন বাংলার নতুন গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডশে। তিনি বলেন, রাজবন্দীরা যখন জেলেই বন্ধ থাকবে, তখন জেলে তাদের সব কিছু সুযোগ সুবিধা কেন দেওয়া হবে না? জেলে যেখানে খুসি, কেন ঘুরে বেড়াতে পারবে না? ইনস্পেক্টর জেনারেল বুকানন বলে, তা যদি করা হয়, তা হ'লে আর আমি জেলের আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না। এর পর স্থির হয়, আমাদের অনেককে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলে একা একা পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের পূর্বসংকল্প অনুযায়ী কুঁজো থেকে জল গড়াই আর খাই। আর, ওরা ওদের কর্তব্যের ধারা অনুযায়ী সকাল সন্ধ্যা ঘরে ঘরে খাবার যেমন দেবার দিয়ে যায়। সকালেরটা বিকেলে, সন্ধ্যারটা সকালে যেমনকার তেমন তুলে নিয়ে যায়। যে কয়েদির তুলে নিয়ে যায়, তারাও চোখের জল ফেলে, হা হুতাশ করে।

২রা ডিসেম্বর। দুপুর বেলা, হঠাৎ হেমেনদার আর মনোরঞ্জনদার ডাক পড়লো মালপত্রসহ জেল আফিসে যাবার। বিকেলে শুনলাম, তাঁদের পাঠানো হ'ল যথাক্রমে দার্জিলিং ও বর্ধমান জেলে। যুগান্তর দলের শ্রেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে এঁরা দু'জনই তখন ছিলেন ঐ জেলে। তাছাড়া, হেমেনদা মেদিনীপুর থেকে প্রথম হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন, এবং মনোরঞ্জন দা পদে পদে রাজবন্দীদের অধিকার নিয়ে জেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেস্টিজের সঙ্গে ঝগড়া করেন। প্রথমেই এঁদের বিদায় করবার অর্থ একরকম বোঝা গেল।

বিপদের দিনে এই বিচ্ছেদে সকলেই একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।

সেই দিন বিকেলে একটি ঘটনা ঘটলো। উপবাসে আছি, কিন্তু আমরা সকাল বিকালের বেড়ানোটা বন্ধ করিনি। এর স্বাস্থ্যের দিকও ছিল—তাছাড়া, বের হ'লে অন্য রাজনৈতিক কয়েদিদের সঙ্গে দেখা হয়, খবরাখবরও আদান প্রদান করা যায়। তাঁদের মুখেই শুনলাম, আমাদের চিঠি সব কাগজে কাগজে বেরিয়ে গেছে।

বেড়িয়ে ফিরছি—গেটের সামনে দেখা ইউরোপিয়ান কয়েদিদের সঙ্গে। তাদের ভিতর Topps নামে একটা ওলন্দাজ কয়েদি ছিল। লোকটি একটি আন্তর্জাতিক ঠক। আটটি বিভিন্ন ভাষায় পড়তে লিখতে ও কথা কইতে পারে। সে জার্মান ভাষায় জিতেনবাবুকে আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, সহানুভূতি জানালো। জিতেনবাবুও যা বলবার বললেন।

সেদিন ওয়ার্ডার ছিল সেই শয়তান°গ্রাণ্ট। সে জিতেনবাবুকে বলে, কথা বলছ কেন?

বলছি, বেশ করেছি, তোর যা করবার কর গিয়ে যা।

গিয়ে সেই জেলার অ্যাটকিন্সনকে ডেকে নিয়ে এল। তার কথা বলার রকমই ছিল যেন ধমকানি। জিতেনবাবু বললেন, না খেয়ে তিলে তিলে মরতে যাচ্ছি। তুই কি ভয় দেখাতে এসেছিস রে? যা, খুসি কর্ গিয়ে।

জেলার গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডেকে নিয়ে এল।

মুলতেনি কথা পাড়তেই যেন বারুদস্তূপে আগুন পড়লো। জিতেনবাবু জেলারকে দেখিয়ে বললেন, তুমি কি জানো বরাবর এই কুকুরের বাচ্চা আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে?

শুনে মুলতেনি আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে জেলারকে ধমক দিয়ে বললেন, অন্য ঘরের বন্ধুদের কানে গেল, এ সময়ে এদের মেজাজ স্বভাবতঃই খারাপ থাকবে। কেন এখন এই সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা তোল?

পর দিন ভোরে অন্য ব্যাপার। আমার ঘরটা এক পাশে। অন্ধকার থাকতেই ঘর খোলে, আমি বেরিয়ে ইয়ার্ডে বেড়াই। রায়ান সাহেব আমার ঘর খুলে ডাকলেন—Mr. Datta, please come with me. ইয়ার্ডের দরজা খুলে আপিসে নেবে, কি হাসপাতালে নেবে—প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। নেবে দেখি ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেল যে গুলো আছে, অর্থাৎ সামনে দেরা, সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে বিশেষ অপরাধী যারা তাদের থাকবার জন্য খারাপ সেল, সেই দিকে নিয়ে চলেছে। আগে আমাদের নিজেদের মধ্যে একবার কথা হয়েছিল, ঐ সেলে আমাদের নিতে চাইলে, আমরা বিনা বাধায় যাব না, বলপ্রয়োগ করলে যাব,—বলপ্রয়োগ অবশ্য ঠিক ধস্তাধস্তি পর্যন্ত নেব না—গায়ে হাত দেওয়া অর্থই বলপ্রয়োগ ধ'রে নেব।

কথাটা মনে পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে নিয়ে চলেছ কেন? রায়ান বললেন, order. আমি বললাম, জোর না করলে যাব না। রায়ান-সাহেব একটু বিপদে পড়লেন, ইতস্ততঃ ক'রে, একটু দূরে গীর্জার কাছে ব'সে জেলার গনতি মিলাচ্ছিল তাকে গিয়ে রিপোর্ট দিলেন।

জেলার ভুঁড়ি দোলাতে দোলাতে ছুটে এল, পেছনে জমাদার। বললো, ও-সেলে যাবে না?

Not unless I am forced.

—আগের দিনের রাগটা সর্বাঙ্গে সরগরম করছে। তারপর ভোরবেলা একটু বোধ হয় টেনেও এসেছে। কিন্তু রাগ বেশী প্রকাশ করার সাহস আর নেই। শুধু হাতপা, চোখের ভঙ্গীতে বিক্রম প্রকাশ ক'রে বললো, জমাদার লে যাও পাকড়কে।

জমাদার আমার পাশে এসে একখানা হাতে আস্তে হাত লাগিয়ে বললে, চলিয়ে বাবুজী!—সেলে ঢুকলাম।

একে একে অনেককেই ওখানে নিয়ে আসা হ'ল। এই সেলে আনবার বেলায় এই রকম প্রতিবাদের যে একটা কথা ছিল, তার বোধ হয় কারও খেয়াল ছিল না। আর কেউ প্রতিবাদ করেন নাই।

সকাল বেলায় যখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলেন বন্ধুদের পরামর্শ ক্রমে নালিশ করলাম জেলারের (bad temper and manners) বদ মেজাজ ও অসদ্ব্যবহারের জন্য। কি ঘটনা ঘটেছিল মুলতেনি জানতে চাইলেন। সমস্তটা শুনে বললেন, But you had no business to disobey orders.

তারপর শুনতে পেলাম, জেলারকে বলতে বলতে যাচ্ছেন, এদের এ সেলে নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। জেলার জবাব দিচ্ছে, সার, আমার আশংকা হয়েছিল, এরা যদি violent হয়ে ওঠে, আমি জেলের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারব না।

এর জবাবে মুলতেনি কি বলেছিলেন জানি না। কিন্তু খানিকটা বাদে জেলার আবার সেলে এসে বললে, আমি যদি আপনাকে কোন আঘাত দিয়ে থাকি, আমি তার জন্য দুঃখিত, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই।

ঐ সেলেও সারা দিন রাত সেল থেকে সেলে ডাকাডাকি ক'রে হৈচৈ ক'রে দুটো দিন আমাদের কাটলো। বেছে বেছে আমাদের জনকতককে নিয়ে এসেছে। খুব লাগলো। কিন্তু যাঁরা আগেকার সেলে প'ড়ে রইলেন, তাঁরা বয়োবৃদ্ধ। তাঁদের লাগলো আরও অনেক বেশী। কয়েদিরা চারবার ক'রে খাবার আর চা নিয়ে আসে, তাদের মারফত খবরাখবর চলে।

পরদিন এল আই জি বুকানন। হাউ হাউ ক'রে কথা বলে। আমরা ওকে বলতাম বোকানন্দ। সব

ঘরের সামনে খাবার প'ড়ে রয়েছে। সবাইর কাছে গিয়ে একই প্রশ্ন করে, Why are you spoiling all this good food ?

একে তো সরকারী দপ্তরের ফাইল মাফিক কাজ, তার উপর ঘটেও এসেছে। কোথা থেকে কি জানাজানি হয়ে যায়—ওরা দালান্দা হাউস খালি ক'রে দীর্ঘকাল সেখানে যে সব বিনা বিচারের বন্দীদের রেখেছিল—সব এজেলে ওজেলে পাঠিয়ে দিল। আমাদের সেদিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক আরম্ভ, তার আগের দিন রাত্রে এলেন অনুশীলনের কর্মী সিরাজগঞ্জের সতীশ দে, আর যে দিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক শুরু হয়ে গেছে, সেই দিন সন্ধ্যা বেলায় ইয়ার্ডের সামনে রাস্তায় বেড়াচ্ছি, এমন সময় এলেন পালং এর আশু কাহালি।

দুইজনই হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে যোগ দিলেন। সতীশ দে রাত্রে এসে শুনলেন, পরদিন থেকে আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক শুরু। খুব উৎসাহ, বেশ বীরত্বের ব্যঞ্জনা দিয়ে আমাদের গান শোনালেন—

সভা যখন ভাঙ্গবে
তখন শেষের গান কি যাব গেয়ে ?

একটু একটু শীত পড়েছে, সতীশ বাবু নতুন এসেছেন, শীতের কাপড় পান নাই, তাঁকে গায়ে দেবার জন্য আমার আলোয়ানখানা দিয়েছি। বাবার দেওয়া আমার একখানা এণ্ডি চাদর ছিল, আমি সেইখানা গায়ে দিয়েছি।

ম্যাজিষ্টেরিয়াল সেল থেকে বুকানন যখন আমাদের সাথে দেখা ক'রে চ'লে যায়, সামনের দরজার একটু ফাঁক দিয়ে চোখে পড়লো, বুকাননের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার আলোয়ানখানাও চ'লে গেল।

ওরা চ'লে যেতে আমার এক পাশের সেলে প্রতুল গাঙ্গুলি, অপর পাশে রমেশ চৌধুরী—ওদের ডেকে জিজ্ঞেস করি, কে ? সতীশ দে চলে গেল না ? ওঁরা বললেন, তাইতো মনে হ'ল। পরে, কয়েদি ও সিপাইদের মুখে শুনলাম, ও বাবু খেতে রাজী হয়েছেন, তাই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ভদ্রলোকের কিন্তু আমাদের চেয়েও কম বয়স, বেশ জোয়ান চেহারা।

ওদিকে ইউরোপিয়ান ইয়ার্ড থেকে সাতুদা (২৪ পরগণা মাহিনগরের সাতকড়ি ব্যানার্জি) ও দুর্গাচরণ বাবু খবর পাঠাচ্ছেন, তিন দিন হয়ে গেছে, তবু বৃদ্ধ দেওয়ান সিংকে কিছুতে খাওয়ান যাচ্ছে না। অথচ খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। বলছেন আমার বাচ্চার মতো সব সোণার চাঁদ ছেলে—ওরা না খেয়ে থাকবে, আর আমি খাব ?

আমরা সকলে মিলে অনুরোধ ক'রে পাঠালাম, পর দিন থেকে খেতে আরম্ভ করলেন।

রাত্তির বেলায় পেছনের সেল থেকে কয়েদিরা কেউবা দুঃখ করে, কেউবা খোদার কাছে আমাদের জন্য দোয়া মাগে, কেউবা বলে, আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

পরদিন সকাল বেলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলেন, আমার নাড়ী পরীক্ষা করলেন, বুকে চোঙা একবার লাগালেন, তারপর আমার টিকেটে লিখলেন, fit for travel. জিজ্ঞেস করলাম কোথায় পাঠাচ্ছেন ?

বললেন, তা জানিনে। তবে এইটুকু বলতে পারি, কাল এমন সময় আপনি বাংলার সীমানা থেকে বহু দূরে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চ'লে গেলে জানা গেল, আমরা ছয় ব্যক্তি একসঙ্গে অপর কোথাও যাচ্ছি—প্রতুল বাবু, রমেশ বাবু, সত্যেন দা, জিতেন লাহিড়ি, বসন্ত ব্যানার্জি ও আমি।

দুপুরবেলা অফিসে ডাক পড়লো। আর এক নম্বর করুণ বিদায়ের পালা—দুই ইয়ার্ডেরই যতজনের কাছ থেকে সম্ভব হ'ল বিদায় নিলাম।

আপিসে যেতে মুলতেনি বললেন, শুনছি, আপনাদের সব চিঠি কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছে। এ সব চিঠি নিশ্চয় আবার জেল থেকে যায় নাই !

কথার ইঙ্গিতটি বুঝলাম—বললাম, তা কি ক'রে সম্ভব হয় ?

সত্যেন দা জিজ্ঞেস করলেন, কি মতলবে চালান ক'রে দিলেন ?

জানি না, হয়তো জোর ক'রে নল চালিয়ে

যাওয়াবে।

এ ক'রে কতদিন বাঁচিয়ে রাখবে?

বহু মাস।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি দুদিকে দুগাছা দড়ি ধ'রে পুলিশ জন কতক দাঁড়িয়ে রয়েছে—যে পথ দিয়ে আমরা ট্রেন পর্য্যন্ত যাব, তার সীমানার ভিতর কোনো লোক ঢুকতে দিচ্ছে না।

দূর থেকে বহু লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ল—আমরা ছয় জন তিন খানা ইণ্টার ক্লাসের গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ীটা বোধ হয় নাগপুর প্যাসেঞ্জার। আমাদের এক একটা গাড়ীতে চার জন ক'রে পুলিশ। একজন বুড়ো-মতো ইউরোপিয়ান ইনস্পেক্টার ওদের দলপতি, আর রইলো আই বির একজন সাব-ইন্‌স্পেক্টার।

স্টেশনে স্টেশনে নামি—পরস্পরকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাব? হদিস পাইনে। এই অনিশ্চয়তাটাই পীড়া দিচ্ছে। জিতেন বাবু আই বিটার সাথে খাতির জমান—কোন লাভ হয় না।

আমরা গল্প করি, বুড়ো কোনো আপত্তি করে না। বরং চা খাব কিনা, অন্য কিছু খাব কিনা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু একটা ষ্টেশনে—বোধ হয় খড়্গপুরে—প্রতুল বাবু যখন বলেন, তার চেয়ে বরং একখানা কাগজ কিনে দাও, ও বল্লে,কাগজ তো তোমরা পড়তে পাবে না।

দীর্ঘ পথ, প্যাসেঞ্জার গাড়ী, ছ্যাকড়া গাড়ীর মতো চলছে, পাঁচদিনের উপোস—অনেকেই একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন—বিশেষ ক'রে জিতেন বাবু ও মেজদা (বসন্ত বাবু), আমি আর সত্যেনদা প্রায় শেষ পর্য্যন্তই নামি আর গল্প করি।

পরদিন বিকেলের দিকে। বুড়ো ইন্‌স্পেক্টার পকেট থেকে একখানা স্লিপ কাগজ বের করে। আমাদের কয়জনের নাম লেখা। প্রথম নামটাই আমার। জিজ্ঞেস করলো—Who is Mr. Bhupendra Kumar Dutta. বললাম, আমি। ও বললে আর এক ঘণ্টা বাদে আপনাকে নামতে হবে, তৈরী থাকবেন।

ও পথে তখনও অতদূর যাওয়া আশা করিনি। কেউই ধারণা করতে পারলেন না, আমায় কোথায় নামাবে।

বিলাসপুর স্টেশন, আসন্ন সন্ধ্যা। আবার সবার কাছ থেকে করুণ বিদায়ের পালা। এ বিদায়ের অর্থ কি, ভুক্তভোগীরা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। শিশু—মা নয়, বাবা নয়—সর্বক্ষণ যার সঙ্গে থাকে, যার উপর নির্ভর করে, যে ভাল বাসে, তারই কাছ ছাড়া হ'তে হু হু ক'রে কেঁদে ওঠে। দিন রাতের, সুখ দুঃখের, বিপদ আপদের সব সঙ্গী—যাদের আপনার বলতে আর কেউ নেই, আছে হয়তো, কিন্তু আর কখনও কাছে পাব কিনা অনিশ্চিত—একত্র এই আজ যারা আছে, তারাই আমাদের আপনার। তারা পরস্পরকে ফেলে যাচ্ছে—হয়তো এজীবনে এই শেষ দেখা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী ক'রে চুকলাম বিলাসপুর সহরে।

পরে জেনেছি—ষ্টেটপ্রিজনারদের বেলায়, সর্বদা যেমন করে—নাম, ওয়ারেণ্ট প্রভৃতি, যে জেলে বদলি করবে, আগে থাকতে সেই জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে পাঠায়, আমাদের ক্ষেত্রে সে সব কিছুই করে নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার, হোম সেক্রেটারী—সব তখন মণ্টেগুর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায়। ওরা মধ্য-প্রদেশ গভর্ণমেণ্টকে তার করে দিয়েছে, তোমাদের ছয়টি জেলে ছয় জন বাঙালী রাজবন্দী রাখতে হবে। সেই অনুযায়ী ওখানকার ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অব্‌ প্রিজন্‌স্ বিলাসপুর, রায়পুর, অমরাবতী, জব্বলপুর ও সাগর জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের প্রত্যেককে তার করে দিয়েছে, একজন বাঙ্গালী ষ্টেটপ্রিজনার আসছে, তাকে রাখবে। যথাক্রমে এই ক্রমটি জেলে গেলাম আমি, প্রতুল বাবু, রমেশ বাবু, সত্যেনদা, জিতেন লাহিড়ী ও মেজদা। সাহেব ইন্‌স্পেক্টারটি যেমন নামের লিষ্ট করেছে, বা পেয়েছে, তেমনি ভাবে পর পর এক এক জনকে এক এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে মেজদার সাগর পৌঁছাতে ছয় দিন লেগে গেল।

ঐ ব্যবস্থা যুক্তপ্রদেশের ছয়টি জেলেও করা হ'ল।

আমাদের পরদিন সেখানে গেলেন হাতকড়ি ব্যানার্জি, সুরেশ দাস, যশোরের বিজয় রায়, সৌরীন, হরিদার ভাই মাখন ও ফরিদপুরের আশু কাহালি।

জেলে যখন পৌঁছালাম, তখন রাত হয়ে গেছে, জেল বন্ধ হয়ে গেছে। খানিক বাদে জেলার তার বাসা থেকে এল। নাম জিজ্ঞেস করলো। বললাম। সঙ্গের বাক্স, বিছানা দেখে জিজ্ঞেস করে—এ কি আপনার সঙ্গেই থাকতো, না, অফিসে থাকতো? আমি বললাম, সঙ্গেই থাকতো।

জিজ্ঞেস করে, কোন ধারায় আপনার শাস্তি হয়েছে?

কোন ধারায় নয়।

তবে?

বিনা বিচারে আটক ক'রে রেখেছে।

কোন আইনে?

Regulation III of 1818

1818? What is that?

যা বলবার বললাম। জিজ্ঞেস করলো যে জেল থেকে আসছেন, সেখানে আপনাকে কোথায় রাখতো?

বললাম ইউরোপীয়ান সেলে।

ও বললে, আমাদের তো ইউরোপিয়ান সেল ব'লে কিছু নেই, সাধারণ সেল যা আছে তারই একটি খালি করে দিই। সেখানে আপনার বিছানা দিচ্ছি, কিন্তু বাক্স আপনি পাবেন না।

কেন?

জেলের আইনে নেই। তবে কাল সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসুন—তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে যা দরকার করব। এখন আপনি কি খাবেন?

জল ছাড়া আর কিছু না।

খেয়ে এসেছেন?

না, হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছি।

সে আবার কি?

অনশন ব্রত নিয়েছি, বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে।

ও যা বুঝবার বুঝলো।

খানিকটা বাদে একটী সেলে নিয়ে ঢুকালো। যেমন ছোট, তেমনি কদর্য, তেমনি আলো বাতাসের প্রবেশপথ শূন্য। প্রেসিডেন্সি জেলের ৪৪ ডিগ্রির কথা আগে বলেছি। তার ভীষণতা আছে, কিন্তু আশে পাশে মানুষ আছে এই অনুভূতিটা থাকে—এর এই ছমছমে ভাবটা সেখানে নেই।

ছোট্ট জেল, মাত্র ১২০ জন কয়েদীর থাকবার জায়গা, জেলে দুইটি মাত্র সেল। তা-ও এক জায়গায় নয়, একটি ইয়ার্ডের দুই পাশে দুটি। মানুষের স্পর্শ থেকে মানুষকে যতোখানি দূরে রাখা যায়, তারই ব্যবস্থা।

পরদিন সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল। আমার কাছ থেকে জেরা ক'রে যা যা জানবার জেনে নিল। তার পর গেল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায়। আলাপ আলোচনা ক'রে ফিরে এল—বেলা দুটো আন্দাজ দেখি, এক কয়েদীর মাথায় আমার বাক্স নিয়ে অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার এল। কয়েদীটি রয়ে গেল, আমার কাজকর্ম যা থাকবে, করবে।

একখানি ডেক চেয়ার এল। তাতেই বসে বসে দিন কাটে। বাক্সে বই ছিল একখানি গীতাঞ্জলি, একখানি রামায়ণ, একখানা অধ্যাত্ম রামায়ণ, একখানা Immitation of Christ, একখানা Trineএর In Tune with the Infinit, একখানা Millএর Liberty ও Representative Government, এবনি আর দু'এক খানা পড়া বই ও দুতিনখানা খাতা।

হাতে নিয়ে বসতাম অবিশ্যি গীতাঞ্জলিখানা, কিন্তু আকাশের দিকে চেয়েই দিন কাটত। আকাশের দিকে চাইবার অবকাশ পর দিন থেকে হ'ল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কি ভেবে চিন্তে পর দিন সেল থেকে আমায় মুক্ত করলেন। পাশের ওয়ার্ডটায় প্রায় চল্লিশজন কয়েদী থাকতো, তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। ওয়ার্ডের ভিতর কয়েদীদের শোবার যে মাটির ঢিবিগুলো, তার মাঝখানে একটা জানালার সামনে আমার সোহার খাটখানা পড়লো। দিনের বেলায় ওয়ার্ডের তিন দিক ঘেরা বারান্দার কোনো না কোনো দিকে ডেক চেয়ারে

বসে কাটতো।

রাতের বেলায় দুইপাশের দুটো সেলে দুজন করেদি থাকতো। সারাদিন সমস্ত জায়গাটা নিয়ে থাকতাম আমি, আমার কাজকর্ম করবার সেই করেদিটি—যার করবার কিছুই ছিল না, সারাদিনে এক কুঁজো ক'রে জল ভরা, ভেক চেয়ারখানা পেতে বা সরিয়ে নেওয়া, আর স্নানের পর কাপড় আর তোয়ালেখানা ধুয়ে শুখোনো ছাড়া। আর থাকতো আমার উপর নজর রাখবার এক সিপাই। এদের সঙ্গে গল্পে আর কতটুকু সময় কাটে? তাও গল্প করার নিয়ম ছিল না। জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে পড়তে পারে, এমন সময়গুলো বাদ দিয়ে ওরা তবু ওরই ভিতর সময় সময় গল্প করতে চাইতো।

আর, খুব ভোরে জেলের হাজিরা নিতে এসে অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার চন্দ্রিকাপ্রসাদ এক মিনিট আর দুমিনিটের জন্য দু'একটা কথা ব'লে যেতেন। লোকটির প্রথম দিন থেকেই আমার প্রতি একটা সহানুভূতি এসে গিয়েছিল। কিন্তু মারাঠী জেলার ভেঙ্কট রাও ও মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে এই যুক্তপ্রদেশের লোকটিকে বিশ্বাস করতো না। কাজেই ইনি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। সারাদিনের খাটুনির পরে সন্ধ্যাবেলায় একটু ছুটি পেতেন। তখন এক ক্লাবে যেতেন। সেখানে স্থানীয় বাঙালীদের সঙ্গে দেখা হ'ত। বাঙালীরা ওঁর কাছে আমার খোঁজখবর নিতেন। আমি যে ঐ জেলে প্রায়োপবেশনে আছি সে-খবরও কাগজে বের ক'রে দেন ওঁরাই।

ভোরবেলাটা ইয়ার্ডের কাঁকরের উপর দিয়ে একটু বেড়াতাম। সেই সময়েই চন্দ্রিকাপ্রসাদ আসতেন। যা খবর থাকতো দু'এক কথায় ব'লে চ'লে যেতেন। বেশী সময় থাকতেন না, পাছে সিপাই জেলারকে ব'লে দেয়।

একলা ব'সে আকাশপাতাল কতো কথা ভাবি। মনে পড়ে, একদিন মরতে চেয়েছিলাম—ক্ষুদিরামের মতো, কানাইয়ের মতো ফাঁসির কাঠে। ছেলেবেলা থেকে মালা গাঁথতে ভালবাসতাম। কতো যত্নে এঁদের ছবিগুলোকে মালা দিয়ে সাজাতাম, অন্যের অলক্ষ্যে ছবি খুলে নিয়ে বুকে চেপে রাখতাম—জিজ্ঞেস করতাম, তোমাদেরই মতো কি জীবনকে সার্থক করতে পারব না?

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। যতীন দা বসেছেন উদার আকাশের নীচে দৌলৎপুর কলেজ হোষ্টেলের দোতলার খোলা বারান্দায়। গভীর রাত। আমি একলা ওঁর দিকে চেয়ে ব'সে। যতীন দার ঐ মুখখানা, ঐ চোখ দুটো, ঐ বুকখানার সঙ্গে ঐ আকাশখানার কোথায় যেন যোগ আছে, কোথায় যেন মিল আছে। আকাশের রবিকে রবীন্দ্রনাথ মিতা বলে ডেকেছেন, ঐ আকাশখানাও যেন যতীন্দ্রনাথের মিতা।

চোখ নামিয়ে বললেন, প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই—একে একে ম'রে দেশকে জাগিয়ে গেছে। এখন আর একে একে নয়, আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যুদ্ধ ক'রে ম'রে দেশকে জাগাব।

বার বছর বয়সে মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত প'ড়ে রঘুনাথজী হাবিলদারকে করেছিলাম জীবনের আদর্শ। ভোরের দিকে যতীনদা চ'লে গেলেন। রাস্তায় তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, রঘুনাথজীর মতোই তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পার তো? যুদ্ধে ম'রে জীবন সার্থক করতে পারব তো?

মনে পড়ে, যতীনদার কথাগুলোয় মনটা তখনও ভরপুর। বেলা প্রায় দুপুর। মেসে সহপাঠীদের খাবার জন্য তরকারীর যোগান করেছি। তাই ঘিয়ের জন্য জিওল গাছের ডাল কাটতে যাচ্ছি। কাঁধে গামছা, হাতে একখানা কাটারি। সমস্ত কথাগুলো যেন নিজের ভিতর সামাল দিতে পারছিনে। ভৈরবের ধারে একটা গাছের ছায়ায় বসলাম। একে একে জীবনে প্রিয় সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। শুধু মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে চোখের জল সামাল দিতে পারলাম না। সে চোখের জল আমার কালে কালে শুকিয়ে গেল।

(১৩৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

শরৎ সাহিত্যের মণি-দীপিকা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[ ]

দীনবন্ধু মিত্রের দেহরক্ষার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'জীবন চরিত' সম্বন্ধে যে একটি চমৎকার নির্দ্দেশ দেন সেটি এমন তাৎপর্যপূর্ণ এবং সত্য যে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না কোরে' থাকা যায় না।

আমাদের দেশের মনীষীদের ইতিহাস এবং জীবন চরিতের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বৈরাগ্য যে ছিল একটা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অল্প বয়সে আমাদের দেশী এবং বিদেশী অধ্যাপকদের কাছে এ সম্বন্ধে কতকটা গঞ্জনা মূলক অখ্যাতি শুনে মন একান্ত ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণও হোত: কিন্তু আজ আর সে বেদের অবস্থা অতিক্রম কোরে' মন এমন একটি অবস্থায় উত্তীর্ণ হোয়ে এসেছে যে, তাঁদের সম্যক দর্শনের শক্তি উপলব্ধি কোরে' বিস্ময়-মুগ্ধ না হোয়েও থাকা যায়না।

প্রথম ইতিহাসের কথাটা পাড়া যাক্। 'ব্ল্যাক্ হোল-ম্যাসাকার"—যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় 'অন্ধকূপ হত্যা' বলি'—সেটি যে ভারতবর্ষের গায়ে বিদেশী ঐতিহাসিকদের স্বকপোল কল্পিত পর্ব্বত-প্রমাণ মিথ্যার অর্ব্বুদ তা' আজ নিঃসন্দেহে প্রমান হোয়ে গেছে। ইংরেজকে একদিন এদেশের লোক দেবতা মনে কোরেছিল। আজ তার স্থান কোথায় তার সঠিক নির্ণয়ের সময় হয়তো এখনও আসেনি! অলমতি বিস্তরেন?

এইবার 'জীবন-চরিতের' দু'কথা বলি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর ছ'মাস যেতে-না-যেতে খানকয়েক জীবন-চরিত "রেসের ঘোড়ার" মত ছুটে বার হোয়ে এসেছিল। সেগুলি "গো-ঘাসিতে" কিন্তু ভরা! তাই লক্ষ্ণ "বাপার আদেশে" কনিষ্ঠের তক্‌মা বেঁধে মিথ্যার ধ্বজা উড়িয়ে বাজিমাৎ কোরলেন। এই যে একটা অন্যায় প্রতি-যোগিতার উৎপাত এটি সত্য গোপনের হয়তো একটা কুৎসিত চেষ্টা! ইতিহাস এবং জীবন-চরিত বহু গবেষণা সাপেক্ষ বিষয়। মোটেই তুড়িলাফ্ খেয়ে কসরৎ বাজির 'খেল্' নয়। আমের আঁঠি পুতে সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে দর্শককে আমের চাক্‌লা খাইয়ে কাপ মোলে পয়সা আনায়! তাও এ নয়!

আলোর আসে-পাশে গাঢ়িপোকার সমাগম হয় বটে। প্রতিভার পাশে—অপ্রতিভদের দল আসবেই—সেই খেসারী খেসাটা শেষ হয়েছে বলেই মনে হয়। কেন না, দেখচি ব্রজেনবাবু বেকুতায় গাঁধুনির জন্যে সাহিত্য-পরিষদে কিছু কিছু মাল মশলা সংগ্রহ কোরেছেন। তাঁকে সহৃদয় ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এইবার সেই চিঠিগুলির সংগ্রহের আলোচনাটি করা যাক্।

চিঠি মানুষ মানুষকে লেখে—যাকে লেখে তার স্বরূপ, ওজন, খ্যাতি, প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বুঝে। চিঠির সংগ্রহের মধ্যে শরৎচন্দ্র যাঁদের পরম আত্মীয়-বন্ধু বোলে' মনে কোরতেন তাঁদের কাউকেই তো খুঁজে পাইনে। যতটুকু জানা আছে,—যে সব মানুষদের কাছেই সবচেয়ে বেশী চিঠি তিনি লিখেছিলেন—অনেক খুঁজে পেতেও তাঁদের ঐ সংগ্রহের মধ্যে সেগুলি পাওয়া গেল না কেন? তাই ভাবি আর উত্তর-উত্তর বিস্ময় বেড়ে যায়। শরৎচন্দ্র মানুষটিকে তাঁর রচনার মধ্যে ধরা যায় না,—তাঁর চিঠির মধ্যেও ধরার পথ আজও বার হোল না: তিনি পাকা অভিনেতা ছিলেন বইগুলি তাঁর অভিনয়ের মঞ্চ! এই চিঠিগুলি সেখানকার "আলোবাতি"। দুঃখ, যে তিমিরে সেই তিমির।

কিন্তু সত্যকে গলা টিপে কেউ হত্যা কোরতে পারেনা;—এই মানুষ মনের একনাত্র সান্ত্বনা! সত্য পিরামিডের মধ্যে পেঁয়াজ রসুনের মত নিজের জীবনীশক্তি দিয়ে থাকে অমর হোয়ে! দেব-দৈত্য-দানব তাকে নিঃশেষে শেষ কোরতে পারেনি তো দেখি, আজ পর্য্যন্ত।

এই চিঠিগুলি কিন্তু জীবনী লেখকদের পক্ষে মোটেই অকেজো হবে না। শুধু শরৎচন্দ্রের প্রতি যাঁরা অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে আছেন আজও, তাঁরা অপগণ্ড ছেলে—পরে যাঁরা ধ্যান নেত্রে তাঁকে দেখবেন,—তাঁরাই তাঁর সত্য স্বরূপটি উপলব্ধি করবেন।

সাপের মণিরই দাম। সাপের দাম তো পাঁচ কড়ি থেকে বড় জোর পাঁচ সিকে উঠ্‌তে পারে!

শরৎ প্রতিভার সৃষ্টিই থাক্‌বে। তাই তাঁর সৃষ্টির ওপর আলো ফেলে দেখা ভালো, জানা ভালো—আমরা কি ভাবে কতখানি সম্ভোগ কোরতে, যাচাই কোরতে পারি, সে গুলি!

এই লেখার শিরোনামের স্বার্থকতা কি তা হয়তো বলা দরকার। শরৎচন্দ্রের বইগুলি সংগে তাঁর জীবনের ঘটনার কোথাও কোন সম্পর্ক যদি থাকে তো সেগুলির সংগে পাঠকের পরিচয় হোলে হয়তো সেগুলি বোঝবার কিছু কিছু সুবিধা হতে পারে।

পাঠক অনেক রকমের হোতে পারেন। তবে মোটা-মুটি দুটি ভাগ করা চলে। এক শ্রেণী "প্রবুদ্ধ," অপর শ্রেণী "অপ্রবুদ্ধ"। নভেল অনেকে পড়েন গল্পের খাতিরে। এই গল্পের নেশা মানুষের আবহমান কাল থেকে চলে আস্‌চে। এই প্রবাহের ধারায় সাহিত্যের জন্ম।

যাঁরা গল্প শুনেই তৃপ্ত এবং তুষ্ট হন তাঁদের নিয়ে বড় কোথায় গোল দাঁড়ায় না। কিন্তু প্রবুদ্ধ পাঠকদের নিয়ে লেখকদের চিন্তা এবং মাথা ব্যথা; কেন না তাঁদের মতের উপর লেখকের খ্যাতি অখ্যাতি, লাভালাভ নির্ভর করে। যখন রবীন্দ্রনাথ প্রথম লিখ্‌তে আরম্ভ করেন তখন তাঁর লেখা পড়া আমাদের অন্তত নিষেধের মধ্যেই ছিল। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন পত্রে তাঁর লেখা তুলে দিয়ে বলা হোতো "রাইট ইন এলিগ্যাণ্ট বেংগলি"—অর্থাৎ "শুদ্ধ বাংলায় লেখ।" কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। অতএব দেখা যাচ্চে—জনমত খাম-খেয়ালির ওপর নির্ভর করে এবং আজ পরিবর্তনশীল।

* *

আজ যে কথা গুলি শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে বোলতে চাই সেগুলি বলার আমার কোন অধিকার আছে কিনা এও একটি সমীচীন প্রশ্ন। নিজের পরিচয় দেওয়ার মধ্যে অনেকখানি যে বিড়ম্বনা আছে তা বিবেচক মাত্রেই বোলবেন। আত্মপ্রশংসা মহর্ষি নারদের মতে আত্মহত্যার মতই মহাপাপ। এদিকে আত্মপ্রশংসার ডোল বড় সূক্ষ্ম ব্যাপার!

যে কথা মহাভারতের দিনে অদের ছিল আজ তার কিছু মূল্য হোয়েছে, কেন না দীর্ঘদিন পরাধীনতা কোরে' আমাদের অনেকটা পতন হোয়েছে। আজকাল দেখতে পাওয়া যায় আত্মপ্রশংসার কিছু কদর আছেই আছে; এটা পতিত জাতির বোধ হয় এটা সাময়িক যুগ-ধর্ম। আগে—যে জাতই হোক্ না কেন, সদ্‌গুণের অধিকারী হোলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ কোরতো। সত্যকামের মা তাকে "বহুপরিচর্যা কোরে" পেয়েছিলেন—তাহলেও ঋষি বোলতে বাধ্য হোয়েছিলেন, "তুমি দ্বিজোত্তম।"

সে বিচার একদিন উঠে কেন গেল, জানিনে; দেখি যজ্ঞোপবীতধারী হোলেই ব্রাহ্মণ হয় এবং সে পাষণ্ড হোলেও কিছু যায় আসে না।

তাই নিজের পরিচয় কিছু দেওয়া দরকার। শরৎ চন্দ্রের একজন জীবনী লেখক শরৎচন্দ্রের মাতুলদের মধ্যে শ্রেণী ভেদ কোরছেন "আপন মামা" আর "দূর সম্পর্কীয় মাতুল"।

তাঁর শ্রেণী বিভাগে বর্তমান লেখক দূরেই পড়ে। দেখা যায় দূরের মূল্য তবুও কিছু থাকে; সম্পর্ক হিসেবে। কেন না রামচন্দ্র 'জনক-দুহিতা' বিবাহ কোরে রাবণ কর্তৃক বিড়ম্বিত হোয়েছিলেন। জ্ঞাতি একটু দূরের হোলে শত্রুতা হয়তো কম হোয়ে আসে—কেন না, আমাদের প্রবাদ-বচন আছে সবচেয়ে বড়শত্রু জ্ঞাতিশত্রু।

ইতিহাসে দেখি জ্ঞাতি-শত্রুতা বশে কে একজন বাদশা তাঁর তিন ভাইকে খুন কোরেছিলেন। অতএব নিকট মাত্রেই যে সাধু হবেন এমন মনে করার মধ্যেও ভুল থাকতে পারে।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর হয় বাষট্টি বছর বয়সে। তিনি আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ই ছিলেন। আমার মায়ের অসুস্থতা বশত শরৎচন্দ্রের মাতা—আমার জ্যেঠ-তুতো বোন—মেজদিদির—স্তন্য পান কোরে আমার শৈশব কাটে। শরৎচন্দ্রের সংগে খেলা কোরেছি, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কতো বেগার খেটেছি। তিনি গৃহ-শিক্ষকের

সহায়তাও কোরতেন আমাদের। সাহিত্যের গুরু ছিলেন। অনেক মার খেয়েছি, ততোধিক স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। তাঁর শেষের দিনগুলি তাঁর ইচ্ছা এবং আহ্বানে তাঁর সংগে কাটাতে হোয়েছিল। তাই মনে হয়—তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা থাকা অসম্ভব নয় লেখকের পক্ষে এবং একটু আধটু বলার অধিকারও হয়তো বা আছে!

* * *

শরৎচন্দ্র স্বভাবত বেশ একটু চাপা প্রকৃতিরই মানুষ ছিলেন। তিনি যৌবনে চমৎকার অভিনয় কোরতে পারতেন এবং অন্তরে অন্তরে বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু বাইরে বোলতেন তিনি 'নাস্তিক'। শিবপুরে থাকার সময় তাঁর বাড়ীতে কীর্তনীয়ারা এসে প্রতি প্রভাতে নাম-গান শুনিয়ে যেতো। তিনি নিজে চমৎকার কীর্তন গাইতে পারতেন—গানের সময় তাঁর গলা "ধামা কণ্ঠ" হোত। ভাগলপুরে থাকতে তিনি মৃণালিনীর পার্টে গান গেয়ে আসর মাৎ কোরতেন।

তাঁর "চরিত্রহীন" পোড়ে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন কোরে ছিলেন; তুমি তো অবিবাহিত,—কিরণময়ীর মুখে যে উচ্চাংগের প্রেমতত্ত্ব দিয়েছ—সে কি তোমার নিজের উপলব্ধি?

শরৎ হেসে উত্তর দিয়াছিলেন—মোটেই না, বৈষ্ণব সাহিত্য বহু যত্নে এবং শ্রদ্ধার সংগে এক সময় পোড়েছিলাম। তারই ওটি ফপ্‌চানি! তাঁর 'মণি মামা'—যখন পুরো বৈষ্ণব হোয়ে গেলেন তখন শরৎচন্দ্র তাঁর সংগ্রহ থেকে প্রায় সব বৈষ্ণব বইগুলি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন।

চাপা-প্রকৃতি মানুষদের যা হয়, তিনি সর্বদাই খুব ছিসেব কোরে কথা কইতেন। তাতে আত্ম-পরিচয় খুব কমই থাকতো! তাঁর যখন খ্যাতি প্রতিপত্তি খুব বেড়ে উঠলো তখন অনেক লোকে এসে অনুরোধ কোরতেন যে, শরৎবাবু,—আপনি 'আত্ম জীবনী' লিখুন না। তার উত্তরে বোলতেন: জীবনে অনেক ভুল কোরেছি; কিন্তু ও ভুল কিছুতেই কোরবো না। তাঁর আত্মার স্বজনকে দেখিয়ে বোলতেন, ওকে ধরগে!—কল্লোল পত্রিকায়,—তাঁর বেঁচে থাকার সময় লেখাটি-তো অনেক জীবনী লেখকের ব্যাং এর আধুলি হোয়ে আছে।

কিন্তু সে ভুলটি কার দোষে হোয়েছিল তা বলা যায় না। তাঁর শ্রীকান্ত প্রথম পর্বের ভূমিকায় যে কথাগুলি লেখা আছে সে গুলি বোধহয় সাহেবের কিছু-কিছু স্বকপোল কল্পনাও তাঁর হয়তো তাতে আছে। মনে হয়, এটি শরৎচন্দ্রের ইচ্ছাকৃত ভুল; কিম্বা সত্য নিজের শক্তিতে আত্ম-প্রকাশ কোরেছে। তিনি কোথাও নিজের "বাবার" পরিচয়টি দিতে চাইতেন না। এই ভূমিকায় তা কেন দিলেন তা বোঝা শক্ত। তাঁর পিতা কোন কাজই আরম্ভ কোরে' শেষ কোরতেন না। হোতে পারে আর একদিকে শরৎচন্দ্র পিতৃ-ঋণটি শোধ কোরেছেন।

শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্র যে নিজে নন্—সে কথার আলোচনা যথা সময়ে করা যাবে। এখানে এইটুকু বলা আবশ্যক যে শ্রীকান্ত চরিত্রের কাঠামোটি পিতার চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু তাতে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা শুধু নয়, তিনি সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাংগালীকে যা দিতে চেয়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ চরিত্র গুলিকে সৃষ্টি কোরে গেছেন।

শরৎচন্দ্র যে দেশ-প্রেমিক ছিলেন তা' তাঁর বইগুলির পাঠক মাত্রেই স্বীকার কোরবেন।

তাঁর "নারীর মূল্য" বই খানিতে যে-আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—অর্থাৎ জাতিকে বড় কোরে তুলতে হোলে সে জাতির নারীদের নারীর উপযুক্ত মর্যাদা দান না কোরলে জাতি কিছুতেই বড় হোতে পারেনা, ছেলেরা যদি জানে যে তারা দাসী পুত্র তো তারা কোন্ পথ দিয়ে কি কোরে বড় হোয়ে উঠতে পারে? বোধহয় নারীর মূল্যের এই "সংকল্প বাক্য" তার সাহিত্য-যজ্ঞের।

মনে হয় এই দানই শরৎ সাহিত্যের সর্ব শ্রেষ্ঠ দান। এই চেতনা শরৎ-সাহিত্যের প্রাণ-স্বরূপ এবং ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নারী চেতনা দেশে চমৎকার সাড়া দিয়েছে। সব চেষ্টার আরম্ভে কোথাও কোথাও সর্বাংগীন সুন্দর রূপ রক্ষা কোরতে না পারাই স্বাভাবিক। শিশু হাঁটতে গিয়ে পোড়েই থাকে। তাতে হতাশ

হালে কি চলে?

শ্রীকান্তের চারটি পর্বে—বহুতর নারী বহুমূর্তিতে প্রকাশ পেয়েছেন। শরৎ-সাহিত্যের যদি কোন "দর্শন" থাকে তো—তাঁর সাহিত্যের নারী চরিত্রগুলি তারই "ইলাস্ট্রেশন"—উদাহরণ।

বিশেষ কোরে শ্রীকান্তে তার বাছা-বাছা দৃষ্টান্ত আছে।

একটি কথা আমাদের বিশেষ ভাবে চিন্তা কোরে দেখা উচিত ছিল। শরৎ-সাহিত্য মূলতঃ প্রকাশের অবসর পেয়েছিল "ভারতবর্ষের" ক্রোড়ে। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনার একটা জল্পনা কল্পনা হোয়ে সহসা কেন বন্ধ হোয়ে গিয়েছিল এটি নিশ্চয় একটি গবেষণার বিষয়।

এখানে দেখি ঋষি বঙ্কিমের সাবধান বাণী অপ্রবুদ্ধ ভাবে কাজ কোরছে। সমস্ত আলোচনা থেকে দেশের লাগও ভেলি সোরে দাঁড়ালেও জন কয়েককে নিরস্ত করাও যায়নি। তাঁরা এক-একখানি মিথ্যা এবং অসম্পূর্ণ জীবনী বার কোরে' কি উদ্দেশ্য সাধন কোরেছিলেন তা বোঝার সময় এখনও হয়তো একেবারে উত্তীর্ণ হোয়ে যায় নি। আর একটি জিনিষও লক্ষ্য করা যেতে পারে—শরৎচন্দ্রের অসম্পূর্ণ পুস্তক অতিশয় অক্ষম ভাবে সম্পূর্ণ কোরে কি লাভ হোয়েছে দেশের এবং দশের এ প্রশ্ন—সকলের মনে জাগলেও কেউ কথা কইলেন না কেন? হয়তো বাংলার সাহিত্য-জগতে এর উত্তর দেওয়ার সময় এখনও আসেনি?

মহাকালের নির্দেশে তা হয়তো যথাকালে প্রকাশ পাবে।

* * *

শরৎ-সাহিত্যের চরিত্রের আলোচনাই মণি-দীপিকার মূল উদ্দেশ্য। তা হয়তো পুস্তক আকারে প্রকাশিত হোলে তার স্বরূপটি বোঝা সহজ হোত। কিন্তু বর্তমানে কাগজ এবং ছাপাখানা এমনি একটা দুর্মূল্যের অবস্থায় গিয়ে পোড়েছে যে তার উত্তাপে তার কাছে যাওয়াও শক্ত, কি প্রায় অসম্ভব।

তাই, মাসিক, পাক্ষিক, কি সপ্তাহিকের সহায়তায় প্রকাশ হওয়া ভিন্ন অন্য গতি নেই।

এই লেখা খণ্ডাকারে প্রকাশ করার জন্য লেখক—সম্পাদক এবং প্রকাশকের কাছে—তাঁর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন। প্রসিদ্ধি আছে প্রাজ্ঞ অজর অমর মনে কোরে নিজেকে—বিদ্যা এবং অর্থের চিন্তা কোরবেন। কিন্তু মৃত্যু কেশ ধারণ কোরে আছে মনে কোরে—ধর্ম চিন্তা কোরবেন।

সত্যই কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়?

খণ্ডাকারে প্রকাশের দোষ—অন্ধের হস্তী দর্শনের ধারণার মতই হোতে পারে। নিরুপায়ের আশাই একমাত্র অবলম্বন। এই আলোচনা পূর্ণতা লাভ কোরলে—পাঠকের ক্ষোভের কারণ হয় তো না থাকতেও পারে।

[২]

এই লেখার দ্বিতীয় কিস্তিতে এর উদ্দেশ্যটি আরও পরিষ্কার কোরে' বলার দরকার আছে বোলে' মনে হয়। ইতিহাসের মতই জীবন-চরিতও ব্যক্তি মতবাদের কৌশলে প্রকৃত এবং সুষ্ঠু আদর্শ চ্যুত হোয়ে যায়, দেখা গেছে। যেমন আকবর এবং ঔরংজেবের চরিত্র সম্বন্ধে বিরাট মতভেদের কারণ তো এই। মানুষকে ঠিক কোরে' চেনা-জানা যে খুব শক্ত তা আমরা জানি। তাদের কাজের ফলা ফলের বিচার বোধকরি, অপেক্ষাকৃত সহজ। আকবর একটা সাম্রাজ্য গোড়ে' তুলেছিলেন যে উদারতায় তাকেই তো ঔরংজেব মুখে ঠেলে দিয়ে গেলেন আর একজন, তাঁর গোঁড়ামি বুদ্ধিতে। এদিকে ঠিক কোরে' দেখতে গেলে ধর্ম তো মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা। কোন রাষ্ট্র যদি নাস্তিক্যবাদের সমর্থককে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেয় তো দেখা যাবে সেখানে উদার-চিন্তার অভাবই ঘোটেচে।

কিম্বদন্তী আছে যে কালীদাসের মৃত্যু হোয়েছিল বেত্রাবাড়ীতে, তাই বোলে কি শকুন্তলা নাটকটি পুড়িয়ে ফেলতে হবে? মানুষ যখন এই রকম বিচার করে—তখন বুঝতে হবে যে তার বুদ্ধি-বিভ্রম ঘোটেচে।

সেদিন এক বিজ্ঞ অধ্যাপক বোল্‌লেন লেখকের জীবন যদি তাঁর সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত না হয়তো—সে জীবনী সত্য নয়। এটি তাঁর নিজের মত কি বিদেশী বইএর মত—তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। চিনির বলদ তো চিনির আস্বাদ জানে না! ইংরিজি বয়েদ মুখস্থ করে' হয়তো এম-এ, কি পি-আর-এস হওয়া যায়; কিন্তু তাতে কাক্ বহু পরিচর্য্যায় কাকই থাকে তাকে তানপুরার ডিম্ খাওয়ালেও সে পিক্ হবে না।

সেদিনো রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র এম-এও নন্ এবং পি-আর-এসও নন্। তবুও—

কে নাকি বোলে গেছেন; বিদ্যা বিনয় দান করে। কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্বানেরা কেমন তর গোঁতে গিয়ে দুর্বিনীত হন। পোড়াকপাল আমাদের!

আবার কে নাকি বোলে গেছেন পণ্ডিতদের সবই গুণ—দোষের মধ্যে যা ওই গিয়ে—তাঁদের মূর্খতা টুকুই!

কি একজন পণ্ডিত শরৎ-সাহিত্যের "পতিতা" নিয়ে নাপা ঘামিয়ে পতিতা উদ্ধারের সাধু চেষ্টায় বই লিখে সাহিত্যিক "বন ফুলের" কাছে বই খানির ভূমিকা লিখিয়ে নিলেন—"নিশ্চয়-কাটতির" জন্যে। ভূমিকায় দেখি শরৎ-সাহিত্যে 'পতিতা' নেই। এঁকেই বোধহয় ওরা বলেন "বিশ মিল্লার গলদ" ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা! ব্রাভো!

আমাদের সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের আলোচনা বর্তমান নিবন্ধটির উদ্দেশ্য। শরৎচন্দ্র একজন সাহিত্যিক ছিলেন। প্রমাণ চাইলে বোল্‌বে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে "ডি-লিটে" নেগে ছিলেন.। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সাহিত্য বোলে' বোলে থাকেন দেশের লোকেরাও যদিও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে গুম্! তাবৎ চ শোভতে "বিজ্ঞ" যাবদ্ কিঞ্চিন্ ন ভাষতে!

যদি কেউ বলেন ও সব সাহিত্যই নয়—"কৃত্তিবাস ওঝার পর বাংলা দেশে সাহিত্যিক জন্মায়নি।" তাহলে?

"ওথেলো! দাই অক্কু পেশন ইজ গন্।"

* ** *

এক রকমের লোক আছেন যাঁদের মধ্যে দেখি, সম্ভোগ প্রবণতাটাই একটু বেশী বেশী! তাঁরা একটু গল্পপ্রিয় জাতীয়। রসোগোল্লা কোন্ লোকানের? ভীম নাগ, না বাঁশিকের? তাঁদের এ প্রশ্ন সম্ভোগ-নিবিড়তার দরুণ মনে উৎপন্নই হয় না। নিশ্চয় সুখী জীব তাঁরা। শরৎচন্দ্র তাঁদের একটি চমৎকার নাম দিয়েছিলেন; গো-গ্রাস-শিরোমণি! তাঁদের পেলে পুষীর চাইতে যদি বেশী কিছু মনের ভাব পাকে তো তাই হোতেন তিনি! অকপট চিত্ত, নিষ্পাপ মন! একটা বালিশ টেনে নিয়ে বই খুল্‌লেন—পাঠ এবং নিদ্রার আরক রসে, হাসি কান্নার পালা-পালিতে বই শেষ কোরে' নিদ্রিত হোয়ে স্বপ্নাবেশে সমালোচনার প্রক্রিয়াও শেষ কোরে' উঠে বোস্‌লেন। তারপর রামাকে ডাক দিয়ে অম্বরি তামাকের ধূম উদ্গীরণ কোরে' বোল্‌লেন—এই নে—রাখ টেবিলের ওপর বইখানা—পড়া আমার হোয়ে গেছে;—আর একখানা আন্‌বি—এই লাল মোহন সিরিজের!

রামা চতুর-শিরোমণি—বোল্‌লে; অনেক বাবু দেখেছি, এমন পড়িয়ে ভূ-ভারতে কোথেও নেই!

বিদেশের এন-এ রে! মুটো মুটো টাকা খরচ কোরে'.....এ গল্প রামার কণ্ঠস্থ—তবুও সে দুচোখ ভাগর কোরে শোনে!

আর একদল আছেন তার্কিক। তারা বুদ্ধিমান হোলেও হতভাগ্য। কারণ তর্ক তো 'নিরবধি।' আদি কারণে না পৌঁছতে পারলে তো তার শেষ নেই। এটি ভগবানের একটি খেলা-ঘর এখেনে চোল্‌ছে নিত্য নিয়ত কাপা-কাপির খেলা।

তার্কিকরা বলেন তোমাদের বিশ্বাসের ভূমি কোথায়? 'চিত্ত'—উত্তর আসে। রামোঃ সেটাতো একটা অন্ধকূপ! সেখানে কামনা বাসনা—প্রবৃত্তি গুলো দাপাদাপী কোরছে। তাদের প্রশ্রয় দিলে মানুষ জানওয়ার হোয়ে যায়! যুক্তির আলো চাই। যুক্তি নৈলে ধর্মহানি হয়!

*

তার মনের গঠনের একটা বিশেষত্ব ছিল, সহজে বড় কারুর কথা শুনতেন না শরৎচন্দ্র। কারুর ফরমাসি লেখা লিখতেন না বড়-একটা। এই লেখার ভার গোড়ে নিয়ে বেশ বিব্রত হোয়ে পেড়েছিলেন যে, তা তাঁর রেংগুন থেকে হরিদাস বাবুকে লেখা চিঠি খানি পোড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়!—

এই সেই চিঠি খানির নকল :— (অবশ্য শেষের দিকে অবান্তর বোলে কতকটা বাদ দিতে হোয়েছে)

রেংগুন ১৫-১১-১৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" যে সত্যই ভারতবর্ষে ছাপিবার যোগ্য আমি তাহা মনে করি নাই—এখনও করি না তবে যদি কেহ কোথাও ছাপে এই মনে করিয়াছিলাম। বিশেষ তাহাতে গোড়াতেই যে শ্লেষ ছিল, সে সকল যে কোন মতেই আপনাদের কাগজে স্থান পাইতে পারে না, সে তো জানা কথা। তবে, অপর কোন কাগজের হয়ত সে আপত্তি না থাকতেও পারে এই ভরসা করিয়া ছিলাম। সেই জন্যই আপনার নিকটে পাঠানো। যদি বলেন তো আরও লিখি—আরও অনেক কথা বলিবার রহিয়াছে। তবে ব্যক্তিগত আক্রোশ-বিদ্রূপ ঐ পর্য্যন্তই।

আমার নামটা যেন কোন মতেই প্রকাশ না পায়।.....অবশ্য শ্রীকান্তের আত্ম-কাহিনীর সংগে কতকটা সম্বন্ধ ত থাকবেই, তা ছাড়া ওটা ভ্রমনই বটে। তবে 'আমি' নেই। অমুকের সংগে সেতারও করিয়াছি অমুকের পা দোঁসিয়া বসিয়াছি এসব নেই।.....রবিবাবু নিজের আত্ম-কাহিনী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু নিজেকে এমন করিয়া সকলের পিছনে ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন যাহারা লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাদের লেখার পরশ হয় নাই, তা তাহারা যত বড় লোকই হন, না জানিয়া তাহাদের দীর্ঘ লেখা ছাপিবার অনেক দায়। ইহারা মনে করে যে সব কথাই বুঝি বলা চাই-ই। যা' দেখে, যা শোনে, যা হয়, মনে করে সমস্তই সকলকে দেখান শোনান দরকার। যারা ছবি আঁকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে, যা চোখের সামনে দেখি সবই আঁকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায় না, তা' নয়। অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়। অনেক বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা যা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্ম সংযম, অনেক লোভ দমন করিতে হয়, তবেই সত্যিকার বলা এবং আঁকা হয়। .....যাই হোক শ্রীকান্ত পোড়ে লোকে কি রকম ছি ছি করে দয়া করে আমাকে জানাবেন। ততদিন শ্রীকান্ত একটি ছত্রও আর লিখব না।"

এই চিঠি খানির মধ্যে এমন একটি শ্লেষ আছে যা' থেকে যাঁকে এই চিঠি লেখা হোয়েছে তিনিও বাদ যান নি। পাঠককে একটু খেই ধরিয়ে দেওয়া বোধহয় দরকার। এর মধ্যে অভিমান আছে। মনে রাখতে হবে যে এর আগে "চরিত্র হীনের" ভারতবর্ষের রুচি বাগীশদের বিবেচনায় যায়গা হয়নি।

* * *

বইখানি যে ভ্রমন-কাহিনী নয় তা একটু প্রণিধান করলে বোঝা শক্ত হবে না। সেখেনে জুড়ে-তেড়ে' কোন রকমে আটকে খাড়া কোরে তোলার বাহাদুরী আছে।

ভ্রমণ কাহিনী যে হবে না তা তিনি ভালো কোরেই জানতেন। যদি শুরুতে ভাগলপুরের মামার বাড়ীর প্রসংগ না এনে—দেবা-নন্দপুর কি ডিহিরির কথা লিখতেন তো এমন কোরে আজ হাতে-নাতে ধরা পোড়ে' যেতেন না নিশ্চয়।

একটা বিষয়, কি জিনিষকে অন্যরূপ দেওয়ার,—যাকে পণ্ডিতরা "রূপান্তর" বোলে থাকেন—সে শক্তি তাঁর অসীম ছিল। কিন্তু এই শ্রীকান্ত 'ফরমাসী—লেখার' সময় মনটি তাঁর এমন বিব্রত হোয়ে পোড়েছিল যে, তার একটা সহজ সমন্বয় খুঁজে পান নি। তখন "কান্তে ভেংগে করতাল গড়াতে" বোসলো। দাদা মশাই তখন হোলেন পিসে মশাই—এবং ব্যাকরণ সংগতিতে দিদিমা হোলেন পিসিমা! মামাদের বোললেন দাদা! একেই

বোধ হয় ইংরিজিতে বলে "মেটামোর্ফসিজম" আমরা বোলবো ভোলবাজি! তার মনেই আসেনি হয়তো তখন,—ধরা পড়ার সম্ভব না পেছনে উদ্যত!

* * *

তবে, আরও একটা কথা আছে; তিনি দুটি-তিনটি মানুষকে সমস্ত মন দিয়ে ভালো বেসেছিলেন জীবনে তাদের কথা শেষ কোরে' বোলেও তাঁর আস্তি মিটতো না। এক একটা পেট রোগা ছেলের যেমন হোয়ে থাকে। তাদের কথা বোলে তাঁর আকৃতিও মিটল না এ জীবনে। শেষের পরিচয়েও মেটাতে পারতেন কি না সন্দেহ। সেটি দুঃখের কথা অনির্বাণই রইলো।

একজনের কথা বোলতে আর আমাদের কোন দ্বিধা-বাধা কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিষেধ নেই। কেন না, মরণের পারে গিয়ে তিনি শরৎ সাহিত্যে অমর হোয়েছেন।

তিনি ইন্দ্রনাথ।

এই শ্রীকান্ত বই কখানি অপূর্ব রস সম্ভারে সম্পন্ন! এ যেন বাণীর নিত্য নবতর খেলা ঘর! বাণীর বর পুত্র বেদবল কোরে' তাকে,—জীবনের ধন গুলিকে নিয়ে আবার নবতর খেলা জুড়ে দিয়েছেন। ভালোবাসার পাত্রগুলিকে নিয়ে হৃদয়ের অতিচার গতিকে চেপে অসাধারণ নিষ্ঠা আর, সংযমের অপূর্ব পরিচয়ের একটি হ-জ-ব-র-ল! এর গতির উদ্দামতা আছে, উচ্ছলতা আছে—আবার কোথাও মন্থীভূত হোয়ে বালির উপর চর বেরিয়েও গেছে! শরৎ সাহিত্যের এটি ল্যাণ্ডস্কেপ-ছবি!

'ভ্রমণ কাহিনী' নামের মধ্যে গভীর এবং নির্মল ব্যংগ রসের ভীমরুলের হুল ফোটান আছে। এতে 'আমি' 'আমি' নেই, আছে আমি-সর্বস্ব!

* * *

শরৎ সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু হোচ্ছে হাতের কাছের জিনিষটি নাগালের মধ্যে পেয়েও না পাওয়া! আর, সেই না পাওয়ার মধ্যে মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় প্রাপ্তি হোল আত্মজয়। তার ব্যথা গভীর, পীড়া মর্মভেদী। তার সাহিত্য আছে, তার বাণী আছে, তা নিঃশব্দ—একটা অস্ফুট মধুর চাপা কান্নার অভিব্যক্তি। তার কিছু কিছু তুলনা—অলক্ষে নীড় থেকে পায়রার কাৎরানির মত! সে যেন বোবার বুক ভাংগা গ্যাঁয়ানি। তাই-ই শরৎ সাহিত্যের আদিম সুর—যাতে আগত-অনাগতের অপূর্ব আনন্দ বেদনার আছে করুণ সমাবেশ! যা' তাল-লয়-মীড়-মূর্ছনার সমাহারে নিত্য ছন্দিত এবং নন্দিত।

এই অনুভূতি প্রায় সব মানুষের কম বেশী, কিছু না-কিছু থাকে। যাদের থাকতে দেখা যায় তারাই শরৎ-সাহিত্যের রস গ্রহণ কোরতে পারে। এই কারণেই বোধ হয় শরৎচন্দ্রের জন-প্রিয়তা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হোয়েছিল।

* * *

শরৎ সাহিত্য বস্তুত বিয়োগান্ত সাহিত্যের গোষ্ঠির কটু কষায় রসের পুট-পাক। সেখানে বিরহ আছে বটে, বিচ্ছেদও হয় কিন্তু তাই শেষ কথা নয়।

পথনির্দেশের হেম, গৃহদাহের সুরবালা, তাদের তপস্যায় তারা জীবনের ব্যর্থতায় ম্লান নয়, মলিন নয়। ভারতীয় আদর্শে তারা পূত-পবিত্র। তারা দেবতা পূজার পুষ্পপাত্রে সংযম চন্দনে চর্চিত—লোক সেবায় বিকচ!

মৃত্যু নদীর পরপারের বন্ধুকে নিয়েই প্রথম পর্ব শ্রীকান্তের যবনিকা উদ্‌ঘাপিত হোয়েছে। তিনি রাজু—রাজেন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তের ইন্দ্রনাথ। শরৎচন্দ্রের শেষের কদিন কাটতো লালুর গল্প লিখে। আর মিলনের সম্ভবনার বিষাদ হর্ষের সেটি একটি সরবতের পেয়ালা! তাতে মিষ্টিও আছে টকও আছে—পেছনে বিচ্ছেদের বিষাদ—"সামনে হয় কি না হয় দেখার" সন্দেহের রেশমী পর্দা আশার আলোকে কলমল কোরছে! বড় বড় চোখে টল্ টল্ কোরছে জল! কুঁজো হোয়ে 'বোকে' শরৎ লিখ্‌ছেন—সে ছবি ভুলে যাবার নয়। সেখানে ধারার চেয়ে আনন্দের অনুপাত অনেক বেশী!

বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন ভিন্ন হোয়ে তীর্থ-পীঠ তৈরি হোয়েছিল, শরৎ সাহিত্যেও তার অনুরূপ নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

সেদিন হয় তো সাহিত্যিক একজন একটি হিসেবের ভুল বোলবেন : শ্রীকান্তর চরিত্রের রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি "ডেভেলপ্" করেনি।

উত্তরে বোলবেন : কিন্তু শরৎ সাহিত্যকে এমন বিজ্ঞির কোরে দেখলে ওর থেই ধরা শক্ত সেই বড়দিদি, পার্বতী থেকে শুরু কোরে রাজলক্ষ্মীতে আসা যায় তো কি একটা মিলের সূত্র কি পাওয়া যায় না ?

উত্তর হোবে : ওরা তো এক নয়।

যদি একই মানুষ নানা পার্টে অভিনয় করে—তো কি বল ?

তিনি হেসে বোলবেন—কিন্তু তাতো বাস্তব নয় !

বোধ হয় শরৎচন্দ্রই একাধিকবার বোলে ঢুকছেন : বাস্তব সাহিত্য নয়—তাকে সাহিত্যের পর্যায় আনতে হোলে অনেক কিছু কারিগিরির দরকার হয়। বড়দিদির সংগে পার্বতীর মিল নেই কি ? রমা ? সাবিত্রী ? ষোড়শী ?

হেসে বোললেন : এবার বুঝেছি।

ঠিক ইন্দ্রনাথও অমনি ছড়ান আছে। 'পথের দাবী'র সব্যসাচীর মেরুদণ্ড তো ইন্দ্রনাথ। শেষ প্রশ্নের রাজেন্দ্রনাথ কি ? আবার কমল কি ?

গৃহদাহের মৃণালকে মনে পড়ে ? ওটি ওরিজিন্যাল—তার পর সব আর্টের সৃষ্টি-নৈপুণ্যে রূপান্তর !

(ক্রমশঃ)

গৌরবোজ্জ্বল বাংলা

ডাঃ বাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বর্ষণ

বিপিনচন্দ্র পালের বক্তৃতা ও "যুগান্তর"

কংগ্রেসের দেয়া ব্যতিরেকে বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা রূপ নিতে পারত কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ ঐ সময়ে তো নয়ই যে যুগান্তরের কথা বলেছি সেটি বারীণ বাবুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আর একখানি কাগজ সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রহ্ম-নীতি নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। সেখানি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যা"। প্রথম প্রকাশ ১৯০৫ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া "নব-শক্তি"ও ঐ ভাবের পোষক ছিল। বিপিনবাবুর বিলাতী বর্জন বা বয়কট, স্কুল কলেজ বয়কট, সালিশী আদালত স্থাপন, সরকারী চাকরী বর্জন এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ পরবর্তি কালে গান্ধীজীর কার্য-সূচীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেব-সূচক নাম হয়েছিল গোলামখানা। বিপিনবাবু ভয় ভাঙ্গাবার জন্য বললেন—ইংরেজের জেলটা কত বড় ভাই ; সেকি বাংলা দেশের চেয়ে বড় ? সবাই জেল যেতে প্রস্তুত হলে ওরা করবে কি ?

আবার মারের মার দেবার ব্যবস্থা দিয়াছিল "যুগান্তর"। ১৯০৬ সালে মার্চ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। "ভয় ভাঙ্গা ও লাঠৌষধং" এবং পরবর্তি এই পর্যায়ের প্রবন্ধ লেখায় পর পর তরুণদের মধ্য থেকে ইংরেজের আদালত ও শাস্তি-বিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে জেল গেলেন ভূপেন দত্ত, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠ আচার্য, বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফণী মিত্র। "যুগান্তর" লেখায় সত্যি যুগান্তর এনেছিল—যেন খালি অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। "সন্ধ্যার" উপাধ্যায় মশায় ইংরেজ রাজ্য স্বীকার করতেন না। "ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" লিখে রাজদ্রোহের মামলায় পড়েন। তিনি বলেন ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত দেশসেবায় ফিরিঙ্গীর কাছে আমার কোন জবাবদিহি নেই। এরপর "মরি নাই, আমি আসিয়াছি" লেখার ফলে নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় "সন্ধ্যার" জন্য ঐরূপ বে-পরোয়া ভাবে জেল যান। এমন নারীরাও যথেষ্ট সাড়া দেন। ভূপেন দত্তের (বর্তমানে ডাক্তার ভূপেন দত্ত) জেল হওয়ায় তাঁর মাকে মাতৃজাতি অভিনন্দিত করেন। উপাধ্যায় মশায় অভিযুক্ত অবস্থায় মারা যান।

স্বদেশী আন্দোলন যে পরিমাণে প্রবল হ'ল, ছাত্রদলন সেই পরিমাণে বেড়ে চলল। বাঙ্গলার প্রতিরোধ শক্তি তখন দুর্বার। ১৯০৬ সালে এই তীব্র আন্দোলন থেকে ছাত্রদের দূরে রাখার জন্য প্রাদেশিক ও ভারত সরকার —লায়ন সার্কুলার, কার্লাইল সার্কুলার এবং রিজলি সার্কুলার জারী করেন। প্রকাশ্যে বন্দে মাতরম্ বলা নিষিদ্ধ; ছাত্রদের রাজনীতিক সভায় যোগদান নিষিদ্ধ হল। কলকাতার ছাত্ররা এর প্রতিবাদে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটি স্থাপন করলেন। শচীন বসু সম্পাদক হন। ছাত্ররা প্রথমে বড় বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং সুরু করেন এবং প্রহৃত ও ধর্ষিত হন। ছাত্ররা জাতীয় পতাকার অভাব বোধ করেন এবং তাঁদের চেষ্টায় একটি ত্রিবর্ণ পতাকা ফ্রিয়ার পার্কে (মুক্ত-বধির স্কুলের পাশে) ভূপেন বসুর সভাপতিত্বে বিপুল সমারোহ ও হর্ষ-ধ্বনির মাঝে সুরেন্দ্রনাথ উড্ডীন করেন। কলেজ-স্কোয়ারে অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির অফিসে একটি জাতীয় পতাকা সর্বদা উত্তোলিত রাখা হত। বিপিনবাবু বলায় সারা বাংলায় তিনবার ছাত্রদের বিরাট ধর্মঘট হয়। এরই ফলে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়। প্রথমে তন্ সোসাইটির সতীশবাবু প্রধান কর্তা হন। ১৯০৬ আগষ্ট মাসে অরবিন্দবাবু বরোদায় সাতশ' টাকার চাকরী ছেড়ে দেড়শ' টাকা বেতনে প্রধান অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন।

এই সালে বরিশালকে "আইন-শৃঙ্খলা-ভঙ্গ-কারী অঞ্চল" বলে ঘোষণা করা হয়। বরিশালে গুর্খা বসান হয়। তারা অত্যাচারে স্ত্রীলোকদেরও জর্জরিত করে। ১৯০৬ সালে বরিশাল সম্মেলনকে ছত্র-ভঙ্গ করা, যুবকদের উপর অমানুষিক লাঠি চালানো ও মাথা-ভাঙ্গায় এবং স্ত্রীলোকদের উপরে অত্যাচারে তরুণদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। তাদের প্রাণ চাইছিল এর একটা বিহিত করতে হবে। নতুন প্রদেশের লাট ফুলারকে বলা হ'ত ফুলে লাট। লোকটা বড় অবরদস্ত ছিল। তাকে হত্যা করতে যুবকরা মনস্থ করল। রংপুর ও বরিশালে তার ওপর আক্রমণের চেষ্টা হয়। সুরেন্দ্রনাথ জানতে পেরে বরিশালের যুবকদের শান্ত ক'রে সামলে নেন।

১৯০৬ সালে কলকাতায় শিবাজী উৎসব হয়। শিবাজীর আদর্শে দেশকে অনুপ্রাণিত ক'রে স্বাধীনতা আহরণের চেষ্টায় লোকমান্য তিলক মহারাষ্ট্রে দেশে ১৮৯৫ সালে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। দেশকে ভালবাসার জন্য তিনি ১৮৮২ ও ১৮৯৭ সালে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর মতবাদ হ'ল—পরাধীন দেশের স্বাধীনতার পথ ক্লেশ-বরণ ও আত্ম-বলিদানের মধ্য দিয়েই। বঙ্গ-ভঙ্গের সময় বাঙ্গালীর প্রবল গণ-আন্দোলন ও দারুণ সংকল্প তিলকের প্রাণকে স্পর্শ করে। তাই তিনি বাংলার আহ্বানে কলকাতায় শিবাজী উৎসবে যোগ দিয়ে এটিকে সাফল্য মণ্ডিত করেন। এই সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। নেতারা তখন দুদলে বিভক্ত—নরম ও গরম দল। স্বাবলম্বন ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসবানরা হলেন গরম দল—লালপৎ রায়, তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল। অরবিন্দবাবুও এই দলে যোগ দেন। গরম দলের হাত থেকে কংগ্রেস বাঁচাবার জন্য বিলাত থেকে দাদাভাই নৌরজীকে নরম দল সভাপতি ক'রে আনেন। দাদাভাই বলেন—শুধু স্বদেশীতে হবেনা, আমাদের চাই স্বরাজ। নরম দল স্বরাজ বলতে বুঝল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। গরম দলের ব্যাখ্যাতা অরবিন্দ বাবু বললেন—ইংরেজের সম্পর্ক-মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা।

১৯০৬ সালে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রথম সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল। পরে অরবিন্দ বাবু সম্পাদনার প্রধান ভার নেন। ১৯০৭ সালে এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবু রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হন। সে সময়ে কাগজে সম্পাদকের নাম দেবার আইন ছিলনা। সুতরাং অরবিন্দ বাবু যে বিপিন বাবুর পর সম্পাদক হন তাই প্রমাণের জন্য বিপিন বাবুকে সরকার সাক্ষী মানে। বিপিন বাবু বলেন আমি সাক্ষ্য দেবনা, শপথও গ্রহণ করবনা। অগত্যা আদালত-অমান্য অপরাধে বিপিন বাবুর ছ মাস জেল হয়। অরবিন্দ বাবু মুক্তি পান।

মকদ্দমার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য। এক

পোরা সার্জেন্ট বুটী ও কল চালিয়ে ভীড় হঠাচ্ছিল। পনেরো বছর বয়স্ক বালক সুশীল সেনকে সে প্রহার করে। সুশীলও তাকে ছাতা-পেটা করে। এই অপরাধে সেই দিনই প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে পনেরো বেত সাজা দেন। এই নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সমস্ত লোকের প্রাণে আগুন জ্বলে উঠল। এই হৃদয়হীন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে এমনই অভদ্র ব্যবহার করেন যে তিনি বিপিন বাবুর মকদ্দমা কেলে এজলাস থেকে বেরিয়ে আসেন। ইতিপূর্বে বড়া শাস্তি বহু লোককেই দিয়ে তিনি অপ্রিয় হয়েছিলেন। গুপ্ত সমিতির পক্ষ থেকে কিংসফোর্ডের প্রাণদণ্ডাদেশ হ'ল। বারীণ বাবুর লেখা থেকে জানা যায় স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ, সুবোধ মল্লিক ও চারু দত্ত সেই হুকুম দেন।

১৯০৮ সালে মে মাসে খিদিরপুরে প্রতাপাদিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বন্দেমাতরম ভয়ধ্বনি বা রণধ্বনি রূপে প্রচলিত করা হয়। তারপর বহু সভা ও সমিতির সাংকেত বন্দেমাতরম্-ধ্বনির দেশব্যাপী চল হ'ল।

অনুশীলন সমিতির কথা আগেই বলা হয়েছে। তিলক শিবাজী উৎসবের সময় সমিতি পরিদর্শনে আসেন ও সমিতির বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখে বিশেষ প্রীত হন।

বোমা-পিস্তল এখনই চালানো হবে কিনা এই নিয়ে মিত্তির সাহেবের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় বারীণ বাবুরা মুরারী পুকুরে আলাদা কেন্দ্র করেন। এঁরা বোমা তৈয়ার করতেন। এঁরা এখনই "যুদ্ধং দেহী"র পক্ষপাতী ছিলেন।

কিংসফোর্ডকে ইহলোক থেকে অপসারিত করা স্থির হ'লে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুর যায়, সেখানে কিংসফোর্ড বদলী হয়ে চ'লে গিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল কিংসফোর্ডের যখন ক্লাব থেকে ফিরবার কথা, যুবকরা তার গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু দেখতে এক রকম হ'লেও এই গাড়ীটি কেনেডি সাহেবের। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা হত হন। নির্দোষী মহিলাদের হত্যার খবরে সকলেই অতিশয় মর্মাহত হন। পালাবার সময় মোকামা ষ্টেশনে নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক দারোগা ধরতে এলে—"আপনি বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে ধরিয়ে দেবেন?" বলে প্রফুল্ল নিজ গুলিতে আত্ম-হত্যা করে। সেই বাংলার প্রথম শহীদ। ক্ষুদিরাম অস্ত্রসহ ধরা পড়ে এবং বিচারে তার ফাঁসী হয়। সে নির্ভীক ভাবে বীরের মত প্রাণ দেয়।

প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামের নিস্বার্থ আত্মদানে অভিভূত হয়ে তিলক "কেশরী" পত্রিকায় লেখেন "দেশের দুর্ভাগ্য"। এই ছেলেরা কোনরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য বা স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে হত্যা করেনি। নাচার হয়ে এ রকম কাযে হাত দিতে বাধ্য হয়েছিল।" এর ফলে তিলককে ৬ বছর বর্মা জেলে কয়েদ থাকতে হয়।

বারীণ বাবুরা যে সব প্রচেষ্টা করেন তা হচ্ছে—বরিশাল ও রংপুরে স্কুলে লাটকে হত্যা চেষ্টা। রংপুর ও হাসডাঙ্গায় ছুটি ডাকাতির প্রচেষ্টা, বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রুফ্রেজারের রেলগাড়ী উল্টে দেবার ছুটো চেষ্টা, চন্দন নগরে এবং শেষ চেষ্টা মেদিনীপুরের নারাণ গড়ে হয়। কুষ্টিয়ার পাদরী হিকেনবোথামকে হত্যার বন্দোবস্ত হয়। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে নিধনের প্রয়াস; চন্দন-নগরের মেয়রের উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা। এঁদের উচ্চ-প্রেরণা ও স্বাধীনতা আনার একনিষ্ঠ আগ্রহ,—দেশহিত ব্রতে নিজেদের উজাড় ক'রে ফেলে দেওয়ার তুলনা বিরল। মরণের মূল্যে স্বাধীনতা কিনতে এঁরা শিখিয়ে দেন।

মজঃফরপুরের ঐ ব্যাপারের পর পুলিশ বেড়াজালে অধিকাংশ বিপ্লবীকে ধ'রে ফেলে। অরবিন্দবাবুও গ্রেপ্তার হন। পরে মকদ্দমায় নরেন গোঁসাই রাজ-সাক্ষী হয়ে অরবিন্দবাবু প্রভৃতিকে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে দেয়। তার স্বীকারোক্তিতে আরও অনেক লোক ধরা পড়ে। স্বামী নিরালম্ব ও সত্যেন বসু স্বীকারোক্তি করবে ব'লে সাহায্যার্থে নরেনকে জেল হাসপাতালে ডেকে পাঠিয়ে সে ও কানাইলাল দত্ত রিভলভারের গুলিতে তাকে ৩১শে আগষ্ট হত্যা করে। ইতিহাসে এদেশে দেশদ্রোহীর এই প্রথম শাস্তি হ'ল। উভয়ে বিচারে চরম দণ্ড পায়।

এবং মানবতার মর্যাদা বৃদ্ধি ক'রে বীরের মত ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করে। কানাইয়ের ফাঁসী হয় ১০ই নভেম্বর এবং সত্যেনের ২১শে। ফাঁসীর হুকুমের পর কানাই কয়েক সের ওজনে বেড়েছিল।

এদিকে ৭ই নভেম্বর ওভারটুন হলে ছোট-লাট এণ্ড্রু-ফ্রেজারকে যতীন রায় চৌধুরী রিভলভারের গুলিতে হত্যা করতে উদ্যত হয়। গুলি লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়ায় লাট বেঁচে যান। যতীনের ১৪ বছর জেল হয়। আবার ৯ই তারিখে সার্পেন্টাইন লেন ও বৌবাজারের মোড়ে প্রহরা চাকীকে গ্রেপ্তার-রত নন্দলাল দারোগাকে নিহত করা হয়। বেচারী বিয়ে করবে সেই সংবাদ এক বন্ধুকে জানিয়ে চিঠি লেখতে যাচ্ছিল।

কানাই ও সত্যেন সম্বন্ধে ইংরেজদের পায়োনিয়র কাগজ লিখেছিল—"এরা খুন করেছে, কিন্তু এতে আত্মাহুতি আছে। এরা নিজেরা ম'রে বহু লোককে বাঁচিয়েছে। গ্রীক বীর হারমোডিয়স্ ও অ্যারিস্টো-গিটনের সম্মান এদের বাঙ্গালীরা দিলে আপত্তি করার কিছু থাকবে না।"

১৯০৯ সালে অরবিন্দ বাবুদের মকদ্দমায় সরকার পক্ষ চালনার জন্য উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে চারু বোস নামক এক যুবক গুলি করে। ধরা পড়ে বিচারে তাকে সেসনে সোপর্দ করলে সে বলে "সেসন-বিচারে কাজ নাই। আমায় কালই ফাঁসীতে লটকে দিন।" সেও মৃত্যু-জয়ী বীরের মত ইহলোক ত্যাগ করে। বিচারে বারীণবাবু প্রভৃতির শেষ পর্যন্ত আন্দামান বাস বা কারা-দণ্ড হয়।

অরবিন্দ বাবু ১৯০৯ সালে ৬ই মে মুক্তিলাভ করেন। তিনি বেরিয়ে এসে "কর্ম যোগীন" ইংরেজীতে ও "ধর্ম" বাংলায় সম্পাদনা করেন। "No control, no co-operation", দেশ-শাসনে আমাদের এক্তার না থাকলে আমরা অসহযোগ করব—কর্ম যোগীনে এই সম্পাদকীয় লেখায় তাঁকে আবার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বার হয়। ভগিনী নিবেদিতার মারফত আগেই খবর পেয়ে তিনি গা-ঢাকা দিয়ে চন্দননগরে মতিলাল রায়ের কাছে চলে যান। তারপর অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ফরাসী জাহাজ দুপ্লেতে তুলে দিলে তিনি পণ্ডিচারী যান। কিন্তু যাবার আগে চন্দন নগরে একটী বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে যান। এরই সম্পর্কে ১৯১০ সালে কলকাতায় প্রবর্তক সমবায়ের উৎপত্তি। এর প্রতিষ্ঠাতা অমর বাবু, যতীন মুখার্জী এবং চন্দননগরের মতিবাবু ও শ্রীশ ঘোষ। এঁদের সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বোস। মুরারীপুকুর বাগান খানাতল্লাশীর সময় পুলিশ তাঁর দু'খানা চিঠি পায়। তাঁকে নিরাপদ করার জন্য সোদপুর তেঘরার শশীভূষণ রায়চৌধুরী তাঁর নিজের জায়গায় বাড়ীর শিক্ষকতা দিয়ে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ডেরাদুনে পাঠিয়ে দেন। ১৯০৯ সালে "বুলবুল" ডাকনামের এক গোয়েন্দাকে শ্যামপুকুর অঞ্চলে হত্যা করা হয়। ১৯১০ সালে বারীণবাবুদের আপীল চলার সময় হাইকোর্টে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সামসুল্ আলমকে বীরেন দত্ত গুপ্ত হত্যা ক'রে ফাঁসী যায়।

এদিকে ১৯০৭ সালে অনুশীলন সমিতিতে নব আন্দোলনের ঢেউ লাগে। প্রথম সফল রাজনৈতিক ডাকাতি হয় ১৯০৭ সালে চব্বিশ-পরগনার চাংড়ীপোতা রেল ষ্টেশনে। কিন্তু ঢের বেশী রোমাঞ্চক ডাকাতি হয় ১৯০৮ সালে ঢাকার বাড়া গ্রামে। প্রথমটিতে সরকারের টাকা লোটা হয়, দ্বিতীয়টিতে এক কুসীদ-জীবির। এরপর রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যা বিপ্লবী-দের কর্মসূচীর বিশেষ অঙ্গ হয়। অর্থ-নৈতিক কারণেও বটে, আবার সামরিক বিভাগে কম-দুষ্যার বাংলার তরুণরা চরকপ্রদ ব'লে এই পথে বীরত্বের ব্যঞ্জনার ক্ষেত্র পেয়ে মুগ্ধ-চিত্তে একে বরে থাকে

বিশেষ আইনে ১৯০৮ সালে সব সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল। অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি নয় জন নেতাকে দেশান্তরী করা হয়। "যুগান্তর", "সন্ধ্যা", "বন্দেমাতরম্" উঠে গেল। গুপ্তভাবে কিছু দিন যুগান্তর বেরুতে লাগল।

১৯১০ সালে পূর্ববঙ্গে ঢাকা ষড়যন্ত্র ও পশ্চিম বঙ্গে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা হয়। প্রথমটিতে পুলিন দাস

প্রভৃতি ও দ্বিতীয়টিতে যতীন মুখার্জী প্রভৃতি আসামী থাকেন। বারীনবাবুরা গ্রেপ্তার হবার পর দেশে অবসাদ আসে তাকে অগ্রাহ্য ক'রে নেতার স্থান নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন তেজোদৃপ্ত দুর্ধর্ষ যতীন মুখার্জী।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয়—১৯০৭ সালে যখন বারীন বোমার বিধান দেন তখন কলিকাতায় অনুশীলন সমিতির কয়েকটি যুবক ভিন্ন-মত পোষণ করে। তারা এর পরিবর্তে গেরিলা যুদ্ধের পক্ষপাতী হয়। সেই জন্য কৃষক, মজুর, ছাত্র ও সৈন্যদের মধ্যে ভাব প্রচারে ব্রতী হয়। বিদেশীর সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য ১৯০৮ সালে বাইরে লোক পাঠায়। এরা ডাকাতি সমর্থন করত না। কারণ এর ফলে গণ-সমর্থন হারাতে হবে। *

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে পঠিত।

ইষ্টার

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ।

বাবিলোনীয় ধর্ম কাহিনীতে ইষ্টার ছিলেন আদি জননী। এঁর চরিত্রে নারীর বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে। কখনও তিনি স্নেহ-কাতর জননী, আবার কখনও প্রেম-কাতর নারী। মানব সমাজের বিকাশে নারীকে দেবী হিসাবে দেখার প্রায় প্রথম রূপ হল ইষ্টার। যেখানে যে আদ্যা দেবী বা শক্তির কল্পনা আছে, সেখানে তাঁর কোন মানবী রূপ আমরা পাই না। বোধ হয় ইষ্টারেই আমরা সর্ব প্রথম সেই রূপ দেখতে পাই।

অনেকে মনে করেন, সেমিটিক ধর্ম-বুদ্ধির নীরসতা-বাহুল্য দূর করে ইষ্টারই খ্রীষ্ট সমাজে মাতা মেরীর রূপ পরিগ্রহ করেন। অবশ্য উভয়ের চরিত্রে কোনই সাদৃশ্য নেই। কিন্তু নারীর দেবী রূপের কল্পনা ইষ্টার হ'তেই খ্রীষ্ট সমাজে আসে—সেমিটিক প্রভাব সত্ত্বেও।

সেই ইষ্টারের কাহিনীকে গল্পচ্ছলে এখানে বলতে চেষ্টা করেছি। ইষ্টারের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, কাহিনী অংশের অনেকটাই আমার কল্পিত।

—লেখক—]

প্রলয় চলেছে—নিষ্ঠুর দেবতা বেল এনলিল (Bel Enlil) সমস্ত মানবী জাতির উপর ক্রুদ্ধ হয়ে, সব সৃষ্টি ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প। অন্যান্য দেবদেবীরাও তার এই মানবলীলায় সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। দিনব্যাপী অবিশ্রান্ত ঝড়-বৃষ্টি-প্লাবন চলছে। কেবল জল-দেবতা ঈয়া (Ea) এতে পুরো সম্মতি দিতে পারছেন না। তাঁরই পরামর্শে পির-নাপিস্তিম (Pir-Napistim) এক তরণী তৈরী ক'রে কোনরকমে জীবন রক্ষা করছিলেন। সমস্ত সৃষ্টির এই আকস্মিক ধ্বংসে দেবী লোক-পালিনী ইষ্টারের হৃদয় কেঁদে উঠল। সমস্ত আকাশ-বাতাস তাঁর ক্রন্দনের ধ্বনিতে মুখর হ'ল। তাঁর ক্রন্দনের সঙ্গে প্রকৃতির প্রত্যেক পদার্থের অন্তরও কেঁদে উঠল। ইষ্টার কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগলেন—যে মানবকে আমি জীবন দিয়েছিলাম, আজ সে কোথায়! প্রলয় জলধির তরঙ্গে তরঙ্গে সেই বিলাপের সুর গিয়ে প্রতিহত হ'তে লাগল। আর তারই মাঝে পির-নাপিস্তিমের তরণী কয়েকটি জন্তু ও বৃক্ষাদির বীজ সহ ভেসে ফিরছিল। নিটসির (Nitsir) পর্বতশিখরে আশ্রয় নিয়ে কোনক্রমে সেই অর্ণবপোতটি বেঁচে গেল। রুষ্ট দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য পির-নাপিস্তিম সেই পর্বত শিখরে পূজা-হোম করতে লাগলেন। ইষ্টার ও অন্যান্য দেবদেবীরা পর্বতশিখরে গেলেন। ইষ্টার নিজের দেহের মূল্যবান অলঙ্কার সব উন্মোচন ক'রে নিরাভরণ হয়ে বললেন, "এই সব হীরক অলঙ্কার বিসর্জন দিয়ে বলছি, এই কয়দিনের কথা আমি কখনও ভুলব না—ক্রুদ্ধ দেবতা বেল আমার মানবদের ধ্বংস করেছে।" ইষ্টার পির-নাপিস্তিমকে আশীর্বাদ করলেন। জলদেবতা ঈয়া বেলকে বললেন, "বেল, তুমি দেবরাজ, এই প্রকার ক্রূরতা তোমার শোভা পায়না।

কোন মানব অন্যায় ক'রে থাকে ত তাকে শাস্তি দাও, কিন্তু এমনি প্লাবন দিয়ে সব ধ্বংস কোরো না। প্রয়োজন হয় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের ছেড়ে দিয়ে মানুষকে শাস্তি দাও; দুর্ভিক্ষ, মহামারীকে পাঠিয়ে দাও, লোকসংখ্যা কমিয়ে দেবে। পাপীকে শাস্তি দেবে, কিন্তু এমনি প্লাবন দিয়ে সব ধ্বংস কোরো না।"

বেল তুষ্ট হ'লেন। পির-নাপিস্তিম ও তাঁর স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তিনি চলে গেলেন।

সেই সর্ব্বব্যাপী সংপ্লবের (Chaos) মধ্যে দাঁড়িয়ে ইষ্টার চারিদিকে দেখছেন, আর ভাবছেন কি ক'রে আবার সৃষ্টির পত্তন করা যায়। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে ইষ্টারের পায়ের কাছে আছড়িয়ে পড়ছে আর চারদিক থেকে ভেসে আসছে প্রকৃতির করুণ ক্রন্দন। আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ প্রলয়ের লেখা লিখে যাচ্ছে;—ক্রন্দসী আজ সত্যই বুক চিরে কাঁদছে. তার আর্ত্তনাদ মেঘগর্জ্জনের রূপে মানবের আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। ইষ্টারও থেকে থেকে কেঁদে উঠছেন। তাঁর সুশোভিত সৃষ্টি এমনি করে সব ধ্বংস হয়ে গেল—দুঃখে বেদনায় তাঁর প্রাণও প্রকৃতির সাথে একসঙ্গে কেঁদে কেঁদে উঠছে।

এমনি সময় আল্লাহু নামে একটি পাখী উড়ে এসে তাঁর হাতে বসল। ইষ্টারের ক্ষুধিত অন্তর যেন একটা আশ্রয় পেল—তিনি পাখীটাকে একবার বুকে চেপে ধরেন, একবার চুমো খান, একবার নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে দেখেন। নানাভাবে আদর ক'রে সোহাগ ক'রেও যেন ইষ্টারের তৃপ্তি হচ্ছিল না। সেই আল্লাহু পাখীকে সম্বোধন ক'রে তাকে কত আদর জানাচ্ছেন—"হে সুন্দর তুমি এসেছ আজ এক নূতন সৃষ্টির দূত হয়ে, আমার অন্তরের সমস্ত রস দিয়ে তোমাকে অভিষিক্ত করছি।", অতি যত্নে ঐ পাখীকে বক্ষে চেপে ধ'রে ইষ্টার চ'লে গেলেন।

এক পাহাড়ের উপর ইষ্টার দাঁড়িয়ে—দূরে আকাশের গা হতে ঠিকরে আসছে আল্লাহু পাখীর ক্রন্দন—"আজ আমি উড়তে পারছি না—আমার পাখা ভেঙ্গে দিয়েছে। হে নিষ্ঠুর দেবী, তোমার আদরে সোহাগেই আমার পাখায় উড়বার শক্তি এসেছিল; আবার তুমিই তা কেড়ে নিলে। কেন বা আমি তোমার আদর ও স্নেহে ভিখারী হয়েছিলাম!"

ইষ্টার সেই করুণ ক্রন্দন শুনছেন—তাঁর দুই চোখ দিয়ে জলধারা পড়ছে। থেকে থেকে আল্লাহুর ক্রন্দন এসে যেন তাঁকে আঘাত দিচ্ছে। কিছু সময় পরে যেন নিজের মনেই তিনি বলছেন—"হে মূঢ় জীব, কি ক'রে তোমাকে বোঝাব, তোমার ব্যথার প্রতিধ্বনি কোথায় গিয়ে বাজছে! না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ আর শোনা যায় না।" দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধ'রে তিনি চোখের পালালেন।

আবার পাহাড়ের উপর ইষ্টার দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর চূর্ণকুন্তল বাতাসে তাঁর বসনাঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে উড়ছে। উদাস তাঁর দৃষ্টি—যেন দূরে কোথায় কি তিনি দেখতে চাইছেন। দূরের কোন আহ্বানে আশায় কান পেতে আছেন। সম্মুখে দিগন্ত-বিসর্পী বিস্তৃতি। প্রকৃতির বাহন হয়ে বায়ু যেন নানাদিক থেকে প্রকৃতির মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দনরাশি সংগ্রহ ক'রে এনে ইষ্টারকে উপহার দিচ্ছে—সোঁ সোঁ ক'রে শীতল বায়ু যেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাছে কি ব'লে যাচ্ছে। কিছু সময় বায়ু ও শ্রুতিকে উৎগ্রীব ক'রে রেখে, পরে ইষ্টার বলছেন—"সব ধ্বংস হয়েছে—এই অসৃষ্টি, এই বস্তুহীন বিস্তৃতি প্রাণের স্পন্দনহীন এই আকাশ, এই বায়ু যা মানুষের সুখ দুঃখের নিশ্বাসকে বহন ক'রে আনেনা, এই জলতরঙ্গ যার প্রতি নৃত্যের ছন্দে মানুষের জলকেলীর স্পর্শ নেই, এই পাহাড় পর্বত যার শিখরে মানুষের বিজয়ধ্বজা ওড়েনা, প্রকৃতির এই তাণ্ডবতা যাকে জয় করবার জন্য মানুষের জিগীষা জেগে উঠছে না, ধরণীর এত সম্পদ যাকে পাবার জন্য মানবের জিহীর্ষা উদ্রিক্ত হচ্ছেনা—এ সবই আজ, আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি চাই মানবের বিদ্রোহী মন এই সব জয় করবে, তো করবে, কখনও হারাবে, আবার কখনও ফিরে পাবে-

P 30496

হয়ে সে সুখ পাবে, ব্যর্থকাম হয়ে দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, কিন্তু সে আশা ছাড়বে না সংগ্রাম করতে ছাড়বে না। তার বিদ্রোহী মন সমস্ত প্রকৃতিকে, দেবকুলের সমস্ত বাধাকে জয় করবে, আবার কখনও পরাজিত হবে, আঘাত পাবে এবং প্রত্যাঘাত করবে। মানুষ বুঝবে কি আনন্দ এর মধ্যে আছে।

"দুর্গম ফেনিল সাগর বক্ষে মানুষ একদিন বিদ্রোহের নৌকা ভাসাবে—কতবার ব্যর্থ হবে, কত দুঃখ পাবে, কিন্তু তবুও সে এই দুর্দান্ত সাগর তরঙ্গকে জয় ক'রে এর উপর দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াবে। অভ্রভেদী চিরতুষারমণ্ডিত প্রতিক্রুদ্ধ পর্বতশিখর দেখে মানবের বিদ্রোহী মন একদিন নেচে উঠবে। প্রস্তরের কত আঘাত তাকে পেতে হবে, কত তুষার সমাধিতে তাকে ডুবতে হবে, তবুও সে একদিন তাকে জয় করবে। তপ্ত বালুকারাশি ধূ ধূ করছে যে বিশাল মরুভূমিতে, মানুষ চাইবে তার বক্ষে বিজয় কেতন উড়াতে: আজ যেখানে উষর মরুময় বিস্তৃতি, সেখানে সে শ্যামল শোভা সৃষ্টি করবে; ফলে, ফুলে, বৃক্ষলতার আচ্ছাদনে এই নিরাভরণা ধরণীকে সে সজ্জিত করবে। যে আকাশের বিস্তৃতি—যার কোথাও কোন সীমারেখা নেই, ঐ যেখানে দিবসে দিবাকরের প্রখর কিরণ এবং রাত্রিতে নিশাকরের মৃদু আলো ও অসংখ্য তারকারাজির ক্ষীণ দৃষ্টি আমাদের প্রাণ ও দেহের আলো যোগাচ্ছে—মানুষের অন্তরাত্মা একদিন চাইবে আত্মাদু পাখীর মত সেও ঐ আকাশের গায়ে উড়ে বেড়াবে।

"জয় থেকে জয়ে সে ছুটে চলবে—এতেই সে আনন্দ পাবে, সে দুঃখও পাবে এতেই। তার বিদ্রোহী মন ক্ষুদ্র বাধা দেখে ভীত হবে না। সেই বিদ্রোহী মানবের হাতে সমস্ত সৃষ্টি সার্থকতা লাভ করবে। কোন কিছুকেই মেনে নেবে না—সবটাকে সে জানবে ও জয় করবে। তারপর একদিন সে এমনি জায়গায় এসে দাঁড়াবে, যেখানে সে দেখবে জয়ের ও জ্ঞানের রাজ্য তার অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে, কিন্তু তবুও অর্জিত ও অজ্ঞাত রাজ্যও তার অনেক বাকি রয়ে গেছে—যেখানে আর সে এগুতে পারবে না, অথচ থামতেও মানবে না। সেদিন আসবে তার জীবনে এক বিষম সমস্যা—কে জানে সেই সমস্যায় সে কি করবে! তার বুদ্ধি তখন অচল, কল্পনা সেখানে স্থাণু, অনুভূতি সেদিন নিষ্প্রভ, তার বীর্যশক্তি তাকে সাহায্য করতে অক্ষম হবে। একদিকে তার গৃহ তখন বিজয়-স্মারকে (Trophy) পূর্ণ হয়ে থাকবে—এর বোঝা তাকে বইতে হবে; অপর দিকে একটা অনিশ্চিত অন্ধকার তার সমস্ত শক্তিকে ব্যর্থ ক'রে তাকে বলবে—হে মানব, কিছুই তুমি পাওনি, কিছুই তুমি জানতে পারনি। পাওয়ার বিড়ম্বনা ও না-পাওয়ার ব্যর্থতা দু'দিক থেকে তাকে পিষবে।

"মানুষের অন্তর কেঁদে কেঁদে মরবে। তার বুকফাটা ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রন্দসীর গায়ে এসে প্রতিধ্বনিত হবে—আবার সেখান থেকে ঝরে ঝরে পড়বে অনাগত সৃষ্টির অন্তরে। আর তার সাথে সাথে আমার অন্তরও কেঁদে কেঁদে ফিরবে। সৃষ্টির ক্রন্দন—এ চিরন্তন। যে জননী শিশুকে জন্ম দেন তাঁর বক্ষ ভেদ ক'রেও যে ক্রন্দনের ধ্বনি ওঠে, নবজাত শিশুর কণ্ঠ থেকেও সেই ধ্বনিই নির্গত হয়। এই ক্রন্দনের ভিতর দিয়েই আমি সৃষ্টির লীলা শুরু করব—এই ক্রন্দনের ভিতরই মানব তার জীবন আরম্ভ করবে—এই ক্রন্দনের ভিতর দিয়েই সে জয় থেকে জয়ে, ব্যর্থতা থেকে ব্যর্থতায়, সুখ থেকে দুঃখে দুঃখ থেকে সুখের দিকে ছুটবে—এই ক্রন্দনের ভিতর দিয়েই আমি সৃষ্টিকে ধারণ ও পালন করব। তারপর, জানিনা কোথায় এর শেষ। হয়তো একদিন এই সবই সংবৃত হয়ে আবার নতুন ক'রে শুরু হবে—অথবা হয়তো এমনি ধারা মায়ামৃগের খেলাই চলবে। কিন্তু আজ চাই বিদ্রোহী মানবাত্মা—কোন বাধা বন্ধনকেই যে গ্রাহ্য না ক'রে, কোন শাসনকে যে না মেনে এগিয়ে যেতে পারবে। সলীল প্রকৃতি, বাষ্পময় আকাশ, উর্বরা ধরণী, তরঙ্গায়িত সাগর, হিল্লোলিত বায়ু—এই সবই তাকে বরণ করে নেবে। আর এর প্রতিদানে মানুষ যুগে যুগে নিজেকে বলি দেবে—প্রকৃতির লীলা ও বিকাশের কাছে মানুষ তিল তিল ক'রে নিজেকে ক্ষয় ক'রে দেবে—সৃষ্টির বেদীমূলে সে হবে নারায়ণ।"

উদর বিস্তৃতি—কোথাও বৃক্ষলতার চিহ্ন নেই, জীবজন্তুর শব্দ নেই। আকাশের গা হ'তে প্রখর রৌদ্রকিরণ যেন ভূমিতে প'ড়ে আবার ঠিকরে উঠছে—শোঁ শোঁ ক'রে গরম হাওয়া বইছে। আস্তে আস্তে একটি সুন্দর তেজীয়ান অশ্ব ও বীর্যশালী, কেশর-শোভিত একটি সিংহ এসে প্রান্তরের দুই পার্শ্বে দাঁড়াল। চারদিকে কি যেন তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল—তারপর আবার আস্তে আস্তে চ'লে গেল

আবার ইষ্টার এসে সেই প্রান্তরস্থিত পর্বতে দাঁড়ালেন। থেকে থেকে দূর হ'তে সিংহ ও অশ্বের ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছে। ইষ্টার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তাঁর চোখে মুখে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠছে। বাতাসের ঢেউয়ের সঙ্গে ঐ সিংহ ও অশ্বের ক্রন্দনের ঢেউ এসে তাঁর বক্ষে যেন আঘাত করছে। কখনও তিনি দুই হাত দিয়ে কান চেপে ধরছেন। তারপর বলতে লাগলেন—

"এই হ'ল সৃষ্টির মূল তত্ত্ব—যেমন জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, তেমনি সৃষ্টির সঙ্গে বিসর্জন, প্রাপ্তির সঙ্গে ত্যাগ, মিলনের সঙ্গে বিচ্ছেদ। ওরা আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছে—যেন আমার খেয়ালের উপরই সব নির্ভর করছে। যে বেদনা ওরা পাচ্ছে, তা যে আমারও অন্তরকে দগ্ধ করছে, কি ক'রে তা ওরা জানবে! আল্লাহ্ পাখী এল, অন্তরের সব স্নেহরসে তাকে পুষ্ট করলাম। তারপর সৃষ্টির বিধানে, সমস্ত জীব ও জড় জগতের বিধানে আজ সে কেঁদে বেড়াচ্ছে। তারপর একে একে সিংহ ও অশ্ব এল। ঠিক তেমনি আদরে ও যত্নে তাদের পুষ্ট করেছি—নিজের অন্তরের রস নিংড়ে তাদের পুষ্ট করেছি। কিন্তু স্থায়ী তো কিছুই নেই—অথবা বাস্তবতঃ পরিবর্তন তো আসবেই। তাই ওদের আজ আসছে ক্রন্দনের পালা। মুগ্ধ জীব, যত সহজে আমার বন্ধনে তুমি নিজেকে ধরা দেবে, তত শীঘ্র তোমার কান্নার দিন আসবে। যাও, পৃথিবীর বক্ষে তোমরা চ'রে বেড়াও—এক হবে মানুষের মিত্র, এক হবে মানুষের শত্রু; এক দেবে মানবকে সেবা, অপর দেবে তাড়া ভীতি। এই হবে মানুষের আবেষ্টন—প্রকৃতির শক্তিকে সে জয় ক'রে কাজে লাগাবে; অপরদিকে আরও বহু শক্তি থাকবে, যার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাকে সদাই সচেষ্ট থাকতে হবে।"

তখনও দূরে সেই অশ্ব ও সিংহের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। ইষ্টার কিছু সময় চুপ ক'রে শুনতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু অন্তরের ব্যথার লিখন তাঁর মুখে ললাটে ফুটে উঠল। দু'হাতে বুক চেপে ধ'রে তিনি ছুটে চ'লে গেলেন।

ইষ্টার ও তমুজ পরস্পরের হাত ধরে এসে পর্বত শিখরে দাঁড়ালেন। উভয়েরই দেহ ও মন যেন আনন্দের বেগে কম্পমান—চোখে মুখে যেন প্রীতি ও আনন্দের ঢেউ খেলছে। প্রকৃতির মতো ইষ্টারও যৌবনভারনতা। যৌবনের কমনীয়তা, সৌন্দর্যের সম্ভার ও সজ্জার প্রাচুর্য যেন ইষ্টারের সমস্ত অঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তমুজের যৌবনের দীপ্তি, পৌরুষের তেজ ও বুদ্ধির প্রাখর্য তার সমস্ত দেহ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।

দু'জনে পর্বতশিখরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির লীলাখেলা দেখছেন—চারদিকে কেবল প্রাচুর্য, সজীবতা ও আনন্দের তরঙ্গায়িত নৃত্য চলছে। এই সব দেখে তুষ্টি ও সন্তোষের উজ্জ্বলতায় এঁদের চোখমুখ ঝলমলে উঠছে।

ইষ্টার বললেন, "দেখ বন্ধু, প্রকৃতি আজ কেমন বিকশিত হয়ে উঠেছে, ঐ দেখ গাছের ডালে ডালে কেমন বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটেছে, আর তার মাঝে পাখীরা কেমন ক্রীড়া করছে। আজ তোমাকে পেয়ে আমার অন্তর যেমন উছলে উঠেছে, তেমনি সমস্ত প্রকৃতিও তার বরিতকে পেয়ে তার সৌন্দর্য সম্ভার খুলে দিয়েছে।

"প্রকৃতি নতুন শোভায় শোভিত হয়ে উঠেছে—চারদিকে সবুজ ও সজীবতার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে, যৌবনভারনতা সুন্দরী প্রকৃতির চারিদিকে প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যে লীলায়িত ছন্দ খেলে যাচ্ছে। পত্র-পুষ্প-ফল-শোভিত বৃক্ষলতা, আর তার নানা রঙ সম্ভারের সঙ্গে তাল রেখে বিবিধ রঙের পাখী গাছে গাছে কূজন করছে। ঐ

আনন্দ ক্ষেত্রে বিবিধ পশু কখনও ক্রীড়াচ্ছলে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, কখনও ঘাস খাচ্ছে। স্নিগ্ধ মলয় পবন সবার কানে কানে যেন কোন্ গোপন সুখবর ব'লে যাচ্ছে। এই বায়ুর স্পর্শে শস্য, বৃক্ষ, লতা সবাই ছেলেদুলে তাকে প্রীতি জানাচ্ছে। বিহগকুল আনন্দসঙ্গীতে তাকে অভিনন্দিত করছে। ওরা যেন সেই বায়ুর সঙ্গকে সুদীর্ঘ করবার জন্য সেই বায়ুবেগের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাচ্ছে।

"হে বন্ধু, আজ তোমাকে পেয়ে সমস্ত ধরণীর বুকের মাঝে নতুন সৃষ্টির পত্তন শুরু হ'ল। আজ দেখবে মানবের ঘরে ঘরে ও অন্তরে অন্তরে কি উল্লাসের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। ঐ দেখ দূরে কৃষক দম্পতি কেমন উৎফুল্ল নয়নে এই সবুজের খেলা দেখছে—ঐ দেখ ঈশান কোণে সবুজ আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে শিশুগণ কেমন ক্রীড়া করছে—ঐ দেখ ঐ ঈষৎ-ক্ষুব্ধ জলরাশির উপর একটি তরণী নিয়ে এক যুবতী কেমন আনন্দ স্রোতে ভেসে বেড়াচ্ছে।

"আমি এইসব দেখছি আর তোমাকে পাওয়ার আনন্দ আমার শতগুণ বেড়ে যাচ্ছে।"

তরুণ বললো, "আমি জানি না সখি, তুমি তোমার সুখবরের নিয়ে এমন মেতে উঠতে পার কি ক'রে? ক্লান্ত দেবতারা তোমাকে এর জন্য অনেক গঞ্জনাও দেন।"

ইষ্টার—হে বন্ধু তুমিও আমাকে এই প্রশ্ন করছ! তোমাকেও এই কথা বুঝিয়ে বলতে হবে! আজ যখন চারদিকে চেয়ে দেখছি, তখন যে আমি সর্বত্র তোমরাই প্রতিষ্ঠা দেখছি। ঐ যে শস্যক্ষেত্রে বায়ুচালিত শস্যশির দুলে পড়ছে, তাতে আমি দেখছি ওর অন্তরের প্রাণ তোমার পায়ে প্রণতি জানাচ্ছে, ঐ যে পাখীরা কূজন করছে, ওদের ভিতর আমি শুনছি ওরা তোমারই স্তবগান করছে, ঐ যে পশুরা সবুজের উপর ছুটে বেড়াচ্ছে—আমার মনে হচ্ছে, তোমার স্পর্শ পেয়ে ওরা আনন্দে নৃত্য করছে, অথবা, এই সর্বত্র সজীবতা ও প্রাচুর্যের ভিতর দিয়ে, আমার অন্তরে তুমি বিকশিত হ'য়ে উঠছ;—ঠিক যেমন অন্ধকারের বক্ষ চিরে আকাশের গায়ে গায়ে অসংখ্য তারকা ফুটে উঠে, তেমনি আমার এই বিস্তৃত উর্বর বক্ষে তুমি সবুজ ও সজীব হ'য়ে ফুটে উঠেছ।

তরুণ একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে ইষ্টারের দিকে চেয়ে তার সুসজ্জিত মস্তকটি নিজের অনাবৃত বক্ষে চেপে ধরে বলল—"প্রিয়ে"।

ইষ্টার কিছু সময় এমনি ভাবে থেকে পরে আবার বলতে লাগল, "তারপর মানবের কথা—বেল বা অন্যান্য দেবতা মানবকে নিন্দা করে, হিংসা করে, তার হয়ত কারণ থাকতে পারে, যে দেবতা মানবের কাছে পূজা চায়, যে চায় তার প্রীত্যর্থে মানব তাকে নানা উপহার দেবে, স্তোক বাক্যে তুষ্ট করবে, সে মানবের উপর রুষ্ট হ'তে পারে, কিন্তু আমি ত' মানবের কাছে কিছু চাইনা! আমি চাই আমার সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে—মানবই তার পক্ষে আমার অবলম্বন, এর মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে, দেহে শক্তি আছে, হৃদয়ে বল আছে, চিত্তে আশা আছে, অন্তরে বিশ্বাস আছে, প্রাণে প্রাণ দেবার শক্তি আছে।

"আমার সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলতে চাই মানবের এই সব গুণ। আর কোন প্রাণীর মধ্যে এই সব গুণ পাবে না।

"প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম ক'রে একবার সে জয়ী হবে, আবার হয়ত সে ব্যর্থ হবে, এই জয় পরাজয়ের দোলায় দুলতে দুলতে, শত আঘাতেও সে ভেঙ্গে পড়বে না, শত ভয়েও সে আত্মহারা হবে না। মানুষ জানবে যে নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার ইচ্ছা ও শক্তি থেকে সে জয়ী হবে, সে স্রষ্টা হবে, সে জানবে সৃষ্টি ও বিসর্জন—একই বস্তুর এপিঠ-ওপিঠ। তোমাকে পেয়ে আমার যে সৃষ্টির পত্তন, এর পরিণতি হবে তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদে। মানুষ এই তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে নিজেদের জীবনে একে বরণ ক'রে নেবে; তাই সে হবে আমার সৃষ্টির সহায় ও অবলম্বন।

কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে ইষ্টার বলল—"বন্ধু, আজ এ পাক, আজ আমার পরিপূর্ণতার দিন; আজ তোমাকে পেয়েছি—সেটা আজ আমার কাছে বড় কথা, আজ সেই মিলনের উৎসব করব, বিসর্জনের কথা আজ নয়—আজ আমার সৃষ্টির দিন। ঐ শুনছ কি দূরে আমাদের মিলন উৎসবের সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে, আমার সহচরীরা

আসছে—নৃত্যে, সঙ্গীতে, কলহাস্যে, সজ্জায় ও বর্ণে আমাদের আজকার মিলনের দিনকে উৎসবময় করতে !"

একদল নৃত্য ও সঙ্গীতরত যুবতী বিচিত্র বর্ণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে উচ্ছলবেশে পর্বতশিখরে ইষ্টার ও তম্মুজের নিকটে এল, ওদের ঘিরে ঘিরে যুবতীরা নৃত্যগীত করতে লাগল, আবার আস্তে আস্তে অপর দিক দিয়ে চলে গেল। শুধু ইষ্টার ও তম্মুজ মুগ্ধনয়নে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল—তম্মুজের একহাত ইষ্টারের কটিদেশ বেষ্টন ক'রে আছে, অপর হাত ইষ্টারের স্কন্ধের উপর, ইষ্টার আস্তে নিজের শিরটি তম্মুজের বক্ষের উপর স্থাপন ক'রে তার দেহের উপর লুটিয়ে রইল, তখনও দূরে যুবতীদের সঙ্গীত শুনা যাচ্ছে।

• •

আবার সেই পর্বত শিখর—প্রকৃতি আজ বন্ধ্যা নারীর মত অন্তরের দৈন্য নিজের সর্বাঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছে, চারিদিকে কেবল রিক্ততা ও উষরতা, বিমর্ষ-বদনা ব্যর্থ নারীর মত, প্রোষিতভর্তৃকা ইষ্টার এসে দাঁড়াল, সে চারদিকে তাকাচ্ছে আর যেন বেদনাহত দৃষ্টিকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। এমনি সময় দূর হ'তে একটা তীক্ষ্ণ করুণ ক্রন্দন ধ্বনি এসে শ্রুতিকেও আহত করল।

ইষ্টার—"সেদিন এখানে এসেছিলাম আমার সৃষ্টির পালা নিয়ে—তাই সেদিন আমার সঙ্গে ছিল সৃষ্টির দেবতা তম্মুজ, আজ আমি-এসেছি আমার উৎসর্গের পালা নিয়ে তাই আজ আমি রিক্তা, একাকিনী। সেদিন আমার সর্বাঙ্গে ছিল যৌবনের সম্ভার, আজ আমার দেহে আছে জরার আড়া। সেদিন চারদিক থেকে শব্দ, গন্ধ, বর্ণ, ছন্দ আমার ইন্দ্রিয়কে পরিতুষ্ট করেছে। আজ রিক্ততা এসে আমার সর্বেন্দ্রিয়কে বেদনাহত করছে।

"একদিক থেকে ভেসে আসছে তম্মুজের করুণ ক্রন্দন, অপর দিক থেকে ভেসে আসছে সমস্ত বিশ্বের ক্রন্দন,—তম্মুজের অভাবে তারাও কাঁদছে। আর অন্তর থেকে ক্রন্দনের শত উৎস উঠছে। এই হ'ল আমার সৃষ্টির খেলা।

"আজ সমস্ত বিশ্বে ঘরে ঘরে তম্মুজের জন্য বিলাপ উঠছে। কত স্তব, কত পূজা, কত আরতি চলছে দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য কত প্রলোভনের জাল এ বুনছে; কত উপহার, কত উৎকোচ দেবতার না এরা মানত করছে। মুগ্ধ মানব, তুমি বুঝেও বুঝছ না এই নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাবার বা উদ্ধা ক'রবার ক্ষমতা কোন দেবতারই নাই। প্রাচুর্য ব চারিদিক থেকে তোমাকে প্লাবিত করতে চেয়েছি যখন অবিশ্রান্ত বর্ষার বারিধারার মত প্রকৃতির দা তোমাকে ডুবিয়ে ফেলতে চেয়েছিল, তখন তোমা নিজের শক্তিতে, নিজের ক্ষমতায়, বুদ্ধিতে, কৌশ তুমি তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলে; তোমার কার্যোপযো ও জীবনোপযোগী ক'রে নিয়েছিলে, সেই চেষ্টায় তু জয়ের আনন্দ পেয়েছ, আবার ব্যর্থতার আঘাত পেয়েছ; একদিকে তুমি নতুন শক্তি সংগ্রহ করে কিন্তু সেই শক্তি সংগ্রহের চেষ্টায় তুমি অনেক বি বিসর্জনও করেছ।"

"আজ দেখছ প্রকৃতির আর এক রূপ—আজ এ ভীষণা রিক্ততার রূপ। দৈন্য ও উষরতা নি তোমাকে পিষে ফেলতে চাচ্ছে। যে শক্তি নিয়ে তু প্রকৃতির অবদানের প্লাবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছ, সেই শ নিয়েই তোমাকে আজকের এই সর্বগ্রাসী উষরতার সা সংগ্রাম করতে হবে। নিজের শক্তি তিল তিল ক' বিসর্জন দিয়ে তুমি এমন শক্তি পাবে, যার ফলে তু এই সৃষ্টিকে জয়ী করবে। উৎসর্জনই সৃজনের তি এই সৃষ্টির জন্য তুমিও নিজেকে উৎসর্গিত ব'লে ম করবে এবং আমিও তম্মুজকে উৎসর্গ ক'রে তোম সহায়ক হব, তারপর দেখবে উৎসর্জ প্রকৃতি তোম কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আবার একদিন দেখ প্রকৃতি তার কার্পণ্যের অবগুণ্ঠনে আবৃত হ'য়ে তোম অধিকার থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে, তখনও তার কার্পণ্যের আবরণ ভেদ ক'রে তার রত্নভাণ্ডার লুঠ কর হবে।"

অদূরে একদল নরনারী শোকার্তস্বরে বিলাপ করছে—

"সে চলে গেছে—চলে গেছে
ধরণীর অভ্যন্তরে
অন্ধকারের রাজ্যে।
মৃত্যুর প্রবাহ চলছে—
পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে
জরা, মৃত্যু, ধ্বংস, অনাসৃষ্টি এসে।
শোকে আজ মানব মুহ্যমান
অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে
হে সূর্যের দেবতা!
তোমার অভাবে সূর্য আজ ম্রিয়মান;
হে প্রাণের দেবতা!
তোমার অবর্তমানে প্রাণ আজ মুহ্যমান;
হে উদ্ভিদের দেবতা!
তোমাকে হারিয়ে তারা শুকিয়ে যাচ্ছে;
হে পশুর দেবতা!
তোমার অদর্শনে তারা আজ আর
পোষণ করছে না।
তোমার সন্তান আমরা, হে প্রাণদাতা!
তোমার যাত্রার গতি ফিরিয়ে নাও—
ফিরে এস আমাদের দিকে—
ফিরিয়ে দাও আমাদের প্রাণ
আবার নিয়ে এস আমাদের আলো
আমাদের ধরণীকে আবার—
হাসির আলোতে উজ্জ্বল ক'রে তোল।
আমাদের উদ্ভিদ, আমাদের পশু,
আমাদের শিশু, এদের অন্তরে আবার
নতুন ক'রে তুমি জেগে ওঠ।"

তারা চলে গেল।

ইষ্টার—"না, এ সহ্য হয় না—আমাকেই যেতে হবে, অন্ধকারের বক্ষ থেকে, সেই মৃত্যুর অন্তর থেকে প্রাণের দেবতাকে, প্রাণের দেবতাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। নিজেও বিলাপ ক'রে ফিরছি—এবং সমস্ত বিশ্ব কেঁদে বেড়াচ্ছে। তমুজকে ফিরিয়ে আনতেই হবে—নতুবা অন্ধকারের রাজ্য থেকে সমস্ত মৃতদের মুক্ত ক'রে দেব—এই ধরণীর বক্ষে জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যা তখন বেশী হয়ে যাবে। হিংসুটে দেবতা তখন শঙ্কান্বিত হবে।"

• • •

নানা আভরণে সজ্জিতা সুন্দরী ইষ্টার এক নতুন মূর্তিতে অন্ধকারের রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ অন্ধকারে আবৃত; চোখে মুখে তার এক তীব্র রুদ্রতা ফুটে উঠেছে, প্রেত লোকের দরজায় এসে সে দেখল, দ্বার বন্ধ—রুদ্ধ দ্বারের সামনে দ্বারী দাঁড়িয়ে আছে।

ইষ্টার বলল—"হে দ্বারী দ্বার খোল—উন্মুক্ত কর তোমার দ্বার;—এর ভেতরে আমাকে যেতে হবে, যদি স্বেচ্ছায় আমাকে যেতে না দাও—ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেব এই দরজা, তারপর এর ভিতর ঢুকে পড়ব। সমস্ত মৃতদের অন্ধকার থেকে মুক্ত ক'রে দেব। আমার গতি রোধ করবার ক্ষমতা তোমার নাই।

দ্বারী বলল—"দেবী, তুমি জান, এই দরজা খোলার অধিকার আমার নাই। অল্লাটু দেবীর অনুমতি ভিন্ন আমি এ খুলতে পারি না।"

ইষ্টার বলল—"যাও, তার অনুমতি নিয়ে এস—কিন্তু জেনে রেখো, আমি এর ভিতর ঢুকবই—কেউ তা' প্রতিরোধ করতে পারবে না। দরকার হ'লে তোমাদের প্রাচীর দরজা ভেঙ্গে এর মধ্যে প্রবেশ করব, এবং মৃতদের উদ্ধার ক'রে ছেড়ে দেব।

• • •

চারদিকে অন্ধকার ও রিক্ততার মাঝে, প্রেতলোক-বাসীদ্বারা পরিবেষ্টিত প্রেতলোকের রাণী অল্লাটুর সামনে দ্বারী গিয়ে উপস্থিত। সে বলল—"দেবী, নগরপ্রান্তে ইষ্টার দেবী দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি এর ভিতর প্রবেশ করতে চান, কিন্তু তিনি জীবিত—কি ক'রে তাঁকে এই প্রেতলোকে প্রবেশ করতে দিই। অথচ ইষ্টার দেবীকে বাধা দেবার ক্ষমতাও আমার নাই, তিনি বলছেন স্বেচ্ছায়

•

তাঁকে প্রবেশ করতে না দিলে, সমস্ত দরজা ভেঙ্গে তিনি ঢুকবেন, এই অন্ধকার কারাকক্ষ হ'তে সমস্ত মৃতদের তিনি মুক্ত ক'রে দেবেন।"

অল্লাটু কিছুসময় চিন্তামগ্ন থেকে বলল—"ইষ্টার এসেছে—আমি জানতাম তাকে আসতে হবে, সে হ'ল আলোর অধিষ্ঠাত্রী, আমি হলাম অন্ধকারের অধিষ্ঠাত্রী, সে হ'ল জীবনের রাণী, আমি হ'লাম মৃত্যুর রাণী। সে হ'ল স্বর্গ ও ধরণীর দেবী, আমি হ'লাম প্রেতলোকের দেবী, তাই তার সঙ্গে আমার চির-বিরোধ, আজ তা'কে আমি পেয়েছি।

"কিন্তু আমারও দুঃখ হচ্ছে সৃষ্ট জীব-জন্তু বৃক্ষাদির জন্ত, তমুজ ও ইষ্টার দুইই আজ এখানে বন্দী হবে—এর অনিবার্য পরিণাম সমস্ত সৃষ্টির ধ্বংস।

"আজ শোক হচ্ছে সেই পুরুষের জন্ত
যে তার প্রিয়াকে ছেড়ে
মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবে;
আজ দুঃখ হচ্ছে সেই নারীর জন্ত
যে তার প্রিয়-আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হবে।
আজ বিলাপ করছি সেই পুত্রের জন্ত
যে পিতামাতার স্নেহকোল থেকে
ঝ'রে পড়বে এই অন্ধকার রাজ্যে।
আজ আমার অন্তরেও কান্না জমছে
বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর আসন্ন ধ্বংসে।

"যাও দ্বারী, ইষ্টারকে প্রবেশ করতে দাও—কিন্তু এখানকার চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম যেন না হয়, অন্ত সবার প্রতি যে নিয়ম প্রযোজ্য—ইষ্টারের প্রতিও সেইসব নিয়মই প্রয়োগ করতে হবে।"

• •

দ্বারপাল ইষ্টারের নিকট গিয়ে বলল—অল্লাটু দেবী তাঁকে নিয়ে যেতে বলেছেন, কিন্তু এখানকার নিয়মানুযায়ী প্রতি দরজায় তাঁর কিছু আভরণ ত্যাগ করতে হবে।

ইষ্টার ও দ্বারপাল—প্রথম দরজায়—দ্বারপাল তাকে বলল—"এই দরজায় তোমার শিরোভূষণ রেখে যেতে হবে।

ইষ্টার তা'র নির্দেশানুযায়ী শিরোভূষণ খুলে দিল।

দ্বিতীয় দরজায়—দ্বারীর নির্দেশমত ইষ্টার তা কর্ণভূষণ খুলে দিল।

তৃতীয় দরজায়—ইষ্টার তার রত্নখচিত কণ্ঠহা খুলে দিল।

চতুর্থ দ্বারে সে তার বক্ষের অলঙ্কার খুলে দিল পঞ্চম দ্বারে খুলে দিল তার কটিশোভা।

ষষ্ঠ দ্বারে তার হস্তপদের কুন্তলাদি খুলে দিল।

সপ্তম দ্বারে সে তার সমস্ত আবরণ ত্যাগ ক'রে— কিছুদূর চলবার পর প্রেতলোকের অধিশ্বরী অল্লাটু সামনে সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হ'য়ে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু সর্ব আভরণ ও আবরণ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে ইষ্টার তার তেজ ও গৌরবে মহীয়ান্। অল্লাটু ইষ্টারের গর্বিত দীপ্তিমান মূর্ত্তির সামনে নিজেকে পরাভূত মনে ক'রে তার অনুচর জরা ও ব্যাধির দানব নমতারকে (Namtar) বললেন—নমতার, ইষ্টারের সর্বাঙ্গ জরা ও ব্যাধিতে জর্জরিত ক'রে দাও,"

দেখতে দেখতে ইষ্টারের যৌবন দীপ্ত দেহ জরা ও ব্যাধিতে ছেয়ে গেল—কিন্তু তবুও ইষ্টার নতি স্বীকার করল না; তার গর্বিত ভাব তেমনই অটুট রইল। অল্লাটু তখন বলল—"ইষ্টার, তবুও তোমার সেই গর্বিত ভাব যাচ্ছে না! জানো, যে দণ্ড আজ তোমার উপরে দিয়েছি, এর প্রতিক্রিয়া কোথায় কি ভাবে হচ্ছে? তোমার অঙ্গের একটি একটি আভরণ যখন খুলে নিয়েছি, পৃথিবীর প্রজনন-শক্তিরও একটু একটু করে ক্ষয় হচ্ছে, যখন তুমি নিরাভরণা ও নিরাবরণা হ'য়ে আমার সামনে দাঁড়ালে তখন জান কি তোমার বড় সাধের মানব-কুলের কুক্ষিস্থ মুষড়ে পড়েছে—তোমার ধরণীর উদ্ভিদ লুপ্ত হচ্ছে? সব তারপর যখন জরা ও ব্যাধি এসে তোমার এই কোমল সুন্দর যৌবন স্নিগ্ধ দেহকে আক্রমণ করল, তখন তোমার পৃথিবী ও মানবকুলে পূর্ণ অনাসৃষ্টি ও ধ্বংসের লীলা শুরু হয়েছে, একটু কান পেতে শুনতে চেষ্টা কর, শুনতে তাদের করুণ ক্রন্দন এখানেও এসে পৌঁছেছে।"

ইষ্টার গর্বিত কণ্ঠে জবাব দিল—"অল্লাটু, আমি জানি তোমার শক্তি কতটুকু এবং তোমার ধর্ম কি। তা জেনেই আমি এখানে এসেছি, কিন্তু এ তুমি জেনো, বল ও শক্তির উল্লাসে যতই উৎফুল্ল তুমি হও না কেন, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর চেয়ে জীবনই জয়ী হবে; ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টিই প্রশস্ত পাবে; অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলই বড় ব'লে প্রতিপন্ন হবে, তাই অসৃষ্টির গর্ভ থেকে সুখ সৃষ্টি বেরিয়ে এসে ক্রমেই বিকশিত হচ্ছে, দিনে দিনে ধরণীর বক্ষে বুকের শোভা বাড়ছে—কৃষি এসে উষরকে জয় করছে; দিনে দিনে পৃথিবীর বুকে মানবের জয়কেতন উড়ছে—ধ্বংস প্রকৃতিকে সে বশ মানাচ্ছে।

"অল্লাটু, আজ তুমি বৃথা আস্ফালন করছ, সৃষ্টিকে বিকশিত করার জন্যই, একে নব নব জয়ে জয়ী করার জন্যই তোমার প্রয়োজন আছে। তোমার নির্দিষ্ট কাজ তুমি করে যাচ্ছ; আমিও আজ আমার নির্ধারিত কাজ করছি। আজ আমাকে ও তমুজকে তোমার অধিকারে পেয়ে যদি তুমি জয়ী মনে কর, তবে পরাজয়ের দুঃখ একদিন তোমাকে শীঘ্রই পেতে হবে।"

ক্রুদ্ধ অল্লাটুর হুকুমে তার অনুচরগণ ইষ্টারকে নিয়ে গেল—বন্দীশালায় বন্দী করতে।

• • • • • • • • •

সূর্যদেবতা 'শামাশ' (Shamash), চন্দ্রদেবতা 'সিন' (Sin) এবং জলদেবতা 'ঈয়া' (Ea) আসীন। সবাই চিন্তান্বিত—সৃষ্টিরক্ষার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না, সূর্যের যেন সে দীপ্তি নাই, চন্দ্রের সে শোভা নাই, জলদেবতা ঈয়ার সে প্রশান্ত গাম্ভীর্য নাই—এমনি সময় দূতবেশে পাপ-সুকল (Pap-Sukal) এসে তাদের প্রণতি জানাল। শামাশ জিজ্ঞাসা করল—"পাপ-সুকল, কি খবর নিয়ে এলে?"

পাপ-সুকল—"দেব, সমস্ত পৃথিবীময় ধ্বংসের খেলা চলছে; সমস্ত উদ্ভিদ শুকিয়ে যাচ্ছে, কে যেন তাদের প্রাণশক্তি হরণ করে নিয়েছে; পশুপক্ষী সব অনাহারে দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তার উপর এসেছে ব্যাধি। মানবকুল আজ কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে এসে জুটেছে মহামারী—ঘরে ঘরে মৃত্যু ও জরার প্রভুত্ব চলছে, তাদের কৃষিক্ষেত্র শুকিয়ে যাচ্ছে, গৃহপালিত পশুপক্ষী ধুঁকে ধুঁকে মরছে, ঘরে ঘরে শিশু-বৃদ্ধ-যুবা অনাহারে ও মহামারীতে ঝরে পড়ছে।"

ঈয়া—"সে সবই জানি। কিন্তু এর প্রতিকার কি? ইষ্টারের খবর কি?"

পাপ-সুকল—"ইষ্টার এখন অল্লাটুর ওখানে বন্দী। তার সপ্ত-দ্বারী প্রাসাদে প্রবেশ করবার সময়, প্রতিদ্বারে একটি একটি আভরণ ও আবরণ ইষ্টারের দেহ হ'তে খুলে নেয়—সম্পূর্ণ নিরাভরণ ও নিরাবরণ হ'য়ে সে অল্লাটুর ঘরে বন্দী। অল্লাটুর আদেশে নমতার দানব তার সর্বদেহ জরা-ব্যাধিতে ভ'রে দিয়েছে। তাই সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপী অনাসৃষ্টি ও মহামারী সুরু হয়েছে।"

ঈয়া বলল—"যে ক'রে হ'ক, ইষ্টার ও তমুজকে উদ্ধার করতেই হবে—নতুবা সৃষ্টিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা কঠিন হবে।"

সিন বলল—"কিন্তু কি ক'রে এ সম্ভব! অল্লাটুর অন্ধকার রাজ্যে গিয়ে ওদের উদ্ধার কে করবে? দেখ ঈয়া, তোমার বিশাল জলরাশির মধ্যে বহুবিধ জানোয়ার আছে; বহু জীব তুমি সৃষ্টি করেছ। এমন একটি জীব সৃষ্টি কর যে গিয়ে ওদের উদ্ধার করতে পারে।"

শামাশ—"দেখ, এই সৃষ্টি হ'ল মানুষকে নিয়ে;—এই বিপদ থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে হ'লে মানুষকেই তা' করতে হবে। এমন জীব সৃষ্টি করতে হবে যার মধ্যে মানুষের ধর্ম ও দেহ দুই-ই থাকবে কিন্তু তার মধ্যে এই সময়ের উপযোগী অপর কিছুও থাকবে।"

ঈয়া—"বেশ, সৃষ্টির একদিকে শ্রেষ্ঠ হ'ল মানব—অপর দিকে শ্রেষ্ঠ হ'ল সিংহ। একটি নৃসিংহ সৃষ্টি করছি যে অল্লাটুর রাজ্য থেকে ইষ্টার ও তমুজকে উদ্ধার করবে।"

দেখতে দেখতে নাদুশু-নামির (Nadushu-Namir) নামে একটি নৃসিংহ সৃষ্টি হ'ল।

ঈয়া বলল—"বৎস নাদুশু-নামির, তোমাকে আহ্বান করেছি—ইষ্টার ও তমুজকে উদ্ধার করতে হবে।

অল্লাটুর অন্ধকার রাজ্যে তারা বন্দী আছে। সেখান থেকে এদের উদ্ধার করতে হবে।"

নাদুশু-নামির বলল—"বেশ, তাই আমি করব—এর জন্য আপনারা ভাববেন না।"

ঈয়া—"তবে তুমি এখনই যাও।"

• • •

ঘন অন্ধকার বেষ্টিত সিংহাসনে অল্লাটু বসে আছে। চারদিকে তা'র বীভৎস অনুচরগণ রয়েছে—কেউ বসে আছে—কেউ বা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এমনি সময় তা'র দ্বারপাল নৃসিংহ নাদুশু-নামিরকে (Nadushu Namir) সঙ্গে নিয়ে ওখানে এল, সে বলল—"দেবী, সাগর-রাজ ঈয়ার দূত ইনি—এসেছেন ইষ্টার ও তম্মুজকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।"

অল্লাটু বলল—"কে তুমি, কোন সাহসে এখানে এসেছ! তুমি কি জান না, এই রাজ্য থেকে কারুর প্রত্যাবর্তন নেই?"

নাদুশু-নামির—"আমি এসেছি, সমস্ত সৃষ্টির পক্ষ হ'তে—ইষ্টার ও তম্মুজকে ফিরিয়ে নেবার জন্য, তুমি জান মানুষ নিজেকে বলি দিচ্ছে, সাধনা বরণ ক'রে নিচ্ছে, এই সৃষ্টিকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য। তাই তা'দের পক্ষ থেকে এসেছি ইষ্টার ও তম্মুজকে ফিরিয়ে নেবার জন্য।"

অল্লাটু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—"নাদুশু-নামির, আমি তোমাকে অভিসম্পাত দিচ্ছি"—নিজের বক্ষে আঘাত ক'রে সে বলতে লাগল—

আমার বৃহৎ কারাগৃহে তোমাকে বন্দী করব,
নগরের পুরীষ তোমার খাদ্য হবে,
পয়ঃপ্রণালী তোমায় পানীয় যোগাবে—
অন্ধকূপের অন্ধকার তোমার বাসস্থান হবে,
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তোমার সন্তানদের দগ্ধ করবে।"

নাদুশু-নামির বলল—"অল্লাটু, এই বৃথা আস্ফালন করছ কেন? তোমার এমন ক্ষমতা নাই যে আমাকে বন্দী ক'রে রাখতে পার, তুমি জান ইষ্টার কে, কি তার ক্ষমতা, কি তা'র দান। সে হ'ল সমস্ত সৃষ্টির জননী—এক মূর্তিতে সে সংহারিণী সমরাঙ্গনী, অপর মূর্তিতে সে স্নেহ-মধুরী জননী, এক মূর্তিতে সে প্রেমের দেবী, সৃষ্টি-বিধায়িনী, অপর মূর্তিতে সে কুমারী, স্নেহ-পবিত্রতার প্রতিমা, এক মূর্তিতে সে হ'ল শুকতারা, অপর মূর্তিতে সে হ'ল সান্ধ্যতারা। এক মূর্তিতে সে সৃষ্টির বরাভয়দায়িনী, অপর মূর্তিতে সে তোমার ভগিনী, এক মূর্তিতে সে উদ্ভিদদেবতা তম্মুজকে স্নেহে পালন করছে—অপর মূর্তিতে তম্মুজকে আঘাত দিয়ে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে; তারপর তম্মুজ যখন তোমার এখানে বন্দী তখন তম্মুজের বুকফাটা ক্রন্দন পৃথিবীর প্রতি বৃক্ষলতা থেকে স্ফুরিত হ'তে লাগল; তখন সে তম্মুজের বিরহিনী শোকাকুলা প্রেম-প্রার্থিনী।

"অল্লাটু, এ হেন ইষ্টারকে বন্দী ক'রে রাখা তোমার পক্ষে সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়, সৃষ্টির নিয়মের ব্যতিক্রম তুমি করতে পার না। সমস্ত মানব ও দেবতা মিলে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে; তোমার কারাগৃহের প্রতি প্রস্তর তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। তারপর, তুমি জান সূর্যের উত্তাপ ও সাগরের উদ্দামতা এবং মানবের সিসৃক্ষা তা'র বিধ্বংসীশক্তি, তা'র বুদ্ধি, তা'র সাহস তা'র ত্যাগ,—এই সব আমার ক্ষুদ্র দেহে সঞ্চিত হয়েছে। তোমার সমস্ত দানবীয়শক্তি এখানে ব্যর্থ হবে।"

অল্লাটু কিছু সময় চুপ ক'রে থেকে বলল—"নমতার যাও, ইষ্টারকে এখানে নিয়ে এস।"

নমতার চলে গেল—কিছু সময় পর ইষ্টারকে নিয়ে ফিরে এল।

অল্লাটু বলল—"ইষ্টারকে মৃতসঞ্জীবনী ঝরণা সুখল-কিকু (Sukhal-Ziku)র জল দাও এবং তম্মুজকে ফিরিয়ে দাও।

অল্লাটু একলা বসে রইল—আর সবাই চলে গেল।

• •

দ্বারপাল ও ইষ্টার জীব ও উদ্ভিদের প্রাণ স্বরূপ সুখল-কিকু ঝরনার জল নিয়ে এল। প্রতি দরজায় ইষ্টারের যে সব আভরণ ও আবরণ খুলে রাখা হয়েছিল, তা সব প্রতি দরজায় প্রত্যর্পণ করা হ'ল। আবার সে তার যৌবন, ভূষণ ও সৌন্দর্য ফিরে পেল—সপ্তম দরজার সামনে

এসে দুর্বল, রোগ-ক্লান্ত, ক্ষয়িত-দেহ তনুজকে দেখতে পেল

ইষ্টার বিলাপ ক'রে উঠল—"তুমি ফিরে এসেছ, বন্ধু? এই মৃতসঞ্জীবনী জলধারায় তোমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছি—তোমার দেহের সমস্ত ক্লান্তি, গ্লানি, জরা এতে ধুয়ে যাবে। আবার তুমি নবযৌবনের নবদীপ্তিতে বিশ্বের প্রাণদাতারূপে আবির্ভাব করবে। তোমার রোগতপ্ত দেহে এই জলধারা যখন পড়বে, পিপাসিত ধরণী, বৃক্ষলতা—সবাই তখন স্নিগ্ধ বর্ষাধারায় স্নাত হবে।"

চারিদিক থেকে বর্ষার জলধারা পড়তে লাগল, ইষ্টার ও তনুজ চলে গেল।

তপ্ত দুপুর

মেঘমালা দেবী

দুপুরের পায়রারঙ্গত—
উড়ে যেতে পারতাম যদি আমি,
ঐ নীল আকাশে রুক্ষের অলকে
একটানা পলকে চকচকে বাতাসে।
পারতাম যদি আমি ভাঙা মেঘে মন্দির আঁকতে;
উজ্জ্বল ঝকঝকে শাদা কালো পায়রার
উজ্জ্বল পাখনায় উন্মন এই মন রাখতে
লাভের হাভের চঞ্চল রৌদ্রে
উজ্জ্বল দুপুরের রৌদ্রের রূপটুকু আঁকতে,
কাপটানো পাখনার চোখাচোখি তাকাতে:
দৃষ্টির দৃষ্টির ছন্দের গন্ধের দুপুরে—
কার্ণিশে রাখতাম চঞ্চল ধুকধুক বুক আর পাখনা।
রুক্ষের শুষ্কের কুঙ্কুম রঙের শিরাসব কাঁপতো;
দুপুরের সুপুরীর ছায়া ভরা কুঞ্জে,
নীল শাদা পাখনায় এক ঝাঁক দুপুরের রৌদ্রে,
ডিগবাজি বুকে বুকে কোনো মেয়ে পায়রার কণ্ঠও দুলতো।
পোড়ো ঝরা ঝলসানো ভাঙা ইটে বাড়ীটার
কাঠগুলো কেটেছে,
ঝলমল চমকানো ভাঙা ভিতে অশথের
চারা ধরে টানতাম,
ঘুলঘুলীতে হাহা করা জানালায়
ঝুলকীর মত রোদ তপ্ত ও রুদ্র
উজ্জ্বল পাখনায় ভাঙা পোড়া বাড়ীটার
কার্ণিশে বসে বসে
চঞ্চুর চুম্বনে পাখনাও খুঁটতাম।
যন্ত্রণার রোদ্দুর নীল কপোতাক্ষির উল্লাসী কণ্ঠ:
সামনের পার্কের রেলিংএর ধারে ব'সে
চিমড়োনো বটগাছ কাঁপতো ও ঝিমুতো।
রাস্তায় পিচভরা রৌদ্রের রুদ্রের হলকায়,
ধুলো ঝড় ঝরাপাতা একরাশ উড়তো;
তপ্ত ও খরতর দুপুরের উচ্ছ্বাসী রৌদ্রে।
চকচকে চাঁদোয়া ও হলকানো বাতাসে
গোটা আট পায়রার ঘরেরী ও শাদাপাখা—
দুপুরের স্বপ্নের বুকটুক কাঁপাতো।
চিমড়োনো বটগাছ ঝলসানো বাতাসে,
ভাঙা পোড়ো বাড়ীটার
একতাল সুরকীও
ভেঙে খসে ঝরতো;
কুঙ্কুম রক্তের পাখনায় শিরাগুলো
চঞ্চল কলকল ভাবনায়
তপ্ত ও উজ্জ্বল উজ্জ্বল রৌদ্রে
প্রতপত্ পাখনায় উড়তাম তুমি আমি
ঐ নীল রুক্ষের শুষ্কের চাকনায়।
সুপুরীর কুঞ্জের ছায়াঘন পুঞ্জে,
ঘুরতাম উড়তাম উড়ন্ত পাখনায়,
উজ্জ্বল ও তপ্ত রৌদ্রে;
ঝাঁপাতাম তুমি আমি উন্মুখ মুখোমুখি
গনগনে পৃথিবীর ছাদে,
তপ্ত ও খরতর দুপুরের উচ্ছ্বাসী রৌদ্রে।

চিতার ধোঁয়া

কমলা দাশগুপ্ত

স্বাধীন ভারতের আকাশ জুড়ে এই কথাই আজ গুঞ্জন তুলেছে যে যাঁরা আপন অস্থি দিয়ে এই মর্মরের ভিত্তি গড়ে দিয়ে গেলেন তাঁরা আজ কোথায়? আমরা তাঁদের ভুলে গেছি কি? সাধনা করতে করতে কখন তাঁরা নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেলেন, কী রেখে গেলেন তাঁরা টের পেলেন না। কিন্তু তিলে তিলে ক্ষয় করা জীবনগুলি আজকের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের মজ্জায় মজ্জায় মিশে আছে। এই আকাশে বাতাসে মিলিয়ে থেকে তাঁরা আজ ভারতের স্বাধীন জাতিকে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলছেন, তোমরা মানুষ হও, বিরাট মনুষ্যত্বের রাজ প্রতিষ্ঠা কর, মৃত্যু আমাদের সার্থক কর।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে সমস্ত ভারতবর্ষকে যখন গান্ধীজী শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ক'রে নিয়েছিলেন, তৈরী বারুদ যখন শুধুমাত্র জ্বলন্ত কাঠির অপেক্ষায় ছিল, গান্ধীজী সেই শেষ আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েও সংগ্রামের আহ্বান দেন নি। তিনি চাইছিলেন viceroyএর সঙ্গে তখনো একবার শেষ বোঝাপড়া করে নিতে। কিন্তু viceroy সে সুযোগ দিলেন না। গভর্ণমেণ্ট জুলাই মাস থেকেই সিদ্ধান্ত ক'রে রেখেছিল যে, সংগ্রাম শুরু করতেই তারা দেবে না। তাই যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্ব্বেই, শেষ কথা উচ্চারণ করবার আগেই সংগ্রামের মূল শিকড়সুদ্ধ ইংরেজ পিষে মেরে ফেলতে চাইল। ৮ই আগষ্ট রাতে কংগ্রেস বোম্বেতে Quite India প্রস্তাব গ্রহণ করল। তারপরই রাত্রি ৪॥০ টায় জাতির পিতাকে অতি চুপে চুপে গ্রেপ্তার ক'রে আগা খাঁ প্রাসাদে নিয়ে গেল। একে একে সেখানে আসতে লাগলেন গান্ধীজীর অতি প্রিয় সঙ্গীগণ। এলেন কস্তুরবা, এলেন মহাদেব দেশাই। মহাদেব দেশাই এবং কস্তুরবা গান্ধীজীর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত এবং একান্ত অনুগত অনুচর, তাঁরই পশ্চাতে পরম নির্ভয়ে আগা খাঁ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু ফিরবার দিনে গান্ধীজী ফিরলেন সঙ্গীহারা, বন্ধুহীন, একা।

আগা খাঁ প্রাসাদের সেই দিনগুলি যেন বিষাদে ছেয়ে আছে। সেটা ছিল ১৯৪২ সালের ১৫ই আগষ্ট। প্রতিদিনের মতো সেদিনও ভোর হয়েছে। প্রাসাদ কারার সেই হাসি মাখা ছোটো ফুলগুলি বাপুজীর সঙ্গে থাকতে পেয়ে যেন বন্দীশালার সকল বঞ্চনা, সকল যাতনা ভুলে সার্থকজীবন মনে করছিলেন। সেদিনও প্রাতঃকালে প্রতিদিনের মতোই বাপুজীর সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরে এলেন মহাদেব দেশাই। তার পর একসঙ্গে হৈ হৈ করে সকালের খাওয়া সমাধা হ'ল। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দীরা যেন স্বর্গে এসেছেন।

বেলা প্রায় ৮টার সময় মহাদেব দেশাই কর্ণেল ভাণ্ডারী এবং দু'একজন বন্দীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঘুরতে লাগলো। তিনি শুয়ে পড়লেন। ডাঃ সুশীলা নায়ারও সেই প্রাসাদেই বন্দিনী। খবর পেয়ে তিনি ছুটে এসে দেখেন যে, মহাদেবের নাড়ী ক্ষীণ হয়ে আসছে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ইনজেকসান দিয়ে তাঁর হার্টকে সতেজ করতে চেষ্টা করা হ'তে লাগলো কিন্তু সবই বৃথা। ওপারের ডাক তখন মহাদেব শুনতে পাচ্ছেন।

গান্ধীজীও তৎক্ষণাৎ এলেন। তাঁর অতি প্রিয় শিষ্যকে ডাকতে লাগলেন "মহাদেব, মহাদেব"। কোন সাড়া নেই। কস্তুরবার গলা কাঁপছে, তিনি বলছেন, "মহাদেব, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন? বাপু যে তোমাকে ডাকছেন!"

মহাদেব তখন তাঁর বাপুজীর এপারের কাজ সা ক'রে মহাযাত্রায় চলে গেছেন। ২০ মিনিট মাত্র সময় দিয়েছিলেন তিনি। তারপর ৮-৪০ মিনিটে সব শেষ।

আগা খাঁ প্রাসাদ সেদিন শোকের বেলাভূমি। মহাদেব দেশাই শুয়ে রয়েছেন, ঘুমন্ত শিশু যেন। স্থির, শান্ত সেই দেহ ফুলে ঢাকা রয়েছে, ধূপের গন্ধে ঘরখানি ভরপুর। বন্দীরা অশ্রুভারে তাঁকে ঘিরে বসে আছেন বাপুজী এবং সুশীলা নায়ার গীতা পড়ছেন।

তারপর গান্ধীজী উঠলেন। তিনি নিজের হাতে তাঁর প্রিয় পুত্রকে স্নান করাতে লাগলেন। তাঁর হাত থর্ থর্ করছে,—কারো বাধা তিনি মানছেন না। স্নানের পরে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে তিনি চন্দন দিয়ে মহাদেবের শরীর লেপে দিলেন। তারপর চিতায় তুলে দিয়ে আপন হাতে বাপুজী আগুন জেলে দিলেন। অবশেষে একান্ত স্নেহের ধনকে ভস্মীভূত করে ফেলে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

মহাদেবের জীবনস্মৃতি বুঝি একটার পর একটা এসে দেখা দিতে লাগলো সেদিনের চিতার আগুন ঘিরে। বলার সেই মহাদেব দেশাই সাহিত্যে, ভাষাজ্ঞানে, বিদ্যানুরাগে বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন তারপর বাপুজীর দৃষ্টিতে পড়লেন তিনি ১৯১৭ সালে তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মহাদেব। সবরমতী আশ্রমে গুরুর কাছেই রয়ে গেলেন তিনি। সেই থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বাপুজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। যতবার স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান এসেছে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, সেই ১৯২০ সাল থেকে আরম্ভ করে একটার পর একটা সংগ্রামে ১৯৩০ সালে, ১৯৩২ সালে এবং সর্ব্বশেষ ১৯৪২ সালে। কোন সংগ্রামেই মহাদেবকে ফাঁকি দিতে পারে নাই।

গান্ধীজী ভারতবর্ষময় যত পরিভ্রমণ করেছেন গত ২৫ বছরের সমস্ত ভ্রমণে মহাদেব দেশাই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা আপন সঙ্গী এবং নিকটতম বন্ধু।

কত হাজার হাজার প্রকৃতির নরনারী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে আসতো, মহাদেব দেশাই থাকতেন তাদের সকলের সামনে। তিনি নিখুঁত ভাবে লিখে চলতেন সেই সাক্ষাতের বিবরণ ও আলোচনা। যত জনসভায় এবং ঘরোয়া আলোচনায় গান্ধীজী বক্তৃতা করতেন মহাদেব রাখতেন প্রায় তার প্রতিটি কথার হুবহু রিপোর্ট। গান্ধীজীর চিঠির সমুদ্রের ব্যবস্থাও তিনিই করতেন।

গান্ধীজীর দর্শন মহাদেব দেশাইর মতো সম্পূর্ণ ক'রে খুব কম লোকেই বুঝেছে। তাঁর মতো ক'রে গান্ধীজীর এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসও আর কেউ বুঝি পায়নি। গান্ধীজীর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর দর্শনের ঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র মহাদেবই করতে পারেন। তাই তিনি বিশ্বাসের পাত্রকে 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক ক'রে দিলেন। গান্ধীজীর প্রতি মহাদেব দেশাইর গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল নিঃস্বার্থ ও মধুর। গান্ধীজীর কাছে মহাদেব ছিলেন সুযোগ্য শিষ্যেরও বেশী আপন পুত্রেরও অধিক। বাপুজীর পক্ষে মহাদেবের মৃত্যু যে কী ছিল তা কেউ ধারণাই করতে পারবে না। তবুও দুস্তর সাগর এসে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর অতিপ্রিয় ধনকে বিপুল প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

মহাদেবের শ্মশানের সামনে বসে দিনের পর দিন বাপুজী তাঁকে ফেলে এগিয়ে যাওয়া পুত্রকে ভেবেছেন, আর, আগা খাঁ প্রাসাদের বন্দীশালার দুর্ব্বহ দিনগুলি কাটিয়ে দিয়েছেন।

মহাদেব দেশাইর মৃত্যুর ঠিক ১৮ মাস পরে আগা খাঁ প্রাসাদে আবার মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল। এবার পালা কস্তুরবার। মহাদেবের মতো অসময়ে বা হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়নি। অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর অসুখের সময় গভর্ণমেণ্টের নির্ম্মম ব্যবহারে গান্ধীজীর অসীম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা চলেছিল। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে ডাঃ জীবরাজ মেটা কস্তুরবাকে চিকিৎসা করতে এলেন। কিন্তু কস্তুরবার অসুখ বা অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথা ডাক্তারকে বলতে গান্ধীজীকে অনুমতি দেওয়া হ'ল না। গান্ধীজী উৎকণ্ঠায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন। আরেকজন ডাক্তারকেও এমনকি পরামর্শ এবং জরুরী ডাকের জন্যও ভিতরে থাকবার অনুমতি দিল না। সারারাত ধ'রে তিনি মটরে আগা খাঁ প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যদি সেই রাতে তেমন কিছু ঘটে। গান্ধীজীর মর্ম্মবেদনার আদি, অন্ত রইল না। মানসিক যাতনা তাঁর এতখানি হয়েছিল যে, তিনি চাইলেন হয় কস্তুরবাকে সাময়িকভাবে ছুটী দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হোক অথবা গান্ধীজীকে এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হোক।

গভর্ণমেণ্ট গান্ধীজীর ইচ্ছায় কর্ণপাত করল না।

১৯৪৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭-৩০ টার সময় কস্তুরবা এ জগতের সকল সুখ দুঃখের ভার গান্ধীজীর কাছে নামিয়ে দিয়ে চিরবিদায় নিলেন।

১৮ মাস পূর্বে গান্ধীজীর প্রিয়তম শিষ্য মহাদেব দেশাই অসময়ে মৃত্যুর যবনিকা ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, আর আজ বিদায় নিলেন কস্তুরবা। মহাদেবের শ্মশানের পাশেই কস্তুরবার চিতা জ্বলে উঠলো। লোকের মাঝখানে থেকেও গান্ধীজী আজ আর অশ্রু রোধ করতে পারলেন না। একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছিলেন দু'জনে। চিরসঙ্গী সেই কস্তুরবা আজ তাঁকে একলা ফেলে রেখে চলে গেলেন। জাতির পিতার সারাজীবনের সাধনার পরীক্ষাগুলি প্রথমেই যে চলতো কস্তুরবার উপর দিয়ে। তিনি উত্তীর্ণ হ'লে তবেই তো জাতি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'ত। মানবতা এবং সমাজের সেবায় দু'জনেই ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক। আশ্রমজীবন যাপন করতে গিয়ে কস্তুরবার উপর গান্ধীজী কড়া প্রহরীর মতো লক্ষ্য রেখে চলতেন, এবং কস্তুরবা মহত্তর জীবনে সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে, নম্রতার সঙ্গে, মর্য্যাদার সঙ্গে পার হয়ে গেছেন। গান্ধীজীর সারাজীবনের সকল কাজে কস্তুরবা গ্রহণ করতেন প্রধান অংশ। সাধনার পরীক্ষায়, উপবাসের দুর্য্যোগে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, কারাগারে সর্ব্বত্রই গান্ধীজীর পাশে পাশে ব্যাকুল মনে আকুল আগ্রহে তিনি চলেছিলেন। সেই একনিষ্ঠ যাত্রা আজ তাঁর থেমে গেল। পরাধীনতার আলা ঘোচাতে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধরত সৈনিক আজ সগৌরবে কারার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। জাতি তার মহীয়সী জননীকে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রেম অন্তর থেকে নিবেদন করল।

তারপর, দিনের পর দিন প্রিয়বিচ্ছেদের ঐ স্থান, মহাদেব দেশাই এবং কস্তুরবার শ্মশানের দৃশ্য গান্ধীজীর স্নায়ুকেন্দ্রকে চূর্ণ ক'রে দিতে লাগলো। ধীরে ধীরে গান্ধীজীর ভগ্নভবনে, জীর্ণদেহে যখন বিপদের আশঙ্কা দেখা দিতে লাগলো তখন অকস্মাৎ ওই যে তাঁর মুক্তির আদেশ এল। প্রথম যেদিন তিনি এই আগা খাঁ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন ছিল এটা কারাগার। আর, আজ সেই প্রাসাদের কারাগারে তাঁর কাছে সমাধিস্থান হয়ে রইলো। মুক্তির মুহূর্তে সেই প্রিয় পরিজনের সমাধি তাঁকে যেন মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ডেকে ডেকে ফিরতে লাগলো। বিষাদে ছেয়ে গেল কারার বিদায়ক্ষণ! গান্ধীজী এখানে এসেছিলেন পরিপূর্ণ আনন্দভরা, আজ ফিরে যাচ্ছেন শূন্যমনে, রিক্তহাতে। বিপুল জনতার আসছেন যেন নিঃসঙ্গ—একা এক মহাযাত্রী।

করাচিতে নৌ-সেনা বিদ্রোহ

শ্রীঅনিল কুমার রায়

ম্যানোরা। করাচি পোতাশ্রয়কে ঘিরে রয়েছে এই ছোট্ট দ্বীপটি। কোল ঘেঁসে ওর পরে রয়েছে সুদূর প্রসারী আরব সাগর। কে জানত ওরই বুকের ওপর দিয়ে ব'য়ে যাবে বিপ্লবের ঝড়, ওর বালুতটে আঁকা থাকবে শহীদের স্মৃতি, ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে এই অজানা অচেনা অখ্যাত নামটি। শুধু নৌ-সেনাদের থাকবার এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে পোতাশ্রয় বাঁচাবার জন্যই যেন এ দ্বীপটির সৃষ্টি হোয়েছে। বেসামরিক জনসংখ্যা এখানকার খুবই অল্প, দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্যও অধিবাসীদের সহরের মুখাপেক্ষী হোতে হয়। কিন্তু করাচি বন্দর থেকে এ দ্বীপটি একেবারেই বিচ্ছিন্ন।

যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয় পালতোলা ডিঙ্গী নৌকা বা মোটর লঞ্চ। ১৯৪৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী এই ম্যানোরার বুকচিরে বেজে উঠল বিদ্রোহের বিউগ্‌ল্, কাতারে কাতারে নৌ-সেনা এগিয়ে এল আত্মাহুতির মন্ত্রে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করবার অদম্য আকাঙ্খা ফুটে বেরুলো ওদের চোখে চোখে। পলাশীর স্মৃতি, আজাদ হিন্দ ফৌজ, জালিয়ানওয়ালাবাগ, আগষ্ট বিপ্লব ওদের ঝিমানো প্রাণে জেলে দিল বিদ্রোহের আগুন—যে আগুন প্রায় একশো বছর আগে আর একবার জ্বলেছিল বাহাদুরশার নেতৃত্বে। সে দিনের সে বিদ্রোহ থামাতে ইংরেজকে আশ্রয় নিতে হোয়েছিল চূড়ান্ত বর্বরতার আর '৪৬ সের নৌ-বিদ্রোহ থামাতে সেই বর্বর ইংরেজকে আশ্রয় নিতে হোয়েছে ভারতীয় নেতাদের, ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দাঁড়াতে হোয়েছে তাঁদের দুয়ারে। সিপাহী বিদ্রোহের মত যদিও নৌ-সেনা বিদ্রোহ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি তবুও একথা নিঃসংশয়ে বোলবো যে সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজের প্রাণে যতটুকু ভীতির সঞ্চার করেছিল, নৌ-বিদ্রোহের ব্যাপকতা দেখে তারা তারচেয়ে কম ভয় পায়নি। ভারতীয় নেতাদের সমর্থন পেলে হয়ত এই নৌ-সেনা বিদ্রোহই ইংরেজ রাজত্বের যবনিকা টেনে দিতে পারত। হয়ত নৌ-বিদ্রোহের বীজ ইতস্তত: ছড়িয়ে প'ড়ে সৈনিক ও বৈমানিকদের প্রাণেও আগুন জেলে দিত। কিন্তু ভাগ্যবান ইংরেজ, তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও অব্যাহতি পেয়েছে ভারতীয় নেতাদেরই দয়ায়।

নৌ-বিদ্রোহের মূল কারণ আবিষ্কার কোরতে তিনজন ভারতীয় বিচারপতি ও দুইজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীকে নিয়ে যে কমিটী ভারত গভর্ণমেণ্ট নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের Reportএ যদিও এ বিদ্রোহকে পুরোপুরি রাজনৈতিক রূপ দেওয়া হয়নি তবুও এ কথা তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নৌ-বিদ্রোহে প্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে নৌ-বিদ্রোহের মূল কারণটিই ছিল রাজনৈতিক। ভাত কাপড়ের যে দাবীগুলি কর্তৃপক্ষের সম্মুখে আমরা হাজির করেছিলুম সেগুলি ছিল নেহাতই মামুলী—তাদের ক্ষুদ্র রোষ থেকে অব্যাহতি পাবারও ছিল একটা পন্থা।

বিদ্রোহের একটি স্ফুলিঙ্গের দিকে শুধু আমরা তাকিয়ে ছিলুম, "তলোয়ারের" বুক চিরে সেটি যখন বেরিয়ে এল, আগুন আর কারু জ্বালাতে হোলোনা, আপনা থেকেই জ্বলে উঠল। ভেবেছিলুম ঐ আগুনেই স্বেচ্ছাচারী শাসকের দল পুড়ে ছারখার হোয়ে যাবে। তা হয়নি সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে। নেতাজীর শেখান বাণী 'জয়হিন্দ' মুখে নিয়ে যারা আত্মাহুতি দিয়েছে দেশ তাদের জানেনি, জানতে চেষ্টাও করেনি! কিন্তু আমরা জোর গলায় বোলবো তারা শহীদ, তারা অমর। হয়ত তাদের জন্যে বেদী রচনা হয়নি, ফুলের মালা পড়েনি তাদের শবের ওপর, তবুও বোম্বে, করাচি, ম্যানোরার প্রাণস্পন্দন যতদিন থাকবে, ততদিন বিরাজমান থাকবে তাদের কীর্তি নৌ-সেনাদের মুখে মুখে বাজবে তাদের জয়গান।

বেতার শিক্ষার্থী কেন্দ্র 'তলোয়ার' থেকে বিদ্রোহের খবর ম্যানোরায় পৌছুতে খুব বেশী সময় লাগেনি। "চমকের" বেতার যন্ত্রে এ খবর যখন এলো দিন শেষে নৌ-সেনারা এসে জুটেছে সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে সাগরের

বালুচড়ায়। এটি ছিল তাদের নিত্যকার কাজের একটি অঙ্গ। সূর্য অস্ত গেল। কালো একটা পর্দা ছড়িয়ে পড়ল সাগরের বুকে। ছোট ছোট ঢেউগুলি আছাড় খেতে লাগল বালুচড়ায়। মাঝ সাগরে লাইট হাউসের বাতিটা উঠ্‌ল সজাগ হোয়ে। সন্ত বেতার যন্ত্রে প্রাপ্ত খবরটা লিখে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালুম ওদের মাঝে। বালুচড়ায় চলল তপ্ত বৈঠক। "হিমালয়" আর "বাহাদুরে"ও জানান হোলো, ওরাও লোক পাঠাল অতি অল্প সংখ্যায়। ঠিক হোলো কর্মপন্থা তৈরী হবার পর সবাইকে সেই অনুযায়ী চলতে হবে আর পরের দিন ভোরেই "হিন্দুস্থান" ও "ট্রাভাঙ্কুর"কে এ বিষয় জানিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বোলে রাখা ভাল যে জাহাজ বোলতে বা বোঝায় করাচিতে সে রকম জাহাজ ছিল শুধু দু'খানা "হিন্দুস্থান" ও "ট্রাভাঙ্কুর"। বাকী সব কটাই "হিমালয়", "চমক," "বাহাদুর," "মুণ্ড," "দেলোয়ার"—স্থল প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে "দেলোয়ার" ও "মুণ্ড" ছিল ম্যানোরার বাইরে। আমাদের প্রথম কাজ হোয়েছিল সমস্ত নৌ-সেনাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং কর্মপন্থা অনুযায়ী তাদেরকে পরিচালিত করা। ১৯শে ফেব্রুয়ারীর বৈঠকেই কার্যকরী সমিতি গঠন ও সাধারণ কর্মপন্থা তৈরী হোয়ে যায়। সেটা মোটামুটি এই :—

(১) ২১শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহ ঘোষণা।

(২) ২০শে ফেব্রুয়ারী সমস্ত দিনরাত সজাগ থেকে পাহারা দেওয়া যাতে না কর্তৃপক্ষ অস্ত্রশস্ত্র দ্বীপের বাইরে চালান দিতে পারে।

(৩) সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিউগ্‌ল্‌গুলিকে বাজিয়ে বিদ্রোহের বাণী ঘোষণা করা।

(৪) White Ensign বা রাজকীয় পতাকা নাবিয়ে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা মাস্তুলে ওঠান।

(৫) করাচি সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি প্রদক্ষিণ কোরে জনসাধারণকে সজাগ করা।

(৬) কর্তৃপক্ষ হিংসার আশ্রয় না নেওয়া পর্যন্ত অহিংস থাকা।

(৭) পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যকরী সমিতি যে নির্দেশ দেবে তা মেনে চলা।

ভোর হোতেই কাজ চলতে লাগল নিয়মিত ভাবে। বোম্বের বিদ্রোহের খবর আর লুকোনো রইল না কারু কাছে। খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতা জুড়ে বেরিয়ে পড়ল বিদ্রোহের কথা। কর্তৃপক্ষের দল উঠল অদ্ভুত রকমের সজাগ হোয়ে, হঠাৎ যেন নৌ সেনাদের প্রতি তাদের আচরণ গেল বদলে। "Best ration" দেবার হুকুম এল "গেলীতে", ঘন-ঘন ছেলেদের ডেকে নিয়ে উপদেশ বর্ষণ হোতে লাগল তাদের উপর। আকার ইঙ্গিতে এটুকুও বুঝিয়ে দেওয়া হোলো যে বিদ্রোহ কোরলে বা বোম্বের নৌ-সেনাদের উপর কোন রকমের সহানুভূতি দেখালে ফল হবে ভীষণ। Discipline Act এর মোটা বইটা এনে পড়িয়ে শোনান হোলো..... "Every person subject to this Act who will join in a mutiny will suffer death or such other punishment as is hereinafter mentioned"..... এ কথাগুলো এত বেশীবার শুনেছি আর এত বেশী কান-সহা হোয়ে গেছে যে এবারে ওগুলো অনেকটা লক্ষ্মীর পাঁচালীর মত শোনাল। ধীরে ধীরে দিন গড়িয়ে পড়ল। সূর্যাস্তের বিউগ্‌ল্‌ উঠল বেজে। শেষবারের মত White Ensign নাবিয়ে নেওয়া হোলো। কেবিনে গিয়ে radio-telephone টি খুলে ধরলুম। আর একবার কর্মপন্থা জানিয়ে দিলুম সবাইকে। সারা রাতটা কাটল তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যে।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই তারস্বরে বেজে উঠল বিউগ্‌ল্‌গুলি সব মাস্তুলে উড়তে লাগল ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। "হিমালয়" ও "বাহাদুরের" নৌ-সেনারা একে ছুটল "চমক" প্যারেডগ্রাউণ্ডে। ঠিক যেন কতগুলি বুভুক্ষু সিংহ বেরিয়ে পড়েছে খাঁচা থেকে। সকলের চোখেই জ্বলছে আগুন যুগ যুগের লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেবার বাসনায় ওরা যেন মাতাল হোয়ে উঠেছে। হিন্দু মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, এংলোইণ্ডিয়ান, সকলে যেন এই একটি মুহূর্তে ভুলে গেছে তাদের বিভিন্ন পরিচয় ভুলে গেছে তাদের ধর্ম, তাদের সমাজ। প্রাণ খুলে ওরা

চেচাচ্ছে" "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" 'Quit India' "জয়হিন্দ"। চমকের "কমাণ্ডিং অফিসার (জনৈক বাঙ্গালী) শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন ওদের নিরস্ত করবার। পাল্টা জবাবে আমরাও ছেলেদের ডেকে নিয়ে তৈরী হোতে লাগলুম করাচী সহরে যাবার জন্ত। বাছা বাছা কয়েক জনকে রেখে যাওয়া হোলো পাহারাদার হিসাবে। একদলকে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো "হিমালয়" জেটীর দিকে। বাকি সবাইকে নিয়ে আমরা চললুম ম্যানোরা জেটীর দিকে। ঠিক হোলো কিয়ামারী জেটী থেকে "হিন্দুস্থান" ও "ট্রাঙ্কারের" ছেলেদের নিয়ে শোভাযাত্রার সুরু হবে Naval H. Q. থেকে।

ম্যানোরা জেটী থেকে যে কখানা নৌকা পাওয়া গেল সবকখানাতেই বোঝাই হোয়ে চললুম ওপারে। ঘাট বরিয়ায় যেতেই শুনতে পেলুম টমীগানের কর্কশ শব্দ। কিয়ামারে পৌঁছে জানতে পেলাম যে "হিমালয়" জেটী দিয়ে যারা আসছিল এপারে একদল গোরা সৈন্ত তাদের ঘিরে ফেলে গুলি চালাতে থাকে বেপরোয়া ভাবে। দূর থেকে "হিন্দুস্থানে"র নৌ-সৈনিকেরা ওদের এই অসহায় অবস্থা দেখে ডেকের উপর টুয়েলভ্ পাউণ্ডার বসিয়ে আক্রমণ করে গোরা সৈন্তদের। সে আক্রমণ প্রতিরোধ কোরতে না পেরে পালিয়ে বাঁচে এই টমীর দল। ছুটি মৃতদেহ আর তার সাথে ৬জন আহত নৌ-সৈনিককে নিয়ে আসা হয় "হিন্দুস্থানে"। গোরা সৈন্তদের এই জুলুম, নিরস্ত্র নৌ-সৈনিকদের এই হত্যাকরণই বাধ্য কোরেছিল করাচির নৌ-সৈনিকদের হাতিয়ার আশ্রয় নিতে। হাজার হাজার গোরা সৈন্তের সঙ্গে লড়বার মত ক্ষমতা আমাদের কিছুই ছিল না; আমরা জানতুম যে আমাদের আরও প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে, আমাদের রক্তে "হিন্দুস্থানের" ডেক লাল হোয়ে যাবে তবুও একটু আগে যাদের হারিয়েছি তাদের মৃত্যুর পানে চেয়ে প্রতিহিংসা নেবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া সম্ভব হয়নি। আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত নৌ-সৈনিকদের উপর ছেড়ে দেওয়া হোলো "হিন্দুস্থানের" ভার। ওরা অফিসারদের তাড়িয়ে দিয়ে জাহাজের সার্বভৌম কর্তৃত্ব তুলে নিল নিজেদের হাতে। বাকি ছেলেদের নিয়ে আমরা ফিরে এলুম স্থল প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেখানকার কর্তৃত্ব বজায় রাখতে।

২২শে ফেব্রুয়ারী সকাল ৮-৪৫ মিনিট Army H. Q. থেকে আদেশ এল জাহাজ ছেড়ে দেবার; আর ঠিক তার আধঘণ্টা পরেই গুলিবর্ষণ হোতে লাগল "হিন্দুস্থানের" উপর। নৌ-সৈনিকেরাও প্রতিউত্তরে গুলি চালাতে থাকে। প্রায় একঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর প্রতিপক্ষের একটি গোলায় জাহাজের একপ্রান্তে আগুন লেগে যায়। উপায়ান্তর না দেখে ওরা অস্ত্র নামিয়ে নিতে বাধ্য হয়। আহত নৌ-সৈনিকদের চীৎকারে ছাপিয়ে তোলে করাচির আকাশবাতাস। ওদের তাজা খুনের ফিনকি ডেকের চারপাশ দিয়ে গড়িয়ে পোড়ে লালকোরে তোলে আরব সাগরের নীল জল।

১২ জন সৈনিক প্রাণ বিসর্জন দেয় আর আহত হয় প্রায় ৭০ জন। বিপক্ষদলেরও আনুমানিক ২০ জন হত ও আহত হয়।

বিদ্রোহী নৌ-সৈনিকদের লরীর উপর চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হোলো মালার বন্দী শিবিরে। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধ জনতা অভিনন্দন জানাল ওদের মৌনভাবে। স্থল প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আমরা তৈরী হোতে লাগলুম নতুন আক্রমণের জন্তে। আমাদের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। রক্ত দেখে দেখে আমরা হোয়ে উঠেছি হিংস্র, চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন, মনের বল রয়েছে অটুট, মৃত বন্ধুদের বিকৃত মুখগুলি জাগিয়ে দিচ্ছে প্রেরণা আর সাহস। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের এ অবস্থা শুধু তাদেরই বোধগম্য হবে যারা প্রত্যক্ষ কোরেছে এই বিশেষ মুহূর্তগুলি। কিন্তু আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমাদের আগ্রহ সব ভেঙ্গে চুরমার হোয়ে গেল পরের দিন। যে হাত বাড়িয়েদিলুম প্রতিশোধ নেবার জন্ত, বাধ্য নত কোরে লোহার শিকল পরতে হোলো সেই হাতে। রক্ত দিয়ে যাদের আত্মার তর্পণ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, চোখের জলে তাদের জানাতে হোলো আমরা কত অসহায়। খবরের কাগজে

বেরুল সর্দার প্যাটেলের হস্তক্ষেপের কথা। বোম্বে ডকইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে সর্দারজী নাকি বোলেছেন যে আমাদের এ বিদ্রোহে দেশের অকল্যাণ হবে, তাই তিনি আবেদন জানিয়েছেন যেন আমরা আত্মসমর্পণ করি। নৌ-সৈনিকদের আর কোণ্ডের অন্ত রইল না।

যে অত্যাচারের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার আকাঙ্খা নিয়ে ওরা মৃত্যুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পোড়েছিল, পরাজয়ের গ্লানি বোয়ে সবাই অপেক্ষা কোরতে লাগল আরও বেশী অত্যাচারের। মাস্তুল থেকে নাবিয়ে নেওয়া হোলো ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। বিউগিলে বেজে উঠল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি। কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলুম যে আমরা আত্মসমর্পন করছি, প্রয়োজন হোলে আমাদের বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু কমাণ্ডিং অফিসারেরা বিশ্বাস কোরল না আমাদের কথা, কয়েক হাজার গোরা সৈন্য নিয়ে এসে ব্যূহ রচনা কোরলো আমাদের চারধারে। ওরা বাজনা বাজিয়ে প্রদক্ষিণ কোরলো আমাদের দল প্রতিষ্ঠানগুলি ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলো যে আমরা ওদের বন্দী। ভারতীয় অফিসারদের কাছে পরম উপভোগ্য হোলো গোরা সৈন্যদের এই "Victory parade" ওদের বেওনেটের আড়ালে থেকে চলতে লাগল তর্জন গর্জন। কিন্তু বেশীদিন সহ্য কোরতে হয়নি এই পাকা গোলামদের শাসন। ২৪শে, ফেব্রুয়ারী সকালেই আমাকে আর চারটি বন্ধুর সঙ্গে চালান দেওয়া হোলো মালীর বন্দী শিবিরে।

করাচি থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে একদম জনগণ বর্জিত একটি যায়গায় যুদ্ধ বন্দীদের রাখ্‌বার জন্যই সৃষ্টি হোয়েছিল ২টি শিবিরের। দৈর্ঘে প্রস্থে একটি প্রায় ২০০ গজ। ঘন কাঁটাতারের বেষ্টনীর মধ্যে ১০টি কামরা-যুক্ত এক একটি ব্যারাক। বাইরে বৃত্তাকারে সাজান গোরা সৈন্যদের কোয়ার্টার। এরই একটি শিবিরে ঢুকিয়ে দেওয়া হোলো প্রায় ৭০০ বিদ্রোহীকে। মোটে ৯০ জনের স্থান হোলো কামরা গুলোতে। বাধ্য হোয়ে বাকি সবাইকে স্থান কোরে নিতে হোলো মুক্ত আকাশের তলে। শুনলুম জাপানী যুদ্ধ বন্দীদের সরিয়ে দিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই পাশের শিবিরটিও আমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রায় এক হপ্তা কাটল এই ভাবে তারপর বেছে বেছে প্রায় ৫০০ ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হলো পাশের শিবিরে। আমাদের ব্যারাকের চারপাশে খান পঞ্চাশ তাঁবুও পাটিয়ে দেওয়া হোলো। বেশ কাটতে লাগল দিনগুলো। কাঁটা তারের বেড়ার আড়ালে থেকেও যেন স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে লাগলুম। যে ঝাড়ুদারগুলো আসত তাদের দিয়েই চলত গোপনে পাশের শিবিরের সঙ্গে পত্রালাপ। দরকার হোলে সহরে পাঠিয়ে অন্যান্য খবরও আনা যেত ওদের সাহায্যে। প্রায় মাস খানেক গেল এই ভাবে। ভাগ্য আমাদের কোনপথে চালিত কোরবে তখনও বুঝে ওঠতে পারিনি। ঐ ক্ষুদ্র গণ্ডি টুকুর বাইরে যে কেউ আমাদের কথা ভাবছে তা বিশ্বাসই হোতো না। আমাদের এ বিদ্রোহ যে দেশের আনাচে কানাচে ঢেউ তুলেছে তা জানতে পেরেছি প্রায় ৩ মাস পর জেলে গিয়ে। বন্দীশিবিরে ঝাড়ুদার 'রূপসীই' ছিল আমাদের "রয়টার"। কোনদিন এসে বলতো: "বাবুজী, আজ্‌বরমে ইয়ে বাত নিকলা যো হিন্দুস্থান আজাদ হো গয়েঙ্গে", কোনদিন বা খবর নিয়ে আসত "কংগ্রেসী লোগোনে বহুত কৌশিস্ কর্‌রহে আপলোগকো ছোড়নে কি লিয়ে"। ওর কথা থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যেত যে দেশের পরিস্থিতি বদলাতে চলেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের দান কতটুকু সে নিয়ে মাথা ঘামাইনি, তবে এটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে দেশ রক্ষার ভার যাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ইংরেজ প্রভুরা আর তাদের বিশ্বাস কোরতে পারছেনা কাজেই চূড়ান্ত ভাবে আপোষ মীমাংসার দিকে নজর দিয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি, ন্যোরিন ড্রাইভ ও ডিগরোডে বৈমানিকদের ধর্মঘট, নৌ-বিদ্রোহ সবগুলো মিলে শাসকের প্রাণে অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার কোরেছিল। যাইহোক "আপলোগকা ছোড় দিয়া যায়গা" কথাটা ধীরে ধীরে ফলবতী হোতে লাগল। শুনলুম পাশের শিবিরে প্রতিনিয়তই অফিসাররা আসছে গীতা, কোরাণ, বাইবেল গ্রন্থ-সাহেব নিয়ে। যারা আপন আপন ধর্মগ্রন্থ

ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কোরছে অফিসারদের আদেশ, উপদেশ মেনে নেবার তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হোচ্ছে যার যার জাহাজে বা স্থল প্রতিষ্ঠানে। আর যারা ধর্মগ্রন্থ ছুঁতে নারাজ তাদের কপালে জুটছে "discharge with disgrace" এবং একখানা কোরে রেলওয়ে পাশ বাড়ীতে পৌছনোর। যতদূর জানি ১০ ভাগের ৮ ভাগ ছেলেই শেষোক্ত পন্থাটি বেছে নিয়ে সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠে-ছিল। মিনিটখানেক পরেই নজর পোড়লো আমাদের শিবিরের দিকে। ৫০ জন ফিরে গেল "to serve the king and the country". আর ১০০ জন হাসিমুখে বিদায় নিয়ে শেষ কোরল তাদের নাবিক জীবনের। আমাদের ৫০ জনকে ধর্মগ্রন্থ ছোঁবার সুযোগটুকুও দেওয়া হলো না। একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস কোরে জানলুম we are not competent to touch the sacred books. অপরাধের মাত্রাটা অনুমান করে নেওয়া শক্ত হোলো না। গাড়ীতে চড়বার সৌভাগ্যটাও যে শীঘ্র হবেনা সেটাও পরিষ্কার হোয়ে গেল।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। একটা দুশ্চিন্তা থেকেই রেহাই পাওয়া গেল।

এবারে সুরু হোলো শ্রীঘরের পালা। ৬জন ৭জন কোরে রোজই সরিয়ে নেওয়া হোতে লাগল আমাদের কাছ থেকে অবশেষে সংখ্যাটা যখন এগারতে নাবল তখন হঠাৎ ও পথটাও বন্ধ হোয়ে গেল কিছুদিনের জন্য। সুযোগ বুঝে আশেপাশের টমীগুলো তাদের মৃত বন্ধুদের আত্মার সদ্গতির জন্য শত্রুদলনে অবতীর্ণ হলো। বাইরে থেকে ওদের নল কেটে দেওয়া, ইতস্তত: টুপাটকেস ছোঁড়া একটা নিত্য নৈমেত্তিক ব্যাপার হোয়ে দাড়াল। অবস্থাটা চরমে উঠল সেদিন যেদিন আমাদের শিবিরের চারপার্শ্বে গ্যাস জেনারেটার বসিয়ে ওরা আমাদের মারবার উপক্রম কোরেছিল। ঘন ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বেশ কষ্ট হচ্ছিল নিঃশ্বাস নেবার। মুখ খেয়ে মাতাল হোয়ে পশুগুলো হাসছিল আমাদের অবস্থা দেখে, রেহাই পেয়েছিলুম একটি শেতাঙ্গের দয়ায়, তবে তিনি আইরিশ ওদের সগোত্র নন্। অর্থাৎ রক্ষীগুলোর শেতাঙ্গ প্রীতি আর ওদের এই হীন অত্যাচার অসহ্য হোয়ে উঠ্‌ল, বাধ্য হোয়ে অনশন কোরতে হোলো পরের দিন।

H. Q.তে খবর যেতে যেতে প্রায় ১০ ঘণ্টা লেগে গেল। একজন Major General এসে খুব বুঝিয়ে সুজিয়ে আশ্বাসও দিলেন যে দোষী যারা তাদের Court-martial হবে। ওদের কথায় আর কাজে যে খুব বেশী সামঞ্জস্য থাকেনা তা জানতুম; তবুও ভরসা হলো যে কুকুরগুলোর হাত থেকে অন্ততঃ বাঁচা যাবে, হয়েছিলও তাই। আমাদের ও অনশনকে বে-আইনী ঘোষণা না কোরে কেন যে অমন তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপারটার সমাধান করা হোলো তা বুঝে নিতেও বেগ পেতে হলোনা।

জনৈক অফিসার এসে খবর দিলেন যে ভারতসরকার নৌ-বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছেন। এবং তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই করাচি আসবেন।

আমাদের কারু যদি কমিশনের সামনে কিছু বলবার থাকে তো যেন তৈরী কোরে রাখি। পাছে কমিশনের কাছে টমীদের দুষ্কৃতি ফাঁক হোয়ে যায় সেই ভয়েই ঐ উচ্চপদস্থ কর্মচারিটির আবির্ভাব হয়েছিল আর তাই অতি মোলায়েম ভাষায় তিনি বলেছিলেন "to forgive is divine". আমরা উঠে পড়ে লেগে গেলুম আর সব বিবৃতি তৈরী কোরতে। আসপাশ থেকে কয়েকটা ফিউসড্ গ্যাস জেনারেটারও কুড়িয়ে আনতে ভুল হোলনা যেগুলো প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হবে কমিশনের সামনে। ভাবলুন ধর্মগ্রন্থ ছোঁবারই যখন অধিকার হয়নি তখন ক্ষমা কোরবো কোন সাহসে। আর তাছাড়া কবি-গুরুও বলেছেন "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে....."কাজেই সেদিক দিয়েও পাপের ভয় আছে। অবশেষে একদিন লরীতে চাপিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হোলো করাচির ইস্‌লামিয়া কলেজ হোষ্টেলে। দেখলুম কোর্ট বোসেছে একটা মস্তবড় হলঘরে। বাইরের জনসাধারণও এসেছে প্রচুর। কমিশনের ৪ জন সদস্যের

মধ্যে ৩ জনই ভারতীয় বিচারপতি বাকি ২ জন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সামরিক কর্মচারী। প্রথমেই ডাক পড়ল আমার। শপথ গ্রহণের পর বিবৃতি পড়ে গেলুম। বিচারপতি মহাজন, বিচারপতি আয়েঙ্গার ও নেভাল জেনারেল বীচ কয়েকটা প্রশ্ন কোরলেন। উত্তর দেওয়া শেষ হোলেই গ্যালজেনারেটারগুলি এগিয়ে দিয়ে বললুম যে ভবিষ্যতে এ রকম অত্যাচার কোরলে ও শিবিরে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াবে! বিচারপতি কয়জ আলী (চেয়ারম্যান) আশ্বাস দিলেন যে এ ব্যাপারটা তিনি কর্তৃপক্ষের নজরে আনবেন। একে একে সকলের বিবৃতি দেওয়া হোলে পর শিবিরে ফিরে এলাম। আবার সুরু হোলো কাটছাটের পালা। ৬ জনকে পাঠান হোলো করাচি জেলে আর ২ জনকে দেওয়া হোলো রেলওয়ে ওয়ারেন্ট। পেছনে রয়ে গেলুম আমি, আজমীরের হিরালাল ও গুজরাটের আকবর আলী Court-martial এর জন্যই যে আমাদের অপেক্ষা কোরতে হবে সে কথাও জানিয়ে দেওয়া হোলো।

ইতাবসরে সিন্ধু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির চেষ্টায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস জুন্না, গোভর্ধন ভাজিরাণী প্রমুখ ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি defence committee তৈরী হোলো আমাদের পক্ষাবলম্বনের জন্য। তাঁরা একদিন বন্দী-শিবিরে এসে দেখা কোরলেন আমাদের সাথে। বিদ্রোহের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে দিলুম তাঁদের কাছে। তারপর ৮ই জুন Naval H. Q. থেকে Court-martial দলীল পত্রের একটা কোরে Copy পাঠিয়ে দেওয়া হোলো আমাদের কাছে। Judge Advocate আমায় জানাচ্ছেন Orders having been given for a Court-martial for your trial to be assembled on shore at H. M. I. S. 'Himalaya' at 10 a m. on Monday the Seventeenth day of June 1946 or as soon afterwards as circumstances will permit".....আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ হোলো "Joining as a Ring leader in a mutiny" Contra S. 11 of the 1st Schedule to the Indian Navy (discipline) Act 1934.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযোগ হোলো "Behaving with contempt to a Superior officer (Commanding officer) Contra S. 17 of the 1st Schedule to the Indian Navy (discipline) Act 1934. আমার বিরুদ্ধে যে ৪জন অফিসার সাক্ষী দিচ্ছেন তাদের বক্তব্যও পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে।

১৭ জুনের জন্যে তৈরী হোতে লাগলাম। ওদিনটি এসে বেরিয়ে গেল কিন্তু ডাক পোড়ল না। তারপর হঠাৎ একদিন Judge Advocate এর কাছ থেকে একখানা চিঠি এলো "take notice that the orders given for your trial by Court-martial have been cancelled. শুনলুম ভারত সরকারই রহিত কোরে দিয়েছেন আমাদের Court-martial এবং হিরালাল ও আকবর আলীর কাছেও অনুরূপ চিঠি আসবে দিন কয়েকের মধ্যেই। অবাক হোয়ে গেলুম। মনে পড়ে গেল বাঙ্গালোরের বিদ্রোহের কথা। কোন এক রেজিমেন্টের বাঙ্গালী যুবকেরা এগিয়ে এসেছিল দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কিন্তু তাদের ২ জনকে ফাঁসী ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অনেককেই বিভিন্ন রকমের কারাদণ্ড ভোগ কোরতে হয়। তাদের অপরাধের চেয়ে আমাদের এ অপরাধের গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই ঘরে ফিরে যাবার বাসনা আমরা তিনজন সত্যি সত্যিই ছেড়ে দিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম "discipline" এর নাম নিয়ে আমাদের তিনজনের নিশ্চিহ্ন কোরে দিতে ওদের একটুও বেগ পেতে হবে না। কিন্তু '৪৩ আর '৪৬ এ কত তফাৎ!

মালীর বন্দী শিবিরের জীবন শেষ হোলো আমার ২৬শে জুন। ঐ দিনই এসে ঢুকলাম করাচি ডিষ্ট্রিক্ট জেলে ৬০ দিন কারাবাস করবার হুকুম নিয়ে। দিন পাঁচেক পরেই হিরালাল আর আকবর আলী এসে জুটল আমার সাথে। পুরোনো বন্ধুদেরও অনেককে পেলাম সেখানে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসেবেই বেশীর ভাগ দিনগুলি কাটাতে পেরেছিলাম করাচি কংগ্রেস

...য়ায়। সকলের মনেই ইচ্ছে ছিল করাচির উপকূলে একটি শহীদ বেদী করবার, কিন্তু দেশ বিভক্ত হোয়ে যাবার এবং অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে এতদিন তা সম্ভব হয়নি আজ এ দায়িত্ব পোড়েছে পাকিস্থানের অধিবাসীদের ঘাড়ে। তাঁদেরই রাজধানীর সাগর তীরে যাঁরা শেষ সংগ্রাম কোরেছে তাদের উপযুক্ত সম্মান দেখাতে তাঁরা পশ্চাৎপদ হবেন না এ ধারণা করা হয়ত অন্যায় নয়।

বোম্বের অধিবাসীদেরই এ বিষয় অগ্রণী হওয়া একান্ত কর্তব্য। মনে পড়ে জনৈক কংগ্রেস নেতার কথা "The Naval mutiny was really the beginning of an end of the British Imperialism in India." তাই যদি সত্যি হয়, যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে নৌ-বিদ্রোহীদের কোন কিছু দান থাকে তবে যারা অবিচার অত্যাচার সহ্য কোরে প্রাণ দিয়েছে অকাতরে তাদের শহীদ বোলে স্বীকার কোরতে আগ্রহ প্রকাশ না করাই হবে চূড়ান্ত অবিচার।

নারী

শ্রী সংযুক্তা কর, বি, এ।

...নি নারী আমি আমি মহীয়সী
...রিহাসছলে গড়া নহি আমি বিধাতার বিদ্রূপের হাসি।
...ষ্ঠে মোর জ্বলে অনুরাগ
...লন্তেরি তান।
...জহীন যাত্রা মোর
...মাহীন পথে
...দ্রোহের রুদ্রবহ্নি হাতে
...াল জ্বালায়ে চলি
...শুভার নিতে অবসান
...লয়ের বাজায়ে বিষাণ।
...হার বেশায় নাচি চূর্ণ চূর্ণ করি জীবনেরে
...ভিক্ষু ইহার স্পর্শ বাঁধা মোর বীণের বেসুরে।
...রুণ ভীরুতারে তাই আমি ছিন্ন ভিন্ন করি
...অগ্নি ধরি।
...ভাবন মোর দুরন্ত
...তীব্র দুর্দম।
...টানে কে জানে
...চলে অসীমের পানে।
...হিক সকল
...প্রতিদান
...খানে নাহি কোন টান।
...ত্রিক জীবনছন্দে
...টেছে যে নিখুঁতি সব
...পরে নাহি কোন লোভ।
...শুধু সম্মুখেতে চাওয়া
...প্রাণ হারিছীন ধাওয়া।
নাহি আশা, প্রত্যাশার ঋণ নাহি রাখি
মোর দুটি আঁখি
পেয়েছে জীবনে এক দুরন্ত বিস্ময়
অনির্বাণ অগ্নিযজ্ঞ অমর অক্ষয়।
আজ শুধু জানি
নহি আর কন্যা শুধু নহিক জননী।
ধরনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বের বলয়ে
যড়ঋতু ভঙ্গ মাঝে
উত্থান বিলয়ে
বিপ্লবের বীজমন্ত্রে সাধা যাঁর বীণা
নিজেরে চিনেছি আমি তাঁরি এক কণা।
এজীবনে বাঁচিবার সাধী আছে মোর
উদাস কৌতুক ভরে অশান্ত কিঙ্কিনী
বাজয়ে চলি যে আমি উন্মনা বিভোর।
নহি ক্ষীণ নহি দীন নহি আমি হেয়
এ সান্ত্বনা পরম পাথেয়।
ক্লেদক্লিন্ন এ ধরার পঙ্গু জীবনেরে
সীমার শৃঙ্খলে বাঁধা ব্যর্থ অসত্যেরে
বৃথা মান অভিমানে বাঁধিবনা আর
খুঁজিয়া পেয়েছি আজি আমাকে আমার।
দুর্জ্জয় সাহসে তাই
বরমাল্যে বরেছি অজানা
তাই মোর নাই আর মানা।
অকুণ্ঠ গরবে ভরি প্রচারিতে আজ
টানিয়া ছুড়িয়া ফেলি কুসুমিত সাজ
হতাশার অঙ্ক নহি শুধু
বিলাসের ভোগ্য প্রেমরাশি
শুধু নারী নারী আমি
আমি মহীয়সী।

স্বরাজ্য আন্দোলনে বাংলা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

বরদৌলি প্রস্তাবে আইন অমান্য স্থগিত করা হয়েছে। কাজেই অসহযোগ আন্দোলন তখন বন্ধ আছে। অথচ জাতির মনে একটা চাঞ্চল্য রয়ে গেছে। বাংলার যুবকগণ আবার মন দিতে সুরু করল সশস্ত্র গুপ্ত ষড়যন্ত্রের দিকে।

১৯২২ সাল; এপ্রিল বা মে মাসে চট্টগ্রামে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনের এক অধিবেশন হল; তাতে দেশ-বন্ধুর পত্নী শ্রীমতী বাসন্তী দেবী সভানেতৃত্ব করেন। তাঁর অভিভাষণে ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশের ইঙ্গিত করা হয়। যাকে পরে স্বরাজ্য আন্দোলন বলা হয়—তার সূচনা এখান থেকে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে যুগান্তর দলের নেতারা প্রায় সবাই চট্টগ্রামে সমবেত হন। যতীন রায়, ডাঃ আশুতোষ দাস, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুরেন ঘোষ, ভূপেন দত্ত, নৃপতি মজুমদার, সূর্য সেন, বিপিন গাঙ্গুলী, জ্যোতিষ ঘোষ প্রভৃতি সবাই আলাপ আলোচনা করেন—দলের ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে। মোটামুটি সিদ্ধান্ত এই হ'ল, নিজেদের দল এখন পুনর্গঠন করা দরকার। কিন্তু বর্তমানে অস্ত্রের প্রয়োগ বা গুপ্ত সমিতির কোন কার্যক্রম নেওয়া হবে না।

এই সময় যুগান্তর দলের সঙ্গে বিদেশের ভারতীয় বিপ্লবীদের কিছু যোগ স্থাপিত হয়। নরেন ভট্টাচার্য তখন মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে খ্যাত হয়েছেন; শৈলেন ঘোষ, তারক দাস, সুরেন কর প্রভৃতি পুরানো বিপ্লবী কর্মী—এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এঁদের মধ্যে মানবেন্দ্র ও শৈলেন ঘোষ একটু বেশী সক্রিয় ছিলেন। মানবেন্দ্র কিছু কাগজপত্র পাঠাচ্ছিলেন। ২১ সালের শেষ দিকে তাঁর চিঠি নিয়ে নলিনী গুপ্ত এলেন; কিন্তু যুগান্তর দলের নেতারা তাঁর প্রতি বিশেষ আস্থা স্থাপন করতে পারলেন না। যুগান্তর দল তখন থেকে মানবেন্দ্রের সঙ্গে রীতিমতো যোগাযোগ রাখতে সুরু করে। যদিও অসহযোগ আন্দোলন ও কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর ও রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির মতের সঙ্গে এরা একমত ছিল না। পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট পার্টির মনোভাব নিয়ে পত্রালাপ চলতে থাকে। এই সম্বন্ধে পরে, এখান হ'তে যাদুগোপাল মুখার্জি একটি থিসিস লিখে পাঠান। ঐ থিসিসের মূল কথা ছিল এই যে ঔপনিবেশিক দেশসমূহে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন প্রথমে প্রয়োজন এবং রুশিয়ার উচিত তাতে সাহায্য করা। তাদের সমাজতান্ত্রিক মতে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিবেচিত হ'ত। যাদুবাবুর সেই থিসিস নিয়ে মানবেন্দ্র যে চেষ্টা করেন তারই ফলে তৃতীয় আন্তর্জাতিক নতুন ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করে।

আটলান্টিকের ওপারে আমেরিকায় শৈলেন ঘোষ Friends of Freedom for India Society স্থাপন ক'রে ভারতের পক্ষে আন্দোলন করতে থাকেন। তাঁর পুরাতন বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে তিনিও যোগাযোগ স্থাপন করেন। যখন ডি ভেলেরা আমেরিকায় আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য টাকা তুলতে যান, তখন আমেরিকার বিখ্যাত হার্ষ্ট পত্রিকা গোষ্ঠির (Hearst group of papers) মারফৎ শৈলেন তাঁকে অনেক সাহায্য করেন। রুষিয়া বা আমেরিকা উভয় স্থলের সঙ্গেই যোগাযোগের একটা আড্ডা ছিল সরস্বতী লাইব্রেরী। অসহযোগ আন্দোলনে এই লাইব্রেরী বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের অনেকটা সংযোগস্থল হ'য়ে দাঁড়ায়। বৈদেশিক যোগাযোগেও সরস্বতী লাইব্রেরীর মারফৎ অনেক কাজ হয়েছে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে বিপ্লবী কর্মীদের এক ঘনিষ্ঠ যোগ এই সময় স্থাপিত হয়—যা ক্রমে সাহিত্যিক গণ্ডী ছেড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়। নজরুল, মোজাফর আহমেদ প্রভৃতি একটা নতুন কর্মী-গোষ্ঠির মতো গড়ে উঠছিল। যুগান্তর দলের সঙ্গে এদের যোগ প্রথম অবস্থায় যথেষ্ট ছিল; কিন্তু ক্রমে কংগ্রেসের প্রতি মনোভাব নিয়ে মোজাফরের সঙ্গে যুগান্তর দলের পার্থক্য হতে থাকে; নজরুল ক্রমে

রাজনীতি থেকে দূরে স'রে পড়েন। কিন্তু নজরুলের বিখ্যাত "ধূমকেতু" কাগজ পরিচালনায় ভূপতি মজুমদার ও তার বন্ধুগণ বিশেষ সাহায্য করেছেন।

আর একটি কর্মী গোষ্ঠিও দানা বাঁধতে লাগল,—যুগান্তরের কিছু তরুণ সভ্য তখনই সশস্ত্র গুপ্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অস্থির হয়। এই দলের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সন্তোষ মিত্র যিনি হুগলি বিদ্যামন্দিরে ভূপতি মজুমদারের সঙ্গে কাজ করছিলেন। জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ ও বিপিন গাঙ্গুলী এঁদের সমর্থন করলেন। কিন্তু এঁদের দলের মধ্যে এমন একটি লোক জোটে যার রাজনৈতিক সততা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ ছিল।

মৌলানা আজাদের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কালীন কার্যকর্মের সম্পর্কিত লোকদের হাতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অঞ্চলে কিছু অস্ত্র ছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের সময় কোন প্রকারেই অস্ত্র নিয়ে তারা কিছু করতে পারে না—যাদুবাবুর এই নির্দেশে যুগান্তর দল ঐ অস্ত্র আনবার কাজে হাত দিতে অস্বীকার করে। তখন ঐ অসৎ লোকটি কোন প্রকারে ঐ ব্যাপারের মধ্যে এসে পড়ে। এবং পরে সব সন্ধান পুলিশকে দিয়ে দেয়। এবং নিজের দল হতে বিতাড়িত হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় সে অনুশীলনের কর্মী হিসাবে ধরা পড়ে। তার তৎকালীন আচরণে সবাই তাকে সন্দেহ করত। এই তরুণ কর্মীদের সঙ্গেও সে অসৎ উদ্দেশ্যেই ভিড়ে পড়ে। এই কর্মীগোষ্ঠির সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্যে গোপীনাথের ফাঁসী একমাত্র গৌরব ক'রে বলার মতো ঘটনা।

১৪।১৫ বছর বয়সে গোপীনাথ হুগলি বিদ্যামন্দিরে আসে;—ছাত্র যতটা, তার চেয়ে বেশী ছিল সে স্বেচ্ছাসেবক কর্মী। রঙ্গে কালো, দৈহিক সৌষ্ঠব তার এমন কিছু ছিল না। তবুও ঐ তরুণ সকলেরই স্নেহ আকর্ষণ করত তার স্নিগ্ধ মৃদু স্বভাবের জন্য। হুগলি থেকে তাকে পাঠানো হ'ল বরিশাল শঙ্কর মঠে;—অল্প কিছু দিন দৌলৎপুর সত্যাশ্রমেও ছিল। তারপর বহু দিন ছিল সরস্বতী লাইব্রেরীতে। কিন্তু একদিন সে চ'লে গেল—এক মিথ্যা আহ্বানের আকর্ষণে। টেগার্ট ভ্রমে সে হত্যা করল ডে নামে একটি ইংরাজকে। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ করল। এই ভুলের জন্যও বোধ হয় দায়ী পুলিশের একটি গুপ্তচর যে দলের মধ্যে থেকে উসকানী দেবার কাজ করত। সে সঙ্গে থেকে টেগার্ট বলে ডে-কে দেখিয়ে দেয়। এর পূর্বের দিন সে পার্সি ব্রাউন নামক বিখ্যাত শিল্পীকে টেগার্ট ব'লে দেখিয়ে দেয়। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন সেগুলি করার সুযোগ পায়নি।

১৯২২ সালের মাঝামাঝিতে আইন অমান্য অনুসন্ধান কমিটি ভারতের সব প্রদেশ ঘুরে দেখল। এই কমিটির সুপারিসে বলা হ'ল—

আইন অমান্য এখন চলতে পারে না। ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ ক'রে ভিতর থেকে বাধা দেওয়া সম্বন্ধে—আজমল খাঁ, মতিলাল নেহেরু ও বিঠলভাই পেটেল অনুমোদন করলেন; ডাঃ আনসারী, রাজাজী ও কস্তুরি রঙ্গ আয়াঙ্গার এর প্রতিবাদ করেন।

দেশবন্ধু খালাস হ'য়ে ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হন। গয়া কংগ্রেসে ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হ'ল না। দেশবন্ধু ওখানে সভাপতি; কোন প্রস্তাব নিয়ে তিনি কিছু বলতে পারেন না। তাই নীরবে নিজের মতের পরাজয় সহ্য করে এলেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করে ব্যবস্থাপরিষদের পক্ষে আন্দোলন করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই প্রচারের স্বাধীনতার জন্য তিনি কংগ্রেসের কোন কর্মকর্তার পদে থাকতে চান নি। এই সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এক প্রস্তাব পাশ করে যে গয়া কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুযায়ী পরিষদ বর্জনের পক্ষে আর প্রচার কাজ চালানো হবে না। এতে কিন্তু দেশবন্ধু তুষ্ট হলেন না; তিনি চাচ্ছিলেন পরিষদ প্রবেশের পক্ষে প্রচার। যে মাসে তিনি নিখিল ভারত ও বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।

কংগ্রেসের নেতৃমহলে ইতিমধ্যে দেশবন্ধুর কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোড়ন সুরু হয়েছে। তার ফলে রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জওহরলাল,

ডাঃ আনসারি পর পর কার্যকরী সমিতি থেকে ইস্তফা দেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের এক অধিবেশন দিল্লীতে হয়, মৌলনা আজাদ তার সভাপতি হন। এই কংগ্রেসে প্রস্তাব হয় কংগ্রেসীরা পরিষদে নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে এবং পরিষদে প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস থেকে কোন প্রচার চালানো হবে না। এই কংগ্রেসের পরই স্বরাজ্য দল স্থাপিত হয় এবং ২৩-২৪ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের নামেই প্রতিযোগিতা করা হয়।

দিল্লী কংগ্রেসের কিছু পূর্ব হ'তেই দেশবন্ধু চেষ্টা করছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর মতের প্রাধান্য স্থাপন করতে। এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র যুগান্তর দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন তখন বৌবাজারে চেরী প্রেস ও হ্যারিসন রোডের ধারে বেনেটোলায় শ্রীসরস্বতী প্রেসে যুগান্তর দলের দুটি বিশেষ আড্ডা ছিল। সুভাষচন্দ্র এই দুই আড্ডায় প্রায়ই আসতেন। যুগান্তর দলের অধিকাংশ কর্মী তখনও স্বরাজ্য কার্যক্রমের বিরোধী। যাদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আলাপে স্থির হয় যে যুগান্তর দল দেশবন্ধুর কার্যক্রম সমর্থন করবে। বোধ হয় জুলাই মাসে Indian Association Hallএ প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে যুগান্তর দলের সমর্থনে—দেশবন্ধু জয়ী হন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর স্থলে মৌলনা আক্রাম খাঁ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ভূপতি মজুমদার সম্পাদক হন।

চট্টগ্রামে ব'সে যুগান্তর দলের যে সিদ্ধান্ত হয় সেই অনুসারে ভূপেন দত্ত, মনোরঞ্জন গুপ্ত স্বর্গীয় নরেশ দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন জেলায় দলের পুনর্গঠনের জন্য যান। ভূপেনবাবু এর পর পাঞ্জাবে গিয়ে কিষণ সিংহ ও তাঁর যুবক পুত্র ভগৎ সিংহের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন। যুগান্তর দল তখন আত্ম-শক্তি ও সারথী নামে যে সাপ্তাহিক কাগজ বের করছিল, তাতে দলের মতবাদ প্রচার করা হ'ত। অনুশীলন দল থেকে বের করা হল শঙ্খ নামে এক সাপ্তাহিক। অনুশীলনদল প্রধানত কাজ করছিল নিজেদের দল নিয়ে। অহিংসার প্রতি একদল যুবকের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণার সুযোগ নিয়ে তারা যুবকদের উপর একটা প্রভাব রাখছিল। অপরদিকে যুগান্তর দল প্রধানত কংগ্রেসকে নিয়েই কাজ করছিল।

১৯২২ সালে মনোরঞ্জন গুপ্ত বঙ্গীয় কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ২৩ সালে ভূপতি মজুমদার সম্পাদক হন। তা ছাড়া সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায়, সতীশ চক্রবর্তী, অশ্বিনী গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবন চ্যাটার্জী বিভিন্ন সময়ে বঙ্গীয় কংগ্রেসের কর্মকর্তা নির্বাচিত হন।

এই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ সুরু হয়। দেশবন্ধু Bengal Pact বা বঙ্গীয় চুক্তি করে হিন্দু ও মুসলমানের রাজনৈতিক দাবীর একটা আপোষ করেন। এই চুক্তিতে মুসলমানদের অনেক ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে এর অনুমোদন পেতে দেশবন্ধুকে বেশ বেগ পেতে হয়। কিন্তু পরে যুগান্তর দলের সমর্থনে এই চুক্তি বঙ্গীয় কংগ্রেসে অনুমোদিত হ'ল। ২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে বঙ্গীয় চুক্তির অনুকরণে একটি জাতীয় চুক্তি বা National Pact গৃহীত হয়। বঙ্গীয় চুক্তির পিছনে ছিল বাংলার বিপ্লবী রাজনীতি বোধ।

ঐ সময় মেদিনীপুরে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনে শাসমল সংগঠন শক্তির ও নেতৃত্বের বিশেষ পরিচয় দেন। তাঁর নেতৃত্বে মেদিনীপুরে জনগণের মধ্যে যে সংগঠন ও প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে, তারই বনিয়াদের উপরই ১৯৩০-৩২ সালের ও ১৯৪২ সালের আন্দোলন ওখানে দাঁড়াতে পেরেছিল।

কংগ্রেসের দিক নিয়ে যখন এসব চলছিল তখন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির কাজও বাংলার কিছুটা সুরু হয়। বাংলায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ডাকাতি ২।৪টা হয়েছে। যুগান্তর দল হতে পৃথক হয়ে একদল যুবক যা করছিল, তা পূর্বেই বলেছি। অন্যান্য ছোটবড় দলও কিছু ডাকাতি করেছে। পুলিশ সজাগ হয়ে উঠল। তখন টেগার্ট

আবার বাংলায় ফিরে এসেছে। ধর পাকড়ের গুজব খুব চলছিল, কিছু কিছু লোক ধৃতও হল এবং ২।১টা বামাল'ও জব্দ হল।

এই সময় এল ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে বুড়িবালামের তীরে যতীন মুখার্জীর নারোত্তর বা martyr হবার তারিখ। যুগান্তর দল ঐ দিনে একটি উৎসবের আয়োজন করল। বাংলার সবগুলি কাগজ এই উপলক্ষে যতীন্দ্র নাথের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে এবং বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে বিশেষ সংখ্যা বের করল। ৯ই সেপ্টেম্বরের উৎসব হয়ে গেল; কিন্তু ২৪শে সেপ্টেম্বর বাংলার প্রায় ৩০জন বিখ্যাত কর্মীকে গ্রেফতার করা হ'ল। এর মধ্যে যুগান্তর দলের ছিল ১২।১৩ জন। এরপর ১৯২৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী গোপীনাথ কর্তৃক ডেকে হত্যার পর আরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়; এঁরা সব কয়জনই যুগান্তর দলের।

সালের শেষ দিয়ে ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন হ'ল, বাংলায় ও ভারতের সর্বত্র স্বরাজ দলের প্রার্থীরা নিরঙ্কুশ ভাবে জয়ী হ'ল। বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে কোন স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করাই সম্ভব হ'ল না; কেন্দ্রীয় পরিষদে স্বরাজ্য দলের নেতা হলেন পণ্ডিত মতিলাল। সেখানে কাগজে দাঁড়াল, সমস্ত বাজেটই অস্বীকার করা হ'ল। বাংলা দেশে একের পর এক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে পড়ছে আর ভাংছে। শেষ পর্যন্ত বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে গভর্ণর শাসন সংস্কার স্থগিত রাখতে হয়।

১৯২৬ সালের ১২ই জানুয়ারী হঠাৎ মহাত্মাজীর এপেণ্ডিসাইটিস (Appendicitis) রোগ ধরা পড়ল, ঐ দিনই দুপুর রাত্রে তাঁর অস্ত্রোপচার হ'ল। ৫ই ফেব্রুয়ারী বিনাসর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। খালাসের পর তিনি বোম্বের উপকণ্ঠে জুহু (Juhu) নামক সমুদ্র-সন্নিহিত স্থানে বিশ্রামের জন্য যান। দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল জুহুতে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করেন। ফলতঃ গান্ধীজীর বিবৃতি ও তাঁদের দুজনের জবাবী বিবৃতি কাগজে বের হ'ল। ব্যবস্থা পরিষদের কার্যক্রম গান্ধীজী সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন—পরীক্ষা মূলকভাবে এই কার্যক্রম চলতে থাক। ফলাফল দেখে হয় স্বরাজীরা নয় তিনি মত পরিবর্তন করবেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি স্বরাজীদের দিকে আকৃষ্ট হ'তে লাগলেন —বিশেষ করে দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত আন্তরিকতার জন্য।

এর কিছু পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সিরাজগঞ্জ অধিবেশনে গোপীনাথ সাহার কার্যের নিন্দা ক'রে তাঁর ত্যাগ, নিস্বার্থ মনোভাব ও দেশ প্রেমের তারিফ করা হয়। গান্ধীজী এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জুনমাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আমেদাবাদ অধিবেশনে এক প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব নিয়ে ওখানে তুমুল বিতর্ক হয়, গান্ধীজী সভায় অশ্রুবর্ষণ পর্যন্ত করেন। অবশ্য তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে এক তীব্র আন্দোলন সুরু হয় তারকেশ্বর মন্দির নিয়ে। তারকেশ্বর বাংলার একটি নামকরা তীর্থ, অথচ এর কেলেঙ্কারী কাহিনী বহু রাষ্ট্র ছিল। দেশবন্ধু ঐ সত্যাগ্রহের দায়িত্ব নিলেন। এবং নিজ পুত্র চিররঞ্জনকে সত্যাগ্রহী ভাবে জেলে পাঠান। আন্দোলন পরিচালনার সব ভারই তিনি যুগান্তর দলের সুরেন ঘোষ, হরি কুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির হাতে দিলেন। বাংলার বিভিন্ন জেলা হ'তে কর্মীরা এসে এই সত্যাগ্রহের কাজে সাহায্য করতে লাগলেন।

বাংলায় তখন কিছু যা সামান্য বিপ্লবী কাজ চলছিল, তার সুযোগ নিয়ে সরকার এক অর্ডিনেন্স জারী ক'রে সুভাষ বসু, সুরেন ঘোষ, হরি চক্রবর্তী, সত্যেন মিত্র, অনিল বরণ রায়, প্রভৃতি বহু লোককে গ্রেফতার করে। এমন সন্দেহ করার কারণ আছে যে পুলিশের আদৎ উদ্দেশ্য ছিল স্বরাজ্য দলকে আঘাত করা—এবং বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে দেশবন্ধুর ও কংগ্রেসের যোগ কেটে দেওয়া। বেলগাঁও কংগ্রেসে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী তাঁর সভাপতির অভিভাষণেও বলেন যে বাংলার এই নিষ্পেষণ হ'ল প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য দলের প্রতি আক্রমণ।

এই সম্বন্ধে বার্মার জেল হতে ভূপেন দত্ত ও জীবন চ্যাটার্জি পুলিশের কারসাজী ও মিথ্যা রচনার কাহিনী

লিপিবদ্ধ ক'রে ভারত সচীবের নিকট এক চিঠি পাঠান। ঐ চিঠিতে বলা হয় পুলিশের নিয়োজিত গুপ্তচর বা agent provocateur অনেক সময় যুবকদের সমস্ত বৈপ্লবিক কাজে উস্‌কানি দিয়েছে যাতে পুলিশ একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্রের অছিলা করে বহুলোককে গ্রেফতার করতে পারে। চিঠি সংবাদ পত্রে Memorial to the White Hall নামে প্রকাশিত হয়। তার একটি কপি (copy) বা নকল দেশবন্ধুর নিকট পাঠানো হয়। দেশবন্ধু তা গান্ধীজীকে দেখান; গান্ধীজীর মনে সন্দেহ রইল না যে ব্যাপক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ বহুলাংশে পুলিশের রচিত মিথ্যা। এর ফলে স্বরাজ্য দলের দিকে তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন।

১৯২৪ সাল শেষ হবার পূর্বে ভারতের বিভিন্ন স্থলে প্রায় ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়; এর মধ্যে কোহাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ও বাংলা তার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রেখেছিল, এইটা বাংলার বৈশিষ্ট্য ও দেশবন্ধুর কৃতিত্ব। দিল্লীতে গান্ধীজী ২১ দিন উপবাস করেন। Unity Conference বা ঐক্য সম্মেলন ও All-Parties Conference বা সর্বদল সম্মেলন প্রভৃতির ফলে তখনকার মতো একটা নতুন আবেষ্টনের সৃষ্টি হ'ল। কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ক্রমেই পরিস্ফুট হ'তে লাগল।

২৪ সালের শেষ দিয়ে বেলগাঁও কংগ্রেসে কার্যত স্বরাজ্যদল গান্ধীজীকে নিজেদের দলে প্রায় পুরো-পুরি পেল।

তখন বাংলার যুবকগণ একটা অন্ধ প্রেরণায় ছুটছিল; পুলিশের গুপ্তচরদের সম্বন্ধে তাদের মনেও তখন আর কোন সন্দেহ রইল না। এমনি অবস্থায় একটি পুলিশ চরের প্ররোচনায় একটি যুবককে ডেকে নিয়ে তারই এক বন্ধু তাকে হত্যা করে। পরে হত্যাকারী যুবক নিজের ভুল বুঝতে পারে। ঐ পুলিশ চরের দোকান গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু মারা যায় একজন নিরীহ ক্রেতা। ঐ গুপ্ত পুলিশ চরটি সেই যে বাংলা হ'তে সরে পড়ল, আজও তার কোন সন্ধান হয় নি। জেলে আবদ্ধ বন্দীদের মধ্যেও পুলিশের প্রেরণা ও প্ররোচনা চলছিল। একজন খ্যাত পুলিশ কর্মচারী প্রায় রোজ আলিপুর জেলে গিয়ে আটক বন্দীদের মধ্যে ২।৪ জনের ঘরে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিত। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরাও তখন আলিপুরে ছিল।

এরা প্রধানত যুগান্তরের বিভিন্ন শাখার যুবক। এদের নেতৃত্ব তেমন ভাবে কেউ নেয় নি, চট্টগ্রামের সূর্য সেনের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। একদিন মরিয়া হ'য়ে লৌহ-দণ্ড নিয়ে ঐ পুলিশ কর্মচারিটিকে এরা হত্যা করে। সেই উপলক্ষে অনন্ত হরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর ফাঁসী হয় এবং ৭।৮ জনের দীর্ঘ দ্বীপান্তর বণ্ডের আদেশ হয়। এই যুগে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ঘটনাবলীর মধ্যে এই ঘটনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সহকর্মীদের আচরণ তাঁরা জাতীয় অপমান ব'লে মনে করেছিলেন, তাই নিজেদের জীবন দিয়ে সেই কলঙ্ক দূর করবার চেষ্টা করলেন। ঐ মারোত্তর (martyr) বীরদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করছি।

জাতীয় আন্দোলন একটা একটানা স্রোত; এর পূর্বের ও পশ্চাতের ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে প্রত্যেক ঘটনাকে বুঝতে হয়। যে দুই অধ্যায়* নিয়ে আমি আলোচনা করলাম বিচ্ছিন্নভাবে তাকে দেখলে ভুল করা হবে।

*কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে পঠিত।

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

শ্রীসুনির্ম্মল

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নিয়ে সাহিত্য গড়ে উঠে। প্রকৃতির মাঝে যে রং, রস ধারাবাহিকভাবে ফুটে উঠে আকাশে, বাতাসে, বনে, পর্ব্বতে তাকে পরিবেষণ করা স্বকীয় আত্মস্বাতন্ত্র্যে তাই সাহিত্য। বাস্তব পদার্থ ব্যতীত সাহিত্যের অপর একটা রূপ আছে যা ইন্দ্রিয়াতীত, যা গগন পেরিয়ে যায়। অতীত রয়েছে পরিবেষ রয়েছে, ভবিষ্যতের কল্পনা রয়েছে, সংহতি-রয়েছে, আপনার অটুট শক্তি গড়ে তুলতে পারে সাহিত্য। যাকে পাওয়া যায় না তার আকাঙ্ক্ষা যুগে যুগে মানুষ করে এসেছে, স্বর্গীয় কল্পনা একমাত্র মানুষের অধিকার। বোধগম্য যা নয় সাধারণ মানুষের মাঝে বা সাধারণের মাঝে যে ভাবধারা প্রকটিত নয় তাকে প্রকটিত করে তোলা। তার মনের সমুদয় গুণাবলিকে জাগ্রত করা। উপাদান সংগ্রহ নানাদিক থেকে, উপাদানে আপন বিশেষত্বে বিশেষিত নয়—তাকে সম্পূর্ণ আপন অনুভূতির আলোকে গুণারোপিত করা। একটা হোলো Objective, অপরটা হোলো subjective. বস্তুজগৎ হোতে যে সাহিত্য পৌঁছে দিতে পারে না একটা ভাব-জগতে সত্যকার সাহিত্য নয় তা। একটা হোলো What is, অপরটা What should be. Aristotle তাই কবি সম্বন্ধে বলেন—It is not the function of the poet to relate what has happened but may happen what is possible according to the law of probablity or possibility." সত্যিকার সাহিত্যের কোন সীমা নেই, সে অসীম—সেলির প্রমিথিউস্ আনবাউণ্ড। রবীন্দ্রনাথ সীমার মাঝে অসীমকে বুঝেছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর
আমার মাঝে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

এ হোলো অতীন্দ্রিয়—যা মনোজগতে এনে দিতে পারে স্বর্গ—তাকে বিলিয়ে দেওয়া মর্ত্তজগতে! সাহিত্যের রূপ হবে অনুভূতি হোতে স্বতঃ উৎসারিত—স্বতঃস্ফূর্ত্ত তার রচনাশৈলী। যা প্রাণহীন রূপায়ণে হবেনা ঘূর্ণীয়মান—সৃষ্টির মাঝে তবুও রয়ে যায় উন্মেষবিকাশের ধারা—সে বিজ্ঞান-সম্মত—ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শনের আঙ্গিক,—স্বতঃপ্রবাহিনী যে উন্মেষপদ্ধতি মানবের মনোজগতে কার্য্যকরী—সর্ব্বকালের সর্ব্বযুগের সমাজেও।

সত্যতাকে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এককথায় ও সর্ব্বোপরি সাহিত্য বিশ্বজগত আপনার দান।

সত্য, সুন্দর, মঙ্গল তার আলোক-বর্ত্তিকা, যুগের পথ-প্রদর্শক—যা নিয়ে যেতে পারে মুহূর্ত্তকে চিরন্তনী সত্যের দরবারে—"সত্যম্, শিবম্ সুন্দরম্" তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে, ক্ষণিককে যা চিরকালের মঙ্গলজনক করে তুলতে পারে যা ব্যক্তি হোতে নিয়ে যায় অসীম বিশ্ব-মানবতার মধ্যে। সাহিত্য শান্তির সোপান, অযাচিত শান্তিবারি বর্ষণ মর্ত্তোর-মাঝে, একজনের সার্বত্রিক সত্তাকে অপরের মাঝখানে বিলিয়ে দেওয়া, সেখানেই সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য যাকে বলা হয়—Seraphically free from the paint of personality. রাজনীতিতে যাকে কেন্দ্রীকরণ বলে সাহিত্য তাই—তাই সবথেকে বেশী বিকেন্দ্রীভূত। এ হোলো সাহিত্যের গণতান্ত্রিকতা, যা জাতিকে জাতি হোতে সমগ্র বিশ্বজাতিতে পরিণত করতে পারে—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন—"মহামানবের সাগরতীরে"। অনুভূতির স্পন্দনে যে সাহিত্য দোলা তুলতে পারে না, কারক্লিষ্টছন্দের বন্ধনে যে সাহিত্য আন্তরিক দোলায় দোলায় যা মিলিয়ে দিতে পারে না তা সাহিত্য নয়, সাহিত্যের অপর নীতি, সাহিত্যের বিড়ম্বনা।

বস্তুর আধিক্য থাকলেই যে সাহিত্য সৃষ্টি হোতে পারে তা নয়—স্রষ্টার মনোজগতে সৃষ্টির-উপাদান নিচয়ের যে কোন একটীর অভাব ঘটলেই সাহিত্যের অঙ্গহানি। স্বতঃস্ফূর্ত্ত হৃদয়াবেগ, হৃদয়ের অনুভূতি, বস্তুকে আপন অন্তরের আলোকে উদ্ভাসিত করা, সংযম, সংহতি সবকটী গুণই সৃষ্টির মাঝে চিত্রপট আঁকতে পারে তাই

সাহিত্য।

সত্যিকার সাহিত্য সৌন্দর্য্য। জ্ঞান যেখানে প্রকটিত, যার স্বতন্ত্রশীল স্বাতন্ত্র একটা সাহিত্যের আন্তরিক স্থিতিস্থাপক মননশক্তি আছে, গতিশীলতায় যে সৃষ্টি প্রখর—প্রস্তররাশিকে বিচূর্ণ করে যা এগিয়ে যেতে জানে তাই সাহিত্য; যে সাহিত্য চিন্‌তে জানে আপনাকে, আপনাকে যে সাহিত্য চেনাতে জানে—যা ইন্দ্রিয়াতীত।

প্রশ্ন হোলো সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীনে উপাদান বা সাহিত্য গড়ে তুল্‌তে প্রয়োজনীয় সেই সমুদয় উপাদানই কি একজনের সাহিত্যের মাঝখানে পরিস্ফুট হোয়ে উঠ্‌তে পারে। সমাজ সৃষ্টিতে ভাবের আদান প্রদানের ইতিহাস অবিদিত নয়। অপরকে—গ্রহণ করে যে গ্রহণ, আপন বিশেষত্বের আলোকে সুস্পষ্ট সাহিত্যের আকার ধারণ করে তাকে আপনার মধ্য দিয়ে অপরের মাঝে বহিঃপ্রকাশ। যা অপরের অন্তঃসত্তায় স্বকীয় আলোক উদ্ভাসিত ক'রে তুল্‌তে পারে—যা আলোর নিশানা দিয়ে মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করে যের যুগের পর যুগ, অসীম অনন্তের দিকে তাই সাহিত্য। এইভাবে চলতে থাকে সৃষ্টি, নূতন আসে,—নূতন সৃষ্টি সঞ্চার হয়—তবুও আজিকার দিনে যা সত্য, যা সুন্দর, যা মঙ্গলদায়ক তার স্থান অক্ষুণ্ণ, সে থাকে চিরকালই, সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে যা স্বতঃসিদ্ধমূলক। পরিপূর্ণ মানবোপলব্ধির জ্ঞান সংস্কৃতি মূলক না হোলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়না, এই জ্ঞান যখন পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তখন সৃষ্টির সার্থকতা, সৃষ্টি তখন হয় তুলনাহীন।

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" যে অন্তর্লিঙ্গা কল্প অন্তরের অন্তঃস্থলকে দ্রবীভূত করে মানবমনে রসসঞ্চার করতে পারে তাই সাহিত্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিস্ফুট, পরিবর্দ্ধিত সেই সৃষ্টি।

সাহিত্য অনুকরণ শিল্প। তবুও তার আপন বিশেষত্বে সে রূপায়িত, প্রাণহীন অনুকরণ নয়, প্রাণবান্ তেজঃপুঞ্জ। যে বস্তু যে ভাবে তাকে আলোকে উদ্ভাসিত করে, তার সৌন্দর্য্য পরিবেশন সমাজের পরিপুষ্টি—মানুষের মনোজগতের অভিব্যক্তি "সত্যম্ শিবম্, সুন্দরম্" তাকে জাগ্রত করে মানুষের মাঝে। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিনিষ্ঠ তবুও সেই সাহিত্যের অবদান প্রতি মানুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে—

"এমনদিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘন ঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝর্ ঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!
* * *
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয়ে দিয়ে হৃদি অনুভব
আঁধারে মিলে গেছে আর সব।—"

সংবাদ

পুষ্পরাণী ঘোষ

"এইবার ওদের ফিরে আসবার সময় হয়েছে" ইংরেজ কর্ণেল বললেন।

"হ্যাঁ—তা হয়েছে", এই বলে ক্যাপটেন পেরোঁন্ত তাঁর পোষাকের বিশিষ্ট ফরাসী-সৈনিকের পদমর্যাদাসূচক চিহ্নটির দিকে তাকালেন—সেদিকে তাকালেই সচরাচর তাঁর মনের বল বেড়ে যায়।

কর্ণেল ধীরে ধীরে বললেন, নিজের লোকেই বোমা ফেলা—বড় কঠিন কর্ত্তব্য।

'কি আর করা যায়—যা অপরিহার্য তাত করতেই হবে"—ক্যাপটেন বল্লেন।

"সেত ঠিকই" কর্ণেল একটা ম্যাপ দেখতে দেখতে বল্লেন "প্রার্থনা করি ওরা যেন ঠিক জায়গাতেই বোমা ফেলতে পারে—ও গ্রাম ছুটো কিন্তু ভারী মজার।"

"হ্যাঁ ভারী মজার—ক্যাপটেন নিজেকে ঠিক রাখবার

ভদ্রলোকটা প্রাণপণ জোরে দুহাতে চেপে ধরলেন—তাঁর সর্বশরীর তখন কাঁপছিল। আজ ভোর তিনটের সময় তাঁকে বৈমানিক-বিভাগ থেকে ডেকে পাঠান হয়। গম্ভীর প্রকৃতি কর্ণেলকে জীবনে এই প্রথম উত্তেজিত হতে দেখা গেল তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "ক্যাপটেন, কার্ল স্নাপকে আপনি জানেন?"

ক্যাপটেন ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ জানি—ফ্রান্সে যেসব জার্মান বাস করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর হল এই কার্ল।"

"বেশ! বেশ! জানেন, কার্ল আজ রাত্রে কোথায় থাকবে সে খবর আমরা পেয়েছি। একটা মিটিং করবার জন্য সে সেখানে গেছে—মিটিংটা এতই গোপনীয় যে প্যারিসে বসে করা চললো না—"

"এই শহরটার ওপর আমরা বোমা ফেলব—এই ত?"

"সেই প্রস্তাবকেই আমরা উড়িয়ে দেব বোমা ফেলে"—ক্যাপটেন শিউরে উঠলেন। ফ্রান্সের উপর বোমা ফেলতে ইংরেজদের সাহায্য করে তিনি তাঁর কর্তব্য পালনই করছিলেন কিন্তু এ কর্তব্যপালনের সময় সবসময়ই তিনি মনে মনে শিউরে উঠতেন।

"হ্যাঁ—তা করতে পারেন—কার্ল একজন প্রতিভাশালী লোক—তাকে সরাতে পারলে লাভ আছে—তা ছাড়া তার গতিবিধির সন্ধান যে আমরা রাখি ওদের কাছে এটা প্রকাশ করা আরও বড় কথা।"—ধীরে ধীরে তিনি বললেন। "তাহলে এইগুলো একবার দেখুন তা—এত আপনার দেশের কাছেই হবে বোধহয়, না?" এই বলে তিনি এরোপ্লেন থেকে তোলা দুখানা ফটোগ্রাফ খুলে দেখালেন। ফটো দুটো ছিল দুটি গ্রামের—দুটি গ্রামেরই আঠারটি করে বাড়ী—দুটি গ্রামেরই মধ্যখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে—বাড়ীগুলি রাস্তারই দুধারে অবস্থিত। গ্রামগুলির চারিপাশে ধূ ধূ করছে খোলা মাঠ—কোন রেলপথ বা ছোটনদী বা জলাভূমি কিছুই নেই। ফটো দুটোর দিকে তাকিয়ে ক্যাপটেন চমকে উঠলেন—তার সর্বশরীরের মধ্য দিয়ে যেন একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। একটা গ্রাম হচ্ছে লিচেরেস্—তিনি ভাল করেই জানেন। আর একটার নাম হল গস্ত্রেভিল—তাঁর নিজের গ্রাম—যেখানে তাঁর পত্নী ক্লেয়ার বাস করছে।

কর্ণেল ইতিমধ্যে বিরক্তভাবে বলে চলেছেন, "দেখেছেন, গ্রামদুটোর মাঝে মাত্র এক ক্রোশ তফাৎ আর গ্রামদুটো একেবারে অবিকল একরকম—কোন তফাৎ নেই। বিশেষ বিমান আক্রমণ হবে ভোরের দিকে যখন নাকি রীতিমত কুয়াসা থাকে—পাইলটদের পক্ষে তাদের গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুবই বেশি।"

ক্যাপটেন পেরোন্ট চুপ করেই রইলেন—নিজের কণ্ঠস্বরকে তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কর্ণেল তখনও বলে যাচ্ছেন, "অবশ্য সন্দেহস্থলে দুটো গ্রামই বোমা ফেলে উড়িয়ে দিয়ে কার্লের মৃত্যু সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া যায় কিন্তু"—বলতে বলতে উঠে এসে ক্যাপটেনের পিঠে হাত রেখে তিনি বললেন "কিন্তু বন্ধু, তোমার দেশের লোকেদের উপর বোমা ফেলে তো আর আমরা আনন্দ পাইনা—"

অবশেষে ধীরে ধীরে ক্যাপটেন বললেন, "আমি ও দুটো গ্রামকেই জানি ভাল করে—দুটোই একরকম; কারণ ১৯১৮ সালে গ্রামদুটো জার্মানরা একেবারে ধ্বংস করে ফেলার পর সরকার থেকে ও দুটোকে আবার নতুন করে তৈরী করে দেওয়া হয়। তখন খরচ বাঁচানর জন্য দুটো গ্রাম ঠিক এক নক্সা অনুযায়ীই করা হয়।"

"ও তাই বলুন, সেইজন্যই অবিকল একরকম, দেখাচ্ছে—" এই বলে ফটো দুটো ক্যাপটেনের হাতে দিয়ে কর্ণেল বল্লেন, "দেখুন, আপনি যদি এমন কোন চিহ্ন মনে করতে পারেন যা ফটোতে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু পাইলটরা সকালের আলোতে দেখতে পাবে।"

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন; "কোন গ্রামটায় বোমা ফেলা দরকার?" স্বাভাবিক স্বরেই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কথাটা কিন্তু তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কাতর প্রার্থনার মতই জেগে উঠেছিল প্রশ্নটা। উত্তর এল, "কার্ল স্নাপ আজ রাত্রে গস্ত্রেভিলে থাকবে খবর পাওয়া গেছে।"

সযত্নে নিজেকে সংযত করে ক্যাপটেন ফটোদুটো দেখবার জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন বটে কিন্তু তার আগেই তাঁর মনে পড়েছিল এ সমস্যা সমাধানের উপায়। যদিও ফটোতে গ্রামদুটো ঠিক একই রকম দেখাচ্ছিল আসলে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা খুব বড় পার্থক্য ছিল। লিচেবেসের বাড়ীর ছাদগুলো সব ছিল কাল স্লেটের আর গস্ত্রেভিলের বাড়ীর ছাদগুলো ছিল লালরংয়ের। ছবিদুটো পাশাপাশি রেখে দেখতে লাগলেন তিনি। গস্ত্রেভিল। লিচেবেস্। তাঁর হাতেই আজ ওদের ভাগ্যসূত্র বিলম্বিত! কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো আর তার বিচার বিবেচনার কিছু নেই—কার্ল স্কাপস্ যে রয়েছে গস্ত্রেভিলে!

ফটোগুলো ভাল করে দেখবার ভান করে তিনি দেরী করতে লাগলেন—আসলে অবশ্য ভাল করে দেখবার কিছুই ছিলনা প্রত্যেকটি জিনিষ একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল প্রত্যেকটি কপি-ক্ষেত প্রতিটি ড্রাক্কাকুঞ্জ পর্যন্ত চেনা যাচ্ছিল। তাঁর নিজের ছোট বাড়ীটাও স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। ঐতো সেই ইট বাঁধানো সরু পথ বাগানে পাথর বাঁধান বেদী, তরকারীর ক্ষেত সবই দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে—হাত বাড়িয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিলেন তিনি। বাগানে একজন স্ত্রীলোক হাটু গেড়ে বসে কি যেন করছে দেখা গেল—ঐত তাঁর স্ত্রী ক্লেয়ার, নিশ্চয়ই ক্লেয়ার—ও যে ক্লেয়ার তাতে কোনই সন্দেহ নেই তাঁর—ছবিতে অবশ্য তাকে একটা অস্পষ্ট বিন্দুর মত দেখাচ্ছে—তাহোক ঐ বিন্দুর জন্যই ছবিটা সুন্দর হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখে জল এসে পড়ল—ক্লেয়ার। তাঁর স্ত্রী, তাঁর প্রিয়তমা। হাসলে তার গালে টোল পড়ে, তার চিবুকের নীচে সোভা পায় একটি ছোট্ট জড়ুল।

যেন বোমারু বিমান থেকে দেখছেন এইভাবে তিনি ক্লেয়ারের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন আর ধীরে ধীরে তাঁর মনে যেন তার অজ্ঞাতেই একটা ইতর নীচ চিন্তা উদয় হতে লাগল।

হয়তবা লিচেবেসের ছাদই লালরংয়ের। এসব জিনিষ ঠিকমত মনে রাখা ভারী কঠিন, তিনি বলবেন কর্ণেলকে একথা; তাহলে লিচেবেসের উপরেই বোমা ফেলা হবে আর তিনি আবার দেখতে পাবেন তাঁর ক্লেয়ারকে।

কিন্তু কার্যতঃ তিনি কোন কথা না বলে ফটোটার দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন—তাঁর মনে হল তিনি যেন এরোপ্লেনে চড়ে ক্রমশঃ নীচে নামছেন—সেই ছোট্ট কাল বিন্দুটা যেন ক্রমশঃই তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—তিনি যেন দেখলেন ক্লেয়ার এক লাফে উঠে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে আদরের সুরে সে বললে, "অত বিষণ্ণ হয়ে রয়েছ কেন প্রিয়তম? অত ভাবনা কিসের? আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যোগ্য ছেলে মেয়ে—প্রকৃত সৈনিক আমরা—ভয় কি আমাদের? আবার আমাদের দেখা হবে। পছন্দসই গস্ত্রেভিলের উপর বোমা—ভালইত। জার্মানিরা যে রয়েছে ওখানে।"

চকিতে সে দৃশ্য মিলিয়ে গেল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতই ক্যাপ্টেন পেরৌল্ট কর্ণেলের কাছে ঘেসে বললেন "পাইলটদের বলে দিন লালরংয়ের ছাদ দেখে বোমা ফেলতে। গস্ত্রেভিলের বাড়ীর ছাদগুলো লালরংয়ের আর লিচেবেসের বাড়ীর ছাদ ধূসর রংয়ের। লালছাদের ওপরই যেন বোমা ফেলা হয়—কালর উপর নয়"—

"এইরকম কিছুই আমরা জানতে চাইছিলাম—" প্রসন্নভাবে কর্ণেল বললেন।

ক্যাপটেন পেরৌল্ট ধীরে ধীরে তাঁর নিজের টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন। সেখানে বসে তিনি নিঃশব্দে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন—অবশেষে টেবিলের ওপর মাথা রেখে করুণ স্বরে বলতে লাগলেন, "ক্লেয়ার প্রিয়তমে! ক্ষমা করো আমায়"—আর ঠিক তখনই যেন তিনি তার পিঠের কাছে কোমল বাহুস্পর্শ অনুভব করলেন "দুঃখ কোরোনা প্রিয়তম—তুমি তো বীরের মত তোমার কর্তব্য পালন করেছ—এতে দুঃখের কি আছে; এতদিন ধরে কত বোমারু বিমান তুমি পাঠিয়েছ ফ্রান্সে—কত লোক মারা গেছে তাতে—আজ তোমার ও আমার পালা।" ছোট শিশুকে সান্ত্বনা দেবার সময় লোকের কণ্ঠস্বর যেমন কোমল ও আশাভরা হয়—

ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর সেইরকম শোনাচ্ছিল।

মিনিটের পর মিনিট—ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল। কর্ণেল টেলিফোনটা ধরে বললেন,—"ক্যাপটেন এবার তারা নামছে—আপনি বরং একবার এসে পাইলটদের সঙ্গে কথা বলে নিন।" বহুবার এইসব ইংরাজ যুবকদের তিনি বিমানাক্রমণের বিষয় নানা পরামর্শ দিয়েছেন—নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন—কিন্তু আজ কি পারবেন তাদের সামনে যেতে দাঁড়াতে? তাদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে? তারা যে এইমাত্র তার ক্লেয়ারের উপর বোমা ফেলে এসেছে।

জোর করে নিজেকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিয়ে, ঘাড় সোজা করে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরের অপরদিকে কর্ণেলের টেবিলের কাছে যাবার উপক্রম করছেন এমন সময় তাঁর নিজের টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি তিনি তুলে নিলেন সেটা। ফরাসী ভাষায় একজন বললে, "আমরা গস্তেভিলের সম্বন্ধে একটা গোপন খবর পেয়েছি" ক্যাপ্টেনের হৃদয়ে যেন তীব্র কষাঘাত হল। নীরবে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।—"জার্মানরা ঐ গ্রামটাকে নিজেদের কাজের জন্যে ব্যবহার করছে—সেসব গোপন রাখবার জন্য তারা গ্রামের লোকেদের ওখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে—"সেই অজানা কণ্ঠস্বর বলে চললো।

"কি বললেন? গ্রামবাসীদের সরিয়ে দিয়েছে? সকলকেই? শীঘ্র বলুন।"

"হ্যাঁ সকলকেই—লরী করে তাদের সব লিচেবেসে নিয়ে গেছে।"

ক্যাপ্টেনের হাত থেকে খসে পড়ে টেলিফোনটা মাটিতে গড়াতে লাগল—

তিনি ধীরে মৃদুস্বরে বললেন—"লিচেবেস—লিচেবেসের ছাদ হল ধূসর—"*

*ইংরাজি হইতে।

সন্ধ্যা প্রদীপ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সুদূর কুটীরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে
একটী গৃহের কত কথা সে যে বলে।
অঙ্গনে সেথা খেলাধুলা করে কারা?
ছুটেছে সেকালি বেলা ও নয়নতারা,
স্নেহ প্রণয়ের উৎসব কত চলে।

(২)

প্রতি আলোটির সঙ্গেতে মনে হয়—
তাহার স্নিগ্ধ ভূমণ্ডলটি-রয়।
রশ্মি তাহার করে যেন পরকাশ
অজানা জীবন যাত্রার ইতিহাস,
ক্ষুদ্র যে দেয় বিরাটের পরিচয়।

(৩)

মানুষ তাহার জ্ঞান ও ধ্যানের জ্যোতি
যুগে যুগে দূরে পাঠাইছে নিরবধি।
আলোতে আলোতে হইবেই পরিচয়
যিনি ভগবান তিনি যে জ্যোতির্ময়
গতি আছে তাঁর—যিনি অগতির গতি।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলকাতায় এসময় কয়েকটা লক্ষ্য করার জিনিষ ছিল। গায়ের জোর ও সাহসের খেলায় লোকেদের খুব ঝোঁক দেখা যেত। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তি ও জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া ছিল এ বিষয়ে দুটী লোকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দর্জিপাড়ায় অমু গুহের আখ্‌ড়া কুস্তী বিষয়ে অগ্রণী ছিল। আমার ছোট কাকা প্রফেসর গৌরবাবুর জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া শুধু কলকাতা ও সহরতলী ছাড়াও হাওড়া হুগ্‌লী প্রভৃতি জেলায় বিস্তৃত ছিল। এঁর ছাত্ররা কয়েকটী সার্কাস খুলেছিলেন। তার মধ্যে প্রফেসর বোসের সার্কাস্ ছিল বিখ্যাত। গৌরবাবু সঙ্গীত বিদ্যাতেও ছিলেন অসাধারণ। যন্ত্র সঙ্গীতে তাঁর অধিকার খুব বেশী ছিল। সাহসী ও বলিষ্ঠ না হলে দেশের কাজ এগুবেনা এই ছিল তাঁর ধারণা। অনেক স্কুল কলেজে ছিল তাঁর জিম্‌নাষ্টিকের ক্লাব।

গায়ের শক্তি দিয়ে দেশ বড় করার কথায় তিনটী উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। প্যারিস্ মহামেলায় শারীরিক শক্তিতে গোলাম পালোয়ান ভারতের নাম আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় ক'রে দিয়ে আসেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে ব'সেই ভারতকে বড় সাব্যস্ত করিয়েছিলেন। তার নাম পালোয়ান করিম বক্স। টম্ ক্যানন্ নামে বিশ্ববিজয়ী মল্ল ঘুরতে ঘুরতে ভারতে আসেন। এখানকার বাজীটা মেরে গেলে সর্বত্র তিনি অপরাজেয় প্রতিপন্ন হতেন। এ অবস্থায় করিম বক্সের সঙ্গে হয় কুস্তি। করিমের বয়স তখন বেশীও নয়। ছোকরা বললেই হয়। কুচ্‌বিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভট্ট ছিলেন বিচারক। টম্ ক্যানন অতি সহজেই পরাস্ত হন।

তৃতীয় বীর স্বনামধন্য পালোয়ান গামা। ইনি আমেরিকায় বিশ্ববিশ্রুত জন্নী জেবিস্কোর সঙ্গে কুস্তি করেন। সেখানে বাজী অমীমাংসিত থেকে যায়। পরে জেবিস্কো ভারতে আসেন লড়তে। এখানে গামা অবলীলাক্রমে তাঁকে পরাস্ত করেন। বিদেশে না গিয়েও নাম করেছিলেন কিকর সিং। ইনি ছিলেন গোলাম পালোয়ানের সমকক্ষ।

জিম্‌নাষ্টিক্ বা সার্কাস সম্বন্ধে দু একটী উল্লেখযোগ্য কথা আছে। হরাইজন্ট্যাল বার ও ফ্লাইং ট্রাপিজের খেলা খুব শক্ত ও সাহসের। এ বিষয়ে কৃষ্ণ বসাক ও রমন মুখার্জী বিলাতী সার্কাসে সাদরে গৃহীত হন ও পৃথিবীর নানা দেশে খেলা দেখিয়ে যশস্বী হন।

শ্যামাকান্ত রায় ও গৌরবাবু দুজনেই বাঘের সঙ্গে লড়তেন। বুকে পাথর ভাঙ্গা ও বাঘের সঙ্গে লড়াতে শ্যামাকান্ত রায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরে ইনি সন্ন্যাসী হয়ে যান। এবং সোহংস্বামী নামে সুবিদিত হন। ভারতীয় সার্কাসের জন্মদাতা এঁরা দুজনে। গৌরবাবুর শিষ্য প্রফেসর মতিলাল বসু নিজনামে একটী সার্কাস্ খুলে বেশ সুনাম অর্জন করেন। স্বামী বিবেকানন্দ খুসী হয়ে উৎসাহ দেবার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বলেন—মতি দেখিয়ে দিয়েছে বাঙ্গালীর দৈহিক বল কি করতে পারে।

বন্দোমাতা আর এক জিনিষ। এটি একেবারে যাকে বলে "মাস্ মুভমেন্ট।" (Mass movement) জনসাধারণের বিনোদনের জিনিষ। এদেশে ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে যখন শোয়া, বসা চলে তখন পাল-পরব বাদ যাবে কেন? এই জন্যইত এদের উদ্ভব। পৌষ মাসে মকর সংক্রান্তির দিন বিভিন্ন জাতের লোক দল বার করত। তারা গান গাইতে গাইতে যেত নানারকম সেজে বেরুত। নাচ্‌ত ও গাইত। ঠাকুর বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছড়া কাটত। নিমতলায় আনন্দময়ী (কালীবাড়ী), বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে খুব ভীড় এই দিন দেখা যেত। ছড়ার সারজনীন দোষ গুণের উল্লেখ থাকত। সমাজের কল্যাণার্থে কি কি দোষ ত্যাগ করা উচিত তাও ব'লে দেওয়া হ'ত। এ ছাড়া এর মন্দ দিকও ছিল। পাড়ায় পাড়ায় নাচ, গান কবিতার প্রতিযোগিতা অনেক সময় ব্যক্তিগত কুৎসা

রচনায় নেমে এসে খুব বারদিঠ সৃষ্টি করত।

সাধারণ সমালোচনার একটা নমুনা:—

"যাদের বাপ্ খাঁটি বাঙ্গালী,
হরি বই আর জানেনা।
তাদের ছেলে হোটেলে গিয়ে
সানকীতে খায় খানা।"

ওধবর্জিত কাজল কৌলীন্যের বিরুদ্ধে কটাক্ষ—

"ক—অক্ষর লিখিতে কাবু
তাকেও বলে বাবু বাবু
জেনো ভাই সম্মানের মূল টাকা॥"

তৃতীয় যে জিনিষটা আমার চোখে পড়েছিল, সে হচ্ছে এই—স্কুল ছুটির সময় স্কুলে স্কুলে মারামারি অনেক সময় লেগে যেত। তার মূল ছিল নিজ নিজ পাড়ার প্রতি অতিরিক্ত টান, 'লোকাল পেট্রিয়টিজ্‌ম্' (Local Patriotism) তাকে বলা যেতে পারে। বৌবাজারের একটি ছেলেকে যদি মারে শাঁখারীটোলার ছেলে, তা হলে বৌবাজারের ছেলেরা গিয়ে শাঁখারীটোলার ছেলেকে মেরে শোধ নেবে। এ ধরনের ছাত্র-হিংসা আমি কখনও কল্পনা করতে পারতাম না।

আমি ছাত্র অবস্থায় শারীরিক বলবৃদ্ধির জন্য ব্যায়াম শিক্ষা করতে লাগলাম। বাকী ছুটোতে ভাগ নিতাম না। তৃতীয়টা ছাত্রদের জিনিষ ছিলই না। এরূপ মারামারি—"দর্জিপাড়ার ছেলে," "বাগবাজারের ছেলে"—ক্ষুদ্রতা নেক। তাই আমার মন এই সবে সায় দিত না। তার ক'রে কেউ কাউকে না মারে, আপোষে নিষ্পত্তির ন্য ছেলেদের মধ্যে একটা বৈঠক গড়ায় মন দিলাম। অনেকটা কৃতকার্যও হলাম। আর যা তখনকে দেখিনি, ানে দেখেছিলাম তা হচ্ছে,—সখের যাত্রা, সখের য়েটার, পেশাদারী থিয়েটার ও কনসার্ট পার্টি। ভিভাবকরা এই সব "শিল্পিদের" সঙ্গে ছেলেদের মিশতে তে চাইতেন না। এদের সঙ্গে মেলামেশা করলে লে "বোখে" যাবার সম্ভাবনা খুবই। লেখা পড়ার দফা া" এবং স্বভাব চরিত্র "যা গঙ্গা" হয়ে যাবে। টেশনের উদ্ধৃত কথা করটি খাস্ কলকাতার বুলি। এ আন্দাজে মারবার জো নাই। কষ্ট ক'রে লিখতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি দক্ষিণা চরণ সেন, গৌরহরি মুখার্জী ও তাঁর ছাত্র বটকৃষ্ণ বসাক প্রভৃতি এসবের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের সখের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একটা সংস্কার চালাচ্ছিলেন।

এ সময় গীতাভিনয়গুলিতে বীর ভাবাবেশে যে ক্ষুদ্রতা প্রকটিত হ'ত তা অবধানযোগ্য। অভিমন্যু বধ একটা খুব অনাদৃত পালা! অভিমন্যু লড়তে যেতে চায় কিন্তু তার আত্মীয়দের মধ্যে সে কি আগে থেকে মড়া কান্না ও কাতরতা। "দাদা অভি, কেন যাবি সেখানে। সেত রণক্ষেত্র নয়, মৃত্যুর আলয়, কত হত হয় সেখানে।" আগে থেকেই মন খারাপ করে দেয়। এই গান শুনে কেউ কেউ বিমর্ষ হ'তেন, কেউ কেউ গালি দিতেন—"এই জাত আবার বীর হবে? অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করবে?"

বাগবাজারের একটী বাবুর সখের যাত্রার দল ছিল। তিনি অভিমন্যু বধের এ কলঙ্ক দূর করিয়ে পালা লেখালেন। নিজে সাজতেন ভীম। একটু তোতলা ছিলেন। কথা আরম্ভ করতে তোতলে ফেলতেন, তারপর বেশ চালিয়ে যেতে পারতেন। অভিমন্যুকে কেমন বীর সাজিয়েছিলেন দেখা যাক্। চৌদ্দ বছরের ছেলের সঙ্গে রথীরা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, অশ্বত্থামা—দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হতে অস্বীকার করলেন। বীরোচিত কার্য বটে! বললেন—তুমি শিশু, তোমার সঙ্গে কি লড়ব? এখন প্রণিধান করা হোক। অভিমন্যু কি পাল্টা জবাব দিল।

"বিশাল বারিধি বক্ষে বীচি বিঘূর্ণিত
আস্ফালে ভেলকে যথা!
রে মূঢ়, শিশু বলি' উপেক্ষিলি মোরে?"

এরূপ জ্বালাময়ী ভাষা অনর্গল উদ্গীরণ করা চৌদ্দ বছরের ছেলের পক্ষে তারিফের বিষয় অবশ্য।

অভিধানখানি সঙ্গে না নিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়ে অনেককে হয়ত পস্তাতে হয়েছে। তা হক্। কিন্তু অভিমন্যুর বীরোচিত, তেজোদৃপ্ত, আগুন ছোটান ভাষা

শ্রোতাদের কাউকে কাউকে কেমন আত্ম ভোলা করে দিত তা হৃদয়ঙ্গম হবে শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে যখন কেউ ভাবাবেগে আপন হারা হয়ে বলে উঠতেন—"বারে, গঙ্গারাম!" অধিকারী মশায় ধন্য হয়ে যেতেন।

একদিন অভিমন্যু বধ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার ও কর্মকারের। যুধিষ্ঠির চিন্তান্বিত হয়ে যখন কাতরোক্তি করলেন—

"কি হবে বলনা ভীম অভিকার রণে?
জয়দ্রথ হের আসি নাশিতেছে সৈন্যগণে।"

ভীম ভীমোচিত উত্তরে বললেন—

"ভেবোনা, ভেবোনা তুমি,
শশী ক'রে দিব আমি।"

সেকি হাত তালির ধুম! দর্শকদের মধ্য থেকে শুনা গেল—ক্যা কইলা বহুত তোফা। ভীম আসর গ্রহণ করলেন সেই জায়গাটায় যেখানে আমাদের দুটীকে দেখার সুবিধার জন্য ব্যবস্থা করে স্থান দেওয়া হয়েছিল। কর্মকার খুব উৎফুল্ল। সে নিজেই একটু বীর লোক ছিল প্রয়াগতীর্থকে কলকাতায় টেনে আনার শক্তি ইতিপূর্বেই সে দেখিয়ে দিয়েছিল। সে আস্তে আস্তে তার বন্ধুকে বলছিল—"এর নাম যাকে বলে পালা। আগাগোড়া বীর রস, রক্ত গরম করে দেয়।" ভীম এই কথা কয়টী শুনতে পেয়ে হাসি হাসি মুখে কর্মকারের দিকে চেয়ে বললেন—"তার পাট ভাল হয়েছে?" কর্মকার উত্তর দিল—সবারই। ভীম পুনরপি প্রশ্ন করলেন—"ভীমের পাট?" কর্মকার সরল অন্তরে জবাব দিল—তা—লো হয়েছে। তবে কথাগুলি একটু একটু তোতলে যাচ্ছিল।" হঠাৎ প্রচণ্ড বজ্রাঘাত যাত্রার আসরে। "বে—বে—বে—বেটাচ্ছেলে, তো—তো—তোর বাবা কখনও যাত্রা করে'ছে?" হুঙ্কার দিলেন ভীম।

বীররসের আসরে বিনা কারণে, অকস্মাৎ এই রকম বীভৎস রসের আপ্যায়ন শুনেই, আক্কেল গুড়ুম কর্মকারের। • ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। পাঁচজনে ব্যাপারটা আর বাড়তে না দিয়ে, ভীম মশায়কে অনেক ব'লে বুঝিয়ে থামিয়ে দিল। যাত্রা চলতে লাগল। সুভদ্রা কৃষ্ণের বোন এবং অর্জুনের স্ত্রীর নাম রেখে বিরাট পর্ব সারলেন। বেরুলেন এবার উত্তরা। তরুণী স্ত্রী, তরুণ স্বামীকে যে বিদায় দিচ্ছেন তা চির বিরহেও পরিণত হতে পারে। স্বভাবতঃ করুণ—...এখানে দেখা গেল। যথোপযুক্ত ভাব ও ভাষায় বিদায় দেওয়া ও নেওয়া হল। "অরাতি দলিয়ে আসিব ফিরে পরম—শশী—বদনী" ব'লে বীরের মত গট্ গট্ করে অভিমন্যু চলে গেলেন। মনে হ'ল বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সেকালের অভিমন্যু ও একালের অভিমন্যুতে যে তফাৎ ধরা পড়ছে তাতে বোধ হয় আসরটা বীর রসের দিকে এগুচ্ছে। এরপর অভিমন্যুকে সপ্তরথীর ঘেরাও। ভীম বিপন্ন বালকের কণ্ঠস্বর পেয়ে সাহায্যে যাচ্ছেন আর জয়দ্রথের কাছে হেরে হেরে ফিরে আসছেন। শেষে বংশের বাতিটীকে বাঁচান ঠিক করলেন। স্থির ক'রে ফেললেন, দীন, হীন ভাবে দাঁতে তৃণ ক'রে গিয়ে জয়দ্রথের কাছে শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাইবেন। সেইভাবে তিনি এলেনও। জুড়ীরা "সিন্ধুপতি, পদে মিনতি" সমস্বরে গেয়ে উঠল। ভীমের ভাব-ভঙ্গী প্রদর্শনে, দুরদৃষ্টে বহুতের এমন পতনে বহু শ্রোতার চোখ সজল হ'ল। ভীম আবার আমার ও কর্মকারের কাছে বসলেন। ভয়ের ব্যাপার। বড় বড় চোখে নিষ্পলক কঠোর দৃষ্টিতে এবার আমার দিকে তাকালেন। আমি 'এবারে গেছি' ভেবে সভয়ে তাঁর মুখের দিকে একবার তাকাই, একবার দৃষ্টি-স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য আসরের যে দিকটায় গান হচ্ছিল সে দিকে তাকাই। ভীম সহসা আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে বসলেন—"এবার কেমন লাগছে?" ভয়ে ভীত হয়ে আমি শুকনো গলা ভেজাতে ভেজাতে বললাম "ভীমের পাটের তুলনা হয় না!" অমনি পিছু ফিরে ভীম একজনকে আঙ্গুলের ইসারায় কাছে ডেকে বললেন—"এ, এ, এই ছেলেটাকে নবীন ময়রার দোকান থেকে এখুনি একসের রসগোল্লা এনে দে।" আমি ফাঁসির হুকুম হবে ভেবে মনে মনে ইষ্ট নাম জপছিলাম। এখন রায় শুনে মরা দেহে প্রাণ ফিরে এল বোধ করতে লাগলাম।

বলতে হবে না, রসগোল্লা এসে কর্মকার তার অধিকাংশের সদ্ব্যবহার করেছিল। তার দরকারও ছিল বেশী।

(ক্রমশঃ)

নোয়াখালী ত্রিপুরাতে গান্ধী ক্যাম্পের বর্তমান কর্মধারা

রঞ্জনকুমার দত্ত

অনেকেই জানিতে চাহেন যে নোয়াখালী ত্রিপুরাতে গান্ধী ক্যাম্প বর্তমানে কি কাজ করিতেছেন। জিজ্ঞাসুদের জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে দুই চার কথা এখানে বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

সাতচল্লিশের ২রা মার্চ গান্ধীজী ত্রিপুরা জেলার হাইমচর হইতে বিহার রওনা হইয়া যান। ঐ সময়ে তিনি পায়ে হাঁটিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের হৃদয়ে ধার্মিক চেতনা ও সদ্ভাবনা জাগ্রত করিয়া ফিরিতেছিলেন। বিশে নবেম্বর তিনি কাজিরখিল হইতে শ্রীরামপুর একক থাকিবার জন্য শ্রীরামপুরে যাত্রা করেন, সংগীদিগকে ছাড়িয়া। সেই সময়ে সেভাষী হিসাবে কেবল অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু ও সর্টহ্যাণ্ড্ লেখক শ্রীপরশুরাম গান্ধীজীর সহগামী সাথী ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচর্যার জন্য তাঁহার নাতনী কুমারী মনুবেন আসিয়া সাথী হন।

বস্তুতপক্ষে গান্ধীজীর গ্রাম পরিক্রমা শুরু হয় শ্রীরামপুর হইতেই। বিশে নবেম্বর হইতে দোসরা জানুয়ারী পর্যন্ত তিনি শ্রীরামপুরেই ছিলেন। "কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিণাম্ আর্তিনাশনম্"—ইহাই ছিল তাঁহার ঐ সময়কার একমাত্র প্রার্থনা এবং উহাই তাঁহার সারা জীবনেরও প্রার্থনা ছিল। শ্রীরামপুরের একটি বিধ্বস্ত গৃহে প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন—"আমার অহিংসার আজ একটি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা চলিতেছে। আমি নোয়াখালীতে আসিয়াছি অহিংসার শক্তিতে শান্তি স্থাপনের জন্য, অথবা সেই চেষ্টায় মৃত্যু বরণের জন্য। লোকে আমাকে মহাত্মা বলিয়া থাকে। কিন্তু আপনাদের বলি, আমি নিজেকে কখনো মহাত্মা বলিয়া মনে করি না। আমি একজন সাধারণ মানুষ। দুঃখতপ্ত প্রাণীদিগের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আমি মানব জাতির দাস মাত্র। আমার মত আটাত্তর বৎসর বয়সের জীর্ণ মানুষ যদি অহিংসা পালন করিতে পারে তবে অন্যে পারিবে না কেন? অবশ্য আমি জানি অহিংস পন্থায় কাজ করা কত কঠিন।" শ্রীরামপুর, ১৭।১২।৪৭

দোসরা সকাল সাড়ে সাতটায় গান্ধীজী শ্রীরামপুর ত্যাগ করেন ও চণ্ডীপুরে অবস্থান করেন। চণ্ডীপুরে সাতুই জানুয়ারী পর্যন্ত ছিলেন, ঐ দিন হইতেই গান্ধীজীর দৈনিক গ্রামান্তর যাত্রা শুরু হয়।

গান্ধীজী নোয়াখালী-ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নির নিবৃত্তি-কল্পে যে ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাথী ও সেবক হিসাবে সেই ব্রতের সার্থক-সমাপ্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য গান্ধী ক্যাম্প পরিচালক ও কর্মীদের উপর বর্তাইয়াছে, এবং তাঁহাদেরও নিত্যকার প্রার্থনা ও কাম্য—"কামরে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিণাম্ আর্তিনাশনম্।" ইহা ছাড়া তাঁহাদের কাছে আর কীই বা প্রার্থনার বিষয় হইতে পারে?

এই ব্রত সিদ্ধির জন্য গান্ধী ক্যাম্প পরিচালক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় চারিটি মূল কর্মনীতি গ্রহণ করেন:—১। নৈতিক প্রচেষ্টা, ২। মানুষ মূলত সৎ—এই বিশ্বাস, ৩। প্রেম, ৪। বীরের অহিংসা।

এই মূলনীতিতে আস্থাবান কর্মীদের লইয়াই গান্ধী ক্যাম্পের শান্তি বাহিনী গঠিত। পূজনীয় সতীশবাবুর মতে ক্যাম্পের এই অহিংস কর্মীরা দাংগাবিধ্বস্ত এলাকার গ্রামগুলিকে নিজেদের বাড়ি বলিয়া মনে করিবেন এবং দুর্বৃত্তদের অপরাধ যতই কেননা মারাত্মক হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতিপূর্ণ মনোভাব রক্ষা করিয়া চলিবেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার সামান্যতম মনোভাবও এই সব কর্মীদের থাকিতে পারিবে না।

কর্মীরা দুর্বৃত্তদের সহিত অবকাশ মত বেলাবেশা করিবেন এবং নিজেদের সংগ দান পূর্বক তাহাদিগকে সত্য ও ভ্রাতৃত্বের পথে আকৃষ্ট করিবেন। আক্রান্ত

হইলেও কর্মীরা নিজেদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন না, বরং আততায়ীর হস্তে অকুণ্ঠিত চিত্তে মরিবার জন্য প্রস্তুত থাকাই হইবে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষার পথ।

এই সুকঠিন মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া পূজনীয় সতীশবাবুর সুনায়কত্বাধীনে গান্ধী ক্যাম্পের কর্মীরা গান্ধীজীর প্রারব্ধ কর্ম সম্পাদন করিতে পরমোৎসাহে জীবনপণ করিয়া লাগিয়া আছেন।

বিহার যাইবার প্রাক্‌কালে গান্ধীজী এতদঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের নিকট একান্তভাবে এই অনুরোধই করিয়াছিলেন, "আমার এই দুইদিনের অনুপস্থিতিকালে, হিন্দু মুসলমান আপনারা পরস্পরে বন্ধুভাবে থাকিবেন। হিন্দু মুসলমান নিজ নিজ দুর্বলতা পরিহার করিয়া অহিংসভাবে আত্মরক্ষার মতো পবিত্র কর্তব্য পালনের জন্য জীবন পণ করিলেই তাহা সম্ভব হইতে পারে।" (২৮।২।৪৭ হাইমচর)

বস্তুত নোয়াখালী—ত্রিপুরার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকটাই গান্ধীজীর এই অনুরোধকে মর্যাদা দিয়া চালিয়াছেন। সম্প্রদায় হিসাবে এখানকার মুসলমান জনসাধারণ সদ্‌ভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন এবং আসিতেছেন, যদিও সমাজদ্রোহী ধর্মদ্রোহী দুর্বৃত্তের অভাব নাই, তাহারা পূর্বের ন্যায় আজও দুর্বৃত্তিপনা করিয়া আসিতেছেই। সদ্‌ভাবনাযুক্ত মুসলীম সমাজের প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই এই সব দুর্বৃত্ত দলকে সংযত বা দমন করিয়া উঠিতে পারিয়া উঠে না। কাজেই সদ্‌ভাবাপন্ন মুসলীম সমাজ এখানকার হিন্দুদের প্রতি আদরপরায়ণ হইলেও, দুর্বৃত্তসমাজের উৎপীড়ন, উশৃংখলতা, চুরি, ডাকাতি, হিন্দু রমনীদের প্রতি বেইজ্জতির মনোভাব—এসব বিচ্ছিন্নভাবে অল্প স্বল্প চলিয়াই আসিতেছে। এখনকার এবং এখানকার অবস্থায় অল্প হইলেও ইহা তো মারাত্মক। তবে চুরি, লুণ্ঠন, ডাকতি এগুলি সম্প্রদায় নির্বিশেষেই হইতেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে কিছু বেশীই হইতেছে। ইহার জন্য দোষ কাহাকে দেওয়া যাইবে। সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হিন্দু জনসাধারণকেও ত মনোবল বাড়াইতেই হইবে। মনে শুদ্ধি ও নির্মলতা আসিলে মানসিক দুর্বলতা স্বভাবতই কাটিয়া যায় ভীরুতা তখনই দূর হয়।

গান্ধীজী এখানকার হিন্দুদের বলিয়াছিলেন, "আপনারা প্রাণভয়ে ভীত হইতেছেন কেন? ভয় পরিহার করুন, দেখিবেন, আপনাদের শত্রু বলিতে তখন আর কেহ নাই। আপনারা বীর্যবান হইয়াছেন দেখিলে মুসলমানেরা আপনাদের সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিবে। কাপুরুষের শত্রু সকলেই, যেমন মুসলমান তেমনি অপরে।" (২৭।২।৪৭ হাইমচর)

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুরা ভয় পরিহার করিতে পারে নাই। পারিলে গান্ধীজীর উপরে চির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে সে নির্ভীকতা আসে নাই।

গান্ধীজী চাহিয়াছিলেন যে মুসলমান জনমত এমন হইবে যে দুর্বৃত্তেরা কোন ব্যক্তির উপর আর অত্যাচার করিতে [redacted] করিবে না। এইরূপ হইলে হিন্দু অধিবাসীকে গ্রামে ফিরিয়া আসিতে এবং থাকিতে বলা যায়। গান্ধীজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আদালতের বিচার অপেক্ষা গ্রামবাসী জনমতের বিচার বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা, প্রতিহিংসা গ্রহণ উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হইতেছে দুর্বৃত্তের সংশোধন, পূর্ণ দুর্বৃত্তির আকর্ষণ হইতে দুর্বৃত্তকে রক্ষা করিয়া তাহার সেই শক্তিকে গ্রাম-কল্যাণে নিযুক্ত করা।

কিন্তু কার্যত দেখা যাইতেছে যে অনেক স্থলে দুর্বৃত্তের নৈরাত্ম্য ও দুঃশীলতার কাছে জনমতকে পরাজয় মানিতে হইতেছে। কোথাও কোথাও "দুর্বৃত্তেরা দুর্বার" বলিয়া জনমত মন্তব্য করিয়া থানায় অভিযোগ পাঠাইতে বাধ্য হইতেছেন। এইরূপ হইবার হেতু এই যে জনমতকে যদি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় তবে দেখা যাইবে তাহাদের মধ্যে শুদ্ধি, সরলতা, সংযমের অভাব, কাজেই শক্তিরও অভাব। শুদ্ধি—শক্তির উৎস, শক্তির পোষক, শক্তির ধারক। শুদ্ধির অভাবেই জনমত এখানে নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রাণ। এমন অবস্থায় সরকারকেই

তৎপর হইতে হয়, কিন্তু সরকারকে যতখানি সুনীতি ও সম্ভাবনা লইয়া এদিকে তৎপর হওয়া দরকার, সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে তাহারও অভাব বলিয়া অনুভূত হইতেছে।

এত সব সত্ত্বেও অবস্থা শান্তিপূর্ণ ও শুভসূচক বলিয়া মনে হইতেছিল। সমস্ত পরিবেশ ভালর দিকেই অগ্রসর হইতেছিল, বলিতে পারি। আর ভাল ত হইবারই কথা। কেননা সদ্ভাবনা, সিন্ধুতে বিন্দুবৎ হইলেও, উহা ব্যর্থ নয়, আত্যন্তিক অদ্ভুত ক্রিয়াশীল। উহার ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি আছে।

পুনর্বসতি কার্যে সাফল্যের সূচনাই দেখা দিয়াছিল। পূর্ববংগের উদ্বাস্তু আশ্রয়প্রার্থীরা, যাহারা পশ্চিমবংগের আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে, স্টেশনে, পার্কে, হাটে বাটে আশ্রয় নিয়াছিল, কষ্টেসৃষ্টে দিনাতিপাত করিতেছিল, তাহারা অনেকেই ফিরিয়া আসিতে ছিল, নিজ নিজ পৈতৃক ভিটায় ঘর দুয়ার তুলিয়া আবার বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

বেশ আশাপ্রদ ভাবে পুনর্বসতির কাজ অগ্রসর হইয়া চলিতেছিল, হিন্দুদের মনে একটা স্বস্তিবোধ দেখা দিয়াছিল, সং মুসলমানদের মনেও প্রীতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাস্তুত্যাগের স্রোতে সত্যই ভাটা দেখা দিয়াছিল। কর্মীদের মনে একটা সার্থকতার আনন্দবোধের পরিচয় দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ইতাবসরে দেখা দিল চরম খাদ্য সংকট, ৩০৲ ৩২৲ ৩৫৲ এমনি করিয়া ধাপে ধাপে চাউলের মণ বাড়িয়া তিন টাকায় দাঁড়াইল। কোথাও কোথাও পঁয়তাল্লিশ টাকাও হইল। কিন্তু শুধুই কি খাদ্য সংকট, জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় সর্ববিধ বস্তু একান্তভাবে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। লোক অভাবে, আহারে পাগল হইয়া উঠিল। সংগে সংগে ভারত গভর্নমেন্টের ভোটদান ও নাগরিক অধিকার সম্পর্কে কড়া আইন ঘোষণার দ্বারা পূর্ববংগের লোকসাধারণ আরও বিভ্রান্ত ও উতলা হইয়া পড়িল। একে ত এখনকার দুর্বৃত্তসমাজের দৌরাত্ম্যে তাহারা কতক পীড়া বোধ করিতেছিলই, তাহার উপর আরও দুইটি মৌলিক কারণ সংযুক্ত হওয়ায় পূর্ববংগের হিন্দু জনসাধারণ অত্যধিক ভীত, বিভ্রান্ত, বিচলিত হইয়া আবার বাস্তুত্যাগে প্রবৃত্ত হয়। বাস্তুত্যাগের হিড়িক আবার দেখা দেয়। পশ্চিমবংগ সরকার, পশ্চিমবংগে ইতিপূর্বেই যে সকল প্রার্থী আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য পালনের চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সে ত করিবেনই, কিন্তু উহাও এখানকার জনসাধারণকে আজ প্রবুদ্ধ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। লোক অল্প বিস্তর চলিতেছেই।

কিন্তু ইহাতে গান্ধী ক্যাম্পের কাজ কমে নাই, আরও বাড়িতেছে। গান্ধী ক্যাম্পের কাজ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই সেবা করা। সমগ্র হিন্দু সমাজ যদি নোয়াখালি—ত্রিপুরা ছাড়িয়া চলিয়াও যায় তবুও ত গান্ধী ক্যাম্পের যাইবার উপায় নাই।

কেননা, গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "হিন্দু-মুসলমান যথার্থ বন্ধুভাবে বসবাস করিতেছে দেখিতে পাইলেই আমি (নোয়াখালি হইতে) চলিয়া যাইব।" (১০।২।৪৮ বিজয়নগর)

আজ যদি একজন হিন্দুও এখানে না থাকিতে পারে, পশ্চিমবংগে চলিয়া যায়, তবে গান্ধী ক্যাম্প কোনমুখে এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইবে? গান্ধীজীর উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে গান্ধী ক্যাম্প কর্মীদেরই হিন্দু হিসাবে এখানকার মুসলমানদের সহিত বসবাস করিতে হইবে এবং এদেশে এমন পরিবেশ গড়িয়া তুলিবেন, আপনাদের আদর্শ জীবন যাপনের প্রভাব স্পর্শে, যে বাস্তুত্যাগী হিন্দুরা সহর্ষচিত্তে নিজ নিজ পৈতৃক বাস্তু ভিটায় আবার আসিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিবে, শিক্ষা, শিল্প, সমাজ গড়িয়া তুলিতে বিপুল উৎসাহে অগ্রণী হইবে।

[ক্রমশঃ]

প্রথম হাজার ট্রাইক

(৮৪ পৃষ্ঠার পর)

মনে পড়লো, আরও একদিন মরতে গিয়েছিলাম—এই সে দিন—নিজের গলায় নিজে ফাঁসি প'রে—পাছে নিজের অজ্ঞাতেও নিজেকে দিয়ে দেশের কোন ক্ষতি হয়।

মরা হয় নাই। আজ আবার এক মরার দিন সামনে—একটা গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে এক মুহূর্তে নয়। তিলে তিলে দীর্ঘ দিন ধ'রে শুকিয়ে শুকিয়ে। পারব তো? আমার জন্যে বন্ধুদের যন্ত্রণা বাড়বে না তো? কলঙ্ক বইতে হবে না তো?

স্বপ্নের বিলাসের মধ্যেই বাস্তব তার কঠোর রূপে এসে দেখা দেয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে বলে, রায়পুর কেলে আপনার যে বন্ধু আছেন, তাঁর ঘরে জল না রেখে দুধ রাখা হ'ত। তিনি দুধ খেতে শুরু করেছেন।

বেশ।

আপনার ঘরেও জল রাখা হবে না, দুধ থাকবে।

ভালো কথা। অসহ্য হ'লে নিজে মূত্রত্যাগ ক'রেও খেতে পারব।

কি ভেবে চিন্তে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জলও রাখতে, দুধও রাখতে হুকুম দিয়ে গেল।

আরও একদিন বাদে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে শুনালো, আই জি হুকুম দিয়েছেন, যদি আপনি না খান আপনাকে যা যা সুবিধা দেওয়া হয়েছে, সব কেড়ে নেওয়া হবে।

সুবিধা কি কি, জানতাম না। দেখলাম, রাত্রে আমার আবার ওয়ার্ড থেকে সেই সেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল, এবং ট্রাঙ্ক, কাপড়, জামা,—এমন কি, পায়খানার মগটি পর্যন্ত নিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু বিছানা, তোয়ালে, আর খাবার জলের কুঁজো ও গ্লাসটি। কাপড় স্নানের সময় এনে দিত, আবার শুকোলে নিয়ে যেত। পায়খানার জন্য জল দিত করেদিদের খাবার একটা লোহার বাটিতে।

দুদিন এইভাবে কাটলো। তারপর দিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ খবর দিয়ে গেলেন, গতকাল ভোরে অমৃতবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে আপনার এই অবস্থার কথা, আর রাত্রে টেলিগ্রাম এসেছে—আপনার সমস্ত জিনিষ ফিরিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে।

জেল খুলবার পর আধ ঘণ্টাও যায় নাই, দেখি, বড় জমাদার পেছনে, আর তার আগে আগে এক করেদির মাথায় ট্রাঙ্ক, হাতে আমার কাপড় ইত্যাদি ফিরে এল। কিন্তু রাত্রের আবার বাসস্থান সেই সেলই রয়ে গেল। দিনের বেলায় ডেক চেয়ার ওয়ার্ডের বারান্দায় পড়তো, সারাদিন সেইখানেই কাটাতাম। এটা বোধ হয় স্বাস্থ্যের খাতিরে।

আর একদিন গেল। উপবাসের সেই তের দিন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটা টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে এল। আই জি টেলিগ্রাম করেছে, If persuasion fails resort forced feeding. বললে, আপনাকে দিনটা ভাববার সময় দিচ্ছি। সন্ধ্যার মধ্যে যদি না খান, আমাকে হুকুম তামিল করতে হবে।

ভাল।

সন্ধ্যার পরে জেলে তালা বন্ধ হয়ে গেছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে জিজ্ঞেস করলো, কি স্থির করলেন?

বললাম, নতুন কিছু স্থির করিনি।

চ'লে গেল। খানিক বাদে আবার এল, সঙ্গে জেলার, ডাক্তার, বড় জমাদার, হাওয়ালদার, আর বাছা বাছা জোয়ান সিপাই ছয় জন। ডাক্তারের হাতে একটি কাঁচের গ্লাস, তাতে নল লাগানো। দুধভো একটি পিতলের হাঁড়িতে ঘরেই ধরা আছে।

হুকুম হ'ল, জমাদার, পাকড়ো।

হাত ধরতেই, একটা ঝট্‌কা মেরে ছাড়িয়ে নিলাম। তখন সিপাই, হাওয়ালদার সবাই মিলে লেগে গেল। আন্দাজে বলি, বোধ হয়, পনের মিনিট ঝাপটাঝাপটি চললো, এর ভিতর আমার বন্ধুদের ধাক্কায় দুইবার দুই সিপাই অ্যাটিসেলের, দুই দেয়ালে প'ড়ে গেল। আমারও গা হাতপা নাখা অনেক জায়গা ছ'ড়ে গেল। তবে একথাও বলি, ওরা আমায় কেউ মারেনি, বরং আমি ব্যথা না পাই, তারই চেষ্টা করেছে।

তখন আমার বেশ চেপে ধরেছে। আমি দাঁত চেপে আছি, ডাক্তার নলটি মুখের সামনে ধ'রে আছেন। ওরা চোয়াল চাপাচাপি করতে চোয়াল কেটে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াতে থাকলো।

ততক্ষণে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার চেঁচামিচি ক'রে হুকুম শুনাতে শুনাতে, আর আমার দুর্বার অবাধ্যতায় বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

আমার দাঁত খুলতে না পেরে হাওয়ালদার বলে উঠ্‌লো, দাঁত নেহি খুলতা।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব'লে বললো, মারো দু লপ্পট, খোল দেগা।

আমি এক ঝাঁকানি দিয়ে মাথা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার ক'রে উঠলাম, What!

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দু'পা পিছিয়ে দরজার কাছে চ'লে গেল। বললো, ছোড় দেও।

আবার সেলের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে ওরা সদলবলে চ'লে গেল।

পর দিন সকাল বেলা জমাদারকে বললাম, জেলারকে ডেকে দিতে। জেলার আসতে বললাম, চার খানা সাদা কাগজ পাঠিয়ে দাও।

কি করবেন?

দরখাস্ত লিখব।

কি ব্যাপার নিয়ে, কার কাছে?

তাতে তোমার প্রয়োজন নেই, তুমি কাগজ পাঠাবে কিনা, তাই আমি জানতে চাই।

না, তা নয়, কাগজ কেন পাঠাব না? আমি অমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম—যদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানতে চান।

India Govarmmentকে দরখাস্ত দেব, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ব্যবহার সম্পর্কে।

খানিক বাদে কাগজ পাঠিয়ে দিল। আমি তখন লিখছি, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে বললো, আমি বড়ই দুঃখিত, কাল আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। আমার ওরকম কথা বলা অন্যায় হয়েছে। আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

আচ্ছা বেশ। কর্তব্য যা' করবার করবেন, কিন্তু কথাবার্তা ভদ্রভাবে বলবেন।

(ক্রমশঃ)

নীলকণ্ঠ

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

ভ্রাতৃঘাতী মহাদ্বন্দ্বে শোণিতাক্ত এ খণ্ডিত ভূমি,
কণ্ঠে মৈত্রীবাণী আর অন্তরে ক্ষমার সুধা তুমি
বহন করিয়া এলে এ বীভৎস নারক লীলায়
শান্তি যাচি' করজোড়ে, প্লাবিত নয়ন করুণায়।
মন্থন উত্থিত বিষ কণ্ঠে ধরে হেন সাধ্য কার
তুমি ছাড়া নীলকণ্ঠ ? বহিলে যে সর্বপাপভার
সানন্দিত চিতে, তবু তোমার প্রার্থনা সকাতর
বারে বারে ব্যর্থ হলো উন্মত্ত প্রস্তর হিংসা'পর,
কৃতঘ্ন জাতির ঋণ শোধ হলো তব রক্তস্নানে,
যারি লাগি দিলে প্রাণ সে তোমার বক্ষে বাঁধা হানে;
হে ক্ষমাসুন্দর ! তবু করজোড়ে জানালে প্রণাম
সে পাপীর উদ্দেশে যে আনিল নিষ্ঠুর পরিণাম ?
বলে গেলে, "ওগো রাম ! পূর্ণ হোক আমার শোণিতে
হিংসার সর্পর আজি, শান্তি তুমি এস পৃথিবীতে।"
মুদ্রিত নয়ন, তবু অধরেতে স্নিগ্ধ হাসি রাজে
মৃত্যু বরি' স্থান নিলে অমৃতের ধ্রুবলোক মাঝে।
তুমি তো জীবন দিয়ে জীবনের বোঝালে মহিমা,
প্রেমে নাহি পরাজয়, ত্যাগের গৌরবে নাহি সীমা,
তোমারে চিনিনি মোরা, তব বাক্যে জাগে নাই প্রাণ,
ধূলিতলে মানুষের দেবতার হোলো অসম্মান।
তোমার বিদেহী আত্মা শান্তিবারি করুক সিঞ্চন
পাপদগ্ধ মরুদেশে, তোমার সন্তান অকিঞ্চন
পিতৃঘাতী হস্তে হানে করাঘাত কলঙ্কিত শিরে।
শান্তি দাও অনুতপ্ত ভাগ্যহত অনাথ জাতিরে
তোমার অমোঘ বাণী দিক্ শান্তি মৈত্রীর আশ্বাস
তোমার পতকা বহি—দাও হেন শক্তি ও বিশ্বাস।
ওগো মৃত্যুঞ্জয়!
তোমার জীবনে তব বাণীর প্রমূর্ত পরিচয়।

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

চীন—

চীনের গণবিপ্লব আজ সাফল্যের লক্ষ্যে আসিয়া প্রায় পৌঁছিয়াছে। মুকডেন, পিপিংয়ের পর ইয়াংসি নদীর পরপারে দাঁড়াইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিয়াছে। ইতিমধ্যে শান্তির চেষ্টা চলিয়াছে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর সব জল্পনা কল্পনা ব্যর্থ করিয়া ইয়াংসি নদী পার হইয়াছে। সরকারী পক্ষ মরণ পণ করিয়া সাংহাই সহর রক্ষা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় বিনা বাধায় সাংহাই সহর মুক্তি ফৌজের হস্তগত হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তথায় স্বাভাবিক নাগরিক জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এমন যে সাঙ্ঘাই আইন C. M. T. শাসনাধীনে প্রায় স্বাধীন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল তাহা অচিরেই বিজেতা কর্তৃক তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সাংহাইতে আসিয়াই কমিউনিষ্টগণ নিরস্ত্র হন নাই, তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ চীনের সমস্ত অংশই দখল করিতে তৎপর হইয়াছে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে কমিউনিষ্ট বাহিনী কোয়ানটুঙ্ প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে।

হংকং—

হংকংএর সীমান্ত অঞ্চলের কিছুটা কোয়ানটুঙের সহিত মিশিয়াছে। কাজেই হংকং সমস্যা জরুরী আকার ধারণ করিয়াছে। এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই বোধহয় মিঃ এ. ভিঃ আলেকজাণ্ডার হংকং সহরে আসিয়াছেন; এবং কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। মিঃ আলেকজাণ্ডারের সফরের প্রাক্কালে হংকং-এর অবস্থা যে আকার ধারণ করিয়াছে, স্থানীয় সামরিক পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাহাকে অস্বাভাবিক রকমে শান্ত বলিয়া অভিহিত করিয়া এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে হংকং-এর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক

এবং একমাত্র প্রচুর পরিমাণে সৈন্য আমদানী করিয়া হংকং-এর রক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিলেই হংকং-এর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইবে।

হংকং সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়া গিয়াছে। ইহার রক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিবার জন্য যেমন বাহির হইতে সৈন্য, যুদ্ধ জাহাজ এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হইতেছিল তেমনি আভ্যন্তরিন শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার মানসে বিপ্লবকারী পঞ্চমবাহিনীর দলীয় গুপ্ত অনুচরদের ছাঁকিয়া বাহির করিবার চেষ্টারও বিরাম ছিল না। তা সত্ত্বেও আজ শান্ত অবস্থাকে অস্বাভাবিক ও ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হইতেছে। অধিকন্তু কম্যুনিষ্ট চীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠানের এক সংবাদে প্রকাশ যে হংকং-এর চীনা রাজনৈতিক দল গণপ্রতিষ্ঠান এবং চীনা অধিবাসীদের উপর হংকং গভর্ণমেণ্ট যে বিধিনিষেধ আরোপ করিয়াছেন পিপিং-এর চীনা নেতৃবৃন্দ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এক যুক্তপত্র প্রেরণ করিয়া হংকং গভর্ণমেণ্টকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, ইহার ফলে বৃটেনের সহিত চীনের স্বাভাবিক সম্পর্ক ব্যাহত ও বিপন্ন হইবে।

এদিকে চীন সরকারের বর্তমান রাজধানী 'ক্যাণ্টন' সহরের দিকে মুক্তিফৌজ বিদ্যুৎ গতিতে অগ্রসর হইতেছে। দলত্যাগী লক্ষ লক্ষ সরকারী সৈন্য গরিলা বাহিনীর সহিত যোগ দিয়া তাহাদের অগ্রগতিকে সহজ করিয়া তুলিয়াছে। খাস ক্যাণ্টন সহরের ভীতরের অবস্থাও বিশৃঙ্খলার চরমে দাঁড়াইয়াছে। এখন সোজাসুজি এই প্রশ্নই করা হইতেছে এই শেষ ঘাঁটিরও কবে পতন হইবে? অতঃপর হয়ত K. M. T. ফরমোসা দ্বীপকেই তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত করিবে।

বার্লিন সমস্যা—

পোটা জার্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরের মুদ্রা-ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া 'সোভিয়েট' ও পশ্চিমি ত্রিশক্তিতে যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল তাহা আজও শেষ হয় নাই। বার্লিন অবরোধ ও অবরুদ্ধ সহরের পশ্চিমি অংশকে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য বিমানসেতু প্রবর্তন—এই ব্যবস্থা প্রায় দশ মাস ধরিয়া চলিবার পর 'সোভিয়েটের' উদ্যোগে আবার চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের সম্মিলন আহূত হয়। ইহার পূর্বে গত ১২ই মে অবরোধ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু আজ প্রায় তিন সপ্তাহকাল অধিবেশনের পরও কোন মিমাংসার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। প্রকাশ্য অধিবেশনের পরে চতুঃশক্তি গোপন বৈঠকে মিলিত হন কিন্তু সে বৈঠকে একমত হইতে না পারায় আবার প্রকাশ্য অধিবেশনের সম্ভাবনা আছে। ইহাও শোনা যাইতেছে যে চতুঃশক্তি বৈঠক সাময়িক মুলতুবী রাখা হইবে।

উক্ত পর্যবেক্ষক মহল ইহাও বলেন যে, বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ সচিবগণ এরূপ ধরিয়া লইয়াই নূতনভাবে আলোচনা করিতে পারেন যে, জার্মানী দুইটি পৃথক ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসিত হইবে। বার্লিনের পূর্বখণ্ডসহ সোভিয়েট এলাকায় এক ব্যবস্থা এবং পশ্চিম বার্লিনসহ পশ্চিমী এলাকায় অপর ব্যবস্থা। ইহার ভিত্তিতে নূতনভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়া উভয় এলেকার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক করিয়া তুলিবার জন্য কোন বাস্তব প্রণালী উদ্ভাবন করা যায় কিনা সেরূপ চেষ্টাও হইতে পারে।

বার্লিন সমস্যার সমাধান যতই সুদূর পরাহত হউক এদিকে কিন্তু আমেরিকার ইউনাইটেড প্রেসে খবর বাহির হইয়াছে—পত্রিকায় বাহির হইয়াছে যে মিঃ প্রোমিকো মিঃ ষ্ট্যালিনকে এই কথা বুঝাইয়া ছিলেন যে, একবার রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হইলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ খণ্ডের জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাইবে। মিঃ ষ্ট্যালিনও মিঃ প্রোমিকার প্রেরিত রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখেন এবং পোলিট বুরোতে তিন মাস ধরিয়া বিতর্কের পর উহা গৃহিত হয়।

উহার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আরও আপোষরফা-মূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় বলিয়া প্রকাশ এবং ঐ নূতন

পরিকল্পনাকে কার্যে রূপদানার্থ পশ্চিমী প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ-আলোচনা চালাইবার ভার মিঃ ভিসিনিস্কি ও মিঃ গ্রোমিকোর হস্তে অভূতপূর্ব ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে অবিলম্বে বার্লিনের অবরোধ অবস্থার অবসান হয়।

মিঃ গ্রোমিকো মস্কো যাইবার পূর্বে কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কিন ব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব চার্লস সইয়ার বর্তমান সপ্তাহে টরোন্টোতে এক বক্তৃতার মধ্যে বলেন যে, রাশিয়া ও উহার তাবেদার রাষ্ট্রগুলি তাহাদের নীতির পরিবর্তন করিলে তাহারা আরও অধিক মার্কিন মাল কিনিবার সুযোগ পাইবে।

ফিলিস্তিন—

আরব, ইহুদি সংঘর্ষ ও তাহার সুদূর প্রসারি ফলাফল আজিও কোন স্থির লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু প্যালেস্টাইনের অস্থায়ী U. N. মধ্যস্থ ডাঃ র‍্যালফবাঞ্চে গতরাত্রে এখানে অভিমত প্রকাশ করেন যে পুণাভূমি প্যালেস্টাইনে স্থায়ী শান্তি আসন্ন। তিনি বিশ্বাস করেন প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে। জুরানে ইহুদি ও আরবদের বর্তমানে সম্মেলন হইতেছে তাহাতে উভয় পক্ষের বুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার উপর স্থায়ী শান্তি নির্ভর করিতেছে।

চীন, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোনেশীয়া এই বিরাট ভূখণ্ড আজ বিপ্লবের আওতায় পড়িয়াছে। বিপ্লবের রূপ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরূপ ধারণ করিলেও মূলতঃ তাহার চরিত্র একই। শোষনের হাত হইতে শোষিতের চিরমুক্তি। সে শোষণ আভ্যন্তরীণ উচ্চতর শ্রেণীরই হউক অথবা বিদেশী জাতিরই হউক চীনের এই বিপ্লবের সাফল্য বিভিন্ন দেশের বিপ্লবান্দোলনকে উৎসাহিত করিবে সন্দেহ নাই। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জোট বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। উত্তর আতলান্তিক চুক্তির অনুরূপ চুক্তি প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অথবা অন্যত্র সম্ভব কিনা তাহা লইয়া অষ্ট্রেলিয়ার নেতৃত্বে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ মার্কিন রাজনৈতিক মহলের সহিত ঘরোয়াভাবে আলোচনা চালাইতেছেন। কিন্তু মার্কিন বৈদেশিক সম্পর্ক পরিষদে উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করা হয় যে নূতন করিয়া দায়ীত্ব গ্রহণ আপাততঃ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নহে। বিশেষতঃ যে সব অঞ্চল আমেরিকার নিরাপত্তার দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে।

ভারত ও কমনওয়েল্‌থ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর একবার রূপান্তর গ্রহণ করল। যদিও রোমক সাম্রাজ্যের অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, তবুও রোমক সাম্রাজ্য হ'তে এর একটা গুণগত পার্থক্য আছে। রোমক সাম্রাজ্য একটা ঘা খাবার পর দুই ভাগ হয়ে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) ও প্রাচ্য রোমক সাম্রাজ্য রূপে অনেক দিন চলল। কিন্তু এর একটিও আবারে ও প্রকৃতিতে রোমক ছিল না। কেবল নামেই বজায় রইল—অন্তর্গত ধর্ম কিছুই রইল না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রথমে ছিল ইংরাজের সাম্রাজ্য; তার পর হ'ল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য; এর পর এল ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ অব নেশনস্ (British Commonwealth of Nations)—অর্থাৎ ব্রিটিশ জাতি-সংঘ। তারপর এবার হ'ল নিছক জাতি-সংঘ বা কমনওয়েল্‌থ অব নেশনস্ (Commonwealth of Nations)। এরা নাম বদলাচ্ছে; কিন্তু অন্তরগত ধর্ম—অর্থাৎ ধারক শক্তি বদলাচ্ছে না। ব্রিটিশ জাতির বিশেষ একটা শক্তির পরিচয় এই পরিবর্তনে পাওয়া যায়।

এত গেল ব্রিটিশ জাতির দিককার কথা। এই শেষ পরিবর্তন আনাতে ভারতের একটা বিশেষ অংশ আছে। বিলাতে গত মাসে সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের এক সম্মিলন হয়। তাতে ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল—সদ্য স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত এই তিনটি রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। জওহরলাল সেখানে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত গুণগ্রামও এর জন্য যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী ভারতের প্রধান মন্ত্রী পদের গুরুত্ব। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর প্রতি যে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তা কোন কোন নূতন স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত রাষ্ট্রের বা ডোমিনিয়নের প্রধান মন্ত্রীদের ঈর্ষার কারণ হয়।

সেই সম্মেলনের পর সব প্রধান মন্ত্রীদের স্বাক্ষরে যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তাতেও কেবল ভারতের জন্যই এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সাধারণতন্ত্র বা Republic হবে; ব্রিটেনের রাজার প্রতি কোন প্রকার আনুগত্য ভারতের থাকবে না। তবুও ভারত ব্রিটিশ জাতিসংঘের মধ্যে থাকতে পারবে এবং এর নাম হ'তে ব্রিটিশ শব্দ বাদ দিয়ে কেবল জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথ্ অব নেশনস্ (Commonwealth of Nations) নামে পরিচিত হবে। কিন্তু ব্রিটেনের রাজা কেবল চিহ্ন স্বরূপ (symbolic) এই জাতিসংঘের প্রধান বলে বিবেচিত হবেন;—কিন্তু এই হিসাবে তাঁর বিশেষ কোন মর্যাদা বা অধিকার থাকবে না।

আমরা বাল্যকাল হতে একটা অন্ধ আবেগে ইংরাজকে ঘৃণা করতে শিখেছি। প্রথম যৌবনে যখন বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেই, তখন পরিষ্কার করে একটা ধারণাই মনে ছিল—ইংরাজের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখব না। তারপর কংগ্রেস প্রথম দাবী করল স্বরাজ; তার পর স্বাধীনতা (Indepedence), এর পর এল পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসকে দিয়ে এই প্রতিজ্ঞা ও দাবী গ্রহণ করাতে কত আবেগময় ও উদ্বেগময় দিন ও রাত কাটাতে হয়েছে। দেড় বছর পূর্বে আমরা স্বাধীনতা পেলাম—নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্রিটিশ জাতিসংঘের বাইরে যাবার অধিকার পেলাম। আজ সেই অধিকার বলে সাব্যস্ত করলাম—আমরা জাতি-সংঘের বাইরে যাব না।

ভারত সরকারের সব কাজই আমরা সমর্থন করি, এমন অপবাদ আমাদের কেউ দিতে পারবে না। বহু ব্যাপারে আমরা সরকারী কাজকর্ম ও নীতির সমালোনা করি। কিন্তু ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে আমরা

সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। গণপরিষদে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রায় কোন প্রতিবাদই হয়নি ;—এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে নাম মাত্র ২।৩ জনের প্রতিবাদকে প্রকৃত প্রতিবাদ বলে ধরা যায় না।

কিন্তু আজ আমাদের এই মত পরিবর্তন কেন? "ব্রিটিশ সম্পর্ক ছেদ করা" (severence of British connection) আমাদের প্রায় রাজনীতির গোড়ার কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কেউ কেউ বলছে—আজ কেন এই ব্রিটিশ সম্পর্ক রাখছি? তারা ভুলে যায়—যে ব্রিটিশ সম্পর্ক আমরা ছেদ করতে চেয়েছিলাম, তা গত বছর ১৫ই আগষ্ট ছেদন করা হ'য়েছে। আজ যে সম্পর্ক স্থাপন করছি—তা সম্পূর্ণ নূতন সম্পর্ক! তবু-ও পুরোনো মনোভাব একেবারে যায় না ;—এতদিনকার এই ব্রিটিশ-বিদ্বেষ থেকে আমাদের মন সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে চায় না। তাই বাস্তব অবস্থার চেয়ে বড় হ'য়ে ওঠে, মনের পুরাতন গতি। তাই ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলেই অনেকের মন খিঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখা উচিত।

ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ ক'রে তার নূতন শাসন পদ্ধতি গড়েছে। তার এই নিসম্পর্কিত স্বাধীনতার মূল্য কতটুকু? আজ আত্মরক্ষার জন্য তাকে ঐ জাতিসংঘের শরণাপন্ন হ'তে হচ্ছে। গতির ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমস্ত দুনিয়া আজ সঙ্কুচিত হ'য়ে প্রতিবেশীর সমাবেশে পরিণত হয়েছে। আজ নিসম্পর্কিত স্বাধীনতা আত্মঘাতী। পরস্পরের উপরই নির্ভর না করে আজ কোন রাষ্ট্র টিকতে পারে না।

একটা কথা লোক মুখে প্রায়ই শোনা যায় history repeats it self—ইতিহাস হ'ল নিজেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এটা হ'ল ইতিহাসের বিকৃত রূপ। ইতিহাস নব নব রূপে নিজেকে নূতন করে গড়ে তোলে ; বলা উচিত history creates itself গত পৌনে দু' বৎসরে ভারতবর্ষের ইতিহাসও নূতন রূপে গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে একটা প্রধান ঘটনা হ'ল ভারত বিভাগ ;—এক ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক ভারতকে ভাগ করে দুটি রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। এই দুই রাষ্ট্রের অস্বাভাবিক উৎপত্তি এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে একটা গুরুতর নূতন পরিস্থিতি। পাকিস্থানের জন্মদাতা ও অধিনায়ক জনাব জিন্না ঘোষণা করেছিলেন—পাকিস্থান ব্রিটিশ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্তই থাকবে। চীন, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি দেশে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের ফলে আজ অরাজকতা ও রাষ্ট্রীয় অনিশ্চয়তা সুরু হয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্র নীতি নির্দ্ধারণের সময়, এই সব বিষয়ই বিবেচনা করা দরকার।

তা'ছাড়া—বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব-ও নয়, সঙ্গতও নয়। ভারতবর্ষ নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী বিশ্বসমস্যার সমাধানে সাহায্য করবে, এটাই ভারতের পক্ষে স্বাভাবিক। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে ভারত কোন বৃহৎ শক্তির সঙ্গেই জড়িত হবে না ;—সে বিশ্ব ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে। ভারতের পক্ষে এমনি রাজনীতি অপমানজনক এবং আমরা মনে করি—অসম্ভব ও অপ্রাকৃত। ভারত চীনের মতো পৃথিবীর এক প্রান্তে অবস্থিত নয় বা আন্তকলহে বিচ্ছিন্ন নয়। সেই চীনও বিশ্ব-যুদ্ধের দুটার কোনটাতেই নিরপেক্ষ থাকতে পারেনি ভারত সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের মতো ক্ষুদ্র নয়—যে আত্ম-ঘাতী যুদ্ধে মানুষ ক্ষয় হতে থাকবে, আর ভারত একপ্রান্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখবে। আজকার বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারত একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তি এবং এসিয়ার মধ্যস্থলে, এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত। যদি কোন বিশ্ব-যুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে সুরু হয়, তবে ভারত তাতে নেতৃত্ব করবে—বিগ্রহে, সন্ধিতে ও শান্তিতে। কাজেই কোন যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ভারত যুদ্ধে জড়িত হবে—এটা মেনে নিয়েই আজকার দিনে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। সেই দিক থেকে-ও ব্রিটেনের সঙ্গে যোগ রাখা ভারতের পক্ষে প্রয়োজন।

লণ্ডনে পণ্ডিত জওহরলাল, যা করে এসেছেন। তাতে ভারতের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক স্বাধীনতা

এতটুকু-ও হর্ষ হয় নি। কোন বিদেশী রাষ্ট্র-শক্তি বা প্রতীকের প্রতি আমাদের কোন আনুগত্য থাকবে না; এটা নিতান্তই একটা সন্ধির মতো ব্যবস্থা অথচ সন্ধির কড়াকড়ি এতে নেই। ভারতের সামরিক ব্যবস্থা আজ ব্রিটেনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত। হঠাৎ ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হলে আমাদের সামরিক ব্যবস্থা কতকটা অচল অবস্থায় আসতে পারে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে আমরা মনে করি—ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্রের অধিকার ভোগ করবে—এই ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী। গত দিনের ইংরাজ-বিদ্বেষ দ্বারা আমাদের বিচার-বুদ্ধি যদি বিচলিত হয়, তবে স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্ব পূরণ আমাদের পক্ষে কঠিন হবে। বর্তমানের প্রয়োজন সাধনই রাজনীতির প্রথম কথা—অবশ্য বর্তমান কোন সময় ভবিষ্যতকে বাদ দিয়ে বিবেচিত হয় না। বর্তমানের একমাত্র সার্থকতাই হল ভবিষ্যতের পুষ্টিসাধন।

সাম্প্রদায়িকতার অপসারণ

ইংরেজের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ভারতের অন্তরে নানা প্রকার ভেদ-বুদ্ধি সঞ্চার করা হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় সদ্য-রাজ্যচ্যুত মুসলমানকে ইংরাজ বিশ্বাস করতে পারেনি, তখন তার নীতি ছিল হিন্দুর তোষণ ও মুসলমানের পেষণ। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সুযোগে গড়ে ওঠে; হিন্দু জমিদারও ঐ সময়ই বিশেষ প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ ইংরাজ আমলে হিন্দুসমাজ বা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝাত তা ইংরাজেরই অনুগ্রহলব্ধ প্রসাদের ফল। কিন্তু হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সময় একটা অসাধারণ দৃষ্টির পরিচয় দিল;—ইংরাজের অনুগ্রহে যে তার চিরকাল চলবে না, তা সে বুঝতে পেরে ইংরাজ-বিদ্বেষী জাতীয় আন্দোলনে সে হ'ল অগ্রণী। তার চেষ্টায় ও উদ্যোগে কংগ্রেস স্থাপিত হল। তখন ইংরাজ তার প্রসাদের থালা হিন্দুর সামনে থেকে সরিয়ে মুসলমানের দিকে এগিয়ে দিল।

এটা সুরু হ'ল গত শতাব্দীর শেষ দিকে। ঠিক যেমন তালে জাতীয় আন্দোলন বেড়ে যাচ্ছিল, সেই অনুপাতেই ঐ ভেদনীতিও গভীরতায় ও ব্যাপকতায় বেড়ে যাচ্ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে যে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়, তার প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধক হিসাবে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি-ও প্রসারিত হল। মিণ্টো-মর্লি সংস্কারের সময় ইংরাজের নির্দেশেই একদল মুসলমান সদ্য বয়স্থ আগা খাঁর নেতৃত্বে পৃথক নির্বাচন দাবী করল। এর পর হ'তে শাসন-সংস্কারের প্রতি ধাপায় সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ হ'য়েছে। এর পরিণতি হ'ল মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি মতবাদ প্রচার ও ভারতের বিভাগ। আজ ভৌগলিক ভারত দুটা বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে।

যারা দ্বি-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করত, তারা আজ পাকিস্থানে চলে গেছে। বর্তমান ভারতের বহু মুসলমান এইভাবে পাকিস্থানে নিজেদের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করে তথায় চলে গেছে। আজ যারা ভারতে আছে, তারা ধর্ম-নির্বিশেষে একই জাতির লোক। এর মধ্যে আবার খোপ খোপ ভাগ করে পৃথক মনোভাবকে বজায় রাখা জাতি ও দেশের পক্ষে ক্ষতি জনক। কিন্তু এত বছর ধরে জাতির স্তরে স্তরে যে বিষ সঞ্চারিত হয়েছে তা সহজে দূর হয় না। পৃথক নির্বাচন যে কেবল মুসলমানদের দেওয়া হয়েছিল, তা নয়; কার্যত ১২।১৩টি বিভিন্ন কক্ষে জাতিকে ভাগ করেছিল। এদের সবাই আজ মনে করে পৃথক নির্বাচন প্রথা রহিত হলে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। এই মনোভাবের পিছনে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থবোধই প্রবল। পৃথক নির্বাচনে ঐ সব সম্প্রদায়ের সাধারণ জনতা উপকৃত হয় না;—যে সব মধ্য শ্রেণীর লোক নির্বাচিত হয় এবং নির্বাচন প্রার্থী হয়, পৃথক নির্বাচন প্রথায় ব্যক্তিগত ভাবে তারাই লাভবান হয়। তাই সাধারণ জনতার মুখপাত্র হিসাবে এরাই পৃথক নির্বাচন দাবী করছে। সাধারণ জনতা প্রায় সর্বত্রই এই বিষয়ে নীরব ও মূক;—তাদের নানা দুর্গতি ও দুঃখের সুযোগ নিয়ে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করা খুবই সহজ রাজনৈতিক চাল। মানুষের

দুঃখ-দুর্দশার প্রতি মৌখিক সহানুভূতি দেখিয়ে, অপেক্ষাকৃত ভাগ্যবানদের প্রতি বিদ্বেষ জাগানো খুবই সহজ। এই বিদ্বেষ জাগানোর রাজনীতিই ছিল, মুসলীম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম-পদ্ধতি। এর ফলে জাতির সংহতি নষ্ট হয়; পরস্পরে বিদ্বেষ ও ঈর্ষা জন্মে। একটা স্বাধীন জাতির পক্ষে এটা মারাত্মক ত্রুটি। এর পরিণতিতে চর জাতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়, নয়ত পৃথক নির্বাচনভোগী সম্প্রদায় চিরকাল সন্দেহের পাত্র হয়ে জনতাব ও রাষ্ট্রের নিষ্পেষণের পাত্র হয়। এই নিষ্পেষণের ফলে তারা ক্রমে লোপ পেতে থাকে—আর তা না চলে তারা রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে দেয়। মোটের উপর কোন রাষ্ট্রই এইভাবে পৃথক সত্তার মনোভাব নিয়ে কোন সংখ্যা-লঘুকে সহ্য করে না।

সর্দার বল্লভ ভাইর চেষ্টায় ও কর্মকুশলতায় সংখ্যালঘুরা যে পৃথক নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করতে রাজী হয়েছে, এটা আজ খুবই সুখের বিষয়। ইতিপূর্বে প্রায় ছয় শতের মতো দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন ক'রে তিনি জাতির ভৌগলিক ও অবস্থানিক (territorial) সংহতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, আজ আবার জাতির মনোগত সংহতি স্থাপন করলেন। সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন প্রথা রহিত করে দেশীয় রাজ্যদের বিলোপ সাধনেও যেমন সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় নি,—মোটামোটি ঐ সব রাজ্যের সম্মতির ভিত্তিতেই তা সাধিত হয়েছে,—তেমনি পৃথক নির্বাচন রহিত করার বেলায়ও, বিধান পরিষদে ভোটের জোরে তা করা হয়নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মতির ভিত্তিতেই এটা সাধিত হয়েছে। মুসলমানদের তরফ হইতে জনতিনেক অতি উগ্র সাম্প্রদায়িক সভ্য ভিন্ন আর সবাই এতে সম্মতি দিয়েছে; শিখগণও সম্মতি দিয়েছে; খৃষ্টানদের সম্মতি পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল।

এই উপলক্ষে ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখার্জীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়। যখন প্রায় কেউ-ই এই প্রস্তাবে রাজী ছিল না, তখন এই বাঙ্গালী বৃদ্ধ খৃষ্টান এবা এই জাতীয় দাবী প্রতিষ্ঠার কথা বলছিলেন। কোন যৌবনে তিনি মার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—জাতির দেহে এই কলঙ্ক-ভাগ দূর করার চেষ্টা করবেন; তাই এই বৃদ্ধ বয়সে নিজ ধর্মাবলম্বীদের একদলের তিরস্কার ও বিদ্রূপ সহ্য করেও তিনি একাগ্রভাবে ঐ আদর্শকে আঁকড়ে ছিলেন। হয়ত তাঁর এই নির্বন্ধাতিশয্য না থাকলে সর্দার বল্লভ ভাই এই বিষয়ে অগ্রসর হতে দ্বিধা বোধ করতেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। ধর্মের ভিত্তিতে কোন পার্থক্যকে স্বীকার না করলেও—সামাজিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে যে পার্থক্য সমাজে আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তাই হিন্দু ও শিখ হরিজনদের বিষয়ে আগামী ১০ বৎসরের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১০ বছর পর এই ব্যবস্থা আপনা হতেই লোপ পাবে। সংখ্যার অনুপাতে পৃথক নির্বাচনে প্রতিনিধি পেলেও, হরিজনদের সম্বন্ধে আরও ব্যবস্থা হয়েছে যে—এ ছাড়াও, সাধারণনির্বাচনে-ও তারা প্রার্থী হতে পারবে। সাধারণ ভাবেই এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক মূল্য যথেষ্ট আছে, তাছাড়া ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেও এ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। হরিজন শ্রেণীর অন্তর্গত লোকদের মধ্যে এমন রাজনৈতিক শুভ-বুদ্ধি বিশিষ্ট লোক আছে, যারা পৃথক নির্বাচনে দাঁড়াতে চায় না—বা তাতে তাদের আপত্তি আছে। অন্তত তাদের জন্যও পৃথক নির্বাচনের বাইরে সাধারণ নির্বাচনে দাঁড়াবার অধিকার হরিজনদের থাকা উচিত। এই অধিকারের ফলে হরিজনরা হয়ত সংখ্যার অনুপাতে ২।১টি বেশী প্রতিনিধি পাবে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে রাজনীতি মুদি দোকানের হিসাব নয়;—এখানে অঙ্কের হিসাবের চেয়ে বড় হ'ল হৃদয়ের প্রসারতা।

এই ব্যবস্থার তাৎপর্য—

ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন রহিত করা হ'ল এবং সামাজিক হিসাবে পিছিয়ে থাকার দরুণ হরিজনদের মাত্র ১০ বছরের জন্য পৃথক নির্বাচন দেওয়া হ'ল—দশ বছরের পর আপনা হ'তেই এসব লোপ পাবে। এই ব্যবস্থার

দুটো দিক আছে। এক দিকে হ'ল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবী যে তারা কোন রাজনৈতিক সংঘ সত্তা রাখবে না। অপর দিকে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের প্রতিশ্রুতি যে সর্ব বিষয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি স্ব-জনোচিত আচরণ করবে এবং সর্বপ্রকারে জাতির বৃহৎ সত্তার সঙ্গে তাদের একাত্ম করে নেবে।

মুসলমান, খৃষ্টান ও শিখগণ যেমন পৃথক নির্বাচনের দাবী ত্যাগ করল, তেমনি সংখ্যাগুরুদের পক্ষ থেকে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা দরকার যে এদের আর বহিরাটিতে বসিয়ে না রেখে নিজেদের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক করে নিতে হবে। এ কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই—ধর্ম হিসাবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ভেদ বুদ্ধি আছে, তা জাতির সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কেও স্পর্শ ক'রেছে। পৃথক নির্বাচন প্রবর্তনের পূর্বে, সাধারণ নির্বাচন দ্বন্দ্বে মুসলমান বা খৃষ্টান প্রতিনিধি যেমনভাবে নির্বাচিত হ'তে পারত না। এখনও যদি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সে মনোভাবের পরিচয় দেয় তবে জাতির পক্ষে পরম অকল্যাণ তারা সাধন করবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে তারা দোষী হবে।

অনুন্নত হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা ক'রে বলা হয়েছে—দশ বছর পর এই প্রথা আপনা হ'তেই লোপ পাবে। এটা কেবল ভোটের জোরে কোন কিছু পাশ করা নয়;—এটা একটা প্রতিশ্রুতি। এতদিন যাদের মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত করে রাখা হ'য়েছে—তাদের প্রতি এটা প্রতিশ্রুতি যে ১০ বছরের মধ্যে সামাজিক অধিকারে, শিক্ষায় ও অন্যান্য সব বিষয়ে তারা সাধারণ হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হবে এবং একই অধিকার ভোগ করবে। যে সামাজিক অন্তরায় জন্য তাদের আজ পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তা দূর না হওয়া পর্যন্ত, তাদের পৃথক নির্বাচনের অধিকার রহিত করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই।

গান্ধীজী বরাবর বলেছেন অস্পৃশ্যতা ও হিন্দুধর্ম—দুটোই এক সঙ্গে থাকতে পারে না,—হয় অস্পৃশ্যতা দূর হ'বে, নয় ত হিন্দু ধর্ম লোপ পাবে। আজ ঐ কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়—হয় অস্পৃশ্যতা ও তার আনুসঙ্গিক সামাজিক ব্যবস্থা লোপ করতে হবে, নয় ত ভারতের জাতীয় সত্তা বিপন্ন হবে। কোটি কোটি লোককে সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে কোন জাতি সুস্থ সবল হতে পারে না। বিধান-পরিষদে সে দিন যে ব্যবস্থা হ'ল—(অর্থাৎ ১০ বছর পর সামাজিক হিসাবে অনুন্নত সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচন লোপ পাবে)—তার অর্থ এই যে জাতির তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল সর্বপ্রকার সামাজিক অধিকার তাদের দেবার যা এই দশ বছরে করা হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

—ভারতী—

দ্বাদশ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৫৬ | তৃতীয় সংখ্যা

প্রথম হাঙ্গার ষ্ট্রাইক

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

ষ্টেট প্রিজনারের সম্পর্কে একটা নিয়ম ছিল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হোক্, ডেপুটি কমিশনার্ হোক্, প্রতিমাসে একবার ক'রে দেখে যাবে; কিন্তু বিলাসপুরে আসিবে পাঁচ মাস ছিলাম তার ভিতর ইউরোপীয়ান ডেপুটি কমিশনারটি একবারও আসে নাই দু'একবার তাঁর অফিস পর্যন্ত এসে ফিরে গেছে, শুনেছি। আমার কাছে আসতেন একজন অ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার—বাঙ্গালী যুবক—এস, পি, সান্যাল। বেশ ভদ্র এবং শিক্ষিত।

সেদিন সকালের মধ্যেই দ্বিতীয়বার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আবির্ভাব; সঙ্গে ইনি। ইনি কে, তখনও তা জানিনে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ওঁকে বললে, কাল তো বাঘের মতো লড়াই করেছেন; কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতেই হবে। ভদ্রলোক নীরবে আমার দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে চ'লে গেলেন।

বেলা বারোটা আন্দাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার এল—পেছন পেছন জেলার, ডাক্তার, গত রাত্রের সেই সব সিপাই জমাদার, আর তাদের পেছনে একজন কাবুলী পাগড়ি নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় মোট পঁচিশটি কয়েদি।

বড় ঘরটায় একখানা আলাদা খাট দিয়েছিল দিনের বেলায় বিছানাটা সেখানে এনে দিত। শুয়ে ছিলাম, জানলা দিয়ে ওদের দেখে গণে নিলাম, এবং আসন্ন যুদ্ধের জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে নিলাম; কিন্তু উঠবার কোনো

আগের বারে ফটাপটির সময় চশমাটা ছিটকে পড়ে গিয়েছিল খাট এসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রথমেই চোখ থেকে চশমা খুলে নিয়ে চরমার দিল, তারপরে সিপাই জমাদারেরা যখন আমার হাত পা ধরে তখন একে একে আমার পায়ের বুড়ো নিচ্ছে।

হাত চেপে ছিলাম ডাক্তার কি একটা পিতলের যন্ত্র বের ক'রে আমার হাতের ফাঁকে ঢুকাতে চেষ্টা করলো। তখন হাত পা ঝাপটে ঝাঁকানি দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তুলে ডেক চেয়ারে নিয়ে যেতে।

ধ্বস্তি: ধুস্তি এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত গেল।

তখন বেশ খানিকটা ক্লান্তও হয়েছি—এটা উপবাসের চৌদ্দ দিন পর আজই তখন প্রায় মানুষের হাত চেপে রয়েছে ডাক্তার সেই পিতলের হাতের ফাঁকে যখন ঢুকাচ্ছে, তখনও মাথা একটা স্ক্রু ঘোরাতে ফাঁক হয়ে হাতের ফাঁকে একটা কাঠের টুকরো ঢুকিয়ে দিল, মাঝখানে একটা চাকা, দুপাশে দুটো ফিতে বাঁধা—এ দুটোকে মাথার পেছনে বেঁধে দিল। এটাকে ওরা বলতো Gag.

গলাগের মাঝখানের ছাঁদা দিয়ে একটা নল চালিয়ে দিল। নলটা যেন বেত দিয়ে বোনা, বেশ শক্ত। গলার ভিতরে না ঢুকে সেটা তালুতে খোঁচা মারতে লাগলো। জল খেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নলটা টেনে নিয়ে খানিকটা বেঁকিয়ে আবার ঢুকিয়ে দিল, এবারে গলার বদলে বুকে খোঁচা মারতে শুরু করলো। আর বেশী দূর ঢুকলো না।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললে, এইবারে দুধ ঢালো। নলের বাইরের মুখে একটা কাঁচের ফানেল ছিল। তা দিয়ে খানিকটা দুধ ঢেলে দিল। বুকের কাছে তখন বেশ ব্যথা করছে।

দুধ খাওয়ান হয়ে যেতে ছেড়ে দিল। তখন গলার ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দু'একবার নাড়া দিতে রক্তে দুধে মিশে বেশ খানিকটা লাল জল যেন প'ড়ে গেল। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট খানিকটা তাকিয়ে দেখে নল-সমেত নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। বুকে তখনও বেশ ব্যথা, এমনি ক'রে আরও বেড়ে গেল।

একটু বাদে স্বল্পবাক্ পার্শি ডাক্তার মোড়ি ঘুরে এলেন। বৃদ্ধা বিধবার মতো চেহারা, বৃদ্ধা বিধবার মতোই অন্তঃকরণটা সহানুভূতিতে ভরা। বললেন, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, জোর ক'রে খাওয়াবার মতো যে কাঠের নল, তা আমাদের নেই. এ নল দিয়ে খাওয়ান উচিত হবে না। তবু কথা শুনলো না। আপনার বুকে ব্যথা করছে নিশ্চয়ই। হেসে বললাম, 'একটু।'

চেষ্টা করব যাতে কাল আপনাকে খাওয়ান না হয়। বার খাওয়াবার কথা ছিল, ওবেলা খাওয়ান হবে না, হলেই গেছে। আর, এরকম ক'রে খাইয়েই বা লাভ কি হবে? আপনি তো আরও জীর্ণ হয়ে পড়বেন।

পরদিন সকালে আবার এসে বললেন, আপনাকে জোর ক'রেই তো খাওয়ান হচ্ছে, আপনি নল টানাটানিতে বাধা দেবেন না। অত স্বস্তাধ্বস্তি ক'রে রক্ত প'ড়ে আপনি আরও তাড়াতাড়ি দুর্বল হবেন।'

হেসে বললাম, আমি কি সবল হ'তে চাইছি?

'সে কথা বলছি না। আপনি স্বেচ্ছায় না খেলেই তো হ'ল। আপনি চেষ্টা.
নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।'

'সে হয় না।'

ক্ষুণ্ণমনে ডাক্তার চ'লে গেলেন। ওঁর মুখখানা সর্বদাই যেন বিষাদে ভরা।

ডাক্তারকে বললাম, 'সে হয় না।' কিন্তু নিজের ভিতরটা দেখছিলাম। বিলাসপুরে পৌঁছাবার পর থেকে পরশু পর্যন্ত এই জোর ক'রে খাওয়াবার ঝঞ্ঝাট জোটে নাই। নিরিবিলি আপনাকে নিয়ে আপনি থাকতাম। তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে কতোখানি সময় মরতে হবে, তার কল্পনা করতাম। ধীরে ধীরে মনের পর্দার পরে পর্দা স'রে গিয়ে কখন যে অন্য কল্পনা এসে পড়েছে, তা টেরও পাইনি। গভর্নমেণ্ট যেন আমাদের দাবী মিটিয়ে দিয়েছে আমরা আবার খেতে শুরু করেছি। সেইজন্যে খেতে শুরু করা, তার ভিতর যতোরকম লোভনীয় খাদ্য, যতোরকম যা কিছু পুষ্টিকর খাদ্য ব'লে জানতাম, তার ছবি যেন একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে। এটা নয়, ওটা; এরকম নয়, ওরকম। এক-রকম ফর্দ তৈরী করছি, মনঃপূত হচ্ছে না, অন্যরকম ফর্দ করছি।

ঝাঁ ক'রে মনটাকে একটা ঝাঁকানি দিতে গিয়ে দেখছি, এই যে ক্ষুধার দুর্বলতা, এই ভাঙা দরজার পথে মনের যতো দৈন্য, যতো চাপা-পড়া ক্লেদ সব যেন ধরা দিচ্ছে।

নিজের অভিমানে জোর একটা ধাক্কা খেলাম। এই আমি? এই আমার সারা জীবনের সাধনা? কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং।

জীবনে যাদের ভালবেসেছি, জীবনে মহৎ যা-কিছুর স্বপ্ন দেখেছি, একে একে আবার তাদের মনের পর্দার উপর টেনে নিয়ে আসি। বলি, আজ আমি নিঃস্ব, নিঃসম্বল, নিরলস। আজ আমার কোনো কাজ নেই, খাওয়াপরাও নেই, আজ আমার অবাধ ছুটি। আজ আবার জীবন ভ'রে তোমরাই শুধু থাক। তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাকে পেয়েছি—সেই 'কেবল তুমি,

কেবল তুমি।'

কিন্তু মানুষের মনটা যে একটা কতো বড় দুর্বার স্রোতে ভেসে চলে! কোনো খোঁটায় ওকে এক জায়গায় বেশী সময় বেঁধে রাখা চলে না। ছুটতে ছুটতে কোন্ এক অনবধান মুহূর্তে আবার এসে রক্তমাংসের খোঁটায় আটকে যায়।

এমনি মুহূর্তে এল ডাক্তারের কথাটা: 'আপনি চেয়ারে ব'সে থাকবেন, আমরা নল চালিয়ে খাইয়ে যাব।' এত দিনের উপোসের পর দুদিনের এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে শরীরের সব গিরোয় গিরোয় ব্যথা হয়েছে। গলা দিয়ে আজ সকালেও রক্ত পড়েছে, বুকে বেশ ব্যথা।

পরক্ষণেই মনে পড়লো, রবীন্দ্রনাথের কথাটা, উপস্থিত মতো মানুষ যা পারে, সেখানেই তার সীমা নয়। তা যদি হ'ত তা হ'লে যুগযুগান্তর ধ'রে মানুষ মৌমাছির মতো একই রকম মৌচাক তৈরী ক'রে চলতো।

যা পারি, তারই সীমার মধ্যে নিজেকে টেনে নামাবার এ চেষ্টা কেন? আমরা না ভাঙতে গ'ড়ে তুলবার কাজে ব্রতী? মানুষের শক্তিকে রবীন্দ্রনাথ দুটো ভাগে ভাগ করেছেন—এর একটার নাম 'পারে,' আর একটার নাম 'পারবে।' 'পারে'র দিকটা মানুষের সহজ, 'পারবে'র দিকটায় তার তপস্যা।

এই 'পারবে'র দিকটা যখন বইতে পারি না, তখনই আমরা আদর্শকে বলি, আমি আর তোমার দিকে যাব না, তুমিই আমার দিকে নেমে এস। এখানেই খুলে গেল নরকের দ্বার।

শিউরে উঠি। মন স্থির হয়ে যায়।

পরদিন আবার সেই খাওয়াবার পালা। ঐ দুদিন ধ'রেই গলা দিয়ে রক্ত পড়ছে। ডাক্তার দুবেলাই রক্ত দেখে যাচ্ছেন।

দুপুর বেলায় আবার সেই ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জনের বাহিনী। সেদিন কাপড়টা ছিঁড়ে গিয়েছিল। আজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘরে ঢুকে নিজে চশমা তুলে নিল, জমাদারকে বললো, কাপড় খুলে নিতে। নইলে, সরকারী পয়সায় কাপড় কিনে দিতে হবে তো!

অতগুলো লোকের সামনে ঐ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি—যেন একটা বন্য জানোয়ার! পরে কতবার ভেবেছি, কি ক'রে পারতাম?

পূর্বদিনের সেই অভিনয়েরই পুনরভিনয় হ'ল। নলটা আজ প্রথমেই বেঁকিয়ে নিল। কিন্তু তবু রক্ত পড়তে কোনো বাধা হ'ল না। আজও যা খাওয়ালো বমি ক'রে ফেললাম।

এইরকম খাওয়ান, বমি-করা আর রক্ত-পড়া আরও তিন চারদিন চললো।

বুকের ব্যথাটা খুবই বাড়লো। তার পর আর একদিন যখন খাওয়াতে এল, কিসে কি বুদ্ধি জুটলো জানি না। এদিন খাওয়াল বলবার নিয়ে। নলটা যখন ঢোকিয়ে দেয়, কি অসহ্য ব্যথা! যখন বের ক'রে নিল, আরও বেশী অসহ্য। সেইদিন থেকে যে রক্ত পড়তে শুরু হ'ল, তা'তে অনেক বছর ভুগেছি। এই যা শুখোবার জন্যে পরে প্রায় এক বছর ধ'রে প্রতিদিন জোলাপ জাতীয় কিছু না কিছু খাইয়েছে। এখান থেকেই শুরু হ'ল জীবনসঙ্গী কোষ্ঠবদ্ধতা।

ওরা সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে টেলিগ্রাম করেছিল। এসে পড়লো মধ্যপ্রদেশের ইনস্পেক্টার জেনারেল অব প্রিজন্স্, কর্ণেল বেন্সলি।

আমায় বলে, আপনি কি মনে করেন, আপনি আত্মহত্যা করার ভয় দেখাবেন, আর গবর্ণমেণ্ট আপনাকে ছেড়ে দেবে, বা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা দেবে?

আস্তে সুস্থে বলি, ওসব বচন হয়ে গেছে, আর নতুন কিছু বলবার আছে?

ও তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্যদের নিয়ে বারান্দার অপর পাশে গেল, বুঝলাম, জোর ক'রে খাওয়াবার নতুন কায়দাকানুন শেখাচ্ছে। লোকটি আইরিশ। শুনলাম, ওদেশে অনশনব্রতীদের খাওয়াবার কাজে হাত পাকিয়েছে।

ওদের যা উপদেশ দেবার দিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে এল। অতি নম্র ভাষায় শুরু করলো:

কেন আপনি এই কষ্ট করছেন? আমার এই প্রদেশে আপনার আর যে সব বন্ধুরা এসেছেন, তাঁরা সবাই খেতে শুরু করেছেন। অন্যান্য প্রদেশেরও খবর আমি যা পেয়েছি, সবাই খাচ্ছেন, আপনিই শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। আমার এই প্রদেশে আর যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি প্রতি সপ্তাহে ছ'তিন ঝুড়ি ক'রে কমলালেবু পাঠাচ্ছি নাগপুর থেকে; কেউ কেউ ফেলে ছড়িয়ে খাচ্ছেন...ইত্যাদি।

চুপ ক'রে শুনলাম। বললে, আপনি খাবেন তা হ'লে?

বললাম, না।

কিছু সময় দাঁড়িয়ে কয়েদিদের খাওয়া দেখছিল। আই জি এসেছে ব'লে সেদিন কয়েদিদের পরিহার চালের ভাত দিয়েছে, বেশ ঘন ডাল দিয়েছে, আলাদা একটু তরকারি দিয়েছে। অন্য দিন দেয় বেশ মোটা মোটা কালো ভাত, এক বেলা তরকারি, এক বেলা ডাল—ডাল মানে ডালের কালো জল, আর তরকারি মানে সর্ষের তেলে পোড়া পাতা সেদ্ধ—তার ভেতর কচি পাতার সঙ্গে পেপের পাতা পর্যন্ত মিশে যায়। মাটি মেশানো কালো একরকম নুন দেয়, তা'তে ভাল তরকারিতে নুনের স্বাদ লাগে না।

সেদিনের খাবার দেখে কিন্তু আই জি বললে, এত ভাল খাবার দিও না—তা হ'লে ওরা বার বার জেলে আসবে। ভাল আর তরকারী দুটোই একবেলায় দিও না, বরং ডালের মধ্যে তরকারী সেদ্ধ দিয়ে দিও। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললে, All right, sir—অন্য দিন যে করে, তা আর বললো না।

আই জি'কে বিদায় করে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আবার এল। সঙ্গে প্রতিদিনের সেই দলবল। কিন্তু ব্যবস্থা আজ ভিন্ন। বারান্দার ঘরের একটা জানালার গায়ে একখানা লোহার খাট এনে ফেললো। রোজকার মতো চশমা ও ধুতি কেড়ে নেওয়া, ধস্তাধস্তি সবই হ'ল। তার পর, আমায় খাটের উপর নিয়ে ফেললো। যেখানে কাটাপটিতে হাত পা অনেক জায়গায় কেটে ছিঁড়ে গেল। পরে পা দুটোকে গোড়ালির ও হাঁটুর উপরে লোহার পাতের সঙ্গে রশি দিয়ে বাঁধলো, বুকের কাছটা এবং কনুই ও হাতের কব্জিটা জানলার গরাদের সঙ্গে তেমনি বেঁধে নিল। অন্যদিনের মতো মাথা ঘুরাবার ফিরাবারও আর প্রায় উপায় রইলো না—জানালার দুটো শিকের মাঝখানে মাথাটা একজন অনায়াসে চেপে ধ'রে রইলো। আজ নল চালালো কিন্তু নাক দিয়ে। আজকের নলও অন্যরকমের—রবারের নরম সরু নল—অনায়াসে বুকের নীচে অবধি চ'লে গেল, বেশ টের পেলাম। তখন দুধ ঢাললো। আজ অনেকটা বেশী পরিমাণেই ঢালতে পারলো।

আমারও আজ বমি করতে বেগ কম পেতে হ'ল। রক্ত কিন্তু অন্য দিনের মতোই পড়লো—বোধ হয় ভিতরে কোথাও একটু ঘা হয়ে গিয়েছিল।

বিকেল বেলায় কয়েদিদের খাইয়ে দাইয়ে ঘরে বন্ধ করতে নিয়ে যাবার আগে আমার ঘরের সামনে ইয়ার্ডের ভিতর জোড়ায় জোড়ায় ফাইল ক'রে বসায়। সেখান থেকে গনতি মিলিয়ে ওয়ার্ডে নিয়ে বন্ধ করে। আবার ভোর বেলায় ইয়ার্ড থেকে বের ক'রেও ঐভাবে ঐখানটায় বসায়। যেদিন থেকে আমায় বাঁধবার জন্যে ওরা কয়েদি নিয়ে আসতে শুরু করলো, সেই দিন থেকে সমস্ত কয়েদিরা রোজ সকাল সন্ধ্যায় ফাইলসুদ্ধ আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। প্রণাম ক'রে উঠে ব'সে জোড়হাতে কি কাতর মিনতি জানায়।

সন্ধ্যাবেলা ওরা বন্ধ হ'তে যাবার পর আর সকালবেলা ঘর খুলে দিতেই আমি ইয়ার্ডের পেপে গাছগুলোর তলায় কাঁকরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কিছু সময় পাইচারি করি।

আই জি ব'লে গেল, আর সবাই খেতে শুরু করেছেন। মনে মনে জানি, এরকম মিথ্যা কথা ওরা বলবেই। কিন্তু কে জানে? সবার খবর পাবারও তো উপায় নেই। চন্দ্রিকাপ্রসাদ রোজকার মতো ওয়ার্ডটা ঘুরে পেপে গাছতলায় এসে বললেন, Good morning.

আমি প্রতিনমস্কার জানালাম। অন্যদিন যা বলবার

উনিই বলেন। আজ জিজ্ঞেস করলাম, "আই জি যে ব'লে গেল, আর সবাই খেতে শুরু করেছে, আপনি কিছু খবর জানেন?"

"আমিও যতদূর শুনেছি, তা-ই সত্যি। সহরে বাঙালীরাও তা-ই বলেন। আমি সঠিক খবর নিয়ে আপনাকে বলব।"

সবাই খেতে শুরু করেছে? কিন্তু কি করে সম্ভব হয়? একে একে সবার কথা মনে পড়ে। বয়স্ক যাঁরা, রুগ্ন যাঁরা—তাঁদের বলে দেওয়া অবিশ্যি আছে যে, তাঁরা যখন খুসি অনশন ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু আর সবাই? সত্যেনদা, মনোরঞ্জনদা, সুরেশ দাস—এঁরাও সব ছেড়ে দিয়েছেন?

অসম্ভব।

দিনরাত মনটার ভিতর তোলপাড় করতে থাকে। এদেরও কারও কারও কথা আজ চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে বসি...মনে পড়ে এই সেদিনের কথা। আলিপুর জেলে দু'একজনের সঙ্গে আমার মিশতে ভালো লাগতো না—আজ যাঁদের কথা বেশী ক'রে ভাবছি, তার ভিতর একজন বলতেন, "না, মেশা প্রয়োজন।"

একটা ছোট কথা। কিন্তু এর ভিতর যেন সেই ভবানী পাঠকের কথা—"লোকালয়ই"—এর সংগতি দেখতে পাই। আমার পক্ষে যা' প্রয়োজন, আমার সে সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না কেন? আবেগ থাকবে না কেন? আমার যাতে আগ্রহ নেই, আবেগ নেই, আমার পক্ষে তা প্রয়োজন কিসে? I do but sing because I must. মনে হ'ল, এঁরা জীবনে শ্রেয়ের সন্ধান করেছেন, প্রেমকে তুচ্ছ করেছেন। শ্রেয়ের প্রেয়ের যোগ ঘটেনি এঁদের জীবনে।

হয়তো অসম্ভব নয়—এঁরা আজ অনশন ছেড়ে দিয়েছেন। তবু কয়েকজনের কথা ভাবতে পারিনে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ দু'একদিন পরে বললেন, "যতদূর খবর পেয়েছি, আপনাদের যে বন্ধু অমরাবতী জেলে আছেন, তাঁর উপবাস এখনও চলছে, আর সবাই ছেড়ে দিয়েছেন।"

অমরাবতী জেলে ছিলেন সত্যেন দা।

বোধ হয় গলার আর বুকের ঘা শুখোবার সুযোগ দেবার জন্যই এর পর দিন দুই খাওয়াল আবার মলম দিয়ে—যদিও ডাক্তার রোজই রিপোর্ট নিতে যাচ্ছিল যে মলমার দিয়েও রক্ত পড়ছে।

যাই হোক্, গলার বা বুকের ঘা বোধ হয় শুখিয়ে গেল—এর পর একদিন ক'রে নাক দিয়ে, একদিন ক'রে মুখ দিয়ে খাওয়ার। রক্ত আর পড়ে না।

খাওয়ার, আমিও রোজই বমি ক'রে ফেলে দিই। ওজন রোজই কমে—কোনোদিন এক পাউণ্ড, কোনোদিন আধ পাউণ্ড। কলে দিনে দুইবার খাওয়াবার ব্যবস্থা করলো। সঙ্গে ডিম ভেঙ্গে মিশিয়ে দিতে লাগলো।

আবার আই জির নির্দেশ এল, খাওয়াবার পর ঐ বাঁধা অবস্থাতে আধঘণ্টা রেখে দেবে, তাতে বমি করতে পারবে না। খুলে দেবার পর চেষ্টা করলেও বমির সঙ্গে বিশেষ কিছু পড়তো না; কিন্তু চেষ্টা প্রতিবারই করতাম।

একমাস হয়ে গেল। সঙ্গী নাই, সাথী নাই—একলা বসে থাকি, নয়তো পেপে গাছের তলা দিয়ে একলা একলা ঘুরি। ভোরে যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখনও আকাশে তারা থাকে। আমার জীবনে বন্ধু, সহকর্মী যারা এসেছে গেছে, আজ তারাও যেন ঐ তারার দলের মতোই কত দূরে! এ জীবনের সম্পর্ক যেন তাদের সঙ্গে চুকে গেছে। এমনি চলতে চলতে একদিন এখানেই পড়ে যাব—যে শেষ—আমার যারা আপনার ছিল, তাদের সাথেও যে আমার শেষ।

কি-ই বা আসে যায়? ঐ অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র তার ভিতর আমার মতো কতো অনন্ত কোটি জীব! প্রতি মুহূর্তে, প্রতিদিন তাদের কতো জীব পঁচে যাচ্ছে, ক্ষয় যাচ্ছে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কি আসছে যাচ্ছে—তা'র এই সৃষ্টির! আমার নিজের মৃত্যুটাকেই বা তাই এত বড় ক'রে দেখবার কি আছে? জন্মেছি যখন, চিরদিন বেঁচে থাকব না—তা হ'লে নিজেকেই বা সৃষ্টির কেন্দ্র ক'রে দেখছি কেন? সলোমনের কথা, Vanity

anities, all is vanity.

আমার সহকর্মী বন্ধুদের কথা ভাবছি—আমা ছাড়া আজও তাদের দুনিয়া তো শুরু হয়ে যায়নি. সুখে দুখে চ'লে যাচ্ছেই। তারাও হয়তো এতদিনে ধরা প'ড়ে গেছে। কর্মক্ষেত্রে তারা নেই, তবু কর্মক্ষেত্র যেমন ক'রে হোক্ চ'লে যাচ্ছেই।

তবু ইচ্ছা হয় জানতে Alexander Selkirk এর মতো—My friends, do they now or then send a wish or thought after me? হয়তো চিন্তা করে, হয়তো দুঃখ করে, হয়তো দুফোঁটা চোখের জলও ফেলে। সেই কল্পনাই আমার কাছে পরম তৃপ্তি বয়ে নিয়ে আসে।

কিন্তু এ তৃপ্তিরও তো আমার তরফ থেকে একটা মূল্য দেবার আছে! সে মূল্য আমার দেওয়া হয় যদি ব্রতের ব্রতে আমি সফল হই, না হয়তো যদি মরি। তারা দেবে তৃপ্তি, আমি দেব গৌরব। "আকাশ আমার বলে: আলোক, আকাশ আমি ভরবো গানে।" মানুষ এমনি করেই পরস্পরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজে শেষ হয়, সৃষ্টি এগিয়ে চলে। এ না হ'লে সৃষ্টির আর অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়?

পঁয়তাল্লিশ দিন হয়ে গেল উপবাসের। বাবা এলেন দেখা করতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জোরের দিকে এসে নিয়ে গেল। তার পরই বাবাকে সাথে নিয়ে জেলার ঘরে এল। আমি তখন শুয়ে ছিলাম। বাবার চোখে পড়ে, গায়ে কাটাছেঁড়ার দাগ দেখে বাবা হু হু ক'রে কেঁদে উঠলেন।

বললেন, ইঁকেনসন টেলিগ্রাম ক'রে কলকাতায় জানতে বলেছিল, সেক্রেটারিয়েটে দেখা করতে বলল। সেখানে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছে, পথ খরচার টাকা দিয়ে বলেছে, যান, আপনার ছেলেকে নিয়ে আসুন. আর সবাই খেতে শুরু করেছে. আপনার ছেলে দিনদিন কষ্ট পাচ্ছেন।

রাতের বেলায় ষ্টেশনে পৌঁচেছেন। একজন রেল কর্মচারী তাঁকে নিয়ে যান বাঙালীদের একটা মেসে—তাঁরা সেখানে আলোচনা ক'রে—ওখানকার একজন ব্যারিষ্টার নগেন্দ্র নাথ সে—তাঁর ভারটা তুলে দিয়েছেন। তিনি খুব যত্ন করছেন। তিনিই জেল পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, কিন্তু দেখা করার অনুমতি নেই বলে তাঁকে অফিসে বসিয়ে রেখেছে।

জেলার কিছু সময় কাছে দাঁড়িয়ে দেখলো, আমরা বাংলায় কথা বলি, কাছে থেকে কিছু লাভ নেই, আমি তাকে বসতেও বললাম না, তখন বারান্দায় গিয়ে ব'সে রইলো। কিছু সময় বাদে অফিসে চলে গেল।

বাবা কাঁদতে কাঁদতে গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। গায়ের দাগগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মারধোর করে কিনা। আমি বললাম না। যা যা ব'লে সান্ত্বনা দেওয়া চলে, বলতে চেষ্টা করলাম।

সকালে প্রায় বারোটা পর্যন্ত রইলেন। আবার দুটোয় এলেন, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত রইলেন। পরের দিনও ঐরকম। ও দুদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আর খাওয়াবার চেষ্টা করলো না। ঐ কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাদ দিতে পারলে কে আর করে? তা ছাড়া, বাবা ওখানে থাকতে থাকতে গায়ে আর তাজা ঘা-ও হয়তো দেখাতে চায়নি। হয়তো আশা করেছে. এইবারে আমি খাব।

বাবা অনেক ক'রে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। অনেক কাহিনী বললেন। দুঃখ কষ্ট কি, জীবনে কখনও জানেন নাই। এখন অবস্থা ভাঙ্গছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে ভাল দেখতে পান না, চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ে। আমার উপরেই সব আশা ভরসা।

তাঁর তরফ থেকে একই সব কথার পুনরাবৃত্তি, অনুরোধ, অনুনয়, চোখের জল। আমিও শেষ পর্যন্ত একটি কথারই পুনরাবৃত্তি করতে রইলাম। আমরণ উপোষ করব যদি না আমাদের দাবী মেটানো হয়—এই সংকল্প আমরা দেশের নেতৃস্থানীয়দের জানিয়েছি, সেই নেতৃস্থানীয়রা যদি বলেন, তা হ'লেই শুধু খেতে পারি। তাঁদের সবার সঙ্গে বাবার দেখা করা সম্ভব নয়। চার জনের নাম বলে দিলাম—সি আর দাস, মতিলাল ঘোষ, রামানন্দ চাটার্জি ও হীরেন দত্ত। এদের

সৎলোক ব'লে জানতাম, সহানুভূতি ও এদের কাছে পাবেন, জানতাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে ওটেন প্রহারের ব্যাপারে শেষোক্ত দুইজনের মতও জানতাম।

বাবাকে ব'লে দিলাম, এরা যদি খেতে বলেন, টেলিগ্রাম করবেন। আমার নিজের মনে ছিল, এরা তো খেতে বলবেনই, কিন্তু তখনও মন স্থির করবার ভার আমার নিজের। বাবাও বুঝলেন, এটা একটা স্তোকবাক্য মাত্র। দ্বিতীয় দিনে নগেন বাবুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় অফিসে নিয়ে গেল, দুজনে ধ'রে সাহায্য করলো। অফিসে নগেন বাবুর সঙ্গে সেই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার এস. পি. সান্যালও বসে ছিলেন—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইচ্ছা ক'রেই তাঁকে রেখেছিল, আমাদের বাংলা কথা বুঝবার জন্যে, —পাছে গোপন কিছু বলে দিই। গোপন বলবার আমার কি থাকতে পারে, অফিসারদের পক্ষে সে কথা ভাববার নিয়ম নেই।

নগেন বাবুও খাবার জন্যে অনেক অনুরোধ করলেন, বললেন, ভূপেন বোস মশায় তাঁর আত্মীয়। তিনি তাঁকে লিখবেন যেন মণ্টেগুকে সব জানান। আমার কাছে গোপন কথা নগেন বাবু একটা বললেন: আমাদের অনশন নিয়ে বাইরে খুব আন্দোলন হয়েছে, এমন কি, মিসেস্ অ্যানি বেশান্ত তাঁর কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতায় অনশনের উল্লেখ ক'রে ষ্টেট প্রিজনারদের প্রতি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছেন। মিঃ সান্যাল এসব কথায় একটুও বাধা দিলেন না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অনুপস্থিত থাকলে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর জায়গায় কাজ করেন। তিনি আমার সব কথাই জানেন। খেতে অনুরোধ করার ভিতরও আজ তিনি যোগ দিলেন না।

বাবা কলিকাতায় যেয়ে শুধু চারজন নয়, আরও অনেক নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সবার কাছেই সহানুভূতি পেয়েছিলেন, সবাই খেতে অনুরোধ করতে বলেছিলেন। শুধু রামানন্দ বাবু বলেছিলেন, বাইরে থেকে এভাবে অনুরোধ জানান আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না।

বাবার টেলিগ্রাম পেলাম, সবাই তোমায় খেতে বলছেন। তুমি খেয়ে আমায় টেলিগ্রাম করবে।

ততদিনে আমার অবস্থার অন্য রকম পরিণতি শুরু হয়েছে। একাদশ দিন যেদিন হ'ল, সেইদিন রাত থেকে অনিদ্রা শুরু হ'ল। মাঝে মাঝে দু'চার মিনিটের তন্দ্রা ছাড়া ঘুম হ'ত না। বিলাসপুরের প্রচণ্ড শীত, সেলে ঠাণ্ডা আরও বেশী। ওরা গায়ে দেবার জন্য একখানি রেজাই কিনে দিয়েছিল। ঐ অবস্থায় থেকে ওদের কাছে কিছু চাইতে ইচ্ছা হ'ত না। অনিদ্রায় হোক্, শীতে হোক্, দুর্বল ক'রে ফেলছিল। চুয়ান্ন দিনের দিন এক দিনে দু'পাউণ্ড ওজন কমলো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তারকে বললো, শুধু দুধ আর ডিম নয়, কাল থেকে কাফি তৈরী করিয়ে রাখবে। কাফি মানে প্রচুর জলে খুব দিদ্ধ করা। আর তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ rum দেবে। Rum এক রকম মদ।

দুধে, ডিমে. কাফিতে পরিমাণটা সেদিন বেশ ভারি হয়ে পড়লো। কিন্তু খাইয়ে যেমন নশ্য বের করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনা আপনি সবটা বমি হয়ে গেল। চেষ্টা একেবারেই করতে হ'ল না। চেষ্টা করার সুযোগও হ'ল না, হাতপা বাঁধা অবস্থাতে বমি হ'ল। বমির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পিত্তও পড়লো। আজ আর বমি যেন থামতে চাইছে না। হায়রান হয়ে পড়লাম। সেটা শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাঁধন খুলে নিতে বললো। সেদিন আর দুধেলা খাওয়ালো না।

একটু বাদে ডাক্তার ঘুরে এসে বললেন, আমি বেকুফটাকে বলেছিলাম, পরিমাণে এতটা আপনার পেটের বর্তমান অবস্থায় সইবে না; ও আমার কথা শুনলো না।

এখন এত দুর্বল বোধ হ'তে লাগলো যে আর ধস্তাধস্তি করিনে। ডেস্ক চেয়ারে ব'সে থাকি, ওরা নল চালায়, একবেলা অল্প পরিমাণে দুধ খাওয়ায়। কিন্তু যা খাওয়ায় তা-ই বমি হয়ে যায়, বরং পিত্ত নিশে পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এক একবার বমির পর

একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ি।

আর বেড়াতে পারিনে। শুয়ে বসে স্বপ্ন দেখি—একটা ধূমকেতু একটি যেন এক অজানা অকূলপথে আপন গতিবেগে ছুটে চলেছে, গতির বেগে অণুপরমাণু তার পথে পথে ছড়িয়ে প'ড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় চলেছি, কি হবে, ভাবতে পারি-ও না, ভাবতে চাই-ও না।

প্রায় সময় ঘরে খাটে শুয়ে থাকি, কখনও বারান্দায় ডেক চেয়ারে এসে বসি। কোনোগতিকে স্নানের জায়গাটায় একবার যাই। স্নান না ক'রে পারিনে।

অন্যদিকে কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের খেয়াল ছিল। তিনি গতিয়ে বনমানুষের মতো চেহারা হয়েছিল। সুপারিন্টেণ্ডের হুকুমে রোজ বাইরে থেকে একটা নাপিত আসতো। সে তার বাঁশের হাতলওয়ালা ক্ষুর নিয়ে সটাসট ক'রে আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার ধ'রে দাড়ি কামাতো। কিন্তু পয়সা আদায় করতে বেচারির একের পর একটা সমস্ত সকালবেলাটা ধরা দিয়ে থাকতে হত। ওর বারণ সত্ত্বেও একদিন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, এরকম যদি কর তো, আর আমি কামাবনা। সেদিন থেকে গেটের সিপাই-ই নাপিতের পয়সা কড়ায় গণ্ডায় তখন দিয়ে দিত।

এইখানে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, খাদ্যের অভাবে পুষ্টিকর যখন কিছু পাচ্ছেন না, তখন অন্ততঃ মালিশ করতে হবে, রোজ অন্ততঃ একঘণ্টা ক'রে সমস্ত গায়ে আস্তে আস্তে তেল মালিশ ক'রে দেবে।

আমায় জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কি তেল মাখতে চান?"

"সরষের তেল।"

"সরষের তেল এখানে বড় গরম হবে।" ডাক্তারকে বলে, "আর্ধেক সরষের আর্ধেক তিলের তেল মিশিয়ে কয়েদিটিকে দিয়ে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধ'রে মালিশ করাবেন।"

তাই চললো। কিন্তু দুর্বলতাও আর কাটলো না, শরীর ভাল হল না।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে বলেন, "অমরাবতীতে নিঃ সেন এখনও উপোস করছেন। বাঙালীরা বলছেন, তাঁরা সব জায়গা থেকে খবর নিয়েছেন, আর সবাই খেতে শুরু করেছেন। আপনাকে তাঁরা খেতে বলছেন।"

জেলের সিপাই কয়েদি, আমার ঘর দেখা যায়, এমন জায়গা দিয়ে যে যায়, সেই দূর থেকে প্রণাম করে। একটি কয়েদির কালাপাগড়ি ছিল—জেলের মাঝখানে সব দিকের ইয়ার্ডে ঢুকবার গেট সে খোলে, বন্ধ করে—নাম শেখ গটু। আমি একদিন দুপুরে বারান্দায় ডেক চেয়ারে ব'সে আছি। তখন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, জমাদার কারও ভিতরে আসবার সম্ভাবনা নেই। সে চাবি এক সিপাইর হাতে দিয়ে ছুটে আমার কাছে এল। আমার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বলতে লাগলো, "দাদা, তুমি খাও।"

আমি পা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মাথাটা বুকের ভিতর টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, "সে হয় না।"

তার সে পাগলের মতো কান্না কিছুতে বুঝানো যায় না।

সে সুবিধা পেলে প্রায় রোজই আসে, আমায় দাদা ব'লে ডাকে, আর ঐরকম কাঁদে। ছেলে মানুষ, অত্যন্ত গরীব, লেখাপড়া খুব সামান্য জানে। চেহারায় সৌন্দর্য নেই, কিন্তু এই যে দরদভরা মনটা, তার ছাপ মুখে মাখানো। সামান্য অপরাধ—তারই জন্য জেল দিয়েছে এক বছরের। ওর সাথে আলাপে মনটা তৃপ্তিতে ভ'রে যায়।

জেলারের এক ভাগ্নে তার বাড়ীতে থেকে পড়ে। স্কুলের বাঙালী ছেলেরা ধরেছে, আমার সাথে দেখা করিয়ে দিতে হবে। দুপুর বেলায় এক এক দিন তিন চার জন ক'রে নিয়ে আসে। গেটের সিপাইও বাধা দেয় না, শেখ গটুতো দেয়ই না। অনেকের সাথে একে একে আলাপ হয়। ওরা বলে, আমার অবস্থা দুচার দিন পর পরই অমৃতবাজার পত্রিকায় বের হয়। ওখানকার বাঙালীরা পাঠান।

(১৬৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জি

(পূর্বানুবৃত্তি)

মানুষের দুরকম মন। এক রকম মন এই খাঁচের গতানুগতিক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকছিল। তাদের সংখ্যা যথেষ্ট। আর এক রকম মন আগামীর আগমন-ধ্বনি মনের কানে শুনছিল। "শুনি মহা ছুটি আওরণ কি আওয়াজ।" তাদের সংখ্যা কম। স্বপ্ন দেখছিল; তাতে বিভোর থাকছিল। জেগে ঘুমিয়ে সব সময় প্রত্যাদিষ্টের মত শুনছিল—সে আসবে, আবার আসবে। সেদিন জগৎ স্তম্ভিত হবে, মুগ্ধ হবে, ধন্য হবে ভারতের মুক্ত আত্মার অভয় বাণীর নির্ঘোষে। এখনও কোথাও কিছু নেই। আকাশে নব সৃষ্টির কোন সূচনাই নেই। কোথায় কোন সুদূর সাগরের বুক থেকে উপাদান চুরি করে ভবিষ্যৎ মেঘের সঞ্চয় সংগ্রহ করছিল সহস্র-কর! কে জানত মেঘের অন্তরের ধন গোপনে গোপনে চাইছিল চাতককে? চাঁদ খুঁজে বেড়াচ্ছিল চকোরকে? ভারতকে দরকার হচ্ছিল বিশ্বের সম্মেলনে। সেই হয়ে আসছিল ভারতের সেই শ্রান্ত দিনের যখন কাল-রাত্রির গাঢ় আলিঙ্গনে নিজেকে সে এলিয়ে দিয়েছিল। আজ একথা কইলে ত আর চলবে না যে আমাদের ফুটে ওঠার শক্তিকে আমরা শুকিয়ে মেরেছি, তার অস্তিত্ব মুছে দিয়েছি, পা'য়ে দলেছি, আবর্জনা-স্তূপে তাকে ঢেকে ফেলেছি? পাঁচজনে হয়ত বলবে এ নিছক স্বপ্ন, বাজে স্বপ্ন, স্বকপোল-কল্পিত স্বপ্ন। এসব কথায় কি যায় আসে? যারা জন্মায় খালি মরতে, মরে কবরের প্রেতাত্মা হ'তে, শ্মশানের ছাই হ'তে, তারা ত এরকমটা বলবেই। তাদের কণ্ঠে অন্য বুলি নাই, জোগায় না। তাদের মন তাদের। কিন্তু যারা মরে বাঁচতে, অনন্ত জীবন অফুরন্তভাবে লাভ করতে, তাদের চিন্তা-ধারাটাও কি এই রকমের হবে? তারা উঠতে বসতে, কর্মে, বিশ্রামে সব সময়ে বলবে, সব অবস্থায় ধিক্কার দেবে—"স্বপ্ন যা এখনও সিদ্ধ হয় নি তার জন্য দুঃখিত হও। এ অবধি জীবন বৃথাই গেছে। জগৎ যে উন্মুখ হয়ে তোমার দিকে চেয়ে আছে। তোমায় চায়—তোমার সেবা, তোমার শক্তি, তোমার আত্ম-নিয়োগ।" খটকা যদি কখনও জাগে যে, সে শুভদিন, সে সুখের তিথি, সে মহেন্দ্রক্ষণ কি করে জানা যাবে, নিজের কাছেই ত উত্তর পাবে,—মানুষের ভবিষ্যতে আস্থা, মানুষে বিশ্বাস, আদর্শে নির্ভর, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা, বাঁচার মত বাঁচবার জীবনে ব্যগ্রতা, সে পথের পথিকের পরমবিত্ত, মহার্ঘ পাথেয়—একমাত্র পাথেয়। যেদিন সে আগন্তুকের আসার পথের কাঁটা বুক দিয়ে নিটিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় এক লহমাও মিছে কাটে আর সে অপরাধবোধ পলকে প্রলয় জাগিয়ে তোলে, বুকে ছুরি বেঁধে, সেদিন জানবে পথভ্রষ্ট হওনি। ছুরি ধারালো; এ অনুশোচনা আরও তেজালো। সে পরমার্থলাভে নির্ভীকতা একমাত্র সম্বল।

মানব মনের পরতে পরতে বাদ, প্রতিবাদ, সম্বাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। তাই মানুষের জগৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই, অবিরাম এগিয়ে চলেছে। সম্বাদের সঙ্গে বিসম্বাদ লেগে আবার নতুন বাদের সৃষ্টি। আবারও ঐ প্রক্রিয়াগুলি ঘুরে ফিরে ঘটে।

দিগন্তে এক জায়গায় একটুখানি রং পাল্টেছে। ছুটকো মনের হরিণ ঐ মরীচিকার সবুজ ক্ষেতে। তার হারান সুরটি হয়ত এ অন্তহীনে সে পেয়ে যেতে পারে। এমনি প্রতিবিম্বিত মুকুর ছিল যাঁদের মন তাঁরা হঠাৎ ভবিতব্যতার অন্ধকার গর্ভ হ'তে একে একে দেখা দিতে লাগলেন। এলেন বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, এলেন আবুল কালাম আজাদ, এলেন তিলক, এলেন গান্ধী। সহসা বিশ্ব দেখল "তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর, দামিনী ঘন চমকায়।" নব সৃজনীর কাজ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে। এর অগ্রগতিকে বাধা দেয় এমন কোন শক্তি জগতে জন্মগ্রহণ করে নাই। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা অসাধারণ প্রতিভা ও মনীষায় নিজ নিজ বিভাগে এক একজন অপরাজেয় দিকপালরূপে ভারতের ভাগ্যপটে দেখা দিয়েছেন। শুধু এইটাতেই এরা বড় থাকতে পারতেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় হয়েছেন দেশপ্রেমী ও মানবপ্রেমী বলে। নিজেরা বড়

হয়ে দেশকে বড় করেছেন। অস্পৃশ্যকে সমাজে ফিরিয়ে দিতে করিয়েছেন। এঁরা দেশকে হৃদয়ের করেছিলেন বলে এঁদের মাথার মণি করেছে। ভারতকে দেশ বিদেশে এঁরা বড় করেছেন। জগতের মানচিত্রে স্থাপন করে দিয়েছেন।

একজন সঞ্জীবনী-বাণী প্রচারক বুদ্ধের অন্তরালে কত কত নীরব বুদ্ধ ছিলেন। লোকলোচনের আড়ালের তাঁদের খবর ক'জন পেল? এখানেও তার প্রভাবায় হয়নি, হতে পারে না। বিভিন্ন স্থানে প্রযুক্ত ক্ষুদ্র শক্তির সমবায়ে এক বিরাট বা বিশাল শক্তির উদ্ভব হয়। জড় জগতেও হয়; মহাপুরুষদের আবির্ভাবের এই নিয়ম। যে অজ্ঞাত বীরেরা এঁদের এনেছেন তাঁরাও আমাদের নমস্য।

বিবেকানন্দ এলেন যেন "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।" ধর্মের নামে নিষ্ক্রিয়তার বড়াই তিনি দিলেন একদম ভেঙ্গে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে দয়া করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" তাঁর ভিতর ছিল ওঁপ্রত অনুভূতি, হিমালয় পরাজয়কারী কল্পনার বৈভব, বহু পূর্বাহ্নে আগন্তুকের দর্শনলাভ শক্তি, কবিচিত্ত, সর্বোপরি ত্যাগ ও বীর্য। দেশের দুর্দশা, সমাজের পচন রোগ, মনুষ্যত্বের দুরপনেয় অবমাননা, পরাধীনতার হীনতা তাঁর অন্তঃসত্তাকে যে ভাবে নাড়া দিয়েছিল তেমন হয়ত খুব কম লোককেই দিয়ে থাকবে। তিনি ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী কিম্বা আদর্শ সম-সমাজ-বাদী, এ বিচার করা দুষ্কর। তাঁর প্রাণের ব্যথা তাদের জন্য বেশী নয় কি যারা দুষ্ট, দুর্গত, দরিদ্র, পিষ্ট, লঞ্ছিত, ন্যায় অধিকারের বাইরে অচ্ছুৎ ক'রে রক্ষিত? অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা-সমস্যার সমাধান আগে রাখতেন, তারপর ধর্ম। তিনি নিজে রাজনীতি করেন নাই। কিন্তু রাজনীতির আত্ম-দান মূলক আন্দোলনকে গোড়ার দিকটায় তিনি চেয়েছিলেন। কৃষি-প্রধান সভ্যতা থেকে শিল্প-প্রধান সভ্যতায় যে সংঘর্ষের পথ মাড়িয়ে যেতে হয় তার প্রথমটা হয় ধর্মাবৃত রাষ্ট্রনীতি, শেষের দিকে ছুটে ওঠে সমাজ ও অর্থনৈতিক রঙ্গে-রঙ্গিত রাজনীতি। বিবেকানন্দের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে ছিল। গান্ধীজী বলেন, তাঁরও জীবনে স্বামীজীর প্রভাব পড়েছিল।

জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র এ যুগে সর্বপ্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক। তাঁদের স্বাধ্যায়, গবেষণা, আবিষ্কার—বিদেশীদের মনে প্রথম রেখাপাত করল যে তন্ত্রমন্ত্র ও কু-সংস্কার সমাচ্ছন্ন ভারতীয় মগজে বিজ্ঞানের প্রতিভা ফুটতে পারে। এটাও তারা অসম্ভব বলে ধ'রে রেখেছিল। এঁরা শুধু এইদিক দিয়ে আমাদের কাছে বড় নন। সবচেয়ে দামী হচ্ছে সেই দিকটা যাতে তাঁরা ভারতকে নিজেদের ব্যক্তিগত অভ্যুদয়ে ভোলেন নাই। "পোষ্যপুত্র" হয়ে যান নাই। "গোত্রান্তরে"র মোহিনী শক্তিকে কাটিয়ে বহু উচ্চে উঠতে পেরেছিলেন। যখনই পেরেছেন মান, অমনি বলেছেন "আমাদের পূর্ব পুরুষদের যা জানা ছিল তা বর্তমানের মত করে বুধ মণ্ডলীকে উপহার দিয়েছি।" নিজেদের কৃতিত্বের মাদকতায় দেশকে ভোলেন নাই। জগদীশচন্দ্র তাঁর বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে যে সব পত্র লিখতেন তার প্রতিটি ছত্র দিয়ে তাঁর দেশপ্রেম ফুটে বেরুত।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন অতি অসাধারণ। বিজ্ঞান বিভাগ ছাড়া শিল্প-প্রতিষ্ঠায় তিনি বাংলা দেশে অগ্রণী। যে আসছে সেই শিল্প সভ্যতার অসামান্য আগমন ধ্বনি নির্ভুলে তিনি মনের মাঝে কত আগে ধরতে পেরেছিলেন, এবং তার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার নিরোধ করার জন্য তিনি যা করেছেন তার তুলনা হয়না। সংকট-ভয়-দুঃখ-ত্রাতার অবতার-কল্প আচার্যদেব রাজনীতির সংসারেও কম প্রভাব বিস্তার করেন নাই। রাজনীতি থেকে দূরে থেকে তিনি কিছু অন্যায় করেন নাই। যেখানে যা সাজে সেখানে সেই রত্ন থাকা ভাল। বাংলার বিপ্লবী রাজনীতিকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও অর্থসাহায্যের কথা কয়জন জানে?

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ বহুদিক দিয়ে। যেমন কবি,

তেমনি স্রষ্টা, কতকিছুর স্রষ্টা। বিশ্ব-জয়ী বিশ্ব-মানব। দেশ কত ঋণ নিয়ে তাঁর কাছে শুধী তার খতিয়ান শেষ হ'তে বহু বছর লাগবে। আমেরিকা থেকে বহু লোক ভারত দর্শনে আসত। গ্রন্থকার নিজের কানে, কয়েকটি মার্কিনবাসীর মুখে শুনেছে, তাদের পরিক্রমা সূচীর তালিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকত, টেগোর, তাজ, গান্ধী। এই তিনটি দেখলেই তারা মনে করত ভারত দেখা শেষ হয়েছে। বলা দরকার এখানে কারো জীবনের তুলনামূলক আলোচনা হচ্ছে না বা কারো পুরা জীবনীর আলেখ্য দেখান হচ্ছে না। শুধু যাঁরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছেন এবং অসাধারণ দেশ সেবী ও স্বাধীনতার অগ্রদূত, প্রয়োজন বোধে তাঁদের কয়েক-জনের জীবনীর সংক্ষেপ বর্ণনা দেওয়া হল। বিশেষ কারণ হচ্ছে যে এঁদের জীবনে জীবন লাভ করে দেশ আত্মশক্তি ফিরে পেয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঘটনার কুটজালে আলোক সম্পাত করবে। তাই উল্লেখ এভাবে করা হল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জগতের মুসলমান সমাজে বহু পূর্ব হতেই সমাদৃত ও সুপরিচিত। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতার আভ্যন্তরীন সংঘর্ষের মর্মকথা অল্পবয়সেই ধরতে পেরে ছিলেন। ধর্মান্ধতার স্ব-সম্প্রদায়ের কাছে তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত দেশপ্রেমিকের ন্যায় আপন গন্তব্যপথে চলেছেন। কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই।

তিলক সাধনা, ত্যাগ ও ক্লেশের পথে স্বরাজ সাধনা নিয়ে যান। তাঁকে প্রকৃত রাষ্ট্রপিতা বলা যায়। তিনি বহু পূর্বে ধরতে পেরেছিলেন এই পথেই প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে। এ ছাড়া পথ নেই। তিনিও আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিলেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও মেধায় তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুসন্ধান ও অঙ্কশাস্ত্রের গবেষণায় বই লেখাতে প্রচুর যশস্বী হয়েছিলেন। বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে তিনি সমাদৃত হয়েছিলেন।

সত্য ও অহিংসার অবতার গান্ধীজী জগতে একটা নতুন যুগ উন্নততর সভ্যতা আনার স্বপ্নে ভরপুর। নিজ জীবদ্দশায় তিনি যা পূজো পেয়ে গেলেন তেমনটি আর কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে ঘটে নি। ভবিষ্যতে এঁর সম্মান, শ্রদ্ধা আরও বাড়বে বই কমবে না। এঁরা মনু-স্রষ্টা ঋষি। এঁদের মনে মনু এল কেন, তার মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ পারিপার্শ্বিক যোগায়।

ইন্দোনেশিয়া

শ্রীঅশোক চন্দ্র গুহ

সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়া নামটা আমাদের খুব পরিচিত হ'য়ে উঠেছে। বিশেষ ক'রে ভারতবাসীদের কৌতূহল একটু বেশী হবার কারণ এই যে ভারতবর্ষেরই প্রধান মন্ত্রী এই সেদিন ভারতের রাজধানীতে ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার নিয়ে এক এশিয়ান সম্মেলন করলেন, তাছাড়া ওলন্দাজদের 'পুলিশী তৎপরতার' সময় কিছুদিন আগে ভারতীয় বৈমানিক পট্টনায়কের ব্যাপার নিয়েও ভারত-বাসীদের ভেতরে কিছুটা চাঞ্চল্য এসেছিল।

'ইন্দোনেশিয়া'—এই নামটাও যেন 'ইণ্ডিয়া' কথাটির সঙ্গে একটু সাদৃশ্যজনক। সুদীর্ঘকাল বৃটীশ শাসনাধীনে থেকে, সাম্রাজ্যবাদীদের যত প্রকার কূটচক্র হওয়া সম্ভব ভারতবাসী প্রায় তার সবগুলির সঙ্গেই ইতিমধ্যে পরিচিত হ'য়ে গেছে। ইন্দোনেশিয়ার জনগণের সংস্রবে তাই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপটি চিনে নিতে ভারতের মোটেই দেরী হয় নি।

নামের পরিচয়

যে ইন্দোনেশিয়া নামটি আমাদের এত পরিচিত, নামটির বয়স কিন্তু খুব বেশী নয়। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারতমহাসাগরকে পৃথক ক'রে রেখেছে যে প্রায় হাজার তিনেক দ্বীপমালা,—সেই দ্বীপপুঞ্জকেই এককথায় বলা হ'য়ে থাকে 'ইন্দোনেশিয়া'। ওলন্দাজরা প্রায় সাড়ে

তিনশ' বছর ধ'রে এই দ্বীপগুলিকে শাসন ক'রে আছে। পৃথিবীর মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যের পক্ষে পরম উপযোগী তিনটি বৃহৎ জলপথ হ'চ্ছে—(১) ক্যারিবিয়ান (Caribian) বা পানামা খাল, (২) মেডিটারেনিয়ান (সুয়েজখাল) এবং (৩) মালাক্কা (Malacca Straites)। এদের ভেতরে শেষেরটির উপরে আধিপত্য ক'রে থাকে ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি বড় বড় দ্বীপ; এবং এই দ্বীপগুলি এমনি ভাবে অবস্থিত যে এগুলি উক্ত সমুদ্রপথের জাহাজ চলাচল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তাছাড়া এই দ্বীপগুলির উর্বর ভূমি থেকে পৃথিবীর সমস্ত শিল্পপ্রধান দেশগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামালের একটা মোটা অংশের সরবরাহ হ'য়ে থাকে। সুতরাং ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় যা হ'য়ে থাকে, তাই হয়েছে। ওলন্দাজরা এদেশের জনসাধারণকে অজ্ঞ রেখে এই দ্বীপগুলিকে কেবল কাঁচামাল রপ্তানীর ঘাঁটী ও জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উপযোগী ক'রে উন্নয়ন করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে—১৯০৯ থেকে ১৯২৯ সালে যখন জাভার রপ্তানীর বিশগুণ বৃদ্ধি ঘটেছিল, তখন সারা দ্বীপটি জুড়ে রাজনৈতিক বিক্ষোভ টগ্‌বগ্‌ করছিল।

ওলন্দাজদের অধীন দ্বীপগুলি এতদিন 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ' বলে পরিচিত হ'য়ে এসেছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া নামটাও একেবারে নতুন নয়। প্রায় সত্তর বছর ধ'রে বৈজ্ঞানিকগণ এশিয়াবাসীদের ভেতরে একটা বিশিষ্ট দল বা একটা ভাষাগোষ্ঠির লোকদের পরিচয় দিতে এই নামটি ব্যবহার ক'রে এসেছেন। কিন্তু মাত্র ১৯৪৮ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর নেদারল্যাণ্ডস্ গঠনতন্ত্রের এক সংশোধন ক'রে সরকারী নাম 'নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিজের' পরিবর্তে 'ইন্দোনেশিয়া' নামটিকে সরকারী ভাবে স্বীকার করা হয়। আগেকার নামের তুলনায় এই নতুন নামটি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে অল্পদিনের ভেতরেই খুব প্রিয় হ'য়ে ওঠে। ইণ্ডিজ কথাটির মধ্যে যে একটা বহুত্বের আভাস আছে, সেই জিনিষটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই নামটির ভেতরে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের মাতৃভূমির বহু আকাঙ্খিত সংহতির আদর্শটিকে যেন রূপ দিলেন। তাছাড়া নূতন নামটির ভেতরে 'ডাচ' —এই কথাটির কোন অস্তিত্ব না থাকায় স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের মন খুশী হয়ে উঠল।

ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ

সাড়ে তিনশ' বছর ধ'রে এই দ্বীপগুলোর উপরে আধিপত্য ক'রে ওলন্দাজরা এগুলির কতটা উন্নতি করেছে, তার একটা চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন—"The struggle for Indonesian Independence" গ্রন্থের রচয়িতা মিঃ উবানী (Mr. Ubani)। তিনি বলেছেন—"ইন্দোনেশিয়াকে কেবল কাঁচামাল রপ্তানী ও অল্প মজুরীর শ্রমিক সরবরাহের ঘাঁটি হিসেবে গণ্য করা হ'ত। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে যখন ওলন্দাজ ধনপতিরা ইন্দোনেশিয়া থেকে বছরে পচাত্তর কোটি টাকা ক'রে লাভ করত, ইন্দোনেশীয়রা তখন দৈনিক মাত্র ছয় পয়সা আয়ের উপরে জীবন ধারণ করত। সাড়ে তিনশ' বছরের ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা সে দেশের লোকের মধ্যে শতকরা মাত্র ছয় জনকে শিক্ষিত করেছে, সাত কোটি লোকের জন্যে মাত্র ৭০০ ডাক্তার তৈরী করেছে, শিল্পের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র উন্নয়ন করেনি আর সবশেষে এক গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠনের পথে ত' কিছু মাত্রই এগোয় নি।"*

ইন্দোনেশিয়ার উপরে ভারতের প্রভাব

ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম, রাজনীতি, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, সাহিত্য ও শিল্পকলা—সকল কিছুরই উপরে ভারতের প্রভাব অনস্বীকার্য। ইন্দোনেশীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ Sir Richard Winstedt মালয় অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর ভারতবর্ষের এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন। প্রধানতঃ ভারতীয় অধিপ্রবাসীদের (imigrants) মারফৎ ইন্দোনেশীয়রা হিন্দু, বৌদ্ধ ও

* "The Indonesian question reviewed" রচনাটি থেকে গৃহীত। বোম্বে থেকে প্রকাশিত "United Asia"র ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর সংখ্যায় রচনাটি প্রকাশিত হয়।

মোসলেম সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে তাদের প্রত্যেকের দ্বারাই কিছু কিছু প্রভাবান্বিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার শতকরা নব্বুইজন লোকই মুসলমান, তথাপি তাদের বাইরেকার মুসলমান সংস্কৃতির অন্তরালে যে মোসলেম-পূর্ব সভ্যতার একটা সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে সেটা লক্ষ্য করা যায়। †

ওলন্দাজ শাসন ব্যবস্থার প্রতি বিরক্তিই কেবলমাত্র এঁদের জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানের একমাত্র কারণ নয়; তার চাইতে বড় কারণ হচ্ছে ইন্দোনেশীয়দের ভেতরে নিজেদের জন্মভূমিকে একটি একক দেশ বলে ধারণা করার একটা ক্রমবর্দ্ধমান চেতনা। আজকের এই জাতীয়তাবাদের পেছনে যে একটা সুপ্রাচীন পরিপ্রেক্ষিত রয়েছে, তা'তে ভারতবর্ষের দান কম নয়।

বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার অভ্যুদয়

ওলন্দাজ শাসনব্যবস্থায় দেশের লোকের সামান্য যোগ ছিল কেবল 'Volksraad'এর সঙ্গে। এই Volksraad ছিল কেবলমাত্র একটা পরামর্শ দেওয়ার প্রতিষ্ঠান, শাসনব্যবস্থায় সত্যিকার হাত এর কিছু ছিল না। ১৯২৮ সনে পুনর্গঠনের সময়ে এর হাতে সীমাবদ্ধ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয় ও সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয় ৬০ জন। কিন্তু মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, এই ৬০ জনের ভেতরে অর্ধেক, অর্থাৎ ৩০ জনই হ'ল ইউরোপীয়; অথচ এই অর্ধেক সভ্য যাদের প্রতিনিধিত্ব ক'রে থাকে সেই ইউরোপী অধিবাসীদের সংখ্যা হ'ল শতকরা মাত্র ০·৪ জন। আর শতকরা ৯৯·৪ জন ইন্দোনেশীয়ের জন্যেও মাত্র ৩০ জন প্রতিনিধি। এই ৬০ জন সভ্যের আবার ২২ জনই মনোনীত সভ্য!

কিন্তু ১৯৪২ সনে জাপানীরা যখন অতি সহজে প্রায় বিনা বাধায়ই এই দ্বীপগুলো দখল করে নেয় আর খোদ হল্যাণ্ড দেশটা যখন জার্মানদের অধীনে, তখন ইংলণ্ডে অবস্থিত পদীবিহীন গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে রাণী উইলহেলমিনা ১৯৪২ সনের ৬ই ডিসেম্বর এক বেতার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে রুজভেল্ট-চার্চিল পরিকল্পিত আটলান্টিক চার্টারের ৩নং ধারাটি (পরাধীন দেশের স্বাধীনতা বিধানের ধারা) ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে। এই ঘোষণায় এবং তারই স্বরূপস্বরূপ দু'বছর পরে ১৯৪৮ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় রাণী এক 'ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান কমনওয়েলথ' সৃষ্টির প্রস্তাব করেছেন।

যুদ্ধের শেষে যখন ওলন্দাজদের মিত্রশক্তিরা যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এই দ্বীপগুলোতে আবার তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দিল, তখন কিন্তু আর আগেকার সে 'ডাচ ইণ্ডিজ' নেই। প্রায় সাড়ে তিন বছরের জাপ কর্তৃত্বের সময় সোয়েকার্নো পরিচালিত ন্যাশনালিষ্ট পার্টি জাপানীদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে ইন্দোনেশিয়ান গভর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে (যেগুলো আগে শুধু ওলন্দাজরাই ছিল,) ইন্দোনেশিয়দের ঢুকিয়েছেন। ১৯৪৪ সনে ন্যাশনালিষ্ট পার্টির নেতারা জাপানীদের কাছ থেকে তাদের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। তারপর থেকেই একটা প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সব উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল। জাপানীরা যে এতে বাধা না দিয়েছে তা নয়। নির্বিচারে তারা বহু লোককে হত্যা ক'রে বা বন্দী ক'রে এই আন্দোলনকে দমন করবার প্রয়াস পেয়েছে, কিন্তু সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ সনের আগষ্ট মাসে একুশ জন সভ্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা বিধানের জন্যে একটা প্রস্তুতি কমিটি (Preparatory Committee) গঠন করা হ'ল। এর কিছুদিন বাদেই এই প্রস্তুতি কমিটি সোয়েকার্নোকে ও হাতাকে যথাক্রমে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতি বলে ঘোষণা করেন ও সেই সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সুমাত্রা, জাভা ও মাদুরা—এই তিনটি দ্বীপেতে মাত্র প্রজাতন্ত্রের কাজ সুরু হয়। যুদ্ধের পরে ওলন্দাজরা ফিরে এসে এই দ্বীপগুলোতে এক নতুন গভর্ণমেণ্টের

† "Indian Influence in the Malay world," The Journal of the Royal Asiatic Society. 1944, P—186.

হীন হয়। যাবার সময় জাপানীরা ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীদের হাতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গিয়েছিল। তাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ওলন্দাজদের প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতার প্রজাতন্ত্রীদের অভাব ছিল না।

লিঙজাতি ও রেণভিল চুক্তি

কিছু দিন টানা-হেচড়ার পরে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সনের ২৫শে মার্চ পশ্চিম জাভার লিঙজাতি (Lingdjati) নামক পার্বত্য প্রদেশে বসে ইন্দোনেশীয় ও ওলন্দাজদের মধ্যে একটা চুক্তি হ'ল। এই চুক্তির ১নং ধারায় জাভা, মাদুরা ও সুমাত্রাতে প্রজাতন্ত্রীদের 'defacto' গভর্ণমেণ্ট বলে স্বীকার করা হয়। ২নং ধারায় বর্ণিত প্রজাতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত ফেডারাল গভর্ণমেণ্টের একটা অঙ্গ হবে এই প্রজাতন্ত্র। এই যুক্ত রাজ্য আবার নিজে নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্যের সঙ্গে একত্রে একটা ইউনিয়ন গঠন করবে,—যাতে থাকবে একদিকে নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্য ও অন্য দিকে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র (United States of Indonesia) [৬নং ধারা]। দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকবে সমান অংশীদারিত্বের।

কিন্তু কাগজে কলমে চুক্তি হ'ল বটে, সে চুক্তিকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হ'লে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণ শুভেচ্ছা ও প্রীতির সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, তা না থাকায় চুক্তির বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে দুই পক্ষের ভিতরে মতান্তর ও মনান্তর হতে দেরী হল না। ইন্দোনেশীয়রা অভিযোগ করতে লাগলেন যে চুক্তির ৪নং ধারা অনুযায়ী ওলন্দাজরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ কমানোর কাজে মোটেই এগোয় নি। তাছাড়া গোপনে এক তরফা উদ্যোগে ওলন্দাজরা নিত্যনূতন ছোট ছোট রাজ্য সৃষ্টি ক'রে চুক্তির ১নং ও ২নং ধারার লঙ্ঘন করেছে। এই মনান্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশীয়দের বিরুদ্ধে 'পুলিশী কার্যতা' সুরু করল ও ইন্দোনেশীয়রা তার উত্তর দিলেন গেরিলা যুদ্ধে।

তখন ভারত ও অষ্ট্রেলিয়ার যুক্ত নালিশ উঠল নিরাপত্তা পরিষদে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির আদেশ দেওয়া হ'ল এবং ১৯৪৮ সনের ১৭ই জানুয়ারী আমেরিকার 'রেণভিল' নামক জাহাজে বসে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত শুভেচ্ছা কমিটীর তত্ত্বাবধানে দুইপক্ষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটা চুক্তি হ'ল।

'রেণভিল চুক্তি'তে আছে—(১) ইন্দোনেশীয় জনগণের স্বাধীনতা, (২) নেদারল্যাণ্ডস্ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সহযোগিতা, (৩) গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটা স্বাধীন ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট গঠন ও (৪) নেদারল্যাণ্ডের রাজার অধীনে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্যের অন্যান্য অংশের মধ্যে একটা ইউনিয়ন গঠন।

এই চুক্তিকে কার্যকরী করার জন্য দুইটি কার্যকরী পন্থার নির্দেশ দেওয়া হল, (১) আইনানুমোদিত উপায়ে প্রস্তাবিত ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠন না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থায়ী ফেডারাল গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হোক; (২) জাভা, মাদুরা ও সুমাত্রার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীরা ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রে থাকবে কিনা তা জানবার জন্যে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হোক।

চুক্তির গলদ

কিন্তু এই চুক্তিরও মেয়াদ দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। উভয় চুক্তিই সাময়িকভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করলেও চুক্তিগুলির যে কতকগুলি মারাত্মক গলদ ছিল তা'-ই এগুলিকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করল। ওলন্দাজরা দাবী করল যে ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট নবগঠিত ফেডারাল গভর্ণমেণ্টের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ করবে। কিন্তু ইন্দোনেশীয়রা এতে রাজী হ'তে পারে না।

ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের বাইরেকার যেসব অঞ্চলকে চুক্তি অনুসারে ক্রমশঃ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার কথা, সে অঞ্চলগুলির নাম হচ্ছে 'ম্যালিনো' অঞ্চল (malino area). রেণভিল চুক্তির পর থেকেই ওলন্দাজরা এই 'ম্যালিনো' অঞ্চলে সামান্য পরিমাণ স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা দিয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট রাষ্ট্রের পত্তন করাতে লাগল। বর্তমানে এরকম ছোট ছোট প্রায় তেরটি রাষ্ট্র রয়েছে। ভবিষ্যতে ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রে এদের ঢুকিয়ে

সেই যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান প্রজাতন্ত্রীদের প্রভাব খর্ব করবার উদ্দেশ্য নিয়েই ডাচ্‌রা এগুলির পত্তন ক'রিয়েছে এবং মাঝে মাঝেই তারা এইসব ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলি থেকে বিভিন্ন তাঁবেদার প্রতিনিধিদের এনে এক একটা সম্মেলন করাচ্ছে। অনুরূপ সব ব্যাপারে লিঙ্গজাতি চুক্তির ১নং ও ২নং ধারা অনুযায়ী দুই দলের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলা থাকলেও ডাচ্‌দের এই সব ছোট ছোট রাষ্ট্র পত্তনে যে একতরফা উদ্যোগের পরিচয় পাওয়া গেছে, ইন্দোনেশীয়দের মতে তার ফলে চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে।

এছাড়া ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্যের যে সমান অংশীদারিত্বে ইউনিয়ন গঠনের কথা বলা হয়েছে তার প্রকৃত স্বরূপটি অর্থাৎ ইউনিয়নের দুইটি অংশের মধ্যে সম্পর্কটি কি রকম হবে, চুক্তির কোথাও সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা নেই। ফলে ইন্দোনেশীয়রা আশঙ্কা করেন যে নেদারল্যাণ্ডের রাজা হয়ত ভবিষ্যতে তাদের যুক্তরাষ্ট্রের উপরে একটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। ইউনিয়নের পরিকল্পিত আসল রূপটি হচ্ছে যেমনটা বৃটীশ (বর্তমানে বৃটীশ কথাটি লুপ্ত) কমন্‌ওয়েল্‌থ্। বিভিন্ন অংশীদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমান ক্ষমতার বণ্টন ও কতকটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতার ভিত্তিতেই কমনওয়েলথের গঠন হয়ে থাকে। কিন্তু ওলন্দাজদের কাছে এ অভিজ্ঞতা একেবারে নতুন। ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্যের ইউনিয়ন গঠন করতে হ'লে উভয় পক্ষের মধ্যে যে পরিমাণ সদ্ভাব থাকা প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় তা নেই। প্রজাতন্ত্রীদের সঙ্গে ইউনিয়ন গঠন করতে হ'লে তাই ওলন্দাজদের আগে তাদের হৃদয় জয় করতে হবে।

কিন্তু তা হয়নি। রেনভিল চুক্তিও বেশীদিন টিকল না। আবার একবার ওলন্দাজদের 'পুলিশী তৎপরতা' সুরু হ'ল। এবারে প্রজাতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের হেড কোয়ার্টার ওলন্দাজরা দখল করল ও প্রজাতন্ত্রী নেতাদের বন্দী করল। শেষ পর্যন্ত এবারেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রয়াসে যুদ্ধ বিরতি ঘটল। প্রজাতন্ত্রী নেতারা মুক্তি পেলেন। জাভা, সুমাত্রা ও মাদুরাতে প্রজাতন্ত্রীদের সার্বভৌমত্বও এই চুক্তিতে স্বীকার ক'রে নেওয়া হল। এই সর্বশেষ চুক্তির ফলে ইন্দোনেশীয়ার ডাচ-রাজ প্রতিনিধি ডাঃ বিল পদত্যাগ করলেন। তাঁর মতে এই সর্বশেষ চুক্তি নাকি ওলন্দাজদের পক্ষে নিতান্তই অপমানজনক। ক্ষুদ্র নেদারল্যাণ্ডস্ রাজ্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিকাংশের সিদ্ধান্তকে অমর্যাদা করার সাহস পেতে পারে না, তাই ডাঃ বিলের পদত্যাগ সত্ত্বেও শান্তি-চুক্তি অনুযায়ী ইন্দোনেশীয়ার ভবিষ্যৎ শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্থিরিকরণের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই সেদিন খবর পাওয়া গেল যে ওলন্দাজরা জোগজাকার্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তবুও গত কয়েকবারের 'পুলিশী তৎপরতা'র (Poli Action) ফলে ওলন্দাজরাই লাভবান হয়েছে। যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পরে প্রতিবারেই দুপক্ষের দখলের অঞ্চল-গুলির Status Quo বজায় থেকেছে। এমনি করে প্রজাতন্ত্রীরা আজ তাদের সীমানার অনেকখানি হারিয়েছে। কিন্তু নবজাগ্রত ইন্দোনেশীয় শক্তিশালী জনমত কখনই এ ব্যবস্থাকে মেনে নেবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যদি শান্তিস্থাপন প্রচেষ্টায় ন্যায্য ব্যবস্থা করতে শেষ পর্যন্ত অক্ষম হন, যে কোন মূল্যে তাদের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ইন্দোনেশীয় জনগণ আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

* Foreign Riviewএ প্রকাশিত S. মিত্রির "Indonesia in the making" অবলম্বনে।

শরৎ সাহিত্যের মণি-দীপিকা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৩)

শরৎচন্দ্রের দু'টি মতবাদ ফল্গু ধারার মতো তাঁর সাহিত্যে প্রবাহিত : একটি দেশ প্রেমে, আর অপরটি নারী প্রগতি।

শ্রীকান্তের চার পর্ব সেই সাহিত্য-সৌধের চারিটি স্তম্ভ। গোড়ায় মনে করেছিলেন যে, সেই আকাশ বাতাসে যথেচ্ছ বিচরণ কোরবেন; কিন্তু সাহিত্যের আর্ট এবং নিয়মের পাকা টনটনে জ্ঞান তা' কিছুতেই কোরতে দেয়নি তাঁকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি :—

"শুধু আমার নূপুর আমারই চরণে
বিমরি বিমরি বাজে!

শুধু আমার কোলের আমারই বীণাটি
নিত নতুন ছন্দে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে!"

শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের গোড়ায় ইন্দ্রনাথ "বাজিমাৎ" কোরে' আছে। ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত ছাড়া অন্যেরও আরও সুযোগ এবং সৌভাগ্য ঘোটে ছিল। সে শুধু তার চক্ষে,—সাহিত্য দৃষ্টিতে নয়।

গান, বাজনায়, অভিনয়ে তাঁর জোড়া আর কেউ ছিল না ওদেশে।

ইংরিজি সাহিত্যে ও-রকম কিছু কিছু পাওয়া যায়। ডাকাতি কোরে দরিদ্রকে সাহায্য করায়—আমাদের দেশেও বহু গল্প প্রচলিত ছিল। রাধা ডাকাতের মতো গল্প শৈশবে আমাদের অনেক শোনা ছিল।

ইন্দ্রনাথের বাছ চুরি নিজের জন্যে নয়; অন্নদা দিদির সংসার চালাবার জন্যে। চুরি সেখানে অপকর্ম নয়, বীরোচিত ধর্ম!

শরৎ সাহিত্যের নারী-চরিত্রগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রসান চমৎকার! কিন্তু পুরুষ চরিত্র—ব্যাক গ্রাউন্ডের মতো বাস্তব হিসেবে পেছনে ঝুলে থাকে মাত্র। মেঘের বুকে বিদ্যুৎ দ্যুতির মতোই। এই বিদ্যা শরৎ সাহিত্যে প্রায় একচেটে!

একথার মধ্যে একদেশদর্শিতা দোষ থাকে। আমাদের পুরাণে সাবিত্রী চরিত্র কি নারী চরিত্রের ব্লু-প্রিন্ট নয়? দেবর্ষির অনুজ্ঞা বানের জলে খড়্ কুটোর মতোই কি ভেসে যায়নি সেখানে? সত্যবান সাবিত্রীর জ্যোতির কাছে নিষ্প্রভ। এমন কি যমরাজকেও মাথা নীচু কোরতে হয়েছিল। আমাদের পুরাণ তো ইতিহাসের দর্শন। এখেনে নারী প্রগতির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত পাই। সাবিত্রী বাপের কথা নারদের কথা না শুনে—যমের সংগে তর্ক-বিতর্ক কোরে' শেষে কোন ঠেলা কোরে' ছেড়েছেন তাঁকে। ধর্ম রাজের হার—সোজা কথা? বিশেষ আমাদের দেশে!

এই দৃষ্টান্তের কি অনুরূপ ঘটনা শরৎ সাহিত্যে নেই! এ শুধু মেয়েদের মাথায় কোরে নাচা নয়! মাতৃ-চরিত্র জাতি গঠনের যে কত বড় কথা তা সব দেশের বড় লোকেই চিরকাল মেনেছেন। আমাদের এই সেদিনের

বিদ্যাসাগর, গুরুদাস এবং আশুতোষের কথা তো আমাদের অজানা নয়!

বড়র সংগে ছোটর তুলনা যদি অবৈধ এবং অগ্রাহ্য না হয় তো এখানে কমল চরিত্রের কথা বলা যায়। শরৎচন্দ্র অসংগতি দোষ নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরেছিলেন মাত্র; তাঁর "গোরা" চরিত্রের "কমল" কি "কিবেল কাউন্টার পার্ট" নয়? ওঁদের বাপ-মা ভারতীয় নন্। যাঁরা প্রগতির পথ-প্রদর্শক তাঁরা সাহিত্যের চিন্তার ধারায় লোকের মনে এই সত্য স্ফুট-তর কোরতে চেয়েছেন যে জাতির পরাধীনতার অভিশাপের মুক্তি কোথায়!

রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল "কর্ডে"র ঝঙ্কারের সংগে শরৎ সাহিত্যের বড় একটা অসংগতি নেই; শুধু তফাৎ তার আলোচনার ভংগিতে। একদিন নাকি শরৎচন্দ্রকে বোলেছিলেন—আমার কল্পনার কারবার;—তোমার সাহিত্যে সে ফাঁক্ নেই, তুমি দেশের অন্তরে প্রবেশ কোরেছ—বাস্তবের স্পর্শে।

এ কথার সত্য মিথ্যা জানিনে, তবে একথা শরৎচন্দ্রকে সকর্ণে অনেকবার বোলতে শুনেছি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃতি আকাশের মতো; কিন্তু শরৎ-সাহিত্য নদীর মতো দেশের অন্তরস্পর্শী। রবীন্দ্র সাহিত্যের অসীমত্ব আছে—তা যে কোন দেশেই অচল নয়। কিন্তু শরৎ-সাহিত্য বাংলার অন্তরের ধন। রবীন্দ্র বিরাটের সম্রাট—শরৎচন্দ্র স্বরাটের গায়ত্রী মন্ত্রের উদ্গাতা!

এইখানে একটু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করার লোভ সম্বরণ কোরতে পারছি না।

সংসারের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে রেংগুনে গিয়ে শরৎচন্দ্র গোড়াটায় বেশ একটু উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন কোরেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই—"হান্ বয়-দাদা" হোতেন—অর্থাৎ 'আমিই বড় দাদা'—তোমরা কেউ, আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পার না এই তাঁর চরিত্র নিহিত দোষ কি গুণ—একটা জেদ্ ছিল—যা বিদ্যাসাগর মশাই-এর মধ্যেও ছিল শোনা যায়। যাঁরা বড় হোয়েছেন তাঁদের মধ্যে এটা প্রায় থাকে।

কিন্তু যেদিন ঠিক কোরে বুঝলেন যে হাউই-বাজি কোরলে বেশীদিন বিদেশে বিভূঁইএ টিকে থাকা যাবে না—সেইদিন তিনি নিজেকে বেঁধে ফেললেন। মদ-বেরে মানুষ থেকে সোরে দাঁড়াবার আর একটা উপায় তাঁর অধিগত ছিল—তিনি অসাধারণ মনোযোগের সংগে বই পোড়তে পারতেন এবং ছবিও আঁকতেন।

রেংগুন যাওয়ার পর কিছুদিন তিনি আমাদের কাছে প্রায় মোরে যাওয়ার মতোই নিঃশব্দ নিঃসঙ্গ হোয়ে গিয়েছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে আবার সাড়া আসতে লাগ্‌লো। সে সাহিত্যের সাড়া।

মন থেকে আফিং,—আকাশে বিচরণ থেকে ধরে এসে সংসার করা। তিনি কারুর উপদেশে কোন কাজই কোরতেন না। তাঁকে উপদেশ দিয়ে বাঁধতে গেলে—সে বাঁধন অবিলম্বে ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হোতেন না। তখন বিপ্লব-উন্মুখ হোতেন। এটি তাঁর রক্তে নিহিত ছিল।

তারও একটা করুণ ইতিহাস ছিল। যেমন ছিল রুশের লেনিনের মধ্যে। শুনেছি তাঁদের জমিদার একজন দুঃশাসনের সমতুল্য ব্যক্তি ছিলেন। শরৎচন্দ্রের ঠাকুরদাদা—তাঁকে অতিষ্ঠ কোরে তুলসে তিনি তাঁকে হত্যা কোরে দেবানন্দপুরের শ্মশানের ঘাটে রেখে যান। গর্ভিয়ান গেরো কেউ খুলতে পারেনি। যিনি কেটে সাফ কোরেছিলেন তিনিই বিশ্ববিজয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ কোরতেন।

পুত্র মতিলাল আজীবন হতভম্ব হোয়ে শ্বশুর বাড়ীতে রোয়ে গেলেন। এই নিঃশব্দ নির্কর্মা মানুষটি একটি অভিশপ্ত জীবন যাপন কোরে' শেষ হোয়ে গেলেন। তারই "রি-এ্যাক্শন" শরৎচন্দ্রের মধ্যে সাহিত্য ধারায় স্ফুরিত হোয়ে ছিল। শরৎ-সাহিত্য বিপ্লবের সাহিত্যও বটে।

তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধুর কাছে শোনা কথা :—

যখন 'ছায়া' হাতে-লেখা কাগজখানি তাঁর সম্পর্কে নামী ৺গিরীন গাংগুলি সম্পাদকতায় প্রথম কোলকাতায় ইং ১৯০০ সালে বার হোয়েছিল, তখন তাতে শরৎচন্দ্রের কোন যোগই ছিল না।

সেখানির ইতিহাস খুব করুণ। তাঁদের বন্ধু ৺সতীশ চন্দ্র মিত্র একখানি 'আলো' বোলে' কাগজ হাতে লিখে বার করার ঠিক করেন। সতীশচন্দ্র, বর্তমান সায়েন্স কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক ডাক্তার শিশির মিত্রের বড়দাদা। 'আলো' পৃথিবীর আলো দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সতীশ চন্দ্রের অকস্মাৎ তিরোধান হোয়ে গেল। সতীশ চন্দ্র, অল্প বয়সেই 'সময়' কাগজে লেখা দিতেন। সে সময় তাঁর বন্ধুরা তাঁর সাহিত্য প্রতিভা দেখে মোহিত হোতেন।

আলো গেলে 'ছায়া' থাকে। তাই গিরীনভায়া "ছায়া" বার কোরলেন। শরৎচন্দ্র সেই কাগজ দেখে ভারি খুশী আর বিস্মিত হোলেন। তখন সে কাগজখানি চালাবার সংকল্প হোল। শরৎচন্দ্র একটা গল্প দিলেন এবং "ক্ষুদ্রের মহিমা" বোলে প্রবন্ধ দিলেন। গিরীন্দ্র নাথের হাতের লেখা মুক্তোকে লজ্জা দিতো; আর, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ অনায়াসে হিমালয় ডিংগিয়ে যেতে পারতো। তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র মজুমদার সমাজপতি মশাই এর মাসতুতো ভাইএর চেয়েও জোর "ক্রিটিক" ছিলেন। তাঁকেই 'ছায়ার' সম্পাদকীয় গদিতে বসিয়ে দিলেন শরৎচন্দ্র।

ছায়ার "নাইটিংগেল্" হোলেন আমাদের "বুড়ীদিদি" তাঁর কবিতাগুলি আঙুরের মতো মধুর, আর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে ভরপুর!

• • •

আপনাদের মনে আছে কিনা; কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার। সে সময়—"কুলীন পুরস্কার" বাংলা দেশে আজকালকার নোবেল-প্রাইজের ইজ্জৎ রাখতো। গিরীন পেলেন, যোগেশ পেলেন—দলের আমি শুধু রইনু বাকি!—শরৎচন্দ্র না বোলে আমায়—আমার নাম ভাংগিয়ে পেলেন। তার আজগুবি গল্প নরেনবাবু কেমন কোরে কোত্থেকে পেলেন জানিনে। একটা বাঘা বটে! ও গল্প ছিল, শরৎচন্দ্রের এক সিটিংএর ওয়াস্তা। রেঙ্গুন থেকে ছুটো-ছুটি লেগার সময় বোধহয় হনুমানের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। এই ছায়া চালাবার জন্যে আমাদের পথে ঘাটে—যেখানে সেখানে সাহিত্য সভা বোস্‌তে লাগ্‌লো। পদ্য লেখায় বুড়ীদিদি কাঁচা হবেনই। ছোট গল্পে একবার আমার ভাগ্য ফিরেছিল। গিরীন ভারি জাঁকালো ভাষায় লিখ্‌তেন। শরৎ তাঁর ভাসার বড় বড় কথা মুখস্ত কোরতেন। একবার আমরা ধোরে বোসলুম—তোমাকে কবিতা লিখ্‌তে হবে। তিনি বোল্‌লেন—আমি যে মেলাতে পারিনে!—বেশ, আমরা বোল্‌লুম অমিত্রাক্ষরে লিখ। লিখেছিলেন চমৎকার—আমার এক লাইনের আধখানা মনে আছে: "ফুলবনে লেগেছে আগুন।" বিভূতি ভট্টর ছিল "জাইগ্যান্টিক মেবারি"—তাঁকে "শেক্ স্ত বটল" কোরলে বোধহয় দু-চার লাইন উপ্‌চে উঠ্‌তে পারে!

•

এদিকে ভবানীপুরে সৌরীন মুখুজ্যের দল, যার আর একজন চাই ছিলেন উপেন গাঙুলি—'তরণী' বার কোরলেন। তখন ছিলেন সমালোচনা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট্ সমাজপতি মশাই! অক্ষম আমরা তাঁর নকল কোরে এরসা সমালোচনা কোরলাম যে তরণীর তল্পা ফুটো হয় আর কি! কিন্তু সৌরীনের গুণ ছিল তিনি ছিলেন গান্ধারী বার্কা!—একসংগে একশো এক আণ্ডা প্রসব কোরতে পারতেন। ঈশ্বর-ইচ্ছেয় এখনও তিনি সে শক্তি রাখেন। 'বসুমতী' তাঁর লেখার একদিন টেই টুম্বুর! তাঁর গল্পে পদ্যে গল্পে নাটকে—হাসির ফোয়ারায়। তিনি চমৎকার অভিনেতা—রংগ মঞ্চে যে মধ্যে মধ্যে ধাওয়া করেন না—সে কথা রসিকেরা জানেন। শিশু সাহিত্যেও তিনি একজন জাঁদরেল। আমার পরম বন্ধু। কদাপি মৎ-প্রতি অপ্রসন্ন নন্। ভরসা, যদি কোন বিপাকে পুলিশ

কোর্টের কাঠগড়ায় যেতে হয় তো—তাঁকে উকিল পাবোই পাব।

বিদ্যুৎ-শক্তি "বাই ইন্‌ডাক্‌শনেও" হয়—শুনেছি। ভাগলপুর কি ভাবানীপুর কোনটি "পজেটিভ পোল" জানিনে। কিন্তু দুটোতেই "ভ" আছে। আপ্‌লাসের কিছুতেই নেই—রাবণের মতো! রাবণ কে কোরেছিলেন: "কুম্ভকর্ণে ভকার অস্তি। ভকার অস্তি বিভীষণে—বয়োজ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে "ভ"কার নাস্তি রাবণে!" তাই আমাদের পণ্ডিতজী মহারাজা বোলেছিলেন: উন্‌কো "রাভন" বোল্‌নে সে দুনিয়াকা কুছ নেহি রহেগা। এমন কি। পায়ে কি ঝিঁ ঝিঁ লাগ্‌লে—তিনবার চিম্‌টি কেটে রাভন বোল্‌লে—নিশ্চয় নিরাময়!

এসব বাজে কথা—সাহিত্য-মহীরুহের চারিদিকের পর-গাছার সমাবেশের সেকেলে ছবি।

• • •

সেই সময় এক সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্র আমাদের 'লিটিল্ রুম্ এসোশিয়নের' ঘরে এসে আড্ডা জুড়লেন। অনেকেই ছিলেন। সে ঘরটিতে আমাদের ইংরিজি চর্চার অধিবেশন বস্‌তো।

শরৎ সে সময় ঘোরতর ভাবে তামাক সেবন কোরতেন, অতএব একটা আড়াল আব্‌ডাল চাইতো! মুশাই চাকরকে ফরমাস করলেন তার কেড়ুয়া তামাক সাজতে।

সে বোল্‌লে: হুক্কা? হামারা ছোড়কে হুক্কা নেহি হে।

উসিমে হোগা। পানি ঠো বদল দেও।

মুশাইএর বয়স তখন ষাট বছরের কম তো হবেই না। সে আট-দশ বছর থেকে এ বাড়ীতে কাজ কোরছে।

মুশাইএর সম্বন্ধে একটা বড় রকমের আলোচনার পর শরতের ওপর আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ হলো—ওকে সাহিত্যে অমর কর।

বেয়াদ—একমাসের।

অনেক ভেবে চিন্‌তে বোল্‌লেন পাঁচ হপ্‌তা।

• • •

তেরমাস পরে আমাদের সেই বনে অংগলের সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্র দেবদাস পোড়ে' শোনালেন। খাতাটা সেদিন কাউকে দিলেন না। বোল্‌লেন কিছু বদল সদল কোরবো—এখন থাক। সে খাতা পরে আমাদের হাতে এসেছিল। বদল কিছুই হয়নি; কিন্তু তাতে এমন সব চিহ্ন ছিল যাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র শুধু প্রতিভার জোরেই তা লেখেননি। 'তরল অনলের' সহযোগিতারও প্রয়োজন হোয়েছিল।

সে সময় "কালা" বোলে একটি তাঁর কুকুর ছিল। সেটা হঠাৎ মারা গেল—তার সম্বন্ধে ইংরিজিতে শোক উচ্ছ্বাসও ছিল শরৎচন্দ্রের।

যে জিনিস আমাদের কাছে তখনও লুকোতে হতো তা' ভট্ট কোম্পানির কাছে সুবিদিত ছিল। অতএব বই খানি শেষ পাতায় বিভূতি ভূষণ মন্তব্য কোরে রেখেছিলেন:—"কুকুর চোরানো।"

তার আগে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনা' 'ছবি', পাষাণ, পড়া হোয়েছিল।

৺নীলেশচন্দ্র সেনের 'ভড়ভরত' বইখানি পড়ে শরৎচন্দ্রের খুব ভাল লেগেছিল। আমার ধারণা চন্দ্রনাথে তার প্রভাব কিছু কিছু আছে হয়তো।

• • •

সেই সময় দেহ-বিক্রি কোরে পেট চালাবার জন্য একটি যুবতী এসে যোগস্বরে বাসা বেঁধেছিল। কলেজের ছেলের দল দলবেঁধে সেখেনে যেতো—সে রকম যাওয়ার একটা সময় ছিল। একটু গা-ঢাকা হোলে অধ্যাপকদের কেউ কেউ যেতেন। মধ্যে মধ্যে দুপলের দেখাও হোয়ে যেতো নাকি!

'দেবদাসের' 'চন্দ্রমুখী' বোধ হয় তথা কথিত গোলাপবালারই রূপান্তর। ধর্মদাস—আমাদের মুশাই, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করার কোন কারণ দেখি না। 'পার্বতী রূপ থেকে রূপান্তরে যেতে যেতে হোলো পেয়ারি তারপর রাজলক্ষ্মী।

বড়দিদির সংগে পার্বতীর মিল আছে কিনা পরী ভক্ত পাঠকদের হাতে তার রইল।

(ক্রমশঃ)

শূন্য প্রান্তরের গান

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে যতীন।

মা, ছোটোবোন এবং নিজে—এই তিনটি প্রাণীর ছোট্ট একটি সংসারের একমাত্র ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল সে।

সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। যতীনের আশা সে আরো পড়ে। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গোপন ইসারা তার তরুণ মর্মে আনে আনন্দের দোলা। আরো অন্ততঃ দু'টো পাশ করতেই হবে। নইলে এই বেকার-সমস্যার যুগে সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালককে কে-ই বা চাকরী দেবে।

মা এসে বলেন—আর পড়ে কী হবে বাবা? একটা পাশ করেছিস্ তো, লোকে আর মুখ্যু বলতে পারবেনা। এখন একটা চাকরী বাকরী খুঁজে নিয়ে তোর ঘর সংসার তুই গুছিয়ে নে। লক্ষ্মীও ঘাটের বয়স্থা হয়ে উঠেছে। ওরও বিয়ে-থাওয়া এখনই দেয়া দরকার; পাড়াগেঁয়ে সমাজের মুখ তো আর কেউ চেপে ধরতে পারবে না। আমি আর এমনি করে পরের বাড়ী ধান ভেনে কুদ কুঁড়ো এনে কতোদিন তোদের মানুষ করবো।

চাকরী—কী চাকরী সে এই বিদ্যা নিয়ে করবে। পেলেও পনের কুড়িটাকার বেশী মাইনে কেউ দেবেনা। তা'ও সুপারিশ ধরাধরি দরকার। বি, এ পাশ করেও পঁচিশ ত্রিশ টাকায় চাকরী করছে এমন লোকেরও অভাব নেই।

অথচ তার মায়ের দুঃখ মোচন করাও একান্ত কর্তব্য। বিধবা হবার পর তাঁর স্বচ্ছল সঙ্গতি সম্পন্ন ভাসুরেরা তাঁকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিলেন; আত্মসম্মানপরায়ণা তিনি, ভাই, ভাই বৌয়ের গলগ্রহ হতে চাননি। ছোটো ছেলের মুখের দিকে চেয়ে নিজে গতর খাটিয়ে পরের বাড়ী ধান ভেনে চাল এনে, বাড়ীতে তরী তরকারি লাগিয়ে স্বামীর ভিটের পড়ে আছেন। ছেলেকে একটা পাশও করিয়েছেন। বড়ো হয়ে ছেলেই বা চোখের সামনে কেমন করে অতো কষ্ট স্বাধে।

ভবিষ্যতের স্বপ্নে রঙ্ আছে, কিন্তু বর্তমানের কঠোর বাস্তবের কালিমা তাতে ঢেকে যায় না।

ছেলে মায়ের কথার কোন উত্তর জোগায়না। মা বোঝেন সে পড়া ছেড়ে দেবার কথায় মনে ব্যথা পায়। পড়াশুনোয় সে খারাপ নয়; সমস্ত বই কিনে সে পড়তে পারেনি। সহপাঠীর বই দেখে হাতে লিখে নিয়ে পড়েছে এবং তাতেও পরীক্ষায় সে ভালোই করেছে; প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। তার আশা সে অন্ততঃ আর দু'টো পাশ করবেই। আশে পাশের তিন চারখানা গ্রামের মাঝে তিনটে-পাশকরা লোক আছে মাত্র আর তিনজন। তাঁদের নাম উচ্চারণ করে গ্রামবাসীরা গর্ব করে; সবাই এঁদের কারো সঙ্গে না কারো সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র যোজনা করে লোকের কাছে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করে। যতীনের ইচ্ছা সে-ও ঐ তিনজনের পাশে একজন হবে।

কিন্তু মা বোঝেন তা' অসম্ভব। গরীবের পক্ষে যা' হয়েছে সে-ই যথেষ্ট। তিনি কথাটা ঘুরিয়ে বলেন—ভাখ, পয়সাকড়ি না থাকলে লেখাপড়ায়-ই কি মান বাড়ে? তোর মামারা তো একটা পাশও না। একজন উকীল সেরেস্তায় কাজ করে, একজন গ্রামের বাজারে দোকান স্বায়। তবু তারা আজ দু'পয়সা করেছে বলে অনেকেই তাদের বাড়ীতে ওঠা-বসা করে।

শেষ পর্যন্ত বাস্তবকে মেনে নেওয়া ছাড়া যতীনের গত্যন্তর রইলো না। গ্রামের জমিদারের কাছারীর নায়েব মশায়কে ধরাধরি করে একটা অবৈতনিক শিক্ষানবিশী মিললো। মাস ছয়েক বাড়ী খেয়ে কাজ কর্ম শিখলে একটা কাজ জুটতেও পারে। যতীন একরকম আকাশের চাঁদ হাতে পেলো। এ নিয়েও পাড়ার দু'চারজন বিচক্ষণ প্রবীণ প্রবীণারা জল্পনা করতে কসুর করলেন না।

দীর্ঘ চ'মাস ধরে যতীন একটি নিরন্ধ্র প্রায় দালানের মাঝে বহুজনের পদরজমাখা চাদর পাতা একটি খাটের

পর বসে সামনে একটি হাত বাক্স রেখে তার উপর নানাপ্রকারের কাগজ লিখে চললো। তারপর নায়েব মশায়ের সহানুভূতি ও নিজের যোগ্যতার সুপারিশে ঐ ডিহিতেই বারোটাকা মাসিক বেতনে একটি তহশীল-সহকারীর পদ পেলো।

জমিদারের রাজস্ব আদায় করতে সে যায় গ্রামে গ্রামে; দারিদ্র্যের কদর্যতা-মাখা অর্ধনগ্ন প্রজারা এসে তাদের দুঃখ জানায়, সুদ মাপের আবেদন করে, কেউ কেউ খাজনা মকুপ চায়।

যতীন শোনে, খাজনা পরিশোধের উপকারিতা তাদের বুঝিয়ে বলে কিন্তু পীড়ন করতে তার মনে বাধে।

সে জমিদারের প্রতিনিধি। জমিদার, সে শুনে এসেছে, বাপ-মায়ের মতো। সুতরাং কেমন করে তাদের দুঃখদৈন্যকে উপেক্ষা করে তার স্বার্থকেই বড়ো করে রাখে। ফলে জোর জুলুম করলে যেমনটি আদায় হতো, তা' হয় না।

তহশীলদার বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাজ উদ্ধারের জন্যে ভেদনীতি, দণ্ডনীতি—প্রয়োজন মতো কোনোটারই আশ্রয় নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আদায় খারাপ হচ্ছে দেখে তিনি সহকারী বালকের আত্মার মাঝে তাঁর স্বীয় সাধনা-পুষ্ট আত্মিক শক্তি সঞ্চারের ছলে বলেন—নরম হয়োনা বাপু। ব্যাটারা জমিদারের খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে আর খাজনা দেবেনা? ওরা কি ভালো মুখের পাত্তর? ভুলিয়ে ওদের থেকে টাকা আদায় করতে হবে।

কথাগুলো যতীনের কানে বেসুরো শোনায়। জমিদারের খেয়ে ওদের প্রাণ বাঁচে, না, ওদের খেয়ে জমিদারের প্রাণ বাঁচে! যে প্রজারা, মমতা দিয়ে মাটির পরিচর্যা করে তারা মাটির মালিক, না জীবনে যাদের গাঁয়ের মাটিতে পা পড়ে না তারা মাটির মালিক! রোদ জল তুচ্ছ করে হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে যারা চাষ করে, দেশে আহার জোগায়, জমিদারের বিলাসের খোরাক যায়, অনাহারের সম্মুখীন হয়েও যদি তারা একবার খাজনা দিতে না পারে, তা'লে জমিদারের কাছ থেকে কি তাদের প্রাপ্য—লাঠি, গাল আর জুতো?

ফাল্গুন গিয়ে চৈত্র এলো। সামনেই তামাদী। জোর মতো আদায় না হলে নালিশ দায়ের করতে হয়; তাতে জমিদারের ঘর থেকে নালিশী খরচার বাবদ অনেকটাকা বেরিয়ে যায়। তাই এই সময় প্রয়োজন মতো জমিদারেরা ডিহি পরিদর্শনে আসেন। ফলে ভয়ে ভয়ে প্রজারা যথাসাধ্য আদায় দায়।

যতীনদের এই ডিহিতে বড়ো তরফের একজন জমিদার এলেন পরিদর্শনে। প্রজাদের ডাক হলো। তহশীলদার ও তাঁর সহকর্মীর আদায়ের পরিমাণ খতিয়ে দেখা গেলো একই গ্রামে তহশীলদার গেলে যা' আদায় হয়, মুহুরী গেলে তার দ্বিগুণ পরিমাণ হয়। নায়েবকে প্রজাদের ডেকে জমিদার বাবু জিজ্ঞাসা করলেন কেন আদায় এমন খারাপ হচ্ছে। দু'তিনজন জবাব দিলো—মহুরীবাবু ছেলেমানুষ, প্রজাদের কড়া কথা বলতে পারেন না তার আদায় হবে কী।

যতীনের তলব হলো। কম্পিত পদক্ষেপে যতীন জমিদার বাবুর সামনে হাজির হলো। নিতান্ত ছেলেমানুষ দেখে মুখে ধমক না দিয়ে তিনি বললেন—তুমি এখন এ চাকরী করতে এসেছো কেন খোকা? মন দিয়ে চারপাঁচ বছর লিখাপড়া করো, ডিহির কাজের হালচাল শেখো; তারপর এসো, চাকরী পাবে। তহশীলদারের কৈফিয়ৎ তলব হলো কেন এমন দায়িত্বপূর্ণ পদে একজন বালককে নিযুক্ত করা হয়েছে।

আশার দীপ জ্বলতে না জ্বলতে নিভে গেলো। তার চাকরী গেলো।

বেকার হয়ে যতীন বাড়ীতে এসে একটি পাঠশালায় শিক্ষকতা সুরু করলো। অভাবের সংসার তবু যা' দু' পাঁচটাকা আসে। সাত আট মাস এইভাবে কাটলো।

জল-ভরা কালো মেঘের সংঘর্ষেই চমকে ওঠে বিজলীর আলো-শিখা।

হাল না ছেড়ে যতীন আবার নানাপ্রকার চেষ্টা করতে লাগলো। চেষ্টা করতে করতে অন্য একটি

জমিদারীর দূরবর্তী এক ডিহিতে মুহুরীগিরির চাকরী মিললো। এবার স্থায়ী চাকরী, বেতনও আগের চেয়ে কিছু বেশী। পূর্বার্জিত স্বল্প অভিজ্ঞতার পর ভর দিয়ে নায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো।

গ্রামের নাম হরিপুর।

কাছারী বাড়ীটি চারিপাশে আম কাঁঠাল গাছের বাড়ি দিয়ে ঘেরা; প্রাঙ্গনে সবুজ ঘাসের শ্যামোচ্ছ্বাস। সন্নিকটে একটি ক্ষীণতোয়া নদী, দু'পারে বালুচর। বর্ষাকালে এই চর জলে ভেসে যায়। উপরের ডাঙায় ঝাউলাগাছের বন, মাঝে মাঝে রসস্রাবশীর্ণ দু'একটি খেজুর গাছ।

পাশেই বাজার; দু'বেলা বাজার বসে। কাছারী-বাড়ীর সামনের ছোট পথ দিয়ে তিন চার মাইল দূর থেকে লোকে বাজার বেসাতি করতে আসে। কাছারী-বাড়ী থেকানেক গজ দূরে দক্ষিণে বাঁশবন ঘেরা একাংশে জেলেপাড়া, তার পিছনে মুসলমানপাড়া।

পাড় দিয়ে একপেয়ে একটা সরু রাস্তা এঁকে-বেঁকে একটা মাঠের মাঝে গিয়ে মিশেছে। মাঠটি বিস্তর বিস্তৃত। সমগ্র প্রান্তরের বুক জুড়ে অধিকারের আধিপত্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে একটি শাখাজালজটিল বটগাছ। ধারে কাছে অন্য কোনো বড়ো গাছের চিহ্ন নেই শুধু ঐ বটগাছের বিপুল ছায়াতলে নিশ্চিন্তে কয়েকটি কাঁটা ও আশ-শেওড়ার গাছ পিতৃসঙ্গহারী সুতের মতো দাঁড়িয়ে

যতীনের মন মুক্তি পায় এই গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মাঝে। বিশেষ করে এখানে এসে সে কয়েকজন বন্ধু পেয়েছে; তাঁর সস্নেহ প্রীতি তার মনে খুব সজীবতা এনে দিয়েছে। তিনি স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

দিনান্তের কাজ শেষে যতীন একা একা নদীর ধারে এসে বসে। দূর ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা থেকে পদ্মা ও এই নদী পেরিয়ে অনেক মালবাহী নৌকা এই নদীতে আসে। পশ্চিমের গোধূলি-আকাশ থেকে গাঢ় লালিমার রেশ এসে লাগে নৌকাগুলির সাদা পালে, ঝিরঝিরে হাওয়ায় সেগুলি কাঁপতে থাকে; বসে বসে সে দেখে। অন্তর তার সুদূরের মধুর আভাসে ভরে ওঠে।

কোনো কোনোদিন বন্ধু এসে তাকে ডাকেন। দু'জনে মিলে বেড়াতে বেড়াতে নদীর ধার বেয়ে সেই মাঠের মাঝে যায়। গিয়ে হয় তো বটগাছটির সামনে বসে।

চারিদিকে ধূসর ধূলির আস্তরণ; দৃষ্টি যেখানে শেষ হয়ে আসে, সেখানে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় তরুণ জীবন সমোচ্চতা রক্ষা করে প্রান্তরের প্রহরা দিচ্ছে।

চারিদিকে চেয়ে যতীনের বন্ধু আবেগ-ভরা কণ্ঠে আবৃত্তি করে ওঠেন—

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়া বটে;
নদীর এপারে চাষু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীর তলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্ত স্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মতো।

কতো জীবন-মৃত্যুর, কতো ভাঙা-গড়ার, কতো দিনরাত্রির স্মৃতি-বিস্মৃতির সাক্ষী ঐ বটগাছ। যতীন ও তার বন্ধু সেখানে বসে বসে নানাদিনের আপন আপন সুখদুঃখের কাহিনী বলাবলি করে।

অস্তে-চলা সূর্যের শেষ রক্তরাগ গোধূলির আকাশখানি রাঙিয়ে তোলে। তারা চেয়ে থাকে। যতীনের বন্ধুর কণ্ঠে শঙ্কিত হয়ে ওঠে—

বেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি।

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসে। দূর প্রান্তরের সীমানাশায়ী গ্রামের নিরালা কুটীরে মাটির দীপ জ্বলে ওঠে। শুক্লা তৃতীয়ার ক্ষীণ চাঁদের আলোয় ধূসরেখা ধূম্রবর্ণ ধারণ করে। দিন-রাত্রির মহামিলনের আলিঙ্গন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আকাশের তারায় তারায়।

দেখতে দেখতে যতীন বলে ওঠে—দেখেছেন পশ্চিমের আকাশের দিকে চেয়ে? সুদূর অতীতে ভারতবর্ষের কোনো সত্যদ্রষ্টা ঋষি হয়তো এমনিতরো এক সন্ধ্যায় ধ্যানলীন মনে পশ্চিমের পানে চেয়ে মহাদেবের মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। ঐ ধূম্রবর্ণ বনরেখা যেন মহাদেবের পিঙ্গল জটাজুট, তৃতীয়ার চাঁদ-ললাটের চন্দ্ররেখা।

যেদিন আদায় করতে মফঃস্বলে যেতে না হয়, সেদিন যতীন দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার ঘরের জানালা ক'টি খুলে হয়তো একখানি বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হয়তো বা একটু শুয়ে পড়ে।

শোবার ঘরে পুব দিক দিয়ে নদীর ধারমুখো একটা সরু পথ গেছে এঁকেবেঁকে। বেলা পড়ো-পড়ো হলে গাঁয়ের জেলেপাড়ার মেয়েরা সারি বেঁধে জল আনতে যায়। ঘোমটাপরা ও ঘোমটাটানা বৌ ও কুমারীরা গাল গল্প করতে করতে পথ চলতে থাকে। কারো বা-কাখালিতে শূন্য কলস, ডান কাঁখে সুকুমার শিশু। কেউ ছেলে সোহাগ করে, কেউ কেউ পরস্পরের কার বাড়ী কী রান্না হয়েছে আলোচনা করে। কেউ কেউ স্বামীর সোহাগের কার্পণ্য নিয়ে পারস্পরিক অভিযোগ জানায়।

সবার মাঝে একটি কিশোরী সহস্র চাঞ্চল্যে সারা পথকে চকিত করে তোলে। নাম তার আদুরী। চলতে চলতে একবার সে সবার আগে এগিয়ে যায়, আবার পিছনে পড়ে। অকারণ হাসিলাস্যে আসন্ন যৌবনের মাতাল আনন্দের আভাসকে সে মুঠি ভরে পথে ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

কাছারী ঘরের পাশে একটা ঝুমকো লতার গাছ। আদুরী সহসা পিছনে পড়ে তাড়াতাড়ি সেই গাছে ওঠে। দু'গাছা ফুল পেড়ে নিয়ে একটি নিজের খোঁপায় গোঁজে, অপরটি পরিয়ে দেয় তার বৌদির খোঁপাতে।

যতীন শুয়ে শুয়ে দেখে।

পল্লীবধূদের এই জল-আনার ছল একটা কৃত্রিম মুক্তির প্রয়াস। তাই তারা কলসীতে জল থাকলেও ছল করে জল ফেলে জল আনতে যায়। ঘাটে যাবার পথে সকলে মিলে মিশে সংসারের সুখ-দুঃখ, দাম্পত্য জীবনের হর্ষ-বিষাদ-ভরা দিনপঞ্জীর আলোচনা করে একটু স্বস্তির শ্বাস ছাড়ে।

জল আনার পালা শীগ্‌গীরই শেষ হয়ে যায়। কুল বধূরা এক একবার জল নিয়েই যে যার বাড়ী ফিরে যায়। আদুরীর জল আনা কিন্তু সহজে সারা হয় না। স্নেহের অনুপাতে দীর্ঘায়ত একটি কলসী কাঁখে নিয়ে বহুবার তাকে এই পথে ঘাটে যেতে হয়।

চৈত্রের রুক্ষ অভিশাপে এদিককার মাটির রস শুকিয়ে মাটি ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে, কূয়োর জল যায় শুকিয়ে। বিজ্ঞানের শুভাশীষ-বঞ্চিত এই অঞ্চলের গরীব লোকের প্রাণ বাঁচে ঐ ক্ষীণতোয়া নদীর শীর্ণ বক্ষের খিন্ন অমৃতধারায়। ধনীদের বাড়ীতে যে দু'একটি নলকূপ আছে—এরা তার সুবিধা পায় না।

আদুরী কাছারী ঘরের সামনে এসে ঝুমকো লতার গাছের কাছে কলসীটি রেখে চারিদিকে ভাগে কোথাও পেয়ারা আছে কি না। কাউকে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি সে গাছে উঠে ফুল ছিঁড়তে থাকে।

যতীন সরলা কিশোরীর গতিভঙ্গী লক্ষ্য করে, কখনো একটু হাসে। পরস্পর চোখাচোখি হলে আদুরীও ফিক করে হেসে ফেলে গাছ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। তারপর কলসীটা কাঁখে নিয়ে ঘাটের দিকে চলে যায়।

যে-পথে আদুরী ঘাটে যেতে থাকে, যতীন সেই দিকে চেয়ে দেখতে থাকে।

এ শুধু একদিনকার নয়, আদুরীর এই কর্মধারা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। যতীন এই মেয়েটির হাবভাবের মর্ম বুঝতে পারে না। তবু তার মন্দ লাগে না। বি-ধর্মী তারুণ্যের লীলা-হিল্লোল তার মনে কোথায় একটু আমেজ বয়ে আনে। এর আগে সে আর কোনো মেয়ের সান্নিধ্যে আসেনি। আদুরীর হাবভাব তাই ইসারায় যতীনকে টেনে নিয়ে নূতন কিছু আবিষ্কারের পানে।

সন্ধ্যা লাগে লাগে। তামাদীর দিন আসন্ন। সারা দিন যে টাকা আদায় হয়েছে যতীন নিজের ঘরের খাটে পর উপুড় হয়ে তার হিসাব মিল করছিল। সহসা পাশে

পর নয়ন কী পভায় যতীন চমকে উঠে দেখলো এক গোছা কুমকোলতার ফুল। মুখ ফিরিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে আছে একটি মেয়ে মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চাইতে চাইতে সৌড়ে যাচ্ছে।

কাছারী বাড়ীর কাছেই জেলেপাড়া। সেখানেই আদুরীদের বাড়ী। আদুরীর বাবা বিজয় মালো ভিটে-বাড়ীর প্রজা। অমিদারের নদীতে মাছ ধরে বিক্রী করে। কাছারীর বাবুদেরকে নায়েব মশায়কে খুশী রাখবার জন্যে ভালো মাছ পেলে মাঝে মাঝে কাছারীতে ভেট পাঠায়।

বেরেকে দিয়ে বিজয় মালো একদিন একটি কাঁকায় করে কতকগুলি তাজা ভিয়েন মাছ আর চাঙ মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে।

আদুরী কাঁকাটা হাতে নিয়ে কাছারীর সামনে এসে দেখে নায়েব মশাই কাছারীঘরের মাঝে প্রজাবেষ্টিত হয়ে বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে ধূমপান করছেন। কথা না বলে আদুরী ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। নায়েব মশায়ের শিকারী দৃষ্টি আদুরীর পর পড়লো। তিনি বললেন—যাও বাসার ভেতর দিয়ে এসো।

বাসার ভিতর এসে সে কাউকে দেখেনা, কাকে ডাকবে ভেবে পায় না। শূন্য চাহনি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার সে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যায় আবার কাছে পিছিয়ে আসে।

—কে?

পরিচিত কণ্ঠস্বর। আদুরী চমকে উঠে বাঁ হাত দিয়ে গায়ের কাপড়টা ঠিক করে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

যতীন বেরিয়ে এসে বললে—কী ওতে, মাছ? কী মাছ দেখি। এগিয়ে এসে সে কাঁকার দিকে চাইলো।

যুবতীবাবুর এত সান্নিধ্যে সে হতভম্ব হয়ে গেল। কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো, সে যেন কাঁপতে লাগলো।

—এর দাম কতো?

আদুরী বিব্রত হয়ে পড়লো। অসহায় অবস্থার হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে সে বলে উঠলো—আমরা আপনাদের পিরজা। বাবা আপনাদের খাতি দেছেন।

জবাবের অপেক্ষা না করে কপ্ করে মাছগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে আদুরী কাঁকাটা মাথায় করে দৌড় মারলো।

এইভাবে যতীনের চাকরীর একটি বৎসর কেটে গেল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি। মেঘলা আকাশ থমথমে। মাঝে মাঝে অনিবার বর্ষণ। মরা গাঙে আবার জোয়ার জেগেছে, নদীর জল ফুলতে শুরু করেছে। তার মুক দুখের মুখর ভাষণে দু' তীর চমকিত।

একদিন দুপুরবেলা ঝরঝর ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। যতীন রান্নাঘরে খেতে বসেছে, তহশীলদারবাবুও খেতে বসেছেন তার পাশে। এমন সময় একটি ছেঁড়া ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে ডাকহরকরা একখানি লম্বা খামের চিঠি নীচে থেকে রান্নাঘরের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেলো।

খেতে খেতেই চিঠিখানা হাতে তুলে তহশীলদারবাবু বললেন হুঁ! সদরের চিঠি। কে জানে হয়ত টাকার তাগিদ।

মুখ ধুয়ে তহশীলদারবাবু চিঠিখানি পড়তে লাগলেন। যতীন বিস্মিতচোখে তার মুখের পানে চেয়ে আছে দেখে তিনি বললেন—তোমার এখান থেকে কপাল উঠেছে।

হতভম্ব যতীনের হাত থেকে গ্রাসের ভাত পড়ে গেলো। সে অন্তরে শিউরে উঠলো। তবু আশাবাদ মনে রেখে প্রশ্ন করলো—বদলীর খবর না কি?

—হুঁ, তুমি খেয়ে নাও। গম্ভীরভাবে তিনি চিঠিখানি খামে পুরলেন।

সদরের জরুরী চিঠি। এই ডিহিটি জমিদারের জমিদারী স্বত্বের অধীন নয়, পত্তনী মহালের অন্তর্গত। মহাল লাভের না হওয়ায় জমিদার উপরিস্থিত মালিকের খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। উপরিস্থ মালিক রুষ্ট হয়ে মামলা রুজু করেন। দু'পক্ষের তদ্বিরের আতিশয্যে ও জিদে নিম্নআদলত থেকে সে মোকদ্দমা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত ওঠে। শেষে উপরিস্থ মালিক জয়ী হন। ফলে সমস্ত পত্তনী মহালই জমিদারের হাতছাড়া হয়ে গেলো। এই ডিহিও আর রইলো না। যতীনের চাকরী গেলো।

তহশীলদারবাবু বহুদিনকার অনুগত কর্মচারী, সেজন্যে তাঁকে অন্য ডিহিতে বদলীর ব্যবস্থা করা হলো।

খেতে খেতে যতীন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এই জায়গা ছেড়ে যাবার কথা তার যতো মনে জাগে ততোই মন তার বাপাতুর হয়ে ওঠে।

সে ভাবে, মাটির কী মায়া! মাটি চিরদিনই ধাত্রী, চিরদিনই মা। সন্তানকে স্নেহভোরে বাঁধতে তার আয়োজনের অভাব হয় না। নইলে একবছর আগে যে মাটি ছিলো একান্ত অজানা, কেমন করে সে এ ভাবে তাকে এত অল্পদিনে আপন করে নিলো।

দুপুরের বিশ্রামের পর তহশীলদারবাবু যতীনকে সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—শোনো একটি কথা আছে।

যতীন এগিয়ে এলো। তিনি বলতে লাগলেন—স্থাখো, এখন বড়ো হয়েছো। জীবনে উন্নতির পথে হয়তো অনেক বাধাবিঘ্ন আসবে। মনে হবে সুদিন বুঝি আর আসবে না। কখখনো মুষড়ে পড়োনা। দুঃখের মাঝেও সত্যকে আঁকড়ে থেকো। দুঃখ চিরদিন থাকবে না। তুমি পারবে। তোমায় আমি আশীর্বাদ করি। পথ তোমার নয়।

যতীন হঠাৎ এ ধরণের কথার মর্ম বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলো। তহশীলদারবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন—আমার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে তোমার বয়সী হতো। সাত বছর বয়সে সে মারা যায়। এক-মাত্র ছেলের শোক সইতে না পেরে তার মাও সে বছরে মারা যায়। আবার সংসারে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছা ছিলোনা। কিন্তু কোথা থেকে কী হয়ে গেলো। আবার বিয়ে থাওয়া করতে হলো। আজ আমি চারটি সন্তানের পিতা। দু'টি শালাকেও ঐ সঙ্গে মানুষ করতে হয়। জমিদার বেতন দেন মাসিক দশটাকা। কী করবো, প্রাণের দায়ে হ্যাচড়াপিচড় বাপ্পাবাজি করতে হয়। আগে মিথ্যা কথা বলে কারো কাছ থেকে পয়সা-কড়ি নিলে মনে খোঁচা লাগতো। বারবার মিথ্যা বলতে বলতে আজ আর সে বোধ নেই। দু'মুটি অন্নের জন্যে শেয়াল কুকুরের মতো উঞ্ছবৃত্তি করি। উপায় নেই বাপু। সম্মানের পরে আজ প্রাণের দায়ী বড়ো। জ্ঞান-পাপী আমরা বাপু, এ পাপের ক্ষমা নেই।

যতীন বিস্মিত হয়ে পড়ে। অর্থ আয়ের জন্যে মানুষ নানা ছলনার সাহায্য নিতে দেখতে দেখতে অভ্যস্ত তার মাঝে একটি জাগ্রত বিবেক বর্তমান!

তহশীলদারবাবু যতীনকে কোলের কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকেন—তোমার মুখের আদল আমার সেই ছেলের মতো। তোমাকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি যতীনের হাতে সদরের চিঠিখানি তুলে দিলেন। চিঠি পড়তে পড়তে তার শরীর কাঠ মতো কঠিন হয়ে উঠলো। আবার চাকরী গেলো। বারবার তার দুখিনী মা ও বয়স্থা বোনের ম্লান মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কোন মুখে চাকরী খুইয়ে মায়ের কাছে গিয়ে মুখ দেখাবে।

তার মনের অবস্থা বুঝে তহশীলদারবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন—বুঝতে পারছি, খুব দুঃখ কষ্টের মাঝে পড়বে। ভয় কী! সামনে তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। দুঃখের সঙ্গে লড়াই করো বাপু, তবু নিজের কাছে ছোটো হয়ে যেয়োনা। ভগবান মঙ্গল করবেন। এ পথ তোমার নয়।

বর্তমানের গাঢ় অন্ধকারের গায়ে আঘাত লেগে যার চোখের আলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, ভবিষ্যতের রঙীন আলোর ধ্যান কেমন করে সে করে। তহশীলদারবাবুর ভাব-গর্ভ উপদেশের বাণী তাই যতীনের মনে সাড়া জাগাতে পারলো না।

যাবার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেদিন ভোরবেলা থেকে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছিলো। যতীন বিছানা পত্তর বাঁধতে সুরু করেছে। এমন সময় মাষ্টার মশায় বলতে বলতে এলেন—ঐ দেখুন যতীনবাবু, আপনার বিদায়-বেদনায় হরিপুরের আকাশ অশ্রুবর্ষণ করছে।

তারপর মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে যতীনের কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো। এদিকে ইস্কুলের বেলা হয়ে উঠেছিলো। মাষ্টার মশায় বেশী দেরী করতে পারলেন না। যাবার সময় বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন—মনে পড়ে?—

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।

নিঃশব্দ হাসির মাঝ দিয়ে দু'বন্ধুর বিদায়ের পালা শেষ হলো। যতীন তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিলো। বর্ষাকাল; নদীতে নৌকা চলাচলের পথ হয়েছে। ঘাটের জল উপচে সারা মাঠ ভেসে গেছে। সেখান থেকে খানিকটা নদী পথে এসে আড়াআড়ি খাল দিয়ে মাঠে পড়তে পারলে সন্ধ্যার আগেই ঝিনেদা পর্যন্ত আসা যায়। তারপর নৌকায় মাইল দশেক এলে তবে তার বাড়ী।

মাঝিরা এসে হাঁক ছাড়লো—বাবু, এখনি উঠুন, নইলে সন্ধ্যার আগে ঝিনেদায় পৌছুনো যাবে না। যতীন মহকুমাহাকিমবাবুকে প্রণাম করে কাছারীর পেয়াদার কাছে বাক্স বিছানা দিয়ে ছাতা হাতে করে বিষণ্ণ মনে ঘাটের দিকে রওনা হলো।

বর্ষাকালে আজ যে পথে চলতে গেলে কাদা ছিটকে গায়ে লাগে, সামনে নদীর উর্মিমুখর জল ওপারের দৃষ্টি ব্যাহত করে আনে, বর্ষার আগে সে পথ এমনটি ছিলো না। শুধু ধূলির পথ তখন ইসারায় তাকে অজানার পানে ডেকে নিয়ে যেতো। কতোদিন এ পথে চলেছে; চলতে চলতে আনন্দে ভরা প্রাণ তার লুটে কেটে পথের ধূলির পর ছড়িয়ে গেছে।

মালপত্তর নৌকায় তোলা হয়ে গেলে যতীন উঠে বসলো। নৌকোর চারিদিক দিয়ে কলকলস্বরে ডেকে জল সামনে চলেছে; ছোটো ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে তীরে। দূরে মাছ-ধরা দু'একখানা জেলের ডিঙ্গি নৌকো কাপড়ের পাল তুলে যাচ্ছে। তীরভূমিতে চাষীরা বড়ো বড়ো ধানবনের মাঝে দাঁড়িয়ে গান গাইতে গাইতে জমির নিড়ানি দিচ্ছে।

—এবার নৌকো ছাড়ি বাবু? মাঝিরা ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলো।

অন্যমনস্ক হয়ে যতীন জবাব দিলো—হুঁ। বেদনাঘন দু'চোখ থেকে তার দু'ফোঁটা জল পড়ে নদীর চলমান জলস্রোতে মিশে গেলো।

নৌকাখানি তীর ছেড়ে স্রোতের পর এসেছে। এমন সময় যতীন চেয়ে দেখলো কলসী কাঁখে একটি স্ত্রীলোক ঘাটের দিকে ছুটে আসছে একটু পরেই তাকে চিনে ফেললো। ও যে আদুরী। যতীনের নৌকো তখন ভাঁটি জলে চলতে সুরু করেছে; সামনেই বাঁক।

আদুরীকে দেখেই যতীনের মন চাঞ্চল্যে ভরে উঠলো। ছইয়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে সে বাইরে এসে বসলো। আদুরী তখন নদীর পাড়ে এসে পড়েছে। পাড় থেকে জলের কিনার পর্যন্ত ঢালু। আদুরী নৌকোর দিকে তাকায় আর নদীর মাঝে নামতে থাকে। এইভাবে জলে নেমে কলসী ভরে নদীর পারে দাঁড়িয়ে সে নৌকোর পানে চেয়ে রইলো।

এদিকে নৌকো বাঁকের কাছে এসে পড়লো। যতীন অন্যমনা হয়ে একটু নড়ে বসতেই ছলাৎ করে নৌকোর মাঝে খানিকটা জল উঠে পড়লো।

হালের মাঝি বলে উঠলো—সাবধানবাবু, এখানে বড়ো পাক। নড়াচড়া করবেন না।

যতীন পিছন ফিরে বাঁকের দিকে চেয়ে সাবধান হয়ে বসলো তারপর সামনের দিকে চাইতেই দেখলো আদুরীর কাঁখানি থেকে জল-ভরা কলসীটা পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। আদুরী স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে।

একটুপরেই নৌকোখানা জলের আঘাতে বাঁকের মোড় ফিরে গেলো।

প্রথম হাজার ষ্ট্রাইক

(১৪০ পৃষ্ঠার পর)

একদিন আমার ওজন তিন পাউণ্ড কমে গেল। তার দুদিন বাদে মধ্য প্রদেশের I. G. C. H (ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল অফ সিভিল হস্‌পিটাল্‌স্) এল। রুকুবি-চালে দু'চারটে কথা জিজ্ঞেস করলো। দু'এক কথার জবাব দিয়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বল্‌লো, হয়তো আবার নলদ্বার দিয়ে খাওয়াবার প্রয়োজন হবে।

আরও দুদিন বাঁচে। সেটা বোধ হয় উপবাসের সাতষট্টি দিন। চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভোরে এসে বললেন, আজ চীফ কমিশনার আসছেন। তখনও পর্যন্ত মধ্য-প্রদেশ চীফ কমিশনারের প্রদেশ।

আরও বললেন, অবরাবতীতে মিঃ সেন উপবাসে মৃত্যু হয় না দেখে একষট্টি দিনের দিন গলায় দড়ি দিয়ে মরতে চেষ্টা করেছিলেন। রশিতে একখানা গীতা, একখানা চণ্ডী বাঁধা ছিল। তাতে আটকে গিয়ে দম বন্ধ হতে দেরী হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁকে খুলে নামিয়েছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁর নামে মামলা করার অনুমতি চেয়েছেন। আই জি ফাইল চীফকমিশনারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ফাইল এখানে এসে গেছে।

চীফ কমিশনার এল না, এল তার চীফ সেক্রেটারী। এসে বল্‌লো, ওয়ার্ধাতে একটা বিদ্রোহ মতো লেগে গেছে, তাঁকে সেখানে যেতে হ'ল। আমাকে আপনার এখানে পাঠিয়েছেন, আপনাকে খেতেই হবে।

আমার নতুন ক'রে আর কিছু বলবার ছিল না। চীফ সেক্রেটারী চার দিন ওখানে রয়ে গেল—রোজ সকাল বিকাল আমায় দেখতে আসে, খেতে অনুরোধ করে।

ইতিমধ্যে চীফ কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে সত্যেনদার সম্বন্ধে জবাব পাঠালো—জেলে কি ক'রে তাঁর পক্ষে আত্মহত্যার চেষ্টা করা সম্ভব হ'ল? এর জন্য দায়ী জেলের আইন শৃঙ্খলা। ষ্টেটপ্রিজনারের নামে এর জন্য মামলা চলতে পারে না। ষ্টেটপ্রিজনারকে বন্দী ক'রে রাখার ওয়ারেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের উপর। ষ্টেট-প্রিজনার যদি পালায়, তা হ'লে তার জন্যেও মামলা হবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে।

খবরটি চন্দ্রিকাপ্রসাদ ব'লে গেলেন। আরও ব'লে গেলেন, ঐ দিন থেকে সত্যেনদা খেতে শুরু করেছেন।

শেষ দিন চীফ্ সেক্রেটারী এসে বল্‌লো, আর তো আমি থাকতে পারছিনে। আপনি খেলেন না, আমিই বা আর কি করতে পারি? আমি তো ডাক্তারও নই। আমি ফিরে গিয়ে বরং কর্ণেল বেন্‌সলিকে পাঠিয়ে দেব।

কর্ণেল বেন্‌সলি এলেন বাহাত্তর দিনের দিন। খাওয়ান বন্ধ ক'রে দিলেন। তিন দিন ধ'রে পেটের ভিতর নল চালিয়ে দিয়ে কি একটা ঔষধ দিয়ে পাকস্থলীকে ধুয়ে নিলেন। পঁচাত্তর দিনের দিন একটা ফিডিং কাপে ক'রে দুধ নিয়ে এলেন। কর্ণেল বেন্‌সলির প্রথম বারের সে চেহারা আর নেই আমার ডেক চেয়ারের পাশে একটা চেয়ারে ব'সে আমার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে বললেন, আপনাকে মরতে কিছুতেই দেব না। We'll make you live at least for your parents' sake. এই ব'লে ফিডিং কাপের নলটা আমার মুখের ভিতর চেপে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি দাঁত চেপে মুখ বুজে রইলাম।

খাওয়াতে না পেরে হতাশ মুখে চ'লে গেলেন। সন্ধ্যার দিকে আবার এলেন—হাতে একখানা টেলিগ্রাম। "আমার যা করবার করেছি। এখন আমার conscience clear. আর তো আমি কোনো কাজেও লাগব না। আজ আমি চলে যাচ্ছি, আশা করি, আপনার মঙ্গল হবে।"

সেই রাত্রি থেকে আর আমায় জেলে থাকতে হয়নি। তবে ঘুম তো আমার তখন ছেড়েই গেছে।

পরদিন ভোরে চন্দ্রিকাপ্রসাদ বললেন, আই জি এখানে এসেই ভারত গভর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাম করেছিলেন,

আপনি এখন খেতে আরম্ভ করলেও আপনার বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। কাল সেই টেলিগ্রামের জবাব এসেছে আপনার dying body আপনার বাপমাকে দিয়ে দিতে।

বোধ হয়, ঐ মর্মে টেলিগ্রাম বাবার কাছেও গিয়েছিল। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রওনা হ'লেন। বাড়ী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে ষ্টীমার ঘাট। শেষ রাত্রে ষ্টীমার ছাড়ে। শীতের রাত। যখন ঘাটে পৌঁছেছেন, তখন সিঁড়ি টানতে শুরু করেছে, তাড়াতাড়িতে উঠতে গিয়ে জলে প'ড়ে গেলেন। চাকর এবং অন্যান্য লোকের সাহায্যে উঠলেন। আবার সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলেন। এসে অসুখে পড়লেন। ন-ও তখন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী। উপবাসের ছিয়াত্তর দিন। বিকেলে খুব একটা ধুন্ধুমার হ'য়ে গেল। সেইদিনই ওখানকার জীত কেটে গিয়ে গরল প'ড়ে গেল।

ডাক্তার মোড়ি আজ খুব গম্ভীর। দুইবার অল্প অল্প পরিমাণ দুধ খাইয়ে গেলেন—আগের মতোই নল চালিয়ে। পরদিন খুব সকালে এলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বললেন, "আপনার জন্যে কয়েকখানা কাগজ এনেছি, আর একটা পেন্সিল। আপনার যাকে যাকে প্রয়োজন, চিঠি লিখুন। যেখানে গিয়ে বলেন, আমি চিঠি দিয়ে আসব।"

"আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। কিন্তু কাকে আমি চিঠি লিখব? কি লিখব?"

"আপনি যাকে খুসি লিখুন। আপনি বাঁচবেন না। শেষ কালে এতটুকু কাজ আপনার ক'রে দিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কাগজগুলো আমি বাক্সে রেখে যাচ্ছি।"

আমি চাকরটাকে দেখিয়ে বললাম, "ওর সামনে রাখবেন না।" অত্যন্ত নীরেট রকমের এই বাঙালি চাকরটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না।

কিন্তু ডাক্তার তখন বেপরোয়া। মুখের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, বয়ে গেছে।

ডাক্তার চ'লে যাবার পর চাকরটা রোজকার মতো কুঁজোয় জল ভরতে গেল। ফিরে আসবার পর বোধ হয় দুমিনিটও কাটে নাই, জেলার এসে উপস্থিত, পেছনে বড় জমাদার।

একটি কথাও না ব'লে জেলার আমার খোলা ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললো। বাক্স থেকে কাগজ কয়খানা ও পেন্সিলটা নিয়ে বাক্স বন্ধ ক'রে চলে গেল।

আমার ভিতর ঝড় বইতে শুরু করলো। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এল সেদিন দুপুরের পরে। কিসে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারলাম না—হঠাৎ ডেক চেয়ার ছেড়ে উঠে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে কাঁধে হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে ধ'রে বললাম, "ডাক্তারকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় বললো, "হ্যাঁ, ছেড়ে দেব, আপনি খেতে শুরু করুন।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে জেলার এবং অ্যাসিষ্টাণ্ট জেলার চন্দ্রিকাপ্রসাদের দিকে একবার তাকালো। তাকাবার ভঙ্গিটায় আমার চমক লাগলো। চন্দ্রিকা-প্রসাদের মুখে একটা অস্বাভাবিক রকমের করুণ হাসি।

মুহূর্তে আমার জ্ঞান হল, আমি কি করছি। ধপ্ ক'রে এসে আবার চেয়ারটায় ব'সে পড়লাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার বললো, "বলুন, আপনি খাবেন, আমি ডাক্তারকে ছেড়ে দেব।"

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওরা চলে গেল।

তখন থেকে সমস্ত রাতটা ধ'রে ঐ একটা কথাই কেবল মনে হ'তে লাগলো আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি? মরতে পারলাম না, শেষকালে পাগল হয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

আমার উপকার করতে গিয়ে ডাক্তার বেচারির সর্বনাশ হবে? ঘুম তো অমনিতেই হ'ত না, সমস্ত রাতটা ছট্‌ফট্ ক'রে কাটলো।

১৬ই ফেব্রুয়ারী। উপোসের আজ আটাত্তর দিন।

ভোর বেলায় চন্দ্রিকাপ্রসাদ এলেন। Good Morning ব'লে বললেন, "ভালো খবর আছে।" ব'লে কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। এ তো চন্দ্রিকাপ্রসাদের পক্ষে অস্বাভাবিক! মনে হ'ল, দুটো কারণ হ'তে পারে।

এক ডাক্তারের ব্যাপারে হয়তো চন্দ্রিকাপ্রসাদ ভয় পেয়ে গেছেন। পাছে বেশী সময় ধ'রে কথা বললে সিপাই জনতার রিপোর্ট ক'রে দেয়। আর, কাল যে রকম পাগলের মতো ব্যবহার করেছি, তা'তে যদি বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে কিছু ব'লে বসি।

ঐ দুই দুর্ভাবনা নিয়ে কাটাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'তে লাগলো চন্দ্রিকাপ্রসাদের কথা—সুখবর আছে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সকাল সকালই এলেন। আজও কালকের মতো ডাক্তার সঙ্গে নেই। বললে, "গভর্ণমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেছে, গভর্ণমেণ্ট দুটো কমিটি করছে—বিশিষ্ট জজ ও বেসরকারী লোকদের নিয়ে। একটা তদন্ত করবে আপনারা কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কিনা, তাই নিয়ে। আর একটা আপনাদের অনেকের বিরুদ্ধে যা চার্জ—তাই নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিবেচনা করবে। যাঁদের বিরুদ্ধে চার্জ প্রমাণ হবে না, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে।"

এই দুইটি কমিটিই, পরে জানলাম, রাওলাট কমিটি ও বীচক্রফট-চন্দ্রভারকর কমিটি।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আরও বললেন, "গভর্ণমেণ্ট আপনাকে জানাতে বলেন নাই, তবু আপনাকে জানাচ্ছি—ষ্টেট্ প্রিজনারদের প্রতি আরও ভালো ব্যবহারের জন্য গভর্ণমেণ্ট নতুন সব আইন কানুন তৈরী করেছেন। আমাকেও তার নকল পাঠানো হবে।

"এখন বলুন আপনি খাবেন।"

ভেবে দেখলাম, আর আমার সময় নেওয়া উচিত হবে না। প্রথমতঃ পাগল হওয়া থেকে বাঁচতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যদি সম্ভব হয়, ডাক্তারকে বাঁচাতে হবে।

তাছাড়া, আর সবাই যে অনশন ছেড়ে দিয়েছে, সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ নেই। আর, আমরা যা চেয়েছিলাম, সবাই ছেড়ে দেবার পরে, এর চেয়ে ভালভাবে সে দাবী মিটবার আশা করা চলে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম, "খাব, কিন্তু একটা সর্তে। আপনার আত্মসম্মানবোধের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, কি একটা কথা দিতে হবে।"

"কি?"

"ডাক্তারকে কোনো শাস্তি দেবেন না।"

"না, দেব না।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাসপাতালে সুপ তৈরী করার আদেশ দিয়ে চ'লে গেল।

নোয়াখালি ত্রিপুরাতে গান্ধী ক্যাম্পের বর্তমান কর্মধারা

রঞ্জনকুমার দত্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

গঠন কর্মের ধারা—

নোয়াখালী—ত্রিপুরার হিন্দু মুসলমান—দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করে যে কাজ গান্ধী ক্যাম্পের তরফ হইতে করা হইতে থাকে, সেই সাথেই গান্ধীজীর অষ্টাদশ রচনাত্মক কর্ম পদ্ধতির বিষয়ও প্রসঙ্গত আসিয়া পড়ে। কিন্তু যেহেতু গান্ধী ক্যাম্প মূলত কোন ব্যবসিক প্রতিষ্ঠান নয়, সেই হেতু কোন ব্যবসায় সংক্রান্ত কর্মভার সোজাসুজি ইহারা হাতে লইতে পারেন না।

এই সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত ছিল এই যে গান্ধী ক্যাম্পের কর্মীরা গ্রামবাসীকে বুঝি জোগাইবে, ব্যবহারিক শিল্প জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচার যাহা তাহাদের আছে

তাহা গ্রামবাসীকে দিবে ও তাহাদের ভিতর দূর করিয়া তাহাদের ভিতর ব্যক্তিগত ও সামূহিক শ্রম করার ইচ্ছা জাগাইয়া গ্রামের হিতসাধন করিবে। ইহাতে বাহিরের অর্থের আবশ্যক নাই, চাই গ্রামবাসীর আ শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা। অর্থ বা দ্রব্য দান করিয়া কখনও এ কাজ গান্ধী ক্যাম্প হাতে লইতে পারে না। আরম্ভের সময় ক্ষেত্র বুঝিয়া কিছু দ্রব্যসাহায্য স্বরূপ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরে গ্রামবাসীদেরই উহা পরিশোধ করিতে হইবে। ইহাই গান্ধী ক্যাম্পের পক্ষে অপরিবর্তনীয় নীতি বলিয়া গান্ধীজী কর্মীদিগকে গ্রহণ করিতে বলেন।

সরকার বা গ্রামবাসীরা সমবায় ব্যবস্থাধীনে কোন কাজ হাতে লইলে গান্ধী ক্যাম্পের নিকট তাহারা বুদ্ধির ও টেক্‌নিক্যাল (যান্ত্রিক) জ্ঞানের সাহায্য পাইতে পারিবেন।

গান্ধী ক্যাম্পের পক্ষে নোয়াখালী-ত্রিপুরাতে যে সব গঠনমূলক কাজ করা হইতেছে তাহা যথাসম্ভব গান্ধীজীর উক্ত অভিমতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইতেছে।

বর্তমানে নোয়াখালী-ত্রিপুরা এই দুইটি জেলাতে তেইশ চব্বিশটি ক্যাম্প চালু আছে। মূল ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়-কাজিরখিল হইতেই কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হয়।

বনিয়াদী বিদ্যালয়—

কেন্দ্রগুলির মধ্যে কাজিরখিল, আন্ডাকোরা, পরকোট ও বাবুরহাটে একটি করিয়া বনিয়াদী বিদ্যালয় সংযুক্ত করা হইয়াছে। কয়েকটি মাটির পিসিম জ্বালানো হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা খুব বেশী নয়। না হইবার কারণও আছে। হিন্দু জনসাধারণ উতলা হইয়া আছে, অনেকেই ত বাস্তুত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মুসলমান জনসাধারণ এই শিক্ষাধারার সহিত একেবারেই পরিচিত নহেন। স্বভাবতই মুসলীম জনসাধারণ এ বিষয়ে অগ্রসর ও সংস্কারবদ্ধ।

ইহাদের মধ্যে কাজিরখিল বিদ্যালয়টি অনেকটা অগ্রসর এবং যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী অঞ্চলে স্বভাবতই বনিয়াদী বিদ্যালয়ের একটা অনুকূল আবহাওয়া প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাধারার প্রভাব ও চাকুরীপ্রিয়তা পল্লীবাসীদের মনকে এমন করিয়া কাবু ও লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে যে আরম্ভে লোকে সহজমনে বা অকুণ্ঠচিত্তে বনিয়াদী শিক্ষানীতিকে মানিয়া লইতে পারে নাই। তৎসত্ত্বেও অভিভাবকদের সংস্কার যাহাই হউক না কেন ছেলে-মেয়েরা যাহারা একবার এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আসিয়াছে তাহাদের মধ্যেই একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে। তাহাদের বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তির স্ফুরণ দেখা গিয়াছে।

ছেলেমেয়েদের ভিতর এই ধরনের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের স্ফুরণ অভিভাবকদের কাছে নূতন বলিয়া মনে হইতেছে। পল্লীর বালক বালিকাদের কাছে ইহা আকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার মূলে বনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোজ্জ্বল দীপ্তি ও প্রতিভা। কাজিরখিলের বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি দেখিয়া শিখিবার জন্য স্থানীয় ও এতদঞ্চলীয় কোন কোন শিক্ষকের মধ্যে আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকিয়া এই ধরনের শিক্ষকতার কথঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া কেহ কেহ নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাহিরের কোন কোন সংস্থা প্রেরিত কর্মীও এখানে আসিয়া বনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জ্ঞান লইয়া গিয়াছেন। মূলত কাজিরখিল বিদ্যালয়টি একটি ছোট আকারের বনিয়াদী বিদ্যালয় হইলেও ইহাকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষক-শিক্ষণের কাজও কিছুটা চলিতেছে।

ভগ্নি আবাস—

অস্থায়ীভাবে কাজিরখিলে একটি ভগ্নি আবাস পরিচালিত হইতেছে। এখানে নাংগাবিধবা এলাকার কুমারী, সধবা ও বাল বিধবা ভগ্নি আছেন। এখানে তাঁহাদের গ্রামের কাজের যোগ্য কর্মীরূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ ও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সুতাকাটা ও বয়নের সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ পাঠ ও কিছু সাধারণ

লেখাপড়ার জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। গ্রামেরই মেয়ে তাঁহারা, এই অল্প কালের মধ্যেই বেশ কর্মনৈপুণ্য অর্জন করিয়াছেন। প্রার্থনা, ভজন, সংগীত, সুতাকাটা, রন্ধন, লেখাপড়ার চর্চা, সমষ্টি চেতনা প্রভৃতির ভিতর দিয়া তাঁহারা বেশ সংকোচবিমুক্তি, সাহসিকতা ও যোগ্যতা অর্জন করিতেছেন। তাঁহাদের অবসন্ন হতাশ প্রাণে একটা নূতন আশার সঞ্চার করিতে পারা গিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন জাতির সেবায় তাঁহাদেরও দেবার আছে, কর্তব্য আছে। তাহা তাঁহারা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্পাবদ্ধ। ইঁহাদের মধ্যে এমন অল্প বয়স্ক ভগিনীও আছেন গত দাংগায় যিনি স্বামীহারা হইয়াছেন।

ইহাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে এক একটি গ্রামে বসিতে পারেন। ভগ্নিদের দ্বারাই একটি তাঁত চলিতেছে; চারজন কাটুনী ও একজন তাঁতি এই পাঁচজনের একটি ইউনিট হিসাবে এখনকার অবস্থায় কত রোজগার করা সম্ভব হইতে পারে তাহার একটি পরীক্ষা এই ভগ্নিদের দ্বারা চলিতেছে।

চারটি পাঁচটি চরকা, একটি তাঁতের আবশ্যকীয় সমস্ত সুতা সরবরাহ করিয়া যাইতে পারে এবং ইহার দ্বারা যে রোজগার হইবে তাহাতে বর্তমান অন্নসংকটেও এইরূপ একটি পরিবার খাইয়া বাঁচিতে পারে এই ধারণা হইতেই এই পরীক্ষার সূচনা এবং ইহা কার্যকরী হইতে পারে বলিয়া দেখাও যাইতেছে।

খাদি বয়ন

এখানকার তাঁতিরা মিলের সুতা বয়ন করিতেই অভ্যস্ত। অথচ মিলের সুতার সরবরাহ বন্ধ। চরকার সুতা বুনিতে রাজী নয়। অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে, অনাহারে কষ্ট পাইবে, রিলিফ কেন্দ্রে ভিক্ষা চাহিবে তবুও চরখার সুতা বুনিবে না। এমনি সংস্কারাবদ্ধ। এই জেলারই ফেণী মহকুমায় বিভিন্ন অঞ্চলে, ত্রিপুরার রবকামতা-চাদিনা অঞ্চলে হাটে বাজারে সাধারণ পণ্যের ন্যায়ই সুতা কেনা বেচা হয়। কাটুনী বেচে, তাঁতী কিনিয়া লয়। তাহারা মিলের সুতা পাইলেও তাহা বুনিবার আগ্রহ রাখে না। তবে ইহাদের অসুবিধা কোথায়? অজ্ঞতা অনভ্যাস ও পরানুকম্পাপ্রার্থীপনায় ইহাদের এই দুরবস্থা।

এই জন্য কাজির খিল ক্যাম্পের সংলগ্ন দুইটি তাঁতি পরিবারের দুইটি ছেলেকে খাদি প্রতিষ্ঠানের নুন্শীরহাট কেন্দ্রে পাঠাইয়া চরখার সুতার বয়ন-কলা শিখাইয়া আনা হইয়াছে। চরখার সুতা বুনিতে অনভ্যস্ত তাঁতিদের আবশ্যক বোধে এখানে আসিয়া বয়ন-কলা শিখিয়া যাইতে বলা হয়। বর্তমানে রামগঞ্জ থানা এলাকায় তাঁতিদের মধ্যে চরখার সুতা বুনিবার আগ্রহ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। সংস্কার বদলাইতেছে। ইহা সুখের বিষয়।

চরখা-শিক্ষাশালা

স্বাবলম্বনের শক্তি বৃদ্ধির দুইটী প্রধান হাতিয়ার, কৃষি ও বস্ত্র শিল্প, পল্লীবাসীর হাতেই। এই দুইটিতে তাহারা যাহাতে স্বাবলম্বী হইতে পারে তাহাদিগকে সেই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন গান্ধী ক্যাম্প।

এই উদ্দেশ্যেই কাজিরখিল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি বড় আকারের চরখা শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে, তাহা-ছাড়া গোপাইবাগ, লালবাজার, শরিয়ত, চণ্ডীপুর প্রভৃতি কেন্দ্রেও চরখা শিক্ষালয় আছে, ঐ সকল কেন্দ্র হইতেও গ্রামবাসীকে চরখা তৈরী ও সুতাকাটা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য সব কেন্দ্র হইতেও সুতাকাটা ও আবশ্যকীয় অন্যান্য শিক্ষাও গ্রামবাসীকে দেওয়া হইতেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বংগের কোনো কোনো সংস্থাও কর্মি পাঠাইয়া বাঁশের চরখা তৈরীর সকল প্রক্রিয়া শিখাইয়া লইয়াছেন। এতাবৎ শতাধিক কর্মি এখান হইতে বাঁশের চরখা তৈরী শিক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন—

কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্য ব্যাপারে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া-তোলার কাজে গান্ধী ক্যাম্প জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন।

গান্ধী ক্যাম্পের প্রেরণায় দুইটি সমবায় প্রতিষ্ঠান

ইতিমধ্যেই রামগঞ্জ থানা এলাকায় গড়িয়া উঠিয়াছে একটি কর্মীর সমিতি ও একটি থানা শান্তি সমবায় সমিতি। এই দুইটি সংস্থার কর্মশক্তি ইতিমধ্যেই বেশ লক্ষ্য করিবার মতো হইয়াছে। অতীত অন্ধকারময় রাজত্বকালের স্রোতের মুখেও এবং বর্তমানের চরম বাজে-সাকোটের দিনেও এই সমিতিভুক্ত পরিবারগুলি [illegible] যৌথ কর্মব্যবস্থার শক্তি ও উপযোগিতা [illegible] বুঝিত না, এখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু পুরাতন সংস্কার ও স্বার্থপ্রিয়তা এমন প্রবল যে সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্য যে স্বার্থত্যাগ বুদ্ধি বা সমষ্টি-কল্যাণবোধ ও উদারতা দরকার তাহার পরিচয় এখনও ব্যক্তির মনে জাগ্রত হয় নাই। এই বোধ জাগাইবার চেষ্টা গান্ধী ক্যাম্প করিয়া আসিতেছেন।

সরকারের সহিত যোগাযোগ—

এতদ্ব্যতিরেকে গান্ধী ক্যাম্প এতদঞ্চলের অর্থ ও বাজে-সাকোট, ভিন্ন প্রচেষ্টার এবং সাম্প্রতিক চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিষয়ে যতদূর সম্ভব সরকারকে রিপোর্টাদি প্রেরণ করিতেছেন। সরকারের দৃষ্টি ও কর্তব্য সম্পর্কে সর্বদা বুদ্ধি ও পরামর্শ দিয়া আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকেও সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও বন্ধুভাব অবলম্বন করিয়া নির্ভীক চিত্তীন নাগরিকের মর্যাদাবোধ লইয়া বাস করিবার প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। যদিও আশাস্বরূপ সাড়া কোন পক্ষ হইতে পাওয়া যায় নাই তবুও গান্ধী ক্যাম্প তাঁহাদের এই সেবাকার্য বিশ্বাসের সহিত করিয়া যাইবেন। তাঁহারা হতাশ হন নাই বা বিশ্বাস হারান নাই। শুভ শুভ প্রচেষ্টার ক্ষয় নাই—উহা সর্বদাই অব্যর্থ, ক্রিয়াশীল এই বিশ্বাসে তাঁহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন। অবশ্য পরিণতি ভগবানের হাতে। তবে সরকার যদি অকুণ্ঠমনে নির্দ্বিধ হইয়া গান্ধী ক্যাম্পের সহিত সহযোগিতা করিতেন অথবা মুসলিম জনসাধারণ সেই সহযোগিতা করিতেন তাহা হইলে নোয়াখালিতে গান্ধী ক্যাম্পের কাজ এতদিনে শেষ হইতে পারিত। গান্ধী ক্যাম্প সর্বদাই সেই সহযোগিতা পাইতে চাহেন জনসাধারণ তথা সরকারের নিকট হইতে। সংক্ষেপেত গান্ধী ক্যাম্প নিম্ন কার্যক্রম হাতে লইয়াছেন।

১। প্রার্থনা সভা

২। অস্পৃশ্যতা বর্জন—সামুহিক ও পরিবারগত

৩। মহিলা সভা—প্রার্থনার জন্য মহিলাদের নির্ভীকভাবে সমবেত করা

৪। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি ও বুনিয়াদি শিক্ষা-পদ্ধতির পার্থক্য ব্যবহারিকভাবে বুঝানো—ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা বানরসেনা সংগঠন দ্বারা নাচ ও খেলা দ্বারা সমাজ-জীবন জীবন্ত করা, বুনিয়াদি শিক্ষার প্রবর্তন।

৫। অহিংসার প্রতীকরূপে চরখার প্রবর্তন উহা স্বাবলম্বনের কেন্দ্রবিন্দু গ্রাম-পঞ্চায়েতের দ্বারা ইহার প্রবর্তন চেষ্টা।

৬। পঞ্চায়েৎ-গঠন-পঞ্চায়েত ধর্মাবাস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লইয়া কাজ করিবে।

৭। সমবায় প্রতিষ্ঠা গঠনের দ্বারা গ্রামের সর্বাংগীণ উন্নতির প্রচেষ্টা।

শিশুদের স্বাধীনতা

শ্রীমতী হেমপ্রভা ঘোষ।

স্বাধীনতা শব্দের অর্থ "বাহ্যিক বাধ্যতা হইতে মুক্তি।" শিশুদের স্বাধীনতা কথাটা একটু অদ্ভুত শুনাইলেও ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য্য আছে। জাতির গঠনে শিশুদের স্থান শীর্ষে—তাহারাই জাতির ভবিষ্যৎ আশার স্থল। শিশুর মন দ্রুত গতিতে পূর্ণ প্রসারের পথে ধাবিত হয়। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে নানারূপ বাধার আবর্ত্তনের মধ্যে রাখিলে মনের স্বচ্ছন্দ গতি প্রতিহত হইয়া নানাপ্রকার কুফলের সৃষ্টি করে।

শিশুর অনুসন্ধিৎসা তাহাকে পিতা, মাতা, শিক্ষক, গুরুজন প্রভৃতিকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে উৎসাহিত করে। আমাদের উচিত তাহার কৌতূহল যথাসম্ভব চরিতার্থ করা। কেবল মাত্র 'ইহা করিতে নাই' 'ইহা তোমার জানার প্রয়োজন নাই' ইত্যাদি উত্তর দ্বারা শিশুর মানসিক পুষ্টির পথে বাধা সৃজন করা উচিৎ নহে।

যদি কোন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর তাহার বুদ্ধির অগম্য হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া বিষয়-বস্তুটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল আংশিক ভাবে চরিতার্থ করিতে হইবে। কেবলমাত্র 'তুমি বুঝিতে পারিবেনা' বা 'তোমার বোঝবার প্রয়োজন নাই' বলিয়া তাহার প্রশ্ন চাপা দেওয়া অন্যায়।

দৈহিক শাস্তি (যেমন বেত্রাঘাত), দ্বারা শিশুকে শিক্ষাদান করা অত্যন্ত ভুল। এরূপ করিলে তাহার স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। যদি শিশু কোন প্রকার অন্যায় করে তাহার কার্য্যের অযৌক্তিকতা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বেত্রাঘাত করিলে অনুরূপ কার্য্য হইতে কিছুকালের জন্য বিরত করা যাইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল হয় না।

মিথ্যা বলার জন্য বেত্রাঘাত করিলে, শিশু মিথ্যা বলিতে ভয় পাইতে পারে কিন্তু তাহাতে সত্যের প্রতি তাহার অনুরাগ বাড়ে না। অপর দিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর উপর তাহার ক্রোধ ও ঘৃণা জন্মে এবং সে শাস্তি এড়াইবার জন্য নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করে।

ভয়ের দ্বারা কোন প্রকৃত শিক্ষাদান সম্ভব নহে।

শিশু অনুকরণ প্রিয়। তাহারা অনেক সময় কোন প্রকার বিচার করিয়াই—বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুকরণ করে। তাহাদের অর্থ-হীন নিষেধাজ্ঞা দ্বারা অনুকরণ হইতে নিবৃত্ত করা শিক্ষাদানের প্রকৃত পথ নহে। অর্থশূন্য নিষেধাজ্ঞা মানসিক উন্নতি খর্ব্ব করে। তাহাদের সম্মুখে আমাদের এরূপ ব্যবহার বা কার্য্য করা উচিত নয়, যাহার অনুকরণ দ্বারা শিশুর ক্ষতি হয়।

যে পিতা শিশুকে মিথ্যা কথা বলিতে নিষেধাজ্ঞা করেন ও অথচ নিজে কোন অভ্যাগত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার করিবার ইচ্ছা না থাকিলে শিশু দ্বারা "বাবা বাড়ী নাই" এই কথা বলিয়া পাঠান তিনি এই সামান্য কথা বুঝিতে পারেন যে, ইহা পরস্পর বিরোধী শিক্ষা। তাঁহার এই কার্য্য সুশিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করে।

মর্য্যাদা বোধ (Selfrespect) উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শিশুকে শিশু বলিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহার করিলে শিশুর মর্য্যাদা বোধের হানি করা হয়। শিশুদের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমাদের সর্ব্বদা চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা উদ্ধত ব্যবহার দ্বারা বিরুদ্ধ ভাব জাগরিত না করি।

'ভয়' শিশুর স্বাধীনতার একটি প্রধান অন্তরায়। শিশুর শিক্ষাদানে ভয়ের কোন স্থান নাই। অজ্ঞাত ও অপরিচিত বিষয়কে শিশু ভয় করে। এই ভয় সম্ভবতঃ একটি জন্মগত সংস্কার (inherited instinct). আদিম যুগের মানবের এই ভয় প্রবল ছিল না। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানব-জাতি ক্রমশঃ অধিকতর ভয়-প্রবণ হইয়া উঠিতেছে। এখনও দেখা যায় অসভ্যদের মধ্যে সভ্য জাতির অপেক্ষা ভয় অনেক কম। শিশুদের মনকে ভয়মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভয় শূন্যতা শিশুর মনে সাহস আনে, কাপুরুষতা

প্রবৃত্তি হীন প্রবৃত্তিকে দমন করে ও মানসিক ক্রমবিকাশে সহায়তা করে। কতকগুলি মানসিক আবেগের জন্ম ভয়ের মধ্যে। মানসিক বিকাশের বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, অভিমান (Sensitiveness) লাজুকতা (Shyness) প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ অধিকাংশ স্থলে ভয়। উদাহরণ স্বরূপ—যদি কোন শিশুকে একবার কোন সভায় গান করিতে বলা হয় এবং সে গান করিতে না পারিলে তাহাকে সে জন্য পরিহাস করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐরূপ অবস্থায় তাহার গান করিতে ভয় হইবে এবং ক্রমশঃ কিছুদিন পরে তাহার গান গাওয়া সম্বন্ধে লাজুকতা জন্মিবে।

শিশুর মনকে নানাবিধ সহজ কথায় ভয়প্রসূত অবস্থা হইতে মুক্তি দিতে হইবে। সহজে বলিতে গেলে আমাদের অবহিত থাকিতে হইবে যাহাতে এমন কোন অবস্থার উৎপত্তি না হয়, যাহা শিশুর মনে ভয় আনে। অভিমান (Sensitiveness) ও লাজুকতা (Shyness) প্রভৃতি ভয়জাত দমন মূলক আবেগগুলি (repressive emotions arising from fear) যে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির পথে বিশেষ বিঘ্নের সৃষ্টি করে ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

অনেক সময় দেখা যায় গুরুজনেরা শাস্তির ভয় দেখাইয়া শিশুর নিকট সম্মান দাবী করেন। এরূপস্থলে বাহ্যিক সম্মান কতটা আন্তরিক তাহা বিবেচ্য। স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ শিশুর মন এরূপ অবস্থায় বিদ্রোহী হয় ও গুরুজনের বিরুদ্ধে তাহার মনে ক্রোধ, ঘৃণা, দ্বেষ প্রভৃতির উদ্রেক হয়।

শিশুকে ভয় দেখাইয়া নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা ভুল। দুর্নীতির প্রতি কৃত্রিম বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করিলেই নৈতিক কার্য্যে আগ্রহ বা ভালবাসা হয় না। ভয় বিয়োগাত্মক গুণ মাত্র। ইহা কোন প্রকৃত গুণ নহে (not a Positive virtue) যখনই আমরা শিশুকে কোন আজ্ঞা করি তখনই আমাদের উচিত শিশুর নিকট আমাদের আজ্ঞার উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করা। এরূপ করিলে প্রকৃত পক্ষে শিশুর স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হয়না কারণ শিশু আমাদের আজ্ঞার অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাহার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়। (Childs' will is converted to our will.)

অর্থহীন আজ্ঞা (meaningless command) নানা কারণে ক্ষতিজনক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক সময়ে শিশুকে অকারণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা হয়। শিশুর চঞ্চলতা তাহার জীবনী শক্তির পরিচায়ক; এরূপ অর্থহীন আজ্ঞা এই শক্তিকে ব্যাহত করে, তাহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার ক্ষতি হয়। এইরূপ ব্যবহারে অনেক সময়ে শিশুর শিক্ষয়িত্রীকে ভাল লাগে না। শিশুর শিক্ষয়িত্রীর প্রতি আকর্ষণ শিক্ষার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান, কারণ ইহা সুশিক্ষার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

আমাদের কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ তাহাকে স্বেচ্ছাচারী করা নহে। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর অসৎ ইচ্ছা গুলিকে দমন বা সংযত করিয়া সৎ ইচ্ছা গুলিকে শক্তিশালী বা প্রবল করা। শিশুর তরুণ অনুকরণ-প্রিয় ভাব-প্রবণ বিচার-বুদ্ধি-বিহীন মনকে এরূপ ভাবে পরিচালনা করা উচিত, যাহাতে ক্রমশঃ তাহার সৎ প্রবৃত্তিগুলি অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করিতে পারে।

বাগানের আগাছাগুলিকে পরিষ্কার না করিলে ভাল গাছগুলি বাড়িতে পারে না, এই আগাছা পরিষ্কার করার মত আমাদের শিশুর অসৎ ইচ্ছাকে অবশ্যই বাধা দিতে হইবে, কিন্তু যখনই বাধা দিব, তখনই আমাদের সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা আমাদের বাধা দিবার আগ্রহে সদিচ্ছার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ ও শিশুর জীবনী শক্তিকে খর্ব্ব না করি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে মালী আগাছা পরিষ্কার করিবার সময় সাবধান হয়, যেন ভাল গাছের বা জমির উর্ব্বরতার কোন ক্ষতি না হয়। যে বাগান যে গাছটীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী ভাল মালী সেই

বাগানে গাছটীর উন্নতীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে। ভাল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত বিশেষত্বের স্ফূর্তি ও ক্রমবিকাশের প্রতি যত্ন নেন। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর শাসনের মূলগত নীতি হওয়া উচিত স্নেহের সহযোগিতার মধ্য দিয়া শিশুর শারীরিক ও মানসিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা।

ভাল শিক্ষয়িত্রী শিশুদের সহিত এমন ব্যবহার করেন যে শিশুরা তাঁহাকে নিজেদেরই একজন মনে করে। শিক্ষয়িত্রী খেলার মধ্য দিয়া তাহাদের শিক্ষা-দান করেন। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি তাহাদের মনে দায়িত্ববোধ, অনুরাগ, সহযোগিতা, সরলতা, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি গুণাবলীর উদ্রেক করে।

শিশুর চরিত্র গঠনের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়—শিশুর সহিত শিশু না হইতে পারিলে প্রকৃত শিক্ষাদান করা যায়না। শিশুর সহিত ব্যবহারে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, কোনরূপে তাহার আত্ম সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সহিত শিশুর সম্বন্ধ অত্যন্ত মধুর, এই সম্বন্ধ যত গাঢ় হয়, শিক্ষাদানও তত সহজ ও সম্পূর্ণ হয়।

স্ত্রীজাতি শিশুর মনের রহস্য পাঠ করিবার স্বাভাবিক শক্তির অধিকারিণী। এজন্য মাতা শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন কার্য্যে শিক্ষয়িত্রীকে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। শিশুর শিক্ষা কার্য্যে পিতার স্থান মাতার তুলনায় গৌণ।

ভালো লেখা

সন্তোষকুমার অধিকারী

আমার বন্ধুটির গল্প লেখায় একটু হাত ছিলো। কতকগুলি সাময়িকে তার অধুনিক মনোবৃত্তিপোষিত লেখাগুলি সমাদরও পেয়েছিলো। এক সময়ে লোকে অনুযোগ করলো তার লেখা ষ্টাইলের বাঁকাচোরা গহ্বরে প'ড়ে আইডিয়ার দুরূহ জটিলতার পথ ব'য়ে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠ্‌ছে। বন্ধুটি নিরুপায় হ'য়ে আমার কাছে মতামত চাইলো; দায়িত্ব হালকা করার উদ্দেশ্যে এক কথায় বললাম—ভালো লেখা লেখো, লোকে সমাদর করবেই।

—ভালো লেখা.....মানে, আমি যা লিখি তাকি ভালো লেখা নয়?

মুস্কিলে পড়লাম। একটু ভেবে নিয়ে বললাম—তোমার লেখা সব ত' পড়িনি। তবে আমার মনে হয়, গল্প লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে লোককে খুসী করার প্রয়াস সামনে রেখে অথবা নিজের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাপ্রবণতা প্রচার করার চেষ্টায় যদি লেখো, তবে সে লেখা গল্পও হ'বে চিন্তাগর্ভও হ'বে কিন্তু ভালো লেখা হয়ত হ'বে না। বন্ধুটির চোখদুটি বড় হয়ে উঠ্‌লো; সে বললো—তবে ভালো লেখা কি একটা অদ্ভুৎ জিনিষ যা চেষ্টা ক'রে হয়না, সাহিত্যিক প্রতিভা থাকলেও নয়।

বাঁ ক'রে হাতের সামনে রাখা বইখানা খুলে ফেললাম, বললাম শোন, ভালো লেখার জন্যে কি দরকার—"Observe acurately, think clearly, choose the right words.....be as fresh, brief and original as you can and above all do not be afraid of being natural." এইটা সব-সময়েই মনে রাখবে যে তুমি যা লিখবে সেটা যেন সকলে পড়তে পারে; সহজ ও সরল হ'বে তার ভাষা। ষ্টাইলের গোলক ধাঁধাঁয় বক্তব্য যেন হারিয়ে না যায়। বক্তব্য বিষয় যেন নিঃসংশয়ে তোমার মনের চিন্তাধারাকেই প্রকাশ করে। মনের চিন্তাধারাতে যেন তোমার ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। অর্থাৎ তুমি যা' ভাববে সেটা যেন তোমার নিজের পথেই ভাবা হয়, আর তোমার

যে তাদের রূপ লেখার প্রকা
তোমার নিজের সন্দেহ না থাকে।

সাহিত্য মানুষের ব্যক্তিমানসের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্যিকের বক্তব্য সকলকে সমান খুশী না করতে পারে কিন্তু তার নিজের চিন্তাধারার অভিব্যক্তি যেন পরিপূর্ণ হয়, সেখানে ফাঁকি না থাকে। তারপর সাহিত্য ব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌লেও সেই ব্যক্তির চিন্তাধারার পটভূমিকায় তার সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব প্রত্যক্ষ থাকে। কাজেই সাহিত্যও সমসাময়িক সমাজ রাষ্ট্র ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করতে পারেনা। উপরন্তু সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবিও তার মধ্যে ফুটে উঠ্‌বেই। যদি তা না ওঠে, তবে সে নিছক ব্যক্তিগত-সামগ্রী হ'বে, সাধারণের নয়।

—কিন্তু তা'হ'লে ইতিহাস বা সংবাদপত্রের রিপোর্টকেও তা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে, নয় কি?

—না তা চলেনা। কারণ সাহিত্যকে আর্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলেনা। বরং শিল্পীমনের স্বতঃস্ফূর্ত যে বিকাশ—তাকেই অবলম্বন ক'রে সাহিত্য জাগে। কাজেই আর্ট বা সূক্ষ্মকলার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রকাশও থাকবে সাহিত্যে। অন্তরে আগে আসে রসানুভূতি; তার প্রকাশ হয় বিভিন্নরূপে—চিত্রশিল্পে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে বা নৃত্যে। তাই যে লেখক বা পাঠক বা শ্রোতা,—সেও যেন এই রসের অনুভূতি পায়, শিল্পীজনের আনন্দের ভাগটুকু পায়। শিল্পীমানসের চিন্তাধারার বিস্তারটুকু পায়।

এই দু'পরিবেশনের দক্ষতার ওপরেই শিল্পীর শক্তি নির্ণয় করা যায়। স্থান ও কালকে যে স্বীকার করে অথচ তাকে অতিক্রম করে যায় সেই সত্যকার কলাবিৎ। রবীন আমার আজকের সমাজ জীবনের যে প্রতিকৃতি আমি আঁকলাম তা' যদি আমার প্রতিবেশী সকলের মনে আনন্দ ও চিন্তার সামগ্রী দেয় তবে তাকে নিশ্চয়ই সাহিত্য (art) বলা চলবে। আর তার রস ও আনন্দানুভূতি যদি সর্বযুগের ও সকলদেশের লোককে আনন্দ দেয় তবেই তা' হ'বে সার্থক পরিবেশন। কিন্তু যার লেখা সাময়িকভাবে মানুষের মনে আনন্দের সৃষ্টি করে, স্থায়ী হয়না, কিম্বা যে লেখা এক দেশের লোককে আনন্দ দিলেও অন্যদেশের লোককে বঞ্চিত করে—সে লেখা সার্থকলেখা বা ভালো লেখা নয়।

মানুষের চিন্তাধারায় দুটো স্তর আছে। একটা হচ্ছে তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিসঞ্জাত, আর একটা আরও সূক্ষ্ম;—এই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির স্তর থেকে সময় ও পরিধির বাঁধন কাটিয়ে ওঠায়; তার মধ্যে এক অতিন্দ্রীয় রসের উপলব্ধিতে। সাহিত্যে এই ভুলটা সকলেই করেন; তাই যখন দেশি উপলব্ধির গভীরতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাহিত্যিকরা ওই মধ্যবর্তী স্তরেই আটকা প'ড়ে গেছেন, তখন দুঃখ পাই তাঁদের জন্যে। জাতীয়তার মধ্য দিয়ে বিশ্বজনীনতাকে, দৈহিক প্রেমের মধ্য দিয়ে বুদ্ধিজাত প্রেমকে, ব্যক্তির ভালোবাসা থেকে মানুষের ভালোবাসাকে যে অনুভব করতে পারলোনা, সে এই পরিধির গণ্ডিকে কাটাতে পারেনি বুঝতে হ'বে।

মানুষের চিন্তাধারা প্রতিদিনই বিবর্তিত হ'চ্ছে। মানুষের বিশ্বাসের জগৎ ভূমিকম্পের আলোড়নে ভেঙ্গে পড়ছে। কাল মানুষ যে মতবাদে বিশ্বাস করত, আজ তা'তে করে না। সাহিত্যে এই বিশ্বাসের ধারারও পরিবর্তন ঘট্‌ছে। বিষয়বস্তু প্রতিদিনই নতুনভাবে গ'ড়ে উঠ্‌ছে। আদর্শবাদী সমাজ কাল যে সকল ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারতো, আজ সে ব্যক্তিত্বকে হয়ত উপহসিত হ'তে হ'লো। জীবনের অজস্র বৈচিত্র—তার অগ্রগতি অসঙ্গতিতে পূর্ণ। চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা ক্রমান্বয়ে বদলে চলেছে। জীবনের অসঙ্গতি, চরিত্রের দুর্বলতার মুহূর্তগুলি, ব্যক্তিত্বের ব্যর্থতা—এ সমস্তের নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে গেলেন মনীষীরা।

ভালো লেখক এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে পারেন; কিম্বা নিজে তার নতুন রূপ দিতে পারে। যারা জীবনকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখাতে পারে জীবনের বিকাশকে নতুন পরিবেশে বিচার করতে পারে তাদের

ওরিজিন্যালিটি আছে বলা চলে। কিন্তু এই ওরিজিন্যালিটি চেষ্টায় আসে না। চিন্তাধারার সারল্য থেকেই আসে। ফুলকে যেমন জোর করে ফোটানো যায়না। জোর ক'রে ফোটালে যেমন তার কোন গন্ধ থাকেনা ওরিজিন্যালিটিও তেমনি জোর ক'রে আনা যায়না।

সাহিত্যের প্রকাশ মূল তিনটি ধারার মধ্যে। উপন্যাস, গল্প ও কবিতা। উপন্যাসের বিভিন্ন সংজ্ঞা বিভিন্ন চিন্তাশীল লেখক দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন লেখকের উপন্যাসের কাঠামো বিভিন্নভাবে গ'ড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের লেখকরা বলতেন উপন্যাসের অর্থ চরিত্রসৃষ্টি। কিন্তু বর্তমানে চরিত্র কথাটির ওপরে মানুষের সন্দেহ এসেছে। জীবনের পরস্পরবিরোধী ধর্মগুলি ঘটনা-পুঞ্জের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই বর্তমান লেখকের কাজ। যাই হোক উপন্যাসের রূপ বর্ণনা করতে একটি জিনিষকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন নি। সেটা হ'চ্ছে তার বিস্তৃতি।

সত্যই উপন্যাস যেন একটা স্রোতস্বতী নদী। তার উৎস লেখকের মানস সরোবরে। তার বিলয় সংশয়ের সমুদ্রে! সমস্ত দেশটাকেই প্লাবিত ক'রে চলেছে সে। গতিপথের দু'ধারে কোথাও কোলাহলমুখর জনপদ, কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও বা ধূ ধূ বালুচর। কোথাও সে স্রোতে ও আবর্তে স্ফীত কলেবরে কীর্তিনাশার মত দু'ধারে শুধু ধ্বংশ সৃষ্টি করে চলেছে। কোথাও তার অববাহিকায় পলিসংযোগে মাটি উর্বরা হ'য়ে উঠেছে। শ্যামশস্য-সম্ভারে তীর তার সমৃদ্ধ।

উপন্যাসের এই বিস্তৃতিতে মানবজীবনের সবকিছু ধরা পড়ে। তার সমাজ জীবন, রাষ্ট্রচেতনা, তার ধর্ম-সংস্কার, তার দেশাচার, তার ব্যক্তিগত জীবনের মর্ম-কাহিনী—অজস্র স্বপ্ন, অজস্র ব্যর্থতা। মন এখানে অবাধে পাখার মতই আকাশচর হ'তে পারে। সীমার বাঁধনে আট্‌কা পড়ার ভয় নেই।

আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম। নেই বললেই চলে। আমাদের সাহিত্যিকরা মনকে এতখানি বিস্তৃতির মধ্যে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ন'ন। তাঁরা জানেন কাহিনী রচনা করতে—যে কাহিনীতে বলিষ্ঠজীবন অবশ্যই আছে—যে জীবনে রূপ, রস ও স্বপ্ন আছে; ঘটনাপুঞ্জের মধ্য দিয়ে একটি সুচিন্তিত পরিণতিও আছে। অর্থাৎ বড় গল্পের টেক্‌নিক্ তাঁদের ভালোভাবেই জানা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দু'চারটি বই বাদ দিলে উপন্যাস আমাদের কই? তারাশঙ্কর মূলতঃ কাহিনীকার। দ্বিতীয়তঃ তাঁর গল্পের পরিধি সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন। গল্পকে যদি বা বড় করতে পারেন বৃষ্টিকে বড় করতে পারেন না। রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাঁর বই পড়ে যাওয়া চলে কিন্তু অবাধ সঞ্চরণের অভাব রয়েছে তাতে যুগকে ছাড়িয়ে সর্বযুগের হ'তে আপত্তি আছে তাঁর। তাঁর পঞ্চগ্রামের বিষয়বস্তু অবশ্য অনেক বড়; অজস্র চরিত্র ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে। কিন্তু তবু ঐ একই অভিযোগ খাটে ঐ বইখানি সম্বন্ধেও। "ইন্দ্রেলি বাঁকের উপকথা"ও তাই। তাঁর উপন্যাসের যেন একটা আলাদা পরিধি। সেই পরিধির মধ্যে চরিত্রগুলি যত উজ্জ্বল, পরিধি থেকে বাইরে টেনে আনলে তারা ততখানিই নিষ্প্রভ। এই ব্যবহারিক জগৎ ছাড়াও যে আর একটা জগৎ আছে—যে জগতের মানুষ প্রতিমুহূর্তে নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করে, যে জগতের মানুষ অসঙ্গতির বালুচর ব'য়ে এগিয়ে চলে, সেই অবচেতন মানসের পরিপূর্ণ উন্মোচন সম্ভব হয়নি তারাশঙ্করের লেখায়—হয়ত মাণিক বন্দোপাধ্যায় বা অন্নদাশঙ্করেরও হয়নি।

মাণিক বন্দোপাধ্যায় মনের একটি অধ্যায়কে অনুশীলন করতে গিয়ে অঙ্গগুলির কথা একেবারেই ভুলে গেছেন। দৈহিক আকর্ষণ ও অনুভূতির যে আবেগে তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের মানস গ'ড়ে উঠেছে—তারও পেছনে আর একটি শক্তির প্রভাবকে তিনি খুঁজে পাননি। যে শক্তি সর্বযুগে ও সবকালে মানুষের বিকাশকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলে, দেহকে সে অস্বীকার করে না। কেননা কোন একটি অঙ্গও তার কাছে মূল্যহীন নয়। দেহকে সে প্রতিষ্ঠিত করে; দেহের আকর্ষণকে বহৎ ক'রে তোলে দেহাতীত অনুভূতির দ্বারা।

তাই যখন দেখি 'লরেন্সের' মত লেখককে—যিনি এই স্বাভাবিক দৈহিক আবেগকে স্বীকার করে নিতে গিয়ে শুধু দেহতত্ত্বেই নিজেকে রুদ্ধ ক'রে ফেললেন, কিম্বা 'হাক্সলি'র মত লেখককে—যিনি আত্মার মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেহকে ঘৃণা ক'রেছেন,—তখন মনে হয় এঁরা কেউই সম্পূর্ণ ন'ন। এই দেহের অনুভূতি শুধু সত্য নয়, মহৎও; কারণ দেহের অতীতে যে আনন্দরূপের আস্বাদন, তাকে স্পর্শ করতে হ'লে দৈহিক আবেগকে স্বীকার করে নিয়েই এগোতে হ'বে। দেহই সম্পূর্ণ নয়, পথ মাত্র। দৈহিক আকর্ষণ যে জীবনকে আরও ব্যাপক ও বিচিত্ররূপে আরও মহৎ ক'রে পাওয়ার অবলম্বন মাত্র—এ কথা ভুলে যাই বলেই দেহকে ঘৃণা করি আমরা। পৃথিবীতে কোন শক্তিই যেমন ফুরিয়ে যায় না, কোন বস্তুও তেমনি ফুরিয়ে যায় না। প্রত্যেক টুকরো শক্তি যেমন আরও বড় শক্তির সৃষ্টি ক'রে, বস্তুর প্রত্যেকটি অণুপরমাণুও তেমনি বৃহত্তর বস্তুর সংস্পর্শে সার্থক হ'য়ে ওঠে।

জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য নয়। জীবনের খণ্ডাংশ মাত্র নয়, পরিপূর্ণ জীবনের রূপ লেখকের চোখে ফুটে ওঠা চাই। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির জগৎ ছাড়াও আর একটি জগৎ আছে—যেটা সত্যকার অন্তর্দৃষ্টির সামনেই শুধু পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। জীবনের এই সমগ্র রূপ যিনি দেখতে পেয়েছেন তিনিই ভালো লেখক। কোন শক্তিই তাঁর কাছে অবহেলার নয়, কোন বস্তুই অনর্থক নয়। পৃথিবীর তুচ্ছতম বস্তুও অপূর্ব হ'য়ে দেখা দেয় তাঁর চোখে। মানুষকে তিনি নতুনরূপে দেখতে পান।

স্মৃতির-বন্ধন

লক্ষ্মীদেবী

হারাণো দিনের স্মৃতি বিজড়িত তিথি।
হৃদয় রাঙালো শত-উচ্ছ্বাসে—
কত না সে মধু গীতি।
কাল-বৈশাখী-গোধূলি লগনে
মাতন জাগালো গগনে-পবনে
গবাক্ষ পথে আমি আন্ মনে—
দাঁড়ালু কখন মাতি,
ভীতি-বিহ্বলা-কিরে চ'লো বলে'—
ডেকেছিলে প্রিয় সাথী।
বানে-অভিমানে-ঘুমে-জাগরণে—
কারণ-অকারণে প্রিয়া,
আঁখি ছল ছল্ হাসি খল্-খল্
প্রেম-উজ্জ্বল্ হিয়া।
সে দিনের সেই ছল ক'রে চাওয়া
শত-চুম্বনে বুকে তুলে লওয়া
আজ মনে পড়ে সেই সে দিনের—
বিরহ-মিলন রাতি।
কুসুম মালিকা দিয়েছিলে গলে
ডেকেছিলে-'প্রিয়সাথী'।

আজ কতদূরে—কাছে তুমি নাই—
অনুভূতি শুধু সাথে,
এই সান্ত্বনা মনের দেউলে—
জাগিছ দিবস-রাতে,
দিনের কঠোর বাস্তব-মাঝে
তব-প্রেরণার সুর আজও বাজে,
বাজাই শুধু-জীবন বীণারে—
প্রেম-মাধুর্য্যে মাতি।
অলখে কখন নিভে যায় ধীরে—
জীর্ণ কুটীরে বাতি।
মরণ আসিছে আঁধার আবাসে
স্বপন মালিকা হাতে,
কল্পনা আঁকে-আলপনা-পথে
বরণের ডালা সাথে,
পূবালী-বাতাস-মৃদু গুঞ্জনে,
শেষের বারতা ব'লে যায় কানে,
তব-দানের অর্ঘ্যে অতিথি রাঙালো
দূরে গেলো বাঁধা ভীতি।
মুক্তি রচিল প্রেমের শ্মশানে
মহা-রঞ্জন গীতি।

শিল্পী

অনুবাদক—শ্রীসলিল গঙ্গোপাধ্যায়

লেখক—জন গ্যালস্‌ওয়ার্দি

কৈশোরের প্রথম থেকেই ওকে আমি জানতুম। কারণ বাবার প্রায় সমস্ত বুট জুতোই তো ওর হাতে তৈরী। ওয়েষ্ট এণ্ডের ছোট এক গলির ভেতর ওদের দোকান। ওদের অর্থাৎ—ও আর ওর বড় ভাই। দুটো দোকানকে জুড়ে একখানা করা হয়েছে। এখন আর সে দোকান নেই, কিন্তু তখনকার দিনে ওটাই ছিল সবচেয়ে রুচিসম্মত ভাবে সাজানো।

একটা লক্ষনীয় শান্ত বৈশিষ্ট্য—সেই দোকান ঘরটায়। কোনো রাজকীয় পরিবারের সাথে দেওয়া নেওয়ার স্বাক্ষর ছিল না কোথাও—শুধু তাদের জার্মাণ নামটুকু—গেসলার ব্রাদার্স। জানালায় কয়েকজোড়া বুট। রেডিমেড জুতো যে তার দোকানে থাকতো না তা' জানতুম, এবং এও জানতুম যে অর্ডারই সে নিক্ না কেন খারাপ হওয়া তো দূরের কথা বিন্দুমাত্র ত্রুটির কল্পনাও তা'তে অসম্ভব। অথচ বেশ মনে পড়ে যতবারই দেখেছি সেই বুটজোড়া ঝুলছে জানালায়, প্রতিবারই মনে একটা অস্বস্তি এসেছে। অনেক সময় ভেবেছি—তবে কি ঝুলিয়ে রাখবার জন্যই ও ওগুলোকে কিনেছিল? কিন্তু তাই বা কেমন করে সম্ভব! যে চামড়ায় নেই তার নিজের হাতের স্পর্শ সে চামড়া তো তার বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে পারে না। আর তা ছাড়া সেই 'পাম্প সু'র জোড়া ছিল অসাধারণ চমৎকার। ধূসর চামড়ার চক্‌চকে রাইডিং বুটগুলো দেখলে মনে হত, একশ'বছর আগে কেউ তা পা'য় দিয়ে গেছে। হটে উঠতো আমার সামনে সেই পাদুকাধারীদের সম্পূর্ণ চরিত্রটি। কী নিখুঁত আর কী চমৎকার! এ জুতো একমাত্র তার পক্ষেই তৈরী করা সম্ভব যে তার সামনে সমস্ত জুতোটার একটা প্রকৃত অবয়ব দেখতে পায়। যদিও এসব চিন্তা বহু পরের কিন্তু আমার সেই চৌদ্দবছরে তার সাথে প্রথম পরিচয়ের পালাতেই তাদের দৃঢ় মর্য্যাদাবোধ আমাকে বেশ একটা নাড়া দিয়েছিল। স্পষ্ট করতে পেরেছিল তারা আমার অন্তরকে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে আজো আমার মনে হয় সত্যিই ওরা যে জুতো তৈরী করতো তা' অদ্ভুত, তা আশ্চর্যময়। ওদের জুতো আজো রহস্যময় হ'য়ে রইলো আমার কাছে। বেশ মনে আছে আমার সেই ছোট্ট পা দুটি এগিয়ে দিয়ে কত সঙ্কোচ নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—

—আচ্ছা জুতো তৈরী খুব শক্ত না!

তার লালচে দাড়ির ফাঁকে বেরিয়ে এসেছিল অবজ্ঞাসূচক একটু হাসি আর তার ছোট্ট উত্তর

—এ একটা কারিগরি।

রেখাবহুল মুখটি তার যেন চামড়ার তৈরী। কোঁকড়ানো লাল দাড়ি আর চুল। পরিষ্কার কণ্ঠস্বর। ধূসর নীল ওর চোখদুটো। তাতে একটা আশ্চর্য্য সরল গাম্ভীর্য্য। ভাইটিও ছিল তার তারই মতো। যদিও একটু ছিমছিমে পাতলা চেহারা। দিনের পর দিন বিরাট ব্যবসায়ের ভারে যা আরো শুকিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের শেষে "আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখবো" এ কথা না বললে সত্যিই ওর ভাইয়ের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত হাতে পারিনি আর এও জানতুম না যে যদি কেউ ওর থাকে—সে ওই ভাই।

খুব ঘন ঘন ওর কাছে যাতায়াতের সুযোগ হতো না। কারণ ওদের তৈরী জুতো ভীষণভাবে টেঁকসই। মনে হতো অকৃত্রিমতাকে ওরা সেলাই করে দিয়েছে জুতোর প্রতিটি ফাঁকে।

প্রত্যেক অতি সাধারণ দোকানের মত কাউকেও ওখানে বলতে শুনিনি—"ওহে আমার একটু তাড়াতাড়ি দেখতো, আমার আবার যেতে হবে।" গীর্জায় প্রবেশের বীরত্ব নিয়ে খদ্দেরকে ঢুকতে দেখেছি সেখানে। বসে তারা অপেক্ষা করতো সেই কাঠের চেয়ারে। এ অবশ্য বলাই বাহুল্য, সে দোকানে কেউই কখনো থাকতো না। আর, কেউ আসবার সাথে সাথেই সেই প্রায়ান্ধকার, চামড়ার মসৃণ গন্ধে ভরা গুহার মত দোকানটার ওপরে উঁকি মারতে দেখা যেতো তাকে,

হয়তো ওর ভাইকে। তারপর একটা গন্ধ মাখানো ব্রাশ। চটর চটাস্ চটাস্, সেই ব্রাশ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। তারপর সে এসে দাঁড়াতো একটু ঝুঁকে। পায়ে ওর জামার বালাই নেই। একটা হাতকাটানো ব্লাউজ। চোখগুলো মিটমিট করতো। যেন এইমাত্র উঠে আসছে কোনো জুতো তৈরীর স্বপ্ন থেকে। পেচার মত আশ্চর্য হ'য়ে গেছে হঠাৎ লাগা দিনের আলোয়। বিরক্ত হ'য়ে গেছে যেন এই স্বপ্নভোগের অভাবিত বাধায়।

বলতাম—কেমন আছো! দেখতো আমার এক জোড়া রাশিয়ান বুট হবে কিনা।

কোনো কথা না বলে ও চলে যেতো। হয়তো যেখান থেকে নেমে এলো এইমাত্র, অথবা লোকানেরই অন্য কোনো অংশে। বসে বসে অপেক্ষা করতাম। চারদিকে ওর ব্যবসায়ের সুরভি। কিন্তু তাড়াতাড়িই ও ফিরে আসতো। সরু সরু শিরা-ওঠা হাতে একটা চকচকে বাদামী চামড়া। সেটার দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে বলতো—কী চমৎকার চামড়া না! আর যখন আমিও তার প্রশংসা করে উঠতাম আবার বলতো, —কবে দরকার আপনার?

—যত তাড়াতাড়ি হয়।

—আচ্ছা দিন পনেরো পরে আসবেন।

আর ওর বড় ভাই যদি আসতো, তবে বলতো—আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞেস করবো 'খন।

আমি আস্তে আস্তে বলতাম—আচ্ছা বেশ, আজ উঠি তাহলে।

চামড়ার দিকে তাকিয়েই আচ্ছন্নের মত ও উত্তর দিতো—আচ্ছা আসুন নমস্কার।

দরজার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেতাম, সেই চটিজুতো আবার শব্দ করতে করতে চলেছে কোন্ শিল্পের স্বপ্নে।

কিন্তু নতুন জুতো তৈরী করতে হলেই সে এক বিরাট কাণ্ড। খুলে ফেলতো ও আমার জুতো। বেশ খানিকক্ষণ তাকে হাতের ওপর রেখে চলতো তার পর্যবেক্ষণ। কী স্নেহপূর্ণ সে সমালোচনার দৃষ্টি! ওর মনে হতো কেমন সুষ্ঠু করে ও সম্পন্ন করবে ওর কাজ। নয়তো অভিযোগ করতো তাদের বিরুদ্ধে যারা এমন চমৎকার একটা শিল্পকে নষ্ট করে ফেলেছে। যত্ন নেয়নি মোটে। তারপর আমার পায়ের পাতাটি একটুকরো কাগজের ওপর রেখে পেন্সিল দিয়ে এঁকে নিতো তার সীমারেখা। ওর আঙুলগুলো কাঁপতো আমার পায়ের আঙুলের ওপর। মনে হতো ও যেন পরিপূর্ণরূপে বুঝতে পারছে কেমনটা আমি চাই—ঠিক কি রকম জুতোটি আমার দরকার।

কিছুতেই আমি ভুলতে পারবো না সেই দিনটা, যেদিন আমি বললুম—গেসলার আমার সেই বাইরে বেরুবার জুতোটা সেদিন যেন কেমন ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছিল।

তার নিঃশব্দতা আমাকে যেন বলছিল আমার কথা ফিরিয়ে নিতে। না হলে খানিক পরেই কেন সে বললে,

—কিন্তু ওরকম তো হবে না!

—আমার মনে হয় ওরকম হয়েছিল।

—হয়তো ওগুলো ভিজে গিয়েছিল।

—বোধ হয় না।

নামিয়ে নিলো ও ওর চোখদুটি। স্মরণ করতে লাগলো সেই জুতোজোড়ার ইতিহাস। অপরাধী মনে হলো নিজেকে যে কেন তাকে আমি এমন করে বলতে গেলাম। শেষে ও বললে,

—ও দুটো একবার পাঠিয়ে দেবেন, আমি দেখবো।

জুতো জোড়ার জন্য যেন আমিও একটা সহানুভূতি অনুভব করলুম। বেশ দেখতে পেলুম কী গভীর দুঃখ আর অনুসন্ধিৎসু মর্যাদাবোধ নিয়ে সে তাকিয়ে থাকবে আমার জুতোজোড়ার ওপর।

আস্তে আস্তে ও বললে,

—কতগুলো জুতো তৈরী থেকেই খারাপ হয়। যদি আমি কিছু না করতে পারি, আপনি দাম ফেরত নেবেন।

ফল হলো এই যে দু বছরের ভেতর আর সচেতনভাবে ও মুখো হলাম না।

অবশেষে একদিন গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম তার দোকানের দুটো জানালার একটায় ঝুলছে অন্তনানের সাইনবোর্ড। যদিও সে সাইনবোর্ড মুচির দোকানেরই তবু তারা শুধু রাজকীয় পরিবারের জন্যই। দেখতে পেলাম না সেই জানালাটার ধারে বহুপরিচিত জুতো-গুলোর ভীড়। এখন দোকানটিতে একটিমাত্র ঘর। চামড়ার গন্ধ আরো তীব্র। অন্ধকার হ'য়ে এসেছে ঘনায়মান। কিন্তু অনেক্ষণ হ'য়ে গেল। কেটে গেল নির্দিষ্ট সময়। অন্তান্তবারে তো কখনোই এত দেরী হয়নি! কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না সেই মুখ। শুনতে পেলাম না সেই চটির শব্দ। অবশেষে সত্যিই ও এসে দাঁড়ালো আর ঘরচে পড়া চশমার ফাঁকে তাকিয়ে বললো,

—আপনি·····না!

—হ্যাঁ আমিই। কিন্তু কী করবো, জুতোগুলো তোমার অস্বাভাবিকরকম ভালো। এখনো কেমন চমৎকার রয়েছে দেখো!

বলে পা'টা এগিয়ে দিলুম ওর দিকে। ও তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে

—হ্যাঁ, আজকাল আর লোকে ভালো জুতো চায় না।

তার সেই ঘৃণাত্মক দৃষ্টি আর কণ্ঠস্বরকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি বললাম

—দোকানের কী করেছো!

শান্তভাবে সে উত্তর দিলো,

—বড় খরচ, আপনার আর জুতোর দরকার নেই!

যদিও মাত্র দুজোড়ারই প্রয়োজন আমার ছিল, আমি অর্ডার দিলাম তিন জোড়ারই।

ঠিক আছে আবার দোকানে আসবার বেশ কয়েকমাস আগে এই ভাব নিয়েই দোকানে ঢুকেছিলাম যে বুড়ো লোকটাকে আমি আর ছাড়তে পারছিনা। যাই, একবার দেখে আসি। আর কেন জানি মনে হচ্ছিলো ওর বড় ভাই-ই আজ নেমে আসবে। আর সত্যিই যেন আমাকে স্বস্তি দেবার জন্ত ওর বড় ভাই-ই একটা চামড়া হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। স্বস্তির কথা বললাম এই জন্ত যে আমি নিশ্চিত ছিলুম—ওর বড় ভাইয়ের আমাকে নিঃশব্দে ঘৃণা করার মত সাহসও নেই। বললাম

—কেমন আছো!

অনেকটা এগিয়ে এলো সে আমার দিকে। বেশ করে আমায় দেখে নিয়ে বললে

—ভালোই আছি, দাদা মারা গেলেন।

এবার লক্ষ্য করলাম। হ্যাঁ ও-ই। জরা আর বার্দ্ধক্যের ভার নেমেছে ওর ওপর। আর কখনো ওর ভাইয়ের সম্বন্ধে ওকে বলতে শুনিনি। খুব দুঃখ হলো। বললাম,

—সত্যিই বড় দুঃখের কথা।

—হ্যাঁ আর উনি লোকও ছিলেন খুব ভালো। ভালো জুতো তৈরী করতেন। কিন্তু মারা গেলেন। এই বলে নিজের কেশবিরল মাথায় ও হাত রাখলে।

—ওই দোকানটা হাত ছাড়া হওয়ার ব্যথা উনি সামলাতে পারেননি। আপনার আর কোনো জুতো তৈরী করবেন! ভালো চামড়া আছে।

হাতের চামড়টা দেখিয়ে ও বললে।

অনেকগুলো জুতো তৈরী করতে দিলাম। যদিও দিতে অনেক দেরী হলো তবু এ জুতোগুলো অন্তান্তবারের জুতোর চেয়ে আরো বেশী মজবুত হলো। এরপর আমি বাইরে চলে গেছি।

একবছরেরও পরে আমি লণ্ডনে ফিরলাম। আর প্রথমেই গেলাম আমার সেই বন্ধুর দোকানে। আমি যাকে দেখে গিয়েছিলাম সে লোকটির বয়স ষাট।—আর আমি যাঁকে দেখলাম তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়া, ঝরে পড়া এক স্থবির। আর এবারে সত্যিই সে প্রথম আমায় চিনতে পারেনি।

—দেখেছো কী অদ্ভুত তোমার জুতো! আমার এই প্রবাস যাত্রার প্রায় সমস্ত সময়ই তো তোমার জুতো পরেছি। কিন্তু এখনো এগুলোর অর্দ্ধেকও ক্ষয় হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে সে আমার জুতোর দিকে তাকিয়ে রইলো। একজোড়া রুশ চামড়ার জুতো। আস্তে

আস্তে তার মুখে একটা স্বৈর্যের ভাব ফুটে উঠলো। শেষে আমার জুতোর ওপর হাত রেখে বললে

—এ জায়গাটা ঠিক হয়েছে তো!

বললাম—চমৎকার হয়েছে।

—আপনার আর জুতো দরকার আছে নাকি। আমি তাড়াতাড়ি করে দেবো। আজকাল একেবারে ফরমাস নেই।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। খুব চমৎকার জুতো দরকার।

—আচ্ছা আপনাকে আমি খুব নতুন রকমের জুতো তৈরী করে দেবো। আপনার পায়ের মাপটা বড় হয়েছে নিশ্চয়ই।

তারপর খুব আস্তে আস্তে সে আমার পায়ের মাপ নিলে। একবার শুধু মুখ তুলে বললে

—আপনাকে কি বলেছি আমার দাদা মারা গেছেন।

এত ক্ষীণ আর কৃশ হয়েছে সে—দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। বাইরে এসে কিছু সুস্থ বোধ করলাম।

নতুন জুতো এলো। ছাড়লুন পুরানো জুতো। পার্সেলটা খুলে চার জোড়া জুতো পরপর সাজিয়ে রাখলুন। একটির পর একটি করে পরতে লাগলুন। কোনো সন্দেহই ছিলো না। যেমন দেখতে, তেমনি চমৎকার ফিটিং। চামড়াও প্রশংসা করবার মত। মনে হলো এর চেয়ে ভালো জুতো ও আর কখনোই আমার জন্য তৈরী করেনি। দেখলাম ওর 'বিল'টা রয়েছে। দাম অবশ্য আগেকার মতোই। কিন্তু ভীষণ একটা ধাক্কা খেলাম। কখনোই তো সে চারদিনের আগে বিল পাঠায় না। তক্ষুণি নীচে গিয়ে নিজহাতে চেক লিখে পোষ্ট করে দিলাম।

এক সপ্তাহ পরে ছোট রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে ভাবছি বলে আসবো গিয়ে কী সুন্দর হয়েছে এবারের জুতোগুলো।

যখন তার দোকানে পৌঁছুলাম, দেখলাম দোকানের নামটি নেই। কিন্তু জানালায় ঝুলছিল সেই বহুপরিচিত জুতোগুলো।

বেশ অস্বস্তি নিয়েই ভেতরে ঢুকলাম। আমার সেই দোকানঘরটা জুড়ে এক করা হয়েছে। একটি ইংরেজ যুবককে দেখলাম সেখানে। বললাম,

—গেসলার আছে!

সে একটু অদ্ভুত অকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো।

—না মশায় নেই। তবে আমরা আপনার পছন্দ মত জিনিষ দিতে পারবো। আর আমারাই এখন দোকানটা নিয়েছি। আপনি নিশ্চয়ই বাইরে আমাদের নাম দেখেছেন। আমারা খুব সমজদার লোকের জন্যই অর্ডার সাপ্লাই করি।

—আচ্ছা সে হবে 'খন, এখন মিষ্টার গেস্‌লার কোথায় আছে বলতে পারেন।

ও! সে মারা গেছে!

—মারা গেছে! কিন্তু এই গত বুধবারে আমি তার তৈরী জুতো পেয়েছি।

সে অনেক দুঃখের ব্যাপার মশাই! গরীব বুড়ো শেষকালটায় উপোস করে মরলে।

আমি শুধু বললাম—ভগবান।

—ডাক্তাররা বললে লো ষ্ট্যারভেশন্। দেখেছেন তো কী কাজটাই না করতো! নিজেই সব করবে। কোনো ব্যাটাকে হাত ছুতে দেবে না ওর জুতোয়। এক একটা অর্ডারে তাই সময়ও লাগতো তেমনি। কিন্তু খদ্দেররা দেরী সইবে কেন বলুন! সবই তাই গেলো। একা একা বসে কাজ করতো। নিশ্চয়ই স্বীকার করবো মশাই—সারা লণ্ডন শহরে অমন জুতোটি আর কে তৈরী করতো। কিন্তু কম্পিটিশন্ বলেও তো একটা জিনিষ আছে! দেখেছেন তো, কোনোদিন একটা বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দেয়নি। আপনিই বলুন এসব লোকের আর কী হবে!

—কিন্তু উপোস করে.....।

—সে—টা হয়তো লোকে বাড়িয়ে বলেছে। কিন্তু আমি তো জানি, শেষ না হওয়া তার প্রতিটি জুতোর ওপর সেই দিনরাত বুকে বসে আছে। এ আমার

নিজের চোখে দেখা মশাই। খেতেও সময় নেই। বাড়ীতে ছিলো না একটি পয়সা। চামড়া আর দোকান ভাড়াতেই সব। অ্যাদ্দিন যে বাঁচলো কেমন করে, তাও তো ভেবে পাই না! রোজ ওর আগুন নিভে যেতো। তবে হ্যাঁ, একটা লোক ছিল বটে। আর এও বলবো মশাই, সাংঘাতিক জুতো তৈরী শিখেছিল বটে!

বল্লাম—হ্যাঁ, অদ্ভুত জুতো তৈরী করতো।

জিজ্ঞাসা ?

কক্ষচ্যুত ধূমকেতু মত'
রাঙ্গিয়া আকাশ,
মিশি গেছো ধরণী ধূলায়।
আগুনের গলিত সে পিণ্ড
টাইগারহিলে সূর্য্যোদয় যেন,
স্মৃতিপটে এঁকে যায় ছবি।

•

ওরা বলে,
করুণার দান নাকি ?
খণ্ডিত বিভক্ত করা
মুষ্টিমেয় কথানা আসন
কি মূল্য ইহার ?

• •

শাণিত কৃপাণ
আমূল বিদ্ধ করো
ফিন্‌কি দিয়ে উঠুক তাজা রক্ত
উষ্ণ প্রস্রবণ মত'।

• •

মূঢ়। অন্তরের পরাজয়
বীরত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
দুই-শতাব্দীর উজ্জ্বল ইতিহাস
ক্ষুদিরাম, যতীনের কথা
শুধু রূপকথা ?
'৪২' এর 'ভারতছাড়'
মিদনাপুরের বীরাঙ্গনা
অবজ্ঞার হেলার সামগ্রী
তোমাদের ইতিহাস মাঝে!

• •

প্রবঞ্চক শঠ ব্যবসায়ী
লুণ্ঠনের সঞ্চিত সামগ্রী,
জাল দলিলের খাতা
হেলা ভরে তুলে দিলো ?
আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের
ছোঁয়া লাগা নাকি ?
ঘুমপাড়ানি গান মাঝে
ঠাকুমার রূপকথা শোনে,
পক্ষীরাজ ঘোড়া চড়ি রাজপুত্র একা
জয় করি এলো তার হারানো আসন।

• • •

বৃদ্ধ সেই বীর,
শোনাইল যে গান তোমাদের
মৃত্যুকে মৃত্যুঞ্জয় করি ;
বন্ধু, হিসাবের বাহিরে তাহারা।

• •

অন্তরের ঐকান্তিক ইচ্ছা
নিজেদের শাশ্বত অধিকার—
সত্য ও ন্যায়ের পথে
বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র

•

আজ তুমি নাই করো
একদিন করিবে প্রণাম।

প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপন

মুকুন্দ দাশ গুপ্ত।

একদা সুদূর অতীতে ভারতের অধিবাসীরা বহির্জগতে বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, কালস্রোতে ইতিহাসের সেই গৌরবময় অধ্যায় বিস্মৃতির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। এই বিস্মৃত অধ্যায়কে উদ্ধার করবার চেষ্টা তেমনভাবে আজও হয়নি। যা সামান্য আমরা জানতে পারি, তা পশ্চিমের পণ্ডিতদের অক্লান্ত গবেষণার মধ্য দিয়ে। আমাদের দেশের কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি এই অল্প-পরিচিত অধ্যায়কে গবেষণার দ্বারা পূর্ণতর করতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের এই প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা যেদিন জয়যুক্ত হবে, সেদিন দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত গৌরবময় হবে।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য ভারতীয় সভ্যতাকে নিত্য বর্ধনে সিঞ্চিত করেছে। রামায়ণের কাহিনী আর্যসভ্যতার উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহের কাহিনী। পরবর্তী যুগে মহাভারতের কাহিনী সমগ্র ভারতের এক সত্তা, এই ভাবের কাহিনী। দ্রাবিড় ও আর্যসভ্যতার মিলনের পর অখণ্ড ভারতের উপলব্ধির প্রয়াস, মহাভারতের মূল সুর। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পর, আবার এক নূতন স্পন্দন অনুভূত হল। ইতিমধ্যে ভারতের সহিত বহির্জগতের ভাবের আদান প্রদান চলছিল। আরব দেশের পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে জ্ঞানার্জনের জন্য আসতেন, গ্রীক দেশের জ্ঞানীরা ভারতবর্ষে অধ্যয়ন করেছেন। বিখ্যাত দার্শনিক পাইথাগোরাস তক্ষশীলায় অধ্যয়ণ করেছিলেন। চীনদেশের সঙ্গে ভারতের ভাববিনিময় খ্রীষ্টাব্দীত কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্যবসা বাণিজ্যসূত্রে নানা দেশের সহিত ভারতবর্ষ পরিচিত ছিল। বুদ্ধদেবের পর, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ভারতের অনেকে চলে গেলেন। এর পরের যুগে ভারতবাসীর মনে রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন জেগে উঠল। কতদিন আগেকার ইতিহাস—প্রায় দু'হাজার বছরের ব্যবধান সেই যুগের সঙ্গে আমাদের বর্তমান যুগের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আর্যরা এদেশে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেন সিন্ধুতীরে। ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে তাঁরা প্রভাব বিস্তার করেন। অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যপর্বতের মাথা নত করে উত্তর ভারতের সভ্যতা দক্ষিণ ভারতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিন্ধ্য মাথা আর তোলেন নি। দক্ষিণ ভারতের সভ্যতার আর উত্তর ভারতের সভ্যতার মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান ছিল, তা চিরকালের জন্য অপসৃত হয়েছে। কিন্তু ভারতীয়দের বিস্তার ভারতের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র ডিঙিয়ে ভারতবর্ষ সুদূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিস্মিত হতে হয় যে এদেরই বংশধররা একদিন বহির্জগতের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং নিজেদের চারিপাশে কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা দিয়ে প্রাচীর গেঁথেছিল। সেই প্রাচীর এখনও কি আমরা সম্পূর্ণ চূরমার করতে পেরেছি? বটগাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বাদা বেঁধেছে—উৎপাটন সহজসাধ্য নয়।

সুমাত্রা, যাভা, বালী, বর্ণিও, মালয়, ব্রহ্ম, আনাম প্রভৃতি ভূভাগে একদিন ভারতীয় সভ্যতার জয়পতাকা উড়ত। সুদূর অতীতে যখন যানবাহনের কোন বিশেষ সুবিধা ছিলনা, পথঘাটও বিপদসঙ্কুল, দূরকে জানবার নেশা ভারতের অধিবাসীদের স্বদেশের ছায়া-শীতল আশ্রয় হতে বহির্জগতে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের উন্মাদনাকে, উচ্ছল প্রাণপ্রবাহকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করতে হবে।

উপনিবেশ স্থাপন কোন সময় হতে আরম্ভ হয়েছিল বলা দুষ্কর। এ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে এবং তার আগে হতেই এসব উপনিবেশ স্থাপিত হয়, কিন্তু এর বহু পূর্বে এই সব দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হবার যোগাযোগ হয়েছিল। হঠাৎ রাজ্যস্থাপনা হয়না। ইন্দোনেশিয়ার বহুস্থানের নাম সংস্কৃতজাত, টলেমির উক্তি হতে জানতে পারি। টলেমি লিখেছেন দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে। আনাম দেশের ইতিহাস আলোচনা করলে জানতে পারি, দ্বিতীয়

শতাব্দীর শেষ দিকে সেখানকার অধিবাসীরা হিন্দুদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে। হিন্দুরাজা রাজত্ব করছেন, পাথরের গায়ে সংস্কৃতে লেখা বহু কথা এবং সেই ভাষা সুমার্জিত, সাহিত্যরস সম্পন্ন। চৈনিক পণ্ডিতদের লেখা হতে উদ্ধার করা যায় যে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব হতে এদব দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য সূত্রে ভারতের পরিচয় হয়েছে। বর্তমান চৈনোসেরিমে হিন্দুরাজত্ব ছিল। খৃষ্টাব্দ ছয়শত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই রাজ্যে একজন প্রতিভূকে চীনদেশে পাঠান হয়েছিল। তাঁর প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় এই হিন্দুরাজ্য তার চারশ বছর পূর্বে স্থাপিত হয়—অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ দুইশত শতাব্দীতে। এরকম আরও অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায়। কিংবদন্তী অনেক সময় উপেক্ষণীয় নয়। তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ তাকে গ্রহণ করা বিজ্ঞান সম্মত নয়। পুরাকালে আনামকে চম্পা বলা হত এবং কম্বোডিয়াকে কম্বোজ বলা হত। চৈনিক পুস্তক হতে জানা যায় যে চম্পা ও কম্বোজের রাজা (হিন্দুরাজত্ব) চীনদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করেছিলেন (২৪০-২৪৫ খৃষ্টাব্দ)। চম্পা ও কম্বোজের হিন্দুরাজত্ব শ্যামদেশের কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্রহ্মদেশেও ঠিক এই সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবাসীরা প্রবেশ করেন। ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা খুব সভ্যতা সম্পন্ন ছিল না। বহির্জগতের স্পর্শ তাঁরা পরিহার করত, নিজদের শিক্ষা অত্যন্ত নিম্নস্তরের ছিল। চীনদেশ এই সময় সভ্যতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল। তারা এই সব স্থানে সভ্যতা বিস্তার করবার প্রয়াস পান। কিন্তু জ্ঞানের আলোকে এই সব স্থানকে উদ্ভাসিত করা দূরের কথা, এই সব স্থানে তাঁরা বাসও করতে পারেন নি। দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীদের বশে এনে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন ভারতবাসীরা করেন।

একথা এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রাজ্য শোষণ করবার মনোবৃত্তি নিয়ে ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপন করবার কথা কোন দিন ভাবেনি। ভারতবর্ষের উপনিবেশ স্থাপন রাজ্যবিস্তারের জন্য কোন কালে হয়নি এবং বৈদেশিক শোষণে তা পর্যবসিত হয়নি। জ্ঞানের, প্রেমের দীপ্তিতে উপনিবেশগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। যাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, উপনিবেশগুলিকে নিজদের মাতৃভূমির মত সম্মান করতেন এবং তাঁদের বংশধরদের কাছে মাতৃভূমি বলে পরিগণিত হত। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করে তাঁদের সঙ্গে তাঁরা মিশে যেতেন। আমাদের শাস্ত্রে আত্মার কথা, পরমাত্মার কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের একটা বিশিষ্ট আত্মা আছে—তা ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর। সেই সুর দূরকে আপন করতে পারে এবং তার মাধুর্যে জ্ঞান, প্রেম উদ্ভাসিত হয়। এই সুর চিরন্তন, মানুষের ভালবাসা হ'তে এর আবির্ভাব এবং মানুষের ভালবাসার মত এর পরিবর্তন হতে পারে না।

সমগ্র ভারতের মানচিত্রের দিকে এখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। কোন কোন স্থান হতে ভারতবাসীরা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অভিযান করতেন? দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের স্তব্ধতা আমাদের বিভ্রান্ত করে। সঠিক সব জানা যায়না। যতটুকু জানা গিয়াছে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

ভারতবাসীরা জলপথ ও স্থলপথ, দুই পথেরই ব্যবহার করতেন। সমুদ্রপথের কথা আলোচনা করি। সমুদ্রপথে তাঁরা রওনা হতেন পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল ভাগ হতে। বাংলাদেশের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুকাল ধরে চলে আসছিল—বহুজনক জাতকে চম্পা ও সুবর্ণভূমিতে সমুদ্র অভিযানের উল্লেখ আছে। পাটলিপুত্র, বারানসী হতে অনেকে বাংলার উপকূলে এসে একত্র হতেন এবং তাম্রলিপ্ত হয়ে সমুদ্রযাত্রা করতেন। গোপালপুর দিয়েও অভিযান চলত। গোপালপুর ছিল বন্দর, গঞ্জাম নদীর নিম্নে অবস্থিত। মৌলুলিপটম হতেও সুদূর প্রাচ্যাভিমুখে অর্ণব রওনা হত। পশ্চিম উপকূলে ব্রোচ হতেও নির্ভিক নাবিকরা প্রাচ্যদেশ দিকে অভিযান চালাতেন। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন। মালবদেশে অশোকের বংশধরগণ রাজত্ব করতেন জানা যায়।

যবদ্বীপে কলিঙ্গ দেশের হিন্দুরা সমুদ্রপথে যেয়ে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। কেহ ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পাঠ করে জানা যায় যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যভাগের লোকদের দ্বারা বসতি স্থাপন হয় ইরাবতী ব-দ্বীপের নিম্নে। নানা গবেষণার দ্বারা এপর্যন্ত বলা যায় যে উপনিবেশকারীরা সমুদ্রযাত্রা করতেন তাম্রলিপ্ত, গোপালপুর, কলিঙ্গ, নৌলপিটম এবং ব্রোচ বন্দর হতে। আরও হয়ত অনেক স্থান ছিল যা আমরা আজও জানতে পারিনি। স্থলপথে, উপনিবেশকারীরা পূর্ববঙ্গ, মণিপুর ও আসামের মধ্য দিয়া বাহিরে যেতেন। এই সব পথ এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। জাপানী আক্রমণের সময় বহুলোক ব্রহ্মদেশ হতে ভারতবর্ষে হাঁটাপথ দিয়ে এসেছিলেন। স্থলপথ দিয়ে ব্রহ্মদেশ হতে ভারতে স্বাধীনতার অভিযান নেতাজী চালিয়েছিলেন—এই পথে কত বীর মৃত্তিকা চুম্বন করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন কারণ এই পথ দিল্লী পৌঁছিবার পথ। দুহাজার বছর পূর্বে স্থলপথ দিয়ে লোক চলাচল, ব্যবসা এবং অভিযান চলত। খৃষ্টপূর্ব দুই শতাব্দীর পূর্ব হতেই ভারতের সঙ্গে চীনের ব্যবসা বানিজ্য চলত ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে। পরে অন্যান্য জাতির উৎপীড়নে এই পথ বিপদসঙ্কুল হওয়াতে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু গুপ্তযুগের শেষভাগে যখন ভারতের ঐশ্বর্য শিখরে উঠেছে, তখন এই পথ আবার বিপদমুক্ত করে উন্মুক্ত করা হয়। এ হয় সপ্তম-শতাব্দীর শেষ দিকে।

উত্তর ব্রহ্ম ইরাবতীর শালউইন উপত্যকায় ইউনান প্রভৃতি দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়। বিজয়ীরা বিজিতদেশের অনেক স্থান নিজদের দেশের বিভিন্ন নাম দ্বারা পরিচিত করেন। ১৩ শত শতাব্দী পর্যন্ত উনানকে গান্ধার বলা হত। ভারতবর্ষে গান্ধার যেমন একদা সংস্কৃতিতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, ইন্দোচীনে উনান তেমনি গৌরবোজ্জ্বল স্থান সুদূর প্রাচ্যে অধিকার করেছিল। ব্রহ্মদেশের অনেক স্থানের নামের উৎপত্তি ভারতীয়। ইন্দোচীনের নৃপতিকে মহারাজা বলা হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত ঐতিহাসিক বসিরুদ্দিনের বর্ণনায় জানা যায় অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু এবং চীনাদের মিশ্রণ আছে। বৌদ্ধধর্মের বিরাট প্রাণকেন্দ্র ছিল ইন্দোচীন। পিপুল গুহা, বোধিবৃক্ষ, উপগুপ্তের প্রাসাদ, আনন্দের তস্মাবশেষরক্ষিত স্তূপ—এসব বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থলপথে যে সব দেশ দিয়ে ভারতীয়েরা গিয়েছিল, সে সব স্থানে বিভিন্ন উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। লাওতে হিন্দু রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল—মালবদেশ বলে ইহা পরিচিত হয়। ইন্দোচীন অভিযান স্থলপথ ও জলপথ দিয়ে হয়। স্থলপথে, বঙ্গদেশ ও আসামের মধ্য দিয়ে চিন্দুইন, ইরাবতী, সালউইন ও মেকং উপত্যকা অতিক্রম করে চালিত হয়। দ্বিতীয় সমুদ্রপথে বিভিন্ন পোত ইন্দোচীনে উপস্থিত হয়। মালয়, সুমাত্রা, যাভা, বালী, বর্ণিও দেশে যারা গিয়েছিল তারা হচ্ছে মালাবার ও করোমণ্ডল উপকূলের অধিবাসীরা—তারা সমুদ্রপথ দিয়ে গিয়েছিল। বাংলা দেশ হতেও উপনিবেশকারীরা এসব দেশে গিয়েছিল। ফা হিয়েন ও ইটসিং'র লেখা হতে জানা যায় যে বঙ্গদেশের সঙ্গে সুদূর প্রাচ্যের বানিজ্য চলত পঞ্চম শতাব্দী এবং সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে। নবম শতাব্দীতে সুমাত্রা, যাভার সঙ্গে বাংলা দেশের রাজার দূত বিনিময় হয়েছিল। বাংলা দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সুবর্ণদ্বীপে শিক্ষা লাভ করতে যেতেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্কৃতির যোগাযোগ বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সব উপনিবেশের কত স্থানের নাম ভারতবর্ষকে স্মরণ করিয়ে দেয়—অযোধ্যা, কলিঙ্গ, কম্বোজ, মথুরা, গান্ধার আরও কত নাম। মাতৃভূমিকে স্মরণ করে গভীর মমতা হতে এসব নামের উৎপত্তি। যে মাতৃভূমি ছেড়ে আসা যায় তাহার গভীর আকর্ষণ কেমন করে ভোলা যায়।

যাভার সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করতে যেয়ে ঐতিহাসিক বহু তথ্য আমরা পাই যা অনেক সময়ে প্রাচীন সাহিত্যে অমর হয়ে আছে বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় জানা গিয়েছে। কিন্তু বর্ণিও সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বড় সীমাবদ্ধ। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্যের দিক দিয়ে যাভা ও বর্ণিওর মাঝে পরে বালী, মালয়,

সুমাত্রা—যে সব দেশের ইতিহাস কিছু কিছু আমরা জানতে পারছি। যাভার ইতিহাস অনেক সময় বহু প্রাচীন স্তম্ভ হতে জানা যায়। চীনদেশে বহু ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু যদি কোন রাজ্য চীনদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করত তখনই সেই রাজ্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা হত; অন্যথা নয়। সুতরাং বহুরাজ্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়নি। ইতিহাস আলোচনা করতে করতে বহু নূতন তথ্যের সাক্ষাৎ ঘটবে—তখন কত নূতন কিছু আমরা জানতে পারব বহু দেশ সম্বন্ধে এবং বিস্মিত হতেও পারি এই সব ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা পাঠ করে।

প্রায় ১৩০০ বছর ধরে হিন্দুরাজত্ব এই সব উপনিবেশগুলিতে চলেছিল। ভারতে মুসলমানদের আগমনের প্রায় ৩০০ বছর পর এ সব দেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হয়। এ ছাড়াও আনামী, আই প্রভৃতির অন্যান্য জাতিদের দ্বারাও হিন্দুরাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে সব কিছু অন্ধকারে নিশিয়ে যায়। দুইশত শতাব্দী পরে এদের সঙ্গে পূর্বসভ্যতার কোন সম্পর্ক থাকে না—একটা ঘোর অন্ধকারের যুগ আরম্ভ হয়, এখনও সেই অন্ধকারের মোহ চলে যায়নি—অপসৃত হচ্ছে মাত্র। মাঝে মাঝে পুরাতন দিনের কথা জেগে ওঠে হয়ত কোন ভগ্নপ্রাসাদ হতে, কিম্বা খোদিত কোন স্তূপ হতে, হয়ত রাজপ্রাসাদে শিল্পীর আঁকা ছবি হতে। কম্বোডিয়ার রাজপ্রাসাদের দেয়ালে বহু পুরাতন শিল্পীর আঁকা ফ্রেস্কো রামায়ণের কাহিনীর অবলম্বনে সুদূর অতীতের স্মৃতি বহন করে আছে,—এই অঙ্কনের তুলনা হয়না।

নতুন পৃথিবী

সন্তোষ কুমার অধিকারী

রণশীর্ণ পৃথিবীর অবিচ্ছিন্ন শোনিত প্রবাহ
অবশেষে শান্ত হয়ে এলো;
ধূসর কঙ্কর মাটি
বিশীর্ণ স্রোতের লাগি বালুকার উৎকণ্ঠ প্রত্যাশা,
ছায়া কই.....?
সহস্র লোকের কণ্ঠে আর্তনাদ—আরও কতদূর?

শুনিতেছি শান্তির ললিত বাণী
ঘাতকের কণ্ঠে শুনি—নির্ভয় প্রত্যাশা।
যার হাতে হত্যার আয়ুধ ছিলো শুধু
সেই আজই
বিচার করিছে বসি ন্যায়ের ধর্মের নামে।
ওরা বলে—আমরা এনেছি আজ—
তোমাদেরই লাগি'
মুক্তির বারতা নব,
ওরা বলে, আমরা পৃথিবী হ'তে
হিংসারে মুছিয়া নিয়া
অত্যাচার শোষণের করেছি নির্মূল;
নতুন পৃথিবী মোরা গড়ি।

নতুন পৃথিবী.....?
মুহুর্মুহু ক্রন্দনমুখ বেদনাব্যাকুল
মানুষের কণ্ঠ চারিদিকে,
আজও শুধু নিষ্ফল আক্রোশে তারা
পাষাণে আঘাত হানে;
বঞ্চিতের শোষিতের দীর্ঘশ্বাসে জমেছে কুয়াশা;
আজও শুধু সবলের শোষণের মুষ্টি রোষায়িত।
পুঞ্জীভূত শোষণ আর শোষিতের অশ্রুজলধারে
ভেসে যায় ইউ এনোর বাণী—
শান্তির প্রলেপ।
সম্মিলিত জাতির আহ্বান শুনি,
—শান্তি ও মুক্তির বাণী;
মানুষের নবযুগ ওরা দিয়ে যাবে...।

দণ্ড

পুষ্পরাণী ঘোষ

দৃশ্যপট—স্কয়েলসএর একটি ছোট নরওয়ল শহরের একটী ছোট রান্নাঘর। ঘরটী বেশ সাদাসিদেভাবে অথচ যাতে বেশ আরাম পাওয়া যায় সেভাবে সাজানো। হেষ্টার-হার্টস্—বয়স প্রায় ৩৬, বেশ সুশ্রী—টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে ইস্ত্রি করছে, চেয়ারের উপর একগাদা কাচা কাপড় রয়েছে আর উনুনের সামনে এক সারি মাড় দেয়া কলার শুকচ্ছে। উনুনের উপর একটি কেটলী বসানো রয়েছে এবং তার পাশে একটি ইস্ত্রি গরম হচ্ছে।

সময়—শীতের গোধূলি—(হেষ্টার উদ্বিগ্নভাবে ঘড়ির দিকে তাকায়, তারপর দরজা খুলে কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে একটু পরে ফিরে এসে আবার ইস্ত্রি করতে আরম্ভ করে। দরজাটা হঠাৎ খুলে যায়, স্কুলের ব্যাগ দোলাতে দোলাতে মেরী এসে ঘরে ঢোকে—বেশ ছিপ-ছিপে লম্বা গড়নের মেয়ে, স্বভাবটা স্নেহশীল ও আবেগ-পরায়ণ।)

হে—তোমার দেরী হয়েছে মেরী।

মেরী—হাঁ, মা।

হে—আটকা ছিলে!

মেরী—না, মা এবারে আর তা নয় আমরা পুকুরটার উপর পিছলে যাওয়া খেলা করছিলাম। পুকুরের জল জমে বরফটা এমন চকচক করছে আর এমন পিছলে পিছলে যেখাচ্ছে যে আমরা একটু খেলা না করে কিছুতেই থাকতে পারলাম না। তোমার কোন কাজের জন্য আমার দরকার হয়নি তো মা?

হে—না না সেজন্য নয়। তোমার দেরী দেখে আমি ভাবছিলাম।

মে—তাই নাকি হয়েছিল মা এমন চমৎকারভাবে গড়গড় করে গড়িয়ে যাচ্ছিলাম।

হে—এ বরফ আর বেশীদিন থাকবে না।

মে—না, আজই ছিল আমাদের শেষ সুযোগ, দিদিমণি বলছিলেন এবারে বরফ গলতে আরম্ভ করবে। আমি যখন বাড়ী ঢুকছিলাম তখন সবে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। (মেরী তার স্কুলের ব্যাগ টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কোট খুলে একটা চেয়ারের পিছনে রেখে দেয়; হেষ্টার উনুনের কাছে এসে ঠাণ্ডা ইস্ত্রিটা তাকের উপর তুলে রাখে এবং গরম ইস্ত্রিটা নিয়ে আবার ইস্ত্রি করতে আরম্ভ করে)।

মে—(ঠাণ্ডা ইস্ত্রির দিকে আঙুল দিয়ে) ওটা গরম হতে দেওয়া হয়নি।

হেষ্টার—না তার আর দরকার হবে না, মনে হচ্ছে এটাতেই কাপড়গুলো হয়ে যাবে, আজ রাত্রে আর বেশী কোরব না।

মেরী—মা মণি, কেন তোমাকে এত ভীষণ খাটতে হয়? আমার ভালো লাগে না একটুও—কেবলই কাপড় কাচা—ইস্ত্রি করা, কাচা কাপড় দিয়ে আসা, ময়লা কাপড় নিয়ে আসা। লোকেরা নিজেদের কাপড় নিজেরা কেচে নেয় না কেন?

হেষ্টার—তুমি একটী বোকা মেয়ে তুললে মেরী! লোকেরা নিজেদের কাপড় নিজেরা কেচে নিলে আমরা জীবিকা অর্জন করতাম কেমন করে?

মেরী—(বিদ্রোহের সুরে) মেয়েদের আর কারুর মাকেই তোমার মত খাটতে হয় না—

হে—তাদের সকলের বাড়ীতেই টাকা রোজগারের জন্য পুরুষ অভিভাবক আছেন। কিন্তু আমাদের তো কেউ নেই।

মে—মা মণি বাবা মারা গেছেন কতদিন আগে?

হে—(সচকিতভাবে) কেন ওকথা জিজ্ঞাসা কোরছ?

মেরী—তা জানি না এমনি মনে হোল তাই।

হে—অনেক দিন আগে।

মেরী—তাকে দেখতে কেমন ছিল? তার কোন ছবি নেই তোমার কাছে?

হে—না, আমার—আমার কাছে ছিল বটে একটা সেটা হারিয়ে গেছে। কিন্তু কেন তুমি এসব জানতে চাইছ?

মেরী—না এমনি। সব মেয়েদেরই হয় বাবা আছেন নয় অন্ততঃ ছবিও আছে। ঐ তো সিসিরও বাবা নেই কিন্তু তার মার কাছে তার অনেক ছবি—ডজন ডজন ছবি আছে।

হে—ডজন ডজন নয় মেরী।

মে—তা নয় ঠিক, কিন্তু রান্নাঘরে দুটো ছোট ছবি আছে, বসবার ঘরেও সুন্দর বাঁধানো একটা আছে, আর তা ছাড়া সিসির না সব সময়ই তার কথা বলেন, কিন্তু তুমি কখনোই বলনা বাবার কথা।

হে—যারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাদের কথা বলা মানেই তো ব্যথা পাওয়া।

মেরী—(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে) তোমার হয়ে গেলেই আমি চা করে ফেলব মা।

হে—না মেরী, চা করার জন্ত তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। মিসেস টমাস তোমাকে তার কাছে চা খেতে বলেছেন। আমি তাকে বলেছি যে তুমি আজ রাত্রে তার কাছে শোবে। মিঃ টমাস বাড়ীতে নেই এদিকে বাচ্চাটারও অসুখ তার একা থাকতে ভালো লাগে না।

মেরী—দূর ছাই আমার ভালো লাগে না।

হে—আমারও তুমি বাড়ী থাকলে ভালো লাগত মেরী, কিন্তু সে বেচারী ছেলের অসুখে ভয়ানক মুসড়ে পড়ছে।

মে—আচ্ছা মা যদি আমি যাব, কিন্তু তোমার কাছে থাকতে আমার এমন ইচ্ছে করছিল, মাত্র সন্ধ্যা-বেলাটাই আমি তোমার কাছে পাই কি না।

হে—বোকা মেয়ে, আর কি সন্ধ্যাবেলা আসবে না নাকি ?

মেরী—(হঠাৎ লাফিয়ে উঠে হেষ্টারের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে) তুমি পৃথিবীর মধ্যে সব—সবচেয়ে ভালো মা।

(হেষ্টার সস্নেহে মেরীর দিকে তাকায়)

মেরী—আমার পড়ার কি হবে ?

হে—তোমাকে বই সঙ্গে নিয়ে যেয়ে সেখানে পড়তে হবে।

মেরী—আজ অনেক পড়া আছে মা, তুমি কাছে থাকবে না, কে যে বুঝিয়ে দেবে ; মিসেস টমাস যে অঙ্কের বিষয় বিশেষ কিছু জানেন তা মনে হয় না। অঙ্কের দরকারই যে কী তা জানি না বাপু, আর আজ তুমি বুঝিয়ে দিতে পারবে না জেনে যেন আজই সবচেয়ে খারাপ অঙ্কগুলো দিয়েছেন। তুমি না বুঝিয়ে দিলে আমি অর্দ্ধেকও করতে পারবো না।

হে—সে একপক্ষে ভালোই হয়েছে বলতে হবে। ওগুলো তোমার নিজেরই করতে হবে। আমার উপর নির্ভর করে তো লাভ নেই পরীক্ষা তো এসে গেল।

মেরী—হায় ভগবান। পরীক্ষার যে কী দরকার।

হে—মেরী তুমি জানো যে যদি তুমি পাস করতে পার তবে তুমি বড় স্কুলটাতে ভর্তি হতে পারবে ও বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ পাবে, আর তা যদি পাও তাহ'লে আমি তোমায় যা দিতে পারব তার চেয়ে অনেক ভালো ভাবে থাকার সুযোগ পাবে।

মেরী—তুমি আমায় যা দিতে পারবে তার চেয়ে ভালো কিছু আমি কোনদিন চাই না। কিন্তু তোমাকে যে অত খাটতে হয় তাতে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে, তোমাকে অত খাটতে যদি না হত।

হে—খাটতে আমি ভয় পাই না মেরী। ভীষণ পরিশ্রম করেও সুখী হওয়া যায়। যাদের আমরা ভালবাসি তারা যদি আমাদের নিরাশ করে, মনের মতন না হয় তখনই শুধু মন ভেঙ্গে যায়।— যাক্ তুমি এবার উঠ মা, সন্ধ্যার আগেই তোমার মিসেস টমাসের বাড়ী পৌছানো ভালো।

মেরী—(অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে উঠে) আমি ঠিক জানি ঐ বিশ্রী অঙ্কগুলো আমি কখনোই পারব না। কিছুতেই পারব না।

হে—আগে মন দিয়ে তুমি চেষ্টা করে দেখ—মিস প্রেসকট বলেছেন মন দিলে তুমি প্রায় সবই পার।

মে—আমাকে তো তিনি কখনোই বলেন না এ রকম ধরণের কথা।

হে—মেরী, আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে চাই তুমি পাস

করে। তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

বেরী—ম'সিয়ে গো—সুস্থিটা পাবার জন্য আমি এখন থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করব। এখন তো আমার বার বছর চলেছে, সভা শেষ করে একটা কাজ যোগাড় করে নিতে কষ্ট হবে না, তখন আর তোমাকে অত কষ্ট করতে হবে না। কোন কাজ আছে না? যাবার আগে করে দিয়ে যেতাম তাহলে।

লু—না, না তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও আর বেরী কোর না মিসেস টমাস হয়ত তার ছেলের জন্য তোমার কিছু আনতে বলতে পারেন।

(একটা দেরাজের ভিতর থেকে বেরী শার্ট আর কোট পরে নেয় এবং একটা খাতা ও কয়েকটা পেন্সিল ব্যাগের মধ্যে পুরে নেয়)

বেরী—ওঃ ঠিক, মনে পড়েছে যাবার আগে তোমার চা করে দিয়ে যাব।

লু—না বেরী তুমি আর দেরী না করে মিসেস টমাসের বাড়ী গেলেই আমি বেশী খুসী হব।

(বেরী ব্যাগটা কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে নিল ও আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে চলল)

বেরী—আচ্ছা না—তাহলে আমি যাচ্ছি—(দরজাটা খোলে) এই আমি চলে গেছি।

হেষ্টার—(ইস্ত্রিকরা কাপড়গুলো একটা ঝুড়িতে রাখল, উহুনের কাছ থেকে কলারগুলো এনে সবচেয়ে উপরে রেখে দিল—এমন সময়ে কড়ানাড়ার শব্দ হল—হেষ্টার দরজা খুলে দিতেই একজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। তার পোষাক পরিচ্ছদ জীর্ণ—অপরিচ্ছন্ন—ভাবভঙ্গীতে একটা সতর্ক ভাব)

—(অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে) লুইস্‌হার্ট!

—হ্যাঁ হেষ্টার আমিই।

—তুমি তাহলে ছাড়া পেয়েছ?

স—তাইত মনে হচ্ছে।

—কিন্তু এখনো তো সময় হয়নি।

—আগেই ছেড়ে দিয়েছে (বিদ্রূপের ভঙ্গীতে) সেখানে তো আমি সব সময়েই ভালো হয়ে থাকি। বেরিয়ে এসে যখন তোমার কোন খোঁজ পেলাম না তখনই আমি বুঝেছি তুমি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এসেছ। আমি প্রথমেই সোজা তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়েছিলাম।

হে—যে লজ্জা আর অপমানে আমার জীবন তুমি ভ'রে দিয়েছ—সেখানে যেয়ে সকলের সামনে সে কথা প্রকাশ হ'তে দেয়ার চেয়ে মৃত্যুও যে আমার কাছে শতগুণে প্রিয় হ'ত একথা তোমার বোঝা উচিত ছিল লুইসহার্ট।

লুইস—যা আমি ভালভাবেই জানি তা হচ্ছে এই যে তুমি অত্যন্ত নিপুণভাবে আত্মগোপণ করেছ—এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় এসে আত্মগোপন করার মানে কি?

হে—কেন আত্মগোপন কোরব না? ঈশ্বর জানেন আত্মগোপন করার যথেষ্ট কারণ আমার ছিল।

লু—তোমাকে খুঁজে বের করতে কি কষ্টইনা আমাকে পেতে হয়েছে।

হে—কোন দরকার ছিল না তো কষ্ট করবার (একটু থেমে কঠিন স্বরে) এখানে কি চাও তুমি?

লু—কি আবার? নিজের স্ত্রীকে ছাড়া আর কি চায় লোকে? (ঘরের ভিতর খানিকটা এগিয়ে এল)

হেষ্টার—লুইস হার্ট—এসব কথা ১২ বছর আগে শেষ হয়ে গেছে।

লুইস—হেষ্টার তুমি অত্যন্ত নির্দয় ও কঠিন।

হে—তোমার কি তাতে আশ্চর্য হওয়া সাজে?

লু—আর আমি কিনা এই দিনটীর অপেক্ষায় রোজ দিন গুণেছি।

হে—(তিক্তভাবে) আমিও দিন গুণেছি আর প্রতিদিনই এই প্রার্থনা করেছি যে এই দিনটী আসবার আগে আমাদের দু'জনের মাঝে একজনের যেন মৃত্যু হয়।

লু—আমার মৃত্যু কামনা এই তোমার প্রথম, না—পুলিস যখন আমায় ধরলো তখনো তুমি এই কথাই বলেছিলে।

হে—মৃত্যু হ'ল ঈশ্বরের দেয়া বেদনা। কালক্রমে তা মধুর স্মৃতিতে পরিণত হয় কিন্তু লজ্জা ও অপমানের যে

বেদনা তার ক্ষত কখনো শুকোয় না।

লু—আমার মতন বোকা আর নেই। তোমাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি ছিল না—আর তুমি কি না আমাকে একবার বসতেও বল্লে না।

হে—(সরে দাঁড়াল এবং উনুনের ধারে ১টা চেয়ারের দিকে আঙ্গুল দিয়ে)—ইচ্ছা হ'লে বসতে পার, (লুইস বসে আগুনে হাত দিয়ে হাত সেকতে সেকতে আড়চোখে ঘরের দিকে তাকাতে লাগল)।

লু—কী ভীষণ শীত আজ রাত্রে, বাতাস যেন ছুচের মত গায়ে বিধছে (শীতে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারটা আগুনের আরো কাছে টেনে নেয়)।

হে—ভিজে কোট খুলে ফেল লুইস নয়ত ঠাণ্ডা লেগে মরবে।

লু—ক্ষতিই বা কি তাতে? একটু আগেইতো তুমি আমার মরণ কামনা করছিলে।

হে—(রুক্ষ স্বরে) কোট খুলে ফেল লুইস—আর বোকার মত কথা বোলনা। (লুইস একভাবে বসে থাকে): শোন লুইস—শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? (লুইস হঠাৎ প্রফুল্লভাবে উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা খুলে চেয়ারের ওপর রেখে দিয়ে হেষ্টারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল)।

হে—(সভয়ে পিছিয়ে যেয়ে) না লুইস না তোমার হাতে রয়েছে রক্তের দাগ।

লু—ওকথা যে মিথ্যা তা তুমি বেশ ভালই জানো হেষ্টার। সেই বুড়োটা বোকার মত চীৎকার করে উঠে বাড়ীশুদ্ধ লোককে জাগিয়ে না দিলে আর কোন গণ্ডগোল হত না, আমি তাকে থামতে বলেছিলাম। তাকে যে সামান্য ধাক্কা আমি দিয়েছিলাম তাতে তার কিছুই হ'ত না যদি না আগে থাকতেই তার পচা হৃৎপিণ্ডটা খারাপ হয়ে থাকত। একবার ভেবে দেখত মাত্র একটা ধাক্কা মারার প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ জীবনের বারটা বছর খুটোয় বাঁধা ছাগলের মত বন্দী জীবন যাপন করা আর তার মধ্যে তোমার কাছ থেকে একছত্র চিঠিও না।

হে—কেন আমি মিথ্যা লিখতে যাব? সবত মনপ্রা দিয়ে আমি চেয়েছিলাম ভুলে থাকতে।

লু—আসল কথা হ'ল আমার কি হ'ল না হ'ল তাতে কিছুই যায় আসে না তোমার। (একটু থামল হেষ্টার কিছুই বল্লে না) আমার মনে হয় জীবনে কো দিনই আমার পরে তোমার বিন্দুমাত্র টান ছিল না।

হে—তুমি জান ওকথা সত্য নয়—দুর্ভাগ্যক্রমে এক সময় তোমায় ভালবেসেছিলাম—না হলে আর তোমা বিয়ে করতাম না।

লু—(অবজ্ঞাভরে) এই কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হল?

হে—তুমি কি বুঝতে পার না—

লু—(বাধা দিয়া) না পারি না—কোন নারী যখন সত্যি কোন পুরুষকে ভালবাসে তখন তার দুঃখ দুর্দশা ভারও নিয়ে থাকে।

হে—(রোষ ও ঘৃণাভরে) আমিও নিয়েছিলাম।

লু—কিছু কি ফল হল তার?

হে—প্রথমবার তুমি যে দিন ছাড়া পেলে জেলের দরজায় তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম—সেখান থেকে তোমায় আমি বাড়ী নিয়ে এলাম। তুমি জেলে যাবার পর কতনা কষ্টে সেই বাড়ী আমি টিকিয়ে রেখেছিলাম। তোমার জন্য একটা ভালো স্থায়ী কাজও যোগাড় করে রেখেছিলাম।

লুইস—তাকে তুমি কাজ বলো?

হে—ভাল হোক—মন্দ হোক কাজ তো বটে—আর জেল ফেরতা একজন আসামীর পছন্দ মত কাজ বেছে নেয়ার বিলাসিতা সাজে না। কাজটা হয়ত একটু খাটুনী বেশী হ'ত। কিন্তু তোমার বয়সও ছিল কম স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। ইচ্ছা থাকলে তুমি অনায়াসেই সে কাজ ভাল ভাবে করতে পারতে।

লু—সপ্তাহে সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য শরীর ম

ক্রীতদাসের মত বাধ্য থেকে
হবে না।

হে—সেই কাজটা নিলে আর যাই হোক সৎপথে থেকে উপার্জন করতে পারতে আর আমরাও তা হ'লে এতদিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতাম। কিন্তু তুমি করলে কি? দু'মাস যেতে না যেতেই তুমি আবার সেই পুরানো দলের মধ্যে মিশে আবার সেই সব কু-কাজ করে বেড়াতে লাগলে—ফলে এক মাসের মধ্যেই পুলিস তোমায় আবার ধরল।

লু—সেটা নেহাৎই দুরদৃষ্ট—না হ'লে মালটা আমি ঠিক পেয়েছিলাম—আর বেশ শাঁসালো মালই ছিল আমি পালিয়েও ঠিক যেতে পারতাম যদি না সেই বুড়ো হঠাৎ জেগে উঠে চীৎকার সুরু করে দিত—বেটার যদি চুপ করে থাকবার মতও বুদ্ধি থাকত।

হে—আবার এসব পুরানো কথা আলোচনা ক'রে কোন লাভ আছে?

লুইস—আছে হেটি, আবার কি আমরা নতুন করে আরম্ভ করতে পারি না?

হে—না পারি না—সেবার আমার যে ভাবে দিন কেটেছে তারপর—আবার—না, না—আবার, সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে আমি কিছুতেই পারবো না—কিছুতেই না—

লু—কিন্তু এবার আমি ভাল হয়ে থাকব—বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি।

হে—তুমি ভাল হয়ে থাকতে পারোনা লুই—জানিনা, হয়ত তাতে তোমার নিজের কোন দোষ নেই, হ'তে পারে ভগবান তোমাকে এই ভাবেই গড়েছেন কিন্তু এটা ঠিক যে আমাকে সে কথা সব সময়েই মনে রাখতে হবে।

লু—তুমি যত বড় বড় কথা বল না কেন আসলে আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশী খাঁটি খৃষ্টান, বুঝলে হেষ্টার ষ্টার্টস? তুমি যদি জেলে যেতে তবে আমি তোমার সাথে কখনো এরূপ ব্যবহার করতাম না।

হে—(ব্যঙ্গভরে) তাই নাকি? তাত আমি জানতাম না!

লু—আমি তা হ'লে আমার যা কিছু থাকত তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতাম। কিন্তু এখন দেখ, তুমি কেমন আরামে রয়েছ অথচ আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও নেই।

হে—(ক্ষিপ্তভাবে) কোন মুখে একথা বলতে পারলে তুমি? কোন মুখে? নিজে কাজ করতে পার না?

লু—মেজাজ তোমার ঠিক সেই রকমই আছে, আগেও মাঝে মাঝে তুমি এমনি রেগে যেতে।

হে—তোমার সংস্রবে যে থাকবে তারই মেজাজ রুক্ষ হবে।

লু—আমি যদি মালটা নিয়ে পালাতে পারতাম তা-হলেই সব ঠিক হয়ে যেত—তুমি তাহলে বেশ সুখেই থাকতে পারতে।

হে—আমি কখনো চোরাই টাকা—

লু—ও নিয়ে আর তোমাকে বড় বড় কথা বলতে হবে না। সেই লোকটার মত ধনী লোকরাই আমাদের চোর বানায়। উঃ, সেই বাড়ীটা সোনা, রূপা, মনি, মুক্তায় একেবারে ভর্তি, যেন খাঁটি আলাদিনের গুহা। কোন একজন লোকের কি অধিকার আছে অত বেশী অর্থের অধিকারী হবার? যখন অন্য লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে।

হে—তুমি না খেয়ে মারা যাচ্ছিলে না লুই—আমার কথা হ'ল যে তোমার মনের চিন্তাধারাই বিপথে গেছে। যাদের মনের চিন্তাধারা বিপথে যায়, তারাই বিপথ-গামী হয় তাদের কাজে। তুমি চিরকালই এরকম ছিলে এবং চিরকালই থাকবে।

লু—(অনুনয় ভাবে) শোন হেষ্টার!

হে—না—না আমি জানি না তোমায় আমি বোঝাতে পারব কি না কিন্তু সেবারকার সেই লজ্জা, অপমান, গ্লানি সব কিছু মিলে যেভাবেই হোক তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ ছিল তা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, চেষ্টা করলেও আর আমি তা ফিরিয়ে আনতে পারি না। একবার যা মরে যায় তা মরেই যায়।

লু—শোন হেষ্টোর, আমার কথাটা

হে—(তাড়াতাড়ি) তাছাড়া আ
(যেমন)।

লু—কি কথা ?

হে—আগেকার মত আমি তোমার কথাই আগে ভাবতে পারি না—আর একজন আছে।

লু—(কর্কশ স্বরে বাধা দিয়া)—ও তাই নাকি ? এই হল আসল কথা কেমন ? আর একজন আছে তোমার তাই না ? আমার জানাই উচিত ছিল যে বারো বছর ধরে একজন স্ত্রীলোক একনিষ্ঠ হ'য়ে থাকতে পারে না। (বিদ্রূপ ও ঘৃণাভরে) বিশেষ তোমার মত যারা ভাল—প্রদীপের নীচেই অন্ধকার কি না—যারা যত ধর্মের আড়ম্বর করে তাদেরই তত সাবধানে রাখতে হয়—তাই না ?—(সেখানে কিন্তু হেষ্টোর কথা বলে না) তুমি ভাবছ আমি এটা নীরবে মেনে নেব, না ? যে আমি এতদিন ধরে একনিষ্ঠ-ভাবে কাটিয়েছি করে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসব করে—সেই আশায় দিন কাটিয়েছি।

হে—আমার কথা ভেবেই যে তুমি ভালো হয়ে ছিলে তা মোটেই নয়—তুমি ভালো হয়েছিলে বাধ্য হয়ে। জেলখানার পাঁচিলই তোমাকে ভাল রেখেছিল, আমার দৃঢ় কথা এবং একমাত্র কথা এই যে জেল-খানার পাঁচিলই পারবে তোমাকে ভাল রাখতে ?

(ক্রমশঃ)

স্থাপিত ১৯১৯

বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স

এণ্ড

বেঙ্গল প্রপার্টি কোং লিঃ

হেড অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

১৮,০০,০০০৲ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালের ভ্যালুয়েশানে প্রশংসনীয় উদ্বৃত্ত

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ, এম্ এল্-এ
মানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বি, ই, এন, বোস
সেক্রেটারী

আষাঢ়ে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিন আসন্ন পুণঃ। আকাশের আঁখি
অশ্রুপূর্ণ। বৃষ্টিধারা ঝরে থাকি থাকি।
পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত। নিস্তব্ধ বিস্তারী
মাঠে মাঠে শ্যামশস্য। কোল ঘেঁসে তারই
বহিতেছে স্রোতস্বিনী। নব জলধারা
গ্রাস করে দুই কূল। অপরাজিতারা
বেড়ায় ফুটিয়া আছে। কদম্বের বনে
দেখা যায় কুঁড়িগুলি। আর্দ্র সমীরণে
মেহেদীর নিষ্টগন্ধ। সারাবেলা ধরে'
মেঘ ও রোদ্দুরে খেলে আকাশের ক্রোড়ে
লুকোচুরি বসা যাবে আনন্দে বাবুই!
তালীকুঞ্জে বর্ষাগমে। ফুটিয়াছে যুঁই
মালঞ্চে প্রচুর। তাপদগ্ধ বসুধায়
এসেছে বরষা স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায়।

বহ্নি

মলিনা দেবী

বহ্নি সম উঠব জ্বলে
তিমির তব গহন তলে,
ঝঞ্ঝা মম ললাট লিখা
সাগর বুকে নাচের তালে।
মরণ আজি সঙ্গী মোর
জীবন ভরে মূর্চ্ছাতুর
এক্ নিমেষে বাজাই আমি
বিচ্ছেদ ও মিলনের সুর।
যেথায় বাজে গভীর ব্যথা
সেথায় থাকি রাত্রি দিন
ললাট লিপি ছিন্ন করি
বাজাই বসি রুদ্রবীণ।

পুস্তক পরিচয়

হারিয়ে যাঁরে জগৎ কাঁদে! শিবদাস চক্রবর্ত্তী
ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী। ২১৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পৃষ্ঠা ১৮৮, মূল্য তিন টাকা।

হারিয়ে যাঁরে জগৎ কাঁদে—মহাত্মা গান্ধীর জীবন-চরিত। মহাপুরুষের জীবন চরিত মহাসমুদ্রের মত। মহামানব মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগর ও হিমালয় পর্ব্বতেরই শুধু তুলনা হয়; এমনি গভীর এবং উত্তুঙ্গ মহিমায় তিনি উদ্ভাসিত। শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের ছোটখাট পরিসরের মধ্যে গান্ধীজীর বিরাট ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। গান্ধীচরিত্রের ক্রম-বিকাশ বায়োস্কোপের ছবির মতো যেন আমাদের সামনে ফুটে উঠতে থাকে—ভাষা এমন ঝরঝরে এবং ঘটনা বিন্যাসের এমনি মুন্সিয়ানা।

গান্ধীজীর জীবনই তাঁর বাণী। শিবদাস বাবু পরম নিষ্ঠার সঙ্গে সেই লোকোত্তর জীবন আলেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—গান্ধীজীর জীবনের বাণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ক্রমবর্দ্ধমান গান্ধীসাহিত্যের মধ্যে শিবদাস বাবুর গ্রন্থখানি কলেবরে ছোট হলেও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কিশোরদের পক্ষে বইখানি অত্যন্ত উপাদেয় বলে মনে হবে। এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া সমাজের কল্যাণের জন্যে একান্তভাবে কাম্য।

খেলাধূলা

শ্রীখেলোয়াড়

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের ফুটবল খেলা ও ফুটবল খেলোয়াড় বলিতে বাঙ্গলার ফুটবল খেলা ও খেলোয়াড় বুঝাইত। সেই ফুটবল খেলা যে বর্তমানে কোন পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে একথা যে কোন ক্রীড়-মোদী বিশেষ করিয়াই জানেন। আজকাল কলিকাতার প্রধান প্রধান ফুটবল দলগুলিতে বাঙ্গালী অপেক্ষা অ-বাঙ্গালীই বেশী। খেলোয়াড় তৈয়ারী বা খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গঠনের চেয়ে আজ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করাই চরম লক্ষ। ফলে আজকাল মাঠে বসিয়া খেলা দেখিতে লাগিলে মনে হয়না কলিকাতায় কোনো প্রথম ডিভিসন্ দলের খেলা দেখিতেছি। মোহনবাগানের মত দলের ভবানীপুর, এরিয়ান্সের নিকট পরাজয় ইহার পরিণাম। মহামেডানের রেঞ্জার্স ও ক্যালকাটার নিকট পরাজয় ইহার অনিবার্য ফল। বাঙ্গালী খেলোয়াড়গণ তাহাদের প্রতিভা হারাইয়া আজ অবহেলিত।

আজ তাই সবচাইতে বেশী প্রয়োজন সেই ফুটবল খেলাকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাহার পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরাইয়া আনা। এ বিষয়ে I. F. A. এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন পূর্বে পেন্টাল সাহেবের সভাপতিত্বে মেট্রোপোল হোটেলে বাঙ্গলার অভিজ্ঞ ও প্রাচীন খেলোয়াড়দের লইয়া এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা তাহাদের মতামত জানান, তবে অধিকাংশই খেলোয়াড় আমদানীর বিরুদ্ধেমত দেন। খেলা অধঃপতনের অন্য একটী প্রধান কারণ উল্লেখ করিতে যাইয়া তাঁহারা বলেন খেলোয়াড়দের ঘন ঘন দল পরিবর্তন ইহার একটি অনিবার্য ফল। একথাটী অবিসংবাদিত সত্য। বাঙ্গলায় ফুটবলের অধঃপতনের সবচাইতে বড়ো কারণ এইটাই।

এরিয়ান, কালিঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ন বা অর্জটেলিগ্রাফের কোন একটী খেলোয়াড়কে প্রথম বছর হয়ত ভালো খেলিতে দেখা গেল; ব্যস অমনি মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় দলগুলির মধ্যে তাহাকে জালে ফেলিবার বিভিন্ন পেচ চলিতে লাগিল। আর যায় কোথায়—তরুণ যুবক হয়তো মফঃস্বল হইতে আসিয়াছেন; একদিন এইসব দলে খেলিতে পারার কল্পনা ছিল—সুতরাং সে সুযোগ তাহারা ছাড়িতে চাহেন না। কিন্তু—এই সব শীর্ষস্থানীয় দলে খেলোয়াড়ের অভাব না থাকায় হয়তো ২।১টী খেলায় খেলিতে পারিলেন এবং সে খেলাগুলিতে সন্তোষজনক ফল না দেখাইতে পারিলে সারা বছর পাওয়ার লীগ পিটাইলেন। সারা বছর খেলিতে না পারার দুঃখে পরবৎসর পুনরায় দল পরিবর্তন করিলেন। এমন করিয়া বাঙ্গলার কত প্রতিভাবান কুশলী খেলোয়াড়ের প্রতিভা যে চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ খালি খেলার উন্নতির দিকে I. F. A.এর যদি প্রকৃত চেষ্টা করিতে হয় তবে খেলোয়াড়ের দল পরিবর্তনের দিকে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতে হইবে। একমাত্র তেমন বিশেষ অবস্থার মধ্যে না পড়িলে যাহাতে খেলোয়াড়গণ ৩ বছর বা ৫ বছরের পূর্বে দল পরিবর্তন করিতে না পারেন সে জন্য নূতন আইন প্রবর্তন করিতে হইবে। আজ শুধু আলোচনা বা সভা করিলে চলিবেনা, সেই আলোচনা যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে।

ষ্টেডিয়াম :—বাঙ্গলায় ফুটবল মরসুমে অগণিত জনসাধারণের অপরিসীম ও অমানুষিক ক্লেশের বিবরণ আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া লোকে শুনিয়াই চলিয়াছে। বহু

আলোচনা ও বহু কমন এ বিষয় লইয়া হইয়া গিয়াছে কিন্তু আজ আমরা একপদও অগ্রসর হইতে পারি নাই। একদিন বুটিশরাজ ক্যালকাটা ক্লাবের স্বার্থহানির ভয়েই হোক বা জনসাধারণকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়েই হোক সে দিকে দৃষ্টি দেন নাই। কিন্তু তাহারা তো এক 'যথেচ্ছাচারিতার জীবন্তি' করিয়াছেন। এখন আমাদের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের এ দুঃখের ইতিহাস তাঁহাদের অজানিত নয় অথচ আজো কিছুই হয় নাই। ভারতের মধ্যে সবচাইতে ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজন বাঙ্গলাতে। অথচ বাঙ্গলা ভিন্ন অন্যান্য প্রায় সকল স্থানেই ষ্টেডিয়াম রহিয়াছে। আবার শুনিতেছি দিল্লীতে নাকি আর একটি ষ্টেডিয়াম নির্মানের কল্পনা চলিতেছে।

তবে বহুদিন পর একটু আশান্বিত হইলাম যে কিছুদিন পূর্বে I. F. A. এর পরিচালকমণ্ডলী, মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিয়াছিলেন এবং গড়ের মাঠে ব্যাণ্ডষ্টাণ্ডের চতুঃপার্শ্বস্থ জমি লইয়া এক পরিকল্পনা নাকি গ্রহণ করা হইয়াছে। আর আলোচনা শুনিবার বা করিবার অভিরুচি নাই কারণ যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বার বার কাহাকেও বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। অনাহারক্লিষ্ট দেশে জনসাধারণকে এ সামান্য নিরামিষ আনন্দটুকু পাইবার উপায় যতশীঘ্র সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করিয়া জাতীয় সরকার ধন্যবাদার্হ হইবেন আশা করি।

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েসানের আবেদন :—

কলিকাতার ফুটবল খেলায় দর্শকগণের অশিষ্ট ও অভদ্রোচিত আচরণ ভারতবিখ্যাত। প্রতি বৎসরই রেফারী ও দু' চার জন খেলোয়াড় তাহাদের হস্তে অভিনন্দিত হন। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের এ অভদ্রতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। খেলোয়াড় বা রেফারীকে গালিগালাজ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইনা, মাঠে নামিয়া তাহাদের দেহস্পর্শ না করিতে পারিলে যেন ঠিক শান্তি লাভ করিতে পারি না। মোহনবাগান ও মহঃ স্পোর্টিং এর খেলায় আমরা সে দৃষ্টান্ত পুনরায় দেখাইলাম ফলে মহঃস্পোর্টিং খেলিতে আপত্তি জানায়, কিন্তু পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে তাহারা পুনরায় খেলিতে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি ও ভদ্রতা বোধের আর একটি চরম দৃষ্টান্ত এবছরে খাড়া করিয়াছি। তাই মহঃ স্পোর্টিং ও ইষ্টবেঙ্গলের গত চ্যারিটি খেলা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে I. F. A. এর তরফ থেকে সম্পাদক মহাশয় একটী প্রচার পত্রে দর্শকগণকে শান্ত থাকবার আবেদন করেন—আবেদন পত্রের শেষটুকু বাঙ্গলার ফুটবল দর্শকদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইবার জন্য তুলিয়া দিতেছি। "মনে রাখবেন খেলা জেতাটাই চরম নয় খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তিটাই আদর্শ। নিজের পৌরুষকে অক্ষুন্ন রাখা, বীরত্ব শৃঙ্খলা বজায় রাখাটাই জাতীয় কর্তব্যবোধের পরিচায়ক। অপরপক্ষকে হারিয়ে দিয়ে উল্লাসিত হওয়ার চেয়ে খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে নেওয়াটাই কৃতিত্ব।"

ক্রিকেট :—ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়কের বিরুদ্ধে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে অমরনাথের বিবৃতি দেখিয়া মনে হয় মেলো সাহেব যখন যাহা খুশী তাহাই করিবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কেহ যদি কিছু বলে তবে তিনি তাহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। পূর্বে তিনি বিজয় মার্চেন্ট ও মুস্তাক আলীর বিরুদ্ধেও এরূপ করিয়াছেন। অমরনাথ সকল প্রাদেশিক ক্রিকেট এসোসিয়েসানের নিকট তাহার বিবৃতি সহ মতামত চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা প্রাদেশিক এসোসিয়েসানের মতামতের প্রতিক্ষায় আছি। সাথে সাথে ক্রিকেট কণ্ট্রোলবোর্ডকেও অনুরোধ করি তাহারা মেলোসাহেবের কথায় সায় না দিয়া নিজেরাও যেন প্রত্যেকটী বিষয় চিন্তা করিয়া মতামত দেন।

ইংলণ্ড ও নিউজিলাণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ লিড্‌স্ মাঠে ও লর্ডস মাঠে অমিমাংসিতভাবে শেষ

হইয়াছে। এই টেষ্টগুলি ৪ দিনের খেলার ফলাফলের উপর বিচার হইতেছে। উভয় পক্ষের ব্যাটসম্যান যেরূপ শক্তিশালী তাহাতে এরূপ ৪ দিনের টেষ্টগুলি সবই অমিমাংসিতভাবে শেষ হইবে বলিয়া মনে হয়।

উইম্বলডন টেনিস্—বিশ্ববিখ্যাত উইম্বলডন টেনিস সহযোগীতা সমারোহের সহিত শেষ হইয়াছে। আমেরিকার খেলোয়াড়গণ অধিকাংশ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

মহিলাদের সিঙ্গিলসে :—মিস্ লুইস ব্রাণ্ড (আমেরিকা) মার্গারেট ওসবর্ণকে ১০।৮, ১।৬, ১০।৮ পরাজিত করেন।

ডবলস্ :—মিস্ লুইস ব্রাণ্ড ও মার্গারেট ওসবর্ণ (আমেরিকা) মিস্ গ্রাটুড মোরান ও মিসেস পোট্রিকা টড্‌কে (আমেরিকা) ৮।৬, ৭।৫, গেমে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলস্ :—রিচার্ড গন্জেলিস্ ও ফ্রাঙ্ক পার্কার (আমেরিকা) টেড্ শ্রোয়েডার ও গার্ডেনার মুলয় (আমেরিকা) ৬।৪, ৮।৬, ৬।২ গেমে পরাজিত করেন।

এই বৎসরে ফুটবল লীগে গোলদাতাগণ :—(৪-৭-৪২ পর্যন্ত)

মেওয়ালাল (ই, আই, আর)—২৩
আবিদ (ইষ্টবেঙ্গল)—১৭
ধনরাজ ( )—১৫
এণ্টনী (মহঃ স্পোর্টিং)—১০
এম, ঘোষ (ই, আই. আর)—৯
কে, সিং (কালিঘাট)...৮
বচন (মহং স্পোর্টিং)–৮
সত্তার —৮

লীগ খেলায় কাহার কিরূপ স্থান (৪-৭-৪২ পর্যন্ত)

	খে		ড্র	বিঃ	
ইষ্ট বেঙ্গল	১৮		৫৪	৪	৩৩
মোহনবাগান	১৮		২৮	৬	২৮
মহং স্পোর্টিং	১৭		৩৩		২৬
ই, আই, আর	১৯		৪৬		২৪

সঙ্গীত বিভাগ

'মল্লিকা'র আমরা কয়েকটি নূতন বিভাগ সঙ্গীত বিভাগ তার মধ্যে একটি। এ বিভাগে প্রকাশ করার জন্য সঙ্গীত রসিকদের কাছ থেকে আমরা প্রবন্ধ ও স্বরলিপি আহ্বান করছি। এবারে শ্রী প্র. মু. লিখিত—বিগত সঙ্গীত সম্মেলনের সম্বন্ধে একটি আলোচনা রইল, এ ছাড়া শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য লিখিত ও শ্রীপৃথ্বি রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সুর দেওয়া একটি গান ছাপা হ'ল। (সঃ মল্লিকা)

বিগত সঙ্গীত সম্মেলন

শ্রী প্র. মু.

কিছুদিন আগে 'শ্রী' সিনেমা হলে যে সঙ্গীত সম্মেলন হ'য়ে গেল—সে সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তাঁরাই বাঙলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, সাধারণতঃ এই রকম সব সম্মেলনে বরাবরই যার প্রাধান্য থাকে, সে হচ্ছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। এটা জেনেই বোধ হয় সাধারণ লোকেরা এই সব সম্মেলন স্বযত্নে এড়িয়ে চলে। যে সব নামকরা ওস্তাদদের আগমন হ'য়ে থাকে এই সব সম্মেলনে কতকটা তাঁদের দেখবার জন্যেও লোকের ভীড় হ'য়ে থাকে বটে। ধৈর্য ধ'রে শেষ পর্যন্ত ওস্তাদদের সুরের কসরৎ শুনবার মত লোক শেষ পর্যন্ত বেশী থাকে না। ঠিক এই রকমটি হ'লেই যদিও নিতান্ত স্বাভাবিক হ'ত, কিন্তু 'শ্রী' সিনেমার সেদিন অস্বাভাবিক রকমের জন-সমাগম হ'য়ে বাঙালী জাতির রসিক মনেরই প্রমাণ দিয়েছে।

বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ, প্রফেসর আলি আকবর খাঁন, প্রফেসর রবিশঙ্কর, ওস্তাদ আমীর খাঁ, প্রঃ বিলায়েৎ খাঁ, শ্রীমতী গঙ্গু বাই, পণ্ডিত রতনজঙ্কার, প্রঃ দেওধর, আল্লা রাখা, শান্তা প্রসাদ, নটরাজ গোপী মিশ্র প্রভৃতির নাম ত অল্পাধিক সকলেরই পরিচিত। এঁরা ছাড়া ছিলেন স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য —শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শ্রীশচীন দাস, মতিলাল, শ্রীউষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধিকা মোহন মৈত্র, মুস্তাক আলি খাঁ, কেরামত খাঁ, শ্রীকানাই লাল দত্ত, শ্রীমতী উষা দে, কুমারী মীরা চট্টোপাধ্যায়, কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

স্থানীয় শিল্পীবৃন্দের পরিচয় দেবার বিশেষ কিছু নেই। কারণ এঁরা প্রায় সকলেই আপনাদের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। বহিরাগত শিল্পীদের মধ্যে ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁ সাহেব সঙ্গীত-রস-পিপাসু ব্যক্তির নিকট বিশেষ ভাবেই পরিচিত। এঁর বিস্তৃত পরিচয় দেবার তেমন প্রয়োজন নেই, কেবল এইটুকু বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে—এই বৃদ্ধবয়সেও তিনি যে রসসৃষ্টি করেছেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। রাগের বিশুদ্ধতা ও সুর সংযোজনার সহিত তাঁহার পদ-বিন্যাস সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠে, শ্রোতাদের সমস্ত মন তাঁর গুণপনার জন্যে এক গভীর কৃতজ্ঞতারসে ভরে ওঠে।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁ অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পী—ইঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর,—সুরের সচ্ছন্দ গতি, গাহিবার অনায়াস ভঙ্গী, দ্রুত তান, সরগম—শ্রোতাদের মনে এক অপূর্ব আনন্দ দান করে। এঁর ঠুংরী গানে পাঞ্জাবী তর্কিপের প্রাধান্য লক্ষ্য করা গেল, যা শ্রোতাদের মনে পুলকের সঞ্চার করে।

দিল্লীর ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের গাম্ভীর্যপূর্ণ সঙ্গীত একটি রসঘন গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পক্ষেত্রে যে একটা কতবড় সাধনার জিনিস, শ্রদ্ধাপ্লুত মন নিয়ে শ্রোতারা সেটি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। এঁর বিস্তারের পদ্ধতি অতীব

সুন্দর,—কৃন্তন ও সাপট এঁর গানের সৌন্দর্য অধিকাংশে বাড়াইয়া তোলে। পরলোকগত ওস্তাদ আব্দুল ওয়াহেদ খাঁ সাহেবের গানের ছাপ এঁর মধ্যে লক্ষ করা গেল।

শ্রীমতী গঙ্গুবাই প্রথমে পরলোকগত ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কাছে এবং করিম সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য শিষ্যা সোওয়াই গন্ধর্বের নিকট শিক্ষালাভ করেন। প্রতি মাধুর্যের দিক থেকে এর গান অপূর্ব হলেও আগেকার সুনাম তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। স্বরোদে প্রঃ আলি আকবর খাঁ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এর সুমিষ্ট হাতের বাজনা শ্রোতৃবৃন্দ তৃপ্তির সঙ্গে শোনেন, সুষন্ত্রী হওয়ার প্রায় সবগুলি গুনেরই তিনি অধিকারী, ইনি ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র, ওস্তাদ আলা-উদ্দিন খাঁ সাহেবের জামাতা প্রঃ রবিশঙ্কর সেতারে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন। বিভিন্ন প্রকারের তাল না থাকলেও সুর ও লয় এর বিশেষ ভাবেই আয়ত্তে দেখা গেল, এর বাজনায় স্বরোদের ছাপ একটু বেশী প্রকট হয়ে ওঠে।

তবলাবাদকদের ভেতরে ওস্তাদ কালের বক্সের সুযোগ্য শিষ্য আল্লা রাখাই শ্রোতাদের বেশী মুগ্ধ করেছেন। এঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাজনা, বিবিধ প্রকারের তেহাই একান্ত মনোরম, বিশেষ করে ওস্তাদ কৈয়াজ খাঁ সাহেব ও প্রঃ বিলায়েৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গে এর সঙ্গত বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। ওস্তাদ নজির খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র কেরামৎ খাঁ সাহেবের সঙ্গত অতি চমৎকার—গান বাজনার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে ইনি সিদ্ধহস্ত, এঁর লহরাও শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে, এছাড়া বেনারসের শান্তাপ্রসাদের নামও উল্লেখযোগ্য।

বিগত সঙ্গীত সম্মেলনের সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা এইখানেই শেষ করতে হল। স্থানাভাব বশতঃ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হল না। আমাদের দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ক্রমশঃ অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠুক এই কামনা জানিয়ে আজ আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

আধুনিক

(দাদরা)

যতটুকু তুমি দিতে পার প্রিয়
তারো বেশী আমি চাই

চকোরের ক্ষুধা দুই চোখে ল'য়ে
চাঁদেরে ধরিতে যাই

হৃদয়ে আমার জোয়ারের বেগ
দুই কূল ভাঙা নদীর আবেগ

তোমার উদার সাগরের মাঝে
আপনারে খুঁজে পাই

তোমারে যে আমি গড়িয়া তুলেছি
রঙে রঙে রূপে রূপে

ভালবাসা মোর তোমারে ঘেরিয়া
অন্তরে করেছে চুপে

তব প্রেম হায় নব বসন্ত যেন
রিক্ত করে সে পূর্ণ করেনা কেন

তার চেয়ে ভাল বৈশাখী ঝড়
ছলনা তাহার নাই।

গ গপ প ধন নসর্ন ধপ প ধনধ প | পধনধ পধন ধন ধনধ প |
যত টু কু তু মি দি০ তে০০ পা র ০০০ প্রি | য়০০০ ০০০ ০ |

ন ধনসর্ন ধ প ম গ প-া -া -া-া -া |
তা রে০০০ রে ই আ মি চা০ ই

II গ ম পস্র্ গ স্র্ ণ ধপ প ধণধ প ম | ম পধপ ম ম গ রগর |
চ কো রে০ এ র ক্ষুধা ছ ই০০ চো০ | খে ল রে০ ০০০ |

গ প ধন নসর্ন ধপ ধ ন র্ স্র্ | ন স্র্ন ধনধ প
চা রে রে ৎ০ রি০০ তে০ চা০ ই | চা ০০ আ০০ ই

ন ধন ধ প ম গ প-া -া -া-া-া -া |
চা রে ধ রি তে চা০ ই

স গ প স্র্-া স্র্ -া -া স্র্ র্ স্র্রস্র্ ন -া -া -া -া -া -া |
ছ ড় রে আনা ০ আ র জো য়া রে, র রে ০ ০ ০ ০ ০ গ |

ধ র্ র্ ধ র্ ধ প-া প ন র্ র্ ঋ র্ গ র্ র | স্র্ স্র্ র্ গ স্র্ র্ গ্ |
ছ ই কু উ০ ল ভাঙ্গা ন০ দী র০ আ ০ ০ | রে০ এ০ এ০ গ |

র্ গ র্ গ্ প ম গ র্ র্-া র্ গ র্ র্ গ র স্র্ র্ গ্ র্ স্র্ ন-া -া -া -া |
তো০ মা ০ র ঊষর সা গ রে ০ র মা রে,০ ০ ০ ০ |

ধন ধনধ প গ প-া | প ধন প | ধন র্ স্র্ স্র্ন ধনধ প
এ০ এ০০ এ আ প না | রে খু০ জে | পা০ ০ আই আ০ আ০০ আই

প-া-া-া-া-া-া-া II
| পা-০-০-০-০-০-০ ই

স র জ্ঞ প-া-া ধ স্র্ ধস্র্ ধ | পজ্ঞ পজ্ঞ র র জ্ঞ জ্ঞ প ক্ষ |
তো মা রে রে আ মি প ড়িয়া ০০ তুলে ০০ ছি ড়ে র ০ |

স ঞ্জ্ঞ স ঋপা প -া প প ন প ণ ণ র্র র্র র্র র্ন র্ঞ্জ র্র
তা ল বা সা মোর তো মা ০ রে খে রি ০ রা আ র ০ তি

ন ন র্র র্স
চু পে ০ ০

স ঞ্জ্ঞ স | স প প দ ক্ষ ক্ষ ধ প ক্ষ ঞ্জ র স র
আ র ০ তি | ক রে ছে ০ চু পে ০ এ এ ০ এ ০ এ

ঞ্জ র স র স
ক ০ ০ ০ পে

গ প- ১	প র্স- ১- ১	র্স -া ১	স র্র র্র র্ম	র্স ন- ১- ১- ১- ১
ভ ব প্রে	এম হা র	ন ব ব	স ও ন ত ০	যে ন- ০ ০ ০ ০

ধ র্র র্র	ধ র্ধ প- ১	প ণ র্	র্ ঋর্র ঋর্র গ	র্ গ র্ স	র্ গ র্ স র্ গ
রি ০ ক্ত	ক ০ ০ রে দে	পু উর্ন	ক ০ রে ০ না ০	কে ০ ০ ন	ও ০ ০ ০ ০

র্গ- ১ গ ম	র্ গ র্প র্ম র্গ র্	র্ র্র্গ র্ র্স	র্ম র্র্স র্ র্স	ন -া- ১- ১- ১- ১- ১
তা র চে ০	এ ০ ০ ০ ভা ল	বৈ ০ ০ শা ০	খী ০ ০ ০ ০	ঝ ০ ০ ০ ০ ০ ড়

ধ ন ধ ন ধ প	গ প প	ধন ন র্স ন ধ প	ধ ন র্ স র্	র্ম ন ধ ন ধ প- ১
অ ০ অ ০ ০ ড়	ছ লনা	তা ০ হা ০ ০ র	না ০ ০ ই	না ০ আ ০ ০ আই

ন ধন ধ	প ম গ	প -া ১- ১- ১- ১- ১	II
ছ ল ০ না	তা হা র	না ০ ০ ০ ০ ০ ই	

জাগতিকি

সুধীর রায়চৌধুরী

প্যারী সহরে বহুদিন পরে গত ২৩শে মার্চ চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক আরম্ভ হয়। এই সম্মিলন প্রায় একমাস পরে ২০শে জুন রাত্রে ঘোষণা করেন যে তাহারা অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি এবং জার্মানী সম্বন্ধে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐকমত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিবগণ তাহাদের সহকারীদের ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে শান্তিচুক্তির খসড়া সম্পূর্ণ করার জন্য অবিলম্বে কাজ সুরু করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে অষ্ট্রিয়ার সীমানা ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী যাহা ছিল তাহাই থাকিবে। অষ্ট্রিয়াকে কোন ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন অষ্ট্রিয়ার নিকট হইতে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ পনর কোটী ডলার পাইবে। এই অর্থ অষ্ট্রিয়াকে ছয় বৎসরে শোধ করিতে হইবে। দানিয়ুবে জাহাজ চলাচলের উপর সোভিয়েটের দাবী অষ্ট্রিয়ার সোভিয়েট মালিকানাধীন তৈল খনি ও দানিয়ুবে অষ্ট্রিয়ার যে সকল জাহাজী কোম্পানী রহিয়াছে তাহার লভ্যাংশের উপর সোভিয়েট সরকারের দাবী, অষ্ট্রিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ব্যতীত ছয় বৎসরের মেয়াদে পনর কোটী ডলারের বিনিময়ে সোভিয়েট কর্তৃক অধিকৃত জার্মান সম্পত্তি অষ্ট্রিয়াকে দেওয়ার যে প্রস্তাব রহিয়াছে তাহা লইয়াও মতভেদ দেখা দিয়াছে। পশ্চিমী শক্তিত্রয় প্রস্তাব করিয়াছে যে চুক্তি কার্যকরী হইবার প্রারম্ভেই ঐ সকল সম্পত্তি অষ্ট্রিয়াকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

জার্মানী সম্পর্কে সাময়িকভাবে যে মীমাংসা হইয়াছে তাহা পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের প্রস্তাবের মূলনীতির প্রধান প্রধান বিষয়গুলির কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়াই সম্ভব হইয়াছে। জার্মানী সম্পর্কে সচিবগণ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে একমত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে :—

(১) জার্মানীর চতুঃশক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী সংযোগরক্ষী প্রতিষ্ঠান গঠন, (২) অবরোধ পুনঃ প্রবর্তন না করার রাশিয়ার সম্মতি, (৩) সোভিয়েট ও পশ্চিমী এলেকার মধ্যে মালপত্র বিনিময়ের ভিত্তিতে পুনরায় বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন।

জার্মানী ও বার্লিনে দখল করা শক্তিগুলির মধ্যে কাজ চালানোর উপযোগী ব্যবস্থা সম্পর্কে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিবদের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা হইতে এই প্রথম সরকারীভাবে স্বীকৃত হইতেছে যে অতঃপর জার্মানী বার্লিনের সমস্যাকে পৃথকরূপে গণ্য করা হইবে।

নূতন ব্যবস্থা অনুযায়ী দুইটি পৃথক পৃথক শাসন ব্যবস্থা বজায় থাকিবে। এতদ্বারা বর্তমানের জন্য ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে যে চতুঃশক্তি নিয়ন্ত্রণাধীনে জার্মানী ঐক্য সম্ভব নয়।

অপর পক্ষে বর্তমান কাজ চালাইবার উপযোগী চুক্তি যদি উভয় পক্ষ কর্তৃক নিষ্ঠার সহিত কার্যকরী করা হয় তাহা হইলে বার্লিন অবরোধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বকার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

চুক্তিতে উভয় পক্ষকে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হইবার জন্যও প্রতিশ্রুতি বদ্ধ করা হইয়াছে।

বর্তমান চুক্তির বিশেষ লক্ষনীয় বিষয় এই যে উহাতে কারেন্সী সমস্যার প্রত্যক্ষভাবে কোনও উল্লেখ নাই।

পশ্চিম বার্লিনের সংবাদ পত্রগুলি জার্মানী ও বার্লিন সম্পর্কে কাজ চালাইবার উপযোগী চুক্তি সম্পাদন সম্বন্ধে মন্তব্যক্রমে উহাকে প্যারিস হইতে আশার আলো বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সোভিয়েট লাইসেন্স প্রাপ্ত পত্রিকা গুলিতে কেবলমাত্র পররাষ্ট্র সচিবদের গোপন বৈঠক অনুষ্ঠান অথবা চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

হয়তো এই চুক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিবে। অন্ততঃ শান্তিকামীদের সেই আশা।

জার্মানীর পাশ্চিমাংশ 'বন' শাসনতন্ত্র অনুসারে চালিত হইবে এবং মিত্রশক্তিত্রয়ের শাসন সনদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের পৃথক সত্তা অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও স্বীকৃত হইল; তাই 'পটসডাম' চুক্তি অনুযায়ী জার্মানীর একীকরণ সমস্যা স্থগিত হইল, কিন্তু পূর্ব বার্লিনের সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বাণিজ্যকেও অর্থনৈতিক সুব্যবস্থার জন্য পররাষ্ট্র সচিবদের সরকারদের বৈঠক আহ্বান করা হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া চুক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যুগোস্লাভিয়া স্লোভেন-মোরিনথিয়া সম্বন্ধে ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছে। মার্সাল টিটোর নেতৃত্বে পরিচালিত যুগোস্লাভিয়ার সহিত কোমিনফর্মের বিরোধের পূর্বে যুগোস্লাভিয়ার দাবীর সমর্থনের ফলেই এর আগে অষ্ট্রিয়া শান্তি প্রস্তাব আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

চীন—

বহুকাল গৃহযুদ্ধের পর কমিউনিষ্টগণ চীনের অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু দেশ অধিকার করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হন নাই, অবিলম্বে দেশের সুশাসন পত্তন করিবার কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। চীনের কমিউনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুং এর নেতৃত্বে ২১ জন চীনা নেতার একটী কমিটি চীনের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী সরকারের একটি সর্ববাদীসম্মত কর্মসূচী ও পরিকল্পনার খসড়া প্রনয়নের কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। ১৫ই জুন পিপিং এ যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে, এই কমিটিই ২১ জনের এই কমিটি নির্বাচন করিয়াছেন।

চীনে গণতান্ত্রিক কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য যে রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলন বসিবে তাহার সংগঠনের নিয়মকানুন প্রণয়নও ২১ জন চীনা নেতার এই কমিটিকে করিতে হইবে। স্থির হইয়াছে যে উক্ত রাজনৈতিক পরামর্শ সম্মেলন পঞ্চতাল্লিশটি প্রতিনিধি মূলক ইউনিট হইতে পাঁচশত দশ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করিবেন। এই পঞ্চতাল্লিশটী ইউনিট চৌদ্দটি গণতান্ত্রিক দল ও গোষ্ঠী নয় অঞ্চল, ছয় সামরিক ইউনিট এবং শ্রমিক কৃষক শিল্পপতি সংখ্যালঘু জাতি প্রবাসী চীনা এবং কনিয় প্রতিষ্ঠানের ষোলটি দল লইয়া গঠিত একুশজন নেতার এই কমিটি জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় প্রতীক নির্দ্ধারণ করিবেন।

গত ১৫ই জুন বাঙ্কুক রাজপ্রাসাদে প্রস্তুতি কমিটির যে বৈঠক বসে তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাও সে তুং ঘোষণা করেন যে, চীনে যে কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট গঠিত হইবে তাহাই প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিংটাং দলের অবশিষ্ট সৈন্যদের ঝাটাইয়া বিদায় করিতে জনসাধারণকে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাইবে এবং এই গভর্ণমেন্টই সমগ্র চীনকে একত্র গ্রথিত করিয়া জাতীয় কল্যাণের সামগ্রিক ভিত্তিতে ধীরে ধীরে এবং সুপরিকল্পিত ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সুসংবদ্ধ দেশরক্ষার পক্ষে দেশকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। তিনি বলেন একমাত্র এইরূপ গভর্ণমেন্ট গঠনের দ্বারাই আমাদের মাতৃভূমিকে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধিনতা, শান্তি, মুক্তি, শক্তি ও সম্পত্তির পথে আগাইয়া যাওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, গত তিন বৎসরে মুক্তি ফৌজ প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিংটাং বাহিনীর পঞ্চাশ লক্ষ নব্বই হাজার সৈন্যকে জখম করিয়াছে। এখন কুওমিংটাং দলের মাত্র ১৫ লাখ সৈন্য আছে। ইহাদের নিশ্চিহ্ন করিতে কিছুদিন সময় লাগিবে বটে। কিন্তু খুব বেশীদিন নয়।

মাও সে তুং অতঃপর বলেন যে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সমূহ চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের বিপ্লব বিরোধী যুদ্ধে উস্কানি দিয়া চীনের জনগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিতে প্রেরণা দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই উস্কানি ও চক্রান্ত শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হইয়াছে। চীনের জনগণ বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করিয়া আজ বিজয় লক্ষ্মীকে বরণ করিয়া লইবার অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে।

মাও সে তুং অতঃপর বলেন যে চীনের নূতন গভর্ণমেন্ট পারস্পরিক উপযোগীতা পারস্পরিক সোহা

সাবভোমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কোন বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। যদি অবশ্য এই সকল রাষ্ট্র চীনের প্রতিক্রিয়াশীলদের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিন্ন করেন, তাহাদের সাহায্য করিতে বিরত হন এবং চীনের জনগণের প্রতি সৌহার্দ্যের শুভ মনোভাব বিসর্জন দিয়া সত্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সত্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়া চীনের নূতন গভর্ণমেণ্ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পৃথিবীর যে কোন দেশের গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা করিতে রাজি আছেন।

মাও সে তুং এর এই শুভেচ্ছা প্রণোদিত শুভ প্রচেষ্টা চীন বিপ্লবের সৃষ্টি সহায়ক এক নূতন অধ্যায় রচিত করিতেছে। দেশের সংগত এমন কোন প্রচেষ্টা তাহা অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রিক, কৃষ্টিমূলকই হউক এই সৃষ্টি কার্যে অংশ গ্রহণ হইতে বাদ পায় নাই। এমন কি বিভিন্ন দেশে অধিষ্ঠিত চীন সংহতিগুলিও তাহাদের যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই বৈশিষ্টের প্রতি লক্ষ রাখিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন যে, যদিও মাও সে তুং কমিউনিষ্ট তথাপি সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিষ্ট মতবাদ যে রূপ গ্রহণ করিয়াছে চীনে তাহার সেই রূপ গ্রহণ করার সম্ভবনা দেখা যাইতেছে না। এবথা যদি সত্য হয় তবে হয়তো কমিন বিনা বিরোধেই বিশ্বে নূতন শান্তি রূপ গ্রহণ করিবে।

কে. এম. টি. কিন্তু তাহাদের জিদ এখনও ছাড়ে নাই। হটিতে হটিতে যেন দেয়ালে পিঠ ঠেকাইয়া সে যুদ্ধ চালাইতেছে। বার বার সাংহাই বন্দরের উপর নিরর্থক ধ্বংসাত্মক বিমান আক্রমণ করিতেছে। কমিউনিষ্ট অধিকৃত বন্দরগুলির উপর অবরোধ কায়েম করিয়াছে। বৃটিশ জাহাজ আনীশসের উপর পর পর গোলাবর্ষন করিয়াছে। এই জাহাজের উপর গোলাবর্ষন ও বন্দরগুলির অবরোধ লইয়া আন্তর্ধাতিক মহলে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। আন্তর্ধাতিক আইনের প্রশ্ন উঠিয়াছে। বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্র দপ্তর সমূহ কর্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব মিঃ একিসন ঘোষণা করিয়াছেন যে এমেরিকা এই অবরোধ মানিয়া লইবেন না। ইংরেজ ও সরকার হয় তো তাহাই করিবেন।

কে. এম. টির এই নিরর্থক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কখনও সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কে. এম. টির সহিত শান্তি প্রস্তাব বা যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব সফল না হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইতেছে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে কে. এম. টির নেতাদের বিচারের দাবী। এই দাবী কিন্তু বিশ্ববাসীর সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজও যদি এই ভাবে লোক ক্ষয় ও সম্পত্তি ক্ষয় হইতে থাকে তবে ইহার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে যুদ্ধাপোরাধী হিসাবে গণ্য করিতে কেহ দ্বিধা করিবেনা।

ইন্দোনেশিয়া—

এশিয়ার আর একটী অংশে শান্তির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রী রাজধানী যোগজাকার্তা হইতে ডাচ সৈন্য অপসারিত হইতেছে, এবং সাধারণতন্ত্রী সরকার তথায় অধিকার স্থাপন করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্ণো প্রধান মন্ত্রী হাত্তা এবং আরও ২।১ জন মন্ত্রী, তথায় প্রবেশ করিয়াছেন। অন্যান্য মন্ত্রীগণ ওলন্দাজ পুলিশ এ্যাকসনের ফলে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারাও ৪ই জুলাই এর ভিতর তথায় আসিয়া মিলিত হইবেন বলিয়া আশা করা হইতেছে।

ইহার পূর্বে গত ২২শে জুন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনের সহিত আলোচনরত ডাচ প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ ভ্যানরোয়েন ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ২৬শে জুন ডাচ সেনাবাহিনী সাধারণতন্ত্রী রাজধানী যোগ্‌জাকার্তা ত্যাগ করিবে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ডাচ বাহিনী যোগ্‌জাকার্তা দখল করে। ৬ মাস পরে তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিল। রাষ্ট্রসংঘ কমিশনের সহিত ডাচ প্রতিনিধি দলের যে আলোচনা চলিতেছিল এতদিনে তাহা সাফল্য-মণ্ডিত হইল। রাষ্ট্রসংঘ কমিশনের গঠনের পরে ইন্দোনেশিয় সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক বিষয়ে আর একটী স্মারকলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে আগামী ১লা আগষ্ট তারিখের মধ্যে এই গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে এবং দুই মাসের মধ্যে বৈঠকের কাজ শেষকরার চেষ্টা হইবে। এতদিন কেবল মাত্র রিপাব্লিকান ডাচ এবং রাষ্ট্রসংঘ কমিশনের মধ্যে আলোচনা চলিতেছিল। গত ২২শে জুন বৈঠকে ফেডারেল পন্থী ইন্দোনেশিয়ার দলের প্রতিনিধিরাও যোগদান করেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় উপনির্বাচন

এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থী ছিলেন শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস এবং কংগ্রেস-বিরোধী প্রার্থী ছিলেন শ্রীশরৎ চন্দ্র বসু। শরৎবাবুর রাজনীতি কি—তা বলা মুস্কিল ;—কেবল এটুকু বলা যায় যে তিনি ঘোরতর কংগ্রেস-বিরোধী। শরৎ বাবুর রাজনীতিতে নেতি-বাচক দিক ভিন্ন প্রায় কোন সময়ই অস্তি-বাচক বিশেষ কিছু ছিল না। বরাবরই তিনি প্রোজল হ'য়ে ফুটে উঠেছেন —কোন কিছুর বিরোধী হিসাবে। কিন্তু তিনি কোন মত বা পথের সমর্থক, তা কেউ কখন-ও বলতে পারে নি। সুভাষ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে যতটা সুবিধা ও অসুবিধা পাবার, তা তিনি পুরো মাত্রায়ই পেয়েছেন। সেই দাবিতেই তিনি কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম আসন—ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য-পদ—পেয়েছিলেন ; সে দাবীতেই তিনি কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হ'য়েছিলেন। তা ছাড়া, নিজস্ব কৃতিত্বের জোরে শরৎবাবু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন কিছুই অর্জন করেন নি। ১৯৪২ সালে যখন ভারতবর্ষ ইংরাজের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সমস্ত সংযোগ বর্জন ক'রে, তখন শরৎবাবু এক দল মুসলমানের সঙ্গে মিশে বাংলার মন্ত্রী হবার আয়োজন করেছিলেন। নিতান্তই বাংলার গভর্ণর তখন তাঁকে গ্রেফতার করালেন ; তাই তিনি ঐ লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পেলেন। জেল থেকে সরকারের সঙ্গে তিনি যে সব পত্র ব্যবহার করেন, তাতে সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করেন এবং ১৯৪২ সালে ভারতের বুকে যা ঘটেছিল, তারও প্রকারান্তরে নিন্দা করেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী হলেন। সেখানে তিনি যে বিশেষ কৃতিত্ব বা কার্য-দক্ষতা দেখিয়েছেন, তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু তখন কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সংখ্যা মন্ত্রী হিসাবেই তিনি ছিলেন। কিন্তু যখন মুসলিম লীগের দল মন্ত্রী-মণ্ডলীতে আসতে রাজী হ'ল, তখন কংগ্রেসের তরফ থেকে কিছু মন্ত্রী বাদ দেওয়ার প্রয়োজন এল। সে সময় শরৎবাবুকে মন্ত্রী-মণ্ডলী থেকে বাদ দেওয়া হয়। তখন তাঁর শারীরিক অবস্থা এমন ছিল যে দপ্তরের কাজ করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল ; বহু জরুরী ফাইল তাঁর দপ্তরে মজুত ছিল। যাক—এর পর হতেই তাঁর কংগ্রেস-বিরোধিতা সুরু হ'ল। কিন্তু তখনও তাঁর রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষ কিছু জানতে পারল না। এই নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট দল তাঁকে বিশেষ ভাবে সমর্থন ক'রেছে। কিন্তু কয় বছর পূর্বে কম্যুনিষ্টগণ তাঁকে বলত কুইজলিং (Quisling) বা পঞ্চম বাহিনী এবং তিনি তাদের বলতেন—দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক। আজও যে দল হিসাবে তাদের সঙ্গে শরৎ-বাবুর বিশেষ মধুর সম্পর্ক আছে, তা মনে হয় না ; তবুও তারা ভাবছে—একটি দল ত্যাগী কংগ্রেসী নেতাকে দিয়ে যদি কংগ্রেসকে দু ঘা লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে তার পিঠ একটু চুলকিয়া দিতে আপত্তি কি।
কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি নিয়ে যাকে
কংগ্রেসকে দু চার ঘা দিতে পারলেই তুষ্ট হবেন।

এই হ'ল শরৎবাবুর রাজপন্থী সমন্বয়। নইলে, এরা সবাই জানে মার্কসের মত ও পথ সম্বন্ধে শরৎবাবুর অনুরাগ খুব প্রবল নয় ; — তাইন বা বা পথ নিয়ে সুস্থ মস্তিষ্ককে তপ্ত করার অবসর-ও তাঁর নেই। কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে সব শক্তির সমাবেশ দক্ষিণ কলিকাতায় হয়েছিল তার মূল হল—যে কোন প্রকারে কংগ্রেসকে লোকের চোখে হেয় করা। প্রায় দু বছর হ'তে চলল—কংগ্রেস দেশের শাসন ভারগ্রহণ করেছে। এর

...যখন কোন দলের দায়িত্ব নেয়, সাধারণতঃ সেই দলের বিরুদ্ধে একটা মনোভাব গড়ে উঠে। কোন দলের পক্ষেই দেশের সব শ্রেণীকেই তুষ্ট করা সম্ভব নয়; এমনকি কোন দলের শাসন-ই সমাজের কোন এক শ্রেণীরও সব দাবী পূরণ করতে পারে না। তাই কিছু লোক এদের প্রতি বিরূপ হবেই। মানুষ স্বভাবতঃ আত্ম-কেন্দ্রিক। ইংরেজী ও ফরাসী একটি প্রবচন আছে—আমার পরই —বিশ্ব প্লাবন—"after me—the deluge"। আমার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থাই যদি না হ'ল—তবে এই গোড়া শাসন দিয়ে কি হবে!

সেই হিসাবে প্রতিটার গণতন্ত্রে একই দল বেশীদিন শাসনকার্য চালাতে পারে না। অবশ্য নানা প্রকারে ভোট দাতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এটা করা হয়: এবং কোন কোন স্থলে করাও হয়। এই বিষয়ে রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট দল এবং ইটালী ও জার্মেণীর ক্যাথিষ্ট-দল সর্বচেয়ে বুদ্ধিমান; কারণ তাদের ব্যবস্থায় অপর কোন দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। কাজেই অপর কোন দলের পক্ষে নির্বাচনে জয়ী হবার কোন কথাই সেখানে আসে না। ভারতে আজ পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত হচ্ছে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বহুদল দাঁড়াবে এবং এই কয় বছরে দেশের শাসনকার্য পরিচালনাতে কংগ্রেসের যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে তা কলাও করে ঐ সব দল প্রচার চালাবে। দেশের শাসনকার্যে বহু বিষয়ে যে কংগ্রেসের সাফল্য হয়েছে, তা হয়ত ঐ প্রচারের ফলে চাপা পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি অবস্থা হয়েছিল দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচনে।

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সমষ্টিগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে বহু অভিযোগ আছে। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়বার পক্ষে তা বিশেষভাবে সক্রিয় হয়েছিল। শোনা যায় কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ঐ সব বিষয়ে প্রকাশ্য তদন্ত করার জন্য একাধিকবার লিখেছে; কিন্তু ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ করতে রাজী নয়। বাংলার সংবাদ পত্রও ঐ খবরটি প্রকাশ করতে সাহস পায় নি। নির্বাচনের পূর্বে যদি ঐ তদন্ত সুরু হত বা লোকে তা জানতে পারত, তবে হয়ত নির্বাচনের ফল অন্যরূপ হ'তে পারত। যারা শরৎ বাবুকে ভোট দিয়েছে তাদের অনেকেরই মনোভাব হ'ল কংগ্রেসের পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী মণ্ডলীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি জ্ঞাপন করা; শরৎ বাবু হ'লেন ওখানে নেতি-বাচক উপলক্ষ মাত্র।

নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণ—

দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে—প্রতিপক্ষী শরৎ বাবু বিপুল ভোটাধিক্যে জয়-লাভ করেছেন। এর কারণ কি? শরৎ বাবু সুভাষ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; এই অঞ্চলে সুভাষ চন্দ্রের ও তাঁদের পরিবারের একটা বিশেষ খাতির ও খ্যাতি আছে। পূর্বে ঐ আসনটি শরৎ বাবুর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সতীশ চন্দ্র বসুর ছিল। তাঁর মৃত্যুতেই ঐ আসনটি শূন্য হয়। আমাদের দেশে পারিপার্শ্বিক দাবী প্রায় সর্বত্রই কিছুটা স্বীকৃত হয়। সে হিসাবে শরৎ বাবুর একটা পারিপার্শ্বিক দাবী আছে। শরৎ বাবু ধনী ও খ্যাতনামা ব্যক্তি; তাঁর পদগৌরব ও অর্থবল সুবিদিত। তিনি মস্ত বড় ব্যারিষ্টার; তিনি কিছু দিন পূর্বে কংগ্রেস নেতৃমণ্ডলীর শীর্ষস্থানে ছিলেন। তাই তাঁর ব্যক্তিগত দাবীও একটা আছে। তার উপর বাংলার কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী এমন কুখ্যাতি অর্জন করেছে যে কংগ্রেসের নামে লোকে ধিক্কার দেয়। কর্মনৈপুণ্যতার অভাব, শাসনিক সততার অভাব, ব্যক্তিগত সততার অভাব ও কর্মচারীদের সদিচ্ছার অভাব—এমনি সব গুরুতর অভিযোগ করার কারণ এবং সুযোগ লোকে পাচ্ছে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এতদিন চলেছে শাসনযন্ত্রের পুচ্ছ হিসাবে। শাসনিক স্তরে যা কিছু হক, প্রাদেশিক কংগ্রেস তারই সমর্থনে একটি ক'রে ফুতোরা দিয়েছে। ঘটনার সত্যতা বা উদ্ভেদের সততা বা শাসনিক সাফল্য —এর কোনটারই হিসাব না করে প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর তাঁবেদারী করেছে। তার ফলে লোকের মনে ধারণা জন্মেছে—বাংলার কংগ্রেস ব'লে কোন সত্ত্ব

সস্তাই নেই ; যা আছে তা মন্ত্রীমণ্ডলীর পুচ্ছ মাত্র ;—পুরী মতো ওরা ওটাকে একটু নেড়ে নেয়।

কংগ্রেসকে লোকের কাছে হেয় করার মতো আরও বহু ঘটনা ঘটেছে। পারমিট, লাইসেন্স প্রভৃতি ব্যাপারে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এমনিভাবে জড়িত করা হয়েছে এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ এমনি ভাবে সাধিত হচ্ছিল যে কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস কর্মীদের সততা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের অবকাশ এসেছে। কংগ্রেস ছিল লোকসেবার প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসকর্মীরা ছিল জনসেবক। এই খ্যাতির আজ অপচয় ঘটেছে—বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায়। তাই আজ কংগ্রেসের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই।

কাজেই প্রথম হ'তেই জানা ছিল যে দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচন খুব কঠিন ব্যাপার। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের যাওয়া উচিত কি না, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন আমাদের সকলের মনেই ছিল। কিন্তু প্রদেশে ও কেন্দ্রে এই মতই প্রবল ছিল যে হারবার আশঙ্কা জেনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দরকার। ঠিক এই বিচার থেকেই এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামা হয়েছিল। বিনা বাধায় শরৎ বাবুকে ছেড়ে দিলে যে রাজনৈতিক আবহাওয়া বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হত, তার চেয়ে বাধা দিয়ে পরাজিত হওয়া ভাল বলেই বিবেচিত হয়েছিল। অবশ্য একথা বলতে চাই না যে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই এই নির্বাচনে নামা হয়েছিল। আমরা জানতাম পরাজয়ের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে,—কিন্তু জয় অসম্ভব বা খুবই দুরূহ নয়।

আমরা এখনও বিশ্বাস করি এই নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় হতে পারত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে সব শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল, তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা জয়ের আশা করেছিলাম। কিন্তু এমনি কিছু কারণ ইতিমধ্যে ঘটেছে, যার ফলে কংগ্রেসপ্রার্থী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলার কংগ্রেসেও দলাদলি আছে। এতদিন প্রাদেশিক কংগ্রেস এমন একদল লোকের হাতে ছিল যারা রাজনৈতিক ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের ধার ধারত না ; —তাই তারা সম্পূর্ণ নিজেদের তাঁবেদারী লোকদের দ্বারা কার্যকরী সমিতি গঠন করেছিল। সাধারণ নিয়ম ও চিরাচরিত প্রথা অনুসারে, কংগ্রেসের অন্তর্গত সংখ্যালঘিষ্ঠ দল থেকেও তাদের সংখ্যার অনুপাতে এক চতুর্থাংশ বা প্রায় তদনুরূপ সংখ্যক সভ্য কার্যকরী সমিতিতে বরাবর নেওয়া হয়। কিন্তু গত ৬ই আগষ্ট কাঁকীবাজী ক'রে যখন এরা কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার পেল, তখন প্রতিপক্ষের ১৫৬ জন সভ্য থেকে মাত্র ৩৪ জনকে কার্যকরী সমিতিতে নেওয়া হ'ল। তেমনি উপদলের মনোভাব নিয়েই তারা এই ১০।১১ মাস কংগ্রেস পরিচালনা করেছে। এই নির্বাচনেও তারা সেই ভাবেই আচরণ করেছে।

একথা সর্বজনবিদিত এবং পূর্বেও বলেছি যে এই কয় মাস প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তারা মন্ত্রীমণ্ডলীর পুচ্ছ হিসাবেই চলেছে। কার্য্যত একই উপদল উভয়ত্র মোড়লী করছিল। যখন তাদের অপসারণের জন্য শতাধিক সভ্য রিকুইজিশন বা বিশেষ আহ্বানের পত্রে স্বাক্ষর করছিল বলে তারাও জানত, ঠিক সেই সময় এই উপনির্বাচনের দিন নির্দ্ধারণ করা উদ্দেশ্যমূলক ;—কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সৎ কি অসৎ সেই বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। রিকুইজিশন বা বিশেষভাবে আহূত সভাকে পণ্ড করার জন্যই যে ঐ সময় এই নির্বাচনের দিন স্থির করা হয়েছিল, এমন সন্দেহ সহজেই লোকে করতে পারে। যদি এই নির্বাচনের পূর্বে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ অপসারিত হ'ত তবে ভোটারদের নিকট কংগ্রেসের কথা বলা সহজ হত। কিন্তু এরা ইচ্ছা করেই প্রাদেশিক কংগ্রেসের আহূত সভাকে নির্বাচনের পরে দিলেন,—মতলব ঐ নির্বাচনের ঢোলে যদি বা রিকুইজিশন (requisition) ভেস্তে যায়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার, ঐ কেন্দ্রের আসনটি এক বছর

হবার মূল কারণ এর মধ্যে এমন সময়ও বহু গিয়েছে, যখন কংগ্রেসের প্রতি লোকের মন খুবই অনুকূল ছিল—যেমন হরিপুরা কংগ্রেসের পর। তখন এই উপনির্বাচনকে স্থগিত রেখে তখন কংগ্রেস লোকের নিকট অত্যন্ত অপ্রিয় হবার এই নির্বাচন ঘোষণা করা কার্যকুশলতা বা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।

দ্বিতীয়তঃ নির্বাচনের ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেসী মন্ত্রীবর্গ সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত ছিল—এমন কথা অনায়াসেই বলা যায়। এত বড় একটা নির্বাচনে যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস ও কংগ্রেসী মন্ত্রীরা উদাসীন থাকে, তবে তাহাদের কর্তব্যের গুরুতর অবহেলা করা হয় এবং সেই অবস্থায় নির্বাচন সংগঠন সুষ্ঠুরূপে হতে পারে না। নির্বাচন সংগঠন যে যথোপযুক্ত হয় নি, একথা অস্বীকার করার নয়। কংগ্রেস প্রার্থীর বন্ধুদের জনবল ও সংগঠনবলের উপরই এই নির্বাচন নির্ভর করেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় গত কয়েকমাসের মধ্যে আরও একটি পরিষদ উপনির্বাচনে ও কয়েকটি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেসের তরফের প্রার্থী ছিলেন শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস; মন্ত্রীবর্গের ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের প্রতিপক্ষ বলেই এর পরিচয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের জরুরী তত্ত্ব আহ্বানের স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে সুরেশবাবু একজন প্রধান তাছাড়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের ও মন্ত্রীদের এমন খ্যাতি রাষ্ট্র হয়েছে, যে তাঁদের পক্ষে এখন সাধারণের নিকট উপস্থিত হওয়াই কঠিন। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ এঁদের কার্যগতিক দোষ-ত্রুটি ও নৈতিক সততার অভাবে এবং কতকটা কম্যুনিষ্ট দলের দুষ্ট অভিসন্ধিমূলক কর্মপদ্ধতিতে। এই সব নানা কারণে প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রধানগণ ও মন্ত্রীগণ নির্বাচনের ভার কাছে নিয়েও যান নি। কংগ্রেসপ্রার্থীর বন্ধুবান্ধবের ব্যক্তিগত চেষ্টায় এমন নির্বাচন পরিচালিত হতে পারে না।

পরাজয়ের অন্য কারণ হ'ল—নির্বাচনের ঠিক পূর্বে পর পর কয়দিন বিভিন্ন গুলী চলেছে। তিনটি জেলে কম্যুনিষ্ট বন্দীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অশান্তির সৃষ্টি করেছে; তেমনি অশান্তির সৃষ্টি ওরা-ই করিয়েছে ২।৩টি কারখানায়। দেশপ্রিয় পার্কে ওরা যে গুণ্ডামী করেছে, তার ফলে ভোটারদের মন ওদের প্রতি বিরূপ হয়েছিল। এটা কাটাবার জন্য ওদের মতলব হল—বিভিন্ন স্থানে পুলিশকেও গুলী করতে বাধ্য করা। যে অবস্থায় পুলিশ গুলী করেছে, স্বভাবতঃ হয়ত সে অবস্থায় গুলী করা অন্যায় নয়। কিন্তু ঠিক নির্বাচনের ২।১ দিন পূর্বে জেলে আবদ্ধ বন্দী বা কারখানার শ্রমিকদের উপর গুলী চালানো অযৌক্তিক হয়েছে;—কারণ পশ্চিম-বঙ্গীয় সরকারের গুলী করা বিষয়ে এমন খ্যাতি হয়েছে—যে সাধারণ লোক অবস্থার বিচার না করে গুলী করাটা-কেই বড় করে দেখবে। ঐ কয় দিনের গুলীতে বহু ভোটার বিগড়ে গিয়েছে।

নির্বাচনের দিন শরৎবাবু পক্ষীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ রীতিমতো গুণ্ডামী করেছে; বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই গুণ্ডামী বিশেষ আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পুলিশ কোথাও এতে বাধা দেয় নি। মেয়েদের ভোট নেবার স্থানে ওপক্ষের পুরুষ ভলান্টিয়ারের এমন সমাবেশ ও এমন আচরণ দেখা গিয়েছে যা মেয়েদের পোলিং বুথে (polling booth এ) নিতান্তই অশোভন ও অসঙ্গত। পুলিশের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও পুলিশ কোন প্রতিবিধান করে নি। শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালানীর মতো বিশিষ্ট মহিলাকে মেয়ে নির্বাচন কেন্দ্রে পুরুষের দল মিলে আক্রমণ করেছে, অপমান করেছে, লাঞ্ছনা করেছে; অথচ কোন পুলিশ তাঁর সাহায্যে যায় নি। পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে এই একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ঠিক নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে পরপর কয়দিন বিভিন্ন জেলে ও কারখানায় গুলি চালালে নির্বাচনের দিক থেকে যে কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা বুঝবার লোক পুলিশ বাহিনীতে যদি না থাকে, তবে সেই পুলিশ বাহিনী দিয়ে গণতান্ত্রিক যুগে দেশ শাসন করা চলে না। হয় এটা তাদের অকর্মণ্যতার পরিচায়ক, নয় ত

তাদের অসদভিপ্রায়ের পরিচায়ক। দুই অবস্থাতেই এমনি পুলিশ বিপদের।

এমনি পরিস্থিতিতে নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় খুবই স্বাভাবিক।

বাংলার কংগ্রেস—

সংগঠন শক্তি দিয়ে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও তার কর্মকর্তাদের কার্যদক্ষতার পরিচয় নিতে হয়, তবে গত কয়মাসের বাংলার কংগ্রেস সর্ব প্রকারেই গ্লানির পাত্র হয়। নিতান্তই নিজেদের তাঁবেদার লোক দিয়ে পারমিট-লাইসেন্সের দিনে একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতি গঠন করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তেমনিভাবে গঠিত কার্যকরী সমিতিকে কার্যকর করা খুবই কঠিন। গত বছর আগষ্ট মাসে যখন নিতান্তই ছল-চাতুরি দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডলীর পুচ্ছ জাতীয় একটি উপদল বাংলার কংগ্রেসের মালিক হ'ল, তখন তারা বিরোধী দলকে বাংলার রাজনীতি থেকে নিশ্চিহ্ন করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল; ভাবল এবার মৌকা মিলেছে! যাদের রাজনীতি জ্ঞান নাকের ডগার বাইরে যায় না, যারা নিজ নিজ গ্রামের বা মহকুমার বাইরে ভাবতে পারে না, যারা প্রাচীন ইংলণ্ডের কেল্টিক রাজার মতো পূর্ববাংলার স্পর্শকে এড়াইবার জন্য প্রাচীর তুলতেও প্রস্তুত, তাদের হাতে পড়ল বাংলার রাজনীতি চালনার ভার। ক্ষুদ্র মন ও ছোটদৃষ্টি দিয়ে যে বৃহৎ কাজ চলে না—তা বুঝবার ক্ষমতা এদের নেই। বাংলার রাজনীতিকে এরা বিষাক্ত ও কলঙ্কিত করেছে—পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রশ্ন এনে—ঠিক যেমন মুসলিম লীগ করেছিল হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে। উভয়ই মূলত বিদ্বেষবাদ ও আত্মঘাতী।

একই উপদল এই ভাবে মন্ত্রী-মণ্ডলীতে ও প্রাদেশিক কংগ্রেসে মোড়লী করেছিল এবং ক্রমে প্রাদেশিক কংগ্রেসকে মন্ত্রী-মণ্ডলীর ক্রীড়নকে পরিণত করল। মন্ত্রী-মণ্ডলীর চেয়ে যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বড়, তা ভুলে গিয়ে এরা কংগ্রেসকে মন্ত্রী-মণ্ডলীর স্তাবক করে তুলল। মন্ত্রী-মণ্ডলীর যত অপকর্ম, তার সাফাই গাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস সদাই প্রস্তুত হল। মন্ত্রী-মণ্ডলীর অপকর্মের তালিকা সাধারণ জনতার হিসাবে যতই বেড়ে যেতে লাগল, ততই প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রভুভক্তির নিষ্ঠার সঙ্গে মন্ত্রী-মণ্ডলীকে সমর্থন করতে লাগল। ফলে কংগ্রেস লোকের নিকট অত্যন্ত হেয় ও উপহাসাস্পদ হ'ল। কোন সাধারণ জনসভায় কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের পক্ষে উপস্থিত হওয়াই কঠিন হ'ল। বাংলার মন্ত্রীগণ বা বাংলা কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ জন-সংযোগ হ'তে একেবারে কাটা পড়লেন।

যে দলকে বাংলার রাজনীতি থেকে মুছে ফেলবার আয়োজন এরা করছিল, তারা এই ১০।১১ মাস চুপ ক'রে রইল। নিজেদের শক্তি সামর্থ্যের উপযোগী কিছু কিছু কাজ তারা করছিল। কিন্তু মন্ত্রী-মণ্ডলী বা প্রাদেশিক কংগ্রেসে তাদের কোন সংস্পর্শ না থাকায় তাদের পক্ষে কাজের সুযোগ-ও বিশেষ ছিল না। কিন্তু এই দীর্ঘ ১০।১১ মাসের মধ্যে তারা কখন-ও দলা-দলিতে ইন্ধন যোগায় নি;—প্রাদেশিক কংগ্রেস বা মন্ত্রী-মণ্ডলীর বিরুদ্ধে কোন উপদলীয় ষড়যন্ত্র তারা চালায় নি। রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রেখে এরা এই কয় মাস চলেছে।

ইতিমধ্যে বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব সুরু হ'ল। যে কর্মীগোষ্ঠী এতদিন প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সভা হ'তে বাইরে ছিল তারা দেখল এইভাবে কংগ্রেস চলতে পারে না। তাই requisition বা বিশেষ আহ্বান নিয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সভা ও কর্মকর্তাদের সরিয়ে নূতন কার্যকরী সভা গঠনের উদ্যোগ এঁরা করল। যথাসময়ে পুরাতন কার্যকারী সমিতি ও কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করে নূতন কার্যকরী সমিতি ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হ'ল।

নূতন কার্যকরী সমিতি—

নূতন কার্যকরী সমিতি মোটামোটি কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের বা গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত। প্রায় এক বছর পূর্বে যে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তাতে প্রতিপক্ষ কর্মীগোষ্ঠীর প্রতিনিধি প্রায় ছিলই না। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের সংখ্যা ছিল ১৭৫ এবং লঘিষ্ঠ দলের সংখ্যা ছিল ১৫৬। কার্যকরী

সমিতিতে এই লঘিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি হওয়া উচিত ছিল ৩৯ জন কিন্তু বিজয়ী দল সমিতি গঠন করার সময় লঘিষ্ঠ দল থেকে মাত্র ৪টি সভ্য নিল: প্রাদেশিক কংগ্রেসের বহু সাব-কমিটি আছে; তার কোন একটিতে-ও লঘিষ্ঠ দলের কোন সভ্য ছিল না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের চিরাচরিত প্রথার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ক'রে বিজয়ী দল এটা করেছিল। নূতন কার্যকরী সমিতি গঠন করার সময় এবারকার বিজয়ী দল যে এইদৃষ্টান্ত অনুসরণ করেনি—এটা খুবই সুখের বিষয়।

নূতন কার্যকরী সমিতিতে ১১২ জন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মধ্য হ'তে একজনকে সহকারী-সভাপতি করা হয়েছে এবং জেলা-ওয়ারী ঐ দলের প্রধান প্রধান সভ্যদের অনেককেই নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলা-কংগ্রেসের প্রধান কর্মকর্তাদের প্রায় সকলকেই নেওয়া হয়েছে। যে উপদলীয় মনোভাবের ফলে গত ১০।১১ মাস যাবৎ বাংলার কংগ্রেস মৃতপ্রায় হ'য়ে আছে, তা থেকে যদি নূতন কর্মকর্তাগণ কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পারেন, তবে এঁরা একটা মহৎ কাজ সাধন করবেন। আমরা জানি গত ১০।১১ মাসের কর্মকর্তাগণ একেবারে নির্লজ্জভাবে উপদলীয় মনোভাব নিয়ে চলছিলেন। শুধু কলিকাতার আফিসে নয়—জেলায় জেলায়ও তাঁরা ঐ মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছিলেন। কার্যকরী সমিতি গঠনের সময় অন্তত নূতন কর্মকর্তাগণ সেই উপদলীয় মনোভাবের পরিচয় দেন নি। আশা করি বিভিন্ন সাব-কমিটি গঠনের সময়-ও তাঁরা সেই দোষ থেকে মুক্ত থাকবেন।

নূতন কার্যকরী সমিতিতে আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় হ'ল এতে কোন মন্ত্রীর নাম দেখলাম না। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীগণ এই দেড় বছরে যে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলের জন্য এদের নিজেদেরই উচিত কংগ্রেসের সঙ্গে কোন প্রতিষ্ঠানিক সংস্রব না রাখা। কিন্তু এঁদের যে সর্বগ্রাসী মনোভাব আমরা দেখছি তাতে স্বেচ্ছায় এঁরা এই ত্যাগটুকু করবেন না। তাই বাংলার কংগ্রেসের এই নূতন সমাবেশে বিজয়ী দল যে মন্ত্রী-সংসর্গের প্রলোভন ত্যাগ করতে পেরেছেন, এটা খুবই সুখের।

এই নূতন কার্যকরী সমিতিতে কার্গুভার যাঁদের উপর পড়েছে, বাংলার রাজনীতিতে সততা ও কর্মদক্ষতার জন্য তাঁদের খ্যাতি আছে। গত ২৭।২৮ বছর যাবৎ বাংলার কংগ্রেসে বহু ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে এরা চলেছেন। ১৯৪০ সালে আর একবার বাংলার কংগ্রেসের অত্যন্ত এক দুর্যোগের সময় ঠিক এই সমাবেশই বাংলার কংগ্রেসকে রক্ষা করেছিল। তখন বাংলার মনে জেগে-ছিল এক তীব্র কংগ্রেস-বিদ্বেষ; চারিদিক থেকে কেবল কংগ্রেসের উপর আঘাতই আসছিল। আজও ঠিক তেমনি কংগ্রেস-বিদ্বেষে বাংলার মন পূর্ণ। এই সময় বাঙ্গালীর আবার সম্বিত ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছেন সেই কর্মী-সমাবেশ, যাঁরা ১৯৪০ সালে এই ভার নিয়ে-ছিলেন। আমরা আশা করি এদের পরিচালনায় বাংলার কংগ্রেস আবার তার নিজের স্থান অধিকার করবে; বাঙ্গালী আবার বুঝতে পারবে কংগ্রেস ভিন্ন বাংলার বা ভারতের মঙ্গল সাধনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আজ ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে কংগ্রেস ভেঙ্গে পড়ছে;—যাঁরা এখন কংগ্রেসের দায়িত্ব নিচ্ছেন—তাঁরা তাঁদের এত-দিনকার ঐতিহ্য বজায় রেখে,ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে থাকবেন এবং কংগ্রেসকে করা করবেন—এটাই বাঙ্গালী কামনা ও আশা করে।

যুগান্তর

কোন সুদূর অতীতে "যুগান্তর" ব'লে এক বিপ্লবী সাপ্তাহিক বের হয়েছিল। তারপর ৪ দশক অতীত হ'য়ে গেছে। সে কাগজ লোপ পেয়েছে ৪০ বছর হ'য়ে গেল। ঐ কাগজ থেকে সুরু হ'ল এক গোপন বিপ্লবী ইস্তাহার—যুগান্তর নামে। যে কর্মী-গোষ্ঠী ঐ সাপ্তাহিক ও ঐ গোপন ইস্তাহার বের করত—তার কত পরিবর্তন হয়েছে।—নদীর জল-প্রবাহের মতো লোক-প্রবাহ কত এক মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। মানুষ বদলেছে, কাল বদলেছে, কর্মপদ্ধতি বদলেছে,—পরিশেষে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এর বিলোপ সাধিত হয়েছে। কিন্তু রয়ে

গেছে দুটা—যুগান্তরের নাম ও এর নিষ্ঠা ও আদর্শ-প্রীতি। যতই যুগান্তরের সভ্যরা ঘোষণা করছে—যুগান্তর ব'লে কোন দল নেই, ততই যেন যুগান্তরের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রায় সাড়ে আট বছর জেলবাসের পর যুগান্তর কর্মীরা বাইরে এসে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করল—কংগ্রেস ভিন্ন আর কোন দল তাদের নেই। প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে এই কথা প্রচার করা হ'ল।—ফলে যুগান্তর দলকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা হ'ল। দলের কোন কোন কর্মী এতে খুব ক্ষুব্ধ হ'ল,—এত দিনের এমন সুগঠিত দলকে এইভাবে লোপ ক'রে দিতে সত্যই তাদের মনে লাগতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সততা দিয়ে যা তারা ভাল ব'লে মনে করল, ব্যক্তিগত বা দল-গত স্বার্থ-বুদ্ধির জন্য তা থেকে বিচলিত হওয়া ত যুগান্তরের ঐতিহ্য নয়

বিপ্লবী দল হিসাবে যুগান্তরের সাফল্য ও আদর্শানুরাগ বিশেষভাবে স্মরণীয়। গুপ্ত বিপ্লবী দলসমূহের একটা বিশেষ ঝোঁক থাকে গোপনতার আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরার দিকে; এই গোপনতার সুযোগে রাজনৈতিক ও বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির অঙ্গ স্বরূপ যে সব সমাজ-বিরোধী ও রাষ্ট্রীয় আইন-বিরোধী কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয়, তার প্রতি একটা স্বগত আকর্ষণ দলের সভ্যদের মনে জাগতে থাকে। শরৎ চন্দ্র যে ব্রজেনের চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যুগান্তর দল এই গোপনতার আশ্রয় থেকে বেরুবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত ছিল;—তারা জানতো, বিপ্লব-প্রয়াসের প্রথম অবস্থায় গোপনতার প্রয়োজন থাকলেও, বিপ্লব হল মূলতঃ গণ-সংস্রবের সন্তান। বিপ্লবের এই তথ্য জানত বলেই, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাতেই যুগান্তর তা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করল। বাংলার অপর একটি গোপন বিপ্লবী দল ও যুগান্তর দলের কর্মীরা তখনও জেলে —যখন গান্ধীজী তাঁর আন্দোলনের কথা বলছিলেন। ১৯২০ সালে খালাস হয়েই দুই দল দুই বিভিন্ন রাস্তা গ্রহণ করল। যুগান্তর গেল অসহযোগ ও কংগ্রেসের বিপ্লব প্রবাহে; অপর দল গেল শ্বেত-ঐরাবতের অনুপ্রেরণায় ঐ আন্দোলনকে রোধ করতে। এরই পরিণতি হ'ল—১৯৩৮ সালে প্রকাশ্য ঘোষণা করা যে কংগ্রেস ব্যতীত আর কোন দল যুগান্তর কর্মীদের নেই;—সুগঠিত, সুপরিচালিত, খ্যাত যুগান্তর দলের বিলোপ এইভাবে সাধিত হ'ল। কিন্তু আদর্শ-নিষ্ঠ একদল কর্মী রয়ে গেল।

ঐ একই সময় বাংলা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠল কংগ্রেসের উপর। বাংলার একটি বহু প্রচারিত কাগজ, যার পত্তন হয়েছিল গান্ধীজীর স্তুতি দিয়ে, গান্ধী ও কংগ্রেসকে বাঙ্গালীর নিকট হেয়ো করার কাজে লেগে গেল। ঘরে ঘরে কংগ্রেসের নিন্দা; কংগ্রেসের কথা বলবার উপায় নেই। সেই সময় যুগান্তর কর্মীরা এগিয়ে এল—বাংলা দেশে কংগ্রেসকে রক্ষা করতে। লোকের সাময়িক উত্তেজনা ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে বৈপ্লবিক সাহসের সঙ্গে এরা কংগ্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করল। জেলায় জেলায় ঘুরে এরা কংগ্রেসকে গড়ে তুলল। ১৯৪২ সালের বিপ্লবকে পরিচালন করার মন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অবশ্য এমন কথা বলতে চাই না যে যুগান্তর কর্মীরাই সব কিছু করেছে। কাজের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল যুগান্তর কর্মীরা—এবং সহযোগী ছিলাবে ছিল খাদী দল ও স্বর্গীয় কিরণ শঙ্কর রায়ের অনুগামী কর্মীগণ। এই সময় যে সব রাজনৈতিক কর্মীরা যুগান্তর কর্মীদের বিরোধিতা করেছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ পরে জেলের শান্ত আবহাওয়ায় বলেছে —"ঐ সময় আপনারা দুটা বড় কাজ করেছেন,—নিজেদের দল ভেঙ্গে দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন এবং যখন অপর সবাই কংগ্রেসকে ভাঙ্গবার জন্য ব্যস্ত ছিল, তখন আপনারা বাংলার কংগ্রেসকে রক্ষা করেছেন।"

আজ আবার বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে অত্যন্ত দুর্দিন এসেছে; বাংলার মন আজ আবার কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ ও ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। আজ আবার ঠিক ১০ বছর পূর্বের কর্মী-সমাবেশ হ'য়েছে কংগ্রেসকে বাঁচাবার জন্য। এর জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসের

এক দিন [illegible] রে
নবিক সাধারণ [illegible] কমকর্তাগণ ও
কার্যকরী [illegible] বলতে নূতন কর্মকর্তা ও কার্যকরী
সমিতি নির্বাচিত [illegible] এই উপলক্ষে বিভিন্ন
কাগজে [illegible] বিবৃতিতে যুগান্তর দলের নাম উঠেছে।
বাংলা কংগ্রেসে নাকি অনেক দলাদলি আছে;—এই
অভিযোগও উঠেছে,—যেন অপর কোন প্রাদেশিক
কংগ্রেসে দলাদলি নেই।

যুগান্তর দলের ইতিহাসে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ
দেখা যায়:—গুপ্ত সমিতির যুগে, নির্দিষ্ট-গঠিত দল ব'লে
যুগান্তরের কোন বস্তু ছিল না। বরবারই আন্দোলনের
ধারা বেয়ে বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় এরা কাজ
করেছে। এই সহযোগিতার ভিতর দিয়ে নূতন নূতন
কর্মী-গোষ্ঠী এদের সঙ্গে এসেছে। তাদের অনেকে
আবার বের হ'য়ে গিয়েছে; এই বের হ'য়ে যাওয়ার
পক্ষে প্রধান কারণ হ'ল এই যুগান্তর কর্মীদের নৈতিক
ও রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও আদর্শানুরাগ। ঐ আদর্শ থেকে
যারা ব্যক্তিক্রম বোধ করেছে, তারা একটা মানসিক
অস্বস্তি বোধ থেকেই চ'লে গেছে—যেন ওখানকার
রাজনৈতিক শুচিতা তাদের পক্ষে অসহনীয় হয়। যারা
এই ভাবে বেরিয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে, তারা হয়ত
মানসিকভাবে বাধাগুলির দিক থেকে ঐ কর্মীগোষ্ঠীর
কিছুটা ক্ষতি করেছে বা করে। কিন্তু ঐ ক্ষতির বহুগুণ
ক্ষতিপূরণ হয় রাজনৈতিক নিষ্ঠা ও আদর্শানুরাগের দিক
দিয়ে। এই নিষ্ঠা ও আদর্শানুরাগের জন্য যুগান্তর
দলের কর্মীগোষ্ঠী ক্ষমতাভিলাষী অন্যান্য দলের নিকট
অপ্রিয় হয়। আজ পর্যন্ত কেউ এই কর্মী-গোষ্ঠীর
রাজনৈতিক আনুগত্য কোন অ-রাজনৈতিক হিসাবে
পায় নি। বিলাতের প্রধান মন্ত্রী পিট (Pitt) নাকি
বলেছিলেন—প্রত্যেক মানুষেরই একটা দাম (price)
আছে যা দিয়ে তাকে ক্রয় করা যায়। রাজনৈতিক
ভাবে এমনি কেনা-বেচা চলে। কিন্তু যুগান্তর কর্মী-
গোষ্ঠীর মধ্যে তা দেখা যায় নি।

বাংলার কংগ্রেসে সে দিন যে পরিবর্তন হ'ল, তা
নিয়ে যুগান্তর দলের নাম লোকমুখে ও কাগজে নানা
ভাবে উঠেছে। তাই যুগান্তর সম্বন্ধে কিছু লিখতে হ'ল।
যুগান্তর দল আজ নেই; প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এর
লোপ সাধন করা হয়েছে। যুগান্তরের আদর্শবাদিতা
ও তার ঐতিহ্য হয়ত অশরীরীভাবে রয়ে গেছে। সে
ঐতিহ্যের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে বর্তমানের
প্রয়োজনকে স্বীকার ক'রে বিভিন্ন কর্মী-গোষ্ঠীর সঙ্গে
সহযোগিতায় বাংলার কংগ্রেসকে গড়বার পক্ষে কোন
প্রতিবন্ধক হ'তে পারে। বৈপ্লবিক প্রয়োজনকে মেনে
নিয়ে দলগত, শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে
চলাই—যুগান্তরের ঐতিহ্য।

সমাজদ্রোহিতা—

কিছুদিন যাবৎ পশ্চিম বাংলায় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা
সৃষ্টির এক সুচিন্তিত ও পূর্ব-কল্পিত কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে।
কলিকাতা ভারতের সবচেয়ে বড় বন্দর, কলিকাতা
ভারতের একটি অন্যতম বড় ইণ্ডাষ্ট্রিয় (Industrial) কেন্দ্র;
বহু কল-কারখানা এখানে আছে। যে সব অশান্তি আজ
চলছে, তাতে বন্দর, ব্যবসায় কেন্দ্র ও ইণ্ডাষ্ট্রিয় কেন্দ্র
হিসাবে কলিকাতার বহু ক্ষতি হচ্ছে। আজ ভারতের
পক্ষে একটা প্রধান সমস্যা হ'ল এর উৎপাদন বাড়ানো
এবং লোকের ব্যবহার-দ্রব্য উৎপন্ন করা। এই সব
অশান্তি-জনক কার্য-পদ্ধতি সে পক্ষে বড় অন্তরায়
সৃষ্টি করছে। সমগ্র ভারতের দিক থেকে এই হ'ল
উৎপাত সৃষ্টির একটা গুরুতর প্রতিফল।

কিন্তু যে পরিকল্পিত উৎপাৎ সৃষ্টি আজ চলেছে, তার
প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কি তা ভেবে দেখার সময় সাধারণ
নাগরিকদেরও এসেছে। কেবল কংগ্রেস শাসনের উপর
রাগ করে এতে সাহায্য করা শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী
কাজ হবে কিনা তা বিবেচনা করা দরকার। দক্ষিণ
কলিকাতার উপনির্বাচনকে উপলক্ষ ক'রে, কংগ্রেস-
বিরোধী দল সমূহের যে সমাবেশ হয়েছিল, এবং যে
সমাবেশ আজও অনেকটা পরিমাণে আছে, সে সব দলের
মধ্যে পরস্পরের কোন মতের ঐক্য বা সমতা নেই।
তাদের এই সহযোগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল

কংগ্রেসকে লোকের নিকট হেয় ও ঘেলো করা। আমরা ধরে নিলাম—এদের সমবেত চেষ্টায় বাংলায় বা ভারতে কংগ্রেস প্রাধান্য নষ্ট হ'ল। তাতে হয়ত ঐসব দলের অনকয়েক মোড়লের কিছু সুবিধা হ'তে পারে; কিন্তু জনসাধারণের কি সুবিধা হ'বে তা আমরা বুঝি না।

ঐ সব-পরস্পর-বিরোধী দলের উদ্দেশ্য হ'ল—কংগ্রেসকে হটাতে পারলে, প্রত্যেক দল স্ব-প্রাধান্যের দাবীতে নিজেও একচত্রী শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ এই পাঁচটি দলের মধ্যে তখন সুরু হবে ক্ষমতা করায়ত্ত করার গৃহ-যুদ্ধ (Civil War)—গণ-স্বাধীনতা বা গণ-অধিকার বলে কোন কিছুর চিহ্নও সে অবস্থায় সম্ভব নয়। সাধারণ জনতার যা যা দুঃখ-দৈন্য—তাত কাঁড়ির যে অভাব অভিযোগ আছে তা শতগুণ বেড়ে যাবে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের পক্ষে তখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হবে—দলের প্রাধান্য বজায় রাখা।

আজ যারা গণতান্ত্রিক শাসনের সুযোগ নিয়ে ও গণ-স্বাধীনতার দাবীতে এই সব উৎপাত সৃষ্টি করছে—তখন দল-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তারাই গণ-তান্ত্রিক শাসন ও গণ-স্বাধীনতাকে টুটি টিপে মারবে। কংগ্রেসের মৌলিক মত ও বনিয়াদ হ'ল গণতান্ত্রিক; মহাত্মা গান্ধীর কর্ম-পদ্ধতি ও আদর্শ এর সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি থেকে কংগ্রেস বিচ্যুত হ'তে পারে না। বর্তমান উৎপাত সৃষ্টিকারীদের মধ্যে কমিউনিষ্টগণ হ'ল প্রধান। তাদের পরিকল্পিত রাষ্ট্রে একদলীয় শাসন প্রচলিত থাকে;—সেখানে অপর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। নির্বাচনের সময় কেবল ঐ একটি দলের প্রার্থীই নির্বাচনের জন্য দাঁড়াতে পারে;—ভোটদাতাদের অধিকার হচ্ছে—ঐ এক-দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেওয়া। এবং একথাও মনে রাখতে হবে যে বিপক্ষে ভোট দেওয়া ভোটারদের পক্ষে প্রায়ই নিরাপদ নয়। এদের বিধানে ঐ একটি দলই সমগ্র জাতি এবং ঐ একটি দলই রাষ্ট্র। সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার সেখানে বিশেষ কিছু নেই।

এই দলে যাদের যাদু ও সমাজের পরিকল্পনা, তাদের হাতে আজ যদি সবাই মিলে খেলতে থাকে, তবে এর প্রতিফল দেশের সকলকেই ভোগ করতে হবে, তাই আজ সকলেরই বিবেচনা করা উচিত এই উৎপাৎ সৃষ্টি-কারীদের দ্বারা দেশের জনসাধারণের উপকার কি হবে। আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মে বা মালয়ে বা চীনে আজ যা চলছে, তা-ই কি আমাদের দেশবাসীরা চায়? বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার কাড়া-কাড়িতে দেশের স্থায়ী ক্ষতি হবার যা আশঙ্কা করা যায়, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—জনসাধারণের যে অবশ্য দুঃখ-কষ্ট হবে। এ কথা সবাই জানে ও মানে যে জন-সাধারণের দুঃখ-দৈন্য অনেক আছে। তা-দূর করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া খুবই সহজ; দুঃখ-কষ্টের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সাধারণ লোককে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলাও খুব কঠিন নয়। কিন্তু কঠিন হচ্ছে—ঐ সব অভাব-অভিযোগ দূর করা, জনসাধারণের দুঃখ-দৈন্যের প্রতিকার করা।

মানুষের দুঃখ দৈন্য নিয়ে যারা দলের খেলা খেলছে তাদের প্রতি একটা অখ্যাই দেওয়া চলে—সমাজ-দ্রোহী। গত যুদ্ধের সময়, ৪০এর মন্বন্তরের সময়, ব্যাপক অন্নতঃ সৃষ্টির সময় যে দল বিদেশী সরকারের নিকট দেশ ও জাতির আত্ম-সম্মান বিক্রয় করেছিল—কেবল দল-পুষ্টির জন্য, তারাই আজ জনসাধারণের দরদী হ'য়ে এই নূতন রকমের সমাজদ্রোহীতা সুরু করেছে। যুদ্ধের ও দুর্ভিক্ষের সময় জাতি এদের চিনে নিয়েছিল;—আজও জাতি এদের চিনে নিবে। কতগুলি যুবক-যুবতী বা একদল শ্রমিককে উত্তেজিত ক'রে পুলিশের গুলির মুখে পাঠিয়ে যারা নিজেরা নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে দলের পুষ্টি সাধন করছে, তাদের দলগত আকর্ষণের সুখ্যাতি করা যেতে পারে, কিন্তু তারা সমাজের হিতাকাঙ্খী নয়। দেশবাসীর আজ সাবধান হওয়া উচিত—কার দুষ্ট অভিসন্ধিতে তারা যোগান দিচ্ছে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅনন্তনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবা

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে

—স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

কয় কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—মগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৫ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

অগ্রদূত

দ্বাদশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৫৬ | চতুর্থ সংখ্যা

শশীভূষণ রায় চৌধুরী

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

Walt Whitman অগ্রগামীদের, Pioneer দের যে পূজার অর্ঘ্য দিয়েছেন, বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রে সেই অর্ঘ্য যাঁদের প্রাপ্য, আজ তাঁদের একজনের কথা আপনাদের কাছে বলব। এঁর নাম শশীভূষণ রায় চৌধুরী—বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠতম অনেক শিক্ষাব্রতীর, সমাজ ও দেশকর্মীর "শশীদা"। প্রভাত-সূর্য্যের আলোর দীপ্তি রাত না পোহাতেই পুবের আকাশের আঁধার ভেদ ক'রে ফুটতে থাকে। সেই আবছা আলোতে পথ দেখে যে দু'একজন ঘরের আরাম ছেড়ে অজানা, অচেনা অনাগতের অভিসারে বেরিয়ে পড়েন, অগ্রগামীর জয়টিকা ইতিহাস তাঁদেরই ললাটে পরিয়ে দেয়। ১৮৭৫-৭৬ সালের কথা—শশীদার বয়স তখন ১২ বছর; ২৪ পরগণার বাঁশবনে ছাওয়া, সুপ্ত তেঘরা গ্রামে বক্তৃতার আওয়াজ, খবরের কাগজে ডবল কলমের বিদ্যুৎচমকানি, কিছুই তখনও পৌঁছায় নাই। শশীদা কিন্তু ভাবতে বসলেন—এই যে আমার গাঁয়ের দীন দরিদ্র, অচ্ছুত, নিরক্ষর চাষী আর মজুর—এম্‌নি কোটি কোটি মানুষকে নিয়েই তো আমার দেশ। এরা যদি এমনিই থেকে যায়, কি ক'রে আমার এই গোলামের জাতের গোলামী ছুটবে?

এম্‌নি সব সৎ চিন্তা, মহৎ কল্পনা নিয়ে যদি শশীদা দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে আকাশের গায়ে বিচিত্র ছবি আঁকতে আঁকতে এক সময়ে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়তেন, আজ আপনাদের কাছে তাঁর কাহিনী বলতে বসতাম না। শশীদা ঘুমোতে পারলেন না—নিজেকে নিংড়ে নিয়ে দীপ জ্বেলে বসলেন। দাওয়ায় মাদুর বিছালেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমবয়সী খেলার সাথী

শশীভূষণ

পাড়ার যারা স্কুলে যায় না, গরীবের ছেলে, চাষীমজুরের ছেলে—তাদের ডেকে নিয়ে এলেন—নিজেই তাদের পড়াতে ব'সে গেলেন। ক্রমে পাড়ায় ঘুরে বয়স্ক যারা ক্ষেতখামার করে, ক্ষেতমজুরের কাজ করে, সন্ধ্যায় যাদের

অবসর মেলে, তাদেরও ডাকলেন। দাওয়ায় আর ঘরে

অবসর সময়ে এক একদিন সবাইকে ডাকলেন। গ্রামের একপাশে একটা জায়গায় কয়েকটা বট আর অশ্বত্থগাছে মিলে একটা স্নিগ্ধ ছায়া সৃষ্টি করেছে—মাটি তুলে তার মাঝখানে বড় রকমের একটা বেদি তুলে পাঠশালার স্থান তৈরী হ'ল। বাড়ী থেকে তিন মাইল দূরে সোদপুর হাইস্কুলে শশীভূষণ পড়তেন। টিফিনের সময় মুড়ি, বেগুনি, বাতাসা কিনে খাবার জন্যে চারটি ক'রে পয়সা পেতেন। তা থেকে দুটি ক'রে, কোনোদিন বা চারটি পয়সাই বাঁচাতেন পাঠশালার ছেলেদের বই, শ্লেট যোগাবার জন্য। দলবল নিয়ে বটতলায় পাঠশালার বেদি তৈরির উৎসাহ দেখে স্থানীয় পাদ্রি ম্যাকডোনাল্ডের কৌতুক জাগলো। বালক শশীভূষণের সাথে আলাপ ক'রে তাঁর সংকল্প জেনে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করতে লাগলেন। এই অর্থে পাঠশালার ব্ল্যাক বোর্ড হ'ল, ম্যাপ হ'ল, গ্লোব হ'ল। মুখে মুখে ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া চললো।

দেখেশুনে ম্যাকডোনাল্ডের উৎসাহ বাড়লো। তিনি শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটর অরেঞ্জ সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। পাঠশালাটির প্রতি বাইরের আরও লোকের দৃষ্টি পড়লো। অর্থ সাহায্য ছুটলো। বাড়ীতে ব'লে শশীভূষণ নিজেদের একখানা জমি ছেড়ে দিলেন। সেই জমিতে পাঠশালার ঘর উঠলো। ইতিমধ্যে এণ্ট্রেন্স পাশ ক'রে শশীভূষণ কলকাতায় এফ, এ পড়তে শুরু করলেন। তখন অন্য শিক্ষক রাখা হ'ল। বেকার যে, দরিদ্র যে—এ বেলায় খাবার আছে তো, ওবেলার অনিশ্চিত—দেশের দশের কাজ করা, কাজের চিন্তা করা, তাকে দিয়ে সম্ভব নয়। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাই কৃষি ও শিল্প শিক্ষারও পরিকল্পনা করেন শশীভূষণ। উপযুক্ত শিক্ষক রেখে তাঁত চালাতে, তালা তৈরী করতে ও রেশমের গুটির চাষ শুরু করেন। এখান থেকে শিখেই পাশের গ্রামের একটি ছাত্র ভাল তালা তৈরী ক'রে বাজারে বিক্রি করতেন। নাটাগোড়ের তালা নামে এগুলি খ্যাতি লাভ করে। তখনকার দিনের শিক্ষাব্রতী অনেকে বাংলার এই প্রথম শ্রমজীবি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে যান। তার ভিতর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ পেড্‌লার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বারোছয় বয়সের শশীভূষণকে সোদপুর স্কুলে যেতে আসতে একটা কালভার্ট পুল পার হ'তে হ'ত। কোনো এক ইংরেজ কর্মচারীর নামে এই কালভার্টটির পরিচয়, এবং সেই পরিচয় এতে খোদাই করা ছিল। শশীভূষণের বুকে জ্বালা ধরতো এটা গোলামির একটা পরিচয় ব'লে। সে পরিচয় ঘুচলো না বটে, কিন্তু কালভার্টের পরিচয় তিনি একখানি ইট দিয়ে ঢুকে ঢুকে একদিন ঘুচিয়ে দিলেন। গোলামির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের এই যে বুক পোড়ানো জ্বালা, তা কিন্তু কোনো হাউইবাজীর আকস্মিকতার পথ ধরলো না—নীরবে নিভৃতে জলে জলে দীর্ঘ সাধনার পথে অনির্বাণ রইলো। সুরেন্দ্রনাথের রিপন কলেজে যখন তিনি পড়েন, তখন সুরেন্দ্রনাথ কলকাতার ছাত্রসমাজে ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শ প্রচার করছেন; শশীভূষণ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। তখনও কিন্তু ছাত্রদের, সহপাঠীদের বলেন, প্রতিজ্ঞা কর্—সরকারী বা সওদাগরি আফিসে চাকরী করবিনে, ওকালতি ব্যারিষ্টারির দিকে যাবিনে, আদর্শ শিক্ষক হ'তে হবে, দেশময় আদর্শ শিক্ষক ছড়িয়ে দিতে হবে, তারা বিপ্লবের দীক্ষায় দেশকে মোরিয়া ক'রে তুলবে। বিপ্লবের দীক্ষা শশীভূষণের শিক্ষাব্রতীর দীক্ষার ভিতর দিয়ে।

কিন্তু শরীরে সইলো না। ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের দীক্ষা দেওয়া, পাঠশালার জন্য সাহায্য সংগ্রহ, সঙ্গে সঙ্গে আহার, নিদ্রা, বিশ্রামের যথাসম্ভব সংকোচন, আর নীরব কৃচ্ছ্রসাধন—সবে মিলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেল। ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ ক'রে ফেললো। অকালে হাঁপানিতে ধরলো। দীর্ঘ, গৌরকান্তি সুপুরুষ—অল্প বয়সে কুব্জ হয়ে পড়লেন। এফ এ পাশ ক'রে পড়া বন্ধ করে দিতে হ'ল। তখন থেকে স্বাস্থ্যের জন্য সেদিনের বাংলার বিভিন্ন স্থানে কাটাতে থাকেন। অবলম্বন শিক্ষকতা, কখনও বা গৃহ-

শিক্ষকতা। যেখানে যান, সেখানেই শিক্ষাব্রতী সংগ্রহ করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিজে শিক্ষকতার কাজ ক'রে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি শেখাতে চেষ্টা করেন, শিক্ষার ভিতর দিয়ে স্বদেশপ্রেম জাগাতে চেষ্টা করেন। নদীয়া জেলার ব্রহ্মশাসনে, মুঙ্গেরে ও গয়াতে হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পুরীতে বর্তমান উড়িষ্যার স্রষ্টা, মহাপ্রাণ গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটে। সত্যবাদী Open Air School-এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ভিতর উভয়ের সহযোগের কথা বাংলার অল্প লোকেই জানে। উড়িষ্যার তখনকার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে শশীবাবুর প্রীতির সম্পর্ক এবং উৎকলবাসী জন-সাধারণের প্রতি তাঁর অনুরক্তি ছিল গভীর।

কলেজে লেখাপড়া শেষ। শশীভূষণের এফ এ পাশ করা পর্যন্ত। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এবং ইতিহাসে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। সরল, বিশুদ্ধ ও idiomatic ইংরেজিতে লিখতে ও কথা বলতে এবং ইংরেজি শব্দের উচ্চারণে—গ্রাজুয়েট ও এম এ পাশ অনেক শিক্ষক ও অধ্যাপকও সানন্দে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ইদানীংকার বাংলার শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে পরলোকগত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ শেঠ, কামাখ্যাচরণ নাগ, লাড্‌লি মোহন মিত্র, ডাঃ সত্যানন্দ রায়, ডাঃ বিধুভূষণ রায় এবং শ্রীসুশীল কুমার আচার্য, সত্যেন্দ্র নাথ বোস, ডাঃ মেঘনাথ সাহা, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, দ্বারিকানাথ মুখার্জি, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শরত চন্দ্র ঘোষ, মনোরঞ্জন সেন, সুধীর কুমার রায়চৌধুরি, ডাঃ নীলরতন ধর, ডাঃ নলিনী মোহন বোস, যতীন্দ্রনাথ শেঠ এবং আরও অনেকে ব্রহ্মজীবি শিক্ষার কাজে শশীভূষণের সহকর্মী, অনেকে তাঁকে গুরুস্থানীয় ব'লে মনে করতেন ও করেন।

শশীভূষণ যখন রিপন কলেজে পড়তেন, ব্যারিষ্টার পি মিত্র তখন বিলাত থেকে ফিরে সেখানে কিছুদিন অধ্যাপকের কাজ করেন। ছাত্রে এবং অধ্যাপকে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। বিপ্লব-আন্দোলন গ'ড়ে তুলবার কল্পনা ও আয়োজন এঁদের বহুমুখী। শরীরচর্চাকে শিক্ষাব্রতী শশীভূষণ নিয়েছিলেন শিক্ষার অঙ্গহিসাবে, মিত্তির সাহেব নিয়েছিলেন সামরিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির উপায় হিসাবে। শশীভূষণ বলতেন, বাঙালীর ছেলে যদি দিনে অন্ততঃ ছয় ঘণ্টা ক'রে কায়িক পরিশ্রম করতে না শেখে, কল্পনা-বিলাসী জাত অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ছেলের পুকুরের আশেপাশে—বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ, গোয়াবাগান থেকে শুরু ক'রে বক্সিপাড়া, বেনেটোলা পর্যন্ত অনেকগুলি আখড়া সমিতি তখনকার দিনে গ'ড়ে উঠেছিল। এর কোনোটায় বা খেপান হ'ত কুস্তি, কোনোটায় জিম্‌ন্যাষ্টিক, কোনোটায় লাঠি, ছোরা ও তরোয়াল খেলা। শশীভূষণ ঘুরে ঘুরে এদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, এদের কাজে উৎসাহ দেন; এদের এক সম্মেলন গ'ড়ে তুলতে সাহায্য করেন। মিত্তির সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী শশীভূষণ এদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এই সম্মিলিত সমিতির নাম হয় অনুশীলন সমিতি এবং পরে স্বদেশী যুগে এর বিপুল প্রসার ঘটে। মিত্তির সাহেব এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। এই হিসেবে অনেকে শশীভূষণকে বলেন অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ডন্ সোসাইটি প্রভৃতি তখনকার দিনের অন্যান্য বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও শশীভূষণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

১৯০৮ সালে বারীনবাবুরা যখন মুরারীপুকুর বাগানের বোমার আড্ডায় ধরা পড়েন, রাসবিহারী বসুর চিঠি সেখানে পুলিশের হস্তগত হয়। যতীন মুখার্জি বলেন, রাসবিহারীবাবুর ধরা দেওয়া চলবে না। শশীভূষণ তখন পি এন ঠাকুরের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করতেন এবং ছেলেদের নিয়ে তাঁর দেরাদুন যাবার কথা হয়। শশীভূষণ এই চাকরী ছেড়ে দেন, তাঁর স্থলে রাসবিহারী গৃহশিক্ষক হয়ে দেরাদুন যান।

১৯১৩ সালে সৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল চক্রবর্তী একজন আদর্শচরিত্রের শিক্ষাব্রতী হিসাবে শশীভূষণকে কলেজ হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করেন। শশীভূষণের প্রেরণায় একদল ছাত্র ঐ সালের দামোদর বন্যায় আর্তসেবার কাজে যান। বানেশ্বর

বন্যার এই সেবাকাজ সম্পর্কে গুপ্তপুলিশের নানাবিধ রিপোর্ট আসে। ব্রজবাবু এই কারণে শশীভূষণকে কলেজ থেকে স্থান বদল করেন। কিন্তু অল্পদিনের ভিতর শশীভূষণ এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষসহ আটজন অধ্যাপকের পদত্যাগ করার সম্ভাবনা দেয়। ফলে, ব্রজবাবু নিরস্ত হন। কলেজের Poor fund-এর আয় বাড়াবার জন্যে বর্তমান বক্তা সহপাঠী ও অন্য ছাত্রদের নিয়ে স্থানীয় রেল ও ষ্টীমার ষ্টেশনে কুলিগিরি করতো। দৌলতপুর কলেজের মাঠে তখন অজস্র খানাডোবা। শশীভূষণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবস্থা করেন, ছেলেদের ঝুড়িকোদাল দিলে তার ওগুলো ভরতি করে দেবে, আর একটা রেট্ অনুযায়ী পয়সা নিয়ে পুকুর কাটার জন্য করবে। শরীর চর্চার যে উদ্দেশ্য শশীভূষণ ব্যক্ত করতেন, তাঁর সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়ও তিনি এর ভিতর খুঁজে পেলেন। ছেলেদের সঙ্গে শশীদা নিজে, অধ্যক্ষ কানাখ্যা চরণ নাগ, অধ্যাপক দ্বিজপদ ব্যানার্জি, নরীন্দ্রনাথ শেঠ, শরৎচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বোস, ডাঃ অমূল্য উকিল এবং আরও কোনো কোনো অধ্যাপক ওখানে কোদালে মাটি কেটে ঝুড়িতে ক'রে বইতেন। অশক্ত শরীরে শশীদার সেই ঝুড়ি বওয়া এক শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতুক সৃষ্টি করতো। শশীদা বলতেন, যে-ঘরে থাকবি, সে-ঘরে ময়লা থাকবে কেন? যে-পথে চলবি, সে-পথে কাঁটাজঙ্গল থাকবে কেন? তাঁর এই উপদেশেই তখনকার দিনের ছাত্ররা দৌলতপুর কলেজের জঙ্গলে ভরা মাঠকে বর্তমানের সুদৃশ্য লনে পরিণত করে।

একদিকে শশীভূষণ, অধ্যাপক নরীন্দ্রনাথ শেঠ ও শরৎ চন্দ্র ঘোষ, অপরদিকে ডাঃ যুগল কিশোর আঢ্য এবং পরে ডাঃ অমূল্য উকিলের সাহায্যে দৌলতপুরে তখন শক্তিশালী কর্মকেন্দ্র গ'ড়ে উঠেছে, বাংলায় প্রথম সমাজতন্ত্রের নীতিতে ছাত্রাবাসের সৃষ্টি হয়েছে। দৌলতপুর শ্মশান, খালিশপুর কালিবাড়ী, সেনহাটি বিজয়তলা ছাত্র ও শিক্ষকদের গোপন মিলনস্থান—গুপ্তসমিতির রেওয়াজে শশীদা যথাক্রমে এগুলির নামকরণ করেছেন "সৌম", "খাকা", "সেবিত"। জ্যোৎস্নারাতে বিজয়তলায় প্রার্থনার পর অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলে একদিকে গান ধরেছে—

সে কোন্ জ্যোছনা দেশ সইরে?
সাকার যেথা নিরাকারে ডুবে যায় চুপে
নিরাকার সে ভেসে ওঠে সাকারেরই রূপে

অপরদিকে আর একদল ছেলে গান গাইতে গাইতে আসছে—

যেথা বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়
খড়্গে খড়্গেতীব্র পরিচয়
যেথা ভ্রূকুটি সনে গর্জন মিশে
রক্ত রক্ত সনে।

খেজুরবাগান মেসে ছেলের দল গীতা পড়ে, ন্যাটসিনি পড়ে, শশীদার ঘরের সামনে যতীন মুখার্জি এসে গভীর নিশীথে আসন বিছান; ভোর থেকে দলে দলে ছাত্ররা মিলিটারি প্যারেড্ করে, ঘোড়ায় চড়ে, নৌকায় বাচ দেয়, গোপনে সিগনালিং শেখে, খুলনাতে মিলিটারি পুলিশ হস্তগত করতে চেষ্টা করে, সারেংদের সাথে ভাব ক'রে জাহাজ চালানো শেখে, দৌলতপুর থেকে বেরিয়ে যশোর খুলনা দু'জেলায় দল গড়ে—এই তখনকার দিনের দৌলতপুর কলেজের চিত্র।

সুভাষচন্দ্র তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে আই এ পড়তেন। কটকে থাকতে অনেকের মুখে শশীদার নাম শুনেছেন, ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জির কাছে দৌলতপুরের কর্মকেন্দ্রের কথা শুনেছেন। শশীদার ঘরের প্রার্থনা-সভায় সুভাষচন্দ্রের ভক্তি-অশ্রুত কণ্ঠে

চিত্তর মম নানস হরি

গান শুনে শশীদা মুগ্ধ হয়ে যান। কাঁধে হাত রেখে হাসি অশ্রুমাখা চোখে সুভাষের চোখের দিকে চেয়ে বলেন, বিপ্লব করতে গিয়ে মরতে হবে, অমন নবরকান্তি চেহারায় চলবে না, ওদের সাথে কোদাল ধরবি চল্।

দৌলতপুর কর্মকেন্দ্রের সেদিনের অকুণ্ঠ সেবাব্রতের আনন্দ-উচ্ছল আবহাওয়ায় যিনি একদিনও শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেছেন, তিনিই যেন এক নবজীবনের উদ্দীপনা

অনুভব করেছেন। গ্রীষ্মের ছুটীর আরম্ভে পরস্পরের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে অধ্যাপকে ছাত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে শিশুর মতো কেঁদে উঠেছেন। সে কান্না যেন সংক্রামক হয়ে উঠেছে। এই কর্মকেন্দ্রের অন্তরঙ্গদের শশীদা বলতেন, জীবনে একটা সত্যিকারের তৃপ্তি পেয়েছি তোদেরই কাছে এই কর্মকেন্দ্র সম্পর্কেই শশীভূষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রে জড়িত—এই সন্দেহে ১৯১৭ সালে ধরা প'ড়ে অন্তরীণ হন। মুক্ত হবার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। ১৯২২ সালে এই অমর জীবনের অবসান ঘটে।

দেশের জন্য সন্ন্যাস ছিল সে-যুগের আদর্শ। এই আদর্শে দীক্ষিত ছিলেন শশীভূষণ। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সাহায্যে আমেরিকায় শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে যতীন শেঠ ও হীরালাল রায় যখন দেশে এলেন, তখন তাঁরা ডাঃ সত্যানন্দ রায়কে নিয়ে একবার নৈহাটপুর কলেজ দেখতে যান। ছাত্রদের কাছে এঁদের পরিচয় করাতে গিয়ে এঁদের পাশাপাশি নৈহাটপুরের দুএকজন অধ্যাপককে বসিয়ে অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ বলেছিলেন—এ যেন সেই আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর দল, আর এই শশী ভূষণই যেন সেই মহাপুরুষ। বিশ্রামের কালে যোগাসনে ব'সে শশীভূষণ আপন অন্তরের দিকে চেয়ে থাকতেন। নিজের ভিতর তিলেক দুর্বলতা—প্রশংসা প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা, ঈর্ষাবুদ্ধি উঁকিঝুঁকি মারতে দেখলে 'মা' 'মা' ক'রে কাতরশব্দ করতেন। স্বেচ্ছায় বরণ করা দারিদ্র্যের জীর্ণ জীবনে অমন সানন্দ পুরুষ বিরল। সকল দারিদ্র্যের মাঝেও প্রাণের সম্পদে ছিলেন তিনি অপরিমেয় বিত্তশালী। শুধু নিজের প্রাণের দরদ দিয়ে শশীদা ছাত্রদের জীবনে বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতেন। ছাত্রদের ভিতর ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি, চতুরচাতুরী, আলস্য, আরামপ্রিয়তা, আর বিলাসিতা দেখলে শশীদার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। নিভৃতে ডেকে নিয়ে স্নেহকাতর স্বরে দু'টি কথা বললে এক একজন জীবনের গতি বদলাবে ব'লে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসতো। এমনি করে কতজন যে সেই স্পর্শে নতুন জীবন গড়ে তুলেছে, আজ তার সংখ্যা করতে কেউ এগিয়ে আসবে না। কিন্তু বাঙালী সমাজের ইতিহাস নীরবে সে ঋণ স্বীকার করবে। আজকে এই আঁধারে দিনেও আশা করবার আছে, সেই বীজ এক অমর দিনে ফুলফলে সমাজকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবে। সত্যিকার মরণীয় সত্যিকার স্মরণীয় যে, তাকে ভুলে গেলেও সে জাতির প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ুকে সুমধুর ক'রে তুলবে।*

*কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

ক্লাশ বদলে গেছে। এবার একজন মাষ্টার এসেছেন যিনি খিঁচুনো, চেঁচান, বকুনি ছাড়া কথা কইতে পারতেন না। কয়েকটি ছেলে এ ক্লাশে ছিল যারা দোষ করলে বকুনি সইবে; কিন্তু বিনা দোষে ধমক ধামক মানতে রাজী নয়। কর্মকার ও আমি ছিলাম এই ঝাঁকে। কলকাতায় খুব প্লেগ হচ্ছিল। বহুলোক মারা যাচ্ছিল। একটি ছেলে টমারী সাহেবের বেত খেয়ে বাড়ী যায়; সেইদিনই জ্বরে পড়ে। তিনদিনের মধ্যে মারা যায়। তার বাড়ীর লোক ছেলে প্লেগে মারা গেছে না ধরে বসেছিল যে মার খেয়ে যদি জ্বর না হোত তবে তার প্লেগই হোত না। যাই হ'ক। এই ব্যাপারটার পর প্রিন্সিপাল হেষ্টর সাহেবের জায়গায় অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ওবি-কল্ল ষ্টিফেন সাহেব ছাত্রদের সঙ্গে কড়া ব্যবহার একদম বন্ধ ক'রে দিলেন। বেত দিকেষ ফেলা হইল। প্রাণভরে ছেলেরা ষ্টিফেন সাহেবের যশোগান করতে লাগল এবং তাঁর সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করতে লাগল। সবদিক দিয়ে ব্যবস্থা ভাল হ'ল কিন্তু এই নতুন মাষ্টার নিজের মুদ্রাদোষ ছাড়তে পারলেন না। তিনি তেমন মনোরম ও ভাল ক'রে পড়াতে পারতেন না।

কয়েকটি ছাত্র শিক্ষককে শিক্ষা দিতে মনস্থ করল। অবশেষে প্যারীবাবুর হবর জানতে পেরে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সৎ উপদেশ দিয়ে ছেলেদের থামিয়ে দেন প্যারীবাবুকে ভয় করত না এমন ছেলে স্কুলে ছিল আবার তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাও করত সকলেই। স্কুলের নিয়ম শৃঙ্খলা তিনি না থাকলে রক্ষা করা সুকঠিন হত।

সুখ নাই। শ্মশান বৈরাগ্যের মত স্কুলে একটা ভীত-স্তব্ধ এসেছে ছাত্রদের মধ্যে। ক্লাশের ঘর থেকে হাস্য শোনা যেত। যখন ছেলেরা অপ্রিয় আবহাওয়ার বন্ধ, সেই সময় দেখতে পেত বুকে চাদর বেঁধে কত লোক আফিসে যাচ্ছে। তাদের পড়া তৈরী করা, পড়া দেওয়া মাষ্টারের কাছে অযথা গাঁত খিঁচুনী খাওয়ার বালাই নেই শুধু তা নয়, সকালে সন্ধ্যায় আড্ডা; দুপুরে আফিসে গল্প করতে করতে কাজ; বিকেলে বাড়ী আসা ছোট বা ট্রামে এবং সে জন্য আবার বাইসে পাওয়া, বাড়ীতে বেশী সমাদর। এই আলোর সঙ্গে ছাত্রজীবনের ছায়ার তুলনা আপনার থেকে মনে আসে। ছেলেরা কেউ কেউ আপোষে এই নিয়ে জল্পনা, কল্পনা করে: কর্মকার, সুরেশ এদের চাই। তারা আমাকেও বোঝাতে বোঝাতে বলে টানল। মাসের হাতে মাসে মাসে টাকা দিতে পারব এই চিন্তা হ'ল আমার কাল।

কয়েকদিনের মধ্যে সুরেশ স্কুল ছেড়ে একটা কাজে লেগে গেল। তার আফিস হ'ল পোলক ষ্ট্রীটে। সে এবার বে-পরোয়াভাবে বন্ধুদের দেখিয়ে দেখিয়ে এই পথ দিয়ে আফিস যেতে লাগল। অন্যপথ তার ছিল। সেদিক দিয়ে গেলেই পারত, এবং সেটা হ'ত স্বাভাবিক। কিন্তু "ক্লাশ-ফ্রেণ্ড"দের বুকে জ্বালা দিতে সে এই রাস্তাটা নির্বাচন করেছিল। ফল যা হবার হ'ল। সাধুদের দোষ নাই। কিন্তু বে-ওয়ারিস পুঁইলী হাতের গোড়ায় ছড়িয়ে থাকলে তারা কি করবে? কর্মকারের মনে লাগল কাতুকুতু। সেই সুড়সুড়িতে সে হ'ল বে-সামাল। আমাকে স্ব-মতে আনল স্বাধীন জীবনের রং চং এঁকে। আমি বললাম চাকরীতে করা উচিত হ'বে না। কর্মকার বেকোল স্কুলে পড়ে যেমন বিদ্যা অর্জন হয়, তেমনি আফিসে কাজ ক'রে ব্যবসায় জ্ঞান অর্জিত হ'বে। সেই জ্ঞান খাটিয়ে তারা স্বাধীন ব্যবসায়ের কার্য খুলবে। বাড়ীর ওপর পেটের ভাতের জন্য নির্ভর করা লজ্জা-জনক নয়? এপথে বরং নিজের খাওয়া পরা মিটিয়ে আরও দশজনকে প্রতিপালন করা যাবে। চিরকাল দাসত্ব করতে ঘোড়াই তারা যাচ্ছে। আর বেশী লেখাপড়া শেখার মানে—সেই তো চাকরীতে ঢোকা।

অনেক বিচার, বিবেচনা ক'রে যখন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল তখন আমি ছিলাম তাড়া। সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে।

একদিন দুই বন্ধু বেরুলাম স্কুলের কি একটা ছুটির দিনে। কেউ জানল না,—বা শুনলো না আমাদের বেরিয়ে পড়ার কথা। বয়ঃবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ কর্মকারই এতাবৎ পথপ্রদর্শক। কর্মকারের উদ্ভাবনী বুদ্ধির নিকট, বয়সে ছোট আমি মাথা হেট ক'রে থাকতাম। কর্মকার স্থির করল কোন আফিসে কাজ নেওয়া হবে। সে বলল যে অফিসের পথে স্কুল চোখেই পড়ে না সেই অফিসে যাবে। স্কুলের ছায়া আর মাড়ানো হবে না। সেই হতভাগা মাষ্টারটার কথা যেন খুব শীঘ্র, চিরতরে ভুলতে পারি। সে কিনা কর্মকারকে বলত—কামারের ছেলে হাতুড়ী পেটাগে না? কামার-শালা ছেড়ে পাঠ-শালায় কেন? হাপর টানোগে যাও। কলম, পেন্সিলে কি হবে?

পথে বেরিয়ে মনে পড়ল দরখাস্ত চাই। নৈলে কেউ চাকরী দেবে না। মহা বিপদ। আমরা তেমন ইংরেজী তখনও আয়ত্ব করিনি যে দরখাস্ত লিখে নিয়ে যেতে পারব। অনাগত-বিধাতা, কর্মকার লঘু-হাস্যে উড়িয়ে দিল। তাদের বাইরের ঘরে গিয়ে 'রাজ ভাষা' কেতাবের শেষের দিকের নমুনা থেকে Understanding that a vacancy has occurred নকল ক'রে দুটো দরখাস্ত ঠিক ক'রে নিল। হাঁটতে হাঁটতে চিৎপুরে পোর্টট্রাষ্ট রেলের একটা আড্ডায় পৌঁছান গেল। সেখানে

এক দরোয়ানকে পান খাইয়ে গল্পে গল্পে বার হ'ল যে নারানবাবু জুট বিভাগের বড়বাবু। এখানকার মালগুদাম শুধু পাটের কাজ করত। পাটের গাঁট গাড়ী বোঝাই হ'য়ে চালান যেত খিদিরপুর। সেখান থেকে জাহাজে উঠত, এবং বিলাত যেত। বড় কারবার। তাতে সন্দেহ নাই। এ সময়টা বর্ষা সবে আরম্ভ হয়েছে। নারানবাবুর কাছে যাবার পথে একটা ভিজে শালিক পাখী নজরে পড়ল। সেটা ভাল উড়তে পারছিল না। চাকরীর কথা ভুলে ছুটোছুটি ক'রে দুজনে সেটাকে ধরলাম। কর্মকার বলল—পাখী যাত্রা, খুব ভাল। জটায়ুপক্ষীকে পথে রেখেছিলেন ব'লে মা জানকী উদ্ধার হ'লেন। স্থূল জীবনই হচ্ছে রাবনের অশোক বনে বন্দী জীবন। এক একটা পরীক্ষায় দশ বছর ক'রে পরমায়ু ক্ষয় হয়। এবার আমাদের বন্দী জীবন উদ্ধার হবে। রাবনের চেড়ী ম'রে ঐ নতুন মাষ্টারটা জন্মেছে। শেষে এই মন্তর পাঠ করল—"পাখী, পাখী, পাখী! তুমি আমাদের রাখ, আমরা তোমায় রাখি।" এই ব'লে পাখীটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। চুমকুড়ি দিয়ে ডাকতে বলল। পাখী ডাকল না। অবশেষে তার ঠোঁটে চুমু খেয়ে দারোয়ানজীর কাছে রেখে নারানবাবুর কাছে চলল। গোড়াতেই যাত্রা শুভ হওয়ায় দুজনের খুব আনন্দ হ'ল।

কর্মকার অতি ভক্তিভাবে নারানবাবুকে প্রণাম করল; আমি তার অনুসরণ করলাম। কথাবার্তা সব কর্মকারই কইল। প্রথমে নারানবাবু আমল দিচ্ছিলেন না। বললেন—তোমরা ছেলেমানুষ, কাজ সামলাতে পারবে না। তার পর বললেন—কাজ করলেই কি হয়? এক গলা মাটি খুঁড়লে একটা কড়ি পাবে না। তারপর বললেন—কাজ এখন খালি নাই। কর্মকারের জবাবগুলি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হতে হতে শেষে নারানবাবুর কর্ণকুহরে ঘুসমন্ত্ররূপে নিবেদিত হ'ল। অবশেষে শুনতে পেলাম, নারানবাবু সদয় হয়ে বললেন—দু-মাসের মাইনে তাঁকে দিতে হবে। তা'হলে তিনি দশ টাকা বেতনে দুজনকে "টালি ক্লার্ক" নিযুক্ত করবেন। ভাল কাজ দেখালে পরে পনের টাকা মাইনের আফিসে অন্য কাজ দেবেন। টালিক্লার্ক গতকিছু মাল গুনানে আসবে, অর্থাৎ পাটের গাঁট লেখে লেখে, গুণে গুণে একটা কাগজে চ্যারা দিয়ে হিসেব রাখবে। বসতে হবে বাইরে। বৃষ্টি বা কড়া রোদ হ'লে কাঠের ছোট গোল খাঁচায় আশ্রয় নিতে পারবে অবশ্য কাজ ক'রে যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে আফিসে নিযুক্ত না হওয়ায় বন্ধু দুটির মনে একটু বিষাদ যে না এসেছিল তা নয়। কবে রাম রাজা হবে, তবে আমি তার মন্ত্রী হব—এই লোভে কি মন মানে? মন্দের মধ্যে যা ভাল তাই নিতে হয়। সে জিনিসটি হচ্ছে নিরাশার আশা।

পথে ফেরার সময় গতি কেন মন্থর হ'য়ে যে আসার বেলা বেশ স্বচ্ছন্দ ও ক্ষিপ্রগতি ছিল।

সুরেশ কর্মকারের কাছে পরে আমাদের "অভিসারের" কথা জানতে পারে। আমাদের বাড়ীতে এসে বেখা ক'রে বলল—দূর দূর, টালিক্লার্ক হ'তে যাবে? আর মাইনে মাত্র দশ টাকা। আমার দাদার মামাশ্বশুর আমাদের আফিসের বড়বাবু। আমার চাকরী তিনি ক'রে দিয়েছেন। আমি ব'লে তোমার একটা ভাল ক'রে নিতে পারব; পরদিন সে আমাকে ধরে পাকড়ে নিয়ে গেল। তার দাদার মামাশ্বশুর জেটিক্লার্কের কাজ দেবেন আশা দিলেন। মাইনে পনের টাকায় আরম্ভ।

আর পড়তে হবে না। বন্দী থাকতে হবে না। ট্রামে চাপার জন্য বাড়ীতে পয়সা চাইতে হবে না। নিজের জুতো, জামা, কাপড় নিজের পয়সায় কেনা যাবে। মাকে প্রতি মাসে অনেক টাকা দেওয়া যাবে। মাসে পনেরো টাকা কম? ছেলেবেলায় এক পয়সা, বড়বেলায় এক মোহর। বেশী দিন নয়, মাসকয়েক চাকরীর অভিজ্ঞতায় মস্ত এক মুচ্ছুদ্দীর আফিস খোলা যাবে। কন্ত-গরীবকে প্রতিপালন করতে পারা যাবে। সেই বিধবা আশ্রমটিতে প্রথম মাসের মাইনের পুরো টাকাটা দেওয়া হবে। বাড়ীতে যারা চাঁদা নিতে আসে, কাকাদের কাছ থেকে নিতে না দিয়ে আমি সবাইকে

তিনি নিজেকে
শিশু মাইতিকে এনে

হাতে টাকা পয়সার ভার দেওয়া হবে। অমন বিশ্বাসী ঝি সে কোথাও খুঁজে পাবে না। একটি পয়সাও সে এদিক ওদিক হ'তে দেবে না। সে উভয় পক্ষকে সামলাতে পারবে। ভাল খবরে আনন্দে উন্মত্ত হ'তে নেই, মা বলেছেন। এ ভাল খবরটা আনন্দের হাতটা চেপে রাখতে হবে। কাল মাকে বললে তিনি প্রাণখুলে আশীর্বাদ করবেন। তাতে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে। কবিরাজ বলেছে, বিলেতের সঙ্গে ব্যাপার চলবে। ব্যবসায়ে জাহাজে এদেশের সাধু, মহন্তদের পাঠিয়ে দিয়ে কর্মবিস্তারের সঙ্গে ওদেশে প্রকৃত ধর্মবিস্তার করতে পারা যাবে। ওদের মাথা খেয়ে শুধু কলকব্জা। ওরা কলের ঘেড়াজালে দিয়ে হয়ত ইঁদুর ধরতে পারে। কিন্তু মানুষগুলোর মনকে নেরে ইট, পাথর করে রাখছে।

রাতটা কোন রকমে কাটালাম। ঘুমের মধ্যেও কেমন যেন আনন্দে অধীর করে তুলছিল আমাকে। স্বপন দেখলাম—আবার তমলুক থেকে বড় বড় জাহাজ যাচ্ছে নানা দেশে। বহু জ্ঞানী, গুণী ও সাধুসন্তরা যাচ্ছেন। বড় আদরে তাদের অপর দেশের লোকেরা ডাকছে। মনের সম্পদ ওদেশে দিতে ভারত আবার যাচ্ছে। জাহাজ যত যেতে লাগল আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। জাহাজের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। চিমনীর ধোঁয়া আকাশে উঠে যাত্রীদের হাত নাড়া, রুমাল নাড়া ও চাদর নাড়ার কাজ করতে লাগল। আর জানাতে লাগল—জন্মভূমি, তোমার সন্তান আমরা। যেখানে থাকি তোমার সঙ্গে দূর দূরান্ত থেকে এমনি করে যোগ রাখবে। মন আমাদের এই রকম এদেশের পানে চেয়ে থাকবে। মনের খোরাক এখান থেকে নেব। ক্রমশঃ জাহাজ আকারে ছোট হ'তে লাগল। শেষে জাহাজ দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল। পৃথিবী গোল, সেটা প্রমাণ করতে বুঝি গোলকের অপরদিকে যেতে আরম্ভ করেছে? ধোঁয়া এখনও দেখা যাচ্ছিল। জাহাজ ক্রমশঃ ডায়মণ্ড-হারবার পৌঁছাবে। তারপর আর ধোঁয়াও নাই, শব্দও নাই। অনুমান হ'ল জাহাজ সাগরে চলে গেল। হঠাৎ একটা মিষ্টি শব্দ কানে এল। মনে হ'ল দূর থেকে গান ভেসে আসছে। গানই ত? সুস্পষ্ট শোনা গেল—

গাহি জনমভূম, অতুল নামে তোমার।
গাহি দুর্গে অচল-মালিনী,
গাহি গঙ্গে রতন-প্রাবিনী,
গাহি লক্ষ্মী সাগর শোভিনী;
সকল ভুবন সার।

সকালে ঘুম ভাঙতে চুপী চুপী মাকে সকল কথা খুলে বললাম। শুনে হাসলেন। পরে আমার মুখের উপর তাঁর করুণ, কোমল চোখ দুটি রেখে বললেন —ছি! তুমি কার সন্তান ভুলে গিয়েছ কি? তাঁর মুখে কালি দেওয়া হবে যে? চাকরীর কথা মন থেকে মুছে ফেল। তোমার পয়সা আমরা চাই না। আর, এ বয়সে তোমার এ সব চিন্তা কেন? আমাদের সংসারত তোমার জন্য আটকে নেই।

(ক্রমশঃ)

বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প।

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস

ছোট গল্প বলিতে কি নির্দ্দেশ করে? শুধুই আয়তনে স্বল্প হইবে, ছোটগল্পের সংজ্ঞা এত সংকীর্ণ নয়। সংক্ষেপতঃ, ছোটগল্প বলিতে ইহাই প্রতীত হইবে যে, এমন কোন গল্প যাহা শুধু একটিমাত্র বিশেষ ভাবের আলোচনার ক্ষেত্র হউক না তাহা এক দীর্ঘ কাহিনীর বিবৃতি; এবং এহেন ছোটগল্প রচনার ব্যাপারে, আন্তর্জাতিক ইংরাজী সাহিত্যের লেখকেরাই সর্বাধিক সার্থক ও সম্পন্ন, একথা বিশ্বজন-বিদিত। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের অবতারনা প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম অনিবার্য ভাবেই আসিয়া পড়ে, এবং এক্ষেত্রে গুরুদেবের প্রতিভার দান এতই বিরাট ও একক যে ছোটগল্প কথাটার সহিত রবীন্দ্রনাথের পুণ্য স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া আছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে বাংলা ভাষার জনকরূপে অভিহিত করা হয়; কিন্তু সর্বজনের বোধগম্য প্রতিশ্রির বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন যিনি, তিনি হইতেছেন ঋষি ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র।—সাহিত্য বলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ হইতেই সুরু; এবং এই যুগ প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষার অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া যে উদারতার ইহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন; তাহাই হইল সাহিত্যের উৎস। এই উৎসধারা দু-খাতে পরিচালিত হইয়া একযুগে বাংলাভাষার সাহিত্য যে নূতনতর ও বিস্ময়কর সমৃদ্ধি লাভ করিল, তজ্জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নাম অবিস্মরণীয়;—বাংলা ভাষার বিভিন্ন ক্ষেত্র, কি উপন্যাস, কি কবিতা, কি ছোটগল্প সর্ববিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়, প্রতিভা অলৌকিক। ছোটগল্পের ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথ ইহাকে যেন একজীবনে শতজীবনের প্রগতির পথে ঠেলিয়া দিয়াছেন।

ব্যাপক আলোচনায় ছোটগল্পকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায়। এক শ্রেণীর গল্প আছে যাহা শুধু ঘটনা বিবরণে রস পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত। এ সমস্ত গল্পের বিবরণে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ন্যাস্ত থাকে না। তৃতীয় শ্রেণীর পাঠকেরা তাহা পাঠ করিয়া সাধারণ আমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন ও খামখেয়ালী ভাব-কল্পনাকে চরিতার্থ করেন। লেখকের নৈপুণ্য ও সার্থকতা যেন তাহাতেই সীমাবদ্ধ ও স্বীকৃত। অধুনা বাংলাভাষার বাজারে ছোটগল্পের ছোটখাটো এমন নানা মাসিক পত্রের অভাব দূর হয় না, যেগুলি এজাতীয় সস্তা গল্পের প্রধান ও স্পষ্ট আড্ডাস্থল।

আর এক শ্রেণীর গল্প আছে, যাহা শুধু অর্থহীন এক-ঘেয়ে প্রেমের কাঁদুনী গাহিয়াই পরিসমাপ্ত হয়। এই সমস্ত

গল্প নেহাৎ নকল ও মৌলিকতা হীন। তাহাতে না থাকে তত্ত্ব ও তথ্যের কোন যুক্তি কিংবা বিশ্লেষণ, না থাকে কোন গূঢ় চরিত্র সৃষ্টির নৈসর্গিক জটিলতা। এই প্রকার সাধারণ শ্রেণীর গল্প লেখকের অগণিত সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যের বাজার ভীড়াক্রান্ত। গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়া ভাবের হাটে গোলমাল বাঁধিলেই তাঁহারা ভাষার দোকানপাট বন্ধ করিয়া কোনরকমে গোঁজামিল দিয়া বসেন, সুতরাং গল্প শেষে ভাবের সামঞ্জস্য কিংবা কাহিনীর স্বাভাবিক পরিণতির গন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ জাতীয় বর্ণ্য কাহিনীর সমাবেশে সাহিত্যাকাশ সমাবৃত বলিয়াই এ কথার পুনরুক্তি করিতে হইল।

তৃতীয় বারে আলোচ্য গল্পই যথার্থ খাঁটি ছোট গল্পের পর্যায় পড়ে, এবং ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্যের সর্তাবলী সম্যক প্রতিপালন করিয়া থাকে। গল্পের অবয়ব বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কোন বিশেষ ভাবকে, কাহিনীর মধ্য দিয়া ইহার যথার্থ পরিণতি ও স্বাভাবিক সম্ভাবনার দিকে টানিয়া লইয়া যে গল্পের পরিসমাপ্তি, তাহাই প্রকৃত ছোটগল্প; এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পুস্তকের প্রত্যেকটি গল্প ছোটগল্পের স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

ছোটগল্পের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পরেই উল্লেখ করিতে হয় শরৎচন্দ্রের কথা। অন্যান্য প্রতিভার কথা বাদ দিয়াও ছোটগল্প রচনায় শরৎচন্দ্র যে অসাধারণ মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্যই বিস্ময়কর,—ছোট গল্প রচনার ব্যাপারে তাঁহার প্রতিভার ক্ষমতা অপ্রতিহত। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যুগ্ম অবদানে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধারী বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষদ্বয় বাংলা সাহিত্যাকাশের দুইটী ভাস্বর জ্যোতিষ্ক স্বরূপ উদিত হইয়া তাঁহাদের ভিন্নমুখী প্রতিভার অবদানে এ সাহিত্যের ছোট গল্পকে যে পূর্ণতা দান করিলেন, সে কথা স্মরিলে অন্তরে যে পরিমাণ বিস্ময় জাগে, তাহার পরিমাপ করা যায় না। বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে শরৎচন্দ্রের "মহেশ" "অভাগীর স্বর্গ" প্রভৃতি গল্পগুলি বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রত্ন।

"অভাগীর স্বর্গ" গল্পটি আয়তনে হ্রস্ব না হইলেও ইহা একটি যথার্থ ছোটগল্প, কেননা ইহাতে একটিমাত্র ভাব এক দীর্ঘা-

নুরূপ কাহিনীর মধ্য দিয়া স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহা একটিমাত্র উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা গেল। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব লইয়াই মানুষের জীবন;—বিশ্বমানবের অন্তরের এই চিরন্তন সুরটি, মানুষের আকাঙ্খা ও আশা ভঙ্গের বেদনার কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের মধ্য দিয়া বেশ সফলতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' 'কাবুলিওয়ালা,' 'জীবিত ও মৃত,' 'ওপ্তধন,' 'কঙ্কাল' প্রভৃতি গল্পগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতীতের এক জাতীয় অতীন্দ্রিয় ও ভৌতিক ভাবের আমদানী করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে ছোটগল্প সমষ্টি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম রত্ন স্বরূপ। বাস্তবতা ও আদর্শবাদ, অ-দৃষ্ট ও অলৌকিক কল্পনাকে বিভিন্ন ভাবের সূত্রে গাঁথিয়া রবীন্দ্রনাথ যেন ছোটগল্পের এক বিচিত্র প্রাসাদ রচনা করিয়াছেন। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'কঙ্কাল', 'ওপ্তধন', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', প্রভৃতি বিভিন্ন গল্পগুলি অদ্ভুত অথচ

একান্ত স্বাভাবিক ভাবের আলোচনা। মানুষের অন্তর অত্যন্ত রহস্যময়, সে রহস্যের মূল তথ্য সর্বদা দৃষ্টিগোচর নয়, কেবল অনুভবের জিনিষ। শিক্ষিত মানবজাতির আদিম ও সহজাত পাশবিক মনোবৃত্তি এবং অতৃপ্ত কামনারাশি জাগ্রত ইন্দ্রিয়সমূহ সহজে দমন করিয়া রাখিতে তাহারা পারে না বলিয়াই সেই জঘন্য বৃত্তিগুলি স্বপ্নে কিংবা অচেতন অবচেতন মনের অন্তরালে ক্ষণে ক্ষণে প্রবাহিত হয় ও জাগরূক থাকে। ইহা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক অথচ সর্বদা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। রবীন্দ্রনাথ তাহার দূরদৃষ্টি দিয়া এই সমস্ত মানবিক গূঢ় তত্ত্বও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহার এজাতীয় ছোটগল্পে এধরণের ভাবের মূল নাড়ী ধরিয়া টান দিয়াছেন। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে কাহিনীগুলি স্বাভাবিক মৌলিকতায় প্রবাহিত হইয়া ছোটগল্পের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। অতএব, রবীন্দ্রনাথকেই বাংলা সাহিত্যে 'ছোটগল্পের জনকরূপে অভিহিত করা যায়।

ছোটগল্পের অর্থ অত্যন্ত উদার, এবং (ইংরাজী wit & humour) বিশুদ্ধ রসালোচনা করিয়া যে সমস্ত গল্পের সৃষ্টি, ছোটগল্প হিসাবে সেগুলিও সার্থক। এ বিষয়ে লেখক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্য দিয়া রস রচনা করিয়া তিনি ছোটগল্পকে অনেকখানি সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। বিশুদ্ধ রস রচনার ব্যাপারে প্রমথ নাথ বিশী, 'বনফুল'—ইঁহাদের নামও উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি কিছুকাল পূর্বে "বেঙ্গল ক্যামিকেল" কর্তৃক এক অভিনব উপায়ে নিজেদের সুনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি ছোটগল্প সমষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। "কথাশিল্প" নামক পুস্তকটি এই সমস্ত গল্পসমষ্টি নিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রত্যেকটি গল্পই ছিল এক একটি সত্যিকারের ছোটগল্প। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে গল্পলেখকের সংখ্যার যেমন অন্ত নাই, তেমনি যথার্থ ছোটগল্প রচনার ব্যাপারে সমসাময়িক কালে কতিপয় গল্পলেখক বেশ সুনামও অর্জন করিয়াছেন। শেষোক্ত "লেখকদের পর্যায়ে পড়েন যথাক্রমে প্র, পা, বী, প্রবোধ সান্যাল, গজেন্দ্র মিত্র, শিবরাম এবং আরও অনেকে। অবশ্য ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। ইঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব পৃথক ব্যক্তিত্ব ও মৌলিকতায় গরীয়ান; এবং গল্প লিখিতে বসিয়া ছোটগল্পের যথার্থ উদ্দেশ্য কি, একথা ইঁহারা ভুলিয়া যান নাই বলিয়াই ইঁহাদের প্রত্যেকটি লেখা সার্থক হইয়া উঠিতেছে। সিনেমার মধ্য দিয়া যে প্রকারের ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করে, কোন কোন ক্ষেত্রে কাহিনীকার ছোট গল্পের যথার্থ উদ্দেশ্য ও সর্তাবলী প্রতিপালন করেন বলিয়াই সেগুলিও ছোটগল্পের মর্যাদা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে সাহিত্যিক শৈলজানন্দের প্রতিভা প্রশংসার অধিকারী।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে সম্পাদক ও মাসিকপত্রের অভাব নাই। রচনার উপসংহারে বলিতে হয় যে বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর, এবং বর্তমানের বিজ্ঞ লেখক ও অনাগত ভবিষ্যতের সুযোগ্য উত্তরাধিকারীদের নিপুণ কলাকুশলতা ও পরিচালনার গুণে ছোটগল্প অধিকতর সমৃদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ করিবে; এবং বাংলা সাহিত্য ইহার ছোটগল্পরূপ মূলধন লইয়া একদা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।

মরুর কামনা

শ্রীপতি চৌধুরী

"কী ভয়ঙ্কর!"

চেঁচিয়ে ব'লে ওঠেন মিসেস্ সিনহা বিদ্যুতের তীব্র আলোকে তার লিপষ্টিক ঘষা ঠোঁটের মাঝখানে সাদা দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ ক'রে ওঠে, সার্কাস পার্টিতে হাওয়ার সাথে যুদ্ধরত খেলোয়াড়ের খেলা দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলেন,

"কী ক'রে এরা জংলী হাওয়াকে বশে আনতে পারে আমি বুঝতে পারিনি, ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে"

আমি বল্লাম—

"আপনার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে, কিন্তু খুব সাধারণ উপায়েই জংলী হাওয়াকে বশে আনা যায়

মিসেস সিনহার ঠোঁটের কোনে অবিশ্বাসের হাসি ফুটে ওঠে, বল্লেন—

"সত্যি নাকি?"

আমি তাঁকে প্রশ্ন করি—

"আপনি কি বলতে চান জানোয়ারের 'প্যাশান' ব'লে কিছু নেই? চেষ্টা করলে সভ্য জগতের সব কিছুই ওদের শেখানো যায় তা জানেন? গভীর বিস্ময়ে তিনি আমার দিকে তাকান, আমি বল্লাম—

"আমিও যেদিন মিঃ রঙ্গনাথমের খেলা প্রথম দেখি সেদিন আপনারই মত অবাক হয়েছিলাম, সেদিন আমার পাশে ছিলেন একজন বৃদ্ধ পাঞ্জাবী সৈনিক, বুকে তার ডান পা খানা কাটা গেছে, তার চেহারা দেখে প্রথমে আমি চমকে উঠেছিলাম, বৃদ্ধের বীভৎসতা তার কপালের প্রতিটি কুঞ্চিত রেখায় যেন আঁকা রয়েছে, তবুও তার মুখে চোখে এমন একটা সরলতার ছাপ ছিল যা আমার খুব ভাল লেগেছিল, পৃথিবীতে ভয় কাকে বলে তা বোধ হয় সে জানে না। এরাই বোধ হয় বুলেটের সামনে হাসিমুখে দাঁড়াতে পারে, মৃত্যুপথযাত্রী সঙ্গীর নাভিঃশ্বাসের মধ্যে খুঁজে পায় হাসির খোরাক, অত্যন্ত নির্বিকার চিত্তে সিগারেট টানতে টানতে সঙ্গীদের মৃতদেহের সৎকার করে।

যাক্ আসল কথা বলি, সেদিন মিঃ রঙ্গনাথমের খেলা দেখে আমার সঙ্গী সেই বৃদ্ধ সৈনিকটি বেশ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, মিঃ রঙ্গনাথমের সাহসের প্রশংসা করতেই মৃদু হেসে মাথা দুলিয়ে বল্লেন—

—'আমি সব বুঝেছি'—

আমি আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম—

'কী করে বুঝলেন? দয়া করে বলবেন কী?'—

গভীরভাবে আমাদের আলাপ জমে ওঠে, কাছেই একটা রেস্তোরা ছিল। দু'জনে সেখানে গেলাম, পুরো চার 'পেগ' হুইস্কি শেষ করে তার স্মৃতিশক্তিকে বেশ একটু প্রখর ক'রে নিল, তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত গল্পটা আমায় বল্ল, গল্প শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারলাম, সে যে অবজ্ঞার হাসি হেসে—'আমি সব বুঝেছি'—বলেছিল, তা যথার্থই সত্যি'

হোটেলে ফেরবার পর মিসেস্ সিন্‌হা গল্পটা বলার জন্য বার বার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। অগত্যা বাধ্য হ'য়ে বলতে হ'ল।

"গত মহাযুদ্ধে এই সৈনিকটী যখন মেসোপটেমিয়ার ছিল তখন হঠাৎ সে বেদুইন দস্যুদের হাতে বন্দী হয়, তাকে বন্দী ক'রে ওরা বহুদূর নিয়ে যায়। সারাদিন দস্যুরা মার্চ ক'রে চলল, কোথাও একবারও থামল না, রাত্রি ঘনিয়ে এলে তারা তাদের আস্তানাতে এসে পৌছুল, নিজেরা খেজুর খেয়ে ও ঘোড়াগুলোকে কিছু বার্লি খেতে দিয়ে তারা ঘুমোবার আয়োজন করতে লাগল, তারা একবারও মনে করেনি যে সৈনিকটি কখনও পালাতে পারবে, তাই শুধু তার হাত বেঁধে রেখে দিল। ক্রমে তারা সবাই গভীর ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়ল, তাদের এই গভীর নিদ্রা দেখে সৈনিকের মনে কিছুটা সাহসের সঞ্চার হয়। অতি সাবধানে দাঁত দিয়ে একটী ছোরা তুলে নিয়ে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখল এবং অতি সন্তর্পণে হাতের বাঁধন কেটে ফেলল, সে তখন সম্পূর্ণ মুক্ত, তারপর একটা ছোট বন্দুক, একটা ছোরা ও কিছু খাবার

সঙ্গে নিয়ে খুব ধীরে ধীরে একটি ঘোড়াতে উঠে জোরে চাবুক কষে প্রাণপণে ছুটিয়ে চলল, মুক্তির আনন্দে পাগল হ'য়ে সৈনিক শুধু ঘোড়া ছুটিয়েই চলল, কোথাও একবার থামল না, এই ভাবে অনেকদূর যাবার পর ঘোড়াটি হঠাৎ থেমে যায়, ব্যস্ত হয়ে সৈনিক ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ে, অসহনীয় ক্লান্তিতে ঘোড়াটির সর্বাঙ্গ পরথর ক'রে কাঁপছিল, লাগামের আঘাতে ঘোড়ার দুই চোয়াল বেয়ে রক্ত পড়ছে, দাঁড়িয়ে থাকবার সামর্থ্যটুকুও যেন আর নেই, তারপর হঠাৎ ঘোড়াটি মাটীতে পড়ে যায়, বিস্মিত হ'য়ে সৈনিক দেখল যে ঘোড়াটির দেহে আর প্রাণ নেই। সেই বিশাল মরুভূমিতে সৈনিক তখন একা, প্রথমে সে কিছুটা হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়ল, তারপর মরুভূমিতে কিছুক্ষণ হাটবার পর বাধ্য হ'য়ে তাকে থামতে হ'ল, মরুভূমির উপর ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে আসছে, সৈনিক তখন এত ক্লান্ত যে আর এক পা চলবার সামর্থ্য তার নেই, হঠাৎ একটা উঁচু জায়গার ওপর কতগুলো খেজুর গাছ তার নজরে পড়ল, এই দেখে সে কিছুটা আশ্বস্ত হয়, সেই উঁচু জায়গায় উঠে একটা বিরাট গ্র্যানাইট পাথরের ওপর তার পরিশ্রান্ত দেহ এলিয়ে দিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পরল। সে এত পরিশ্রান্ত হ'য়েছিল যে এই নির্জন স্থানে কোন বিপদ হ'লে কী দিয়ে যে আত্মরক্ষা করবে সে ভাবনাটুকুও তার মনে হয়নি; ঘুমোবার আগে শুধু মনে হ'য়েছিল "কেন বেদুইনদের ছেড়ে এলাম, ওদের যাযাবর জীবন এমন কি মন্দ ছিল, এখানে ত আমার বাঁচবার কোন আশাই নেই"।

পরদিন সকালে গ্র্যানাইট পাথরের ওপর সূর্যের তীব্র আলো পড়ে অত্যন্ত গরম হ'য়ে ওঠে, সেই গরম স্পর্শে সৈনিকের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাড়াতাড়ি উঠে বসল, সে বিশাল মরুভূমির ওপর দৃষ্টি পড়তেই আবার গভীর নিরাশায় ভ'রে উঠল তার মন, যতদূর চোখ যায় শুধু দেখা যায় ধূ ধূ বালুকারাশি, এ যেন আদি-অন্তহীন মরুসমুদ্র, তার চারিদিকে শুধু বালুকারাশি ছড়িয়ে আছে, সূর্যের তীব্র আলো তার ওপর প্রতিফলিত হ'য়ে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বাতাস এসে বালুর ওপর ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, সৈনিকের মাঝে মাঝে সমুদ্র ব'লে ভুল হয়, বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের উত্তাপ প্রখর হ'তে থাকে, আগুনের হলকার মত উত্তপ্ত বায়ু সারা মরুভূমিতে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে, সারা মরুভূমি অস্বাভাবিক ভাবে নীরব, আকাশে একটুও মেঘ নাই। এই অস্বাভাবিক নীরব পরিবেশে সৈনিকের নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসে, বহুদূর দিকচক্রবালের অস্পষ্ট সূক্ষ্ম রেখা সে দেখতে পায়, হঠাৎ সৈনিক পরম বন্ধুর মত একটী খেজুর গাছকে গভীর ভাবে আলিঙ্গন করে, এই মৃত্যুপুরীতে গাছটির সঙ্গই যেন তার কাছে একান্ত কাম্য, তারপর সেই গ্র্যানাইট পাথরের ওপর বসে সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, এই নীরবতাকে ভঙ্গ করবার জন্য সে অনেকক্ষণ ধ'রে জোরে জোরে চেঁচিয়ে কাঁদল, তার এই কান্নার প্রতিধ্বনিটুকুও সে শুনতে পায় না, প্রতিধ্বনি হয় শুধু তার মনে, সৈনিকের বয়স তখন মাত্র বাইশ। সে তার বন্দুকটিতে গুলি ভ'রে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়, মরুসমুদ্র ও নীল আকাশ যেখানে মিশেছে সেই দিকে চেয়ে হঠাৎ তার দেশের কথা মনে পড়ে যায়, সে যেখানে থাকত সেখানকার নোংরা নর্দমার পচা গন্ধটুকুও তার নাকে যেন অনুভব করতে লাগলো, পরিচিত বন্ধু বান্ধব এমন কি জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাগুলোও উজ্জ্বল হ'য়ে চোখের সামনে ভাসতে লাগলো, আত্মহত্যা আর করা হ'ল না।

তারপর ভবিষ্যতের নানা বিপদের চিন্তা মাথায় ভীড় করতে লাগলো। অনেকক্ষণ সে গভীরভাবে চিন্তা করলো, তারপর সেই উঁচু জায়গা থেকে নামলে, হঠাৎ সে নীচে গুহা আবিষ্কার ক'রে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠল, গুহার মধ্যে মাদুরের ছিন্নাংশ দেখে সে অবাক হ'য়ে যায়, হয়তো কোন কালে তার মত কোন হতভাগ্য এখানে ছিল, আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা খেজুর গাছ দেখতে পায়, থোকা থোকা খেজুর ওতে ছিল, গভীর নিরাশার অন্ধকারে সে একটু আশার আলো দেখতে পায়, শুধু তার মনে হ'ল এখন যদি কোন মানুষের শব্দ শুনতে পায় তবে মোটেই আশ্চর্য হবে না। দূর থেকে কামানের

আওয়াজ শোনাও বিচিত্র নয়। সে যেন তার হারানো শক্তি আবার ফিরে পায়, দ্রুত পদক্ষেপে সেই উঁচু জায়গায় সে উঠে যায় ও সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে একটা গাছ ছোরা দিয়ে কাটতে থাকে, সারা দিন ধরে সে শুধু গাছ কাটতে লাগলো, আজ তার সামান্য ক্লান্তিবোধও হ'ল না, সূর্য যখন অস্ত যায় তখন সবকে গাছটি ভেঙ্গে পড়ে, নির্জন মরুভূমিতে সেই শব্দ বড় অদ্ভুত লাগে সৈনিকের কাছে, মরুর স্তব্ধতা যেন এক অজানা বাথায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে, ভাঙ্গা গাছটা টেনে এনে গুহার সামনে রাখে, তারপর পাতাগুলো দিয়ে ছেড়া মাদুরটা বুনে ফেলে, সারাদিনের পরিশ্রমে সে এত আহত হ'য়ে পড়েছিল যে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে গুহার ভেতর গাঢ় ঘুমে অচেতন হ'য়ে যায়।

গভীর রাত্রে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজে সৈনিকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে উঠে বসল, রাত্রির নীরবতার মধ্যে সে গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল, এ যেন ঠিক মানুষের নিঃশ্বাস নয়, গভীর আতঙ্কে তার সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, রক্ত তার জমে বরফ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়, গুহার ভেতর আলো আলোচায়ার সে ছোট্ট দুটো হলদে আলো দেখতে পেল, প্রথমে ভাবল এ বোধ হয় তার চোখের ভুল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এ ভুল নয়, তার থেকে মাত্র দুহাত দূরে আবার সেই আলো দুটো দেখতে পেল, কিছুক্ষণ বাদে গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে সে দেখতে পেল একটা বিরাট্‌কায় জন্তু তার কাছে শুয়ে আছে, এটা কি সিংহ? না অন্য কিছু, অশিক্ষিত সৈনিক প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না, আতঙ্ক আর বীভৎস কল্পনায় সে প্রায় মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়ল, প্রাণীটির নিঃশ্বাসের একটা তীব্র দুর্গন্ধ তার গুহাটাকে ভরে তুলল, অস্তগামী চাঁদের আলো গুহাতে পড়তেই সে স্পষ্ট দেখতে পেল একটা বিরাট চিতাবাঘ আপন মনে তার সামনে ঘুমিয়ে আছে। চাঁদের আলোতে বাঘের দেহের ডোরাগুলো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বিশাল মরুভূমির হিংস্র চিতাবাঘ তার সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে মুহূর্তের জন্য চিতা একবার চোখ মেলে চেয়ে আবার সৈনিকের দিকে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ে। সৈনিকের তখন কোন বিষয়ে চিন্তা করবার সামর্থটুকুও নেই, প্রথমে ভাবল বাঘটাকে গুলী করবে, কিন্তু তার ও বাঘের মধ্যে ব্যবধান এত কম যে বন্দুক তুলে গুলী করা সম্ভব নয়, কিন্তু বাঘটা যদি জেগে ওঠে? আবার সে কিছুক্ষণ নিশ্চল হ'য়ে বসে রইল, তার বুকের মধ্যে ধুক্ ধুক্ শব্দ গুহার নীরবতার যেন প্রকট হ'য়ে উঠতে লাগলো, তার ভয় হ'তে লাগলো পাছে এই শব্দেই বাঘের ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাঘের মাথাটা কেটে ফেলবার জন্য সে ছুরির ওপর হাত রাখল। কিন্তু ভাবনা হ'ল যদি এক কোপে মাথা না কাটে? সামান্য অসাবধান হ'লে মৃত্যু নিশ্চিত, তাই সে ঠিক করল ভোর না হওয়া পর্যন্ত এখানে এই ভাবেই থাকবে, ধীরে ধীরে দিনের আলো ফুটে উঠল, এবার ভাল করে বাঘটিকে দেখবার সুযোগ সে পেল। বাঘের মুখের দুদিকে রক্তের দাগ লেগে আছে, সৈনিক ভাবল "বাঘটা বোধ হয় পেট ভরে খেয়েছে, ঘুম ভাঙ্গলে ওর খিদে নাও পেতে পারে", ভাল ক'রে দেখে বুঝল এটা বাঘিনী, বাঘ নয়, ভেলভেটের মত মসৃণ হলদে চামড়ার ওপর কালো ডোরা কাটা, বাঘিনী তখনও নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমুচ্ছে, বাঘিনীর রাজকীয় দেহ সৌষ্ঠব দেখে কিছুক্ষণের জন্য সে মুগ্ধ হ'ল, সাপের তীক্ষ্ণ চক্ষু যে ভাবে ছোট্ট বুলবুলকে আকর্ষণ করে তেমনি যেন একটা আকর্ষণও বাঘিনীর প্রতি অনুভব করতে লাগল, তার মনে হ'ল দুদিন আগে বেদুঈনরা আমাকে মেরেও ফেলতে পারতো, এখানেও আমার বাঁচবার কোনও উপায় নেই, তবে মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব, মরীয়া হ'য়ে শুধু একবার দেখবো যে বাঘিনীকে আমি বশে আনতে পারি কিনা। তারপরে একমনে চুপচাপ বসে বাঘিনীর ঘুম ভাঙ্গার প্রতীক্ষা করতে লাগল। বেলা বাড়বার সঙ্গে সূর্যের আলো যখন তীব্র হ'য়ে উঠল তখন বাঘিনীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তারপর হাত পা ছড়িয়ে শরীরের আরামোড়া ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড একটা হাই তুললো, তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি ও লাল টকটকে কর্কশ জিহ্বা সৈনিক দেখতে পেল। বাঘিনীর এই ভঙ্গীটী তার চোখে বড় ভাল লাগলো, আপন মনে বলে "চমৎকার! ও ঠিক যেন একটী সুন্দরী মেয়ের মত দেখতে", বাঘিনী

তার ঠোঁটের দুপাশের রক্তগুলো জিভ্ দিয়ে চাটতে আরম্ভ করে, তারপর খুব সুন্দর ভঙ্গীতে তার মাথা ধোয়াতে লাগলো, সৈনিকের মনে ধীরে ধীরে একটু সাহসের সঞ্চার হয়, তারপর আস্তে আস্তে ছোরাখানা তুলে নেয়। বাঘিনীকে লক্ষ্য ক'রে বলে "সুপ্রভাত সুন্দরী"

সৈনিকের এই কথা শুনেই বাঘিনী তার দিকে ফিরে তাকায়, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে, বাঘিনীর উজ্জ্বল বর্ণ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখে তার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হয়, বাঘিনীর চোখের দিকে সেও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বাঘিনী প্রায় তার গা ঘেঁসে দাঁড়াল, সে তখন সাহস ক'রে বাঘিনীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো, আরামে বাঘিনীর চোখ বন্ধ হ'য়ে আসতে লাগলো, মধুর আবেশে তার গলা দিয়ে গম্ভীর আওয়াজ বের হ'তে লাগলো, বেড়ালের মত সৈনিকের পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে; যখন সে বুঝল যে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য বাঘিনী তার হিংসা ভুলেছে তখন বাইরে যাবার জন্য সে উঠে দাঁড়াল, বাঘিনী তাকে কোন বাধা দিল না, বাইরে গিয়ে সেই উঁচু জায়গায় উঠে দেখলো বাঘিনী বেরিয়ে এসে যেন আনন্দে নাচতে নাচতে তার দিকে এগিয়ে আসছে, তীব্র সূর্যালোকে তার মসৃণ চামড়া চক্‌চক্ ক'রে ওঠে, কাছে এসে তার পায়ে আরাম করে মুখ ঘষতে আরম্ভ ক'রে, তারপর মরুর নীরবতা ভঙ্গ করে ভীষণ গর্জন ক'রে ওঠে, তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সৈনিক বলে "সত্যি, কী সুন্দর রে তুই !"

ঠিক শিশুর মতই সে বাঘিনীর সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করে, নখ দিয়ে তার মাথা চুলকে দিতে থাকে, তারপর সাহস করে ছোরা দিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথার নরম জায়গা খুঁজতে লাগলো, কিন্তু মাথার হাড় অত্যন্ত শক্ত, ছোরার আঘাত করা সম্ভব নয়, গলায় আঘাত করলেই বোধ হয় ভাল হবে, তারপর যেমনি ছোরা তুলে মারতে যাবে অমনি বাঘিনী প্রচণ্ড শব্দ ক'রে লাফ দিয়ে নীচে পড়ে যায়, সৈনিক অত্যন্ত আতঙ্কিত হ'য়ে ভাবে এবার আর রক্ষে নেই, বাঘিনী নিশ্চয় তাকে হত্যা করবে, কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখলো বাঘিনীর চোখে প্রতিহিংসার চিহ্ন মাত্র নেই, আবার সে সৈনিকের কাছে এসে বসে, সৈনিক তখন গাছের নীচে বসে খেজুর খেতে আরম্ভ করে, খাওয়ার পর একটি একটি করে খেজুরের বীচিগুলো দূরে ফেলে দেয়। বীচিগুলো যেখানে পড়ে গভীর সন্দেহের চোখে বাঘিনী সেই জায়গাগুলো দেখে, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী পর্যবেক্ষণ করে, হঠাৎ তার মনে হ'ল 'যখন এর খিদে পাবে তখন' মনের দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পাবার জন্য সে ধীরে ধীরে পায়চারী করতে আরম্ভ করল, বাঘিনী তাকে ঠিক ছায়ার মতই অনুসরণ করতে থাকে। মুহূর্তের চোখের আড়াল ক'রে বাঘিনী যেন তাকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, কিছু দূরে গিয়ে সৈনিক ঘোড়াটার মৃতদেহ দেখতে পেল, অর্ধেকেরও বেশী কে যেন খেয়ে ফেলেছে, সে তখন বুঝতে পারল কেন বাঘিনী তাকে আক্রমণ না ক'রে অত আরাম ক'রে রাত্রে ঘুমিয়েছিল, ধীরে ধীরে তার মন থেকে নিরাশার অন্ধকার যেন কেটে যেতে থাকে, লোকালয় থেকে বহু দূরে এই নির্জন মরুতে বাঘিনীকে নিয়ে সংসার করার অদ্ভুত কল্পনা তার মাথায় আসে, তার মনে হ'তে লাগলো বাঘিনী হয়তো তার কোন ক্ষতি করবে না, আবার মরুর বুকে তেমনি রাত্রি নামে, সৈনিক গুহার সামনে দাঁড়িয়ে বলে 'আয় সুন্দরী তোকে ঘুম পাড়িয়ে দেই' বার কয়েক গর্জন ক'রে বাঘিনী তার কাছে ছুটে আসে, পায়ের কাছে শুয়ে মাথা ঘষতে আরম্ভ করে। সৈনিক আবার তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে সুরু করে, কখনও গলা জড়িয়ে ধরে, কখনও বা কান টেনে আদর করে, এই ভাবে বাঘিনী ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ে, মানুষের করস্পর্শে মরুভূমির বাঘিনী নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোয়। গভীর রাতে চাঁদের আলোয় মরুভূমি হ'য়ে ওঠে রহস্যঘন। সৈনিক তখন পলায়নের সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ বাদে অতি সাবধানে নিদ্রিত বাঘিনীকে চুমু খেয়ে বলে "এবার তবে চলিরে সুন্দরী, তুই আরাম করে ঘুমো।"

তারপর গুহা থেকে বেরিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করল, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা একবারও তার মনে হ'ল না, কিন্তু মাইল খানেক যাওয়ার পর সে বাঘিনীর তীব্র গর্জন শুনতে পেল, তবুও সে চলতে লাগল। হঠাৎ চোরাবালির মধ্যে পড়ে ক্রমেই সে তলিয়ে যেতে লাগলো। মরুভূমির অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা জানে এই চোরাবালি কত বিপজ্জনক, চোরাবালিতে পড়ে কেউ কখনও বাঁচে নি। সে তখন মৃত্যু নিশ্চিত জেনে তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠল, এমন সময় বাঘিনী দৌড়ে এসে তার সার্টের কলার খুব জোরে কামড়ে ধরল, তারপর আস্তে আস্তে পেছু হঠতে লাগলো; সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে তাকে চোরাবালি থেকে টেনে তুলল, কৃতজ্ঞতায় সৈনিকের চোখ বাষ্পাকুল হ'য়ে ওঠে। বাঘিনীকে জড়িয়ে ধ'রে বলে "আগের জন্মে তুই আমার কেউ ছিলি রে সুন্দরী?" আদর করতে করতে বলে "তুই আমার প্রেমে পড়েছিস নাকি রে?"

এমনি করে দিন কাটে, মরুর নিঃসঙ্গতা যেন সৈনিকের কাছে আর ক্লান্তিকর মনে হয় না। মানুষ ও বাঘিনীর বন্ধুত্ব ক্রমে নিবিড় হ'তে নিবিড়তর হয়। বাঘিনীর সহজাত হিংসা রূপান্তরিত হয় ভালোবাসায়। মনের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি কথাও যেন সে বাঘিনীর কাছে অকপটে বলে, তবুও সৈনিক মুক্তির জন্য মাঝে মাঝে উন্মাদের মত হয়ে যায়। এখান থেকে পালিয়ে লোকালয়ের জনতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায়, কিন্তু সে যেতে পারবে কি? কী যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে নিজেকে বাঘিনীর সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে গুহার ভেতর বাঘিনী নেই, একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে সৈনিক। তাড়াতাড়ি সেই উঁচু জায়গায় উঠে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকে 'সুন্দরী', তার এই উদ্বাস্ত আহ্বান ক্রমে অস্পষ্ট হতে থাকে, তারপর ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে যায়, বহু দূরে বাঘিনীকে দৌড়ে আসতে দেখা যায়, বাঘিনীর দেহ ক্রমে স্পষ্ট হ'তে থাকে, তারপর সৈনিকের পায়ের কাছে এসে বসে, আদর করে বাঘিনীর মাথা কোলে তুলে নেবার সময় মুখে রক্তের দাগ দেখতে পেল, ভীষণ রেগে তার কান টেনে গালেতে চড় মেরে বলে "নিশ্চয় তুই কাউকে খেয়ে এসেছিস। তোকে কতদিন মানা করেছি না" অনুশোচনায় বাঘিনীর চোখ দুটো ছলছল ক'রে ওঠে। সৈনিকের মনেও আঘাত লাগে, পরম আগ্রহে বাঘিনীর মাথা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে "তোর যত ইচ্ছে বেহুঈন ধরে খাস, কিন্তু দেখিস ভুলেও আমাকে কখনও খাস নি"

দিনের পর দিন কেটে যায়, সত্য মানুষ আর মরুভূমির এই বাঘিনীর এই বিচিত্র সৌহার্দ ক্রমেই ঘনিষ্টতর হ'তে থাকে, মানুষের অজানা মরুভূমির মহান সৌন্দর্য বিচিত্র অনুভূতিতে ভরে দেয় সৈনিকের মন, মরুর আদি অন্তহীন বালুকারাশির সঙ্গে যেন অচ্ছেদ্যবন্ধনে সে জড়িয়ে পড়েছে, কত রূপেই সে মরুভূমিকে দেখল, মরু যেন সৌন্দর্যরাশি উজার ক'রে তুলে ধরেছে সৈনিকের চোখের সামনে, উন্মুক্ত করে দিয়েছে রহস্যের রুদ্ধদ্বার, নিস্তব্ধ দুপুরে যখন কোন যাযাবর পাখী পাখার শব্দ ক'রে মাথার ওপর দিয়ে চ'লে যায় তখন এক অদ্ভুত নেশায় সে যেন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, দূর চক্রবালে সে যেন ভিন্ন জগতের এক অপূর্ব সঙ্গীত শুনতে পায়, তবুও মাঝে মাঝে এক অজানা দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে ওঠে তার মন। এই অপূর্ব সৌন্দর্য যেন সে স্বার্থপরের মত একা ভোগ করতে চায় না, তার প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে এই রহস্যময়ী মরুভূমি দেখাতে চায়, তার মনের ব্যথা মনেই গুমরে গুমরে কাঁদে, গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতে পায় মরুর এক প্রান্তে উঠেছে চাঁদ, চাঁদের আলোয় মরু যেন অপূর্ব সাজে সেজেছে। কী রহস্যঘন তার রূপ; মৃত্যুপুরীতে যেন এক ক্লান্তিময়ী অভিশপ্ত রাজকন্যা নিবিড় ঘুমে অচেতন হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে 'সিমুম' মরুর বুকে ছোট ছোট ঢেউয়ের সৃষ্টি করে, ঢেউগুলো এগিয়ে যেতে থাকে, শেষে দূর দিগন্তে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, হঠাৎ এক নাম না জানা আতঙ্কে সৈনিক শিউরে ওঠে, মনে হয় যেন এক অপূর্ব সুন্দরী রাক্ষসী তাকে গ্রাস করতে চায়। শেষ রাত্রে চাঁদ অস্ত যায়। মরুর আর এক বিচিত্র রূপ সে দেখে, অনির্বচনীয় এক অনুভূতিতে আপ্লুত হ'য়ে যায়

তার মন, মাঝে মাঝে মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করতে চায়, চীৎকার ক'রে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। তাই শুধু অবাক্ত ব্যথায় অভিশপ্ত সৈনিক বোবাকান্না কাঁদে, বাঘিনী এখন আর তার কাছে সামান্য পশু নয়, মরুর বুকে সেই তার একমাত্র সহচরী, বাঘিনীর কিছুই অপরিচিত নয় তার কাছে, ওর প্রতিটি ভঙ্গী ও চাউনি দেখে সে তার মনের ভাব পরিষ্কার বুঝতে পারে, বাঘিনী কোনদিন অশান্ত হ'লে সৈনিকের ধমকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। একদিন দুপুরে সৈনিক বাঘিনীর পিঠে মাথা রেখে বিশ্রাম করছিল এমন সময় এক অচেনা আওয়াজে সে চমকে ওঠে, তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে একটী বিরাট পাখী সেই উঁচু জায়গায় বসে আছে, এর আগে এ রকম পাখী আর কখনো দেখা যায়নি, সে অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলো, বাঘিনীও গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তার পা চেটে দিতে লাগলো, ভালো ক'রে পাখীটা দেখবার জন্য সে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল, বাঘিনীও সেখানে গিয়ে তার পা চাটতে লাগলো। বিরক্ত হ'য়ে সৈনিক পা দিয়ে বাঘিনীর মুখ সরিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে যায়। হঠাৎ বাঘিনীর বিকট গর্জনে সে চমকে ওঠে, সেই সঙ্গে পাখীটাও সশব্দে উড়ে গেল, বাঘিনীর এ রকম গর্জন এর আগে সে কখনো শোনেনি, পেছন ফিরে দেখতে পায় ক্রোধে ফুলে উঠেছে তার শরীর, চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে, বাঘিনীর ভেতর আজ সুপ্ত নারীত্ব জেগেছে, ঈর্ষাপরায়না হ'য়ে উঠেছে সে, মরুসম্রাজ্ঞী যেন প্রত্যাখানের অপমানের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে, তারপর আবার গর্জন ক'রে এগিয়ে এসে তার উরুতে কামড়ে ধরে, সৈনিক তখন আর কোন উপায় না দেখে ছোরা আমূল বসিয়ে দেয় বাঘিনীর গলায়। বিকট চীৎকার ক'রে বাঘিনী নীচে লাফ দিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ তীব্র যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে দিতে হঠাৎ মারা যায়। বাঘিনীর চীৎকারে মৃত্যুর মত মরুর স্তব্ধতা চৌচির হ'য়ে ভেঙ্গে পড়ে।

অধীর আগ্রহে মিসেস্ সিনহা আমার গল্প শুনছিলেন, তারপর বল্লেন "এত ঘনিষ্টতার পরেও বাঘিনীর মনে অবিশ্বাস এলো কী করে?"

আমি বল্লাম "দুজনে দুজনকেই ভুল বুঝেছিল, সেই জন্যই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে" মিসেস্ সিনহা আবার জিজ্ঞেস করেন 'সব শেষে কী হল?' উত্তর দিলুম "একথা আমিও তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সৈনিক তখন বল্লে আমার কোন ব্যবহারে বাঘিনী যে মনে আঘাত পেয়েছিল তা আজও বুঝতে পারি নি, আমাকে যখন ও আক্রমণ করেছিল তখন আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে ওকে খুন করি, কিন্তু মরবার সময় যে ভাবে করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল তখন আমার ভুল বুঝতে পেরেছিলাম, আমাকে ও বোধ হয় মেরে ফেলতে চায়নি, অনুশোচনায় আমি অস্থির হ'য়ে পড়লাম, শুধু মনে হচ্ছিল সুন্দরীকে বাঁচাবার জন্য সব কিছু আমি ত্যাগ করতে পারি, মরুভূমিতে আমার তখনকার অবস্থা নিশ্চয় কল্পনা করতে পারেন। ওখান থেকে পালিয়ে আসার জন্য আমি পাগলের মত হ'য়ে উঠেছিলাম, এমন কি আমার গায়ের শার্ট ছিড়ে সেই উঁচু জায়গায় গাছের ওপর নিশানের মত ক'রে বেধে রেখেছিলাম, হয়তো দূর থেকে কেউ কোনদিন এটা দেখে আমাকে উদ্ধার করতে পারে। দিন কয়েক বাদে আমার সঙ্গীরা যখন আমাকে খুঁজে পেল তখন বাঘিনীর মৃত দেহের ওপর পড়ে শিশুর মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম, তারপর পৃথিবীর কত দেশ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু মরুভূমির মত এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও দেখিনি, সত্যি কী অপূর্ব সুন্দর, কী মহান!

আবার প্রশ্ন করি 'সেখানে আপনার কেমন লাগত?' সৈনিক উত্তর দিল 'মনের সব কথা গুছিয়ে বলার মত শক্তি আমার নেই, তবে এটুকু বলতে পারি যতদিন বাঁচব ততদিন আমার সুন্দরী, আমার খেজুর গাছ, আমার মরুভূমিকে কখনও ভুলতে পারবো না, সারা জীবন আমার মনে ওরা উজ্জ্বল হ'য়ে আঁকা থাকবে।*

* একটি ফরাসী গল্পের ভাব অবলম্বনে

স্বপ্ন ও সাধনা।

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

"গগনে গগনে নব নব দোল কবি
নবপ্রাতে জাগে নতুন জনম লভি।"

শ্রাবণের এমনিতর এক বর্ষামুখর দিনে বাঙলার, বিশ্বের রবি অস্তাচলে পাড়ি দিলেন ঢেউ সমুদ্রের পর-পারে। যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসভায় বাঙলাকে বসিয়েছিলেন সম্মানের সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে মৃত্যুর এই অনুশাসনে সত্যিই কি তিনি অনুশাসিত? ইহা তো জীবনের ক্ষণ বিরতি। স্রষ্টা, দ্রষ্টা, কবীর কি কখনও মৃত্যু হয়? বৃহতের সাধনার মধ্যেই যে জীবন দানা বেঁধে ওঠে—গতিশীল প্রাণসমুদ্রের দোলায় দোলায় যার গতিপ্রবাহ—জন্মমৃত্যুর বন্ধনীতে তা' আবদ্ধ থাকতে পারে না। জীবন দর্শনের মধ্যেই অমরতা। শুধু কাব্যের মধ্যে নয়, রাজনীতির মধ্য দিয়েও তাঁর জীবন গড়ে উঠেছিল। তাই সকল অন্যায় ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে তিনি নানাভাবে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। কত শত ক্ষেত্রে প্রতিবাদে তাঁর কণ্ঠকে ধ্বনি তুলেছেন। তিনি সাগ্রহে "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন। কারাগারে আটক বন্দীদের ওপর যখন British Power গুলি চালায়, তা'র সংবাদ যখনই তিনি পেলেন, তখনই প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়েছে—

"আমি যে দেখেছি কপটহিংসা
গোপন রাত্রি ছায়ে।
হেনেছে নিঃসহায়ে।"

জাপানী কবি "নগুচি" মিস্ র‍্যাথবোনের কাছে চিঠি, পয়লা বোশেখের বাণী—রাজনৈতিক ভারতের অতি পরম পাওয়া। এই পাওয়াই জাগরণের গতিপথে এনেছে নবজীবনের জয়গান। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বলেছেন—

"হে বিজয়ী বীর নব জীবনের প্রাতে
নবীন দিনের খড়্গ তোমার হাতে
কাটো সুকঠোর হাতে
তোমারি হউক জয়।
বন্ধন হোক্ ক্ষয়।"

আজ তাঁকে নশ্বরদেহে আমরা আর সাক্ষাৎ করতে পারছি না। কিন্তু সকলের অন্তরে অন্তরে অবিনশ্বররূপে তিনি জীবন মৃত্যুর ভেদ করে অমৃতধারার দানে আমাদের অন্তর দীনতায় শূন্যকে কূলে কূলে ভরে তুলেছেন। সাধারণ মানুষ অমরত্বকে সহজে ধারণা করতে পারে না। কবিগুরু যে নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে নেই এই সত্যকে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সহজ নয়। তাই তাঁর অমরত্বের স্পর্শ লাভের জন্য আমাদের সাধনা করতে হয়। তাঁর অসীমতার মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্রতা সীমা হারিয়ে ফেলে তাকে নীবিড়তর ভাবে উপলব্ধি করতে চায়। তাই তিনি লিখেছেন—

"বিচ্ছেদেরই ছন্দে লয়ে
জীবন ওঠে নবীন হয়ে
আলো, আঁধারের তীরে
হারাই, পাই ফিরে ফিরে।"

অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন বারে বারে নবীন হয়ে ওঠে, এ শুধু আধ্যাত্মিক রহস্য নয়, শুধু কাব্য কথা নয়, শুধু ভাববিলাস নয়, এ সত্যকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাকে করে তুলতে হবে সুপরিস্ফুট। কবিগুরু বলেছেন—"কিন্তু কীর্ত্তি মহাপুরুষের নিজের, পূজোটা তো আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাবো, কিছু দেবোনা, সে তো হতেই পারে না।" রবীন্দ্রনাথ মূর্তিরূপে নয়, কীর্তিরূপে অমর হ'য়ে রয়েছেন। আমাদের ক্ষুদ্রতা সীমার মধ্যে ধরা দিয়েছেন স্বেচ্ছায়। কিন্তু তাঁর আদর্শকে আমাদের জীবনে সার্থক করে তোলবার জীবন্ত সাধনার দ্বারা সেই অমরত্বকে আমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ। তাঁর বলিষ্ঠ আদর্শকে স্মরণ করে আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ অমর হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্র প্রয়াণের ষষ্ঠ বার্ষিকীর কয়েকদিন পরেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো। কিন্তু এই লাভের আসন্ন সম্ভাবনা দেশবাসীর অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগিয়ে

তুলছে বলে মনে হচ্ছে না। এতদিন যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখলাম, তা' আজ ধূলিসাৎ হয়েছে। ভারত বিভক্ত হয়েছে। ভারত বিভাগের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির স্বরূপ বাঙলা ও পাঞ্জাবকেও বিভক্ত না করে চলে নি। বিভক্ত ভারতের উভয় অংশের মধ্যে কিরূপ সম্পর্ক দাঁড়াবে তা' অনিশ্চিত। আমরা সত্যিই স্বাধীনতা পাচ্ছি কি না সে সন্দেহও যে বহু লোকের মনে জাগেনি তাও নয়। এতদিন স্বাধীন ভারতের মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষুধার্ত মনে যে রঙিন আশা-ছবি সৃষ্টি করেছে কল্পনায়। স্বাধীন ভারতের ছবি হতে যে সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্যের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে আমরা দেখছি, তা' কি সত্যি সুখের পূর্ণ প্রতীক হবে? তবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "শুধু কাব্য কথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না।" যদি আমরা দেশবাসীকে অন্নবস্ত্রের কষ্ট হতে মুক্ত করতে না পারি, যদি তাদের মুখে শান্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে না পারি, তা' হলে রবীন্দ্রনাথের সাধনা আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে কি করে? কবিরূপে যেমন বিশ্বকবি, তেমনি তাঁর জাতীয়তা বোধও সমগ্র বিশ্বকে আলিংগন করেই পূর্ণতা লাভ করেছে। আজ স্বাধীন ভারতের পূর্বদ্বারে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মহাজাতির আদর্শকেই একান্তভাবে আমাদের মহাপন্থা বলে ধরে নেওয়া উচিত। যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি, রবীন্দ্রনাথের মহাজাতি আদর্শই তাকে সার্থক করে তুলতে সমর্থ। এতোদিন পরাধীনতার অজুহাত তুলে যাদের নীচে ফেলে রেখেছি স্বাধীনতা লাভের পরেও যদি তাদের নীচেই ফেলে রাখি, তাহলে এ স্বাধীনতা আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন শতকণ্ঠে "আমার ভারতবর্ষ, শুধু ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়।" ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই সত্য যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে আবার অখণ্ড ভারত গড়ার আশা আমাদের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতা লাভ করবে। মহাজাতি সদনের উদ্বোধন প্রসংগে কবি গুরু বলেছেন—"বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবা, আত্ম নিবেদন, আর আপন আপন বিচিত্র রূপে। অতীতের মহৎ স্মৃতি ও ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হউক।" আমরা যদি বলিষ্ঠ সাধনা দ্বারা তাঁর আদর্শকে সার্থক করে তুলতে পারি, তাহলেই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে আমরা গর্ব করতে পারবো। এই বলিষ্ঠ সাধনার দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের স্বাধীনতার যাত্রাপথ ধ্বনিত, কম্পিত হয়ে উঠুক। তাহলে জনসেবার আড়ম্বরের মধ্যে আমাদের আর অকৃতার্থ হতে হবে না। আমরা এক মহাজাতি হয়ে গড়ে উঠবো; সত্যিই তা' হলে সার্থক হয়ে উঠবে—রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও সাধনা!!

শরৎ সাহিত্যের মণি-দীপিকা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৪)

ওঁদের সংসারে শরৎচন্দ্রের মা-ই ছিলেন লক্ষ্মী-স্বরূপা। বাবা উদয় বাউড়ে, চেহারাও তেমনি কোরে রাখ্‌তেন। সংসারের কোন খোঁজ খবর নেই। বাইরে একটা ছেঁড়া চেটাই-এ বোসে—"মিষ্ট্রেস অব দে কোর্ট অব জনডিস পোড়ে" বশগুল হোয়ে আছেন। কত ধানে কত চাল, তাও জানেন না। তাড়া দিলে স্নান কোরে একমুঠো খেয়ে মিনিট পনর কুড়ি শুয়ে আবার গিয়ে বোস্‌লেন সেই বই নিয়ে।

বোধ হয় এমনি কোরেই বছর খানেক, কি বড় জোর দু'বছর দেবানন্দপুরে কেটে ছিল। অবশেষে বাড়ী-ঘর বিক্রমপুরে তোলে শরতের মা চোখে অন্ধকার দেখলেন।

ভাগলপুরে থাকতে শরৎচন্দ্র ক্লাশে ফার্ষ্ট হোতেন, ডবল প্রমোশন পেতেন। হুগলীতে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে ছিলেন। এমন ব্যাপার দাঁড়ালো সেখানেও থাকা আর সেল না।

তখনকার অবস্থা তিনি লিখে রেখে গেছেন দত্তার পোড়ায়। তার ফের বদল অনেক কিছু থাকলেও মোটের মাথায় সত্যি।

এই সময় তিনি পালিয়ে পুরী গিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। কখনও যাত্রা দলে ঢোকেন, কখনও দোকানে পেট ভাতায় দোকানের চাকরীতে ভর্ত্তি হন।

অবশেষে সহ-যাত্রী জুটলো একটি বিধবা মেয়ে। কিছুদিন পরে তাকেও ডাকাতে নিয়ে গেল।

'চরিত্র-হীনে'র 'সাবিত্রী' সেটি! তার মোটামুটি পরিচয় চরিত্রহীনে আছে। পরিশেষে একা গিয়ে উঠেন কে-পি-বোসের বাড়ী। সেই কে-পি-বোস—যাঁর 'এলজেবরা' আছে। তিনি খোঁজ খবর নিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন বাংলা দেশে।

* * *

একথা সেদিন বিশ্বাস হোল, যেদিন এর মত একটি গল্প শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র বোলেছিলেন শরৎচন্দ্রের শবদাহের সময় কেওড়াতলার ঘাটে বোসে।

৺গনেশচন্দ্র চন্দ্র আসছেন পশ্চিম থেকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে। সকালে একটি ছেলে নোংরা জামা কাপড়, খালি পা—গাড়ী ছাড়ার সংগে সংগে, কাঠবেড়ালির মতো কুড়ুক কোরে গাড়িতে উঠে পোড়লো। বোধ হয় মনে কোরেছিল সেটা খালি গাড়ি। ঢুকে পোড়ে বেঞ্চীর তলায় ঘুমিয়ে পোড়লে ধরে কে? গনেশবাবু গাড়ীর ষ্টেশনের অন্যদিকে সন্তবত ছিলেন।

ছেলেটি পোড়ে গেল তাঁর জেরায়। পরিচয় নিতে নিতে বার হোল যে বৌবাজারের ৺অক্ষয় গাঙ্গুলীর বাসায় উদ্দেশে, অবশ্য বিনা টিকিটে সে চোলেছে।

৺অক্ষয় গাঙ্গুলী বর্ত্তমানের বিখ্যাত বিপিন গাঙ্গুলীর বাবা ছিলেন। গনেশ বাবুর সংগে পরিচয় ছিল।

হাওড়া থেকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে খাইয়ে দাইয়ে ৪নং দুর্গাচরণ পিপুড়ির গলিতে পাঠিয়ে দিলেন। ইনিই শরৎচন্দ্র।

ইং—১৮৮৯ থেকে ১৮৯২-এর মাঝা-মাঝি পর্যন্ত শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে ছিলেন। ইং—১৮৮৭ সালে তাঁরা দিহিরিতে ছিলেন। অতএব দেবানন্দপুরে একাদিক্রমে প্রায় চার বৎসর ছিলেন।

এ কথা বলার প্রয়োজন এই যে, শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে কিম্বা হুগলিতে তাঁর মাসীর বাড়ীতে যে কোন কারণেই হোক মনের সুখে থাকতে পারছিলেন না এবং ইং—১৮৯৩ সালের গোড়াতেই তাঁরা ভাগলপুরে চোলে আসতে বাধ্য হোয়েছিলেন।

ভাগলপুরে এসেও তাঁরা স্বাধীনভাবে সংসারে থাকতে পারেন নি। মামা কিম্বা দাদা মশাইদের বিনা সাহায্যে তাঁদের ভরণ-পোষণের কোন উপায় ছিল না। মতিলাল সেই বিষয়ে বহুল পরিমাণে অক্ষমই ছিলেন। শ্রীকান্ত বইখানিতে শ্রীকান্তের ছবিটি কি অনেক পরিমাণে এই-ই নয়?

রাজলক্ষ্মীর অর্থে শ্রীকান্ত নড়ে-চড়ে, উঠে-বসে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায় না?

শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্র নিজে নন্। জ্ঞাতসারে হোক্, অজ্ঞাতসারে হোক তিনি তাঁর পিতা মতিলালের ছবিখানি ফুটিয়ে তুলছিলেন।

* * *

যে ছবি আমরা অন্নদা দিদির সংসার চালানয় দেখ্‌তে পাই—প্রকৃত পক্ষে এখানেও তারই অনেকটা—তফাৎ শুধু সংস্করণের।

শরৎচন্দ্রের মার মৃত্যু হয় ইং ১৮৯৬ সালে। তাঁর মার মৃত্যুর পর আর মামার বাড়ীতে থাকা কেন যে সম্ভবপর হয় নি—তা অনুমান করা শক্ত নয়। মামার বাড়ীর ওপর সব দাবি-দাওয়া তো ছিল শরৎচন্দ্রের মার। সেই যোগ ছিন্ন হওয়ার পর ওদের শ্বশুরপুরে যে সংসার শুরু হোল তা তো বেদের সংসার।

এইখানে একটা খুব বড় প্রশ্ন ওঠে। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবী তাঁর মার মৃত্যুর সময় ভাগলপুরে এসেছিলেন। তাঁদের একটি বোন হওয়ার পরই তাঁর মার মৃত্যু হয়।

এবার দেখা যাক্ সেই সংসারের সমস্যা কি কি হোল বা দাঁড়ালো। ছেলের মধ্যে তিন জন শরৎচন্দ্র, প্রভাসচন্দ্র, প্রকাশচন্দ্র। শরতের বয়স কুড়ি, প্রভাসের বয়স ন-বছর; প্রকাশের পাঁচ ছয়। সে সময় পাচক ব্রাহ্মণ এবং ঝি-চাকর মোটেই দুষ্প্রাপ্য ছিল না। টাকার দিকের সমস্যা—মতিলাল এবং শরৎচন্দ্র দুজনে চাকরি কোরছিলেন। তাদের দুজনের মিলিয়ে আয় ষাট তো নিশ্চয় ছিল। যে বাড়ীতে মোরে গেলেন তার ভাড়া পাঁচ টাকার বেশী কিছুতেই হোতে পারে না। তখন ভাগলপুর খুব সস্তা-গণ্ডার দেশ ছিল। অতএব সমস্যা টাকার দিক থেকে হয় নি। হোয়েছিল একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে।

এখন অনিলা দেবীর কথা বলি:—তাঁর পুত্র-সন্তান হয় নি। মেয়ে দু'তিনটি বোধ হয় হোয়েছিল। সংসারের তিনি বড়-বৌ ছিলেন। তাঁর একটা মস্ত বড় গুণ ছিল যে, তিনি ছেলে-মেয়ে মানুষ কোরতে ভালো বাসতেন। জমিদার ঘরের বড়-বৌ—পাড়ার কর্ত্রী বটেন। তিনি যদি বোনটিকে নিয়ে যেতেন সঙ্গে কোরে—তো মতিলালের সংসারের সকল সমস্যা দূর হোয়ে যেতো। তা না হওয়ার জন্যে তাঁদের সংসারের দুঃখ কষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না।

ছোট মেয়েটির জন্যে একটি দুধুনি-ঝি রাখতে হোল। আর কিছু বোল্‌তে চাই নে।

* *

শরৎচন্দ্র যে, বোলে বেড়াতেন যে পয়সার অভাবে তাঁর লেখাপড়া হয় নি সেটা লজ্জা-নিবারণের একটা গা-ঢাকা কথা। ওটা আসল কথা নয়। খুব গরীবের ছেলেও পাতা জ্বালিয়ে মার চাকরির পোড়া রুটি শুড় খেয়েও শাস্ত্রী হোয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এই নতুন বাড়ীতে এসে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ

হয় নি। শশীবাবু উকিলের লাইব্রেরির কোন বই পোড়তে বাকি রইল না। আর অতি কাছে ভট্ট-বাড়ীতে তাঁর আদর আহ্বানের শেষ ছিল না। ভাগ্য তাঁর ভবিষ্যতের পথ তৈরী কোরছিল। দরাজ আড্ডা দেওয়ার যায়গাও ছিল অন্নদপুর ক্লাব। সেখানে তামাক, চরস, চণ্ডু থেকে আরম্ভ কোরে—নেশার আদি অন্ত ছিল না।

এইখানেই তাঁর প্রেমের হাতে-খড়ি হয়। অবশ্য পুরী পালান মধ্যেও সে রহস্য যে কিছু কিছু ছিল না তা বলা যায় না; কিন্তু তার মধ্যে আকর্ষণের চেয়ে, বিকর্ষণই কার্যকরী হোয়ে গেল। সে কথার আলোচনা আসুবে চরিত্র-হীনের প্রসঙ্গে। তথা-কথিত সাবিত্রীর কথাও সেখানে আর অবান্তর হবে না।

সাহিত্যের বহুতর খোরাক আছে কিন্তু প্রেমই বোধ হয় তার মেরুদণ্ড। সর্বত্রই তো দেখি তাই। তার মধ্যে একটা অসাধ্য-সাধনও থাকে। অনতিক্রমনীয় বাধাও থাকে। মদনকে পুড়িয়ে শিব-পার্বতীর মিলন হোল। তপস্যা ছিল দুজনেরই।

• • •

এক বয়সে ছেলেতে ছেলেতে নিবিড়-গভীর প্রেম হয়। সেটা হৃদয়ের আদি-কর্ষণ। তা' শরৎচন্দ্রের হোয়েছিল দুজনের সংগে। একজনের কথা তিনি সাহিত্যে নানারূপে অমর কোরে রেখে গেছেন কিন্তু আর একজন সম্বন্ধে মূক হোয়ে রইলেন। সাহিত্যে তার কোথাও প্রকাশ কি অভিব্যক্তি হয় নি। ময়দার ময়ান বেশী কমে যেমন খাবার জিনিষের তারতম্য হয়, মনের, চিত্তের ময়ান তো দেখি প্রেমে! রুটিতে ময়ান থাকে কিন্তু ভাজার সময় ঘি না দেওয়ার তার রূপ হয় অন্য। আবার নোগলাই পরোটার পরতে পরতে ঘি থাকাতে তার রূপ-সৌরভ অন্য। আবার খাজার ময়ান অনেক,—তার ওপর মধুর রসে তা মনে কোরলেই পেটুকের জিভ সরস করে।

শরৎচন্দ্র বেচারি বাইরের সহকারিতা না পেয়ে না হোলেন খাজা-গজা—না হোলেন রুটি পরোটা—হোয়ে গেলেন অন্তরদাহে পাউরুটি! এঁর সাহিত্যের মধ্যে বিলিতি আমদানি আছে—সেই প্রেমের প্রবাহের পয়ো-নালী না থাকাতে—তা জীব জন্তুর দিকে ধাবিত হোল—যেমন তাঁর 'ভেলি' কুকুর—আর দেশ-প্রেম পরিণত হোল গিয়ে "পথের দাবীতে।" সেখানে মেয়েদের বিদায় কোরলেন বিয়ে দিয়ে। তাদের যুদ্ধ বিগ্রহে আহ্বান কোরে আনলে প্রকৃতি দেবী ক্ষিপ্ত হন। মেয়েরা যদি পুরুষ হোয়ে যায় তো মানুষের স্রোত প্রবাহ যে বন্ধ হয়। জাপান এটি চমৎকার কোরে হৃদয়ঙ্গম কোরে-ছিল। আমাদের দেশেও তার অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু আজকাল সে ধারা বোদলে গেছে। তাঁরা বাইরে স্বাধীন হোচ্ছেন। কিন্তু বুঝিনে, কোনটা বড়—অন্তর না বাহির?

মাতৃমূর্তি এক আর রণচণ্ডী আর এক! সিংহের পিঠে দশহস্তা—অসুরের বুকে বর্ষা মারছেন! দেখ্‌লে মনের অবস্থা হয় হ্যান্ড কাপ হাতে পুলিশ দেখার মতো।

পুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি চোষবে—তার কাজ সব হবে বীরত্ব ব্যঞ্জক। সে সংসার আহব থেকে ফিরে মাথা রাখবে মায়ের কোলে জায়ার কোলে—সেখানেই তার বাগান বাড়ী, বিশ্রামের জায়গা। সেখানে তার ছেলে মেয়েরা আদরে যত্নে মানুষ হোচ্ছে। মেয়েরা বুদ্ধিধর, আর্টের পরিকল্পনায় হবেন সরস্বতী আর সেবার স্নিগ্ধতায় হবেন মা-লক্ষ্মী।

দেবদাসের পার্বতী বুড়ো বরের ঘরে—তৃতীয় কি চতুর্থ পক্ষের গিন্নী হোয়ে—প্রথম পক্ষের ছেলেকে ডেকে যখন কোলে বসালে তখন কি পাঠকের বুকে একটা আনন্দের ঢেউয়ের ধাক্কায় চিত্ত বিকচ হয় না? আর কমলের তত্ত্ববাদে পাঠকের কাণ ঝালাপালা হয় না? কলাগাছে কাঁদি ঝুল্‌লে চমৎকার দেখায়—আর মাধবী লতায় যদি সে কাঁদি ঝোলে তো হয় না কি অসহ্য পীড়া? গনেশ বাবাজীর শুঁড়িটি চমৎকার নাদুস নুদুস্—ওঁর মুখটি সর্বগ্রাসী হাতীর মুখ!—কথায় আছে হিসেবের কড়ি শিপড়েয় খায় না। আজকাল হাতীমুখো ব্যবসাদারেরা সর্বগ্রাস কোরে শুঁড়ি লতিয়ে বোসেছে। এদিকে দেশে হা অন্ন, হা অন্ন!

বিলেত এক রত্তি দেশ—ওদের মাটি নেই ওরা ব্যবসা না কোরে করে কি? সেকালে ছিল ওদেশের লোকেরা জল-দস্যু। তারই নামান্তর ব্যবসাদার। মাটি নেই করে কি? পেট তো চালাতে হবে?—আর আমাদের দেশ—সেকালে অর্ধেক পৃথিবী জুড়ে ছিল। তখন শস্য ছিল, বস্ত্র ছিল—সিল্ক ছিল। আর আজ? টাকা, টাকা, টাকা! সব হোল ব্যবসাদার—কাজেই অন্ন আসচে বিদেশ থেকে। ময়দায় মিশচে হামখড়ি—ঘিয়ে তেলে—খনিজ তেল! পাড়াগাঁ হোয়ে গেল জঙ্গল। সে গরু নেই; গুঁড়ো দুধ আসচে বিদেশ থেকে। আর ছেলেরা বি-এ পাশ কোরে M-A. হোয়ে কোরছেন কেরাণীগিরী! ইংরেজদের পাল্লায় আমাদের বুদ্ধিও উঠছে শিশি বোতলে দ্রাবক দ্রব্যে রূপান্তরিত হোয়ে!

• • •

সাহিত্য নতুন আদর্শ দেয়, ইঙ্গিতে কথা কয়। স্বাধীনতার খোলা বাতাসে সেই ইঙ্গিত আসুক যাতে আমরা আবার মানুষ হোতে পারি।

বঙ্কিমের আনন্দ-মঠ তো এই স্বাধীনতার আগমনী গানের গীতা, উপনিষদ। যে জাতি বান দিয়ে মোরলো তারা আজও হোচ্ছে নিষ্পেষিত। এর পর আসবে শূদ্র যুগ—বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যৎ-বাণী সত্যি হোতে চোলেছে। যতই মার এবং কড়া কড়া নিয়ম কানুন কর—যে কথা সত্যি তা হবেই হবে।

শরৎ সাহিত্যের মধ্যে সমুদ্রের মতো দুটি স্রোত আছে। উপরের স্রোতের উল্টো গতিতে নিচের স্রোত বয়। মেয়েদের মান ইজ্জৎ মর্যাদার স্রোত বইচে ওপর দিয়ে। ভেতরে—মানে তলা দিয়ে নিছক দেশ-প্রেম।

দেশের মায়েরা তৈরি না হোলে সে দেশ কিছুতেই বাঁচতে, বড় হোতে পারে না।

পথের দাবীর মেয়েরা শেষ পর্যন্ত উদ্বাহ ব্যাপারে মেতে গেল। এই নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুর মহা তর্ক বিতর্ক হয়। শরৎ উত্তরে একটি ভারি বড় কথাই বোলেছিলেন। আদর্শ বর্তমানের ওপর সেই আদর্শের লোভ উঠবে তো? আমরা বর্তমানে যে কত দুর্বল তাও তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে; আমার বই রুশের নকল নয়। আমি দেশকে তৈরী না কোরে আদর্শের ধ্বজা উড়িয়ে বাহবা পেতে চাইনি কোন দিন। আগে ভীত পাকা হোক। আমার চন্দ্রমুখী, আমার সাবিত্রী কি গল্পের মধ্যে দিয়ে দেশের অন্তর স্পর্শ করে নি, কি কোরবে না?

বন্ধুটি হার স্বীকার কোরলেন শেষ পর্যন্ত।

• • •

শরৎ সাহিত্যের ঠিক সমজদার এখনও দেশে গোড়ে উঠেনি। যাঁরা শিক্ষকের আসন জুড়ে বোসে বিদেশী পদোন্নতির ভারবাহী হোয়ে বুলি কপচাচ্ছেন তাঁরা সত্যিই শরৎ সাহিত্যের গভীরতা উপলব্ধি কোরতে পেরেছেন? তাঁরা তর্ক কোরতে জানেন।

শুনতে পাই ইংরেজরা ভারি বুদ্ধিমান। কিসে তারা বুদ্ধিমান হোল তা তো বুঝি নে। তারা রাজ্য শাসন নীতির মধ্যে দিয়ে রোমের কাছে শেখা "ডিভাইড এণ্ড রুল" শিখেচে। তাতে আজ টিকলো না দেখি! গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের কাছে মাথা নত হোল না! মুসলমানদের রাজত্ব নীতির তলায় যে কতবড় গলদ আছে তা তারা বুঝে উঠতে পারেনি। সেইটেই চালিয়ে দিয়ে জমিদারিটা ভাল কোরে বহাল কোরে দিয়ে গিয়েছিল।

আজ সেই জমিদারী নীতি তো অচল হোয়েছে। কারণ শিবের কাছে মৃত্যুঞ্জয় বাণ পেয়ে সেটা যদি শিবের জিম্মায় দিতো তো—হনুমানের লাঙ্গুলে স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙ্গে তা রামের হাতে কোন দিনই পৌঁছত না।

মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় বোকামি হচ্ছে নিজেকে সেয়ানা মনে করা।

হরিদাস বাবুকে শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে যে চিঠিখানি শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে লিখেছিলেন তাতে লেখার সম্বন্ধে একটি দামী কথা লিখেছিলেন: লেখার সংযম, অর্থাৎ কি না-লিখে লেখাকে চিত্তাকর্ষক করা যায়—তা অনেকেই জানে না।

আমাদের একটা প্রবাদ কথা আছে সেটি ভারি সত্যি: "যা বলে পরকে তাই আসে ঘরকে।" তাঁর

এক বিষয়ে খুব হুসিয়ারি ছিল। নিজের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সবসময়ই সজাগ থাকতেন। অন্য লোকের ধরার আগেই তিনি সামলে যেতে পারতেন। এবিষয়ে চতুর বুদ্ধি তাঁর থেকেসেরাদের চেয়ে বোধ করি বেশী ছিল।

বাড়ীর একটা ভারি কড়া নিয়ম ছিল। বয়সে বড় মাত্রেই তাঁরা নিজেদের হাই-কোর্ট মনে কোরতেন। মানে ছোটদের তথাকথিক অন্যায়ের বিচারের আগেই শাস্তি হোয়ে যেতো!

আগেই বোলেছি শরতের ঠাকুরদাদা বিনা বিচারেই অপঘাতে মারা যান। এই কথা শোনা মাত্র শরতের কোমল মন একেবারে শুধু ইস্পাৎ হয়নি—বিপ্লবী হোয়ে গিয়েছিল। নিষেধমাত্রকে ডিংগিয়ে যাওয়ার সংকল্প তার তক্ত তুলে কথা বোবে থাকতই ঐ মানুষটি মধ্যে!

একটি ছোট ব্যাপার বোললে বিষয়টা স্বচ্ছ হবে:—গোপাল ঘরের পাশে একটা তুঁত আর একটি পেয়ারা গাছ ছিল ভাগলপুরের বাড়ীতে। শরৎকে তাঁর দাদামশাই-এর চিনে নিতে একতিলও বিলম্ব হয়নি।

তিনি মুশাইকে ডাকলেন। মুশাই বাড়ীর পুরোনো চাকর—এটুকু বোললে বলাই হয় না। ছোটদের পক্ষে মুশাই ছিল কমিশনার অব পুলিশ থেকে শুরু কোরে—নীল কোর্তা পরা চৌকিদার পর্যন্ত। ইতিহাসে তো অন্ধকূপ উড়ে গেছে? কিন্তু ঐ গাঙ্গুলী বাড়ীতে যে সেটা তখন জ্যান্ত ছিল—তা প্রমাণ কোরতে তিল তুলসী গঙ্গা জল হাতে নিয়ে শপথ কোরতে তারা তিল মাত্র ইতস্তত কোরবে না যারা আজও বেঁচে আছে। পান থেকে চুণ খোসেছে কি মুশাই পুরে দিলে সেই অন্ধকূপে। তার বিচার নেই, তার আপিল নেই, তার হাইকোর্ট নেই!

একজন ছিলেন তিনি সেরা ভালো মানুষ। শরতের দিদিমা, কাজেই আমাদের জ্যেঠিমা—দূর-নিকটের বিচার ওবাড়িতে ছিল না। ওসব দেব-দেবতাদের বানানো কথা। তাঁর কানে গেছে মুশাই এর কীর্তি কথা—তো হোয়ে গেলেন দশপ্রহরণধারিনী—এরোপ্লেন না থাকলে কি হয়—উড়েই যেন আসতেন—বোলতেন খুলে দে নৈলে মাথা মুড়ো খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হোয়ে মোরিবো।

খটাং কোরে খেকল খুলে গেল! উঃ! সেই খটাং এর মধ্যে বিশ্বের সুর ব্রহ্ম বানা বেঁধে যেন বিছরির কুঁদো হোয়ে আছে! আঃ বোলে অপরাধী মুক্তির হাওয়ায় উড়ে গেল! সেই বয়সেই ও-বাড়ীর ছেলেরা স্বাধীনতার আস্বাদ চাক্‌তে পেতো!

গোয়াল ঘরের গোবর আর চোনার সেঁতানিতে পেয়ারা গাছে কি ফুলই না ধোরলো! দেখ্‌তে দেখ্‌তে—"ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ—তখন প্রকাশ পায় ফল।"

বড়কর্তা গলির দোর দিয়ে খড়ম পায়ে খুট্ খুট্ কোরে যেতে যেতে দেখ্‌লেন পেয়ারা ভাগর হোয়েছে।

বাইরে গিয়ে মুশাই এর ডাক পোড়লো;—জি হুজুর...

দেখো, বড়ী মাইজিসে একঠো টুটা কাপড়া মাংলে কর—কুল সপড়ি আম বান্ দেও: নেইতো শরতা খা জায়েগা।

পেয়ারারা বোরখানসিন্ হোল। শরতের পোয়া বারো তেরো!

একদিন পেয়ারা পেড়ে আনা হুকুম হোল। বোরখার মধ্যে থেকে কবে তারা যে শরতের পেটে গেছে সে খবর কে রাখে?

মুশাই লুকিয়ে রইল। শেষে রিপোর্ট কোরতে বাধ্য হোল:—

"পাখী উড়ে গেছে সাগরের পার—শূন্যময় নীড় পোড়ে আছে তার।"

বোলাও শরতা কো।

শরতা সাগর পার!

* * *

রবীন্দ্রনাথ লিখ্‌ছেন:—বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয়ে প্রথম ভাগে গোপাল নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ মায়ে যা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোন কোন অংশে রাখালের

সংগেই তাঁহার সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বলিতেন।, শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, 'না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব।' যেদিন বলিতেন যে, 'আজ স্নান করিব না'; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না।" ইত্যাদি।

এইবার রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটুকু না দিলে পাঠকদের "আধ কপালে" হোতে পারে।

"নিরীহ বাংলা দেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী-লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাবে জাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ হইলে বাঙ্গালী ছেলেগুলি পাস করিয়া ভাল চাকরি বাকরি ও বিবাহ কালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই; কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করেছিলেন।"

শরৎচন্দ্র ভাল মানুষ সেজে প্রায়ই বোলতেন যে, তাঁরা একান্ত গরীব ছিলেন বোলে তাঁর লেখা পড়া হয়নি। সত্যিই কি তাই? তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস কোরে কলেজে ভর্তি হোয়ে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস পর্যন্ত পোড়েছিলেন। পরীক্ষা দেওয়া হোল না সত্যি-ই কি পয়সার অভাবে?

না তা নয়। তাঁর 'চরিত্রহীনে', সাবিত্রী যখন প্রশ্ন কোরছে—তুমি লেখা পড়া আর কোরলে না কেন? উত্তরে সতীশ বলেছে: মাষ্টারদের চক্রান্তে আমার পরীক্ষা দেওয়া হোয়ে উঠ্‌লো না।

যতই কেন সত্যকে আমরা চাপা দিতে চাই—ফাঁক পেলে তা, মাথা বার কোরে—আসল কথাটি প্রকাশ কোরে দেয়।

আসল কথাটি কি? সত্য যা তা শুনলে শরৎচন্দ্রের অন্ধ ভক্তের দল নিশ্চয় রাগ কোরবেন, বোলবেন ওটা না বোল্‌লেই কি চোল্‌তো না? ইতি 'গজ কোরে' পাশ কাটিয়ে গেলেই চোল্‌তো না?

না চলে না—অন্ততঃ সত্যপ্রিয়লোকেরা তা কোরতে সাহস করে না।

একটা খুব বড়—যাকে সমস্ত পৃথিবীর লোক মহাত্মা বোল্‌চে—তাঁর কথা বলি।

পাঠক দয়া কোরে মহাত্মাজীর আত্মজীবন চরিতের সেইখানটা পোড়ে দেখবেন। তাঁর পিতার মৃত্যু হচ্চে, আর পাশের ঘরে তিনি কি কোরছেন—তা বোল্‌তে তিনি একটুও ইতস্তত করেননি তো!

বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে, তা বোধ হয় অনেকেই জানেন। তাঁকে যদি কেউ বোল্‌তো—অমুক আপনার নিন্দে কোরেছিল—তা শুনে তিনি মাথা চুল্‌কে বোল্‌তেন কৈ! আমি তো তার কন উপকার করিনি, তবে নিন্দে কেন করে!

শরৎচন্দ্রের পিতা যে বাড়ীতে থেকে মানুষ হোলেন, প্রবেশিকা পাশ কোরে পাটনা কলেজে পোড়তে গেলেন: তিনি হোলেন নন্দ ঘোষ, তো নেই দোষ! পরের মুখের ঝাল খেয়ে যাঁরা জীবনী লিখ্‌তে ছোটেন—কোন খোঁজ খবর না নিয়ে—তাঁদের অপরাধ অমার্জনীয়! শরৎচন্দ্র অর্থের অভাবে পরীক্ষা দিতে পারেন নি—একথা সর্বৈব মিথ্যা! তবে আসল কথা কি? তাই বলা দরকার হোয়েছে।

আগের দিনে কলেজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে টেষ্ট পরীক্ষা হওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ইং ১৮৯৬ সালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্ভবতঃ অনুজ্ঞা অনুসারে উহা জারি কোরতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হোয়েছিলেন।

অন্যত্র তো বাবারা ছেলেদের পোড়তে বোল্লে তাদের রাগ হয়। তেমনি কলেজের একদল ছেলে টেষ্ট হবে শুনে গেলো রেগে। তাদের চাঁই হোলেন শরৎচন্দ্র! অনেক আন্দোলন কোরতে যখন পরীক্ষা বন্ধ হোলো না তখন শরৎচন্দ্র বন্ধু কুন্তো কোনর বেঁধে লেগে ছোষ্টেলের ঘরে বোসে—স্লিপে উত্তর লিখে পড়তে লাগ্‌লেন।

• •

অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে লড়াই-এ হবে জীব হত্যা। গান্ধীজীর মতে সেটি "শিব-হত্যা।" ওটা বোধহয় মানুষের আদিম বর্বরতার রেশ। সত্যাগ্রহ হিংসা বাদ-দিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া আর কি? তখন যদি দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সমস্ত ছাত্ররা একযোগে পরীক্ষা না দিতো তাহলে কলেজের কর্তৃপক্ষ সম্ভবত বাধ্য হোতেন একটা রফা কোরতে। দেখা যায় সেইখানে ছাত্রদের মধ্যে একতার অভাব ঘোটে ছিল। তাই বা হয় কেন?

সবাই একরকম কোরে চিন্তা না করা—যার নামে আদর্শের ভেদ। একদল ছেলের মনে ছিল কর্তৃপক্ষ যা কোরছেন তা তাদের ভালোর জন্যে। তাই তখন তাকে মেনে নেওয়াই তারা প্রকৃষ্ট পথ মনে কোরছিল। অপর পক্ষ মনে কোরলে: যা এতদিন চোলে এসেছে তা আজ কেন বদলাবে? এর মধ্যে ছিল কর্মতৎপরতার অভাব অর্থাৎ আলস্য। আলস্য স্মরণ-শক্তির প্রতীক। দেখতে পাওয়া যায় মানুষের মধ্যে দুটো শক্তি জন্ম থেকে কাজ করে। একটা জীবনী শক্তি, আপরটা মরণ শক্তি। দুটো মরণ-শক্তির জয় ছাড়া আর কি?

আমরা দেখে আসছি শরৎচন্দ্র স্বভাবতই ছিলেন 'বিপ্লবী'—বিপ্লব তখনই সমাজের বন্ধু যখন লক্ষ-ভ্রষ্ট না হোয়ে প্রগতির সহায় হয়।

শরৎচন্দ্র পরে বুঝেছিলেন এই আন্দোলনে তাঁর ভুল হোয়েছিল। তা না হোলে—উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে—দিয়ে পাশ কাটিয়ে বোলতেন কেন যে, টাকার অভাবে লেখাপড়া হয় নি! অনেক ভালো ছেলে জল-পানির পর জলপানি নিয়ে অভাবকে লংঘন কোরে গেছেন, এও তো দেখা যায়।

সতীশ জীবনে একবার এই সত্যের স্বীকার কোরেছে—তার সাবিত্রীর কাছে—যার সংগে সে একাত্মা। মুখে শরৎচন্দ্র যাই বলুন না কেন, বাবার দোষে, কি মামাদের স্বার্থপরতায় তাঁর লেখা-পড়া হয়নি, কিন্তু বিবেকের কাছে তিনি জানতেন যার যাই দোষ থাক্—ও বিষয়ে তিনি নিজেই ছিলেন সবচেয়ে বড় অপরাধী!

• • •

তাঁর একজন আত্মীয়—যখন তাঁর অবস্থা খুব স্বচ্ছল—তখন একটি গরীবের ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন এই বোলে যে, ছেলেটি 'প্রতিভার', শুধু টাকার অভাবে সে আর এগুতে পারছেনা। তুমি জীবনে এ বিষয়ে খুব ভুক্ত-ভুগী—দরদী। একে কি কলেজে ভর্তি কোরতে পার না? ছেলেটি বাংলা দেশের—বেহার থেকে খুব ভালো কোরে পাশ কোরেও 'বেহারী'—নয় বোলে জলপানি পায়নি। শরৎ তার সহায়তা কোরেছিলেন বটে; কিন্তু নিখুঁত ভাবে নয়। মাসে টাকা দেওয়ার সময় তাঁকে অনেক গজ্-গজ্ বক্-বক্ কোরতে শোনা যেতো।

"নিজের বেলায় আঁটি-শাটি—পরের বেলায় দাঁতকপাটি"

আমাদের একটা খুব বড় ভুল হয় বিচারে। কাউকে যখন বড় করি—তখন তাকে আকাশে তুলি। তাকে রাজ সিংহাসনে বসাই। আবার,—আমাদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগে,—তখন তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নরকে পাঠাতেও দেরি হয় না।

এ কথাই বোলতে চাই যে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে খুব বড় হোয়েছিলেন বোলেই যে মানুষ হিসেবে সবদোষ বর্জিত হোয়েছিলেন—একথা যাঁরা মনে করেন তাঁদের কাছে—সবিনয় নিবেদন যে দয়া কোরে বিচারে ভুল কোরবেন না।

•

মানুষ আমরা!—এক-একটি সংগতি অসংগতির পুঁটলি আমরা! সেদিন একবন্ধু একটি মেয়েকে লক্ষ কোরে বোললেন:—"শি ইজ্ এ বন্ডল অভ কন্‌ট্র্যাডিকশন।"

বাংলা আমাদের মাতৃ-ভাষা। কিন্তু কিছু জোর দিয়ে বোলতে হোলে আমরা ইংরিজিতে বোলে মনে করি জগৎকে তাক্ লাগিয়ে দিলাম। এওকি একটা কন্‌ট্রাডিকশন নয়? পরকে বিচার কোরতে গেলে সহস্র চক্ষু হই। নিজের দিকে কাণা কি ছানি-পড়া চোখটি ফিরিয়ে রাখি—নিজেকে ক্ষমা করিনে; কৃপা করি!

সাহিত্য আমাদের ভালো লাগে;—কেন? সাহিত্য জীবন-দর্শন বোলে। আমাদের দেশে ইতিহাস ছিল না। তার বদলে ছিল পুরাণ। নয়কি পুরাণগুলো ইতিহাসের দর্শন?

জীবন একটা পরীক্ষা! প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা চোলেছে। বিবেক আছে বিচারকের মতো—ভুল হোয়েছে কি বিবেক জজ সাহেবের মত মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে "না! না!"

লোকে কি মনে কোরবে বোলে—আমরা মিথ্যার জাল বুনি মাকড়সার মতো! এ পথে শত্রু এলে আত্মরক্ষার জন্যে ও পথ দিয়ে পালাই!

• •

সাহিত্য জীবন-দর্শন বোলে ওটি মনকে খোরাক জোগায়! সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে আমরা শিখি, আমরা বাঁচতে পারি! তাই কালের প্রবাহে সব ভেসে গেলেও সাহিত্য মহাকালের কুলিতে থেকে যায়। তাই, সেক্সপিয়ার অমর, তাই কালীদাস অমর—তাই আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ রোয়েছেন জল জ্যান্ত হোয়ে আজও।

মানুষ তো কাদা-মাটির পুতুল! সব বন্ধ হোলে কি হয় আগুনে গেল নয় জলে গেল নয়তো মাটির গহ্বরে গেল।

মানুষের সত্যি বিচার তার কীর্তির মধ্যে। স্রষ্টার বিচার তাঁর সৃষ্টি, সাহিত্যের মধ্যে। সে কথা মনে রাখতে হবে।

আকাঙ্খা

শ্রীজয়ন্তী দেবী

আমি যদি হতাম প্রদীপ ভাতি
গভীর রাতে অন্ধকারে
জ্বালিয়ে দিতাম সাহস করে
আলোক যত—ঘুচিয়ে দিয়ে রাতি।
তপ্ত দিনের বিবস্বানের মত
জ্যোতি যদি রইত তবে
জানিয়ে দিতাম গভীর রবে
অন্যায় যা—করতো মাথা নত।

ফুলের মত শুভ্র হ'তাম যদি
বিলিয়ে নিতাম সবার তরে
গিরির মত হ'তাম উন্নত।
পায়ের তলে মরণ নাচে
দুঃখ সুখ রইত পাছে
হৃদয় গলি' করত স্নেহ যত।
দাওনা প্রভু; অমর পরশ তব!
পরশমণি! পরশ দিয়ে
উজল হয়ে উঠুক হিয়ে।
ঘুচিয়ে কাল' জীবন হ'লুক নব।

অগ্নিবেশ ও আয়ুর্বেদ

ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ এম-বি

চরক সংহিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে প্রাচীন ঋষিরা ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন, এবং তিনি তাঁহার কাছে হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞানাত্মক ত্রিসূত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যান্য ঋষিরা ভরদ্বাজের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করেন। ঋষি অত্রির পুত্র আত্রেয় পুনর্বসু ভরদ্বাজের নিকট হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক তাঁহার ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কয়জন আদি প্রবর্তক ছিলেন, তাঁহাদের আত্রেয় পুনর্বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গ্রন্থের নাম আত্রেয় সংহিতা; এবং পরবর্তী কালের বহু চিকিৎসক ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। "He is one of the oldest authorities on Hindu medicine, and several later writers have based their works on his treatise." তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অগ্নিবেশের নামই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, একদিকে তিনি যেমন সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন, তেমনি আবার সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ চিকিৎসকও ছিলেন, সেইজন্য তিনিই প্রথম অগ্নিবেশ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "History of Indian Medicine" গ্রন্থে সত্যিই লিখিয়াছেন, "He was the most intelligent amongst the disciples of Atreya Punarbasu. He was of sharp intellect, and his work was declared to be best of all the books composed by the pupils af Atreya."

অত্রির পুত্র বলিয়া অগ্নিবেশকে ধরা হইয়া থাকে। ভরদ্বাজ তাঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করিয়া ছিলেন; তিনি আবার তাহা দ্রোণাচার্যকে প্রদান করিয়াছিলেন। অগ্নিবেশ 'হুতাশ' নামেও পরিচিত ছিলেন; 'নিদানে' মাধবাকার উক্ত নামেই তাঁহাকে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

অগ্নিবেশ 'অগ্নিবেশ তন্ত্র' নামক একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাই পরে 'চরক সংহিতা'য় পরিণত হয়। চরক সংহিতার অনেক অধ্যায়ের লিখন প্রণালী পাঠে ইহা বুঝা যায় যে বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসক একত্র সম্মিলিত হইয়া নানা রোগের বিষয় ও আয়ুর্বেদের নানা সমস্যা পরস্পর আলোচনা করিয়া প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন, এবং পরিশেষে আত্রেয় পুনর্বসু যেন সভাপতি রূপে সেই সব মতের সামঞ্জস্য করিয়া সমাধান করিতেন। হিরণ্যাক্ষেণী বড়িশ, সাংকৃত্যায়ণ, শরলোম কাশ্য, কাংকায়ন কুমারশিরা, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি, বামক, বার্ষোবিদ শৌনক, মৈত্রেয়, পৈল, শাকুন্তেয় প্রভৃতি ভিষকাচার্যেরা পুনর্বসু আত্রেয়ের সমসাময়িক ছিলেন। তাই ইঁহাদের প্রভাব অনেকটা আসিয়া পড়ায় চরক সংহিতাখানি যেন কোনও ভিষক্ সমিতির বক্তৃতাগুলির সারসংকলন বলিয়া মনে হয়। যে সকল স্থানে মতদ্বৈধ ছিল না সে সকল স্থানে আত্রেয় যেন নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিবেশ লিখিত তন্ত্র চরক পুনরায় প্রতিসংস্কার করিয়া চরক-সংহিতা নামকরণ করিয়াছিলেন। এই অগ্নিবেশ সংহিতা একাদশ শতাব্দীতে চক্রপাণির সময় পর্যন্তও পাওয়া যাইত।

প্রমাণ অভাবে অগ্নিবেশের কাল নির্ণয় আজ সুকঠিন। ভাগবতের 'অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা' পাঠে জানা যায় যে অগ্নিবেশ ভাগবতের পূর্ববর্তী; কেন না "Vagbhata distinctly mentions Agnivesa to be one of his sources." বিজয় রক্ষিতের (১২৪০ খৃঃ অব্দ) শিষ্য শ্রীকান্তদত্ত তাঁহার 'বাক্য-কুসুমাবলী' নামক গ্রন্থে অগ্নিবেশ তন্ত্রের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। শ্রীকান্ত দত্তের সময় কাল ১২৮৮ খৃঃ অব্দ পাওয়া যাইতেছে। ভাবমিশ্রও তাঁহার গ্রন্থে অগ্নিবেশের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ চক্রপাণি-দত্তের সময়ে অর্থাৎ ১০৬০ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

আজ আর 'অগ্নিবেশ-তন্ত্র' গ্রন্থখানি পাওয়া যায় না ; চরক-সংহিতায় রূপান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার দেহাবসান বহু পূর্বেই ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া অগ্নিবেশ চোখের চিকিৎসা যাহাতে প্রচারিত হয়, তাহার জন্য আরও দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ দুইটির নাম :—(১) অঞ্জন নিদান ও (২) নিদান-স্থান। আজ চোখের চিকিৎসার নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীও বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু অগ্নিবেশের চিকিৎসা প্রণালীও যথেষ্ট বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ধারিত ; শুধু মাত্র আমাদের অজ্ঞতার দরুণ আজ আর ইহার কোন পরিচয় রাখি না।

উপরিউক্ত তিনটি চিকিৎসা গ্রন্থ ছাড়া অগ্নিবেশ দুইটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের নাম :—(১) রামায়ণ-রহস্য, ও (২) রামায়ণ শত শ্লোক।

অগ্নিবেশ তন্ত্র এখন আর না পাওয়ায় চরক-সংহিতাই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া পড়িয়াছে। চরক-সংহিতা পাঠে দেখা যায় যে বাহ্লীক দেশীয় ভিষকরা আত্রেয় পুনর্বসুর ভিষক পরিষদে সমবেত হইতেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে আত্রেয় পুনর্বসু যেখানে বাস করিতেন, বা তাঁহার সমধর্মী চিকিৎসকেরা যেখানে বাস করিতেন তাহা বাহ্লীক দেশের নিকটবর্তী স্থান ; সুতরাং এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে তক্ষশিলার নিকটবর্তী কোনও স্থানে তাঁহাদের এই চিকিৎসা পরিষদের অধিবেশন হইত। প্রাচীন কালে কাশী ও তক্ষশীলা বিদ্যার প্রধান কেন্দ্র ছিল। অগ্নিবেশের আবাস স্থল সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারা গেলেও অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে তিনি তক্ষশিলার কাছাকাছি কোনও স্থানেই বাস করিতেন।

আয়ুর্বেদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অগ্নিবেশের নাম চিরকাল অক্ষয় হইয়া থাকিবে। আত্রেয় পুনর্বসুর সুযোগ্য শিষ্যের অকৃত্রিম নিষ্ঠার ফলেই পরবর্তী কালে চরকের মত মনীষীরা তাঁহাদের পথ ও পাথেয় খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কম কৃতিত্বের কথা নয়।

পঙ্কজ

শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

আজিকার এ দুঃসহ পঙ্কময় পরিবেশ হ'তে
চলো, সবে ফুটে উঠি মুক্তিরাঙা উষর আলোতে
প্রভাত সূর্যের পানে মুখ তুলি' পঙ্কজের মত,
ওগো মোর বন্ধুদল ! গ্লানির আঁধার অপগত।
কলঙ্কিত দেশে মোরা স্বর্গচ্যুত দেবশিশু দল
নামিয়া আসিনু যবে পঙ্কলিপ্ত হোলো পদতল।
এ যুগ-সঞ্চিত পাপ আমাদের শোণিত ধারায়
মিশে গেলো, বহি চলি' পিতৃপিতামহদের দায়।
ছন্দহীন বন্ধহীন জীবনেরে মেনে নিয়ে আর
পারিব না ফিরাইতে সুন্দরেরে করি অস্বীকার।
শ্বাস নিতে ব্যথা পাই,—অবরুদ্ধ কক্ষ ক্ষুদ্রতার
ভেঙে ফেলো, খুলে দাও নবীন যুগের স্বর্ণদ্বার।
এ যুগে আঁধার আছে, আছে বিধা ভীরুতা সংশয়,
তারি মাঝে ঐ শোনো অভিযাত্রী-কণ্ঠে বরাভয়
দুর্বল সন্দিগ্ধচিত্ত জেগে উঠি' মোহসুপ্তি হ'তে
জাগ্রত জনতা সাথে পথ চলে উষার আলোতে।
আমরা সম্মুখে রাখি' রচি' যাবো নব ইতিহাস,
যুগেরে শোধন করি' সৃষ্টি করি' নূতন আশ্বাস।
আমরা অজাতশত্রু নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ নির্মল,
উচ্ছল প্রাণের বেগে চঞ্চলি' তুলিব ধরাতল ; —
শুধু জীব নয়, চাই জীবন্ত মানুষ দেহে মনে,
শুধু বেঁচে থাকা নয়, পরিপূর্ণ প্রাণের স্পন্দনে
অস্তিত্বের সার্থকতা বিঘোষিত হোক উচ্চরবে,
এ প্রাচী-দিগন্ত পুনঃ মুখরিবে মানুষের স্তবে।
সে মহৎ সম্ভাবনা আমাদের মাঝে বর্তমান,
বিরাটের ধ্যানমন্ত্র মোরা বীর সাধক সন্তান।

দণ্ড

পুষ্পরাণী ঘোষ

(পুনরুক্তি)

লু—(লাফিয়ে উঠে) শোন হেষ্টার, এই লোকটাকে তুমি বিয়ে করনি নিশ্চয়? কি বলো? (হেষ্টার নীরব) বলো—বলছি, শীগগির বলো—? করেছ বিয়ে? (এগিয়ে)

হে—(তাড়াতাড়ি পেছনে সরে যেয়ে)—না।

লু—তাহলে আমি পুনর্বিবাহের জন্য তোমার নামে নালিশ করতে পারব্রাহে। (যেন কোন বিষয়ে মন স্থির করেছে এইভাবে হেষ্টারে সহসা লুইসের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় এবং বসবার চেয়ারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তাকে বসবার নির্দেশ দেয়)

হে—বস—আমি যা বলেছি তুমি সব ভুল বুঝেছ। তুমি যা ভাবছ তা নয়।

লু—(চেয়ারে বসে) তাহলে কি? আমার ঈর্ষা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলে বুঝি? বাবা মেয়েমানুষের মনের কথা ঠিক বুঝতে পারবে এমন চালাক ছেলে—আজও জন্মায়নি।

হে—(ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে) না, তাও নয়। যাকে আমি তোমার, আমার, পৃথিবীর সমস্ত লোকের সব কিছুর আগে স্থান দিচ্ছি—সে হল আমাদের সন্তান।

লু—সন্তান? তার মানে—কার সন্তান, কোন সন্তান?

হে—তোমার এবং আমার।

লু—তুমি কী বলতে চাও?

হে—হ্যাঁ—।

লু—এ্যা?

হে—তুমি জেলে যাবার ৬ মাস পরে সে হয়েছে।

লু—আর তুমি আমাকে এর বিন্দুবিসর্গ জানাও নি।

হে—তুমি তো—তখন জেলে। কি লাভ হত তোমাকে জানিয়ে।

লু—আমাকে জানানো তোমার খুবই উচিত ছিল। আমি যাই হই না কেন আমিই তো তার বাবা।

হে—হ্যাঁ, যে কোন শিশুর পক্ষে খুব চমৎকার বাবাই বটে! লুইস তোমাকে এ খবর জানানো ছাড়া আমার আরো অনেক জরুরী কাজ ছিল। ভীষণ কষ্টে তখন আমার দিন কেটেছে; আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না বাচ্চাটা গরীবখানার জন্মায়। কাজেই অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করে আমাকে সেই সময়টা কাটিয়ে উঠবার মত কিছু টাকা যোগাড় করতে হল। তারপর আমি এখানে চলে আসি, যেখানে সবাই তোমার কথা জানে, সে জায়গা ছেড়ে নতুন জায়গায় এসে নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে চেয়েছিলাম আমি।

লু—বাচ্চাটাকে একবার দেখব।

হে—তা—হবে না—আমি তাকে বলেছি যে তুমি নেই।

লু—তাহলে নিজের মেয়েটাকে আমি দেখতে পাব না?

হে—না—না লুই!

লু—একবার দেখলেই তার কী ক্ষতি হবে শুনি? আমি কি একজন কুষ্ঠ রোগী—এ্যা।

হে—বুঝতে পারছোনা—সব নষ্ট হয়ে যাবে—আমার এতদিনের এত চেষ্টা সব তুমি ব্যর্থ করে দেবে। তোমার কোন কথাই আমি তাকে বলিনি—এখানকার কোন লোক জানেনা কোন কথা—মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী। আমি চাই সে যেন জীবনে উন্নতি করবার সুযোগ সুবিধা পায়।

লু—আমি তার সুযোগ সুবিধা নষ্ট কোরব না। আমি তার উন্নতির পথে বাধা হব না।

হে—হ্যাঁ, তাই হবে তুমি চলে যাও। যদি একবার রটে যায় যে তার বাবা জেল ফেরতা আসামী তাহলে তার যে কত উন্নতির আশা থাকবে তা তুমি নিজেই ভাল করে ভেবে দেখ।

লু—কিন্তু, সে কথাত গোপন করে রাখা যায়।

হে—তুমি কি মনে কর এই রকম ছোট মফস্বল সহরে যেখানে সবাই প্রত্যেকের খুঁটিনাটি সব কিছু জানে

ও তাই নিয়ে আলোচনা করে—সেখানে কোন কিছু গোপন রাখা যায়? না—না—আমার ও তোমার নিজের জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ কিন্তু খুকীর জীবন আমি ব্যর্থ করতে দেব না—কিছুতেই না। তুমি তোমার নিজের মত থাক আর আমাকেও আমার নিজের মত থাকতে দাও।

লু—কিন্তু যদি আমি না যাই।

হে—কিন্তু তোমাকে যেতে হবে।

লু—যেতেই হবে, তাই না? কিন্তু কে আমাকে জোর করে যাওয়াবে শুনি? (থেমে তারপর ভয় দেখানোর ভঙ্গীতে গলার স্বর আর একটু উঁচু করে) কে সে?

হে—আমি—আমিই তোমাকে যেতে বাধ্য করবো, আজ রাত্রেই তোমাকে এ সহর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

লু—আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে যাব? তাই তুমি সম্ভব মনে কর? তুমি আমার স্ত্রী—এই আমার বাড়ী এখানেই আমি থাকব।

হে—এটা মোটেই তোমার বাড়ী নয়—আমার বাড়ী। আর লুইস—আমাকে নিজের মনে নিশ্চিন্তে থাকতে দাও। বুঝতে পারছ না তুমি সব কিছু খুকীর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নষ্ট করে দেবে? যাও, আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।

লু—তুমি কি ভাব আমায় বলতে পার? একেবারেই ভীষণ বোকা না? (এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম হেষ্টারের মনে ভয় দেখা দেয়)

হে—নিজের সন্তানের জীবন নষ্ট করে দেবে এত নিষ্ঠুর তুমি নিশ্চয়ই হতে পার না লুইস? আমার জন্য না ভাব খুকীর জন্য তোমার একটু মায়া হওয়া উচিত।

লু—দেখ হেষ্টার, ভালো ভালো গাল ভরা কথা বলে আমায় ভোলাতে পারবে না। খুকীর কথা আমায় না জানিয়ে তুমি আমার প্রতি খুবই অবিচার করেছ আর এখন কিনা তুমি আশা কর যে আমি আমার নিজের বাড়ী ঘর, বৌ মেয়ে সব ছেড়ে চলে যাব—কখনোই না—

হে—খুকীর পরে তোমার কোন অধিকার নেই লুইস। আমি তার মা।

লুইস—ওঃ এই কথা? তুমি ছাড়া আর কারু কোন মায়া মমতা নেই না? কেমন? তোমরা মায়েরা সবাই সমান তোমরা ভাব ছেলে মেয়েদের কাছে তোমরাই সব কিন্তু আসলে তা নয়—সেটা তোমাদের ভুল ধারণা বুঝলে? তাছাড়া আমি চরম্ভ তার জন্য তোমার চেয়ে ভালোই করতে পারব। জেল থেকে বেরিয়ে এসে একজন লোকের সাথে আমার দেখা হয়েছে—সেও ছিল জেলে। তবে সে আমার বের হওয়ার আগেই বেরিয়েছে। আমরা একটা মস্ত দাও মারার চেষ্টায় আছি—আর সেটা হওয়ারই—সম্ভাবনা ষোল আনা—সে লোকটার বুদ্ধি খুব।

হে—(লাফিয়ে উঠে হাত তুলে মুঠো শক্ত করে) বেরোও, বেরোও বলছি আমার বাড়ী থেকে—বেরিয়ে যাও। (হেষ্টারের এই প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে যেন পরাভূত হয়ে লুই উঠে দাঁড়ায়। দুজনে দুজনের দিকে এক মুহূর্ত তাকায়—তারপর লুইস আবার তার চেয়ারে পিছন ফিরে বসে আর হেষ্টারও হতাশভাবে তার চেয়ারে বসে পড়ে) এমন কিছুই কি আমি বলতে পারিনা লুইস যাতে তুমি বুঝবে? আমার কথা নাই ভাবলে খুকীর কথাটা একবার ভাব। তুমি পুরুষ—পৃথিবীতে তোমার স্থান তুমি যে ভাবে হোক করে নেবে—আর সে একটি ছোট মেয়ে।

লু—আমি তাকে দেখতে চাই।

হে—আমি পারতপক্ষে কিছুতেই তা হতে দেব না, তোমার কোন অধিকার নেই লুইস।

লু—হেষ্টার তুমি বড় কঠিন বিচারক। তুমি বিচারক হলে আসামীদের আর দুর্দশার শেষ থাকত না, খুকী কার মত হয়েছে—মানে আর কি দেখতে কার মত হয়েছে—তোমার মত না আমার মত?

হে—আমাদের কারুর মতই হয়নি সে হয়েছে তোমার মায়ের মত।

লু—বেশ, ও যদি স্বভাবেও তার মত হয়, তাহলেই যথেষ্ট হবে। তার মত ভাল মানুষ পৃথিবীতে বড় একটা [illegible] যায় না। (হেষ্টারের দিকে ফিরে দোষ দেবার ভঙ্গীতে) হ্যাঁ, তিনিই ছিলেন সত্যিকারের খাঁটি ভালো। তোমাদের মত মুখে বড় বড় কথা বলতেন না কিন্তু লোকে যে দোষই করুক না কেন—তার কাছে ঠিকই আশ্রয় মিলত।

(লুইস পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক পুরল ও সেটা জ্বালাতে এবং দুএক সেকেণ্ড পরে পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে হেষ্টারের দিকে ফিরে) এ কিন্তু এক অদ্ভুত ব্যাপার—ভীষণ অদ্ভুত। একটা বাচ্চা মেয়ে অথচ সে বিষয়ে কিছু জানি না—কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যেতে হয় হঠাৎ—যাই বলনা, কেন কথাটা লুকিয়ে রেখে তুমি আমার প্রতি ভীষণ অবিচার করেছ।

হে—সে যাতে জীবনে সুখী হয়—জেলখানার ছায়া যাতে তার জীবনকে অন্ধকার করে না তোলে, সেজন্যই আমাকে করতে হয়েছে এটুকু। তাতে কি তুমি আমাকে দোষ দিতে পার?

লু—(একটু ভেবে) আমি তার বাবা—আমি তাকে দেখতে চাই। (উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) আমি তাকে দেখবই। কোথায় সে? ঘুমুচ্ছে?

হে—না সে গেছে পাড়ার একজনের বাড়ী সেখানেই আজ রাত্রে থাকবে। তার ছেলেটার অসুখ বলে সে আজ মেরীকে সেখানে থাকতে বলেছে।

লু—তাহলে তাকে বাড়ীতে ডেকে পাঠাও।

হে—না, না লুই, সমস্ত ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাক—তার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যাক—তাতে কি তোমার কিছুই যায় আসে না? জীবনে কি একবারও তুমি মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠে এখান থেকে নীরবে চলে যেতে পার না?

(বাইরে দ্রুত পদধ্বনি শোনা যায়—দরজাটা খুলে যায়—মেরী ঘরে ঢোকে)

মে—মিঃ টমাস এসে গেলেন কাজেই আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে এলাম মা—

(মেরী দরজার দিকে ফিরে ভিতরের দিককার দেয়ালের গায়ে কোট ও হ্যাট খুলে রেখে দেয়)

হে—(চাপাগলায় হিংস্রভাবে) ভগবানের দোহাই লুই ওকে কিছু বল না।

(মেরী স্কুলের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে আসতে থাকে এবং আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই থেমে যায়)

হে—ইনি আমার একজন পুরানো বন্ধু—আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

(মেরী কৌতূহলভরে লোকটার দিকে চেয়ে থাকে)

লু—এস খুকী আমার কাছে এস; কই দেখি তোমার হাত।

(পরস্পর করমর্দন করে—মেরী তখনো এক দৃষ্টে লুইসের দিকে চেয়ে থাকে)

মেরী—আমি যখন বাড়ী থেকে বেরুচ্ছিলাম আপনার সঙ্গেই আমার দেখা হল না? আপনি না আমায় জিজ্ঞাসা করলেন না কোথায় থাকেন?

লু—তাইত! ঠিকইত। আমি তো বুঝতে পারিনি। অদ্ভুত মজার ব্যাপার তো—খোঁজ নিলাম কিনা নিজেরই—

হে—(জোরে নিশ্বাস নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে) মিঃ টমাস ফিরে এলেন যে বড়?

মেরী—খোকার জন্য তার খুব ভাবনা হচ্ছিল সেজন্য তিনি তাড়াতাড়ি কাজটা করে কোনরকমে শেষ ট্রেনটা ধরে ফিরে এসেছেন।

হে—কেমন আছে খোকা?

মে—সে এখন অনেকটা ভালো আছে। (মেরী দোকার ধারে দাঁড়িয়ে ব্যাগ থেকে খাতা বের করে তার মধ্যে রাখে—তারপর মার দিকে ফিরে বলে। জান মা, আমি কিন্তু চা না খেয়েই চলে এসেছি।

হে—এই যে মা—এখনই আসি

(উনুনটা খুচিয়ে দিয়ে কেটলিটা বসিয়ে দেয়)

মে—আমি কাপগুলো নিয়ে আসি। (তাকের কাছে যেয়ে হুক থেকে কাপ পাড়তে পাড়তে মার দিকে ফিরে—তিনটে কাপ নেব না ?)

(হেষ্টার কেটলী নিয়ে ব্যস্ততার ভাণ করে, কোন উত্তর দেয় না। মেরী লুইসের দিকে তাকিয়ে)

মে—আপনিও আমাদের সঙ্গে চা খাবেন তো ?

হে—(রুক্ষভাবে) তিনটে কাপই নাও মেরী, মিঃ লুইস খাবেন চা।

মেরী—মা আমি টোষ্ট কোরব ?

হে—কর।

(হেষ্টার কয়েক টুকরো রুটি কেটে প্লেট সুদ্ধ মেরীর হাতে দিল। মেরী টেবিল থেকে আর একটা প্লেট নিয়ে আগুনের ধারে রাখল—তারপর টোষ্ট করবার টোষ্টার নিয়ে একটা টুল পেতে টোষ্ট করতে বসল। লুই মেরীর দিকে চেয়ে থাকে)

লু—তুমি ঠিক বলেছ হেষ্টার যে খুকী তোমার মতও নয় কিম্বা—কিন্তু ও হুবহু ওর ঠাকুমার মত হয়েছে—একেবারে প্রতিচ্ছবি।

মেরী—(মুখ তুলে লুইসের দিকে তাকিয়ে আপনার লোকের মত বিশ্বস্ত ও বন্ধুভাবে বলে) মিঃ লুইস আপনি কি ভালো অঙ্ক জানেন ?

লু—(লজ্জিত ভাবে) না খুকী—জানিনাত।

মে—ওঃ আমি ভেবেছিলাম তাহলে আপনার কাছে অঙ্কগুলো বুঝে নেব, আপনারা যখন স্কুলে পড়তেন তখন কি অনেক অঙ্ক দিত ?

লু—ওসব আমি বিশেষ করিনি, পড়াশুনার দিকে কোন-দিনই আমার তেমন মন ছিল না।

(মেরী উঠে, টোষ্টগুলোতে মাখন মাখায়, তারপর উনুনের ধারের গরম প্লেটটার ওপরে রাখে)

মেরী—আমাদের স্কুলে এ্যাত—এ্যাত অঙ্ক দেয়। একরাশ অঙ্ক। (টোষ্টার দিয়ে বইগুলো দেখিয়ে) দেখুন না একবার কত বই, অঙ্ক, ইতিহাস, ফরাসী জার্মানী (সে আরো কয়েকটা রুটী নিয়ে আবার টোষ্ট করতে বসে) অঙ্কে আমি ভীষণ কাঁচা কিন্তু ফরাসী ও জার্মানীতে নেহাৎ মন্দ নই।

—বড় হয়ে টীচার হবে বুঝি ?

(হেষ্টার টেবিলে কাঁটা চামচ প্লেট সাজিয়ে রাখছিল, সে তাকের উপর থেকে খানিকটা চীজ বের করে আনতে বলে)

হে—হ্যাঁ, আশা করা যায় মেরী একটা বৃত্তি পাবে। ভাষার ওপর ওর খুব দখল আছে।

লু—বা এত ভারী মজার ব্যাপার—আমার ভাই জর্জ তার কথা তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই হেষ্টার, সে খুব চালাক ছিল আর সহজে যে কোন ভাষা শিখে ফেলতে পারত। (গর্বভরে হেষ্টারের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) দেখতে পাচ্ছ খুকীর চরিত্রগঠনে একলা যে তোমারই হাত আছে তা নয় এটা ও কোথা থেকে পেয়েছে বুঝতে পারছ ?)

হে—(মেরীর দিকে ফিরে খুব তাড়াতাড়ি) জর্জ আজ ষ্টেশন থেকে কার বাক্স নিয়ে আসছিল রে ?

মে—ক্যাপারিনের—সে আজ ফ্রান্স থেকে ফিরে এল।

হে—পাশ করেছে কিনা কে জানে !

মেরী—হ্যাঁ মা পাশ করেছে—জর্জ আমাদের সঙ্গে খেলতে এসেছিল সে বলে ক্যাপারিণ পাশ করেছে আর লণ্ডনের একটা স্কুলে ভাল কাজ পেয়েছে।

হে—খুব খুশী হলাম শুনে, (লুইসের দিকে তাকিয়ে) আমি আশা করি মেরীও ঐ রকম বাইরের কোন কলেজে যেয়ে পাশ করে আসবে। বিদেশের একটা ডিগ্রী থাকলে ভাল কাজ পাওয়া খুব সহজ হয়।

(মেরী টোষ্টের প্লেটটা টেবিলে রাখে। হেষ্টার চা তৈরী করে। তারপরে তারা সবাই টেবিলে যেয়ে বসে)

লু—(টেবিলের চারিপাশে তাকিয়ে) বেশ চমৎকার একটা পারিবারিক আবহাওয়া না ? এই রকমই তো হওয়া উচিত। এই বেশ হয়েছে)।

(মেরী টোস্টের প্লেটটা লুইসের দিকে এগিয়ে দেয় সে একটা টোষ্ট নিয়ে খেতে আরম্ভ করে)

লু—খুকী তুমি চমৎকার টোষ্ট কর তো।

মেরী—টোষ্ট আমি ভীষণ ভালবাসি মিঃ লুই—আপনি খাবেন না মিঃ লুই?

লু—আমিও খুব ভালবাসতাম, কিন্তু ১২ বছর আমি টোষ্ট খাইনি।

হে—(ভীষণ আশ্চর্যভাবে) ১২ বছর টোষ্ট খাননি? আপনাদের কি কোন উনুন ছিল না?

লু—না (সে হেষ্টারের দিকে ফেরে, এক মিনিটের জন্য তার স্বভাব বদলায়) জান হেষ্টার আগুনের অভাবটাই আমাকে সব চেয়ে বেশী কষ্ট দিত। শীতের পর দিন শুয়ে শুয়ে সেই সাদা চুনকাম করা সেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ভাবতাম একটা অগ্নিকুণ্ড থাকলে কী ভালোই হত, (একটু থেমে) ভারী আশ্চর্য না? খুবই আশ্চর্য যে একটা অগ্নিকুণ্ডের অভাব আমাকে অতটা উতলা করত।

মেরী—(আশ্চর্যভাবে লুইসের দিকে তাকিয়ে) কিন্তু আপনি নিজে তো একটা উনুন আনিয়ে নিতে পারতেন, পারতেন না কী?

লু—না খুকী পারতাম না আমি যেখানে ছিলাম সেখানে তা পাওয়া যায় না। যেখানে—

হে—(হঠাৎ এক কটকায় দুধের পাত্রটা উলটে নেয়) তারপর একটা নেকড়া দিয়ে দুধটা মুছতে মুছতে)—হায়। হায়! মাত্র ঐ দুধটুকুই ঘরে ছিল, মেরী লক্ষ্মী না এই নাও (পকেট থেকে পয়সা ও দুধের পাত্রটা মেরীর হাতে দিল) মিসেস জোনসের ডেয়ারী থেকে একটু দুধ নিয়ে এস।

মেরী—দাও না আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি, যাব আর আসব। (কোটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে যায়)।

হে—(টেবিলের অপর দিক থেকে হিংস্রভাবে চাপা গলায়) পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই যা দিয়ে আমি তোমার মুখ বন্ধ করতে পারি? (লুইস তার দিকে তাকায়, কিন্তু কোন উত্তর দেয় না) বল তুমি কি চাও? কত টাকা চাও তুমি লুইস হার্ট?

লু—ওঃ এইবার বুঝি তুমি এই খেলা খেলছ? টাকা দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে ভাবছ?

হে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদিও আমার এমন কিছু নেই, তবু যা আছে—আমার যথাসর্বস্ব আমি দিয়ে দেব তোমায় যদি তুমি—

লু—হয়েছে, হয়েছে, থাম হেষ্টার। এত বছর ধরে তুমি খুকীর কথা চেপে রেখেছ আর যখনই আমি তাকে জানলাম, দেখলাম সেই মুহূর্তেই কিনা তুমি আমায় চলে যেতে বলছ তাকে ছেড়ে। আমি কখনোই তা করবোনা—কিছুতে। তাছাড়া খুকীকে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

হে—(ঘৃণাভাবে) ভালোই লেগেছে বটে। তার বাবা যে জেল ফেরত আসামী একথা তাকে জানিয়ে তার মন ভেঙ্গে দেয়াই তার প্রতি তোমার চূড়ান্ত স্নেহের নিদর্শন। এ কাজ করলে তার সমস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে, অপরিসীম দুঃখে ও কষ্টে ভরে যাবে তার জীবন।

লু—কি করে জানলে তুমি শুনি?

হে—মানুষের স্বভাব তুমি ভাল করেই জানো; যে মুহূর্তে তারা জানবে যে ওর বাপ একজন চোর মাত্র, তখন থেকেই তারা ওকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েরা ভীষণ নিষ্ঠুর হতে পারে—শুধু তাই বা কেন, শিক্ষয়িত্রীরাও—মেরী ভয়ানক অভিমানী, তার যে কী অবস্থা এতে হবে সহজেই বুঝতে পারা যায়, দয়া করে তাকে এ লজ্জা হতে অব্যাহতি দাও লুইস। আর—

(মেরী দুধ নিয়ে ফিরে এসে কোট খুলে রেখে দিলে, হেষ্টার দু কাপ চা ঢেলে মেরী ও লুইসকে দেয়)

হে—মেরী মিঃ লুইসকে টোষ্টটা এগিয়ে দাও।

লু—না আমি আর টোষ্ট নেব না, আমি চুরুট খেতে খেতে এই চায়ের কাপটা শেষ করব। (চুরুট বের করে)

মেরী—(উত্তেজিতভাবে মায়ের দিকে ফিরে) জানো মা

আমি যখন সেখানে গেলাম তখন গোয়েনের মা সেখানে কী কী যেন কিনছিলেন, তিনি আমাকে কাল তাদের সাথে চা খেতে বলেন, যাব না? আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছে।

হে—এখনই ঠিক বলতে পারছি না মেরী, গোয়েনরা এত বড়লোক যে আমার মনে হয়—

মেরী—(মাঝ পথে বাধা দিয়ে · তাড়াতাড়ি)
গোয়েন একটুও অহঙ্কারী নয়—হ্যাঁ বল মা লক্ষী;

হে—আমি দেখে দেখব মেরী।

লু—তোমার খুব ইচ্ছা করছে যেতে।

মে—ওঃ তা আর বলতে? যেতে পেলে আর কিছু চাই না আমি, (মিঃ লুইসের দিকে ফিরে যেন নিজের মনে কথা বলছে) কেন জানেন গোয়েন খুব ভালো মেয়ে, সব মেয়েরাই তাকে খুব ভালবাসে, সে আমাদের হকী টীমের ক্যাপটেন, তার মাও খুব ভালো আর তার বাবা—তিনি যে কী চমৎকার লোক সে আর কী বলব, (হঠাৎ থেমে যায়) আচ্ছা মিঃ লুইস আপনি কি আমার বাবাকে চিনতেন? (লুইস হতভম্ব ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছু বলতে পারে না) আপনি মাকে অনেক দিন ধরে জানেন কি না—তাইতে আমার মনে হল যে বাবাকেও হয়ত জানতে পারেন।

লু—এ কথা জানতে চাইছ কিসের জন্য?

মেরী—দেখুন আমি তার বিষয়ে কিছুই জানি না; মা কখনো তার বিষয়ে কিছু বলেন না। স্কুলের মেয়েরা তাদের বাবার কথা নিয়ে কত অহঙ্কার করে, গর্ব করে, আমি চুপ করে থাকি, আমি কিছুই বলতে পারি না। আপনি যদি তার বিষয়ে কিছু বলেন আমাকে তবে আমিও তাই নিয়ে অহঙ্কারকরতে পারতাম।

লু—(মুখের থেকে চুরুট নামিয়ে ধীরে ধীরে) খুকু, তোমার বাবা ঠিক অহঙ্কার করার মত লোক ছিলেন না।

মেরী—কিছুই কি বলতে পারেন না? অন্ততঃ কিছুও?

লু—না খুকু, যা নিয়ে ঠিক গর্ব বোধ করা কিছুই তিনি কোন দিন করেন নি।

মেরী—আপনি তাকে চিনতেন তো ভালোভাবে?

লু—পৃথিবীতে আমার চেয়ে ভাল ভাবে কেউ চিনত না তাকে।

মেরী—তাহলে মিঃ লুইস, আপনি যদি অনেকক্ষণ ধরে খুব ভালভাবে ভাবেন তাহলে হয়ত একটা কিছু মনে করতে পারবেন।

লু—আচ্ছা ভেবে দেখি (একটু পরে) না সে ছিল একজন সাধারণ মানুষ, সেটা যে তার নিজের দোষ ছিল তা নয়—তার ভাগ্যটাই ছিল খারাপ যখন আর সবাই যখন ছাড়া পেয়ে যেত সে কিন্তু ঠিক—

হে—(বাধা দিয়া) যথেষ্ট হয়েছে মেরী, এবার থামো এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না, যাই হোক তিনি তো মৃত, স্বর্গে গেছেন আর সে কথা কেন?

লু—তিনি মৃত তাই না হেষ্টার?

হে—আমার মত তুমিও ভালো করেই জানো তিনি মারা গেছেন।

মেরী—(হতাশ ভাবে, করুণস্বরে) হায়
আমি এত আশা করেছিলাম যে আপনি নিশ্চয় কিছু বলতে পারবেন।

লু—(আগ্রহভরে) আচ্ছা খুকু, একটা কিছু বানিয়ে বলে হয় না? যেমন ধর সমুদ্র থেকে কোন লোককে উদ্ধার করা বা ঐ রকম দুঃসাহসিক কোন কাজ?

মে—(গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে) তা পারি ঠিকই কিন্তু সত্যি না হলে তা বলে লাভ কি?

লু—(ভগ্নোৎসাহ হয়ে কাঁচুমাচু ভাবে) তা লাভ নেই।

মেরী—(সহসা উৎফুল্ল ভাবে) আচ্ছা তিনি কি খেলোয়াড় ছিলেন মিঃ লুইস? আমি কি মেয়েদের বলতে পারি যে তিনি একজন খাঁটি খেলোয়াড় ছিলেন?

লু—(চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ পুকু তা বলতে পার—তিনি একজন খুব ভালো খেলোয়াড় ছিলেন, তা খুব বলতে পার ; (লুইস চুরুটের ছাই ফেড়ে ফেলে পাইপটা পকেটে রাখে—ওভার কোট ও টুপী পরে নেয়—তারপর নেরীর দিকে হাত বাড়িয়ে) এবার তাহলে আসি পুকু—বিদায় ।

(নেরীর সঙ্গে করমর্দন করে)

নে—বিদায় মিঃ লুইস ।

হে—(অবিশ্বাস ভাবে) তুমি চলে যাচ্ছ লুইস ।

লু—হ্যাঁ চলেই যাচ্ছি ।

(লুইস দরজার দিকে যায় ফিরে হেষ্টারের দিকে তাকায়)

লু—বিদায় হেষ্টার । আর কখনো তুমি আমায় দেখতে পাবে না । এবারে মেয়াদ আমার সারাজীবনের ।

(লুইস চলে যায়) *

* ইংরাজি হইতে অনূদিত ।

"খোকা'র শপথ"

শ্রী—রায়

সইতে যে না আর পারিনে,
আমার কি ছাই আছে জানা ?
ইলা তোমার কাঁদছে কেন একটু দেখনা !
তোমার মত যতন ক'রে
দিচ্ছি চুমু আবেগভরে
খোকাই তারে কত ক'রে ; কিছু বোঝে না ।
বসি যখন দুধ খাওয়াতে
বাটি তা মেরে ছোট হাতে
দুধের বাটি উল্টে দিল ; একটু গেল না ।
জোর করে না দুধ খাওয়াতে
ইলারে মোর বকত নিতে
প্রাণের মাঝে কেমন করে ; সইতে পারি না ।
এ কাজ কি মোর ভালো আছে ? *
তোমারইত এরে সাজে
"মাগো" তোমার পায়ে পড়ি ; তুমিই এসোনা !
বিক্রি করে লাটাই খানি
নিলেন তাতে পুতুল কিনি
পুতুল পানে ইলা তোমার ফিরেও চাহে না ।

তোমার বাঁধা ছবির পানে
তাকিয়ে থেকে দুই নয়নে
হাত তুলে কি বলতে চাহে ; বলতে পারে না,
আমি তোমার দুষ্টু ছেলে,
তাইতে আমায় গেলে ফেলে
ইলা যে তোর অবোধ শিশু ; কিছুই জানে না !
আমার দোষেই কেন তারে
পালিয়ে গেলি হেথার ছেড়ে
পাষাণ পরাণ তোর কি "মাগো" একটু কাঁদে না ?
বলছি আমি শপথ ক'রে
তুই যদি "মা" আসিস্ ফিরে
হাজার সাধে পরের পাছে আর যে যাব না ।
এতেও যদি আমার না চাও
যাচ্ছি চলে অন্য কোথাও
ফিরে পেলে, না দিলে কেউ কিছু খাবনা ।
আমিত 'মা' যাচ্ছি চলে
ইলারে তুই রাখিস কোলে
নয়ত ইলা নিজেই যাবে বাধা মানবে না ।

আমাদের সাহিত্য

এ যুগের উপন্যাস

(সাম্প্রতিক সাহিত্য)

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশের বর্তমান নিত্য পরিবর্তনশীল বিচিত্র জীবনের ঘাত-সংঘাতের মধ্যে থেকে আজকাল যে সব সাহিত্য সৃষ্ট হচ্ছে, একথা স্বীকার করবোই, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'যার যেথি যাক্' নিঃসন্দেহে অন্যতম। সাময়িক সাহিত্যের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে সাধারণতঃ এটা কালজয়ী হোতে পারবে না। প্রবহমান ঘটনাস্রোতের মধ্য থেকে যে সব উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আমরা ছবি আঁকি বা লিখে রাখি তার মূল্য ঠিক সেই সময়ে অথবা তার কিছু কাল পর পর্যন্ত মন্দ লাগে না; তার পরে তার রস রঙ সবই ফিকে হোয়ে আসে। তার একমাত্র কারণ এর পারিপার্শ্বিকতা। সুতরাং সেই সব সাহিত্যের বিচারে পাঠক সাধারণকে একথা মনে রাখতেই হবে, তার স্বকীয় ক্ষেত্রে শিল্পটী কতোদূর মনোত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে। এর মধ্যে একথাও উল্লেখ-যোগ্য যে, যদি নিপুণ হাতে এই সব ছবি আঁকা হয় তাহ'লে এর একটা স্থায়ী ঐতিহাসিক মূল্যও নিরূপিত হোতে পারে। আমাদের মতে যে কোনো শিল্প-সৃষ্টির পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়।

আজ যে গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে নেমেছি, গ্রন্থকারের মতে সেটা "১৩৪৮—১৩৫০ সালের একটী জীবনময় কাহিনী।" আমাদের মনে হয় এটা তাঁর বিনয়। আসলে তিনি নূতন ধরণের একটী উপন্যাস রচনারই চেষ্টা ক'রেছেন। ঠিক সেই জন্যেই চিত্রের পর চিত্র এঁকে একটা অভিনব রূপ দিতে চেয়েছেন। প্রত্যেকটী ছবিতে তাঁর যে দরদী মনের আভাষ আছে সেটা স্বীকার ক'রেও বলবো পরিণতি শেষ পর্যন্ত ছোট গল্পের মতোই হয়েছে। সাধারণতঃ লেখক আজকাল বেশী ছোট গল্প লিখ্‌ছেন বলেই তাঁর রচনায় উপন্যাসের ধর্ম বাধা পেয়েছে; আবার ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি, তারো সম্পূর্ণতা এর মধ্যে নেই।

গ্রন্থটি প্রকাশ ক'রেছেন ডি, এম, লাইব্রেরী। প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩৫২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গোপাল দাস মজুমদার। দাম তিন টাকা।

কাহিনী সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে সংক্ষেপে এর গল্পাংশটীকে বিবৃত ক'রে নিতে চাই।

১৩৪৮ সাল। তখন আমাদের এই বিরাট নগরীর প্রত্যেকটী মানুষ জাপানী বোমার আক্রমণের আশংকায় আতঙ্কিত জীবন কাটাচ্ছে। এ, আর, পি, আর ব্লাক-আউটের তখন পূর্ণ রাজত্ব। ঠিক এরই মধ্যে থেকে গ্রন্থকার কাহিনীটীর সূচনা ক'রেছেন।

প্রতিদিনই সহরের অবস্থা আশংকাজনক। সব থেকে ভীতিকর হচ্ছে মানুষের রটানো গুজব। প্রতি দিনই সহর থেকে লোক চ'লে যাচ্ছে। যে দিকেই তাকানো যায় সেই দিকেই যেন পলায়নের একটা মহোৎসব আরম্ভ হোয়ে গেছে।

শ্রীভূষণবাবুও এই আতঙ্কিত পলাতকদের মধ্যে এক জন। অতি সাধারণ নিরীহ কেরাণী তিনি। 'সেবা' তাঁর কন্যা। গৃহিনী আছেন। পলায়নের এই বিরাট স্রোতে তিনিও কম্পমানা। এই ভয়ানক মৃত্যুপুরী থেকে সপরিবারে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারলে তিনি বাঁচবেন।

এ বাড়ীতে সুজন ব'লে একটী ছেলের যাতায়াত আছে। আলাপী ছেলে। কম মাইনেতে চলবে ব'লে সুজনকে শ্রীভূষণবাবু মাষ্টার রেখেছিলেন 'সেবা'র জন্যে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ঠাহর করলেন "সুজনের লক্ষ্যস্থল বই নয়, ছাত্রীর মুখপদ্ম" সুতরাং সুজনের এখন আসা যাওয়াটা সংকোচের মধ্যেই।

'সেবা' জিগ্যেস করেছিল, সুজনও যাচ্ছে কিনা? সুজন হেসে জবাব দিয়েছিলো, না। এখানে থেকেই সে যুদ্ধ করবে; আর সে যুদ্ধের অস্ত্র হবে তার লেখনী।

একটা কথা। আজকের এই বিরাট বিপর্যয়ে শ্রীভূষণ বাবুরও মনের জোর যেন অনেকটা আলগা হয়ে এসেছে। যে 'সেবাকে ইস্কুল মাষ্টার সুজনের হাতে তুলে দিতে তাঁর

ঘোরতর আপত্তি ছিলো, আজ যেন তা অনেক শিথিল; আজ অন্ত তাঁর ইস্কুল মাষ্টারে কোন আপত্তি নেই।

তাই 'সেবা' বলেছিল, এবারে বিয়েটা হোয়ে যাক্। হেসে সুজন উত্তর দিয়েছিলো, এই দুর্যোগের সময়ে বিয়ে? তারপরে বলেছিলো, বিয়ে তোমার মতো অতো তাড়াহুড়োর ব্যাপার নয়, ওটা শক্তির ব্যাপার—শান্ত মাঠের ফসল।

বাঁধ ভাঙবার আয়োজন সম্পূর্ণ হোলো। কোনো গ্রামে চ'লে যাওয়াই ঠিক করলেন শ্রীভূষণবাবু। ষ্টেশনে নেমে বারিধির সংগে তাঁদের পরিচয় ঘটলো। জমিদার পদ্মবিনোদের ছেলে। সেবারতী। ইভাকুয়িদের জন্যে সে প্রাণ ঢেলে দিয়েছে।

পথে শ্রীভূষণবাবুর সমস্ত টাকা পকেট থেকে চুরি হয়ে গিয়েছিলো। সেই নিদারুণ শোকের সময়ে মূর্তিমান সান্ত্বনার মতো বারিধি এলো। 'সেবার' প্রতি লক্ষ্য পড়লো তার কালিপড়া ছাটা চিম্‌নির হ্যারিকেনে পা থেকে চোখ তুলে বারিধি আরেকবার দেখ্‌লো 'সেবা'কে। মুহূর্তে বুঝলে এর নাম মালিক। "যাকে বলে বসুষ্টমা, অনন্ত-যৌবনা। অপ্রাপনীয়া হ'লেও যেন অবারনীয়া নয়।

শ্রীভূষণবাবু বারিধির ব্যবহারে একেবারে গলে গেলেন।

দিন যেতে থাকে। তবু এর মধ্যে শ্রীভূষণবাবু মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে ওঠেন। 'সেবা'র সংগে বারিধির খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তাঁর চোখে লাগে।

সাবধান হ'তে বলেন স্ত্রী মহামায়াকে, সাবধান ক'রে দিতে বলেন 'সেবা'কে।

শ্রীভূষণবাবু যে বারিধির মতো ছেলেদের একেবারে চেনেন না তা নয়—তাই আশংকাটা তাঁর সব থেকে বেশী, কিন্তু মহামায়া এর মধ্যেই আবার আলো দেখতে পেয়েছেন। কে বলতে পারে, বারিধিকে তিনি জামাই করতে পারবেন না? যে দিনকাল—সম্ভব সবই।

দিন যায়। 'সেবা' আন্তরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হোয়ে আসে বারিধির কাছে। অবশেষে বারিধিকে বিয়ের প্রস্তাব করে একদিন। বারিধি বোবার এতো আশংকা কেন? দীর্ঘ আর ওজস্বিনী বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় "প্রেম" তাহ'লে অর্থহীন হবে। বলে, যে যাই বলুক, তুমি ভুল বুঝনা 'সেবা'!

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বারিধির সংগে 'সেবা' দেশের কাজ করে। বারিধির আশ্রয়ে নিজেকে তার অনেক নির্ভয়, অনেক নিঃসংশয় মনে হয়। এক রঙে ছুপিয়ে নিয়েছে তাদের নিশান। এক সুতোয় বেঁধে নিয়েছে রাখী। বিয়ে হয়তো হবে একদিন।

এদিকে ক'লকাতায় সুজনের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে। স্কুলের অবস্থা ভয়ানক খারাপ। সেক্রেটারী হীরেন বাবুর কাছে প্রতীকারের জন্যে সে এসেছিল,—অর্ধেক মাইনেতে তার চলবে কি ক'রে?

পুরশ্রী হীরেন বাবুর মেয়ে। বিলাস-লালিতা। পিতার সংগে তার মতের অমিল আছে। বলে, "আমরা সমষ্টির দলে, আমাদেরও তাই সমগ্রকেই প্রতিরোধ। প্রাপ্তিতে তো আমাদের সমাপ্তি নয়; আমাদের সমাপ্তি পর্যাপ্তিতে। যদি বাবার উপরেই শুধু ক্ষুব্ধ হোতাম তাহ'লে তাঁর টাকা দশ হাতে উড়োতাম। একমাত্র মেয়ে বলে আটকাতো না একটুও। কিন্তু ক্ষুব্ধ হোয়েছি—বিরাট একটা ব্যবস্থার উপরে। আমার এই ব্যবহারটা বাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়; বাবা যে প্রতিবেশের প্রতি-নিধি তার বিরুদ্ধে।"

পুরশ্রীর সংগে সে তাদের আখড়ায় ঘোরে। বন্ধু অটবীরায়ের বাড়ী যায়। একজন সোল ইঞ্জিনিয়ারকে সে বিয়ে ক'রেছে। কিন্তু এতো ঔজ্জ্বল্য—এতো শালীনতা এবং এতো শিক্ষার মধ্যেও হঠাৎ যখন পুরশ্রী তাকে বলে "আপনি একেবারে পুরোদস্তুর ইস্কুল মাষ্টার।" তখন কেমন যেন সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরে সুজনের। তারই পাশাপাশি একটা মিষ্টি আর শান্ত মুখ মনে পড়ে। তার নাম 'সেবা'।

এদিকে 'সেবা'রও বিপদ কম নয়। আশংকা হোতেই কথাটা বারিধিকে জানিয়েছিলো। ব'লেছিলো এবারে আমাদের বিয়ে করা উচিত।

আকাশ থেকে পড়লো বারিধি। বললে, এর জন্যে বিয়ে কেন? চলো ক'লকাতায়—সেখানে আমার চেনা

ক্তার আছেন এ সব ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত।

'সেবা' চোখে অন্ধকার দেখ্‌লো। বারিধি মনে মনে ঠিক করলো, প্রয়োজন বোধে সে সোজা সমস্তই অস্বীকার করবে।

'সেবা'ও মন ঠিক ক'রে নিলে। কিছু মোটা টাকা শুধু সে চেয়ে নিলে তার কাছ থেকে। আর সেই ডাক্তারের ঠিকানা। আর কিছু নয়।

আসবার সময়ে মাকে শুধু আভাষ দিলে এই সংকটের, মা বারিধিকে ভেবে মনে মনে বোধহয় একটু উল্লসিতাই হোলেন—কারণ এইবার তাকে ফাঁদে ফেলা যাবে—কিন্তু 'সেবা' যখন অস্বীকার ক'রে তার পরিবর্তে এর জন্যে সুজনকে দায়ী করলে, তখন তিনি মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন।

অকথ্য নির্যাতন চল্‌লো 'সেবা'র ওপর। শ্রীভূষণবাবু একটা আস্ত ছাতাই 'সেবা'র পিটে ভাঙ্‌লেন।

তারপরে শ্রীভূষণবাবু তাকে নিয়ে এসে ক'লকাতায় সুজনের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বিজয়ী 'সেবা'। হাতে মাত্র দুগাছা ক'রে চুড়ি ছাড়া আর কিছু দিলেন না তাকে।

সুজন শুন্‌লো সব। আশ্রয় দিলে। অভয় দিলে। 'সেবা' জিজ্ঞেস ক'রেছিলো, বিয়ে করবে আমাকে?

উত্তরে সুজন ব'লেছিলো, "হ্যাঁ তোমাকে। আগে করিনি, বুঝিনি প্রয়োজন। এখন বুঝছি বিয়ে দিয়ে ঢেকে দিতে পারবো তোমার সব লজ্জা, তাই আজকেই তো বিয়ে করবার দিন।"

তবু ডাক্তারের কাছে গেলো সেবা। পরীক্ষা করালে দেহকে। ডাক্তার বললেন "কিছু না। দুই আর দুই দেখেছেন সোজাসুজি চার ক'রে ব'সে আছেন। এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি সুস্থ। যান মনের সুখে দৌড় ঝাপ ছুটোছুটী করুন গে।"

সহরের অবস্থা আবার পরিবর্তিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। ক'লকাতায় তখন লোক আবার ফিরে আসছে কিছু কিছু ক'রে। গ্রামে তারা উৎপীড়িত মৃত্যুকলঙ্কিত!

বারিধিও ক'লকাতায় এসেছে ক'লকাতাকে দেখ্‌তে, কিন্তু আসলে 'সেবা'কেই দেখতে চায় সে। কেমন আছে, সে খবর নেওয়া প্রয়োজন তার।

ডাক্তারের কাছে পাকে প্রকারে সব সংবাদ নিয়ে সে জান্‌লে, সব ভুল, সব মিথ্যা, সবই অমূলক আশংকা।

একদিন সুজনের বাড়ী পর্যন্ত গেলো বারিধি। দূর থেকে দেখ্‌লে 'সেবা'কে। রোদ্দুরে একটা কাচা সার্ট শুকোতে দিচ্ছে। 'সেবা'র অন্তরকম চেহারা বুকের উপরে প্রকাণ্ড একটা ঘুসি খেলে বারিধি। অনুসন্ধান করতে লাগ্‌লো, কে সেই পুরুষ, যে সেবাকে এমন উদার আশ্রয়ের মধ্যে দুই হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়েছে!

অসামাজিকভাবে একটা মেয়ের সাথে এভাবে বাস করবার জন্যে স্কুল থেকে সুজনের চাকরী যে রেজেষ্ট্রী ক'রে বিয়ে ক'রেছে সেবাকে একথা সেক্রেটারী হীরেন খাস্তগীর কানে তুললেন না। নাম্‌লো চরম বিপদ।

যে বাড়ীতে সুজন থাকে সে বাড়ীরই একটা অংশ ভাড়া নিলো বারিধি। অনুসন্ধানের কাজ যাতে ভালো ভাবে চলে, তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি নেই। সুজন বাসা বদল করলো। এক মাড়োয়ারীর চায়ের আড়তে চাকরী নিলো তারপরে। চল্লিশটাকা মাইনে। পুরোশ্রী এসেছিলো বন্যার কাজে সুজনকে সঙ্গে হিসেবে পেতে, 'সেবা'কে দেখে পিছিয়ে গেলো।

বন্যার স্নানে দুর্গতচর্যায় বারিধিও এসেছিলো। ভিতরে শান্তি নেই। কেবলি চিরে চিরে রেখে নিজেকে।

গলি চিনে একদিন 'সেবা'দের বাড়ীতে এসে সে হাজির হলো। এতো বড়ো নির্লজ্জতা 'সেবা' কল্পনা করেনি। আরো টাকা দিতে চেয়েছিলো বারিধি তাকে। মুখের উপরে সে সে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

'সেবা'র শ্বশুর শাশুড়ী এসেছেন দেশ থেকে। সুজনের পরের ভাইটী মারা গেছে কি-চাকরি রাখ্‌বার সাধ্য নেই। সুজনের ম্যালেরিয়া জ্বর। মাথার উপরে বিপদের ঘনঘটা।

১৩৫০ সাল আবার লোক সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটলো নিরুপায় হোয়ে। চালের মণ চল্লিশে এসে পৌঁছলো। পথে পথে যেন প্রার্থীরা হাঁড়ি হাতে ক'রে বেরিয়ে প'ড়েছে। ফুটপাথে মৃতদেহ চোখে পড়ছে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে লোক আসারও বিরাম নেই। চাষী, সূত্রধর, কাপালি, কয়াল সকলে আসছে। দরিদ্র জনসাধারণ নিষ্পেষিত হোলো; এবার মধ্যবিত্তদের পালা আসছে।

চালের আড়তে সুজন চাকরী করতো, বাধ্য হয়ে সেখান থেকে সে কিছু চাল নিয়ে এলো। এতে তার উপরওয়ালা কর্মচারীর সাহায্য ছিলো। দুর্ভাগ্যক্রমে চালটা যখন গাড়ী থেকে বাড়ীতে তোলা হচ্ছিলো তখন দূরে রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে বারিধি সেটা লক্ষ্য করে। প্রতিশোধ নেবার উপযুক্ত অবসর এলো তার। খোঁজ-খবর নিয়ে লোকটা সুজনকে চাল নিতে সাহায্য করেছিলো, তাকে গিয়ে ধরলো। কিছু টাকা পাইয়ে এটাকে চমৎকার একটা চুরির চেহারা দিলে। সুজন ধরা পড়লো।

চাকরী গেলো তার। চারদিক যেন ভয়ানক শূন্য। ম্লান মুখে সে বাড়ী ফিরে এলো।

কিন্তু 'সেবা' পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। যা নিশ্চিত, যা অপ্রতিরোধ্য, তাকে সে স্বীকার ক'রে নিতে জানে। কনট্রোলের লাইনে তাই সে অসংকোচে চালের থলি হাতে ক'রে গিয়ে দাঁড়ালো।

এই কনট্রোলের লাইনেই দীর্ঘ দিনের পরে তার বাবা শ্রীভূবনবাবুর সংগে দেখা হোলো। প্রথম সাক্ষাতেই অন্য সব কথা বাদ দিয়ে প্রথম প্রশ্নই হোলো, "সেবা, চাল পেলি তুই?—আমি পাইনি।"

'সেবা' নিজের থলি থেকে অর্ধেক চাল তাঁকে দিয়ে বাড়ী ফিরে এলো।

বারিধি কাছেই ছিলো। দিনরাতই সে 'সেবা'কে চোখে চোখে রাখছে আজকাল। বললে এতো কষ্টে অর্জন করা ক্ষুধার অন্ন, তাও বিলিয়ে দিলে?

'সেবা' মুখ নিচু ক'রেছিলো, ব'লেছিলো, বাঃ, বাবাকে দেবোনা?

আরো অনেক কথাবার্তা হ'লো। বারিধি প্রচুর চাল দিয়ে সাহায্য করতে চাইলো তাকে।

কিন্তু রূঢ় প্রত্যাখ্যানে বারিধিকে হতচকিত ক'রে দিয়ে 'সেবা' চ'লে গিয়েছিলো সেদিন।

পুরশ্রী রিলিফের কাজ নিয়ে কাছাকাছি একটা গ্রামে এসেছে। সংগে বারিধি। তাদের সংঘের খেয়াল চরিতার্থ করবার নিঃসন্দেহে এটা একটা চমৎকার সুযোগ।

সুজন আজকাল সাবান বিক্রী করছে। প্রথমে হীরেন খাস্তগীর তাকে তার চেহারার জন্যে চিনতে পারেন নি। পুরশ্রী চিনতে পেরে ঘরে ডেকে নিয়ে বসিয়ে সাবান কিনলো।

এর মধ্যেই পুরশ্রী বললে, সুজন তার সংগে কোথাও চলুক। পুরোণো মোহের স্মৃতিটা তাকে দোলা দিয়েছিলো। কিন্তু 'সেবা' আছে তার সংগে,—সেটা সম্ভব নয়।

আরো নীচে নেমে এসেছে সুজন। এখন নিদারুণ অসুস্থ সে। বস্তিতে ঘরভাড়া নিয়েছে। বাড়ীউলি মাসী এবারে পথের ধারে দাঁড়াবার সুপরামর্শ দেয় 'সেবা'কে। বলে, স্বামী যার ঘরতে ব'সেছে তার আবার সতীপণা কিসের?

কিন্তু না, 'সেবা' ভিক্ষা করতেই দেয় হ'লো শেষ পর্যন্ত। একটা ছেলে পাকুলে ভিক্ষুকের ছবিটাতে সম্পূর্ণতা আসুধে। তাও সংগ্রহ হোলো।

এবারে শেষ দৃশ্য। ফুটপাথ থেকে অবাঞ্ছিত যারা, আবর্জনা যারা, তাদের গ্রেফ্‌তার ক'রে ধ'রে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে। 'সেবা'র কোলে ছেলে দেখে বারিধি যা পেলে একটা। মোটরটা জোরে চালিয়ে দিলে।

সন্ধ্যে হোয়ে এসেছে। ঘুরতে ঘুরতে পুরশ্রী আর বারিধিও আবার এসেছে সেখানে। এমন সময় পুলিশের গাড়ী এসে ফুটপাথের থেকে ভিখিরিদের গাড়ীতে তুলতে আরম্ভ করলো।

উপসংহারটা লেখকের অভিনব প্রকাশ ভংগী থেকেই তুলে দিলাম, কারণ এর মধ্যে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে, তা আমার বর্ণনার ভংগীতে মোটেই ফুটবে না!

"এই যে এদিকে। এরা দুজন।" কে একজন 'সেবা' ও পাশের ঘুমন্ত শিশুটাকে স্পষ্ট আঙুলে দেখিয়ে দিলে।

কে একজন বেহারী পাঞ্জাবীর মতো লোক। সংগে ধরসজ্জার একজন মহিলা! জামাটাই বুকের আবরণ। আচলটা বাহুল্য। মুখে উগ্র কারুকাজ। ওরা কর্তা-ব্যক্তিদের সাহায্য করছে সেটা বোঝা গেল। এই এখন এদের কাজ। ফুটো জাহাজকে মেরামতের জন্যে বন্দরের কারখানায় নিয়ে যাওয়া। এই এখন এদের নতুন চাকরী।

'সেবা' করুণস্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠলো; আমি না, —আমি না। আমি ভিখিরি নই।

সমস্ত কথা খতিয়ে দেখবার সময় কোথায়। সংগে যে তার ছেলে, সে যে ফুটপাথে, সে যে কংকালসার এইটাই তার ভিখিরিত্বের আপাত প্রমাণ।

টেনে ঠেলে তুলে দিলে 'সেবা'কে, আর তার ছেলেকে।

বেহারী পাঞ্জাবীটাকে চিন্‌তে পেরেছে 'সেবা।' চিন্‌তে পেরেছে তার কণ্ঠস্বরের কাঠিন্যে। চেঁচিয়ে উঠ্‌লো সে আর্তকণ্ঠে: বারিধিবাবু, বারিধিবাবু আমি। আমি। আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছে? আমি কি ভিখিরি?

পুরশ্রী কৌতূকান্বিত হ'য়ে বললে এ তোমাকে চেনে দেখ্‌ছি।

বারিধি অদৃশ্যায়মান গাড়ীর দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হেসে বললে "এদের মধ্যে এতো রিলিফের কাজ ক'রেছি, আর আমার নামটা জান্‌বেনা!" (পৃঃ ১৪৪, যায় যদি যাক।)

এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি।

এবার আমাদের বক্তব্য। সমালোচনার প্রথমে সবচে মনে রাখ্‌তে হবে, এটা একটী কাহিনী, উপন্যাস নয়। সমস্ত আখ্যান বস্তুটীর মধ্যে যে বিষয়টীকে নেওয়া হ'য়েছে এবং যে সব চরিত্রকে চলাফেরা করতে দেখা গেলো তারা এক একটী মহৎ আদর্শ নিয়ে কেউ আসেনি, বা একটা বিরাট মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার শুভ ইচ্ছা নিয়েও লেখক এ কাহিনী লেখেন নি। আমাদের ভাগ্য-বিধাতা একদা আমাদের দেশের উপর দিয়ে যে প্রবল ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন, তারই ছিন্নভিন্ন ঘটনাগুলির ইতিহাসকে লেখক জীবন্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন। কি ক'রে একটী সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার তার নিজের আসন থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে অবশেষে পথের ভিক্ষুকে পরিণত হোলো, সমস্ত কাহিনীর মধ্যে এইটাই ছিলো মূল ঘটনা। কিন্তু আসলে এটা প্রতীকের কাজ ক'রেছে। এই যুদ্ধ—এই দেশের বর্বর শাসন এবং রাষ্ট্রের ব্যবস্থা যে কি ক'রে সম্ভ্রান্ত সম্মানিত মানুষকে লাঞ্ছনার চরম অধঃপতনে নামিয়ে এনেছে, আমি বলবো, এই কাহিনী তার চরম নিদর্শন। এই লাঞ্ছিত ঘৃণিত জীবন যদি এইভাবেই যায়—যাক্। সেব ঘর হোক্, কোনো দুঃখ নেই আমাদের, কোনো ক্ষোভ নেই। যারা প্রপীড়িত, যারা প্রতিদিন রাষ্ট্রের চক্রান্তে নিরীহ কীটের মতো আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হোলো তাদের জীবনের জন্যে সহানুভূতি দেখানোর অর্থ কোথায়? একান্তই এ সব জীবন 'যায় যদি; যাক্।' আমার মনে হয়, গ্রন্থকার এই অর্থই করতে চেয়েছেন। অন্তত ঘটনার বিন্যাস থেকে সেই কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

আর একটা কথা। এই কাহিনীর স্বাভাবিকতাই এ রচনার লক্ষনীয় বৈশিষ্ট। এখন আমাদের ভেবে দেখ্‌তে হবে, স্বকীয় ক্ষেত্রে এই শিল্প কতোদূর রসোত্তীর্ণ হোতে পারলো।

ভূমিকাতেই ব'লে রাখা ভালো, আমাদের আজকের এই সমালোচনা, সম্পূর্ণ একজন সাধারণ পাঠকের মনে রচনাটী কেমন লেগেছে, সেই দৃষ্টিভংগী থেকে করা হ'বে। উপন্যাস-এর নিয়ম অনুযায়ী কোনো জায়গায় ব্যাকরণ-গত ভুল ঘট্‌লো কিনা সে প্রশ্ন এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। ব্যাকরণের খুঁটি-নাটীর থেকে হৃদয়ের আবেদনটাকেই বড়ো স্থান দেওয়া হ'বে। সুতরাং যদি কোন নিষ্ঠাবান সাহিত্য সমালোচক, চিরাচরিত প্রথানুযায়ী এ-আলোচনায়

সে সব ত্রুটী লক্ষ্য করেন, তাহ'লে আমরা করযোড়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বিনীত ভাবে জানাবো, এইটেই আমাদের দৃষ্টিভংগী।

প্রথমেই চরিত্রগুলি সম্বন্ধে কিছু ব'লে নিতে চাই। যে ক'টী মানুষকে দেখ্‌লাম, তার মধ্যে সব থেকে বেশী ক'রে চোখে পড়েছে 'সেবা'কে। খুব স্পষ্ট, খুব সুন্দর হোয়েছে 'সেবা'। তার চলাফেরা, কথাবার্তার মধ্যে এক গ্রাম ছাড়া আর কোথাও আড়ষ্টতা লক্ষ্য করিনি। সহর থেকে পালাবার বিরাট আতঙ্কের মধ্যে বাইরে যাওয়া হবে কি হবে না, চিত্তের এই দোলায়মান অবস্থাতেই তাকে প্রথম দেখি। তার বাবা শ্রীভূষণবাবু অত্যন্ত সাধারণ একজন কেরাণী; অনেক আপত্তির পর সুজনকে শিক্ষক হিসেবে রেখেছেন। এই পরিবেশের মধ্যে সেবাকে দেখে মনে হয়, সে যেন আমাদের নিত্যদিনের পরিচিতা। রোজই তাকে দেখি, কথা বলি, গল্প করি। চরিত্রাংকণের এই পদ্ধতিটাই সব থেকে সার্থক চেষ্টা ব'লে মনে হয়। 'সেবা' নামটী তার চরিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হোয়েছে।

'সেবা' সম্পূর্ণ নাগরিক চরিত্র হ'য়েছে। সন্দেহ নেই 'সেবার' প্রতি লেখকের পক্ষপাতিত্ব সর্বাধিক। সুজনের উপরে 'সেবার' আস্থা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক হোয়েছে, এবং সেই সংগে একথাও ঠিক, 'সেবা' চরিত্রটীর মধ্যে লেখকের একটা আদর্শের চেরাগের আভাষ আছে। কাহিনীর শেষের দিকে 'সেবা' আরো স্পষ্ট এবং আরো উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছে, এবং তাকে দিয়ে এইখানে লেখক যে সব করুণ দৃশ্যের অবতারণা করিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ শিল্পীজনোচিত হোয়েছে।

সব থেকে 'সেবা'কে ভালো লাগ্‌লো, যখন সে জীবনের চরমতম বিপদের সময়ে নিঃসংশয়ে সুজনের ওপরে সমস্ত অপবাদ অর্পণ করলে। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এটা খুবই দৃষ্টিকটু লাগে, কিন্তু এর মধ্যে 'সেবা'র সুজনের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাসের যে ছবিটীকে লেখক এঁকেছেন, সত্যিই তা প্রশংসনীয়। শেষ পর্যন্ত 'সেবা' একথা জান্‌তো যে সুজন সত্যিই সু-জন, আর সে তাকে প্রাণ দিয়েই ভালোবাসে; তার জীবনের নিশ্চিত নির্ভর সে।

'সেবা'কে অনেক দুঃখ এবং কষ্টের আগুনে পুড়িয়ে তার ভিতরের খাটী সোনাটুকুকেই আমাদের পরিবেশন করবার চেষ্টা ক'রেছেন লেখক। হয়তো খানিকটা সার্থক হোয়েছেন, কিন্তু তাতে সম্পূর্ণতা আসেনি। আমার মনে হয়, 'সেবা'কে প্রথম থেকেই একটী পরিপূর্ণ 'সাধারণ মেয়ে' ক'রে আঁক্‌তে চাইবার এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। 'সেবা' হয়তো সেদিক থেকে সার্থক হ'তে পারতো, যদি তার মধ্যে সমাজ সচেতনতাটা এতোটা প্রবল না হোত। নিজের দেশ সম্বন্ধে তার চিন্তা, ভাবনা মিলিয়ে তাকে খানিকটা যেন, ক্ষণিকের জন্যে হোলেও, অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন; সেখান থেকে আবার সেই গতানুগতিকের পথে ফিরে আসায় একটু যেন ছন্দপতন ঘটেছে ব'লে মনে হয়। তবু অন্য দিক থেকে দেখ্‌লে 'সেবা' সার্থক।

এর পরে স্বভাবতঃই সুজনের কথা মনে হয়। এই কাহিনীতে এটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, প্রত্যেকটী চরিত্রকেই খুব অল্প পরিসরের মধ্যে প্রকাশ করতে হ'য়েছে। কারুর সম্বন্ধেই লেখকের সুবিস্তৃত পটভূমিকায় চরিত্রাংকণের অবকাশ নেই। নিতান্ত সহজ সাধারণ একটী স্কুল মাষ্টার হিসেবেই সুজনকে আমরা প্রথম থেকে দেখেছি।

তবু তারই মধ্যে সে যে লেখক, এমন কথাও প্রথমের দিকে গ্রন্থকার আভাষ দিয়েছেন, দুঃখের বিষয় সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সেই স্বীকারোক্তির কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না। সুজন সম্বন্ধে ভাব্‌তে গিয়ে তাই প্রথমেই মনে পড়ে, জাপানী বোমার ভয়ে সমস্ত দেশ যখন উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর, তখন সে এসে 'সেবা'কে প্রশ্ন করলো:—

"তোমরাও চল্‌লে?

—উপায় কি! তুমি? 'সেবা'র চোখ ঝিকিয়ে উঠলো।

—আমি পালাবো কেন? আমি যুদ্ধ করবো।

—যুদ্ধ করবে! কি দিয়ে? কলম দিয়ে?

সুজনের পাঞ্জাবীর বুক পকেটে সস্তা ক্লিপে আঁটা থেলো ফাউন্টেন পেনের দিকে ইংগিতটা ঝল্‌সে উঠ্‌লো।

—হ্যা, কলম দিয়েই! যার যা কাজ, তাতে অবিচলিতভাবে লেগে থাকাই হচ্ছে যুদ্ধ করা।"

(পৃষ্ঠা ৮—যার যদি থাকে)

সেখানে তার সমস্ত চরিত্রে যখন দেখি কাজের থেকে কথাটাই বড়ো হোয়ে উঠেছে, তখন একটু যেন কোথায় রসবোধে বাধা ঘটে। এর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে হয়তো একথাও বলা চলবে, যে সেইটাই তো স্বাভাবিক—পারিপার্শ্বের চাপে সুজনের মধ্যে যদি সে সব শুভ ইচ্ছা থেকেও থাকে, তাহ'লে একেবারেই তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়ে গেছে—সেই আসল মানুষটীকে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। উত্তরে আমরা বলবো, মেনে নিলাম, এটা যুক্তিযুক্ত; কিন্তু যে সুজনকে সমস্ত কাহিনীটার কেন্দ্র-নির্ভর বলা যায়। যার প্রত্যেকটী চলাফেরার মধ্যে 'সেবা' এবং আরো অনেকের প্রকাশ নির্ভর করছে, তাকে আমরা আরো একটু স্পষ্ট ক'রে পাবো না কেন? আর তার মেরুদণ্ড এতো দুর্বলই বা হবে কেন? যার মধ্যে একদা দেবতার প্রেরণা দেখলাম, তার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর মহত্ত্ব প্রকাশের সুযোগকে লেখক অবহেলা করলেন কি ক'রে? অবশ্য একেবারে অবহেলা করেন নি; কিন্তু যেন কম দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন; সব সময়ে তাঁর লক্ষ্য ছিলো, আমাদের দেশের সেই সাময়িক চরম দুর্ভাগ্যকে এই কাহিনীর মধ্যে মর্মান্তিক ক'রে আঁকতে হবে—আমার কাছে চরিত্রাংকণ শিথিল হওয়ার সেইটেই একমাত্র কারণ ব'লে মনে হয়েছে!

এর পরে বারিধি। এক কথায় নিখুঁত নিটোল বলা যায়। প্রত্যেকটী চলাফেরা কথাবার্তা চমৎকার হোয়েছে। বারিধিকে আঁকতে গিয়ে লেখক যেখানে বলছেন :—

"উদ্ধত 'না' এই বারিধি। নির্মম নাস্তিবাদী। ধরো ঈশ্বর। কি এই ঈশ্বর? ধনতান্ত্রিক সমাজে নির্ধনের জন্যে স্তোক—সস্তায় সান্ত্বনার ব্যবস্থা।.....কিসের তোমার কর্মফল? তুমি যে গরীব হোয়ে জন্মেছো। সেকি তোমার দোষ না সমাজের অপরাধ?"

তখন তার সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় থাকে না। সব থেকে ভালো লাগে তার কথাবার্তা। এতো স্বাভাবিক এবং সার্থক সৃষ্টি এ গ্রন্থের মধ্যে আর একটীও চোখে পড়েনি।

দেশ সেবার অংগাবরণ গায়ে জড়িয়ে যে সব মানুষ প্রতিদিন জনসাধারণকে এইভাবে বঞ্চনা করে, তাদের কথা বারিধির মধ্যে দিয়ে লেখক যে ভাবে বলতে পেরেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তবে পরবর্তী জীবনে ক'লকাতায় এসে পুরশ্রীর সংগে তার আলাপ পরিচয় এবং অন্তরংগতা বেশ খানিকটা নাটকীয় ব'লে মনে হোয়েছে। 'সেবা'র প্রতি যে তার লক্ষ্য থাকবেই, এটা বলা বাহুল্য—কিন্তু সেই সূত্রে পুরশ্রীকে আবিষ্কার ক'রে তাকে নিয়ে তার সেই উদ্দাম প্রণয় লীলার পুনরাবৃত্তি ক্লান্তিকর। শেষের দিকে বারিধির এই পরিণতিটা একটু অতিকথন দোষে দুষ্ট ব'লে মনে হয়। অবশ্য একথাও বলবো, বারিধির মতো মানুষের পক্ষে আর অন্য কোনো পরিণতির কথা তো ভাবা যায় না। সুতরাং এটা হোতে বাধ্য—তবু এইরকম একটা সবল চরিত্রকে পেয়ে প্রথমে মনে হোয়েছিলো, হয় তো লেখক এর মধ্যে সত্যিই একটা কিছু দেখাতে পারবেন। কিন্তু তা হয় নি! সেই জন্যেই আমার মনে হয়, বারিধির মতো চরিত্রকে পড়তে ভালো লাগে, তার সম্বন্ধে কৌতূহলও জাগে, কিন্তু মনের মধ্যে চিরকালের স্থায়ী আসন পাততে পারে না। আমাদের বর্তমান সাহিত্যে সেটাই সব থেকে ত্রুটী ব'লে মনে হয়। সেই শক্তি আর সৃষ্টি কোথায়?

এবারে পার্শ্ব চরিত্রগুলি। ডাক্তার সঞ্জীবন সিংহ ভাল ফুটেছেন। ইরেন খাস্তগীর, শ্রীভূষণবাবু, মহামায়া সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছু নেই!

তবে 'সেবা'র সেই চরম দুর্দিনে তার উপরে ক্রুদ্ধ হ'য়ে শ্রীভূষণবাবুর ছত্র-প্রহারটা কি জানি কেন বড়ো চোখে লেগেছে। এটা একটু বাড়াবাড়িই হ'য়েছে বলবো। গঞ্জনা বা লাঞ্ছনার চেহারাটা লেখক অন্যভাবে আরো করুণ ক'রে দিতে পারতেন। স্বাভাবিক হোয়েছে কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর, সেদিক থেকে বিচার করলে হয়তো খুবই ঠিক হোয়েছে, কিন্তু রুচিকে পীড়িত করে যে রচনা, তাকে স্বাভাবিকতার দোহাই দিয়ে শিল্প-ক্ষেত্রে প্রবেশপত্র দিতে একটু বাধে বৈ কি?

রাধার চরিত্রটী এককথায় চমৎকার।

(ক্রমশঃ)

"রবীন্দ্রকাব্যের সুর।"

অশোক সেনগুপ্ত।

ভাবসংহতি সমন্বিত কবির হৃদয়খানি যেন কাব্যলক্ষ্মীর পূজার ডালি। কবিমনের অন্তরের অন্তঃস্থল হতে যে সুরের রিণিকিণি তাঁর ভাবাপ্লুত চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তোলে—সেই যে সুরের অকথিত অনুভূতিপূর্ণ আবেদন, কবি-হৃদয়ের মণিকোঠায় একান্ত সঙ্গোপনে একান্ত সংগতনে রক্ষিত যে ভাবসম্পদ—তাহাই কাব্যলক্ষ্মীর সংস্পর্শে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সেই সুরের আলাপনকে সার্থকতার গৌরবমুকুটে বিভূষিত করে। কবির কাব্য কোন সাধারণ ধরা-ছোঁয়া বাঁধা-ধরা সীমার বাইরে। অনন্ত দিগন্তের মতই তাহা বিশাল—অতল সমুদ্রের মতই তাহা গভীর—মেঘে ঢাকা আলোছায়া ঘেরা ঐ আকাশের মতই তাহা রহস্যময়, সীমাহীন। যে সূক্ষ্ম অনুভূতি কোন এক অজানা অচেনা, কোন এক আকস্মিক হৃদয়াবেগে কক্ষচ্যুত উল্কার মতই সহসা স্থানভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যুতগতিতে কোন আর এক বিরাট সম্ভাবনার দিকে ছুটিয়া চলিবে—কবি ভিন্ন কে তাহার গোপন সন্ধান রাখিবে? হৃদয়ের সঙ্গেই যে কবির কারবার! সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়েই যে তাঁর জগত।

কবি জীবনের আশা আকাঙ্খা অপরিমিত। তাই কবির চোখে ফুল শুধু আগামী ফলেরই ইঙ্গিত দেয় না—উহা কবির মানসনন্দনে সুরভিত পারিজাত! কবিমন হু হু করিয়া তার কল্পনার পক্ষীরাজে আরোহণ করিয়া কোন এক অজানা অচেনা অকথিত ভাবরাজ্যের প্রতি ধাবিত হইতে চায়। তাই আমরা দেখিতে পাই কবি চিরদিনই পৃথিবীর ধূলিধূসরিত, স্বার্থ পঙ্কিলতার ক্লেদগন্ধে ভরপুর স্থূল বাস্তবতা হইতে বহু উর্দ্ধে বিচরণ করেন। কবি ক্ষুদ্র কিছু চিন্তা করিতে পারেন না—চিন্তা করিতে চান না—চিন্তা করেন না। চিরসুন্দরের চরণতলে উৎসর্গীকৃত কবি যে চিরসত্যের পূজারী। তিনি 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এর উপাসক। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি সবার—সকলে তাঁর! কবি তাঁর জীবনের যতকিছু ভালবাসা—ভালো লাগা,—তাঁর না পাওয়ার বেদনা—চাওয়ার আকুলতা—পাওয়ার সফলতা—ব্যর্থতার পুঞ্জীভূত গ্লানি, সব কিছুই হৃদয় উজাড় করিয়া কাব্যলক্ষ্মীর চরণতলে উৎসর্গ করিয়াছেন। কবি জানেন যে কাব্যলক্ষ্মীর সুপ্রসন্ন কটাক্ষ ব্যতীত তাঁর সাধনা বিফল। তাই তিনি গাহিয়াছেন "যত সাধ ছিল, সাধ্য ছিল না।" এই যে বিফলতা ইহা জগৎবাসীর অনুপভোগ্য হইতে পারে—কিন্তু ইহাই তো কবির একান্ত আপনার। যে চিন্তাধারার সুকোমল কুঁড়ি এখনো শতদলরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করে নাই—তাহাই তো কবির নিজস্ব! ইহাই তাঁহার দেবতাকে অর্ঘ দিবার শ্রেষ্ঠ ধন! যাহা সফলতায় পরিণত হইয়াছে তাহা তো বিশ্বগত হইয়া পড়িয়াছে—গোপনতার যে সুনিবিড়তা—তাঁহা তো সকলের নিকট পরিস্ফুট হইয়া তার সৌরভ বিলাইয়া নিজে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁর সার্থকতা সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

"দেবি, এ জীবনে আমি গাহিয়াছি
বসি অনেক গান
পেয়েছি অনেক ফল
সে আমি সবারে বিশ্বজনারে
করেছি দান
ভরেছি ধরণীতল।"

এই 'সোঁপন' সম্বন্ধে পাশ্চাত্য কবি Robert Browning এর কণ্ঠেও আমরা এই সুরই ধ্বনিত দেখিতে পাই—

"Thoughts hardly to be packed
Into a narrow act,
Fancies that broke through language and escaped;
All I could never be,
All, men ignored in me,
Thus, I was worth to God, whose wheel the pitcher shaped."

কত কামনা বাসনাই না কবির হৃদয়ে সতত বিরাজমান। কিন্তু কতটুকুই বা তিনি সফলতার রূপ দিতে পারিয়াছেন। কবি বিশ্বাস করেন তাঁর বিফল সাধনারাশি কাব্যলক্ষ্মীর পূজার উপযোগী অনাঘ্রাত কুসুমপুঞ্জ ব্যতীত আর কিছুই

নয়! সারাজীবন কবি তাঁহার ক্ষীণ অনুভূতি, অব্যক্ত ভাব, ভাষায় ধ্বনিত করিতে চেষ্টিত হইয়াও বিফল হইয়াছেন। তাই ভাষায় ব্যক্ত করিবার তাঁর যে সাধু প্রচেষ্টা—সেই শ্রেষ্ঠধনই কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর চরণে নিবেদন করিয়াছেন—

"যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠধন
দিতেছি চরণে আনি—
অকৃতকার্য, অকথিত বাণী অগীত গান
বিফল বাসনা-রাশি।"

আমরা সারা রবীন্দ্র কাব্যে এই সুরই ধ্বনিত দেখিতে পাই। সার্থকতার ভরপুর বিশ্ববরেণ্য কবির আশা এত লাভেও সীমাবদ্ধ হয় নাই—তাঁর ভাবলিপ্সু মন বার বার তাঁকে আঘাত করিয়াছে আরও আরও দূরে অগ্রসর হইতে। অজানাকে জানিবার আকুলতা তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই সত্যের পূজারী কবি সত্যের সন্ধানে ডুবুরির ন্যায় কাব্যসমুদ্রে রহস্যঘেরা গভীর অতলে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন আজীবন। মানুষ রবীন্দ্রনাথ—কবি রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন। মানুষ তার ব্যক্তিত্বের উপর তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু কবি নিজে জানেন না যে তিনি কি চান—কি তাঁর বক্তব্য! অন্তরের মধ্যে যে কাব্যরস অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা কাব্যলক্ষ্মীর কটাক্ষে হয়তো বা সফলতার যশমুকুট অর্জন করিবে—না হয় বিফলতার স্তূপ নীরবে বহন করিতে হইবে। এই যে অজানা অচেনা কাব্যলক্ষ্মী, কবির মানসী, তাঁর জীবনদেবতা—যার মূলে তাঁর এই রচনাশক্তি—এরই সন্ধান করিয়া গিয়াছেন কবি নিশিদিন তাঁর অমর কাব্যের মধ্য দিয়া। কাব্যলক্ষ্মী ব্যতীত তাঁর কোন পৃথক সত্তা নাই—ইহা অনুভব করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"অন্তর মাঝে বসিয়া অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুর।"

আর এক স্থানে—

"কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার
কেহ এক বলে কেহ বলে আর
আমারে শুধায় বৃথা বার বার
দেখে তুমি হাস বুঝি।
কে গো তুমি, কোথা রয়েছ গোপনে,
আমি মরিতেছি খুঁজি।"

.....কবি তাঁর জীবনে সফলতা অর্জন করিয়াছেন প্রভূত। কিন্তু যখন মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের কাঁপি খুলিয়া কবি রবীন্দ্রনাথের বিচার করিতে বসিয়াছেন—তখন এক মহাসত্য তাঁর চক্ষে ধরা পড়িয়াছে। তাই তাঁর আত্মপরিচয়ে তিনি বলিয়াছেন "আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই, এ একটা ব্যাপার যার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না।" তাই তিনি লিখিয়াছেন—

"এ কী কৌতুক নিত্য নূতন
ওগো কৌতুকময়ী
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই।"

.....রবীন্দ্রকাব্য চিরদিন সঙ্কীর্ণতার হীন ক্ষীণ গণ্ডি কাটাইয়া নিজেকে সারা বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের ভিতর মানুষ রবীন্দ্রনাথ যত-বার তার বাস্তবতা সঙ্কীর্ণতা কাব্যের ভিতর সীমাবদ্ধ করিতে গিয়াছেন—কবির কাব্যমানস বার বার কল্প-লোকের মহিমায় এবং কাব্যের স্বভাবগত ধর্মানুসারে তাহাকে বিগলিতবিস্তৃত, সুমহান করিয়া তুলিয়াছেন। আত্মগত ভাবটা তখন আপনা থেকেই বিশ্বগত হইয়া পড়ে। তাই কবি লিখিয়াছেন—

"বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপন কথা আপন জনারে
শুনাতেছিলাম ঘরে দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে বহিয়া অনলে
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে
নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে ধরার মত।"

এই মানসলোকের কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধানেই কবি করিয়া গিয়াছেন আজীবন সাধনা। কিন্তু কাব্যলক্ষ্মীর বরপুত্র কবির সঙ্গে কাব্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য মিশিয়া অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন—আর তার কোন পৃথক সত্তা ছিল না। কবি শেষে বুঝিয়াছিলেন যাহা যত গভীর তাহা তত রহস্যময়—তত গোপন—তত আপনার। তাই তিনি তাঁর কাব্যে অন্তরকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন

"যদি কৌতুক রাখ চিরদিন
ওগো কৌতুকময়ী
যদি অন্তরে লুকায়ে রহিয়া
হবে অন্তর জয়ী,
তবে তাই হক। দেবী, অহরহ
জনমে জনমে রহ তবে রহ—"

কবির কাব্যে জীবতদেবতা সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত এই সুরই ফুটিয়াছিল—এই সত্যই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।"

"অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।"

—বন্দিতা—

কুমারী মীরা চক্রবর্ত্তী

উজ্জ্বল ধারা স্রোতে অমলিনা বর্ষা।
কবিদল বন্দিতা সুরভিতা হর্ষা॥
ধরণীতে আনো তুমি অপূর্ব হিল্লোল।
তটিনীর প্রবাহেতে তুমি তব কল্লোল॥

প্রকৃতিরে নবসাজে সাজাইয়া নিত্য।
পুলকেতে হয় সে যে স্পন্দিত চিত্ত॥
তৃণ দলে বারি দিয়ে কর তুমি সিক্ত।
চঞ্চল-অঞ্চলা নহ তুমি রিক্ত॥

উত্তাপ ভরা বুকে আনো তুমি শান্তা।
স্নিগ্ধা, রম্যা এসো ওহে মেঘ-কান্তা॥
বহুরূপীর কেকা রব পশে আসি' কর্ণে।
রামধনু দেয় দেখা মনোরম বর্ণে॥

সুন্দরী শ্রেষ্ঠা গো এসো গীতি ছন্দে।
আকুলিত ধরণী যে তোমারেই বন্দে॥

হে সাহসিকা

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

দেখেছিনু তারে গ্রামের প্রান্তে,
ভরা ঘট নিয়ে স্নান দিনান্তে
একাকী চলিতে, হায় অজান্তে—
নির্জন বনছায়;
শুনিনাই কথা, জানি নাই নাম,
কি তার শিক্ষা, কি-বা তার দাম!
এইটুকু শুধু বুঝিয়াছিলাম,
যাবে কোনো আঙিনায়,
ভীরু চাহনির সেথা হবে শেষ,
খুলিবে ঘোমটা, খুলে দেবে কেশ,
বাংলার বধূ আপনার দেশ
চিনিবে ঘরের কোনে!
চাঁদের আলোতে মায়া যে কি আছে,
হেনা কি সুবাস বিলায়ে গিয়াছে,
কোথা অপমান, মান কার কাছে,
বুঝিতে পারেনি মনে।
মনে করেছিনু, বাঙালীর মেয়ে
যেথায় থাকুন, বড় এর চেয়ে
হবেনা কখনো; বৃথা সন্দেহে
যবনিকা টেনে দিয়ে—
এরা কারা এলো পথে ও বিপথে
হাজার হাজার অঙ্গন হ'তে?
অবারিত মনে দুর্বার স্রোতে
বিপুল ভরসা নিয়ে?
ফুটপাথে, ট্রেনে, বাসে আর ট্রামে,
নির্ভয় মনে ওঠে আর নামে,
আসে সংসারে ঘোর-সংগ্রামে
সহায়তা তার দিতে;
কারো তার নয়, আপনার বোঝা
আপনি সে বহে, চলা হয় সোজা,
পাউডার শাড়ী জুতো আর মোজা
গয়না সে চেয়ে নিতে।
সরে যায় চোর, যায় গাড়োয়ান,
চেয়ে চেয়ে দেখে কালো পালোয়ান,
সারা ভারতের বৃদ্ধ জোয়ান
ফিরে ফিরে দেখে চেয়ে!
বিশবছরের ছোট ব্যবধানে
শিক্ষা, সাহস, জীবনের গানে
কি ক'রে লভিলো? হৃতসম্মানে
ফিরালো বাঙালী মেয়ে?
দীপ্ত-চাহনি, দৃপ্ত ভঙ্গী,—
এই আজ তার আপন সঙ্গী,
ভীরু নয় আর, এখন অঙ্গী
দেহমন তার বুঝি!
কিছু বাচালতা চঞ্চলতায়,
কিছু উচ্ছ্বাস চপল কথায়,
ক্ষমা কোরো, তার হাতে হাতিয়ার
পেলো কি কোথাও খুঁজি?
দেখিয়াছে ছবি, লভিয়াছে বাণী,
মুছিয়া ফেলেছে সঙ্কোচ গ্লানি,
শুনিয়াছে, ছিল কাশ্মীর রাণী,
হাজরা মাতঙ্গিনী;
দেখিয়াছে চোখে বিপুল বন্যা
স্বাধীন দেশের স্বাধীনা কন্যা;
জানিয়াছে আর নয় নগণ্যা,
হবে রণরঙ্গিনী।
গ্রামে আজ যারা জল নিয়ে আসে
তারাও পড়েছে ম্যাট্রিক ক্লাসে,
অবগুণ্ঠনে কেশ বিন্যাসে
তাই রাখে নাই ঢেকে।
বাহিরে ও ঘরে সারা দেশ ভ'রে
উজ্জয়িনীই জাগে মন্বরে,
ওগো সাহসিকা, চল জোরে জোরে
রেখা যাও রেখে রেখে॥

রোমান্স*

সন্তোষ কুমার অধিকারী

নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত ব্রোকার হারভে ম্যাক্সওয়েলের অফিস সেক্রেটারী পীচার আজ একটু আগেই অফিসে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু মিঃ ম্যাক্সওয়েলকে আজ তাঁর তরুণী টেনোগ্রাফারের সঙ্গে ঠিক সাড়ে নটায় ব্যস্তভাবে অফিসে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর ভাবহীন মুখমণ্ডল বিস্ময়ে যেন একটু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অভ্যাস মত তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়েই মিঃ ম্যাক্সওয়েল তার চেয়ারে প্রায় লাফিয়ে এসে বসলেন ও সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর গাদা ক'রে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রামের মধ্যে নিমেষের মধ্যেই তলিয়ে গেলেন।

তরুণীটি প্রায় বছরখানেক যাবত ম্যাক্সওয়েলের অফিসে রয়েছে। তাকে সুন্দরী বলা চলে। বরং তার সৌন্দর্যে এমন একটি বিশেষত্ব রয়েছে যাতে সাধারণ টেনোগ্রাফার বলতে আটকায়। রুজ ও লিপ্‌স্টিকের মত আধুনিক প্রসাধনের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠেছে। দেহে অলঙ্কারের বাহুল্য মোটেই নেই। শুভ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাকেই তার সৌন্দর্যের জ্যোতি যেন বেড়ে উঠেছে। মাথায় কালো টুপীতে সোনালী রঙের পাখীর মুখ! চোখ দুটি ঈষৎ স্বপ্নালু, গালে অরুণাভার ছোঁয়া, সমস্ত মুখটাই যেন উজ্জ্বল, অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশী সুন্দর।

পিচার একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলেন—অন্য দিনের মত তার নির্দিষ্ট স্থানে না গিয়ে তরুণী আজ ম্যাক্সওয়েলের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। তার ভঙ্গী একটু দ্বিধান্বিত অথচ নীরব। ম্যাক্সওয়েলকে না ডেকে সে তাঁর টেবিলের ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়লো!

টেবিলের পিছনে যে লোকটি বসে তাকে আর মানুষ বলা চলে না; নিউইয়র্কের এক অতিব্যস্ত ব্রোকার—মেসিনের মতই তার মন ও দেহ এক সঙ্গে কাজ ক'রে চলেছে। তার হাত বা চোখের দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে বিরতি নেই। একটা মোটা খাম খুলতে খুলতে নিমেষের জন্যে ম্যাক্সওয়েল তাঁর ধূসর চোখ দুটি তরুণীর ওপর বুলিয়ে নিলেন ও অত্যন্ত দ্রুত তার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন—কি চাই, কিছু বলবার আছে?

"না"—তরুণী সলজ্জ হাসির সঙ্গে নেমে এলেন। পিচারের দিকে চেয়ে সে একবার মৃদু কণ্ঠে বললো—মিঃ ম্যাক্সওয়েল কি কাল আপনাকে অন্য একজন টেনোগ্রাফার নিয়ে আসতে বলেছিলেন? পিচার উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, তিনি বলেছিলেন। আমি কালই বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছি। এখনও কেউ এসে পৌঁছায় নি।—তাহ'লে যতক্ষণ কেউ এসে আমার চেয়ারে না বসছে, ততক্ষণ আমিই কাজ চালিয়ে যাই। উত্তরের প্রত্যাশা না ক'রে তরুণী তার স্থানে গিয়ে বসলো—টুপীটি খুলে রেখে কাজ সুরু করে দিলো সে।

বহৎ জীবনের কর্ম ব্যস্ততার উল্লেখে অনেক প্রশংসা রয়েছে আমাদের সাহিত্যে; একটি ব্রোকারের সময়-টুকু, শুধু কর্মব্যস্ত নয়, তার প্রত্যেক মুহূর্তটি পর্যন্ত অমূল্য। তার টেবিলের ডানে বাঁয়ে সামনে পিছনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অবিশ্রান্ত চিঠি ও টেলিফোনের ভীড় ঠেলে মানুষ তখন মেসিন হয়ে ওঠে।

ম্যাক্সওয়েলের অফিসেও এমনি একটি ব্যস্ত দিন আজ। প্রতি মুহূর্তে মানুষের ভীড় ছিটকে আসছে তার টেবিলে। তাদের কারও সঙ্গে হাসিমুখে কারও সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে কথা বলা। বেয়ারাগুলি অনবরত টেলিগ্রাম ও চিঠি নিয়ে ছোটাছুটি করছে। ঝড়ো সমুদ্রের জাহাজের নাবিকের মত অফিসের কেরাণীগুলিও ব্যস্ত ও চঞ্চল।

শেয়ার বাজারে প্রতিমুহূর্তেই বিপর্যয় ঘটতে থাকে,—প্রতিমুহূর্তে তার জাহাজডুবি হয়, পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। শেয়ার ব্রোকারের অফিসকেও এই বিপর্যয় তেমনি বেগেই আঘাত করে। চেয়ারটাকে পেছনে ঠেলে ফেলে ম্যাক্সওয়েল এই ভূকম্পনকে সামলাতে থাকেন। নর্তকের মতনই তিনি নিজের টেবিল থেকে টেলিফোনে, টেলিফোন

*O' Henry'র "The romance of a New Yorke brother" গল্পের অনুবাদ।

ছেড়ে অন্য টেবিলে লাফাতে থাকেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেও হঠাৎ ম্যাক্সওয়েলের নাকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এলো। উঁচু ও কাঁপালো গোলাপী সিল্কের ফ্রক ও পালক গোঁজা কালো ভেলভেটের টুপীর ওপর তাঁর দৃষ্টি আছড়ে পড়লো। ম্যাক্সওয়েলের চোখ এক মুহূর্তে আতুর হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর সামনেই পীচারের পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণী মহিলা।

পীচার বললেন—কাল আমরা একজন টেনোগ্রাফার চেয়ে একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম; ইনিই এসেছিলেন তার জন্যে। ম্যাক্সওয়েল ফিরে দাঁড়ালেন। তাঁর দুই হাতে ভর্তি কাগজপত্র। ভ্রূ কুঁচকিয়ে বললেন তিনি—কিসের জন্যে?

—টেনোগ্রাফার একজন দরকার। আপনি কাল বলেছিলেন.....ম্যাক্সওয়েলের মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠ্‌লো—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে পীচার। মিস্ লেসলি আজ এক বছর ধ'রে আমাদের এখানে ভালো ভাবেই কাজ করছেন। তিনি নিজের ইচ্ছের চলে না গেলে আমরা তাঁকে ছাড়বো কেন? আমি বড়ই দুঃখিত মিস্.....আমাদের এখানে আপাততঃ কোন চাকরী খালি নেই।

সেই গোলাপী সিল্কের ফ্রক অত্যন্ত রাগতভাবেই অফিস ত্যাগ করলো। পিচার ফিরে এসে এক বুড়ো কেরাণীর কাছে দাঁড়ালেন; বললেন—দেখেছেন, মাথা খারাপ হয়েছে আমার? আর উনি যে আজকের কথা কাল ভুলে যাবেন—তাতে দোষ নেই।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাজের বেগও বেড়ে উঠতে লাগলো। অফিসের মেঝেতে পার্টির শেয়ার ডিবেঞ্চারের স্তূপ জমে উঠলো! প্রতিমুহূর্তে শেয়ার কেনা ও বিক্রীর নির্দেশ এসে জমছে। কোন কোন ষ্টকের দাম হঠাৎ পড়ে যাওয়ার অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। আর এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সংহত ক'রে একটি লোক মেশিনের মতই কাজ ক'রে চলেছে। তার নির্দেশ দ্বিধাহীন, তার অনুমান অভ্রান্ত; ঘড়ির কাঁটার মতই নির্দিষ্ট তার গতি। চারিদিকের এই পুঞ্জিভূত শেয়ার ষ্টক ডিবেঞ্চার ও কনসলের মধ্যে, প্রতিমুহূর্তের দাম কমা ও বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্জিন সঠিক রেখে চলার মধ্যে আমেরিকার সমস্ত অর্থনীতিই যেন ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ জগতের মানুষের কোন স্থান নেই এখানে।

তারপর দুপুর গড়িয়ে গেলো। লঞ্চে যাওয়ার সময় এগিয়ে এসেছে। দুই হাত ভর্তি কাগজপত্র নিয়ে ম্যাক্সওয়েল উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার চুলগুলি এলোমেলো, ডানকানে একটা কাউন্টেন পেন গোঁজা। ডানদিকের খোলা জানলার দিকে বোধহয় ভালো ক'রে নিশ্বাস নেওয়ার জন্যেই তাকালেন।

আর সেই জানলা দিয়ে বোধহয় একগোছা বুঁইফুলের করে যাওয়া একটুখানি মিষ্টিগন্ধ এসে লাগলো তাঁর নাকে। আর এই গন্ধটুকু মিস্ লেসলির একান্ত নিজস্ব। শুধু তিনিই এই গন্ধটুকু সযত্নে ধরে রাখেন।

একমুহূর্তে ম্যাক্সওয়েলের মনে হলো মিস লেসলির মাধুর্যময় দেহ তাঁরই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই অতিব্যস্ত শেয়ারবাজার তাঁর চিন্তাজগৎ থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেলো। মিস লেসলি.....পাশের ঘরেই তাঁর আসন, মাত্র কুড়িপা দূরে.....মিস লেসলি...নিঃ ম্যাক্সওয়েলের মনের আকাশে বুঝি আগুন ধরে উঠেছে। লাফিয়ে এসে ভেতরের ঘরে প্রবেশ করলেন তিনি ও টেনোগ্রাফারের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন।

মিস লেসলির মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো। তাঁর গালে রক্তাভা দেখা দিলো। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার আনন্দে ভরে উঠ্‌লো সমস্ত মুখ। নিঃ ম্যাক্সওয়েল টেবিলের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর দুইহাতে ভর্তি কাগজপত্র। কানে এখনও কলম গোঁজা। ব্যস্তভাবে ম্যাক্সওয়েল বললেন—

—মিস লেসলি, আমাকে আধ মিনিটের মধ্যেই কথা শেষ করতে হবে। একটা জরুরী কথা বলতে চাই তোমাকে। শোন, আমার স্ত্রী নেই; তুমি আসবে আমার কাছে আমার জীবনকে ভরে দিতে। সাধারণ লোকের মত দিনের পর দিন তোমায় সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে

পূর্বরাগ সৃষ্টি করার মত সময় আমার নেই। কিন্তু তবু আমি তোমায় ভালোবাসি; আমায় বিশ্বাস করো,—তোমায় ভালোবাসি আমি। বলো, কথার উত্তর দাও। ওই দেখো টেলিফোনে ডাক এসেছে, বলো শীগগির।

তরুণী লেসলি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে। মন নেওয়ার চেষ্টা ক'রে সে বললো—আমি বুঝতে পারছিনা, তুমি কি বলছো আমি যে বুঝতে পারছি না.....

—"তুমি বুঝতে পারলে না?" ম্যাক্সওয়েল অধীর হ'য়ে উঠলেন—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। তোমায় ভালোবাসি আমি। এবার উত্তর দাও, তোমার কথা বলো, বলো...ওঃ টেলিফোনেরও নিকুচি করেছে; পিচার, আধমিনিট ধরে রাখো, আমি আসছি।..... মিস লেসলি কথা বলবে না...? তরুণী লেসলির মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিলো। প্রথম বিস্ময়কে কাটিয়ে উঠতে তার একটুসময় লাগলো। তারপর তার দুই গণ্ডে নামলো অশ্রুধারা। সেই অশ্রুজলের মধ্যে বর্ষাকালের রৌদ্রের মতই হেসে উঠলো সে;—প্রশান্ত মধুর হাসি। তার হাত ম্যাক্সওয়েলের গলায় জড়িয়ে নিয়ে মিস লেসলি বললো—এবার বুঝতে পেরেছি; এই অবিশ্রান্ত কাজের চাপেই তোমার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছে। তার জন্যেই আমি প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। তোমার মনে পড়ছে না হয়তো, কালই ত সন্ধ্যে আটটায় ঐ ছোট্ট গির্জাটায় নিয়ে তুমি আমায় বিয়ে করেছো।"

---

* O' Henry নর্থ ক্যারোলিনার এক ডাক্তারের ছেলে—নাম উইলিয়ম সিডনি পোর্টার। প্রথমবয়সে সে তার কাকার ওষুধের দোকানে চাকরী করতো। তারপর ঘুরতে ঘুরতে সে অষ্টিনে আসে ও নানারকম চাকরীর মধ্য দিয়ে উন্নতির চেষ্টা করে। ফার্ষ্ট ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের ক্যাস ভাঙ্গার অছুহাতে—অবশ্য তার বিরুদ্ধে কোন প্রমান ছিল না; অনেকের মত তিনিও অন্যায় বিচার পেয়েছেন তার নামে মামলা রুজু হ'লো! এই সময়ে তার প্রেয়সী স্ত্রী যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়—ও কিছুদিন পর মারা যায়। ব্যাঙ্ক মামলায় সিডনি পোর্টারের পাঁচ বছরের কারাবাস গ্রহণ করতে হলো।

জেলে বসেই পোর্টার ছোট গল্প লিখতে সুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই নিউইয়র্কে এক তরুন সাহিত্যিকের নাম শোনা গেল। তার নাম ও' হেনরি। ১৯০১ সালে কারামুক্তির পর তিনি পুরোপুরি মনোনিবেশ করলেন সাহিত্য চর্চাতে। "Cabbages and kings" ও "The four Million" তাঁর নাম করা গল্পের বই। ১৯১০ সালে পৃথিবী জোড়া যশ নিয়ে ও'হেনরী মারা যান মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ কথা—আলো জেলে দাও, নইলে অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবো না।

উত্তরা-পথ ভ্রমণ

—ভবঘুরে—

ছোটবেলা থেকেই হিমালয়ের নাম শুনেছি। বড় হ'য়ে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, এর দুর্গম পথঘাট সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। তাই ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে হিমালয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব ক'রে এসেছি। এতদিন কোন সুযোগ ঘটে উঠে নি। কয়েকটি বন্ধু মিলে ঐ পথে পা বাড়িয়েছেন দেখে লোটাকম্বল বেঁধে নিয়ে তাদের দলে ভিড়ে পড়লাম। মুসৌরী থেকে বেরিয়ে হ'টা পথে যমুনা নদীর উৎসস্থল—যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ-হিমালয়ের উপর এই চারটি তীর্থ—হিমালয়ের উপর মোট প্রায় ছ' শ' মাইল হেঁটে বেড়াবেন—এই হচ্ছে তাঁদের পরিকল্পনা। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহও আমার নাই। তবু তীর্থ যাত্রীদের দলে ভিড়ে যদি নূতন দেশ দেখা যায়—এই আশাতেই বন্ধুদের সঙ্গ নিলাম।

এভাবে যে যাব—এটা আগে ভাবি নি; তাই প্রস্তুতও ছিলাম না। হঠাৎ ঠিক করলাম যাব। জামা কাপড় যা ছিল তাই নিয়ে অতিরিক্তরূপে বাটা কোম্পানীর এক জোড়া ভাল কেড্‌স্ কিনে নিয়ে একেবারে সোজা হাওড়া ষ্টেশনে এসে পৌঁছে গেলাম। দেরাদুনের টিকিট আগে থেকেই কেনা হয়েছিলো। সোজাসুজি গিয়ে দুন এক্সপ্রেসের একটা থার্ড ক্লাশ কামরায় চড়ে বসলাম। প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি ট্রেণ ছেড়ে দিল। বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করলাম।

কামরাটার এক কোণে বেঞ্চের এক অংশ দখল করেছি। আমরা পাঁচটি প্রাণী। গাড়ীতে অসম্ভব ভীড়, পা ফেলবার জায়গা নেই। যাত্রীদের মধ্যে যারা সৌভাগ্যবান—আগে আসতে পেরেছে—তারা কোন রকমে বেঞ্চে বসতে পেয়েছে। আর যারা দেরীতে পৌঁচেছে—তাদের ভাগ্যে দাঁড়ান ছাড়া গত্যন্তর নাই। তবে বসেছে যতজন দাঁড়িয়েছে—তার চেয়ে অনেক বেশী।

ট্রেণ চলেছে—হু হু করে—অন্ধকারের বুক চিরে। বিশ্বব্যাপী বিরাট অন্ধকারের মধ্যে এটা যেন একটা বিরাট সরীসৃপ বুকে হেঁটে ছুটে চলেছে। তার সামনের একটা মাত্র চোখ থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। ঐ সরীসৃপটার পেটে আশ্রয় নিয়েছি —আমরা—ক্ষুদ্র মানবসন্তানগুলি—ছুটে চলেছি ওর সঙ্গে। মাঝে মাঝে এক একটা ষ্টেশন আসে—নীল আলোর নিশানা জালিয়ে ষ্টেশন মাষ্টার আমাদের অভ্যর্থনা জানায়।

ট্রেণে উঠবার আগে কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিলাম। বর্ধমান ষ্টেশন পেরিয়ে সে গুলোর সদ্ব্যবহার করা গেল। খাওয়ার পর কিন্তু একটা নূতন উপসর্গ জুটল—ঘুম। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের পক্ষে ঘুমানর চেষ্টা করা বিলাসিতা মাত্র। এতখানি বিলাসিতা থার্ড-ক্লাসীদের সাজে না। শুনতে পেলাম—একজন যাত্রী পাশের যাত্রীকে বলছে—"ঠিক হ'য়ে বসুন মশায়। ঘুমোতে হয়তো সেকেণ্ড ক্লাসে যান।" আমার মনে হয়—কোন লোক যদি অনবরত কয়েকদিন থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করে—তাহ'লে সে কম্যুনিষ্ট না হয়ে পারে না। শ্রেণী বৈষম্যের চাপে পড়ে সে হয়ত বা শ্রেণী সংগ্রাম লাগিয়ে দেবে—অর্থাৎ থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনে ইণ্টার ক্লাসে মাথা গলাবে।

কোন রকমে গল্পগল্প ক'রে রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া গেল; ভোরের দিকে আর পারা গেল না। বসে বসেই নিদ্রাদেবীর আরাধনা সুরু করে দিলাম।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙল—তখন গয়া ষ্টেশনে ট্রেণ থেমেছে। ট্রেণ থামতেই একদল যাত্রী ভিড় ক'রে এল। দরজার কাছে রীতিমত একটা যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেল। যাত্রী এবং লটবহরের চাপে দরজাটা আগে থেকেই বন্ধ হ'য়ে ছিল। কিন্তু তাতেও কেউ দমল না। দরজার ক্ষুদ্র জানালাটা গলেই মালপত্র আর মানুষ মাথা গলাতে লাগল। ভিতরের লোকও এপাশ থেকে তাদের বাহিরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। রীতিমত কিল ঘুষি ঠেলাঠেলি চলতে লাগল দুই পক্ষ থেকে। দরজা দিয়ে

ঢুকবার সুবিধা নাই দেখে আর একজন জানালার দিকে ছুটে এল সারারাত এক জায়গায় বসে বসে ঘুমের ঘোরে ঢুলে যারা প্রভাতের আলো দেখতে পেয়ে একটু 'বাহুসেবনের' চেষ্টা করছিলেন—তাঁরা স্থানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ ক'রে দিলেন। ওপাশের লোকরাও বেগতিক দেখে প্রাণপণে জানালা চেপে ধরলেন। অবশেষে কিছুক্ষণ ধরে জানালার ওপরে ব্যর্থ করাঘাত চীৎকার ক'রে ওপাশের বীরপুরুষরা রণে ভঙ্গ দিলেন।

ট্রেণের ভিরটা ক্রমশঃ পাতলা হ'য়ে এল—তখনও যারা উঠতে না পেরে নাসিকা প্রবেশের আশায় দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—তাদের আর কোন আশা ছিল

কারণ প্রত্যেকটা গাড়ী আকণ্ঠ বোঝাই। আর একটু আগেই যারা অস্ত্রের অসুবিধার কোন তোয়াক্কা

রেখেই জোর করে মানুষের ঘাড়ে চেপেছে—অন্য যাত্রীরা বাধা দিলে 'ইনসানিয়াৎ' বা মনুষ্যত্বের বড় বড় কথা আউড়েছে—তারাই ভিতরে ঢুকে অন্য মূর্তি ধারণ করেছে—দরজা জানালা আটকে রেখে অন্যকে ঢুকতে দিচ্ছে না। 'ইনসানিয়াৎ' গাছে উঠেছে।

মুখ হাত ধোয়ার জন্য একবার বাহিরে যাওয়ার দরকার ছিল। জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়লাম। ট্রেণটা একটু ঘুরে ফিরে সহযাত্রীদের অবস্থাটা একটু "জরিপ" করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। থার্ড ক্লাসে সর্বত্র একই অবস্থা। ইণ্টার ক্লাসে অবস্থাটা কিছু সহনীয়। অন্ততঃ দশজনের গায়ের উপর আর একজন চেপে পড়ছে না। ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড ক্লাসে যাত্রীদের দেখলাম। এক একজন এক একটা পুরা 'বার্থ' অধিকার করে দিব্যি আরামে শুয়ে বসে আছেন। তাদের ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি রাত্রির অনিদ্রার পরিচয় দিচ্ছে না। সদ্য ঘুম ভেঙে কেউ বা জানালা খুলে প্রভাতের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, কেউ বা ঘুম থেকে উঠে 'কেলনারের' 'বয়'কে হাঁকাচ্ছেন—চা জলযোগের অর্ডার দেওয়ার জন্য।

ঘুরে ফিরে এসে আমার এক সহযাত্রী বললেন—"দেখ, দেখে শুনে ইচ্ছে হচ্ছে একটা কামান দেগে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাসগুলো উড়িয়ে দিই।"

হেসে বললাম—"কেন ঐ ভগবানের জীবদের আরামের উপর আপনার হিংসা হ'ল নাকি?"

গম্ভীর হ'য়ে তিনি বললেন—"দেখ, হিংসে আমরা করছি না, ওদের আরামেও আমরা হস্তক্ষেপ করতে চাই না। এতখানি সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা চায় না। তারা চায় শুধু মাথা গলাবার মত একটু জায়গা। এ কি যাওয়া? এ যেন মালগাড়ীতে টানাটানি ক'রে মাল পুরে দেওয়া হয়েছে।"

তাকে আর ঘাটাতে সাহস হ'ল না। স্বস্থানে ফিরে এলাম। দরজার কাছে দেখলাম—একটা মারামারি ব্যাপার লেগেছে। একটি জোয়ান জোর করে জানালা দিয়ে মাথা গলাবার চেষ্টা করছে। এপাশের লোক তার মাথায় ধাক্কা দিচ্ছে। ও পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা লোক তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে গার্ডের হুইসিল শোনা গেল। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ীও চলতে আরম্ভ করল। নেহাৎ নাছোড়বান্দা দেখে এপাশের যাত্রীরা একটু স্থান ক'রে নিয়ে তাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলে। লোকটা ভিতরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি জিনিষপত্র নিতে লাগলেন। এক বিরাট সুটকেশ নিয়ে এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। গাড়ী তখন প্লাটফরম ছেড়ে জোরে চলতে সুরু করেছে। সুটকেশটা কোন রকমে রেখে দিয়ে ভদ্রলোক বাইরে মুখ বাড়ালেন। তখনও বোধ হয়—কিছু জিনিষ বাইরে ছিল। বাইরে চেয়েই দেখলেন—ট্রেণ প্লাটফরম ছেড়ে পড়েছে। মুখ বাড়িয়ে হাঁক সুরু করলেন—"ভেইয়া, এ.....ভেইয়া....." আর ভেইয়া! 'ভেইয়া' তখন বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়েছে।

বিবর্ণ মুখে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। নানা জনের নানা প্রশ্ন এবং নানারকমের উপদেশের ঠেলায় বেচারার অবস্থা আরও কাহিল হ'য়ে উঠল। ভদ্রলোক পরের ষ্টেশনে নেমে গিয়ে রেহাই পেলেন!

বেলা বেড়ে গেল—ট্রেণও ছুটে চলল—একটানা। বিহারের ছোট ছোট পাহাড় দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলি

ছাড়িয়ে আমরা সংযুক্ত প্রদেশের সমভূমির উপর চললাম। মাঠের পর মাঠ ধূ ধূ করছে। মাঝে মাঝে একটু সবুজের চিহ্ন দেখা যায়। কোথাও বা একটু আখ চাষ, কোথাও বা একটু জায়গাছ কচুর চাষ দেখা যাচ্ছে। বাকী ঐ বিরাট দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ রোদের তেজে যেন জ্বলছে।

দুপুর বেলা গাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হ'য়ে উঠল। বাইরে থেকে এক এক ঝলকা বাতাস আসছে—যেন এক এক হল্কা আগুন—সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। বিহার এবং সংযুক্ত প্রদেশ অঞ্চলের এই 'লু'র কথা আগে শুনেছিলাম। এবার মর্মে মর্মে অনুভব করলাম।

গরম হাওয়ায় গলা শুকিয়ে গেলেও বন্ধুদের রসজ্ঞান বিন্দুমাত্রও কমে নি দেখলাম। একটী বন্ধু পাশের এক বিহারীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলেছেন। শুনতে পেলাম বন্ধুবর তাঁর অপরূপ হিন্দি সহযোগে বিহারীকে প্রশ্ন করছে—

"ঐ যো কেতমে 'কচু' হুয়া হ্যায়—উসকো আপকা দেশমে ক্যা বোলতা ?"

সহযাত্রী উত্তর দিলেন—"হামারি দেশমে তো উসকো "ভুইয়া" বোলতা"

বন্ধুবরের তো চক্ষু স্থানাবড়া ! 'ভুইয়া' মানে 'কচু' ? তাহলে বাংলার 'বারো ভুইয়ার অবস্থাটা কি হবে ? ভাগ্যে চাঁদরায়, প্রতাপাদিত্য বেঁচে নেই !"

যাই হোক, কোন রকমে আরও একটা বিনিদ্র রাত্রি ট্রেণে কাটিয়ে পরের দিন যখন দেরাদুনে এসে পৌছালাম —তখন প্রায় এগারটা বাজে। ট্রেণ থেকে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। দীর্ঘ ভ্রমণ-শ্রান্ত যাত্রীর দল লটবহর নিয়ে গেটের কাছে ভিড় লাগিয়েছে। সকলেই আস্তানার ফেরার জন্ত উদগ্রীব। আমাদেরই আস্তানার কোন পাত্তা নেই। কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাওয়ার আশায় সারা প্লাটফরম ঘুরলাম। কিন্তু 'কাকস্ত পরিবেদনা,' অগত্যা জিনিষপত্র নিয়ে প্লাটফরমের বাইরে এলাম।

ষ্টেসন থেকে বেরোতেই দেখি—হঠাৎ কোথা থেকে একদল লোক চারপাশ থেকে ছেঁকে ধরেছে। ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছি।

হঠাৎ দেখি তারা পকেট থেকে এক একটা ছাপান কার্ড বের ক'রে ফেলেছে। ওঃ হরি ; এরা সব হচ্ছেন—বিভিন্ন হোটেলের দালাল। এতক্ষণ ভয়ু ছিল ভাল—এর পর আবার বক্তৃতা আরম্ভ হ'ল। সব চেয়ে কম পয়সায় কে কত বেশী সুখ সুবিধা দিতে পারে—তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে আমাদের উত্যক্ত ক'রে তুলল ! তার পর কে কত অল্পে তুষ্ট তার বর্ণনা শুনতে শুনতে কাণ ঝালাপালা ক'রে উঠল। এদের দেখলে মনে হয়—প্রত্যেকটী যেন এক একটী বিনয়ের অবতার—আর পৃথিবীর মানুষকে সেবা করার কি প্রচণ্ড আগ্রহ ! যেন পৃথিবীতে মানুষের - 'খিদমত' ক'রে বেড়ান ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই।

একে ট্রেণে বসে বসে শরীরটা যাপছাড়া গোছের ঠেকছে—তার পর এসে এই উপদ্রব বড় বিরক্তি লাগল—অথচ এদের কারও না কারও পাল্লায় না পড়েও উপায় নেই। অগত্যা হাতের কাছে যাকেই পেলাম—তাকেই ঠিক ক'রে নিয়ে এগিয়ে চললাম। অন্যান্যগুলি কিন্তু নছোড়বান্দা তারা আমাদের পিছনে বকতে বকতে হোটেলের দরজা পর্যন্ত এল। তারপর নেহাৎ সুবিধা হ'ল না দেখে আমাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য ক'রে সরে পড়ল।

হোটেলে এসে স্নানাহার পর্ব চুকিয়ে নিয়ে খানিকটা ঘুম দিয়ে নিলাম। বিকেলের দিকে সহরটা একটু ঘুরে ফিরে আসা গেল। দেরাদুন সহরটা হিমালয়ের কোলে খানিকটা সমতল ভূমির উপর অবস্থিত—সমুদ্রতল থেকে ২১৪০ ফুট উঁচু। এত উঁচুতে পাহাড়ের কোলে থেকেও কিন্তু এর প্রকৃতি ভীষণ রুক্ষ। দুপুর বেলা গরমে তিষ্ঠান দায় হ'য়ে ওঠে। শুনলাম শীতকালে আবার প্রচণ্ড শীত পড়ে।

সহরটা খুব বড় না হলেও খুব ছোটও নয়। বিজলী বাতি এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা মোটামুটী ভাল। বাজারে প্রায় সব রকমের জিনিষ পাওয়া যায়। কলেজটা স্কুল একটা কলেজ আছে। শুনলাম অধিবাসীদের মধ্যে

কিছু বাঙালীও আছেন। দেরাদুন থেকে হরিদ্বার, ঋষীকেশ, নীলাই, সাহারানপুর হ'য়ে দিল্লী পর্যন্ত মোটর যাতায়াত করে। মুসৌরী যেতে হ'লে এখান থেকেই বাসে যেতে হয়।

পরের দিন আমাদের ঋষীকেশ যাওয়ার কথা। স্নানাহার সেরে হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে মোটরে চড়ে বসলাম। সাড়ে এগারটা নাগাদ বাস ছাড়ল। দেরাদুন সহরকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুধারে বিস্তৃত চায়ের বাগান। মাঝে মাঝে বন্য গোলাপের ঝাড়। রাস্তাটা এক জায়গায় একটা মরা নদীর উপর দিয়ে গেছে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে নদীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে—সমস্ত তলাটা সাদা নুড়ি ছড়ান হয়ে আছে। কিন্তু মাঝখান দিয়ে অতি ক্ষীণ একটী জলধারা ছাড়া আর কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নাই। শুনলাম বর্ষাকালে বৃষ্টি হ'লে এটা কানায় কানায় ভরে যায় আবার কয়েক ঘণ্টা পরেই শুকিয়ে যায়।

ঋষিকেশ যখন পৌঁছালাম তখন দুপুরের রোদ চা চা করছে। সাধু কালী কমলী-ওয়ালার ছত্রে গিয়ে উঠলাম। ছত্রে যাত্রী ভর্তি। এই সময়টা ঋষিকেশে যাত্রীর ভীড় খুব বেশী হয়। উত্তরাখণ্ড যাত্রার প্রবেশ-দ্বার হচ্ছে ঋষিকেশ। যারা ও পথে পা বাড়ায়—তারা সাধারণতঃ ঋষিকেশ হয়েই যায়। যাত্রাপথের সাজ-সরঞ্জাম—ব্যবস্থা সব কিছু এখান থেকেই ক'রে নিতে হয়।

জিনিষপত্র রেখে চারিদিক একটু ঘুরে এলাম। ঋষিকেশে অসংখ্য মন্দির। গঙ্গার তীরে ছোট ছোট কুটীর বানিয়ে সাধুরা বাস করেন—এ ছাড়া ঋষিকেশে দেখবার মত বিশেষ কিছু নাই। বাজারটা এক চক্কর ঘুরে নিয়ে আস্তানায় ফিরে এলাম।

সাধু কালী কমলীওয়ালার আস্তানা। বিরাট ব্যাপার। অনেকেই বহুলোক কাজ করছে। সমস্ত উত্তরাখণ্ডের পথে এঁদের ধর্মশালা আছে। তাছাড়া নিঃসম্বল সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য পথে পথে এঁদের সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। আরও বহু রকমের সুযোগ সুবিধা এঁরা যাত্রীদের জন্য ক'রে থাকেন। ছত্রের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম। ম্যানেজার এক "খাতিরদারী পত্র" দিলেন। এই পত্রের কথা আগে শুনেছিলাম। যাত্রা পথে এই পত্র বাহকরা একটু বিশেষ 'খাতির' পেয়ে থাকেন। ম্যানেজার উপদেশ দিলেন—"মাত্র দুদিন আগে গান্ধীজীর চিতাভস্ম নিয়ে রামদাস গান্ধী—দলবল সহ বেড়িয়ে গেছেন—আপনারা যদি একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে তাদের ধরে ফেলতে পারেন—তবে আপনাদের অনেক সুবিধে হবে।"

সেই চেষ্টা করতেই বেড়িয়ে পড়লাম। ঋষিকেশ থেকে যমুনোত্রী যাওয়ার সোজা রাস্তা হচ্ছে—টিহরি পর্যন্ত বাসে গিয়ে তারপর হাঁটা সুরু করা। কালী কমলীওয়ালার একটী লোককে সঙ্গে নিয়ে টিহরি পর্যন্ত বাস যাওয়ার যে কয়টা কোম্পানী ছিল সব ঘুরলাম। কিন্তু সব বাসেই আগামী দুদিন পর্যন্ত সীট রিজার্ভ। অগত্যা ফিরে এলাম।

বন্ধুরা ইতিমধ্যে একটা গাইড কিনে নিয়ে ম্যাপ দেখতে আরম্ভ করছেন। ম্যাপ দেখে মনে হ'ল—মুসৌরী দিয়ে যে রাস্তটা গেছে—সেটা বোধ হয় সোজা হবে। অতএব চল মুসৌরী, মুসৌরী সহরটা দেখে যাওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে একটা ইচ্ছা প্রত্যেকেরই ছিল। কাজেই কয়েক মিনিটের মধ্যে স্থির হ'য়ে গেল—আজ দেরাদুন ফিরে মুসৌরী যাব কাল। দেরাদুন যাওয়ার শেষ বাসটা তখন সামনে দাঁড়িয়ে হর্ণ দিচ্ছিল। রাস্তা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়ার আর অবসর হ'ল না। তাড়াতাড়ি বাজার থেকে একখান করে লাঠি কিনে নিয়ে লটবহর নিয়ে বাসে চড়ে বসলাম।

দেরাদুন পৌঁছাতে একটু সন্ধ্যা হয়ে গেল। সেই পুরাণ হোটেলের পুরাণ ঘরটাই রাত্রির মত দখল করা গেল।

পরের দিন সকালে উঠে মুসৌরী যাওয়ার জন্য মোটরের চেষ্টা করতে লাগলুম। সকাল বেলাটা মোটর পাওয়া একটু মুস্কিল—সাধারণতঃ গাড়ীর সহরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে মোটর যাতায়াত করে। হোটেল ম্যানেজারের চেষ্টায় একটা মোটর জুটে গেল। আমরা

পাঁচ মূর্তি লট বহর গুলো ছাতে তুলে দিয়ে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ সীট অধিকার করলাম।

প্রায় ৮টা নাগাদ মোটর ছাড়ল। দেরাদুন থেকে মুসৌরী ২২ মাইল পথ। মাইল চারেক পথ প্রায় সোজা ঘর আসা গেল। তারপর পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে লাগলাম।

উঠেছি—ত উঠেই চলেছি। গীয়ারটাকে একেবারে 'টপে' ঠেলে দিয়ে গাড়ীটা সরীসৃপের মত রাস্তা বেয়ে উপরে উঠছে। ইঞ্জিনটা আঁ আঁ করে ডাক ছাড়ছে—যেন—বলছে—"আর পারছি না—আর পারছি না।" দেরাদুন সহরটা দূরে দেখা যাচ্ছে। যেন মনে হচ্ছে—ছোট খেলনার ঘরবাড়ী, সেখান থেকে মুসৌরীর আঁকাবাঁকা রাস্তাটা বেড়িয়ে এসেছে—যেন একটা বিরাট অজগর সাপ—পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠেছে।

উপরের দিকে রাস্তাটা উঠছে—দূর থেকে মনে হয় যেন একটা দুর্গের চারিপাশ ঘিরে প্রাচীর দেওয়া হয়েছে। নীচে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজান কৃষিক্ষেত্র। মানুষের সৃজনী প্রতিভা কঠিন পাহাড়ের বুকেও শ্যামল প্রান্তর গড়েছে।

মাঝখানে মোটরটা একবার থামলো। এখানে মুসৌরী যাত্রীদের কাছ থেকে মাথা পিছু দু টাকা হারে ট্যাক্স নেওয়া হয়। দেরাদুন থেকে মুসৌরী পর্যন্ত রাস্তার মেরামতী খরচ বাবদ এই ট্যাক্স আদায় করা হয়।

প্রায় দশটা নাগাদ মুসৌরীর বাসট্যাণ্ডে এসে পৌছালাম। বাসট্যাণ্ডটা সমুদ্র সমতল থেকে ৬০০০ ফুট উঁচু। এই ২২ মাইলের আঁকাবাঁকা পথে দেরাদুন থেকে আমরা প্রায় চার হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি। এখান থেকে মুসৌরী সহর প্রায় অর্দ্ধ মাইল উপরে। সেখানে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নাই। অবশ্য ডাণ্ডি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার কোন দরকার ছিল না।

বাস থেকে নামতেই একজন পাহাড়ী কুলি এসে ছোঁক ধরল। তাদের একজনকে ঠিক করে জিনিষপত্র-গুলো তার ঘাড়ে দিয়ে আমরা উপরে উঠতে আরম্ভ করলাম। পাহাড়ীরা বোঝা বয়—পিঠে ক'রে। এতে বোধ হয় পাহাড়ের পথে চলবার একটু সুবিধা হয়। মুসৌরীর সনাতন ধর্মশালায় এসে আস্তানা গাড়লুম। বিকালেই হাঁটা পথে বেরিয়ে যাওয়ার কথা, তাই তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নেওয়া গেল।

কিন্তু ইতিমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির পর প্রচণ্ড শীত। এই শীতে অজানা রাস্তায় বেরোবার ইচ্ছা কারও ছিল না। কাজেই স্থির করা হ'ল—মুসৌরীটা বিকালে দেখে নিয়ে কাল ভোরে বেরোন যাবে।

খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা ঘুম সেরে নিয়ে বিকালে মুসৌরী সহর দেখতে বেরোলাম। উঁচুনীচু রাস্তায় কখন উঠে, কখনও নেমে সহরটা দেখতে লাগলাম ৬০০০ ফুট থেকে ৭৫০০ ফুট পর্যন্ত এই দেড়হাজার ফুটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে—সহরটা। ঘরবাড়ী-গুলি ছবির মত সুন্দর। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে খেয়াল হ'ল এর সব চেয়ে উঁচু চূড়াটায় উঠে এর দৃশ্যটা দেখতে হবে। উৎসাহ কারও কম নয়, কাজেই পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করা গেল। একটানা প্রায় দেড় মাইল চড়াই পেরিয়ে চূড়ার উপরে উঠলাম। এক কোটীপতি এই শৃঙ্গের উপরে একটী বাড়ী তৈরী করতে লেগেছেন। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় উড়িয়ে খানিকটা জায়গা সমতলও করেছেন দেখা গেল। বহুদূর থেকে ফুল গাছ এনে চাষ করেছেন—বাগানটী সুন্দর। ভদ্রলোকের রুচি আছে।

এখানটায় প্রচণ্ড বাতাসে বেশ শীত করতে লাগল—আর একটু ভয়ও হ'তে লাগল। নীচের দৃশ্য কিন্তু খুব সুন্দর। ও পাশের পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজান ঘরবাড়ী গাছপালা গুলোকে মনে হচ্ছে—যেন সুদক্ষ শিল্পীর হাতে গড়া একটা মডেল। দূরের রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে—একটা বিরাট সাপ—পাহাড়টাকে পাক খেয়ে জড়িয়ে ধরেছে, মোটরগুলা মনে হচ্ছে—যেন খেলনার দম দেওয়া কলের মোটর। লোকজন প্রায় দেখা যাচ্ছে না। এ পাশে ঘুরে দেখলাম—মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেছে। নীল আকাশের বুকে জেগে

আছে তুষার মৌলী পর্বত শৃঙ্গ একজন স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করে জানলাম—ওরই এই শৃঙ্গগুলির উপরেই আমাদের উঠতে হবে। ওরই মধ্যে আছে—কেদারনাথ বদ্রীনাথ পাহাড়। বেশীক্ষণ সেখানে থাকতে পারা গেল না। শীত করতে লাগল। নেমে এলাম। বাজারে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিষ কেনারও দরকার ছিল।—

মুসৌরী সহরটা সুন্দর হ'লেও এটা বড়লোকের সহর এত ঝকঝকে রাস্তা—চক্‌চকে বাড়ী—সুসজ্জিত বিপনী—সুবেশ তরুণ তরুণী—সবাই যেন হাত উঁচিয়ে বলছে—দরিদ্রের প্রবেশ নিষেধ। ছেড়া পোষাকে ঢাকা পাহাড়ী কুলীদের কথা বাদ দিলে—আর যাদের রাস্তা ঘাটে দেখা যায় তাদের কারও অঙ্গে দারিদ্র্যের চিহ্ন মাত্র নেই। দম্য ধোপ দুরস্ত কোট প্যাণ্টেলুন এটে জুতার মস্ মস্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে তরুণরা চলেছে—চোখে মুখে তাদের উৎকট আভিজাত্য ফুটে বেরোচ্ছে; পাউডার ঘষা গালে রক্ত লিপষ্টিক লাগিয়ে তরুণীরা চলেছেন—একেবারে যেন রঙ্গীন প্রজাপতিটী সেজে—চারিদিকে গন্ধে মাতোয়ারা ক'রে দিয়েছে—আবার হয়তো কো[illegible] বিপুলা শ্রেষ্ঠ গৃহিনী রিক্সায় চড়ে চলেছেন। ঝকঝ[illegible] তকমা আঁটা বেয়ারারা ঠেলে নিয়ে চলছে—মুখে বলছে —"হট্ যাও হট্ যাও" এখানে এলে মনে হয়—যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। এখানকার সবকিছুই যেন কৃত্রিম—সব কিছুরই ওজন হয় টাকার মাপে!

ধর্মশালায় ফিরে এলাম। শিগগির শিগগির খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া গেল। ভোরে উঠতে হবে। কাল থেকেই আমাদের আসল যাত্রা সুরু হবে।

—ক্রমশঃ—

—ঃ বহু সুপ্রসিদ্ধ লেখকের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ ঃ—

"মন্দিরা"

শারদীয় সংখ্যা

আগামী ৫ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

কলিকাতার ফুটবল লীগ খেলা এই বৎসরের মত প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগ বিজয়ী হইবার সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছে, তিনটী খেলা বাকী থাকিতেই তাহারা বিজয়ীর আখ্যা লাভ করিয়াছে। শুধু লীগ খেলায় জয়ী হওয়া নহে একটী খেলায় সব চাইতে বেশী গোল ও মোট খেলার গোল সংখ্যায় তাহারা লীগের সকল পুরাতন ইতিহাস ম্লান করিয়া দিয়া নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে!

কিন্তু এই বৎসর লীগের খেলায় যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া রহিল তাহা ক্রীড়ামোদিগণের স্মৃতিপটে ও বাঙ্গালার ফুটবল ইতিহাসে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই। গত ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়ান দলের খেলার সময় রেফারীর ত্রুটীপূর্ণ বিচারের ফলে মাঠের একদল উগ্র দর্শক রেফারীকে আক্রমণ করে ও খেলা পরিচালনার বিঘ্ন ঘটায় ফলে খেলা শেষ হইবার সাত মিনিট পূর্বে রেফারী খেলা শেষ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

রেফারী যখন আক্রান্ত হন তখন ইষ্টবেঙ্গল ও এরিয়ান দলের খেলোয়াড় ও পরিচালকগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। বিশেষ করিয়া ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের জে, সি, গুহ রেফারীকে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইয়া নিরাপদে তাঁবুতে পৌঁছে দেন এবং ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় কালীমিত্র রেফারীকে রক্ষা করিতে গিয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন।

অথচ রেফারী যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কোনো খেলোয়াড় তাহাকে রক্ষা করিবার কোনরূপ সাহায্যই করেন নাই উপরন্তু জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার তাহারা সহায়তা করিয়াছেন; তিনি আরও বলিয়াছেন যে অচৈতন্য অবস্থায় যখন তাহাকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মেম্বারদিগের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয় তখন মেম্বারগণ তাহার গায়ে থুথু ও জুতা নিক্ষেপ করেন! এখন কথা হইতেছে অচৈতন্য অবস্থায় কোনো ব্যক্তির গায়ে থুথু পড়িলে সে কি জানিতে পারে? থুথু কি চেতনার অবার্থ ধন্বন্তরিরূপ শান্তিবারি যাহা সিঞ্চনেই জ্ঞানলাভ হয়!

রেফারী জ্যোতিষ বাবুর কোলের মধ্যে এমনভাবে আশ্রয় নিয়াছিলেন যে, কোনো লোক থুথু বা জুতা নিক্ষেপ করিলে তাহা জ্যোতিষবাবুর গায়েই লাগিত রেফারীর গায়ে নহে। জ্যোতিষবাবুর বিবৃতি হইতে জানিতে পারিলাম যে কোনো লোক আঘাত করিবার বা অপমান করিবার কোনো চেষ্টাই করে নাই।

নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া বুঝিলাম এখনো Climaxএ ওঠে নাই এবং climaxএ উঠিবার জন্যই গতি দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালার ফুটবল দেবতাদের বিচারের রায় বাহির হইল। তাহাতে দেখিলাম যে সাতমিনিট পূর্বে খেলা শেষ হওয়া সত্ত্বেও এরিয়ানকে দুইটী পয়েন্ট দেওয়া হইল ও আনন্দ, ধনরাজ ভবিষ্যতের জন্য সতর্কিত হইল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়

ইহাই যে, [illegible] দপ্তর বা I. F. A প্রমান করিতে [illegible] নাই যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি বা খেলোয়াড় দ্বারা এই কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমেদ ও আরিফ খেলা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া হাত উঁচু করিয়া রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিল মাত্র। ইহা কি সতর্ক করিবার মত অপরাধ? পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশেই শুধু ফুটবল নহে সকল খেলাতেই রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। গত বৎসর বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল খেলার এমন কি ফাইন্যালেও যাহারা দর্শক ছিলেন তাহারা জানেন যে এরূপ চেষ্টা সেখানে বহুবার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল অথচ কৈ রেফারী তো তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন নাই? Inter National Football Association তো তাহাদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেন নাই। এখন তবে প্রশ্ন আসিতে পারে আমেদ এবং বনরাজকে এরূপ আদেশ দেওয়া হইল কেন? ক্রিকেট খেলা মেলো সাহেবের সাথে সংযত ভাবে কথা না বলায় অমরনাথের যে দুরবস্থা হইয়াছে বাঙ্গলার বর্তমান ফুটবল নেতাকে দেখিয়া যদি কোনো খেলোয়াড় হাসেন বা কাসেন তবে তাহার বিরুদ্ধে নাকি এরূপ শাস্তিই প্রয়োগ করা হইবে।

সন্তোষ ট্রফি ফুটবল খেলার দল গঠনে যে ট্রায়াল খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হইল এবং বাঙ্গালা দল যে গঠিত হইল তাহা হইতে আমেদ ও বেঙ্কটেশকে বাদ দিয়া গতবারি, হরিদাস ও নিবু বসুকে স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

বিচারকের রায় দানের পরে রাজস্থান ও ক্যালকাটা প্যারিসনের খেলার মাঠে যে অপ্রীতিকর অবস্থা হয় যাহাতে রতন সেন ভীষণ ভাবে আহত হন তাহার জন্য I. F. A. কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংএর প্রথম খেলায় উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ মহমেডানের ব্যাক্‌কে আক্রমণ করিয়া প্রহৃত করেন তাহার জন্য I. F. A, কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন?

পূর্বে এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খলতা অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেদিন মাঠে উপযোগী পুলিশের ব্যবস্থা কেন ছিলনা?

কলিকাতার ক্রীড়ামোদীগণ বহুদিন ধরিয়া রেফারীর বিচারে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতা আমরা কোন প্রকারেই সমর্থন করিনা কিন্তু রেফারী যাহাতে সত্য সত্যই উপযুক্তভাবে খেলা পরিচালনা করিবার মত উপযুক্ত হন সেই দিকে I. F. A. এর দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ নয় কি?

আজ I. F. A. এর তাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে যে বাহির হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনিয়া রেফারীদিগকে শিক্ষা দেওয়া। শুধু জনসাধারণ বা সমর্থকগণের দোষ দিয়া এড়াইয়া গেলে চলিবে না। নিজেদের দোষ ত্রুটির কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

বাঙ্গলার ফুটবল ঐতিহ্য যাহা একদিন ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিত তাহার আজ এত অবনতি দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? আজ যদি সে ঐতিহ্যকে পুনরায় তাহার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তবে I. F. A. এর দলীয় রাজনীতি ও ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্ব বা একক সম্মানের গর্বের মোহ পরিত্যাগ করিয়া সত্যকারের সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাতে উপযুক্ত খেলোয়াড়রা সম্মান লাভ করে, উদীয়মান খেলোয়াড়গণ যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া, সারা ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে পারে—তার বিচারের দ্বারা সে চেষ্টা করিতে হইবে।

সন্তোষ ট্রফি :—এই বৎসর সন্তোষ ট্রফির প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার সকল খেলাই কলিকাতাতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রথম রাউণ্ডে হায়দ্রাবাদ উড়িষ্যাকে ৩—০ গোলে ও বাঙ্গলা দল সি, পি, কে ৯—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। বাঙ্গলার এই খেলা সন্তোষ ট্রফির ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল—পূর্বে এই প্রতিযোগিতায় এত বেশি গোল আর কেহ দিতে সমর্থ হয় নাই। বাঙ্গলা দল পুনরায় রাজপুতনাকে ৪—০ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি ফাইন্যালে উন্নিত হইয়াছে। অন্যদিকে হায়দ্রাবাদ দল বোম্বাই দলকে ৩—২ গোলে পরাজিত করিয়া সেমি ফাইনালে উঠিয়াছে। বিহার

দল আসামকে ৩—১ গোলে পরাজিত করিয়াছে এবং মাদ্রাজ দল দিল্লীকে ২—১ পরাজিত করিয়া বিহারের সাথে প্রতিযোগিতা করিবে এবং তাহাদের মধ্যে যে দল জয়ী হইবে তাহারা সেমি ফাইনালে বাঙ্গলা দলের সহিত খেলিবে।

ক্রীকেট :—ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচও অমিমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। ইংল্যাণ্ড দলের সিনানে ১০৩ রাণ ও নিউজিল্যাণ্ডর দলের মাচ ক্লিক ১০১ রাণ করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত এড্রেচের ৭৮ রাণও উল্লেখযোগ্য।

১৬ জন খেলোয়াড় লইয়া গঠিত কমনওয়েলথ ক্রিকেট দল আগামী ১০ই নভেম্বর বোম্বাইতে পৌঁছিতেছে। তাহাদের মধ্যে ১১ জন অষ্ট্রেলিয়া ৩ জন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ২ জন ব্রিটেন হইতে আসিতেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ল্যাক লিভিংষ্টোন দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ইংল্যাণ্ড দলের জর্জ ডাফ্ ওয়ার্থ দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হইয়াছেন।

I. F. A. এর খেলোয়াড় শিক্ষা দানে প্রশংসনীয় উদ্যম :—I. F. A. এর পরিচালকমণ্ডলী স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা ফুটবল খেলায় বাঙ্গলার মুখোজ্জ্বল করিতে পারে সে দিকে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাহাদের এই প্রকারের উদ্যম আমরা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করিতেছি। শ্রীযুত গোষ্ঠ বিহারী পাল্ ট্রেনার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উত্তর দক্ষিণ ও মধ্য কলিকাতার যথাক্রমে দেশবন্ধু পার্ক দেশপ্রিয় পার্ক ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে তাহাদের শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজ হইতে দুইজন করিয়া ছাত্র লইয়া প্রাথমিক পরিক্ষার পর কৃতকার্য ছাত্রদের লইয়া উল্লিখিত স্থান গুলিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ইষ্টার সার্ভিসেস ফুটবল খেলা :—ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সৈনিকদের মধ্যে এ জাতীয় ফুটবল খেলা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইল এবং এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের যাহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাদের আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইতেছি। সৈনিকদের মধ্যেও যথেষ্ট দক্ষ ও কুশলী খেলোয়াড় বর্তমান অথচ সাধারণের তাহাদের নাম ও খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হয় না। এই প্রতিযোগিতায় ইষ্টার্ণ কমাণ্ড যাহারা বর্তমানে ক্যালকাটা গ্যারিসন নাম দিয়া কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলিতেছে তাহারা R. I. A. F. দলকে ৫—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে।

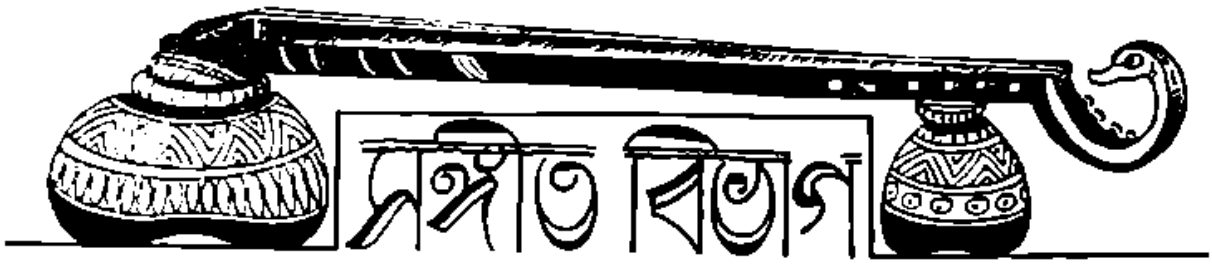

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গলদ

শ্রীলামু

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচলন আজকাল যে বেড়েই চলেছে বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রভূত জনসমাগম দেখে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু তবুও এটা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কোথায় যেন মস্ত একটা গলদ থেকে যাচ্ছে যার জন্য সাধারণ শ্রোতারা আজও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সহজে এড়িয়ে চলে। সেই সম্বন্ধেই আজ এই প্রবন্ধে কিছু বলব।

গানে গায়কের মনে বেশীক্ষণ ধরে না রাখবার একটা ইচ্ছা প্রবল দেখা যায়। তাঁরা করেন যে বেশীক্ষণ ধরে গান গাইলেই হয়ত তাঁদের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে; কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন না যে শ্রোতাদেরও একটা ধৈর্যের আছে,—যার একই জিনিসের পুনরুক্তি শ্রোতাদের মনে আনন্দ দান করতে পারে না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—Minimum Expenditure, Maximum Result—ওস্তাদেরা যদি একথা মানতেন তাহ'লে তাঁদের গান আর এত একঘেয়ে হ'ত না।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ে—তাঁকে একদিন গান শোনাতে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি বলেছিলেন যে "বাপু! শুনতে ত' যাব। বলি থামবে তো।" আজও সাধারণ শ্রোতাদের মনে "শুনতে ত' যাব কিন্তু থামবে ত" এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে রয়েছে যার জন্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনাতে সাধারণ শ্রোতাদের আনন্দের চেয়ে কষ্টই বেশী হ'য়ে থাকে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে কথার চেয়ে সুরের প্রাধান্য বেশী এবং সুর সর্বসাধারণকে মুগ্ধ করে। তবে প্রশ্ন ওঠে এখনও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সাধারণ লোকে এড়িয়ে চলে কেন? ওস্তাদেরা হয়ত ঐ কুঁচকে সাধারণ লোকদের বলবেন যে বাপু যে বিষয়ে তোমরা অজ্ঞ সে বিষয়ে মাথা ঘামাতে যাও কেন? কিন্তু সঙ্গীত কি কতিপয় মুষ্টিমেয় লোকের জন্য? নিশ্চয় তা নয়—তবে সাধারণ লোকেরাও কেন এ রস থেকে বঞ্চিত হবেন। তবে এও সত্য যে সঙ্গীত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লোক সাধারণ লোক অপেক্ষা বেশী আনন্দ উপভোগ করবেন; কিন্তু তাই বলে ত' সাধারণকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না—যে সঙ্গীত সর্বসাধারণকে মুগ্ধ করতে সক্ষম হ'বে সেই যথার্থ সঙ্গীত।

দ্বিতীয়তঃ কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষতা সাধন আজকাল ওস্তাদেরা মোটেই করেন না—সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের অধিক পরিতৃপ্ত করবে—কিন্তু ওস্তাদেরা এদিক যেন এড়িয়ে চলেন—দেখা গেছে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরকে চাপা দিয়ে আর এক কণ্ঠস্বরকে নকল করতে গিয়ে নিজের কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছেন। নকল করার প্রচেষ্টা এত বেশী হয়ে উঠেছে যার জন্য আজকাল সঙ্গীতে নূতনত্বের অভাব বেশী অনুভূত হয়। অথচ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গায়কের নিজের বৈশিষ্ট্য ফোটাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

তৃতীয়তঃ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গলদের প্রধান কারণ ওস্তাদদের রসবোধের ও আন্তরিকতার অভাব। অনাবশ্যক চীৎকার এবং বীভৎস রকমের অঙ্গচালনা সঙ্গীতের মাধুর্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে। আজকাল ওস্তাদী সঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে যে রস সৃষ্টি করার চেয়ে বাহাদুরী নেবার জন্য ওস্তাদেরা বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। বিশেষতঃ খেয়াল গানে তানের প্রাধান্য এত বেশী হ'য়ে উঠেছে যে তানের মধ্যে সুরকে যেন আমরা

(২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

কয়েকটি কবিতা—দিলীপ কুমার রায় প্রণীত
অভিযান পাবলিশিং হাউস
৪৮ বহুতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা।
পৃঃ ৬৪। মূল্য—২৲

আমাদের জাতীয় জীবনে আজ একটা অবসাদ এসেছে—এই অবসাদের ছাপ পড়েছে আমাদের সামগ্রিক সামাজিক চেতনার ওপর। আমাদের জাতীর আত্মা যেন পূর্ণ-গ্রহণ কবলিত।

আমাদের জাতীয় সাহিত্যেও এই অবসাদের ছাপ লেগেছে—শুধু লাগেনি—লেগে সাহিত্যকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেছে।

সর্ব্বত্র একটা একটানা ঘ্যানঘ্যানানি আমাদের বলিষ্ট ভাবালুতাকে লুপ্ত করে দিয়েছে—হৃৎ নাকী সুরে কান্না নয়ত বিদেশীয়ানার উৎকট ও হাস্যকর নকলনবিশী। এই সামগ্রিক বিক্ষিপ্ততার মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীর আধোগোঙানি মনকে পীড়া দেয় সব চাইতে বেশি করে। নতুন ভাবনা, নতুন চেতনা বা নতুন প্রেরণা—এর কোনটাই সাম্প্রতিক কাব্য-সাধনার চোখে পড়েনা—কিন্তু কাব্য-সাধনা বলে বোধ হয় ভুল করলাম—সাম্প্রতিক কাব্য-চর্চ্চাকে সাধনাহীন বাগ্ বিস্তার বলাই বোধ হয় অধিকতর সত্য হবে। কিন্তু 'কয়েকটী কবিতা' পড়ে চমকে উঠেছি। 'কয়েকটী কবিতা'র কাব্যের আঙ্গিক এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতা মনকে নাড়া দেয়। পুরণো জিনিষকে নতুন চোখে দেখবার এবং নতুন নতুন জিনিষকে কাব্যিক রূপ দেওয়ার সাহস আছে—শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের; এবং এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়।

কয়েকটি কবিতা যেমন—অপারেশন, পরিক্রমা, অনিবার্য্য কারণ, এক বুড়ো, কোন এক...বুদ্ধি-দীপ্তির সঙ্গে অনবদ্য প্রকাশ ভঙ্গীর মিশ্রণে অদ্ভুত ভাল হয়েছে। যে মহৎ ভাবনা থাকলে কাব্যে গুড আর্ট গ্রেট আর্ট হয়ে ওঠে তা হয়ত নেই, এতে 'তবুও স্বপ্ন-বাসরে দ্যুতি জ্বলে'—এই কাব্যিক দুর্ভিক্ষের দিনে তাই বা মন্দ কি। 'কয়েকটি কবিতা' ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির মহিমায় ভাস্বর। কয়েকটি কবিতা'র কবি দিলীপ কুমার রায়কে স্বাগত জানাই।

বাংলা বর্ষলিপি:—শিশির কুমার আচার্য্য চৌধুরী, বি, এ, সম্পাদিত। সংস্কৃতি বৈঠক ১৭, পতিতিয়া প্লেস, বাদীগঞ্জ হইতে প্রকাশিত। পৃ, ৩৬০+৩৬ মূল্য—২৲।

'বাংলা বর্ষলিপি'র এটা নবম বার্ষিকী প্রকাশ—'বাংলা বর্ষলিপি'যে বাঙ্গালীর মনে স্থান কেড়েছে এই থেকেই তা বোঝা যাবে। বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ এই পুস্তকখানি সর্ব্বদা পঠনীয় পুস্তকের তালিকাভুক্ত হয়ে ওঠেছে। পূর্ব্বে আমরা যে সব তথ্যের জন্যে বিদেশী ভাষায় সংকলিত এই নত তথ্যগ্রন্থের দুয়ারে ধর্ণা দিতাম—আজ মাতৃভাষায় আমাদের হাতের কাছে তা তুলে ধরে সংস্কৃতি বৈঠক সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থ সকলেরই উপকারে আসবে, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা পরীক্ষার জন্যে যাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন—সেই সমস্ত বিদ্যার্থীর পক্ষেত এ বই অবশ্য প্রয়োজনীয়। বই-খানির ছাপা পরিচ্ছন্ন, তবে তথ্য সংকলন ত্রুটীহীন নয়—এবং মুদ্রাকর প্রমাদ ও অনেক ক্ষেত্রে প্রমাদের কারণ হয়েছে।

তথ্য সংকলনে ত্রুটী থাকা নানারূপক ত্রুটী—কাজেই এ কার্য্যে সংস্কৃতি বৈঠক ভবিষ্যতে অধিকতর সতর্কতা দেখাবেন আশা করি।

Incidents of Gandhiji's Life:—চন্দ্রশেখর শুক্লঃ সম্পাদিত ভোরা এণ্ড কো পাবলিশার্স প্রাঃ,

এবং রাইটস্ বিল্ডিং
পৃষ্ঠা ৩৪৪, মূল্য—১০৲

চরিত্র কি এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যা প্রতিভাত হয় তাই চরিত্র না যা অন্তর্নিহিত তাই চরিত্র? এ তর্কের শেষ নেই। মনে পড়ে কার যেন এক সমালোচনা পড়েছিলেম যে মার্চেণ্ট অব ভেনিসে সেক্স্‌পীয়র নাকি শতিকারের চরিত্র এবং নকল চরিত্রের পার্থক্য দেখিয়ে দেবার জন্যেই কলম ধরেছিলেন। হতে পারে। কিন্তু মর্চেণ্ট অব ভেনিস পড়ে আমার কখনও ওকথা মনে হয়নি। আমি যথার্থ যা, এবং লোকে আমাকে যা বলে জানে—এ দু'এর মধ্যে বেশ খানিকটা পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার চরিত্র বিচার করতে হলে আমি কি, লোকে আমাকে কি ভাবে দেখে এ দুই দৃষ্টি-কোণ থেকেই আমাকে দেখতে হবে। "কিন্তু আমি কি" এই প্রশ্নটা যেন বড় বেয়াড়া ধেঁসা হয়ে পড়ছে—নয় কি? বেয়াড়া—বেয়ের অন্ত হলেও ও জিনিষটার কোন অন্ত নেই ব'লেই বেয়াড়ার কাছাকাছি হলেই সাবধান হওয়া ভাল।

সুতরাং 'আমি কি' এই দুর্ধর্ষ বৈদান্তিক তত্ত্ব রেখে লোকে আমাকে কি চোখে দেখে সেইদিক থেকে আরম্ভ করলেই বোধ হয় 'আমি কি' তা ভাল বোঝা যাবে। প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। লোক ত একটা নয়—বহু জনে, বহু মনে এবং বহু চোখে দেখছে। কোন দেখা সত্য? এর সোজা উত্তর হচ্ছে—সব দেখাই সমান সত্য এবং সমান ভুল। তবু এই দেখাই আত্মজিজ্ঞাসার চাইতে সহজ।

গান্ধীজীর জীবিত কালে এবং তাঁর অপসারণের পর মানুষ গান্ধীর রূপটি যে যেমন ভাবে দেখেছেন তার বিশদ বিবরণ বের হয়েছে। বিরাট এক গান্ধী সাহিত্য গড়ে উঠেছে। গান্ধী চরিত্রের বহু চিত্র আমরা দেখেছি—তবু গান্ধী চরিত্রের এমনি মাধুর্য্য যে আরও দেখতে ইচ্ছে হয় এবং দেখলে ভাল লাগে।

শ্রীচন্দ্রশেখর শুক্ল সম্পাদিত 'ইন্সিডেণ্টস্ অব গান্ধীজিজ লাইফ' গান্ধী চরিত্রের একটি ছোটখাটো বিশ্বকোষ। দেশী ও বিদেশী ৫৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি—তাঁরা যে ভাবে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজীকে দেখেছেন সেই বিচিত্র কাহিনী বলেছেন।

এই লেখার মধ্যে কোন 'আহা মরি' বা গরগদ ভাব থাকায় সমস্ত গ্রন্থখানিই অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছে। গান্ধীজীকে আমরা অনেক অন্তরঙ্গ কোণ থেকে দেখার সুযোগ পাই এই গ্রন্থে। গান্ধীজীর অন্তর্নিহিত গভীর মানবতা, তাঁর একান্ত মানবিকতা, সর্ব্বোপরি তাঁর কঠোর তপোশ্চরণ সবই আমাদের সামনে ছবির মতো ফুটে ওঠে—লেখার ভঙ্গী এমনি সরস, এবং এমনি মধুর।

এই ৫৪ জন লেখকের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মতানুগ নন—আবার এমনও অনেকে আছেন যাঁরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধাচরণই করেছেন। গান্ধী চরিত্র বিচারে তাঁদের সাক্ষ্যের মূল্যই বোধ হয় বেশি। এন্‌, সি, কেলকার অথবা কোনল্ড রাওএর স্মৃতি কথা এই কারণেই খুব ভাল লাগে।

লোকমান্য তিলকের অন্তিম শয্যার পার্শ্বে গান্ধীজীর যে চিত্রটি শ্রীকেলকার ফুটিয়ে তুলেছেন তা অমূল্য।

তারপর শ্রীকেলকার গান্ধীজীর ঐতিহাসিক বিচারের যে ছবিটী দিয়েছেন তাও অপূর্ব্ব।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ এবং গান্ধীজীর সঙ্গে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রথম সাক্ষাৎ করার কথা তো রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই বলেছেন। গান্ধীজী যখন প্রথম বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের পাটনা গৃহে যান তখন তিনি বাড়ী ছিলেন না। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের ভৃত্য গান্ধীজীকে একজন গেঁয়ো মক্কেল ভেবে—তাঁকে বড় একটা আমলই দেয় না। এ কাহিনী গল্পের মত মনে হলেও সত্য।

পট্টভী সীতারামায়ার আঁকা গান্ধী চিত্রটীও মানুষ গান্ধীকে বুঝতে খুব সাহায্য করবে—গান্ধীজী দেবতা ছিলেন না—রক্ত মাংসের মানুষই ছিলেন—এবং এই স্থানেই তাঁর সত্যকারের মাহাত্ম্য। ডাঃ সীতারামায়ার চরিত্র-চিত্রটী সেই রক্ত মাংসের গান্ধীজীকে বুঝতে সাহায্য করবে বলেই ও লেখাটী গ্রন্থখানির সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।

গ্রন্থের মুদ্রণ ও ছাপা ভাল।

গান্ধীজীকে যাঁরা বুঝতে চান, জানতে চান, গান্ধীজীর আদর্শকে যাঁরা অনুসরণ করতে চান—তাঁদের পক্ষে এ গ্রন্থ অপরিহার্য্য।

'জাগতিকি'

সুধীর রায় চৌধুরী

চীন—

গত ৮ই আগষ্টের এক খবরে প্রকাশ জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইশেক ও কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ডঃ রী কর্তৃক যুক্তভাবে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম জীতি বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা সুদূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার আবেদন জ্ঞাপন করিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ঐক্যবদ্ধ হইলেই আমাদের নিরাপত্তা নিরঙ্কুশ হইবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলির মধ্যে একটী কম্যুনিষ্ট বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অগৌণে একটী সম্মেলন আহ্বানের জন্য ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টকে জানুইয়ারীতে একটী সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

সাংবাদিক বৈঠকে এই সরকারী খবর প্রকাশ করবার সময় জেনারেলিসিমো চিয়াং বলেন যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার বিরোধী। এই পাপ অবশ্যই দূর করিতে হইবে এবং ইহার জন্য আমাদের ব্যক্তিগত সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

পর্যবেক্ষক মহল আশা করেন যে এশিয়ার কম্যুনিষ্ট বিরোধী ফ্রন্ট গঠন সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের সহিত আলোচনার জন্য ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট অদ্য এখানে পৌছিবেন। তাহার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে তিন দিন অবস্থানের সম্ভাবনা আছে।

নিজ দেশ হইতে বিতাড়িত চিয়াং অদ্য কোরিয়ার বিদেশী শক্তির তাবেদার ও তাঁহার অন্ন পুষ্ট 'রী' এবং সমপর্যায়ের ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট এই ত্রিমূর্তির সমন্বয়ের ইতিহাসের পরিহাসের উপকরণ জোগাইবে না তো? আটলান্টিক চুক্তির অনুরূপ একটী আক্রমণ বিরোধী চুক্তি এশিয়াখণ্ডেও সম্পন্ন করিবার প্রয়াস অনেক দিন ধরিয়াই হইতেছে। কিন্তু মার্কিন পররাষ্ট্র মহলে সেই চেষ্টা তেমন আমল পাইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যদিও সুদূর প্রাচ্যের খবরাখবর লইবার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর খুবই উৎসুক এই উদ্দেশ্যে সিনর গ্রাডিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে তথাপি একথা স্বীকৃত হয় নাই যে ইহার মূলে আছে ঐ রূপ এক চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব প্রয়াস। এশিয়া খণ্ডে দক্ষিণ কোরিয়া এবং পারস্য দেশ ছাড়া প্রকাশ্য ভাবে সামরিক সাহায্য আমেরিকা আর কাহাকেও সম্প্রতি করিবে বলিয়া মনে হয় না। পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে বৈদেশিক মন্ত্রী মিঃ এ্যাকিসন যে বিবৃতি বাহির করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এম, টি, সরকারকে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সেনাপতি মার্শাল বহু পূর্বেই এইরূপ সাহায্যের নিরর্থকতা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জোরের সহিত ও স্পষ্ট ভাষায় নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই সরকারী বিবৃতি হইতে—পরাজিত ও সর্বথা অক্ষম অকর্মণ্য বলিয়া চূড়ান্তভাবে প্রতিপন্ন চিয়াং-সরকারকে সাহায্য করিবার—মার্কিন সরকারের যে কোন রকম সদভিপ্রায় নাই তাহাই প্রমাণিত হইতেছে বলিয়া নিঃসংশয়ে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই বিবৃতি হইতে আরও বুঝা যায় বৈদেশিক শক্তি-সমূহের প্রতি চীনা কমিউনিষ্টগণ কেন এত বিরূপ। নানাভাবে মার্কিণ প্রতিনিধিগণ চীনে লাঞ্ছিত হইতেছে। এই লাঞ্ছনা হইতেছে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত। চীনে বিদেশী শক্তির সামরিক ক্রিয়াকলাপ ইতিহাসের বস্তু হইলেও অদ্যাপি চীনবাসী তাহা ভুলিতে পারে নাই। কি করিয়া একের পর এক ইউরোপীয় জাতি নিজের জন্য জোর করিয়া ব্যবসায়গত আইনগত ও ভূমিসত্ব সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে তাহাও ভুলিবার নহে। কাজেই আজ যখন কথা উঠে বাহিরের সাহায্য ব্যতীত চীন জাতি নিজের শিরোন্নতী ও সর্বাঙ্গীন প্রগতি সম্পন্ন করিতে পারে না, তখন যদি চীন নেতা সেই উক্তির প্রতি বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেন তাহাতে বিস্মিত

হইবার কিছুই নাই। চীন জাতিকে যে বাহিরের সাহায্য লইতে হইবে—বিশেষতঃ অগ্রসর পশ্চিমী শক্তি সমূহের নিকট হইতে—একথা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে পশ্চিমী শাসনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র বিশেষ করিয়া অনতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বাদের প্রতি বৈরভাব কিছুমাত্র লাঘব হইবে। এইসব দিক দিয়া বরং সোভিয়েট রাশিয়া তাহার সমগোত্রীয়। তাই আন্তর্জাতিক শক্তিগোষ্ঠীর বিভাগ হিসাবে তাহাতে স্থান পশ্চিম বিরোধী সোভিয়েট সমর্থক রাষ্ট্র মণ্ডলীর কোঠায়।

ইহা ছাড়া কেহ যেন মনে না করেন কমিউনিষ্ট চীনে সোভিয়েট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সম্বন্ধে অন্ধ অনুকরণ মাত্র। এই অন্ধ অনুকরণের কথা যাহারা বলে অথবা যাহারা বলে যে বর্তমানে যেরূপ ব্যবস্থাই চালু হউক না কেন পরিণামে সোভিয়েট অনুরূপ একনায়কত্বেরই বিবর্তন চীনদেশেও হইবে। তাহারা নিছক স্বার্থ প্রনোদিত হইয়াই এইরূপ অপপ্রচার করিতেছে "নয়া গণতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তথ্য এবং সত্যকে উপলব্ধী করিলেও প্রকাশ্যে তাহা স্বীকার করিবার সৎ সাহস তাহাদের নাই। বিদেশী শাসনপুষ্ট নীতিভ্রষ্ট স্বার্থান্বেষী প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও পুঁজিপতি শ্রেণী ব্যতীত অন্য সব শ্রেণীই নব প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় স্থান পাইয়াছে। এমন কি সরকার যে সম্পত্তি দেশের ও দশের স্বার্থে বাজেয়াপ্ত করিতে বাধ্য হইতেছেন তাহার জন্যও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। অতি অকিঞ্চিতকর সংখ্যালঘু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠি ব্যতীত এইরূপ সরকার, নেতৃত্ব, দল ও সমাজ ব্যবস্থা যে সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন মাত্র অবকাশ নাই। এইরূপ জনসমর্থন পুষ্ট কমিউনিষ্ট চীনকে এ্যাটম বোমার ভয় দেখাইয়া আদর্শচ্যুত করার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

ইন্দোনেসিয়া—

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ভারতের গণপরিষদের সভ্যদের সম্বোধন করিয়া বলেন যে, "এসিয়ার জাতি সমূহকে যুদ্ধের আশঙ্কা হইতে রক্ষার জন্য এসিয়ার আমাদের শান্তি প্রচেষ্টায় সচেষ্ট হইতে হইবে।" তিনি আরও বলেন হেগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পথে তাঁহার দিল্লীতে আগমন ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর করা ইহার একটী উদ্দেশ্য।" তিনি বলেন যে "ভারত ও ইন্দোনেসিয়া উভয়েই পাশ্চাত্যের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কলনে হইয়াছে এবং তাহারা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। ইহা ছাড়াও অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয়দের নিকট হইতে আমরা অনেক সাংস্কৃতিক তথ্য লাভ করিয়াছি। এই জন্যই পরাধীন জাতি হিসাবে তাহাদের মধ্যে একতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই জন্যই এই দুইটী দেশের জনগণ সকল প্রকার অত্যাচারের বিরুদ্ধতার সংকল্প করিয়াছে এবং বিশ্বের মানব সমাজ যাহাতে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে তাহার জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দাবী করিয়াছে।

জাপানীরা পরাজিত হইবার সাথে সাথেই আমরা ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগষ্ট প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করি। আমরা চারি বৎসর ওলন্দাজদের সহিত আলোচনা করি। এই সময় ওলন্দাজ বাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় বলিয়া এই শান্তিপূর্ণ আলোচনার ব্যাঘাত ঘটে। আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সামরিক অভিযানের পর এই পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে সকলেই বুঝিয়াছেন যে বর্তমানে কোন অন্তবর্তী ব্যবস্থা হইতে পারে না এবং বিনা সর্তে ইন্দোনেসিয়া বাসীদের নিকট সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরই সঙ্কট দূরীকরণের একমাত্র উপায় এই জন্যই আমরা হেগ গোলটেবিল বৈঠকে যাইতেছি।"

এতদিন পরে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইন্দোনেসিয়া সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। ইন্দোনেসিয়ায় আস্থায়ি ভাবে যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছে। উভয়পক্ষ নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। শান্তি চুক্তির সর্তগুলি যাহাতে নিশ্চিতভাবে পালিত হয় তাহার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি লইয়া

কেন্দ্রীয় একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে সংবাদপত্রে প্রচারিত না করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য এই কেন্দ্রীয় সমিতিকে জানাইতে হইবে। এই অবস্থায় মনে হয় উভয় পক্ষই শান্তি চুক্তি পরিপূরণে আন্তরিক চেষ্টা করিবে। সাম্রাজ্যবাদের গৃহ বিচ্ছেদ নীতি বহু দিন কার্যকরী হইয়াও শেষ পর্যন্ত এখানে ব্যর্থ হইয়াছে। নিজ সাধারণতন্ত্রী অংশের বাহিরে আন্তান্য অংশ গুলিও সংযুক্ত ভাবে সার্বভৌমত্বের দাবীতে সমর্থন জানাইয়াছেন। কাজেই মনে হয় এবার ওলন্দাজ সরকার সম্মিলিত ইন্দোনেসিয়ার দাবীগুলি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। ইন্দোনেসিয়ার সমস্যা যে আন্তর্জাতিক অশান্তির কারণ হইয়াছিল তাহা দূর হইবে বলিয়াই আশা করা যাইতেছে।

ইউরোপ—

ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র হইতে অদ্য ঘোষণা করা হয় যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন ব্যাতীত ইউরোপে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জীবন যাত্রার মানের অবনতি ঘটা অবশ্যম্ভাবী। গত বৎসর হেগ সম্মেলনের পর সম্মিলিত ইউরোপ গঠন করে যে পাঁচটী, প্রধান স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তাহাদের সম্মিলিত বৈঠকের পর গত ৭ই আগষ্ট উপরিক্ত মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এই ইউনিয়ন গঠনের অসুবিধা আছে এইরূপ মন্তব্য প্রসঙ্গে বিবৃতিতে বলা হয়, "আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই ইউরোপীয় সংগঠন সম্ভব। যদি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করিতে পারি তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা শুধু ইউরোপের স্বাস্থ্য ও শক্তিরই পুনরুদ্ধার করিব না, বিশ্বের উন্নতি সাধন ও শান্তিরক্ষার কার্যে বিশেষ সাহায্য করিতে পারিব।"

ইউরোপীয় পরিষদের উদ্যোক্তা ১০টী রাষ্ট্রের বৈদেশিক সচিবগণ গত ৭ই আগষ্ট একটী বৈঠকে মিলিত হন। বিশ্ব পার্লামেন্ট গঠনের প্রথম পরীক্ষা এখানেই সুরু হইবে।

একটীর পর একটী করিয়া নূতন নূতন সংগঠনের শেষ নাই কিন্তু যে শান্তির বাণী বিঘোষিত হইতেছে তাহার দেখা কবে মিলবে কে জানে। প্রথমত গঠিত হইল পশ্চিম ইউনিয়ন—ইংলণ্ড, ফরাসী দেশ, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও হল্যাণ্ড এই ৫টী দেশ লইয়া। তারপর আসিল আটলান্টীক চুক্তি। এখন শোনা যাইতেছে যে আমেরিকার আটলান্টিক চুক্তি গৃহীত হইবার পর এই পশ্চিম ইউনিয়নের সার্থকতা লোপ পাইয়াছে। মার্কিন সামরিক প্রতিনিধি দল গোপনে আলোচনা করিবার জন্য মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের নাকি এইরূপ অভিমত।

এদিকে মার্কিন কংগ্রেসে বিদেশে অর্থ সাহায্য করিবার যে বিল মার্কিন সরকার পেশ করিয়াছেন তাহার আলোচনা দিনের পর দিন স্থগিত করা হইতেছে। সাধারণ ভাবে এই সাহায্যের সমর্থন যদিও প্রতিনিধিদের আছে তথাপি সাহায্যের পরিমাণ, সময় ও লাভকারী দেশ সম্বন্ধে গভীর মতদ্বৈধ আছে। আটলান্টিক চুক্তি অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দেশ সমূহকে সামরিক সাহায্য আমেরিকাকে সরবরাহ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া তুরস্ক, গ্রীস, পারস্য ও কোরিয়া তো পূর্ব হইতেই এইরূপ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে। তাহাদের সাহায্যও চালু রাখিতে হইবে। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য হইতেছে আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম হইতে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করা। ইউরোপের অর্থনৈতিক ও সামাজিক যে অবনতি যুদ্ধের ফলে ঘটিয়াছিল তাহা দূর করিয়া তথায় অর্থনৈতিক সামাজিক পুনর্গঠনের যে ব্যাপক পরিকল্পনা মার্শাল সাহায্যের মারফত কার্যকরী করা হইতেছে ও যাহা ক্রমশঃ সুফলপ্রসূ হইতেছে সেই পরিকল্পনার সাফল্য ও সাধারণ ভাবে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও ঐতিহ্য কম্যুনিজমের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এই ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই মার্শাল চুক্তির উদ্ভব। এবং তাহারই সর্তানুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দেশ সমূহকে সর্তাধীনে সামরিক সাহায্য করা আমেরিকার দায়িত্ব। আমেরিকার রণসজ্জা ইউরোপের এই সব অঞ্চল হইতে আটলান্টিক মহাসাগরের পরপারে বহুসহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। এই অঞ্চল আক্রান্ত হইলে আমেরিকা হইতে সাহায্য আনিতে অনেক সময়

লাগিবে। ততদিনে গণতান্ত্রিক অঞ্চল শত্রু কর্তৃক হইয়া এতদিনের পরিশ্রমের ফল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে। এই ধ্বংস হইতে যাহাতে অন্ততঃ সাময়িক ভাবে রক্ষা পাইতে পারে সেইরূপ প্রস্তুতি এই অঞ্চলেরথাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন আর্থিকভাবে অবশ্য এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে নিজেদের দায়িত্বে করিতে হইবে। এই প্রস্তুতির যোগ্যতা ও সম্ভাবনা সব দেশের সমান নহে। যাহার যতটা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কিনা তাহাও বিচার্য। এই বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে কাহাকে কতটা সাহায্য করা প্রয়োজন। এইরূপে প্রস্তুত দেশগুলিকে লইয়া একটী সম্মিলিত আত্মরক্ষা মূলক প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। পশ্চিম শক্তিগুলির প্রধানগণ মনে করেন এইরূপ সামরিক প্রস্তুতি-সম্ভার তৃতীয় মহাযুদ্ধের একমাত্র প্রতিষেধক।

সঙ্গীত বিভাগ

(২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

কোথায় হারিয়ে ফেলি। পূর্বেই বলেছি যে সঙ্গীত সর্বসাধারণকে মুগ্ধ করবে সেই যথার্থ সঙ্গীত—মুগ্ধ করতে পারে সেখানেই যেখানে সুরের প্রাধান্য বেশী থাকে—কিন্তু ওস্তাদেরা Sentiment এর ধার ধারেন না—তাঁরা বাহাদুরী নেবার জন্য যত রকমের কসরৎ আছে তা দেখাবার চেষ্টা করেন, যার জন্য সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্যই চাপা পড়ে থাকে এবং যার জন্য সাধারণ লোকেরা এই উচ্চ সঙ্গীতের রস থেকে বঞ্চিত হন। অনাবশ্যক চীৎকার ক'রে এবং পর্দায় পর্দায় সোনের বাথার বিরাট লাফ নেয়ে ওস্তাদেরা যখন সঙ্গীত শেষ করেন তখন সাধারণ শ্রোতারা আনন্দের চেয়ে কৌতুকই বেশী উপভোগ করেন। এই সব ও অন্যান্য ত্রুটীর জন্যই সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত সত্য থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। অবশ্য সব ওস্তাদেরই যে এই সব ত্রুটী রয়েছে সে কথা আমি বলছি না—এর ব্যতিক্রমও আছে, তবে অধিকাংশ ওস্তাদের মধ্যেই এই সব ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'য়ে থাকে। যাঁদের এই সব ত্রুটি নেই তাঁরাই সঙ্গীতের দ্বারা শ্রোতাদের মনোহরণ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ ৺আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের কথা বলা যেতে পারে।

পরিশেষে এইটুকু বলতে চাই যে বর্তমান ওস্তাদেরা এই ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করে যদি গান না করেন তাহ'লে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত কখনও সর্বাঙ্গীন সুন্দর হ'য়ে উঠবে না এবং শ্রোতারাও পূর্বের মত এই উচ্চসঙ্গীতকে সভয়ে এড়িয়ে চলতে থাকবেন। এটুকুও মনে রাখা উচিত যে সঙ্গীত একটা জাতিকে অনেক কিছুই দিতে পারে তাই সঙ্গীতকে বিকৃত করলে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হব। সঙ্গীত সাধনালব্ধ জিনিষ ;—যাঁরা এই সাধনা করছেন তাঁদের কাছে এই আন্তরিক অনুরোধ যে তাঁরা যেন এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখেন। তাহ'লেই আমাদের ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমৃদ্ধিশালী হবে এবং সাধারণ লোকেরাও এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে না।

বাংলার সমস্যা ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ—

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি হঠাৎ বাংলার ব্যাপার সম্বন্ধে স্পষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছেন। হয়ত কার্যকরী সমিতির পূর্বে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারও বাংলার ব্যাপার সম্বন্ধে শঙ্কিত ও চিন্তিত হয়েছিলেন। কারণ, ভারত-সরকারের প্রধান হুইপ (Chief Whip) শ্রীসত্য-নারায়ণ সিংহ ও প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বাংলায় এসে এ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেছেন। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃপক্ষ কার্যত একই।

আমাদের মনে হয় বাংলার ব্যাপার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আরও পূর্বেই তৎপর হওয়া উচিত ছিল। গত এক বৎসর—প্রাদেশিক কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রিবর্গ বাংলার জনসাধারণের সামনে প্রায়ই উপস্থিত হতে পারে নি। কংগ্রেসের নামে কোন সাধারণ জনসভা ইত্যাদি প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সুদূর জলপাইগুড়ি সহরে কলেজের একটী বিশেষ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলার প্রধান মন্ত্রী রায় বিড়ম্বিত হয়ে ফিরে এলেন; ক্রোধের বশে অনিশ্চিত কালের জন্য সেই কলেজ বন্ধ করার হুকুম দিলেন।

অপর দিকে দেশে আইন ও শৃঙ্খলা ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ার অবস্থায় এসেছিল। দক্ষিণ কলিকাতা নির্বাচনকে উপলক্ষ করে দুমাস পূর্বে যে সব উৎপাত করার সুযোগ কমিউনিষ্ট দল পেয়েছে, তা ছেড়ে দিলেও প্রদেশের নানাস্থানে আইন ও শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি বাংলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল: নমনা, বশিরহাট নিয়ে যে দুঃসাহসিক কাণ্ডের অভিনয় কয়েক মাস পূর্বে হয়েছিল—তা নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালকে এক বিবৃতিও দিতে হয়েছিল।

তখনও যে কেন্দ্রীয় সরকার অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি তা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। কথায় কথায় গুলী-চালিয়ে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত মন্ত্রীদের পক্ষে দেশ শাসন করা চলে না; বিদেশী শাসকবর্গ, জনসাধারণের কাছে যাদের কোন জবাবদিহি ছিল না, এবং শাসনকর্তার গদি হ'তে যাদের অপসারণ করবার অধিকার জনসাধারণের ছিল না—তাদের পক্ষে পুলিশ ও পল্টনের লাঠি ও গুলী দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা হয়ত সম্ভব ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ততঃ এটা বোঝা উচিত ছিল—যে এমনি করে জনপ্রিয় মন্ত্রীদের কাজ চলতে পারে না। তা সত্ত্বেও যে কেন্দ্রীয় সরকার বা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বাংলার ব্যাপারে এত দিন হস্তক্ষেপ করে নি—এইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। হয়ত প্রধান মন্ত্রীর ও অন্যান্য ক্ষমতাশালী মুরুব্বির খাতিরে বাংলার এই মন্ত্রীসভা দিল্লীর কর্তৃমহলে অনেকটা "লাই" ও আস্কারা পেয়েছে।

কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব—

তবুও এতদিনপর কর্তৃপক্ষ যে বাংলার অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছেন এইটাই সুখের বিষয়। ওয়ার্কিং কমিটী চার দিন আলোচনার পর এক প্রস্তাব পাশ করেছেন। এই প্রস্তাবকে তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমে মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত আমরা মনে করি, আরও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হওয়া উচিত ছিল। বাংলার পক্ষে এটা বিশেষভাবে জানা দরকার যে বর্তমান মন্ত্রীসভার উপর কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বিশ্বাস ও আস্থা আছে কি না। প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ভারতবর্ষের বাইরে। দেশের এই সঙ্কট সময়ে

দীর্ঘকালের জন্য বাইরে চলে যাওয়ার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি তিনি গ্রহণ করেছেন কি না জানি না, কিন্তু কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির আহ্বান সত্ত্বেও তিনি দেশে ফিরে আসেন নি। তাই পূর্ব কার্যক্রম অনুসারে সমস্ত সফর শেষ করে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করবেন। কাজেই কার্যকরী সমিতির প্রস্তাব পূর্ণ একটী মাস বুলঝুরী থেকে যাচ্ছে।

ভাঃ রায় ফিরে এলেও মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রস্তাবে নেই। তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তি, অনেক প্রভাবশালী মুরুব্বী তাঁর আছে! তিনি ফিরে আসার পর হয়ত আবার দীর্ঘ আলোচনা ও দরাদরি চলবে। তারপরে সাব্যস্ত হ'বে মন্ত্রীসভার কি হবে। আমরা মনে করি—কার্যকরী সমিতি হয়—অবস্থার গুরুত্ব প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি, অথবা হৃদয়ঙ্গম করেও গুরুত্বের উপযুক্ত নির্দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় দিতে পারেন নি। তাঁদের প্রস্তাবে আছে এক অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা (Interim Ministry) গঠিত হবে। সেই মন্ত্রীসভার গঠন কি হ'বে তা অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে, এই প্রস্তাব অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী পরিষদের উপর। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই, বর্তমান মন্ত্রীসভার সামান্য অদল-বদল করে বাংলার অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব কি না, তা যেন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করে দেখেন।

কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অংশ কংগ্রেস কমিটি সম্বন্ধে। প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাহক সমিতিতে কংগ্রেসের বিভিন্ন উপদলের পর্যাপ্ত প্রতিনিধি নিয়ে এর পুনর্গঠন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্বাহক সমিতি মাত্র অল্পদিন পূর্বে গঠিত হয়েছে এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিও এতে আছে। এর পূর্বে যে নির্বাহক সমিতি ছিল, তখন তাতে বিভিন্ন দলের কোন প্রতিনিধি ছিল না বললেই চলে। এই নূতন নির্বাহক সমিতি গঠনের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের দল প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির আলোচনার সময় নিজেদের স্মারকলিপিতে নির্বাহক সমিতির কর্মকর্তাগণ স্পষ্টই বলেছেন, কংগ্রেসের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকদের কারও নির্দেশ অনুসারে প্রতিপক্ষের আরও প্রতিনিধি নির্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করতে তাঁরা রাজী আছেন; কাজেই কার্যকরী সমিতির এই নির্দেশ বাংলা কংগ্রেসের বর্তমান কর্তৃপক্ষদের পক্ষে কোন একটা অবাঞ্ছিত নির্দেশ নয়।

কার্যকরী সমিতি এ সম্পর্কে আরও নির্দেশ দিয়েছেন যে বাংলা কংগ্রেসের নির্বাহক সমিতি এত অধিক সংখ্যক সভ্য নিয়ে গঠিত যে তা নিয়ে কাজের আলোচনা ঠিক ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। তাই একটা ছোট প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতি গঠনের নির্দেশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ এমনি ছোট একটি কার্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন।

কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে যে নির্বাহক সমিতির এমনি সন্তোষজনক পুনর্গঠন সম্ভব না হলে বাংলা থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যরাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাহক সমিতিরূপে কাজ করবে। আমরা মনে করি প্রস্তাবে এই নির্দেশ দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন নিজে থেকেই নির্বাহক সমিতির পুনর্গঠন এবং ছোট কার্যকরী সমিতি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন—তখন একটি অনপসরণীয় (irremovable) নির্বাহক সমিতি প্রাদেশিক কংগ্রেসের উপর চাপাবার ধমক দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের এই নির্দেশ কাজে পরিণত করতে হ'ল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সমস্ত গঠনতন্ত্র (constitution) স্থগিত রাখতে হয়। তাতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে না। কার্য্যকরী সমিতির এটুকু অনুধাবন করা উচিত ছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন—

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির তৃতীয় নির্দেশ হ'ল—পশ্চিমবঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন ছয় মাসের মধ্যে করতে হবে। বাংলার মন্ত্রীসভার উপর তাঁর অসন্তোষের কারণ ঘটেছে—এটা অনুমান করা যায়। বাংলা দেশে বর্তমানে কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের তেমন আস্থা নেই—এমন অনুমান করারও কারণ আছে। কিন্তু এর কারণ কি তাও চিন্তা করা উচিত। বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভা বাংলার জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারে নি। বরং গত দেড় বছরে এই মন্ত্রীসভা জনসাধারণের আস্থা হারিয়েছে। আজ মন্ত্রী-সভা বা ব্যক্তিগত ভাবে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ গুরুতর আকারে রাষ্ট্র হলেই, জনসাধারণ তা বিশ্বাস করে নেয়। অর্থাৎ জনসাধারণ ধরেই নেয়—যে কোন দুষ্কর্ম এই মন্ত্রীসভার দ্বারা সম্ভব। এই মনোভাবের বশে অনেক অসত্য অভিযোগও জনসাধারণ সত্য বলে মনে করে নেয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পক্ষে এটা খুবই অনিষ্টকর।

কিন্তু তার প্রতিকার স্বরূপ যদি পরিষদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তবে আমাদের মনে হয়—কার্যকরী সমিতি সঠিক ব্যবস্থা করেন নি। এক অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভা গঠন করার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে আবার নূতন নির্বাচনেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্বাচনের বিশেষ সার্থকতা আমরা দেখছি না। ছয় মাসের মধ্যে হয়ত পুরাতন ভোটার তালিকার কিছু অদল-বদল করেই এই নির্বাচন হবে। পূর্ববঙ্গ হ'তে আগত ভোটারদের নামও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হবে—এই নির্দেশ দিয়ে কার্যকরী সমিতি বিশেষ বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু আপত্তি উঠবে—সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটের (Adult suffrage) অধিকার এই নির্বাচনে দেওয়া হবে না হয়ত। অবশ্য কার্যকরী সমিতি বলেছেন—সম্ভব হ'লে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার এই নির্বাচনে দেওয়া উচিত। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তা সম্ভব কি না সন্দেহ। তা না হ'লে এই নির্বাচনের বিশেষ সার্থকতা হবে না। দেড় বছর পরই হয়ত নূতন শাসন বিধানে নির্বাচন হবে;—মাঝখানে আবার একটা ঠিকা নির্বাচন বাংলায় করার প্রয়োজন বিশেষ অনুভব করি না। বহু অর্থ ব্যয় হবে;—সেটা খুব বড় কথা নয়। কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের সমস্ত দৃষ্টি দেওয়া দরকার নূতন শাসন বিধানে নির্বাচনের পূর্বে বাংলা দেশে কংগ্রেসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিকে। এর জন্য মন্ত্রীসভা ও প্রদেশিক কংগ্রেসের সমবেত ও অবিশ্রাম চেষ্টা আবশ্যক। এই সময় নির্বাচনের জন্য যে সময় ও শ্রমও যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হ'বে, তা ব্যয়িত হওয়া উচিত কংগ্রেস সংগঠনের জন্য।

বাংলার বর্তমান মনোভাবে নির্বাচনে যে কংগ্রেস খুব সাফল্য লাভ করবে—তা হয়ত আশা করা যায় না। বিভিন্ন দল কিছু আসবে; কংগ্রেসের অন্তর্গত বিভিন্ন উপদলও থাকবে। কাজেই এখনকার চেয়ে ভাল একটি সুগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ দল তখন ব্যবস্থা পরিষদে থাকবে, তারও আশা করা যায় না। কাজেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার দিক থেকে বিশেষ লাভ হবে না। কিন্তু এই নির্বাচন ব্যবস্থায় কংগ্রেস গণতান্ত্রিক মনোভাব ও গঠনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন কংগ্রেস নেতৃবর্গ মনে করেছেন যে কংগ্রেস পূর্বের ন্যায় দেশবাসীর আস্থা ভোগ করছে না, তখনই তাঁরা ঠিক করলেন—দেশবাসীর স্বাধীন মতের নিকট সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। অপর কোন রাজনৈতিক দলই এই সময় নির্বাচন ঘোষণা করতো না।

কংগ্রেস ও বিরোধীদল

দক্ষিণ কলিকাতা উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন দলের এক সমাবেশ হয়েছিল। ঐ উপনির্বাচনের জয়ী প্রার্থী শ্রীশরৎচন্দ্র বসু চেষ্টা করছেন—এই বিভিন্ন দলের সমাবেশকে এক স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে দাঁড়া করান যায় কিনা। শোনা যাচ্ছে ২০।২১টী এমনি বিভিন্ন দল বাম-পন্থী আখ্যা নিয়ে নিজেদের পরিচয় দিতে চায়। ১০ বৎসর পূর্বে এমনই এক বাম-পন্থী সমাবেশের (Leftist Conoslidation) চেষ্টা হয়েছিল। সেই চেষ্টা স্থায়িত্বের সময় হিসাবে বা কার্যকারিতার পরিমাণ

হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে কোন চিহ্নই রেখে যেতে পারেনি। বর্তমান চেষ্টার স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা সম্বন্ধেও ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সন্দেহ জেগেছে।

এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে একমাত্র কম্যুনিষ্ট পার্টির কিছু পরিমানে গণ-সংযোগ আছে। গত যুদ্ধের পরিণাম হিসাবে ও শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক দুঃখ দৈন্য ও তজ্জনিত অসন্তোষ আছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টি জনসাধারণকে সমাজদ্রোহী বিশৃঙ্খলা উৎপাদক কাজকর্মে প্ররোচিত করছে। কোন জনহিতকর দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের পক্ষে এমনি কর্মপন্থা সমর্থনযোগ্য কিনা সন্দেহের বিষয়। কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য দলের মধ্যে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দলই (Socialist Party) দেশের শিক্ষিত লোকদের কিছুটা শ্রদ্ধা ও আস্থা উপভোগ করে। এই দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা দীর্ঘ দেশসেবা, লাঞ্ছনা বরণ ও আদর্শগত নিষ্ঠার দ্বারা দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থাভাজন হয়েছেন। কম্যুনিষ্ট বা অন্যান্য দলের সাথে এমনি ভাবে এক যৌথ ব্যাপারে যেতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি আছে; এই দলের বিভিন্ন নেতারা ইতিমধ্যেই শরৎবাবুর আমন্ত্রণকে প্রত্যাখান ক'রে বরং তাঁকেই আহবান দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক দলে যোগ দেবার জন্য!

অন্যান্য যে সব ছোট ছোট দল আছে তাদের সম্বন্ধে কোন গুরুত্ব দেশবাসী দেয় না; নিজ নিজ ছোট আবেষ্টন ও গণ্ডীর মধ্যে বসে থেকে এরা মনে করে—তাদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতি সব চেয়ে বিজ্ঞানসম্মত ও সমাজের উপযোগী। অল্প সংখ্যক যুবক নিয়েই এই সব দল গঠিত; কারোর হাতে হয়ত বা ছাতাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ঝাড়ুদার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দু' একটি শ্রমিকসংঘ আছে। এই সব দল হয়ত শরৎবাবুর আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারে এবং বাংলা দেশের আগামী নির্বাচনে হয়ত আবার এ সব দলের সমাবেশ হবে—প্রধানতঃ উৎপাত সৃষ্টি করে জনসাধারণের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জন্য। এই সব বিভিন্ন দলের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে যে বিরোধ আছে তা সমাধান কোন কালেও হতে পারে না। কাজেই সাময়িক ঐক্যের পর আবার এরা নেতৃত্ব নিয়ে বিড়ালের ঝগড়া সুরু করে দেবে এবং তার পরিণতি কি হতে পারে তাই দেশবাসীর অনুধাবণ করা উচিত। ছ'মাস পরে যে নির্বাচন বাংলা দেশে হ'বার কথা তখন এ বিষয়ের গুরুত্ব দেশবাসীকে উপলব্ধি করতে হ'বে।

কুচবিহার ও ত্রিপুরা :—

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিভক্ত হয়েছে; বৃহৎ বাংলার দুই তৃতীয়াংশ ভারতীয় রাষ্ট্রের বাইরে চলে গিয়েছে। ছোট এক টুকরা জমি নিয়ে কলিকাতা সহরের বিরাট নগরী সহ বর্তমানে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ গঠিত। স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধিত হয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী সমস্ত প্রদেশগুলির অঙ্গীভূত হয়েছে। এই সব বিভিন্ন রাজ্যের অনেকগুলি এমন ছিল যাদের উপর ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক যোগের দিক দিয়ে একাধিক প্রদেশের দাবী ছিল। সেই সমস্ত দাবী মীমাংসা হয়েছে দিল্লীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে বসে এবং কোন না কোন প্রদেশের সঙ্গে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলিকে একত্রিত ক'রে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে পশ্চিম বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে বহুলোক হত ও আহতও হয়েছে।

ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রাচীন ইতিহাসের সংযোগের দিক দিয়ে বাংলার সাথেই কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের সম্পর্ক। পৌনে দুশ বৎসর পূর্বে যখন কুচবিহার ইংরাজ শাসনের অধীনে আসে তখনকার সন্ধিতে একটী সর্তে বলা হয়েছিল যে আলাদা রাজ্য হিসাবে যদি কোনদিন কুচবিহারকে রাখা না হয় তবে কুচবিহার বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবে। ভারত সরকারের সাথে কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ বরাবরই বাংলা সরকারের মারফৎ হচ্ছিল। হঠাৎ সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে এই দুই রাজ্যের ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ আসাম সরকারের মারফৎ করার প্রয়োজন যে কেন হ'ল সে আমরা বুঝি না।

গত ছ'বৎসর যাবৎ কুচবিহারে এক প্রধানমন্ত্রী কাজ ক'রছেন যাঁর সমস্ত দৃষ্টিকোন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী এবং বাংলার বিরোধী। তিনিই প্রথম চেষ্টা করেছিলেন কুচবিহার রাজ্যের মুসলমানদের সিলে পার্শ্ববর্তী পূর্ব বাংলার জেলার মুসলমানদের যোগাযোগ স্থাপনের। এবং ভারতীয় রাষ্ট্র বিরোধী কার্য্যকলাপও তিনিই রাজ্যে ঘটিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যে বিশেষ ভাবে বাধা দিয়েছে কুচবিহারের শিক্ষিত সহরবাসী—বাঙালীরা। তখন থেকে তিনি চেষ্টা ক'রেছেন কুচবিহার ও বাংলার মধ্যে যাতে একটা বিরোধের মনোভাব গড়ে ওঠে। সেই ভাবেই তিনি একটা নির্বাচন করিয়াছেন এবং ২৫ জনের মধ্যে ২৩ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নাকি লিখে দিয়েছেন যে তারা পশ্চিম বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বিরোধী।

এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি কুচবিহার পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নাই। তাই তাঁদের বর্তমান ব্যবস্থায় যে কুচবিহার কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকবে এটা আমরা মন্দের ভাল হিসাবে গ্রহণ করছি। কুচবিহারে পূর্ব বাংলা হ'তে বহু বাস্তহারা বাঙ্গালী গিয়েছে। কুচবিহার সরকার এতদিন তাদের পুনর্বসতির সম্পূর্ণ বিরোধিতাই করেছে। আশাকরি নূতন ব্যবস্থায় এই বাস্তহারা দুর্ভাগা বাঙ্গালীদের পুনর্বসতির সুবন্দোবস্ত ওখানে হবে। আমরা আরও আশা করি পূর্বের ন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কুচবিহারের যোগাযোগে বাংলা সরকারের ঘনিষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবে।

ত্রিপুরা রাজ্য সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকার শীঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত করবেন এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ী কুকিরা ভিন্ন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা-বাংলা, এবং কয়েক দশক যাবৎ ঐ রাজ্যের সরকারী ভাষাও বাংলা। কুকিদের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আসাম বা অন্য কোন অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। এ রাজ্যের শাসনপদ্ধতি ও সংস্কৃতি সবই বাংলা এবং বাঙ্গালীর প্রভাবে পরিচালিত হচ্ছিল। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যেরও বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া উচিত। হয়ত আপত্তি উঠবে—ত্রিপুরা রাজ্যের সহিত পশ্চিম বাংলার কোন ভৌগলিক যোগাযোগ নেই। যদিও এ আপত্তি অখণ্ডনীয় নয় তবুও এর কতকটা যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। সেই হিসাবে ত্রিপুরা রাজ্য কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে থাকলেই আপাততঃ ব্যবস্থা হিসাবে আমরা সন্তোষজনক ব'লে মনে করব।

এই প্রসঙ্গে মণিপুর ও লুসাই রাজ্যের কথাও আসে। বহু প্রাচীন কাল হ'তে মনিপুরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাংলার সঙ্গেই ছিল, আসামের সাথে ভাষা বা সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিশেষ সম্পর্ক মনিপুরের নেই। আসামের বর্তমান অধিবাসীদের ভাষাতাত্ত্বিক ও প্রাদেশিক তীব্র ও ক্ষুদ্র মনোভাবের জন্যও মনিপুর-বাসীরা তাদের প্রতি বিরূপ। এই দুই কারণে মনিপুর কংগ্রেস কমিটি আসামের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বিরুদ্ধেই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। লুসাই অঞ্চল থেকেও এই একই আপত্তি উঠেছে। আমরা মনে করি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উচিত হ'বে এই দুই অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে রাখা।

এই সম্পর্কে আরও একটা কথা বিবেচনা করার আছে। ত্রিপুরা, মনিপুর, লুসাই ও কুচবিহার প্রান্তীয় অঞ্চল। কুচবিহার ও ত্রিপুরা রাজ্য পাকিস্থানের সংশ্লিষ্ট; মনিপুর ও লুসাই অঞ্চলের সঙ্গে ব্রহ্ম সীমান্তের সম্পর্কও আছে। সেই হিসাবে এই সব অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের অনাকাঙ্খিত কোন শাসনপদ্ধতি চাপিয়ে দিয়ে তথাকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে খুবই অনুচিত হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আসনে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবা

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে

—স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুষ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

পরিচয়

দ্বাদশ বর্ষ | ভাদ্র—১৩৫৬ | পঞ্চম সংখ্যা

বাংলা অক্ষর

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

শুনা যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে নাকি হিন্দী অক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই রকম ব্যবস্থা বা একেবারে বাংলা অক্ষর বর্জন করিয়া শুধু হিন্দী অক্ষরেই মুদ্রিত হইবার ব্যবস্থা তাহা বুঝা যাইতেছে না। হিন্দী ভাষায় বা অন্য কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী অনুদিত হইলে বা অনুবাদের বাঁধতা হইলে, কাহারও কোন উদ্বেগের কারণ ছিল না। কিন্তু বাংলা রচনা কেন হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত হইবে, সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে বুঝা কঠিন।

এই প্রস্তাব বা প্রচেষ্টার মূল কোথায়, তাহা জানি না। এইরূপ উদ্ভট প্রেরণা আসিল কোথা হইতে তাহাও জানি না। এই প্রেরণা কি সাহিত্যিক, না সামাজিক, না রাজনৈতিক, না নিতান্তই ব্যক্তিগত? রামমোহন—বিদ্যাসাগর—বঙ্কিম—মধুসূদন—বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র—দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রভৃতি অগণিত বাংলার বরপুত্রগণ যে লিপি, ভাষা ও সংস্কৃতিকে স্বীয় রচনা ও সাধনা দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাতের কারণ কি? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রচনা বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের কথা কেহ কি কখনও চিন্তা করিতে পারেন?

হিন্দী আমাদের প্রতিবেশী ভাষা। প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার, সৌজন্য, আপদে বিপদে সহযোগিতা, সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে কাহারও অমত মতদ্বৈধ নাই কিন্তু কোন প্রতিবেশীর সহিত কোনরূপ একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে গিয়া স্বীয় পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদায় জলাঞ্জলি দেওয়া বা স্বীয় বিলোপ-সাধনের পন্থা অবলম্বন করা কেহই সমীচীন করিবেন না।

হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হইবে বা অন্য কোন ভাষা হইবে, বাংলা অন্ততঃ রাষ্ট্রভাষারূপে পরিগণিত হইবে কি না, প্রভৃতি প্রশ্নের এখনও সমাধান হয় নাই।

যাহাই হউক না কেন, তাহার সহিত বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্থিতি, বৃদ্ধি ও উন্নতির সাক্ষাৎ সম্পর্ক গভীর নহে। ইংরাজি রাষ্ট্রভাষা থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষার উন্নতি হইয়াছে। বিগত দুই শতাব্দীর সমস্ত উন্নতিই বৈদেশিক রাষ্ট্রভাষার আমলেই হইয়াছে কোন অবস্থাতেই বাংলা রচনা ইংরাজি অক্ষরে লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই

রোমান হরফের কীট কিছুদিন বাঙালীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অত্যন্ত সুখের বিষয়, সুমতি-ডি, ডি টির সিঞ্চনে সম্প্রতি এই কীটের ক্রিয়া স্তব্ধ হইয়াছে। আশা করা যাইতে পারে, সত্বরই ইহা বিলুপ্ত হইবে।

হিন্দী হয়তো রাষ্ট্রভাষা হইবে, ইহা হয়তো নিশ্চয়

মাধ্যম হইবে, হয়তো ইহা ক্রমশঃ সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এই ধরণের কল্পনার ফলেই কি রবীন্দ্র রচনার উপরে এই অত্যাচারের কথা উঠিয়াছে?

প্রয়োজন হইলে যেমন আমরা ইংরাজি ভাষার বা অন্য বৈদেশিক ভাষার চর্চা করিয়া থাকি, তেমনি প্রয়োজনানুসারে আমরা হিন্দী ভাষারও চর্চা করিতে পারি। কিন্তু বাংলা লিখিতে হিন্দী অক্ষর ব্যবহার করিব কেন? গবেষণা, বিজ্ঞানচর্চা, আন্তর্জাতিক পত্রালাপ, বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিলপত্রাদি প্রভৃতিতে আমরা প্রয়োজনানুসারে হিন্দী, ইংরাজি, ফরাসী, বা অন্যান্য বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার করিতে পারি, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইবে

কিন্তু জনসাধারণের ভাষায় বা সাহিত্যের ভাষায় অন্য প্রকার ভাষা বা অন্য প্রকার বর্ণমালা ব্যবহার করিবার কোনই কারণ নাই।

শুনিয়াছি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যবহারের অনেক জিনিস তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশতঃ অতি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ইহা খুবই সমীচীন। কিন্তু কবিগুরুর দেহমুক্তি চম্পকাঙ্গুলি যে লক্ষ লক্ষ মুক্তার মালা গাঁথিয়া দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া বাণীর গলায় পরাইয়াছেন, সেই মুক্তারাশিকে অবহেলা করিয়া বা বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার চটিজুতাজোড়াকে পূজা করিলে কি তাঁহার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা হইবে?

বাংলার গৌরব করিবার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বাংলার ভাষা ও সাহিত্য। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও এই কথা তাঁহার সহজাত সরলতা ও নিষ্ঠার সঙ্গেই বলিয়াছেন। অত্যন্ত ক্ষোভের কথা, যে একটা defeatist mentality, একটা ঘৃণিত ক্লৈব্য যেন বর্ত্তমান বাঙালীসমাজকে পাইয়া বসিয়াছে। অর্থ, সম্পত্তি, ব্যবসায়, সামাজিক ও পারিবারিক মর্য্যাদা, এমন কি, সাহিত্য ও সংস্কৃতিও অন্যের পায়ে বিসর্জন দিবার একটা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙালাকে আপাততঃ pseudo বাঙালীতে পরিণত করিয়া পরে সম্পূর্ণ অবাঙালীতে পরিবর্তিত করাই যেন এই প্রবৃত্তির মূল প্রেরণা। বাঙালী এ বিষয়ে এখন হইতেই সতর্ক না হইলে, স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি নিষ্ঠা অর্জন করিতে না পারিলে, স্বকীয় ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে না পারিলে, বাংলার বহুযুগ সঞ্চিত ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি কখনই রক্ষা করা যাইবে না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অভিভাবকগণের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা যেন কবিগুরুর অমর সাহিত্যের প্রতি এরূপ বিসদৃশ ও নির্দ্দয় আচরণ হইতে বিরত থাকেন। কবির চিতাধূম এখনও দিগন্তে বিলীন হয় নাই। তাঁহার অতৃপ্ত আত্মাকে অবমাননা করিবার কোন হেতু এখনও ঘটে নাই।

একটী সাদা পাতা

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতদূর চোখ যায় হৃদয়ের দিগন্ত অবধি
অনেক গানের সুর ঘুরে ঘুরে হৃদয় ছুঁয়েছে;
আজও এক ঝাঁক গান ওড়ে দেখি আমার আকাশে,
ধানক্ষেত হতে ওড়া দূরমুখী পাখীর মতন
বিকেলের কাকলী মুখর।
ভাষা দিয়ে জাল বুনে গান ধরা ব্যাধের মতন,
জীবনে অনেক দিন ব্যাধ হয়ে আমিও ধরেছি।
অজস্র পালকে মোড়া হৃদয়ের ছোট ছোট গান
হাতের মুঠোয় এনে বহুবার ঘরে তো দেখেছি,
আঙুলের মৃদু চাপে মিলিয়ে গিয়েছে।

আজ থাক জাল বোনা, গান ধরা মনের খেয়ালে।
খাতার একটী পাতা এ বিকেলে সাদা হয়ে থাক।
হাঁসের মতন সব আকাশের নীলিমা প্রয়াসী
ভিজে রোদ ভেঙে ভেঙে, ডানা দিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
আমার হৃদয়ে ওরা উড়ুক উড়ুক।

বিপ্লবী সুশীল সেন

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

বাংলার বিপ্লবী অগ্নি-প্রবাহের মধ্যে সুশীল সেন একটী উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ। স্বল্প-পরিসর জীবনে বৃহৎ ঘটনা খুব কিছু নেই ;—কিন্তু আছে একটা মনের পরিচয়—সামান্য দুচারটি ঘটনায় যার প্রকাশ।

শ্রীহট্ট জেলায় বানিয়াচং গ্রামের সাধারণ মধ্যবিত্ত কায়স্থ পরিবারে সুশীলের জন্ম। বাংলা ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণ (১৮৯২ সালে) মাসে তার জন্ম। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর তখনকার দিনে জীবিকার উপায় ছিল সরকারী চাকুরি। সুশীলের পিতা কৈলাসচন্দ্র সেন ছিলেন রাজভক্ত এবং হিন্দু ধর্ম ও সমাজের অনেকটা বিরোধী। যৌবনে খ্রীষ্টীয় ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব তাঁর মনে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ও রীতি-নীতির প্রতি একটা বিরূপতা জন্মে। কিন্তু সুশীলের মা ছিলেন—স্বধর্মানুরাগী এবং আচার নিষ্ঠা। ভাইদের মধ্যে একজন ছিলেন সাব-ডিপুটি এবং একজন (হেমচন্দ্র) ছিলেন সহকারী জেল-দারোগা। কৈলাস বাবু ছিলেন আসাম প্রাদেশিক জেল-বিভাগের হেড ক্লার্ক ;—সুশীলের জন্মের সময় তিনি ছিলেন শিলংএ এবং সেখানেই সুশীলের জন্ম হয়। ৭ বৎসর বয়সে সে শিলং জিলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হ'ল।

পড়াশুনায় প্রথমটা সুশীল খুব মনোযোগী ছিল না। তখন বাংলায়, ও এসিয়াতে একটা নূতন আবহাওয়া সুরু হয়েছে। রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলে সমস্ত এসিয়ায় একটা উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে—একটা নূতন জীবন-প্রবাহে এসিয়ার যুবকগণ উদ্বেলিত হচ্ছিল। এর পূর্বে আসে বুয়র যুদ্ধ। বুয়ার সেনাপতি বোথা, ডিওয়েট প্রভৃতির নাম বাংলার ঘরে ঘরে সশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হচ্ছিল। প্রায় ঐ একই সময় বাংলায়ও এক নূতন জাগরণ আসে। কলিকাতায় শ্রীযুক্ত প্রমথ মিত্র, সরলা দেবী প্রভৃতির উৎসাহে বিভিন্ন কেন্দ্রে যুবকদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চলছিল। এই সব সমিতির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য যাই থাক, এদের পিছনে আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি ! স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব যুবকদের মধ্যে তখন চলছে। সুশীল ও তার ভাইরা এই সব প্রভাব থেকে মুক্ত রইলো না। সুশীলের অগ্রজ হেমচন্দ্র সেন জেলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় গেলেন। সুশীল ও তার মেজো ভাই বীরেন সেন কিছুদিন পর শিলং ছেড়ে শ্রীহট্ট এসে স্কুলে ভর্তি হ'লেন।

এখানে এসে সুশীল ও বীরেন এক নূতন সংসর্গে পড়ল। এই সময় সুশীল পড়াশুনায়ও বিশেষ মনোযোগী হয়েছিল এবং এই দুই ভাই একসঙ্গেই পড়ছিল। এখানে জ্ঞানেন্দ্র নাথ ধর নামক এক পূত-চরিত্র যুবকের প্রভাবে আসে। জ্ঞানবাবু আজ কয় বছর হ'ল পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ বরণ ও আদর্শ-চরিত্র আজও স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। লোক লোচনের অগোচরে থেকে তিনি জীবনের সর্বস্ব দেশ সেবায় দিয়ে গেছেন ; একদিনের জন্যও খ্যাতি ও সম্মান, সচ্ছলতা ও আরেস তাঁর সাদাসিধা জীবনকে শান্তি দেয় নি। হাসি-মুখে সবই তিনি বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র নাথ ধর একটি বিপ্লবী সমিতির সভা ছিলেন ! বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ছিলেন এই সমিতির কেন্দ্রস্থল। সুশীল ঐ সমিতির আওতায় এসে শারীরিক ও ব্যায়াম চর্চার সুযোগ পেল। এই সময় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হ'য়েছে। বিপিনচন্দ্র পাল শ্রীহট্টের লোক ;—সুরমা উপাত্যকা সম্মেলন উপলক্ষে তিনি শ্রীহট্টে যান। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় শ্রীহট্টের যুবকগণ মেতে উঠল। সরকারী স্কুল কলেজ ত্যাগ করার উন্মাদনা সুরু হ'ল। সুশীল ও বীরেন শ্রীহট্ট ছেড়ে কলিকাতায় এসে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'লেন। এর পূর্বে তাদের অগ্রজ হেমবাবু কলিকাতা আসেন এবং তিনি কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। অপর দিকে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়—অরবিন্দ বারীনের সঙ্গে।

এই সময় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক স্বদেশী মামলার বিচার চলছে। শহরে তা নিয়ে খুব উত্তেজনা চলছে। কোর্টের সম্মুখে লোকের ভিড় জমেছে ;—সকলেরই মুখে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এক

একবার বন্দে মাতরম্ উচ্চারিত হয়, এক একবার পুলিশ বেত ও লাঠি নিয়ে জনতাকে তাড়া করছে। ইউরোপীয় অশ্বারোহী সার্জেন্ট জনতার মধ্যে ঢুকে দুধারে বেপরোয়া বেত চালাচ্ছিল সাধারণ পুলিশও জনতার উপর লাঠি চালাচ্ছিল হঠাৎ নায়ক একটি বিলাতী সার্জেন্ট জনতার মধ্যে ঢুকে খুব বেত চালাচ্ছিলেন। সুশীলও ঐ জনতার মধ্যে ছিল। তার পার্শ্বেই জাতীয় বিদ্যালয়ের অপর একটি ছাত্রের উপর হঠাৎ বেত চালাচ্ছিলেন। সুশীল তখন ১৪।১৫ বছরের কিশোর মাত্র। বিদেশী সার্জেন্টের এই পাশবিক আচরণ দেখে সুশীল আর স্থির থাকতে পারল না। সে হঠাৎকে ঘুষি মারল; দুজনে ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হ'তেই আরও পুলিশ ও সার্জেন্ট এসে সুশীলকে আক্রমণ করল। তাদের সম্মিলিত আক্রমণের নিকট সুশীলকে অবশ্যই হার মানতে হ'ল। ঐ সব পুলিশ ও সার্জেন্ট সুশীলকে যখন আরও মারধর করতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ গিয়ে তাদের থামিয়ে দেন। হয়ত ঐ কিশোর বালকের তেজস্বিতা ও সাহস দেখে হঠাৎ মুগ্ধ হয়ে ছিলেন।

কিন্তু সুশীলকে গ্রেফতার করা হল। সরকারী কাজে বাধা দেবার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে ১৫ঘা বেত তাকে গ্রহণ করতে হয়। ১৫ বছরের বালককে জেলে নিয়ে টিকটিকিতে (Trangle) বেঁধে পরণের কাপড় খুলে পিছনে ১৫ঘা বেত দেওয়া হল। ইউরোপীয় জেলার স্বয়ং বেত মারে। রাজনৈতিক কারণে এই প্রথম বেত মারা হয়। একটি ১৫ বছরের বালকের উপরই প্রথম বেত্রদণ্ড হ'ল;—সমস্ত দেশে একটা তীব্র মনোভাব এতে গ'ড়ে উঠল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় "সন্ধ্যা" কাগজে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখলেন—'সুশীলের চুড়িদার, কিরিঙ্গীকে বলায় বাপ।" অরবিন্দ সুশীলকে অভিনন্দন করলেন—এবং তাকে দেখবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রকাশ্য জনসভায় সুশীলকে অভিনন্দিত করতে চান। কালী-প্রসন্ন কাব্যবিশারদ সুশীলের বেত্রাঘাত উপলক্ষ ক'রে গান রচনা করেন—

"বেত মেরে মা ভুলাবি—
আমি কি মায়ের তেমনি ছেলে!"

সুশীলের এই সব অভ্যর্থনায় তার এক খুল্লতাত শ্রীমহেন্দ্র নাথ আপত্তি জানান; মহেন্দ্র বাবুর অভিভাবকত্বে সুশীল ও বীরেন কলিকাতায় ছিল। মহেন্দ্র বাবু তখন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর মতে সুশীল তার কর্তব্য করেছে; এর জন্য যদি এই বালককে এইভাবে অভ্যর্থনা করা যায়, তবে তার মনে অহঙ্কারের উদ্রেক হবে। তাতে সুশীলের চরিত্রে সে ভাবের বদলে আত্মম্ভরিতার ভাব বাড়বে। কিন্তু তাঁর বন্ধু ও স্ব-জেলা বাসী বিপিনচন্দ্র পাল এসে যখন অনুরোধ করলেন, তখন তিনি আর আপত্তি করতে পারলেন না। কিন্তু সুশীল নিজেও এই ভাবে তাঁকে নিয়ে নেতাদের হৈ-চৈ করা পছন্দ করছিল না। তাই সে নিজেই প্রস্তাব করল—সে কোন অভ্যর্থনা গ্রহণ করবে না, সাধারণ শ্রোতা হিসাবে সভায় উপস্থিত থাকবে মাত্র। এর পরও মহেন্দ্র বাবু কাগজে এক বিবৃতি এই সম্বন্ধে দিয়েছিলেন।

এই ঘটনায় সুশীল স্বভাবতই খুব খ্যাতিলাভ করল। তখন কলিকাতায়—কলিকাতা অনুশীলন, অরবিন্দ ঘারীন্দ্রের যুগান্তর দল, বিপিন গাঙ্গুলীর আত্মোন্নতি দল অনেকটা মিলেমিশেই চলছিল। এই সব দলের মধ্যে খুব একটা স্পষ্ট সীমা রেখা ছিল না; বরং পরস্পর মিশে যাবার দিকেই এদের ঝোঁক ছিল। সুশীল এই সময় এক যুবকের মারফৎ ৺দেবব্রত বসুর সঙ্গে পরিচিত হয়। এই দেবব্রত বসু পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হন। দেবব্রত বসুর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সুশীল যুগান্তর দলের একজন নিয়মিত সভ্য হলেন। শ্রীহট্টে থাকতে শ্রীযুক্ত জ্ঞান ধরের সঙ্গে সুশীল ও বীরেনের যে পরিচয় হয় তা-ও এক হিসাবে যুগান্তরের সংস্পর্শে আসা। কিন্তু সেখানকার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হবার পূর্বেই সুশীল কলিকাতা চলে আসে তখন তার বয়স খুব অল্পই ছিল। তাই তখন পর্যন্ত কোন গুপ্ত সমিতির নিয়মিত সভ্য সুশীল হয়নি। এখন দেবব্রত বসুর মাধ্যমে সে যুগান্তরের সভ্য হল।

এই সময় ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার প্রস্তাব হয়। এই কাজের জন্য যাদের নাম আলোচিত হয়, তার মধ্যে সুশীল অন্যতম। কিন্তু পিতার অসুখের সংবাদে তাকে শ্রীহট্ট যেতে হয়, বা অন্য কোন কারণে এই কাজের জন্য তাকে নির্বাচিত করা হয় নাই। শ্রীহট্ট যাওয়ার পর, তাকে ও তার দুই ভাইকে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে পুলিশ গ্রেফতার করে।

মুজাফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলে কেনেডি নামক সাহেবের গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে। তাতে কেনেডির পত্নী ও কন্যার মৃত্যু হয়। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের, এই ঘটনায় সরকারের ও বাংলার জনতার মনে চমক লাগল। ২রা মে মুরারীপুকুর উদ্যানে বারীনের বোমার কারখানা ধরা পড়ে। মনে হয় পূর্বেই পুলিশের খবর ছিল; মুজাফ্ফরপুরের ঘটনার ৫দিন পরই ঐ বাগানে পুলিশ হানা দেয়। বোমার কারখানা ধরা পড়ে। অরবিন্দ, বারীন, উল্লাসকর, উপেন, হেমদাস প্রভৃতিকে নিয়ে আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হল। বারীন, উল্লাসকর, উপেন ও অপর কয়েকজন পুলিশের নিকট স্বীকার উক্তি করে। সুশীল ও তার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে-ও ঐ মামলার আসামী করার জন্যই ধরা হয়। কারোর কোন স্বীকার উক্তিতে সুশীলের নাম ছিল না;—যা তার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণই পায় নি। অরবিন্দের নিকট লিখিত এক চিঠিতে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হেমবাবু সুশীলের নাম উল্লেখ করেন। সেই চিঠি মুরারীপুকুর বাগানের খানাতল্লাসীতে ধরা পড়ে। কোন বইএর উপর S. K. S. নামের এই আদ্যাক্ষর পাওয়া যায়। এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির অসতর্ক উক্তিতে পুলিশের মনে সন্দেহ জাগে—নামের ঐ আদ্যাক্ষর সুশীলকুমার সেনকেই সূচিত করেছে! এই সন্দেহেই এঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বাহির হয়। পুলিশের পাহারায় এঁদের শ্রীহট্ট হতে কলিকাতায় আনে। গোয়ালন্দে ও চাঁদপুরে ট্রেণ ও ষ্টীমারে বদলা-বদলি করার সময়, সমস্ত পথটা সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

এক বৎসর ধরে সাক্ষ্য জজের নিকট বিচার চলে। বিচারে সুশীলের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। যথানিয়মে মামলা যায় হাইকোর্টে। সেখানে সুশীল সম্বন্ধে ৩ই জজের মধ্যে মতভেদ হয়। তাই হাইকোর্টের এক Full Benchএ পাঁচজন জজের নিকট তার বিষয় বিবেচনার জন্য যায়। সেখানে সুশীল নির্দোষ সাব্যস্ত হয় এবং মুক্তি লাভ করে। কিন্তু তার দুই জ্যেষ্ঠ অগ্রজ হেমবাবু ও বীরেনবাবু হাইকোর্টে দণ্ডিত হন।

১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে সুশীল জেল থেকে খালাস হয়। অনেকদিন যাবৎই অরবিন্দ সুশীল সম্বন্ধে স্নেহ-পরায়ন ছিলেন। অরবিন্দ-ও ঐ মামলা থেকে মুক্ত হন। সুশীল জেল থেকে বের হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি সুশীলকে পত্রাবর্ত সেন বেশে গিয়ে পড়াশুনা করতে। বারিয়াচং ফিরে এসে সুশীল গ্রামের স্কুলে ভর্তি হয় এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। পরীক্ষায় সুশীল বৃত্তি বা scholarship লাভ করে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে স্কুলের কৈফিয়ৎ তলব করে—কেন সুশীলকে ভর্তি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের কাজ সমর্থন করায় সরকার স্কুলের কোন ক্ষতি করতে পারে নি কিন্তু সুশীলের বৃত্তি বন্ধ করে দিল। পরীক্ষায় কৃতিত্বের দিক দিয়ে সুশীল বৃত্তিলাভের যোগ্য বিবেচিত হলেও, রাজনৈতিক কারণে সরকার তার বৃত্তি বন্ধ করে দিল। ঐ সময় পূর্ব বাংলার বহু বিদ্যালয় সম্বন্ধে সরকারের এমনি ব্যবস্থা ছিল।

ম্যাট্রিক পাশ করে সুশীল এল কলিকাতায় পড়তে। সেখানে দুবছর পড়ার পর সুশীল I. Sc. পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করল। এবার আর সরকার তার বৃত্তিলাভে বাধা দিল না।

সুশীল মনোযোগের সঙ্গে পড়াশুনা করতে লাগল; হয়ত বা একটার পর একটা পরীক্ষায় খুব কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে কোন বড় চাকুরি বা এমনি কোন ধন-মান-প্রদ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সুখে ও আরামেই সে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু বিপ্লবের আহ্বান যার কানে এসেছে তার

[illegible] আবার বা আহাসের জীবনের কোন মোহ থাকতে
তাই সুশীলের পক্ষেও নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা
সম্ভব হল না পড়া-শুনা হল গৌণ; মুখ্য
দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব প্রয়াস

তখন বাংলার ছিন্ন ভিন্ন বিপ্লবী দল আবার দানা বেঁধে উঠতে সুরু করেছে। অরবিন্দ বারীনের মুরারীপুকুরের দল, প্রমথ মিত্রের কলিকাতা অনুশীলন দল এবং যতীন মুখার্জী ও যতীন বাঁড়ুজ্জীর (পরবর্তী কালের নিরালম্ব স্বামীর) সঙ্গে এবং সংশ্লিষ্ট বিপ্লবী কর্মীরা এক সঙ্গে দলবদ্ধ হ'তে চেষ্টার আয়োজন হয়েছিল। ইতি মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয় এবং সেই সঙ্গে সুরু হয় ভারত জার্মেন ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন যতীন্দ্র নাথ এবং বাংলার এর সংযোজক ছিল যুগান্তর দল। শ্রীহট্টে থাকতে ব্রজেন্দ্র নাথ সংস্পর্শে সুশীল যুগান্তর দলের এক শাখার সঙ্গে পরিচিত হয়। কলিকাতা এসে দেবব্রত বসুর মারফতে যুগান্তরের সঙ্গে তার আরও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। মুরারীপুকুরের মামলার পর সবই কতকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবার নূতন করে সংগঠনের সময় সুশীল যতীন মুখার্জীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এখন সুশীলের বয়স প্রায় ২২ বছর হয়েছে; পূর্বের মতো অপরিণত বুদ্ধির কিশোর তখন সে নয়। এবার সে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সবটা বুঝে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিল।

এবার আমরা এসেছি সুশীলের জীবনের অন্তিম অধ্যায়ে সে এক বিষাদময় কাহিনী;—অকালে ঝরে পড়ল একটি ফুল, একদিন সৌরভ ও সৌন্দর্যে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারত। বিপ্লবী জীবনের দীক্ষা ছিল—কাজের গুরুত্ব বিচার করবে না;—নির্বিচারে প্রয়োজন হতে লঘু গুরু বিচার না করে কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। তেমনি এক কাজে পুলিশের সঙ্গে কয়েক জন বিপ্লবীর সংঘর্ষ হয়; একজন পুলিশ পিছন থেকে সুশীলকে জড়িয়ে ধরে। তার সঙ্গীরা পুলিশকে লক্ষ্য ক'রে যে গুলি করে তা গিয়ে লাগল সুশীলের গায়ে এবং তাতেই সুশীলের মৃত্যু ঘটে। মৃত দেহকে গঙ্গা গর্ভে সমাধিস্থ ক'রে সঙ্গীরা চলে আসে।

হয়তো কোন হিসাবী লোক বলবে—বৃথাই সুশীলের জীবন গেল;—সুশীল বেঁচে থাকলে হয়ত সমাজের একটি বিশিষ্ট সভ্য হ'তে পারত। হয়ত সেকথা সত্য—হয়ত ধনে মানে বিদ্যায় ও পদগৌরবে সে খুব বড় একটা কিছু হ'তে পারত। বিপ্লবী জীবনে এমনি অকারণে ও অকালে ঝরে পড়া ত মোটেই বিরল নয়;—কত মহৎ সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া হয়েছে। এমনি বলির দ্বারা বিপ্লব-প্রয়াস বেগবান হয়। বিপ্লবের আহ্বান শুনে—কত সুশীল কত ঘরে ঘরে মেতে উঠেছিল। বিপ্লবের মোহন সঙ্গীত এদের কানে কানে বলেছিল।—

"জীবন এবার মাতৃক মরণ-বিহারে।
এই বেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস নে আর আও পিছু,
রাখিস নে তুই খুকিয়ে কিছু,
চরণে কর মাথা নীচু
দিক আকুল কেশে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।" *

* কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সৌজন্যে।

ভাগ্য

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ

ভাগ্যের মার খাইতে যাহারা অভ্যস্ত, ভাগ্যকে মানিয়া লওয়াই তাহাদের আত্মরক্ষার উপায়। দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছিলাম, কুলমর্যাদাও ছিল না। রূপ, শিক্ষা, সম্মান কোনটাই গর্ব করিবার মতো নয়। কাজেই অনাদর পাইয়াছি প্রচুর এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই শুনিয়াছি অদৃষ্ট, অদৃষ্টই সব। সহিয়া যাও, মানিয়া লও এ ছাড়া পথ নাই।

মানিয়াই নিয়াছিলাম কিন্তু যেদিন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলার চাঁদা চাহিতে পাশের গ্রামের জমিদার ঘোষবাড়ীর মেজোকর্তার বৈঠকখানার জুতাপায়ে ঢুকিবার অপরাধে "ছোটলোকের আস্পর্দ্ধার" শাস্তিস্বরূপ কানমলা খাইয়া বাহির হইয়াছিলাম। সেদিন প্রসন্নমনে বিধাতার বিধানকে মানিয়া নিতে পারি নাই। সেদিন আমার ছোটমনে বড় গভীর দাগা লাগিয়াছিল। সেদিন বিদ্রোহী মন বলিয়াছিল—দিন আসিলে এ আঘাত ফিরাইয়া দিব।

সে দিন সত্যই আসিল। যুদ্ধের গোড়াতেই জীবনটা নিয়া অসমসাহসিক জুয়া খেলায় লাগিয়া গেলাম। জানিতাম যদি এ খেলায় হারি তাহা হইলে চরম মূল্যই দিতে হইবে—কিন্তু চাকা ঘুরিয়াছে—অনেক উঁচু নীচুতে তলাইয়া গিয়াছে, অনেক নীচু উপরে উঠিয়াছে। ৵ হইতে হাজারে—হাজার হইতে লাখে—তাহার পর? বড়াই করিতেছি না—নিজের চেষ্টায়ই অর্থ ও প্রতিপত্তিতে বড় হইয়াছি। হ্যাঁ, দুই একলক্ষ টাকার অঙ্কটা আমার কাছে স্বপ্ন ও কল্পনার ব্যাপার নয়।

কলিকাতায় বাসা করিয়া বসিতেই জানিতে পারিলাম সংসারে আমার কত আত্মীয় পরিজন। কত মাসী, পিসী, কত—'তুতো' ভাই, বোন, ভাগিনা আমার পরিচর্যার জন্য আসিয়া ভীড় জমাইল। মিষ্টি হাসিয়াই সকলকে অভ্যর্থনা করিলাম—কিন্তু সিকড় গাড়িতে কাহাকেও দিলাম না। যাহারা মুখোস পরিয়া আসিয়াছিল নির্মমভাবেই তাহাদের মুখোস খুলিয়া দিলাম—কিন্তু অর্থ সাহায্যে বঞ্চিত করিলাম না। তাহাদের এই কথাই জানাইয়া দিলাম যে আমি তাহাদের অনুগ্রহ করিলাম—নীচু হইয়াই তাহাদের আমার কাছে দান গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে অনাদর আমাকে একদিন দিয়াছে ঔদার্যের ছলে সে অনাদর শতগুণ তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম। প্রকাশ্যভাবেই সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে উপেক্ষা করিলাম। তাহাতে কিন্তু সমাজে আমার মর্যাদা বাড়িয়াই গেল। যে সমাজ দুর্বলকে মারে সেই সমাজই প্রবলের মার খাইয়া খুশী হয়!

এইবার বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন বিবাহ করিতে। বিবাহে অরুচিও ছিল না—আগ্রহও ছিল না। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে সমাজের ভুয়া কুলের গর্বকে আর একবার আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়া খুশীই হইলাম। আজ স্বোপার্জ্জিত মেচ্ছ সরকারী পদ ও পদবী এবং মোটা ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টের আড়ালে হেয় পৈতৃক পদবীটা ঢাকাই পড়িয়া গেল। সমাজ আজ আমার কুলশীল পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল না! কত উচ্চবংশ গৃহস্থ, কত গর্বিত কুলীন কন্যার পিতা আমাকে আজ কন্যাদান করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছুক তাহা দেখিয়া একটা হিংস্র আনন্দ অনুভব করিলাম।

শুনিয়া আসিয়াছি জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এই তিন বিধির বিধান—মানুষের ইহাতে হাত নাই। বিধির বিধানে উঁচু বংশে জন্মিতে পারি নাই—তাহার জন্য যে মার খাইয়াছি তাহার উপর হাত ছিল না, মৃত্যু—ভবিষ্যৎ ও অনিশ্চিত। জানিনা সেখানে বিধির বিধানই জয়ী হইবে কিনা। কিন্তু বিবাহ? সেটাও বিধির বিধান? কেন? স্থির করিলাম বিবাহটা স্বেচ্ছায় এবং নিজ পছন্দ মতই করিব। বিবাহ সম্বন্ধে "উঠতি ঘরের ছেলে ও পড়তি ঘরের মেয়েই শ্রেষ্ঠ এই প্রবাদে বিশ্বাস করি সুতরাং তেমন পাত্রীরই সন্ধান চলিতে লাগিল। বহু মেয়ে দেখিলাম, বহু আদর আপ্যায়ন লাভ করিলাম, বহু অনুনয়পত্র পাইলাম, বহু ফটোগ্রাফে টেবিল ভর্তি হইয়া উঠিল—কিন্তু ঠিক মনের মতনটি যেন হইতেছিল না।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম আমাদের পাশের গ্রামের জমিদার সেই ঘোষবাবুদের ঘরের সুন্দরী অরক্ষণীয়া কন্যার জন্য তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পাত্র খুঁজিতেছেন। বহুদিন পূর্বে চাঁদা চাহিতে যাইয়া লাঞ্ছনার কাহিনীটি মনে পড়িয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সংকল্প করিলাম এই মেয়েকেই আমার ঘরে আনিতে হইবে। মেজোকর্তা বহুদিন গত হইয়াছেন—জমিদারীও ঘোষবাবুদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। আজ সেই ঘোষ বাড়ীরই সাক্ষাৎ বংশধর প্রাচীন কুলমর্যাদা এবং মার্চেন্ট অফিসের দেড়শো টাকার এক চাকুরী নিয়া কায়ক্লেশে কলিকাতা ভাড়াটে বাড়ীতে দিন যাপন করিতেছেন এবং কন্যার বিবাহ চিন্তায় দিন দিন শীর্ণ হইতেছেন। চাকা ঘুরিয়া ঘোষবাবুরা আজ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন—তথাপি প্রাচীন সংস্কার তো সহজে ঘুচিতে চায় না—তাই দ্বিধা এবং বাধা অনেকটাই ছিলো। তথাপি যতটা আপত্তি আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক কমেই ব্যাপারটা নিষ্পন্ন হইল। বিবাহের প্রস্তাবে তাঁহারা রাজী হইলেন।

শিকার সুযোগ যথেষ্ট পাই নাই, কিন্তু বর্বর আমি নই। অবশ্য তাঁহাদের ক্ষত আঘাত দিলাম না। এই একটি মাত্র মেয়েকেই না দেখিয়া ফটোগ্রাফের উপর নির্ভর করিয়াই পছন্দ করিলাম। এই আশ্বাস পূর্বেই দিয়াছিলাম যে দাবী আমার কিছুই নাই—তাঁহাদের সাধ্যমত তাঁহারা দিবেন। কিন্তু এই সাধ্য যে কত সামান্য তাহা আমার অজানা ছিল এবং এ জন্য তাঁহাদের যে সঙ্কোচ ও আশঙ্কার অবধি ছিলনা তাহাও আমি জানতাম। তাই কন্যাকর্তা যেদিন পাকা কথা কহিতে আমার বাড়ীতে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই আসিলেন সেদিন তাঁহাকে যথোচিত আপ্যায়ণ করিয়া সহজভাবে ব্যবহারে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। কিন্তু এতখানির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। উঠিবার সময় গোপনে তাঁহার হাতে সহস্রাধিক টাকা বিবাহের খরচ বাবদ গুঁজিয়া দিলাম। তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন—প্রথমে আপত্তি করিলেন, শেষে ম্লান হাসিয়া টাকাটা নিলেন কিন্তু চোখ দুটি তাঁহার কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করিয়া উঠিল। পুরাতন অপমানকে আজ ঔদার্য দিয়াই জয় করিলাম। ইহার জন্যে মনে কোন দুঃখ নাই। মনে মনে নিশ্চিত জানিতাম ইহার ফলে আর একটি তরুণী হৃদয়ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তাহার লাজনম্র কালো আঁখি দুটি কল্পনা করিয়া মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

আলো, সজ্জা, কোলাহল মুখরিত বিবাহ বাসরে বসিয়া কেমন যেন নেশা লাগিতেছিল। আজ আমারই সম্মানে এই সমারোহ, এই আনন্দ আয়োজন। আজ কোন সম্রাটের চেয়ে গৌরব আমার কম নয়। আর সগর্বে এই কথাই ভাবিয়াছিলাম—এই গৌরব বিধাতার কৃপাভিক্ষা নয়—নিজের চেষ্টায় ইহা আমি অর্জন করিয়াছি।

আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিলাম শুভদৃষ্টির মধুর মুহূর্তটি। রক্তাম্বরা সাভরণা নববধূ মুহুর্মুহু হুলুধ্বনির মধ্যে আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বরমাল্যহস্তে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সখীদের কলহাস্যের মধ্যে গৌরী তরুণীর অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল। সুন্দরী অপরূপ রূপসী বধূর আয়ত চক্ষু দুইটি নিবেষের ভরে উন্মিলিত হইল।—একমুহূর্তে মনে হইল যেন ওই স্নিগ্ধ সুকুমার মুখখানি আমার জন্মজন্মান্তরের পরিচিত। আমারি জন্য যেন ওই অপরূপ চোখ দুটি যুগযুগান্ত অপেক্ষা করিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া আমার চোখের যেন আর পলক পড়িতেছিলনা। কিন্তু বধূ আর মুখ তুলিল না। ওই ব্রীড়ানতা মুখখানাও কি আনন্দের দ্যুতিতে ক্ষণিকের তরে রাঙিয়া উঠে নাই?

সম্প্রদানের পালা শেষ হইলে স্ত্রী আচারের পালা সুরু হইল। গুরুজন ব্যক্তিরা আচারের খুঁটিনাটি নিয়া ব্যস্ত কিন্তু মধুর সম্পর্কের রসিকরা নানা রসাল মন্তব্যে আচারের অঙ্গ আয়োজনকে মধুর রসে ভরিয়া দিতেছিলেন। ভালই লাগিতেছিল। আজ আমি যে সাহানশাই বাদশাই এই সুন্দরী তরুণীদের মধুর রসের রাজকর এ তো আমার প্রাপ্য নজরাণা।

দূর সম্পর্কের এক বৃদ্ধা ঠান্‌দি হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন "কৃষ্ণের পাশে আমাদের মানিনী রাধাকে মানিয়েছে ভাল। কে যেন ত্রস্ত হইয়া বৃদ্ধাকে সরাইয়া নিল। আমার কিন্তু আনন্দই লাগিয়াছিল—সুন্দরী স্ত্রীভাগ্য কি সকলের জোটে?

হঠাৎ এক ছোটর দল চুপি দিয়া আমাকে দেখিয়া ছড়া কাটিয়া গেল "ধনে দেখ্‌না ধনে দেখ্‌না ধনকটাপা ফুল। আর, বর দেখ্‌না, বর দেখ্‌না রান্নাঘরের ঝুল।" ঘর শুদ্ধ মেয়ের দল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। কে যেন একজন চাপাস্বরে বলিল "বানরের গলায় মুক্তার মালা।" বয়স্থা একজনের সন্ত্রস্ত ধমকে মেয়েরা চুপ করিল। সামনের বড় আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া যেন চমকাইয়া গেলাম—সে প্রতিবিম্ব যেন আমায় পরিহাস করিল।

কোন বাড়ীর কি জানলার নীচু দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল "টাকার জন্যে এ্যামন কুচ্ছিৎ ছেলের কাছেও সোনার পিত্তিমার মত মেয়ের বিয়ে দ্যায়? ম্যাগো, আমি হ'লে যে ঘেন্নায় মরে যেতুম!"

পাশে বধূর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম তাহার চোখে জলের ধারা।

কে যেন আমার সমস্ত আনন্দে বিষ ঢালিয়া দিল। আমার তাসের সাম্রাজ্য এক নিমিষেই ধ্বসিয়া পড়িল। মর্মান্তিক দুঃখে জানিলাম—ভাগ্যের মার এড়াইবার যো নাই।

জ্যোতির্ময়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

কালো পৃথিবী প্রান্তে দাঁড়িয়ে
সুন্দরের স্বপ্ন দেখেছি আমি।
এই পশু জীবন, এই অসহ্য গ্লানি,
দুঃখ, শোক, জরাগ্রস্থ মনের ক্রন্দন,
চারিদিকে দুঃস্বপ্ন, চারিদিকে নিরাশা,
ধূলি-রুদ্ধ পৃথিবী পাপ আর অন্ধকারে ভরা
তবু আমি দেখেছি কোথায়
সুন্দরের ছবি আছে—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়!
পাইনি কিছুই, তবু পেয়েছি যে সব।

এক তারে অষ্টরোল, ধ্বনির হুঙ্কার—
অন্য তারে সুর মোহময়,
এক চক্ষে অন্ধকার, ভ্রান্তি, ক্লান্তি, ভুল
অন্য চক্ষে তার ছবি—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়!
কোন প্রশ্ন করবনা আমি:
কে সে যার মন্ত্র স্বপ্ন রচনা করে,
কে সে অন্ধকারের সীমায় দাঁড়িয়ে
আগুণের বীণা বাজায়,
কে সে যে আছে আমার অনুভবে,
আমার বিতৃষ্ণার সুদূর প্রান্তে নির্ঝর-ঝঙ্কারে?
শুধু দেখে যাই সে আছে,
কালো পৃথিবী প্রান্তে সে আছে,
উজ্জ্বল, জ্যোতির্ময়!

"সবকো সম্মতি দে ভগবান"

রঞ্জন কুমার দত্ত

আমাদের প্রার্থনা যে কি সে বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতা ও বিমূঢ়তা আমাদিগকে লজ্জা দেয়। আমাদের হয়তো সে বোধই নেই। তাই আমাদের প্রার্থনা ছিল এতাবৎ স্বার্থে ভরা, সহস্র কামনার পুঞ্জ পুঞ্জ ভারে ভার-পীড়িত; কিন্তু গান্ধীজীর কাছ থেকে আমরা আজ অন্তরূপ শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। অভিনব সে প্রার্থনা,—কত ব্যাপক অর্থে তার প্রয়োগ। এ জিনিস ছিল না আমাদের ধারণায় বা চেতনায়। গান্ধীজী যে মন্ত্রে আমাদের হৃদয়ে নবীন আশা ও চেতনার বন্যা সঞ্চার করে গেছেন, সে হল নিষ্কাম প্রার্থনা—

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম
সবকো সম্মতি দে ভগ"

সে হল—

"নত্বহং কামযে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্
কামযে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনাম্ আর্তিনাশনম্।"

সে হল—

"স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং
ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ।"

সে হল—

"লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।"

একেই বলে নিষ্কাম প্রার্থনা। এই প্রার্থনায় ব্যাকুলতা থাকলে, নিষ্ঠা ও শুদ্ধ ভক্তি থাকলে, বিশ্বাসে দৃঢ়তা থাকলে আত্মিক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রিক ও জাগতিক ক্ষেত্রে—সর্বত্র সুখ ও শান্তির অধিকারী আমরা হতে পারি। 'আমি' নই, 'আমরা' সকলে, আমরা 'বিশ্ববাসী'। কিন্তু সে নিষ্ঠা কই আমাদের? নেই হিন্দুদের, নেই মুসলমানদের, নেই খৃষ্টানদের—আছে কি কারোও?

ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব

তথাকথিত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে গুটিকতক লোকের জীবনে ও চরিত্রে এই পৌরুষ বা তপশ্চর্যা দেখতে পাই আমরা। তাঁদের সংখ্যাও আঙুলের কর গুণে নির্ণয় করা কঠিন নয়। কিন্তু যে অগুণতি কোটি কোটি লোক এক একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মাশ্রিত হয়ে জীবন যাপন করছে অথচ আচরণে স্ব স্ব ধর্মদ্রোহিতাই করছে তাদের উপর এই সব দুটি চারটি চরিত্রবান সদাচারী আদর্শ মানবের কোনো প্রভাব নেই। এই—যে দুটি চারটি, এঁরা ধর্মমতগুলির মধ্যে কোনো বৈষম্য দেখেন না, এঁরা সত্যানুসন্ধানী, বিজ্ঞানী, এঁরা সেই অগুণতি কোটি কোটি মানবের পূজা বা শ্রদ্ধা পান, ভক্তিও পান, কিন্তু আপনার সর্বব্যাপক বিরাট সাত্ত্বিক আদর্শের দিকে তাদের আকৃষ্ট করতে পারেন না। এই না-পারার জন্য দায়ী তাঁরা নন, ত্রুটী তাঁদের নয়; জনসাধারণের বা তদনেতৃস্থানীয়দের। জনসাধারণ তাদের নিজ নিজ ধর্মাচরণে ও কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে ঔদাসিন্য ও প্রতিকূলতা প্রদর্শন করছে। তাদের চরিত্রে পুরুষকারের দীনতা চরমরূপে পরিণতি লাভ করেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক বিপর্যয় একটা কিছু ঘটে, যা পৃথিবীর ভারস্বরূপ এই বিরাট লোকালয়ের ক্ষয়সাধন দ্বারা পৃথিবীতে নতুন একটা যুগের সূচনা করে যায়।

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবার কতক লোক আছে—অত্যন্ত গোঁড়া, সংস্কারবিরোধী। এরা দৃশ্যত আস্তিক হলেও অন্তরে বা কার্যত নাস্তিকের চরম। সংকীর্ণতার গণ্ডী দিয়ে তাঁরা নিজেদের 'বিশেষ' কোরে রেখেছে। এই 'বিশেষের' গণ্ডী দ্বারা তারা নিজেদের শুধু নয়, ধর্মকেও মলিন ও খর্ব কোরে ফেলেছে। এই 'বিশেষের' দ্বারাই মানুষ স্রষ্টার অধিকতর প্রিয়কার্যসাধনে অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্ট এই বিরাট বিশ্বের কল্যাণসাধনে অদ্ভুত কর্মশক্তির পরিচয় দিতে পারে, এই ভূমণ্ডলকেই স্বর্গরাজ্যের স্বরূপ দানে যোগ্যতা দেখাতে পারে, আবার এই 'বিশেষের' দ্বারাই স্রষ্টার সৃষ্ট এই দুনিয়াকে মানুষের বাসের অনুপযোগী কোরে তোলা যায়, এই স্রষ্টার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ কলুষিত কোরে তোলা যায়।

কিন্তু দর্পহারী স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা সৃষ্ট জীবের পক্ষে দীর্ঘকাল চলে না। তাই যখনই মানুষের দ্বারা

ধর্মের মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, স্বধর্মিকেরা যখন অধার্মিকের দ্বারা নানারূপে পীড়িত, লাঞ্ছিত ও অবহেলিত হতে থাকে, তখনই তিনি একটা "বিশেষ"রূপে প্রতিভাত হন অর্থাৎ তাঁর প্রেরিত শক্তির আবির্ভাব হয়। "ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—এই উক্তির সত্যতা তখনই প্রত্যক্ষ করি আমরা। কালে কালে যুগে যুগে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও রক্ষাকল্পে 'আমি' বিশেষ শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। এই 'আমি'কে আমরা দেখতে পাই—রামায়ণে রাম, মহাভারতে কৃষ্ণ, বাইবেলে যীশু, কোরাণে মহম্মদরূপে। রাম, কৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ বা আরো যে সব ধর্মপ্রবর্তক বা ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষের কথা আমরা জানি বা আলোচনা করি—সে সকলেই স্রষ্টার একই উদ্দেশ্য সাধনে পুনঃপুন আমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু আমরা—আমাদের বুদ্ধির প্রমাদ ও সংকীর্ণতাবশতঃ মনে করি, যে এক একটী যুগে এক একজন মহাপুরুষ এসে নতুন একটা ধর্মের সৃষ্টি করে গেলেন। বস্তুতঃ, জনসাধারণ মনে করে, ধর্ম এক নয়—ঈশ্বরই এক এক শ্রেণীর জন্য ধর্মকে পৃথক কোরে সৃষ্টি করেছেন। যদিও কার্যত তা নয়। আর এই প্রয়াস ও অজ্ঞতাবশতঃ লোকে পরস্পরের ধর্মের প্রতি অত্যধিক ঈর্ষাপরায়ণ, অসহিষ্ণু ও অবিশ্বাসী! যে কেনো সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন, কেউ যখন অপর সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি বা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ধর্মত ও কার্যত, সে স্বধর্মের প্রতিও বিশ্বাসহীনতার পরিচয় দেয়। সে পতিত হয় ও নিজকে যে ধর্মের অনুগামী বা পূজারী বলে মনে করে সেই ধর্মেরই মহত্বকে ও মর্যাদাকে সে ক্ষুণ্ণ ও মলিন করে। আপনার কদাচার ও ব্যাভিচারের দ্বারা ধর্মের সত্যরূপকে বিকারগ্রস্ত ও ঘৃণার্হ কোরে তোলে। আপনার ক্ষুদ্রতার মাপে আপনার ধর্মকেও ক্ষুদ্র ও খণ্ড করে। আর এই ধর্ম—স্থাপনের দ্বারা 'সমস্ত মানব একজাতি'—কোরাণের বা গীতার এই উক্তিকে অস্বীকারই করা হয়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানুষের এই মনোভাব যে অজ্ঞতা ও ঔদ্ধত্য বা অহংকারের পরিচায়ক সে বিষয়ে লেশমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই।

কোরাণ বলছেন :—"হে মোহাম্মদ, তোমার জন্য সেই ধর্ম নির্ধারণ করিয়াছি যাহা আমি নোহা, এব্রাহিম, মুছা ও ইছাকে আদেশ করিয়াছিলাম এবং তাহারই অনুপ্রেরণা আমি তোমার মধ্যে দিয়াছি;" (কো: ৪৩, ১৫)

কোরাণ আবারো বলেছেন :—"মোহাম্মদ, তোমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের নিকট যাহা বলিয়াছি তাহার অতিরিক্ত কিছু বাস্তবিকই তোমার নিকট বলি নাই। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু ক্ষমার প্রভু এবং দুঃখজনক প্রতিফল প্রদানের প্রভু।" (কো: ৪১, ৪৩)

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি—পয়গম্বর মহম্মদ নতুন কোনো ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। শাশ্বত সনাতনী সত্যধর্ম যখন মানুষের মিথ্যাচার, অনাচার ও ব্যাভিচারে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল, তেমনি একমুহূর্তে আমাদের মধ্যে মহম্মদের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরপ্রেরিত মহম্মদের দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে অসত্যের প্রভাবমুক্ত হয়ে আমরা ধর্মের যথার্থ রূপটি চিনতে পারি।

ধর্ম মূলত এক ও অভিন্ন

এও দেখা যাচ্ছে যে কোরাণ তথাকথিত অন্য সম্প্রদায় ও জাতিগুলিকেও স্বীকার করছেন। যেমন—

"আমি জগতে সকল সম্প্রদায়ের জন্যেই প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত করিয়াছি।" (কো: ১৫, ২৪)

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ধর্ম যদি একই তবে কেন লোকে তা এক বলে মেনে নিতে এত কুণ্ঠিত ও পরস্পরের ধর্মভাবনার প্রতি পরস্পরে এত বিদ্বেষপরায়ণ? কেন তবে কোরাণ একথা বলেন যে সকল সম্প্রদায়ের জন্যই প্রেরিত পুরুষ আবির্ভূত করেছেন? বিশ্বের সর্ব স্থান ও সর্ব কালের জন্য কেন তবে একজন নবী বা মহাপুরুষ প্রেরিত হন নি?

বিশ্বের সকল মানবের প্রতি প্রেম ও বন্ধুভাব নিয়ে যদি আমরা বিচার করে দেখি তবে দেখতে পাব যে মানুষের ভাষা সর্বত্র এক নয়, জীবনযাপনের প্রকৃতিও

সর্বত্র এক আঞ্চলিক পরিচয় ও যোগাযোগও সেকালে এখনকার মতো এমন সহজ ও সুগম ছিল না—কাজেই এক একটি অঞ্চলের জন্য এক একটি আবশ্যকীয় মুহূর্তে এক একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব অস্বাভাবিক নয়। আর এই সব অসুবিধা, বৈষম্য ও ব্যবধান হেতু কোনো এক অঞ্চলে আবির্ভূত কোনো এক প্রেরিত পুরুষের পক্ষে সমগ্র বিশ্বে ধর্মশিক্ষা দানের জন্য ভ্রমণ করা ও সকলকে তাঁর প্রচারিত বাণীর মর্ম গ্রহণ করিয়ে একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক ধর্মাশ্রয়ে সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। আর এ সম্ভবও নয়। সেই কারণেই আঞ্চলিক ব্যবধান, ভাষাবিষমতা ও স্থানীয় পরিস্থিতির আবশ্যিক মুহূর্তের আহ্বানে এক একটি অঞ্চল এক একটি ক্ষণে এক একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। এতো সেই অধিতীয় ভগবানেরই বিচার ও ব্যবস্থাপনা। স্রষ্টার এই ব্যবস্থা দ্বারা ধর্মের বহুরূপ দেওয়া হয়নি বা 'ধর্ম এক অখণ্ড ও বিশ্বজনীন' এবং 'সমগ্র মানব একজাতি'—গীতা কোরাণের এই সব উক্তির যাথার্থ্য এর দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না। এবং যে কোনো কালে যেকোনো স্থানে, যেকোনো পারিপার্শ্বিকে যেকোনো প্রেরিত পুরুষের প্রচারিত ধর্মভাবনাই হোক না কেন, সকলের মধ্যেই একটা মৌলিক ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে যে কোনো ভেদ বা বৈষম্য নেই, কম বা বেশী নেই তা আমরা কোরাণের উক্তি থেকে উদ্ধৃত কোরে দেখাতে পারি :

"তুমি বল হে মহম্মদ, আমরা সকল স্বর্গীয় দূত, সকল স্বর্গীয় ধর্মগ্রন্থ ও সকল প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করি, তাহাদিগকে সমান সম্মান করি, তাঁহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না।" (কো: ২, ১৪৪)

"সমস্ত মানব একজাতি।" (কো: ১০, ১৯)

"হে মহম্মদ, তোমার পূর্ববর্তী স্বর্গীয় তত্ত্ববাহকগণকে যাহা বলিয়াছিলাম, তদতিরিক্ত তোমাকে কিছু বলি নাই।" (কো: ৪১, ৪৩)

"তুমি জগদ্বাসীকে বল, আমাদের ও তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এক, তোমাদের প্রত্যাদেশ বাণী বিশ্বাস করি।" (কো: ২৯, ৪৬)

এই সব উক্তি থেকে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট প্রতিভাত ও প্রমানিত হয় যে আমরা যারা নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের ও সম্পূর্ণত্বের বড়াই করি এবং অপর সম্প্রদায় ও জাতির ধর্মভাবনার প্রতি অসহিষ্ণুতা, অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করি, তারা বস্তুতপক্ষে ধর্মদ্রোহিতাই করি, ধর্মের মহান উদ্দেশ্যকে ম্লান ও বিকৃত করি। এতে ঈশ্বরে অনাস্থাই সূচিত হয়। সকল মানবের জন্যই সত্য অর্থাৎ ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, প্রত্যাদেশ বাণীও এক।

স্রষ্টা যে এক, একথা সকলেই স্বীকার করছি, কিন্তু সে-অভিভাবকের শাসন বা বিধান আমরা মানছি না। তন্নিবন্ধন এই বিড়ম্বনা আমাদের উপর চেপে বসেছে। এথেকে মুক্তিপাবার একটা রাস্তা আমাদের বের করতে হবে; অবশ্য এখনকার এই ঘোর নাস্তিকতা, এমন একটা অবস্থায় আমাদের এনে ফেলেছে যে এরই ভেতরে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নৈতিক ও ধার্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হবার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এবং এখনকার এই কাজ তার যথেষ্ট অনুকূলে এরূপও মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

একথা যদি মেনে নিই যে সমস্ত প্রেরিত মহাপুরুষ বা নবী বিশ্বের বিভিন্ন এলেকায় সেই সেই আঞ্চলিক ভাষায় ঈশ্বরের একই ঐশী বাণী প্রচার কোরে গেছেন, তবে 'ধর্মান্তর-গ্রহণ' কথাটির কোনো মানে বা প্রয়োগ অচল হয়ে পড়ে।

ধর্ম এক ও অবিচ্ছেদ্য। এর বহুরূপ অসিদ্ধ ও অসত্য। ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন সত্তা স্বীকার করার যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ থাকত তবে ধর্মান্তর-গ্রহণ' কথাটির প্রয়োগও স্বীকার করতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আদপেই ধর্মের মধ্যে কোনো বৈভিন্ন্য প্রমাণিত হয় না, আর সেইজন্যই ধর্মান্তর-গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ নয়। যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে বা ধর্মান্তর গ্রহণে উৎসাহিত করে অথবা এই কার্যে যাজকত্ব গ্রহণ করে তারা সকলেই ঐ বিধানকে প্রকারান্তরে অমান্য ও

অস্বীকার করছে। এ তাদের অশিক্ষা অথবা বিশ্বশিক্ষার ব্যবস্থার ওপর দাম্ভিক প্রগল্‌ভতা বা অনধিকার চর্চা। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লোভে ধর্মের দোহাই।

পরমতসহিষ্ণুতা ধর্মজীবন যাপনের একটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি সামাজিক সংস্কার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, দৃষ্টত ভিন্ন ভিন্ন হলেও সহিষ্ণুতা ও পবিত্র আনন্দ-স্বভাব যাদের চরিত্রের এক বিশেষ সম্পদ, তাদের কাছে, তাঁরা যে-সম্প্রদায়েরই হোন না কেন, অপর সম্প্রদায়ের সামাজিক বা ধার্মিক অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান বা অংশগ্রহণ অধার্মিক বা স্বধর্ম-বিরোধী বলে মনে হয় না। ব্যক্তির নিকট বিবেকই তার শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। ভাষাজ্ঞানে অপটুতা কোটি কোটি জনসাধারণকে বেদ-উপনিষদ, গীতা, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি স্বর্গীয় গ্রন্থাদির পাঠ ও অভ্যাস থেকে বঞ্চিত করে বটে, আর ওই সকলের মধ্যে প্রবেশ কোরে সার সংগ্রহ সাধারণের পক্ষে অসাধ্যও বটে, কিন্তু লোকের বিবেক যে তার কাছে অত্যন্ত নিকট-বন্ধু, সকল ধর্মসংকটেই ব্যক্তি তার বিবেকের দ্বারস্থ হতে পারে—বিবেকের ভাষা বুঝতে বই পুস্তকের আবশ্যকতা নেই। পয়গম্বর মহম্মদের অক্ষরজ্ঞান ছিল না, যীশুখ্রীষ্ট কোনো ইস্কুলকলেজে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন—একথা কেউ বলে না, পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কি এমন ভাষাজ্ঞান ছিল। কিন্তু এই সব মহাত্মারা 'আপনি আচরি ধর্ম' নিজ নিজ বিবেকরূপ শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে বিশ্বজয়ী হয়ে গেছেন। এঁরা নিজ নিজ জীবিতকালে নিজ নিজ দেশে এক একটি নবযুগের সূচনা করে গেছেন। একথা কেউ কি অস্বীকার করবেন?

ব্যথার বিষয়, যে এই সব পরম বিবেকী মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত জনসাধারণ নিজ নিজ জীবনে অনুশীলন করে না। তাদের ধর্মাচরণ কার্যে নয়, তর্কে বা দ্বন্দ্বে দেখা যায়। ধর্মের অনুসরণ করে না বটে, কিন্তু ধর্মের বড়াই ও অভিনয় আছে খুব।

ইংরেজী ১৯৪৬ সালে কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে যে সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয় সে সবেরও পশ্চাতে এই তথাকথিত 'ধর্মের দোহাই' ছিল। ভারতবর্ষ এই দোহাইয়ের চাপেই দ্বিধা বিভক্ত হল। 'ইসলাম বিপন্ন, হিন্দু বিপন্ন'—এই ছিল নেতাদের নেতৃত্বে 'জিগীর' বা সম্বল। মূঢ় নিরক্ষর জনসাধারণকে 'ইসলাম বিপন্ন, হিন্দু বিপন্ন,'—এই সব বলে পবিত্র সত্যধর্মের আদর্শ-দ্রোহিতা করতেই তাদের প্ররোচিত করা হয়। জনসাধারণকে রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরেই, ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতারিত করা হয়। সম্বলবন্তি হিন্দুমুসলমানগণ এই মিথ্যা জিগীরেও যখন বিবেক-বিরুদ্ধ কিছু করতে অগ্রসর হয়নি, তখন লাঠির জোরেই অন্যায়কে সমর্থন করতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। ভারতবিভাগ বা বাংলাবিভাগ ব্যাপারে ও সাধারণ কোন নির্বাচন পর্বেও সময়কার ঘটনাপঞ্জী স্মরণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে ধর্ম কাদের দ্বারা বিপন্ন হচ্ছে বা হয়েছে। মহম্মদের প্রচারিত পবিত্র ইসলাম ধর্মে আর বৈদিক ধর্মে বস্তুতপক্ষে সামাজিক বা লৌকিক সংস্কার বাদ দিলে, নীতি ও ভাবধর্মে কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই, যে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে ধর্মকে বিকৃত কোরে এমন নিপুনভাবে কাজে লাগানো হয়েছে এবং হচ্ছে, স্বভাবতই যারা অশিক্ষিত-চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খল আচরণকারী, তারা স্বীয় স্বার্থানুকূলে ধর্মের বিকৃত রূপটাকেই সত্যের মর্যাদা দিয়ে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করছে। অপকর্ম ও অপধর্ম তাই আমাদের সমাজে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। পরস্ব-লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী-লাঞ্ছনা, মিথ্যা-সাক্ষ্য, প্রতারণা, চোরাবাজার, উৎকোচ-গ্রহণ—এসব আজ তথাকথিত ধর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব অপকর্মগুলির অনুষ্ঠানেই আজ ব্যাপকভাবে জনসাধারণের সহানুভূতি পাওয়া যায়। আজ এইগুলিকেই ধর্মের মোড়কে ধর্মানুশাসন বলে প্রচার করা হচ্ছে। নেতৃবর্গ ও রাষ্ট্রনায়কদের এদিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টি নেই। রাষ্ট্র যে কতখানি অকল্যাণের পথে এগিয়ে চলছে আজ তা কেউ বুঝবে না, কিন্তু এমন দিন খুব বেশী দূরে নয় যখন এ অবস্থায় ভালোর দিকে পরিবর্তন মানুষের শক্তির বাইরে চলে যাবে।

হিন্দুধর্মের শাস্ত্রে আমরা দেখি—

"ধর্মধ্বজিত্বকে হীনে জঘন্যঃ ধর্মবাণিজঃ"

(মহাভারত—বনপর্ব)

অর্থাৎ কোন কিছু সুবিধা বা স্বার্থ হাসিলের জন্য যদি ধর্মের দোহাই পাড়া হয় বা ধর্মকে বিকৃত করে কাজে লাগানো হয়, তবে তাকে ধর্মবাণিজ্যই বলা চলে। এ অতি হীন ও জঘন্য প্রচেষ্টা। ধর্ম এতে পীড়িত হয় ধর্মের মহত্ত্ব এতে খর্ব হয়। কিন্তু আজ হিন্দুই বা কি, মুসলমানই বা কি, সদ্ধর্মকে সকলেই আজ 'বয়কট' কোরে অর্থাৎ অগ্রাহ্য কোরে যার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবেই চলছে। এ এক ব্যাপক স্বৈরতান্ত্রিকতা বা অরাজকতা চলছে। এইই আজকে সাম্যবাদের নামে চলছে। কে যে এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী তা বলা শক্ত। এই ধর্ম—সংকীর্ণতা বা বিষমতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আরো দুটি প্রবন্ধে 'মন্দিরা'র আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ (১৩৫৪) সংখ্যায় আলোচনা করেছি। উক্ত প্রবন্ধ দুটির আনুসঙ্গিকরূপে পাঠ করলে এই প্রবন্ধের ভাব ও উদ্দেশ্য সহজ বোধ হবে বলে মনে করি।

নীতি ও ভাবধর্মে মূলত প্রচলিত ধর্মমতগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। না থাকলেও মানুষ সহজেই যে-কোন সংস্কারকে, সে সংস্কার যতই কেন না উচ্চাঙ্গের ও শুভদায়ক হোক, স্বচ্ছন্দমনে হৃদগত করবে এমনটী অবশ্যই আশা করা যায় না। কিন্তু ব্যবহারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এমন একটা সমন্বিত বা নির্বিরোধ সংস্কারে আমরা এসে পৌঁছিতে পারি যেটা গ্রহণে বা আচরণে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরই আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। এরূপ সংস্কার সাধন অসম্ভব, একথা কদাপি মনে হয় না। কেননা বিকাশশীল ও পরিবর্তনশীল এই জগতে কিছুই যে একস্থানে দাঁড়িয়ে নেই—এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। নৈতিক ও ঐতিবৃত্তিক ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন—এতো চোখের ওপরই প্রতিনিয়ত ঘটছে, দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে সামাজিক ও লৌকিক আচার সংস্কার—এগুলোর পরিবর্তন ও বিকাশ সাধন তো আরো সহজ বলেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও উদার-হৃদয় হিন্দুমুসলমান সমাজ হিতৈষীদের এইদিকে অগ্রসর হবার সময় এসেছে বলে মনে হয়। ভাষা ও লিপিবৈষম্য যেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নেই সে সব অঞ্চলের অধিবাসীরা এই ধরণের সংস্কার সাধনে পথিকৃতের কাজ করতে পারে। এ যুগ কিন্তু এই চিন্তাধারার যথেষ্ট অনুকূলে মানুষের মনে এই উদার ধর্মভাবনা দৃঢ় হয়ে উঠুক—এই তো প্রার্থনা। গান্ধীজী চেয়েছিলেন—এই শুভবুদ্ধিই সকলের অন্তরে উজ্জ্বল সক্রিয় হয়ে উঠুক। তিনি বলতেন যে তিনি শুধু হিন্দু নন, তিনি ইহুদী, খৃষ্টান, পার্সী, শিখ, জৈন, মুসলমান অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল। এর অর্থ এই, যে তিনি বিশেষ অনুধ্যানপূর্বক জেনেছেন যে ধর্মমতগুলির মূলভিত্তির মধ্যে কোন বৈষম্য নেই এবং কোন ধর্মমতের সম্বন্ধেই অশ্রদ্ধাশীল ও অসহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করার কোন সঙ্গত কারণও নেই। এই চিন্তাধারায় তিনি স্বীয় ধর্মভাবনাকে অধিকতর শক্তিশালী, উদার ও ব্যাপক করতে পেরেছিলেন। আর এই বিশ্বাসের ওপর তিনি ধর্মমত-গুলির মধ্যে বিরোধিতার কারণগুলির উচ্ছেদ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজীর শিক্ষা ও তার দৃষ্টান্ত জনসাধারণ গ্রহণ করলে আমাদের সকল অশান্তি ও দুঃখদায়ক অপবৃত্তির অবসান হয়, এ বিষয় কোন সংশয় নেই। বাস্তবিকপক্ষে ধর্মমতগুলির প্রতি পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণই ধর্মের মৌলিক লক্ষ্য। আর এতেই যদি আমাদের অযোগ্যতা প্রমাণিত হয় তবে আস্তিক্যবাদ সমাজাশ্রয়ে থেকে আস্তিক্যবাদকে অস্বীকার করার মতো পাপে আমরা লিপ্ত হচ্ছি, একথা কে না বলবে? তাই বলি, 'সবকো সন্মতি দে ভগবান' —অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের সকলকে সেই শুভবুদ্ধি দিন যাতে কোরে আমরা পরস্পরে পরস্পরের ঘনিষ্ট আত্মীয়, সুহৃদ হয়ে উঠতে পারি।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদু গোপাল মুখার্জি

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমার বাবা লেখাপড়ার জন্য কোনদিন আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন না বা চাপ দিতেন না। ইচ্ছা হলে পড়ব, না ইচ্ছা হলে পড়ব না। আমার এখন পড়ায় মন নাই। কেউ আমাকে সেইজন্য চাপাচাপি করল না। আমাদের এক আত্মীয় ছিলেন যিনি প্রবাসে মাঝে মাঝে যেতেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। সম্প্রতি তিনি বাইরে যাচ্ছিলেন। আমি তার সঙ্গ নিলাম।

প্রথমে আমরা গেলাম বর্দ্ধমানে। ছেলে বেলায় খেলার ছড়ায় শুনেছিলাম "বর্দ্ধমানের রাঙ্গাবাটি।" সেটি দেখার খুব সাধ ছিল। মেদিনীপুরে "চন্দনবৃষ্টি" কখনও কখনও হয়। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার বটে! কিন্তু বর্দ্ধমানেও দেখার জিনিষ কিছু ছিল। গোলাপ বাগ, চিড়িয়াখানা, বিদ্যা-সুন্দরের সুড়ঙ্গ, রাজবাড়ী, তাছাড়া সেটা হল "সীতা ভোগের" দেশ। মিহিদানা ও রকম কলকাতায় পাওয়া যায়। কিন্তু "সীতা ভোগ" সেইখানে গিয়ে না খেলে নাকি তার প্রকৃত আস্বাদ বোঝা যায় না। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে বিদ্যাসাগর মশায় এক বাবুর মোট বয়ে দিয়ে ছিলেন, গল্পে শুনেছিলাম। বর্দ্ধমান এইরকম নানা কারণে দেখবার জায়গা বটে।

বর্দ্ধমানে পৌছে মহাজন পট্টিতে একজনদের বাড়ীতে আমরা উঠলাম। তারা খুব আদর আপ্যায়ন করল। দুপুরে আহারের পর সবাই শুয়েছে। আমি ভাবলাম দেশ দেখতে এসেছি শুয়ে শুয়ে কি সময় নষ্ট করতে আছে? খুট্ করে এক সময় বেরিয়ে পড়লাম, খানিক এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক বাগান বেষ্টিত পুকুর ধারে উপস্থিত হলাম। কি একটা পাখী অতি সুমধুর স্বরে—ডাকছিল। পথে দাঁড়িয়ে দু—তিন ডাক শুনলাম। তাতে মন ভরল না। কি পাখী? কেমন দেখতে? কি রকম রং? এই সব নির্ণয় করতে পুকুরের দিকে চললাম। পুকুরটীতে একটী সান বাধান ঘাট ছিল। সেখানে গিয়ে পাখীর ডাক শুনতে শুনতে বসে পড়লাম। পাখীটির হলুদে গা। বুকের কাছে একটু লাল। কি পাখী চিনতে পারলাম না। তারপর কোকিল ডেকে উঠল—কুহু, কুহু—কু, কু, কু। তারি মিষ্টি। একটা পাখী নানারকম কায়দা দেখিয়ে উড়তে লাগল। অবশেষে টেলীগ্রাফের তারের উপর গিয়ে বসল। পথে টেলীগ্রাফের খাম ছিল। সেখানে বসে বসে কেমন সুন্দর ডানা নাড়ছিল। কয়েকটা হাড়িচাচা চেঁচাতে লাগল। পিক্-পিকলু, করে দুটো বুলবুলি একটা নারকেল গাছের মাথায় বসে ডাক সুরু করল। সবুজে চক্‌চকে পাতার উপর রোদ যেন ঠিক্‌রে যাচ্ছিল। সে বেশ শোভা। পেছনে একটা আমড়া গাছে একটা কাক উড়ে এসে বসল। তার বোধ হয় মনে হল—এই মানব শিশু সবাইয়ের গুণগান সংগ্রহ করছিল। অতএব সেই বা কেন বাদ যায়? কা, কা, কা—করে ডেকে একটু ঘাড় বেঁকিয়ে তার যে নিজস্ব একটা কায়দা আছে সেটা অবহিত করিয়ে দিল। তার দিকে ফিরে চাইলাম। মুখ দেখে মনে হল কাকটা বুঝেছিল যে এ লোকটা ঠিক সমজদার নয়। তাই বোধ হয় কাকটা আমাকে হেলার পাত্র বুঝিয়ে দিতে ডাক ছেড়ে একটা শুক্‌নো ডালে ঠক্, ঠক্ করে কয়েকটা ঠোকর মেরে আমার দিকে আর একবার বঙ্কিম গ্রীবায় তাকিয়ে তাচ্ছিল্য ভরে উড়ে গেল।

আমি স্বভাবের শোভার বৈচিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। এমন সময় পেছন থেকে কার স্নেহার্দ্র কণ্ঠস্বর কানে এল—"কাদের ছেলে বাবা তুমি?" মুখ ফিরিয়ে দেখি একটী স্ত্রীলোক কলসী কাঁখে দাঁড়িয়ে "কারুদের ছেলে নয়" বলে মুহূর্ত মধ্যে আমি আবার সেই হলুদে পাখীটা যে গাছে বসেছিল সেইদিকে চাইলাম। আমার বলার উদ্দেশ্য যে বর্দ্ধমানের কোন বাড়ীর ছেলে আমি নই। পাখীটা তখনই উড়ে গেল। সেই স্ত্রীলোকটী আবার বলল—"কোন বাড়ীতে থাক?" স্বরে জবাব দিলাম—"জানি না।" বাস্তবিক সে যে কাদের বাড়ী এসেছি, এ পর্যন্ত তা জানতাম না; শুধু

মহাজন পট্টী নামটা শুনেছিলাম বলে মনে ছিল। স্ত্রীলোকটী বড্ড মোলায়েম ভাবে বলল—"আমার কলসীটা এইখানে রইল, একটু দেখ্‌তে বাবা।" বলেই পিতলের কলসীটা সেইখানে রেখে চলে গেল। আমি আবার দেখছিলাম বাতাসে নড়নড়ে নারিকেল পাতা রোদের সঙ্গে ধরা-ছাড়া খেলছিল যেমন দোলা আসে সূর্যরশ্মি তাকে স্পর্শ করে। আবার যেমন দুলে উঠে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আলো-আঁধার—আঁধার-আলো—এইরকম ঘুরে ফিরেকত লাগল। একটা কাট-ঠোক্‌রা "কুই, কুই, কুই" আওয়াজ করতে লাগল। একটা কাট বেড়ালী তরতর করে কদম গাছটায় উঠে গেল।

সেই স্ত্রীলোকটী ফিরল। হাতে তার কিছু খাবার সে এসে আমার সামনে খাবারের ঠোঙ্গাটী ধরে অতি অন্তরঙ্গের সঙ্গে—বলল—একটু মুখে দাওতো, গোপাল আমার। ঘুরিয়ে পড়ে গেলাম। যেখানে সেখানে আমি খাইনা। অপরিচিতের কাছ থেকে কিছু নেওয়া আমার অন্তর প্রকৃতিতে বাধে। প্রত্যাখ্যান করলাম। স্ত্রীলোকটীর দুচোখ দিয়ে এবার দর-বিগলিত ধারা বইতে লাগল। সানুনয়নে উপরোধ জানাতে লাগল—"খেতে হয় মানিক। আমি যে তোমার মা হই।" "মা? আমার না? তুমি?" বলে হতভম্বের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্ত্রীলোকটী এবার আমার পাশে বসে পায়ে পিঠে, মুখে হাত বুলাতে লাগল। মাঝে একবার কাপড়ে চোখ মুছে বলল—"কেন তুমি অমন করে আমার কথা ঠেলছ? ঠিক তোমার মত সে যে ছিল! আজ বছর দিন ঘুরে এল তাকে খাওয়াতে পাই নাই! তুমি না হয় খেয়ো না। আমার হাত থেকে নিয়ে না হয় ফেলে দাও কিন্তু না বলো না।" বলে আরও কেঁদে কেঁদে কাঁপতে লাগল। ঘরে বন্ধনে পড়লাম। কারুর কান্না দেখলে, বিশেষ মাতৃজাতির, আমি চোখের জল ধরে রাখতে পারতাম না। এদিকে অপরিচিতা রমণী। জানা নাই, শুনা নাই। কি যে বলছে—ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। যার তার কাছে আহার্য নিয়ে মুখে দেওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। কি করে তাকে বাধিত করব ঠিক করতে পারছিলাম না। স্ত্রীলোকটী আমাকে আদর করতে লাগল। অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কি যে করা উচিত আর কিই বা অনুচিত স্থির করতে পারছিলাম না। এমন সময় একটী বৃদ্ধা জল নিতে সেই ঘাটে এল। সে স্ত্রীলোকটীর ঐ অবস্থা দেখে সহানুভূতির স্বরে বলল—"পরেশের মা, অমন করে কেঁদে কেঁদে বেড়ালে পাগল হয়ে যাবি। স্থির হ।" আমাকে আজ সে দেখেছিল মহাজন পট্টীর বাড়ীতে। সে পরেশের মাকে চিনিয়ে দিলে যে এ ছেলেটী কলকতা থেকে এসেছে। রাধাকান্তদের বাড়ীতে উঠেছে। "কাল যাস্ না হয় সেখানে?" পরে আমাকে বলল—"এ খাবার ভাল, খেতে পার।" আমি ঘাড় নাড়লাম। স্ত্রীলোকটি যখন হতাশ হয়ে গেল তখন বলল—এই খাবার রইল। এর সঙ্গে আরও খাবার নিয়ে আমি রাধাকান্ত দাদার বাড়ী যাব, গিয়ে তোমায় খাইয়ে আসব। ভয় নাই। আমি ডাইনি নই। না খেলে, নেই, নেই। একবার আমায় মা বলে ডাকো।" এতে না বলার কিছু ছিল না। বিমুগ্ধ হয়ে বার দু-তিন মা মা বলে ডেকে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগলাম যে পূর্বে পূর্বে জুতো বা জামার দোকানের সামনে দিয়ে চলে যেতে এমন কয়েকবার ঘটেছে যে খরিদ্দার আমাকে ডেকে পরিয়ে নিজের ছেলের মাপের জুতো, জামা কিনে নিয়ে গেছে। তারাও বলত—তাদের ছেলেও এই রকম সাটের হবে। কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব। মাকে ছেড়ে এসেছিলাম কলকাতায়। অথচ দেখছি মা এখানে আগে থেকে এসে রয়েছেন। মা সর্বত্র বিরাজমান। প্রকৃতই মায়ের অভাব বুঝতে পারলাম না। কোথা থেকে মায়ের স্নেহ, মায়া ও মমতা এমন করে দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে। এদের অতিক্রম করে যাবার উপায় নেই।

ক্রমে বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার অনেক গ্রাম ঘুরলাম। রইলাম গিয়ে অতি সাধারণ লোকদের মধ্যে। মিশলাম তাদের ছেলে পিলেদের সঙ্গে। ধোপা, বাগ্দী, নাপিত

তাঁতি, গোয়ালা, কামার, আগুরী, ডোম, ছুলে, বাউরী কৈবর্তদের সঙ্গে খুব ভাব করে নিলাম। তাদের সুখ, দুঃখের সঙ্গে যতটা সম্ভব পরিচিত হলাম। দুটী চরিত্র আমাকে বিশেষ করে স্পর্শ করেছিল। ঝড়ু বৈরাগী ও শচী তাঁতিনী। ঝড়ু বলত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এরাও জন্মমৃত্যুর অধীন। এদের ঘরে মুক্তি হয়না। মুক্তি হয় তখন যখন মানুষ মানুষকে চিন্‌তে পারে, মানুষের নাগাল পেয়ে মানুষকে ছুঁতে পারে। তখনই মানুষ তাদের মাঝে ধরা দেয়। মানুষের জন্ম তখন সার্থক হয়।

সে ভাবাবেশে "আনন্দ লহরী" বগলে নিয়ে কাটিতে ঝঙ্কার তুলে সন্ধ্যার সময় গাইত। আশপাশের লোকেরা জমা হয়ে শুনত।

"বেদ বিধির পর গোলক উপর,
নিত্য মানুষ আছে
তার নাই চলাচল, সদাই অচল
দেদিপ্যমান রয়েছে॥"

আবার গাইত—

"আমি এক দিনও না হেরিলাম তারে।
বাড়ীর কাছে আশি নগর, তাতে পড়সী বসত করে॥"

ঝড়ু দুঃখ করে বলত, যে দেশটা পুণ্যক্ষেত্র ছিল সে হয়েছে মনুষ্য-ক্ষেত্র। মানুষে মানুষে সদ্ভাবের জায়গায় হয়েছে খাওয়া-খাওয়ি। কুরুক্ষেত্রের পর মহাশ্মশান হয়ে পড়ে আছে। এখানে মানুষ নাই। শুধু কুকুর, শেয়ালে কলরব করছে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত এর কি উপায় নাই, সে বলত—আছে বৈ কি। মানুষ আবার জাগবে। "মানুষ হলে ধরবি মানুষ, ঘুচবে মনের ব্যথা।" দীর্ঘকাল বাদে কোন একটা বছর আসবে। তখন এদেশে মরার হাড়ে প্রাণ নাচবে। কিন্তু সেদিন নিশ্চয় আসবে, কোন এক ক্ষ্যাপা তাকে বলেছে। ঝড়ু বলত তার কথা মিথ্যা হবার নয়। তার লক্ষণ সে বলেছিল—"এখন যেমন দেখছ যে মরছে চষে সে রয়েছে বসে। সুখে আছে যারা এদের মাথায় কাপিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন হবে এর উল্টোটা।" "রাজা, উজীর মিছে কথা ; চাষীর পায়ে বাদুনের দলিত মানবের উত্থান সম্বন্ধে ঝড়ুর মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। মানুষকে মানুষ অবহেলা করে এটা মহামানুষ চিরদিন সইবে না।

শচীর কথা। কোতলপুরের আছে একটি গ্রামে আমাকে সে দেখতে পায়। সদ্ভাতের ছেলে ধোপাদের বাড়ীতে আছে। সীতারাম বুড়ো মানুষ। প্রতি কথায় সে "হরিবোলে"র মাত্রা দিত। বিনা "হরিবোলে" সে কোন কথা আরম্ভ করতে পারত না। একদিন আমাকে "হরিবোলে" সে ধরে নিয়ে গেল। মুড়ি, কাঁকুড়, গুড় রেখেছিল জলখাবার জন্ত। খাবার আগে হাত পা ধোয়ার দরকার। সীতারাম বলল—"হরি বোলে, এইখানে এস ঠাকুর।" আমি দাওয়ায় বসলাম। মেয়েদের উদ্দেশ্তে সীতারাম হেঁকে বলল—"হরিবোলে, ঠাকুরের পা ধোয়ার জল আন।" মেয়েরা শুধু ঘটিতে জল আনে নাই, একটা বড় গামলাও সঙ্গে এনেছিল। আমার হাতে ঘটি কিছুতে তারা দিল না। গামলার ওপর পা রেখে ঘটির জল ঢেলে পা ধুইয়ে দিল। তারপর গামছার বদলে মাথার চুল দিয়ে পা মুছাতে এল। আমার মনে হল, আমার মা যেন নিজ চুল দিয়ে তার ছেলের পা মোছাতে এসেছিল। চমকে উঠি। বুকের ভেতর কামারের হাতুড়ির ঠোকা আরম্ভ হয়ে গেল, কিছুতে পা মোছাতে দেব না ; মেয়েরাও ছাড়বে না—

বড় গোলমাল হতে লাগল। সীতারাম বলল—"হরিবোলে, আমাদের কৃপা কর বাবা! বারে বারে কত ছলবে? কি ছলে এই বেশে এসেছ কে জানে? হরিবোলে, অনুমতি কর।

"হরিবোলে তোমরা নিজের কাজ করে না ও।" "না গো আমায় অপরাধী ক'র না, তোমরা যে আমার মা"—ব'লে আমি পা ওটিয়ে নিয়ে যোড়হাত করে বসলাম। সহসা বাড়ীশুদ্ধ লোক কান্নাকাটি সুরু করে দিল। আজ সকালেই অমঙ্গলের সূচনা হল, সাপের বাচ্চা আর বড় সাপে কোন তফাৎ নেই, বরং বাচ্চা

সাপের বিষের তেজ আরও বেশী। হায় হায় কি হবে? বিধি বাম...ইত্যাদি। সোরগোল শুনে শচী এসে ঢুকল। সব কথা শুনে সে সহাস্য মুখে বলল, "তার জন্য এত ভাবনা কেনে? কিষ্ট বোড়ো লাবড়। উয়ার মত জবাব আমরাও জানি। যশোদা দড়ি দিয়ে বাঁধতে পেরেছিল। কিন্তু মায়ার বাঁধনে বাছাকে বেশটি করে জড়াই রেখেছিল। লে, জোর করে খাগে দেখি, দে উয়ার মুখে অল্প মুড়ি গুড়। এবার তাদের হাতে যেতে হল। অনেক কষ্টে তাদের কাছে বিদায় নিয়ে শচীর ডাকে শচীর বাড়ি যাই। রাত প্রভাত বোধ হয় হয়ে এসেছিল। আমার ঘুম ভাঙল কার গলার মিষ্টি আওয়াজে। "বাপ গৌর গোবিন্দ, ও বাপ রাধা গোবিন্দ, উঠরে বাপ, দুঃখিনীর ধন ছলনা করলে চলবে কেন বাপ।" শচীর দুই ছেলে উঠল। কি করব ভাবছি, এমন সময় ঘরের মধ্যে পা টিপে টিপে শচী এল। একটু দরজা ফাঁক করে ঘরে আলো আসতে দিয়ে আমার কাছে বসল। ধড়মড়িয়ে উঠতে গেলে শচী ধরে শুইয়ে রাখল। বলল—না, তুমার উঠবার মত বেলা হয় নাই। ইজন্মে ত আর গরু চরাবে নাই। তুমি শোও। গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। তারপর প্রশ্ন ক'রে বসল—তুমার মাকে বলিহারী, এমন অল্প বয়সে একলা তুমায় ছাড়ে রইতে পারলেক? তারপর আপন মনে গাইতে লাগল—"অল্প বয়স, তুমার অল্প বয়স, এখন তুমার সন্ন্যাসের সময় লয়রে।" গানটি শেষ অবধি গাইতে বললাম। গৌরাঙ্গকে উপলক্ষ্য করে শচীমাতা এই কথা বলেছিলেন। ভাবলাম বাঁচা গেল। এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমার মার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল সেটা ভাল লাগে নাই। আবার দেশ বেড়াতে আসার, মায়ের ত কোন দোষ ছিল না। উঠে পড়লাম। প্রাতকৃত্যাদি শেষ করে চলে যেতে চাইলাম। শচী পথ আগলাল. কেন এমনভাবে হঠাৎ চলে যাবার কথা মনে হল? কি হল? সরলভাবে নিজ মনের কথা ব্যক্ত করলাম। শচী আমাকে কোলের উপর বসিয়ে আমার হাত দুটোকে জড় ক'রে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে রেখে বলল—"কার উপর রাগ কচ্ছ? কি রকমে জানলে আমি তুমার মা লই? যেথা কাড়বে রা সেথায় পাবে মা। মায়ে মায়ে কুন তফাৎ আছে? না কি এতটুকু সাড়েতিন হাত খাঁচায় আটকা থাকে? মায়ের প্রাণের কাছে শরীলটা বোতলের পারা। আলো ইপার কুড়ে ভিতার যাবেক; ক্ষেরে উপার কুড়ে বোতলের বহিরকে যাবেক। কে তাকে আটক করবেক?" অবাক হয়ে এই মহিমাময়ীর মধুমাখা মাতৃভাষা পিয়াসার মত গিলে খেতে লাগলাম। আবারও মনে হল—অপার মাতৃনামের শক্তি। কে শচী? কেই বা আমি তার? অথচ কেমন সহজ সে করে নিল তাদের সম্পর্ক। তারপর শচী বলল যদি আমি তার মত না নিয়ে, না বলে আজ চলে যাই তা হ'লে আমার মাতৃদ্রোহীতার পাতক হবে। সাহস থাকেত যাও; সে আর বাধা দেবে না। কথা কয়টি বলে সে তার হাত খুলে নিল। কিন্তু অভিভূত আমার সাধ্য হল না—তাকে ছেড়ে এক পা যাই। এবার আমার দৃঢ় প্রতীতি হ'ল—যত মা সব এক। মা কোনদিনই তিরোহিত হন না। সবার মায়ের ভেতর নিজের মাকে পাওয়া যায়। মরার জগতে একমাত্র মা-ই চিরজীবি। শচী ঠিক বলেছে—মা দেহ বিশেষে নিবদ্ধ নন। মা সর্বব্যাপী মহাপ্রাণ।

(ক্রমশঃ)

কলম্বসের নতুন অভিযান

অনুবাদক—শ্রীপতি চৌধুরী

"তীর দেখা যায়,"

সমুদ্রের তীর দেখা যায়।"

মাস্তুলের ওপর থেকে একজন নাবিক আনন্দে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে। কুষ্টোফার কলম্বসের বিপদসঙ্কুল দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার আজ পরিসমাপ্তি ঘটে। লম্বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রটী চোখের সামনে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কলম্বস দেখতে থাকে। দূরে সমুদ্রতীরের অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। তার সঙ্গীদের ডেকে বলে "দূরে মস্ত লম্বা একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চার্য পাহাড়ের গায়ে এত জানালা কেন? এমন পাহাড় আগে তো কখনও দেখিনি।"

তার সঙ্গীদের মধ্যে একজন ব'লে উঠলো—

"ঐ দ্বীপের দুজন লোক নৌকা ক'রে আমাদের জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে।"

পালক লাগানো টুপি ও চিলে জোব্বা পরা অভিযাত্রীর দল তাড়াতাড়ী নৌকোর সামনে এগিয়ে যায়। সবুজ রঙের অদ্ভুত পোষাক পরা দুজন লোক জাহাজে উঠে সসম্মানে কলম্বসের হাতে একখানা কাগজ দিল। গর্ব-মিশ্রিত সুরে কলম্বস বলেন—"আমি তোমাদের দেশ আবিষ্কার করেছি। স্পেনের মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ইসাবেলার নামে আমি ঘোষণা করছি যে আজ থেকে এ দ্বীপে আমাদের.....

তার কথায় বাধা দিয়ে একজন লোক ব'লে উঠল—

"থাক সে কথা, এই কাগজে যে সব প্রশ্ন লেখা আছে তার উত্তর আগে লিখে দিন। আপনার নাম, পদবী, আপনার ধর্ম, কেন আপনি এসেছেন, বিয়ে করেছেন কিনা, চোখের কোন অসুখ আছে কি না, আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করছেন কিনা সব পরিষ্কার করে লিখুন। আপনি নিরেট বোকা কিনা সেটাও কিন্তু লিখতে ভুলবেন না।

শেষের কথাগুলো শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে কলম্বস খাপ্ থেকে তলোয়ার খুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল এখন তলোয়ার বের করা নেহাৎ বোকামী হবে। কিছুটা শান্ত হয়ে তার সঙ্গীদের বলে—

"এ লোকগুলোকে চটানো ঠিক হবে না। সত্যি এরা শিশুর মতই সরল। অসভ্যদের অনেক বিচিত্র নিয়ম কানুন থাকে।"

ওদের মধ্যে আর একজন বলে—

"আপনার রিটার্ণ টিকিট আছে তো? শ পাঁচেক ডলার আপনার কাছে নিশ্চয় আছে।"

বিস্মিত হ'য়ে কলম্বস জবাব দেন—

"ডলার কাকে বলে?"

"ডলার কাকে বলে তা জানেন না অথচ নিরেট বোকা লিখতেই আপনার আপত্তি। কী করতে আপনি এখানে এসেছেন?"

"আমি আমেরিকা আবিষ্কার করতে এসেছি।"

"এজন্য আপনার পাবলিসিটি দরকার।"

"পাবলিসিটি? সেটা আবার কি? এর আগে তো এ নাম কখন শুনিনি।"

কলম্বসের মাথা থেকে পা পর্যন্ত লোকটী একবার ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর মৃদু হেসে বলে—

"পাবলিসিটি কি জিনিষ আপনি জানেন না?"

'না।"

"এ সত্বেও আপনি আমেরিকা আবিষ্কার করতে চান? সত্যি মিঃ কলম্বস আপনি নিরেট বোকা।"

ভ্রুকুটি ক'রে কলম্বস জবাব দিল—

"তা হলে আপনি বলতে চান যে আমি এ দ্বীপ আবিষ্কার করতে পারব না?"

কোন উত্তর না দিয়ে লোকদুটী নৌকা করে ফিরে যেতে থাকে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—

"কি বোকা! আজকাল পাব্লিসিটি না হলে কিছুই হয়না।"

তারপর কলম্বসের জাহাজ তীরে এসে লাগলো। বলবল নিয়ে সে এই অভিনব দ্বীপে পদার্পণ করে। শরৎকালের সোণালী রোদে সারা দ্বীপটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সমুদ্রের

ওপর দিয়ে "ঈগল" পাখীগুলি চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চোখে এই নূতন দ্বীপটী বড় ভালো লাগলো।

তার একহাতে সোনা ও রূপোর সুতোয় কাজ করা একটি প্রকাণ্ড স্পেনের জাতীয় পতাকা। অন্য হাতে কতগুলো—পুঁতির মালা, এগুলোর বদলে অসভ্যদের কাছথেকে কিছু সোনা ও হাতীর দাঁত নিয়ে সে প্রচুর লাভ করতে পারবে। কিন্তু অন্য দ্বীপের মত সে এখানে গাছপালা পাহাড় কিছুই দেখতে পেলনা। চারিদিকে শুধু পাথর কংক্রীট আর ইস্পাত।

বিচিত্র পোষাকে সজ্জিত নরনারীর দল, নোট বুক, পেন্সিল ও ক্যামেরা হাতে নিয়ে তার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে লাগলো। তার দলে একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। বেচারীর দেহের মধ্যে গলাটা একটু মোটা ও কানদুটো সামান্য বড়। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। কলম্বসের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

দুটী মেয়ে মুখে নানা রং মেখে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলাবলি করতে লাগলো—"ন্যাগ হাতে ঐ 'ফানি' লোকটী কে?"

"এটা বোধহয় স্পেনের কোন রেষ্টুরেন্টের এ্যাডভার-টিজমেণ্ট।" কৌতুহলী হয়ে তারাও মুষ্টিযোদ্ধার দিকে এগিয়ে গেল।

অনেক চেষ্টা করেও কলম্বস তার পতাকাটী—মাটিতে পুঁততে পারলো না। ভীষণ শক্ত মাটি। তলোয়ার দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে দেখতে লাগলো। হঠাৎ তলোয়ারটী ভেঙ্গে গেল কিন্তু মাটিতে সামান্য একটু গর্ত্তও করতে পারলো না। তখন নিরুপায় হয়ে বিরাট নিশানটী কাঁধে করে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো। 'ডিউটী' না দিতে পারায় তার পুঁতিগুলো আগেই 'কাষ্টমস্' অফিসে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

শত শত নরনারী সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত, কোন দিকে দৃক্‌পাত করার অবসর নেই কারও। কেউ কেউ অদ্ভুত একটা জিনিষে চড়ে মাটির নীচে চলে যাচ্ছে। একবারও তাদের মনে হচ্ছে না যে আজকেই তারা প্রথম আবিষ্কৃত হ'ল এবং তাদের আবিষ্কর্ত্তা তাদের সামনে দিয়েই হেটে চলেছে।

কলম্বসের মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সমুদ্রের এত বিপদ উপেক্ষা করে, নিজের জীবন বিপন্ন করে এত বড় একটী দ্বীপ আবিষ্কার করলুম অথচ আমার দিকে এরা কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।

অনেক চেষ্টার পর সে একজন ফিটফাট পোষাক পড়া লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেল। গর্বের সঙ্গে সে বল্ল—

"আমার নাম ক্রিষ্টোফার কলম্বস।"

"কী নাম বল্লেন?"

"ক্রিষ্টোফার কলম্বস।"

অসহিষ্ণু হয়ে লোকটী বল্লে—

"বানান্ করুন।"

কলম্বস চুরুটে টোক গিলে বানান্ করল। লোকটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বল্ল—

"নামটী যেন কোথায় শুনেছি। তা আপনি কিসের ব্যবসা করেন?"

"আমি এইমাত্র আমেরিকা আবিষ্কার করেছি।"

"সত্যি! কখন করলেন?"

"এই তো মিনিট পাঁচেক আগে।"

"বাঃ! বেশ মজার ব্যাপার তো। এখন আপনি কি করতে চান মিঃ কলম্বস?"

খুব বিনয়ের সঙ্গে কলম্বস বলে—

"আমি চাই সারা দেশের লোক আমার এই বিরাট আবিষ্কারের কথা জানুক।"

"আপনাকে অভ্যর্থনার জন্য 'ডেকে' কেউ গিয়েছিল?"

"একটী প্রাণীও না। এ দ্বীপের লোকগুলি আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না।"

"দেখুন আপনি একটা ভুল করেছেন। প্রথমে আপনার 'কেব্‌ল' করা উচিত ছিল। নূতন কোন দেশ আবিষ্কার করতে হলে প্রথমে টেলিগ্রাম করতে হবে তারপর কতগুলো চমকপ্রদ গল্প রচনা করে পত্রিকার রিপোর্টারদের দিতে হবে অবশ্য সেই সঙ্গে শ' খানেক

ফটোগ্রাফ্ও দেওয়া চাই। পাবলিসিটি না হলে আজকাল কোন কাজই হয় না—।"

"আবার পাবলিসিটি! আচ্ছা পাবলিসিটি জিনিষটা কি বলুন তো? এটা ধর্মের কোন অনুষ্ঠান নাকি?"

লোকটি কৃপার দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে—"আপনি দেখছি নেহাৎ ছেলেমানুষ। পাবলিসিটি মানেই পাবলিসিটি। আচ্ছা দেখি আপনার জন্য কিছু করতে পারি কিনা।"

লোকটী তখন তাকে একটী হোটেলে নিয়ে গিয়ে আধী ডলার একটি ঘর ঠিক করে দিল। কলম্বসকে একলা ঘরে রেখে সে চলে যেতে উদ্যত হয়। যাবার সময় বলে গেল—"দেখি, আপনাকে একটু পাবলিসিটি দিতে পারি কিনা।"

আধঘণ্টা বাদে আবার দুজন লোক তার ঘরে এল। ওদের মধ্যে একজন সব সময় কি যেন চিবুচ্ছে। আর একজন কলম্বসের সামনে ট্রাইপড্ যুক্ত একটী ক্যামেরা নিয়ে এসে বলে—"একবার হাসুন তো। না, মুচ্‌কী হাসলে চলবেনা। আমার মত জোরে হাসুন, লোকটী হোঃ হোঃ করে হেসে বলে—ঠিক এই ভাবে হাসুন।" অগত্যা কলম্বসকে বাধ্য হয়ে হাসতে হলো। হঠাৎ এক ঝলক আলো তার মুখের ওপর এসে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ক্লিক' করে একটা শব্দ শোনা যায়।

"থ্যাঙ্কস্" বলে লোকটী তার ক্যামেরা সরিয়ে নিয়ে যায়। অন্য লোকটী আপন মনে তখনো চিবিয়েই চলেছে। তারপর পেন্সিল ও নোটবুক বের করে কলম্বসের পাশে এসে তাকে জিজ্ঞেস করে—"আপনার নাম কি?"

"কলম্বস।"

"বানান্ করুন। সি, ও, এল, ইউ, এম্, বি, ইউ এস্ এই তো? বেশ নাম ভুল করলেই ঘুষিয়ে। কতক্ষণ আগে আপনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন মিঃ কোলম্যান? আজকে? বেশ। আচ্ছা আপনার আমেরিকা কেমন লাগছে?"

"জায়গাটা বেশ উর্বর বলেই মনে হয়। সবটা তো এখনও ভালো করে দেখিনি।

লোকটি গম্ভীর হয়ে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—

"মিঃ কোলম্যান, আমেরিকার এমন চারটে জিনিষের নাম করুন যা আপনার খুব ভাল লাগে!"

"দেখুন এটা বলা খুব শক্ত।"

লোকটী আবার চিন্তা করতে লাগলো। অনেক চিত্রতারকা ও মুষ্টিযোদ্ধার সাথে তার 'ইন্টারভিউ' হয়েছে কিন্তু এই লোকটীর সঙ্গে আলাপ করে সে যেন হাপিয়ে উঠেছে। শেষটায় সে আবার জিজ্ঞেস করলো—

"এমন চুটো জিনিসের নাম করুন যা আপনার ভাল লাগেনা।"

এমন বিপদে কলম্বস বোধহয় আর কখনও পড়েনি। ভ্রূকুঞ্চকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল—

"পাবলিসিটি আমি পছন্দ করিনা।"

"আপনি পাগল নাকি? পাবলিসিটি না হলে চলেই না আজকাল। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি যে আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন সেটা তেমন কিছু নয়, আমেরিকা আপনাকে যে আবিষ্কার করেছে সেইটেই হল আসল কথা।"

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ্ থেকে সে বলে—

"আমেরিকান মেয়েদের কেমন লাগে আপনার?"

কিন্তু তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে কাগজে খস্ খস্ করে লিখতে সুরু করে দিল। মাঝে মাঝে মুখ থেকে জলন্ত সিগারেটটি নিয়ে কানের পাশে গুজে রাখে, আবার পেন্সীলটা কামড়াতে কামড়াতে সিলিংএর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে। তারপর লেখা শেষ করে "ওকে" বলে তার লেস্ লাগানো ভেলভেটের জামার ওপর হাত রাখে, তারপর বলে—

"চলুন সহরটা একবার দেখে আসবেন। এডওয়ের দিকে যাওয়া যাক্ কিন্তু আপনার নিশানটী এখানে রেখে যেতে হবে। ওটা বোধ হয় বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।"

লোকদুটো তখন তাকে "বার্লেস্ক" শোতে নিয়ে গেল কিন্তু এই ভিড় ও হৈ চৈ এর মাঝে কলম্বসের অবস্থা ঠিক 'হংস মধ্যে বক যথা'র মতই হলো। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত আর সে সহ্য করতে পারলো না। ভিড় ঠেলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে ভগবানের নাম জপ করতে করতে রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলো। যখন সে হোটেলে এল তখন রীতিমত ঘামছে। পরিশ্রান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে সে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই টেবিলে খবরের কাগজ দেখতে পেল। পাতা ওলটাতে ওলটাতে একস্থ পৃষ্ঠায় তার নিজের ছবি দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল ছবিতে সে দাঁত বের করে হাসছে। কাগজে তার সম্বন্ধে লেখা হয়েছে সে নাকি আমেরিকান মেয়েদের একান্ত ভক্ত, তারমতে এরাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতা ও রুচিসম্পন্না; এবং সে নাকি শীঘ্রই হার্বার্ড য়ুনিভারসিটিতে জিওগ্রাফি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে।

কিন্তু তার কাছে এই সমস্ত ব্যাপার বড় গোলমেলে মনে হতে লাগলো। কাল রাতের লোকদুটীর কাছে এসব কথা তো কখনো বলেনি। এখন আরও দুজন অচেনা লোক তার ঘরে এল। কোন বাক্যব্যয় না করেই তারা তাদের কাজ আরম্ভ করে দিল। পাবলিসিটির কাজ বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়েছে। লোকদুটীর কাছে সে হলিউড যাবার আমন্ত্রণ পেল। একজন তাকে বলল—

"দেখুন মিঃ কলম্বস আমাদের নূতন ঐতিহাসিক ছবি আমেরিগো ভেসপুসি'তে আপনাকে নায়কের ভূমিকায় নাবাতে চাই। ছবির কথার ড্রাফ্‌টের কথাগুলো বুঝে নেবেন বুঝেছেন? বোঝেন নি? তাহলে দেখছি আপনাকে গোড়া থেকে সমস্ত বলতে হবে, আমাদের 'সিনারিও' লেখা শেষ হয়েছে। গল্পটা নেওয়া হয়েছে—"

"আলেক্‌জাণ্ডার-ডুমার, 'কাউণ্ট অব্ মন্টিক্রষ্টো' বইখানা থেকে। আপনার—আমেরিকা আবিষ্কারের কাহিনী আমরা নূতন ভাবে দেখাতে চেষ্টা করবো।"

কোন উত্তর দেওয়ার মত অবস্থা কলম্বসের তখন নেই। বিস্মিত নয়নে সে শুধু এদের হাবভাব দেখছে। কিন্তু লোকটি আবার বলতে আরম্ভ করলো:—

"তা হলে মিঃ কলম্বস, আপনি নায়ক আমেরিগো ভেসপুসির ভূমিকায় নাবছেন। স্পেনের রাণী এই ভেসপুসির প্রেমে পড়বে। কিন্তু ভেসপুসি তাকে চোখে দেখতে পারে না। সে আবার রাশিয়ার রাজকুমারী গ্রিসকাকে ভালবাসে। শেষটায় কার্ডিনাল বিসলু বেশ মোটাহাতে ভাস্কো-ডি-গামাকে ঘুষ দেয় এবং লেডী হ্যামিলটনের সঙ্গে পরামর্শ করে আপনাকে অর্থাৎ ভেসপুসিকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেয়। সমুদ্রে জলদস্যুরা তাকে আক্রমণ করে, সিংহবিক্রমে সে তাদের সঙ্গে লড়াই করে। শুধু এইটুকুর জন্য তিনশ ডিটার ডিস্ক খরচ করবো। আপনি বোধহয় অভিনয় করতে জানেন না। যাক্ সেটা খুব প্রয়োজনের নয়।

কলম্বস বেশ একটু রেগেই জিজ্ঞেস করলো—

"তবে প্রয়োজনীয় কোন্‌টা জানতে পারি কি?"

"পাবলিসিটি। অনেকে আপনার নাম এখন জেনেছে। আপনার মত একজন শিক্ষিত লোক যে জলদস্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এটাই তো মজার ব্যাপার। শুধু এটুকু দেখতেই কত লোক আসবে। আপনার আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়েও এ দৃশ্যটা বেশী চমকপ্রদ হবে। যুদ্ধের দৃশ্যটা যতদূর বাস্তব হয় সেজন্য আমরা চেষ্টা করবো। কিছু কুঠার, তলোয়ার, বল্লম এইসব দেখাতে হবে। এ সবই আমাদের আছে। হাঁ—ভালোকথা, আপনার দাড়িগোঁফ সব কামিয়ে ফেলতে হবে। রাশিয়ান ছবিতে দাড়ি দেখতে দেখতে দর্শকরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছে। তাহলে চট্‌পট্ দাড়ি গোঁফ কামিয়ে ফেলে ছয়মাসের জন্য এই কনট্রাক্টে সই করে দিন।"

কলম্বস তখন প্রায় অর্দ্ধমৃত। তবুও ক্ষীণকণ্ঠে বলে—

"ও'কে।"

রাত্রি গভীর হলে সহরের গোলমাল কিছুটা শান্ত হয়। তখন সে স্পেনের রাণীর নিকট এই পত্রখানা লিখলো—

স্পেনের মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী

রাণী ইসাবেলা সমীপেষু

নিবেদন এই যে আমি বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি কিন্তু আমেরিকার মত এমন বিচিত্র দেশ ইতিপূর্বে আর দেখি নাই। ইহারা নীরবতা মোটেই সহ্য করিতে পারে

না এবং অনাবশ্যক গণ্ডগোলের জন্য নানা প্রকার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছে। লোহার স্তম্ভের ওপর এই রাস্তাগুলি স্থাপিত হইয়াছে। এবং এক ধরণের অদ্ভুত শকট এই রাস্তা দিয়া চলাফেরা করে।

এখনও জানিতে পারি নাই ইহারা নরখাদক কি না, তবে ইহারা কুকুরের গরম গরম মাংস খাইতে খুব ভালবাসে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি ভোজনাগারে ইহারা কুকুরের মাংসের নানারূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। এখানকার প্রত্যেক লোকের গায়ে একটা অস্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধদ্রব্যটার নাম "গ্যাসেলিন," প্রায় প্রত্যেক রাস্তাতেই এই গন্ধ পাওয়া যায়।

এ স্থানের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে ইহারা পৌত্তলিক, নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। আগুনের মত উজ্জ্বল একটী জিনিষ দিয়া দেবদেবীর নাম তাহাদের কুটীরের সামনে লিখিয়া রাখে। দেবী কোকোকোলা, ভগবান ড্রাগিষ্ট সোডা, দেবী কাকেটেরিয়া, ইহাদের দেব দেবীর নাম। সর্বাপেক্ষা পূজ্য দেবতার নাম হইল ভগবান গ্যাসেলিন এবং ভগবান ফোর্ড। এই দুই দেবতাই বোধ হয় তাহাদের "জিউস।"

ইহারা অত্যন্ত ভোজন বিলাসী এবং সর্বক্ষণই কি যেন চিবাইতে থাকে দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহারা এখনও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নাই। আমাদের স্পেনীয় সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করিলে ইহারা এখনও বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। স্পেনের কর্মঠ অধিবাসীদের তুলনায় ইহারা অত্যন্ত অলস। সাধারণতঃ ইহারা পায়ে হাটিতে চায় না। এইজন্য 'অটোমোবাইল' নামে এক অদ্ভুত শকট আবিষ্কার করিয়াছে, ইহার দ্বারা বিদ্যুত গতিতে চলা যায়।

এখানকার ব্রডওয়ে নামক অঞ্চলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় এক বিচিত্র অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। 'বার্লেস্ক' নামক একটী প্রকাণ্ড ঘরে বহুলোক একত্রিত হয়। একটা মঞ্চের উপর এই দেশীয় কয়েকটী স্ত্রীলোক টমটম্ এবং জ্যাজকোন নামক বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে আরম্ভ করে এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে থাকে। সমস্ত দর্শকগণ তখন আনন্দে শিশুর মত করতালি দিয়া উঠে। যখন স্ত্রীলোকেরা প্রায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া যায় তখন দর্শকদের প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের উপর একটী আবরণ পড়িয়া যায়। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে দর্শকবৃন্দ নিজেদের কুটীরে ফিরিয়া যায়।

আমি এখনও ভ্রমণ করিব এবং নানা তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া শীঘ্রই আপনার নিকট পেশ করিব। এখানে আমার কোনপ্রকার জীবনাশঙ্কা নাই। এই দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত সরল এবং অতিথি পরায়ণ। ইতি—

ক্রিষ্টোফার কলম্বাস *

* Ilya Ilf and Engene Petrove এঁদের "Columbus Reaches Port" গল্পের অনুবাদ।

সাহিত্যে সামাজিকতা

[প্রবন্ধ]

শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্মকার

শিল্পী কতকগুলি নিছক কল্পনা থেকে সৃষ্টি করেন তাঁদের সৃষ্টি প্রকাশ করেন পাঠকের বোধগম্য শিল্পীর রচনা তখনই প্রকৃত সাহিত্যে পরিণত হয়, যখন তিনি নিজের অনুভূতির দ্বারা অপরের চেতনা শক্তিকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে পারেন। আবার যাকিছু তাই সবই সাহিত্য নয়। সাহিত্য অর্থে "সাহিত্য-কলা" বিশেষ যুগে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ কালে, বিশেষ সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কেননা মানুষের ভাবধারা, চিন্তাধারা, সুখ-দুঃখ, রুচি-ব্যথা ও আনন্দের অনুভূতির কোন স্থিতি নেই। এগুলি স্থান, কাল, পাত্র অনুযায়ী পরিবর্তনশীল সমাজে ব্যবস্থার পরিবর্তনের সংগে সংগে আমাদের অনুভূতি আর প্রকাশ ভংগীও পাল্টে যায়। তাই সাহিত্য-কলা হ'ল—"সামথিং সোস্যাল নট্ ইনডিভিডুয়াল" সমাজ গত মানব জীবনের নিরন্তর পরিবর্তনই হচ্ছে—"সোস্যাল-ল।"

এখন আমাদের দেখতে হবে কিভাবে মানুষের প্রবৃত্তিগুলি কাজ করে এবং সাম্প্রদায়িকভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে বা ভবিষ্যতেও হবে। জীবন সংগ্রামে ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র ও বাহুল্য থেকে যা' আমাদের মনের অবচেতন স্তরে স্থান পেয়েছে, অথচ সচেতনার দিবালোকে সুস্পষ্ট নয়, কোন ইংগিতে সেই অনুভূতির পরিবর্তনশীলতা বিচারের জন্য এ আলোচনার দরকার আছে।

প্রথমে আমরা আরম্ভ করতে পারি নৃত্য বা সংগীতের জন্মক্ষেত্রের দিকে। দেখব যে যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে তারাও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, নৃত্যে ক্রমশই এসে ছন্দ-বদ্ধ অংগ-ভংগী। আদিম যুগের মানুষের জীবন ছিল সরল ও সাবলীল। মানুষ তখন সমষ্টিগত জীবন যাপন করত। ব্যক্তিত্ববাদ তখনও তাদের দেহের পরমাণুতে প্রবেশ করেনি। তাই নৃত্যও ছিল তাদের সমষ্টিগত জীবন যাত্রার প্রতিচ্ছবি মাত্র। কিন্তু সমাজগত পরিবর্তনের সংগে এই ছন্দই বর্তমানে অশরীরী আকার নিয়েছে—"সংস্কার-করণ"—সংগীতেরও প্রথম উৎপত্তি কতকগুলি শব্দ সংযোজন থেকে, কিন্তু আজকালের গতির সংগে ও সমাজের গতির সংগে যোগ রাখবার ফলে ঐ শব্দগুলিই হয়েছে বর্তমান জটিল সংগীত বিদ্যা বা মার্গ সংগীত।" সাহিত্য সম্বন্ধেও ওই একই প্রযোজ্য। আদি মানুষের স্বল্পতম শব্দ সমষ্টি থেকে বর্তমান ভাষার উৎপত্তি।

কালের গতির সংগে সমাজের পরিবর্তনে মানুষের সংগ্রাম নতুন নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। আমাদের অবচেতন মনকে তা' বিচিত্র রূপেই স্পন্দিত করছে। প্রাচীন সাহিত্যেও সমষ্টিগত সরল জীবনের আত্মপ্রকাশ মাত্র। স্বল্পতম শব্দসমষ্টিই ছিল তা'দের সকল অনুভূতির প্রতীক, আর তাই তাদের ছিল ভাষণ। এখন আমরা সাহিত্য বলতে আমাদের নানা প্রকার অনুভূতির প্রকাশ মাত্রকেই বুঝি। ভাষা বাহন মাত্র। তাহা এখন শুধু আমাদের চেতনার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবন যাত্রার ধারায় এখন হয়েছে অগণিত পরিবর্তন আর যোগ-বিয়োগ। আদিম যুগের চেতনার সহজ প্রকাশ আজো আমরা আদিমতম বংশগুলির ভেতর সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। কিন্তু দুই বছরের পরিবর্তনের ফলে আমাদের জীবন যাত্রা ও সূক্ষ্ম ভাবের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আর দেখি না। এখন আমরা ভাবকে অতীতের ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দিয়েছি। আর ভুলে গেছি ভাবের সংগে ভাষার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সমাজের জটিলতার ক্রমবৃদ্ধিতে আদিম যুগের স্বল্পতম শব্দগুলি পাখা ছড়িয়ে বিস্তার লাভ করেছে। নানা রঙে প্রতিফলিত হয়ে শব্দগুলির অনেক অর্থগত পরিবর্তন ও অস্পষ্টতা এসেছে। জটিলভাষা তার অস্পষ্ট কুয়াসার আভাস নিয়ে দেখা দিয়েছে। সমাজগত পরিবর্তনের সংগে সাহিত্যের ধারা বদলে গেছে। মাটির সংগে যাদের ছিল প্রত্যক্ষ যোগ, যারা প্রকৃতির আলো-হাওয়ার গন্ধের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল—তাদের সাহিত্যে বাস্তবতার ছাপই বেশী করে ফুটে উঠত। যারা মাটির বুকে শস্য সম্পদ সৃষ্টি করত, তাদের লাঙল টানার সংগে সংগে তারা সৃষ্টি করেছে গান।

যে ছেলের দল, ঝড়ে, জলে, আলো আর আঁধারে নৌকায় পাড়ি দিত, তারাই প্রকৃতির বহু রূপের সম্মুখীন হয়ে বহুরূপী কথিকা সৃষ্টি করেছে। এ ভাবেই গ্রামের মেয়েরা ভাটিয়ালী গান তৈরী করেছে। গ্রামের অভ্যন্তরে পুরুষের পর পুরুষের যে জীবন চলে এসেছে সেইখানকার সেই সুখ-দুঃখ ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ ছড়া আর কথিকা। এতে মাটির গন্ধ আর মানুষের বয়ে যাওয়া জীবনের সরল কাহিনীটি পাওয়া যায়।

এমনি করেই গড়ে উঠেছে সব দেশের সাহিত্য। যে সময়ে, যে দেশে, যে সভ্যতার আলো পেয়েছে, তখনকার যুগের সংগে সামঞ্জস্য রেখেই সেই দেশের সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ সেই কালের রূপই প্রকাশ পেয়েছে তখনকার সাহিত্যে।

মধ্য যুগে ইউরোপেও সমাজ, ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা গেল। মাটির সংগে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনেকের হয়ে গেল শেষ। ব্যারণদের বাসস্থানে এ শিল্প তৈরী হতে লাগল। কিন্তু রইল না স্বার্থ। অলস জীবন যাত্রার সংগে শৌর্য মনোবৃত্তির আবির্ভাব হল। তাই মধ্যকালীন ঐতিহাসী বলতে আমরা বীরত্ব শক্তির প্রকাশই বুঝে থাকি। ধর্ম প্রচারের সংগে সংগে গীর্জার প্রাধান্য হল। তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আর মানুষের কর্মধারা এই গীর্জারই অধীন ছিল। সমাজগত জীবন ছিল ধর্ম প্রেরণার উচ্ছ্বসিত প্রতিচ্ছবি। তাই সেকালের কাব্য-কলা বা সাহিত্যে আমরা উপাসনা সংগীতের প্রাধান্যই লক্ষ্য করে থাকি। তার পর এল এক বিরাট পরিবর্তনের যুগ। ধর্মজগতে বিপ্লব সুরু হল। কারণ শ্রম শিল্পের বিপ্লবের পর ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। তখন তারা খ্রীষ্টের রাজ্যের আধিপত্য মেনে নিতে চাইলেন না। মার্টিন লুথার এবং অন্য অনেকে পোপের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার আন্দোলন আরম্ভ করলেন। "সেপারেশান অব পোলিটিক্স ফ্রম রিলিজিয়ন।" নবযুগের সূচনায় প্রথম শিল্পীর জন্ম হয়। গ্রীক বা রোম সভ্যতার মোহ কাটিয়ে লোক সমাজের পরিবর্তনে মন দিল। যন্ত্র যুগেরও আবির্ভাব হল। দেশে নানা রকম অর্থনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিতে লাগল। সাহিত্যেও লাগল তার ঢেউ। ফিউডাল যুগের ধীর মন্থর গতিতে এল ভাঙন। দেশে দেশে যুদ্ধ বেধে যেতে লাগল। ধনিক যুগে নিয়ে এল বিস্তার অবগতি। সবই যেন সুগম ও সহজ হয়ে গেল। সাহিত্যেও এল নতুনের সমাবেশ, কল্পনার প্রাচুর্য। সুদূর প্রসারী নীহারিকা তার লক্ষ্য। যন্ত্র যুগের সংগে সমাজ ধনিকবাদের করায়ত্ত হল। বেশী সংখ্যক মানুষ দারিদ্রের নিষ্পেষণে বক্ষের বেদীমূলে নিজের সতেজ রক্তকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই সাহিত্যেও দেখতে পাচ্ছি বেঁচে থাকার করুন আবেদন। অর্থাৎ—"সেসিমিষ্টিক আউট লুক।" সত্যকার সাহিত্য তো সমাজেরই প্রতিচ্ছবি!

গলস্ওয়ার্দির "জাষ্টিস" বইখানা ইংলণ্ডের কারা বিধির সংস্কারের অনুপ্রেরণা এনে দিয়েছিল। রাশার-সমাজই গোর্কি, "ডষ্টয় ভস্কির" রচনার বিষয়। বাঙলা সাহিত্যের ধারা দেখলেও এই কথার সত্যতা প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করেই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথমেই বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কথা মনে পড়ে—শরৎচন্দ্র ও তাঁর অতি আধুনিক উপন্যাস বিপ্রদাস। শরৎচন্দ্রের মতে ধনিক সভ্যতাই সব দুঃখের কারণ, কাজেই যন্ত্র ছেড়ে মাটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেই দুঃখের অবসান হবে। তাই পাশ করা, ধনীর দুলালী, বিলেত ফেরৎ ছেলের বাগদত্তা বন্ধনাকে দিয়ে তিনি বলালেন—"চাইনে আমি সভ্যতা, চাইনে আমি সমাজ, গ্রামের সেই শিবিড় নিরালায় যেখানে রয়েছে প্রাণের স্পন্দন, দোল দুর্গোৎসব, চণ্ডীমণ্ডপ, গো-পালন আমি সেই খানে ফিরে যেতে চাই, আর তাতেই ফিরে পাব সত্যিকারের শান্তি।" গল্পের পরিনতি দাঁড়াল এই! প্রাচীন-পন্থী বিজদাসের সংগে অতি আধুনিকা বন্ধনার মিলন করিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র বর্তমান ধ্বংসমূলক সমাজের বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কথাটিকে একটু পরিষ্কার সাহেবী ভাষায় রূপ দিলে এই কথাই মনে জাগে "লেট আস্ বিগিন ফ্রম স্ক্র্যা ভেরী বিগিনিং।"

পল্লীসমাজ, পরিণীতা, শ্রীকান্ত ও চরিত্র হীন বইগুলি পড়লেও দেখতে পাই বর্তমান সমাজবিধির প্রতি লেখকের বিরাট অভিযোগ। মধ্যবিত্ত ঘরের সুখ দুঃখের কথা নিয়েই তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন; এজন্য অনেকে তাঁকে আদর্শবাদী বলেন, কিন্তু বিশ্বমানবের দৃষ্টিতে তিনি একজন সাংস্কারিক। তারপর রবীন্দ্রনাথের অতি স্বাভাবিক এবং অত্যাধুনিক উপন্যাস 'শেষের কবিতা' পড়ে বুঝতে পারি, অমিয় রায়ের জীবন কাহিনী। অক্সফোর্ডের এক রঙ-ধরা ছেলে, মিঃ রায়। নির্জলা যৌবনের জোরে ছুটে চলেছে, অনেক সোণার মুহূর্ত তার মনে পড়েছে, কিন্তু কিছুতেই কূল পায় নি। একদিন শিলং পাহাড়ে তার লাবণ্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। কিন্তু আদর্শবাদী অমিয় আর বাস্তববাদী লাবণ্যের মিলন হলনা। "আপার—সেলফ" আর "লোয়ার সেলফ" এ লাগল বিরোধ। এঁরা প্লেটোনিক, পাওয়ারই মহিমা কীর্তন করলেন। মনের মিলনকেই বাস্তব মিলের চেয়ে কবি বড় করে দেখালেন। না পাওয়াই হল সব চেয়ে বড় পাওয়া। যুগ ধর্মকে তিনি সম্মান করেছেন। যে সমাজে দুঃখময় মত রয়েছে, সাহিত্যেও তার মতাবলম্বী দৃষ্টি-ভঙ্গীও দেখা পায়। অভিজাত শ্রেণীর দার্শনিক কবি তাঁর লেখাতে দেশ কালের ছাপ এড়াতে পারেন নি। তাঁর নাটক "রক্ত করবীতে"ও তিনি দেখিয়েছেন যে, বর্তমান সভ্যতা, ক্ষুধা ভৃষ্ণা, দ্বেষ ও হিংসায় পরিপূর্ণ। "ইভিল ইজ ইন দ্যা মেসিন।" তাই যক্ষপুরের শ্রমিকদের ডেকে বলেছেন, "পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ক্ষেতে, ফিরে যা, তবেই মুক্তি।" মাটির সঙ্গে আবার সংযোগের যাওয়াই বাতলে দিচ্ছেন "মুক্তি-ধারা" নাটকেও কবি জগতের যন্ত্রিকদের দিয়ে যন্ত্রের ধ্বংস করিয়ে প্রকৃতিকে দিতে চান মুক্তি।—তবেই সুপ্ত শান্তি ফিরে আসবে। এখানেও সেই একই ধ্বনি বাজে, "বিগিন ব্রুথ দ্যা ভেরী বিগিনিং।"

বাস্তবতার রুদ্র রূপ কবিকে শংকিত করে তুলেছে। তাই তিনি আশ্রয় খুঁজছেন ঈশ্বর-দর্শন-বাদী ধর্মমতে। বর্তমান সমাজে এসেছে প্রগতির বন্যা। আধুনিক সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের কারো কারো লেখাতে অবশ্য স্বতন্ত্র-সত্তা-বাদ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। যুগ ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ভাব ধারা ও জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টি ভঙ্গীমার অনুসরণ করে।

তাই বলি, এ বাস্তববাদের যুগে আকাশ বিহারী কল্পনার আর স্থান নেই, নিছক কাল্পনিক, বিশৃঙ্খল-ধ্যান স্বপ্ন আর মায়াবাদের যুগ চলে গেছে। এ যুগে রামায়ণ বা মহাভারতের আদর্শ সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে না। যেখানে জনসাধারণ দুঃখের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সাহিত্যেও তাদের চলার সুর পাকা চাই বইকি!

যখন দেশের চতুর্দিকে অজ্ঞানতা দারিদ্র মহামারী বর্তমান, সেখানে কাল্পনাকে নীহারিকার থেকে টেনে এনে বাস্তবের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যা' কিছু দেখেছি আর যা'কিছু পেয়েছি তাকে শাশ্বত সনাতনের ইংগিত বলে চরিতার্থতা লাভ করলে আর চলবেনা।—

প্রথম আন্তর্জাতিক নারী-শারীর শিক্ষা কংগ্রেস

কোপেন হেগেন ডেনমার্ক

জুলাই—১৯৪৯

গত ১৮ই জুলাই ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর শিক্ষা কংগ্রেসের ছয় দিবস ব্যাপী অধিবেশনে পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচজন মহিলা কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য জানাইয়া বাণীদান করেন। ভারতবর্ষের শ্রীমতী লীলা রায় এশিয়ার পক্ষ হইতে এই বাণী দান করিতে গিয়া বলেন—

"কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ এবং গান্ধীর স্মৃতিধন্যা এশিয়ার কন্যা আমি। "শান্তির অন্ত শক্তি সাধনাই এশিয়ার বাণী। তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর নিদ্রিত জাতি সমূহ এশিয়ার প্রজ্ঞাপবন উদ্ভূত 'সত্যম শিবম সুন্দরম' বাণীতেই জাগ্রত ও আলোকিত হইয়াছিল। এশিয়ার নারী যুগ-যুগান্ত ধরিয়া শত দুঃখ দুর্যোগে সহস্র ঝড় ঝঞ্ঝায় জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয়নি, আজও না।"

যুক্ত রাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীমতী লীলারায় এই কংগ্রেসে তাহা পাঠ করেন—

"আমি কুমারী লীলারায়ের নিকট হইতে নারীদের শারীর শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ভারত এই কংগ্রেসে যোগদান করাতে সুখী হইয়াছি।

আমরা মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছি যাহাতে তাহারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। আমি এই কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিতেছি।"

—পরিচিতি—

শ্রীমতী লীলারায়, বি,এ, বি,টি, বাঙলা সরকারের অধুনা লুপ্ত 'কলেজ অব ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন' হইতে শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা লইয়া কলিকাতা উইমেন কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের ব্যায়াম শিক্ষিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বাঙলা সরকারের পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত হইয়া, তিনি শারীর শিক্ষার

শ্রীমতী লীলা রায়

বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন এবং প্রথমে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তদনন্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া বর্তমান ১৯৫৮ সালে ইউটা হইতে অনার্স সহ এম এস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের শারীর শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি কোপেন হেগেনে আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়া য়ুরোপের শারীর শিক্ষা কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শনে রত আছেন। হলিউড রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষস্বামী প্রভবানন্দের স্নেহলাভ করিয়া শ্রীমতী লীলা এলডুস হাক্সলীর মত বিশ্ববিখ্যাত মনীষিদের সংস্রবে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন এবং উক্ত আশ্রমে অনুষ্ঠিত আমরিকার সর্ব প্রথম সর্বজনীন কালীপূজায় অংশ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিত নাট্যকার মন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা সহোদরা।

প্রাবৃট

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

প্রাবৃট, তোমার ঘন কলেবর খানি
নৃত্যচপল শিঞ্জিত ঘন্টীরে,
বহু বরষের বহু পুরাতন বাণী
আমার চিত্তে জাগাইছে ধীরে ধীরে।

বায়ু হিল্লোলে কম্পিত পল্লব,
তৃণ দল ছবি কম্পনে ঘন্নড.
আনে অন্তরে কিবে ক্রন্দন
ব্যথিত মুগ্ধ হৃত-জীবনের তীরে।

কোন সে সুদূর কালের চলার পথে
কাহার নয়ন মুগ্ধ করিল মোরে,
ক্ষণকাল তরে অভিনব কোন স্রোতে
ভাসিলাম তার নন্দিত বাহু ডোরে।

তারপরে আর এ-সারা জীবন ভরি
কত পথে, হায়, আনা গোনা সে যে করি।
আমারে ছলিয়া গেল সে চলিয়া,
আমি মরিতেছি মম-মত্ততা ঘোরে।

বর্ষা, তোমার নভপ্রাঙ্গণ পরে
উল্লাস ভরে পথহারা মেঘ ছুটে।
তাহার নৃত্য নিত্যকালের তরে
যত বন্ধন আনন্দে ফেলে টুটে।
মনে করি, হায়, এই চঞ্চল ছবি
জানিত সে যদি বাঁধন খোলার বিধি,
পারিত হরিতে অলকাধামের
রাজলক্ষ্মীর চরণেতে মাথাকুটে।

কৃষ্ণ মেঘের দীন বক্ষ মাঝে
বিদ্যুৎ শিখা চপল অগ্নি হানে,
মোর বক্ষের ক্রন্দনখানি বাজে,
বলে উদ্দেশে কী জানে কাহার কানে।
তাইত তাহারে ভালবাসিয়াছি আমি,
চিরকাল ওবে অলকার পথগামী,
ওবে চির-চর রাজলক্ষ্মীর
তাহার আবাস আমার কামনা জানে।

হে মোর বর্ষা, ঘন বর্ষণ তব
আমার চিত্তে ধীরে ধীরে দেয় দোলা।
তাইত তোমার এই অপরূপ নব
কলেবর খানি দেখি আমি পথ ভোলা।
ওগো জলধর মিনতি আমার শোন
মোর প্রেয়সীরে সঙ্কোচ নাহি কোন,
মোর ছবি নিয়ে তুমি চলি যাও
তোমার লাগিয়া অলকার দ্বার খোলা।

"আমাদের শিশু-সাহিত্য"

শ্রীসুনীল গুহ।

মানুষের জিজ্ঞাসু মন যেদিন 'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্'—এর বিশ্লেষণ ক'রতে পেরেছিল, সেদিনই বোধ হয় মানবসভ্যতা প্রকৃতরূপ পেয়েছিল আমাদের চিন্তায় ও সাধনায়। মানুষ সেদিন বুঝেছিল যে বাস্তব জগতের নির্মম কঠোরতার বাইরেও একটা দিক আছে—সেটা সুন্দরের দিক; তার মনের উপর সৌন্দর্যের ক্রিয়া রূপ পেল ভাষায়—এবং পরিণামে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে।

স্ফুটোন্মুখ কৈশোরের অনাবিল আগ্রহভরা মনের মতই মানুষের শিশুসুলভ চপলতা তাঁকে কল্পনা-প্রবণ করে তোলে আর তখনই সে বুঝতে শেখে নানা তত্ত্ব এবং তথ্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাবধারাকে। শিশুরা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ; তারা কল্পনায় রং লাগিয়ে রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়—এতেই তাদের আনন্দ; বয়স যত বাড়তে থাকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার আবহাওয়া ততই এদের নিষ্পাপ মনকে দেয় বিষিয়ে।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সুন্দরের দান যে কতখানি তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি মানুষের জীবন সাধনার দিকে চেয়ে। প্রত্যেক মানুষই চায় তার জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গ'ড়ে তুলতে—এবং এর জন্য যা প্রয়োজন সে তার সাধনা ক'রে; জীবন ও সাহিত্য অবিচ্ছেদ্যসূত্রে জড়িত। মানব সভ্যতার এই পটভূমিকায় শিশু সাহিত্য এক মহামূল্যবান সম্পদ।

এখানে শিশু সাহিত্য বলতে আমি দশ আনা মূল্যের রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা বলছি না। যে সাহিত্য শিশুর কাঁচামনে বাইরের সৌন্দর্যের অনুভূতি এনে দেয় যা তার কল্পনাকে সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করে তাই শিশুসাহিত্য।

আমাদের দেশে যে নির্জীব শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন আছে তাদ্বারা শিশুর ভবিষ্যতকে গঠন করা যায় না বরং সে শিক্ষা শিশুর মানসিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। শিশুমনের বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে অদম্য কৌতূহল; এদের এই অদম্য কৌতূহলকে সজাগ ক'রতে পারা যায় এমন অনুকূল শিশুসাহিত্যের সৃষ্টি ক'রতে হ'বে।...'প্রহেলিকা' বা 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' সিরীজের কাহিনী এদের মনে সাময়িকভাবে একটা রোমাঞ্চকর প্রতিক্রিয়া ঘটায় সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবন-খাতার পাতায় এরা স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারেনা।

মধ্যযুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যিকরা যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতেন তা যুক্তিতর্ক এবং নৈয়ায়িক তত্ত্বের দ্বারাই পরিপূর্ণ থাকতো কেউ কেউ নীতিকথার বুলি চালিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতেন—এ হেন সাহিত্য ছিল রসবোধহীন। শিশুমনের খোরাক জোগাবার মত সাহিত্যিক সে যুগে একরকম ছিলই না। শিশুমনের প্রতিকূল কতগুলি বই যেমন "Reading without Tears"—প্রভৃতি সেকালের শিশুদের পড়তে দেওয়া হোতো। এর ফলে তাদের কল্পনাশক্তি এবং কোমল মনোবৃত্তিগুলির সহজ বিকাশের পথ হ'য়ে যেতো রুদ্ধ। শিশুর মন চায়, পারিপার্শ্বিক ক্ষুদ্রগণ্ডীর বাইরে যে সুবৃহৎ অজানা, অচেনা রাজ্য রয়েছে তার স্বাদ গ্রহণ ক'রতে, কিন্তু সেকালের অভিভাবকরা ছোটদের "আরোগ্যোপন্যাস" বা "রূপকথার" কাহিনী পর্যন্ত পড়তে দিতেন না।

মানুষের মনে কল্পনার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় শৈশবেই। সেখানে কল্পনার রঙীন স্বপ্ন চায় জীবনের বিস্তার,—"পথের পাঁচালী"র অপু যেমনটি চেয়েছিল। শিশু তার মনের কল্পনায় সত্যের একটা অস্পষ্ট ছবি এঁকে নেয়—তার কাছে ঐ যেন সবচেয়ে সত্যি—বাস্তব।

শিশু যখন পড়ার বই নিয়ে মুষড়ে পড়ে—যখন পড়া আর তার ভাল লাগেনা—তখন সে 'মা'কে ডেকে বলে,—

"আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত,—
পড়ার কথা আজ বোলো না।

.....আজ বলো মা,
কোথায় আছে তেপান্তরের মাঠ ?"

...অজানা অচেনা সুদূরের তেপান্তরের মাঠ তার কল্পনাকে রাঙিয়ে দেয় নানা রঙে। সে চায় "মধুমাবির মত নৌকাখানা নিয়ে "সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে" চলে যেতে। সে যাবে "রাজপুত্তুর হ'য়ে নৌকোভরা সোনারূপো নিয়ে।" ফিরে আসতে সন্ধ্যা হ'য়ে যাবে, রাত্রে মার কোলে ব'সে মাকে শোনাবে সেই পাতাল পুরীর রাজকন্যার কথা।...বাস্তবতার কঠোর সত্যের চেয়ে এই মুক্ত কল্পনা শিশুর মনে অনেক ভাল লাগে।

আমাদের দেশের বর্তমান শিশুসাহিত্য পাশ্চাত্য-চিন্তাধারা থেকে মুক্ত নয়; এর কারণ আমাদের শিশু-সাহিত্যিকরা আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারেন নি। মধ্যযুগে এ-দেশে শিশুসাহিত্য বলতে কিছুই ছিল না। ক্রমে কতগুলি ছেলেভুলান ছড়ার সৃষ্টি হোলো। এই ছড়াগুলি অসংলগ্ন অস্পষ্ট একটা জগতের আভাস শিশুর সামনে মেলে ধ'রে; ছড়াগুলি নিছক কতকগুলি বুলি নয়—এরা শিশুমনের স্পন্দন আনে—কল্পনার আনন্দ মাধুর্যে এরা শিশুসাহিত্য-কে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। এই ছড়াগুলিই বোধ হয় আমাদের দেশের সর্বপ্রথম শিশুসাহিত্য।

তারপর আসে রাজপুত্র আর রাজকন্যার কথা। রূপকথার কাহিনীগুলো শিশুমনের সত্যিকারের খোরাক যোগায়। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই রূপকথা একটা অমূল্য-সম্পদ—সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ। তেপান্তরের মাঠ, রাজকন্যা রাজপুত্র, বেঙ্গমা বেঙ্গমী, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র আর রাক্ষসপুরী শিশুর কল্পনায় এক বিরাট জগতের সৃষ্টি করেছে। রামায়ণ, মহাভারতেরও শিশুমনের ওপর যথেষ্ট আধিপত্য আছে; আমাদের দেশে শিশুদের প্রথম পাঠ সুরু হয় রামলক্ষ্মণ আর পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনী দিয়ে।

আমাদের শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। শিশুর যত প্রশ্ন—তার কৌতূহল, তার মনের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথ যতটা বুঝতে পেরেছিলেন ততটা বুঝি আর কেউ বোঝেননি।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' দুরন্ত; দুর্বার তার আকাঙ্ক্ষা আর দুর্দমনীয় তার কৌতূহল। সবেমাত্র কথা বলতে শিখেছে তখনই মায়ের কাছে তার প্রশ্ন—

"এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি মোরে ?"

বিচিত্র তার মনের সাধ: সে চায় 'ফিরিওয়ালার মত রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে',—'ফুলবাগানের মালির' কাজ করতে; সে চায় পাহারাওয়ালা হ'য়ে রাস্তায় রাত জেগে বেড়াতে। এমনি কতরকমের সাধ তার শিশু-কল্পনাকে দোলা দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'শিশু', 'শিশু-ভোলানাথ' প্রভৃতি, আমাদের শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ; 'মুকুট' এবং 'ডাকঘরের' মত নাটক—অন্যান্য দেশের শিশু সাহিত্যে বিরল। কবির 'গল্পগুচ্ছের' অনেকগুলি ছোটগল্প—শিশুমনের প্রকাশ। বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় রহস্যময় তত্ত্ব এবং তথ্যের সুচারু ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে প্রকাশ ক'রেছেন।...

গল্পগুচ্ছের "ছুটি" গল্পের নায়ক স্বাধীন উন্মুক্তমনা ফটিকের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন—বাঙলার হাজার হাজার স্নেহকাঙাল কিশোর প্রাণের মর্মব্যথা। পল্লীগ্রামের উন্মুক্তমাঠে আর অসীম আকাশের তলে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে যে ছেলে হ'য়েছে মানুষ,—সহরের "পাষাণ করার রুদ্ধ হাওয়ায়" সে ছেলের জীবন হ'য়ে ওঠে দুর্বিসহ।...তবুও কেন ফটিক কলকাতায় আসতে চেয়েছিল মামার সাথে? ফটিকের কল্পনায় 'কলকাতা' ছিল অদ্ভুতরকম—নানারঙে রঙীন—তাই সে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর আর অতি প্রিয় বুড়ি নাটাই—এমনকি মায়ের কোল ছেড়ে চলে আসতে পেরেছিল। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন—যে এ তাঁর কল্পনা—কবি-মানসের কল্পনা যে কত সত্যি—কত খাঁটি তা আমরা

জানি—দেখ্‌ছি। আর এর যে কি পরিণাম হ'তে আমরা দেখেছি— 'ফটিকে'র জীবনসন্ধ্যায়। অসীম বালক তার জন্য সকলের সমস্ত প্রকার দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্‌কা করে দিয়ে অনন্ত পথযাত্রী হোলো!

বাঙলার প্রতিটি কিশোর-প্রাণ 'ফটিকে'র মত স্বচ্ছ। এঁদের স্বাধীন চিন্তাকে প্রসারিত করবার খোরাক দিতে হ'বে—আমাদেরকেই—কবিগুরুর সমবেদনা ও দুঃখানুভূতিকে মেনে নিয়ে—শ্যামল সুন্দর কিশোরদের রাহুতে হবে বাঁচিয়ে।

বাংলার শিশুসাহিত্যের জনক ৺সুকুমার রায়চৌধুরী। আজগুবি, অসম্ভব এবং উদ্ভট জিনিষ নিয়ে তিনি হাস্য-রসের সৃষ্টি ক'রতেন। এঁর লেখা পড়ে না হেসেছেন এমন পাঠক বিরল। এঁর সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দগতি, ভাবসমাবেশের অপূর্ব অসংলগ্নতা পদে পদে চমৎকৃত করে। এঁর লেখা "আবোল তাবোল," 'হ, য, ব, র, ল,' 'ঝালাপালা,' 'বহুরূপী,' প্রভৃতি আমাদের শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ ছাড়া 'অবাক-জলপান' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'—প্রভৃতি শিশু-নাটক তাঁর রচনা বৈশিষ্টের পরিচায়ক। সুকুমার বাবুর পিতা উপেন্দ্র বাবুও মিষ্টি করে ছোটদের জন্য পুরাণের কাহিনী বলেছেন। এ ছাড়া সুধিনয় রায়, সুখলতা রাও প্রভৃতির নাম বাংলার শিশুমহলে সমধিক প্রসিদ্ধ।

বর্তমানে আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যে রূপকথার মত অমূল্য জিনিষ যে স্থান পেয়েছে তা দক্ষিণাবাবুর কল্যাণে। রূপকথা আমাদের দেশ থেকে প্রায় অবলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল, দক্ষিণাবাবু আমাদের সে গ্লানি থেকে উদ্ধার করেছেন। 'কাট বয়' ও 'লাট বয়'-এ তিনি পদ্মজা শিশুর অপূর্ব ও নিখুঁত ছবি এঁকেছেন। এছাড়া এঁরই লেখা 'ঠাকুরমার ঝুলি' এবং ঠাকুরদাদার ঝুলি—বাংলার শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

বাংলার শিশুসাহিত্যকে উন্নত করার কাজে সুনির্মল বসু, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কার্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত, শিবরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির দান অসামান্য।

এরপর মাসিক পত্রিকার কথা বলা যেতে পারে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের সম্পাদনায় বাংলার প্রথম শিশু মাসিক "বালক" আত্ম-প্রকাশ করে। গল্পে প্রবন্ধে, কবিতায় এই মাসিক সমৃদ্ধ ছিল। এর পরে ক্রমে ক্রমে 'সখা' 'সাথী', 'সন্দেশ', 'মৌচাক', শিশুসাথী' 'রং মশাল' প্রভৃতি বাংলার শিশু সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করছে। বর্তমান যুগের বাংলা শিশুমাসিকের মধ্যে 'শিশুসাথী' অন্যতম। ২৬ বছর আগে শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদনায় এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং আজও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া আছে 'শিশুমাসিক' পত্রিকা। শিশু-সাহিত্যে এগুলি আদর্শ স্থানীয় এবং শিশুদের পক্ষে মনোরঞ্জক। 'রূপরেখা,' 'রংতুলিকা', 'আজব বই' 'বার্ষিক শিশুসাথী' 'চিত্রদীপ', 'সোনালী কমল', প্রভৃতি শিশু মাসিকগুলি শিশুদের আদরের বস্তু। শিশুদের মনোরঞ্জক গল্প, আদর্শপূর্ণ প্রবন্ধ, স্বদেশী এবং নানারকমের কবিতা, মহাপুরুষদের জীবনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, খেলা-ধূলার খবর, উপদেশমূলক নাটক প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত হ'য়ে এই পত্রিকাগুলি আত্মপ্রকাশ করে।

পরিশেষে শিশুসাহিত্যিকদের কাছে নিবেদন যে তাঁরা যেন তাঁদের রচনার ভেতর দিয়ে শিশুর অপরিনত কল্পনাকে প্রসারিত করবার চেষ্টা করেন। স্বাধীন ভারতে ভাবীকালের সৈনিক এই শিশুদের মনকে এবং ভবিষ্যতকে গঠন করবার ভার বহুল পরিমাণে শিশু-সাহিত্যিকদেরই বহন ক'রতে হ'বে। বিশ্বের শিশু-সাহিত্যের দরবারে বাংলার শিশু-সাহিত্য যাতে সমান ভাবে আদৃত হয়—তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে—আমাদের সাহিত্যিকদেরই।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্ছ্বাস গল্প

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে

—স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুশ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঔপন্যাসিক গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ করে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ নং ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

"যন্ত্রালয়"

কুমারী গৌরী দাস

( )

সে দিন সন্ধ্যায় পাড়ার শঙ্খ-রোলকে চাপা দিয়া শ্রীকানাই ঘোষের বাড়ী কলহের রোল উঠিল।

কলহটা—পিতা এবং পুত্রে। কলহের কারণ—শ্রীকানাইয়ের প্রথম এবং শেষ পুত্র দীনুনাথ আজ পাঁচমাস যাবৎ বকুলহাটির স্কুলে মাষ্টারী করিয়া মাসে চল্লিশ টাকা করিয়া উপার্জন করিতেছে, কিন্তু এযাবৎ পাঁচটি পয়সাও বাপের হাতে দেয় নাই। প্রতি মাসেই এই লইয়া পিতা-পুত্রে গোলমাল বাধে। কিন্তু আজিকার ব্যাপার অন্যান্য বারের তুলনায় একটু গুরুতর।

বৃদ্ধ শ্রীকানাইয়ের পক্ষে রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, একমাত্র পুত্রটিকে সে সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যেও খরচ পত্র করিয়া বি, এ, পর্যন্ত পড়াইয়াছিল এবং পার্শ্ববর্তী বকুলহাটির বাবুদের বাড়ী দুইবেলা হাঁটা-হাঁটি করিয়া, শেষ পর্যন্ত বাবুদের ধরিয়া-কহিয়া, তাঁহাদের স্কুলে তাহার কর্মের যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। শ্রীকানাইয়ের মনে বড় আশা ছিল যে, তাহার কষ্টের সংসারে, দীনুনাথের উপার্জনের অর্থ, অনেক কষ্ট লাঘব করিবে। কিন্তু ফলে কিছুই নাই। দীনুনাথ যে চল্লিশ টাকা করিয়া উপার্জন করে, তাহা ত্রিশ দিনের মধ্যেই সে পোষাক-পরিচ্ছদে, আমোদ-প্রমোদে এবং বিলাসে অপব্যয় করিয়া ফেলে। দরিদ্র ঘরের ছেলে হইলেও সে চাল-চলনে বড়লোকের ছেলেদের মত থাকিতে চায়। সেইজন্য ছ'খানা ধুতির স্থলে তাহার বার খানা ধুতি, হরেক রকমের আট দশ খানা জামা, তিন চার জোড়া জুতা, চশমা, ছড়ি, রিষ্টওয়াচ, মোটা তিনেক কাউন্টেন পেন্, ক্রীম, ক্যাষ্টর-অয়েল, টুথ-ব্রাস্, হেয়ার ব্রাস, স্নো, টর্চ, ক্লাস্ক প্রভৃতি তাহাকে সর্বদাই বেষ্টন করিয়া রাখিত। এতদ্ভিন্ন—প্রতি শনি এবং রবিবার, ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনিয়া, ২০ মাইল দূরবর্তী কলিকাতায় যাওয়া এবং সিনেমা দেখা তাহার চাই-ই। তারপর হেয়ার কাটার আছে, রেস্তোঁরা আছে, ট্রাম, বাস, গ্রামের ক্লাব, লাইব্রেরী ইত্যাদি অনেক কিছু। সুতরাং চল্লিশ টাকা কোন ছার,-পঞ্চরাজের রাজত্ব পাইলেও তাহার মাসিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া দীনু দরিদ্র পিতাকে এক পয়সাও সাহায্য করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

কিন্তু শ্রীকানাই—মূর্খ শ্রীকানাই—বৃদ্ধ শ্রীকানাই—ভীষণভিপ্রস্ত শ্রীকানাই পুত্রের এই ব্যবহারটাকে ঘোরতর অন্যায় বলিয়া এতদিন ধরিয়া আসিতেছিল এবং পাঁচ মাসের দুঃখ ও গ্লানিকে সহিষ্ণুতার যে আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা একেবারে কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, ক্রোধে, উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এই দণ্ডেই দূর হয়ে যা, পাজী, নেমকহারাম, হতচ্ছাড়া কোথাকার।"

অতঃপর উভয়ের মধ্যে বকাবকি যখন চরমে গিয়া পৌঁছিল, তখন শ্রীকানাইয়ের ভগিনী যশোদা আসিয়া ক্রোধ-কম্পিত ভ্রাতাকে জোর করিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসাইল এবং কন্যা কল্যাণীকে তাহার মামার জন্য এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিল। শ্রীকানাই ভগিনীকে ঝাঁঝি দিয়া কহিল—"তামাক সেজে আনবে ও কোত্থেকে? পয়সা-কড়ি ছিল না বলে আজ কি আর তামাক আনতে পেরেছি, না সারাদিন এক ছিলিম তামাক খেতে পেরেছি?"

কন্যার দিকে চাহিয়া যশোদা কহিল—"তোর দাদা যে সিগারেট্ খায়, ও-ঘর থেকে তাই একটা না হয় এনে দে না, মা।"

শ্রীকানাই চীৎকার করিয়া বলিল—"ও তুয়োরটার ছিনিষে আমি,—তুই যা কল্যাণি, তোর কাজ কর গে যা।"

পায়ে ক্রোকোডাইল্ লেদারের স্যাণ্ডেল, গায়ে পপ্‌লিনের পাঞ্জাবী, এক হাতে টর্চ আর এক হাতে এক গাছা চেরীর ছড়ি নিয়ে দীনু তখন উঠানের একাংশে দাঁড়াইয়া ছিল।

দীনু খিড়কীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আম গাছটার দিকে হাতের টর্চটা তুলিয়া, তার বোতামটা একবার টিপিয়া

ধরিল। তারপর ছড়িগাছটার প্রান্ত ভাগ দিয়া উঠানের মাটীর উপর দুই চারিবার ঠকা-ঠক্ টোকা মারিল। তারপর শীস্ দিতে দিতে ও ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে 'কাত্তিকপুর বিজলী ক্লাবে'র উদ্দেশে বহির্গত হইয়া গেল।

(২)

সেই মাসেই দীনুর 'ঘুঘুর বাসা' পুড়িয়া গেল—অর্থাৎ বকুলহাটির হাই স্কুল হইতে তাহার চাকুরী খতম্ হইয়া গেল।

বকুলহাটি জমিদার-বাড়ীর যিনি মেজবাবু, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং বিচারপরায়ণ। দীনু যে তাঁহার দরিদ্র পিতাকে এক পয়সাও সাহায্য করে না এবং তৎপরিবর্তে সমুদয় অর্থ বিলাস-বাবুগিরিতে অপব্যয় করে, এই সংবাদ যথা সময়ে তাঁহার কানে পৌঁছিয়াছিল। তিনি মাস দুই পূর্বে হেড্‌মাষ্টারকে দিয়া দীনুকে জানাইয়াও ছিলেন যে শ্রীকানাইয়ের সাহায্যের জন্যই তাহাকে স্কুলের চাকুরী দেওয়া। সে যদি শ্রীকানাইকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাহার স্কুলের চাকুরি থাকিবে না। তাহার পরে সে-দিনের ঘটনার কথা যখন তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখনই তিনি তাহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই ব্যবস্থার ফলেই আজ দীনুর অবস্থা—যথা, পূর্বং তথা পরং।

সুতরাং দীনু স্থির করিল, সে আর কাত্তিকপুরে থাকিবে না, কলিকাতায় চলিয়া যাইবে। কলিকাতায় গেলে পয়সার অভাব কি? যাহারা মূর্খ, বোকা, গবাকান্ত তাহারাই কলিকাতার মত জায়গায় গিয়াও কিছু করিতে পারে না। কলিকাতায় পয়সা বাতাসে উড়িতেছে, ধরিয়া লইতে পারিলেই হয়—এ কথা ধ্রুব সত্য, খালি গুটা মুখের কথাই নয়। সে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু গৌরকে কহিল—"চল গৌর কলিকাতায় যাই। কি সুখে আর কাত্তিকপুরে থাকিব? যাবি?"

"যাব।"

দুই বন্ধুতে তখন অনেক কথা, অনেক আলোচনা, অনেক শলা পরামর্শ হইল। কলিকাতায় গিয়া দুই বন্ধুর যে পয়সা উপার্জন হইবে, এবং তদ্দ্বারা যে সুখের হাওয়া তাহাদের ঘিরিয়া নিশিদিন প্রবাহিত হইবে; তাহারই স্বপ্নে দুই বন্ধু মশগুল্ হইয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বেই কলিকাতা-যাত্রার একটি শুভ দিন তাহারা স্থির করিল।

তাহাদের বিদায়ের পূর্বে 'বিজলি ক্লাবে' একদিন 'ফিষ্টের' ব্যবস্থা হইল। খিচুড়ী, ডিমভাজা, আলুভাজা, আমড়া চাটনী এবং আরো কতকিছু। 'ফিষ্টের' দিন বৈকাল হইতে আয়োজন হইতে লাগিল। ব্যাপার নেহাৎ সামান্য নহে। প্রায় পঁচিশ জন মেম্বার। চাল, ডাল, ডিম, আলু, মশলা, তৈল, ঘৃত, লবণ, কড়া, ডেকচি, কলাপাতা, কাঠ—বহু দ্রব্যের আয়োজন।

সন্ধ্যার কিছু পরে মদন একটা বড় রকমের প্রস্তাব করিয়া ফেলিল, বলিল—"খিচুড়ীর সঙ্গে পাঠা হলে বেশ জুত্ হ'ত।" প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা অনুমোদন হইয়া গেল। তখন সকলের মধ্যে একটা পরামর্শ চলিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বেই স্থির হইয়া গেল, সুরেন বাগ্দীর খামার বাড়ীতে গোয়ালের মধ্যে তার যে কালো খাসীটা থাকে, তেলিপুকুরের পাড় দিয়া চুপি চুপি গিয়া, সেটার মুখ বাঁধিয়া নিয়া আসিলেই হয়।

যথা সময়ে সুরেনবাগ্দীর কালো খাসীটা এবং একখানা খাঁড়া আসিয়া পড়িল। যথা সময়ে খাসী বলি এবং রন্ধনও হইয়া গেল। নটবর কহিল—"আমি কিন্তু পাঠা-কাটার দিকে নেই। ও আমি খাচ্ছি না। আমি বলি'র 'এগেনস্ট্'—এ।"

দীনু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—"এ বলিতে কোন দোষ নেই। এ ত আর দেবতার কাছে বলি নয়। এতে পাঠার যেমন প্রাণ, ঠিক তেমনিই থাকবে। মাঝ-খান থেকে খুব ধর্ম সঙ্গত উপায়ে তার মাংসটা আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে।"

নরেশ কহিল—"দুটো ছেলেবেলায় ছাগলের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে, সেই জন্য ছাগ জাতির ওপর ওর ভয়ানক দরদ। মুর্গী বলি দাও, তাতে ওর বোধ হয় কোন আপত্ত নেই।"

গৌর কহিল—"তা নয়, তা নয়। রাণীগঞ্জের গোঁসাইবাড়ী ওর বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, সেই জন্যে আগে

থাকতে ও রিহার্সাল দিয়ে তৈরী হয়ে নিচ্ছে।"

ছোট্ট একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ হইতে যেমন বিরাট অগ্নি কাণ্ড ঘটিয়া থাকে ; বিন্দুপ্রমাণ একটি ছিদ্র দিয়া যেমন বৃহৎ তরণী জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায় ; তেমনই এই সামান্য কথা উপলক্ষ করিয়া নটবরের সহিত আর সকলের তুমুল বচসা ও কলহ বাধিয়া গেল। অর্দ্ধ-ঘণ্টা আগে যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই, অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহাই ঘটিয়া গেল। হুলস্থূল কাণ্ড। দৃশ্যের চরম অবস্থায় দীনু নটবরকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে কহিল—"গেট-আউট্ ইউ র‍্যাসকেল।" নটবর আদপেই ইংরেজি না জানাতে, সে সমান ওজনে তেজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া গোঁজ ভরে ক্লাবঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

মদন কহিল—"ও বোধ হয় একটা কিছু কাণ্ড করবে।"

নরেশ কহিল—"করবে—অবশ্যি।"

দীনু কহিল—"গৌর, ওকে 'ফলো' করে দেখ্ কোথায় যায়।"

গৌর লাফাইয়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং প্রায় একঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া চুপি চুপি সকলকে যে সংবাদ দান করিল, তাহাতে কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। মিনিট দুই পর দীনু কহিল—"আজই রাতে সুরেশবাবুকে থানায় পাঠিয়ে—?"

মানিক পরামর্শ দিল—"তা হলে দারোগাকে সঙ্গে করে এনে একেবারে মালশুদ্ধ—এক কাজ করা যাক এস। তাড়াতাড়ি সকলে খেয়ে দেয়ে নিয়ে, হাড়-গোড় সব ফেলে দিয়ে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট—

বাধা দিয়া দীনু কহিল—"থাম। ওতে পার পাবি না। পাঠা মারা, রান্না, খাওয়া সব প্রমাণ হয়ে যাবে। এই যে পাশে আমাদের মহাশত্রুর ষষ্ঠু ঘোড়লটি আছে, ও-ই সাক্ষী দেবে, আর মুটো ত আছেই। সুতরাং প্রমাণ হতে বাধবে না।"

দীনুর কথায় সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়িল। দীনু কহিল—"দু-তিন শিশি 'অয়্-ব্লাড্' পাওয়া যাবে?"

দু-তিন জন বলিয়া উঠিল—"যাবে।"

"শীগগীর নিয়ে এস। আর একখানা বুরুশ।"

যথা সময়ে অয়্-ব্লাড্ আসিয়া পড়িল, বুরুশও আসিল। তাহার পর সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইলে যে যাহার বাটী চলিয়া গেল ; এঁটো-পাতা, হাড়-গোড়, সকলই স্ব স্ব স্থানে পড়িয়া রহিল।

শেষ রাত্রিতে গ্রামের তিন জন চৌকিদার, বিজলী-ক্লাবের মেম্বারদের গৃহে হাঁটা-হাঁটী ও তাহাদের ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। থানা হইতে দারোগা আসিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে সুরেশবাবুর খাসী চুরি কেসের 'এন্‌কোয়ারী' লইবে।

সেই শেষ-রাত্রিতেই ক্লাবঘরে দারোগার 'এন্‌কোয়ারী' বসিল। সারি সারি এঁটো পাতা ও পাঁঠার হাড়-গোড় দেখিয়া দারোগা কহিল—"দেখছি আপনাদের ভাল রকমই ভোজ হয়েছে।"

দীনু কহিল—"আজ্ঞে, তেমন বিশেষ কিছুই নয়, খিচুড়ী আর পাঠা মাত্র।"

বাহিরের বারান্দায় করিয়াদী সুরেশ বাবু ও নটবর, ওপাড়ার কৃষ্ণনাথ এবং এ-পাড়ার ষষ্ঠু ঘোড়ল প্রসন্ন মুখে বসিয়া ছিল।

দীনু বলিল—"মাঝে মাঝে একটু-আধটু আমোদ—প্রমোদ করা যায় আর কি!"

"মন্দ নয়। গাঁয়ে খাসীর ত আর অভাব নেই ;—অন্ধকারে বেঁধে টেনে আনলেই হয়! তা', এবার বুঝি সুরেশবাবুরই পালা পড়েছিল—তার খাসীটি?"

"বুঝতে পাচ্ছি না, কি বলছেন।"

"বলছি সুরেশের কালো খাসীটিকেই এবার চুরি ক'রে জীষ্ট করা হয়েছে।"

"সুরেশের? কালো খাসী? বলতে পারি না। আমরা কাল হাট থেকে একটা লাল খাসী কিনে এনেছিলুম। সস্তায়—অর্থাৎ সিকে সাতেকের ভেতর পাওয়া গেল, তাই—"

"লাল্ খাসী? ছালখানা তার ফেলে দিয়েছেন নিশ্চয়?"

"আজ্ঞে না, ছাল বাল্না কি ফেলে দিতে পারি? ওটা যে আট না আনাতে বিক্রী হবে মশাই ঐ যে—দেয়ালের গায়ে ঝুলছে।

দারোগা সেই দিকে তাকাইল। ফরিয়াদী সুরেশ বাবুর ও তাহার পক্ষীয় সকলেও সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া সকলেই থতমত খাইয়া গেল।

অতঃপর 'এনকোয়ারী' আর বেশী দূর গড়াইল না। দারোগা রিপোর্ট লিখিল—কেস্ মিথ্যা। কালো খাসী নয়, লাল খাসী। পরে সুরেশবাবুর উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে গালা-গালি দিতে দিতে গো-যানের ছইয়ের মধ্যে গিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দু তখন সকলকে কহিল, "অঙ্ক-ব্লাড্" মাখিয়ে ছালখানা 'পেণ্ট্' না করে ফেললে—অনেক ভোগাই ভুগতে হ'ত।

(৩)

কলিকাতার টালিগঞ্জের একটি বাটীর সদর-দরজার সম্মুখে গিয়া একটি যুবক বাটীটির দিকে একবার তাকাইয়া দরজার কড়া নাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দেওয়া হইলে যুবক ভিতরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এটা কি ৮৯ নং? কালিচরণ মিত্র এখানে থাকেন?"

"হাঁ, তিনি আমার মামা হন। ডেকে দেব? দিচ্ছি। আপনি বৈঠকখানাতে বসুন।"

মিনিট দুই পরেই মামা শ্রীযুক্ত কালিচরণ মিত্র আগন্তুকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি দরকার?"

"আপনার কিছু হারিয়েছে কি?"

"হারিয়েছে? হ্যাঁ, হারিয়েছে বৈ কি! আমার বুদ্ধিশুদ্ধিই হারিয়েছে। একটি ছেলের অসুখ। তার চিকিৎসার ব্যাপার আমায় যেন নাস্তানাবুদ ক'রে ফেলেছে। দুর্ভাবনা ভেবে ভেবে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি—"

"কোন জিনিষ আজ আপনার হারিয়েছে কি? কোন কাগজ পত্র—কোন টিকিট—কোন—?"

"একখানা ট্রামের মান্থলি টিকিট আজ হারিয়েছে মশাই! মাথার নেই ঠিক, হারাবার আর দোষ কি বলুন? পেয়েছেন আপনি? খুবই উপকার হ'ল। ট্রামভাড়াটা দিয়ে দি আপনাকে। অশেষ ধন্যবাদ—অশেষ ধন্যবাদ।'

"ট্রামভাড়াটা আমি নিতে পারব না। আর আপনার টিকিট কুড়িয়ে পেয়ে আপনাকে দিতে আসা, এটা আমি উপকার করা ব'লে মনে করি না, এটা আমার কর্তব্য, না করলে পাপ। সুতরাং এর জন্যে ধন্যবাদও আমি পেতে পারি না।"

ইন্দু উপার্জনের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়াছে। একলা আসে নাই, পূর্ববাবস্থা মত গৌরকে বোসরূপে আনিয়াছে। উভয়ে মির্জাপুর ষ্ট্রীটের একটা মেসে আছে। গৌর সামান্য কিছু টাকা সঙ্গে আনিয়াছে, বর্তমানে তাহাতেই মেসের খরচ চলিতেছে।

পথে বাহির হইয়া ইন্দু মনে মনে বলিল—মাসকাবারের ত মোটে আর তিনটে দিন বাকী! টিকিট খানা না দিয়ে যদি রাখতুম, না হয় তিনটে দিন ব্যবহার করতে পারতুম! তাতে আর এমন কি বিশেষ লাভ হ'ত? ধরা পড়লে কুড়ি টাকা জরিমানার ভয়ও ছিল। তার চেয়ে বুদ্ধি খাটিয়ে এ যা করলুম—খুবই ভাল হ'ল। তান্ত্রিক জ্যোতিষী বলে আমার ওপর বুড়োর ত' খুব বড় গোছের একটা ধারণা জ'ন্মে গিয়ে গেলুম। এই ধারণার ফলে দেখি কতদূর কি করতে পারি! জাল ত পেতে রেখে এলুম, দেখা যাক মঙ্গলবার সন্ধ্যার পরে আসতেই হবে।"

মঙ্গলবার দুপুর বেলা আহারাদির পরে সিগারেট টানিতে টানিতে ইন্দু গৌরকে কহিল—"গৌর!"

"বল।"

"ঠিকানাটা মনে আছে ত?"

"পরিপাটিরূপে। ১১৭ পার্ক এ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ।"

"ঐটে ওর জামাইয়ের বাড়ী। জামাই ব্যাঙ্কে চাকরী করে। দু'টার বাড়ী আসে, আর কোথাও যা'র হয় না। তুই ঠিক সাতটায় সেখানে যাবি। এখানে

আমিও বুড়োর কাছে সাড়ে ছ'টায় গিয়ে হাজির হব। বুঝলি ?"

"কাল থেকে বুঝছি, আর তোর বোঝাতে হবে না।" সাড়ে ছ'টা বাজিতে মিনিট ৫।৭ বাকি থাকিতে দীনু টালিগঞ্জের ৮৯ নং বাটীর বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিল। মিত্র মহাশয় গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন। দীনুকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—"আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই ব'সে আছি। আপনার কথাটা আমি ভাল করে ভেবে দেখলুম। গ্রহ-নক্ষত্র, রাশি-লগ্ন মিলিয়ে বিচার ক'রে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে যে অকাট্য ফল পাওয়া যায়, সে কথা আমি খুব বিশ্বাস করি। গ্রহ-শান্তির দ্বারাই আমার ছেলেটির খুব শীগ্‌গীর সেরে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু আজ কাল এসব কাজে আর—"

"বিশ্বাস হয় না, এই ত ? তা না হবারই কথা। একটু-আধটু শিখে যে-রকম ব্যবসাদার জ্যোতিষীর ছড়ো-ছড়ি আর সাইনবোর্ডের ছড়া-ছড়ি, তা'তে—'সাত নকলে আসল ভেস্তা হয়ে পড়েছে। সেই জন্যই ত মিত্তির মশাই, ঠিক পেশা হিসেবে বিদ্যাটাকে লাগাইনি। জ্যোতিষীর ছুচ্‌চুরির কথা ত' নতুন নয়, কথাটা পুরোণো হয়ে গিয়েছে। 'বসুমতী'তে মাঝে মাঝে কত গল্পই পড়ি !"

সেই জন্যেই বলছি, জিনিষটা ভাল এবং কারকরী খুবই কিন্তু—"

"যাক, আপনার কিন্তুর জের আমি রাখবো না। যদি আপনাকে এই দণ্ডেই বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারি ? আচ্ছা, আপনার এই ছেলেটি ছাড়া আর ছেলে আছে ত ? সে এখন বাড়ীর ভেতর কি কচ্ছে, আমি ব'লে দেব।"

শ্রীযুক্ত কালিচরণ মিত্র মহাশয় হি হি করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন—"ছেলে আমার ঐ একটি, সেটির অসুখ। ছেলে একটি, মেয়েও একটি। সেটির বিয়ে হয়েছে, তারা বালীগঞ্জে থাকে।"

"আপনার জামাইটির নাম কি ? তাঁর রাশিটা জানা আছে ? আপনার মেয়েটির কি রাশি ?"

"মেয়ের রাশি হচ্ছে বৃশ্চিক, তার নাম নমিতা। জামাইটির নাম কিশোরমোহন, তার রাশিটা বোধ হয় ধনু।"

"ধনু ? তা' হলে অগ্নি রাশি।"

ফাউণ্টেন পেন্ বাহির করিয়া নোট-বইয়ের সাদা পাতায় মিনিট দু'তিন ধরিয়া কি সব আঁক-জোঁক কাটিয়া লিখিয়া দীনু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল এবং তাহার পর মাথা তুলিয়া কহিল—"দেখুন খাঁটি হিসাবের ফল কতখানি সত্য হয়। ঠিক এই সময়ে আপনার জামাই কোন একটি লোকের কাছ থেকে কিছু কিনছেন।"

"কি কিনছেন ?"

"সেটা ঠিকভাবে এ অবস্থায় বলতে পারা যাবে না তবে কোন বই-টই বা কালি-কলম, মানে লেখা-পড়ার সম্পর্কে আর কিছু। কাল সকালে কোন লোক পাঠিয়ে আমার কথাটা একবার পরীক্ষা করে দেখবেন আমি না হয় আবার কাল এমন সময় আসব।"

উৎসাহিত হইয়া মিত্র মহাশয় কহিলেন—"কাল কেন ? আমারও ফোন আছে, তাদেরও আছে, এখনই জানা যায়।"

মিত্র মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া রিসিভারটা হাতে লইলেন। "সাউথ—থ্রি, কাইভ্, জিরো, নাইন্—কে কিশোর ?"

"হ্যাঁ,"

"আমি টালিগঞ্জ থেকে বলছি। তুমি এখন কি করছ ?"

"আজকের খরচের হিসেবটা লিখছি।"

"কতক্ষণ থেকে হিসেবটা লিখছ ?"

"এই সবে লিখতে বসেছিলুম খানকতক বাঙলা বই কিনলুম এখন, সেই খরচটা লিখছিলুম।"

"কি বই ?"

"বাঙলা গল্পের বই। একটি ছোকরা বেচতে এসেছিল। খান আষ্টেক বেছে বেছে রাখলুম—'স্বর্ণলতা' '৭০৩' 'যুগধর্ম্ম' এই সব।"

পরম বিস্ময়ে মিত্র মহাশয় রিসিভার রাখিয়া দীনুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। অতঃপর আরও কিছু আলাপ

আলোচনার পর শীতু কহিল—"কুপিত গ্রহকে শান্ত করতে বড় জোর গোটা পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে। আমার আর আপনাকে কিছু দিতে হবে না, কেন না আমার ত' এটা ঠিক ব্যবসা নয়, বিদ্যাটা শিখেছি, যদি এর দ্বারা পরোপকার হয়, সেইটেই ত মহা লাভ, জন্মান্তরের মূলধন। তবে একথা জোর করে বলতে পারি, গ্রহ শান্ত হ'লেই আপনার ছেলেটি ভাল হয়ে যাবে।"

"পঞ্চাশ টাকা এখনই তা'হ'লে আপনাকে দিতে হবে

"আজ্ঞে। আর ছেলেটির হাতের একটা মাদুলি কি একটা আংটি, বা সে নিত্য ব্যবহার করে। সুবর্ণের হওয়া চাই এটা 'অন্তর্ধাবন-শুদ্ধি' করে দিয়ে তৃতীয় দিনে ফেরৎ দিয়ে যাব, সেই দিন থেকে আবার ব্যবহার করতে হবে।"

"অন্তর্ধাবন শুদ্ধি কি ব্যাপার?"

"সে আপনি বুঝবেন না। তন্ত্রোক্ত একটা বিশেষ ক্রিয়া।"

আরও দুই চারিটা কথা, দুই চারিটা উপদেশ, দুই চারিটা প্রশ্ন, দুই চারিটা উত্তরের পর দশ টাকার পাঁচখানি নোট এবং একটি সোণার আংটি লইয়া শীতু মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণান্তে চলিয়া গেল।

(৬)

"হুজুর!"

"হ্যাঁরে, ও বই খানা বুঝি নিলে না?"

"কোন্ বই খানা?"

"ঐ যে—চুম্বন—তাহার শক্তি ও প্রয়োগবিধি'। জামাইটা সেকেলে গোছের বোধ হয়, নইলে ঐ খানাই ত আগে নেবার কথা। বই খানা এদেশে যিনি ছাপিয়েছেন, তাঁকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে, তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। যাক্—চল্ দিকি ঐ মোড়ের পোদ্দারের দোকানে গিয়ে আংটিটির সদ্গতি ক'রে আসা যাক্!"

"সদ্গতি ক'রে আসা যাক?"

"হ্যাঁ।"

"চ' ভাই। কিন্তু এরকম ক'রে তোর পয়সা উপার্জ্জন কতদিন চলবে, তাই জিজ্ঞাসা করি।"

"কি করা যায় বল্! চাকরীর বাজার ত দেখ্‌ছিস্। এক রকম করে খরচটা চালান চাই ত'!"

"শোন ভীষু, আমার বুদ্ধি নে। দু'জনে খেটে-খুটে আর কোন একটা ছোট-খাটো ব্যবসা করা যাক।"

মোড়ের দোকানখানি সকালবেলা খুলিয়া পোদ্দার মহাশয় ভিতরে বসিয়া বোধ হয় মনেমনে নাম জপ করিতেছিলেন। রেলিং দিয়া ঘেরা ভিতরের খানিকটা স্থানে তাহার কারিকর উনানে হাপরের বাতাস করিতে করিতে গুণ্‌গুণ করিয়া কৃষ্ণনামের এক কলি গান গাহিতেছিল। ভীষু গৌরকে সঙ্গে করিয়া দোকানে প্রবেশ করিল এবং গতকল্য টালিগঞ্জের মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত 'অন্তর্ধাবন-শুদ্ধি' করিবার সেই সোনার আংটীটি পোদ্দার মহাশয়ের হস্তে দিয়া কহিল—"এটি বিক্রী করব।"

কিছুক্ষণের জন্য নাম-জপ স্থগিত রাখিয়া পোদ্দার মহাশয় ভাল করিয়া আংটীটি দেখিতে লাগিলেন। ভীষু ও গৌর তাঁহার সম্মুখের দুইখানি চৌকীতে আসন গ্রহণ করিয়া বসিল। পোদ্দার মহাশয় কহিলেন—"খাঁটি সোনা, না গালালে বোঝা যাবে না।" বলিয়া ভিতরের রেলিংয়ের ফাঁক দিয়া আংটীটি তিনি কারিকর শ্যামাপদর হাতে দিলেন, কহিলেন—"গালিয়ে ফেল।" কৃষ্ণনামের গানের কলিটি বন্ধ করিয়া শ্যামাপদ আংটীটি হাতে করিয়া লইল এবং তাহা একটি মুচির ভিতরে স্থাপন করিয়া জোরে জোরে উনানে হাপর করিতে লাগিল। প্রবল অগ্নিতাপে আংটীর সোনা গলিয়া গেল, কিন্তু ভক্ত শ্যামাপদর হৃদয়ের জমাট হরিভক্তি সে তাপে বিন্দুমাত্র গলিল না, আরও জমাট বাঁধিয়া গেল। সে হাই তুলিতে তুলিতে বলিয়া উঠিল—'হরি—হরি—হরি।'

হাইয়ের স্বধর্ম্ম—একজনের উঠিলেই আর একজনের উঠে, অবশ্য দু'য়ের প্রাণ মন এক সুরে বাঁধা থাকা চাই। সুতরাং শ্যামাপদর হাইয়ের সঙ্গে সঙ্গেই—'হর—হর—হর' বলিয়া পোদ্দার মহাশয় প্রকাণ্ড এক হাই তুলিয়া তাল

করিয়া নড়িয়া বসিলেন। দীনু চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"খবরদার, ওসব চালাকী চলবে না পোদ্দার মশাই, দোকানে তা'হলে রাত্রিতে আগুন লাগিয়ে দেব, আমরা বিজলী ক্লাবের মেম্বার।"

গৌর একেবারে চমকিত—অবাক।

পোদ্দার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—"কি হ'ল আপনার—ব্যাপার কি?"

"আমরা বিজলী ক্লাবের মেম্বার, ব্যাপার বুঝতে কি আর আমাদের আটকায়? উনি ওখান থেকে মত জিজ্ঞাসা করলেন—'হরি—হরি—হরি?' আপনি বললেন —'হর—হর—হর।' আরে ছ'আনা ত সোনা! ওর থেকে ত 'হরলে' চলবে না। অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে, পরিশ্রম ক'রে ঐটেই ত 'অন্তর্ধাবন' দ্বারা হরা হয়েছে ও ছ'আনার গিনির নেয্য দাম দিতে হবে, গণ্ডা'আষ্টেক পয়সা না হয় লাভ রাখবেন।"

অতঃপর উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা হইয়া একটা সন্ধি হইল এবং পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করিবার পর দীনু পোদ্দার—প্রদত্ত বিড়িটি ধরাইয়া আংটির দাম ২০৲/১০ পকেটে ফেলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তখন বেলা দশটা। ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে কলেজে যাইতেছিল। দীনু গৌরকে গাঁঠেলা দিয়া ইস্পিরিয়ম-দিককার ফুটপাথের দিকে দেখাইল। সেই দিক দিয়া তখন একটী তরুণীর দল বুকে বই চাপিয়া কলেজে যাইতেছিল। তাহাদের কাহারও পায়ে স্যাণ্ডেল, কাহারও পায়ে হাই-হিলযুক্ত কারকোর স্লিপার। কেবলমাত্র বাঙলা দেশের তরুণীদের বিক্রয়ের জন্য বোম্বাই আমেদাবাদে যে দামী শাড়ী প্রস্তুত হয়, পরনে সকলেরই সেই শাড়ী এবং তাহা পরিবার কায়দা—যেমন হইয়া থাকে, তেমনই। চুল—সকলেরই সুন্দর, শোভন, নামমাত্র তৈল-যুক্ত এবং বাঁধা। দুই একজনের চোখে চশমা। তাহাতে তাহাদের মুখের কি চশমার সৌন্দর্য বাড়িতেছে, তাহা না ভাবিয়া বলা যায় না। চলন—সকলেরই ধীর-মন্থর গতি-যুক্ত, মুখভাব—চাপা আনন্দ-মিশ্রিত গাম্ভীর্যময়।

সেই দিকে দেখিতে দেখিতে দীনু ও গৌর মেসের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

(৫)

ছয় মাস হইল দীনু ও গৌর কলিকাতায় আসিয়াছে। কিছুদিন হইল মির্জাপুরের মেস ছাড়িয়া বর্তমানে ভবানীপুরের একটি মেসে তাহাদিগকে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। সেখানে দু'তিন মাসের টাকা বাকী পড়িয়া যায়। তাগাদার পর তাগাদা করিয়াও যখন তাহা আদায় হয় না, তখন একদিন খুব ঝগড়া-ঝাটি ও গালাগালি করিয়া মেসের কর্তা তাহার বাকী পাওনা আদায় করিয়া লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। তবুও সব টাকাটা আদায় হয় নাই। কিছু বাকী ছিল।

সেই জন্য উত্তর প্রদেশ ছাড়িয়া উভয়ে এখন একেবারে দক্ষিণ প্রদেশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। নতুন মেসে আসিয়া, আদি এবং অকৃত্রিম নাম দুইটাকে তাহাদের পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। গৌর হইয়াছে নিতাই। তবু সে এক রকম গৌরের মধ্যেই আছে, কিন্তু দীনু তার নিজের রাজ্য ছাড়িয়া একেবারে লঙ্কায় গিয়া উপস্থিত হইল। সে হইয়াছে রাম।

দীনু চাকরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, কিন্তু কোন স্থানেই সুবিধা করিতে পারিতেছে না। কলিকাতার দক্ষিণে গড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে একটা কাজ খালি আছে শুনিয়া কয়দিন ধরিয়া সে সেই কাজটির জন্য খুব ঘোরা-ঘুরি করিতেছে। কোন একজন প্রতিষ্ঠাবান কমিশনারকে ধরিতে পারিলেই তাহার কাজটি হইয়া যায়। সন্ধান লইয়া সে জানিল, কয়েকজন কমিশনার আছেন, তাঁহারা একেবারে নিরীহ প্রকৃতির; তাঁহারা মাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। তাঁহারা কাহারও জন্য বড় একটা সুপারিশও করেন না। তাঁহাদের বিশেষ কোন প্রতিপত্তিও নাই। আর কয়েকজন আছেন, তাঁহাদের প্রতিপত্তিও যত, তেমনই সরকারের মধ্যেই তাঁহারা ঢুকিয়া আছেন। কিন্তু দুষ্ট লোকদের দ্বারা বাজারে তাঁহাদের দুর্নামও যথেষ্ট। তাঁহাদের দ্বারা সহজে কোন সুযোগ আদায় করা অত্যন্ত কঠিন। ইঁহাদের মধ্যে শুধু দেবেন্দ্র বাবুর অবস্থা

ভিক্ষুক তাঁহার প্রতিপত্তিও যেমন, সর্বসাধারণের নিকট সুনামও তেমনই অতি খাঁটি লোক তিনি। নারায়ণ পূজা করিয়া তিনি কোনদিন জলগ্রহণ করেন না। ঘোটরে উঠিয়া অন্ত সকলে যখন খবরের কাগজ খুলিয়া পাঠ করেন, তিনি সে সময় পকেট হইতে 'ধরকি'-গীতা বাহির করিয়া তাহার কোন একটি অধ্যায় অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন। গরীব দুঃখীদের প্রতি তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যও যথেষ্ট। সব চেয়ে প্রশংসার বিষয় তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী এবং বিপত্নীক হইয়াও চরিত্রবলে তিনি মহাবলী। তিনি রাজর্ষি তুল্য। দেবেন্দ্র বাবুকে একটু ধরিতে পারিলেই ইন্দুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কিন্তু আজ দু' তিন দিন চেষ্টা করিয়াও সে তাঁহার দেখা পাইতেছে না, সর্বদাই তিনি কাজে ব্যাপৃত। ঘরে বাহিরে তিনি খুব কম সময়ই থাকেন। এক জন লোক চুপি চুপি ইন্দুকে বলিয়া দিয়াছেন যে তাঁকে ধরতে হ'লে অমুক বড়-বাজার 'পুতুল চাক'র ওখানে না গেলে আর হবে না।

আজ সকালে ইন্দু সেই খানে গিয়াছিল। অনেক যোগাড় পত্র এবং কিকির কন্নীর পর চারুবালার সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল। চারু পুতুলই বটে। রূপ তাহার বাচির। পড়িতেছিল। এমন রূপ না হইলে কি আর দেবেন্দ্র ভোলে যাহাই হউক, সেখানেও কিন্তু ইন্দু দেবেন্দ্র বাবুর দেখা পাইল না। সে চাকুরীটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানাইয়া চারুকেই ধরিয়া বসিল। চারু কহিল—"আপনি কাজের আশা ছেড়ে দিন। আগে আমার কথা ঠেলতে পারতো না; যা ধরেছি, তাই শুনেছে। একজন নতুন ওকলতী পাস ক'রে এসে একটা কাজের জন্যে আমাকে ধ'রে বসলো। ওঁকে বলতেই আড়াইশো টাকা মাইনেতে 'স্যানিটারি' অফিসারের কাজে তাহাকে বসিয়ে দিলেন।"

"ল পাস ক'রে হ'ল—স্যানিটারী অফিসার?"

"হ'ল বৈ কি! আমার সুপারিশে"

"সন্ধ্যাবেলা এলে কি তাঁর দেখা পাব এখানে?"

"না আগে সর্বদা প্রায় এখানেই থাকতেন বটে, কিন্তু আজ কাল—আপনি 'মহিলালয়' জানেন, ঐযে নতুন খুলেছে?"

"না। কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে কি?"

"আরে না না, জামাকাপড়ের আলয় নয় ঐযে লেক রোডে 'বসনালয়' নতুন খুলেছে, সেখানে জামাকাপড় খুব পছন্দসই আর সস্তা; সেটে ছাড়িয়ে খানিকটা পুবে গেলেই ঐ 'মহিলালয়'—অর্থাৎ মহিলাদের আশ্রম। এই-সব অনাথা, বিধবা, অথবা মেয়েদের জন্যে। আপনি আজ-কাল সেইখানে এঁকে পাবেন। সেইখানেই আজকাল খুব ঢলেছেন। কি আর বলবো, মশাই, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স হ'ল আমার, জীবনে 'বাবু' ও আমি দেখেছি অসংখ্য, কিন্তু এরকম কু-চরিত্রের লোক—"

"আর দেখেন নি। তাই ত। আপনার মত লোকের সংসর্গে এসেও তাঁর এসব দোষ গেল না? বাস্তবিকই দুঃখের কথা বটে।"

আরও দু'একটি কথার পর ইন্দু হতাশমনে পুতুল চারুর ওখান হইতে চলিয়া আসিল। আসিতে আসিতে সে ভাবিল, একবার এই সকাল বেলাটাতেই লেক রোড যাওয়া যাউক, যদি কোন রকমে দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দেখাটা হইয়া যায়। সে ট্রামে উঠিয়া বরাবর লেক রোডে আসিয়া পড়িল। একটু খুঁজিতেই একটি বাটীর ফটকের মাথার উপর সে সাইনবোর্ড দেখিতে পাইল—"মহিলালয় (অনাথা দুঃস্থ মহিলাদের আশ্রম)"

বহু চেষ্টার পর তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। দেবেন্দ্র বাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। দেবেন্দ্র বাবু তাহাকে কহিলেন—"গড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কাজ সম্বন্ধে আমার কোন হাতই নেই। একেবারেই অসম্ভব।"

ইন্দু হতাশ হইয়া কহিল—"যদি কোন রকমে কাজটি আমার—"

"উপায় নেই—উপায় নেই। যাও তা হ'লে, আমি একটু বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছি।"

"আজ্ঞে, আর একটু কথা আছে।"

"আবার কি কথা? শীগগীর করে সেরে ফেল।"

"দেখুন, আমার দুইটি বিধবা আত্মীয়া আছেন।

বৎপরনাস্তি দুরবস্থায় তাঁরা পড়েছেন, আপনাদের এখানে তাঁর যদি একটু—"

"তাঁদের কি ছেলেপুলে নেই? কি করে এখন চলে?"

"চলে না, যেটুকু চলে, তা পাঁচজনের দয়ার আর তাদের চোখের জলে। একটি, অবিশ্যি বৃদ্ধা হয়েছেন, বেশী দিন বোধ হয় তাঁকে কষ্ট আর পেতে হবে না, কিন্তু—"

"আর একটির বয়স কত?"

"একেবারে ছেলেমানুষ, বছর একুশ বাইশ হবে। সমস্ত দুঃখের জীবনটাই এখন তার পড়ে রয়েছে, আপনার এই মহৎ এবং সৎ আশ্রয়ে স্থান পেয়ে যদি প্রাণটাকে আর চরিত্রটাকে বজায়—আপনার হাতে কি বই ওখানা?—ওই অত ছোট?"

"হ্যাঁ বরঞ্চি গীতা।"

"সকালবেলা অনাথাদের পড়ে শোনাতে হয় বোধ হয়? থাক—তা হ'লে যদি আপনার হুকুম পাই, তা হ'লে আমার আত্মীয়া দু'টিকে—"

"দেখ, দু'জনকে একবারে র‍্যাডমিট করতে পারা যাবে না, কেন না, আর ও ত সব আছে। ঐ ছোট মেয়েটিকে না হয় নিয়ে এস। কবে আসবে?"

"আজ্ঞে, তা হ'লে—দিন আষ্টেক—"

"না না, কালকেই নিয়ে এস, নইলে হয়ত সীট পাওয়া যাবে না। চা খাও তুমি? হ্যাঁ আর মিউনিসিপাল অফিসারের কাজটার জন্যেও নিয়ে এস একখানা দরখাস্ত লিখে,—দেখা যাবে এখন। তা'হলে যেনো দেরী ক'রে ফেলো না, কালই ঠিক এসো। বুঝেছ? অনাথা আর র‍্যাপ্লিকেশন দুই-ই কাল সঙ্গে করে নিয়ে এস।" দেবেন্দ্র বাবু দীনুর জন্য চা আনিতে হুকুম করিলেন।

আরও ২।৪ টি কথার পর দীনু চা পানান্তে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং মেসে আসিয়া এই সব গল্পই বসিয়া বসিয়া এতক্ষণ গৌরকে শুনাইতেছিল।

চুপ করিয়া সমস্ত শুনিবার পর হঠাৎ গৌর হাসিয়া লুটো-পুটি খাইতে লাগিল। হাসি থামিলে সে কহিল—"রগড় হচ্ছে বন্ধু নয়।"

"মাইরি, ভাল লাগছে না কিছু আমার। একটা কাজ কাজ না হ'লে আর—"

"সেই গুজরাটিটার আফিসে একটু ভাল ক'রে চেষ্টা করে দেখ না।"

"আজই যাব সেখানে। সেখানেও যাব একবার, আর 'বেহার ট্রেডিং কর্পোরেশনে' ও একবার যাব।"

দ্বিপ্রহরে দীনু গুজরাটীটার আফিসে গিয়া হাজির হইল। সেখানে তিন চারিটি লোক লওয়া হইবে। প্রত্যুহে দীনু যখন 'লেকে' বেড়াইতে আসে, এই গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত প্রত্যহই তাহার সাক্ষাৎ হয়। ক্রমে তাহার সহিত আলাপ পরিচয়ও হয়। লোকটি খুবই ভদ্র এবং অমায়িক। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখান হইতে নিরাশ হইয়া দীনুকে ফিরিতে হইল। তিনি কহিলেন —"রামবাবু, আমাদের একটা নিয়ম আছে। সাধ্যমত আমাদের দেশের লোক ছাড়া আর কাকেও র‍্যাপয়েন্ট করবো না। সুতরাং বড়ই দুঃখিত হলাম—নমস্কার।"

রাগে এবং দুঃখে দীনুর অন্তর বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তখন 'বেহার ট্রেডিং কর্পোরেশনে'র আফিসে যাইবার উদ্দেশ্যে একখানি বাসে উঠিয়া বসিল তাহার হাতে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা ছিল। সেই খানি খুলিয়া যে পৃষ্ঠাতে একখানি কার্টুন ছবির নীচে লেখা ছিল—

'ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই—ভাঙ্গা ঐ তরী,
তোমারই নানান্ দানে গিয়াছে ভরি।'

সেই পৃষ্ঠাটি মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল।

(৬)

সন্ধ্যার সময় শ্রান্তদেহে, বিষন্নমুখে, দীনু মেসে ফিরিয়া আসিয়া গৌরকে কহিল—"দেখ, এবার মরিয়া হ'য়ে কাজ করব। হয় এস্পার না হয় ওস্পার। টাকা-সত্যিই কলকাতায় উড়ছে, এবং যথেষ্টই উড়ছে—ধরে নিতেই হবে। সোজা পথে হাটলে পথের শেষ মিলবে না" বলিয়া সে তাহার আজিকার নিষ্ফলতার ইতিহাস আনুপূর্বিক বর্ণনা করিল।

গৌর আশ্চর্য হইয়া কহিল—"বেহার ট্রেডিংয়ের রঘুপতি প্রসাদও ঐ ব'লে ভাগালে?"

"হ্যাঁ। ওসব বোকা গেছে। বাঙ্গালী যেমন বোকা। এখন দেখছি, এই বাঙ্গালী জাতটাকেই ঠকিয়ে না দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই; ঠকবার পক্ষে এরা একেবারে ওয়ার্ল্ড্ রেকর্ড ব্রেক করেছে। নিজেদের এরা যত বেশী চালাক মনে করে, তত বেশী এরা বোকা। এই ছবিখানা কাল বাঁধিয়ে এনে রাখিস্ ত, ঘরে-টাঙ্গিয়ে রাখবো" বলিয়া দীনু সেই ঠাঁই নাই—ঠাঁই নাই—এর ছবিখানা গৌরের হাতে দিল।

গৌর খানিক মৌন থাকিয়া কহিল—"দেখ্, ব্যারাকপুরের সেজবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করে আয় না, যদি কাজ-টাজের বিষয়ে কিছু সাহায্য করেন। তোকে ত তিনি খুবই ভালবাসেন। আর সেই যে একটি খুব বড়-লোক ডাক্তার বাবু—"

"পাগল হয়েছিস্? ব্যারাকপুরের সেজবাবুর কথা আলাদা, কিন্তু সেই বড়লোক ডাক্তারের কথা বলছিস্? বড়লোক কখনও গরীবকে ভালবাসতে পারে না। দু' একবার আমার গান-টান শুনে একটুখানি মোহ তাঁর জন্মেছিল, তাই দিন কতক—আমি যদিও ঠিক দীনুনাথ ঘোষই আছি এবং গানও আমার গলা দিয়ে সেই রকম ভাসই বেরোয়, কিন্তু মোহ ত আর লোকের চিরকাল থাকে না, অল্পদিন পরেই কেটে যায়। সুতরাং বুঝলি না?"

"বুঝেছি।"

"ছাই বুঝেছিস্। আমার মত পাকা হ', তবে সব বুঝবি! জুচ্চুরীটা আমাকে ধরতে হয়েছে বটে, কিন্তু কি করি বল্ না? আমাদের দেশে যাদের পয়সা-কড়ি আছে, তাদের দ্বারা ত দেশের কোন ভাল লোকের উপকার হবে না। আমি আমার কথা বলছি না,—এমন লোক আছে, যারা অতি পবিত্র, অতি ভদ্র, অতি সৎ,—কিন্তু ভগবান্ তাঁদের দৈন্যও দিয়েছেন—অতি। তাদের এমন স্বভাব যে, সহস্র দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন হলেও কারও কাছে গিয়ে মুখ ফুটে বলে হাত পাততে পারে না। বড় জোর, হয় ত একটু ইসারা-ইঙ্গিতে জানায় মাত্র। কিন্তু—"

বাধা দিয়া গৌর বলিল—"সমস্ত দিন ঘুরে তোর মাথা খারাপ হয়েছে, দীনু। শুনেছি ত নিরেনব্বই জন লোক গরীব একজনের হয়ত কিছু পয়সা-কড়ি আছে। গরীবদের বাঁচাতে হলে, তা হ'লে ত—" বলিয়া হি হি করিয়া গৌর হাসিয়া উঠিল।

"তুই থাম্ থাম্। এর ভেতর ঘোড়বার তোর ঢের দেরী। তুই ভাই ষ্টোভটা ধরা, একটু চা তৈরী কর্।"

চা হইলে পর কিছু জলযোগান্তে চা পান করিয়া দীনুর শ্রান্তি দূর হইল, একটি সিগারেট ধরাইয়া সে কহিল,—"বরাতে আমার অনেক কষ্ট ভোগ আছে। জীবনে যে খুব বেশী অন্যায় করেছি—তা করি নি, কিন্তু যে অন্যায়টা করেছি, সেইটিই যে প্রকাণ্ড অন্যায়।"

"যথা?"

"যথা—বুড়ো বাপের প্রতি অসদ্ব্যবহার। যাদে বারোটি করে টাকা তাঁর পুঁজি। কত কষ্টে আমাদের সব মানুষ করেছেন। আর আমি উপরন্তু হয়েও তাঁর সেই কষ্টের অর্থ ধ্বংস করে, মাসে বাবুগীরীতে চল্লিশটা ক'রে টাকা খরচ করেছি। কতবার আমায় বলেছেন, বুঝিয়েছেন—আমি কান দিই নি। একটা পয়সার জন্যে বাবা এক এক দিন তামাক না খেয়ে থাকতেন, আর আমি রোজ দু'আনা অর্থাৎ সাত আনার সিগারেট পুড়িয়েছি।"

"কিরে! আজ তোর ব্যাপার কি বল্ দেখি? হঠাৎ—"

"বাস্তবিক, আজ মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। চ'—একটু বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে আসি।"

রাত্রিতে আহারাদির পর শুইয়া দীনু কহিল—"গৌর, ঘুমুলি, না কি?"

"না।"

"দেখ্, পরশু থেকে আমি হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করব।"

"কি করবি?"

"হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক—অনশন। মাইরি করবো। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলে নি। পৌষ মাসে

একবার ব্যারাকপুর যাব। সেজবাবু যথার্থ আমাকে খুবই ভালবাসেন। কিন্তু এ কথাও ভাবি যে, তিনি আমার কি করতে পারেন?"

"কেন?"

"কেন এই জন্যে যে, যারা সম্পত্তিশালী, সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের পেছনেই তাঁদের সমস্ত সময়, শক্তি, আর ভাবনা খাটানো হয়। গরীবের দিকে দেখবেন কি, তাঁরা তাঁদের নিজের সংসারটাও ভাল করে দেখতে অবসর পান না, এ কথা আমি জানি। তার ওপর আরও একটা কথা জানি, সেটা হচ্ছে এই যে, আমি যে কারও কাছ থেকে উপকার পাবো, সেটাও ত আমার নিজের ভাগ্যে থাকা চাই। বাবার কথাটাই ভাবি। আপনার লোক কে বাবাকে বাঁচিয়ে রেখেছে? রেখেছে ত পরেই। বুঝতে হবে, সেইটেই বিধির বিধান—ভাগ্যের লেখা!"

"ও সব তত্ত্বকথা এখন রাখ্। হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক কি বলছিলি?"

"হ্যাঁ, পরশু থেকে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক করবো। চাকরী-বাকরী করবোও না, পাবও না। আমি বলে নয়, কেউ-ই আর পাবে না। তুই আমাদের শ'খে কামারের ছুরি, ক্ষুর দেখেছিস?"

"দেখেছি! সে ত ফার্ষ্ট ক্লাস জিনিষ, আমার বোধ হয়, অনেক রিলিতির চেয়েও ভাল।"

"সত্যিই তাই ওর ক্ষুরগুলো দু'টাকা ডজন দরে কারা কিনে নিয়ে যায়। শিংয়ের বাঁট আর নাম খোদাই হ'লে ন'সিকে। খাপটাপ করতে আর ইলেকট্রো প্লেটিং করতে, সব শুদ্ধ বড় জোর সাড়ে তিন টাকা ডজন পড়বে। কলকাতার বাজারে ঐ ক্ষুর অন্ততঃ দশ টাকা ডজন বিকোবে।"

"তা হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকে মরবি, কি শ'খে কামারের ক্ষুর গলায় দিয়ে মরবি, সেইটে বুঝি ঠিক করতে পাচ্ছিস্ না?"

"ঠিক করেছি। মরবো না—বাঁচবো। প্রথমে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকে বাঁচবো, তার পর শ'খের ক্ষুরে বাঁচবো।"

"অর্থাৎ।"

"অর্থাৎ, সেবার আর এক দফা ছুচ্ছুন্দরী করতে হবে। নইলে উপায় নেই। প্রথমে হাঙ্গার-ষ্ট্রাইকের মারফৎ কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। তার পর তাই দিয়ে এখানে ঐ 'কাটলারি'র এক বিজনেস্ খুলবো। আমি এর সুকুকসন্ধান সব সংগ্রহ করেছি। আমার খুব বিশ্বাস, স্বপনে থেকে, পেটেখুটে এই ব্যবসাটা চালাতে পারলে আমাদের দু'জনেরই বোধ হয় অর্থ-কষ্ট আর থাকবে না। আর তা হ'লে, বাবার ওপর আমার এত দিনের অন্যায় করার পর, তাঁকে আমি সুখী ক'রে তাঁর আশীর্বাদ পেতে পারবো।"

গভীর রাত্রি পর্যন্ত শয্যায় শুইয়া দুই বন্ধু এ সম্বন্ধে বহু আলাপ আলোচনার পর উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িল।

পরের দিন লোকের মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে একচমকপ্রদ সংবাদ প্রচারিত এবং আলোচিত হইতে লাগিল। ভবানীপুরের এক মেসে রামবাবু নামক জনৈক যুবক একটি 'যন্ত্রালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এক মাসের মধ্যে দুই সহস্র টাকা না পাইলে অনশনে জীবন বিসর্জন দিবেন। অনশনের পূর্ব মুহূর্তে তিনি এই বলিয়া আহার ও বাক্য বন্ধ করিয়াছেন যে, দেশে 'যন্ত্রালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেকের একটি করিয়া টাকা দেওয়া আশ্চর্যের বা অসম্ভব নহে। বাঙ্গালার দুই হাজার লোকের নিকট হইতে এই মহৎ কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যে যদি দুই হাজার টাকা সংগৃহীত না হয়, তা হইলে তাঁহার অনশনে মৃত্যুর জন্য সমস্ত পাপ এবং ধার—সমস্ত বাঙ্গালী জাতির।

এই সংবাদ সর্বত্র প্রচারিত হইবার পর হইতেই অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে অনশনকারীর নিকট লোক এবং অর্থ আসিতে আরম্ভ হইল। অনশনকারী কাহারও সহিত কোন কথা বলেন না। তিনি গলা পর্যন্ত একখানি চাদরে দেহ আবৃত করিয়া এক ধারে শয্যায় শুইয়া থাকেন। তাঁহার অনুচর নিতাই কৃষ্ণ যথাসাধ্য সমাগত সকলের সহিত আলাপ আলোচনা করেন ও টাকা গ্রহণ করেন।

দিন সাত আট পরে এক দিন গভীর রাত্রিতে, সেরখানেক খাবার ও বড় এক বাটি দুধ খাইয়া যীশু গৌরকে জিজ্ঞাসা করিল—আজ পর্য্যন্ত কত হ'ল ?

"৮৪১৫"

"আর ২।১ দিনের মধ্যে দশ হাজারেই দাঁড়িয়ে যাবে দেখছি। হাজার দুয়ের আশা করেছিলুম, কিন্তু ঘন্ত্রালয়ের দশ গুণ পাইয়ে দিলেন।"

ঠিকই তাই। দিন দুই তিন পরে, ধর্ম্মের বাঙ্গালা দেশের ধর্ম-পূর্ণ কলিকাতা সহরে, ধার্মিক বাঙ্গালীর দ্বারা, 'যন্ত্রালয়' প্রতিষ্ঠার জন্য ধার্মিকপ্রবর যীশু নাথের হাতে বিশ সহস্র রৌপ্য-মুদ্রা আসিয়া জমা হইল, যাহার ফলে বৌবাজার ষ্ট্রীটের উপর প্রকাণ্ড এক ঘর ভাড়া লওয়া হইল এবং ঘরের দেওয়াল—গাত্রে তদুপযোগী সুবৃহৎ এক সাইন বোর্ড ঝুলিল, যাহাতে লেখা :—

"যন্ত্রালয়"

সর্ব্বপ্রকার স্বদেশী ক্ষুর, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি

নির্ম্মাণ-কারক।

প্রোপ্রাইটার্স—যীশু নাথ ঘোষ ও গৌর কৃষ্ণ মণ্ডল।

পুস্তক পরিচয়

সুরের সিঁড়ি—প্রথম ভাগ, প্রথম খণ্ড, শ্রীপ্রদীপ রায় প্রণীত। প্রবর্ত্তক পাব্‌লিশার্স—৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃষ্ঠা—২৩।

এই বইটি ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষার জন্য লেখক বিশেষ পরিশ্রম করে রচনা করেছেন। এদিক থেকে সঙ্গীত শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক হিসেবে এ বইটি আদৃত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এ বইটি সঙ্গীত জগতে সত্যি সত্যি কতদূর আদৃত হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এর দুর্বোধ্যতা; বিশেষ ক'রে যাদের জন্যে লিখিত তাদের কাছে। প্রথম দিকে তবুও খানিকটা বোধগম্য হয়েছে, কিন্তু শেষের দিকে শিশুরা গোলক ধাঁধায় প'ড়ে যাবে। শিশুদের উপযোগী ক'রে এ বইটি লিখিত হ'লেও শিশুদের সম্পূর্ণ আনন্দদান করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। নানা প্রকার ছবি এবং ঘর কেটে বইটিকে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য, করবার চেষ্টা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য সাধু, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—কয়েক স্থানে লেখক সাফল্যলাভও করেছেন—কিন্তু কয়েক স্থানে লেখকের বিষয়বস্তু বিশেষ জটিল আকার ধারণ করেছে। ছন্দ শিক্ষা দেবার প্রণালীটি সত্যই ভাল। প্রথমে কথার সাহায্যে ও পরে সুরের ভাষার সাহায্যে লেখক—ছন্দ শিক্ষা দেবার প্রণালীটি যা বার করেছেন তা সত্যসত্যই চমৎকার। তবে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি এই বইটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যাই হোক, আশা করি অন্য সব খণ্ডে এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে লেখক সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

আমাদের সাহিত্য

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছোট্ট চরিত্রের মধ্যে হীরেন খাস্তগীর ভালো। চলমান ঘটনার স্রোতের মধ্যে দুটী মেয়ে বড়ো সুন্দর ছাপ রেখে গেছে আমাদের মনে। আমি বলবো এতো অল্প জায়গায় মেয়ে দুটীকে লেখক এতো অবলীলায় এঁকেছেন যে মুগ্ধ হ'তে হয়; আর তাদের মধ্যে দিয়ে পরিপার্শ্বকে এতো সুন্দর ফুটিয়েছেন, যে উদ্ধৃতি না দিয়ে পারা গেলনা।

"দুটী মেয়ে সিনেমার সামনে রাস্তার উপরে অপেক্ষা করছিলো তাদের বর ফ্রেণ্ডের জন্যে। একটী নোটন পায়রা, অন্যটী ঝোটন বুলবুলি। আমাদের ফুলবাড়ীর সুভংগবালাদাসী আধখানা মুখের উপরে ঘোমটা টেনে হঠাৎ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে। ওর ছেলে বন্যায় গিয়েছে ভেসে, ওর স্বামী ভীড় ঠেলে ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা হড়কে পড়েছে চাকার তলায়, সঙ্গে আছে দুটো ছানাপোনা। একটা কাঁখে, আরেকটা হাত ধরে। বেঁকে কুঁকে পড়ে একটা মাই চোষে, আর একটা নিজের আঙুল কামড়ায়।

কিছু দেবে মা খেতে? এই বাচ্চা দুটো—

অভ্যেস নেই কোন দিন। সুভংগ কথাটার মানে যেন সেই সুর আনতে পারলোনা। যেন এলো খানিকটা লজ্জা, আর একটা অকারণ সঙ্কোচের অনুভব।

না, ফোটাতে হবে সেই বুকফাটা হাহাকার, একটী মাত্র করুণ সম্বোধনে।

মা, মা—গো!

আর উপেক্ষা করতে পারলো না।

'তিন দিন খেতে পাইনি। দেখ চেয়ে, বাচাদের পেটে পিঠে এক হোয়ে আছে।

নোটনটী টললো বোধ হয়। সে তার থলের থেকে আরেকটা ছোট থলে বের ক'রে একটা ডবল পয়সা তুলে নিলো। আলতো ক'রে ধরলো তার আঙুলের ডগায়।

ঝোটন এলো কাপটা দিয়ে: দিসনে, খবরদার দিসনে, কতো বিবি তুই একধার থেকে? দিয়ে কি করতে পারবি তুই, জানিস না—বার্নার্ডশ' কি বলেছে?

কি? নাদ মোহিত তাকালো নোটন।

বলেছে, ভিখিরির সাহায্য করা মানে সংসারে আরেকটা ভিখিরির সৃষ্টি করা। মানে, যে দেবে, খালি দেবে, দিতে দিতে ফতুর হ'য়ে সে হবে ভিখিরি হোয়ে যাবে। সুতরাং ভিখিরিকে কখনো সাহায্য করোনা। ভিখিরিকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে তাকে কায়েমী ক'রে রাখা, তার দল বাড়ানো। আর কেউ মরছে ব'লে আমাকে মরতে হবে এটার কোন মানে নেই।

নোটন তার আঙুলের ডগাদুটী যেমনকে তেমন ছোট থলেতে নিমজ্জিত করলো। **"শব্দ না ক'রে সাবধানে রেখে দিলে ডবল পয়সা।"**

(পৃষ্ঠা—৯২, ৯৩ বার বাঁদি বাক্)

সমস্ত বইতে আর কোথাও এদের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কোনো উল্লেখ নেই, যেটুকু উদ্ধৃত দিয়েছি মাত্র এইটুকুই তাদের দুজনের প্রতিষ্ঠা ভূমি, মন দিয়ে এই অংশটা পড়লেই বোঝা যাবে। লেখকের সব সময়ে কী অদ্ভুত তীব্র সচেতনতা ছিলো পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে। বিশেষ ক'রে বড় অক্ষরে লেখা অংশটী অদ্ভুত মনে হয়। ব্যঞ্জনাটী একটী নিটোল কবিতার মতো। ডবল পয়সা দিতে গিয়ে একটু আগে মেয়েটী অন্যায় করতে যাচ্ছিলো— তাকে যথাসময়ে যে সংশোধিত করা গেছে, এতেই সে আন্তরিক খুসী, সুতরাং অন্যায় কাজের জন্যে থলি থেকে তুলে নেওয়া মুদ্রাটী সে চুপি চুপি শব্দ না ক'রে থলির মধ্যেই রেখে দিলে। এ দৃষ্টিভংগীর প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না।

বাকী রইলো পুরশ্রী। তার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই। দারিদ্র-চরিত্রের পরিপূরক হিসেবে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাকে এম্পায়ারে নাচের আসরে, সন্ধ্যা বেলায় ফিরপো বা গ্র্যাণ্ড হোটেলে

আমরা অনেক দেখেছি তার সম্বন্ধে বেশী বলা বাহুল্য। যেমনটি প্রয়োজন ঠিক ততোটুকুই হ'য়েছে।

এর পরে কাহিনীটার আংগিকের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আংগিক সম্বন্ধে অচিন্ত্যবাবু চিরকালই বিশেষ-ভাবে সচেতন। সে দিক থেকে এই কাহিনীর প্রকাশ ভংগী অত্যন্ত উপযুক্ত হোয়েছে। সব থেকে ভালো লেগেছে, খুব সহজ সুরে খুব গভীর কথাটা শোনাতে পেরেছেন তিনি। এটা বিশেষ আনন্দের ঘটনা। আগাগোড়া লেখাটা পাঠক পাঠিকাকে রুদ্ধশ্বাসে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলে। কথোপকথনগুলি তাঁর এই গতিকে অত্যন্ত বেশী সাহায্য ক'রেছে।

খুব কাটাকাটা তীব্র কথা আরো এর তীব্রতাকে সাহায্য ক'রেছে এটা লেখকের সাম্প্রতিক দান। ইতিপূর্বে তিনি যে সব উপন্যাস লিখেছেন তাতে ঠিক এই তীব্রতা ছিলোনা। সেদিক থেকে এ আংগিক বিশেষ-ভাবে প্রশংসনীয়।

প্রকাশভংগী সম্বন্ধে আমাদের আরেকটু বলবার আছে। বহুত্ব গ্রন্থে কয়েকজায়গায় অত্যন্ত অল্প আয়াসে তিনি তাঁর বক্তব্যকে এতো সুন্দর ক'রে পরিবেশন ক'রেছেন তা দেখলে সত্যিই বিস্মিত হোতে হয়। আমি কয়েকটা ঘটনা উল্লেখ বা উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে লিপিবদ্ধ করছি

সহরে বোমাবর্ষণের আতংকে পলায়নপর জনতার যে অসহায়তা, তার মধ্যে রেলষ্টেশনে একটী মানুষকে দিয়ে তিনি কী চমৎকার সেই করুণ এবং হাস্যকর অবস্থাটীকে প্রকাশ করেছেন তা নীচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে :—

"এই গাড়ি, এই গাড়ি !'

দরোজা খুলবে না কেউ, না খুলুক। জানলা দিয়েই গলতে হবে ভিতরে। আগে মাল পরে মেয়েরা। লজ্জার সময় নয় এটা। বীরত্বের সময়। কুলির পাথালি কোল ডিঙে উপায় কি? 'তারপর এইবার আমি' জয়মা দুর্গা ব'লে শ্রীভূষণবাবুও কুলির কোলে উঠ্‌লেন। তাঁর এক-পাটি জুতো প্ল্যাটফরমে পা ফস্‌কে পড়ে গেলেও আরেক পাটি জুতো কুলি কায়দা করে খুলে নিলে।"

(পৃষ্ঠা ৫—যায় যদি যাক্‌)

সহরের পরিস্থিতি বোমাবর্ষণ সম্পর্কিত মিথ্যা রটনায় কি ভাবে প্রতিমুহূর্তে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, একটী মধ্যবিত্ত গৃহিনীর কথোপকথনের মধ্যে তা কতো সুন্দর এবং করুণ হাস্যরসের সংগে ফুটেছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষনীয় :—

"উনি বলেন, চিড়িয়াখানার সব বাঘ সিংহ রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে, অনেক দিন পরে লোক দেখ্‌বে আর পাখা উঁচিয়ে বলবে—হালুম !—সে কি ভয়ানক ব্যাপার ভাবো দেখি। ভাব্‌তেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আগের চেয়ে বেশী ভারিক্কি মুখে বউটী বলে।"

(পৃষ্ঠা—৬, 'যায় যদি যাক্‌')

সহর থেকে আত্মরক্ষার্থে নাগরিকারা এসেছেন গ্রামে—তাঁদের এবং গ্রামবাসীদের অবস্থা বর্ণনার কী অদ্ভুত রচনাশৈলী দেখুন :—

"গেঁয়ো সহরের লোকেরা হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। মাথায় বোঝা চাপানো, হাটুরে বেপারীরা ঘাড় ঘোরায়। আড়তদারের হাতে পাল্লা বেপাল্লা হোয়ে যায়। মুহুরিদের হাতের কলম কাণে গিয়ে ওঠে। বউকিরা ইতি উতি উঁকি মারে। যাঁরা নেহাৎ হেঁজি পেঁজি নয়, যারা ভদ্রলোক, তারা আড়বাঁকা হোয়ে চাউনিটা একটু কোণাচে করে। লীলায় লালিত চিত্রিতা হারিণীরা যেন নেমে এসেছে কোন দুরারোহ পর্বত থেকে। কারু বেণী। কারু লোটোন। কেউ বা আঁট দিয়ে গেরো বাঁধা। গাছের ছায়ায় পিক্‌নিক্ করে, নৌকো নেই ব'লে ছইহীন গরুর গাড়ীতে ব'সে খোলা গলায় গান ধরে। কেনই বা ধরবেনা শুনি? সবাই বেঁচে এসেছে উদ্যত মৃত্যু, নির্বারিত অপমান থেকে। ছাড়া পেয়েছে আকাশের আবহাওয়ায়। প্রৌঢ়ারা পর্যন্ত বেরিয়ে প'ড়েছে স্যাণ্ডেল পায়ে, লম্বা আঁচলে চাবির রিং বেঁধে। কেউ বা খাটো আঁচলে গাঁথুনি আঁটুনি ক'রে। বেরিয়ে পড়েছে, পাড়া বেড়াতে, তাদের সহরে স্পর্ধা ও সমৃদ্ধি দেখাতে। যার যতো কাপড় তার ততো নীত প্রমাণ করতে। নয় দুয়ারীর

মতো এ কোন নরকে এসে পড়েছে, তারই জলন্ত অবস্থি মুখে মেখে। স্কুল কলেজ পালানো নিষ্কর্মা ছেলের দল কনুই ক'রে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, পাটের গুদাম কেটে যেখানে সিনেমা বসানো হোয়েছে সেখানে গিয়ে চল্লা বাধায়। নদীর পারে যেখানে বা উডস্ত আঁচলে মেয়েদের জটলা। কাব্‌লি পায়ে, বুকের বোতাম খোলা শার্টে, উস্কু খুস্কু চুলে রাশ হালকা হোয়ে রাশিয়া রাশিয়া করে। সমস্ত ধনী নিঃস্ব হোয়ে বাবে ভেবে মনে মনে গরমের আরাম পায়। কোথায় কে যায়, কখন কে বাড়ী ফেরে, কোনো হিসপাস নেই।

অভিভাবকেরা শুধু বাজার করে।

…গেরো শহর হক্‌চকিয়ে গেছে। মেয়েরা সাইকেল শিখ্‌ছে, ছেলেরা নেশা করছে। ছেলেতে মেয়েতে মিলে সাঙাৎ পাতাচ্ছে। এদিকে জিনিষ পত্রের বেদম দাম। বাজারে রেজগী নেই পয়সা হঠাৎ পাখ্‌না মেলে উড়ে পালিয়েছে। পাকির ওজন নেমে এসেছে কাঁচির ওজনে।…গোজামিল জোড়া তালির দিন এখন।"

(পৃষ্ঠা—১৮-১৯, যায় যদি যাক্)

এককথায় অপূর্ব!

অভাবের তাড়নায় আর একটী জলন্ত বর্ণনা :—

"রাত ভোর কে ওই কাঁদছে না? হ্যাঁ, প্রিয়লাটীর বউ গোরাশশী। পিট্‌ছে বুঝি বউকে। চলো দেখে আসি কি ব্যাপার? না, গোরাশশী শিলে তার বুড়ো আঙুলের মাথা ঘসে ঘসে ঘা ক'রে ফেলেছে। তবু প্রিয়লাটী তাকে রেহাই দিচ্ছে না—বলছে, টিপের রেখা এখনো চুপ্‌সে যায়নি আরো ঘসো।

বুঝ্‌তে পারে এক নজরে। বউর নামে পত্ত দিয়েছে বেনামীতে, এখন আদালতে নালিশ ঠুকে মহাজন টিপ পরখের সাক্ষী মান্‌তেই মুরু ক'রেছে এ জালসাজি। বুড়ো আঙুলের মাথাটা একেবারে বেদাগ ক'রে ফেলেছে। ঘায় ক'রেছিস, কিন্তু পাপ তো করিস্‌নি, কেন এই ঘেক্ ঘেক্।"

(পৃষ্ঠা ৩২, যায় যদি যাক্)

আরেকটী জায়গা। 'সেবা' যেখানে তার অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের আশংকায় মুহ্যমানা। বাপিদি যখন তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার ক'রেছে তখন তার অবস্থা বর্ণনায় কি অদ্ভুত লিপি কুশলতা:—

"শুধু বিষন্ন নয়, বিপন্ন আজ 'সেবা'।

ছ গরুর গাড়ী যাচ্ছে বনের পথ দিয়ে। বাঘ এলো। গাড়ী ছেড়ে গাড়োয়ান বাঁদরের মতো লাফিয়ে উঠে পড়লো গাছে। বাঘ পড়ল একটা গরুর উপর, আরেকটা গরু মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তার হত্যার প্রতীক্ষায়!

সেই আরেকটা গরুর মতোই আতঙ্কে অসাড় হোয়েছিল 'সেবা'।"

(পৃষ্ঠা ৪৩, যায় যদি যাক্)

এর থেকে আর ভালো বর্ণনা আশা করা যায় না!

গ্রামে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, বাস্তুহারা হোয়ে যখন মানুষ গঙ্গলিকা প্রবাহের মতো আবার দলে দলে সহরে ফিরে আসছে, তখনকার বর্ণনা লক্ষ্য করুন :—

"সবারই মুখে দুর্ঘটনার ছাপ। ছেলে ডুবেছে জলে, মরেছে গাছ থেকে প'ড়ে। প'ড়েছে সাপে কাটা! মেয়েটা গেছে টাইফয়েডে। কারু চুরি হোয়ে গেছে সর্বস্ব।…দোকানের ঝাঁপ উঠ্‌ছে থেকে থেকে। পানের দোকান। মণিহারি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আস্‌ছে কতক রিক্‌শাওয়ালা। ঝাঁকা মুটে। বাক্স হাতে পরামাণিক দেখা যাচ্ছে দু' একজন। মুচিরা কেউ কেউ পায়ের তলায় গোরুর শিং চেপে ধ'রে সুঁচের মুখে বোম ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে জুতো সেলাই করছে। ভিখিরিরা জড়ো হোয়ে উঠ্‌ছে। পয়সার বদলে ভিক্ষে করছে ট্রামের কুপন।

(পৃষ্ঠা ৬৩, যায় যদি যাক্)

একটি তীক্ষ্ণ ব্যংগের অভিব্যক্তি :—

"গত যুদ্ধে দেখা দিয়েছিলো খাটো চুল আর খাটো ঘাঘ্‌রা, হাত কাটা খাটো সার্ট, আর পা কাটা খাটো প্যান্ট; এবারে দেখা দিয়েছে রেশনের থলে।

সম্রান্ত ভিক্ষার ঝুলি।" (পৃষ্ঠা—৯৫ যায় যদি যাক্)

সব থেকে স্মরণীয়, সব থেকে চমকপ্রদ এবং মানুষের মনে সব থেকে গভীর ভাবে যা রেখাপাত করে তাহ'চ্ছে,

যখন সুদীর্ঘ তিন পরে চালের কনট্রোলের লাইনে 'সেবা'র সঙ্গে তার স্বামীর দেখা হচ্ছে, তখনকার কথোপকথন :—

"গলি থেকে বেরিয়ে আসতেই গ্যাসপোষ্টের নিচে তাকে দেখে 'সেবা' চম্‌কে গেলো। কে একজন বুড়ো মতোন লোক দাঁড়িয়ে আছে থামে হেলান দিয়ে। যেন মাটীতে পড়ে যেতে যেতে সাম্‌লে নিয়েছে কোনরকমে। গায়ের জামা দিয়ে বুকের বিক্ষত পাঁজর ক'খানাই সে ঢেকে নি, ঢেকেছে অনেক পরাজয়, অনেক লাঞ্ছনার ইতিহাস। ...'সেবা' ভেবেছিলো, ক্ষুধিত জনতার এমনি হয় তো নিষ্ঠুরের প্রতীক, কিন্তু ঠাহর ক'রে চেয়ে দেখলো তার বাবা, শ্রীভূষণবাবু। হাতে রেশনের থলে।

মাটির মধ্যে সেঁধোনো ক'কে বলে, মাটীর উপর দাঁড়িয়ে থেকেই বুঝতে পারলো 'সেবা' এগুতে পারলো পিছুতেও পারলো ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো নিরুপায় হ'য়ে রইলো।

ভেবেছিলো, বাবাই হয়তো স'রে যাবেন। ঘৃণায় হয় লজ্জায়। রাগে না হয় বিরাগে। কিন্তু না এগিয়ে এলেন দু পা। আশ্চর্য, তারই অভিমুখে। নিঃসংকোচে বললেন, 'পেলি তুই' ?

'পেয়েছি।'

'আমি পেলাম না। আমিও গিয়ে পৌঁছলুম দোকানের কাছে, আর দোকান বন্ধ হ'য়ে গেলো।

সকল প্রশ্নের আগের প্রশ্ন, চাল পেয়েছিস্ কি না। কেমন আছিস্, কোথায় আছিস্, কি ভাবে আছিস—এ সব কোন প্রশ্নই আজ আর প্রধান নয়।"

(পৃষ্ঠা ১১৫—যায় যদি যাক্)

আর একটা জায়গায় :—

"বিকেল বেলা কনট্রোলের কেরু দোকান খুলবে। 'সেবা' তুলে নিলো সেই রেশনের থলে। থাকবার মধ্যে ওটাই শুধু আছে, জায়গায় জায়গায় কাপড়ের পাড় দিয়ে সেলাই করা ইঁদুর তার ভিতে মেটাতে দাঁত বসিয়েছে ওই থলেতে। সোণার উপরে মিনের কাজ করা।"

(পৃষ্ঠা ১৩৩, যায় যদি যাক্)

অপূর্ব প্রকাশ !

চেষ্টা করলে আরো হয় তো উদ্ধৃতি দেওয়া যায়—কিন্তু বাহুল্য বোধে এখানেই থামা গেলো। এর থেকেই বোঝা যাবে, লেখকের ভংগী কতো তীক্ষ্ণ এবং সুষ্ঠু।

এর পরেই ভাষা। একথা আজকে সকলেই জানেন, ভাষা সম্বন্ধে এই গ্রন্থকারের সচেতনতা কতো বেশী। তাঁর প্রথম রচিত গ্রন্থ থেকে আরম্ভ ক'রে এ পর্যন্ত যা তিনি লিখেছেন—সব কটী আলোচনা করলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁর যে নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা তা দেখ্‌লে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় নেই। সব থেকে প্রশংসনীয়, নতুন কথা সৃষ্টি করবার দিকে তাঁর সুদীর্ঘ কালের অবিরাম প্রয়াস। ফলে এর দুটো দিক গ'ড়ে উঠেছে। একদিকে যেমন তিনি নতুন নতুন কথা সৃষ্টি ক'রে আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ ক'রে বিত্তশালিনী করতে চেষ্টা ক'রেছেন, অপর পক্ষে তাঁর এই দিকে অস্বাভাবিক আকর্ষণ এবং মোহ থাকবার জন্যে এমন কতোগুলি কথার সৃষ্টি হ'য়েছে যা সাহিত্যে অপাংক্তেয় এবং অশোভন। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যা সুন্দর তাকেই সাহিত্যের আসরে আসন দেওয়া চলবে—যা অসুন্দর তাকে শিল্পীর রঙের স্পর্শে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করতে হবে। অচিন্ত্যবাবু যে সে বিষয়ে একেবারেই অ-সচেতন সে অভিযোগ কখনই করতে পারবো না। তবু তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে যে সব ত্রুটী চোখে প'ড়েছে এখানে তার কথা না বলা অন্যায় হবে।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে আমার বক্তব্যটা আশা করি স্পষ্ট হবে। যেমন দেখুন, চমৎকার ভাষার স্রোতের মধ্যে হঠাৎ একটা বেসুরো কথা বসানোর ফল কি হোয়েছে :—

"সুজনের গলায় সেই চমৎকার মসৃণতা। 'বিয়ে বোমার মতো অমন তাড়াহুড়ো ব্যাপার নয়। ওটা শক্তির ব্যাপার, শান্ত মাঠের ফসল। তারপর অবমাননা-কর সান্ত্বনার প্রলেপ আমি আছি, তুমি আছ,'—আজকের দিনে এই সত্য, এই অনুভূতিই জাজ্বল্যমান থাক্।

'সেবা' কাপড় কুঁচোতে লাগলো। সুজন গেলো মায়ামন্ত্রীর বাঁধা ছাদায় সাহায্য করতে। মায়ামন্ত্রী

শ্রীভূষণবাবুর মতো অতো **ভেড়াবুদ্ধি** নয়।" (পৃষ্ঠা ১১—যার যদি থাকে)

সমস্ত কথাগুলির মধ্যে 'ভেড়াবুদ্ধি' শব্দটি পাঠক পাঠিকাকে লাঠী নিয়ে তাড়া ক'রে আসে। একটী গানের চমৎকার সুরের নিটোল অপমৃত্যু। তবু রক্ষে এই, ছাপাখানার ভূতেরা কথাটী 'ভেড়াবুদ্ধি' ব'লে ছাপেনি, ছাপলে আমাদের অর্থবোধে কোন রকম বাধাই ঘট্‌তো না। সুতরাং লেখকের ভুল কি ছাপার ভুল বুঝবার উপায় থাকতো না। কথাটীকে ইচ্ছে করলে তিনি অনায়াসে পরিবর্তন করে দিতে পারতেন।

এ ছাড়া কতোগুলি নিতান্ত 'টেক্‌নিক্যাল' কথা আছে যাতে রস বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে মনে হয়, একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :—

"অন্তহীন দিগন্তের স্বপ্ন দেখে বারিধি। আইল ইন মাঠের। নিষ্কণ্টক অসপত্ন পৃথিবীর। খালি পায়ে ঘুরে বেড়ায় **হালটে**। কার কি জমি খোঁজ করে। **নোনা না মিঠে, আওল না নাবাল। নোনা শিকস্তি** হ'য়ে কার মাঠে অজন্মা হচ্ছে.....। হিন্দু মুসলমানে মিলে **মহব্বত করায়, মিলে জুলে** থাকতে শেখায়।" (পৃষ্ঠা ১৬-১৭, যার যাদ যাক্)

"তবু ভেঙে যাক এই ধোপদস্ত জীবন। জীবনের যা কিছু টুন্‌কো আর মেকী। বাজে আর ভেজাল। জলো আর জ্যালজেলে। যতো চং আর চামালি। কাপটোর পারিপাট্য। **আজাম সরজাম** যত জাল জোচ্চুরি। ধাধন মহাজনি। **রিষ বিষ। হাম্‌লা-হামলি।**

থাকবে না আর **বেছপ্পর** আর **বেএক্তিয়ার** বেকার আর বে-ইজ্জত। ফিকিরে ধারা ফকির সেজেছিলো, সব আজ বেগতিক। এসেছে আজ **চাল সুমারের দিন অবর রাত্রির অবসান।**" (পৃষ্ঠা ৮২-৮৩ যার যদি থাকে

"এই শক্তির উৎস হচ্ছে টাকা। **বে-খিরকিচ** টাকা। (পৃষ্ঠা ৯৭—যার যদি থাকে)

"তিনি নিজেও কখনো এরকম **বাছুনি** করতে পারতেন না.....কোন্ অজাত কুজাতের মেয়ে নিয়ে আসে ঘরে, সেই ভয়ে তিনি তটস্থ ছিলেন। কিন্তু একটা **আজোড়-জোড়ন।**" (পৃষ্ঠা ১১০—যার যদি থাক)

"বড্ডো বেশী ইজিচেয়ারের আলস্য। **ভঙ্গিয়ানের** ভংগী। সাত নকলে আসল না **খাস্ত** হয়।" (পৃষ্ঠা ১২৩—যার যদি থাক)

"হীরেন খাস্তগীর প্রথমে চিনতে পারেন নি। কঙ্কালসার চেহারা। **ডিমেরোগা।** (পৃষ্ঠা —১২৬ যার যদি থাক)

'নোনা শিকস্তি মহব্বত করা, দেকসেক্, চং আর চামালি, আজাম সরজাম, রিষ বিষ, হামলাহামলি, বেছপ্পর, বে-এক্তিয়ার, চালসুমার, অবর, বেখিরকিচ, বাছুনি করা, আজোড় জোড়ন'—এ সব শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কতো-খানি এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বরং এতে তাঁর ভাষার যে অপূর্ব সুন্দর সুরটীকে পাচ্ছিলাম এবং তার দিকে যেন সঙ্গীন উঁচিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ করে 'অবর রাত্রির অবসান' কথাটীর অর্থ বোঝা এক সমস্যা মনে হয়। অথচ লক্ষ্য করবার ব্যাপার এই, যেখানে তিনি সহজে তাঁর স্বাভাবিক রচনার ভংগীতে লিখেছেন সেখানে তাঁর ভাষার সম্পদ এবং রচনাভংগী সূর্যের মতো ভাস্বর :—

"উজ্জ্বল নিষ্ঠুরতা যুগের মতো চেয়ে থাকে বারিধি। যা ক্লিষ্ট ও পাণ্ডুর তা যে এতো সুধাস্নিগ্ধ হতে পারে তা সে ভাবতেও পারতো না। দারিদ্র্য ও কদর্যতা যে হ'তে পারে এতো দীপ্ত কীর্তি, এ নিজের চোখে দেখেও তার অবিশ্বাস মনে হচ্ছে। বারিধি অমিতাংশিতের মতো চেয়ে রইলো।" (৮০ পৃষ্ঠা যার যদি থাক)

"সরল সফরীর মতো ছিলো, এখন যেন হয়েছে অগাধ জলের মাছ। গ্রীষ্ম মণ্ডল থেকে চলে এসেছে মন্দোষ্ণ মণ্ডলে। কোমল ভাব ছেড়ে এখন সে হয়েছে রুক্ষ, শক্ত, অচিক্কণ। এতদিনে ব্যক্তিত্ব তার ছাঁদ বেঁধেছে। সে আজ আর কুলংকষা নয়, সে আজ মানস সরোবর, আজই বুঝি সে ধ্যানের ও সন্ধানের।

সত্যি তাকে বারিধি ফিরিয়ে নিতে এসেছিলো, তার প্রথম পরম অধিকারে। কিন্তু এসে দেখলে, অনেকদূরে

সংসারের শিকড় গাড়িয়ে দিয়ে সে কৃতজ্ঞতার নিশ্চিন্ত রসে শুভ্র শুচি দুঃখের ফুল হ'য়ে ফুটে আছে। আর যেন তাকে ছেঁড়া যাবে না। ছোঁয়া যাবে না। এমনি এক তীক্ষ্ণতা। সে এখন অনেক দূর দুর্গম, এমনি এক নির্জন নিবৃত্তি।" (৮১ পৃঃ যায় যদি যাক)

"দিগন্তে বর্ণ-বিদীর্ণ সন্ধ্যা, সবুজ সমুদ্রে চাঁদের মুক্ত স্নান, শুভ্র মধ্যাহ্নের মন্থর মদিরা একবার এসে ডাক দিলো সুজনকে।" (১৩৪ পৃষ্ঠা—যায় যদি যাক্)

"সেই আলামালিনী মেয়ে কেমন যেন এখন ছায়া-কারিণী হ'য়ে উঠেছে। খট্‌খটে রোদের উপর নিয়ে এসেছে ঠাণ্ডা কালো মেঘ। হীরেন খাস্তগীরের বরখাস্তর দিন দিয়েছে পিছিয়ে।" (১২৮ পৃষ্ঠা—যায় যদি যাক্)

সুতরাং ভাষা সম্বন্ধেও যিনি এতোটা 'দীপ্তকীর্তি' তিনি যে কেন স্ব-ইচ্ছায় কোন কোন জায়গায় 'ম্লানকীর্তি' হ'চ্ছেন, তা আমাদের কল্পনার বাইরে।

লেখক বলতে পারেন, শব্দগুলি যথাযথ পরিবেশকে চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পারে। সে কথা মানি, কিন্তু সেটা একজন কোন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে হ'লে খুব সুন্দর হয়, কিন্তু লেখককে ঠিক সেই জন্যেই তাঁর রচনার রাজকীয় প্রাসাদের উপরের তলা থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে একেবারে নীচের তলায় নেমে আসতে হবে এমন কোন কথা নেই। আমরা চাই তিনি তাঁর আসনে অটল হ'য়ে ব'সেই লিখবেন —তাঁর স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে নীচে নেমে এসে যা তিনি রচনা করবেন, তাতে তাঁর স্বকীয়তা থাকবে না, থাকতে পারে না—একটা চেষ্টাই থাকতে পারে। একটি চমৎকার সোণার মূর্তির যদি খানিকটা হয় সোণা খানিকটা রূপো বাকী অংশটা তামা ও পিতলের; তাহ'লে যতোই ভালো দেবী মূর্তি হোক তা দিয়ে—আমাদের শিল্পী মনের প্রণাম সেখানে নিশ্চয়ই পৌঁছবে না।

কি ক্ষতি হোত যদি তিনি আমার উপরের উদ্ধৃত লেখাটার ভংগীর সমতালে সমস্ত গ্রন্থখানি রচনা করতেন?

আর একটী কথা। অনুপ্রাস বাহুল্যের জন্যে অনেক জায়গায় ভাষার ত্রুটী ঘটেছে। অনুপ্রাস থাকুক, কিন্তু তা পরিমিত হোক। অনেক জায়গায় জোর ক'রে অনুপ্রাস দিতে গিয়ে সমস্ত সুরটাই নষ্ট হ'য়ে গেছে—এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

২০ পৃষ্ঠায় "বাপের হস্তবুদে খাঁকতি পড়ে এ কখনো চায় নি বারিধি"—এর অর্থ ঠিক বোঝা গেল না।

এবারে সমস্ত গ্রন্থটীর সামগ্রিক পরিণতি বা আবেদন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা ক'রে আমাদের এ সমালোচনার উপসংহারে পৌঁছুতে চাই।

১৩৫০এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমাদের দেশে এপর্যন্ত কম লেখা হোলো না। বিশেষ ক'রে ছোট গল্পের তো সীমা সংখ্যা নেই। বেশীর ভাগই তার মধ্যে তরল রচনা! এ রচনাটী সে হিসাবে আমাদের মনে কতোখানি রেখাপাত করে সেটাই ভেবে দেখা দরকার।

বইখানি পড়তে যে ভালো লাগে—পড়বার সময়ে মন যে কোথাও বাধা অনুভব করে না; এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রায় প্রত্যেকটী চরিত্রকেই রক্তে মাংসে যেন আমাদের চার পাশে চলাফেরা করতে দেখেছি মনে হয়; তবে সমস্ত লেখাটী পড়বার পর এইটা মনে হয় যে কোথাও কোথাও সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা নাটকীয় ভাব এসে পড়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে নাটকের উপাদানও তো আমাদের এই জীবনের মধ্যে থেকেই আহরণ করা হোয়ে থাকে, তাহ'লে এরকম রচনায় যদি তার প্রভাব এসেই পড়ে তাতে ক্ষতি কোথায়? ক্ষতি হয়তো তেমন বিশেষ কিছু নয়—তবে যেটা কাহিনী, সেটাকে কাহিনী হিসেবেই পেতে ভালো লাগে। সবন্ধু এবং বান্ধবী যেখানে কয়েক দিন পরে কাশ্মীরে প্রমোদ বিহারে যাবার কথা ছিলো কয়েকদিন পরে বাধ্য হ'য়ে তার পরিবর্তে যদি এয়ারোপ্লেনের পাইলট হয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে যোগ দিতে হয়, তাহ'লে মানুষের মনের যে অবস্থা আসে, হয়তো সেই রকমই কোনো অসামঞ্জস্য। এর বেশী কিছু নয়।

যায় যদি যাক্ আমাদের পাঠক পাঠিকাদের, বিশেষ ক'রে যাঁরা সেই সময়ে কলকাতায় ছিলেন তাঁদের ভালো লাগবেই এই আমার দৃঢ় ধারণা, কারণ লেখক তাঁর অপূর্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেই সময়ের মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি

দৈন্য প্রতিটী অভাবকে যে ভাবে লক্ষ্য করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন, তা সত্যিই আলাময়ী—তা সত্যিই মর্মান্তিক।

শিল্পীর জীবনের কাজ তো এইখানেই সার্থক হয়। তাঁর মতো আমরাও প্রতিদিন এই দুঃখকে দেখেছি। কষ্ট পেয়েছি, আমাদের জীবন প্রতি পলে দুর্বিসহ হ'য়ে উঠেছে, তবু আবার যখন দিন ফিরলো তখন তার একটা বিষণ্ণ ছায়া ছাড়া আমাদের আর কিছু মনে রইলো না; কিন্তু লেখক এখানে যে সহানুভূতি এবং স্নেহ দিয়ে এই ছবিগুলি এঁকে রাখলেন, সেখানে তাঁর সেই দুঃখবোধ—তাঁর সেই সমবেদনা চিরকালের হ'য়ে রইলো। রেকর্ডে তোলা গানের মতো, যখনোই বাজানো যাবে—বাজবে।

তবে কথা উঠতে পারে, কিছুকাল পরে দেশের লোক এ গ্রন্থের হয়তো শুধু একটা ঐতিহাসিক মূল্যই দেবে—তার বেশী সম্ভবতঃ আশা করা যাবে না।

না গেলো! তবু তার দাম কম নয়! আগেই বলেছি, সেদিক থেকে বিচার করলে সাময়িক সাহিত্যের আয়ু নিঃসন্দেহে কম, কিন্তু তাই ব'লে সাময়িক সাহিত্য রচিত হবে না, একথাও তো বলা চলে না।

যে বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে একই লেখা হ'য়েছে, তা আমাদের দেশের ললাটে—বিদেশী শাসক প্রভুদের হাতে পরিয়ে দেওয়া একটা কলংক তিলক ছাড়া আর কিছু নয়; এই দুর্গতি যে স্বয়ং-সৃষ্ট—, একথা এদেশের আপামর সকলেই জানে; সুতরাং তার কাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে যে হতাশা এবং ধ্বংসের গানই বাজবে এতে আর সংশয় কোথায়? তবু এই প্রসংগে বইখানি সম্বন্ধে শেষ কথা বলতে গিয়ে মনে হচ্ছে, যখনই কোনো দুঃখ আসে, দুর্গতি আসে, দেশের শিল্পীদের কাছে আমরা তখনই আশ্বাসবাণীর আশা করে থাকি, কারণ তাঁরাও এক অর্থে দেশ-নায়ক।

অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাবার মন্ত্রও তাঁরা দীক্ষিত হ'য়ে লেখনি হাতে তুলে নিয়েছেন—সুতরাং ছোট ছেলে যেমন তার বিপদের সময়ে মায়ের কাছে এসে আশ্রয় নেয়, আমরাও শিল্পীদের কাছ থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেই রকম আশ্বাস বাণী পাবার জন্যে সব সময়ে উন্মুখ হয়ে আছি। অন্ধ আমরা; কিংবা ক্ষীণদৃষ্টি আমরা আমাদের তাঁরাই তো যুগে যুগে সংকটের মধ্যে চিরকাল পথ দেখিয়ে এসেছেন। সেই সাহিত্য, সেই সৃষ্টি তখনই চিরজীব হোয়ে ওঠে যখন তাতে এই আলোর অমৃতময় স্পর্শলাগে, তখনই তা শাশ্বত সত্যে পরিণত হয়। তার জন্যেই তো যুগে যুগে মানুষের প্রার্থনা ঊর্ধ্বায়িত হ'য়ে উঠেছে।

উপসংহারে আর একটু নিন্দা করবার ছিলো। সেটা আর কিছু নয়, এই কাহিনী রচনা করতে গিয়ে তিনি যে একটা সমস্যার মুখোমুখি হ'য়েও তাকে শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে এসেছেন সেই জন্যে। বিস্তৃত পটভূমি পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু যেখানে সত্যিকারের উপন্যাসের আরম্ভ হোতে পারতো সেখানেই তিনি ছোট গল্পের আংগিকে রচনা শেষ করেছেন—এটা দুঃখের। সুদূর বিরাট পটভূমিতে লেখকের দৃষ্টিক্ষেপের প্রয়োজন ছিলো, আরো কয়েকটী মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনকে এই কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশিত করতে পারলে, আমাদের মনে হয়, তাঁর বক্তব্য সুসম্পূর্ণ হোত।

মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আরেকটী ত্রুটী দেখিয়ে আমাদের কথা শেষ করি। 'সেবা' যেখানে অনেকদিন পরে তার বাবাকে কনট্রোলের লাইন থেকে বেরিয়ে এসে চাল দিচ্ছে, তখন তার উচিত ছিলো তাঁকে অন্ততঃ মায়ের কথা জিজ্ঞেস করা—সেটাই সব থেকে স্বাভাবিক হোত।

পরিশেষে বলি, যদিও এ গ্রন্থ নৈরাশ্যের কাহিনী—দুর্গতির অনন্ত স্রোতে ভেসে আজ আমরা কোন নরকে এসে পৌঁছেছি তারই জীবন্ত বর্ণনা; তবুও মনে রাখতে হবে এ-ও সত্য—এরও মূল্য অপরিসীম—আমাদের আত্মবিশ্লেষণের দিক থেকে এই সব রচনা একান্ত অপরিহার্য!

গ্রন্থকারকে রচনাটীর জন্যে—আমার অন্তরের নমস্কার জানাচ্ছি।

আমাদের সাহিত্য ভবন
কলিকাতা।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

এই বৎসর সন্তোষট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা বেশ সমারোহের সহিত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইল। শক্তিশালী ভারতীয় ফুটবল টীম গঠনের জন্য ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তি ও নিজেদের ভুল ত্রুটী সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য এ জাতীয় প্রতিযোগিতা একান্তই প্রয়োজন।

এই প্রতিযোগিতা ফুটবল খেলার একান্ত উৎসাহী সন্তোষের মহারাজার নামে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ১৯৪১ সাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গলা দল ফাইন্যালে হায়দ্রাবাদ দলকে ৫-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া এই প্রতিযোগিতার জয়লাভে সমর্থ হইয়াছে। পূর্বে বাঙ্গলা দল ১৯৪১, '৪৫ ও '৪৭ সালেও বিজয়ীর সম্মান লাভে সমর্থ হয় এবং প্রত্যেক বৎসরেই ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার যোগ্যতা লাভ করে। সন্তোষট্রফির খেলায় একটী আশ্চর্যজনক বিষয় হইতেছে যে কোনো খেলা অমিমাংসিতভাবে কখনো শেষ হয় নাই। বাঙ্গলা দল এই বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে এখনো বাঙ্গলা সমস্ত ভারতের মধ্যে ফুটবল খেলায় শীর্ষে অবস্থান করিতেছে। অবশ্য এর জন্য বিভিন্ন প্রদেশের বহু আমদানী খেলোয়াড় বাঙ্গলার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই। প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড় লইয়া যদি বাঙ্গলা দল গঠিত হইত এবং বাঙ্গলা আজ বিজয়ীর জয়টীকা পরিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা আরো বেশী আনন্দিত ও গর্বিত হইতাম।

কিন্তু বাঙ্গলা দলের খেলা দেখিয়া আমরা মোটেই আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। খেলাতে সঙ্ঘবদ্ধতা ও ক্ষিপ্র গতি যাহা বাঙ্গলার খেলোয়াড়দের পূর্বের সম্পদ ছিল সে প্রতিভা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। খেলোয়াড়েরা গোল করা অপেক্ষা নিজেদের কেরামতি জাহির করিতে ব্যস্ত। নিজেদের উপর তেমন আত্মবিশ্বাস নাই। গোলের সম্মুখে দুর্বল শট্—ও সমস্ত আক্রমণ যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। এই সকল ভুল ত্রুটীর বিষয়ে বাঙ্গলার খেলোয়াড় ও পরিচালকগণের একান্ত ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন; অন্যথায় বাংলার সম্মান রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে যে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অবশ্য এর জন্য খেলোয়াড়দের বেশী দায়ী করিয়া লাভ নাই। নির্বাচকমণ্ডলীর খামখেয়ালী নির্বাচনও ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। নির্বাচক মণ্ডলী অন্যান্য প্রদেশকে বোধ হয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে 'বুড়ির ঝুলিতে' এত খেলোয়াড় জমায়েত রহিয়াছে যে নিত্য নূতন খেলোয়াড় নামাইয়া সব তাক্ লাগাইয়া দিবেন।

সবচেয়ে হাস্যকর বিষয় 'বুড়ির ঝুলি' হইতে দৈনিক অধিনায়ক পরিবর্তন। প্রথমে দেখিলাম সিংহাসনে অনিল দে, বুঝিলাম পুরাতন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, বড়ো ক্লাবের মোটা গদির সহিত যুক্ত; যাহোক নির্বাচন ঠিকই

হইয়াছে। ও হরি, হঠাৎ দেখিলাম সিংহাসনে মান্না উপবিষ্ট। কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলাম। চিন্তা করিয়া দেখিলাম মান্না তো এ বৎসরে কলিকাতার মাঠে বিশেষ পদার্পণ করেন নাই এবং যা দুচারদিন মাঠে পদর্পন করিয়াছেন তাহাতে তাহার ক্লাবের সভ্যগণ, ক্রীড়ামোদী দর্শকগণ আনন্দ অপেক্ষা নিরানন্দই বেশী লাভ করিয়াছেন। অথচ তিনি স্থান পাইলেন একেবারে অধিনায়কের আসনে?—গত বৎসরে অলিম্পিক খেলার পর ব্যাকিংহাম প্রাসাদে রাজার সহিত করমর্দন কি তাঁহাকে এ সম্মান দিল? না পরিচালক মণ্ডলীর নেক নজরে ইহা ঘটিল?

নির্বাচকমণ্ডলীর কেরামতিতে অভিভূত হইলাম মান্নার খেলা দেখিয়া। কোনো খেলোয়াড় যে এত নিরুষ্ট খেলিবে বলিয়া স্থান লাভ করিতে পারে তাহার অপূর্ব নিদর্শন মাঠে বসিয়া দেখিলাম'। মনে মনে দণ্ডবৎ ভক্তি করযোড়ে ফুটবল বিধাতার পায়ে উজাড় করিয়া দিলাম, মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল 'মার দাবা'।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এস, নন্দী। বাংলার বিজয়মুকুট হস্তে ভাগ্যবান ব্যক্তি হাস্যমুখে বাহির হইয়া আসিলেন। ফাইন্যাল খেলার দল গঠনে মধ্যভাগের বামদিকে দেখিলাম অভয় ঘোষ নাই। তাহার স্থানে আসিলেন এস, রায় অভয় ঘোষ এবৎসর যেরূপ খেলিতেছেন এবং সন্তোষ ট্রফির প্রত্যেকটী খেলায় যেরূপ দর্শনীয় খেলা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন তাহাতে তাহার স্থলে এস, রায়ের মত খেলোয়াড়কে না দেখাইলে নির্বাচক মণ্ডলীর ফাইন্যাল প্যাচ দেখানো হইত কি?

'তোবা তোবা' বলিতে বলিতে মনে আসিল ভেঙ্কটেস্ ও আমেদ খাঁর নাম। মনে মনে বলিলাম তোমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই এ নির্বাচনে তোমাদের স্থান লাভ না করায় তোমাদের সম্মান অক্ষুন্নই রহিয়াছে। অন্ততঃ বাংলার প্রকৃত খেলোয়াড় ও দর্শকগণ তোমাদের খেলোয়াড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিবে।

ভারতীয় ছাত্র দলের আফগান সফর:—আফগান গভর্ণমেন্টের আমন্ত্রণক্রমে ভারত গভর্ণমেন্টের অনুরোধে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ভারতবর্ষ হইতে একটী ফুটবল দল প্রেরণ করিয়াছেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র নির্বাচিত হইয়াছে; অবশ্য ৪।৫ জন ছাত্র ব্যতীরেকেও আছেন। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের আবিদ অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। আমরা ভারতীয় ছাত্র দলের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি ভারতের সম্মান তাহারা উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিয়া আসিবে।

ভারতীয় দল গঠন:—আগামী অলিম্পিকে ভারতীয় দল গঠিত হইবে তাহার জন্য ট্রায়ালে যাহারা স্থান লাভ করিয়াছেন তাহাদের নাম বাহির হইয়াছে। নামগুলি পড়িয়া দেখিলাম বহু দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়ও তাহাতে সুযোগ লাভ করিয়াছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হইতেছে গত বৎসরের অলিম্পিক খেলোয়াড় ও বর্তমান বৎসরে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ দক্ষ খেলোয়াড় আমেদ খাঁর নাম তাহাতে নাই। বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাইট আউট ভেঙ্কটেশও স্থান লাভ করেন নাই। ফুটবল বিধাতাদের এই খামখেয়ালী জনসাধারণ আর কতদিন নীরবে সহ্য করিবে? যাহারা উপযুক্ত খেলোয়াড়কে নিজের স্বার্থসিদ্ধির বা জেদ বজায় রাখার জন্য দেশের সম্মানকে অবহেলিত করিতে দ্বিধা করেন না, তাহাদের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদী ও উৎসাহী দর্শকগণ নিশ্চয়ই অবনত মস্তকে এ অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া ভারতের ফুটবল ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করিবেন না আশা করি?

ক্রিকেট:—গত ৩১শে জুলাই তারিখে ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের মিটিংএ ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যে জঘন্য কলঙ্ক সৃষ্টি হইতে বসিয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ক্রিকেট খেলায় ভারত আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটা স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সুতরাং আজ ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে যদি কোনো কলঙ্কের সৃষ্টি

হয় তবে তাহাতে সমস্ত পৃথিবীর কাছে
নিচু করাইতে সন্দেহ নাই

ক্রিকেট বিধাতা মেলো সাহেব পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। এবং বোর্ড অব রুল সাহেবের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ বিনাসর্তে তুলিয়া লইয়াছেন ও তাহাদের অভিযোগ যে আইন বহির্ভূত হইয়াছে তাহাও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অমরনাথও মেলো সাহেবের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে একলক্ষ টাকা সহী করিয়া যে মানহানির মামলা রুজু করিয়াছিলেন তাহাও তুলিয়া লইবেন জানাইয়াছেন।

সব চাইতে আনন্দের বিষয় হইতেছে যে ভারতের প্রিয় অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট পুনরায় সুস্থ হইয়া অধিনায়কের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া ও ওয়েষ্টইণ্ডিজের বিরুদ্ধে বিজয় মার্চেন্ট অসুস্থতার জন্য খেলিতে পারেন নাই তাহার জন্য ভারত অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। কমনওয়েলথ টিমের বিরুদ্ধে পুনরায় আমাদের প্রিয় অধিনায়ককে পাইয়া সমস্ত ভারত অত্যন্ত আনন্দিত হইবে সন্দেহ নাই। তাহার শারীরিক সুস্থতা যেন অটুট থাকে ইহাই আমরা একান্তভাবে প্রার্থনা করি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ক্রিকেট লাভ করিয়াছেন।

সভাপতি—মিঃ ডি মেলো।

সহ সভাপতি—জে সি মুখার্জি, মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম, কে এস রঙ্গরাও, সি কে নাইডু, পি এইচ কুঠার।

সম্পাদক—এম, জি, ভাবে।

কোষাধ্যক্ষ—জেড্, আর, ইরাণী।

আই, এফ, এ, শীল্ড।

আই, এফ, এ শীল্ড প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ভারতের মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা সারা ভারতের খেলোয়াড় ও ক্রীড়ামোদীর আশা, আকাঙ্খার খোরাক দীর্ঘদিন ধরিয়া জোগাইয়া আসিতেছে তাহাতে এ বছর যেন তেমন প্রাণ নাই। বহিরাগত কোন দলই তেমন শক্তিশালী নয়। খেলা দেখিয়া যাহা মনে হয় তাহাতে স্থানীয় দুটী দলের মধ্যেই যে প্রতিযোগিতা চলিবে সেকথা একরূপ জোর করিয়াই বলা চলে। যাহা হোক আগামী বারে I. F. A. এর সমস্ত খেলার বিষয় আমরা বিষদভাবে আলোচনা করিব।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষ—

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয়-বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। দু' বৎসর পূর্বে কংগ্রেস ছিল জাতীয় সংগ্রামের প্রতিষ্ঠান এবং জনতাকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করার নেতা।—দু' বৎসর পূর্বে ঠিক ঐ দিনে রাতারাতি কংগ্রেসের এত দিনকার কর্মপদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানগত প্রকৃতি পরিবর্তিত হ'ল—প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার কাজ থেকে হঠাৎ কংগ্রেসের ওপর দায়িত্ব এল শাসন-ব্যবস্থাকে চালু সামাজিক ও অর্থনৈতিক নূতন আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলার। যে প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দল এতদিন রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল, তাকে হঠাৎ গ্রহণ করতে হ'ল রাষ্ট্র চালাবার গুরু দায়িত্ব—যে কাজের কোন অভিজ্ঞতা ও মানসিক প্রস্তুতি তার ছিল না। যে অবস্থায় কংগ্রেসকে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে হয়েছে তাও সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। দেশের নৈতিক ও বস্তুগতিক অবস্থা যখন চরম সঙ্কটময় দশে ইংরেজ বুঝেছে কেবল তখনই সে ভারতবর্ষের ওপর আধিপত্য ত্যাগ করতে রাজী হয়েছে। অর্থাৎ পৌণে দু'শ বছরের কুশাসনও শোষণের ফলে ভারতবর্ষের অবস্থা যখন তার পক্ষে অসম্ভব ও অপ্রতিকার্য হ'য়ে উঠেছে—কেবল তখনই সে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে রাজী হয়েছে।

কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে এই নূতন দায়িত্ব মোটেই সহজসাধ্য হয়নি। শাসনকার্য পরিচালনার পক্ষে কংগ্রেস একদিকে পেয়েছে ইংরেজের পরিত্যক্ত আমলাতন্ত্র, অপরদিকে পেয়েছে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস কর্মীর দল। ইংরাজের আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম কাজের জন্য ও অন্যরকম রাষ্ট্রের জন্য সংগৃহিত ও শিক্ষিত হয়েছিল। ইংরাজ পালিত রাষ্ট্র ছিল বিদেশী শাসনকে কায়েমী রাখার জন্য আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার শাসন। ইংরাজের আমলাতন্ত্র ঠিক ঐ রাজ্যের উপযোগী হিসাবেই শিক্ষিত ও গঠিত হচ্ছিল। কিন্তু স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র দায়িত্বশীল লোকসেবার এবং নূতন সমাজ গঠনের যন্ত্র। এ দায়িত্বের শিক্ষা ও ঐতিহ্য ইংরাজের আমলাতন্ত্রের ছিল না। তাই এই আমলাতন্ত্র দিয়ে কংগ্রেসের শাসনকার্য পরিচালনা খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয়নি। এতদিনের শিক্ষা ও রীতিনীতি হঠাৎ একদিনে বর্জন করা এ আমলাতন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই অনেকক্ষেত্রেই কংগ্রেসের নূতন কর্মপদ্ধতি এই আমলা-তন্ত্রের জন্য ব্যাহত হয়েছে। অথচ একটা চালু শাসন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখার জন্য; বিশেষ ক'রে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, এই আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনও আছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের যুগে দেশে আইন শৃঙ্খলার সম্মান প্রায়স্থানে রক্ষিত হয় নাই ;—ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। ক্ষমতাভিলাষী বিভিন্ন দল নানাপ্রকার উৎপাতের সৃষ্টি ক'রে সন্ত্রাসমূলক কার্যপদ্ধতি নিয়ে দেশে একটা অরাজকতার ভাব আনবার চেষ্টা করে, এবং ভারতবর্ষেও সেই প্রমাণ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ ক'রে সাম্প্রদায়িক অরাজকতার মুখে ইংরাজ দেশের শাসনভার হস্তান্তরিত করল তাতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কংগ্রেসী শাসনকর্তাদের পক্ষে একটা বিশেষ দায়িত্ব হয়ে পড়েছিল। শত দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই আমলাতন্ত্র সেই আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। কাজেই হঠাৎ প্রচলিত আমলাতন্ত্রকে বর্জন করা কোনরকমেই সম্ভব ও সঙ্গত হ'ত না। এই অসুবিধা ও প্রতিবন্ধককে স্বীকার করেই কংগ্রেসকে দু'বৎসর শাসনকার্য চালাতে হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের পক্ষে নূতন সমাজ গড়বার জন্য অপর বহু ছিল তা হ'ল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও অগণিত কংগ্রেস কর্মী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দেশে ব্যাপক অসততার বন্যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও ধ্বসে পড়েছে। যাঁরা দীর্ঘকাল ত্যাগস্বীকার ও কষ্টবরণের ভেতর দিয়ে দেশসেবা ও লোকসেবার আদর্শ নিয়ে চলছিল তারা হঠাৎ সাফল্যের সন্ধান পেয়ে নিজেদের আদর্শ হ'তে বিচ্যুত হ'ল। যখন কংগ্রেস কর্মীদের পর্যায় থেকে কয়েকজন লোক মন্ত্রিত্বের গদিতে বসে কতকটা স্বাচ্ছন্দ্যের ও কর্তৃত্বের অধিকার পেল, তখন তারা যেন হঠাৎ জমকের মোহে নিজেদের কৃচ্ছ্রসাধনের আদর্শকে বিসর্জন দিল। এর ফলে অবশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীদের মনে একটা ঈর্ষা ও প্রলোভনের ভাব জাগতে লাগল। একসঙ্গে যারা চলছিল তাদের ভেতর কয়েকজন গেল কর্তৃত্বের গদিতে এবং সেখানে গিয়ে সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের থেকে একটু স্বতন্ত্র ও উচ্চতর মনে করতে লাগল। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সাধারণ কংগ্রেস-কর্মীদের ভিতর অনিবার্য; যদিও নীতিশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বলা চলে যে এরকম না হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াই অনেক সময় প্রবল হয়ে ওঠে, নৈতিকবোধ সব সময় নিজের প্রাধান্য রাখতে পারে না।

এর ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর শাসনকার্যের জন্য যতটা নির্ভর করা সঙ্গত ছিল স্বাধীনভারতে তা সম্ভব হল না। তাই এই দু'বছরের শাসনকার্যে অনেক ভুল-ত্রুটী হয়েছে, কিন্তু তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে নূতন অবস্থায় এমনি ভুল ত্রুটি অনিবার্য। ফরাসী বিপ্লব ও রুষ বিপ্লবে এর চেয়ে অনেক গুরুতর ভুল ত্রুটি হয়েছিল। তাছাড়া, এ দু'বছরে সাফল্য ও যতটা হয়েছে তাও খুব কম নয়। যখন কংগ্রেস প্রথম শাসনভার গ্রহণ করে তখন দেশে এক ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সবাই করেছিল। কিন্তু যে ক'রেই হোক কংগ্রেসী মন্ত্রীদের, বিশেষ ক'রে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের শাসন কৌশলে সেই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পেয়েছে। আজ দেশের খাদ্যপরিস্থিতি দু'বছর পূর্বের চেয়ে বহু পরিমাণে উন্নত ও সহজ হয়েছে। আশা করা যায় আগামী ২।১ বছরে খাদ্য-পরিস্থিতি আরও উন্নত হ'য়ে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে। এখানে স্মরণ করা উচিত যে রুষ বিপ্লবের পর ক'বছর ধ'রে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মহামারী চলছিল। যা পাইনি তার জন্য আক্ষেপ হয়ত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু যে দুঃখদৈন্যের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছি তার স্বীকৃতিও মানুষের মনে থাকা উচিত।

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা পুনঃস্থাপন, মানুষের জীবন ও ধন সম্পত্তির প্রতি মর্যাদা ফিরিয়ে আনা, স্বল্পশত দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন ক'রে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি বড় বড় সাফল্যমূলক ঘটনা ছাড়া ছোটখাট ক্ষেত্রেও দু'বছরে কংগ্রেসী শাসন কিছু, কিছু সাফল্য লাভ করেছে। দু'বছর পূর্বে রেলের ও ডাক বিভাগের সময় নিষ্ঠা সম্পর্কে কোন আস্থাই দেশবাসীর মনে ছিল না। আজ তা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ফিরে এসেছে। চিঠি ও টেলিগ্রামের ও ট্রেনের যাতায়াতে মোটামুটি নির্দিষ্ট সময় বজায় রাখা হয়। আশাকরি ব্যাপক অসততার ও কিছুটা হ্রাস দেখা দিয়েছে। শাসনকার্যে যে সব শিথীলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা দু'বছর পূর্বে দেখা যাচ্ছিল তাও হয়ত কিছুটা কমতির পথে। সর্বোপরি অন্ন ও বস্ত্রসঙ্কট-দু'বছর পূর্বের ন্যায় আজ আর তেমন তীব্র নেই।

স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে এসব সাফল্যের কথা আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য। স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিকদের নূতন সমাজ গড়বার যে দায়িত্ব তাও প্রত্যেকের ঐদিনে স্মরণ করা উচিত। এ কথা স্বীকার করতেই হবে আজও আমরা নূতন সমাজ গড়বার লক্ষ্য থেকে বহু দূরে আছি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার যে দায়িত্ব তা সমবেত ভাবে সমস্ত জাতিকে গ্রহণ করতে হবে; কেবল স্বাধীন ভারতের নূতন রাষ্ট্রের ওপর তার দায়িত্ব ফেলে রাখলে চলবে না। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতার লোভে কংগ্রেস ও কংগ্রেসী সরকারের

বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে তার গোড়ার কথা হ'ল মানুষের অনিবার্য দুঃখবৈভবের সুযোগ নিয়ে তা'দিগকে হিংসা ও বিদ্বেষের পথে চালিত করা। এখানে বিচার করা কর্তব্য এই সব বিভিন্ন দলের অতীত ঐতিহ্য কি এবং ভবিষ্যতের পক্ষেও বা তাদের কার্যকারিতা কতদূর। যারা আজ খুব সস্তা দরদ দেখিয়ে জনমন অধিকারের চেষ্টা করছে তাদের কর্মপদ্ধতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির বিশ্লেষণ ক'রে দেখা উচিত গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্যাদা তা'তে কতখানি রক্ষিত হবে।

স্বাধীনতা দিবসের উৎসব :

১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা দিবসের উৎসব উদযাপিত হয়েছে। ভারতের রাজধানী দিল্লীসহর থেকে সুরু ক'রে দূর দূর পল্লী অঞ্চলেও এই উৎসব বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়েছে। কংগ্রেস বিরোধী তথাকথিত সমস্ত বামপন্থী দল এই উৎসবে জনতার যোগদানের প্রতিকূলে নানাপ্রকার প্রচারকার্য চালিয়েছে। ভুয়া স্বাধীনতা ব'লে এই স্বাধীনতাকে অভিহিত ক'রে তারা বিরোধী জলসা বা demonstration এর চেষ্টাও করেছে। কলিকাতায় তাদের এই চেষ্টা বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমগ্র জনতা যে উৎসাহ, আগ্রহের সহিত ১৫ই আগষ্টের উৎসবে যোগদান করেছে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিন চার দিন পূর্ব হ'তে এই সব বামপন্থী অভিহিত দলগুলি ছাত্র, শ্রমিক ও সাধারণ জনতার মধ্যে প্রচার চালিয়েছে যাতে ১৫ই আগষ্টের উৎসবে তারা কেউ যোগদান না করে এবং যাতে এই স্বাধীনতাকে তারা সত্যিকার স্বাধীনতা ব'লে স্বীকার না করে। কিন্তু তাদের এই সমস্ত অপচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

১৫ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি ময়দানে এক সভা আহ্বান করে। সংবাদপত্রের প্রচার সাহায্যে বর্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কোন ক'লেই বিশেষ পায় না। কলিকাতার সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত কার্পণ্যের সহিত ১৫ই আগষ্টের সভার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীমহলের সঙ্গে বর্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেসের সহযোগিতা প্রায় নাই বললেই চলে। ঐ সভার কার্যে মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কোন প্রকার সাহায্যই পায়নি। তাছাড়া বর্তমান প্রাদেশিক কংগ্রেসের পেছনে অর্থবল বা নামজাদা লোকের প্রভাব-বল বিশেষ নেই। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে শরৎবসুর জয়ে বামপন্থীগণ যে সাহায্যের আশা করেছিল তাও এই সভা সম্পর্কে বিবেচ্য। এই সব বাধা সত্ত্বেও ১৫ই আগষ্ট ময়দানের সভায় তিন লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল। বিভিন্ন শ্রমিক অঞ্চল হতে প্রায় লাখখানেক শ্রমিক এসেছিল। তা ছাড়াও কলিকাতার সাধারণ নাগরিক দু'লক্ষের মতো ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। মোটের ওপর বলা চলে পণ্ডিত জওহরলাল বা সর্দার বল্লভভাইর আগমন উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থার এবং বিশেষভাবে আহূত সভা ব্যতীত এত বড় বিরাট সভা কলিকাতায় কখনও হয়েছে কি না সন্দেহের বিষয়।

এই সভা হ'তে আমরা দু'টি শিক্ষা লাভ করতে পারি। যে স্বাধীনতাকে সমস্ত কংগ্রেস-বিরোধী দল ভুয়ো স্বাধীনতা ব'লে অভিহিত করছে এবং উৎসবকে বর্জন করার জন্য জনতাকে প্ররোচিত করছিল সেই স্বাধীনতাকে বাংলার জনসাধারণ স্বীকার ও গ্রহণ করে। এটা মোটামুটি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও পরিচালনার প্রতি জনসাধারণের আস্থার পরিচায়ক। দ্বিতীয়তঃ, যখন সবাই মনে করেছিল বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লোপ পেয়েছে এবং যখন বাংলার মন্ত্রীবর্গ ও মন্ত্রীবর্গের পৃষ্ঠপোষিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাগণ কোন জনসভা আহ্বান করতে বা তার সম্মুখে উপস্থিত হ'তে সাহস পান না, তখন বাংলার নবগঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির আহ্বানে এত বড় বিরাট জনসমাবেশ হয়েছিল। এর একমাত্র তাৎপর্য এই হয় যে বাংলার মন্ত্রীসভার প্রতি বাংলার জনসাধারণের আস্থা ও শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু এই প্রাদেশিক কংগ্রেসের নবগঠিত কার্যকরী সমিতির ও তার পরিচালকদের প্রতি বাংলার জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা আছে।

আশা করি নিখিলভারত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির (Working Committee) নির্দেশে বাংলা কংগ্রেসের নূতন কার্যকরী সমিতি এমনিভাবে পরিচালিত হবে যে সমস্ত বাংলায় কংগ্রেসের প্রতি আস্থা ও মর্যাদা আবার ফিরে আসবে। নিখিলভারত কার্যনির্বাহক সমিতি নির্দেশ দিয়েছেন বাংলায় নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তাদের এই নির্দেশ কার্যে পরিণত হ'লে বাংলার কংগ্রেস-নিষ্ঠা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।

স্বর্গীয় নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সংবাদটি অত্যন্ত আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত। আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে প্রিয়জন যারা তাদেরও বছরে বছরে বয়স বৃদ্ধি হয় এবং তারাও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে আসে। নৃপেন্দ্র চন্দ্রের মৃত্যু আকস্মিক হলেও একথা বলা চলে না যে তাঁর মৃত্যু অকাল-মৃত্যু। ১৯২১ সাল থেকে আমরা তাঁকে চিনি। তখনই তিনি প্রৌঢ়। তারপর ২৮ বৎসর অতীত হয়েছে। কাজেই তাঁর মৃত্যু অন্ততঃ বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল হিসাবে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

তাঁর মৃত্যু আমাদের নিকট আপন ও প্রিয়জনের মৃত্যুর মতোই। এই ক্ষ্যাপা মানুষটি জীবনের সমস্ত উপভোগ্য জিনিষকে বিসর্জন দিয়ে দেশসেবায় নেমেছিলেন। স্ত্রী, পুত্র-কন্যার অর্থকষ্ট ও দারিদ্র্য এবং নিজের দুঃখবরণ ও লাঞ্ছনা কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করেন নি। একাগ্র নিষ্ঠার সহিত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই দেশ ও জাতির সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হয়ত রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর এতখানি ত্যাগ ও দুঃখবরণ সার্থকতায় মণ্ডিত হয় নি। হয়ত চলতি রাজনীতির ঘোর-প্যাঁচে তিনি ভাল ক'রে চলতে পারেন নি, কিন্তু তাতে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব ও ত্যাগের গুরুত্ব হ্রাস হয় না। কয়েক বৎসর যাবৎ রাজনীতি হ'তে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। চাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর হ'তে ক'বৎসর পূর্বেই হুগলী জেলায় বৈদ্যবাটী গ্রামে নিজের আবাসস্থল নির্মাণ করেছিলেন। পল্লীর স্নিগ্ধ ছায়াতে জীবনের শেষ ক'বৎসর তিনি অতিবাহিত করেছেন। কৃতবিদ্য পুত্রদের হাতে সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ ক'রে এ ক'বৎসর তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করেছেন। হয়ত সমস্ত জীবনের দুঃখবরণের পর তিনি কিছুটা শান্তিতে ও সোয়াস্তিতে জীবনের শেষ ক'টা বৎসর অতিবাহিত করেছেন।

তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক নয়, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও ছিল। তাই তাঁর মৃত্যুতে একটী সত্যিকার দরদী বন্ধুর অভাব বোধ করি। যে আদর্শ-নিষ্ঠা ও চরিত্রবল তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন তা বিশেষভাবে অনুকরণীয়। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণ করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্বর্গীয় পুলিনবিহারী দাস :

ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক পুলিনবিহারী দাস পরলোক গমন করেছেন। আজকার যুবকদের নিকট পুলিনবিহারী প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্বে অন্ততঃ পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে পুলিন বাবুর নাম যুবকদের মন্ত্রমুগ্ধ করত।

যখন ইংরাজের কঠিন নাগপাশ জাতির কায়, মন ও বাক্যকে দৃঢ় নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল; তখন গুপ্ত ষড়যন্ত্র ভিন্ন যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাবার অন্য কোন উপায় ছিল না। সে সময় কলিকাতার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পি, মিত্র মহাশয়ের নির্দেশে পুলিন বাবু ঢাকায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন। সমগ্র পূর্ব বাংলায় অনুশীলন সমিতির শাখা প্রশাখা গড়ে ওঠে এবং ১৯০৮ সালে সরকারের সংশোধিত ফৌজদারী আইন, তখনকার দিনের তাবায় সমিতি আইন অনুসারে এই সব সমিতি বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়। তখন পুলিনবাবুর অনুশীলন সমিতি গোপনতার আবরণ নিয়ে সর্বত্র বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে। এই সময় পুলিনবাবু

যে সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়েছেন সত্যই বিস্ময়কর।

পরবর্তী প্রকাশ্য রাজনীতির সঙ্গে তিনি চলতে পারেন নি তাই ১৯২০ সালের পর হতে আস্তে আস্তে তিনি রাজনীতির বাইরেই প্রায় চলে যান। কিন্তু ৪০ বৎসর পূর্বে বাংলার রাজনীতিতে তিনি যা দান করেছেন তা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জাতি অনেক কাল স্মরণ করবে। আমরাও তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও তাঁর পরিজনদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সংবাদপত্রে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে গুরুতর সব অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। কথিত হয়েছে যে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিকট পশ্চিমবাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত এক স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কাগজে সেই সব অভিযোগই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশে তথাকথিত মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের গুজব প্রচলিত আছে। তার সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু সাধারণ লোক সেই সব অভিযোগ বহুলাংশে বিশ্বাস করে। নইলে মুখে মুখে তা এমনি ছড়িয়ে পড়তে পারত না।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন কলিকাতায় গিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে সঠিক অভিযোগ যে কোন মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে পেলে সে সম্বন্ধে তদন্ত করতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। হয়ত তাঁর সেই কথার উত্তর হিসাবে কয়েকটী সঠিক ও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পণ্ডিতজীর নিকট উপস্থাপিত হয়েছে। এবং সেই সব অভিযোগ বিভিন্ন প্রদেশের কাগজের মারফৎ সমস্ত ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিবাদ বের হয় নাই। হয়ত তার সব কিছু সত্য নয় বা এ সব অভিযোগের পিছনে অনেকখানি সত্যও আছে।

কংগ্রেসের সুনাম ও মর্যাদার জন্য এই অভিযোগের বিশেষ তদন্ত হওয়া আজ প্রয়োজন। ঐ স্মারকলিপিতে দাবী করা হয়েছে যে বাংলা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশের হাইকোর্টের কোন একজন জজ বা জেনারেল কোর্টের কোন একজন জজের হাতে এই অভিযোগের তদন্তভার দেওয়া উচিত। স্মারকলিপিতে আরও বলা হয়েছে যে এই তদন্ত গোপনে সংশোধিত হওয়া উচিত। এ নিয়ে কোন প্রকার হৈ চৈ না হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তদন্তের ফলাফল সাধারণে প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বতন অর্থসচিব শ্রীসন্মুখম চেট্টীর বিরুদ্ধে যখন সন্দেহের কারণ হয়েছিল তখন শ্রীযুক্ত চেট্টী মন্ত্রীত্ব পদে ইস্তফা দিয়ে বিধান পরিষদে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে মন্ত্রীদের আচরণে কোন সন্দেহের অবকাশ হ'লে তাঁর মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এই নীতিকে পুরোপুরি কার্যে পরিণত করার অসুবিধা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা মনে করি এই নীতিই সামনে রেখে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর চলা উচিত। বিলাতে খুব সামান্য একটু ত্রুটির জন্য ডাঃ ডালটনের মত লোকেরও অর্থসচিবের পদ ত্যাগ করতে হয়েছে। তার পরও সামান্য সন্দেহের উদ্রেক হওয়ামাত্র প্রকাশ্য তদন্তের পর একজন সহকারী মন্ত্রী ও একজন পার্লামেন্টারী সদস্যকে পদত্যাগ করতে হয়েছে। ভারতবর্ষে এই ব্যাপক অসততার দিনে ইহাই কাম্য যে মন্ত্রীবর্গের আচরণ সর্বপ্রকার সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকবে এবং তাঁরা সাধারণ জনতার নিকট সততার আদর্শ বজায় রাখবেন। সে দিক থেকে আমরা মনে করি বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ সাধারণ্যে প্রচার হয়েছে তার অবিলম্বে তদন্ত হওয়া উচিত।

বাংলার সাধারণ নির্বাচন :

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি নির্দেশ দিয়েছে ছ'মাস পরে বাংলাদেশে এক সাধারণ নির্বাচন হবে। বাংলা দেশের মন্ত্রীমণ্ডলী যে ভাবে দেড় বৎসর শাসনকার্য চালাচ্ছে তাতে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে প্রদেশের সর্বত্র প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। বিধান পরিষদে কেন্দ্রীয়

সরকারের মন্ত্রী শ্রীযুত গোপালস্বামী আয়াঙ্গার বলেছেন যে বাংলার শাসনকার্য ও ব্যবস্থা পরিষদ সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে যে সততা ও গণতান্ত্রিক নীতির মর্যাদা সেখানে থাকছে না। এই কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে এই সন্দেহ বাংলার জনসাধারণের মধ্যেও আছে এবং তাঁদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ ও শঙ্কার কারণ হয়েছে বলেই পণ্ডিতজী স্বয়ং বাংলাদেশে গিয়েছিলেন।

তবুও আমরা মনে করি যে অবস্থায় এক নূতন নির্বাচনের দায়িত্ব কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি বাংলার উপর চাপিয়েছেন তাতে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হ'ত। কার্যকরী সমিতির মনে সন্দেহ জেগেছে

বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব আজ নেই। তাই জনমতের সমর্থনহীন শাসন চালু রাখা গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়। কংগ্রেসের মৌলিক নীতি গণতন্ত্র। সেই মৌলিক নীতির সম্মান রক্ষার জন্যই কার্যকরী সমিতি নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন। কার্যকরী সমিতির নির্দেশ পশ্চিমবাংলার কংগ্রেসের ওপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এই নির্বাচনে যদি কংগ্রেস জয়ী হতে না পারে, তবে শুধু বাংলার নয় সমস্ত ভারতের পক্ষে তা পরম অকল্যাণকর হবে।

আমরা বিশ্বাস করি যদি বাংলা মন্ত্রীমণ্ডলী সম্বন্ধে কংগ্রেসের উচ্চতন কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে এ নির্বাচনে জয়ী হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না। আজ জনমত যে কংগ্রেসের উপর ক্ষুব্ধ তার একমাত্র কারণ কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীর ত্রুটি বিচ্যুতি। যদি তার সংশোধনের প্রতিকার জনতা পায়, যদি প্রভাবশালী ব্যক্তি ব'লে উপযুক্ত ব্যবস্থা থেকে কেউ অব্যাহতি না পায়, তবে কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের আস্থা অবিলম্বে ফিরে আসবে। তার কতকটা আভাস ১৫ই আগষ্টের নয়াদিল্লীর সভায় বিপুল জনসমাবেশ দেখেই বোঝা গেছে।

বাংলার বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের এখনই অবহিত হওয়া উচিত যাতে কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি জনসাধারণের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভের উপর জনসাধারণের স্বার্থ কতখানি নির্ভর করে তা প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর আজ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন এবং জনসাধারণকে তা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য রাগ ক'রে যদি তারা সমস্ত কংগ্রেসকে বর্জন করে তাতে জনসাধারণের স্বার্থই যে ক্ষুণ্ণ হবে সে কথা বিশেষ করে জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা করার সময় এসেছে। আমরা আশা করি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে সুরু ক'রে নিম্নতম প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব উপলব্ধি ক'রে এখন থেকেই যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা কর্তব্য যে উড়িষ্যা, বিহার ও মাদ্রাজের বিভিন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস প্রত্যাশিত সাফল্যলাভ করেছে। কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যে ও জাতীয় মঙ্গল সাধনে বাংলাদেশ অন্য কোন প্রদেশের চাইতে পশ্চাতে থাকে না। এ দুটি আমরা প্রায়ই সগর্বে সহিত প্রচার করি। আগামী নির্বাচনের ভিতর দিয়ে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে বাংলার জনতা এখনও কংগ্রেসানুরাগী; কংগ্রেস এখনও জনসাধারণের আস্থাভাজন।

কিছুদিন যাবত প্রায়ই কাগজে সংবাদ পাওয়া যায় বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে কোন আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক ফেরারীর সন্ধানে গেলে গ্রামের জনতা সেই ফেরারীদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের সহিত সংঘর্ষে এগিয়ে আসে। পুলিশকে বাধ্য হ'য়ে গুলি ছুঁড়তে হয়। তার ফলে নিরীহ গ্রামবাসী ২।৩ জন নিহত হয়। এইভাবে কিছু সাঁওতাল একাধিকবার পুলিশের সাথে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। সহজেই অনুমেয় যে এসব ফেরারী কমুনিষ্ট দলভুক্ত। কলিকাতা ও ইণ্ডাষ্ট্রির অঞ্চল হ'তে কমুনিষ্টগণ তাদের কার্যক্ষেত্র হয়ত আপাততঃ সরিয়ে নিয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

এই অবস্থায় সরকারের ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়ছে। পল্লীঅঞ্চলের

কৃষকদের অনেকেরই পর্যাপ্ত জমি নাই এবং অনেকে ভূমিহীন কৃষক। এই দুর্মূল্যের দিনে তাদের দুঃখদৈন্য সহজেই অনুমেয়। এই দুঃখদৈন্যের সুযোগ নিয়ে নীতিজ্ঞানহীন কম্যুনিষ্ট ফেরারীগণ এসব সরলমতি কৃষকদের ক্ষিপ্ত ক'রে তুলছে, হাতে হাতে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামের স্বর্গ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে। আজ এই কৃষকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারকার্য চালান দরকার যাতে তারা তাদের সত্যিকার স্বার্থ বুঝে কম্যুনিষ্টদের খপ্পরে না পড়ে।

আজ দেশে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। কেবল পুলিসী ব্যবস্থার জনতাকে ঠাণ্ডা রাখা গণতন্ত্রবিরোধী। বাংলা সরকারকে আজ বুঝতে হবে যে যেকোন কারণে পল্লীঅঞ্চলের কৃষকশ্রেণী তাদের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। নিজেদের সততা ও সদিচ্ছার পর্যাপ্ত প্রমাণ তাদের নিকট না দিতে পারলে কম্যুনিষ্ট প্রভাব থেকে জনতাকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। এ জন্য আমরা মনে করি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ব্যবস্থার মধ্যে একটা বিশেষ সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন। বাংলায় আজ তা নেই, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু ইতিমধ্যেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের এই বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

বৃটেনের সঙ্গে দেনা-পাওনার হিসাব—

গত মাসে ভারত এবং ইংলণ্ডের ভেতর ষ্টার্লিং ব্যাপারে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তার সমস্ত সর্ত প্রকাশিত হয়েছে। ভারত এবং ইংল্যাণ্ড দুই দেশই বর্তমানে যে অর্থসঙ্কটের ভেতর দিয়ে চলেছে তা মনে রাখলে এই চুক্তির সর্তাবলী ভারতের পক্ষে সন্তোষজনক হয়েছে ব'লে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। অন্ততঃ গত বৎসরের চুক্তির চাইতে এটা যে তুলনায় অনেক ভাল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গত যে মাস পর্যন্ত "ঢালা হুকুম" এর ছিদ্র ধরে যে পরিমাণ আমদানী আমাদের দেশে হয়েছে তাতে গত বছরের প্রাপ্য ৮ কোটি পাউণ্ড ছাড়া আরও ৪ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সেই ছিদ্রপথে বেরিয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও আরও খরচ হয়েছে অনেক। তার পরিমাণ এখনও জানা যায় নি। জানা যাবে ক্রমে ক্রমে পাওনাদারদের পরওয়ানার মারফৎ।

গত বৎসরের চুক্তি অনুযায়ী ভারতের প্রাপ্য ধার্য হয়েছিল—পূর্বেকার জমা ৮ কোটি পাউণ্ড। তাছাড়া ১৯৪৮-৪৯ এবং ১৯৪৯-৫০ এ দু'বছরের প্রত্যেক বছর ভারত ৪ কোটি পাউণ্ড পাবে বলে ঠিক হয়েছিল। এ ছাড়াও স্থির করা হয়েছিল ডলারে পর্যবসিত করার জন্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং অর্থাৎ ৮ কোটি ডলার ভারতকে দেওয়া হ'বে ১৯৪৮-৪৯ এই এক বছরের জন্য। আরও স্থির করা হয়েছিল যে পরের দু'বৎসরের ডলারে পর্যবসিত করার জন্য কত ষ্টার্লিং ছাড়া যাবে ভারত এবং ইংলণ্ডের ভেতর আলোচনা ক'রে পরে ঠিক করা হবে। বর্তমান চুক্তিটি গত বৎসরের চুক্তির অপেক্ষায় ভাল হয়েছে কি না বিচার করতে হ'লে এই সর্তগুলো মনে রাখা দরকার।

বর্তমান চুক্তি অনুযায়ী ১৯৪৮-৪৯ এ ৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড ছাড়াও ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১-এই দুই বৎসরের প্রত্যেক বৎসর ৪ কোটি পাউণ্ড ভারত পাবে। এ ছাড়া "ঢালা হুকুম" এর ছিদ্র ধ'রে পাওনার অতিরিক্ত যে পরিমাণ ষ্টার্লিং ভারত খরচ করেছিল তাও অতিরিক্ত বরাদ্দ হিসেবে কাটিয়ে দেওয়া হবে। আগামী দু'বছরে প্রাপ্য ষ্টার্লিং থেকে তা বাদ যাবে না।

গত চুক্তি অনুযায়ী কত পরিমাণ ষ্টার্লিং ডলারে পর্যবসিত করা যাবে তা ঠিক হয়েছিল দুই পক্ষের দরাদরির ভিতর দিয়ে। কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে দরাদরির পন্থা বাতিল ক'রে দিয়ে এক নতুন নীতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ষ্টার্লিং আওতার দেশগুলির মধ্যে এবার ভারতকে পূর্ণ সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার সুযোগ হিসাবে ঠিক হয়েছে অন্যান্য দেশ ভারতের কাছে যে পরিমাণ ডলার পাবে তা ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং থেকে মিটিয়ে দিতে পারবে। গত বৎসরের চুক্তিতে ভারত যেখানে পেয়েছিল ৮ কোটি ডলার, এই চুক্তির হিসাবে সে পাবে ১৪ থেকে ১৫ কোটি ডলার। অবশ্য

এ সুযোগের জন্য দাম দিতে হয়েছে। অন্যান্য ষ্টার্লিং আওতার দেশগুলির মত ভারতও মেনে নিয়েছে যে ডলার ঘাটতি কমাবার জন্য ১৯৪৮ সালের আমদানীর শতকরা ২০ ভাগ কম আমদানী সে করবে। এই সর্তের ফলে অন্ততঃ—বর্তমান অতিরিক্ত ডলার ঘাটতি কিছুটা

সর্তটি নিয়ে স্বভাবতঃ আপত্তি উঠতে পারে, হতে পারে। কিন্তু, এ কথাটা মনে রাখা দরকার কোন সমষ্টিগত বন্দোবস্ত থেকে সুযোগ পেতে গেলে, সাথে সাথে কতগুলো কর্তব্য ও দায়িত্ব স্বীকার করে এগিয়ে যাওয়া কোন ষ্টার্লিং অঞ্চলের কাছে স্বাভাবিক সর্তই সব চাইতে বেশী।

আজকে তাই তার ওপর অতিরিক্ত চাপ দিয়ে ষ্টার্লিং এর মূল্য এবং বিশ্বের বাজারে তার মর্যাদায় একটা অনিশ্চয়তা যদি এনে দিই তাতে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি আমাদেরই সব চাইতে বেশী।

আরও একটী কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থায় ডলারের ঘাটতি আমাদের কিছু কমবে। কিন্তু, এ কথাটা ভুলে গেলে চলবে না যে জমা টাকা ভেঙ্গে খাওয়া-পরা বেশী দিন চলতে পারে না। প্রতি বৎসর যে ডলার ঘাটতি চল্লিশ পঞ্চাশ বাড়িয়ে আমরা যদি তা মুছে ফেলতে না পারি তা হ'লে দেউলিয়া হ'তে আমাদের আর বেশী বাকী নেই; তার পরিণাম হিসাবে যে অর্থ সঙ্কট দেখা দেবে তা থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না

ফোন : ওয়েষ্ট ১২০৯

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ

২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	২৫,০০,০০০ টাকা
বিক্রীত মূলধন	১২,৫০,০০০ টাকা
বিক্রয়ার্থে মূলধন	১২,৫০,০০০ টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুত তহবিল	১৪,৫০,০০০ টাকা

আপনি ৪৪৷৵০ দিলেই আমাদের ৫০ টাকা মূল্যের ৩ বছরের ব্যাঙ্ক বা ফিকেট ক্রয় করিতে পারেন কোন সময়েই ভাঙ্গান যায় এবং আপনার টাকা যেমন নিরাপদ অথচ তেমনি পাওয়া যাইবে।

ছাপাখানার সকল রকম নূতন ও পুরাতন যন্ত্র টাইপ ও ছাপার কাজের জন্য আমাদের নিকট আসুন।

ভারতবর্ষে ছাপাখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সর্ব্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান

প্রিণ্টিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল মেশিনারী লিঃ

পি ১৪, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট কলিকাতা

ফোন : সিটি ৩৭৬৭

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্য্যালয় ৩০নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

হরপার্ব্বতী

শিল্পী : বিষ্ণু গুপ্ত

—অগ্নিযুগ—

দ্বাদশ বর্ষ | আশ্বিন—১৩৫৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শহীদ

মন্মথ রায়

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট।

গান্ধীজির পরাধীনতা-কাতর পাঞ্চজন্য নিনাদিত হলো —'ভারত ছাড়'।

শৃঙ্খল-জর্জ্জর দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে অভাবিতপূর্ব রণোন্মাদ!

উদ্বেলিত হয়ে উঠলো জনসমুদ্র—কাটা পড়লো টেলিফোন—টেলিগ্রাফের তার; রেলপথ হলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, সেতুর পর সেতু গেল উড়ে।

১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট।

মেদিনীপুরের মহিষাদল থানা আক্রমণ করতে চলেছে স্বাধীনতা-পিপাসু জনতা। আবালবৃদ্ধবনিতার সমবেত কণ্ঠে—"ভারত ছাড়"—"বন্দে মাতরম্"—"মহাত্মাজীকি জয়" ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত।

থানার সামনে ত্রস্ত ব্রিটিশ রাজশক্তির শেষ আক্রোশ গর্জ্জন করে উঠলো—গুড়ুম্—গুড়ুম্।

জনতার পুরোভাগে যে বৃদ্ধা পতাকা হাতে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, কিন্তু পতাকা তখনও তেমনি বজ্রমুষ্টিতে সোজা করে ধরা আছে। একটি দশ-বার বছরের ছেলে বৃদ্ধার হাত থেকে পতাকা তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো। দুটি মেয়ে একখানি 'ষ্ট্রেচারে' বৃদ্ধাকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এবার মহিষাদল-রাজ-এষ্টেটের কুখ্যাত এইচ্ সাহেবের হাতের বন্দুক গর্জ্জে উঠলো।

একটা আর্ত্তনাদ—আহত পতাকাধারী ছেলেটির মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত—তবু সে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলেছে। ছুটে এসে যে লোকটি বালকটিকে কোলে তুলে নিয়ে তাকে 'ষ্ট্রেচারে' চড়িয়ে দিলে আর নিজে পতাকা নিয়ে এগিয়ে চললো, তার তারুণ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তির দিকে চাইলে সম্ভ্রম জাগে

আবার বন্দুকের আওয়াজ—জনতার আর্ত্তনাদ—আহতের কাতর চীৎকার। কিন্তু, এবার বিরুদ্ধ-শক্তি অভিভূত হলো—প্রোথিত হলো ত্রিবর্ণ পতাকা থানার ফটকে। ঝোপের আড়াল থেকে এইচ্ সাহেবের গুলী ছুটে এসে বিঁধলো যুবকটির বুকে। যুবকটি আহত হয়ে পড়লো।

'মার মার' রবে কয়েকজন ছুটে গেল ঝোপের দিকে। এইচ্ সাহেবের বন্দুক কেড়ে নিয়ে, তারই কুঁদো দিয়ে তাকে প্রহার শুরু করলো।

আহত যুবকটি বললে, "জল, জল।"

একটি সুন্দরী মেয়ে তাঁর আহত পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছিলো; অসহায়ের মতো এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দৌড়ে গেল একটা পুকুরে। আঁচলটা ভিজিয়ে নিয়ে, ছুটে এসে কয়েক ফোঁটা জল দিল তার মুখে।

ছেলেটি আস্তে আস্তে চোখ মেল্‌লো।

'তুমি-সু-এখানে!'

মেয়েটি বল্‌লে, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মণদা সে অনেক কথা—কাছেই আমার বাড়ী, কোনও রকমে আমার কাঁধে ভর দিয়ে এইটুকু চলো, লক্ষ্মীটি।'

দ্বিধাভরে ছেলেটি বল্‌লে, 'কিন্তু—।'

মেয়েটি ফোঁস করে উঠলো, 'একটা পতিতা মেয়ের বাড়ী যেতে ঘৃণা হচ্ছে, কেমন এই না? কিন্তু, আজকের দিনটা একটু সুস্থ হয়ে নাও—তারপর যত পারো প্রাণ ভরে ঘৃণা করো'—নাও—ওঠো।'

কষ্ট ক'রে উঠতে উঠতে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করলো, 'ওরা?'

মেয়েটি বল্‌লে, 'রাজবাড়ীর দিকে এগিয়েছে।

দূরে চীৎকার—বন্দুকের আওয়াজ—কাছে মিলিটারী—বুটের শব্দ—ওরা গাছের আড়ালে লুকোয়। দুটো 'টমি'—হাতে বন্দুক—চলে যায়, কি যেন খুঁজছে ওরা।

শেষে সুভদ্রার বাড়ীতে পৌঁছায় ওরা—সুভদ্রা আর লক্ষ্মণ।

সযত্নে পরিচর্য্যা করতে করতে সুভদ্রা লক্ষ্মণকে শোনায় তার ব্যর্থ জীবনের অশ্রু-সজল কাহিনী। এমন সময় দরজায় ঘা পড়ে। 'মুখপোড়া আবার এসেছে' ব'লে উঠে যায় সুভদ্রা, আলো নিবিয়ে দিয়ে। পাশের ঘরে ঢুকিয়ে।

তারপর টমিটাকে মদ দেবার সময় Bromide মিশিয়ে দেয় সে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। তার রিভলবার আর বুলেট-বেল্ট খুলে নেয় সুভদ্রা, তারপর বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ বাদে ঘুমন্ত লক্ষ্মণকে সুভদ্রা ডেকে ওঠায়—গোরুরগাড়ী এসেছে। এক্ষুণি যেতে হবে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। গোরুরগাড়ী এসে পৌঁছায় লক্ষ্মণের বাড়ীর সামনে, দু'টি ক্রোশ দূরের এক গ্রামে।

লক্ষ্মণ সুভদ্রাকে আমন্ত্রণ করে। সুভদ্রা রাজী হয় না, বলে নিজের বাড়ীতে ফিরে যাবে।

লক্ষ্মণ ভয় পেয়ে বলে, 'সে কি করে হবে—তুমি একলা।

ছেলে সুভদ্রা বলে, 'একলা কেন? তুমি তো একে নিলে না— এখন থেকে এ-ই আমার সঙ্গের সাথী—ব্লাউজের ভেতর থেকে বার করে দেখায় রিভলবারটা। এমন সময় লক্ষ্মণের স্ত্রী এসে দাঁড়ায় পিছনে।

লক্ষ্মণ সুভদ্রাকে বলে, না-না-সু—আমাদের পথ হিংসার নয়; এই ব'লে সে সুভদ্রার হাত থেকে কেড়ে নিতে যায় সেটা।

লক্ষ্মণের স্ত্রী চেঁচিয়ে ওঠে—'এই বুঝি তোমার দেশ সেবা হচ্ছে!' চমকে তাকায় লক্ষ্মণ।

ইতিমধ্যে সুভদ্রা গোরুরগাড়ীতে গিয়ে ওঠে।

প্রায় একমাস কেটে গেছে। জাতীয়-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লক্ষ্মণ ওদের গ্রামের জগন্নাথদেবের মন্দিরে ছবি আঁকছে—জগন্নাথ বলরাম শেষ হয়েছে, কিন্তু সুভদ্রার মুখ আঁকতে গিয়েই হয়েছে তার বিপদ। দেবীর মুখে কেবলই এক মানবীর মুখের সাদৃশ্য ফুটে উঠছে।

এমন সময় সুভদ্রা এসে হাজির। বলে, 'সেই সাহেবটা ক্ষ্যাপার মত আমার খুঁজছে—আমাদের গাঁয়ের চারদিকে মিলিটারী। কোনও রকমে পালিয়ে এসেছি। একটা লুকিয়ে থাকবার জায়গা চাই।' ও হাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ লক্ষ্মণের স্ত্রী দৌড়ে এসে বলে, 'শীগগির পালাও'। ওর দৃষ্টি পড়লো সুভদ্রার দিকে, তারপর স্বামীর হাতে সুভদ্রার পটের দিকে—মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল ওর। বলে, 'প্রেম করবার উপযুক্ত সময় বটে—সারা দেশটা জ্বলছে, বাড়ীতে খানাতল্লাসী হচ্ছে, আমারই শুধু মাথাব্যথা! এই নাও সরকারী কাগজপত্তর।' এই ব'লে কতকগুলি দপ্তর ফেলে দিলে স্বামীর পায়ের কাছে।

লক্ষ্মণ দৃঢ় স্বরে বল্‌লে, কি ছেলেমানুষি করলে রাণী! সুভদ্রা সেই সাহেবটার ভয়ে পালিয়ে এসেছে। তুমি মন্দিরের সুড়ঙ্গটায় লুকোও। আমি সুভদ্রাকে আর এই কাগজপত্তর ভাঙা শিবমন্দিরে লুকিয়ে রেখে আসি।'

ওরা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই বাইরে হৈ হৈ শোনা

গেল। রাণী ওর লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এলো। দেখে একটা সাহেব আরও কতকগুলো সৈন্যসামন্ত নিয়ে ঢুকছে। তাদের পেছনে ওদের গাঁয়ের কতকগুলো লোক, তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে এসে রাণীকে বললে, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, বৌদি। দাদা একটি মেয়েকে কোথায় লুকিয়ে রেখে ফেরবার মুখে ধরা পড়ে গেছে।' 'এ্যাঁ!' বলে ব'সে পড়লো রাণী।

এমন সময় সাহেব লক্ষ্মণের আঁকা ছবিটা দেখেছে—বলে, 'হ্যাঁ এই মেয়েলোক।'

রাণীকে জিজ্ঞাসা করে, 'জানতা কিধর হ্যায় উরো?'

রাণী সে কথার জবাব না দিয়ে বলে, 'সাহেব আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও'

'ছোড় দিতে রাজী আছে, লেকিন তুম্ রাতকে হামারা সাথ ক্যাম্পমে—'এমন সময় বাইরে কি একটা গোলমাল শুনে সাহেব চলে যায়।

গভীর রাত্রি। যাবো কি যাবো না করে, রাণী ক্যাম্পে গিয়ে হাজির।

'আমি এসেছি সাহেব,'

সাহেবের মুখে একগাল হাসি। পাশের তাঁবুতে চাবুকের আওয়াজ আর লক্ষ্মণের কাতরানি। আবার চাবুক আবার কাতরানি।

'আমি তো এসেছি, ছেড়ে দাও ওকে', রাণী বলে।

সাহেব বলে যে, যতক্ষণ না সেই মেয়েটার হদিশ দিচ্ছে ততক্ষণ ওর নিস্তার নেই।'

আবার চাবুক, আবার গোঙানি!

'আমি জানি সাহেব, আমি বলছি, রাণী ব'লে ফেলে।

'তুমকো ঘাত সাচ্ বোলনেসে হম্ উসকো জরুর ছোড় দেগা—গুলি নেহি করেগা' সাহেব এই কথা ব'লে একটা সিপাহীকে ডাকে। কি বলে দেয় তাকে। ঘাড় নেড়ে সিপাই চলে যায়।

'আভি তুম্ মেরা পাস্ আ যাও মেরা—সাহেব আমন্ত্রণ করে রাণীকে—তাঁবুর আলো নিভে যায়—সাহেব আকর্ষণ করে রাণীকে। হঠাৎ রিভলবারের আওয়াজ—সাহেব পড়ে যায়। দুসরী কামরামে তুম্হারী পতি হ্যায়। হম্ ছেড্ সিপাহীকো বোল দিয়া—উন্হোনে উস্কো খোল্ দিয়া—আভি তুম্ উস্কো লেকর চলা যাও। ম্যায় আউর সব্কো করেঙ্গে কিরেগা—।" বলতে বলতে সাহেব প'ড়ে যায়।

লক্ষ্মণ স্ত্রীকে দেখে বোঝে, তারই দেহের মূল্যে সাহেব ওকে মুক্তি দিয়েছে—ও যেতে চায় না।

বন্দুকের আওয়াজ হয়। নারী কণ্ঠের চীৎকার ওঠে—বহু কণ্ঠের কলরব।

সুভদ্রা—সু—ব'লে লক্ষ্মণ ছুটে বেরোয়—সুভদ্রার রক্তাক্ত দেহ। বলে, 'পায়ের ধুলো দাও'—লক্ষ্মণ বলে, 'একি করলে সু—এতো আমাদের পথ নয়।'

বন্দুকের আওয়াজ—লক্ষ্মণ পড়ে যায় সুভদ্রার বুকের ওপর। একদল সেপাই এসে রাণীকে টেনে নিয়ে যায়—সে চীৎকার করে—'আমি যাব না—আমি যাব না, আমাকেও মেরে ফেল—।'

চারদিকের গ্রাম তখন জ্বলছে—শহীদের খুনে লাল হয়ে ওঠে মেদিনীপুরের মেদিনী।

মাথা ঠাণ্ডা
রাখতে অদ্বিতীয়

বেঙ্গল কেমিক্যালের
গোল্ডেন আমলা
হেয়ার অয়েল

কেশবৃদ্ধি ও কেশসংরক্ষণে শ্রেষ্ঠ উপকরণ
বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।

আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন।
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই

হাঙ্গার স্ট্রাইকের জের

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জেলখানার সাধারণ অবস্থা যাঁরা জানেন না, বিশেষতঃ ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের রাজবন্দীদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সতর্কদৃষ্টির সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা নেই, তাঁদের মনে হবে, ডাক্তার মোডি নিয়ে তো গেলেন মাত্র কয়েক-খানা সাদা কাগজ আর একটা পেন্সিল, তা নিয়ে আমি অত অস্থির হয়ে উঠলাম কেন। কি-ই বা ডাঃ মোডির ওতে হত ?

চিঠির কাগজ ইত্যাদি জেলের আইনে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে ভিতরে ঢুকতে পায় না। তারপর, ষ্টেটপ্রিজনারদের কোনো চিঠি গোপনে বাইরে যাবে, সে তো কল্পনার অতীত। একজন ষ্টেটপ্রিজনারকে ঔষধ খাবার জন্য এক তোলা চিনি দেবে, এই ধরণ সরকারী হুকুমনামার উপরও অঙ্কিত থাকবে "Confidential" বা "গোপনীয়।"

কিন্তু অস্থির হয়েও ডাঃ মোডিকে বাঁচাতে পারলাম না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপে তার কথা রাখলো না। এই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ আর মারাঠা জেলার বেঙ্কট রাও দুইজনই স্বাধীনচেতা, পার্শী ডাঃ মোডিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। এখন এমন সুযোগ ছাড়লো না। সেইদিনই হুকুম হ'ল, নসিংগড় জেলায় তখন প্লেগ লেগেছে—ডাঃ মোডিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ডিউটির জন্য রওনা হ'তে হবে। যতদূর খবর নিতে পেরেছিলাম, তা'তে জেনেছিলাম গভর্ণমেণ্টের কাছে রিপোর্ট দিয়ে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়ায় নাই। সদর হাসপাতাল থেকে আর একজন ডাক্তার জেলের কাজ পেল।

মোডি অত্যন্ত হীনতা স্বীকার ক'রেও চেষ্টা করেছিলেন যাওয়ার আগে আর একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে। গেটের সিপাই দুঃখিত, নম্রভাবে তাঁকে জানিয়ে দেয়, আসতে দিতে পারে না, জেলার সাহেবের

হুকুম নেই। মোডির সাথে আর জীবনে আমার দেখা হয় নাই। ডাঃ মোডি, শেখ গফুর, চন্দ্রিকাপ্রসাদ—আমার সেই হাজার ষ্ট্রাইকের জীবনের হয়ে রয়েছেন যেন ছোট ছোট কয়েকটি তারা আর ফুল :—

অন্যমনে চলি পথে
ভুলিনে কি ফুল, ভুলিনে কি তা
তবুও তাহারা
প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর,
ভূলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয় সুর।

আলিপুর জেলে যেদিন হাজার ষ্ট্রাইক শুরু করি, সেইদিন বা তার আগের দিন ওজন নিয়েছিল। তখন ছিল ১৫১ পাউণ্ড। ইদানীং রোজই ওজন নিত, আজ হাজার ষ্ট্রাইকের শেষ দিনেও নিল, দাঁড়ালো ৮৯ পাউণ্ড।

একটু বেলায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবার এল। এসে বললো, এত দিনের উপোস, এর পর অন্ততঃ ১৫ দিন আপনাকে আমি শক্ত জিনিষ কিছু খেতে দেব না, দুধ, সুপ, ফলের রস—এই সবই আপনাকে খেয়ে কাটাতে হবে।

তার জন্যে মন খারাপ হয় নাই। মনে এক দিকে ছিল ডাক্তারের চিন্তা। অপর দিকে, তখন বেলা বেড়ে উঠেছে—মাথার ভিতর কি রকম আগের দিনের মতোই একটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে—ইচ্ছা হচ্ছে যেন অস্বাভাবিক একটা কিছু ক'রে বসি। ঐ ভয়টা পেয়ে বসলো, বুঝি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি। মনে হ'ল, চেপে যাওয়া ঠিক হবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বললাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিল, পেছন দিকে চারদিক খোলা আর একটা ছোট ঘরে আমায় নিয়ে যেতে, সেই ঘরের সব দরজা জানালায় খস্‌খসের পর্দা ক'রে দিতে, একটা ফুল দিতে, আর একশিশি বেশরঞ্জন তেল আনিয়ে দিতে। আমায় বললে, দুপুরে যেমন স্নান করেন, রোজ ভালো করে স্নান করবেন, তাছাড়া সন্ধ্যার আগে গরম জলে আর একবার স্নান করবেন।

পরের দিনও উদ্বেগটা অনুভব করলাম। নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে রাখতাম। খস্‌খসের পর্দা তৈরী হয়ে এল। ৮টা ৮॥টা থেকে সেগুলো ভিজিয়ে দিত। তখন থেকে আর বেলা ৪টা ৫টা পর্যন্ত ঘর থেকে বের হ'তাম না। উদ্বেগও কমে গেল। দুধ, সুপ—এই সব খেয়ে কেটে যেত।

আই জি নাগপুর থেকে সপ্তাহে দু'তিন দিন করে এক এক ঝুড়ি কমলালেবু পাঠিয়ে দিত। সাত দিনের দিন থেকে খুব পাতলা দু'একখানা টোষ্ট সুপের সঙ্গে দিত।

দশ দিনের দিন বাবা আবার এলেন। কলকাতা এসে ষ্টীফেনসনের কাছে জেনেছেন, আমি খেতে শুরু করেছি। ষ্টীফেনসন বলেছে, আপনি শুধু যান, দেখা ক'রে আসুন। খরচের টাকাও দিয়ে দিয়েছে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ এসে বলে গেলেন, হুকুম এসেছে, আপনার বাবা যে কয়দিন এখানে থাকবেন, দিনের বেলা যখন তখনই জেলের ভিতর এসে দেখা করতে পারবেন, পুলিশ কর্মচারী কেউ থাকবে না, আমাদের জেল কর্মচারীরও কারও থাকবার প্রয়োজন নেই।

এবারে যে ঘরটায় আমায় থাকতে দিয়েছিল, সেখান থেকে আগের মতো আর জেলের গেট অবধি দেখা যেত না—জেলার বেঞ্চটরাও পা টিপে টিপে হঠাৎ এসে ঘরে ঢুকতো। ডাঃ মোডি যে নিজেই আমায় ফাঁসত দিয়েছিলেন, ও তো তা জানতো না, ওর বোধ হয় ধারণা হয়েছিল, আমিই চেয়ে নিয়েছিলাম। ও কাজেই ধরতে চেষ্টা করতো, আমি বাবার মারফত কোনো চিঠি পাঠাই কিনা।

বাবা আমার শরীরের অবস্থা দেখে তো খুব কাঁদলেন। তারপর, আমার মৃত বা মৃতপ্রায় দেহ নিয়ে যাবার জন্যে দরকারী পত্রের কথা, তাঁর নিজের বাড়ীর সিঁড়ি থেকে গড়ে পড়ে যাবার কথা, অসুখের কথা সব বললেন। বাড়ীর কথাও বললেন, চিরদিনের সচ্ছল সংসার এখন অভাবের সংসারে দাঁড়িয়েছে। মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন, চোখে কম দেখতে পান, তাই নিয়েই সংসারের কাজ সব কিছু করতে হয়।

সব শুনলাম—ঐ উপবাস শীর্ণ শরীরে মনটা

দিক দিয়ে একটা সমর্পণের ভাব আর একটা সুদূরের স্বপ্ন নিয়ে নিয়ত থাকতে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মায়ের কথাগুলো শুনে সেই দিনটা রাতটা ক্রমাগত মনে হ'ল, এ সবই তো আমারই জন্যে। এর পর আমার জীবনে সম্ভোগের, সঞ্চয়ের কোন স্থানই তো নেই। খেতে আরম্ভ করার পরেও রাতের ঘুম ফিরে আসে নাই ঘণ্টা দুই ক'রে ঘুমোতে শুরু করেছি যেদিন থেকে সন্ধ্যাবেলায় গরম জলে স্নান করছি। ওদিন রাত্রে সে ঘুমটুকুও হ'ল না।

বাবা সেদিন সন্ধ্যায় যাবার বেলায় ব'লে গেলেন, তিনি আর একদিন মাত্র থাকবেন, কিন্তু যাবার আগে তিনি আমায় ভাত খাইয়ে যাবেন। আমি বললাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেছে, পনের দিনের আগে ভাত দেবে না। বাবা বললেন, তা তিনি শুনবেন না, তিনি আমায় ভাত খেতে দেখে যাবেন, অন্ততঃ দুটো বোঁটা ভাত তিনি নিজে হাতে ক'রে নিয়ে আসবেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি নেবেন।

এবারেও বাবা সেই ব্যারিষ্টার নগেনবাবুর বাড়ীতে এসে রয়েছেন। সেদিন জেলার আর ডাক্তার দুজনে আমায় দুহাত ধ'রে জেলের গেটে নিয়ে গেল। অফিসে গিয়ে দেখি, সেখানে বাবাও রয়েছেন, আর রয়েছেন নগেনবাবু, আর সেই ম্যাজিষ্ট্রেট এস পি সান্যাল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমায় বললো, আপনার বাবা আর দেরী করতে রাজী নন, আজই আপনাকে সামনে বসে চারটি খাওয়াতে চান। আমার মনে হচ্ছিল, আরও দু এক দিন দেরী করা ভালো। ওঁর সেন্টিমেণ্টের দিকে চেয়ে আমি আর আপত্তি করছিনে। আজই উনি ভাত এনে দেবেন, আপনি খাবেন।

এরপর লেগে গেল নগেন বাবুতে আর মিঃ সান্যালে কগড়া। নগেন বাবু বলেন, তাঁর বাড়ী থেকে খাবার নেবেন, মিঃ সান্যাল বলেন, তাঁর বাড়ী থেকে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললো, আপনাদের কারও বাড়ী থেকে আমি দিতে পারিনে, ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। তবে আমি এখানে যেসব পাচক পাব, তাদের হাতে খাবার তৈরী ক'রে এঁকে দেখাব আমার ইচ্ছা নেই। কাজেই আপনারা যে কেউ ভার নিলে আমার দায়িত্ব অনেকখানি কমবে। কিন্তু আপনারা যিনিই দিন, খরচের টাকা আমি দিতে বাধ্য, এবং আপনাদের তা নিতে হবে।

দুজনে সমস্বরে বলে উঠলেন, ওসব বাজে কথা ছাড়ুন।

তারপর মিঃ সান্যাল মৃদু হেসে নগেন বাবুকে বললেন, আপনি সরকারী লোক নন, আপনাকে কেন দিতে দেব?

অনেক কগড়াঝাটির পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মধ্যস্থতা করলো।

মিঃ সান্যাল, আপনি বাবুর্চির হাতে খান, বিকেলের খাওয়াটা ওঁর এখন দরকার হালকা রকমের—সেটা আপনি পাঠাবেন। আর মিঃ দের বাড়ীতে মেয়েরা করবেন, উনি দুপুরের খাওয়াটা দেবেন।

ঐ ভাবেই শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল। বাবা সেদিন নগেন বাবুর বাড়ী থেকে ঘোঁটা ভাত ক'রে নিয়ে এলেন। ঠাকুর খাবারটা জেল গেট পর্যন্ত নিয়ে এল, সেখান থেকে কোনো সিপাই করেদি দিয়ে আনতে দিলেন না। নিজে হাতেই নিয়ে এলেন।

এর পর থেকে ক্রমে শরীর ফিরতে লাগলো। কমবার বেলাতেও যেমন রোজ আধ পাউণ্ড, এক পাউণ্ড, দুই পাউণ্ড ক'রে ওজন কমেছে, এখন তেম্‌নি আবার বাড়তে শুরু করলো। দুই বেলা খাবার ছাড়া টিফিনের জন্য বিস্কুট, মাখন, পাঁউরুটি, সুজি, ঘি দিয়েছিল, একটা ষ্টোভ দিয়েছিল। দুধ, ডিম, ফল—এগুলোও আসতো। চাকরটাকে দেখিয়ে দিয়েও বিশেষ লাভ হ'ত না। তা ছাড়া, অভ্যাস নোংরা, নিজে হাতেই প্রায় সব ক'রে নিতাম। সকাল বিকাল বেড়াতাম, বেড়াবার গতিবেগ আর পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়ে তুললাম।

যেন নতুন জীবন লাভ করছি। ছোট্ট শিশুটির মতো তুলতুলে নরম শরীর গ'ড়ে উঠ্‌ছে। ইচ্ছা হ'ল, ভিতরটাকেও নতুন ক'রে গড়ে তুলব। "আমার এ রূপ

না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি চালে।" পোড়ানো তো চরম ক'রেই হ'ল, কিন্তু গন্ধ তো আমার নিজের চেষ্টাতেই সৃষ্টি করতে হবে। স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি সারা জীবন। একা একা ঘরে ব'সে সময় কাটে, নতুন ক'রে স্বপ্ন সৃষ্টির চেষ্টা করি। পথ খুঁজে পাইনে, নতুন আয়োজন করতে হবে, এই শুধু জানি। আয়োজন বন্ধুদের সাথে মিলে করব, নতুন পথ খুঁজব। কিন্তু যে কোনো আয়োজন, যে-কোনো পথেরই যেন যোগ্য হ'তে পারি। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতি মুহূর্তের দৃষ্টি খুলে রাখি ভিতরের দিকে।

যখন তখনই প্রায় আফিসে যাই। কেউ বাধা তো দেয়ই না, বরং জেলের বড় গেট খুলে দেয়। নিয়ম, বড় গেট খুলবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আরও উপরওয়ালা এলে। কিন্তু হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে শ্রদ্ধা পাই আমি প্রায় উপরওয়ালাদের মতোই। তার কাছে আইন নত হয়। এইভাবে আমার জন্য বড় গেট খুলতে জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও দুএক দিন দেখেছে। অবশ্য জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও কিন্তু বারণ করে নাই।

ভোর বেলায় জেলের কয়েদিদের গনতি মেলাতে আসেন চন্দ্রিকাপ্রসাদ। তখন জেলার বা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারও আসবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ঐ সময় মাঝে মাঝে চন্দ্রিকাপ্রসাদই আমায় অফিসে ডাকেন, আমার সম্পর্কিত যতো confidential চিঠিপত্র, তা খুলে আমায় পড়তে দেন। অবশ্য বিশেষ confidential যেগুলো, সেগুলো থাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিজের কাছে। তাও দুএক খানা মাঝে মাঝে হাতে পড়তো। যেগুলো হাতে পেলাম, তারই মধ্যে পেলাম রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের যে নতুন আইন কানুন জুরেছে তারই একখানা। নির্জন কারাবাস রাজবন্দীদের ঘুচে গেল। বেশী বিপজ্জনক আর অল্প বিপজ্জনক এই যে দুই শ্রেণীর রাজবন্দী তাঁরা যথাক্রমে পাঁচ ও দশজন এক সঙ্গে মিশতে পারবেন, খেলাধুলো করতে পারবেন, সপ্তাহে একখানা এবং দু'খানা ক'রে চিঠি লিখতে পারবেন। মাসে দু'দিন ক'রে অন্যান্য-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। রান্নাবান্নার তদারক নিজেরা করতে পারবেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

চন্দ্রিকাপ্রসাদ ছাড়া আরও একজন আইনকে অগ্রাহ্য ক'রে চলেন। তিনি মিঃ সান্যাল।

শরীর যেমন ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠতে রইলো, শুধু স্বপ্ন নিয়ে থাকা ছাড়া নিজের ভিতর কাজের তাগিদ দেখা দিল। পড়া বই সঙ্গে যা ছিল, আর একবার ক'রে কিছু কিছু পড়ি, গীতাঞ্জলি ইংরাজিতে অনুবাদ করি, আলিপুর জেলের ফরাসি শিখবার খাতাগুলো ছিল, তাই মুখস্ত করি, অথবা ভুল হোক্, শুদ্ধ হোক ফরাসি লিখি।

এখন আর আমার হাঙ্গার ষ্ট্রাইক নেই। তাই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার সিভিল সার্জন হিসাবে প্রায়ই মফঃস্বলে ঘোরে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ করেন মিঃ সান্যাল। তিনি একদিন বলেন, আপনাকে কিছু কিছু বই দেব। কিন্তু দেখবেন যেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না দেখতে পায়। বই তিনি প্রায়ই দিতেন ক্রপট্‌কিন, ষ্টেপনিয়াক—এঁদের।

ষ্টেপনিয়াকের Career of a Nihilist বইটা সেই দিনই প'ড়ে শেষ করেছি। বইয়ের সম্পর্কেই সান্যাল ব'সে আলোচনা করছেন, আমি তাঁকে একটা জায়গা প'ড়ে শোনাচ্ছি—এমন সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এসে হাজির। এসেই জিজ্ঞেস করে, কি বই পড়ছেন?

আমি কিছু বলবার আগেই মিঃ সান্যাল জবাব দেন, একটা প্রেমের গল্প, আমিই পড়তে দিয়েছি।

Career of a Nihilist প্রেমের গল্প—কথাটাকে মিথ্যা না বললেও চলে, কিন্তু অনেকবার ভেবেছি, ষ্টেপনিয়াকের Underground Russia বা Russia under the Czars, অথবা ক্রপট্‌কিনের Conquest of Bread পড়বার বেলায় অমনি ধরা প'ড়ে গেলে উনি কি বলতেন। অধিকন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ও বালাই ছিল না—সে যদি বইখানা হাতে নিয়েও দেখতো, Nihilist মানে কি, তা তার বোধগম্য হ'ত না।

এঁদের ঠিক বিপরীত, আর আইনের ক্রুর প্রতিমূর্তি ছিল জেলার। সে দেখতো, সান্যাল এসে মাঝে মাঝে

অনেকক্ষণ [illegible] কথা কন, সুপারি-ন্টেণ্ডেণ্ট তখনও করে। সেই র করে কেন? তবে, সে আসতো প্রায়ই রাত্তির অন্ধকারে—পা টিপে টিপে, অথবা দুপুরে আমার ঘুমোবার পর। তার আলাপ ছিল প্রায়ই নিজের বাড়ি ঘরের উদ্দেশ্যে—আমার কথা থেকে গোপন কিছুর সন্ধান পায় কি না, আর তার নিজের সম্পর্কে আমি যেন কোনো খারাপ ধারণা না পোষণ করি।

একদিন বিরক্ত হয়ে বলি, আচ্ছা, বলতো কোনো সিপাই কয়েদি তোমার সম্পর্কে 'শ'কারাদি বচন ছাড়া প্রয়োগ করে না কেন?

পান-খাওয়া দাঁত বের ক'রে খুব একচোট কাঁছহাসি হেসে বলে, আমি জানি, অমুক সিপাই, আর অমুক জমাদার।

ওরা কি বলে আমি জানিনে, তবে তোমার প্রশংসা করবার লোক একেবারে নেই

আর একটু হেসে বলে, আমি সেলে থাকতে অমুক সিপাই বলছিল, আর অমুক জমাদার এই দর—আমি সেলের দেয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনে গেছি।

আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ি। কিন্তু সেরকম ভাব না দেখিয়ে ওদের বাঁচাবার চেষ্টায় বলি, কি জানি ওরা এরকম বলেছে ব'লে আমার মনে পড়ে না!

কতবার আমি সাবধান করেছি সিপাইদের, তারা নিজের গরজেও কতবার খৈনি খেয়ে থুথু ফেলার উপলক্ষ্যে অ্যান্টিসেলের বাইরে দেখে নিয়েছে। তবু দেখছি ও কারও কারও কথা শুনে গেছে;

ও যে সিপাই আর জমাদারের নাম করলো, পরে তাদের পেয়ে সাবধান ক'রে দিলাম। ওরা এই শ্রেণীর লোকের সাধারণ দুর্বলতার ভাব প্রকাশ করলো, বললো, কি করবে ও?

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট
লিমিটেড

জমি ইত্যাদির উন্নতিবিধায়ক প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান।
হেড অফিস: ৫নং ক্লাইভঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কোম্পানী কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বহু মূল্যবান জমি সংগ্রহ করিয়াছে।

১৯৪৭-৪৮ সালে কোম্পানী শতকরা ৫% আয়করমুক্ত ইণ্টারিম ডিভিডেণ্ড দান করিয়াছে।

উচ্চহারে স্থায়ী আমানত গৃহীত হয়। "হোম এণ্ড-ডাউমেণ্ট স্কীম" কোম্পানীর আর একটি বিশেষত্ব।
বিস্তৃত বিবরণের জন্য
সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

বঙ্গলক্ষ্মী
ইন্‌সিওরেন্স লিঃ

১৪, নেতাজী সুভাস রোড,
কলিকাতা।

ক্রমোন্নতি জনপ্রিয়তার নিদর্শন।

১৯৪৭ অপেক্ষা ১৯৪৮এ নূতন বীমা শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এখানে ব'লে রাখি, বিলাসপুর প্রবাসী বাঙালীরা এই সিপাই জমাদারদের মাঝে মাঝে রাস্তায় ধ'রে আমার খবর নিতেন এবং আমায় খবর পাঠাতেন। তার জন্য ওদের সাথে ভাব করবার উদ্দেশ্যে টাকা পয়সাও খরচ করতেন। জেলারের কথায় বুঝলাম, সে সব ও কিছু জানতে পারেনি। তবে চন্দ্রিকাপ্রসাদের যে আমার সাথে বেশ ভাব এবং তিনি যে গোপনে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলাপ করেন, তা জেনেছে। এই এক ধরণের জেলার ছিল এবং এখনও আছে—যাদের জেল শাসনের উপায় কতকগুলি স্পাই এবং গুণ্ডা পোষণ করা। এই স্পাই এবং গুণ্ডার প্রাদুর্ভাব বড় বড় জেলগুলিতেই বেশী ক'রে টের পাওয়া যায়।

জেলার হঠাৎ একদিন একটা কতকটা বাইরের কথা পাড়লো। জিজ্ঞেস করলো, "বাংলা দেশে কয়টা সেণ্ট্রাল জেল?" আমার একটু খট্‌কা লাগলো।

বললাম।

তার পর জিজ্ঞেস করে, তার ভিতর কোন্ জেলটা ভালো?

বুঝলাম, গবর্ণমেণ্ট জানতে চায়, আমার কোন্ জেলে যাবার ইচ্ছা।

ইতিপূর্বে আই জি ব'লে গেছে আমি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ছেড়ে দিলে জব্বলপুর জেলে নিয়ে যাবে, সেটা ওখানকার সব চেয়ে ভালো জেল। জব্বলপুর স্বাস্থ্যকর জায়গা। এবং ঐ জেলে ষ্টেটপ্রিজনারদের রাখবার মতো ভালো ঘর আছে।

গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করেছিল, বাংলার সব ষ্টেটপ্রিজনারের হাজারিবাগ জেলে রাখবার। তার জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ ক'রে পুরোণো সেল ভেঙ্গে নতুন ক'রে প্রায় শ'দেড়েক সেল তৈরী করেছিল। কিন্তু প্রথম যে ষ্টেটপ্রিজনাররা সেখানে যান, তাঁরা গিয়ে পান এক যাচ্ছা রকমের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে—ফলে, পর পর তিনটি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক সেখানে হয়। আমায় হয়তো সেখানে আর নিতে চায় নি।

এদিকে বাবাও বিলাসপুরের গরম দেখে এসেছেন, তিনি কলকাতায় এসে চীফেনসনকে বলেন আ বাংলার কোনো জেলে আনতে। তিনি চেয়েছেন, আমায় যশোর, খুলনা বা ফরিদপুর—এর কোনো জেলে আনা হয়, যেন তিনি মাঝে মাঝে দেখা করতে পারেন।

চীফেনসন বলেছে, আমায় সেণ্ট্রাল জেল ছাড়া রাখা চলবে না। এরই ফলে ওখানে প্রকারান্তরে অনুসন্ধান করতে বলেছে, আমি কোন্ জেলে থাকতে চাই।

জেলারের প্রশ্ন থেকে অনুমান করলাম, এইরকমই একটা কিছু ব্যাপার দাঁড়িয়েছে। তাই জেলারের কথার জবাবে ব'লে বসলাম, রাজসাহী জেল।

রাজসাহী জেলের কথা আলিপুরে থাকতে শুনেছি, সবচেয়ে বেশী দুর্ব্যবহার ঐ জেলে, সবচেয়ে কড়া নির্জন বাসের ব্যবস্থা। আবার এ-ও শুনেছি, মেদিনীপুর জেলের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনকে ওখানে নিয়ে গেছে। তাঁদের কেউ কেউ আমার পরিচিতও।

এতদিনে বুঝে নিয়েছি, জেলে দুরবস্থা সবচেয়ে বেশী যেখানে, দুরবস্থা যেখানে সয়ে নেওয়া হয়। তবে প্রথম প্রথম সয়ে না নিয়েও উপায় ছিল না—প্রায় সবাই সর্বত্র একা পড়েছিলেন, ষ্টেট্‌প্রিজনারদের অধিকার কি, তা-ও জানা ছিল না। বাইরে থাকতে এই শুধু জানা ছিল, শত্রুর পুরীতে দুর্ব্যবহার তো ওরা করবেই, হয়তো বা যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মেরেই ফেলবে—তারই জন্যে তৈরী হ'তে হবে। অনেক জুলুম অনেকে নীরবে সহ্য করেছেন এই শিক্ষার ফলে।

চন্দ্রিকাপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি। তিনি বললেন, হয়তো আপনার অনুমান সত্যি। আমায় কিছু জানতে দেয়নি। একটা কি চিঠি এসেছে—জেলারকে ডেকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিয়েছে, কিন্তু চিঠি ফাইলে রাখে নাই।

কয়েকদিনের মধ্যেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানালো, আমার বদলির হুকুম এসেছে। কোথায় বদলি, তা বললো না। অন্য সময় জেলার আমায় আপ্যায়িত ক'রে

বললো, আপনি বলেছিলেন, রাজসাহী জেল বাংলার সেণ্ট্রাল জেলের মধ্যে সব চেয়ে ভালো। তাই আমরা আপনার সেখানেই বদলির ব্যবস্থা করেছি।

বাংলাদেশে ফিরে আসছি, নতুন জায়গায় আসছি, সঙ্গীসাথী পর—মনে আনন্দও আছে। আবার ভাবি, নিজেকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলবার সুযোগ এখানেইতো ভাল পাচ্ছিলাম! বেশ হ'ত থাকলে। সকাল সন্ধ্যায় ধ্যান, প্রার্থনা, আত্মবিচার করি, আপন মনে গান গাই। সারাদিন কিছু কিছু পড়ি বা লিখি। মনটা সব সময় একটা কিছু নিয়ে আছে, এই তৃপ্তিটা বেশ পাই। হাজার ঝঞ্ঝাটের পর ওখানে বেড়াসে এইভাবে কাটে।

জেলার একজন রিজার্ভ ইন্‌স্পেক্টর নিয়ে এল—আংলো-ইণ্ডিয়ান। বললে, ইনিই কাল আপনাকে নিয়ে যাবেন।

ইন্‌স্পেক্টরটি বললে ট্রেন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায়। কিন্তু আমি আপনাকে বিকেল ৩টা আন্দাজ নিয়ে যাব। আপনি তার ভিতর তৈরী হয়ে নেবেন।

সান্যাল এর ভিতর একদিন এসে বিদায় নিয়ে গেলেন। নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন, ছাড়া পেয়ে জব্বলপুরে একবার যেন তাঁর বাড়ীতে যাই। শুনেছিলাম, জব্বলপুরে কেন, সমস্ত মধ্যপ্রদেশের ভিতরই তাঁদের বাড়ীটি সুন্দর। মিঃ সান্যালের নিমন্ত্রণ কিন্তু রাখা হয়ে ওঠে নাই।

নগেন বাবু সরকারী কর্মচারী নন। আর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ পরঞ্জপের অন্তরঙ্গতার জন্য ওখানকার সমাজে বিশেষ খ্যাতি ছিল না—নেহাৎই সরকারী কর্মচারী। তাই নগেনবাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আর চেষ্টা করেন নাই। তিনি এবং বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুরের মারফৎ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। আমিও ঐ পন্থাতেই বিদায় নিলাম।

ইনস্পেক্টরটি জেল থেকে বেরিয়েই বললেন, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে আমি এত আগে বের করে নিয়ে এসেছি, কারণ, আমার মা আপনাকে একবার দেখতে চান, আপনাকে একটু চা খাওয়াতে চান।

বললাম, এতো সুখের কথা—মা চা খাওয়াতে চান, এতে মনে করবার কি আছে?

ইন্‌স্পেক্টরের কোয়ার্টারে গাড়ী থামতেই একটি শ্যামবর্ণ বৃদ্ধা মহিলা ছুটে এসে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এস বাবা এস, আমি কত কৃতজ্ঞ!

বুড়ি টেবিল সাজিয়েই রেখেছিলেন। বললেন, আমি বাঙালীর মেয়ে, আমার মা ছিলেন ব্যারাকপুরে সুরেন ব্যানার্জির বাড়ীতে আয়া। তোমার কথা কত শুনি। কি কাণ্ডই করেছিলে বাবা! অমন ক'রে মানুষেও পারে—আমরা তো শুনেই অস্থির—বলতে বলতে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন।

ছেলে তখন মাথা নীচু ক'রে পাশের চেয়ারটাতে ব'সে। তারপর তাঁর স্ত্রীও এসে টেবিলে যোগ দিলেন। চারজন এক সঙ্গেই চা খাওয়া হ'ল—আরও কত কি সব পিঠে পায়েস তৈরী করেছিলেন। আমি তখনও গুরুপাক জিনিষ কিছু খাইনে। কিছু কিছু বাদ দিলাম।

খেতে খেতে ইনস্পেক্টারটি বললেন: চারজন কনষ্টেবল ও একটি হেড কনষ্টেবল নিয়ে আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। অথচ কলকাতার উপর দিয়ে গেলে কি যে ক্ষতি হ'ত জানিনে। আমার স্ত্রীকে কলকাতায় পৌঁছে দেব। সে কথা জানান স্বত্বেও অনুমতি পেলাম না। আপনাকে নিয়ে যেতে হবে সিনি, আদ্রা, আসানশোল, ব্যাণ্ডেল, নৈহাটি হয়ে। একেবারে পথ ছকে দিয়েছে।

পথে বড় কষ্টই করেছিলেন এই ইনস্পেক্টর ও তাঁর স্ত্রী।

বাংলার সমস্যা

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

নানাদিক থেকেই বাংলা একটি সমস্যামূলক প্রদেশ বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলার এই খ্যাতি নিতান্ত অর্বাচীন নয়—বহুদিন থেকেই তার এই খ্যাতি চলে আসছে। বাংলার শাসনকর্তা বা গভর্ণর নিয়োগের সময় ইংরেজকে বিশেষ চিন্তা করে কাজ করতে হয়েছে আজ প্রায় ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ। বাংলার এই সমস্যামূলক অবস্থা বুঝতে হলে বহু পুরানো কথার আলোচনা এসে পড়ে। ভূ-তত্ত্বের দিক হতে বাংলাকে ভারতবর্ষের নবীনতম অঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল যখন শক্ত মাটীতে গড়ে উঠেছে, তখন হিমালয় হতে গঙ্গা সাগরে প্রবেশের মুখে পলিমাটী এনে এনে নাকি বাংলা দেশকে গড়ে তুলেছে—এমনি একটী কথা প্রচলিত আছে। নৃতত্ত্বের দিক হতে দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ আর্যরক্তের সাথে অনেকটা বেশী পরিমাণেই ঘটেছে। তাছাড়া ভারতের প্রাচীন অধিবাসী, যাদের বলা চলে কোলেরিয়ন, তাদের রক্তও বাঙালীর দেহে বেশ কিছু পরিমাণে প্রবাহিত আছে। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ কতকটা আলাদা অঞ্চল হিসাবে বরাবরই ভারতীয় ইতিহাসে বিবেচিত হ'ত। পরে মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রকে কেন্দ্র করে অঙ্গ এই আঞ্চলিক গণ্ডী হতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। দ্রাবিড় প্রভাব ও গাঙ্গেয় বংশের নেতৃত্বে মুসলীম রাষ্ট্রশক্তির প্রতিরোধ করতে গিয়ে কলিঙ্গ অঞ্চলও ঐ আঞ্চলিক গণ্ডীর প্রভাবের বাইরে অনেকটা চলে যায়। ঐতিহাসিক যুগে আমরা দেখতে পাই সংস্কার মূলক সমস্ত আন্দোলনের এই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঞ্চলেই উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধ ও মহাবীর এই অঞ্চলেই তাঁদের ধর্মমত প্রথম প্রচার করেন এবং এই অঞ্চলেই তাঁদের মত বিশেষ বিস্তার লাভ করে।

ক্রমে পূর্বোক্ত কারণে অঙ্গ ও কলিঙ্গ বাংলা হতে অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে যায়; তার বিশেষ পরিচয় আমরা পাই মুসলমান যুগে। মুসলমানরা উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বাংলায় আসে সকলের শেষে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার পাঠান শাসকগণ বহুল পরিমাণে বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং বাংলার পাঠান শাসকগণ অনেকটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বাংলার শাসন-কার্য্য চালায়। বাংলা ভাষা গড়ে তোলবার পক্ষে বাংলার পাঠান মুসলমান শাসকদের সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। হুসেন নামক মুসলমান শাসনকর্তা বিরচিত গঙ্গাস্তোত্র বাঙালী ব্রাহ্মণদের পক্ষেও অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হত। বাংলায় যে সব ভাদান ও মঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে মুসলমান কবিদের দানও কম নয়।

আচার্য শঙ্করের প্রভাবে যখন সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের ঝড়াকড়ি পুনঃস্থাপিত হচ্ছিল তখন বাংলা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কতকটা সমন্বয় হিসাবে তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করে। তারও পূর্বে পৃথিবীর আদিম দর্শন এবং সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রথম প্রবর্তক, সাংখ্য শাস্ত্রের উদ্ভাবক মহর্ষি কপিলের জন্মও বাংলাদেশে। ভারতব্যাপী ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুমোদিত আচারনিষ্ঠার কড়াকড়ির বিরুদ্ধে বাংলা বরাবরই একটা বিদ্রোহের ভাব বজায় রেখেছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও উত্তরাধিকার ও বিষয় সম্পত্তির বিধান হিসাবে প্রচলিত আছে মিতাক্ষরা; বাংলা সেইস্থলে গ্রহণ করেছে দায়ভাগ, যার মূল নীতি মিতাক্ষরা থেকে বহু পরিমাণে যুক্তি সঙ্গত ও সমাজনীতি সঙ্গত। আজ প্রস্তাবিত হিন্দু কোডে সমস্ত ভারতের জন্য দায়ভাগই অবলম্বিত হতে যাচ্ছে।

বাংলার প্রকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও বাংলা একান্তভাবে ভারতেরই অঙ্গ। ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে একটা নতুন রূপ দেওয়ার প্রয়াস বাংলাতেই প্রথম সূচিত হয়েছে—এইমাত্র বাংলার পুরাণো ইতিহাস হ'তে আমরা পাই। হিন্দু যুগে ভারতীয় কৃষ্টির গৌরবময় যুগ ছিল মৌর্য্য ও গুপ্ত যুগ। ঐ উভয় সাম্রাজ্যেরই কেন্দ্র ছিল মগধে এবং বাংলা একান্তভাবেই ঐ সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে ভারতের সংস্কৃতিগত গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। হর্ষবর্ধনের ও পরবর্তী যুগে চীন ও ভারতের মধ্যে যে

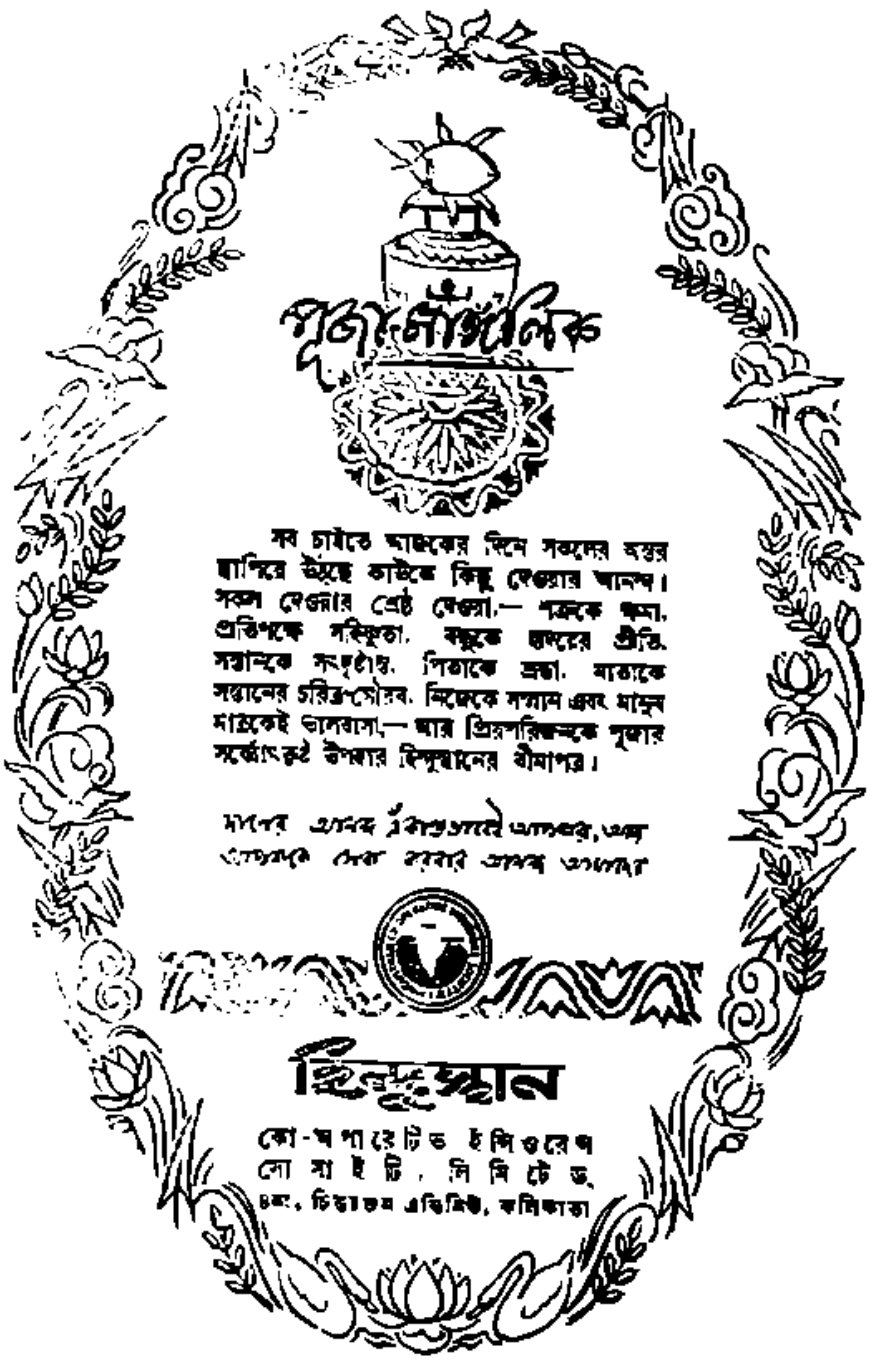
পূজা-সাপ্তাহিক
সব চাওয়াতে আজকের দিনে সবলের বড়
হাসিরে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ।
সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা,
প্রতিপক্ষে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি,
সন্তানকে সদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে
সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ
মাত্রকেই ভালবাসা,— আর প্রিয়পরিজনকে পূজার
সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটি, লিমিটেড,
৮নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

সংস্কৃতির যোগ স্থাপিত হয় তার মধ্যে বাংলা নালন্দা, বিক্রমশীলা, মহাস্থান প্রভৃতি বৌদ্ধ বিহারের মারফতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। পাঠান আমলে ভারতের সাংস্কৃতিক ও শাসনিক ঐক্য সে ভাবে বজায় থাকেনি। মোটামুটি এ কথাও বলা চলে যে পাঠান যুগ ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিচ্ছিন্নতার ও মৎস ন্যায়ের যুগ। সেই যুগে শাসনতান্ত্রিক সংগঠনে বাংলা অনেকটা স্বতন্ত্র ভাবে চলেছে, কিন্তু এই যুগে যে নূতন সাংস্কৃতিক আন্দোলন সুরু হয় বাংলা তাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। রামানন্দ, কবির প্রভৃতির সঙ্গে বাংলার চৈতন্যদেবের নামও এই নতুন আন্দোলনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যদেব সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করেন যা সেই যুগে অন্য কোন ধর্ম সংস্কারক করেন নি। চৈতন্যের ধর্ম প্রচলিত হিন্দুধর্ম হতে একটু স্বতন্ত্র ধরণের ও হিন্দু এবং ইস্‌লাম সমন্বয় সাধনের এক প্রয়াস এতে দেখা যায়। পরে গুরু নানক এই চেষ্টা বিশেষভাবে করেছিলেন মোটের ওপর আমরা দেখতে পাই নিজের চিন্তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা বজায় রেখেও বাংলা ভারতের অঙ্গ হিসাবেই বরাবর চলে এসেছে।

মুসলমান শাসন বাংলাদেশে উত্তর ভারতের মধ্যে সকলের শেষে স্থাপিত হয় এবং সকলের প্রথম বাংলা মুসলমান শাসনকে উচ্ছেদ করে। পরবর্তী যুগে মুসলমান শাসকগণ যে স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছিলে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জনতা তার বিরুদ্ধে কার্যত বিদ্রোহ করল। মীরজাফর বা উমীচাঁদকে দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক বলে আমরা যতই গাল দিই না কেন, একথা স্বীকার করা উচিত যে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জনতার মোটামুটি সমর্থন তাদের কাজের পিছনে ছিল। পলাশনপর সিরাজদ্দৌলা কোন মুসলমানের স্নেহ ও আশ্রয়লাভ করতে পারেননি এবং শেষ পর্যন্ত একজন মুসলমানই তাঁকে ধরিয়ে দেয়। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য একেবারে নিরর্থক নয়।

বাংলা দেশেই প্রথম ইংরেজ শাসন স্থাপিত হয়, বাংলাই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা গ্রহণ করে। ইংরেজী শাসনের প্রসারের সাথে সাথে ভারতের প্রায় সমস্ত উত্তরাঞ্চলে ইংরেজের সহায়ক হিসাবে বাঙালী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সব অঞ্চলে ইংরেজের কর্মচারী হিসাবে তারা যে কর্তৃত্ব ও অধিকার পেয়েছিল তার সম্পূর্ণ সুযোগ বাঙ্গালীরা গ্রহণ করে। ঐ সব অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত হয় বহু পরে। চাকরী এবং সহর-বাসী মধ্যশ্রেণীর উপযোগী জীবিকাক্ষেত্রে ঐ সব প্রদেশ-বাসীরা প্রবেশ করেও অনেক পরে। কাজেই বাঙালীরা প্রত্যেক প্রদেশেই শিক্ষিত সহরবাসী মধ্যশ্রেণীর আর্থিক ও সামাজিক সমস্ত সুখসুবিধা বহুদিন পর্য্যন্ত প্রায় একচেটিয়া ভাবে উপভোগ করেছে। ঐ সব অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে বাঙালী অনেকখানি সাহায্য করেছে। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে যখন ঐ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা শিক্ষিত ও মধ্যশ্রেণীর দাবী নিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন বাঙালীদের মনে একটা বিরূপভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ক্রমে ঐ সব অঞ্চলের লোকদের সাথে বাঙালীদের একটা বিষেষ ভাবাত্মক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলা দেশের ভিতরে বহুদিন পর্যন্ত বাঙালী হিন্দুরাই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সুখ-সুবিধা উপভোগ করছিল। ইংরেজ হঠাৎ একদিন হিন্দুতোষণ ও মুসলমান নিষ্পেষণ নীতি পরিবর্তন করে যখন মুসলমানদের তোষণ করার নীতি গ্রহণ করলে তখন প্রদেশের ভিতর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সম্পর্ক গড়িয়া উঠল।

উভয় ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে, এই পারস্পরিক বিদ্বেষ মূলতঃ ছিল মধ্যশ্রেণীর দ্বন্দ্ব। মধ্যশ্রেণী প্রথমে দেখা দেয় বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের ধারক ও সংরক্ষক হিসাবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট তালুকদার, জোতদারের সৃষ্টি হ'ল যারা ইংরেজের রাজস্ব আদায়ের যন্ত্র; আর সহরে উৎপন্ন হ'ল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ইংরেজের অফিসের কেরাণী হিসাবে। মধ্যশ্রেণীর বিরুদ্ধে আজ যত তীব্র মনোভাবই দেখা যাক না কেন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনে

গত ১০০ বৎসর ভারতবর্ষে এই মধ্যশ্রেণীর স্থান সব চেয়ে বেশী ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সংবাহক ও ধারক এই মধ্যশ্রেণী এবং বাংলাদেশে বরাবরই মূলত মধ্যশ্রেণীর প্রাধান্য চলে এসেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই বাঙালী মধ্যশ্রেণী প্রদেশের অভ্যন্তরে ধাক্কা খেল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে এবং প্রদেশের বাইরে ধাক্কা খেল প্রাদেশিক দ্বন্দ্বে। শিক্ষিত, কার্যক্ষম এবং তজ্জনিত উচ্চাভিলাষ নিয়ে গঠিত মনোবৃত্তিসমন্বিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী চারিদিক থেকে প্রতিহত ও ব্যর্থ বোধ করতে লাগল। একদিকে সে প্রতিহত হচ্ছিল বিভিন্ন প্রদেশের এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে উদীয়মান ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর নিকট; অপরদিকে সে প্রতিহত হচ্ছিল ইংরেজ সরকারের নিকট। বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুকে এতদিন সরকার কাজে লাগিয়ে ইংরেজ তখন নীতি পরিবর্তন করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী রাজনৈতিক জাতীয় আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে উঠল। তাই তাকে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস ইংরেজ সরকার স্বভাবতই করতে লাগল।

এই নীতিরই অনুসরণ করে ইংরেজ বাংলাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করল ১৯০৫ সালে। বাঙালী এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সুরু করলে। এই প্রতিবাদ ক্রমে গিয়ে দাঁড়াল স্বাধীনতার দাবীতে এবং গোপন ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টায়। সমগ্র ভারতের ভিতর বাংলাকে কার্যত আলাদা করে ইংরেজ তার নিষ্পেষণ নীতি চালাতে লাগল। বাংলার এই জাতীয় আন্দোলন ও ইংরেজের বাঙালী নিষ্পেষণ নীতির ফলে অন্যান্য প্রদেশ প্রচুরভাবে লাভবান হতে লাগল। বাঙালীর বিলাতী পণ্য বর্জনের সুযোগ নিয়ে বোম্বের কাপড়ের কলওয়ালারা প্রচুর মুনাফা করতে লাগল। এবং এই নীতিরই সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকরী ও ব্যবসা বাণিজ্যে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। প্রদেশের ভিতরেও শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী এসে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিস্যা নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু করল। তাই বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনে সকলের প্রতি একটা বিরুপতার মনোভাব গড়ে উঠল। ইংরেজকে সে সাহায্য করেছে, তার প্রতিদানে ইংরেজের কাছ থেকে সে তখন পাচ্ছিল নিষ্পেষণ ও নির্য্যাতন। বিভিন্ন দেশে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংবাহক হিসাবে কাজ করে সে পাচ্ছিল ঐ সব প্রদেশ হতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সমস্ত ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করে ভারতবর্ষের কোন অঞ্চল থেকে তার স্বীকৃতি সে পেল না, পেল ঘরে ও বাইরে প্রতিবন্ধক ও নির্য্যাতন। এর ফলে বাঙালীর মনে একটা আত্মঘুণী ভাব দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে
একলা চল, একলা চল
একলা চলরে॥
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলরে॥

—তাকে শিক্ষা দিল সমস্তকে অগ্রাহ্য করে চলতে।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা বিশেষ অধ্যায়। এই যে একলা চলার মনোভাব—তারই পরিচয় পাওয়া যায় এই আন্দোলনে। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছিলেন বাঙালীর আর সবই আছে, নেই কেবল মৃত্যুর সম্বল। বাঙালীর ইতিহাসে সামরিক বীরত্বের কাহিনী অতি বিরল। শান্তিপ্রিয়, নিরীহ বাঙালী যুবক মরিয়া হয়ে উঠল এই অপবাদ ঘুচাবার জন্য। বাঙালী যুবকের এই উন্মাদনায় রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তখন তিনি আবার লিখেছিলেন—

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥

বছরের পর বছর প্রায় ৩০।৩৫ বছর ধরে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন চলেছে এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বছরের পর বছর এই জন্য নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষ এই আন্দোলনকে বুঝবারও চেষ্টা করেনি। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে লোকমান্য তিলক কতকটা দরদ নিয়ে বাংলার এই আন্দোলনকে দেখেছিলেন। পাঞ্জাবের লাজপৎ রায় কখনও এই আন্দোলনের প্রতি সামান্য সহানুভূতি হয়ত প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু ব্যাপক ভাবে ভারতবর্ষ এই আন্দোলনকে বুঝতেও চেষ্টা করেনি, একে রাজনৈতিক কোনো স্বীকৃতিও দেয় নি। অথচ এই আন্দোলনের অনুবর্তী হিসাবে এল রাউলাট আইন এবং তারই অনুসরণে মহাত্মা গান্ধীর ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলন। Servants of India Society'র প্রভাব হ'তে যে সংঘর্ষ-মূলক রাজনীতিতে গান্ধীজী অবতীর্ণ হলেন তা বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনেরই ধারা বেয়ে। গান্ধীজী নিজে পুরোপুরি অহিংসাবাদী হয়েও আন্দোলনে বাংলার যুবকদের সাহস, লাঞ্ছনা বরণ, দেশপ্রেম ও আত্মাহুতির স্পৃহাকে স্বীকার করেছেন এবং অনেকটা দরদ দিয়ে এদের বুঝতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবর্গ, বিশেষ করে পণ্ডিত জওহরলাল বাংলার এই আন্দোলন সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন বাঙালী মধ্যবিত্ত যুবকদের কাছে তা অজ্ঞাত নয়।

এই সব নানা কারণে বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুদের মধ্যে সর্বভারতীয় ভাবপ্রবাহের সঙ্গে পুরোপুরি সংযোগ রাখা সম্ভব হয়নি; বরং একটা বিচ্ছিন্নতা ও একঘরের ভাবই বাঙালীর মনে গড়ে উঠেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যিক যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজের পোড়ামাটি নীতি (Scorched earth policy) ও প্রত্যাখ্যান নীতি (Denial policy) বিশেষভাবে বাংলায় প্রযোজিত হয়েছিল। বাংলার রাজনৈতিক চেতনাশীল ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব এবং বাংলা একটা প্রান্তীয় প্রদেশ এই দুই কারণে বাংলা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের সময় বিশেষ সতর্ক ও হুঁসিয়ার হয়ে ছিল। ইংরেজের এই যুদ্ধনীতির কবলে পড়ে বাংলাকে যে নির্যাতন ও অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে তার সঙ্গে অন্য কোন প্রদেশের কোন তুলনা হয় না। পঞ্চাশের মন্বন্তর এই যুদ্ধনীতিরই ফল। জাতিকে শুধু ভাতে মারা নয়, নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়েও তাকে আঘাত করার জন্য ব্যাপকভাবে অসততার প্রসার ইংরেজের যুদ্ধনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। চোরাকারবারী, মুনফাখোর প্রভৃতি জিনিষের উৎপত্তি ঐ সময় এবং ইংরেজের বুকে সুকে গৃহীত যুদ্ধনীতির অনিবার্য ফল। ইংরেজের এই সব অপকর্মে জনযুদ্ধওয়ালারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইংরেজকে সাহায্য করেছে। এই সঙ্গে এল মেদিনীপুরের বন্যা। বিদ্রোহী মেদিনীপুরকে সায়েস্তা করার জন্য প্রকৃতিও যেন ইংরেজকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হ'ল ঐ বন্যার সময় বাংলা সরকার যে অমানুষিক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে তা ইতিহাসে বিরল।

এই সব অত্যাচারের যথোপযুক্ত স্বীকৃতি ও অপনোদনের মত দরদ বাংলাদেশ সর্বভারতীয় নেতাদের কাছ থেকে সে ভাবে পায়নি। বাংলা মনে করে যুদ্ধের বাজারে যখন বড় বড় ধনপতিরা কোটী কোটী মুদ্রা অর্জন করছিল তখন বাংলা সর্বপ্রকারে নিষ্পেষিত হচ্ছিল।

এর পর এল বিলেতী মন্ত্রীসভার দল (Cabinet Mission), বহু আলাপ আলোচনার পর কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত হ'ল; পণ্ডিত জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন। সমগ্র ভারতের শাসনভার অর্পিত হ'ল কংগ্রেসের ওপর এবং তার প্রতিবাদে মোসলেম লীগ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কার্যক্রম গ্রহণ করল মহাযুদ্ধের সময় যেমন ইংরেজের যুদ্ধনীতির প্রথম ও প্রধান মার পড়ল বাংলার ওপর, মোসলেম লীগের এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরও প্রধান কেন্দ্রস্থল হ'ল বাংলা। '৪৬ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় যা নৃশংস কাণ্ডের অভিনয় হ'ল তা পুরো এক বৎসর পর্য্যন্ত চলেছিল। তখন বাঙালী যুবক যে প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছিল তার পর্যন্ত স্বীকৃতি

রূপসী পল্লীবাসিনী

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা বাঙ্গলার শ্যামল বক্ষে যে কাব্য ও সঙ্গীতের ফল্গুধারা প্রবহমান তা মূর্ত হয়ে উঠেছে বাঙ্গলার পল্লীনরনারীর জীবন ও চরিত্রে।

বাঙ্গালী নারীর কমনীয় লাবণ্য সুষ্ঠু ভাবে বিকশিত হয় তার সরল, অনাড়ম্বর বেশে। সাধারণ শাড়ীতে তার লালিত্য ফুটে ওঠে, দেহ ভাঙ্গমায় আসে অনুপম ছন্দ, শাড়ীর বর্ণাঢ্য পাড় ও তার জমির শুভ্রতায় ঘটে অপূর্ব সমন্বয়।

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ এখন যাবতীয় চাহিদা মিটোবার জন্য নানাপ্রকার কাপড় তৈরী করছেন। আমাদের তৈরী শাড়ী, ধুতি ও শার্টিংগুলি সূক্ষ্ম ও দীর্ঘস্থায়ী বলে সারা ভারতে সুনাম অর্জন করেছে।

অনুপম বসন

কেশোরাম কটন মিল্‌স্ লিমিটেড

কেশোরাম

ম্যানেজিং এজেন্ট : বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ
৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

নিখুঁত ব্লক

মনোরম ডিজাইন ও রঙ্গীন ছাপার

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

রিপ্রোডাক্সন সিণ্ডিকেট

THE SYMBOL OF SOUND SERVICE

৭-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট · কলিকাতা · ফোন বি.বি.৬০১

আজও সর্বভারতীয় তরফ থেকে হয়নি। অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলিয়ে এবং প্রচলিত শাসন যন্ত্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাঙালী যুবক মরিয়া সাহসে মোস্‌লেম লীগের আক্রমণকে প্রতিহত করতে প্রস্তুত হ'ল: তখন যে সব কাণ্ড উত্তর তরফ থেকে হয়েছে, মনুষ্যত্বের মানদণ্ড দিয়ে দেখতে গেলে তা অত্যন্ত লজ্জাকর। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে তখন যদি কলিকাতা মোস্‌লেম লীগের নিকট আত্মসমর্পণ করত তা'হলে কলিকাতা সহর ও বন্দর ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকত কিনা সন্দেহ। এবং এ কথাও স্মরণ করা দরকার যে কলিকাতা নগরী ভারতীয় রাষ্ট্রের বাইরে চলে গেলে সমগ্র ভারতের আর্থিক ও ইণ্ডষ্ট্রীয় সংগঠন বিশেষভাবে পর্যুদস্ত হ'ত।

পূর্ব্বে যা বলেছি তা থেকে এটুকু সহজেই দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে ইংরেজের সাম্রাজ্য-নীতির মার বাংলা ও বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই বিশেষভাবে খেতে হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগে এবং ১৯১২ সালে বাংলা ও বিহারকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থায় আমরা এই নীতিই দেখতে পাই। বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কাবু করে রাখার জন্যই বাংলা-ভাষাভাষী কতকগুলি অঞ্চল বিহার ও আসামের অন্তর্ভুক্ত রাখা হ'ল। বাংলার অপরাধ হ'ল সমগ্র ভারতের জাতীয় দাবীকে সে উগ্র করে তুলেছিল। এর প্রতিশোধে বাংলাকে মারবার জন্য ইংরেজ যে ব্যবস্থা অবলম্বন করল তার পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ ও উপভোগ করল পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলার এই সব ন্যায্য দাবী তার মনে স্বভাবতই জাগে। আমরা এমন কথা বলতে চাই না যে বাংলা যে সব দাবী করছে এর প্রতিকূলে কোন যুক্তি নেই বা তার দাবী ষোল আনাই স্বীকার্য। কিন্তু সমবেদনা ও সহানুভূতির স্পর্শ সে নিখিল ভারত হ'তে আশা করতে পারে। তার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই সে প্রতিহত ও ব্যর্থ হচ্ছে। সর্ব্বোপরি এল নূতন বাংলা বিভাগ। বাংলার দুই তৃতীয়াংশ ভারত রাষ্ট্রের বাইরে চলে গিয়েছে। বাঙালী আজ দুইটী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। এই দুই রাষ্ট্রের ভিতর সম্পর্ক মৈত্রী ও প্রগতির পথে না গিয়ে বরং চলেছে একটা উল্টা পথে। এবং দুই রাষ্ট্রের এই পারস্পরিক সম্পর্কে ক্রমশঃ যে বৈরিভাব জাগছে তার কারণ বাংলা নয়, তার কারণ হায়দ্রাবাদ বা কাশ্মীর। সেখানেও বাঙালীর মনে ক্ষোভ আছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারতীয় রাষ্ট্র যে বাস্তবতার পরিচয় দিচ্ছে তার শতাংশও বাংলার জন্য দিচ্ছে না। অন্তত ২৫ লক্ষ উদ্বাস্তু হিন্দু পূর্ববাংলা হতে ভারতীয় রাষ্ট্রে এসেছে। তাদের পুনর্বসতি ও দুঃখ লাঘবের (relief) যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কার দোষ তা সাধারণ মানুষ ততটা অনুসন্ধান করে না। সে কেবল এইটেই দেখে যে যা সে চায় তা কার্য্যে পরিণত হচ্ছে কিনা।

এ ছাড়া আরও একটা বিষয় বিচার করবার আছে। বাংলা প্রধানত মধ্যশ্রেণীর দেশ এবং বাংলার মধ্যশ্রেণী যতটা রাজনীতি-সচেতন তেমন আর কোন প্রদেশের মধ্যশ্রেণী নয়। এই মধ্যশ্রেণী দেখছে জীবনক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধা ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। বাংলার বাইরে তাদের স্থান নেই; বাংলার ভিতরে ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানত অবাঙালীর হাতে; এই অবাঙালী ধনপতিদের বদান্যতা অন্য প্রদেশে যতখানি দেখা যায়—বাংলার ব্যাপারে তারা যেন অনেকটা কৃপণ হস্তে বদান্যতার পরিচয় দেন; সমগ্র বাংলার দুই তৃতীয়াংশ হতে বাঙালী হিন্দু মধ্যশ্রেণী আজ প্রায় উৎসাদিত হবার মুখে;—প্রায় কোন জীবিকার উপায়ই আজ তাদের জন্য সেখানে মুক্ত নেই। এই অবস্থায় তারা সাধারণতই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তুলছে।

স্বভাবতই বাংলার অসন্তোষ আজ তীব্র হয়ে উঠেছে। স্থানীয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি এই অসন্তোষকে আরও প্রখর করেছে। সমাজ বিরোধী ও ক্ষমতা অভিলাষী বিভিন্ন দল বাংলার তাদের প্রভাব বিস্তার করছে। কেবল সহরে নয়, সুদূর পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যেও ঐ শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের প্রভাব যেন বিস্তার লাভ করছে। বাঙালী সমাজ

কোনদিকেই কোন পথ যেন খুঁজে পাচ্ছে না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপজীবিকার ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। মানভূম, কুচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙালীর যে সম্প্রসারণের স্থান হতে পারত তাও আজ প্রায় রুদ্ধ। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ঘন বসতি প্রদেশ—প্রতি বর্গমাইলে আটশতের উপরে লোক এ প্রদেশে বাস করে। বাংলায় যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তা বাঙালীর পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। অন্য প্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপনের বা জীবিকা অর্জনের পথ প্রায় রুদ্ধ। আসামে ও বিহারে আজ বাঙালী বিদ্বেষ তীব্র। এমনি অবস্থায় যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হচ্ছে। স্থানীয় শাসনের অব্যবস্থায় ও অক্ষমতায় এর গতি কতকটা দ্রুত হয়েছে মাত্র।

পরিশেষে আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। পশ্চিম-বাংলা আজ ভারতের একটি প্রান্তীয় প্রদেশ। একটা অস্বাভাবিক ও ভূগোল-বিরুদ্ধ দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলার পূর্বে ২০০ মাইলব্যাপী সীমান্তরেখা আছে যা প্রায় কোথাও কোন সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার সাথে কোন সংযোগ রাখেনি। এই বিভাগের ফলে কলিকাতার ব্যবসার ক্ষেত্র আজ সঙ্কুচিত; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক অতিকায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে আজ একটি ছোট অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে; কলিকাতা হাইকোর্টও তেমনি সঙ্কুচিত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা আন্তর্জাতিক বিধানে যতই পরস্পরের নিকট বিদেশ হউক না কেন, ভূগোল, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সামাজিক বন্ধনে উভয়ই পরস্পরের নিকট আত্মীয়। পশ্চিম বঙ্গের বাঙালী নিজের দেহকে কেটে বাদ দেওয়ার এ দুঃখ সহজে ভুলতে পারে না এবং তজ্জনিত অসন্তোষ ও ক্ষোভ তার মনে সক্রিয় থাকবেই।

আজ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কংগ্রেসের উচ্চতম অধিনায়কদের এ সব বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। কেবল নিয়মতান্ত্রিক বিধিনিষেধ দ্বারা এর প্রতিকার করা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলা আজ একটি প্রান্তীয় প্রদেশ তা ভুললে চলবে না। এবং একথাও মনে রাখা দরকার যে একটা অস্বাভাবিক বিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলা আজ প্রান্তীয় প্রদেশ হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এইভাবে প্রান্তীয় অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। যদি ভারতের নেতৃবর্গ ও কেন্দ্রীয় সরকার সে মনোযোগ দিতে না পারেন তবে এর ফলও তাঁদের ভোগ করতে হবে। পশ্চিম বাংলায় যদি সমাজ-বিরোধী উৎপাতসৃষ্টিকারী রাজনৈতিক দলের প্রভাব বৃদ্ধি পায় তবে আসামে ও বিহারে ঐ সব দলের প্রভাব বিস্তার লাভ করতে আদৌ দেরী হবে না। তার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হবে এবং সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ ও ব্যাহত হবে।

পরিশেষে বাংলার জনসাধারণের, বিশেষ করে রাজনৈতিক চেতনাশীল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। তাদেরও স্মরণ রাখা উচিত তাদের দাবীর বিরুদ্ধে অপর অঞ্চলের দাবীও উত্থাপিত হতে পারে। এবং ষোল আনা যুক্তিই যে তাদের দাবীর পিছনে আছে এমন কথা মনে করাও সঙ্গত নয়। সকল প্রদেশেই বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষভাব দেখা যাচ্ছে তার জন্য ঐসব প্রদেশের লোকদের ওপরই সমস্ত দোষ চাপিয়ে যদি আমরা আত্মানুসন্ধান না করি তাহ'লে আত্মপ্রতারণার অপরাধে আমরা অপরাধী হব। ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন ধর্মের লোক আছে। এদের পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সমন্বয় সাধন করে ভারতের জাতীয়তা গড়ে তুলতে হবে। রামমোহন রায় থেকে সুরু করে সুরেন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত বাংলাই একজাতীয়তার ভাবে সমস্ত ভারতকে উদ্বুদ্ধ করেছে। যে নূতন ভাবধারার সূচনা হয়েছিল বাংলায় তার, পূর্ণতার সময় বাংলা পিছিয়ে থাকবে এটা তার পক্ষে গৌরবের নয়। ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহ ত্যাগ করে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণী মহৎ আদর্শ নিয়ে আবার চলতে পারবে এই বাঞ্ছনীয়।

প্রচ্ছন্ন

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

হঠাৎ সিঁড়ির আলোটা জ্বলে উঠতেই, কিশোর ও অনু আস্তে-ব্যস্তে সরে দাঁড়ালো।

অনুর বড়দি সুপ্রভা গা ঘুরে, ভিজে কাপড়ে ওপরে যাচ্ছেন। গম্ভীর গলায় তিনি হাঁকলেন, কিশোর! তারপর অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বললেন, ভালো লোক জেনে তোমার হাতে অনুকে পড়তে দিয়েছিলাম। এই তার ফল? যাও, এক্ষুণি বেরোও বাড়ী থেকে। আর কোন দিন ঢুকবেনা এখানে।

কিশোর প্রথমটা হতবুদ্ধি হ'য়ে গেল, কিন্তু তখনি সেভাবটা সামলে নিয়ে সে বললো, আপনার কথার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে চাইনে। কিন্তু আমার একটা কথা-ও আপনি করি শুনবেন আপনি।

—না, কোন কথা নয়। কি এখনো তুমি দাঁড়িয়ে যে! যাও, এক্ষুণি বেরোও।

কথাটা কিন্তু শুনলেই পারতেন, বলে কিশোর বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। তার পিঠের ওপর ঝনাৎ করে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে, সুপ্রভা আবার সিঁড়িতে ফিরে এলেন। বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে প্রবল বেগে। বারেন্দার গা-ঘেঁষে-ওঠা ঝাঁকড়ামাথা ঘোড়া নিমের গাছটার বর্ষণ-বিব্রত পাখীরা করছে কিচি-কিচি। তীক্ষ্ণ তরবারির ফলার বিদ্যুৎ দিগন্ত চিরে কালা-ফালা করছে, আর গুড় গুড় হুড় হুড় মেঘ গর্জ্জনের সমারোহে ধ্বনিত হচ্ছে কেন তার দুঃসহ কি একটা চাপা ক্রোধ! জানালার গরাদ ধরে অনু নিঃশব্দে বাইরের পথে তাকিয়ে আছে তার পনেরো বৎসরের জীবনে লেগেছে যেন কি একটা নূতন অনুভূতির ছোঁয়াচ!

সুপ্রভা এসে দাঁড়ালেন তার কাছে।

—সত্যি কথা বলো, কি হচ্ছিল।

—কিছু না। পড়ে গিয়ে পায়ে লেগেছিল, কিশোরদা তাই পা-টা ডলে দিচ্ছিলেন। আমি বারণ করেছিলাম...

সুপ্রভা মুখ ভেংচে বললেন, থাক, আর ন্যাকামি করতে হবে না। আমি স্পষ্ট দেখছি, দুজনে জড়াজড়ি ক'রে বসেছিলে ছি ছি এতদূর হয়েছে! লেখাপড়ার নামে এই বদমাইসি!

অনু দিদির দিকে একবার করুণ চোখে তাকিয়ে বললো, শুধু-শুধু যা তা বলছো কেন দিদি? যাকে নিয়ে এই কথা বলছো, তিনি গরীব হলেও ছোট লোক নন!

খুব যে বড়ন, বলেই এক ঝলক বিদ্রূপের বিষ ঢেলে দিয়ে সুপ্রভা ওপরে উঠে গেলেন। অনু নিশ্চল পাষাণ মূর্তির মতো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। কি তার অপরাধ?

কিশোর বি-এ পাশ করার পর যখন ইতস্ততঃ চাকরির ধান্দায় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে, আর উপস্থিত মতো তালি দিয়ে চালানোর জন্যে এবেলা-ওবেলা করছে প্রাইভেট মাষ্টারী, সেই সময় অনুর দাদা সমীরের সঙ্গে তার হঠাৎ আলাপ হয়। সমীর ছেলেটি খুব অমায়িক—বুদ্ধি তার একটু কমই ছিল, কিন্তু অন্তরের প্রাচুর্য্যে সে অভাবটুকু পূরণ ক'রে নিতো। সে-ই চেষ্টা-চরিত্র করে কিশোরকে অনুর প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করলো—অনু ম্যাট্রিক দেবে, ইংরেজী আর অঙ্কে তার একটু ভালো কোচিং দরকার।

তারপর থেকেই অনু পড়ে কিশোরের কাছে। কিশোর আসে সন্ধ্যার, আর রাত্রি সাড়ে ন'টা দশটা পর্য্যন্ত থাকে। এই সময়টা অনুর মা থাকেন পূজোর ঘরে, দিদিরা রান্না ঘরে, আর সমীর কোথায় যেন যায় গটস্থাণ্ড শিখতে। শুধু কিশোর আর অনু থাকে ওপরের ঘরে পড়াশুনা নিয়ে.....এতে কারুরই ছিল না কোন আপত্তি, কারণ অনু হ'ল ছেলে মানুষ, আর কিশোর নেহাৎই ভালো মানুষ! ওরা জানলো না, কিন্তু এই ভালো মানুষীর ফলেই অনু আর কিশোরের সম্পর্কটা আস্তে-আস্তে হ'য়ে উঠলো কেমন যেন আত্মীয়তার সম্বন্ধের মতো। শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধটা শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো তার বহিরাচরণ মাত্র।

এক রকমের পড়ানো আছে, যেখানে ছাত্রের মনের ভেতর থাকে চাপা একটা প্রভুত্বের ভাব, আর শিক্ষকের

প্রসাধনের সাধনায়

কুন্তলপরিচর্য্যার
তুল্যপরিহর্ত্তা
উপকরণ সম্ভার

ডি.কে.সেন'স
ড্রাগস এণ্ড কেমিক্যাল্স লিমিটেড
২০৫/১ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

ছাপাখানার যন্ত্রপাতি

রোটারি প্রিন্টিং মেসিন
অফসেট প্রিন্টিং মেসিন
ফ্লাট বেড ট্রেডল মেসিন

ব্লকবিভাগের যন্ত্রপাতি

ক্যামেরা
ক্রীন
আর্কল্যাম্প
কেমিক্যালস্

দপ্তরিখানার যন্ত্রপাতি

কাটিং মেসিন
ষ্টিচিং মেসিন
নম্বরিং মেসিন
রুলিং মেসিন
পার্ফোরেটিং মেসিন

সব কিছুর জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে আনন্দিত হইব।

ইণ্ডোসুইস্ ট্রেডিং

=কোম্পানী লিঃ=

কেণ্ট হাউস

৩৩ মিশন রো একস্টেনসন-কলিকাতা

ফোন : ওয়েষ্ট ৭১৬

মধ্যে থাকে একটা চাকরি করার কুণ্ঠা। শিক্ষক-ছাত্রে অন্তরঙ্গতা হ'তে পারে না সেখানে। এই জিনিষটার ব্যতিক্রম হ'ল ওদের ক্ষেত্রে। এর ফলে অন্নুর ওপরে কিশোরের আধিপত্যটাও গেল অসম্ভব বেড়ে।

অন্নু যদি একদিন টাস্ক না ক'রে রাখে, কি না বলে যদি বেড়াতে যায়, কিংবা যায় সিনেমায় তাহ'লে কিশোর রাগ করে, ধমক দেয়। এক-এক দিন কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে, রাশভারী মাষ্টারমশাইটি হ'য়ে থাকে। অন্নুও কম পাত্র নয়, সেও নড়ে না, চড়ে না, গুম্ হয়ে থাকে—হাতই দেয় না বই খাতায়। তারপর অবশ্য ভাবটা আবার কিশোরকেই করতে হয়। এক-আধ পশলা অশ্রু বর্ষণ ও মান-অভিমান যে বাদ যায়, তা নয়। এ কালের মানুষ আমরা এসব ব্যাপারকে স্বাভাবিক বলেই গণ্য করি এবং এইটুকু প্রসঙ্গকে জল্পনার ঘড়ি দিয়ে টানতে-টানতে আর বেশী দূর নিয়ে যাওয়া অসঙ্গত ভাবি, যদিও প্রবীণেরা এর ভেতরই কি আর আগুনের সম্পর্কের আভাষ পান।

একটা কাজের খবর পেয়ে কিশোর ক'দিন খালি দৌড়াদৌড়ি করছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবসরই হয় নি তার। অবশেষে কাজটি হল না জেনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, চারদিন পরে আবার সে এলো অন্নুকে পড়াতে।

কাঠের পুতুলের মতো অন্নু বই খাতা নিয়ে বসে আছে, কথা নেই, বার্ত্তা নেই, যেন হুঁসই নেই যে কিশোর তাকে পড়াতে এসেছে। হয়েছে কি তার? কিশোর তার কপালে অন্নুলের একটা টোকা দিয়ে বললো, এই, ভাবছো কি অত? মেয়ের বিয়ে নাকি?

অন্নু সাড়াশব্দ দিল না। হঠাৎ কিশোরকে অবাক ক'রে দিয়ে, অন্নু দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে-কাঁদতে বললো, আসেন নি কেন?

আমার বুঝি আর মন খারাপ হয় না?

কিশোর দস্তুর মতো ঘাবড়ে গেল। কেউ দেখলে কি মনে করবে। তাছাড়া চারদিন আসতে না পারায়, কি এমন হয়েছে, যাতে কান্না আসতে পারে? চারদিন অনুপস্থিতির জন্যে মাইনেত কাটা যাবে তার—কাঁদলে কাঁদা উচিত তারই, ও কাঁদছে কেন? তাড়াতাড়ি সে অন্নুর একটা হাত চেপে ধরলো। বললো, ছি, শুধু-শুধু কাঁদে নাকি মানুষে? কি হয়েছে.....যা, ওকি?

কিন্তু ব্যাপারটা তা বলে উপেক্ষনীয় নয়। সত্যিই কি এই ক'দিন না আসায় ওর কষ্ট হয়েছে? কি সেই কষ্টের কারণ? কিশোরের মনটা দুলিয়ে গেল—তার মনের তারে কেমন একটা না-বোঝা আনন্দের সুর বাজতে লাগল, তারি সঙ্গে মোচড় দিতে লাগল একটা বেদনার সুর। দুই-ই যেমন আকস্মিক, তেমনি অননুভূতপূর্ব্ব! সে অন্নুর হাতটি জোরে নেড়ে দিয়ে বললে, ছি, কেঁদো না। বিদ্যুৎ চমকের মতো তার মনের আয়নায় ফুটে উঠলো একটা কথা—অন্নু তাকে নিশ্চয় ভালোবেসেছে!

অন্নুর কান্না থামলো একটু পরে। কিছু না বলে নিঃশব্দে ধরলো কিশোরের ডান হাতটা এবং সেটা তুলে নিয়ে নাচাতে লাগলো আস্তে-আস্তে।

হঠাৎ দরজার ওপিট থেকে কাঁজালো গলার হাঁক দিল অন্নুর মেজদি মনু, অনি, শুনে যা ত একবার!

অন্নু নীচে চ'লে গেল। একটু পরে যখন সে আবার ওপরে এলো, তার মুখ চোখ গম্ভীর, বিমর্ষ, থম-থমে। কিশোর জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো, অন্নু কিন্তু বললো না কিছুই। তবে যে ভাবে সে খোলা দরজার মুখোমুখি পিছু হটে বসলো, তাতেই কিশোর বুঝলো, ব্যাপারটা মনু সবই দেখেছে এবং বাইরে থেকে যা ভাবা স্বাভাবিক, তাই ভেবে অন্নুকে ধমকেও দিয়েছে আচ্ছা করে।

লজ্জায় মুখ কালো হয়ে গেল তার।

বিছানায় শুয়ে কিশোর ঘুমুতে পারলো না অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত। নানা এলোমেলো চিন্তায় চিত্ত তার বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল দিকে-দিকে ছোট বেলার কথা মনে পড়লো। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে, সে মানুষ হয়েছে পরের উঠানে অন্ন খুঁটে একটু দয়া, একটু দরদ, একটি আদরের কথা কোন দিন লাভ হয় নি তার ভাগ্যে—উপেক্ষা, অসম্মান, লাঞ্ছনা, এই জুটেছে তার বরাবর। দোকানে খাতা লিখে, লোকের বাড়ী ছেলে পড়ানোর

বিনিময়ে হেরে থেকে, খাতায় বই টুকে, পরের বই চেয়ে পড়ে, কত কষ্টেই সে পড়েছে বি-এ পর্যন্ত! এম-এ আর পড়তেই পারে নি, যাহক একটা চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা করছে কিন্তু কোথায় চাকরি? দিন রাত্রি ঘুরে-ঘুরে হয়রাণ, কত লোকের দরজায় গেছে, কত সই-সুপারিশ জুটিয়েছে, কিন্তু চল্লিশ টাকা মাইনের একটা কাজও হল না তার চার বৎসরের মধ্যে! খুচরো টিউশানির ভরসা খুঁটি ধ'রে সে দাঁড়িয়ে আছে কোন মতে একটা অল্প খরচের মেসে!

এর ওপর হঠাৎ অনু এ কি সুরু করেছে ক'দিন থেকে? সে কুমারী, সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, তার সামনে রয়েছে মস্ত ভবিষ্যৎ—এমন ক'রে তার জীবনে ত বিপর্য্যয়ের ঝড় তোলা ঠিক নয়। যার নিজেরই দাঁড়াবার স্থান নেই, চাল-চুলো নেই, সে এর কী সমাধান করে? যতই আকর্ষণ থাকুক এতে, তবু এ জালে জড়ানো উচিত হবে না। তাছাড়া ওদের বাড়ীতে বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অপমানও আসতে পারে কোনদিন!

তখনি কিশোর ঠিক ক'রে ফেললো, আর সে ওখানে যাবে না, অনুকে পড়াবেও না! কিন্তু অনুকে তার ভালো লেগেছে, খুবই ভালো লেগেছে.....লাগুক, উপায় নেই কিছু!

সকাল বেলা খবরের কাগজের একটি টুকরো হাতে নিয়ে, কিশোর বাহাত্তর নম্বর চোরবাগানে এসে হাজির হল এক টিউশানির খোঁজে। ঢুকেই সে দেখলো, মোটা-সোটা কালো গোছের এক ভদ্রলোক খালি গায়ে, ধুতি পরে বারান্দায় ঘুরছেন। একটু এগিয়ে নমস্কার করতে গিয়েই সে খুসী হয়ে উঠলো—আরে, এযে জানকীবাবু। অনুর বড়দি সুপ্রভা দেবীর স্বামী। হ্যাঁ, হাঁ, তিনি চোর বাগানেই ত থাকেন—শাশুড়ীর সঙ্গে বনে না বলে,সুপ্রভা থাকেন বাপের বাড়ীতে, জামাই-ই নিয়মিত যাওয়া আসা করেন!

কিশোর প্রথমটা খুসী হয়ে উঠলেও, পর মুহূর্ত্তেই বেশ একটু সঙ্কুচিতও হল—অনুদের বাড়ী পড়ানো ছেড়ে দিয়ে, এ বাড়ীতে পড়ানো নিলে, কি ভাববেন জানকী-বাবু? জানকীবাবুও কিশোরকে দেখে, কেমন যেন একটু বিব্রতই হলেন। আশ্চর্য্যান্বিতভাবেই 'কি খবর', বেশ ...বসুন' এমনি গোটা একটা কথা বলতে-বলতেই তিনি ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বললেন, দেখছি, দেখছি আমি।

কিছুক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করার পর আর এক ভদ্রলোক এলেন—চেহারা অনেকটা জানকীবাবুরই মতো। বোধ হয় তাঁর ভাই। কিশোর নমস্কার করলো।

—কি চাই আপনার?

—ছেলে পড়ানোর খবর দেখেছি কাগজে···

—হ্যাঁ, ছেলে ত পড়বে একটি, কিন্তু দলে-দলে লোক আসছেন ঠিক ভোজের বাড়ীর মতো। সবাই বলেন বি-এ, এম-এ···তা আপনি কি?

কিশোর সবিনয়ে বললো, বি-এ। তারপর আমতা-আমতা ক'রে বললো, জানকীবাবু বুঝি আপনার দাদা হন?

—হ্যাঁ, চেনা আছে নাকি?

—আছে। ওঁর শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে জানাশোনা আছে, সেখানেই আলাপ হয়েছে।

—বেশ, বেশ, তা ওঁর শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ-টম্বন্ধ আছে নাকি?

ঢোক গিলে কিশোর বললো, না, তাঁদের মুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসাতে আমি পড়াতাম।

শুনেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো হো করে, ছাদ ফাটানো হাসি। হেসে, কেসে, পেটে চাপড় মেরে অদ্ভুত একটা কাণ্ডই বাধিয়ে দিলেন তিনি। কিশোর ত হতভম্ব—ব্যাপার কি? পাগল না ত? ভদ্রলোক কিন্তু হাসছেনই, হাসছেন আর বলছেন, আ, তাই বলুন, তাই বলুন।

অপ্রস্তুত মুখে কিশোর বললো, কেন বলুন ত? হাসছেন কেন এতে?

—কেন শুনবেন? দাদার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, নাতি নাৎনী সব এখানেই আছেন—দাদার শ্বশুর বাড়ী এখান নয়, কাটোয়ার। আর ঐ মুকিয়া ষ্ট্রীটের যার কথা বলছেন

তিনি ওঁর স্ত্রী নন, কি বলে গিয়ে উপ……, তাই। এক সময় খাসা নাচতেন, গাইতেন, দাদা আর শরৎকুণ্ডু গিয়ে ভিড়লেন সেখানে। কুণ্ডু শেষ পর্য্যন্ত কোত হয়ে ফিরলেন, দাদার আর ফেরা হল না—দু লাখ টাকা আয়ের কারবার খতম করলেন ওর ধ্যানে। মনাই, সাবধান! ছেলে মানুষ, কেন ওখানে গিয়ে নিজের পরকালটি ঝরঝরে করবেন?

কিশোর নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনলো ভদ্রলোকের বক্তৃতা। কি এক রকম অদ্ভুত অনুভূতিতে যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহটা তার শিউরে উঠলো বার দুই, তারপরই তাতে নেমে এলো একটা অসাড়তা! জানকীবাবুর ভাই থামতে, সে নিস্তেজ ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললো, একজন ভদ্র মহিলার নামে এসব বিশ্রী কথা কেন বলছেন! আপনার দাদার উনি দ্বিতীয় স্ত্রীও ত হতে পারেন।

ভদ্রলোক আবার হেসে উঠলেন তেমনি করে। বললেন, আরে ভায়া, বসো, বসো। বয়স কত হল! চব্বিশ-টব্বিশ হবে আশা করি। আমার প্রায় পঞ্চাশ হল এ বয়সে আর যাই করি, ইতরতাটা করবো না. এ ঠিক জেনো। হ্যাঁ, ঐ যে ভদ্র মহিলা না-কি বলছো, ওর মার নাম জানো? বাইজী বিনোদিনীর নাম শুনেছো? তিনিই। এখনো বঙ্কিম সরকার বেঁচে আছেন—তেপান্ন নম্বর সিমলা ষ্ট্রীট, খোঁজ করো গে, সবই জানতে পারবে। তিনি ঐ বিনোদিনীকে ভয় করেন, আর সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ী তাঁরি দেওয়া। এরপর সরকারের সঙ্গে আজনাই ছুটে গেল—বড় মেয়েটি লায়েক হ'য়ে উঠেছিল, বিনোদিনী তাকে ধরালো নিজের কারবারে, আর সেখান থেকেই সুরু হল আমাদের সর্ব্বনাশ!

ভয়ে-ভয়ে কিশোর বললো, কি রকম?

—ঐ যে বললাম, শরৎকুণ্ডু আর আমার দাদাতে কাড়াকাড়ি সুরু হল পুঁটীকে নিয়ে। দুজনে পাল্লা চললো, কে কত নবাবী দেখাতে পারে—কে হাজার টাকার নোট পুড়িয়ে সিগারেট খেতে পারে, কে নতুন কাশ্মীরী শালে পা-পোষ বানাতে পারে! এই করতে-করতে শেষটা কুণ্ডু ফেল মারলেন, ল্যাজ গুটিয়ে সরে পড়লেন, ঘরে গেলেন আমার দাদা! এত বড় আমাদের টিম্বারের কারবার, সব গিয়ে সেঁধোলো ঐ মাগীর বাক্সে! ঐ যে তোমার ভদ্র মহিলা না…উনি একটি অতল সমুদ্র, অনেক জাহাজ ডুবেছে ওতে, বুঝলে ভায়া। যাও, একটু খোঁজ করে দেখো!

শুনতে-শুনতে কিশোর কেমন যেন ভূতগ্রস্তের মত হ'য়ে গিয়েছিল। টিউশানির কথা আর তার মনে রইলো না, ছোট একটি নমস্কার দিয়ে সে পথে বেরিয়ে পড়লো!

পথে বেরিয়ে কিশোরের মাথা ঘুরতে লাগলো বন বন ক'রে। তাহলে সুপ্রভা পতিতা, তাঁর মা, অর্থাৎ জেঠীমা তাহলে আর কেউ নন, স্বনামধন্যা বিনোদিনী। আর অনু, মনু…ছি ছি, কেন সে এখানে এলো? কেন এ পর্দ্দা উঠে গিয়ে, সত্যের উলঙ্গ কুশ্রী মূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে গেল এমন ভাবে? কিন্তু সেই আদি ইতিহাস, বা ঐ রূপবতী, শান্ত, ভদ্র পরিবারের মেয়েকে প্রথম নরকের পথে টেনে এনেছিল?

সিমলা ষ্ট্রীটে এসে, কিশোর বঙ্কিম সরকারের বাড়ী খুঁজে বের করলো, তারপর এক বৃদ্ধ পানওয়ালার কাছ থেকে সে বিবরণ সংগ্রহ করলো, তা বহু জানকীবাবুর ভায়ের দেওয়া ইতিহাসের সঙ্গে মেলে। অবশ্য কথাটা তাকে পাড়তে হল বেশ কৌশল করে—যেমন, বাড়ীটি কার? কি করেন? কেমন লোক? অল্প বয়সে বড়লোকদের যে সব ব্যারাম থাকে, ওঁর তা ছিল কিনা। বুড়ো ঐ পাড়ারই লোক, সে ঠিক-ঠিক উত্তর জুগিয়ে গেল সব প্রশ্নেরই। আর বিনোদিনীর বড় মেয়ে পুঁটী এবং শরৎ কুণ্ডু ও জানকী চৌধুরীর কাহিনী পর্য্যন্ত!

দীর্ঘ দিনের সংস্কারে কিশোর এই শ্রেণীর নারীদের ঘৃণা করতেই শিখেছে! জীবনের কোন কদর্য্যতম মুহূর্ত্তেও সে এদের সংস্রবে আসবে, এ তার স্বপ্নের মধ্যেও ছিল না। নিজেকে তার খুবই যেন কলঙ্কাক্ত, কলুষিত মনে হল। এদের হাতে সে খেয়েছে, নিত্যকার মেলামেশায় এদের সে আপন জন বলে ভেবেছে এই সঙ্গেই মনে হল তার—কত বড় প্রতারণা ক'রে এরা সমাজের বুকে চেপে বসে আছে, আর ঝুটা ভদ্রতার গুমর করছে! সহরে

মন্দিরা—আশ্বিন

স্থাপিত ১৯১৯

বেঙ্গল ইন্সি ও রেল্‌স

এণ্ড

রিয়েল প্রপার্টি কোং লিঃ

অফিস : ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

১৮,০০,০০০৲ টাকার উপরে দাবী মিটান হইয়াছে।

গত সালের ভ্যালুয়েশানে প্রশংসনীয় উদ্বৃত্ত

শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ, এম্ এল্-এ
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

মিঃ বি, ই. এন, বোস
সেক্রেটারি

আধুনিকতম ডিজাইনের হেডিং ও বডি

টাইপ ও বর্ডার প্রভৃতি ষ্টক হইতে

সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

শ্রী টাইপ ফাউণ্ডরী

৮ বি, লালবাজার ষ্ট্রীট
বিকানীর বিল্ডিংস্

সত্বাধিকারী

জে, সি, হুই অ্যাণ্ড কোং

সমাজে কেউ কারুর খবর রাখে না, সেই সুযোগে এরা লোকালয়ে চলে হ'য়ে গেছে, আর অপরাধী হয়েছে, অবজ্ঞাত হয়েছে শুধু তারা, যারা ছল-চাতুরীর আশ্রয় না নিয়ে, খোলাখুলি পথে এসে দাঁড়িয়েছে!

বিরক্তিতে রী-রী করতে লাগলো তার দেহ মন।

হঠাৎ কিশোরের মনে পড়লো অনুর কথা। সুন্দরী, কিশোরী, কুমারী অনু, নিষ্পাপ, পবিত্র একটি ফুলের মতো—যেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি তার মধুর স্বভাব। কিন্তু এই রূপ গুণের সম্পদ নিয়ে, সে কি পারবে কোন দিন মানুষের অধিকারে উঠে দাঁড়ানোর উপায় করতে? এই আবেষ্টনীতে তা কি সম্ভব? তাই কি সে তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছে, এই পাপের আবর্ত্ত থেকে উদ্ধার পাবে বলে? অনুর জন্যে সহানুভূতিতে ভরে উঠলো তার সারা মন। হতভাগী অনু—কি তার ভবিষ্যৎ?

তারপর মন একটু শান্ত হলে, সে ভাবলো, আচ্ছা, ওদের দোষ কি? ওরা কতটুকু দায়ী এজন্যে? আর মানুষ নির্ব্বিশেষে মূল্য কি কমে যায়, তার উদ্ভবের ইতিহাস পঙ্কিল হলে? প্রস্ফুটিত পঙ্কজের আদি শেকড় পাকে পোতা, তবু কি তা সুন্দর নয়, মধুর নয়? সমাজের আদর্শ ই বদলে গেলে, এত পাপ ব'লে গণ্য না-ও হতে পারে। তবু সংস্কার.....শেষ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেই হবে কিশোরকে এদের সংস্রব থেকে। কিন্তু এক্ষুণি ভাবে নয়—চরম ভাবেই সে বিদায় নিয়ে যাবে এদের কাছ থেকে, অনুর কাছ থেকে।

সন্ধ্যের সময় অনুদের বাড়ী এসে, কিশোর দেখলো দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই, অনু নেমে এলো হড়মুড় করে। হঠাৎ পায়ে কাপড় বেঁধে পড়ে গেল সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার সময়। তারপর কি হল, সে বিবরণ গোড়াতেই দিয়েছি।

বিতাড়িত হ'য়ে কিশোর পথে নামামাত্র হুহু ক'রে এলো ঝড় আর বৃষ্টি। কিন্তু সে দিক দৃকপাত করার মতো মনের অবস্থা তার নেই—তার বুকে তখন বইছে অনেক বড় ঝড়, দেহে ছুটছে অনেক বেশী প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহ। সে ভাবলো বাইজী বিনোদিনীর মেয়ে পুঁটী, বর্ত্তমানে সুপ্রভা বোনের শুচিতা সম্বন্ধে হঠাৎ এমন মারাত্মক রকম সচেতন হ'য়ে উঠলেন কেন? সেকি নিজের গ্লানিময় জীবন যাপনের প্রতিক্রিয়া, অথবা তার জন্যে ঠিক নিজের মতোই কোন শাঁসালো খদ্দের জোটানোর জন্যে, তাকে দরিদ্র প্রাইভেট টিউটারের কবল মুক্ত করা?

কিন্তু অনু তাকে ভালোবেসেছে। তাকে সে পেতে চেয়েছে। ভালো করেছে কি? কিন্তু, যাক গে—ওরা চুলোয় যাক, আর সে ওদের কথা ভাববেই না কোন দিন।

ঝড়-জলের মধ্যে দিয়েই বোঁ বোঁ করে এগিয়ে চললো কিশোর, তার মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটের মেস মুখো।

ফিরে আয়?

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

সংসারের শংকাকুল দিশাহীন পথে।
অন্তরের স্বপ্নরাশি মহাকাল স্রোতে—
যায় ভেসে। মানবের বহু ক্ষুদ্র আশা।
উঠি' দিগন্তের পানে পায় নাকো ভাষা॥
তাই থাকে মূক হ'য়ে ধরিত্রীর বুকে।
মরণের হিম স্পর্শ টেনে তার মুখে॥
সুদূরের যবনিকা যুগ যুগ ধরি'।
মুক্তির বাঁশরী তান গায় প্রাণভরি'॥
শরতের মেঘসম ভাসে কলতান।
রচে শুধু অন্তরের তরে অভিমান॥
রূপহীন, স্পর্শহীন, শূন্য পারাবার।
অসীমের গতি পথে করে হাহাকার॥

ভ্রান্তি দিয়ে শান্তি দিয়ে গড়া ঘর 'পরে!
খেলাঘর বাঁধা হেথা দু'দিনের তরে॥
অসীম ডাকিয়া চলে নিশি দিন ধরি'
ফিরে আয় মোর কাছে সব কিছু ছাড়ি॥

দধীচির ভূমিকা

শ্রীরবীন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী

ভারতের সম্পূর্ণ বৈদেশিক তহবিল বৃটেনে, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের নিকট স্বল্পমেয়াদী ঋণপত্রে লগ্নী আছে। যুদ্ধ-বিরতির পরবর্তী আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে ইহার পরিমাণ ছিল ১৩৫২ কোটি টাকা। মধ্যবর্তী কয়েক বৎসরে ভারত সরকার এদেশে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধকালীন সম্পত্তির মূল্য (১৩৩ কোটি টাকা), আন্তর্জাতিক বাট্টা তহবিলের ও পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের মূলধন, অবসর গ্রহণকারী বিদেশী কর্মচারীদিগের পেন্সন বাবদ থোক টাকা ও অবিভক্ত ভারতের নগদ তহবিলে পাকিস্তানের অংশ প্রভৃতি হস্তান্তর করায় উক্ত তহবিল ক্রমশঃ কমিয়া ৮৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘমেয়াদী, একটু বেশী সুদের ঋণপত্রে ইহা লগ্নী করিতে দেওয়া হয় নাই; তৎপরিবর্তে ট্রেজারি বিলে নামমাত্র সুদে লগ্নী করিতে বাধ্য হওয়ায় ইহার উপর শতকরা বার্ষিক মাত্র বারো আনা সওয়া তিন পয়সা হারে সুদ পাওয়া যায়। অথচ, বৈদেশিক লেনদেন সম্পর্কে ক্রমাগত ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র হইতে বার্ষিক শতকরা ৪১।৪।০ সুদে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

গত জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ ভারতীয় আর্থিক চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার এই তহবিল হইতে বার্ষিক খরচ সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়াছেন,—

(১) গত বৎসরের (১৯৪৮ সনের) সহিত তুলনায় মোট আমদানী বাণিজ্য ও ডলার এলেকা হইতে আমদানী শতকরা ২৫ ভাগ কমানো হইবে;

(২) বৃটিশ পাউণ্ড মুদ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট এলেকা হইতে যথাসম্ভব বেশী পণ্য আমদানী করা হইবে; এবং

(৩) রপ্তানী বাণিজ্য যথাসম্ভব বাড়ানো হইবে।

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে এই বাধ্যবাধকতাগুলির সম্যক তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তৎসম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে এই চুক্তির পটভূমিকা ও ভারত সরকার কর্তৃক উপরোক্ত সর্তে সম্মতিদানের কারণগুলি আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনার এবং স্বদেশে নাগরিকদিগকে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র সরবরাহের জন্য বৃটিশ সরকার বিভিন্ন মিত্ররাষ্ট্র হইতে প্রভূত পণ্যসম্ভার ক্রয় করিয়াছিলেন; তদ্ব্যতীত যুদ্ধক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী মিত্র দেশগুলিতে ঘাঁটি স্থাপনের জন্যও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের অত্যন্ত চরবস্থা; সেজন্য তাহারা নগদ টাকা কিম্বা জিনিষপত্র পাঠাইয়া দায় পরিশোধ করেন নাই। তৎপরিবর্তে, বিলাতী কোম্পানীর কাগজ দিয়া সরবরাহকারীদিগের পাওনা নিকাশ করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত লণ্ডন সহরই পুরাতন গোলার্দ্ধে টাকার বাজারের কেন্দ্র ছিল। বহির্বাণিজ্যে একটি দেশের নিকট অপর দেশের নিট পাওনা লণ্ডনে ব্যাঙ্কারদিগের মারফতে পাউণ্ড মুদ্রায় ভাঙ্গাইয়া বিভিন্ন দেশের হিসাবে জমা থাকিত। সে সুযোগে বিভিন্ন দেশের পাওনা অন্যান্য মুদ্রাও বৃটিশ সরকার হস্তগত করিয়াছিলেন এবং বিনিময়ে পাওনাদার দেশগুলির হিসাবে বৃটিশ কোম্পানীর কাগজ জমা করিয়াছিলেন। এইভাবে জমা তহবিলই ষ্টার্লিং ব্যালান্স নামে আখ্যাত।

উপরোক্ত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে,—আভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও আমদানী হ্রাসের দ্বারা জনসাধারণের শারীরিক ক্লেশ বাড়াইয়াই উক্ত তহবিল সঞ্চিত হইয়াছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় কর্মী অথবা উৎপাদনকারী মজুরী অথবা মূল্যবাবদ প্রাপ্ত অর্থদ্বারা জিনিষপত্র কিনিয়া থাকে। সে সময়ে জিনিষপত্র না পাওয়ায় নোটগুলি হাতে লইয়াই তাহাদিগকে শ্রম অথবা পণ্য বিক্রয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির জন্য সে নোটগুলিও তাহাদের হাতে থাকে নাই। ঐ শ্রম বা ততোধিক দরে জিনিষ ক্রয়ের জন্য সেগুলিও তাহাদের হাতছাড়া হইয়া মুনাফাশিকারী ও মজুতদারদিগের

সিন্ধুকে প্রবেশ করিয়াছে।

সে যাহাই হউক, উপরোক্ত খাতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোম্পানীর কাগজগুলি (অর্থাৎ ষ্টার্লিং ব্যালান্স) জনসাধারণেরই সম্পত্তি। কেননা, তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে বঞ্চনাদ্বারা স্থানান্তরিত পণ্যের বিনিময়ে উহা সঞ্চিত হইয়াছিল।

মূল্য বাকী রাখিয়া বৃটেনের জন্য সামরিক ও অসামরিক পণ্য সংগ্রহের উপরোক্ত ব্যবস্থানুসারে তথাকার নাগরিকগণ বৃটিশ শাসিত এলেকার অধিবাসীদিগের তুলনায় অনেক বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিয়াছে। সেখানে মাথা পিছু বরাদ্দ ও বেসরকারী ক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কঠোরভাবে বলবৎ করা হইয়াছিল বটে; কিন্তু অপরিহার্য্য জিনিষপত্রগুলি প্রত্যেকের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বাটোয়ারা হইত। সুস্থদেহ কোটিপতিকেও কমলালেবু দেওয়া হয় নাই, আবার অসুস্থ কৃষি একেবারে নিঃস্ব হইলেও সরকারী ব্যয়ে লেবু, দুধ, মাখন পাইয়াছে। প্রায় সব রকম খাদ্য সম্পর্কে বৃটেন পরনির্ভরশীল। বিভিন্ন উদ্বৃত্ত দেশ হইতে উহা আমদানী করিয়া সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফতে বন্টনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেজন্য খোরাকীতে হয়ত কিছু খাদ্য কমিয়াছিল সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য্য খাদ্যগুলি কমে নাই। কখনও-কখনও সাময়িকভাবে কোন-কোন পণ্য আমদানী কমিলে উহা ক্রয়ের অধিকারভোগী ব্যক্তিদিগের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই দিক দিয়া ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহারা কর্জ্জ ব্যবস্থানুসারে মূল্য না দিয়াই বৃটেনের প্রয়োজনানুসারে সর্বপ্রকার খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা ১৯৪২ সনে বলবৎ ছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময়ও ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কোন খাদ্য পায় নাই। এখানে বাস্তবিকই যে একটা দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে কিম্বা খাদ্যের গুরুতর ঘাটতি আছে—এ কথাও ভারতীয় আমলাতন্ত্র ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ সে সময়ে আন্তর্জাতিক দরবারে খাদ্যশস্যের জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলে ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধিহেতু বৃটেনের অংশে খাদ্যের বরাদ্দ কমিত। নিজেদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বজায় রাখিবার জন্যই কি তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ—সুস্পষ্ট প্রমাণ স্বত্বেও—সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারতে খাদ্যসঙ্কটের সংবাদ অস্বীকার করিয়াছিলেন? সে সময় বহির্ব্বাণিজ্যে লাভ ও ভারতে বৃটিশ সরকারের খরচ বাবদ ভারতের পাওনা বার্ষিক প্রায় ৪৫ শত কোটী টাকা লণ্ডনে ষ্টার্লিং ব্যালান্সে জমা হইতেছিল। তথাপি বিদেশ হইতে খাদ্য কিম্বা অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র কিনিতে দেওয়া হয় নাই।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য বাকী রাখিয়া সে সময় বৃটেনের কলকারখানায় ক্ষয়িত যন্ত্রপাতি পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি বৃটিশ ডমিনিয়নে ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অনগ্রসর রাষ্ট্রে নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে শিল্প বিস্তারের জন্য আদৌ কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষয়িত যন্ত্রপাতিগুলি পরিবর্ত্তনের জরুরী প্রয়োজন থাকিলেও উহা আমদানীর জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই। মার্কিণ সরকার কর্তৃক প্রেরিত গ্রাডি মিশন ভারতের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধানের পরে কতগুলি শিল্পবিস্তার করিতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ইজারা কর্জ্জব্যবস্থানুসারে আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র, কারিকর প্রভৃতি পাঠাইতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে রিপোর্টও গোপন করেন।

সে সময়ে ভারতের প্রয়োজনমত জিনিষপত্র আমদানীর ব্যবস্থা হইলে ষ্টার্লিং ব্যালান্সে জমার পরিমাণ কমিত; অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষও ইজারা কর্জ্জ ব্যবস্থানুসারে মার্কিন হইতে যন্ত্রপাতি পাইত; শিল্পবিস্তার ঘটায় এদেশে উৎপাদন বাড়িত, লোক নিয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত হইত, এবং মূল্যহার ক্রমশঃ চড়িতে পারিত না। কিন্তু তৎকালীন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষকে সব দিক দিয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন। ভারতের বাজার চিরকাল হাতে রাখাও যে তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল

না—সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় কি ?

টাকাটা আটক করার সময় বৃটিশ সরকার পরিশোধের ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই, মাত্র বলিয়াছিলেন যে যুদ্ধবিরতির পরে এই সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। কিন্তু স্থায়ী ব্যবস্থা সম্পর্কে এযাবত কোন আলোচনা হয় নাই। সাময়িক কিস্তি সম্পর্কে কয়েক দফা আলোচনা হইয়াছে। তদুপলক্ষে প্রতিবারই তাঁহারা ভারতের প্রয়োজনমত ঋণ পরিশোধ করিতে সামর্থ্যহীনতা জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং কিস্তি কমাইয়া ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে বলিয়াছেন।

সাম্প্রতিক সঙ্কটের পটভূমিকা—

পণ্য অথবা মূল্যবান ধাতু রপ্তানী দ্বারা আন্তর্জাতিক ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। বৃটিশ মুখপাত্রগণ গুজর দিতেছেন যে বৃটেনে চলতি উৎপাদন দ্বারা ষ্টার্লিং ব্যালান্স খাতে ভারতের দরকারমত বিলাতী যন্ত্রপাতি কিম্বা ডলার মুদ্রা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। অতএব, তাঁহারা লাভমাত্র ডলার মুদ্রায় ভাঙ্গাইয়া দিবেন ; এবং তাঁহাদের পাওনা সুবিধানুযায়ী কিস্তির মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ বৃটেনে অথবা পাউণ্ড মুদ্রার সহিত সংশ্লিষ্ট এলেকায় খরচ করিতে হইবে। ভারত সরকার, সম্ভবতঃ নিরুপায় হইয়াই, এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া থাকিবেন। ইহার ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতের গুরুতর ক্ষতি অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

বৃটেনে দর অত্যন্ত চড়া, সেজন্য ভারতবর্ষকে অকারণে বেশী খরচ করিতে হইবে ; যন্ত্রপাতি দুষ্প্রাপ্য ও ডেলিভারি পাইতে দেরী হয় বলিয়া প্রগতিমূলক পরিকল্পনায় বাস্তব রূপ দিতে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটিবে ; শিল্পবিস্তার স্থগিত থাকায় এদেশে উৎপাদন বৃদ্ধির এবং নিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সম্ভাবনা পিছাইয়া যাইবে ; সর্ব্বোপরি, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় হ্রাসের ফলে সেখানে বিক্রয়ও কমিবে। তথাপি ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়া ডলার এলেকা হইতে পণ্য ক্রয় শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাসের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গত বৎসর তথা হইতে ১৭৫ কোটী টাকার পণ্য আমদানী হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ৭৪ কোটী টাকার পণ্য সরকারী খাতে আমদানীও অপরিহার্য্য পর্য্যায়ভুক্ত। উহা কমানো হইবে না। অতএব বেসরকারী খাতে আমদানী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ছাঁটাই অংশটা তথা হইতে বাদ দেওয়া হইবে। ফলে জাতীয় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া অত্যাবশ্যক পণ্য এবং যন্ত্রপাতি আমদানীও অস্বাভাবিক পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। এই সম্পর্কে শ্রীযুত কিতীশ চন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের বিবৃতিটি বিশেষ তাৎপর্য্যব্যঞ্জক। তিনি বলিয়াছেন যে,—দর বেশী হইলেও ষ্টার্লিং এলেকায় মাল কিনিতে হইবে। সেখানে মাল পাওয়া না গেলে বরঞ্চ উপবাসী থাকিতে হইবে, তবু ডলার এলেকার মাল ক্রয় করা চলিবে না ;

প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিলে ভারতীয় জনসাধারণ ইহাতে মর্ম্মাহত হইবে। নানা কারণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, জার্ম্মানী, জাপান, বা কানাডা হইতে বৃটেনে পড়তা খরচ অনেক বেশী। কাঁচা মাল সম্পর্কে বৃটেন বহুল পরিমাণে পরনির্ভরশীল। উহার উপর জাহাজ ভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচটা অতিরিক্ত বোঝারূপে পড়তা খরচের অঙ্ক কাঁপাইয়া তোলে। বহুক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতি চালু থাকায় অন্য দেশের, আধুনিকতম কারখানার মত কম খরচে ও দ্রুত মাল তৈয়ারী হয় না ; সেখানে সাধারণ কারিকরও মার্কিণ, জার্ম্মাণ বা জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বীর মত সুপটু নহে। সর্ব্বোপরি, উৎপাদন ক্ষমতার সহিত তুলনায় বৃটিশ জনসাধারণকে অনেক বেশী মজুরী দেওয়া হয় ; তদুপরি, সর্ব্বব্যাপক বীমা, চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও বৃটিশ সরকার প্রতি বৎসর শত শত কোটি টাকা খরচ করিয়া থাকেন। রোগে ডাক্তারের পরামর্শ পাওয়ার কিম্বা ঔষধ ক্রয়ের জন্য কাহাকেও নিজের পকেট হইতে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না ; সরকারী তহবিল হইতে অধিকাংশ প্রিমিয়ম দিয়া এবং শ্রমিক ও মালিকের নিকট হইতে নামমাত্র প্রিমিয়ম লইয়া বেকার ও বার্দ্ধক্যবীমা করা হয় ; এবং সরকারী খরচে প্রত্যেককে প্রাথমিক শিক্ষা ও যোগ্য ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিক্ষা দেওয়া হয়। আবার জনসাধারণকে সস্তাদরে অত্যাবশ্যক খাদ্য সরবরাহের জন্যও তাঁহারা প্রভূত লোকসান দিয়া থাকেন।

এই সকল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য তাঁহারা যে কর আদায় করিয়া থাকেন, তাহা যোগ হইয়া পড়তা খরচ কাঁপাইয়া তোলে। সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে যে,—বৃটিশ জনসাধারণকে রাজার হালে রাখিবার উপযোগী ব্যয় সঙ্কুলানের জন্যই বিলাতী মালের দর চড়িয়া থাকে। প্রতিযোগিতায় মাল বেচিয়া তাহারা ইহা জোগাড় করিতে পারে নাই; অন্যান্য দেশে জোর করিয়া চড়া দরে মাল বেচিয়া ইহা আদায় করিতেছে।

ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। পুষ্টিকর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, এবং অপরিহার্য্য সুযোগ সুবিধার অভাবে এখানে শতকরা ৯০ জন লোক দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছে। ঔষধ পথ্য মিলে না, পুত্রকন্যাকে পাঠ্যপুস্তক, খাতা পেন্সিল কিনিয়া দিতে পারে না, বার্দ্ধক্য বা বেকারবৃত্তি, বিনাব্যয়ে শিক্ষা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা এখনও কল্পনা করা যায় না। বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসারে এই সকল অত্যাবশ্যক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন ভারত সরকার এখনও স্বীকার করেন নাই। অথচ বৃটিশ জনসাধারণকে রাজার হালে রাখিবার জন্য চড়া দরে বিলাতী মাল ক্রয়ের ব্যবস্থা দ্বারা দরিদ্র ভারতবাসীর উপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন!

মহর্ষি ধর্মীচি পরার্থে নিজের জীবন দান করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের কর্ণধারগণ বৃটিশ জাতির জন্য নিজেরা আত্মোৎসর্গ করেন নাই, স্বদেশবাসীর উপর অতিরিক্ত ক্লেশের ও ব্যয়ের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন মাত্র।

ডায়াপেপ্‌সিন

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে। যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত। ডায়াপেপসিন্ সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক পরিমাণে ডায়াপেপসিন্ বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খাদ্য হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে না। ডায়াপেপসিন্ ঠিক ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর একটি প্রধান সহায়ক মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ

কলিকাতা।

মহাকবি মাইকেল

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, পি-এইচ-ডি,

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিরোভাব দিবস বাঙ্গালী জাতির মনে যুগপৎ গৌরব বোধ ও কলঙ্কের সঙ্কোচ উদ্রেক করে। এই মহাকবি আধুনিক কাব্য সাহিত্যের উৎসমূলে দাঁড়াইয়া ইহার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রসাদে বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্য-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যুগীয় মনোভাব অতিক্রম করিয়া আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধুনাতন বিশ্ব বরেণ্য শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহারই কীর্তি ও অনুপ্রেরণার পরিণতি। সুতরাং ইহার তোরণ দ্বারে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবার যোগ্য।

কবির প্রতি সমাজের যে একটা দায়িত্ব আছে তাহা মধুসূদনের যুগে বাঙ্গালী সমাজ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। কবির আচরণের বিচার যে সাধারণ নীতির মানদণ্ডে সম্ভব নয় এ সত্য আমারা এখনও ঠিক গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাই মাইকেলের শোচনীয় অভাব ক্লিষ্ট মৃত্যু আমাদের বিবেকে কণ্টক বোধের বেদনার মত গ্রথিত আছে। কবির আশা আকাঙ্খা, প্রয়োজন, অভাব বোধ, আচরণের শোভনতা-সঙ্গতি সবই তাঁহার বিরাট প্রতিভার মাপ কাঠিতে নিয়মিত। অপরিমিত হিসাব নিকাশের বহির্ভূত ঐশ্বর্য্য-বিলাসের বিদ্যুৎ দীপ্তি বলসিত সুপ্রশস্ত জীবনযাত্রা তাঁহার বিরাট কবিত্ব শক্তির প্রতিবেশ ও পরিপূরক হিসাবে অপরিহার্য ছিল। নিজ জীবনকে সমিধ রূপে ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার কাব্যের হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছেন।

দুর্জয়, দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির বেদনা-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া—এই কবি রক্তাক্ত চরণে কাব্য সাধনার দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালার প্রথম কবি যিনি আত্মানুভূতির অন্তস্থ সাধারণতার মধ্যে নিজ কাব্য রচনার উপাদান খুঁজিয়া পাইয়াছেন। আশা তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে; কামনা তাঁহার বক্ষে হুতাশন জ্বালাইয়াছে;—হিসাব নিকাশের বাধ্যবাধকতা তাঁহার আকাশ বিহারের প্রবণতাকে পদে পদে প্রতিহত করিয়াছে; অশান্তিও আত্মদ্রোহের আবেগ তাঁহার রক্তোরক্তে প্রচণ্ড দোলা দিয়াছে। এই সমুদ্র-মন্থনের বিরাট আলোড়ন হইতেই মধুসূদনের কাব্য প্রতিভার জন্ম। এই ব্যোমচারী গরুড়পক্ষী বটিকা বিক্ষুব্ধ মহাকাশের নীড়েই জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার অপ্রকাশিত ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের সঙ্কীর্ণ সমাজ ব্যবস্থাও নীতিজ্ঞানকে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে। বাঙ্গালা সমাজে বিপ্লবী প্রথম কবিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সমাজে মাইকেলের আবির্ভাব যে অনন্ত সম্ভাবনার দ্যোতক, আজ তাঁহার তিরোধান দিবসে তাঁহারই স্মৃতি আমাদের ভবিষ্যৎকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলুক। *

* সিঁথি বৈকল্য সম্মিলনীতে মাইকেলের স্মৃতিবাসরে পঠিত।

দয়িতা

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

হে আমার দয়িতা !
শৈশবের শোভন স্বপ্নে
তোমাকেই ভাল বেসেছিলাম ;—
আর তাই ছিল আমার আনন্দ।
তোমার ছায়াচ্ছন্ন ছবি
নীরবে আমার ঘুমের মাঝে
শৈশবের ক্ষীণ জীবনে
দেখা দিয়েছিল।

ছায়ার আড়াল হ'তে
আমার ব্যথায় ভরা সুদূর নিদ্রার মাঝে
বেদনা ও দৈন্য দিয়ে ঘেরা দোলার উপর
তোমার হাসির ঝরণা
খুলে দিয়ে ছিলে।
তুমিই সেই স্নিগ্ধ ও তৃপ্তিকর—
ঘুমপাড়ানী দীর্ঘ রশ্মির প্রভাত আলো ;
সেই প্রভাত আলোর রশ্মিই
অপরাহ্নে আবার দেখা দিত।

আমার সরল চোখে
আমার আয়ত লোচনে—
—যা' তখনও ক্ষীণ দৃষ্টি হয়নি—
আমার সেই মুগ্ধ চোখে
আমার পাঁচ বছরের
ঊর্দ্ধগ্রীব নয়ন—
যা দেখে হাস্যমুখী
বসন্ত বালিকাগণও মুগ্ধ হ'ত॥

সমস্ত নিঃসঙ্গতার ভিতরও
বিশ বছর, ত্রিশ বছর ধ'রে—
আমার যৌবন তোমাকেই খুঁজেছে।
আমার বিকাশোন্মুখ প্রতিভা
আমার দুর্ভিগন্ধ পিঞ্জর থেকে
তোমার অন্তর মাঝে
আশ্রয় কামনা করেছে
—যাতে সেখানে
পূর্ণভাবে বিকশিত হ'তে পারে।

আমার শৃঙ্খলিত প্রতিভার
রুদ্ধকণ্ঠ কান্না
তোমার কাছেই
তার মিনতি জানিয়েছে—
তোমার হাত থেকেই
তার সেই শান্তি এসেছে
যা' তা'কে শুদ্ধ, শান্ত করেছে ॥

তুমিই আমার অনন্ত বাসনা
তুমিই আমার সাধনা
তুমিই আমার সুধা
তুমিই আমার বিষাদ
এতকাল তোমারই স্বপ্ন দেখেছি—
যখন ছলনাময়ী নির্জ্জন নিশীথিনীতে
আশার বিস্ময়ে
আমি প্রেমরজনীর গান গেয়েছি।

আবার তখনও
তোমারই স্বপ্ন দেখেছি
যখন নিঃসঙ্গতা ও হতাশার অবসাদে
করুণ বিষাদের গান গেয়েছি।
হে আমার নিরাশা,
হে আমার যাদুকরী !
অবশেষে তোমাকে পেয়েছি—
যখন আমার কেশ পলিত
যখন বৃথাই তোমার প্রতীক্ষায়
থেকে থেকে
আমার অন্তর প্রকৃতি এসেছে

সীতাসন্ধান

"সকল আকাশ সকল ধরা
আনন্দে হাসিতে ভরা"
—রবীন্দ্রনাথ

EIR • BNR

পাবলিক্ রিলেশন্স অফিসর কর্তৃক প্রচারিত

সর্বশক্তি দিয়া ইহার প্রতিবাদ করিব; ফল কি হইবে জানিনা। তোমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃসহায় বলিয়া বোধ করিতেছি। পত্র পাঠ সত্বর চলিয়া আসিও। পরাণ, সৌদামিনী ও ডালিম-কন্যাকে আমার প্রীতি ও স্নেহ দিও। প্রীতি জানিবে।

ইতি—
শ্যামল

পত্রখানির দিকে বিহ্বলনেত্রে তাকাইয়া সীতানাথ নিজেকে প্রশ্ন করিল, বন্ধ ব্যবচ্ছেদ?

সৌদামিনী, পরাণ ও ডালিম-কন্যা সীতানাথের মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিল বিষম কিছু ঘটিয়াছে, নচেৎ সীতানাথদার মুখে এতটা গাম্ভীর্যের ছায়া পড়িবার কথা নহে। পত্রের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে সীতানাথ কাহাকেও কিছু প্রকাশ করে নাই বটে, তবে ব্যবসায়ী ললিত পাল সবই যেন বুঝিল। সে খবরের কাগজখানি নিয়মিত পড়িত, ভাবিয়াছিল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরিকল্পনাটি যাহাতে এই নিয়ামতি বন্দরে সমর্থিত হয় তাহার জন্য একটি সভা ডাকিবে এবং সীতানাথকে সভার সভাপতিরূপে বরণ করিবে। সীতানাথ অবশ্যই এই প্রস্তাবের সমর্থনে যথেষ্ট বক্তৃতা করিবে। তাহাতে ফল ভালই হইবে। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ছাড়া আর আমাদের ব্যবসায়ী শ্রেণীর কল্যাণ নাই। ব্যবসাদার ললিত পাল কংগ্রেসের সেবকও বটে। মাসান্তে এক টাকা চাঁদা দিয়া যথাসাধ্য দেশ সেবা করিয়া থাকেন। কেহ নিয়ামতি বন্দরে পদার্পণ করিলে গোপদোরস্ত খদ্দরের কাপড়খানি পরিয়া গলায় মটকার চাদর জড়াইয়া সভামণ্ডপে বিরাজ করেন। ললিত পাল বুদ্ধিমান লোক। টাকা বাজাইয়া কোনটা আসল, কোনটা নকল এবং কোনটায় কত রস আছে তাহা সহজেই ধরিতে পারেন। ললিত পাল সীতানাথকে বাজাইয়া লইয়াছিল। আসল কাজ হাসিলের বেলায় সীতানাথ যে গোল বাধাইবে—তাহা ললিত পাল জানিত। কিন্তু কি করিবে কংগ্রেসের চাঁদার খাতায় নেহাৎ নামটা উঠিয়া গিয়াছে। এখন উহা কাটাইয়া লইতেও বিধা হয়। যদি এই পথে কিছু

সাহেবের সঙ্গে যাহোক এক রকম করিয়া খাতিরটা পাকাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ খাতির টিকাইয়া রাখিতে বড় বেশী খরচ। তার চাইতে কংগ্রেসী খাতিরটা সস্তে কিছু সুবিধা বটে। কিন্তু মাঝে-মাঝে ভারি ঘাটতি পড়িয়া যায়—এরা সব জেলে গেলে পুলিশ ভারি হাঙ্গামা করে। যাই হোক সেটাও মোটামুটি কাটাইয়া ওঠা গিয়াছে। কেননা এবার যুদ্ধের সময় যুদ্ধ তহবিলে যে টাকাটা দিয়াছে—তাহাতে শনির দৃষ্টির প্রায় এড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ না হইলে ত সব যাইবে। ললিত পাল এক অনিবার্য্য দুর্য্যোগের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিল। সে মনে-মনে স্থির করিল, যত টাকা লাগে তাহাই দিবে, কিন্তু সভা খুব বড় রকমের হওয়া চাই। এবং বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব যে কোন প্রকারে হোক পাশ করিতেই হইবে।—আমরা বঙ্গব্যবচ্ছেদ চাই। নচেৎ স্বাধীনতা আমাদের কাছে অর্থহীন।

সীতানাথ একদিন ললিত পালকে বলিয়াছিল, ললিতবাবু টাকায় দেশ স্বাধীন হয় নয়। ললিতপাল বুঝিয়া ছিল এ লোক ঘাঁটাইয়া লাভ নাই। সেদিন এই তীব্র মন্তব্য শুনিয়াও সে একবার সবিনয় ঘাড় কাৎ করিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, 'বুঝা লজ্জা দেন ক্যান্।' স্থানীয় কর্ম্মীরা দরিদ্রের সন্তান, জীবনদর্শন তাহাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে, এবং অনেক কর্ম্মীই এই পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে। তাহাদের দীনতার সুযোগ লইয়া যতটা ধনগর্ব্ব ললিত পালের দেখাইবার তাহার এতটুকু অপব্যবহার হয় নাই। সীতানাথের বেলায় অবশ্য সেইরূপ কিছু ঘটে নাই। তাই পাকা ব্যবসায়ী ললিত পাল স্ফীত গর্ব্বকে মনের গহন নিবিড়ে নির্ব্বাসন দিয়া কহিল, 'আওজকার ভাবা এখানেই অইব।'

এ প্রস্তাবে সীতানাথ মাথা নাড়িয়া আপত্তি করিল, 'না, আমরা এক্ষুনি রওয়ানা হব।'

ললিত পাল চক্ষু-মুখ বিস্ফারিত করিয়া বার দুই গলার তুলসী মালা ঘুরাইয়া লইয়া কহিল, 'আপনারা চইলা যাবেন।'

সীতানাথ ললিত পালের অনুরোধের মাত্রা আর বাড়িতে না দিয়া কহিল, 'আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমাদের খাবার ব্যবস্থা কৈবর্ত্ত বাড়ি হয়েছে।'

• •

ঈশ্বর মাল তরঙ্গিণীকে আসিয়া জানাইল, বন্দরে সভা হইবে। একবার পরোক্ষভাবে ঈশ্বরমাল তরঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইল, তরঙ্গিণী সভায় যাইবে কিনা। তরঙ্গিণী বেণী দুলাইয়া ঘাড় কাৎ করিয়া জানাইয়া দিল, অবশ্যই যাইবে। ঈশ্বর মাল হয়ত অন্তরে-অন্তরে ইহা কামনা করিয়াছিল। যদি তরঙ্গিণীর মন ইহাতে খুসী হয় ত মন্দ কি? সেদিন যে নূতন পাটশাড়ি সে কিনিয়া আনিয়াছে তাহা পরিয়া তরঙ্গিণী একদিনও কোথাও বাহির হয় নাই। শাড়িখানি পরিয়া বাহির হইলে তরঙ্গিণীকে কেমন দেখায় এই ফাঁকে তাহা দেখিয়া ঈশ্বর মাল শাড়ির কেনার পয়সা সার্থক করিবে। ঈশ্বর মালের অবশ্য বয়স হইয়াছে, তাতে মনের কি? তাহা না হইলে এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আবার তৃতীয় পক্ষ? তাহা কি করিবে মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে গেলে একটি সঙ্গী চাই ত। বাবা, এত বাঁচা নহে একেবারে বাঁচার উপরে ভুল রকে বসিয়া বাঁচা। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে কে তাহাকে দেখাশুনা করিবে? 'ধর যদি এমন হয় ছ'মাস পড়িয়া থাকি তবে আবার পুত্র বধূরা কি আমাকে দেখিবে?'—ঈশ্বর মাল তৃতীয় পক্ষের ঘরণীকে ঘরে আনিবার পূর্বে এই যুক্তিই প্রদর্শন করিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকানাই এই বিবাহের ছ'মাস পর আলাদা ঘর বাঁধিয়া নিজ ব্যবসায় মন দিল। কন্যারা কেহই বাবার বাড়িতে আসে না। কিছু দিন হইল ছোটপুত্র শম্ভুনাথ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক দেশত্যাগী হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেও তাহার শ্বশুর বাড়িতে নূতন করিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। ঈশ্বর মাল পুত্র কন্যা বিবর্জিত হইয়া একক জীবন অতিবাহিত করিতেছে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই, পাশে আছে তরঙ্গিণী। কিন্তু যে পাশে থাকে সে-ই কি মনের মানুষ হয়? আঃ পঞ্চাশ বছরের বুড়োর আবার মন? অমন মনের মুখে আগুন। মনে পড়িতেছে, তরঙ্গিণী

পাড়ার বুলবার মায়ের কাছে এইরূপ উক্তি করিয়াছিল। ঈশ্বর মাল ইহা শুনিয়া ঘুরে ঘুরিয়াছে, কিঞ্চিৎ হাসিয়া আপনার পাড়িতে হাত বুলাইয়াছে কিন্তু কোন মন্তব্য করে নাই। সেই দিনই হাটে গিয়া নয়নসুন্দরকে কহিল, 'ছোর দাদ, আমারে চাইর গাছি চুরি গড়াইয়া দেও।' নয়নসুন্দর মুখ টিপিয়া হাসিল। চুড়ি আসিল বটে, তবে রূপার চুড়ি।

সেই দিন রাত্রে রূপার চুড়ি ক'গাছি হাতে করিয়া ঈশ্বর মাল আসিয়া আলোর সামনে বসিল। আলো টাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, এ মল নয়, আজকাল লোকে এ জিনিষ বেশ পছন্দ করে। ঈশ্বর মাল হাতের চুড়ি ক'গাছি সকলকে নাড়িয়া যেন কাহার মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টায় ছিল। আড় চোখে একবার রান্না ঘরের দিকে তাকাইয়া আপনিই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী রান্না ঘরে আপন মনে যে কাজে ব্যস্ত ছিল তাহাতে ব্যাঘাত ঘটিল অর্থাৎ কাজে আর মন পুরাপুরি রহিল না। তরঙ্গিণী কৌতুক মিশ্রিত দৃষ্টি দিয়া পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, ঈশ্বর মাল কি একটা উজ্জ্বল পদার্থ হাতে লইয়া আপনাতে আপনি হাসিয়া কাটিয়া পড়িতেছে। উজ্জ্বল পদার্থটি তরঙ্গিণীর দৃষ্টি পথে পড়িতেই চিনিতে পারিল। সে আপন অন্তরের অদম্য কৌতূহল চাপিয়া রাখিয়া রান্না ঘর হইতে উচ্চৈস্বরে কহিয়া উঠিল, 'রাত্তির এবনকম অইল। আমি আর এ্যাকলা-এ্যাকলা থাকতে পারমু না। খাওয়া-দাওয়া শ্যাষ অইলে বাচি।'

ঈশ্বর মাল সলজ্জ পদে ধীরে-ধীরে তরঙ্গিণী দিকে আগাইয়া আসিল। পিছন হইতে বাথার উপর হাত রাখিয়া চুড়ি ক'গাছি কোলের মধ্যে টপ করিয়া ফেলিয়া দিল। ঈশ্বর মাল আবার হাসিয়া উঠিল। তরঙ্গিণী সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিল, 'না না আমার ভাল লাগে না।'

রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে তরঙ্গিণী ঈশ্বর মালের জন্য খানিকটা পান চেঁচিয়া তাহাকে দিল ও নিজে একগাল পান খাইল। বেশ-ভূষার পরিবর্ত্তন করিয়া তরঙ্গিণী চুল বাঁধিতে বসিল। পাশের আলোটা এক-একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিতে চাহে। তরঙ্গিণী ভাবিল আজ আলোটা সারা রাত জ্বালাইয়া রাখিবে। না হয় তেল একটু বেশী খরচ হইবে তাতে কি? হাতের চুড়ি ক'গাছির পানে একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে ঈশ্বর মালের দিকে মুখ ফিরাইল। বেচারি ঈশ্বর পাশের বিছানায় পড়িয়া সমানে নাক ডাকিয়া ঘুমাইতেছিল। তখন পানের নেশা তরঙ্গিণীর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। তরঙ্গিণীর মুখমণ্ডল হইতে যেন উষ্ণ বাষ্প বাহির হইতেছিল। তরঙ্গিণীর স্বল্প ঘর্ম্মাক্ত দেহে পানের নেশার আবেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ঘুমন্ত ঈশ্বর মালকে ধাক্কা দিয়া তরঙ্গিণী কহিয়া উঠিল, 'উঃ কি ঘুমরে বাবা! তরঙ্গিণী ভাবিয়াছিল আলোটা সারা রাত্রি জাগিয়া থাকিয়া আজিকার মিলন-দুর্গ পাহারা দিবে। যাক তাহা ঘটে নাই—তরঙ্গিণী শুইবার সঙ্গে-সঙ্গেই আলোটা নিভিয়া গেল। বাড়ির কোনে তাল গাছটায় চীলের নবীন শাবক কাঁদিয়া-কাঁদিয়া মায়ের কাছে হয়ত কিছু প্রার্থনা করিতেছে—তরঙ্গিণী ভাবিল যার 'কোদল' করিবার জন আছে, যার চাহিবার জন আছে সে ত চাহিবেই ও বিষয় পশু-পক্ষী মানুষ সবই এক। পাশ ফিরিয়া শুইয়া তরঙ্গিণীর মনে পড়িল, মানদা কহিয়াছিল করালীর চীৎকারে দুই রাত্র ঘুমাইতে পারে নাই,—না হয় করালীকে আমার কাছে থাকতে দে। তাত হবে না, কেবল পরকে শুনাইবে, সন্তানের অত্যাচারে রাত্রে ঘুম হয় না।

* * * *

কুলদার মা তরঙ্গিণীর হাতের চুড়ি নাড়িয়া কহিল, ওঃ রূপার। কুলদার মা মুখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া কহিল, 'রূপার চুরি যদি তবে, আর তেরাজ বয়ের ঘর ক্যান।' তরঙ্গিণীর মনে বেঘ জমিল। কিন্তু জলত বাড়াইতে হইবে। সে একেবারে নদীর ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া সোজা বিছানায় সটান শুইয়া পড়িল। হাতের চুড়ি ক'গাছি খুলিয়া বিড়ালের গলায় ঝুলাইয়া দিয়া বিড়ালটাকে

অনতি দূরে বাঁধিয়া রাখিল। বিড়ালটা চারি পায়ের নখে যাহা পারিয়াছে তাহাই আঁচড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। পাশে মাছ ধরিবার ভাল নূতন জাল পড়িয়াছিল, তাহাও বিড়ালের আক্রমণ হইতে রেহাই পায় নাই।

ঈশ্বর মাল সারা রাত্রি নদীতে মাছ ধরিয়া পাইকারের দেনা পাওনা শোধ করিয়া একটু বেলায় বাড়ী ফিরিয়াছিল। এদিকে যে এমন লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়াছে তাহা ঈশ্বর কি করিয়া জানিবে? উনুনে হাড়ি চাপে নাই, ঘরে কোন সাড়া শব্দ নাই। শুধু বন্দী বিড়ালটা সামনের দুই পা দিয়া অবিরাম আঁচড় কাটিতেছে। আর তাহারই দেহের আন্দোলনে চুড়ির টুংটাং শব্দ হইতেছে। ঘরে ঢুকিয়াই ঈশ্বর মালের প্রথম দৃষ্টি পড়িল নূতন জালের দিকে। তারপর বিড়ালটা হঠাৎ ম্যাও করিয়া উঠিয়া দাঁড়াতেই চুড়ির আওয়াজ কানে আসিল। সুতার অভাবের দিনে কোনমতে একটা জাল সে তৈয়ারী করাইয়াছিল, কিন্তু সেই জালের দুর্দশা দেখিয়া ঈশ্বরের মাথা ঘুরিয়া গেল। সে মুহূর্তে জ্ঞানশূন্য হইয়া তরঙ্গিণীর চুলের মুঁটি ধরিয়া সজোরে কয়েক ঘা বসাইল। পাড়ায় সোরগোল পড়িয়া গেল। নারী কণ্ঠের কর্কশ চীৎকারে বাড়ির আঙ্গিনা মুখর হইয়া উঠিল। তরঙ্গিণী অবিরাম বাক্যবান নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছে। ঈশ্বর মাল সেই যে স্তব্ধ হইয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতে শুরু করিল আর একটু টু শব্দও করে নাই। শুধু নীরবে দূর নদীর পানে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকাইয়া ভাবিতেছিল, এ সংসারি-ধর্ম্মে কাজ নাই গুরু পথ দেখাও। তরঙ্গিণী চীৎকার করিতে-করিতে একেবারে সীতানাথের দরবারে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সীতানাথ সহসা নারী কণ্ঠের চীৎকারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সীতানাথের দাম্পত্য কলহের রহস্য বুঝিবার কথা নহে। সে হতভম্বের মত একবার সৌদামিনীর দিকে আরেক বার ডালিম-কন্যার দিকে তাকাইতে লাগিল। সৌদামিনী আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'ওঠ বোন ওঠ' তরঙ্গিণী আলু-থালু কেশের ফাঁক দিয়া একবার সীতানাথের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'তোমরা বিচার কর।'

সীতানাথ এক অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আপনাকে বড় বিব্রত বোধ করিল, 'কিসের না না বিচার? বিচার ত কই আমরা করি নে।'

—'তোমরা স্বদেশী হাকিম তোমরা বিচার কর না?' কহিয়া তরঙ্গিণী ফুঁপাইয়া-ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আর স্বামীর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল। অদূরে ঈশ্বর মাল অধোবদনে বসিয়াছিল।

ললিতপাল আসিয়া কহিল, 'সীতানাথবাবু মিটিং।'

'ও হ্যাঁ।'—কহিয়া সীতানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।

•

সৌদামিনী অনেকদিন পর এক গোছা সংবাদপত্র পাইয়া মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া একটি সংবাদ ডালিম-কন্যাকে আঙুল দিয়া দেখাইল। সংবাদটি এক মুহূর্তে পাঠ নিঃশেষ করিয়া ডালিম-কন্যা স্বগোতোক্তি করিল, 'কি রকম দিল্লীবাসিনী নারীকুল কিরণশঙ্করকে তাড়া করেছে!' সৌদামিনী হাসিয়া উত্তর করিল, 'বোধ হয় কিরণশঙ্কর বস্ত্র-ব্যবচ্ছেদের বিরোধী। ওরা সমাজের খুব উঁচু তলার জীব কিনা। তাই বাঙ্গালার নারী সমাজের মন টীমারের ওপরতলা থেকে সুতো ফেলে মেপে দেখে। সীতানাথবাবুর মুখে শুনেছি ওদেশে নাকি লাখ টাকার স্বামীর গৃহিণী তিনশ টাকার স্বামীর গৃহিণীর সঙ্গে মেলামেশা করতে কুণ্ঠাবোধ করে। বিদেশী সরকার মন বন্টনের অন্তরালে মন বন্টনের কাজটা ও সমাধা করে রেখেছেন।'

পরাণ কহিল, "দিদি অর্থ যেখানে সম্মানের ভিত্তি রচনা করে সেখানে সামাজিক বিভাগ দেখে তোমরা অমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?"

সহসা কোলাহল শুনিয়া পরাণ একটু চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি কিছু গোলযোগ বাধল নাকি।"

চৌধুরিনী উত্তর করিল, "কিছু বিচিত্র নয় হয়ত কোথায় একটা কিছু—"

ভদ্রলোক কহিল, "সীতানাথবাবু কোথায় খোঁজ নাও

সীতানাথকে সভাস্থলের দিকে রওয়ানা হইয়াছে।

"দেরকে রাজা মুচ্‌লমান
লড়কে লেকে বঙ্গিস্তান।"

চৌধুরিনী একটু শঙ্কিত হইয়া পরাণকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার পরাণ জনতা এদিকেই আসছে নাকি।"

তাকাইয়া দেখিল এক বিরাট জনতা সবুজ পতাকা উড়াইয়া সভার দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।

এদিকে দারোগাবাবু যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা হয়ত ললিতপালের মনঃপূত হয় নাই। ব্যবসায়ী মানুষ সবই লাভ লোকসানের নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখে। তাহাকে আপাতত আর কিছু দিন এই নিয়ন্ত্রিত বন্দরে কাটাইতে হইবে। নগদ টাকা-পয়সা যাহা কিছু সবই ইতিমধ্যে সরানো হইয়াছে মালপত্রে যে টাকাটা আটকা পড়িয়াছে তাহা হাতে না আসা অন্ত পর্যন্ত ললিত কোন প্রত্যক্ষ বিরোধের মধ্যে যাইতে রাজি দারোগাবাবু অতি গোপনে যাহাদের সহিত করিয়া সভার আয়োজন করিয়াছিলেন সামর্থ্য নেহাৎমুটি কম নহে। তাহারাও বন্ধ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া ছাড়িবে না। বন্দরজীবী-কুলের দৌড় এ অঞ্চলে কাহারো অবিদিত নহে। ঈশ্বর নাগ অবশ্য আজ বৃদ্ধ। কিন্তু তাহার জাতি-গোষ্ঠী সব ত রহিয়াছে। খবর পাইলে গোটা গ্রাম ছুটিয়া আসিবে। বস্তুত তাহাই ঘটিয়াছে। সভার আয়োজন সঙ্গে 'আত্মরক্ষার' আয়োজন হইয়াছে। ললিত পাল এই আয়োজনের ভবিষ্যত পরিণতি ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ললিত পালের আশা, সভায় ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বাকি-বকেয়া টাকাটা হাতে আসিলেই শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া সে বন্দরে চাপিবে। সে বন্দর পরিত্যাগ করিলে বন্দরের আমদানি রপ্তানি বন্ধ হইবে। ইহাতে অবশ্য কাহারও অসুবিধা হইবে কিনা তাহা ললিত পালের ভাবিবার কথা নহে। কিন্তু দারোগাবাবুর গোয়ার্তুমিতে বুঝি সব পরিকল্পনা ভাঁসিয়া যায়। দারোগাবাবুর কি, তিনিত লাঞ্ছা ঘটিয়া গেলে তবে অনুসন্ধানে আসিবেন—এদিকেত ললিত পালের গুদাম সাবাড় হইবে। বিপর্যয় ঘনাইয়া আসিয়াছে জানিয়াও ললিত পাল দারোগাবাবুকে ঘাঁটাইতে সাহস পায় নাই। ললিত পাল দারোগাবাবুকে জানাইয়া দিল যে, সীতানাথবাবু আসিয়াছেন। তিনি এ সব টের পাইলে সভা পণ্ড হইবে। 'দারোগাবাবু হাসিয়া কহিয়াছিল,' সভা পণ্ড হইবার কি আছে? তিনি সভার কাজ চালাইয়া যাইবেন গ্রামবাসী তাঁহার কথা শুনিবে:

এদিকে চৌকিদার ছোবাহান ছুটিয়া আসিয়া দারোগাবাবুকে জানাইয়া দিল লাঞ্ছার সম্ভাবনা আছে আপনি যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিবেন। দারোগাবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যারা যেরূপ শান্তি ভঙ্গ করিবে তারা সেইরূপ শান্তি পাইবে।

আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনি করিতে করিতে মৎস্যজীবকুল সভাস্থলের দিকে রওয়ানা হইয়াছে। ছোটবড় বাঁশের লাঠির ডগায় রঙীন কাগজের পতাকা কাঁধে, সবাই সভাস্থলের দিকে সদর্পে আগাইয়া চলিতেছে। "আমরা চাই,"—একপক্ষ চীৎকার করিয়া কহিতেছে। আর একপক্ষ তাই অনুসরণ করিয়া সুর মিলাইয়া উত্তর দিতেছে "বাঙলা ভাগ।"

"বাঙালী হিন্দুর—আবাস চাই।"

• • • •

সীতানাথ অবাক হইয়া যেন নিজেকে প্রশ্ন করিল, ইঁহাদের মুখে এ ভাষা কে দিল? ইঁহারা কি জাতির বংশের পানে ছুটিয়া যাইতেছে, না এক নির্মম সত্যের সন্ধানে চলিয়াছে? এতদিনের সাধনায় আমরা কি মানুষকে এমনি করিয়া গড়িতে শিখিয়াছিলাম। কই নির্জন কারাকক্ষে বসিয়া একবারও ত মনে হয় নাই কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীবিশেষের জন্য আমরা

ত্যাগের সাধনায় মাতিয়াছি ? যে দুঃখ তোমার আমার সর্ব্বমানবের কল্যাণকে ম্লান করিয়াছে তাহাই অন্তরের অন্তরতম স্থলে অনুভব করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। যে নিবিড় বেদনা সমাজের প্রতিটি জীবকে মূঢ় করিয়াছে, যে অভাব, যে দীনতা, সমাজের সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে, যে বিভেদ মানুষকে বিচ্ছেদের ব্যথায় অবিরাম পীড়িত, বাধিত করিয়া আঘাত করিতেছে, যে দম্ভ আজ সমাজ-শীর্ষে অন্যায়ের সৌধ রচনা করিয়াছে—যাহার তলায় আজ বিকৃত মানবের মিছিল চলিয়াছে—তাহার-ই তালা-ভাঙ্গা গান গাহিয়া বৈতালিকের দল আমরা পথে চলিয়াছি। তবে কি আমরা এত এতদিন অচল কড়ি সম্বল করিয়া এই মানব মুক্তির মহাতীর্থের পথে রওয়ানা হইয়াছিলাম ? শেষে আজ খেয়া ঘাটের সামনে আসিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছি নকল কড়িতে আর যাহাই হউক দুস্তর সত্যের সাগর পার হয় যায় না। সীতানাথ দ্রুতবেগে সভাস্থলের দিকে আগাইয়া চলিল। ললিত পাল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'আউজকা বর গোলমাল হইব। সভা বন্ধ কইরা দ্যান্।'

সীতানাথ গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, 'না, তা হয় না।'

তখন সভার বিচিত্র কোলাহলধ্বনি সীতানাথের কানে এক ঐক্যতান সঙ্গীতের মত ভাসিয়া আসিতেছিল। বহুর কোলাহল মিশিয়া যে সুরের সমন্বয় করে তাহার মাধুর্য্য সাধকের মনকে আলোড়িত, মথিত করিয়াছে। সীতানাথ দুর্নিবার বেগে এক মহা রুক্ষরুঢ় বাস্তব সত্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহাকে রোধ করিতে পারে এমন শক্তি সম্ভবত আজ এই মুহূর্ত্তে কাহারো নাই, সম্ভবত সৌদামিনীরও নাই। যে সাধনা দুঃখের দুরন্ত পথে সিদ্ধিলাভ খুঁজিতেছে তাহাকে মমতার অন্তরালে ঘিরিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি কাহারো নাই।

দারোগাবাবু ফাঁদ পাতিয়া যে শীকার ধরিবার আশায় বসিয়াছিল তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। এস্. ডি. ও.-সাহেব বিশেষ জরুরী হুকুম দিয়া লোক পাঠাইয়াছেন। সভানুষ্ঠান হইবার পূর্ব্বেই সেই বিশেষ দূতটি দারোগাবাবুর কাছে হাজির। কাজেই সাহেবের হুকুম কিছু পরে তামিল করিবার আর অবকাশ নাই। দারোগাবাবুকে তখনই সীতানাথের সোঁজে বাহির হইতে হইল। সভার কোলাহল দারোগাবাবুরও কানে আসিয়া পৌঁছাইতে লাগিল। তিনি দ্রুতপদে সভার দিকে অগ্রসর হইলেন। দারোগাবাবু ভাবিতেছিলেন, আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইবে না ত ?

দারোগাবাবু সভাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলেন দুইপক্ষের পতাকা দুই বিপরীত দিকে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। হয়ত এখনই পতাকাগুলি একে অন্যের বিপরীত দিকে প্রবল বেগে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু তখন কি অবস্থা হইবে ? প্রশান্ত চিত্তে সীতানাথ সবই লক্ষ্য করিতেছিল। কাহারা সমাজের এই বিভিষীকাময় বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সীতানাথ জানিত। তাই সে নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেছিল, যে বিদ্বেষের আগুন আমরা জ্বালিয়াছি। তাহাতে পুড়িয়া গিয়া যে অংশটুকুর অস্তিত্ব থাকিবে তাহাই জাতির আত্মা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঐ দারোগা, ঐ ললিতপাল জাতির বিদ্বেষ বহ্নিতে অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র। যাহাকে আপনার বলিয়া ভাবি নাই সে ত পর হইয়া-ই রেখা দিবে আপনার জন পর হইয়াছে—তাই আজ বঙ্গিস্তান। এ যেন কাহাদের বাঁচিবার দুঃসহ চেষ্টা মাত্র। কিন্তু যাহারা এই নির্ম্মম স্বাতন্ত্র্যের জন্য লড়াই করিতেছে তাহারা-ও কি বাঁচিবে ? পৃথিবীতে যদি মানব সভ্যতার ইতিহাস শুধু বিরোধ-বিদ্বেষকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিত তবে এই ভয়াবহ স্বাতন্ত্র্যের লড়াই সত্য বলিয়া প্রকটিত হইত। কিন্তু পৃথিবীর যতগুলি দিন আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহাত বিরোধের মেঘে অবলুপ্ত নহে ?

"আমরা চাই বঙ্গীস্তান" কহিয়া কে একটি যুবক পতাকা তুলিতেই ঈশ্বর মাল ছুটিয়া আসিল।

দারোগাবাবু আর তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া সীতানাথকে কহিল, "সীতানাথবাবু আপনাকে সদরে যেতে হবে। আপনি—, ঈশ্বর তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।"

তখনও কাছে সীতানাথ চীৎকার করিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'বন্ধুগণ, আপনারা ঘরে ফিরে

সহসা কোলাহল উচ্চ আকাশে উঠিয়াছিল তাহার ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত ভাবিয়া সীতানাথ শিহরিয়া উঠিল

ললিত পাল উচ্চস্বরে ছত্রভঙ্গ জনতার দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল সে মুখে একবার 'হাম' হাম বলিতেছে আরেকবার চীৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিতেছে—অন্ধ, ও অন্ধা—ওরে শালার ব্যাটা সিন্দুকের উপর তিন কাঁধা চাপা দে, নইলে হগ্‌গল জইলা যাইব।

তখন নিরামতি বন্দরে বহ্নুৎসব শুরু হইয়াছে।

আদর্শ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমারে হেরেছি অনেক উষ্ণে
ভীত পুলকিত চিত,
এসো আমাদের ধ্যানের মূর্তি
নত সাধনার ক্রীত।
এসো সুদূরের হে দেবতা মম
এসো উন্নত শুচি, অনুপম,
এসো আরাধ্য এসো সুন্দর
হে চির আকাঙ্ক্ষিত।

২

জীর্ণ পক্ষ অভিনাশে তুমি
উঠাও উদ্ধাকাশে।
রয়েছে অলস উদাসীন যারা
টেনে লও তব পাশে।
যাহা শ্রেয় যাহা অতি দুর্লভ
দাও সেই কৃপা, সেই বর তব,
তোমার কাছেতে আগাইয়া যাই
যেন প্রতি নিঃশ্বাসে।

৩

অনাদিবিদ্ধ তুমি তেজোময়
তুমি জানি কালাতীত
হে গুরু, মোদেরে তোমার আলোকে
করহে উদ্ভাসিত।
তোমার করুণা—দাও তব বাণী
তোমার কাছেতে লও লও টানি
দাও নব বল নূতন জীবন
আমরা অকুণ্ঠিত

স্বীকৃত

শ্রীমতী বাণী রায়

—"Flower of the clove,
All the Latin I construe, is 'amo,' I love."—
Browning.

নিষ্ফলা মরুতে আজও কাঁদি হাহাকারে ;
তবু আমি বারে বারে করেছি স্বীকার,
শৈশবের স্বপ্ন সনে যার অঙ্গীকার
পেয়েছি সুগুপ্ত চিতে। কত বারে বারে
দুর্বার-মরুর ঝড়ে নিভেছে প্রদীপ ;
হাতে লাগে ক্ষণে ক্ষণে শৈত্যস্পর্শদাহ ;—
তবু আমি ভীরু চোখে চেয়ে পূর্ব্বাশার
উদয় পথের পানে খুঁজিয়াছি তারে।
কে জানে হৃদয়ে মম নির্গুণ প্রবাহ ?
অণু-পরমাণু শুধু চেতনা-বিভোর !
তার ডাকে পথে পথে ত্যজিলাম ঘর,
—কামনার বিষক্ষতে জ্বালি অন্তর্দাহ।
উষার হিরণ-রথে ক্ষণিক আভাস,
ক্ষণিক দক্ষিণাবায়ে বিরল আশ্বাস,
পথের সবাকে কোন চকিত আলোক
কচিৎ এনেছে ধ্যানে—তবু বহ্নিলোক
দেয় নাই, দেয় নাই চাওয়া সে আমার।
আমারে পাওয়াতে বাজে না—পাওয়ার তার।
আজিও সুদূরে প্রেম ; শেষ স্বর দিয়ে
মুমূর্ষু মরাল প্রায় তবু যাব বলে—
ধূলো ওঠে সোনা হয়ে শুধু প্রেম নিয়ে
দেহপাত্রে সঞ্জীবনী প্রেমমণি জ্বলে।

ভিয়েট-নাম নেতা হো-চি-মিন

শ্রীঅশোক চন্দ্র গুহ

সূর্য যখন ওঠে তখন তার উজ্জ্বলতার স্পর্শ পেয়ে পৃথিবীর সমস্ত কিছু হ'য়ে ওঠে আলোকময়। এই পৃথিবীর বুকেও মাঝে মাঝে এমনি এক একটি সূর্য মানুষের মাঝে কখনো কখনো এসে থাকে যার স্পর্শে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে লক্ষ প্রাণের মৃতপ্রায় আত্মা, যার তীব্র দাহনে পবিত্র হয়ে ওঠে পৃথিবীর লোকের লক্ষ গ্লানির লজ্জাকর ব্যক্তিত্ব। ইন্দোচীনের 'জাতির জনক' হো-চি-মিন হচ্ছেন এই ধরণের বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এক পুরুষ, যাঁর চরিত্রের ভাস্বর দীপ্তি বহুযুগ সঞ্চিত অন্ধকারের অখ্যাতি থেকে ভিয়েটনামীদের তুলে নিয়ে এসেছে আলোকের পথে।

সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে বহুযুগ-সঞ্চিত পরাধীনতার গ্লানিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যে একটা নূতন জাগরণের ঢেউ এসেছে গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে, আর জাগরণের ফলে শোষণকারী পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের ভিত্তি উঠেছে কেঁপে,—ফরাসী শাসনাধীন ভিয়েটনাম আর তার নেতা—হো-চি-মিন যে জাগরণের মধ্যে অনেকখানি অংশ গ্রহণ ক'রে আছেন। নবজাগ্রত ভিয়েটনামকে যদি জানতে হয়, যদি বুঝতে হয় ক্ষুব্ধকায় নিরীহপ্রকৃতির এই লোকগুলির হঠাৎ এই অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দনের পেছনকার শক্তিটির মূল উৎসটি কোথায়, তাহ'লে জানতে হবে তার সর্বজনস্বীকৃত নেতা—হো-চি-মিনের জীবনকে, বুঝতে হবে 'জাতির জনক' ঐ ক্ষুব্ধকায় নিরাড়ম্বর ব্যক্তিটির জীবনদর্শনকে।

আজকের পৃথিবীতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি তাদের যে কোন অপকর্মের বিরুদ্ধে এখনই কারু কাছ থেকে কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে তখনই বিনা দ্বিধায় তাকে আখ্যা দিচ্ছে—রেড ডিক্টেটর। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভিয়েটনাম নেতা হো-চি-মিনের কপালেও জুটেছে এই চিরাচরিত আখ্যার সম্মান-লাভ: কিন্তু কম্যুনিষ্ট তিনি যদি বা হ'য়ে থাকেন, তার চাইতে কোন অংশে কম তিনি ন'ন জাতীয়তাবাদী। আমাদের দেশে মহাত্মা গান্ধীর যে স্থান, ভিয়েটনামবাসীদের কাছে হো-চি-মিনেরও সেই স্থান। মহাত্মা গান্ধীকে যেমন আমরা বলে থাকি 'বাপুজী',—হো-চি-মিনকেও তেমনি তার দেশে বলা হ'য়ে থাকে 'জাতির জনক' বা Father of the people. সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপনের দ্বারা বাপুজী যেমন আমাদের দেশের জনগণের হৃদয়ে তাঁর জন্যে একটা সর্বব্যাপী প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসন রেখে গেছেন, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন হ'য়েও নিতান্ত সরল তাঁর আগেকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রেখে হো-চি-মিন হয়েছেন তাঁর দেশের 'জনগণ-মন-অধিনায়ক'।

এই নেতার জীবন সম্বন্ধে ইন্দোচীনের বাইরের লোকেরা কিন্তু জানে খুব অল্পই। সম্প্রতি ভারতস্থিত 'ভিয়েনাম নিউজ এজেন্সী' থেকে এই সর্বজনপ্রিয় নেতার একটি জীবনী প্রকাশ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিকে অবলম্বন ক'রেই আমরা এখানে এই বিপ্লবী নেতার আদর্শ জীবনের সঙ্গে আমাদের দেশের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

১৯৪০ সালে যখন জার্মানদের কাছে পোতা বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিলেন, তখন ইন্দোচীনের ফরাসী শাসকবর্গ একরকম বিনাযুদ্ধেই জাপানীদের হাতে ইন্দোচীনকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ভিয়েটনাম জনগণের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত প্রতিষ্ঠান 'ভিয়েটমিনের' নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ভিয়েটনামবাসীরা বরং আগের চাইতে আরও জোরভাবে ফরাসী ও জাপানীদের এই দুনো সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামকে তীব্রতর ক'রে তুলল।

এই ভিয়েটমিন সম্বন্ধে ইংরেজ আমেরিকা গোষ্ঠীর সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ যে সব খবর আমরা পেয়ে থাকি, তা'তে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এটা হচ্ছে একটা কম্যুনিষ্টদের প্রতিষ্ঠান আর ইন্দোচীনের বর্তমান ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলে বোধহয় সে দেশটা গিয়ে পড়বে কম্যুনিষ্টদেরই হাতে, কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত ভিয়েটনাম নিউজ সারভিস প্রচারিত পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে এই ভিয়েটমিন কোন

একদলীয় প্রতিষ্ঠান নয়। ১৯৪১ সালে প্রথম গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে—ডেমোক্র্যাট, কম্যুনিষ্ট, নারীসঙ্ঘ ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মিলিত শক্তি,—যার একমাত্র সর্বজনস্বীকৃত লক্ষ্য হচ্ছে ভিয়েটনামে একটি লোকায়ত্ত সরকারের প্রতিষ্ঠা করা।

ফরাসীদের পরিত্যক্ত গুদামগুলি থেকে, বিচ্ছিন্ন জাপানী অস্ত্রশালাগুলি আক্রমণ করে দখল করে নিয়ে ও আমেরিকার সাহায্য থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে 'ভিয়েটমিন' চালিয়ে গেছে তার স্বাধীনতা-সংগ্রাম। ১৯৪৫ সালে জাপানীরা তাদের তাঁবেদার গভর্ণমেণ্টে যোগদান করবার জন্যে আহ্বান জানালে এঁরা ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৪৫ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে জাপানীদের আত্মসমর্পণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েটমিন পরিষদ উত্তর ভিয়েতনামের নিজেদের দখলিত অঞ্চল থেকে ও দক্ষিণভিয়েতনামের গ্রামাঞ্চল সমূহ থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু ক'রে হানয় ও সাইগণ দখল ক'রে নেয়।

এইভাবে ভিয়েটমিনের হাতে ক্ষমতা এলে সারা দেশজুড়ে আনন্দোৎসব লেগে যায়। ১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভিয়েটনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। তারপর থেকে দক্ষতার সঙ্গে ভিয়েটমিন দেশ শাসন ক'রে এসেছেন। বোমায় বিধ্বস্ত বাড়ীঘর পুনরায় তৈরী করা হ'ল, হানয় বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলা হ'ল এবং জাতির সর্বাঙ্গীণ ব্যাপক উন্নয়নের জন্যে বিরাট কর্মসূচী অবলম্বন করা হ'ল। এই ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণের ফলে গত তিন বছরে ভিয়েটমিন শাসিত এলাকায় নিরক্ষরতা কমে শতকরা ৮৫ থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এখন ৪০ এ; খাদ্যোৎপাদন এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে ১৯৪৪-৪৫ সালের ফরাসী-জাপানী শাসনাধীনে যখন প্রায় ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেছে, সেস্থলে আজ লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য সেখানে উৎপাদিত হচ্ছে; বেশ্যাবৃত্তি ও বেকারত্ব সে দেশে একেবারে উঠে গেছে এবং মাদকদ্রব্য সেবন হয়েছে নিষিদ্ধ।

১৯৪৬ সালে ভিয়েটনামের প্রথম স্বাধীন শাসনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হয়। সমগ্র দূর প্রাচ্যের ভেতর এ-ই হচ্ছে প্রথম স্বাধীন শাসনতন্ত্র। এই শাসনতন্ত্রের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই একটি নীতিই হয়েছে মূলভিত্তি যে—"সকল কিছুই জনগণেরই মঙ্গলের জন্য জনগণের দ্বারাই করা হবে।" (Every thing is done by the people and for the people.)

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছে এই শিশু গণতন্ত্র হ'য়ে উঠল চক্ষুশূল। তাই জাপানী-নিরস্ত্রীকরণের ছলে আগে আগে বৃটীশ ও তাদের সহযোগী ভারতীয় সৈন্যরা ও পেছনে পেছনে ফরাসী সৈন্যরা ইন্দোচীনে প্রেরিত হ'তে লাগল। ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের এই কাজে এমন কি এরা জাপানীদের সাহায্য নিতেও ছাড়ল না।

১৯৪৫ সাল থেকে ইন্দোচীনে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে। সে সংগ্রামে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে যোগ দিয়েছে এসে শিশু ও বৃদ্ধ সমেত সমগ্র ইন্দোচীনাগণ। ইন্দোচীনাদের এই প্রতিরোধ-বাহিনীতে আছে সকল শ্রেণীর লোক,—এতে মজুর যেমন আছে, আছে ভূম্যধিকারী; খৃষ্টান আছে, বৌদ্ধ আছে, জাতীয়তাবাদী, সাম্যবাদী সকলে এর ভেতরে এসে একত্রিত হয়েছে এক লক্ষ্যে—মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন।

১৯৪৬ সালের মার্চমাসে অবস্থার চাপে পড়ে ফরাসীরা এই শিশুগণতন্ত্রকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু শীঘ্রই তারা মার্চমাসের চুক্তি ও পরবর্তীকালের ১৯৪৬ এর ১৪ই সেপ্টেম্বরের চুক্তিকে লঙ্ঘন ক'রে ১৯৪৬ এর নভেম্বরে এক সর্বাত্মক নরঘাতী যুদ্ধে দেশটাকে জড়িয়ে ফেলে।

ইন্দোচীনা জনগণ তাদের প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যে জীবন-মরণ যুদ্ধে আজ ব্যাপৃত রয়েছে; আর এই কাজে তাদের সর্বজনপ্রিয় নেতা হচ্ছেন হো-চি-মিন।

হো-চি-মিনকে তাঁর শত্রুরা বলে থাকে 'রেড ডিক্টেটর' বা কম্যুনিষ্ট; বন্ধুরা বলে থাকে—'জনগণ-পিতা' অথবা 'এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্যতম'; আর নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বলে থাকে তাঁকে 'নম্রস্বভাব সৎ ব্যক্তি' অথবা 'বিচক্ষণ কূটনীতি বিশারদ';—কিন্তু একটা কথা সকলেই স্বীকার করবে যে নবজাত ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এই নিতান্ত মামুলি পোষাক পরিহিত কৃষ্ণকায়

ব্যক্তিটি তাঁর নিজের দেশের লোকদের কাছে হচ্ছেন চূড়ান্ত সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র

১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে দেশের বৃহত্তম মঙ্গল এবং একতার জন্য হো যখন ইন্দোচীনের সব চাইতে সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রতাপশালী দল—কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আত্মবিলোপ ঘটাবার জন্যে অনুরোধ করেন, তখন তারা তৎক্ষণাৎ সে অনুরোধ মেনে নেয়। ১৯৪৬ এর এপ্রিলে যখন ফরাসী সৈন্যদের দ্বারা ভিয়েটনাম মন্ত্রিসভার অর্থদপ্তরের বাড়ীটি দখল ক'রে নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে জনগণের ভেতর থেকে স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভস্বরূপ এক সর্বব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট দেখা দেয়—এবং যে ধর্মঘটের ফলে ফরাসীরা বাধ্য হয় ভিয়েটনামীদের দাবী মেনে নিতে,—তখন হ্যানয়ের রেডিও থেকে প্রচারিত হোর কণ্ঠের একটিমাত্র আবেদনের ফলেই যাদুর মত একদিনে হ্যানয়ের সর্বত্র জীবন ফিরে আসে। ফরাসী শাসনকালে যেখানে ভিয়েটনামীদের মধ্যে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা ৮৫ জন, সেখানে মাত্র তিন বছরের ভেতরে কেবলমাত্র হোর স্লোগান—'প্রত্যেক ভিয়েটনামীকে জানতে হবে কি ক'রে লিখতে হয় ও কি ক'রে পড়তে হয়'—অনুসরণ ক'রে সে সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়াল ৪০এ। এছাড়া হোর আর একটি স্লোগান—'দেশের জমির সামান্য এক ইঞ্চিও যেন অনাবাদী অবস্থায় না থাকে'—অনুসরণ ক'রে ভিয়েটনামে আজ খাদ্যোৎপাদন এত বেড়ে গেছে যে ১৯৪৬ সাল থেকে দেশের জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

সামান্য এই কয়েকটি ঘটনা থেকেই বেশ বোঝা যায় দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে হোর আসন কত গভীর ও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছে তাঁর দেশই হচ্ছে তাঁর জীবনদেবতা, তিনি নিজে কিছু নন; দেশের জনসাধারণকে নিয়েই তাঁর পরিবার, পিতৃভূমিই তাঁর রাজনৈতিক দল। সন্তান যেমন তাদের পিতাকে ঠিক চিনে নেয়, তেমনি তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন বা যে নামই কেননা গ্রহণ করুন, ভিয়েটনামীরা সকল সময়েই তাদের পিতাকে চিনে নেয়। প্রত্যেক ভিয়েটনামীর অন্তরে আশার আলোক, বিশ্বাসের দৃঢ়তা, সাহসের তীব্রতা এবং স্বাধীনতার দীপ্তি জাগিয়ে তোলে যে নামের একবার মাত্র উচ্চারণ, সে হচ্ছে—হো-চি-মিন। নগরে ও পল্লীতে, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে ও ধনীর প্রাসাদে, বৌদ্ধবিহারে ও খৃষ্টানদের গীর্জায়—সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় হোর চিত্র লটকানো রয়েছে।

জনগণ মন-অধিনায়ক এই নেতার চরিত্রগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোনদিন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঢুকেও গভীর তাঁর বিদ্যত্তা। ফরাসী ও ইংরেজী কাগজে প্রকাশিত তাঁর বিচক্ষণ যুক্তিসমূহ বিভিন্ন বিদেশী পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করেছে। অবসর সময়ে তিনি কাব্যপাঠ ও কাব্যরচনাও ক'রে থাকেন। বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তায় কখনও কোন দোভাষীর সাহায্য গ্রহণ তিনি করেন না। চীনা, জার্মান, ইংরেজী, রাশিয়ান এবং ফরাসী ভাষা তিনি সমান পারদর্শিতার সঙ্গে বলতে পারেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তাঁর যুক্তির সারল্য অসাধারণ। পুঁথিগত কোন থিয়োরীকে আঁকড়ে প'ড়ে না থেকে ঘটনার চাহিদা অনুযায়ী থিয়োরীকে রূপ দিতে তিনি ইতস্ততঃ করেন না।

কথাবার্তায় তিনি অত্যন্ত মিতভাষী, তথাপি তাঁর বাক্যের প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি শিক্ষা বা পাঠের মত। সাদাসিধা তাঁর জীবনযাত্রার কথা আগে একবার হয়েছে; সমস্ত বছর ধরে তাঁকে দেখা যায়—পরণে খাকি জ্যাকেট ও ট্রাউজার, খাকি রঙের হ্যাট ও সর্বক্ষণের জন্যে তাঁর পায়ে একজোড়া চীনা স্লিপার। একবা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে ভাল কাপড়চোপড় পরতে দিতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন—"আমার দেশের লোক বড় দুঃখী, এই পোষাকই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

সাধারণ একজন ভিয়েটনামীর ন্যায় তাঁর দৈনিক খাদ্যতালিকাও নিতান্ত মামুলি ধরণের; তার চাইতে কিছুমাত্র বেশী তিনি গ্রহণ ক'রেন না।

বাস করার জন্য তাঁর বিরাট একটি প্রাসাদ থাকলেও তিনি তার পুরোণো জীবন ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্যই, তাঁর সহকর্মী—তা সে মন্ত্রীই হোক্ বা তাঁর দেহরক্ষীই হোক্—সকলের সঙ্গে সর্বক্ষণের জন্যে যোগাযোগ

রাখতে বেশী পছন্দ করেন। কোন কোনদিন হয়তো কোন দীর্ঘ নৈশপ্রার্থনাসভার শেষে তাঁকে দেখা যায়—ঠিক তাঁর প্রেসিডেন্ট হবার আগেকার জীবনের মতই, কোন এক সহকর্মীর সঙ্গে এক বিছানায় একটু অংশ গ্রহণ করে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলেন। নিরহঙ্কার এই ব্যক্তিটিকে প্রেসিডেন্ট ক'রেও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের বন্ধুকে কিন্তু হারায় নি।

সময়ের মূল্য তাঁর কাছে অত্যন্ত বেশী। খুব সকালে শয্যাত্যাগ ক'রে বেলা পাঁচটার মধ্যে তিনি তাঁর পড়ার টেবিলে এসে বসেন। যত ব্যস্তই তিনি থাকুন না কেন, যত কিছু কাজের চাপই থাক, কোনদিন তিনি তাঁর প্রাত্যহিক রুটিনের অন্তর্গত দৈনিক আধঘণ্টার শরীরচর্চা করতে কিন্তু ভুল করেন না।

হোর চরিত্রের এইসব বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলে দেশ-বাসীর কাছে তাঁর এই অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণ খুঁজে পেতে দেরী হয় না। ১৯৪৫ সালে হোর একখানা আবক্ষ চিত্র ১৮,৬৮,০০০ পিয়াস্তার (ভিয়েটনামী মুদ্রা) দামে বিক্রী হয়েছিল। জগতের আর কোন দেশে তার প্রেসিডেন্টের ছবি এত অধিক দামে কোনদিন বিক্রী হয়নি। এমন কি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ধামাধরা প্রতিক্রিয়াশীল কাগজগুলি এবং ভিয়েটনাম গভর্ণমেন্ট ও ভিয়েটমিনের বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচারে পঞ্চমুখ সাইগণ রেডিও পর্যন্ত হোর সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে সংযত হ'য়ে কথা বলে থাকে।

এহেন যে হো-চি-মিন, তাঁর জীবন কথা শুনতে ও জানতে কার না ভাল লাগবে? কিন্তু রহস্যময় এই লোকটির অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা খুবই কঠিন কাজ। এর প্রধান কারণ হোর গোপন বিপ্লবী জীবন। বহুবার ফরাসী শাসকবর্গ তাঁর মাথার উপরে বিরাট অঙ্কের মূল্য ঘোষণা করেছেন, তাই এমন কি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও কথাবার্তা ও চলাফেরায় হো সর্বদা একটা অতিরিক্ত সতর্কতা ও গোপনতার আশ্রয় নিতেন। হোকে তাঁর অতীত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা হ'লে তিনি হেসে বলতেন—"আমার অতীতের বিশেষ কোন মূল্য নেই; কেবলমাত্র ভবিষ্যৎ-ই আমার কাছে মূল্যবান্।" তিনি আরও বলেন—"বিপ্লবীদের নামের কি কিছু ঠিক আছে? সকালে একটা নাম আছে ত' বিকেলে আর একটা; কিছুদিন পরে কবে একদিন আমরা আমাদের আসল নামটাই যাই ভুলে।" এরূপ আত্মপ্রচারবিমুখ একটি বিপ্লবীর অতীত ইতিহাস সংগ্রহ করবার সবচাইতে ভাল উপায় হচ্ছে কেবল সাধারণ জনমত এবং অনেক সময় ব্যক্তিগত বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বদলে প্রচলিত গল্পকাহিনীর উপর নির্ভর করা।

হো-চি-মিনের বন্ধু বা শত্রু সকলেরই মতে তাঁর আসল নাম হচ্ছে নগুইয়েন আই কোয়াক্ (Nguyen Ai quoc.) এই নামটির শব্দগত মানে হচ্ছে দেশপ্রেমিক নগু-ইয়েন (Nguyen the Patriot)। তাঁর পিতা ছিলেন আনাম সম্রাটের রাজদরবারে একজন ডক্টর অব্ লিটারেচার (pho-bang)। খুব ছোট বয়স থেকেই তিনি ফরাসী প্রভুত্বকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতে থাকেন এবং জনসাধারণের ভেতরে বৈপ্লবিক চেতনা জাগিয়ে তুলবার কাজে তখন থেকেই তিনি তাঁর পিতা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ফরাসী প্রভুত্বের উচ্ছেদকল্পে প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কাজে যোগ দেন। ১৯১১ সালে মাত্র তাঁর যখন ১৯ বছর বয়স, সেই সময়ে একদা তাঁর পরিবারের সমস্ত লোককে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার দায়ে গ্রেপ্তার ক'রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেই সময়ে তিনি মাত্র প্রাইমারী ডিগ্রীটি নিয়ে, স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে একটা জাহাজে নাবিকের কাজ নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

পথে বেরিয়ে সর্বপ্রথম তিনি পৌঁছুলেন প্যারিসে। কিন্তু তক্ষুণি সেখানে বসবাস করতে সুরু না ক'রে কয়েক বছর ধ'রে স্যানফ্রান্সিস্কো ও লণ্ডনে নাবিকের কাজ ক'রে ১৯১৮ সালে এসে প্যারিসে বসবাস সুরু করেন। প্যারিসে এসে তিনি ফটো-আঁকবার কাজ করতে লাগলেন। কিন্তু দেশবাসীর পরাধীনতার জ্বালা ও আপন পরিবারের ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ ক'রে তাঁর মন উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত এবং তাঁর অবসর সময়ের সম্পূর্ণটুকু তিনি ব্যয় করতেন ভিয়েটনামের স্বাধীনতা আন্দোলনের

কাজে। ফ্রান্সে তিনি অপর একজন নির্বাসিত ভিয়েটনাম দেশপ্রেমিক—ফান চু ট্রিন্-এর দেখা পেলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ভার্সাই সন্ধির প্রাক্কালে প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দদফা কর্মসূচীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে নগুয়েন ভিয়েটনামীদের কতগুলি দাবীদাওয়া সন্ধিশর্ত-প্রণয়নকারীদের নিকটে পাঠান; কিন্তু এতে কোন ফল হ'ল না। তথাপি এতে নিরাশ না হ'য়ে তিনি একরকমভাবে খাস ফ্রান্সের বুকের উপরে ব'সে ভিয়েটনামের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯২০ সালে তিনি 'লে পারিয়া' (Le Paria) নামে একখানা কাগজ প্রকাশ ক'রে নিজেই তার একাধারে—প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও প্রধান বিক্রেতা সেজে বসেন ও সেই কাগজের মারফৎ ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার মুখোস খুলে দিলেন দুনিয়ার সামনে। ইতিমধ্যে তিনি চীনা, ভারতীয় কোরিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি অন্যান্য এশিয়াবাসীদের যোগ-যোগে "আন্তর্জাতিক অশ্বেতকায় পরিষদ" (International council of coloured peoples)—এর প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯২৫ সালে নগুয়েন—সঙ্ ম্যান চো (Song Man cho)—এই নাম নিয়ে ক্যাণ্টনে গিয়ে চীনের কুয়োমিন্টাঙ দলে একজন অনুবাদকের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য সা সামনে ছিল—তা হচ্ছে বিদেশে ব'সে তাঁর দেশের ভেতরকার বিপ্লবীশক্তিকে সুসংহত ক'রে তোলা। হোয়ামপোয়া অ্যাকাডেমীতে চিয়াং কাই শেক্ যখন চীনা জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর অফিসারদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, সেই সময় নগুয়েন আই ফোক্ ভিয়েটনাম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কতিপয় উদ্যোক্তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য তাদের নিয়ে একটা আলাদা বিভাগ গঠন করলেন। শতশত ভিয়েটনামী যুবক সীমান্ত পেরিয়ে এসে নগুয়েনের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত থেকে, দেশে ফিরে গিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে দেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগলেন। ১৯২৭ সালে যখন কম্যুনিষ্ট-কুয়োমিন্টাঙ্ বিরোধ বেধে সমগ্র চীনে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় সেই সময়ে চীনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নগুয়েন কারারুদ্ধ

কারাগার থেকে মুক্ত হবার পর তিনি চলে গেলেন সায়াম দেশে।

১৯২৯ সালে তিনি ভিয়েটনামে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিকালে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন এবং তাঁর শিরের উপরে মোটা অঙ্কের মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল। কিছুদিন বাদেই তিনি সায়ামে ফিরে যান ও সেখানে জাপানী, পর্তুগীজ, চীনা, রাশিয়ান, ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান ভাষার উপরে আরও একটি অর্থাৎ সায়ামী ভাষায়ও তিনি পারদর্শী হ'ন। পরে নগুয়েন তান থান (Nguyen Tan Thai)—এই নাম নিয়ে তিনি পুনরায় দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও সেখানে ১৯৩০ সালের বিদ্রোহের সকল প্রারম্ভিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে রেখে হঙকঙে চ'লে যান।

১৯৩১—এর ৫ই জুন, যখন সমগ্র ভিয়েটনাম জুড়ে ধর্মঘট, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলছিল, হঙকঙের বৃটিশ পুলিশ কর্তৃক ধৃত হ'য়ে তখন তিনি ছ'মাসের জন্য কারারুদ্ধ হ'ন। বৃটিশ পুলিশ চেয়েছিল তাঁকে উন্মুখ ফরাসী কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পন করতে; কিন্তু এই প্রস্তাবে সমগ্র লণ্ডন এবং ফ্রান্সে প্রতিবাদ সভার ধুম পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত বিলাত থেকে একজন খ্যাতনামা এটর্নী এসে নগুয়েনের পক্ষ সমর্থন ক'রে এই হস্তান্তরকে রোধ করতে সক্ষম হ'ন। তাঁর সাজার মেয়াদ ছ'মাস পূর্ণ হবার আগেই যক্ষ্মারোগে তাঁর গুরুতর পীড়িত অবস্থায় বৃটিশ পুলিশ তাঁর মৃত্যুর দায়িত্ব এড়াবার জন্য তাঁকে ছেড়ে দিল।

নগুয়েনকে ধরতে না পেরে শেষ পর্যন্ত মুখ রক্ষার জন্যে এবং ভিয়েটনামীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ঘমিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ফরাসীরা এক মিথ্যা গুজব রটিয়ে দিল যে যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ইন্দোচীন এবং তার বাইরের প্রায় সমস্ত লোকই এ খবর বিশ্বাস করল এবং ভিয়েটনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে একে একটা অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে করল।

কিন্তু নগুয়েনের কর্মসূচী তখনও শেষ হয় নি। জেল থেকে খালাস পেয়েই তিনি ইউরোপে চলে গেলেন।

তারপর এই মহাপুরুষের প্রাক্কালে তিনি তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং বন্ধুদের সকলকে উপেক্ষা করে চীনে ফিরে যান এবং এই থেকেই শুরু হয় তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায় যার পরিণতি হচ্ছে ভিয়েটনামী বিপ্লবী জনগণের দ্বারা ক্ষমতা অধিকারে।

হো-চি-মিনের গৌরবময় জীবনের তুলনায় তাঁর জীবন-কাহিনীর যে মাল মশলা পাওয়া যায় তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সেকথা আগেই বলেছি। তাঁর সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে লোকের মুখ থেকে যে সব অভিমত বেরিয়েছে তার দু'একটি উদ্ধৃত করলে তাঁর চরিত্রের ওপরে তা' আরও কিছু আলোকপাত করবে, এসম্বন্ধে তাঁরই একজন সহকর্মী, শিক্ষা বা বন্ধুস্থানীয় এক মহিলা সেনানায়কের একটি গ্রন্থ ভিয়েটনাম নিউজ সার্ভিস থেকে হো-চি-মিনের জীবনকথার মধ্যে সন্নিবেশিত এই গল্পটি পড়লে ভাবতে অবাক লাগে যে ওই ছোট্ট চেহারার মানুষটির মধ্যে কি বিরাট এক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে,—সকল দিকে সব সময়ের জন্যে সজাগ তাঁর দৃষ্টি, আদর্শচ্যুত সহকর্মীদের প্রতি স্নিগ্ধ ও করুণাবর্ষণকারী ও ঠিক পথে চলতে সাহায্যকারী বন্ধুর সহজ ব্যবহার তাঁর বৈশিষ্ট্য, আর সর্বোপরি সকল অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার মত অসম্ভব মনের বল তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে মহিমান্বিত

তাঁর ওই ক্ষুদ্র চেহারার মধ্যে অমন বিরাট ব্যক্তিত্বের অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য ক'রে ১৯৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরস্থ 'মর্নিং ট্রিবিউন' কাগজে মিস্ কেটুট তান্ত্রী (Ketut Tantri) লিখলেন—"হো-চি-মিন হচ্ছেন মাত্র পাঁচফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একজন ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তি এবং তাঁর মত এমন করে এশিয়ার আর কোন নেতা আজ —'মলাটটা দেখে তুমি বইয়ের ভেতরকার পরিচয় পাবে না' —এই প্রবচনের সার্থকতা প্রমাণিত করেন না, কারণ তাঁর চেহারা দেখে লোকে মনে করবে তাঁকে সম্ভবতঃ একজন নম্র ও ভদ্র প্রকৃতির একটি ছোট্টমানুষ ব'লে বা একজন সন্ন্যাসী এবং স্বপ্নদ্রষ্টা ব'লে; আর তিনিও তাই-ই বটেন; কিন্তু আরও ঘনিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত মুখে চাপ রয়েছে এক দৃঢ় সঙ্কল্প এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের, এবং আরও লক্ষ্য করা যাবে যে তাঁর ওই আপাতপ্রতীয়মান বিনম্র চেহারার অন্তরালে ঘুমিয়ে আছে এক ছন্ন আগ্নেয়গিরি।

আমেরিকান সাংবাদিক অ্যানড্রু রোথ (Andrew Roth) একবার তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারের সময় জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, একথা কি সত্যি যে আপনি বলেছেন—আপনি কম্যুনিজমে বিশ্বাস করেন বটে কিন্তু কম্যুনিজম সফল হওয়াটা হচ্ছে সময়সাপেক্ষ?" তার উত্তরে তিনি বললেন—"আমি নিজে পড়েছি, যীশুখৃষ্ট দু'হাজার বছর আগে বলেছিলেন 'মানুষ তার শত্রুকে ভালবাসবে'—কিন্তু সে আদর্শ ত এখনও সফল হয় নি! 'মার্কসবাদ' কবে সফল হবে? এর উত্তরে আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে এর সাফল্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় যা তা' হচ্ছে ব্যাপক-বিস্তৃতচেষ্টা, ব্যাপকতর কৃষিব্যবস্থা এবং প্রত্যেকের ভেতরে তার আপন ক্ষমতার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা।" সাংবাদিকদের তিনি আশ্বাস দেন যে তাঁর গভর্ণমেণ্ট ব্যক্তিগত ধনধন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা করবেন। কিন্তু যখন সাংবাদিকরা তাঁকে আরও প্রশ্ন করেন যে তিনি কোন্ শিল্পটি অবিলম্বে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চান, তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন—"অ্যাটম বোমা তৈরীর।"

দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য বিষয়ে দু'একটি কথা

শ্রীজ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি-এল

বাণীর বরপুত্র ডি-এল রায়ের প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয়—"More is thy due than more we can pay." বাংলার ভাষা, ভাব ও ছন্দে তিনি নূতন রূপ দিয়েছেন; গানে নূতন সুর, নাট্যসংলাপে মার্জিত রুচি, ছন্দোময় গদ্যে অপূর্ব পদ্য-মাধুর্য, বিদ্বেষহীন শ্লেষ ও কৌতুক, সমালোচনার নূতন প্রণালী তাঁহার মৌলিক অবদান। ভাবাতিশয্য ও আবেগ চাঞ্চল্য (অনেকের মতে) তাঁহার রচনাকে স্থানে স্থানে ব্যাহত করিলেও, তাঁহার তীব্র একাগ্রতার ফলে আমরা পাইয়াছি প্রেরণা, মনের দীপ্তি, মনুষ্যত্ব পিপাসার মহিমাবোধ, মিথ্যা আত্মাভিমানের ব্যর্থতার অনুভূতি; দেশ-প্রেম ও ত্যাগের মহনীয় রূপ ও জাতীয় জীবনে আশার আলো। সুরই তাঁহার সঙ্গীতের প্রাণ, যথা দেহমন্দির; তিনি আগে সুর, পরে গানের কথাগুলি ঠিক করিতেন। বাংলার "কোরাস" গান (বা সুচারু সমবেত সংগীত) তাঁহারই সার্থক সৃষ্টি। বিদেশী সংগীত তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। ইহার সুরের স্পর্শে তাঁহার রচিত কয়েকটি জাতীয় সংগীত প্রাণবন্ত হইয়াছে। বিলাতী ও দেশী সংগীতের পার্থক্য সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীন গতি, স্বাবলম্বী বিংশতি বর্ষিয়া সুকুমারী ইংরাজ মহিলা, অপরটি যেন গৃহ প্রাঙ্গণে সশংকগতি গৃহ প্রবেশোদ্যতা ষোড়শী সুন্দরী বধূ বধূ.....একটি আশাময়ী উন্মুখী সুখমুখী অপরটি যেন সভয়া বিনতনয়না অপরাজিতা ও একটি হাস্য, অপরটি বিলাপ।" রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন— "দ্বিজেন্দ্র লালের গানের সুরের মধ্যে ইংরাজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে' কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয় তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু সংগীত বলে কোন পদার্থ যদি থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই, তার জা আছে।"

কাব্য অনুভূতিমাত্র; এই অনুভূতি বিচিত্র ভাবোচ্ছ্বাস-মাধুরীতে উৎসারিত হইয়া দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালীর পরম সম্পদরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুকবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—

"কাব্য অনুভূতিমাত্র—কবি চিত্ত বিমল দর্পন।
ফলিত অরূপ রূপ, মানবের কারণে অর্পণ,
তুমি সেই কবি ওগো বিধাতার মানস মুকুর।"

"হাসি গানের" প্রধান উদ্দেশ্য—দেশাত্মবোধ জাগরণ ও সমাজ সংস্কার; ইহার কয়েকটি রচনা তাঁহার গভীর দুঃখের প্রতীক—"He laughed to save himself from weeping" (Charles lamb—সম্বন্ধে একজন বিশিষ্ট সমালোচক যাহা বলিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে তাহাই বলা যায়)। উপরোক্ত উক্তের দুইটির সীমার মধ্যে বাঁধা না পড়িলে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য রসের প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারিত। ইংরাজি নাটকের নিকট তাঁহার ঋণ দ্বিজেন্দ্রলাল মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বাঙলার রঙ্গালয়ে তাঁহার রচিত নাটক ও প্রহসন আজিও সাফল্যের সহিত অভিনীত হইতেছে। ছোট গল্প তিনি লিখেন নাই, কিন্তু ছোট প্রহসন "পুনর্জন্ম" সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উপন্যাস তিনি রচনা না করিলেও ইতিহাস প্রসিদ্ধ এমন কয়েকজন স্বদেশ ভক্ত, ত্যাগী বীরের কাহিনী নাটকে ও সংগীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা উপন্যাস অপেক্ষাও হৃদয়গ্রাহী, ঘটনার পারম্পর্যে চিরনধুর, গতিতে চাঞ্চল্যময় ও প্রেরণাময়। তাঁহার নাট্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রঙ্গালয়ের হিতৈষীগণের কর্তব্য; তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শ নাটকে রূপায়িত হইয়া সে যুগের নাট্য সমাজে সুরুচি, দেশভক্তি ও প্রকৃত সম্মান বোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। জাতির উন্নতিকল্পে তাঁহার সাহিত্য রচনা সার্থক হইয়াছে।

বনবাসিনী শকুন্তলা

কবির কল্পনায় দুষন্ত প্রথম যেদিন শকুন্তলাকে দেখেন, সেদিন তার হাতে ছিল ফুলের মালা, গলায় কেশরের মালা, পরনে বাকল। বনবাসিনীর সেই অপরূপ রূপের অফুরন্ত মাধুরী ছিল তার অনুপম অঙ্গরাগ অলকায়। এ যুগের শকুন্তলাদেরও রূপের ঐশ্বর্য কেশশ্রীতে। আর এই কেশশ্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—সকলাধীর সুপরিচিত "লক্ষ্মীবিলাস"।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

এম. এল. বসু এণ্ড কোং লিঃ. লক্ষ্মীবিলাস হাউস, কলিকাতা।

বঞ্চনা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গল্প)

ভাগ্য-লাঞ্ছিত আর পাঁচজনের মতো অসিতও একদিন এখানে এসেছিলো। দুপুরের রোদে ছেঁড়া স্লিপার পায়ে ডালহাউসীর দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে অনেক দিন, শীতের রাত্রে অর্ধাহারে থেকে একখানা ছেঁড়া চাদরে রাত কাটিয়ে পরের দিন আবার বেরিয়েছে। বেশীর ভাগ চাকর আর বেয়ারাদের কাছ থেকেই সংবাদ শুনে ফিরে আসতে হয়েছে। কয়েকবার আসল মালিকের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সৌভাগ্য ঘটেছে, তাকে চাকরী দিতে পারলেন না ব'লে দুঃখিতও হোয়েছেন তারা, দু'একজন করুণাপরবশ হোয়ে আবেদনপত্র দেবার নির্দেশও দিয়েছেন। একজন বাঙালী ভদ্রলোক জীবন বীমার দালালী অথবা ব্যবসায় করবার সুপরামর্শও দিয়েছিলেন।

অক্ষমতা তারই, কোনোটাই হোয়ে ওঠেনি।

অবশেষে একদিন একটী পরিচিত ভদ্রলোকের সংগে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে দেখা হোয়ে গেলো। তাদেরই গ্রামের মানুষ, বললেন, কি করছো আজকাল ?

সবই বললো সে, তারপরে এক রকম বলতে গেলে তিনিই অসিতকে হাত ধরে এখানে নিয়ে এলেন, তাকে বাঁচালেন উপবাস থেকে। শুধু তাকে নয়, তার পরিবারকেও !

ছোট সাহেব জিগেস ক'রেছিলেন, কতোদূর পড়েছেন ? সামান্য দু'একটা কথা, তারপরেই তার কাজ ঠিক হোয়ে গেলো। উপস্থিত ডেস্ প্যাচে থাকতে হবে, তারপরে ভবিষ্যতে উন্নতি আছে। মন দিয়ে কাজ শিখ্‌লে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। প্রথম কয়েকমাস দশ টাকার বেশী দেবেন না, কী রকম কাজ করতে পারে, সেটা দেখে তবেই স্থায়িত্বের প্রশ্ন। পরের মাস থেকে কুড়ি টাকা মাইনে, দু'টাকা ডিয়ারনেস্—আজকের দিনে এর বেশী আশা করা বিশেষ ক'রে একজন নতুন লোকের পক্ষে অন্যায় নয় কি ? ছোটসাহেব তাকেই প্রশ্ন ক'রেছিলেন।

মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলো সে। টাকার সংখ্যাটা কি পাচ্ছে সেটা তার এখন বিচার্য নয়—টাকা পাবার উপায়টাকে যে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেলো এই তো বিধাতার পরম আশীর্বাদ !

দিন কেটে গেছে। একে একে তারপরে চারটে বছর উত্তীর্ণ হোলো। কুড়ি টাকা আজ চার বছরে চল্লিশে এসেছে—ডিয়ারনেস্—আট ! এতেও যদি সংসার না চলে তা হ'লে তাদের কর্তৃপক্ষ কী করতে পারেন ? যুদ্ধের পরেও জিনিষপত্রের অগ্নি-মূল্য ব'লে তাঁদের তো মাইনে বাড়িয়ে দেবার একটা সীমা আছে, আছে এতো বড়ো একটা ব্যবসায় সুপরিচালিত করবার মহত্তম দায়িত্ব। কাজ কারবারের অবস্থা ভালো হোক—তখন তারেরো উন্নতি হবে বই কি !

কিন্তু এসব অবান্তর কথা। যাঁকে নিয়ে এই কাহিনী তাঁর নাম গৌরচাঁদ দত্ত। পেনশিং ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। আসতেন দক্ষিণ গোবিন্দপুর থেকে বর্ষা-কালে একটা লণ্ঠন আর লাঠী থাকতো সংগে। বাড়ী ফিরতে প্রায়ই রাত হোয়ে যেতো তাঁর, জংগলের পথ ভেঙে তবে গ্রামে পৌছতে হোত, পথে সাপের ভয় খুব বেশী—তাই এই সশস্ত্র আয়োজন।

প্রথম দিন থেকেই তাঁর সংগে অসিতের একটু হৃদ্যতা ঘটেছিলো। খুব পান খেতেন। সমস্ত জীবনে ওই বোধ হয় তাঁর একমাত্র বিলাস ছিলো ; অসিতের কাছে আরো আসতেন, আবেদন পত্র লিখে দেবার জন্যে। প্রায়ই নানা জায়গায় চাকরীর জন্যে আবেদন করতেন, বলতেন তিরিশ টাকার সংসার চলে না ভাই—এক বেলা না খেয়ে থাকতে হয়—বউটার আবার ক'দিন থেকে জ্বর, একটু ওষুধ পড়ছে না মুখে—বেবেন দুটো টাকা ধার ?

তাই দিতো অসিত। কোথা থেকে, কি ক'রে এবং কি ভাবে যে সেটা সে পারতো তা আজো তার নিজেরই কাছে অনেকদিন পর্যন্ত ধাঁধার মতো মনে হোয়েছে, তবু সে দিতো, মাইনে পাওয়ার সংগে সংগেই গৌরবাবু তা

তাকে বোধ ক'রেও দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতা অবিস্মরণীয় ছিলো

অনেক দিন থেকেই তিনি এদের এই প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত। একেক দিন অবসর সময়ে গল্প করতেন। হয়তো সেদিন অফিসাররা কেউ নেই; বোর্ডের মিটিংএ চ'লে গেছেন, সমস্ত পাচতলাটা একেবারে ফাঁকা, কেরাণীদের তখন গল্প করবার অপূর্ব অবসর। অসিত হয়তো সেই সময়ে সবেমাত্র সমস্ত দিনের ডাক-টিকেট খরচের হিসাব মিলিয়ে ক্যাশটা গুছিয়ে রাখছে, হাসতে হাসতে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে গৌরবাবু নমস্কার ক'রে বললেন, এই যে অসিতবাবু, দিন রাত তো খালি খাতার উপরে মাথা নীচু ক'রেই আছেন—রাখুন মশাই, ফেলে রাখুন ও সব, যতো দেখবেন, ততো ওরা আপনাকে ফোঁকের মতো চেপে ধরবে, এই আমাকেই দেখুন না কেন!

একটু আগেই পান খেয়েছিলেন, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পিচ্ ফেলে অসিতের টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

এই যে আসুন, অসিত তাড়াতাড়ি বললে, হাতের কাজটা সেরে নিয়েই আপনার সংগে কথা বলছি।

গৌরবাবু পকেট থেকে রুমালটা বের ক'রে নিয়ে ভালো ক'রে মুখটা মুছলেন একবার, তারপরে বললেন, মশাই এমন দিন গেছে এদের, সমস্ত রংএর ডিপার্টমেন্ট টলমল করছে তখন, এই বার এই যায় অবস্থা; তখন এই গৌর হরি এসে তাকে বাঁচায়, কতো রকমের রং যে এদের বিক্রী করিয়ে দিয়েছি, তার হিসেব আছে? আর তাছাড়া ভক্ থেকে লাল খালাস করা, সে সব জাংগামের কথা কী আর বলবো আপনাকে, এরা তো বোঝে না, তাই আমাদের উপর এমন অবিচার—তবে এটাও ঠিক অসিতবাবু, একদিন আমি এদের ঠিক বুঝিয়ে দেবো কত ধানে কতো চাল?

ইতিমধ্যে অসিতের হিসেবের কাজ শেষ হোয়ে গিয়েছিলো। খাতাপত্রগুলো বন্ধ ক'রে ডেস্‌প্যাচ বইটা খানি নিজের সামনে খুলে রাখলো সে, তারপরে তাঁর দিকে চেয়ে হেসে বললে, তা তো বটেই। আপনার মতো মানুষকে ওরা অজো চিন্‌লো না।

ভয়ানক উৎসাহ পেলেন ভদ্রলোক। চোখে মুখে একটা দীপ্ত উৎসাহ যেন মুহূর্তের মধ্যে জলে উঠলো, পকেট থেকে ডিবে বের করে বললেন নিন্ না স্যর!

কেরাতে কোথায় যেন বাধলো অসিতের,অথচ পান খেতে ঠিক যে তার ভালো লাগে তা নয়, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, সাদা তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—খান্ না, ছোক্কা টোক্কা আমি খুব কম খাই, তারপরে হেসে বললেন, ও আপনার বৌদির হাতের তৈরী পান।

হেসে চোখ বড়ো বড়ো ক'রে অসিত বললে, ওঃ, তাই নাকি, বেশ বেশ, ব'লে সে পানটাকে মুখে পুরলো।

আবার পূর্ব প্রসংগটাকে টান্‌লেন গৌরবাবু। বললেন পোর্ট কমিশনারের সাহেবরা আমাকে ভীষণ খাতির করে অসিতবাবু, এই ছেঁড়া জুতো আর ছেঁড়া ছাতা দেখ্‌লে কি হবে আমার ইংরিজি শুনে ওরা খুব অবাক, বলে দস্তুর, তুমি তো খুব চমৎকার আমাদের দেশের কথা বলতে পারো, বলেই একটু হেসে বলতেন; যা মুখে আসে তাই ব'লে যাই কিনা, কিছুই তো আর আমার আটকায় না।

ডেস্‌প্যাচের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে হাসতো অসিত, বলতো সে কথা সত্যি, আপনি এত ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারেন যে আমরাও অবাক হোয়েছি।

হাসিতে এবারে সমস্ত মুখখানি উজ্জ্বল হোয়ে উঠলো গৌরবাবুর। বললেন সত্যি দেখেছেন নাকি আমার কথা বলা?

বেশ লোক আপনি! অসিত বললে, সেদিন ডালহাউসীর মোড়ের উপরে দাঁড়িয়ে সেই যে ফিরিংগীটার সংগে কথা বলছিলেন মনে নেই?

খুব খুসী হোলেন। টেবিলের উপরে একটা বাজে কাগজ পড়েছিলো সেইটা হাতে নিয়ে অকারণে পাকাতে লাগলেন, বললেন, ওঃ—একবার যা কাণ্ড হোয়েছিলো শুনুন বলি—

হঠাৎ কি একটা কাজে ছোটসাহেব আবার পাচতলার উপরে উঠে এসেছিলেন সেই সময়ে। সংগে সংগে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টে যেন একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ ব'য়ে গেলো, যে যার জায়গায় শান্ত শিষ্টের মতো এসে বসলো আর গৌর বাবু ডিবে থেকে আরেকটা পান মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে টেবিলের সাম্‌নে থেকে স'রে গেলেন।

তবু আলাপ একদিন আন্তরিকতায় নেমে এলো। প্রায়ই বল্‌তেন, অসিত বাবু, আপনাকে একদিন আমাদের ডকে নিয়ে যাবো, দেখ্‌বেন সে কি জায়গা মশাই, আপনাদের সে আইডিয়াই নেই। উঃ, অন্ত কোম্পানী হোলে আমাকে মাথায় ক'রে রাখ্‌তো, কি আর করবো, দেশী কোম্পানী কিনা! বরাতটাও খারাপ, তাই এদের এখানে প'ড়ে আছি।

রোজ বেলা দেড়টার সময়ে অসিতদের টিফিনে খাবার ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিলো, দেড়টা থেকে ছুটো, এই আধঘণ্টা। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছেই একটা ছোট্ট খাবারের দোকানের সংগে এই উপলক্ষ্যে অসিতের পরিচয়টা নিবিড় হোয়ে উঠেছিলো। গরম কচুরি ভাজতো ওরা এই সময়ে আর তা ছাড়া দোকানদার মানুষটী বড়ো ভালো—কচুরি খেতে খেতে একটু আধটু রাজনীতি চর্চাও হোত তাঁর সংগে অসিতের।

গৌর বাবুকে অফিসে খুব কম সময়েই দেখ্‌তে পাওয়া যেত। প্রায়ই কাজের জন্ত তাঁকে বাইরে বাইরে ঘুরতে হোত। কোনো কোনো দিন হঠাৎ দেখা যেতো হন্তদন্ত হোয়ে অসিতের সাম্‌নে অফিসের এক একটা জরুরী চিঠি নিয়ে হাজির হোতেন, বলতেন, অসিতবাবু, কাইণ্ডলি দিন না ভাই, এটাকে ডেসপ্যাচ ক'রে—এখনি আবার একবার কাষ্টমে ছুটতে হবে।

সে দিন গেট্ থেকে বেরুতেই সাম্‌নে গৌরবাবুর সংগে তার দেখা হোয়ে গেলো। ছাতা বগলে ট্রাম থেকে নাম্‌লেন। দেখা হ'তেই হাত তুলে নমস্কার ক'রে বললেন, এই যে অসিত বাবু। কোন্ দিকে, টিফিনে নাকি?

—হ্যাঁ ভাই, অসিত হাস্‌লো একটু, আপনি কোথা থেকে?

—আর বলেন কেন? পোর্টকমিশনারের সাহেব শালা কম বজ্জাইস—সকাল থেকে খালি ব্যাটা আমায় ঘুরিয়ে মারছে, আজ দিয়েছিলুম শুনিয়ে। বলেছি, দিন তোমাদের ধনিয়ে এলো বাবাজীবন, আর ওস্তাদী নয়—এবার কারবার গুটোও বাবা ভালোয় ভালোয়, আমাদের গান্ধী-মহারাজের নাম শুনেছো তো?

জানেন অসিতবাবু, শালা বলে কিনা, ড্যাম ইয়োর গ্যান্ধি! উই ডোণ্ট্ কেয়ার!

হাঁটতে হাঁটতে কয়েক পা এগিয়ে এসেছিল অসিত, বললে, চলুন না কিছু মিষ্টি মুখ ক'রে আসি—এখন আর কাজ নেই তো?

হাসিতে মুখটা ভ'রে উঠ্‌লো গৌরবাবুর, বললেন, নাঃ, এখন আর কাজ নেই চলুন!

ভাক্‌লো তো, কিন্তু নিজের পকেটের কথা ভেবে বেশ একটু ভাবনা হোলো তার মনে—মাত্র দু-আনা পয়সা আছে জলখাবারের, চারটে ক'রে কচুরি তার বাঁধা। যাক্ গিয়ে, জানা দোকান এই যা রক্ষে!

টেবিলের সাম্‌নে ছুটো চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো অসিত, বললে, বসুন গৌরবাবু!

ছাতাটাকে একপাশে রেখে গৌরবাবু ভালো ক'রে বস্‌লেন চেয়ারের উপরে।

বললেন, যাক্ আপনার কল্যাণে কিছু ভালো মন্দ খাওয়া হ'য়ে যাবে দেখ্‌ছি!

হেসে অসিত বললে, ও কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না ভাই, আপনাকে সেরকম ভাবে খাওয়াতে আর পারলুম কই?

একটী ছোক্‌রা চাকর ধোয়া কলাপাতার উপরে চারটে ক'রে গরম কচুরি এবং ডাল দিয়ে গেলো।

অসিত বললে, আসুন গৌরবাবু, ব'সে যাই!

ভদ্রলোক জলের গ্লাসটা কাৎ ক'রে হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর গল্প করতে করতে খেতে আরম্ভ করলেন।

অনেক সুখ দুঃখের গল্প হোলো সেদিন, বললেন, ভাই অসিতবাবু, একদিন চলুন আমাদের দেশে, একটু

বেড়ানোও হবে আর এই গরীবের বাড়ীতে যদি একটু পায়ের ধুলো দেন—

অসিত বললে, ছি ছিঃ, এ সব কি বলছেন, যাবো বই কি, নিশ্চয়ই যাবো একদিন, গিয়ে বৌদির হাতের রান্না খেয়ে গল্প ক'রে আসবো—দাঁড়ান একটা ছুটীর দিন চিঠি আসুক।

ভারী খুশী হোলেন গৌরবাবু। ছুটো নাগাত তারা দোকান থেকে উঠ্‌লো। হিসেব ক'রে অসিত দেখ্‌লো, একটাকার উপরে উঠেছে, দোকানদারকে আভাষে বললে, টাকাটা কাল দেবো, ব'লে টেবিল থেকে মশলা নিয়ে দুজনে রাস্তায় নেমে পড়লো।

সত্যি কথা বলতে, সেদিন থেকেই ওর সংগে অসিতের আন্তরিকতা যেন একটু একটু ক'রে গভীর হোতে লাগলো। ভদ্রলোকের মনে তার সম্বন্ধে ভারী অদ্ভুত একটা ধারণা গ'ড়ে উঠেছিলো। কার্যকারণে শেষপর্যন্ত এমন হোলো যে সেটা তাঁর মন থেকে বদ্‌লাতে পারেনি সে। অবশ্য এ মিথ্যাচারণের জন্যে নিজের মনের কাছে সব সময়েই সে লজ্জিত ছিলো, কিন্তু সত্যিই তার এ ছাড়া আর কোনো উপায়ন্তর ছিলো না।

কথায় কথায় একদিন বললেন, তা আপনার স্ত্রীমতীটী কেমন? একদিন আলাপ করিয়ে দেবেন না?

অসিত বললে, কার কথা বল্‌ছেন? আমার স্ত্রী?

হেসে বললেন, তাছাড়া আবার কার কথা বলবো?

অসিত হেসে ফেললো, বললে, আমার স্ত্রী তো নেই ভাই, এখনো বিয়েই করিনি।

তেম্‌নি ক'রে এক গাল হেসে তার কথাটা উড়িয়ে দিলেন গৌরবাবু, বললেন, ন্—নাঃ, বিয়ে করেননি, বললেই হোলো, কেন আর ঢাকছেন মশাই ও আর লজ্জার কথা কি?

আবার হাস্‌লো অসিত, বললে সত্যি বল্‌ছি আপনি বিশ্বাস করুন! নিজেরি চলে না, বিয়ে করবো কি ক'রে বলুন?

রাখুন মশাই রাখুন, বলি মনের মতো হয়নি বুঝি, তাই অমন ক'রে বল্‌ছেন, তারপরে দু'একটা একথা সে-কথার পর উঠে গেলেন টেবিল থেকে।

এর দিন করেক পরে আবার একদিন এলেন অসিতের কাছে। হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে খুব সহজ ভাবে সেদিন তাদের গল্পের স্রোত বইছিলো, ছোটসাহেব আসেন নি—সুতরাং তাদের সেদিন অবাধ স্বাধীনতা।

বললেন, স্বাস্থ্য কেমন ভাই?

অসিত বললে, কার?

—কার আবার? হেসে একটু অর্থপূর্ণ ভংগী ক'রে চোখ টিপ্‌লেন।

গৌরবাবুর এই ধরনের কথায় মনে মনে এবারে ভারী একটা কৌতুকও বোধ করলো সে, কী খেয়াল হোলো, বললে, মন্দ নয়, বেশ মোটা সোটাই!

ভারী খুশী হোলেন গৌরবাবু। বললেন, এই তো সুর, আজকে তো স্বীকার করলেন, ও মশাই, আমাকে আর ভোলাবেন না,—শিকারীবেড়ালের গোঁফ দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি, তা কোথায় বিয়ে ক'রেছেন?

হঠাৎ কোনো নাম মনে এলো না অসিতের, কি বলে, করেকদিন আগে শ্রীরামপুরে তার ছোটমাসীমার কাছে গিয়েছিলো অসিত, বললে শ্রীরামপুরে!

বললেন, বেশ, বেশ, তা নামটী কি হোল?

ঠোঁটের উপরে একটু হাসি টেনে এনে অসিত বললে, মাধুরী!

—বাঃ, চমৎকার নাম! এইরকম নামই তো চাই, তা না, বেবি, ডলি, রুবি, যত সব বাজে নাম আজকালকার। তা শালা শালী ক'টী?

অদম্য আর অসাধারণ উৎসাহ ভদ্রলোকের। বাধা দিতে পারলো না অসিত, তার কৌতুহলের স্রোতে ভেসে সেও উপন্যাস রচনা ক'রে চল্‌লো।

একদিন এসে বললেন, কি আজ মনটা খুব খারাপ খারাপ মনে হচ্ছে আপনার, ঝগ্‌ড়া টগ্‌ড়া ক'রে এসেছেন নাকি?

হেসে অসিত বললে কই না?

—না আবার, কোথায় আছেন তিনি, বাপের বাড়ী নাকি?

হেসে অসিত বললে, না এখানেই!

বেশ লাগ্‌তো। সমস্ত অফিসের মধ্যে এই একটী মানুষ—যিনি তার কুমার জীবনকে একেবারে বিশ্বাস করতেন না।

একদিন বললেন, আচ্ছা অসিতবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ভাই?

নিশ্চয়ই!—কি সম্বন্ধে? অসিত বললে।

একটু হেসে বললেন, পেন্‌টিং ডিপার্টমেন্টের ভূপেন বলছিলো আপনি যে ছবিটবি আঁকেন মাসিক পত্রিকায় ও সব নাকি বাজে, আসলে আপনি কাউকে টাকা দিয়ে আঁকিয়ে নেন, তারপরে ছাপতে দেন।

একটু ইতঃস্তত না করে অসিত বললে, ঠিক কথাইতো, আপনি ঠিকই ধরেছেন!

একটু যেন অপ্রস্তুত হোয়ে গেলেন প্রথমে, তারপর বললেন, দেখলেন, আমি যা মনে ক'রেছি, তাই ঠিক, হেসে অসিত ব'লেছিল, তা আর বলতে!

একদিন বললেন, কই বউদিকে একদিন দেখাবেন না।

—বউদি। একটু পরেই সে বুঝলো তার সেই কল্পিতা স্ত্রীর কথা বলছেন গৌরবাবু। একটু হাসলো সে, তারপর বললে, যাবেন বইকি ভাই, বাড়ীতে বড়ো অসুখ বিসুখ চলছে এখন আমার, একটু সারলেই আপনাকে নিয়ে যাবো। তারপরে একটু থেমে বললে; সেদিন ভারী মজা হোয়েছিলো কিন্তু আপনাকে নিয়ে—

—সেকি? উৎসাহে গৌরবাবুর চোখ দুটী যেন ঈষৎ বড়ো হোয়ে উঠলো। বললেন, কি হ'য়েছিলো?

অসিত বললে, প্রায়ই আপনার গল্প করি কি না! সেদিন বললুম, জানো মাধুরী আমাদের গৌরবাবু কিন্তু ভারী চমৎকার কথা বলেন; সেদিন হোয়েছে কি জানো, দুপুরে খুব হন্তদন্ত খেয়ে আমার টেবিলের ধারে এসে বসলেন, বললুম কোথা থেকে এলেন গৌরবাবু, সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি সুন্দর কথা বলেছিলেন শোন, বললেন উঃ, বড্ডো ঘুরেছি ভাই, ঘুরতে ঘুরতে চারকোল বিক্রী করবার থেকে নারকোল খেয়েই ফিরে আসা ঠিক করলুম।

হাসতে হাসতে তো আমার স্ত্রীর দম বন্ধ হোয়ে আসে আর কি!

—বলেন কি? আনন্দে হাসিতে গৌরবাবুর সমস্ত মুখটা উজ্জ্বল হোয়ে উঠ্‌লো।

বললেন, যান, এই সব গল্প আপনি তাঁর কাছে করেন বুঝি?

•

কয়েকটা মাস কেটে গেছে তারপরে। অল্প অল্প বৃষ্টি নেমেছে। এমনি একটা দিনে গৌরবাবুর সঙ্গে দক্ষিণ গোবিন্দপুরের দিকে রওনা হোলো অসিত।

ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু ভারী সুন্দর। নতুন বর্ষার চারিপাশের রূপ যেন আরো চমৎকার হোয়ে উঠেছে।

বেশ বড়ো বাড়ী। কিন্তু কালচক্রে তা ক্রমশঃ খণ্ডিত হয়ে গেছে। বড়ো ভাই পাশেই থাকেন। গৌরবাবুর সংসার খুবই ছোট, উনি নিজে, স্ত্রী আর একটি মাত্র ছেলে

সামনেই বাগান। নিজের হাতেই গৌরবাবু শাক-সবজীর ক্ষেত ক'রেছেন। প্রতি হাটে কিছু না কিছু জিনিষ তাঁর নিয়মিত বিক্রী হয়।

আলাপ হোলো বউদির সঙ্গে। বড়ো লাজুক মেয়েটী। নাম সরোজিনী দাসী। একগলা ঘোমটা টেনে অসিতকে চা ক'রে দিলেন, অসিত বললে, এ ভারী অন্যায় বউদি, ছোট ভাইয়ের সামনে আপনার যদি এতো লজ্জা হয়, তা হ'লে আর আসবোনা। এই শেষ। গৌরবাবুও স্নেহের সুরে একটু মৃদু তিরস্কার করলেন, বললেন, সবই তোমার বাড়াবাড়ি বউ, উনি আমার পরমবন্ধু, আপনার জন, ওঁর কাছে আবার লজ্জা কি তোমার?

এইবার ঘোমটা সরিয়ে একটু হাসলেন তিনি। তারপর ভাত দেওয়া নিয়েই কি ভাবে আস্তে আস্তে কথা আরম্ভ ক'রে কথার স্রোতের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলো তারা তা আজ আর অসিতের মনে পড়ে না।

আসবার সময়ে অসিতকে তাঁর সে কি একান্ত অনুরোধ, আর একবার আসবেন ঠাকুরপো—এবার কিন্তু আমার জা'টিকে নিয়ে আসা চাই, উঁহু, কোনো

আপত্তি আমি শুনবোনা ভাই! তারপরে তার নিজের হাতের করা নারকোল নাড়ু, খানিকটা কুলের আচার, কিছু ক্ষেতের বেগুন সীম আর লাউ ডাঁটা দিয়ে যে একাণ্ড বোঝাটি তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন, বাড়ী পর্যন্ত টেনে আনতে শেষ পর্যন্ত তার কম অসুবিধে হয়নি।

গ্রাম্য মেয়েদের সম্বন্ধে যে ধারণা নিয়ে অসিত গ্রামে গিয়েছিলো, এই গ্রাম্য তরুণীটী সেদিন তার সেই সমস্ত ধারণাকে অবলীলায় বদ্‌লে দিতে পেরেছিলো সন্দেহ নেই!

এরপরে আরো একবছর পার হ'য়ে গেছে। হঠাৎ একদিন অসিত শুনলো গৌরবাবুর অসুখ। কয়েকদিন কাজের চাপে এতো বেশী বিক্ষিপ্ত ছিলো সে যে তার অনুপস্থিতিটা লক্ষ্যই করেনি—কথাটা কানে আসতেই খোঁজ নিয়ে সব জান্‌লো—নিমোনিয়া হ'য়ে অবস্থা খুবই খারাপ।

সেই দিনই অফিসের পরে তার বাড়ী গিয়ে উঠ্‌লো অসিত তখনো অন্ধকার হয়নি ওঁর স্ত্রী বাইরে উঠোনের উপরে ছিলেন—অসিতকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন, বললেন, ঠাকুরপো, ওই দেখুন অবস্থা।

অসিত দেখ্‌লো, বিছানার উপরে পাশ ফিরে গৌর-বাবু শুয়ে আছেন জ্বরে একেবারে অচৈতন্য। এ পর্যন্ত কিছুই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়নি। খালি কেবল কতোগুলি তাবিজ তাগা আর মাদুলি পরিয়ে দিয়েছে তার এখানকার শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

অফিসে ফিরে এসে কর্তৃপক্ষকে সব জানিয়ে কিছু টাকার জোগাড় করলো সে—তাই দিয়ে সেই রাত্রেই কলকাতা থেকে ভালো ডাক্তার নিয়ে গেলো দক্ষিণ গোবিন্দপুরে—কিন্তু সবই বৃথা হোলো, আট দিনের দিনই সব শেষ!

সত্যিকথা বলতে, সেদিন থেকে অসিত খুব একটা জালের মধ্যে হঠাৎ যেন জড়িয়ে পড়ে তার থেকে বেরিয়ে আস্‌বার চেষ্টায় অস্থির হোয়ে উঠ্‌লো।

কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নেহাত অবিচার করেননি—একদিন অফিসে এসে অসিত শুনলো, গৌরবাবুর বিধবা পত্নীর জন্যে তারা একটা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রেছেন, যতোদিন না তার নাবালক ছেলেটী সাবালক হ'য়ে ওঠে ও কর্মক্ষম হয়, ততোদিন এই বৃত্তি অব্যাহত থাক্‌বে।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো অসিত, যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা হোলো তা'হলে। প্রস্তাবটীকে বহন করে নিয়ে গিয়ে সেই অনাথিনীকে দেবার ভার শেষ পর্যন্ত অসিতের ওপরেই পড়লো।

তবু এতো দুঃখের তরংগের মধ্যেও এ যেন একটী ছোট্ট আনন্দের শতদল, বেদনার সরোবরে টলমল করে তা দুলছে

* * *

তারপরে ৫ বছর কেটে গেছে!

কিন্তু আজ বিপদ এসেছে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে। গত ৫ বছর হোলো গৌরবাবুর বিধবা স্ত্রী সেই বৃত্তি সমানে পেয়ে এসেছেন হঠাৎ আজ সকালে ছোট সাহেব অসিতকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। যেতেই বললেন, গৌরবাবুর আপনি অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছিলেন, তাই আপনাকেই প্রথমে জানাচ্ছি, কিছুকাল থেকে আমাদের কাজ-কারবারের অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে, কতোদিন আমরা যে এ ভাবে তাঁর স্ত্রীকে অর্থ সাহায্য করতে পারবো, ঠিক বুঝতে পারছি না, যাই হোক সাত দিন পরে আমাদের কমিটীর মিটিং আছে—কি হয় ফলাফল পরে জানাবো।

সাতদিন পরে নিজের টেবিলে বসেই একটা স্লিপ পেয়েছিলো অসিত। ছোট সাহেব তাকেই লিখেছেন, জানিয়েছেন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত, গৌরবাবুর স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁরা আর কোনো বিশেষ বন্দোবস্ত করতে পারলেন না—ব্যবসায়ের অবস্থার কথা ভেবেই এই অত্যন্ত অশোভন ব্যবস্থা করতে হোলো।

স্লিপটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলো অসিত। সামনে পুজো, সেদিন সে গৌরবাবুর স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে অনেক আশা দিয়েছিলো, বলেছিলো আপনার টাকার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ওঁরা করে দেবেন বৌদি—যথেষ্ট দয়া মায়া আছে ওঁদের, আপনি ভাববেন না, বলে একবার

শুধু তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলো। ঈষৎ মাথা
বসেছিলেন তিনি, স্পষ্ট দেখেছে অসিত,
একটা অক্ষর ধরে শুধু টিক্ টিক করছে।

কতোগুলি ভাউচার আর বিল খরচের
লেখা হবার জন্যে অসিতের টেবিলে এসে পড়েছিলো।
দোয়াতে কলম ডুবিয়ে মাথা নীচু করে সেগুলি লিখতে
লাগলো। হঠাৎ একটা বিলের ওপরে দৃষ্টি পড়লো তার।
কিনটনে তাদের কোম্পানীর পাবলিসিটী অফিসার
আনন্দ পিল্লাই-এর সই। এবারে মাদ্রাজ ঘুরে আসবার
পর এই বিল হয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলটা পড়ে গেলো
সে। দেখলো প্রায় হাজার দেড়েক টাকার শাড়ী, স্যুট,
বেবিকট, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি কেনা হয়েছে। নীচের
ছোট্ট একটা কাগজে লেখা 'ফর মিষ্টার নটরাজন'।
প্রচার এবং বিজ্ঞাপনের খাতে এ হিসেবগুলির
কেনা হয়েছে।

বুঝলো সবই অসিত। আজকে এঁদের কারবারের
প্রতিটি ধাপে যদি এইসব ঘুষের মলম
তাহলে কি সে ভাগ্যলক্ষ্মী এতো
পারতেন। জানে, অসিতও জানে

টাকাই শাড়ী কিনে কয়েক মাস আগে
আলনা থেকে তার দামী একটা শাড়ী চুরি হয়ে গিয়েছিলো,
তার শোকটা সে সহজে ভুলতে পারছে না। তাই তাকে
এই কথা দিয়েছিলো অসিত, বলেছিলো এবারের বোনাস-
এর টাকাটা সব তোকেই দেবো শীলা।

না, আর তা হবে না। অন্ধকারে গ্রামের একান্তে ভাঙা
লণ্ঠন জেলে যে অনাথিনী তার দেওর প্রতিপ্রতির আশায়
প্রহর গুনছে, তাকে সে প্রবঞ্চনা করবে কেমন করে?
৫ বছরের ছেলেটার প্রবল জ্বর দেখে এসেছে কদিন আগে
—তাকেই বা তিনি বাঁচাবেন কি করে?

আজ সকালেই বোনাসটা পাওয়া গেছে। অনেক কিছু
কিনবার প্রয়োজন ছিলো অসিতের, অভাবের সংসারে
প্রয়োজনের শেষ কোথায়?

অসিত জানে, সন্ধ্যে থেকে শীলা
থাকবে আজকেই তার শাড়ী কিনে নিয়ে যাবার কথা
আছে। আদর করে তাকে বুঝিয়ে বলবে সব
অসিত। আমাদের অফিসের অবস্থা
বিশেষ
দিয়েছে ওরা ডাবিলনা
অয়েলপেনটিং-এর জন্যে আমি টাকা পাবো
সামনেই চার্চের ঘড়িটার
ট্রেনের আর বেশী দেরী নেই!
তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো

ফোন ২৭৭৪ বড়বাজার
ভারত অয়েল মিলের
ঘানির তৈল
ব্যবহার করুন।

ফটোগ্রাফীর ব্যবহার

বীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

মননশীলতার দিক থেকে মানুষ অনেকখানি অলস, প্রয়োজন না হ'লে তাঁরা কোন কিছুই বেশী চিন্তা করতে চান না—পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে এ সত্য অনেক বারই প্রমাণিত হ'য়ে গেছে। একমাত্র যুদ্ধের উত্তেজনার সময়ই মানুষ সমষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজে ব্যাহত হ'য়ে পড়ে এবং নানারকম বৈজ্ঞানিক তথ্যও আবিষ্কার সেই জন্যই যুদ্ধকালীন উত্তেজনার সময়ই আবিষ্কৃত হয়েছে। শান্তিকামী মানুষের কাছে এই সংবাদ আনন্দ দেবে না সত্যিই কিন্তু যুদ্ধকালীন অদ্ভুত, বিচিত্র আবিষ্কারগুলি পরবর্তীকালে মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনেকখানি সহায়তা করেছে একথা তাঁরাও অস্বীকার করতে পারবেন না, বিগত মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র ক'রে ফটোগ্রাফী যে ভাবে উন্নত, বিস্তৃত ও পল্লবিত হ'য়ে উঠেছে, যে রকম ব্যাপকভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি বিধানে ফটোগ্রাফীর ব্যবহার করা হচ্ছে, যুদ্ধের আগেকার মানুষ সে কথা ভাবতেও রাজী ছিল কি না সন্দেহ।

বর্তমানে ফটোগ্রাফীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংস্করণ হচ্ছে এরোপ্লেন ফটোগ্রাফী, অবশ্য আকাশ থেকে ফটো যে কোন কিছুর ফটোই হোক না কেন) তার থেকে বিশেষ কোন খবরাখবর সংগ্রহ করা বিশ্লেষণ-কর্তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর করে, অপর একটি জিনিষও তাকে অনেকখানি সাহায্য করে, সেটা হলো আকাশ ফটোকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্বলিত একটি ঘন-বস্তুর মতই দেখা সম্ভব, ঠিক যেমন ইঞ্চি দূর থেকে কোন জিনিষের প্রতি তাকালে আমরা যেমন তার প্রত্যেকটি অংগ প্রত্যংগ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পারি তেমনি একই জিনিষের কয়েকটি ফটো যদি আকাশ থেকে তোলা হয় এবং তাইনে বাঁয়ে উপর নীচু ক'রে বিভিন্নদৃষ্টি-কোন থেকে অনেকগুলি ফটো তোলা হয়, তাহ'লে সেই সমস্ত ফটো মিলিয়ে ভাল ক'রে পরীক্ষা করলে জিনিষটির যথাযথ স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অবহিত হ'তে পারি। এই প্রসংগে আকাশ ফটোগ্রাফীর একটা বিশেষ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, গত ১৯৪৩ সালে বৃটিশ যুদ্ধ দপ্তর যে সমস্ত আকাশ-ফটো তুলেছিলো তাতে শত্রুপক্ষের কত রকমের জলযান থাকতে পারে এবং তারা সাধারণতঃ কোন্ পথে কোথায় যায় এবং কি কি মালপত্র বহন করে—সব কিছুর খবরই জানা সম্ভব হয়েছিল। এ' ছাড়া জার্মান শিল্প-সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি সংবাদাদি এমন কি কোন্ কারখানায় মাসে কত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছে তার সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করাও কঠিন ছিল না। বেতার ও আনবিক বোমার ক্ষেত্রে জার্মানীতে যে সমস্ত গবেষণা তখন চলছিল সেই সম্পর্কেও বৃটিশ যুদ্ধদপ্তর সম্পূর্ণ রকম ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফটোগ্রাফীর সাহায্যে একদিকে এই সমস্ত গোপনীয় সংবাদাদি যেমন পাওয়া গেছে অন্য দিকে শত্রুরা কোথায় আক্রমণ চালাবে কিংবা শত্রুপক্ষের কোন জায়গায় আক্রমণ করলে সব চেয়ে বেশী কার্যকরী হবে এটা জানাও অসম্ভব ছিল না।

যুদ্ধকালীন ব্যবহার ছাড়াও শান্তিকালীন ব্যবহারও ফটোগ্রাফীর কম নয়। এই ব্যবহার কম বেশী সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। জমি জরিপ বা ল্যাণ্ড সার্ভে, প্রত্নতত্ত্বের তথ্য সংগ্রহে, গাছপালার জীবন ও বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করার জন্য, অরণ্যের প্রসার ও অরণ্য থেকে কি কি সময়োপযোগী উপকরণ পাওয়া যেতে পারে, তার সঠিক ধারণা করার পক্ষে ভূতত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনায় এবং পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের নানারকম গবেষণামূলক পরীক্ষা কার্যে ফটোগ্রাফীর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যবহারের উৎকর্ষ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো।

কোন স্থানের মানচিত্র করতে হ'লে আকাশ থেকে করাটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। আফ্রিকার মতন অরণ্য-সংকুল ভয়াবহ স্থানের মানচিত্র স্থলপথে জমি জরিপ ক'রে প্রস্তুত করাটা অনেক সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। অথচ আকাশ থেকে অনেক তাড়াতাড়ি এবং যথাযথভাবে এটা করা সম্ভব, বিশেষতঃ বর্তমানে যে রঙীন ফিল্মটারের

ব্যবহার হচ্ছে তাতে অর্থব্যয়ও অনেক কমে গেছে। এই উদ্দেশ্যে যে স্থানের মানচিত্র প্রস্তুত করা হবে তার উপর এরোপ্লেন সামনের দিকে ও পিছনের দিকে চালিয়ে সোজাসুজি ফটো তোলা হয়, ক্যামেরা গুলিতে এমন ব্যবস্থা থাকে যে তাতে কোন স্থানের উচ্চতা ও নীচুতা সংগে সংগেই লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায় এবং পূর্ব নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী ক্যামেরাগুলি সমানভাবে কাজ ক'রে চলে। পাশাপাশি দুটি ফটোর মধ্যে প্রায় শতকরা ষাটভাগের মত মিল থাকে, এটা এইজন্য দরকার যে এতে দুটী ফটো পাশাপাশি রেখে তাদের যথাযথ পরীক্ষা করে তথ্য সন্ধান সহজ হয়। কোন স্থানের উপর দিয়ে বিমানটি সমান্তরাল ভাবে চালানো হয়, এতে অবশ্য বিমান চালকের দায়িত্ব অনস্বীকার্য, তবে তাকে সাহায্য করার জন্য মাটির উপর থেকে আদেশ পাঠানো হয়। এভাবে দুতিনবার উপর নীচ ফটো তুললেই সমস্ত স্থানের যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায়।

যে সমস্ত বড় বড় প্রাসাদ যুদ্ধের দরুণ ভেঙ্গে গেছে অথবা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে ফটোগ্রাফী থেকে তার পুনর্নির্মানের ব্যবস্থা করা যায়। গত ১৯১৪-১৮ এর যুদ্ধে সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, কয়েকটি বিখ্যাত ফরাসী গির্জা এই উপায়ে পুনর্নির্মিত হয়েছে। আকাশ ফটো থেকে আরও অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যায়। কৃষি, খনি, নগর-পরিচালনা, বিদ্যুৎ অথবা জল সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে এরা অনেক সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

আকাশ বিহারের সাহায্যে প্রত্নতত্ত্বের তথ্য সন্ধানের জন্য অনেক স্থল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, মাটির উপর জুপ, ঘাস আচ্ছন্ন পুরাতন ঘরবাড়ী, অথবা কোন স্থানের মাটির অতিরিক্ত সংকোচন দেখে বুঝতে পারা যায় যে এখানে পুরোণো দিনের ইতিহাসের নিদর্শন কিছু পাওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে এরা চোখে নাও পড়তে পারে কিন্তু ফটোগ্রাফীর প্লেটের উপর এরা সাধারণতঃ বিশিষ্ট জ্যামিতিক ছাঁদ তৈরী করে যা দেখলেই বোঝা যায় যে এটা মনুষ্যনির্মিত, মাটির প্রাচীন ইতিহাসের উপর যে গাছপালার আকার, আকৃতি, বর্ণ নির্ভর করে এটা আকাশ ফটো থেকে ধরা পড়ে। উদ্ভিদের আকৃতি ও বর্ণ থেকেও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক হদিস্ এই প্রকারে পাওয়া যেতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকার উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ লোকবসতি, কৃষির উপযোগী জমির বিস্তার, প্রাকৃতিক বাধা অথবা প্রাকৃতিক চলাচল পথ, করলা জল প্রভৃতির উৎস সন্ধানের নিমিত্ত আকাশ ফটোগ্রাফীর সাহায্য নিচ্ছেন। প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতের গোপনীয় জীবনযাত্রা ও কার্যাবলী অনুসন্ধানে এটা অনেকখানি সাহায্য করছে। এতে রোগবিস্তারের সাহায্যকারী পতংগ, মশা, মাছি ইত্যাদির জন্মনিরোধ করা সহজ হয়েছে।

খাদ্য অথবা অন্য কোন মৌসুমী উদ্ভিদ উৎপাদন এবং ঋতুবিশেষে এই সমস্ত উদ্ভিদের বংশ বিস্তার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করার জন্য ভূমির গঠন, প্রকৃতি জানা দরকার। বিমান ফটোগ্রাফের সাহায্যে এটা করা সহজসাধ্য, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভূতত্ত্ববিদগণ ক্যানাডার প্রকৃতিগত নদনদী, লীলা, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতি বিস্তারের যে হিসাব করেছেন, তাতে মাত্র শতকরা এগার ভাগ সঠিক তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। এভাবে কাজ এগোতে থাকলে, একমাত্র ক্যানাডার ভূমি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে প্রায় দুইশত বছর লাগবে, কিন্তু আকাশ ফটোর সাহায্যে একমাত্র ১৯৪৬ সালেই প্রায় ৫লক্ষ বর্গমাইল ভূমি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, এতে কেবলমাত্র যে ভূমির উপরকার তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে তা নয়, অভ্যন্তর ভাগের নানারকম মূল্যবান খনিজ পদার্থেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

উপরিউক্ত ব্যবহার ছাড়াও নানাবিধ শিল্প উন্নয়নে, আজকাল ফটোগ্রাফীর বহুল ব্যবহার হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ এই যে ফটোগ্রাফীর সাহায্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা সহজভাবে সম্ভব, (১) এর দ্বারা যে সমস্ত রেকর্ড তৈরার করা হয়, সেগুলি যথাযথ ও সুবিধা-জনক মাপজোঁপ করবার একটা বিশিষ্ট উপায়, (২) যেখানে চোখের সাহায্যে কাজ করা সম্ভব নয় সেখানে

ফটোগ্রাফী অনায়াসে কাজ করতে পারে : যেমন খুব বেশী আলো অথবা আলোর অত্যন্ত স্বল্পতা এই দুই অবস্থাতে চোখের কাজ সম্ভব নয় কিন্তু সম্পূর্ণ স্বচ্ছ পদার্থের ফটোগ্রাফ নেওয়া যেমন সহজ তেমনি আলোর সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বেও ফটোগ্রাফী কাজ চালাতে পারে (৩) কোন জিনিষের গতিচঞ্চলতা, যাতে ক্যামেরাস্থিত স্লেটের পরিবর্তন ঘটে, সেটা ফটোগ্রাফীতে ধরা পড়ে (৪) শিক্ষা ও শিল্প সম্পর্কীয় টেনিকএ সম্পূর্ণ রকমে সাহায্য করে।

কোন জিনিষের যথাযথ ফটো তুলে অথবা সময় সময়ে এক জিনিষের ফটো নিয়ে যদি রেকর্ড করা হয় তবে সেই জিনিষের জীবন ও বিবর্তনের ইতিহাস ফটোগ্রাফীতে ধরা যায়। সরকারী দলীলপত্রের এমনভাবে কপি করা সম্ভব যাতে মূল দলিল সম্পূর্ণ অধিকৃত থাকে। এ সমস্ত দলিলের সংখ্যা ক্রমশই এতো বেড়ে যাচ্ছে সরকারী অফিস গুদাম এমনকি মিউজিয়ম্ পর্যন্ত সমস্ত পুরাতন অথচ মূল্যবান দলীলপত্রে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ ধরনের ক্যামেরার সাহায্যে ব্রোমাইড পেপার, ফটোগ্রাফীর ফিল্ম্ অথবা প্লেটের ওপর নানাবিধ উপায়ে এ সমস্ত দলিলের কপি ক'রে রাখা হয়, এর সুবিধা হ'ল এই যে দশ মিলিমিটার প্রস্থ একটা ফিল্মের উপর প্রায় সেডহাজার শব্দ সম্বলিত একটি দলীল মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কপি করা সম্ভব, এবং এতে একটা বড় অফিসের কাগজপত্র মাত্র দুটি টেবিল ড্রয়ারের মধ্যে প্রিন্ট করে রাখা যায়।

১৫০০ খীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী যে সমস্ত ইংরাজী বই ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে এই উপায়ে সে সমস্ত বইয়ের কপি করা হয়েছে। এর দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রথমতঃ দলিলপত্রের যথাযথ কপি থাকলে সেগুলি চুরি করলে অথবা জাল করলে অপরাধীকে প্রায় সংগে সংগে ধরা যেতে পারে, দ্বিতীয়তঃ মূল্যবান বইয়ের কপিগুলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা যেতে পারে। এই সমস্ত ফটোগ্রাফীর নিগেটিভ থেকে যাতে অনুরূপ ব্যবস্থায় পজিটিভ তোলা যায় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

শিল্প কার্যে যে সমস্ত কাঁচামাল দরকার হয় তাদের গুণাগুণ ও অবস্থার উপর উৎপন্ন দ্রব্যের কোয়ালিটি নির্ভর করে। সুতরাং কোন জিনিষ প্রস্তুত করার পূর্বে যদি কাঁচা মালের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায় তবে ব্যবসাক্ষেত্রে লাভবান হওয়া প্রায় নিশ্চিত। এই জন্য কাঁচামালের নানা রকম ফটো তুলে যে সমস্ত ফটো বিশ্লেষণ করা হয়, সাধারণত বিভিন্ন রশ্মি যোগে যে সমস্ত ফটো তোলা হয় তাতে কাঁচামালের বিভিন্ন স্তরের অণুগুলি কি ভাবে সাজানো আছে, তার মধ্যে কোন বিজাতীয় দ্রব্যের মিশ্রণ আছে কিনা এবং যদি থাকে সেটা উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষতি সাধক হবে কিনা তার পরীক্ষা করা চলে, কাজেই কাঁচামালকে নানারকম-ভাবে রাসায়নিক উপক্রিয়ায় শোধন করবার উপায় এর থেকে পাওয়া যায়।

এক্স-রে অথবা রেডিওগ্রাফীগ্রামারের দ্বারা সমস্ত ফটোগ্রাফ তোলা হয় যাতে পরীক্ষিত পদার্থের বিভিন্ন স্তরের অণুগুলি পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। এর মধ্যে যদি এমন কোন বিজাতীয় পদার্থ থাকে যেটা এই সমস্ত রশ্মি প্রবেশে বাধা দেয়, ফটোগ্রাফীক প্লেটের ওপর সে সমস্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে যায়, বর্তমানে লোহা, টিন প্রভৃতি ধাতবপদার্থের কোয়ালিটি বিচারের জন্যে তাদের ইন্-ফ্রা-রেড় (infrared) ফটোগ্রাফ তোলা হয়, লোহা অথবা টিনের উপর যে খরিচা পড়ে এতে সে খরিচা স্তর ভেদ ক'রে ভিতরের অণুগুলির সাজানো লক্ষ্য করা যায়, এক ইঞ্চি পুরু ষ্টীলের ভিতরকার অণুগুলি পর্যন্ত গামারের সাহায্যে দেখা যেতে পারে। পরিশেষে বিশ্ মিলিয়ন ভোল্টযুক্ত এক্স-রে উৎপাদনকারী বিটাট্রোনের সাহায্যে এর চেয়ে পুরু লোহার স্তরও ভেদ করা যায়।

এই পর্যন্ত আমরা সাধারণ ক্যামেরার সাহায্যে যে সমস্ত সাদা ও কালো ফটো তোলা যায় তার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আকাশ ফটোগুলি সাধারণত হলদে রঙের ফিলটার মিডিয়মে পরিশোধন করা হয়, এতে ফটোগুলি আল্ট্রাভায়োলেট (ultra-violet) রশ্মি গ্রহণ করে, এতে দূরবর্তী কোনস্থানের

দৃশ্যাবলী পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু কোন স্থানের বিভিন্ন উদ্ভিদ, মাটির অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেলে বিভিন্ন রকমের রঙিন ফিল্টারের প্রয়োজন হয়, গাছের রঙ ও মাটির রঙ এক নয় অথচ সাধারণ ক্যামেরায় এই রঙের বিভিন্নতা ধরা পড়ে না, রঙিন ফিলটারের কাজ হ'ল প্রকৃতির বিভিন্ন রঙ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে সচেতন ক'রে তোলা, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে চিরসবুজ গাছের কতকগুলি পাতা কোন বিশেষ জমিতে ঝড়ে পড়ে, তার সঠিক হিসেব এসব রঙিন ছবির সাহায্যে করা যায়। বন-বিশেষজ্ঞদের কাছে উদ্ভিদের জীবন ইতিহাস জানবার জন্যে এ প্রক্রিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসংগে যুদ্ধকালীন একটা বিশেষ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করছি। শত্রুপক্ষের সমুদ্রউপকূলের গভীরতা সঠিক জানা থাকলে তাদের জলযানগুলি কোথায় কোথায় নোঙর করতে পারে সেটা জানা যায়, দেখা যায় সমুদ্রের নীলচে জল নীল আলোর চেয়ে লাল আলো বেশী শোষণ করতে পারে সুতরাং যদি উপকূল ভাগের জলের লাল ফিল্টার ও নীল ফিল্টারের ভিতর দিয়ে দুটি ফটো তোলা যায় তবে একটি অপরটির চেয়ে অপেক্ষাকৃত কালো হবে, দুটি ফটোর মধ্যে এই কালো রঙের পরিমাণ নির্খুঁতভাবে মেপে তার সাহায্যে জলের গভীরতা মাপা যায়।

আলোচ্য ব্যবহারগুলি ছাড়া পদার্থ বিজ্ঞান ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফীর ব্যবহার অদ্ভুতভাবে কার্যকরী হয়েছে, রাসায়নিক গঠন প্রক্রিয়ার এবং নানারকম দ্রবণ কার্যে নিয়োজিত পদার্থগুলির আনবিক পরীবর্তন ফটোগ্রাফীর সাহায্যে নির্খুঁতভাবে ধরা যায়। প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ে পূর্ণাংগ আলোচনা করবার ইচ্ছে রইলো।

ছন্দোপতন

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

—বিয়েটাকে কি লাইফ ইনসিওরেন্স মনে করো মা? ছেলে হ'লে বছর কুড়িক তার মানুষ করার প্রিমিয়াম চালাতে পারলে একেবারে এককালীন লাভ? মায়ের কথার জবাব দিয়ে ছেলে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—সব তাতে তোর দুষ্টুমি। আমার অসুখ হ'য়ে পড়লে দেখে কে? খেটে খেটে আমার গতর পড়ে গেলো। পারবোনা আমি আর তোর সংসারে খাটতে। মায়ের কথায় একটা কৃত্রিম রাগের ভাব ফুটে ওঠে।

ছেলে মায়ের মনে একটা খোঁচা মারবার জন্যে খুনসুড়ী ক'রে ব'লে ওঠে—নাঃ! ঐ ভয়ে আমি বাড়ী আসতে চাইনে। এই মাস দু'রেক পরে আসছি, তা' স্বস্তিতে থাকতে দেবেন; দেখছি। আর আজকের দিনটা তো। কাল সকালেই তো যেতে হবে।

মায়ের রাগটা এবার মিনতিতে পরিণত হয়, মুখে হাসি টেনে এনে বলেন—সত্যি তুই একটা বিয়ে কর বাবা। কাজকম্ম আমিই সব করবো। আগুনের আঁচ তাকে পোয়াতে হ'বে না। সে দু' বালতি জল তুলে দিলো কি মাছটা তরীতরকারীটা কুটে দিলো, তাতেই আমার হবে। আর তা' ছাড়া ছোট্ট একটা মেয়ে বৌ সেজে দিব্যি ঘুরঘুর ক'রে আমার সামনে ঘুরে বেড়াবে—সে আমার কতো আনন্দের কথা।

মায়ের রঙিন কল্পনায় বাধা দিতেও ছেলের ব্যথা লাগে অথচ বিয়ে করাও এখন তার ইচ্ছা নয়। কী করে? দুদিক বজায় রেখে সে বলে—আচ্ছা এতদিন যখন গেলো, আর দু' একদিন না হয় সবুর করো। দিনকালের যে অবস্থা। এখনো ভালো চাকরী বাকরী কিছু জোগাড় করতে পারলাম না। আজকাল মেয়েদের যে উঁচু রুচি তাতে আমাকে বিক্রী করলেও তোমার বৌমার শাড়ী ব্লাউজের দাম উঠবে না। ছেলে আবার খিল খিল ক'রে হাসে।

পুরুষের একটা বয়স আছে যখন নারী-নেশা গোপনে গোপনে মনকে পেয়ে বসে। অবস্থার চাপে সে বিয়ে করবে না বললেও, সত্যি সত্যি না করলেও, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নারী-সান্নিধ্যের কথা পরের মুখ দিয়ে শুনতেও মন্দ লাগে না। মন বলে চাই চাই, মুখ বলে চাইনে।

আজকালকার মেয়েদের পর জাতিগত আক্রমণ মায়ের সমর্থন পায়না। ছেলের যুক্তি খণ্ডন করতে বলেন—সব মেয়েই কি সমান হয়রে? মেয়ে যদি মাকারি ঘরের হয় আর বয়েস-খাওয়া না হয় তা হ'লে ওরকম হ'বে কেন? মেয়েরা সব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ছেলে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

মা নিজের কথার খেই ধরেই বলতে থাকেন—তোর অত ভাবনা কিসের? আমি কি একেবারে খালি হাতে বৌয়ের মুখ দেখবো ভাবিস্? আমার তো আর দশটা পাঁচটা ছেলে মেয়ে নেই। আমার যা কিছু সে তো তোরই।

বলতে বলতে তাঁর মন সহসা চাঞ্চল্যে আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। মনে পড়ে অনেক কথা। যে বয়সে আশার আবেশ নেশার মতো মনে জড়িয়ে থাকে, সেই বয়সেই অদৃষ্ট করলো তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর পরিহাস। বৈধব্য তার নির্বিকার শুভ্র মূর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। তাঁর স্বামীর পুত্রমুখ দেখবার বড়ো সাধ ছিলো। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে তাঁরা দেবতার কাছে মানত করেছিলেন একটি পুত্রসন্তান। দেবতাও বিমুখ হয়নি। ছেলে যখন আটমাস গর্ভে এসেছে তখন স্বামীর হলো জীবন-সংশয় পীড়া। গ্রামের ডাক্তারেরা জবাব দিয়ে গেলো। রোগীকে আনা হলো কোলকাতায়। দু' মাসের মাথায় রোগ ভালো হ'য়ে এলো। এই সময় ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়। কোলকাতায় থেকে রোগী খবর পেলেন। শুভসংবাদে তাঁর রোগ-পাণ্ডুর মুখের পর দিয়ে আচমকা একটা সলজ্জ আনন্দের ঢেউ বয়ে গেলো।

বাড়ীতে যাবেন ঠিকঠাক। পুত্রমুখ দেখবার জন্যে সোণার চিরুণী গড়ানো হ'য়ে গেলো।

কল্পনায় নবজাতকের ধ্যানমূর্তি জেগে ওঠে। কেমন সে হবে—গোলগাল না রোগাটে; মায়ের রঙ্ পেল না বাপের রঙ্। মুখের আড়' বাপের মতো না মায়ের মতো। দ্বিমুখী ভাবনা চলে মনে মনে। বিচার সহসা কোনপক্ষেই রায় দিতে পারে না। জগতের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত শিশুমূর্তি একসঙ্গে এসে ভিড় করে চোখের সামনে।

সহসা রোগ আবার তার মুখোস খুলে কঠোর রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। ডাক্তাররা বললেন, সহসা আনন্দের উত্তেজনায় রোগ আবার রিলাপ্স্ করেছে। একদিন, দু'দিন, তিনদিন, চারদিনের দিন সব শেষ। পুত্রমুখ দেখার আশা আর ভাষা পেলো না।

ব্যর্থ সান্ত্বনার প্রলেপ মাখিয়ে প্রসূতিকে সে দুঃসংবাদ জানানো হ'য়ে গেলো। প্রসূতি কোলের শিশুকে সোহাগে জড়িয়ে ধ'রে একবার ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর সে সর্বংসহা সদ্য জননীরূপিনী নারীমূর্তির এক চোখে আঁকা রইলো অশ্রুবিন্দু, আর চোখে ধীর ম্লান হাসি-রেখা।

প্রাণের দেবতা জন্মের মতো বিদায় নিয়ে চলে গেলো, রেখে গেলো তার জীবন্ত স্মৃতি-চিহ্ন—একটি নবজাত শিশু-সন্তান। বুক যতোটুকু খালি হলো, কোল ততোটুকু ভ'রে উঠলো।

সেই একদিনকার রক্তমাংসের পিণ্ডকে নানা দুঃখ দুর্দশার মাঝে বুকের স্নেহ-তাপ দিয়ে বড়ো ক'রে তুলেছেন। মায়ের বড়ো সাধ ঐ একান্ত সম্বল গহনাগুলি ব্যাঙ্কার বৌকে পরিয়ে নিজের না-মেটা সাধ মেটাবেন। কিন্তু গহনার কথা মনে আসতেই অতীতের অন্ধকার পথ বেয়ে তাঁর মন চলে যায় পঁচিশ বছর আগেকার এক সর্বনাশা দিনে। আর তাঁর কথা বলা হয়না।

ছেলে অত বোঝে না। মাকে রাগাবার জন্যে বলে—তোমার সেই মান্ধাতার আমলের অনন্ত আর মাঁকড়ি আজকালকার মেয়েরা পরে না।

স্মৃতি-ক্লিষ্ট মায়ের মুখে এবার আর কথা জোগায়না; চুপ করে তিনি অন্য ঘরে চলে যান।

রবীন দুদিনের ছুটীতে মায়ের কাছে এসেছে। এবার

মা গাঁয়ের বাড়ীতে নেই। কোলকাতা থেকে কাছে হ'বে বলে জেলা সহরের পর বাসা ভাড়া করে রেখে গেছে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু ঘুমিয়ে উঠে সে বেরিয়ে পড়লো দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

সহরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে। একবছর দেড়বছর আগে যা ছিলো জমজমে, এখন তা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা। পাকিস্তান হবার পর অনেকেই সহর ছেড়ে চলে গেছে, যাচ্ছে। যে সমস্ত তরুণদল সরকারী চাকরী করে সহরে থাকতো, পনেরোই আগষ্টের পর তারা সবাই বদলী হয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে। তরুণ-বিরল সহর তাই একেবারে নিষ্প্রাণ। রবীন রাস্তা দিয়ে চলে, চেনামুখ আর সেরকম চোখে পড়ে না। অচেনা নতুনেরা এসে পুরাণোর ঠাঁই কেড়ে নিয়েছে।

ভোজ শেষের উচ্ছিষ্ট মাটির পাত্রের মতো যে দুচারজন বন্ধু সহরে আছে, রবীন তাদের সঙ্গে আধা করে বিকেলটা কাটিয়ে দিলো। এ ধরনের বন্ধু মিলনে আনন্দের চেয়ে বেদনার ভাগই থাকে বেশী। যে আছে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে যারা নেই তাদের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ে। বন্ধুরাও আর অকারণ আলাপনে আনন্দ পায়না। চালের দাম চল্লিশটাকা, করলা মেলেনা কাপড় কলনার বস্তু, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকা কি না—এই সব কথাই বলে।

ওতে রবীনের মন ভরে ওঠেনা। মামুলী আলাপ ক'রে সে বাসার দিকে ফিরে আসে। মায়ের আদেশ—দোকানে চা না খেয়ে বাসায় এসে চা খেতে হবে।

—কৈ, না, চা কৈ? দোকানে চা খাইনি কিন্তু।

—আয় বাবা, এই যে জল চাপাচ্ছি।

দরজার চৌকাট ডিঙিয়ে ঘরের মাঝে এক পা দিতে না দিতেই সে থমকে দাঁড়ালো। সহসা এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকানিতে তার চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেলো। একটী অচেনা মেয়ে ধড়্‌মড়্‌ করে রবীনের মায়ের পাশ থেকে উঠে ওপাশে গিয়ে ঘেড়া ঘেসে দাঁড়ালো। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মুখখানা ভালো করে আঁচ পেলোনা। তবে মনে হয় তার গায়ের রংটা ফর্সাই হবে।

মায়ের ওপর তার রাগ করা উচিত কি খুশী হওয়া উচিত সহসা সে বুঝে উঠতে পারলোনা। তার সঙ্কোচভাব ঘেপে মা সাহস দিয়ে বললেন—কৈ ভিতরে আয়। এই যে জল প্রায় হ'য়ে গেলো।

—না ঘরের মাঝে বড়ো গরম, আমি বাইরে বসি। রবীন দরজার সামনে একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

ঘরের মাঝে শোনা যায় একটি অপরিচিত কণ্ঠের মিষ্টি সুরের কিস্‌কিসে কথা—আমি যাই এখন।

মা জোরে জোরে তার জবাব দেন—তা' কি হয়? তোমার জল নিয়েছি। চা হ'য়ে গেলো, না খেয়ে যাবে কোথায়। তুমি একটু আসো বলে তবুও দু'টো কথা ক'য়ে হাঁফ ছাড়ি। ও আমাকে দিব্যি একলা রেখে ভাবতে গিয়ে বসে আছে।

—আমি এখন যাই, আর দেরী করলে বাবা রাগ করবেন। সেই মিষ্টি কণ্ঠের কিস্‌কিসে আওয়াজ।

—তুই বাইরে বসে রইলি কেন? গরম চা আমি বাপু বাইরে নিয়ে যেতে পারবোনা। উল্‌কে পড়ে যাবে। কথার রেশ রেখে সুর বদল করে বলেন—ও। রেবাকে দেখে লজ্জা করছে বুঝি? ও আমাদের পাশের বাসার মেয়ে।

রবীন ভারী অস্বস্তি বোধ করলো। কেন এ কারসাজী? জোর ক'রে একটা অচেনা মেয়ের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া। তার ইচ্ছা হয় মাকে ডুড়ে বকে যায় কিন্তু মেয়েটা তাতে কী ভাববে ভেবে ইচ্ছাটাকে তার চেপে যেতে হয়।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রবীন দেখলো মেয়েটি তার মায়ের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে চায়ের পেয়ালা মুখে ধরে চা খাচ্ছে।

উবু হয়ে বসে রবীন একবার সেদিকে চাইলো। তার মনে হলো মেয়েটির ঘাড়টি যেন তার দিকেই বেঁকে আছে। গম্ভীরভাবে মায়ের হাত থেকে পেয়ালাটা তুলে নিয়ে সে বললো—শুধু চা নাকি মা?

—কী করি বাপু। তুই সেই বেরুলি, আর এলি

সন্ধ্যের সময় দু'টো মুড়িটুড়ি আনাকে তা' আনাই থাকে দিয়ে! আটা-টাটা তো আর মেলে না'

—ভালো, চা ভালো জিনিষ। কিন্তু কেউকে কফি দিতে এর চেয়ে ওস্তাদী দাওয়াই আর নেই।

মেয়েটা ফিক্ করে হেসে ফেলে রবীনের পাশ দিয়ে বাইরে চলে যেতে লাগলো। হাসির শব্দে চকিত হ'য়ে সে চেয়ে দ্যাখে তরুণীটি তার পানে চাইতে চাইতেই ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—যাচ্ছো না কি মা? মা জিজ্ঞাসা করলেন

—সন্ধ্যের পর বাইরে থাকলে বাবা রাগ করেন। একটু চঞ্চলতার ঢেউ জাগিয়ে কথা বলতে বলতে সে চলে গেলো'

চা খাওয়ার পর মায়ে-পোয়ে অনেক কথাবার্তা হ'তে থাকে রবীন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে—ও জাতটাকে আমদানী করলে কোথা থেকে?

—তোর সব কথা বেয়াড়া। মা স্নেহের পর্দায় চড়া আওয়াজ তুলে বলেন—আমি কেন আমদানী করতে যাবো?

—রাগ করো কেন? বেশ স্নেহের সম্বন্ধও গড়ে উঠেছে দেখছি, তাই বললাম।

—ওরা গাঁয়ের বাড়ী ছেড়ে এসেছে। ওর বাবা সরকারী চাকুরে ছিলেন। ওরা ব্রাহ্মণ তা জানিস্ তো?

—বকে করো মা, জানার জিনিষ দুনিয়ায় অনেক আছে পরের জাতের খবর রাখতে আমি ব্যস্ত নই। আর তা' ছাড়া জানো তো জাতটাত আমি মানি নে। পাকিস্তান হবার পরে ব্রাহ্মণ টাহ্মণ ও সব চুকে গেছে। এখানে এখন সব হিন্দু।

মায়ের মুখে একটা গৌরবজ্জ্বল হাসি জেগে ওঠে। তার ভাষা যেন—তাঁর ছেলেটা পাগল, সে শাস্ত্রটাস্ত্র কিছু জানে না মুখে বলেন—একাকার হচ্ছে বলে কি ব্রাহ্মণ আর ছোটো জাত সমান হতে পারে না কি?

ছেলে মায়ের ভাব লক্ষ্য ক'রে জোর ক'রে আর একটু বেশী হেসে বলে—আচ্ছা মা, আমি যদি একটা অব্রাহ্মণের মেয়ে বিয়ে করি?

মায়ের জবাব পাওয়ার আগেই বলে—ত্যাগ ক'রে কাশীবাসী হবে তো? শেষে বিশ্বেশ্বরের দর্শন করতে গিয়ে আমাকে দর্শন ক'রে বসলে কিন্তু আমার দোষ নেই।

—যাকগে বাপু, আমি বলিনি। মায়ের মুখখানি গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—না, না, তুমি বলো। আমি চুপ করে শুনছি।

—কী ছাই বলবো। রেবার কথা জিজ্ঞাসা করলি, তাই বলছিলাম যে মেয়েটা লক্ষ্মী।

—তা কি আমি অস্বীকার করছি? স্বয়ং লক্ষ্মী না হলেও লক্ষ্মীর অংশ তো বটেই। নিঃশব্দ হাসিতে ছেলের মুখ রাঙিয়ে ওঠে। মা তার মর্মবোধের জন্যে ব্যস্ত হন না।

আগের কথার রেশ টেনে তিনি বলেন—আমার তো মেয়ে নেই। ও আসে এখানে,.....মেয়েটাকে আমার ভালো লাগে.....

—পরের মেয়েকে ভালো লেগে লাভ? এই তো বাসা, বাসা বাসা করছো, পেলেই তো তোমাকে কোলকাতায় নিয়ে যাবো,—তখন?

এতক্ষণে মা যেন মনের কথাটি খুলে বলার একটা সুযোগ পান—তাই তো বলছিলাম তুই মত করলে রেবার মায়ের কাছে কথাটা পাড়ি। ওর বাবা সংসারের ধার ধারেন না। দিন রাত আহ্নিক নিয়েই আছেন। শেষ বয়সে কী কষ্ট ভদ্দর লোকের। চোখ দু'টো হারিয়েছেন।

মায়ের মুখে সম্ভাবিতা বধূর কথা শুনে রবীনের কাণে থেমে-যাওয়া গানের সুরের মতো বাজতে থাকে তার চলে-যাবার সময়ের কথা কটি। চোখের সামনে মূর্ত হ'য়ে ওঠে সেই রক্ত-চাহনী-ভরা দেহের গতিভঙ্গী। মুখখানা ভালো না দেখলেও স্বাস্থ্যের সঙ্গে কল্পনা মিশে তা' সুন্দর হয়ে দ্যাখা দ্যায়। মন জানার চেয়ে মানাতেই খুসী হ'য়ে ওঠে।

তরুণ-মনে তরুণী-বিচার।

মায়ের পীড়াপীড়িতে রেবার মায়ের কাছে তাঁর প্রস্তাব করার ব্যাপারে একরকম সায় দিয়েই রবীন কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলো।

পাখি উড়ে আনন্দ পায় কিন্তু উড়ে যেতে যখন পাখায় নামে ক্লান্তি, তখন সে খোঁজে নীড়ের আশ্রয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর মেসের একখানি খাটের পর বসে মনে পড়ে আপন নিঃসঙ্গ জীবনের কথা। মিশেছে অনেকের সঙ্গে, মেলেনি অনেকের সাথেই। জীবনের পান্থশালায় কতো অতিথি এলো গেলো। সবাই যেন কয়েকরাত্রি প্রবাসের বন্ধু। রইলো না কেউই। তবু সে তো পথ ছাড়ে নি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা আর থাকবে না, তারা মানুষের অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারবে—এই বুক-ভরা আশা নিয়েই তো বর্তমানের বঞ্চনাকে সে উপেক্ষা করতে পেরেছে। দারিদ্র্য-দলিত জীবনে আরো দারিদ্র্যকে বরণ করে আগষ্ট আন্দোলনের সময় পুলিসের লাঠি গুলিকে উপেক্ষা ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলো সেই মরণ মহোৎসবে। কারাবাস নিভৃত সাধনার দুর্লভ অবসর ব'লে মনে হয়েছিলো। কিন্তু আজ তার দেশ পড়েছে পাকিস্তানে। আজো সেখানে সংখ্যালঘুর নাগরিক অধিকারের দাবী পাকা হলো না। যারা সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে এসেছে তারা আজ বাঙালী নয়, পাকিস্তানের কাঙালী। যারা মাটি কামড়ে পড়ে আছে তাদের কপালে কী আছে কে জানে?

রবীনের চোখে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হ'য়ে ন্যাকা পায়। ঘুর আর যাকে হাতছানি দিয়ে সর্বনাশা আনন্দের পথে টেনে আনবে না, ঘরের সুখটুকু তার ছেড়ে লাভ?

সে ভাবে—মন্দ কী, মা আছেন, মনের মতো স্ত্রী এলে দু'টি নারীর স্নেহডোরের বিচিত্র রসধারায় হয়তো জীবন-মরু আবার সরস হয়ে উঠবে। ভেবে দেখলো মায়ের প্রস্তাবে মত দিয়ে সে ভালোই করেছে। দু'পক্ষের যদি মত হয়, বিয়ে আজই না করলেও ক্ষতি নেই, দু'চার মাস পরে করলেও চলবে।

রবীন মায়ের কাছে একখানা চিঠি দিলো ভাবী বধূর পিতৃকুলের পরিচয় জানবার জন্যে।

সময় মতো মায়ের কাছ থেকে জবাব এলো। মা লিখেছেন—রেবাদের বাড়ীও যশোর জেলায়। রেবার বাবা একজন অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। উনি অনেকদিন আগে তোদের থানায় বড়ো দারোগা ছিলেন। উনি বললেন ছোটকালে বোধ হয় তোকে উনি দেখেছেন। সেই যে বঙ্গবিভাগ রোধার স্বদেশী আন্দোলন হয় উনি তখন তোদের থানার বড়োবাবু ছিলেন। বড়ো আলাপী লোক, আর যে রকম ধর্মভীরু তাতে লোক খারাপ ছিলেন বলে মনে হয়না। মেয়ে জামাইকে তিনি যথাসাধ্য দিতে কসুর করবেন না। বড়ো মেয়ে……।

রবীন চিঠিখানির এই পর্যন্ত পড়ে থেমে যায়। তার আশা-রঙীন মনের আকাশে কোথা থেকে একটুকরো মেঘ ভেসে আসে, শ্রান্ত পাখির পাখা আবার শক্তির বেগে হয় চঞ্চল, সংসারের রস-লোলুপ মানুষটির মাঝ থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে স্বপ্ন-সাধক বৈরাগী মূর্তিটি।

রেবা দারোগার মেয়ে? এমন একটা হীন প্রস্তাব মুখে আনতে তার মায়ের মুখে বাধলো না। রাগে, বিরক্তিতে, ঘৃণায় সে মায়ের চিঠিখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো।

দারোগা? যারা বিদেশী শাসকের ছিলো বন্দুকধারী! তার সঙ্গে স্বদেশ-সেবীর আত্মীয়তা—অহি-নকুলে মিতালী……

মা লিখেছেন—তিনি বড়ো আলাপী লোক, ধর্মভীরু। কথাটা মনে হতেই স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তার মনে পড়ে সেই বিশেষ জাতীয় স্ত্রীলোকদের কথা, যারা সারাজীবন ধরে দেহ বিক্রী করে অর্থের স্তূপ জমিয়ে শেষ জীবনে দানধ্যান ক'রে নাম কিনতে চায়, না হয় কাশীবাসী হয়ে ধর্ম করে।

আচমকা হাসিতে মেসের বন্ধুরা চমকে উঠে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। সে সত্যিমিথ্যে ভাঁজিয়ে একটা জবাব দিয়ে লজ্জা পেয়ে চুপ ক'রে গেলো।

উপুড় হয়ে বালিশের পর মুখ রেখে শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে লাগলো। বঙ্গবিভাগ রোধার স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার জ্ঞান হয়নি। কিন্তু বড়ো হয়ে সে শুনেছে তার গ্রামের লোকদের পর বিদেশীর অনুগত দেশী ভৃত্যদের নির্লজ্জ অত্যাচারের কাহিনী।

অসহযোগ আন্দোলনের নেশায় সারা ভারতবর্ষ মাতোয়ারা। ভারতমাতার একটা অবাধ্য উদ্ধত ছেলে বহুদিনের পর বিদেশ থেকে ফিরে এসে তার ভাইবোনদের কানে কানে কী কথা শুনিয়ে দিলো, আর আসমুদ্র হিমাচল নেচে উঠলো তার কথায়। তারা মরণপণ ক'রে মেতে উঠলো বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনে। সহায় বিধাতার অমোঘ অস্ত্র—অহিংস অসহযোগ।

সেই জাগরণের আলোক-রাঙা দিনে নব সূর্যের স্বর্ণরশ্মির একটা পথ-ভোলা ঢেউ কালক্রমে তাদের দূর পল্লীর আঙিনায় এসে পৌঁছে সেখানকার পল্লীবাসীদের কানে কানে শুনিয়ে দিয়েছিলো ঘুম-ভাঙানো গান।

অসহযোগ রূপ দিলো—ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে। তাদেরই একজন নেতার অঙ্গুলীনির্দেশে সরল গ্রামবাসীরা স্থির করলো তারা ট্যাক্স দেবে না।

আন্দোলনের সংহার নষ্ট করবার জন্যে সরকারী কূটনীতি ব্যস্ত হ'য়ে গেলো। তারপর এলো কঠোর দমননীতি অপমান, অত্যাচারের নির্লজ্জ অভিযান। ছোটোবড় নির্বিশেষে পুলিশের নির্যাতন, বন্দুকে বিবস্ত্র করে স্বাধীনতা হানি, মায়ের কোল থেকে তার বুক-চেরা ধন ছিনিয়ে নিয়ে দোতলার পর থেকে নীচে ফেলে দেওয়া।

বিদেশীর আইনে দমননীতি প্রয়োগের বিধি ছিলো ঠিক কিন্তু অত্যাচারের তো পদ্ধতি বা মাত্রা বাঁধা ছিলো না।

অত্যাচার তো করেছে দেশী লোকেরাই। অতোখানি নিষ্ঠুর তারা না হলেও তো পারতো। কেমন করে দেশের লোক হয়ে তারা পারলো?

হ্যাঁ—তারা পেয়েছে চাকরী পাকা করবার লোভে। দেশ নাড়ছে প্রভুকে খুশী করে উন্নতির আশায়। স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সেই সব পরপদলেহী জীবদের অবসরোত্তর ভাতা বন্ধ না করে, তাদের দ্বিগুণ পদোন্নতি বিধান করে মনুষ্যত্বের গৌরব নিতে পারেন, কিন্তু অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ হয়ে সে কেমন করে ক্ষমা করে?

না—না—না তা হ'তে পারে না। মায়ের প্রস্তাবিত পক্ষকে ভালো করে না জেনে মত দিয়ে রবীন যেন নিজের কাছে ছোটো হয়ে গেলো। রেবা সুন্দরী হতে পারে, কাজের মেয়ে হতে পারে, তার বিদ্যাও থাকতে পারে কিন্তু তার দেহে রয়েছে সেই অত্যাচারীর রক্ত, আত্মসম্মান-হীন প্রভুভক্তের রক্ত। রক্তের আহুতি একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করবেই; তার গর্ভে যে সন্তান হবে তার দেহের শিরায়ও তো থাকবে ঐ রক্তের অংশই বেশী।

মা লিখেছেন, রেবার বাবা অন্ধ। হ্যাঁ, হয়েছে। বন্দবিলার আন্দোলনের সময় যখন তিনি বড়ো দারোগা ছিলেন, তখন নিশ্চয়ই তিনি কোনো নারীর পর অত্যাচার করেছিলেন, আর না হয় তো কোনো নারীকে অত্যাচারিতা হ'তে দেখেও তার প্রতিকার করেননি। তাই সেই সতী নারীর অভিশাপে চোখ দু'টি অন্ধ হয়ে গেছে!

ধীরে ধীরে সেই গোধূলির আলো-ছায়ার আড়াল দিয়ে পালিয়ে-যাওয়া আধক-স্মৃতি তরুণীর ছায়ামূর্তি যেন সমস্ত মাধুরী হারিয়ে নাগিনীর ক্রূর মূর্তি নিয়ে ভেসে উঠলো।

না, বিয়ে আর সে করবে না। যে জীবন কোনোদিন স্বপ্নে ঠাঁই পায়নি, তাকে বাস্তবে রূপ দেবার প্রথম প্রয়াসেই হলো এমনিতরো দুঃস্বপ্নতন!

রাত্রের খাওয়া দাওয়ার পর মেসের কোলাহল নীরব হয়ে এলো। সে চাকরকে দিয়ে বাইরের দোকান থেকে একটা বাতি কিনে আনিয়ে নিলো ছাদের পরে। তার মাথাটা যেন দুশ্চিন্তায় টনটন্ করছে।

ছাদে এসে খানিকক্ষণ সে বাইরের হাওয়ায় পায়চারী ক'রে বেড়ালো। বহুদিন তারা-ভরা আকাশ এমনি ক'রে একা তাকাবার সুযোগ হয়নি। আজ প্রাণ ভরে সে চেয়ে রইলো সেই দিকে। স্বপ্নাবেশভরা চোখের সম্মুখ থেকে আকাশের আর সমস্ত তারার অস্তিত্ব মুছে গেলো; জেগে রইলো শুধু সপ্তর্ষি—বহুযুগের বিস্ময়-মাখা একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। সপ্তর্ষির তারাগুলো তার পানে চেয়ে হাসতে লাগলো।

বাতিটা জ্বালিয়ে তার ম্লান আলোয় বসে সে মায়ের কাছে একখানা কড়া চিঠি লিখে ফেললো। যে পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন তার বেশী যেন আর অগ্রসর না হন। আর সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে যেন বলেন তাঁর ছেলে এ বিয়েতে রাজী নয়। তবে মেয়ে সৎপাত্রস্থা হয়েছে জানলে সে খুশী হবে।

চিঠি শেষ করে রবীনের মনে হলো সব যেন লেখা হয়নি; আর একবার চিঠিখানি পড়ে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখলো —হ্যাঁ আর ঐ মেয়ে যেন কখ্খনো আমাদের বাসায় না আসে।

পূর্বাচল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

কোন্ দূর দিগন্তের বিজয় উল্লাস
আমাদের প্রাণগাঙে তোলে বন্যা
আনন্দ প্লাবন।
অনেক সমুদ্র আর অনেক প্রান্তর
অনেক অরণ্য-পথ,
পার হয়ে পাহাড়-পর্বত—
দগ্ধ মাটির বুকে যাহাদের ঘর;
যাহাদের ঘরে শুধু ছিল ত্রাস,
ছিল শুষ্ক দুঃখের আঁধার,
বিবর্ণ দিনের আনাগোনা
সৃষ্টির মৃত্যুর মতো;
যেখানে নগরে-গ্রামে
রাজপথে ভীরু পায়ে চলা,
ভীরু কথা কানে কানে বলা ছাড়া
ছিল না উপায়,
এ ধারের এ দেশের মতো
রক্তজীবী বণিক-শাসনে—
ঈশানের ঝড় শেষে
পৃথিবীর সে প্রান্তেও মহাসমারোহে
জনতার জয়ধ্বনি উঠে,
আকাশের বুকে উড়ে বিজয়-কেতন
রক্তরাঙা ভোরের উৎসবে।
আমরা এ পূর্বাচলে
মুক্তি-মূল্য দিয়েছি অনেক:
ঘুম-ভাঙা গানে গানে
ঘুম টুটে গেছে আমাদের
আজি তাই গণ-চিত্তে
প্রাণ-বন্যা নেমেছে উত্তাল:
বণিক-শাসক কিংবা বিত্তলোভী
সব বে-সামাল।
নতুন পৃথিবী জাগে:
এ মহাদেশের মাটি আবার মুখর,
আবার হয়েছে সুরু জীবন-বন্দনা
নব সূর্যালোকে
এক বা বহুর নয়, আলো সর্বজনীন।

কার্লমার্কস, প্লেটো ও কম্যুনিজম্

শ্রীবাসুদেব মণ্ডল

সমস্ত মতবাদই একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর গড়িয়া উঠে। মতবাদ সামাজিক অবস্থার অভাব প্রধান করে এবং উহা তৎকালীন সামাজিক দ্বন্দের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দেয় এবং সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা ক'রে।

মধ্য বিংশ শতাব্দী স্থায় এবং বিজ্ঞানসম্মত দার্শনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। গণতান্ত্রিক-ধনতন্ত্রের মুখোস খুলিয়া পড়িতেছে। এবং ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রহসনের মূলসূত্র একশত বৎসর আগে কার্লমার্কস তাঁহার বিজ্ঞান সম্মত ডায়ালেকটিক ম্যাটিরিয়ালিজমের সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছেন। রাষ্ট্রহীন সমগণতন্ত্র অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ কার্লমার্কসের মতে—মানুষকে তাহার সমস্ত রকম অবমাননা এবং বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। রুশো দেখিয়াছিলেন যে মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্মগ্রহণ করে—কিন্তু চারিদিকের বন্ধন তাহাকে পীড়া দেয়। রুশো মুক্তি চাহিয়াছিলেন—পরিণামে হইয়াছিল আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম। মানুষ হিসাবে মানুষের যে স্বাভাবিক অধিকার—দার্শনিক রুশো ইহার প্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিহাস এবং সামাজিক শক্তির বিশেষ সমাবেশ রুশোর মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছিল জাতীয় রাষ্ট্র বিপ্লব। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। কিন্তু এই স্বাধীনতা যুদ্ধের দার্শনিক গুরু ছিলেন রুশো—যাহার নিকট জাতীয়তার রূপ বিশেষ পরিষ্কার ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন জাতি নির্বিশেষে মানুষ হিসাবে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা—যে অধিকার তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে ছিলো। রুশো শোষণ-হীন স্বাধীন মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। রাষ্ট্রীয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল। কার্লমার্কসের নিকট রাজনীতি ও অর্থনীতির নিকটসম্বন্ধ পরিষ্কার ছিল। তিনি ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার সাহায্যে সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা দেখাইয়াছেন। উৎপাদন শক্তির ক্রমবিকাশ এবং যন্ত্র-বিপ্লবের আবির্ভাবের ফলে হইল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। প্রাক্-যন্ত্র বিপ্লব সমাজের উৎপাদন কেন্দ্র এবং রূপ ছিল গ্রামীন। ইহা ফিউডাল সমাজের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। যন্ত্র-বিপ্লবের ফলে নূতন সামাজিক শক্তির পরিবেশ হইল। সহর-কেন্দ্রীকে যান্ত্রিক সভ্যতা এবং বড় আকারের যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে দ্রুত এমন এক শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ হইতে চলিল যাহার নিজস্ব বলিতে কোন ধনসম্পত্তি বা জমি নাই, যাহার নিজ শ্রম বিক্রয় করা ছাড়া কোন সম্পদ নাই। কিন্তু শ্রমের চাহিদা তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না—উহা নির্ভর করে যন্ত্রশিল্পের ব্যক্তিগত মালিকের অভিরুচি এবং লভ্যাংশের উপর। দার্শনিক কার্লমার্কস দেখাইয়াছেন যে সংগবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণী পরিণামে উৎপাদক যন্ত্র অধিকার করিবে এবং সমস্ত শোষণের অবসান ঘটাইয়া মানুষকে রাষ্ট্রবন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। কার্লমার্কসের মতে রাষ্ট্র হইল শ্রেণী শোষণের যন্ত্র মাত্র। যখন সমাজের উৎপাদন যন্ত্র-শক্তি শ্রমিকের করায়ত্ত হইবে—তখন শোষণের প্রয়োজন হইবে না—তাই রাষ্ট্র বৃক্ষচ্যুত পত্রের ন্যায় সমাজ হইতে ঝরিয়া পড়িবে। মধ্যকালীন অবস্থায় শুধু শ্রমিক রাষ্ট্র কিছুদিন থাকিবে। এই মধ্যকালীন সাময়িক শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হইল সমাজকে ধনতন্ত্র ব্যবস্থার আবহাওয়া হইতে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা; এবং প্রতিক্রিয়াশীল প্রাক্তন ধনিকশ্রেণী ব্যবস্থা নির্মূল করা, সাম্যবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আবহাওয়া তৈরী করা। কারণ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন হইলে সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র-হীন সম-সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় না। মানবসমাজ যন্ত্র নহে। তাই মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে শ্রমিক রাষ্ট্র সাময়িক ভিত্তিতে প্রয়োজন হয়। কার্লমার্কস্ চাহিয়াছিলেন প্রতি মানুষকে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সমসুযোগ প্রদান করিতে। তাঁহার মতে প্রতি মানুষ মানুষ হিসাবে আত্মবিকাশের সুযোগ তখনই পাইবে যখন সমাজ হইতে

রাষ্ট্রব্যবস্থা দূর হইবে। সমাজের আত্মবিকাশের পথে এক সময় বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা চিরদিন চলিতে পারে না। শ্রেণী সংগ্রামের অন্তর্নিহিত শক্তির সমাবেশে—এবং সমাজের উৎপাদন শক্তির মালিকানা সাধারণের হইলে বল বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা লোপ পাইবে। তখন মানুষ স্বাধীন হইবে—রাষ্ট্রহীন ন্যায়-সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে—মানুষ স্বাভাবিক আত্মবিকাশের সুযোগ পাইবে—ইহাই কার্লমার্কসের মূলসূত্র।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে আর একজন দার্শনিক কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। প্লেটো দেখিয়াছিলেন নগর রাষ্ট্রে শ্রেণীতে শ্রেণীতে—ধনী নির্ধনে সংঘর্ষ। প্লেটো চাহিয়াছিলেন এই শ্রেণী সংগ্রাম দূর করিতে, এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে।

প্লেটোর নিকটে বর্তমান জগতের অর্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের পার্থক্য ছিল না। তাঁহার রাষ্ট্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রধানতঃ থাকিবে তিনশ্রেণী—মুষ্টিমেয় দার্শনিক, যোদ্ধাশ্রেণী এবং বাণিজ্য ও অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত শ্রেণী। দার্শনিক শ্রেণী সংখ্যায় মুষ্টিমেয়—তাহারাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনায় থাকিবে। সমাজের সংগঠনের মূল দায়িত্ব মূলগত তাহাদের। তাহাদের অধীনে থাকিবে যোদ্ধাশ্রেণী—তাহারা রাষ্ট্র সমাজ রক্ষা করিবে। তাহার পর হইল অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত শ্রেণী—ইহারা শিল্প, কৃষিকার্য এবং জীব পালনের কার্যে নিযুক্ত থাকিবে। ইহারা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকারভুক্ত সর্বনিম্ন শ্রেণী; এবং তাহার নিম্নে থাকিবে সর্ব অধিকারহীন ক্রীতদাস শ্রেণী। ক্রীতদাস শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাহিরে। নাগরিক অধিকারভুক্ত তিন শ্রেণী তাহাদের শ্রেণীগত কার্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবে। এই তিন শ্রেণীর গুণগত সমন্বয় সাধিত হইলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হইবে ও সমস্ত সামাজিক কলহ দূর হইবে। রাষ্ট্রকরায়ত্ত শিক্ষাব্যবস্থাই প্রধানতঃ এই কার্য করিবে। প্লেটোর কম্যুনিজম প্রধানতঃ প্রথম দুই শ্রেণীর জন্য। দার্শনিক শ্রেণী—যাহাদের উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত এবং যোদ্ধাশ্রেণী যাহারা রাষ্ট্ররক্ষার কার্যে নিযুক্ত তাহাদের জন্যই প্লেটো সমসমাজের বিধান দিয়াছেন। অর্থকরী নিযুক্ত শ্রেণী প্লেটোর সাম্যবাদী সমাজের অংশ নহে।

প্লেটোর রাজদার্শনিক এবং যোদ্ধাশ্রেণীর সাম্যবাদে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থান নাই। রাজদার্শনিক যাহাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্পিত তাহাদের ব্যক্তিগত কোন সম্পত্তি ও গৃহ নাই—ব্যক্তিগত পরিবার তাহাদের জন্য নহে। স্থায়ী কোন বিবাহ ব্যবস্থা থাকিবে না। সন্তানের জন্য নরনারীর মিলন সাময়িক মাত্র, রাষ্ট্র নির্দেশিত; রাষ্ট্র মনোনীত, নরনারীর সাময়িক সংযোগের ফলে উৎপাদিত সন্তান রাষ্ট্রের, উহা কোন ব্যক্তির নহে। শিশুর পিতা মাতা কে কেহ তাহা জানিতে পারিবে না। তাই প্রত্যেক নরনারীই রাষ্ট্রের প্রতিটি শিশুকে সমান ভাবে দেখিবে এবং স্নেহ করিবে। প্লেটোর মতে সমস্ত কলহের মূলে রহিয়াছে—স্ত্রী, সন্তান এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা। যাহারা শাসক হইবে—যাহাদের উপর রাষ্ট্রের শুভাশুভ নির্ভর করিবে তাহাদের সমস্ত কলহের ঊর্ধ্বে থাকিতে হইবে। তাই প্লেটো রাজদার্শনিক ও যোদ্ধাশ্রেণীর জন্য সাম্যবাদী সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাষ্ট্র করায়ত্ত শিক্ষার সাহায্যে শৈশব হইতে সমস্ত কলহের ঊর্ধ্বে থাকিবার জন্য, ভবিষ্যৎ রাজদার্শনিক ও যোদ্ধা শিক্ষা পাইবে এবং এই শিক্ষা দূর করিবার জন্যই কম্যুনিজম্। প্রসংগতভাবে ইহা জানা দরকার যে প্লেটোর শ্রেণী বিভাগ খুব দৃঢ় ছিল না—প্রতিভা, জ্ঞান ও শিক্ষার সাহায্যে প্রত্যেকেই শ্রেণী পরিবর্তন করিতে পারে।

প্লেটোর কম্যুনিজম অভিজাত ও শাসকশ্রেণীর জন্য। যাহারা অর্থকরী কার্যে নিযুক্ত ও শ্রমিক শ্রেণী—প্লেটোর সমসমাজে তাহাদের স্থান নাই। প্লেটোর নিকট ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও রাজনীতির সহিত সম্বন্ধ জানা ছিল না। জ্ঞান, বিদ্যা ও গুণ ছিল প্লেটোর নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের মানদণ্ড। উৎপাদন শক্তির অধিকার এবং যন্ত্রশিল্পের বিকাশের সহিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা কার্লমার্কস দিয়াছেন—তাহা প্লেটোর

সাম্যবাদে স্থান পায় নাই। ক্রীতদাস ব্যবস্থাকে প্লেটো স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। প্লেটোর রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থায়ী। প্লেটোর দৃষ্টির সীমানা নগররাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ ছিল। নগররাষ্ট্রের বাহিরে যে আরও মানুষ আছে—আরও দেশ আছে—তাহাদের সহিত নগররাষ্ট্রের সম্পর্ক যুদ্ধ মনোভাব সম্পন্ন। এই মনোভাব স্বাভাবিক। কারণ যে রাষ্ট্রে ক্রীতদাস ব্যবস্থা থাকে—যে রাষ্ট্রের মালিকানা মুষ্টিমেয় রাজনৈতিক ও যোদ্ধাশ্রেণীর হাতে ন্যস্ত—যে সমাজে শ্রমিক শ্রেণী অধিকার হীন—সেই সমাজের বৈদেশিক নীতি যুদ্ধ মনোভাব-সম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক। প্লেটোর নিকটে যাহারা গ্রীস দেশীয় নহে তাহারা বর্বর। কার্লমার্কসের সাম্যবাদ আন্তর্জাতিক। কোন বিশেষ রাষ্ট্রে ইহা সীমাবদ্ধ থাকিবে না। কার্লমার্কসের আদর্শ সমভাবিকার ও সমসুযোগ প্রাপ্ত এই পৃথিবীর বর্ণ ও দেশ নিরপেক্ষ ৩ই শত কোটি লোকের বিশ্বভ্রাতৃত্ব। কার্লমার্কসের নিকট সমস্ত পৃথিবী প্রতি লোকের মাতৃভূমি। কার্লমার্কসের মতবাদ বর্তমান যুগের চিন্তাধারায় বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, এবং শান্তিপূর্ণ প্রগতিশীল মানব সমাজ প্রতিষ্ঠা কার্যে ইহা গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে প্লেটোর কম্যুনিজম্ এর শিক্ষা বিশেষ রূপে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ধনসম্পদের প্রতি মানুষের আসক্তি স্বাভাবিক কিনা এই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সোভিয়েট বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের পরে সুরু হইয়াছিল। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর কম্যুনিজমের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করে। প্লেটো ও কার্লমার্কসের সমন্বয় হওয়া সম্ভব কিনা বহুবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

বৃন্দাবন দাস

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

নদীয়া-লীলায় তুমি ব্যাসদেব
প্রণমি তোমার পায়।
আত্মসত্তা হারাওনি তুমি
বৈষ্ণবী দীনতায়॥
গৌর মহিমা করিলে প্রচার
সগর্বে এই দেশে।
সেই বেশে আজো গৌর বিরাজে
তুমি সাজালে যে বেশে॥
তোমার প্রেমের দিব্যানন্দ
ঘনীভূত ভাগবতে।
তাহাই মোদের পরম পাথেয়
চরম যাত্রা পথে॥
কবিরাজ গুরু তুমি দেশগুরু
নারায়ণী-সুত বীর।
নারায়ণী সেনা পুরোভাগে তব
চির উন্নতশির॥

আবির্ভাব

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নহ নবদ্বীপ মাঝে
গৌড়বংগে গৌরকথা কহিবার কাজে
নব দ্বৈপায়ন করি পাঠাইল বিধি
শ্রীচৈতন্য লীলা ব্যাস—ব্যাস প্রতিনিধি।
শ্রীচৈতন্য ভাগবত অচৈতন্য যুগে
চৈতন্য সন্দর্ভ সুধা। গৌর পদযুগে
নব বংগ ভারতীর অরবিন্দ খানি।
ফুটায়ে তুলিলে ধরি' সপ্তসপ্ত-বাণী
ভ্রমর ঝংকার সম, ছন্দে অলংকারে
নব বৃন্দাবনেশ্বরে ষড়ৈশ্বর্য ভারে
মাধুর্যে নিষিক্ত করি করিলে প্রচার।
ধন্য তুমি, তুমি বিনা সাধ্য অন্য কার?
বৃন্দাবন ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসবে।
পুনঃ পূর্ণ গৌরচন্দ্র আবির্ভূত হবে॥

মৃত্যু দূত

শ্রীসুলতা কর এম, এ,

গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় আমরা বহুলোক এক ধনীর সাজান বৈঠকখানা ঘরে বসে গল্পগুজব করছিলাম। আমরা ছিলাম নিমন্ত্রিত অতিথি। আমাদের মধ্যে ছোট ছেলে, কয়েকজন বৃদ্ধ এবং মহিলারাও ছিলেন। ধনী গৃহের সমাদর আর ভূরিভোজনের শেষে মন আমাদের পরিতৃপ্ত। মন খুলে সবাই মিলে গল্প করছিলাম। কোন একদল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামে যে সব দুর্নাম রটেছিল তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম। এমন সময় তীক্ষ্ণ, কর্কশ বোঁ বোঁ শব্দে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম ঘরের ভিতর ঢুকেছে একটা বড় আকারের পোকা। বন্ বন্ করে ঘরময় ঘুরছে, চারদিকে পাক খাচ্ছে, এক একবার দেয়ালে বসছে। পোকাটা দেখতে একটা মাঝারি ধরনের ফড়িং বা বোলতার মত। শরীরের রং ঘোর কালো, কাঠির মত শক্ত ডানা দুটিও ঠিক তেমনি কালো। শরীরের তুলনায় মাথাটা খুব বড়, গোল আর তাতে রয়েছে দুটো শুঁড়। পেটের তলা থেকে থাবার মত পাগুলো থেকে থেকে বার করছে আর গুটোচ্ছে। মাথা আর পায়ের থাবাগুলো টকটকে লাল, যেন সদ্য মানুষের রক্তে ডুবে এসেছে। গাঢ় কালো শরীরে, টকটকে লাল মাথা আর পা এমন ভীষণ বিদ্রূপ দেখাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন এই ছোট প্রাণীটি কোন দানবপুরের জীব।

অদ্ভুত পোকাটা ক্রমাগত তার মাথা নাড়তে লাগল উপরে নীচে, ডাইনে বাঁয়ে। রক্তমাখান থাবার মত পাগুলো নাচাতে লাগল এপাশে ওপাশে।

থেকে থেকে বিশ্রী কর্কশ শব্দ ক'রে দেয়াল থেকে উড়ে যেতে লাগল, ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল আবার এসে দেয়ালের উপর বসে মাথা আর পা নাচাতে লাগল।

আমরা সবাই ঘরের সব নিমন্ত্রিত অতিথি, এই অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখবামাত্র কি এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠলাম। ঘৃণা, বিদ্বেষ, আর আতঙ্কে মেশান এক অদ্ভুত ভাব মনের মধ্যে জেগে উঠল। পোকাটা যেন এক ঐন্দ্রজালিক মোহে সবাইকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল।

আমরা সবাই একসঙ্গে চীৎকার করতে লাগলাম—"এই ভীষণ পোকাটাকে তাড়িয়ে দাও।" আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরে সরে গিয়ে রুমাল নাড়তে লাগলাম। কেউ সাহস করে পোকাটার সামনে এগিয়ে আসতে পারলাম না।

পোকাটা উড়তে আরম্ভ করলেই আমরা প্রত্যেকে নিজের অজ্ঞাতসারে অনেক দূরে সরে গিয়ে বসতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে কেবল একজন—এক বিদেশী তরুণ যুবক সকলের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগল আর বোকার মত হাসতে লাগল। ব্যাপারটা কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারল না।

আমরা যে কেন এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠছি, কেন এত ছুটাছুটি করছি কিছুই ধারণা করতে পারল না। সে সেই সাংঘাতিক পোকাটাকে একবারও দেখতে পেল না, কানে একবারও তার কর্কশ ভয়াবহ আওয়াজ শুনতে পেল না।

হঠাৎ পোকাটা দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফেরাল। ভয়াবহ দুটো চোখের আগুন ঢালা দৃষ্টি বিদেশী যুবকের মুখে ফেলল। তারপর তীরের মত বেগে ছুটে এসে কুৎসীৎ বীভৎস আওয়াজ করতে করতে তার কপালের উপর বসল, রক্তের মত লাল শুঁড় দুটো বার করে ঠিক কপালের মাঝখানে কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে যুবক মাটিতে চলে পড়ল। মুখের উপর পাংশু বিবর্ণতা ঘনিয়ে এল, অস্ফুট গোঙ্গানীর আওয়াজ করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যুর কোলে চলে পড়ল। আর তারপরের মুহূর্তেই সেই রক্তমাখা বিভীষিকাময়ী সাংঘাতিক পোকা তেমনি আওয়াজ করতে করতে জানলা দিয়ে বাইরের বাগানে বেরিয়ে গেল।

সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের দিকে চেয়ে আমরা সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। বিস্ময়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হ'য়ে তার চলার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভাবতে লাগলাম বিদেশী যুবকের প্রাণ অপহরণ করবার জন্যই কি ছদ্মবেশে এই বিভীষিকাময়ী মৃত্যুদূতের আবির্ভাব হয়েছিল? *

---

* বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

আমাদের ত্রুটী বিচ্যুতি

(১) বেশী কথা বলা

কমলা দাশগুপ্ত

আচ্ছা এই নতুন যুগে এসে অজস্র কথা শুনতে শুনতে কান যখন ঝালাপালা হয় তখন মনে হয়, অতীতের সেই কম কথা বলার প্রয়োজন কি আজ ফুরিয়ে গেছে? তাতো নয়। আজ কেবল বিদেশী শাসনটুকু চলে গেছে বলে বর্তমানের সঙ্গে তাল রেখে চলার দিন এসেছে আর তো কিছুই বদলায়নি। দায়িত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তো তেমনই আছে। বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি-সংগ্রাম আজ শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু জাতি গঠনের দুরূহ দায়িত্ব নিয়ে নীরবে কাজ করার দিন শুরু হয়েছে। কঠিন সাধনায় জাতিকে মানুষ ক'রে তোলার দায়িত্ব আছে যাদের উপর তারা বাচাল হ'লে কে তাদের কথা শুনবে? অবশ্য স্বভাবে বাচাল হয়ে প্রয়োজনে বেশী কথা বলা দোষের নয়। স্থান কাল পাত্রভেদে প্রয়োজন অনুযায়ী কথা কন অথবা বেশী বলে ফেলবার আসল কাজটি যে ক'রে যেতে পারে সে-ই জাতির প্রকৃত সেবা ক'রে যাবে। তা'কে অপ্রয়োজনে বেশী কথা বলা মোটেই সাজে না।

কিন্তু এখন সর্বত্রই চলছে কাজের চেয়ে কথার ফুলঝুরি বেশী। অজস্র বাজে কথা, অবান্তর কথা শুনি যেন নিরর্থক, বিনা প্রয়োজনে। যেমন পথে ঘাটে ট্রামে বাসে, চায়ের দোকানে এবং গায়ে পড়ে উপদেশের উপর বর্ষণে। এই সমস্ত জায়গায় যত কথা নিষ্প্রয়োজনে চলে তাতে মনে হয় জাতির উৎসাহ, উদ্যম অযথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অপচয়ের আতিশয্যের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। যখন প্রতিমুহূর্তটিকে জাতির কাজে লাগানো প্রয়োজন তখন বাধ্যতার আমরা কাজ না ক'রে বাজে আড্ডায়, বেফাঁস সমালোচনায় মত্ত হয়ে জাতির পঙ্গুত্বকে আরো পঙ্গু ক'রে তুলছি।

অথচ বচনবিলাসে অপব্যয়িত এই উৎসাহ উদ্যমকে সঞ্চিত রেখে আমরা প্রত্যেকে যদি সত্যিকার কাজ যৎসামান্যও করতাম, উৎসাহ উদ্যম এইভাবে ক্ষয়িয়ে না দিয়ে নিজের নিজের সাধ্যানুযায়ী কিছু না কিছু কাজে লাগতাম তবে বোধ হয় জাতি আরো কিছু শক্তি কিছু দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারতো। শুধু অন্যকে দোষারোপ করবার প্রলোভনকে সংযত ক'রে যদি আমরা নিজের দিকে দৃষ্টি দিতাম, ভেবে দেখতাম, নিজে কি করিনি, করতে পারিনি, অথচ করা উচিত ছিল, তবে জাতির দুর্দিন সুদিনে পরিণত হ'ত। এই আত্মবিশ্লেষণ মানুষ তখনই করতে পারে, যখন সে বাজে ব'কে energy নষ্ট না ক'রে আপন মনকে প্রশ্ন করবার এবং চিন্তা করবার সুযোগ নিজেকে দেয়। কথার চেয়ে আত্মবিশ্লেষণের ও আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আজ অনেক বেশী। স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের উপর যে নতুন দায়িত্ব এসে পড়েছে তা আমরা কতটুকু পালন করছি সে প্রশ্ন আজ নীরবে নিভৃতে নিজের কাছেই করতে হবে।

একদিন দেখি এক Bus Conductor বিনা প্রয়োজনে কী অজস্র কথাই ব'লে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার জায়গা ক'রে নিজেই বসেছে, তবুও Conductor বলছে "হ্যাঁ বসুন স্যার। অমনি করে আপনাদের বসাবার জন্যেই তো আমি আছি মশাই। ঠিক হয়ে বসুন।" কেউ নেমে যাচ্ছে তো বলছে "দেখবেন দাদা পড়ে যাবেন না যেন, আবার হাসপাতালে দৌড়তে হবে। আপনাদের সুখ সুবিধা দেখবার জন্যেই তো আমি আছি।" ক্রমাগত এমনিতর হাজার হাজার বাজে কথা বক বক ক'রে সে নিজেকে যেন ক্ষয় ক'রে ফেলছিল। এর স্বভাবই বেশী কথা বলা। এর চিন্তা করবার অথবা আত্মবিশ্লেষণ করবার একটা মুহূর্ত সময়ও নেই।

খবরের কাগজে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অনেকে লেখেন, আবার অনেকে আছেন যাঁরা অনেক কথাও বলেন। তাঁরা দুদিকের বহু খবরই রাখেন। দুদিকের বহু দোষ ত্রুটীই জানেন। ঝগড়া করবার সময় নিজের পক্ষের দোষকে গুণে পরিণত করবার জন্য এমন অজস্র বাজে এবং মিথ্যা জেনে শুনেও তাঁরা বলতে পারেন ও লিখতে পারেন যে, তেমন তেমন লোকেরা তাঁদের প্রতি

আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এখানে তাঁদের মিথ্যা বলার art-টাই বড় নয়, আস্থা হারানোটাই বড় কথা। লোকে কথায় বলে খবরের কাগজের Propaganda, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করে। খবরগুলো পড়ে যাবে কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্যতে প্রভাবান্বিত হওয়া ঠিক নয়। সেটা অনেক সময়ে স্বার্থদুষ্ট অথবা অতিসন্ধি-মূলক হয়ে থাকে। তাছাড়া খবরের কাগজে কাজ ক'রে যারা বেশী কথা বলে তাদের লোকে বলে, "ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওদের কথা আমল দিতে নেই, ওরা হচ্ছে পেশাদার বাচাল।"

জীবিকা অর্জন বা পেশার ক্ষেত্রে কিছু লোককে কথা বেশী বলতেই হয়। যেমন জিনিষপত্রের canvassar, তাকে তার জিনিষ বিক্রির জন্য অজস্র বকতে আমরা দেখি। কিন্তু সেও যদি মাত্রা ছাড়িয়ে সঙ্গে অজস্র মিথ্যা কথা ব'লে যায় তখন একই খদ্দের সে দুবার বড় পায়না। তবে অজস্র বকে সে যদি মিথ্যা প্রচার না করে তাহলে লোকে হাসলেও খদ্দের আবার আসবে। খদ্দের মনে করবে লোকটা বেশী কথা বললেও খাঁটি। খাঁটি লোকের কাছে লোকে বার বার যায়। সাচ্চার প্রতি লোকের আছে বিশ্বাস এবং সহানুভূতি। কাজেই এসব ক্ষেত্রে মিথ্যাকে বাদ দিয়ে যদি কেউ বাচাল হয় তবে সেটা খুব দোষের নয়। ঠিক এমনিতর অবস্থা হচ্ছে Insurance agent এর। অপরিমিত অজস্র কথা ব'লে লোকের মন ভিজিয়ে তাদের কাজ আদায় করতে হয়।

Political agent এর অবস্থা অন্যরূপ। তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক নীতি বুঝেশুনে অতিকৌশলে প্রয়োজনে অজস্র কথা অথবা সুমিতকম কথা ব'লে কাজ হাসিল করতে হয়। কিন্তু তিনি যদি বিনা প্রয়োজনে বাচাল হ'ন তবে লোকে তাঁকে হয়ত খেলো চোখে দেখবে, তাঁর কথার কোন মূল্য দেবে না, তাঁর কথায় আস্থা স্থাপন করবেনা। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্যও সফল হবে না।

বক্তা যখন সভামঞ্চে উঠে দাঁড়ান তখন তাঁর মনে হয় যে, যাঁদের সামনে তিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁরা সবাই বোধশক্তিসম্পন্ন নন। কথার যাদু দিয়ে তাঁদের বোধশক্তি জাগাতে হবে, তাঁদের বিশ্বাস করাতে হবে, মনের মধ্যে গভীর দাগ কাটতে হবে, বুঝিয়ে বুঝিয়ে কথা বলতে হবে। তাই বেশীর ভাগ বক্তা হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা অপরিমিতভাবে বলতে থাকেন। আবার বক্তার মধ্যেও তারতম্য আছে। অনেকে অল্প কথায় মনের ভাবটি দরদের সঙ্গে গভীর অনুভূতির সঙ্গে এমন ক'রে বলে যান যে, তাতে শ্রোতার অন্তরে ঝঙ্কার তোলে; তার মনে হয় যেন তারই মনের গভীর কথাটি বক্তার মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। আবার এমন বহু বক্তা আছেন যাঁরা একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর বসতে চান না, বকেই চলেছেন। শ্রোতারা যেন ক্লান্ত কানে আঙুল দিতে চান। বক-বকানিতে বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন, কারো চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে, কেউ ভাবেন কতক্ষণে এই বিরক্তিকর বক্তৃতা শেষ হবে, সেখান থেকে উঠে গিয়ে বাঁচা যাবে। বক্তা কিন্তু বুঝতে পারছেন না—যে তিনি শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করছেন। তাঁর ধারণা তিনি কত ভাল বক্তৃতাই না দিচ্ছেন। এই হচ্ছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশী বকার দোষ।

এই সবগুলি ক্ষেত্রেই হচ্ছে কথার প্রয়োজনে কথা বলা। এ ধরণের ব্যাপারে কিন্তু কথা না বললেই চলে না। তাও পরিমিত চলেই ভাল হয়; এবং মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে। বেশী কথা বললেই সেখানে লোকে অনেকসময়ে মিথ্যা কথা বলে; চালাকি করে; লোক দেখানো কথা ব'লে, নিজেকে বহুবারম্ভে লঘুক্রিয়ার প্রকাশ ক'রে নিজেকে অতিবড় ক'রে দেখাতে গিয়ে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়। কর্মীদের পক্ষে বেশী কথা বলার অভ্যাস অতি মারাত্মক। এগুলিতে তারা হেয় প্রতিপন্ন হয়, খেলো হয়ে যায়। লোকের আস্থা হারায়। তাতে জাতিগঠনের কাজ ব্যাহত হয়।

এমন বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে বেশী কথা বললে বিপদ ঘটে, কাজের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আপন পরিচয় গোপন রেখে যদি কেউ কোন গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাজ করতে যায় তখন তার পক্ষে খুব কম কথা বলাই শ্রেয়। বেশী কথা বলতে গেলেই বেশী বিপদের সম্ভাবনা।

গোপন কাজে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেউ নিঃশব্দ হ'য়ে থাকে আবার কেউ প্রাণপণ কথা ব'লে যায়। যে প্রাণপণ কথা বলে তার চালাকি অনেক সময় ধরা পড়ে যায়, কারণ সে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বড্ড বেশী। আমরা দেখেছি ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুপ্ত সমিতিগুলি নীরবে নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ ক'রে গেছে। তাঁরা বেশী কথা বলতে শেখেননি, শুধু নীরবে কাজ করতেই শিখেছিলেন। তাই তাঁরা পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে শেখাতে পেরেছিলেন। সে আমলের কর্মীদের বেশী কথা বললে বিশ্বাস করা যেতো না। গুপ্তসমিতির গুরুত্বপূর্ণ কাজে বাচালদের স্থান ছিল না। এই কথাটা সব গোপন কাজের পক্ষেই প্রযোজ্য।

গোপন কাজ ছাড়াও কর্মীরা যিনি যেখানে যে কাজ করেন, সেখানে যদি গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রয়োজন মত পরিমিত কথা বলেন তবে তাঁরা লোকের বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন, বেশী আস্থা অর্জন করতে পারেন। অধিক কথা বললে লোকে সেখানে ছ্যাবলা মনে করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, হাসিঠাট্টা করলেই ছ্যাবলামী করা হয় না। কিন্তু জনসাধারণের সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণ করতে গেলেই বাচালতার প্রয়োজন নেই। বরং লোকের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে স্বল্পভাষী হওয়া প্রয়োজন। বাচাল বা ছ্যাবলাকে লোকে খুব গোপন কথা বিশ্বাস ক'রে বলে না। কথা গোপন রাখার যোগ্যতা সাধারণতঃ নেই বলেই লোকের ধারণা।

আরেকদিকে দেখা যায় যে, প্রথম আলাপ, প্রথম পরিচয়ে বেশী কথা বললে লোকের ধারণা খারাপ হ'য়ে যায়। প্রথমেই আস্থা হারিয়ে ফেলে। প্রথম পরিচয়ের এই ধারণার ছাপ মুছে ফেলা পরে কঠিন হয়ে পড়ে।

আবার কারো যদি কোন কারণে মনে গভীর দুঃখ বা আঘাত থাকে তখন তার কাছে বেশী কথা না বলে, দু একটা কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করলে সে যে তার দুঃখে সমব্যথী ও দরদী একথাটাই বেশী প্রকাশ পায়। আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতে অল্পকথাই শোভনীয় ও ফলপ্রদ।

অতিশোকের মধ্যে কথা বললে শোককে অসম্মান করা হয়। এখানে নীরব থাকা ছাড়া আর কিছু করারই থাকেনা। সান্ত্বনার কোন ভাষাই তো সেখানে নেই।

কম বা বেশী কথা বলার বিশেষ কোন মাপকাঠি নেই; কোন সীমারেখা টানা যায় না। প্রয়োজনে দুটোই ভাল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে যখন যা বলা দরকার তা বলা যেতে পারে। তাকে বেশী কথা বলা বা বাচালতা বলা চলে না। সে তো বিবেচনা করেই মেপেজুখে কথা বলছে। আর বিনা প্রয়োজনে যারা স্থান কাল পাত্র বিচার না ক'রে ক্রমাগত অনর্থক অপরিমিত কথা ব'লে যায় তাদেরই আমরা বাচাল বলি। এই বেশী কথা বলাটাই দূষনীয় ও বর্জনীয়। আজ যখন জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার দায়িত্ব দেশবাসী সকলেরই তখন এই অনিষ্টকর জাতীয় ত্রুটী থেকে আমাদের সর্বপ্রযত্নে মুক্ত হ'তে হবে। নতুবা জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার।*

*কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে গৃহীত।

জীবন

বারীন্ দাশগুপ্ত

অপরাজিতার দিন যতো আসে তার ভিতর তার সমস্ত মন নিয়ে কোন দিক দিয়েই যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। যে সম্ভবকে সে গ্রহণ কোরেছে অসম্ভব যেন ক্রমশই অপরাজিতাকে একটা কঠিন সমস্যার ব্যাকুলতায় ভরে দিচ্ছে।

মেয়েদের পাওয়ার ভিতরই তো রোয়েছে সার্থকতার পরিপূর্ণতা তা অপরাজিতা ভালো কোরেই তো জানে। এও সে জানে যে এই পরিপূর্ণতাকে সর্বাংগীন পরিপুষ্ট কোরে তোলাটাই হোল মেয়েদের বড় রকমের কৃতিত্ব ও দান। জীবনও সেই বেষ্টনীর মাঝে থেকে আপনার জীবনের আনন্দ গানের সুর ছন্দ-মধুর কোরে তোলে। তা জেনেও বর্তমান আবর্তনের ভিতর থেকে অপরাজিতা এখনও তার ব্যক্তি জীবনকে গড়ে নিতে পারে নাই। অবিচ্ছিন্ন শান্তি যেন তার সৃজনীশক্তির বাইরে। তাই তো অপরাজিতার আত্মপ্রকাশ কতো সঙ্কুচিত ; মনেরও সেখানে কতো বিচ্যুতি। অথচ পিতা মাতার অযাচিত আশীর্বাদের ভিতর দিয়ে নতুন সংসার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে কোন নালিশ অপরাজিতার নাই নাইও কোন অভিমান ও অভিযোগ।

স্বামীর কাছে স্ত্রীর যা-কিছু দাবী কোরবার, যে অধিকার চিরন্তন মুখর হোয়ে আছে সে সম্বন্ধকে প্রাণবন্ত কোরে নেবার অপ্রতিহত পথ অনাবিলভাবে পড়ে আছে সেখানে অপরাজিতার বাঁধাহীন গতি অবারিত ও নির্মল ; অভাবের কোন ছায়া সেখানে নাই। সহজ ও সম্পূর্ণ ও কতো পরিষ্কার। কিন্তু তবুও অপরাজিতা যেন একলা—একেবারেই একলা।

স্বামী পেয়েছে অপরাজিতা। এই পাওয়ার অনির্বচনীয়তার কাছে সে নিজের আনন্দ-ব্যাকুলতায় অহরহ পাচ্ছে বেদনার আঘাত। সাধনার কোমলতা কতোই না দুর্লভ।

স্বামীকে অপরাজিতা স্বীকার কোরে নিয়েছে অভিভাবকদের অনুশাসনে কিন্তু সেখানে অপরাজিতার মনের কোন সম্মতিই ছিল না। অভিভাবকদের সদিচ্ছায় মনের রুচি হয়তো বা কিছুটা সম্মতি পেয়েছিল কিন্তু সেইটাই যে সব নয় ব্যক্তিগত রুচিরও যে দাম আছে এবং প্রয়োজনের তা স্বীকার কেউ করে না এক্ষেত্রেও তাই হোল।

সিঁথির সিঁদুর পরিয়ে তাকে অক্ষয় ও অমর রাখবার যে উৎসবের প্রভূত আয়োজন হোয়েছিল তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচিকে প্রকাশ কোরতে গিয়েও পারে নাই তাই তো মেনে নিতে বাধ্য হোয়েছে অপরাজিতা।

মেয়েরা নিজেদের বিচার কোরতে পারে না এই সত্যকে অপূর্ব কোরে চালিয়ে নেওয়া হোচ্ছে। রুচি ও ইচ্ছা এইখানেই কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে যায়। অথচ এ শুকিয়ে যাওয়া রুচির মন নিয়েই সংসার কোরতে হয়। পিছনের একটা ইংগিত এই ভাবেই থাকে যে ছেলে-পিলের মা হোলেই সাবলীলতা এসে যাবে। কিন্তু দেহটাই সব নয়—মা হওয়াটাই মনের স্বচ্ছন্দকে প্রমাণ করে না।.....

.....বিয়ের পর অপরাজিতার দিনগুলো এমনি গড়িয়ে চোলল। স্বামী সত্যপ্রকাশ অপরাজিতার কাছ হোতে তার পাওনা নিয়ত উপেক্ষিত হোলেও নিজের কাছে এইটুকুনই কৈফিয়ৎ পরিস্ফুট কোরে তোলে যে কোথায় যেন তার নিজেরই ভুল রোয়েছে বুঝবার। সত্যপ্রকাশ খোঁজে নিগূঢ় অন্তরের জাগরণের ভিতর কোথাও তার ফাঁক আছে কি না। বিচার করে অভিমান কোরে নয়—অপরাজিতাকে আত্মজাগরণের উপর-প্রতিষ্ঠিত কোরে।.....

.....দিনের পর দিন তীড় কোরে আসে—আসে বৎসর তারপরেও আসে আবার দিন—আবার মাস...

উভয় উভয়কে চেনে কিন্তু জানে কি না সে পরিচয় বাইরের লোকের কাছে ধরা না পড়লেও অপরাজিতা সত্যপ্রকাশকে প্রেমের নিরাপদ আসনে বসিয়ে দিন-গুলো গ্রহণ কোরতে পারে নাই। মন তার বিক্ষুব্ধ

হোয়ে আছে সত্যপ্রকাশের বিরুদ্ধে নয় সত্যপ্রকাশের স্বামীত্বের উপর। সত্যপ্রকাশ তা বুঝতে পেরেও এই দুরত্বকে সে পরিপূর্ণভাবে অবহেলা কোরে বন্ধনের সৌন্দর্যকে আবার নতুন কোরে আবিষ্কার কোরতে সুরু করে।

সত্যপ্রকাশ ভাবে মেয়েরা তাদের স্বামীর কাছ হোতে মনের, দেহের ও সাংসারিক সকল প্রকার খুঁটি-নাটির ভিতর দিয়ে সবখানি পেয়েও যেন পূর্ণ হোতে পারে না, পাওয়ার আকিঞ্চন বুভুক্ষুর পূর্ণতা নিয়েই সজীব হোয়ে থাকে। সত্যপ্রকাশ অপরাজিতার কাছে নবতম সৌন্দর্যের সৃষ্টির আবেদন নিয়ে যেন হোয়ে উঠবার জন্য মুখর হোয়ে ওঠে।

সংসারটি এদের ছোট্ট হোলেও এমনি ছন্দের ভিতর দিয়ে অপরাজিতার ও সত্যপ্রকাশের দিনগুলো এগিয়ে চোলেছে কিন্তু কেউ কাউকেও মনের ব্যাকুলতা নিয়ে নিবিড় কোরে নিতে পারছে না। সত্যপ্রকাশ পেয়েও পায় না অপরাজিতা পেয়েও তাকে গ্রহণ কোরতে মনের ভিতর নানাপ্রকার চিন্তার আলোড়নে স্তব্ধ হোয়ে ওঠে। নিত্য রাত্র অপরাজিতাকে ওর ফেলে আসা প্রতিটি দিনের কতো কথা ও কাহিনীর দিকে। সে কাহিনী পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় অপরাজিতার ছিল সুন্দর চঞ্চলতা। সে চঞ্চলতায় আজও সে উন্মুখ।

বিকাশের সংগে অপরাজিতার পরিচয় অনেক দিনের।.....তখন ওরা দুজনা দুজনাকে চিনত মাত্র। তারপর ধীরে ধীরে দিনের অবস্থার আবর্তনে ওরা যেখানে এসে পৌছল ওরা ওদের জানতে সুরু কোরল—আন্তরিকতায় ভরে উঠল ওদের মন ও প্রাণ। ভালোবাসার গভীর সত্যটিকে ওরা আবিষ্কার কোরে ফেলল।

উভয় উভয়কে জীবনের অনন্তরূপের মধ্যে পাওয়ার ব্যাকুল চঞ্চলতায় ব্যগ্র হোয়ে ওঠে। মহান সৃষ্টিকে ওরা ওদের অন্তরাত্মার অক্লান্ত তপস্যায় পরিপূর্ণ কোরে তোলে। প্রেমের সেই মহতী সৃষ্টির উপর নির্ভর কোরে মনে দাবী নিয়ে ওরা দুজনে ওদের ভবিষ্যতের দিনগুলো রঙিন কোরে তোলবার চেষ্টায় থাকে।

উচ্ছ্বসিত মন নিয়ে ওরা কেবল অপেক্ষা ক'রে সেই একটি দিনের জন্য। ওরা ভাবে সেই দিনটি এই অপরিমেয় প্রেমের নিষ্ঠাকে স্বীকার কোরতেই হবে।

কিন্তু বিকাশ ছিল নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত গেরস্থ ঘরের অতি সাধারণ ছেলে।

সমাজের কাছে বিকাশের পরিচয় দেবার কিছুই নেই। পকেটে নাই একটা ব্যাংকের পাশ বই—নাই দুয়ারে কোন গাড়ী। আছে শুধু কয়েকটা ডিগ্রি। বর্তমান সমাজে ডিগ্রীর বাজার নাই তাই বিকোয় না। ডিগ্রীর মূলধনে জীবন বরং দেউলে হয়। অপরাজিতা ধনী।

অর্থের স্বচ্ছলতায় সমাজে ওরা কৃতী।

এইখানে বিকাশ নিজেকে খুবই চতুর ও একলা মনে কোরত অথচ বিকাশের ভালোবাসা অর্থের দারিদ্র্যের কাছে হার মানতে চায় না বোলেই গভীর ও জমাট বাঁধতে কোন অন্তরায় ছিল না। অবস্থার অনুশাসন নিয়ে ভালোবাসার জন্ম হয় না বোলেই ভালোবাসার পথ চলে অন্তরের অন্তরতম সীমায় থেকে আপন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে—পাওয়ার গভীরতম ব্যাকুলতায় মন উপচে উঠতে চায় সেখান থেকেই—বিকাশ ভাবে।

আরো ভাবে আগামী জীবনের দিনগুলো বর্তমানের বাস্তবতায় টেনে এনে। বর্তমানের এই অনাবিল আনন্দ ও উদ্দীপনার দীপ্তি কি থাকবে তখন? এখন যেটা সেটা তো একটা নিরেট উচ্ছ্বাসমাত্র; এটা তো একটা লোভ ও পিপাসা।

অপরাজিতাকে বিকাশ নানা কথার প্রসংগে মনের এই জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরে।

অপরাজিতা বিকাশের মনের দুয়ারে মাঝে মাঝে সজোরে আঘাত কোরে সরলভাবে জবাব দেয়—বলে, "নানা পরিকল্পনায় পাওয়া যখন নিবিড় পূর্ণতায় জেগে ওঠে আর্থিক স্বচ্ছলতার মূল্য সমাজের কাছে থাকলেও যাদের মন সত্যিকারের আবেদন নিয়ে আদান-প্রদান মূর্ত হোয়ে ওঠে তাদের কোন দিনই মুসড়ে যায়তে পারে না বিকাশ—সেইটাই সুন্দর।"

বিকাশ অপরাজিতার কথার প্রতিবাদ কোরে জবাব দিল,—"স্বপ্নের আঘাত যদি প্রবল হয় তখন—"

"তখনকার কথা" অপরাজিতা তার মনোবৃত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরবার মনোভাব নিয়ে উত্তর কোরল, —

"মানুষের বেঁচে থাকবার দিনগুলোর ভিতর নানা-প্রকার ঝগড়া-বিসম্বাদ তো থাকবেই সার্থকতাকে গ্রহণ কোরবার জন্য। তোমরা অর্থাৎ পুরুষরা চিরকালই বাস্তবতার জন্য বেশী চঞ্চল, অবশ্য তা অত্যন্ত প্রয়োজনের। কারণ বাইরের পৃথিবীর যত সব ব্যস্ততার ভিতর তোমাদের জড়িয়ে থাকতে হয়। যে ভালোবাসাকে ব্যক্তিগত সৃজনীশক্তির দ্বারা আমরা প্রকৃষ্ট কোরে তুলবার জন্য ব্যগ্র হই সেখানে আমাদের পাওয়া একটা সীমায় এসে পৌঁছলেও ভালোবাসার আদর্শ সে তো চির উন্নত। তবে সেখানে সুখ। প্রয়োজনের তাগাদায় ভালোবাসার যে আনন্দ সৃষ্টি তার কি মৃত্যু হয়? হোতে পারে না—। মানুষ সে নারী বা পুরুষ যেই হোক নিজের স্থিতির সম্বন্ধে নেউলে হোয়ে যেতো, কোন স্থিতিই থাকত না তা হোলে। মায়ের বুকের স্তন থেকেই যে সে ভালোবাসার উৎস।—"

—"তুমি কি বোলতে চাও অপরাজিতা যে ভালোবাসারও প্রেমের জীবন কোন দিন কোন সময়ের জন্যও স্তিমিত হয় না বা হোয়ে আসে না—", বিকাশ প্রশ্ন কোরল।

একটু গর্বের সংগে অপরাজিতা জবাব দিল,—"না, কোন কালে কোন সময়েই তা হয় না কারণ হওয়া সম্ভব নয়। যদি কারো সে রকম মনের অবস্থা হয়, জানবে সে নিজেকেই নিজে হারিয়ে ফেলেছে, মনটা তার শূন্য একেবারে শূন্য।

জান বিকাশ সংসারের বাস্তবের যে জড়তা তার নিষ্পেষণে নিজেকে আতুর কোরে ফেলে, তখন কতো দীর্ঘনিঃশ্বাস অনুশোচনাও কম নয়। সেইখানেই যত ভুল। মাটির সংগে গাছের সম্বন্ধ যখন ও যতোদিন থাকে ততোদিন তারা উভয়েই চির প্রফুল্ল। যে ভুল গাছে কাঁটে সেইটাই হোল ওদের ভালোবাসার বিকাশ। —আর আমরা মেয়েরা বয়েস নিয়ে বড় হই দু'দিন পরে পাই স্বামী—তারপর সন্তান তারপর সংসার এই যে পরিস্থিতি এসব কিছুই তারা আপন দরদ দিয়ে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠাও কম থাকে না তার ভিতর। মেয়েদের মনের এই যে খোরাক জুগিয়ে দেয় ঐ ভালোবাসা-ঐ প্রেম। অস্বীকার করবার বা প্রতিবাদ করবার কোন যুক্তিই নাই এখানে বুঝলে—"

বিকাশ অবহিত চিত্তে শুনছিল অপরাজিতার কথা, শেষ হোতে না হোতেই বোলে উঠল,—"কিন্তু—"

"জানতাম বিকাশ তুমি একটু অসহিষ্ণু হোয়ে এমনি কিছু বোলবে—" অপরাজিতা চোখের তারাদুটো বিকাশের দিকে নিবদ্ধ কোরে উত্তর কোরল,—"তোমার ঐ কিন্তুর জবাব হোল—মেয়েদের জগতটা হোল পুরুষের চাইতে অনেক ছোট। বর্তমানে মেয়েরা পুরুষের জগতের দিকে পা' বাড়াচ্ছে, অংশ দাবী কোরছে আর্থিক স্বচ্ছলতাকে পাবার জন্য যতটা নয় তার চাইতে বেশী অধিকারের মনোবৃত্তি নিয়ে। এ মনোবৃত্তি এত বড় ভুল যার জন্য মেয়েদের সংসার জগতটিকে তারা আরো ক্ষুদ্র কোরে ফেলেছে। মেয়েরা ইচ্ছে কোরে ভুলতে চায় যে তাদের হাতে রোয়েছে দেবালয়ের পুষ্পপত্র, তাদের হাতে যে রোয়েছে বরণ ডালো আঁচলে চাবীর পুঞ্জ তারাই যে উৎপাদনের আধার।—একথা ভুললে চোলবে কেন বরং ভোলাটা পাপ। ভালোবাসার সৃষ্টি একমাত্র আমাদের হাতেই; তোমরা পুরুষ আমাদের সেই ভালোবাসার দুয়ারে চিরকালের অতিথি অথচ আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে তোমাদের কতোই না প্রয়োজনের—"

"তা গ্রহণ কোরে নিলেও" বিকাশ একটু চঞ্চলতা নিয়ে বোলল, "বাস্তবের কথাই তোমাকে বলছিলাম অপরাজিতা—।"

—"হা, সেই কথাই তো বলছিলাম, যে ঘরে তোমাদের জীবনের সংসার তাকে বড় ও মহৎ কোরবার যে ব্যাকুলতা সেখানে তোমরা চাও একটা সজাগ প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত পরিচয়—। জীবন নিংড়িয়ে

সেখানে অকাতরে দুর্লভ পরিশ্রমকেও স্বীকার কোরতে কুণ্ঠা বোধ কর না। এই জায়গায় তোমরা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে বাইরের জগতের কাছে জড়িয়ে যাও, যেতে বাধ্য হও। মনে করো তোমরা সে ভালোবাসাকে বুঝি হারিয়ে ফেলেছ—দুর্বলতা তাই তো বেড়ে ওঠে। তোমাদের কাছ হোতে কিছু না পেলেও আমরা প্রতীক্ষায় আনকে কতো পূর্ণ। ভালোবাসায় কোন শুদ্ধতা নাই বিকাশ। কতোকগুলো ছেলে-পিলের মা-বাবা হোলেই তাকে ভালোবাসা বলেনা।"

"আমি যে খুবই সাধারণ অপরাজিতা", একটা আবেগের সুরে বিকাশ অপরাজিতাকে বোলল।

অপরাজিতা বুঝল কোথায় বিকাশের দুর্বলতা। একটু মৃদু হেসে উত্তর দিল, "সাধারণ তো সকলেই বিকাশ—। সেই সাধারণকে ব্যক্তিগত কৃষ্টির উপর দাঁড় করিয়ে তাকে অসাধারণ বানাতে হয়।"

বিকাশ দৃষ্টির ঘনতা নিয়ে অপরাজিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। গম্ভীর হোয়ে ওঠে।

বিকাশ ও অপরাজিতা উভয় উভয়কে জানার ভিতর দিয়ে প্রেমের প্রেরণায় যে গ্রন্থীকে বিরাট সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কোরবার জন্য প্রাণের যে আকর্ষণ অবিচলিত ভাবে সকল সঙ্কীর্ণতা উপেক্ষা কোরে সৌন্দর্যে উদ্বুদ্ধ হোয়ে উঠেছিল। জীবনের সার্থকতার মহিমায় সত্যকে দুঃখ-কষ্টের উপরে যে জ্যোতীর্ময় রূপ দিতে চেয়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল এক বিরাট বাধা।

জীবনের শ্রেয় বোধের উপর মানুষের সতীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকে সেখানে বিকাশের সাংসারিক সচ্ছলতার ছিসেব নিক্তি দিয়ে নির্দ্ধারণ করার যথার্থ কোন যুক্তি নাই। অপরাজিতা ব্যক্ত কোরল তার এই মতবাদ তার বন্ধুবান্ধবদের কাছে।—ধীরে ধীরে এই সংবাদটি এসে পৌঁছিল অপরাজিতার মা নিরুপমা দেবীর কাছে। লেখাপড়া শিখেছে অপরাজিতা। বাইরের আলো-বাতাস গ্রহণ সে কোরেছে নির্বিবাদে। নিরুপমা দেবী একমাত্র মেয়ে অপরাজিতার মনের চাহিদাকে সম্মান দিবার অভিপ্রায়ে একদিন সুযোগ বুঝে কর্তা নিখিলেশ-বাবুর কাছে সব কিছুই ব্যক্ত কোরলেন।

নিখিলেশবাবু রাশভারি মানুষ। মেয়ের জন্য তার অগাধ মমতা ও ভালোবাসা প্রচুর হোয়েই থাকে। কোন দ্বিধা নাই কোন সংকোচ নাই নির্বিবাদে অপরাজিতার জন্য নিখিলেশবাবু অনেক শাসনকে শিথিল কোরে দিয়েছেন। যুক্তি অপরাজিতা সুন্দর হোক শিক্ষায় বড় হোক অপরিমের জ্ঞানে।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, "নিরু, বয়সের সংগে সংগে যেমন 'জিতা' এগিয়ে এসেছে সেখানে ওকে এই ভাবে বুঝতে চাই নি কল্পনাও করিনি। বিকাশকে আমি ভালো কোরে চিনি না তাই বোলে সে যে ভাল ছেলে নয় এ কথা বলা আমার পাপ—। জিতা, নিজের ভবিষ্যৎকে মনে কোরলো নিজেই ভালো কোরে চিনেছে।"...

"কি আর করা বল। বয়েস হোয়েছে বুঝতেও তো শিখেছে—" নিরুপমা দেবী বোললেন।

—"ভুল করো না নিরু", নিখিলেশবাবু চশমা জোড়া চোখ থেকে নামিয়ে চশমার হাতল দুটো একত্র কোরে ধরে নিয়ে জবাব দিলেন,—"বুঝতে ও শিখে নি। যেটা শিখেছে তুমি বোলছ সেটা যৌবনের উদ্দামতাকে। যে আনন্দসুখকে জিতা পেতে চাইছে সেটা একমাত্র বর্ত্তমানকে, তারপরের দিনটি ওদের গ্রহণ কোরবার ক্ষমতা নাই। মানুষ বাঁচতে চায় এই তো সত্য, শুধু আজকের মুহূর্তগুলো নিয়ে থাকলে সে সত্যকে অপমান করা হয়।"

নিরুপমা দেবী কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বোললেন, —"আমি জিতার মা কিন্তু মেয়েমানুষ তো, তাই জিতার কথা যতোই ভাবি ব্যাকুলতায় অস্থির হোয়ে ওঠে আমার মন।"

"কিন্তু জেনো নিরু, আমি তার বাবা—কিন্তু আমিও পুরুষ—", বোলেই নিতান্তই গম্ভীর হোয়ে উঠলেন নিখিলেশবাবু আর কোন কথা বোললেন না।

পর পর কতোকগুলো মাস পার হোয়ে গেল। অপরাজিতা আর বিকাশের দিনগুলো আড়াল থেকে

বাইরে এসে উপস্থিত হোল—বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে উৎসাহিত সমর্থন পেলেও বাড়ীতে মা-বাবার কাছ থেকে কোন কথাই সে শুনতে পেল না।

বেদনায় ভরে উঠল অপরাজিতার মন। একটা ব্যবস্থার সীমায় এসে দাঁড়াতে চাইল অপরাজিতা, সেখানে বিকাশকে বিয়োগ কোরে নয় বিকাশকে নিয়েই।

নিস্তেজ চলতি দিনগুলোর মাঝে অপরাজিতা নিরুপমা দেবীকে আন্তরিক আবেগ নিয়ে ডাকল—"মা।"

নিরুপমা দেবীও ভাবছিলেন অনেক দিন হোল—এইরূপ ভাবে অপরাজিতা একদিন হয়তো নিজেকে অনাবৃত কোরে ফেলবে। বুঝতে পারলেন এই 'মা' ডাকের পিছনে রোয়েছে বিরাট এক আবেদন। জবাব দিলেন তিনি,—

"মা, ভবিষ্যতের পিছনে মানুষের থাকে কতো অবিশ্বাস কিন্তু তথাপিও সে ভবিষ্যতকে গড়বার জন্য কতো বিবেচনা কতো বিতর্ক। মেয়েরা বয়েস নিয়ে বড় হোয়ে উঠলে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে থাকে মস্ত বড় উৎকণ্ঠা। সে উৎকণ্ঠার পুরো দায়িত্ব একমাত্র বাবা-মাই গ্রহণ কোরে থাকে, অনাবিল সুখে যাতে মেয়েরা বিয়ের পর অতিবাহিত কোরতে পারে সেইটাই হয় কামনার। ভিটে-মাটী বিক্রী কোরেও মেয়েদের আগামী কালের দিনগুলো নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন রাখবার জন্য কতোই না পরিশ্রম করে, ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না। সেখানে মেয়েরা বড় হোয়ে যখন সব কিছু বুঝতে শেখে মনে করে কত বড় সুবিবেচকই না হোয়েছে তারা। তখন তারা বর্তমানকেই চেনে ভবিষ্যৎকে পারে না গড়তে। এটাই হোচ্ছে বয়সের নেশা—..." অপরাজিতা একটু গম্ভীর মনোভাব নিয়ে জবাব কোরল,—

"অর্থের স্বচ্ছলতাই কি মানুষের মন সৃষ্টি করে? তার কি আর কোন আশ্রয়ের বস্তু নেই বলতে চাও? সাংসারিক জীবনের সুস্পষ্ট উচ্চারণই হোল মনের আসন প্রদান নিয়ে যে মনের সৃষ্টি হয় সেখানে অর্থের স্থান কতটুকু মা? আর সে অর্থকে আমি ঘৃণা করি। ছেলেটি বিয়ে কোরে স্ত্রীকে দুবেলা খেতে দিতে পারবে কিনা এ চিন্তা যে ভাবে তোমাদের ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলে যার জন্য ছেলের সত্যিকারের কৃষ্টিকে আদৌ স্থান দাও না। "ছেলে কি করে..." এই জিজ্ঞেসগুলো তোমাদের কাছে এমন ভাবে মুখ্য হোয়ে ওঠে যার জন্য মানুষের ব্যক্তিত্বকেই শুধু অবজ্ঞা করো না মানুষের জীবনের পরমকেও অশ্রদ্ধা কোরে থাক। বাজারে ছেলে খুঁজতে গিয়ে প্রথম বিচারে তোমাদের সত্যিই একটা অবহেলার ইঙ্গিত থাকে বৈ কি?"

"জীবন যাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই মানুষের বাস্তবের সংগে লড়াই কোরতে হয় বোলেই অভিযাত্রকদের দৃষ্টি ঐ পথ দিয়েই চলে।"—নিরুপমা দেবী একটু কঠিন হোয়ে বোললেন।

অপরাজিতা তার মার এমনি কথার উপর একটু মৃদু হেসে উত্তর কোরল,—"সাংসারিক স্বচ্ছলতার দাম থাকলেও যে মেয়ে যাকে স্বামী বোলে গ্রহণ কোরে নিল সেখানে স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতার অথবা তাদের গড়িয়ে চলার জীবনে নানা প্রকার অভাব অনটন এগুলো যদি মেয়েরা অন্তরের সংগে গ্রহণ কোরতেই না পারল, আঘাতের ওজন পূর্ণ ভাবে তুলে নিতে না পারল সেখানে মেয়েদের কোন শিক্ষাই যে হয় নি তারই প্রমাণ হয়। পিতামাতার আর্থিক আভিজাত্যের উপর যে সব মেয়েরা উড়ে বেড়ায় সেটাই যে সব এ ভাবলে চোলবে কেন? অর্থ বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হোলে সেই অর্থ আনে ভোগের উপর অমার্জিত কুৎসিত একটা বিলাসিতা। বিয়ের বাজারে ভাল ছেলের মাপকাঠি মাইনে পাওয়ার উপর নির্ভর কোরলে মনে হয় জীবনের সম্বন্ধ যেন সীমাবদ্ধ এবং একটা চুক্তি মাথা তুলে দাঁড়ায়।—মা,"—একটা নিঃশ্বাস গভীরভাবে টেনে নিয়ে—ছাড়বার সংগে সংগে বোলল, "তোমাদের কাছে উপার্জনটাই কি বড়?"

নিরুপমা দেবী কথার প্রসংগ আর বাড়াইতে চাইলেন না। কথা শেষ কোরবার জন্য একটু চঞ্চল হোয়ে উঠলেন, বোললেন—"উপার্জনটা বড় না হোলেও মেয়েদের পাত্রস্থ কোরবার বেলায় এটা অত্যন্ত

প্রয়োজনের, শরীরের সঙ্গে মন যেমন বুঝলে—" বোলেই চুপ কোরে রইলেন।

অপরাজিতাও কিছুক্ষণ চুপ কোরে রইল। কি আর বোলবে ভেবে পায় না। একটু পরে স্থির মনে আবার জিজ্ঞেস কোরল,—

"মা, বাবাও কি এই কথাই বলেন"—

তিনি কি বলেন তা তুমি নিজে গিয়েই শুনলে পারতে—ভালোও হোত। ...হাঁ তিনিও এই কথাই বোলেছেন। বিয়ের পর স্বামীর হাত ধরে মেয়ের মা-বাবার দিকে যদি প্রত্যাশা কোরতে হয় সেটা খুবই অপমানের। মেয়ের ও ছেলের। আর শোন তোমাকে পাত্রস্থ কোরবার ইচ্ছের তিনি যে চেষ্টা কোরেছেন তার দিনও এগিয়ে আসছে সেখানে বিকাশকে তিনি অবহেলা করেন নি, তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি তোমার চাইতে বেশী ভালো বুঝেছেন..."

সত্যিই হোলও তাই। নিখিলেশবাবু একমাত্র মেয়েকে খুব ঘটা কোরে বিয়ে দিলেন।

সত্যপ্রকাশ ভালো চাকরী করে ছেলেও তেমনি। পৈত্রিক সম্পত্তির পরিচয়ও রোয়েছে যথেষ্ট। সত্যপ্রকাশের পরিচয়ের বাজারে সেটাও কম নয়।

অপরাজিতাকে কাছে ডেকে এনে নিখিলেশবাবু আদর কোরে বললেন,—

"জিতা, আমার আজকের কথা তোমার রুচির বাইরে হোলেও তোমাকে যে আঘাত দিলাম প্রয়োজন মনে কোরেই দিতে বাধ্য হোলাম সেখানে ব্যথা আমারও কম লাগে নি। কিন্তু তোমার মনের আমি বাবা হোয়ে আমার যে অধিকার বা দাবী আছে তা আমারই সম্পত্তি তাকে আমার রক্ষা কোরতেই হয় এটা আমার কর্তব্য। মা, মেয়েদের জীবন ভয়ানক একটী বস্তু। সংসার গড়ে মেয়েদের হাতেই, আবার ভাংগে সেই মেয়েদের হাতেই। লেখাপড়ার চিতর যে শিক্ষা ও জ্ঞান মেয়েরা পেল সাংসারিক জীবনকে সুষ্ঠু ও পুষ্ট রাখবার জন্য ওগুলো হোল উপকরণ মাত্র। একদিন তুমি বোলেছিলে এত লেখা পড়ার কি প্রয়োজন মেয়েদের? জবাব দিইনি—শুধু তোমার পড়াশুনায় উৎসাহ দিয়েছি। আজ দিচ্ছি—বুকের যে দুধ খাইয়ে সন্তানকে বড় কোরবার চেষ্টা কোরবে তোমার এই লেখা পড়ার শিক্ষা কোরবে সাহায্য যে হাতা দিয়ে ভাতের হাড়ী নাড়বে সেখানেও তেমনি, নিজে অভুক্ত থেকেও সংসারের সকলকে খাইয়ে মেয়েরা যে তৃপ্তি পায় সেখানেও সেই শিক্ষার দান। বর্তমানের দিনে মেয়েরা মনে করে দু'পা বেশ এগিয়েছে কিন্তু বিশ্লেষণ কোরে দেখ তিন পা তারা পিছিয়ে গেছে। লালসাই বড় না মা—শিক্ষাই বড়।

অপরাজিতার জীবনের স্রোত ঘুরে চোলল অপর দিকে, বাঁধতে সুরু কোরল বালুর চর। পরের খবর রাখবার আর অবসর নিখিলেশবাবু পেলেন না। স্ত্রীকে দুখানা বাড়ীর মালিক কোরে তিনি বিদায় নিলেন।

• • • •

বিকাশকে অপরাজিতা ভুলতে পারে নাই তেমনি বিকাশও হৃদয়ের কষ্টি পাথরের উপর স্বাক্ষর দিয়ে যে গ্রাহ্যিকে ওরা সৃষ্টি কোরেছিল তাকে মুছে ফেলে সে রচনার উপর সমাধি গড়বার স্বাস্থ্যবান যুক্তিকে ওরা পায় না।

সত্যপ্রকাশের সংসারে বিকাশের যাতায়াত বেশ সহজ হোয়ে ওঠে। বিকাশ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে অপরাজিতাকে বলে,—"না হয় তাদের আগেকার জীবনের পাতাগুলো একটা অধ্যায়ের পরিসীমায় টেনে পিছনে রেখে দিয়ে বর্তমান জীবনের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে....."

অপরাজিতা জবাব দেয়, "মেয়ে মানুষের জীবনে অধ্যায় মাত্র একটিই সৃষ্টি হয় বিকাশ—।"

বিকাশ চেষ্টা করে অপরাজিতাকে ভুলে থাকতে কিন্তু পারে না—।

বিকাশের অপরাজিতার কাছে আসা যাওয়া সত্য-প্রকাশের কাছে কোন বেদনাই আনে না। তবুও তো অপরাজিতা সময় কাটাবার একটি লোক পায় আর ওদের পরিচয় তো কতো দিনের—। সাধারণের চোখগুলো নিতান্তই সাধারণ কিনা হয়তো রূঢ় হোতে

পারে কিন্তু সত্যপ্রকাশের সেজন্য কোন ক্ষোভই নাই কোন নালিশই নাই।

সত্যপ্রকাশের মাসের বেশী দিন প্রায় মফঃস্বলেই থাকতে হয় কোম্পানীর কাজে। বাড়ী ফিরলে সত্যপ্রকাশ চায় অপরাজিতার ঘন সান্নিধ্য তা যে সে পায় না এমন নয়, কিন্তু আরো পেলে যেন মনটা তার ভরে উঠত। অপরাজিতা সত্যপ্রকাশের জন্য সব কিছুই এটা সেটা করে কিন্তু তার ভিতর মনের সাবলীল মনোভাবটা যেন থাকে না। অপরাজিতা চলতে গিয়েও পারে না—ফাকের সৃষ্টি যেন ওখান থেকে পুষ্ট হোতে থাকে।

সত্যপ্রকাশ বাড়ী ফিরে দেখলো অপরাজিতা বিকাশের সঙ্গে বেড়াতে বের হোয়ে গেল।..... এমনি ভাবে চোলেছে দিনগুলো.....।

• • •

সেবার সত্যপ্রকাশ বাইরে গেছে কোম্পানীর কাজে দিন পনর কুড়ি দেরী হবে ফিরতে এমন কি মাসও হোতে পারে। অপরাজিতা গাড়ী বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে—সত্যপ্রকাশের গাড়ী বের হোয়ে যায়।

যখন যেখানে থাকে অপরাজিতার কাছ হোতে সত্যপ্রকাশ পত্র পায়। সত্যপ্রকাশ জবাব দেয়—। সমস্ত দিনের কাজের ব্যস্ততায় শরীর এলিয়ে গেলেও সত্যপ্রকাশ অপরাজিতকে পত্র দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যখন যেখানে থাকে তার কতো বর্ণনা, কতো বিশ্লেষণে ভরা থাকে সত্যপ্রকাশের পত্র। অপরাজিতাকে নিয়ে আসবে বেড়াতে এমনও আদর-অভিলাষ থাকে পত্রের লাইনে লাইনে। কিন্তু অপরাজিতার কাছ হোতে যে জবাব পায় তার ভিতর এসব কিছুর নাম গন্ধও থাকে না। যা থাকে সত্যপ্রকাশ বিস্ময়ে আতকে ওঠে—। এমনি ধরনের চিঠিত সত্যপ্রকাশ কখনও পায় নি। বন্ধুত্বের দাবীকে সে চাইছে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত কোরতে। স্বামীত্বের দাম কি অপরাজিতা সত্যপ্রকাশের জীবন থেকে খুঁজে পেল না?—এক এক কোরে সত্যপ্রকাশের অনেক কিছুই মনে হয়।—তবে কি বিকাশই এর মাঝে একটা ব্যাবধান সৃষ্টি কোরে বসে আছে? সেখানে বিকাশ তো একা নয়; অপরাজিতার সম্মতি নিশ্চয়ই রোয়েছে। সিঁথির সিঁদুরের কোন মূল্য কি অপরাজিতা দেবে না? তবে কি অপরাজিতা তাকে অস্বীকার কোরেই চোলেছে, চিঠির লাইনগুলো কেঁপে উঠল—কেঁপে উঠল বারে বারে—। বন্ধুত্বের দাবী স্বামীত্বের উপর হোলেও স্বামীত্বই প্রথম সেই কথাই সত্যপ্রকাশ লিখে দেয়—।

জবাবও তার এসে যায় অপরাজিতার কাছ থেকে। মন ভেঙে ওঠে সত্যপ্রকাশের। বিশ্বাস কোরতে চায় না। তবে কি অপরাজিতা চায় বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদকে কি নতুন এক অধ্যায়ে পরিপূর্ণ কোরে নিতে চায় বিকাশের সংগে? নারী জীবনের সুনার্জিত মূলধন কি এই? এমনি বিতর্কের ভিতর দিয়ে চিঠিখানা শেষ কোরে সত্যপ্রকাশ অপরাজিতাকে চিঠিখানা ছেড়ে দেয়—থাকে ব্যাকুল প্রতিক্ষায় প্রতি-জবাবের।

অপরাজিতার জবাব আসে—।

উৎকণ্ঠার আবেগ নিয়ে চিঠিখানা খোলে।

ভালো কোরে দেখে—আবার দেখে—আবার দেখে। চোখের তারা দুটো স্থির হোয়ে ওঠে। চিঠিটার পৃষ্ঠাগুলো বার বার দেখে ঐ একই নাম বিকাশ। বিকাশের নাম এখানে সেখানে। অপরাজিতাকে লেখা সত্য-প্রকাশের কথাগুলোর বিপুল সমালোচনায় ভরা। তার পরের কথাগুলো এক কঠিন মীমাংসায় টেনে আনে। সত্যপ্রকাশের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধে। বিকাশ ও অপরাজিতা নতুন কোরে দিন গড়তে চায়। অপরাজিতা মনের মিথ্যাকে নিয়ে আর চোলতে পারে না—চায়ও না। বিয়ে তার আগেই হোয়ে গেছে বর্তমানের অসহিষ্ণু দিনের কাছে সত্যপ্রকাশ একজন অতিথি মাত্র।.....

সত্যপ্রকাশ আর পড়তে পারে না—চায়ও না। চায় একটা ব্যবস্থা খোঁজে সে পথ।

বাড়ী ফিরে আসে সত্যপ্রকাশ।

অপরাজিতা জানতো সত্যপ্রকাশের ফিরতে দেরী হবে।

"হঠাৎ চোলে এসেছ দেখছি"—অপরাজিতা বোললে।

"কাজ হোয়ে গেল—তাই চোলে এলাম। কেন", সত্যপ্রকাশ গম্ভীরভাবে জবাব দিল।

সত্যপ্রকাশ চঞ্চল হোয়ে ওঠে যে দিনটা আসে তার পরের দিনটার জন্য তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। জীবন যেন এইখানেই ইতি টানে। ভাবে।

এলোও না তেমনি।

একটা পিস্তলের গুলীর শব্দ পেয়ে অপরাজিতা পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে

ঘরকে সাজার দোরের সামনে—চীৎকার কোরে ওঠে, ডাকে—প্রকাশ

কাছে গিয়ে সত্যপ্রকাশের রক্তাক্ত মাথাটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে অপরাজিতা।

জিহ্বা এগিয়ে আসে সত্যপ্রকাশের।

এগিয়ে এগিয়ে বলে,—প্রকাশ—আজ অপ্রকাশ হোয়ে গেল। তোমাকে খুসী কোরতে চাইলাম—অপা।"

সব শেষ।

অপরাজিতার মুখ হোতে কোন কথা বের হয় না—আড়ষ্ট—নিশ্চল যেন

সামনে টেবিলের উপর বিকাশের লেখা চিঠিখানা তুলে সত্যপ্রকাশের ঠিকানায় যেটা চোলে গিয়েছিল—আর তার সাথে সত্যপ্রকাশের এক টুকরো—

"অপরাজিতা, শুভযোচিত কাজ না হোলেও তোমার সিঁথির সিঁদুর আমার মৃত্যু ব্যতীত মুছে ফেলবার কোন পথই যে নাই। ওটাকে অক্ষয় অমর কোরে তোলে স্ত্রীরা স্বামীকে বাঁচিয়ে রেখে। মৃত্যুকে না ডেকে তোমাকে মুক্তি দেয়া হয়তো যেতো কিন্তু যতোদিন বেঁচে থাকতাম ঐ সিঁদুরই তার সাক্ষ্য দিত। সে প্রমাণের মৃত্যুকে তোমার হাতে এনে দিলাম। বিকাশকে তোমার প্রয়োজন। নতুন কোরে ওর হাতে এঁকে নিও তোমার মাথার সীমান্তের সিঁদুর—এই আমার শুভ কামনা। ভুলে চিঠিখানা আমার কাছে পাঠিয়েছিলে—সে ভুল আমার মঙ্গলকেও ডেকে আনল—নিলও তোমাকে মুক্তি—নিষ্কৃতি।"

—নিস্তব্ধ—

নিষ্ঠুর মৌনতায় ঘরটা ভরে উঠল।

অপরাজিতা বিহ্বল। চিৎকার কোরবার কণ্ঠ একেবারে স্পন্দনহীন।

বিকাশ কয়েকদিনের জন্য কোলকাতার বাইরে গিয়েছিল।

ট্রেণ থেকে নেমে অপরাজিতার কাছে সোজা চোলে আসে।

কি যে তোমার মন, কার পত্র কাকে পাঠিয়েছ? বোলেই বিকাশ ঘরে ঢুকল। বাকী কথা মুখ থেকে আর বেরুল না। হাতে তার সত্যপ্রকাশকে লেখা পত্রটা।

অপরাজিতা সত্যপ্রকাশের রক্তাক্ত মাথাটা আরো ব্যাকুল আবেষ্টনে চেপে ধরে।

সত্যপ্রকাশের কোঁটা কোঁটা রক্ত অপরাজিতার সিঁথির সিঁদুর উপর গড়িয়ে পড়ছে।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

ফুটবল ও বাঙ্গলা

ভারতবর্ষ আজ খেলাধূলায় অন্যান্য দেশ হইতে অনেক পেছনে পড়িয়া রহিয়াছে। একমাত্র হকি ব্যতীত অন্যান্য কোনো বিষয়েই তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমপর্যায়েও আসিয়া উঠিতে পারে নাই। হকি ব্যতীত ক্রীকেটে ভারত প্রথম শ্রেণীর দলভুক্ত আছে সত্য কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া বা ইংল্যাণ্ডের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ বা সাউথ আফ্রিকা দল ভারত অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। সন্তরণে ভারতের যে সুনাম ছিল তাহাও নাই। টেনিস্ বা অন্যান্য দু' একটী খেলায় ভারত দু' এক পদ অগ্রসর হইতেছে কিন্তু গতি এত মন্থর যে যাত্রাপথ কবে যে শেষ হইবে বলা কঠিন। অবশ্য ভারতের পক্ষে যুক্তিও আছে অনেক—

দুইশত বছরের পরাধীনতায় ভারতবাসী খেলাধূলা বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সাহায্য খুব কমই লাভ করিয়াছে এবং এই সামান্য সাহায্য বা উৎসাহের মধ্যেও সাধা কাদোর ব্যবধান ছিলো প্রচুর। দারিদ্র্য, অত্যধিক পরিশ্রমের পর উপযুক্ত খাদ্যাভাব ও সুযোগের অভাবে প্রতিভা বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

এত বাধা বিপত্তি বা দারিদ্র্যের মধ্যেও তবুও যেটুকু উৎসাহ আজো জীবিত আছে তাহা সামান্য নয়। সে প্রতিভাকে আজ সত্যিকারের নয়ী মনোবৃত্তি বা রাষ্ট্রীয় চেতনার অঙ্গ হিসাবে যদি গ্রহণ করা হয় তবে ভারত নিশ্চয়ই বেশীদিন পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

ভারতের সব চাইতে প্রিয় খেলা আজ ফুটবল। যদিও ফুটবল খেলায় ভারত পৃথিবীর অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহারা যে কত দুর্বল ও খেলা যে কত ত্রুটীপূর্ণ তাহা গত বৎসর বিশ্ব অলিম্পিক খেলায় যোগদান করিয়া বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে।

ভারতের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রথম প্রচলন ও শক্তিশালী দল এবং কুশলী খেলোয়াড়দের প্রথম অভ্যুদয় এই বাংলার মাটীতেই।

বাঙ্গলার ফুটবল খেলার সুনাম বা ঐতিহ্য ভারতের মধ্যে অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ ছিল এই বাঙ্গালার খেলার মাঠে যে সব বাঙ্গালী নিকপাল খেলোয়াড় তাহাদের ক্রীড়াকৌশল দেখাইয়া সহস্র সহস্র দর্শকের চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, শক্তিশালী বিভিন্ন দলকে পরাজিত করিয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে যে নাম খোদিত করিয়া গিয়াছেন, ইতিহাস তাহা কখনো বিস্মৃত হইবে না।

বাঙ্গালার এই ফুটবল ঐতিহ্য গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত একরূপ একচেটিয়া ছিল। কলিকাতার প্রাচীনতম ক্লাবগুলির অন্যতম মোহনবাগান ক্লাবের সুনাম শুধু ভারতে নয় ভারতের বাহিরেও প্রচারিত ছিল। সেই সুনাম, ঐতিহ্য বা প্রতিভা আজ বাঙ্গলার মাঠ হইতে অন্তর্হিত। আজ বাঙ্গলার ফুটবল ইতিহাস অবাঙ্গালী খেলোয়াড় ও দলাদলির চরম আঘাতে লুণ্ঠিত। নবীন আগন্তুকদের আহ্বানের কোনো চেষ্টা নাই; খেলোয়াড়দের প্রতিভা

বিকাশের কোনো আন্তরিক তত্ত্বাবধান নাই, অল্প দিনেই খেলোয়াড়দের খেলিবার ক্ষমতা অবলুপ্ত হয়— এমনিতর বহু সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে।

যদিও বাঙ্গলা এ বৎসরেও প্রাদেশিক প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে সক্ষম হইয়াছে তথাপি একথা বলিলে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হইবে না যে সে সম্মান সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গলার প্রাপ্য নয়। বাঙ্গলার দল যদি শুধু বাঙ্গালী দ্বারা গঠিত হইত, যদি কোনো প্রদেশের খেলোয়াড় আমাদের শক্তি বৃদ্ধি না করিত আন্তরিক সুখী হইতাম।

আজ এ কথা বলিলে প্রাদেশিকতার প্রশ্ন আসে না। যদি সকল প্রদেশ তাহাদের নিজেদের প্রদেশের খেলোয়াড় লইয়া দল গঠন করে এবং সেই প্রদেশের খেলোয়াড়দের খেলাধূলার উন্নতির জন্য কায়মনবাক্যে যত্নবান হয় তবে তাহাতে ভারতের সম্মানই বৃদ্ধি হইবে। সমস্ত প্রদেশের মিলিত শক্তিতে এই মহাদেশের যে বিরাট শক্তির সৃষ্টি হইবে তাহাতে ভারতের সম্মানই বিশ্বের মাঝে স্থায়ী আসন লাভে সক্ষম হইবে।

শুধু বাঙ্গলার কথা নয় সমস্ত ভারতের ফুটবলের মান যে কত নিচু হইয়া গিয়াছে তাহা যাহারা এই বৎসর সন্তোষ ট্রফির খেলা দেখিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহারা সে কথা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। একথা বলিলে নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে না যে বৃটিশ শাসনকালে যে সব শক্তিশালী মিলিটারী ও সিভিল দল সাদা চামড়ার দ্বারা গঠিত হইত এবং তাহাদের উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্যের সাথে বুঝিবার জন্য আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করিয়া তখন যে সব ভারতীয় দল গঠিত হইত আজ বৃটিশ শাসন অবসানে সেই সব দলের অন্তর্ধানের সাথে সাথে সে প্রতিভাও বিলুপ্ত হইয়াছে। অবশ্য ইহাই একমাত্র কারণ নয় তবে যে একটী প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গত মহাযুদ্ধের সময় ফুটবল খেলা সাময়িকভাবে করেক বৎসরের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। একটী অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অভাব, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভিক্ষের যে বিরাট বাত্যা বাঙ্গলার সমস্ত মাটিকে প্রকম্পিত করিয়া এমন ফাটলের সৃষ্টি করিয়া যায় যাহাতে পূর্ব প্রতিভার রজ্জু ও বংশানুগত অধিকারের রজ্জু হইতে বাঙ্গালী বিচ্যুত হয়।

তারপর রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে বিদেশীর চরম অত্যাচার ও নিষ্পেষণে এবং রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনের মাঝে বাঙ্গলার সে পুরাতন সূর্য আর উদিত হয় না। আজ দেশ স্বাধীন হলেও এখনো অভাব অনটন ও ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব শেষ হয় নাই, দেশপ্রেমিকরাও আজ স্বার্থের লোভে দেশ-দ্রোহিতা করিতে কুণ্ঠিত হন্ না। সুস্থদেহে শান্তভাবে বিচারের শক্তি আমরা লাভ করি নাই। স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ ভারতবাসী এখনো ভোগ করে নাই।

খেলার একমাত্র উদ্দেশ্য যে প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি গঠন একথা আমরা আজ ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের বিশেষ করিয়া কলিকাতার শক্তিশালী দলগুলি সেকথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন। আজ প্রতি-যোগিতা হয় খেলায় জয়লাভ করার জন্য তা সে যে কোনো উপায়েই হোক। তাই আজ বাঙ্গলাকে অন্য প্রদেশের খেলোয়াড় লইয়া দল গঠন করিতে হয়। বিখ্যাত ক্লাবগুলির শক্তিবৃদ্ধি করে বহিরাগত অর্থলুব্ধ পেশাদারী খেলোয়াড়গণ, ইহা অন্ততঃ বর্তমানে নিশ্চই সমর্থনযোগ্য নয়।

কলিকাতায় ফুটবল খেলার পূর্বে যে অনুশীলনের ব্যবস্থা ছিল বা খেলোয়াড়গণ নিজেদের স্থানের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে আন্তরিক চেষ্টা করিত আজ সে আন্তরিকতা নাই। ইহারও অবশ্য কতকগুলি কারণ বর্তমান; যথা খেলোয়ার নির্বাচনে ক্লাবের দলীয় রাজনীতি। প্রত্যেক ক্লাবেই বেশীর ভাগ খেলোয়াড় অনুশীলন না করলেও নির্বাচিতই থাকেন, ফলে নূতন খেলোয়াড়েরা সমস্ত বৎসরে দু চারিদিনের বেশী খেলিতে সক্ষম হন্না; ফলে যে নৈরাশ্য বা হতাশার সৃষ্টি হয় তাহাতে খেলোয়াড়দের মানসিক অবস্থার অবনতি ও সাথে সাথে প্রতিভারও অবনতি ঘটে।

এই বৎসরে এরূপ একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে

পারে। ভবানীপুর ক্লাবের বিখ্যাত গোলকিপার ইস্‌মাইল খেলার মরশুমের প্রথম হইতেই আহত হন। ফলে ভবানীপুর ক্লাবের নূতন গোলকিপার এম, সরকার সে স্থানে খেলাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই নবাগত এম, সরকার প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে শুধু ইস্‌মাইল নয় বাঙ্গালাদেশের যে কোনো গোলকিপার হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। এমনিতর কত প্রতিভা আজ আমাদের সামান্য উৎসাহ বা দলীয় রাজনীতির চাপে পড়িয়া চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

খেলোয়াড়দের অনুশীলন এবং ভুলত্রুটী সংশোধন করিয়া নির্ভুল খেলা শিখাইবার লোকেরও বাঙ্গালা তথা ভারতের মধ্যে দুচারজনও নেলেনা। খেলোয়াড়েরা যেটুকু খেলা দেখিয়া বা ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের সাহায্যে শিখিতে পারিলেন সেইখানেই তার প্রতিভার চরম বিকাশ হইয়া গেল। ফলে নির্ভুল খেলা জীবনেও শিখিতে সক্ষম হইলনা।

শুধু ইহাই নহে ঘন ঘন দল পরিবর্তনের ফলে এবং অহমিকার প্রচণ্ড আকর্ষণে প্রতিভার পুষ্প ফুটিবার আগেই ঝড়িয়া পড়ে। যদি কোনো খেলোয়াড় এক বৎসর ভালো খেলিলেন অমনি বড়ো ক্লাবগুলিতে টানা-টানির প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া গেল। অর্থ, চাকুরী বা অন্যান্য প্রলোভনে প্রলোভিত করিয়া তাহাকে জালে নিক্ষেপ করা হইল। দুচারদিন ভালো খেলিয়া কাগজের শিরোনামায় নাম ও ছবি দেখিয়া খেলোয়াড় নিজের ম্যাজ এরূপ মোটা দেখিতে আরম্ভ করিল যে তাহার খেলাতে সে আন্তরিকতা বা আরো উন্নতির চেষ্টা আর থাকলনা—ফলে দু এক বৎসরের মধ্যেই সে খেলার মাঠ হইতে অন্তর্হিত হইল। এ সংক্রামক মনোবৃত্তি আজ বাঙ্গালা দেশের খেলোয়াড়দের এমন ভাবে আক্রমণ করিয়াছে যে ইহা হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে ভবিষ্যতে আরো অবনতির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

খেলোয়াড়দের খেলা বজায় রাখার চেষ্টা যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ খেলোয়াড় তৈয়ারী করিবার চেষ্টাও তদপেক্ষা বেশী প্রয়োজন; এবং সে পথে অগ্রসর হইতে হইলে স্কুল ও কলেজের খেলোয়াড়দের প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা এতদিন ধরিয়া কি তাহা করিয়াছি। কলিকাতার খুব মুষ্টিমেয় দু একটী কলেজ ব্যতিত অন্য কোনো স্কুল বা কলেজের কোনো মাঠই নাই। কলিকাতা ময়দানে জায়গা থাকা সত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো পৃথিবীখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটীর বেশী মাঠ নাই। ইহা যে কত বড়ো আমাদের অবহেলা ও খেলাধূলা বিষয়ে উদাসীনতার পরিচয় তাহা চিন্তা করিতেও লজ্জিত হইতে হয়। আজ যদি খেলার মান প্রকৃত উন্নত করিতে হয় তবে এই ভাবী খেলোয়াড়দের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিবার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। রাষ্ট্রের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও বিদ্যালয়গুলিকে অগ্রণী হইয়া তাহাদের প্রতিভাকে স্ফুরনের পূর্ণ সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা খেলাধূলার ভারতের প্রাণকেন্দ্র। অথচ আশ্চর্যের কথা ইহাই যে দর্শক বা খেলোয়াড়দের সামান্য সুযোগের জন্য একটী ষ্টেডিয়াম পর্যন্ত নাই। ফুটবল মরশুমে ও বহিরাগত ক্রিকেটদলের আগমনে লক্ষ লক্ষ দর্শকের যে অমানুষিক কষ্ট দিনেরপর দিন সহ্য করিতে হয় তাহাতে ক্রীড়ামোদী দর্শকগণেরও বেশীদিন উৎসাহ অবশিষ্ট থাকেনা। কিন্তু দুঃখের কথা ইহাই যে দিল্লী ও বোম্বাইতে একটি ষ্টেডিয়াম থাকা সত্বেও নেতাদের নামে পুনরায় সেখানে ষ্টেডিয়াম স্থাপিত হইতে চলিয়াছে অথচ ভারত সরকার বা প্রদেশিক সরকার যে প্রাণকেন্দ্রের জীবন দীপকে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা করিতেছেন না।

খেলার মাঠে দর্শকগণের হাতে খেলোয়াড়দের লাঞ্ছনা বা অপমান খেলোয়াড়দের যে কতখানি অবিভূত করে তাহা প্রত্যেক খেলোয়াড় নিশ্চই অনুভব করেন। আমরা স্বাধীন হইয়া সভ্যতার বড়াই করি কিন্তু আমরা আজো কত বর্বর ও খেলোয়াড় হইবার অনুপযুক্ত তাহা এই বৎসরেও খেলার মাঠে প্রমাণিত করিয়াছি।

(৪৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সঙ্গীত, জনসাধারণ ও সরকার

শ্রীদাদু

মানুষের অনুভূতির ইন্দ্রিয়গুলি (Sense organ) যে অনুভূতির নিকট সবচেয়ে সুখ পায় সেই অনুভূতিকেই আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে—কর্ণেন্দ্রিয়কে সবচেয়ে অধিক পরিতৃপ্ত করে সঙ্গীত। এই সঙ্গীত মানুষের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এই জন্যেই মানুষ সঙ্গীতকে এত অধিক ভালবাসে এবং সঙ্গীত পরিবেশক-গণের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগে। ইহার কারণ বিশেষ রসজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞ খুব অল্পই দেখতে পাওয়া যায়। দেশদেশের সকল প্রকার মানুষই সঙ্গীতকে ভালবাসে। Shakespeare বলেছিলেন "যে সঙ্গীতকে ভালবাসেনা সে মানুষ খুন করতে পারে।" কথাটা অতি সত্য। সঙ্গীতের একটা Special appeal আছে। জনসাধারণের মনের উপর এর প্রভাব অনেক—এই জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে Marching Song এর দ্বারা মানুষকে উত্তেজিত ক'রে তোলা হয়। সঙ্গীত এক চমৎকার আব-হাওয়া সৃষ্টি করতে পারে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিকার সঙ্গীতজ্ঞ কয়জন আছে? সত্যিকারের সঙ্গীতজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সঙ্গীত সাধনার বস্তু। যাঁরা এই সাধনা ক'রে বড় হয়েছেন তাঁরা যে মানুষের শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাবেন ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক যুগে মানুষ অন্ন-বস্ত্রের সমস্যায় এত ব্যস্ত যে সঙ্গীতজ্ঞেরা সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করতে পারেন না—ইচ্ছা থাকলেও নয়। যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ হ'তে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন হয় বিক্ষিপ্ত মনের জন্য তা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনা। অনেকেরই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সাধনা করার সময়ের অভাবের জন্য এরা যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারেন না। কারণ অষ্টপ্রহর অন্ন-বস্ত্রের চিন্তাতে ব্যস্ত থাকলে কি ক'রে সঙ্গীতের সাধনা করবেন। অথচ সুযোগ সুবিধা পেলে এরা অনেকেই যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারতেন।

সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীতের সাধনার দিকেই নিমগ্ন থাকা প্রয়োজন : এদের যদি অন্ন চিন্তা বিশেষতঃ অন্ন-বস্ত্রের চিন্তা থেকে মুক্ত করা যায় তবে এরা সাধনার দ্বারা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধশালিনী করতে সক্ষম হবেন। যদি ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট থেকে এবং আমাদের জাতীয় Govern-mentএর নিকট থেকে এই সব সঙ্গীতজ্ঞরা সাহায্য পান তবে অনেক উপকার হয়। কোনও কোনও State কোনও কোনও Artistকে সাহায্য করে থাকেন সুতরাং তাঁহারাও পারিবারিক চিন্তা থেকে মুক্তিলাভ ক'রে সঙ্গীতের সাধনা নিয়ে মগ্ন থাকেন। কিন্তু যে কজন সাহায্য পান তাঁদের সংখ্যা কতটুকু। আমাদের জাতীয় Government যেন এদিকে একটু দৃষ্টি দেন। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ব্যাপারে আমাদের Government এত ব্যাতিব্যস্ত যে Fine arts এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারছেন না। আশা করি শীঘ্রই এই বিশৃঙ্খলার অবসান হবে এবং Government এই সব শিল্পের উন্নতির দিকেও দৃষ্টি দেবেন। এটুকু মনে রাখা উচিত যে একটা জাতির মর্যাদা নির্ভর করে তার সংস্কৃতির উপর—যেমন সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য, বিজ্ঞান, চিত্রকলা প্রভৃতি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে অন্যান্য শিল্পের তুলনায় আমাদের সরকারের সঙ্গীতের উৎকর্ষতার প্রতি দৃষ্টি অত্যন্ত কম। ইহা অতি পরিতাপের বিষয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সরকার সাহায্য না করলে সেই শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প—আমাদের বর্তমান সরকার সঙ্গীত শিল্পের উন্নতির প্রতি এত উদাসীন যার জন্য সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতির যথেষ্ট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি

হচ্ছে—এই গেল প্রধান কারণ, ইহা ছাড়া সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে রাগ রাগিনীর স্বরূপ নিয়ে এত মতবিরোধ দেখা যায় যে কোনটা শুদ্ধ এবং কোনটা অশুদ্ধ তা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে পড়ে—যদি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞেরা একত্রিত হয়ে আলোচনার দ্বারা মতানৈক্য দূর ক'রে এক মধ্যবর্তী পথের নির্দেশ দিতে পারেন এবং বিভিন্ন সঙ্গীত কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে সঙ্গীতের এই মধ্যবর্তী নিয়মানুযায়ী সঙ্গীত শিক্ষা দান করলে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা হবে ব'লে আশা করা যায় এবং এর দ্বারা সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেবে। কিন্তু সঙ্গীত কলেজের এই দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যে সঙ্গীত-শিক্ষকগণ যেন কেবল Theory শিক্ষা দেন না Practical Training ও বিশেষভাবে দেওয়া দরকার। তাঁরা যেন এদিকে দৃষ্টি দেন যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা যে রসপরিবেশন করবেন তা যেন সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়—খালি বই মুখস্থ করিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা সম্ভবপর হয় না—সঙ্গীত শ্রুতিবিদ্যা—তাল সঙ্গীত শুনে শিক্ষার্থীদের অনেক উপকার হয় সুতরাং শিক্ষার্থীদের ভাল সঙ্গীত শোনানোর ও প্রয়োজন এবং গাহিবার ভঙ্গী কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষতা সাধন এই সবের দিকে দৃষ্টি দেবারও বিশেষ প্রয়োজন। নচেৎ সঙ্গীত কখনও শ্রুতিমধুর হবে না। আমাদের দেশে সঙ্গীত কলেজ একেবারেই নেই বললে চলে—দু একটা ছাড়া—এঁদের মধ্যে লক্ষ্ণৌ এর সঙ্গীত কলেজের নাম উল্লেখযোগ্য—কিন্তু দেখা গেছে যে এই কলেজের ছাত্ররা সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্যই বুঝতে পারেন নি—সঙ্গীতের দ্বারা যে রস সৃষ্টি করা সম্ভব তা এঁরা একেবারেই করতে পারেন না—যা হোক তবুও এ কলেজের যা প্রচেষ্টা তা খুবই ভাল—দেশে বেশে কলেজ প্রতিষ্ঠা ক'রে এবং মতবিরোধ দূর ক'রে সঙ্গীতের উন্নতির দিকে জনসাধারণের ও সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন—তা'হলেই আমাদের সঙ্গীত সর্বাঙ্গীন সুন্দর হবে।

খেলাধুলা

(৪৩৩ পৃষ্ঠার পর)

শুধু খেলোয়াড় নয় খেলা পরিচালনাও সুষ্ঠুভাবে দর্শকগণের জন্য সম্পন্ন হয়না। কলিকাতার মাঠে তাই আজ কয়েদীদের মত খেলোয়াড় ও রেফারীকে খেলিতে ও খেলা পরিচালনা করিতে হয়। ইহা যে কত জঘন্য খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির অধঃপতন তাহা আলোচনা করিতেও ভয় হয়। এ মনোবৃত্তির পরিবর্তন না হইলে বাঙ্গলার খেলাধূলার ইতিহাস যে কোনদিনই পরিবর্তিত হইবেনা এ কথা জোর করিয়া বলা চলে।

শুধু দর্শকগণ নয় রেফারী ও সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনে অক্ষম। আজ তাই বিদেশ হইতে উপযুক্ত শিক্ষক আনাইয়া খেলা পরিচালনা শিক্ষা দেওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

সর্বশেষে বাঙ্গলার ফুটবল পরিচালনার ক্ষমতা যাহাদের পরে ন্যস্ত তাহাদের সকল সময় একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমস্ত বাঙ্গালার সম্মান বা হৃতগৌরব পুনরধিষ্ঠিত করিবার সকল দায়িত্বই তাহাদের। দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে থাকিয়া প্রকৃত সেবার মনোবৃত্তি লইয়া আজ তাঁহাদের আগাইয়া আসিতে হইবে। বাঙ্গালীর সে বিজয়পতাকাকে আবার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার সঞ্জীবন মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

জাগতিকি

সুধীর চন্দ্র রায়চৌধুরী

পৃথিবী জুড়িয়া সোভিয়েট ও মার্কিনের ভিতরে যে বিরোধ চলিতেছে, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে বিশেষ করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

ইউরোপ :—ইউরোপে একদিকে যেমন আতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ দেশগুলি নিজেদের সংহতি বাড়াইয়া তুলিতেছে, কমিনফর্মের মারফৎ সোভিয়েট প্রভাবিত দেশগুলি নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি ও নানাপ্রকার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তির ভিতর দিয়া নিজেদের সংগঠন আরও দৃঢ় করিতেছে।

পশ্চিম জার্মানীতে পশ্চিম বার্লিন ব্যতীত অন্যান্য এগারটি রাষ্ট্র লইয়া যে নূতন শাসন ব্যবস্থা সূচীত হইয়াছে তাহার কর্মক্রম সুরু হইয়াছিল কিছুদিন আগে সাধারণ নির্বাচনের মারফৎ। এই নির্বাচনের ফলে যে পার্লামেন্ট গঠিত হইয়াছে তাহার উচ্চতম পরিষদ গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বিখ্যাত 'বন' সহরে নূতন সাধারণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহার নাম হইয়াছিল "ওইমার সাধারণতন্ত্র"। হিটলার এই সাধারণতন্ত্র নাকোচ করিয়া তৃতীয় রাইক' প্রতিষ্ঠা করেন। হিটলারের পতনের পর এক-জার্মাণী গঠন করার সিদ্ধান্ত মিত্রশক্তিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পট্‌সডাম চুক্তির ইহাই ছিল প্রথম ও প্রধান কথা। কিন্তু সোভিয়েট ও অন্যান্য মিত্রশক্তিদের মধ্যে অনৈক্য হেতু যে বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে তাহার ফলে পট্‌সডাম চুক্তির কোন মর্যাদাই রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। জার্মাণীর পূর্বাঞ্চল সোভিয়েট প্রভাবে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পৃথক হইয়া যায়। আর পশ্চিমাঞ্চল ইংরেজ, মার্কিন ও ফরাসী কর্তৃত্বাধীনে পৃথকভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে এই গড়িয়া উঠার পরিণতিই হইল 'বন' সাধারণতন্ত্র। এই 'বন' শাসনতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী জার্মাণীর এই অঞ্চল জার্মান সাধারণতন্ত্র হিসাবে পুনর্জীবন লাভ করে এবং ইহার জাতীয় পতাকা অতীত ঐতিহ্যজ্ঞাপক "ওইমার" পতাকারই অনুরূপ। কৃষ্ণ, রক্তিম ও স্বর্ণ রঙে এ পতাকা রঞ্জিত। যদিও এই 'বন' গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিম জার্মাণীর প্রায় সকল বিষয়েই কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে তথাপি মিত্রশক্তির হাইকমিশনারগণের দায়িত্ব অটুট রহিল এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা তাহাদের হাতেই রহিয়া গেল।

এই দায়িত্ব ও চূড়ান্ত ক্ষমতা বজায় রাখিবার ঐতিহাসিক কারণ রহিয়াছে। পট্‌সডাম চুক্তি অনুযায়ী হিটলারের সমর্থক মতবাদ, মনোভাব, শিক্ষা, দীক্ষা চূড়ান্তভাবে নির্মূল করিবার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবৃন্দ তাহা পুরাপুরি কার্যকরী করিতে সমর্থ হন নাই। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর পদে পদে এই প্রচেষ্টার বিরোধীতা করিয়াছে। এই ব্যাপারে ইংরেজ, মার্কিনের সমর্থক না হইলেও জোর দিয়া নিজের মত ব্যক্ত করিয়া তদনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই; ফলে নিজের দেশে এবং অন্যত্র প্রগতিশীল জনমতের নিকট তাহার পররাষ্ট্রনীতি দুর্বল ও মার্কিন প্রভাবান্বিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ফরাসী সরকারও যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহাও ইংরেজ নীতির ন্যায় দুর্বল ও অক্ষম। তাই পরস্পরবিরোধী কম্যুনিষ্ট ও "দ্য-গল্" পন্থিগণও তাহাদের বিরুদ্ধে জনমতকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে যে ধনতান্ত্রিক শিল্পপতিদের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করিয়া ১৮৭১, ১৯১৪ ও ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রণকুশলী, সমরতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যতন্ত্রী শক্তি বার বার বিশ্ব-শান্তিকে কঠিন আঘাত হানিয়াছে তাহা নির্মূল হওয়া দূরের কথা তাহা যেন ক্রমে ক্রমে নিজেকে প্রকাশ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। জার্মাণীর কিছু কিছু অংশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সীমানা নির্ধারণের গুরুতর প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু জার্মাণ জনসাধারণের ভিতরে ইহা লইয়া যেন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই কার্যকে পিতৃদেহের ব্যবচ্ছেদ হিসাবে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ভুয়ুল প্রচারকার্য চালান হইয়াছিল। বর্তমানে জার্মাণীর

কতগুলি বড় বড় কারখানা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার নীতি কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই কার্যের মূল উদ্দেশ্য হইল যাহাতে এই সকল কারখানা ভবিষ্যতে অস্ত্র প্রস্তুত করিবার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে। জার্মাণীর সমরচক্র ও তাহার শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রথম মহা-যুদ্ধের পর গোড়াতে আত্মগোপন করিয়া হিটলারের অভ্যুত্থানের পর কি ভাবে আবার শান্তিবিধ্বংসী কালান্তক অস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা কেহই ভোলে নাই। তাই এই দ্বিধাবিজড়িত ইংরেজ প্রয়াস। কিন্তু ইহার ফলে বেশ বিরুদ্ধ সমালোচনা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের চেষ্টা চলিতেছে। কোন এক মার্কিন ধুরন্ধর বলিয়াছেন বাণিজ্যিক প্রতিযোগীতার ভয়েই ইংরেজ এত সাত-তাড়াতাড়ি এই কারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যোগী হইয়াছে।

এই মনোভাবের আর একটি অভিব্যক্তি হইল যে গত ১৪ই আগষ্ট তারিখের পশ্চিম জার্মাণীর সাধারণ নির্বাচনের ফলে প্রগতিশীল দলগুলি দক্ষিণপন্থী দলগুলির তুলনায় অনেক কম ভোট পাইয়াছেন। বিভিন্ন দলগুলির প্রতিনিধি ও সভ্য সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল।

ক্রীশ্চিয়ান ডিমক্র্যাটস্—১৩৯—৭,৩৫৭,৪৭৯।

সোস্যাল ডিমক্র্যাটস্—১৩১—৬,৯৩২,২৭২।

উদারনৈতিক দল—৫২—২,৭৮৮,৬৪৩।

কম্যুনিষ্ট—১৫—১,৩৬০,৪৩৩।

ব্যাভেরিয়ান দল—১৭—৯৮৬,৬০৬।

কেন্দ্রীয় দল—১০—৭২৭,৩৪৩।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দল—১২—৬৪১,৯৮১।

জার্মানদল (চরম দক্ষিণপন্থী)—১৭—৯৪০,০৮৮।

দক্ষিণপন্থীদল সমষ্টি—

(চরম জাতীয়তাবাদী রক্ষণশীলদল)—৫—৪২৮,৪৪৯।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপরোক্ত পরিষদের মোট সভ্যসংখ্যা—৪০২।

ইউরোপীয় একতা :—মিঃ চার্চিলের কল্পনারাজ্যে মিলিত-ইউরোপের যে ছবি আঁকা হইতেছিল বিভিন্ন সমস্যার ও বিরোধীতার সমাধানের পর তাহা গত ১০ই আগষ্ট তারিখে "ইউরোপীয় পার্লামেন্টের" প্রথম অধিবেশনে বাস্তব রূপ গ্রহণ করে। এই সভার সভাপতিত্ব করেন প্রবীন ফরাসী জননায়ক ও রাজনীতিবিদ 'মঁসিয়ে হ্যারিও'। এই সভায় ১৭টি দেশের ১০১জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং ঐ ১৭টি দেশের বৈদেশিক মন্ত্রিগণও উপস্থিত ছিলেন। এই ১৭জন বৈদেশিক মন্ত্রী লইয়া একটি মন্ত্রিপরিষদ এই প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত। এই অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে এম, হ্যারিও বলেন যে কোনরূপ সামরিক আতাত গড়িয়া তোলার অভিপ্রায় তাহাদের নাই, কারণ তাহারা কাহারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছে না।

বৃটেনের রক্ষণশীল নেতা মিঃ চার্চিল এই অধিবেশনে উপস্থিত হইলে তিনি অন্যান্য প্রতিনিধিগণ কর্তৃক তুমুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। এম, হ্যারিও মিঃ চার্চিলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বক্তৃতা করেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের প্রতিনিধিরা যখন পার্লামেন্টের উদ্বোধনে ব্যস্ত তখন কম্যুনিষ্টরা প্রচারপত্র বিলি করিতে ব্যাপৃত ছিল। কম্যুনিষ্টদের প্রচারপত্রে এই সব কথা লিখিত ছিল—পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের যুদ্ধলিপ্সুরা নিপাত যাক্, পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট আর একটী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে ইত্যাদি।

প্রাথমিক আলোচনা ও কার্যসূচী নির্বাচনের পর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্ক আরম্ভ হয়। বৃটীশ শ্রমিক প্রতিনিধি প্রমুখ সমাজতন্ত্রীদল হঠাৎ কিছু করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং রক্ষনশীলদল মনে করেন ভারতীয় সার্বভৌম অধিকারই হইল যুদ্ধের প্রধান সূচক। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এই পার্লামেন্টে অংশগ্রহণকারী জাতিসমূহ আপাততঃ তাহাদের সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন না। স্বয়ং মিঃ চার্চিল এই মত প্রকাশ করেন "ধীরে চলাই" বাঞ্ছনীয়।

প্রায় একমাসকাল অধিবেশন চলিবার পর গত ৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে এই সম্মেলনের অবসান হয়। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি এম, স্পাক অধিবেশনের সর্বশেষে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন "আমরা আজ যাহা সাধন করিলাম তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র

সম্মেলন. এই ট্রান্সআর্গ সহরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন মহানগরীর মর্যাদা লাভ করিবে।

এই অধিবেশনের প্রায় সর্বশেষ কাজ হইল ইউরোপীয় জনগণের "মানবীয় অধিকার" সম্বলিত একটি সনদে স্বাক্ষরদিবসন এবং এই সব অধিকার রক্ষাকল্পে একটি বিচারালয় স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ। এই সনদের বলে যে কোন ইউরোপীয় নাগরিক তাহার নিজের সরকারের বিরুদ্ধে মানবীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করিবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারিবে। এই অভিযোগ প্রথমে একটী স্থায়ী কমিশনারের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই কমিশন প্রথমে চেষ্টা করিবেন যাহাতে এই বিরোধ আপোষে মিটমাট করা যাইতে পারে। সেই চেষ্টা বিফল হইলে চূড়ান্ত রায়ের জন্য এই বিরোধ বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। এই মানবীয় অধিকারগুলি রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অধিকারমূলক। ১২টি অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্র এই অধিকার মানিয়া লওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন।.....

পশ্চিম জার্মাণীর যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন পশ্চিম ইউরোপীয় একত্বমূলক ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অধিবেশন এবং আতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের আতলান্তিক চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিটি রাষ্ট্রের আইন সভা কর্তৃক সমর্থন ও গ্রহণ। এই তিনটি ঘটনা পশ্চিমী শক্তিসমূহের কম্যুনিষ্টবিরোধী সংগঠনের ভিত্তিস্থাপন। আতলান্তিক চুক্তি অনুসারী এই চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহকে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইবার জন্য আর্থিক সাহায্য দান করিতে আমেরিকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনের পূর্বে উক্ত আতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ ১২টি দেশের সমরনায়কদের সহিত ঘরোয়া আলোচনার ব্যবস্থা হয়। আঞ্চলিক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার সমস্যাগুলির বিশেষ আলোচনার জন্য মার্কিন সমরনায়কগণ আগষ্টমাসের প্রথমে ইউরোপে আগমন করেন এবং বিভিন্ন রাজধানীতে তত্রত্য সমরনায়কগণের সহিত গোপন বৈঠকে মিলিত হন। তাহাদের এই আলোচনার ফল আশাপ্রদ এবং উৎসাহজনক বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহারা একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই সরকারী ব্যয় বরাদ্দ নির্ধারিত হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিগুলি সাহায্যের পরিমাণ কমাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের বক্তব্য যে সাহায্য করা প্রয়োজন হইলেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশসমূহ কতটা আত্মনির্ভরশীল হইতেছে এবং তাহাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা সচেষ্ট হইতেছে কিনা এবং সম্ভাব্য সর্বপ্রকার সক্রিয় চেষ্টাকে সাহায্য করাই মার্কিন সরকারের মূলনীতি হওয়া উচিত। অন্যথায় অর্থের অপব্যয় তথা আত্মরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবার সম্ভাবনা। উপরন্তু এই সাহায্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতামূলক সামরিক শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে। তাই তাহারা সুপারিশ করিয়াছেন যে প্রাপ্ত অর্থদ্বারা পশ্চিম ইউরোপে নূতন অস্ত্রকারখানা গড়িয়া তোলা, বর্তমান কারখানা-সমূহ ও সমরসজ্জা চালু রাখিবার খরচ অথবা এই সকল কারখানার নিযুক্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কাহারও বেতন দান প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হউক।

আতলান্তিক চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহ ছাড়া ইউরোপে গ্রীস ও তুরস্ক, এশিয়া মহাদেশে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইরান এইসব দেশগুলিকে অস্ত্রসজ্জা বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখিবার জন্য অর্থসাহায্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

যুগোস্লাভিয়া :—পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের সংহতি যখন উপরোক্ত স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন কমিনফর্ম হইতে বিতাড়িত যুগোস্লাভিয়ার সহিত সোভিয়েটের বিরোধও পাকাপাকিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিতেছে। অন্যদিকে কমিনফর্মের অন্তর্গত দেশসমূহের ভেতরে যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহজনক শক্তি প্রবল হইয়া উঠিতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কম্যুনিজমের পরম শত্রু রোমান ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের প্রভাব চূড়ান্তভাবে নির্মূল করিবার জন্য রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ও ধর্মপ্রচারক-গণের উপর কড়া নজর রাখা হইতেছে। রাজদ্রোহের অনেক ধর্মযাজককে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। যাহারা পুরাপুরিভাবে কমিনফর্মের নীতি সমর্থন করিতেছেন না বলিয়া সন্দেহ হইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। বহু গণ্যমান্য প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট নেতা এবং সরকারী কর্মচারী ও নাগরিক এইভাবে শাস্তি ভোগ করিতেছেন। আইনের চরম দণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল কারাবাস বহু নেতার ভাগ্যে জুটিয়াছে।

টিটো ষ্টালিন বিরোধ এখন সরকারী খোলাখুলি বিরোধে পরিণত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার যুগোশ্লাভিয়ার নীতি সম্পর্কে মস্কো যে সকল "মিথ্যা" অভিযোগ করিয়াছিল বেলগ্রেড হইতে যুগোশ্লাভ সরকার তাহার উত্তর দেওয়ায় রাশিয়া ও টিটো সরকারের মধ্যে "উত্তেজনার সংগ্রাম" আর একধাপ আগাইয়া গিয়াছে। গত ১১ই আগষ্ট টিটো সরকারকে সোভিয়েট ইউনিয়নের শত্রু ও বিরোধী বলিয়া রাশিয়া যে নোট প্রদান করিয়াছিল যোগোশ্লাভিয়ার নোট তাহারই উত্তর। উক্ত নোটে রাশিয়া যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে এই অভিযোগও করিয়াছে যে সোভিয়েট ইউনিয়নের অজ্ঞাতে যুগোশ্লাভিয়া অষ্ট্রিয়ার উপর তাহার দাবী সম্পর্কে বৃটেনের সহিত আলোচনা চালাইয়াছে। ইহার উত্তরে প্রেরিত যুগোশ্লাভ নোটে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সহিত তাহার আলোচনার কথা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে মঁ: মলোটভ মঁ: ভিসিনিস্কির প্রস্তাবক্রমেই উহা করা হইয়াছে অতঃপর নোটে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধিদের সহিত মঃ বিদো ও বৃটীশ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সহ অপরাপর পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত যে সকল আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে নোটে বলা হইয়াছে যে, মঁ: মলোটভ ও মঁ: ভিসিনিস্কি যুগোশ্লাভিয়াকে জানায় যে গ্রোভেন কারিনথিয়ানকে মুক্ত করার কোন সম্ভাবনা নাই কাজেই যুগোশ্লাভিয়া স্বতন্ত্রভাবে পশ্চিমী রাষ্ট্রের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে পারে এবং অষ্ট্রিয়া সীমান্ত পুনর্নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা করিতে পারে। কাজেই রাশিয়ার অজ্ঞাতে কারিনথিয়ানকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট বিক্রয়ের যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সত্য নহে।

নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সরকার যখন গ্রোভেন কারিনথিয়ান সম্পর্কে যুগোশ্লাভিয়ার দাবী সমর্থন করিতেছেন সে সময় যুগোশ্লাভিয়াই স্বেচ্ছায় উক্ত দাবী ত্যাগ করে বলিয়া সোভিয়েট যে অভিযোগ করিয়াছে তাহা ঠিক নহে। যুগোশ্লাভিয়া দৃঢ়তার সহিত এই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান মনোভাব হইতে যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

বিরোধ এখানে আসিয়াই শেষ হয় নাই। গুজব রটিয়াছিল রুমানিয়া রাষ্ট্রে সোভিয়েট সৈন্যের সামরিক সমাবেশ যুগোশ্লাভিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই সংঘটিত হইতেছে। মার্শাল টিটো কিন্তু মনে করেন না যে বর্তমান স্নায়ুযুদ্ধ বাস্তব যুদ্ধে পরিণতি লাভ করিতে পারে। তিনি বলেন তিনি এখনও মার্কসবাদে বিশ্বাসী এবং মার্ক্সীয় গণতন্ত্র নীতি অনুযায়ী তাঁহার দেশ শাসিত হইতেছে। তিনি কখনও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের দলে যোগ দিবেন না। শুনা যাইতেছে সোভিয়েট ও কমিনফর্ম বিরোধী মার্কসবাদে বিশ্বাসী একটী নূতন কমিনফর্ম গঠনে তিনি উদ্যোগী হইয়াছেন এবং যুগোশ্লাভ-সোভিয়েট বিরোধ নাকি ইউ, এন, ও র সম্মুখে উত্থাপিত করা হইবে।

এদিকে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে কমিনফর্মের সবগুলি দেশই সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক চুক্তি নাকোচ করিয়াছে। ফলে এই দেশ পূর্ব ইউরোপ বা সোভিয়েট হইতে এমন কোন সাহায্য পাইতেছে না যাহা দ্বারা ব্যাপক পুণর্গঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী করা যায়। তাই এই অর্থনৈতিক অবরোধের হাত হইতে আত্মরক্ষার নিছক প্রয়োজনেই টিটোকে আমেরিকার নিকট অর্থসাহায্য চাহিতে হইয়াছে এবং কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন অর্থনৈতিক পর্যবেক্ষক এইরূপ সাহায্য করিবার পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এবং আলোচনার জন্য বেলগ্রেডে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গত ৮ই আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ যে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, যুগোশ্লাভিয়াকে ২ কোটী ডলার ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এই অর্থ সাহায্য করিয়াই আমেরিকা ক্ষান্ত হয় নাই। উপরন্তু যুগোশ্লাভাকিয়াকে রাশিয়া আক্রমণ করিলে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে সেই সম্পর্কে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে পরামর্শ হইতেছে এবং এই সম্পর্কে এই ত্রিশক্তি একটি ঘোষণা করিতে পারেন।

দুর্গাপূজা—

বাঙালীর জীবনে দুর্গাপূজা কতকটা জাতীয় উৎসবের স্থান এক সময় অধিকার করত। যদিও এটা হিন্দু সমাজের ধর্ম-উৎসব, তবুও গ্রামে গ্রামে সাম্বৎসরিক উৎসব হিসাবে দুর্গাপূজা পরিচিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতি গ্রামের জনসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করত। সমাজ ব্যবস্থা এতকাল ছিল সামন্তমূলক এবং সমাজের কর্তৃত্ব ছিল উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের হাতে। এই উৎসবের পরিচালনাও গ্রামের ছোট, বড় জমিদার, তালুকদারদের হাতেই বিশেষ পরিমাণে ছিল। অন্ন-বস্ত্রের অভাব সমাজে তেমন ছিল না তাই এই উৎসবে অন্ন-বস্ত্রেরও ছড়াছড়ি প্রচুর হত। এই উৎসব উপলক্ষে সরকারী বে-সরকারী অফিস এবং স্কুল কলেজ দীর্ঘদিন ছুটি পেত। অন্য কোন প্রদেশে কোন উৎসব উপলক্ষে এমন দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা নেই। বাংলার জীবনে এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই দীর্ঘ ছুটি থেকে অনেকটা অনুমান করা চলে।

এসব ছিল অতীতের চিত্র; কালের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও অর্থ ব্যবস্থা এসে পুরাতনকে সরিয়ে দিল। অন্ন-বস্ত্রের সেই প্রাচুর্য্যের দিন অনেককাল চলে গিয়েছে, কিন্তু সামাজিক আচার, রীতিনীতি কালের সঙ্গে সঙ্গেই বিদায় নেয় না। বরং অতীতের মৃত বোঝা হিসাবে এগুলো সমাজের বুকের ওপর চেপে থাকে। বাংলার দুর্গোৎসবও অতীতের বোঝা হিসাবেই আজ বাঙালীর সমাজের ওপর চেপে আছে।

যে গ্রাম্য সাম্বৎসরিক ব্যবস্থার উপর এই উৎসব গড়ে উঠেছিল তাও আজ নেই। জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। গ্রামের সামাজিক জীবন ভেঙে গিয়েছে; পরিবারের বন্ধন শিথিল হয়েছে: আজ ব্যক্তি ও তার পুত্রকন্যাই সমাজের উনত (unit) হিসাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও অতীত ঐশ্বর্য্যের স্মৃতি হিসাবে বাঙালী এই উৎসবকে আঁকড়ে ধরে আছে। জাতীয় আন্দোলনের শেষ দিয়ে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতার পাল্টা জবাব হিসাবে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত একটা নূতন ধরণের সাম্প্রদায়িক ভাব গড়ে তুলল। তাই সমস্ত পূজা-পার্বন আজ সহরে সহরে সার্বজনীন আকার ধারণ ক'রে হিন্দুত্বের বড়াই করার এক বস্তু হয়েছে।

হিন্দু ধর্মের কতকটা মূল নীতি হচ্ছে অন্তর্মুখিনতা; ঐশ্বর্য্য বা ক্ষমতা প্রদর্শনের বাহ্যাড়ম্বরের ব্যাপার ধর্ম নয়; ধর্ম হবে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ সাধনার বস্তু। সে হিসাবে এই সার্বজনীন পূজা আমরা মনে করি, হিন্দুধর্মের মূলনীতির সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি রক্ষা করে না। তা ছাড়া সার্বজনীন পূজা উপলক্ষে অপর ধর্মের প্রতি যে বিরূপ মনোভাবের প্রকাশ মাঝে মাঝে পায় তা খুবই পরিতাপের। তার কতকটা যেন এমনি যে পাকিস্থানের দাবী ক'রে মুসলীম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভাগ করেছে; কাজেই ভারতবর্ষ আজ হিন্দুস্থান, হিন্দুর দেশ। তার দাবী মেটাবার পরে অন্যের দাবীর স্থান এখানে হতে পারে। আজ স্বাধীন ভারতের সংখ্যাপরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দু সমাজের পক্ষে এমনি মনোভাবের পরিচয় দেওয়া অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

পূজা আগতপ্রায়। বিভক্ত বাংলার বাঙালী হিন্দু নিজেদের সুখ দুঃখের মধ্যে দুর্গোৎসব পালন করবে।

বাংলার যে অংশ আজ ভারতের বাইরে সেখানেও পূজা পালিত হবে। আমরা আশা করি গত বছরের মত এ বছরও উভয় বাংলা নির্বিঘ্নে কোন বাধা হাঙ্গামার ভিতর না গিয়ে এই উৎসব পালন করবে। আমরা আরও আশা করি সামবায়িক উৎসব হিসাবে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভিত্তি পুনঃস্থাপিত হবে।

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীরের ব্যাপার ক্রমেই যেন জটিল হয়ে উঠছে। কয়েকদিন হ'ল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ট্রুমান ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ভারত ও পাকিস্থানের নিকট এক বিশেষ বার্ত্তা প্রেরণ করেছেন যাতে কাশ্মীর সমস্যা আপোষে মিটে যায়। আজ এক বৎসরের উপর হ'ল সংযুক্ত জাতিসংঘের নিকট কাশ্মীর সমস্যা ঝুলে আছে। সংযুক্ত জাতিসংঘের তরফ হ'তে এক কমিশন এখানে এসেছে; একটার পর একটা প্রস্তাব তারা উথাপন করছে এবং একটার পর একটা প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হচ্ছে। কাশ্মীর কমিশনের প্রস্তাব ছিল মোটা-মুটি এইরূপ (১) জাম্মু কাশ্মীর রাজ্য হ'তে পাকিস্থানী সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া; (২) উপজাতীয় লোকদের এবং পাকিস্থানী অধিবাসীদের জাম্মু কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নেওয়া; (৩) ভারতীয় সৈন্যের অধিকাংশকে জাম্মু কাশ্মীর থেকে সরিয়ে নেওয়া; (৪) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্ন যার মধ্যে ভারত সরকার চায় আজাদ কাশ্মীর বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া। কিন্তু উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই চার বিষয় মতের ঐক্য না হওয়াতে যে সমবেত আলোচনা হওয়ার কথা ছিল তাও স্থগিত রয়েছে।

এর পর আন্তর্জাতিক কাশ্মীর কমিশনের তরফ হ'তে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সালিশীর দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসা করার জন্য। এই সালিশী প্রস্তাবের উপরেই রাষ্ট্রপতি ট্রুমান ও ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী সাহেব ভারত ও পাকিস্থানের নিকট আবেদন করেছেন। পণ্ডিত নেহেরু এলাহাবাদের জনসভায় এই প্রস্তাবের উত্তরে যা বলেছেন তাতে মনে হয় অত দূর দেশ হ'তে ট্রুমান ও এট্‌লী কাশ্মীর সমস্যার জটিলত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। পণ্ডিতজী যা বলেছেন তার সারমর্ম্ম এই যে কাশ্মীর ভারতের একটী অংশ বিশেষ, এবং যখন সেই অংশ সমস্ত্র বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল তখন ভারতের পক্ষে তার রক্ষা ব্যবস্থা করা একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এই সমস্যার মূল নীতি স্বীকৃত না হ'লে কোন প্রকার সালিশী ব্যবস্থাতে ভারতবর্ষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধবিরতির সময় যে সব নীতি স্বীকৃত হয়েছিল সালিশীর দ্বারা যদি আবার সেই সব নীতির পুনরালোচনা সুরু হয়, তাহলে সমস্যা সহজ না হয়ে বরং আরও জটিল হবে। তাই সালিশীর প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পূর্বে ভারতবর্ষকে দেখতে হবে যে কোন্ ব্যাপার নিয়ে সালিশী হবে।

আজ যদি সালিশী আলোচনার মুখে আবার প্রশ্ন ওঠে যে কাশ্মীর ভারতের অংশ কিনা এবং আজাদ কাশ্মীর বাহিনী বা পাকিস্থানী বাহিনীর কাশ্মীর প্রবেশ ভারতের অংশবিশেষের ওপর হামলা করার সমর্থক কিনা তাহ'লে ভারতের সালিশী প্রস্তাবে রাজী হওয়া কঠিন। ভারতবর্ষ বরাবরই এ সমস্যার শান্তিমূলক মীমাংসার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছে এবং সেই জন্যই যুক্ত-জাতিসংঘের নিকট এই সমস্যা ভারতবর্ষ উথাপন করেছে। এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে কাশ্মীর সমস্যার আপোষমূলক মীমাংসার ওপর ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের ভবিষ্যত প্রগতি অনেকখানি নির্ভর করে। এ সমস্যার সাথে বিশ্বশান্তির সমস্যাও জড়িত হয়ে পড়তে পারে। আমেরিকার স্বরাষ্ট্র সচিবের সাংবাদিক বৈঠকে যে সব আলোচনা হয়েছে তাতেও বোঝা যায় যে কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে বিশ্ব শান্তির সমস্যা জড়িত হবার আশঙ্কা আমেরিকাতেও কেউ কেউ করছে। বিশেষ করে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যে ভৌগলিক সংযোগ ও সন্নিহিতি কাশ্মীরের আছে, তা নিয়েই ঐ আশঙ্কা গভীর হয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতজী এই সালিশী সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন তা অতি গুরুত্বপূর্ণ। ট্রুম্যান ও এট্‌লী সাহেব হঠাৎ এই ভাবে সালিশীর জন্য অনুরোধ ক'রে সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক হননি। সালিশীতে যাওয়ার পূর্ব্বে সব সমস্যার মৌলিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সালিশীর অর্থ এ হ'তে পারে না যে—যে কোন প্রকারে গোলমালের অবসান করতে হবে; সালিশীর মূলনীতি হওয়া উচিত ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করা। এই দীর্ঘ দুই বছর ধ'রে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তার পূর্বাপর আলোচনা করে কোন কোন বিষয়ে সালিশী হবে, তা স্থির হ'লে পর সালিশের নিকট সমাধানের ভার দেওয়া চলে।

ভারতের আর্থিক সমস্যা—

ভারতের আর্থিক অবস্থা এখন একটা সঙ্কটজনক অবস্থায় এসেছে। ৮ মাস পূর্বে অর্থ সচীব বেশ আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—আমাদের আর্থিক অবস্থা মূলত বেশ ভাল (our financial position is intrinsically sound)। এই আশার বাণী নিয়ে এই বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারী সচীব এই বছরের বাজেট (budget) পেশ করেন। আর এই ৮ মাসের মধ্যে অবস্থা সঙ্কটজনক হ'য়ে উঠেছে। এর পূর্বের বছর ভারত সরকার তাদের আয় ব্যয়ের হিসাবের বাইরে ৮৩ কোটি টাকা বেশী পেয়েছিল;—এটা কতকটা ফাউ পাওনা। তাদের আয়ের হিসাব (২৫৫ কোটি) থেকে ৮৩ কোটি অর্থাৎ ½ অংশ বেশী আয় হওয়া, ভাগ্যবানের লক্ষণ হ'তে পারে, কিন্তু তা সক্ষ হিসাব রক্ষার পরিচায়ক নয়। সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় হ'ল এই যে ফাউ ৮৩ কোটি টাকা এল,—তার ৮২½ কোটি তখনই খরচ হ'য়ে গেল। আয়ের হিসাবে ও তাদের যেমন সঠিক, ব্যয়ের হিসাবও তেমনি সঠিক। অর্থ সচীব আরও ভরসা দিয়েছিলেন—মুদ্রা স্ফীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা কতকটা সফল হয়েছি (We have made some headway in the fight against inflation)। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি বন্ধের পথে যায় নি, বড় জোর এক বছর যাবৎ কতকটা বন্ধ হ'য়ে আছে।

কাজেই ৮ মাস পূর্বে অর্থ সচীব যে ভরসা দেশবাসীদের দিয়েছিলেন, তা পূরণ হয়ই নি; বরং গতি অনেকটা তার উল্টা দিকেই চলেছে। যখন ইংরাজরা ভারতবর্ষের শাসনভার দেশবাসীর হাতে দেয়—অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৫০০ কোটি টাকা ভারতের মজুত ভাণ্ডারে (Cash deposit) ছিল। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে এই মজুত ভাণ্ডারে টাকার পরিমাণ হয় ৪০০ কোটি। ভারত বিভাগের পর পাকিস্থানের হিস্তায় যায় ২০ কোটি। এই টাকা কমতে কমতে ১৯৪৮ সালের অক্টোবরে গিয়ে দাঁড়ায় ২৫৭ কোটি এবং এই বছরের অক্টোবরে এই তহবিল প্রায় শূন্য হবে। এত বড় দেশের শাসন দায়িত্ব যে সরকারের উপর নির্ভর করছে তার হাতে যদি কোন মজুত টাকা কিছু না থাকে, তবে তার সব দিককার সব দায়িত্ব পূরণ করা কঠিন। বিশেষ করে বহু উন্নয়ন পরিকল্পনা এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া আজকার জগতে অতর্কিত বহু ঘটনা এসে পড়তে পারে, যার জন্য হঠাৎ বহু টাকা খরচ করার প্রয়োজন হয়। যুদ্ধবিগ্রহও এখনকার দিনে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই নিজ এক্তিয়ারের মধ্যে নয়। এই যে, মজুত টাকার ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়েছে, এর অর্থ এই যে ভারত সরকারের ঋণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই। কারণ প্রধানত ঋণ করা টাকা দিয়েই মজুত ভাণ্ডার পূরণ করা হয়।

কিন্তু সব চেয়ে গুরুতর কথা হ'ল—এই বছরের ঘাটতির পরিমাণ। এই বছর রাজস্বের পরিমাণ ধরা হয়েছিল ৩০৭ কোটি টাকা। কিন্তু যতটা বুঝা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় প্রায় ৪০ কোটি টাকার মতো এবার ঘাটতি হবে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্য কমে গিয়েছে, তার ফলে শুল্ক কর (customs duty) অনেক কম হবে। জাতির আয় কমে গিয়েছে; তার ফলে আয়কর অনেক কম হ'বে।

এই অবস্থা যে হচ্ছে বা হবে—তা অন্তত কিছুদিন পূর্বেও কর্তৃপক্ষের টের পাওয়া উচিত ছিল। এই দুই বছর যাবৎ ক্রমাগত চেচানো হচ্ছে—দেশে উৎপাদন বাড়াতে হবে;—কিন্তু উৎপাদন বাড়ছে দ্রব্যের নয়, চাকুরির। বৈদেশিক বাণিজ্য চলছিল প্রায় একমুখী—অর্থাৎ আমদানীই হচ্ছিল খুব বেশী; রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমেই কমছিল। তখনও সচীবদের খেয়াল হল না যে বিলাস দ্রব্য আমদানী করে

বিলাতে জমানো ষ্টার্লিং মুদ্রার মজুত তহবিল খরচ করা বুদ্ধিমানের কথা নয়। এক বছর পূর্বেই বলা হ'য়েছিল—ব্যয় সংক্ষেপ করা হ'ক, সাধ্যতামূলক সঞ্চয় ব্যবস্থা করা হ'ক, কৃষি আয়ের কতক অংশ যাতে সরকারী তহবিলে সঞ্চিত হয়, তার ব্যবস্থা করা হ'ক। তখন এই সব কথা ও প্রস্তাব অবান্তর ও অ-কার্যোপযোগী ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আজ এক বছর পর যখন অবস্থা সঙ্কটজনক হ'য়েছে, তখন এঁদের টনক নড়ল।

ডাঃ ধনমাথাই লজ্জন ও বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততার উপর কারোর কোন সন্দেহ নেই। তবুও এমন অবস্থা কেন হ'ল। এর একটা উত্তর এই হ'তে পারে:—১৯৪৭ সাল থেকে ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও আকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। পূর্বে এটা ছিল পুলিশীরাষ্ট্র—আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার রাষ্ট্র এখন এই রাষ্ট্র হল জনসেবার রাষ্ট্র (welfare state)। কিন্তু এর শাসন-ব্যবস্থা সবই রয়েছে পুলিশীরাষ্ট্রের অনুরূপ; কর্মচারীর পর কর্মচারী বাড়ছে, তাদের বেতনও বাড়ছে; সঙ্গে সঙ্গে ফাইল (file) বা নথি বাড়ছে। কিন্তু কাজের ক্ষিপ্রতা স্বভাবতই কমছে। বড় বড় পরিকল্পনা বা plan হচ্ছে; কোটি কোটি টাকা তাতে যাচ্ছে; দেশবাসী কবে যে তার ফল পাবে—কেউ জানে না। জনসেবার জন্য পরিকল্পনা ও তার জন্য কর্মচারী প্রভৃতি বাবদ খরচ বাড়ছে প্রচুর; কিন্তু জাতীয় আয় বাড়ছে না। দ্বিতীয়তঃ এখন সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা বড় বড় ধনপতিদের হাতে; তারা আজ জোর ক'রে স্তূপ আটছে। তাদের তুষ্টির জন্য প্রতি বছর বা প্রতি মাসেই কিছু না কিছু ইশারা (gasture) দেখানো হচ্ছে। যা পায় তাই নির্বিচারে গ্রাস ক'রে তারা আরও চাচ্ছে; আরও পাচ্ছে; তারা আবারও চাচ্ছে। এমনি করে রাষ্ট্র ও ধনপতিদের সঙ্গে আজ দ্বন্দ্ব চলছে। এই দ্বন্দ্বে সরকারী আমলাবর্গের সহানুভূতি কোন দিকে তা নিয়ে জনসাধারণের বিশেষ সন্দেহ নেই।

বনেদী আমলাবর্গ, বনেদী অর্থনীতি ও বনেদী রাজনীতির মোহ যদি আমাদের কর্তৃপক্ষ ত্যাগ করতে না পারে, তবে আর্থিক অবস্থা ভালর দিকে না গিয়ে বরং খারাপের দিকেই যাবে।

কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী দলের সংহতি—

বিধান পরিষদে স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা চলছে। বিধান পরিষদে কংগ্রেসী দলই প্রধান দল এবং কার্যত কংগ্রেসী দলের সিদ্ধান্তই বিধান পরিষদে গৃহিত হয়। কংগ্রেসী দল প্রথমে নিজেদের মধ্যে আলোচনা ক'রে প্রত্যেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সেই অনুসারে মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) খসড়া ধারা (clause) তৈরি করে এবং পরিষদে তা উপস্থিত করে। এ পর্যন্ত মুসাবিদা কমিটি সব বিষয়েই কংগ্রেসী দলেরসিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু দুটি বিষয়ে মুসাবিদা কমিটি ও কংগ্রেসী দলের মধ্যে মতের ঐক্য হয় নি। তাই দুটি বিষয়ে বিধান পরিষদে যে খসড়া ধারা পেশ করা হয়, মুসাবিদা কমিটির তরফ হ'তে তা হয় না; তা পেশ করা হয় কংগ্রেসী দলের কোন সভ্যের তরফ থেকে।

এই দুটি বিষয় হ'ল—সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখলের ক্ষতি পূরণ এবং রাষ্ট্রীয় ভাষা। এই দুটি বিষয় নিয়ে কংগ্রেসী দলের মধ্যে বহুবার আলোচনা হয়; আলোচনা এক এক সময় বেশ তীব্র তীক্ষ্ণ ও তিক্ত হ'য়ে উঠেছে। মতের ঐক্য হয় নি; আবার আলোচনা হয়েছে; হয়ত চেষ্টারও ব্যর্থ হয়েছে। এমনি করে ৩।৪ বার ক'রে আলোচনার পর কংগ্রেসী দল শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এসেছে। ভাষা নিয়ে আলোচনার মতৈক্য সাধনের চেষ্টা কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর, ঠিক হয়েছিল ঐ বিষয়ে যে যার খুশী মতো ভোট দিতে পারবে। এর ফলে, বিধান পরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেসী সভ্যরা প্রায় সমান দুভাগে দুদিকে ভোট দিত।

এই অবস্থাটা অনেকের নিকটই অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হয়েছিল। তাই কংগ্রেস পার্টির সভ্যদের মধ্যে বারবারই আলোচনা চলছিল কি করে দলের সংহতি বজায় রাখা যায়। শেষে কংগ্রেসী দলের সভায় ঠিক হয়েছিল যে যার যার ইচ্ছামত বিধান পরিষদে ভোট দিলেও দলগত শৃঙ্খলার কোন ভঙ্গ হবে তবুও

সকলে অনুভব করছিল যে এটা দলের নৈতিক পরাজয়ের একটা স্বীকৃতি। তাই বারবার চেষ্টা করে একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এক সংশোধক প্রস্তাব গৃহীত হয়। যে প্রস্তাব নিয়ে মতবিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল এই সংশোধক প্রস্তাবের সঙ্গে তার পার্থক্য অতি সামান্য; তবুও দলের সংহতির রক্ষা হ'ল এই জন্য উভয় পক্ষই এই সংশোধক প্রস্তাবকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছে।

কংগ্রেসী দলের মধ্যে যে সংহতি শক্তি আছে এটা তারই পরিচয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে দলের শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখাই সব সময় কাম্য কিনা। আমরা স্বীকার করি জাতীয় জীবনে এমন এক একটা সময় আসে যখন দলগত শৃঙ্খলা ও সংহতির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে দলের আদর্শ ও প্রগতিকে বজায় রাখা কিন্তু তেমনি উপলক্ষ সচরাচর আসে না, আসে কদাচিৎ। আজ চারিদিক থেকে কংগ্রেসের উপর আক্রমন চলছে, এ সময়ে কংগ্রেসের সংহতি বজায় রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দলের মধ্যে মতের অনৈক্য প্রবল হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বেশী ভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাবের একটী গৌণ ব্যাপার নিয়ে। সেই ব্যাপারটী হ'ল এক হ'তে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লিখবার পদ্ধতি নিয়ে। এ ব্যাপারটী এতই গৌণ ও ছোট যে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে উভয় পক্ষের ভেদ এমন প্রবল হওয়ার কোন কারণ ছিল না ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের ক্ষতিপূরণ নিয়ে যে মতদ্বৈধ তা অবশ্য অর্থনীতির দিক দিয়ে কতকটা মৌলিক। ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও আশু ভবিষ্যত সংগতি (resources) আলোচনা করলে এ কথা সহজেই স্বীকার করতে হবে যে কোন অর্থনীতির পাঠ্য পুস্তকের সূত্র দিয়ে আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে যাওয়া সমীচীন হবে না। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে আপোষমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সঙ্গত ব'লে বোধ হ'বে। তাই এই প্রসঙ্গেও যে আপোষমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা হয়ত কোন পক্ষেরই মনঃপূত হয়নি। তবুও অনেকেই মনে করে যে ঠিকভাবে কাজ করতে পারলে অন্ততঃ বর্তমান প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে ঐ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত।

যদি এ কথা স্বীকার করি যে আজও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, তাহলে এর প্রতিষ্ঠানিক সংহতি ও সংগঠন বজায় রাখা দরকার। তাই মুষ্টিমেয় দু'চার জন ছাড়া বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যরা উভয় ক্ষেত্রেই আপোষমূলক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, মূলত দলের ও প্রতিষ্ঠানের সংহতি বজায় রাখার জন্য। বিধান পরিষদে কংগ্রেসী দলের এই আচরণ কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে অনুকরণীয় ব'লে আমরা মনে করি।

ত্রুটী স্বীকার—

এই সংখ্যায় প্রকাশিত "দয়িতা" নামক গদ্য কবিতাটি Louis Mandin নামক ফরাসী কবির লিখিত La Feance নামক ফরাসী কবিতার গদ্য অনুবাদ।

খোদেজা খাতুন

অন্ধছাত্রীর কৃতীত্ব

অন্ধ আলোক নিকেতনের ছাত্রী খোদেজা খাতুন এই বৎসর দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে খোদেজা ভারতীয় অন্ধ মহিলাদের মধ্যে এই কৃতিত্ব অর্জনে তৃতীয় এবং অন্ধ মুসলমান মহিলাদের মধ্যে প্রথম। এইবার উচ্চশিক্ষালাভের জন্য সে উইমেন্‌স্ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হইয়াছে। তাহার পূর্বে মাত্র আর একজন অন্ধ ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছে। সেও অন্ধ আলোক নিকেতনেরই, প্রাক্তন ছাত্রী—নাম শ্রীমতী প্রতিভা বাগচী।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

—অগ্নিবীণা—

দ্বাদশ বর্ষ | কার্ত্তিক—১৩৫৬ | সপ্তম সংখ্যা

বরণীয় তারা, স্মরণীয়

—কুন্তল চক্রবর্ত্তী—

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

ফুলটি ফোটে। একটি রাত্রি বা দুটি দিন সুধা বিতরণ করে—জীবনের কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায়। তার পর সে শুকিয়ে যায়, ঝ'রে পড়ে। জীবনের কর্ত্তব্য তাকে কেউ শেখায় না, বা এই কর্ত্তব্য ক'রে যাবার পথে অন্ততঃ আপাত-দৃষ্টিতে তার কোনো দ্বন্দ্ব সংগ্রাম নেই। মানুষের জীবনের সাথে এর যেন কোথাও কোনো মিল নেই। সংসারে জন্ম নেবার দিন থেকে মানুষ নানা মানুষের সংস্পর্শে আসে—সাক্ষাৎ, পরোক্ষ নানাভাবে সমা মানুষ মানুষের জীবনের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে কুটিয়ে আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে প্রবৃত্তির নিয়ত সংঘর্ষের ভিতর যে যেমন পারে, জীবন কাটিয়ে দিয়ে যায়।

এক একটা জায়গায় ইতিহাসের মোড় ফেরে। তেমন জায়গাটিতে যারা জন্ম নেয়, জন্ম নিয়ে ইতিহাসের মোড় ফেরাবার কাজে হাত লাগায়, তাদের এক একটি মানুষকে দেখে মনে হয় যেন স্বয়ংসিদ্ধ। তাদের বাপমা, বোন, নিকট আত্মীয়বন্ধু—সবাইকে ধ'রে ধ'রে, তাদের চিন্তা ও কাজের ধারার সাথে মিলিয়ে বিচার ক'রে, এর চিন্তা বা কাজের ধারার কোনো উৎস খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হয়, ফুলটির মতোই এ যেন জীবনের কর্ত্তব্যের সন্ধান নিয়ে এসেছিল আপন উপাদানের মধ্যেই লুকিয়ে। সেই কর্ত্তব্য প্রাণপণে করবার সাধনায় জীবনকে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে গেল।

কলকাতার এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের ছেলে কুন্তল। জয়নগর-মজিলপুরের এক পুজারী ব্রাহ্মণবংশে এঁর জন্ম। কুন্তলের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন বাবা সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চ'লে যান। শিশুকালেই মাকে হারান। মামাদের কাছে মানুষ হন। দাদা সমাজে চাকরী করতেন। কুন্তল স্কুলে ভাল ছাত্র ছিলেন। বেশী পড়াশুনো করতেন না, বা করার সুযোগ পেতেন না; কিন্তু পরীক্ষার ফল ভালই হ'ত। এক পিতৃবন্ধুর সাহায্যে তিনি সীতারামপুরের নিকটবর্তী এখোড়া স্কুলে পড়াশুনো ক'রে ১৯১৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ ক'রে বৃত্তি পান। তার পর মেট্রোপলিটান কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তে শুরু করেন।

বালক কুন্তল এখোড়ার ময়দানে ঘুরতেন, আর আপন মনে জীবনের ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে চেষ্টা করতেন। পরীক্ষায় পাশ ক'রে সংসারধর্ম করা,—সে তো সবাই করে। বাপদাদারা পুরুষপরম্পরায় ঐ কাজই ক'রে গেছেন। এই যদি মানুষের একমাত্র ধর্ম হবে, একমাত্র কর্ত্তব্য হবে, আজ আমার জাত গোলামের জাত কেন, আমার জাতের মানুষের এই পশুর স্তরের জীবন কেন? ক্ষুদিরাম, কানাই—এঁরা তো জীবনের সার্থকতার এক

নতুন পথ দেখিয়ে গেছেন। তা হ'লে গতানুগতিক সার্থকতার পথেই বা যাব কেন? অত্যন্ত শান্ত, মৃদু-প্রকৃতির কুন্তল। কিন্তু গতানুগতিকের প্রতি অন্তরের গভীরে কোথায় যেন ছিল তাঁর এক তীব্র ঘৃণা।

কয়েক বছর আগে কলকাতা অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়ে লুপ্ত হয়ে গেছে। সমিতির কর্মীরা অনেকে গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়ে মাণিকতলা বাগানের অবশিষ্ট কর্মীদের সঙ্গে এক হয়ে যতীন মুখার্জি, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রমুখ নেতৃবর্গের নির্দেশে কাজ করছেন। সমিতির শ্যামসুকুর শাখাটি মহামায়া ক্লাব নাম নিয়ে শরীরচর্চার, সেবাসমিতির কাজ করে। হরিপদ দাশগুপ্ত, ললিত বসাক সমিতির উৎসাহী কর্মী। বাইরে থেকে সতীশ চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি গুপ্তসমিতির সঙ্গে মহামায়া ক্লাবের যোগাযোগ রাখেন।

কলকাতায় এসে জীবনের নতুন সার্থকতার খোঁজে কুন্তল পাড়ার ক্লাবটিতে যোগ দিলেন। আপন আগ্রহে যোগ দিয়েছেন, কাজেই তিনি আপনার কাজই করেন সেখানে—অপর কারও দাসত্ব করেন না। আন্তরিকতায় তাঁর সব কাজই সফল হয়, সুন্দর হয়। কুন্তলের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, কাজ যা' পড়বে, যেমন ক'রে হোক, তাকে সফল ক'রে তুলতেই হবে, সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে করতেই হবে। 'অমুক বাধা পড়লো, কাজটি ক'রে উঠতে পারলাম না'—একথাটি প্রাণ গেলেও কোন বন্ধুর কাছে বা নেতৃস্থানীয়ের কাছে বলতে পারতেন না। তাই সবাই জানতেন, কুন্তলের উপর একটা দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়। দায়িত্বের কাজও তাই তাঁর উপরই বেশীর ভাগ চাপতো।

কুন্তলের কাছে অনেক সময় অস্ত্র, বোমা, এসিড ইত্যাদি থাকত। একদিন ও-পাড়ায় থানাতল্লাসীর সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় বন্ধুরা এসে এসিডের বোতলগুলি চাইলেন। নামাবার বেলায় একটি বোতল ফেটে গেল। মুখে বুকে এসিড প'ড়ে পুড়ে গেল। একটি শব্দ না ক'রে একে একে বোতলগুলি বের ক'রে দিলেন। তারপর, বন্ধুরা গোপনে যা' চিকিৎসা করাতে পারলেন, ক'রল। বাড়ীর বকুনি খেয়ে বাড়ীর ভিতরই লুকিয়ে কাটাতে লাগলেন—ছোট বোনটি অসামান্য ভালবাসা আর বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যে-কয়দিন পারলেন, সাহায্য করলেন। কিন্তু পাড়ার লোক, বিশেষতঃ মেয়েরা ঘরে সর্বত্র যাওয়া আসা করে। ব্যাণ্ডেজগুলো জামা আর আলোয়ানের তলায় যথা সম্ভব লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মোগলসরাই স্টেশনে হাওড়াগামী এক ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে বন্ধুত্ব জমে ওঠে। তাঁরই সাথে হাওড়ায় চ'লে যান। সেখানে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসেন এবং হিন্দি বলতে, পড়তে ও লিখতে শিখে আসেন। বন্দুক ছোড়াতেও সেখানেই হাত পাকান।

কলকাতায় যখন ফিরে এলেন ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রে বিপ্লবের আয়োজন অনেকখানি এগিয়েছে। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর চ'লে গেছেন। বিভিন্ন পথে অস্ত্র আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। তার জন্য আয়োজন ও প্রস্তুতির উৎসাহে কলকাতার কর্মীদল সদা চঞ্চল। নানাবিধ সাহসের কাজের ভিতর অর্থসংগ্রহের কাজ একটি। এই কাজে যতীন্দ্রনাথ থেকে শুরু ক'রে যুগান্তরদলের নেতৃস্থানীয় সবাই লুণ্ঠনের বিরোধী ছিলেন। কেবল বিশ্বযুদ্ধের কালে জার্মানীর সহায়তায় বিপ্লবের সুযোগ পাওয়া যাবে ব'লেই দ্রুত অর্থ সংগ্রহের জন্য এই উপায়টিকে সমর্থন করেছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীদলকে ইংরেজ এককালে বলতো এনার্কিষ্ট। জেথ্রো ব্রাউনের মতো বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রনীতির লেখকও বললেন, এঁদের এনার্কিষ্ট বলার কোনো অর্থ হয় না। এই কারণেই হোক, বা এঁদের হীনতর ক'রে দাঁড় করাবার উপায়ান্তর হিসাবে হোক, পরে এঁদের বলতে লাগলো টেররিষ্ট। গৃহস্বামী পোষা তোতাপাখিটিকে বলে, 'বলতো তোতা, আমি গাধা'—তোতা ঘাড় বেঁকিয়ে, গর্ব জানিয়ে পড়তে থাকে, 'আমি গাধা'। তেমনি, আমাদের বিদেশী শাসকরা শেখাল। আর, যে সম্বলে জাত ছিল দীনতম, সেই মৃত্যুর সম্বল আমাদের জাতকে দিল যে বাংলার

বিপ্লবীরা—তাদের আমাদের জাতসুদ্ধ তোতার দল বলতে শুরু করলো, এরা হয় এনার্কিষ্ট, নয়তো টেররিষ্ট।

কথা আছে, টলষ্টয় এবং ক্রপটকিন দুজনাই ছিলেন এনার্কিষ্ট। এঁদের মধ্যে টলষ্টয় ছিলেন হিংসার বিরোধী, আর ক্রপটকিন হিংসার সমর্থক। কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রে ছিলেন দুইজনা ঠিক বিপরীত। কুন্তলও দেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিপ্লবের সাধনায় সাহসের কাজে সাহসই দেখিয়েছেন, নৈপুণ্যই দেখিয়েছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কোনো মানুষকে দূরের কথা, একটা গৃহপালিত পশুকে আঘাত ক'রেও আপন অন্তরে ব্যথা পেতেন। আবার, সাহসের কাজেও গুলিভরা পিস্তল কোমরে গোঁজাই থাকতো, বিন্দুমাত্র ভীত চঞ্চল না হয়ে হাতের কৌশলেই নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে স'রে পড়তেন। অথচ প্রয়োজনে প্রিয়বন্ধুর প্রতিও গুলিবর্ষণে দ্বৈধ্যে পেয়ে বসতো না। প্রয়োজন অপ্রয়োজন বুঝতেও তাঁর নিমেষের বেশী বিলম্ব হ'ত না। সর্ব-দ্বন্দ্বমুক্ত মনে মুহূর্তের বিচারে তিনি যা কিছু করেছেন, তা সকলের আন্তরিক সমর্থনই সর্বদা পেয়েছে। অপরকে বা নিজেকে তাঁর কাজের জন্য কখনও অনুতপ্ত হ'তে হয়নি। সত্যিকার এনার্কিষ্ট যাদের বলে, ইংরেজিতে যাঁদের নীতি philosophical anarchism ব'লে পরিচিত, তাঁদের কল্পিত সমাজ চলতে পারে কুন্তলের মতোই একান্তভাবে সমাজের প্রয়োজনের দিকে চেয়ে যাঁদের জীবন গ'ড়ে উঠেছে, তাঁদেরই নিয়ে। বাংলার বিপ্লবের ক্ষেত্রেই এমনি দু'পাঁচজন ছিলেন—যাঁদের বাইরের আইন শাসন নিয়ে জীবনের কোনো অবস্থাতে, কোনো প্রলোভনেই বাঁধবার কোনো প্রয়োজন কল্পনা করা চলে না।

একনিষ্ঠভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্রে কাজ করার ফলে ডাক পড়লো, কুন্তলকে বাড়ীঘর, পড়াশুনো ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। এই অবস্থার নাম বললে কুন্তল প্রথম কিছুদিন চন্দননগরে শিক্ষকতার কাজ করেন। তার আগেও পড়াশুনোর সুযোগ কমই ছুটতো. বাড়ীতেও কম সময়ই থাকতেন। তবু আই এ পরীক্ষাটা দিয়ে দিলেন। চন্দননগরে থাকতে খবর পেলেন, প্রথম বিভাগেই পাশ করেছেন।

চারদিকে তখন ধরপাকড়, উদ্বেগ, অশান্তি, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম। তবু পলাতকের সমাজে প্রায় সমবয়স্ক পাঁচটি বন্ধু—সুরেন কুশারি, চারু ঘোষ, কুন্তল, জীবন চ্যাটার্জি এবং আমি—কি আনন্দেই আমাদের দিন কাটতো। পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসায় জীবনের ভ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ বেদনা কখনও মনে একটু ছায়াও ফেলতো না। কুন্তলের বুদ্ধির দীপ্তি, স্নিগ্ধ হাসি, রসিকতা, অনাবিল বন্ধুপ্রীতিতে সবাইকে মুগ্ধ ক'রে রাখতো। ২৪ পরগণার অলক চক্রবর্তী বলতেন, কুন্তলদা পিঠে একটা থাপড় দিয়েই প্রাণ কেড়ে নেয়। নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও যাদুগোপাল অমর চাটার্জি, অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবর্তী, নলিনী কর—এদের সবার কাছেই কুন্তল ছিলেন এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ স্নেহের উৎস।

১৯১৭ সাল। বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন —যাঁদের নামে মোটা হুলিয়া জারী রয়েছে—তাঁরা ছাড়া আর কর্মীরা প্রায় সবাই ধরা প'ড়ে গেছেন। মন্টেগু তখন ভারতবর্ষে। শীঘ্রই শাসন-সংস্কার পাওয়া যাবে, এই আশায় জাত বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সংস্কার-প্রীতিতে জাতের মনে একটা অধোগতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কলকাতায় সেবারে কংগ্রেসের অধিবেশন। সেই উপলক্ষে লোকমান্য কলকাতায় এসেছেন। কুন্তল তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। উদ্দেশ্য, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও বিনয় দত্ত গোয়াতে ধরা প'ড়ে যাবার পর বাংলা ও মহারাষ্ট্রের যে-যোগ ভেঙে গেছে, সেই যোগ পুনঃস্থাপিত করা, আর দেশকে ঐ সংস্কার-প্রীতির অধোগতি থেকে কি ক'রে বাঁচানো যায় সেই আলোচনা করা। লোকমান্য আর বিপিনচন্দ্র-লাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরামর্শে কুন্তল এক ইস্তাহার প্রচার করেন; "We have no concern in Mr. Montagu coming and going. He is coming

in peace, he may depart in peace··· Remember your brothers who are perishing in jails and rotting in swamps·····Remember, watch and work." এই ইস্তাহারের কথা বলতে গিয়ে রাওলাট রিপোর্টে কুন্তল চক্রবর্তী নামক যে পরিচ্ছেদটি আছে, তা'তে স্বাধীন ভারতের সীলের যে পরিকল্পনা বেরিয়েছে, কুন্তলের স্বাধীন চিন্তাশক্তির সামান্য আভাস তার ভিতরও পাওয়া যায়।

সব দলের প্রায় সব কর্মী ধরা প'ড়ে যাওয়ায় যুগান্তরের ও অনুশীলনের অবশিষ্ট কর্মীরা তখন কতকটা একযোগেই চলছেন। এই সময় কেষ্ট সাহা ব'লে অনুশীলনের একজন বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় কর্মীকে যুগান্তরের একটি নিরাপদ আশ্রয়—তিলজলার রেলওয়ে কর্মচারী নেপাল ঘোষের বাড়ীতে রাখা হয়। বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির লোককে নানুষ চিনবার ক্ষমতা খানিকটা অর্জন করতে হয়ই। কুন্তলের এই ক্ষমতাটি ছিল অসাধারণ। কেষ্ট এই আশ্রয়ে আসবার দু'চার দিন পরই কুন্তল তার বিলাসপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে একদিন বল্লেন, ভাই, এ লোক ধরা পড়লে যে কি অনর্থ করবে বলা যায় না। কয়েক মাসের মধ্যে এই বিলাসপ্রিয়তা যখন তার সব চরম লক্ষণে ফুটেছে, তখন কুন্তল একদিন অপর এক আশ্রয় থেকে কেষ্টকে ধমকে বের ক'রে দেন। অথচ এ আশ্রয় কেষ্টরই রচিত। এই বিলাসপ্রিয়তার ফলেই কয়েক দিনের মধ্যে সে ধরা পড়ে। পুলিশের হাতে প'ড়ে প্রথম কাজটি সে করে কুন্তল আর তাঁর সঙ্গী চারু ঘোষকে ধরিয়া দেওয়া।

কুন্তল বলতেন, মারতে মারতে মেরে ফেলবে—এই তো বিপ্লবীর জীবন। এ লোককে নিয়ে পুলিশ হাঙ্গামে তাই আর ঘাঁটাঘাঁটি করে নাই। ১৯১৮ সালের ৫ আইনে বন্দী হয়ে কুন্তল ঢাকা জেলে প্রায় দুই বৎসর কাটান। এই দুই বৎসর প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় কাটে। পড়াশুনো করারও বিশেষ সুযোগ পান নাই। ধ্যান ধারণাতে এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেই প্রায় কাটিয়ে দেন। ১৯২০ সাল। তখন অন্তরীণদের ও রাজবন্দীদের অনেককে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মুক্তির আগে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজবন্দীদের সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ করছে। বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী এবং আই বি'র ডি আই জি যান ঢাকা জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। সর্বশেষ ডাক পড়েছে কুন্তলের। ওরা দুজন টেবিলের সামনে ও পাশে দুখানা চেয়ারে ব'সে। আর কোনো চেয়ার সেখানে নেই।

কুন্তল ঢুকেই বলেন, 'চেয়ার কোথায়?' অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী বলে, 'আমার সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবেন, দাঁড়িয়েই কথা বলতে হবে।' কুন্তল টেবিলের উপর চেপে ব'সে বলেন, 'তুমি কে শুনি?' 'আমি বাংলা সরকারের অ্যাডিশনাল সেক্রেটারী।' কুন্তল বলেন, 'তোমার সঙ্গে কথা না বললে কি আসে যায় আমার?' সেক্রেটারী বলে 'বেশ, না বললেন।' কুন্তল উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে বলেন, 'ভদ্রতা যে জানে না, তার সাথে আবার কথা কি?

এর পর, কুন্তল বদলি হ'লেন রাজসাহী জেলে। তিন বছর বাদে আবার সাক্ষাৎ। কুন্তলের প্রথম প্রশ্ন, 'ভবিষ্যতের কর্মপন্থা কি? শুধুমাত্র গুপ্ত সমিতির কাজের ফলে দেশ স্বাধীন হবে না।'

তখন জালিয়ানওয়ালাবাগ হয়ে গেছে। গান্ধীজি কংগ্রেসকে বিপ্লবী রূপ দিচ্ছেন। যুগান্তরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা বিভিন্ন জেলে ছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই স্বাধীনভাবে স্থির করেছেন, জেল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে, সর্বত্র জনসাধারণের কাছে বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতে হবে। অল্পদিনের মধ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত, চারু ঘোষ প্রভৃতিও রাজসাহী জেলে এলেন। ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা চললো দিনের পর দিন। কুন্তল অল্প কয়েক মাসে বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলো বইও প'ড়ে ফেললেন।

একে একে সবাই খালাস হ'লেন। কুন্তল ও বর্তমান বক্তা নাগপুরে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাত করেন, এবং পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। উভয়েই এঁদের কল্পিত কার্যধারাতে মোটামুটি সমর্থন জানান।

১৯২১ সালের প্রথমেই মুক্ত রাজবন্দীদের মধ্যে কুন্তল, চারু, কিরণ মুখার্জি, জীবন চাটার্জি এবং খুলনার রসিক লাল দাস, যশোরের অমূল্যরতন দাস ময়মনসিংএর অসমীন নাগ, ফরিদপুরের কৃষ্ণদাস চক্রবর্তী, চট্টগ্রামের মনি দে, উপেন ভট্টাচার্য এবং আরও সব কর্মীদের নিয়ে দৌলতপুরে সত্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

দৌলতপুর কলেজের নয়ন্তন্ত্র ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, কলেজের সীমানার মধ্যে পর্যন্ত আমাদের জন্ত একটি মেসের বাড়ী হ'তে পারবে না, আমাদের সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কি? আমরা কেন যোগ দেব এই আন্দোলনে? সত্যাশ্রমের কর্মীরা অনেক সময় এঁদের এখানেই প'ড়ে থাকতেন, ছাত্ররাও অনেক সময় আশ্রমে কাটাতেন। দেখলেন, অন্ততঃ এঁদের ভিতর জাতি ভেদের সংস্কার পর্যন্ত নেই। ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এর পর, কুন্তল ও চারু যান বাগেরহাট কলেজে। সেখানেও ছাত্ররা কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন।

অনলসভাবে খাটতে পারতেন ব'লেই আশ্রমে কুন্তলের প্রচুর খাটুনি পড়ে। শরীরে সইলো না। পলাতক জীবনেই একদিন হঠাৎ গলা দিয়ে রক্ত ওঠে। অতুল ঘোষের ব্যবস্থায় ডাঃ গোবিন্দিন ব'লে চন্দননগরের সিভিল সার্জন কুন্তলকে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর চিকিৎসায় এবং ফরাসী নার্সের যত্নে কুন্তল অল্পদিনে সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে পলাতক জীবনে কয়েক মাসে তাঁর শরীর বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা জেলে আবার খারাপ হ'তে থাকে। পরে আশ্রম জীবনের কৃচ্ছ সাধনে যক্ষ্মারোগ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে সাংঘাতিক হয়ে উঠলো। খুলনাতে, যশিধিতে, ভায়মণ্ড হারবারে, উত্তরপাড়ায় রেখে ডাঃ অমূল্য উকিল, আশুতোষ দাস, তুলসী ভট্টাচার্য, যাদুগোপাল মুখার্জি, সৌরীন মুখার্জি সযত্নে চিকিৎসা করেন। কিন্তু ফল কিছু হ'ল না। ১৯২৩ সালের ১২ই এপ্রিল উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠে অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, মন্মথ বিশ্বাস প্রভৃতি সকলের সস্নেহ যত্ন আর অক্লান্ত সেবাকে ব্যর্থ করে দিয়ে কুন্তল চ'লে গেলেন।

ছদিনের ফুলটি সুষমা বিলায় ক'রে ঝ'রে পড়লো। তার সুষমা সে যেন সাথে ক'রেই নিয়ে এসেছিল। বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত, আপন সৌন্দর্যে সে আপনা থেকেই বিকশিত হয়ে রয়েছে। বুকের অতি কাছা-কাছি না গেলে টেরও পাওয়া যেত না কি কড় বইছে

কুন্তল চক্রবর্তী

সেখানে। ঝড়ে যখন উন্মত্ত ক'রে তুলতো, ঘরের বা বারান্দার এক ধার থেকে আর এক ধার পর্যন্ত ঝড়ের বেগেই ঘুরতেন। কখনও বা ঝপ্ ক'রে এসে খাতা টেনে লিখতে ব'সে যেতেন। তখন পাতার পর পাতা লিখে যাচ্ছেন—বাংলায় বা ইংরেজিতে। প্রায় কোথাও কাটাছাঁটা নেই—সে-লেখাকে সেই অবস্থাতেই ছাপতে দেওয়া চলতো—যেমন চমৎকার তার ভাষা, তেমনি গভীর তার ভাব। কিন্তু পরাধীন দেশের অভিশাপে সে রত্ন হারিয়ে গেল—পুলিশে নিল, কি, কি হ'ল, তা কেউ বলতেও পারে না।

[৪৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

টাকার দর

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

[যুগান্তর পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক]

বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারত সরকার টাকার বৈদেশিক দর কমাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে টাকার দর ছিল—মার্কিণ ডলার মুদ্রায় ৩০·২২৫ সেন্ট (১০০ সেন্ট = ১ ডলার); এখন দর হইয়াছে ২১ সেন্ট; পূর্ব্বে ডলার মুদ্রার দর ছিল ৩।৵০ আনা, এখন দর হইয়াছে ৪৸৯ পাই। গ্রেট বৃটেনও ঠিক এই অনুপাতে পাউণ্ড মুদ্রার দর কমাইয়াছে। পূর্ব্বে ১ পাউণ্ডের বিনিময়ে ৪·০৩ ডলার ভাঙ্গানী পাওয়া যাইত, এখন ২·৮০ ডলার পাওয়া যাইতেছে। ইহার তাৎপর্য্য :

> পূর্ব্বে ১৲ টাকার জিনিষ পাঠাইয়া ভারতবর্ষ ৩০·২২৫ সেন্টের জিনিষ পাইত; এখন ২১ সেন্ট দরের টাকার বিনিময়ে সমপরিমাণে জিনিষ ক্রয়ের জন্য আরও ৯·২২৫ সেন্টের (অর্থাৎ ৪৩·৯ শতাংশ বেশী) জিনিষ পাঠাইতে হইবে। অন্য দিকে ১৲ টাকার জিনিষ পাঠাইয়া পূর্ব্বে যেখানে ৩০·২২৫ সেন্টের জিনিষ পাওয়া যাইত, এখন সেখানে মাত্র ২১ সেন্টের—অর্থাৎ ৩০·৫ শতাংশ কম—জিনিষ পাওয়া যাইবে সহজ ভাষায় আন্তর্জ্জাতিক মান অনুসারে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে।

সরকারী মুখপাত্রগণ দৃঢ়তার সহিত, বারবার বলিয়াছিলেন যে আন্তর্জ্জাতিক মান অনুসারে টাকার দর কমাইলেও গার্হস্থ্য অর্থনীতিক্ষেত্রে আদৌ কোন প্রতিক্রিয়া ঘটিবে না; বৃটেন এবং অন্য বহু দেশ নিজ নিজ মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য সম অনুপাতে কমাইয়া দেওয়ায় ঐ সকল মুদ্রার সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য অপরিবর্ত্তিত আছে। সেজন্য ঐ সকল দেশজাত পণ্যগুলি পূর্ব্বেকার সমান খরচেই পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব হইতে মজুত বিদেশী পণ্যের দরও চড়িবে না; ভারতে উৎপন্ন শিল্প পণ্যের মধ্যে যে সকল জিনিষের জন্য ডলার এলেকাজাত কাঁচা মাল কিম্বা উপকরণ আবশ্যক হয়—মাত্র সে সকল পণ্যের দর সামান্য চড়িবে; এবং ভবিষ্যতে ডলার এলেকা হইতে আমদানী পণ্যের দর চড়িবে। মোট সরবরাহের অতি নগণ্য অংশই ডলার এলেকার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া ইহার ফলে সংসার খরচ বাড়িবার আশঙ্কা নাই। বাস্তবক্ষেত্রে এই পূর্ব্বাভাষ অসার কল্পনা-বিলাসে পরিণত হইয়াছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্বত্র ষ্ট্রেপটোমাইসিন, পেনিসিলিন প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য মার্কিণ-ঔষধ উধাও হইতে আরম্ভ করে; পূর্ব্ব হইতে মজুত ডলার এলেকাজাত পণ্যের দর ৬০ শতাংশ পর্য্যন্ত এবং অন্যান্য দেশজাত মালের দর ৫০, ৩৪ শতাংশ পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়; এমনকি ভারতীয় কলওয়ালা-ব্যবসায়ীরাও মিহি ও মাঝারি কাপড় ও সুতা, চট ও বস্তা, মশলা, সরিষার তৈল প্রভৃতির দর দ্রুত চড়াইতে আরম্ভ করে। সরকার মাত্র অর্থনীতিশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত সূত্রগুলির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ভবিষ্যতে যাহাই ঘটুক না কেন, পূর্ব্বেকার বাট্টা অনুসারে আমদানী পণ্যের খরচ চড়ে নাই, কিম্বা দেশজাত পণ্যের পড়তা খরচও ভবিষ্যতে কয়েক মাস পর্য্যন্ত চড়িবে না—সুতরাং বুচরা দর চড়িবারও কোন কারণ নাই। বাস্তবক্ষেত্রে শিল্পব্যবসায়ীদিগের মুনাফা-লালসা অর্থনীতিশাস্ত্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলে না। তাহারা দেখিতে পাইল যে ভবিষ্যতে যখন মার্কিণজাত পণ্যের দর চড়িবে, তখন এখন হইতেই গুদামজাত মাল সরাইয়া দর চড়াইবার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসিয়াছে; একদিকে ডলার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির, অন্য দিকে আমদানী হ্রাসের ফলে ভবিষ্যতে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যের গুরুতর ঘাটতি পড়িবে; সে সুযোগে দেশী, বিলাতী, মার্কিণ—প্রত্যেকটি পণ্যেরই দর চড়াইয়া অতিরিক্ত মুনাফা লুটিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই প্রলোভনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা সরকারী পূর্ব্বাভাষ ও আশ্বাস একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপের দ্বারা মধ্যবর্ত্তী

পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে গৃহস্থের সংসার খরচ প্রতি টাকায় প্রায় চারি আনা হিসাবে চড়িয়াছে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহু বিজ্ঞাপিত প্রতিশ্রুতি পালন করিতে না পারায় জাতীয় সরকারের কর্ণধারগণ জনসাধারণের নিকট অপদস্থ হইয়াছেন।

সরকারী হিসাবে ভুল

বস্তুত বিদেশী মালের ও দেশী মালের দর চড়াইয়া শিল্প ব্যবসায়ীরা সরকারী পূর্ব্বাভাষ বাণচাল করিয়া দিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহারা যাই করুক না কেন, ভবিষ্যতে আমদানী পণ্যের পড়তা খরচ সম্পর্কে সরকারী হিসাবেও গুরুতর ভুল ছিল। অর্থনীতির সূত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সরকার ধরিয়া লইয়াছিলেন যে সব দেশেই স্থানীয় মুদ্রার ভিত্তিতে মূল্যস্তর অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; এবং বিলাতী পাউণ্ড ওলন্দাজ গিল্ডার, বেলজিয়ামের ফ্রাঁ, অষ্ট্রেলিয়ার পাউণ্ড, সিংহলী ও ব্রহ্মী টাকা প্রভৃতির সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য যখন অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে—তখন ঐ সকল দেশজাত পণ্য পূর্ব্বেকার সমান দরেই আমদানী করা যাইবে। কিন্তু বাস্তব জীবনে এতটা সোজা হিসাবে লেনদেন চলে না। ডলার এলেকাজাত পণ্যের দরই সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহার সহিত প্রতিযোগিতার জন্যই ষ্টার্লিং এলেকার দেশগুলি ডলার পণ্যের দরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পণ্য বিক্রয় করিত। বাট্টা হ্রাসকারী দেশগুলিতে ডলার পণ্যের দর ৪৪ শতাংশ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্লিং এলেকার, বাট্টা হ্রাসকারী দেশগুলিও ক্রেতা-সকলগুলিতে ঘাটতির ও মূল্য বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া চড়া দর আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া নিজ নিজ দেশের মুদ্রার গমের দর চড়াইয়া ডলার মুদ্রার ভিত্তিতে পূর্ব্বেকার সমান দর দাবী করিয়াছে। মাত্র এই একটি খাতে অষ্ট্রেলিয়া ১৬০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২ কোটি পাউণ্ড বেশী দর আদায় করিতে পারিবে। বৃটেন বিভিন্ন ধাতু, আলানী তৈল, তুলা, ও রকমারি জিনিষের দর চড়াইয়াছে। মালয় রবারের, সিংহল নারিকেল তৈলের, ব্যবসায়ীদিগের মারফতে ভারতবর্ষ গোলমরিচ, চট, পাট, কাপড়, সুতা, চিনি, গুড়, এবং রকমারি জিনিষের দর চড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় স্বদেশের ব্যবসায়ীদিগকে অন্যান্য বাট্টা হ্রাসকারী দেশে ডলার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহারা শুধু রপ্তানী বেশিয়া ঘরে ফিরিবেন না, সহযাত্রীদিগের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া কিছু রেন্তও সংগ্রহ করিবেন। অন্যদিকে এই সকল দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারেও যে দর প্রকৃত পরিমাণে চড়িয়াছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড অনুমান করিয়াছিলেন যে ইহার ফলে ইংরাজদিগের সংসার খরচ ১ শতাংশ বাড়িবে; অর্থনীতিকগণ সে হিসাব অগ্রাহ্য করিয়া ১০ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধি অনুমান করিতেছেন। ভারত সরকার অনুমান করিয়াছিলেন যে সংসার খরচ বাড়িবে না। কিন্তু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ জে, পি, সিংহ সংসার খরচ ৩০ শতাংশ বাড়িবে বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কলিকাতায় সংসার খরচ ১৯৩৯ আগষ্ট মাসের সহিত তুলনায় ৪'৮৪ গুণে উঠিয়াছে ইহা আরও ৩০ শতাংশ চড়িয়া ৬'৩১ গুণে উঠিলে জনসাধারণের দৈনন্দিন অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

বাট্টা হ্রাসের অনুকূলে সরকারী যুক্তিগুলিও অন্তঃসারশূন্য। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে ভারত হইতে রপ্তানী জিনিষগুলির চাহিদা সীমাবদ্ধ; বাট্টা হ্রাসের দ্বারা বিদেশের বাজারে উহার দর কমাইয়া দিলেও রপ্তানী বাড়িবার আশা নাই, অথচ আভ্যন্তরীণ বাজারে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য্য। সেজন্য তাঁহারা প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে বৃটেন বাট্টা হ্রাস করায় এবং আরও বহু দেশ কর্ত্তৃক বাট্টা হ্রাসের আশঙ্কা দেখায় তাঁহারাও সমব্যবস্থা অপরিহার্য্য বলিয়া স্থির করেন। "ষ্টার্লিং এলেকার সহিতই ভারতের অধিকাংশ বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ঐ সকল দেশ হইতে রপ্তানী পণ্যের দর কমিয়া যাওয়ায় উহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হ্রাস পাইত। অন্যদিকে সুলভ বিদেশী মাল আমদানীর ফলে ভারতীয় শিল্পগুলিও বিপন্ন হইত।" সরকার

অবশ্য আশ্বাস দেন যে আলোচ্য সিদ্ধান্তের ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের দর কমিয়া যাওয়ায় রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িবে এবং বহির্ব্বাণিজ্যে ঘাটতি কমিবে।

কিন্তু অঙ্কের হিসাব করিলেই সরকারী যুক্তির অসারতা বুঝিতে পারা যায়। প্রথমতঃ তাঁহাদের স্বীকারোক্তি অনুসারে দর কমিলেও রপ্তানী বাড়িবার আশা নগণ্য। অথচ বাট্টা হ্রাসের ফলে বৈদেশিক দর কমিয়া যাওয়ায় পূর্ব্বেকার সমপরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা ৪৪ শতাংশ বেশী মাল পাঠাইতে হইবে। অর্থাৎ রপ্তানী বৃদ্ধির মধ্যে প্রথম ৪৪ শতাংশ বাট্টা হ্রাসজনিত ক্ষতিপূরণ করিতে নিঃশেষ হইবে, তদপেক্ষা বেশী রপ্তানী করিতে পারিলে বাড়তি অংশটা অতিরিক্ত রোজগার হইবে এবং কম রপ্তানী হইলে আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিবে। গণপরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে মাথাইও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন; এবং ডলার মুদ্রার আয় হ্রাসজনিত ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যে সু-উচ্চহারে রপ্তানী শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন।

ক্ষতির পরিমাণ

দেখা যাইতেছে যে বাট্টা হ্রাসের দ্বারা ভারতবর্ষ কোনদিক দিয়াই লাভবান হয় নাই। বরঞ্চ নানাদিক দিয়া গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ মূল্যবৃদ্ধি-জনিত গুরুত্ব পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত ব্যালান্সে যাহা ভারতের নিট পাওনাও ৩০% কমিয়া গিয়াছে। বাট্টা হ্রাসের পূর্ব্বদিন এই খাতে বৃটেনের নিকট ভারতবর্ষ প্রায় ৭৮০ কোটি টাকা পাইত পূর্ব্বেকার বাট্টা অনুসারে উহা ডলার মুদ্রায় রূপান্তরে ২৩৬ কোটি ডলার পাওয়া যাইত, নূতন বাট্টা অনুসারে মাত্র ১৬৪ কোটি ডলার—অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ৭২ কোটি ডলার কম পাওয়া যাইবে। ভারতীয় টাকার অঙ্কে, বর্ত্তমান বাট্টাহার অনুসারে এই লোকসানের পরিমাণ প্রায় ২৮৩ কোটি টাকা—যুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মোট আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। লোকসান না পড়িলে মাত্র এই টাকা দিয়াই ভারতে জলস্থ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ও নদী উন্নয়নের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংগ্রহ করা যাইত।

উপরোক্ত তহবিলটি সুদীর্ঘকাল যাবৎ বৃটেনে গচ্ছিত আছে; এবং ৩১ সেন্ট হিসাবে টাকার দর ধরিয়াই উহা বৃটেনে পাউণ্ড মুদ্রায় লগ্নী করা হইয়াছিল। সেজন্য ভবিষ্যতে পাউণ্ড মুদ্রার দর যাহাই হউক না কেন—পূর্ব্বেকার পাওনা তহবিল হইতে ৩০% শতাংশ খারিজ করার কোন অধিকার বৃটেনের ছিল না। তথাপি বৃটিশ সরকার একতরফা সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন দেশের নিকট তাঁহাদের ঋণ কমাইয়া দিয়াছেন। এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লেখক দীর্ঘকাল যাবৎ অনুরোধ জানাইয়াছেন। আর্জ্জেন্টিনা ও ইরাণের নিকট বৃটেনের ঋণ পাউণ্ড মুদ্রার তৎকালীন স্বর্ণমূল্য অনুসারে পরিশোধ করার সর্ত্তে বৃটিশ সরকার সম্মত হইয়াছিলেন। ভারতে বৃটিশ ঋণ সম্পর্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা করার জন্য আমরা পরামর্শ দিয়াছিলাম কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সে সম্পর্কে কিছুই করেন নাই—একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। বাট্টা হ্রাসের পরেও পূর্ব্বেকার ঋণটা তৎকালীন বাট্টা অনুসারে পরিশোধের জন্য তাঁহারা বৃটেনের উপর চাপ দিতে পারিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন দাবীও উত্থাপিত হয় নাই। দরিদ্র একটা জাতির অশেষ কষ্টার্জ্জিত সম্পদ হইতে এতগুলি টাকা বৃটেন আত্মসাৎ করিল—আর ভারত সরকার একেবারে টুঁ শব্দটি করিলেন না। বৃটেনের প্রতি তাঁহাদের অহেতুকী প্রীতি আরও কি সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবে—মাত্র ভবিতব্যই তাহা বলিতে পারে।

ষ্টার্লিং ব্যালান্সের ৩০% শতাংশ খারিজ করার ব্যবস্থায় মৌন সম্মতি জানাইয়াও ভারত সরকার ক্ষান্ত হন নাই; ডলার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সুযোগে ব্রিটিশ ও বাট্টা হ্রাসকারী অন্যান্য দেশের শিল্পব্যবসায়ীদিগকে ৪৪ শতাংশ পর্য্যন্ত দর চড়াইয়া এদেশের বাজারে পণ্য বিক্রয়ের সুযোগ দিয়াছেন। ফলে বিদেশীরা ন্যায্য দরের উপর অতিরিক্ত মুনাফা লুটিতে থাকিবে এবং দেড় গুণ, দুই গুণ চড়া দরে পণ্য ক্রয়ের জন্য ষ্টার্লিং

ব্যালান্সের অবশিষ্টাংশও দ্রুত নিঃশেষ হইবে।

পাকিস্তান সরকার বাট্টা হ্রাস না করার জন্যও ভারতের শিল্পবাণিজ্য গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। ভারতের কয়েকটি শিল্প পাকিস্তান হইতে আমদানী পাট, মাঝারি আঁশের তুলা এবং কাঁচা চামড়ার উপর নির্ভরশীল। নূতন বাট্টা অনুসারে পাকিস্তান হইতে আমদানী জিনিষগুলির দর ৪৪ শতাংশ চড়িয়াছে, সে দরে কাঁচা মাল কিনিলে ভারতীয় কারখানার পড়তা খরচ চড়ে, রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যাহত হয়। এই অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের প্রতিকারকল্পে ভারতীয় শিল্প পরিচালকগণ পাকিস্তানজাত কাঁচা মাল ক্রয় বন্ধ রাখিয়াছেন এবং ভারতের অভ্যন্তরে পাটের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া অভ্যন্তরীণ ফসলটা নির্দ্দিষ্ট দরে ক্রয়ের ব্যবস্থা করা সরকার তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ভারতে বিক্রয় বন্ধের ফলে পাকিস্তানে পাটের দর অত্যধিক কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয় মুখপাত্রগণ আশা করেন যে পাকিস্তানের পক্ষে হয় বাট্টা নয় দর কমাইয়া ভারতের সহিত আপোষ মীমাংসা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অন্যদিকে অপরপক্ষও পাট ব্যবসায়ী-দিগের (ইহাদের অধিকাংশই অমুসলমান ও ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিক) উপর চাপ দিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দরে পাট কিনিতে বাধ্য করিতে চাহেন। রাজায় রাজায় এই যুদ্ধে শেষ পরিণতি যাহাই হউক না কেন—কি ভারতে, কি পাকিস্তানে উভয়ত্রই সাধারণ নাগরিকদিগের ক্ষতি অনিবার্য্য। পরস্পর সমঝোতায় পাকিস্তানী পাটের দর কমিলেও চাষী সর্ব্বস্বান্ত হইবে, আর আপোষের অভাবে পাট বিক্রয় বন্ধ থাকিলেও তাহারা মরিবে। অথচ পাকিস্তানে যে দরই থাকুক না কেন, পাট ব্যবসায়ীরা ভারত সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট দরে পাট বেচিবে বলিয়া আশা করার কারণ নাই। চাহিদার তুলনায় এই বৎসর পাটের প্রচুর ঘাটতি পড়িয়াছে, সে সুযোগ লইয়া কলওয়ালাদিগের মত পাট ব্যবসায়ীরাও দর চড়াইবে। লাভের মধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নে পাটের দর বাঁধিয়া দিয়া সরকার এখানকার চাষীদিগকে বিক্রয় মূল্যের ন্যায্য অংশে বঞ্চিত করিয়াছেন মাত্র।

উভয় সরকারই পরস্পর বাট্টা হার সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে টালবাহানা করিতেছেন। ইতিমধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার লেনদেন বন্ধ থাকায় জনসাধারণ দুর্ব্বহ ক্লেশভোগ করিতেছে। পশ্চিম বাঙ্গলায় পণ্য রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় পূর্ব্ব বাঙ্গলার জেলে ও চাষীর রোজগার অত্যধিক কমিয়া গিয়াছে; আবার পশ্চিম বাঙ্গলাতেও অত্যাবশ্যক বিভিন্ন জিনিষের গুরুতর ঘাটতি পড়িতেছে ও দর চড়িতেছে। কর্ম্মরত ব্যক্তিরা অপর রাষ্ট্রের নিজ নিজ পোষ্যদিগের নিকট টাকা পাঠাইতে না পারায় উভয় অঞ্চলেই বহু গৃহস্থ একসঙ্গে রোজগার ও পাওনাভাত সংগ্রহের সমস্যা সমাধান করিতে পারিতেছে না।

বাট্টা হ্রাসের রহস্য

বিভিন্ন দিক দিয়া গুরুতর ক্ষতির ও অপ্রত্যাশিত জটীলতার অনিবার্য্য আশঙ্কা স্বত্বেও ভারত সরকার বাট্টা কমাইয়াছেন কেন—সে সম্পর্কে জনসাধারণ স্বভাবতঃই আগ্রহ বোধ করিতে পারে। বাট্টা হ্রাসের দ্বারা লাভ-বান পক্ষগুলির পরিচয় প্রকাশ করিলেই সে রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ, বাট্টা হ্রাসের দ্বারা ভারতীয় কর্ম্মচারীরা টালিং ব্যালান্স আদায়ের ব্যাপারে গাফিলতি গোপন করার সুযোগ পাইয়াছেন। উপরোক্ত খাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে প্রায় ৭৮০ কোটি টাকা পাউণ্ড মুদ্রার লগ্নী ছিল। পাউণ্ড মুদ্রার দর ৪'০৩ ডলার হইতে কমিয়া ২'৮০ ডলার ধার্য্য হওয়ায় উহা হইতে ২৪০ কোটি টাকার মত খারিজ হইয়া যায়। তখন টাকার দর অপরিবর্ত্তিত রাখিলে রিজার্ভব্যাঙ্কে স্থিত অপেক্ষা প্রায় ২৪০ কোটি টাকার মত বেশী দাঁড়াইত এবং নূতন করিয়া দায় ও স্থিতে সমতা দেখাইতে হইত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই বিরাট লোকসানের খবর প্রকাশ হইয়া পড়িলে জনসাধারণের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ ঘটিত। সে ঝুঁকি না লইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় টাকার দরও সম অনুপাতে কমাইয়া হিসাবে মিল দেখাইয়া দেন। একটু ব্যাখ্যা করিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

পূর্ব্বে চায়ে ও দিতে উত্তর ঘরেই অঙ্কগুলি ৩০ সেন্ট—১৲ টাকা দরে লিখিত ছিল। দিতের ঘরে ৭৮০ কোটি টাকার দর কমিয়া ২১ সেন্ট দাঁড়ায়, তখন দায়ের ঘরেও সম্পূর্ণ অঙ্কটা ৩০ সেন্ট হইতে কমাইয়া ২১ সেন্ট ধার্য্য করা হয়। অর্থাৎ ষ্টার্লিং ব্যালান্স খাতে লোকসানের খরচ মেটান করার উদ্দেশ্যে সরকার চলতি নোট ও রেজকী, কোম্পানীর কাগজ, অন্যান্য লগ্নী ও অন্য সকল খাতে পাওনার পরিমাণ টাকাপ্রতি পাঁচ আনা কমাইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, সরকার অনুমান করিয়াছিলেন যে বাট্টা হ্রাসকারী দেশগুলিতে তৈয়ারী জিনিষ পত্রের রপ্তানী মূল্য কমিয়া যাওয়ায় ভারতে আমদানী মাল মজুতকারীরা ও শিল্প কারখানাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐ সকল দেশের মুদ্রার সহিত টাকার দর অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া তাঁহারা সেরূপ সম্ভাবনা রোধ করেন। ফলে বিদেশী মালের বিক্রয় মূল্য আরও চড়িয়া যাওয়ায় শিল্প ব্যবসায়ীরা অপ্রত্যাশিত পরিমাণে মুনাফা লুটিতেছে। মূল্যহ্রাস ও সংসার খরচ হ্রাস করাই নাকি ভারত সরকারের অভিপ্রায়। বাট্টা হ্রাসের ফলে সে আদর্শ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

বরণীয় তারা স্মরণীয়

অবিনাশ চক্রবর্ত্তী

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'য়ে যে সব লোক আরামের, সামাজিক সম্ভ্রমের ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে আসেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন—অবিনাশ চক্রবর্ত্তী। কোন সার্থকতা বা কোন কৃতকার্যতার প্রতিদান না পেয়েও যাঁরা বিপ্লবের সেবায় আমরণ দুঃখ-বৈন্যকে বরণ করেছেন, যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় বিসর্জ্জন দিয়েছেন অবিনাশ চক্রবর্ত্তী তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী।

অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর নিবাস পাবনা জেলায়। তাঁর পিতা মাধব চক্রবর্ত্তী ছিলেন জজ। নিজ জেলায় ও গ্রামে এঁদের কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। কাজেই বলা যায় অবিনাশ বাবুর পারিবারিক অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। তখনকার প্রচলিত সমাজের উচ্চতম শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। তিনি এম-এ ও আইন পরীক্ষা পাশ করেন। দৈহিক গঠনে অবিনাশ বাবু কেবল সুদর্শন ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঠিক ফুলের মতো কোমল-গঠন। অত্যন্ত মৃদু-ভাষী। প্রায় সব সময়ই যেন ফিস্ ফিস্ ক'রেই কথা বলতেন; কদাচিৎ উচ্চস্বরে কথা বলতেন। লোক জনের সঙ্গে ব্যবহারে ও আচরণে অবিনাশ বাবু ছিলেন কতকটা অতিরিক্ত রকমে বিনয়ী ও নম্র। তিনি প্রায় সকলকেই আপনি ব'লে সম্বোধন করতেন, তুমি ব'লে কাউকে বলতে যেন তাঁর মুখে আটকে যেত।

এই প্রকৃতির ও এই সামাজিক আবেষ্টনে গঠিত অবিনাশ চক্রবর্ত্তী এসে পড়লেন বিপ্লবের আবর্ত্তে। তাঁর সমস্ত আবেষ্টন ও প্রকৃতিই হয়ত এর প্রতিকূল। কিন্তু যুগধর্ম্ম তাঁর কাছে প্রবল হ'য়ে উঠল এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও সমাজগত আবেষ্টনকে অতিক্রম ক'রে তাঁকে বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করল। যখন বঙ্গ ভঙ্গকে উপলক্ষ ক'রে বাংলার বিপ্লবী আত্মা উদ্বেল হ'য়ে উঠল, তখন অবিনাশ বাবু ছিলেন মুনসেফ। সেই চাকুরিতে বহাল থাকলে হয়ত কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সাবজজ হ'তেন এবং পরিণত বয়সে পিতার মতোই জজ হয়ে আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু আরামের জীবন তিনি পছন্দ করলেন না; তিনি বেছে নিলেন বিপ্লবীর কৃচ্ছ্রময় জীবন।

পিতা মাধব চক্রবর্ত্তী কিছু অর্থ রেখে যান। অবিনাশ-বাবুর অপর একজন ভ্রাতা ছিলেন—অতুল চক্রবর্ত্তী। দুই ভাই-ই শিক্ষিত ও উপার্জ্জনশীল। অবিনাশ বাবু প্রস্তাব

করলেন পিতৃদত্ত এই টাকা নিজেদের সংসারে খরচ করার চেয়ে দেশের কাজে দেওয়াই ভাল। অতুলবাবু তখনই এই প্রস্তাব সমর্থন ক'রে বললেন লোকেত কতরকম অপকর্মে এমনি পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করে; তার চেয়ে বিপ্লবী কাজের জন্য টাকাটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। ৫০ হাজার টাকা যতীন মুখার্জীর হাতে দুই ভাই দিলেন।

অন্নদা কবিরাজ নামে উত্তর বঙ্গের একজন বিপ্লবী নেতা তখন হেদোর ধারে থাকতেন। তখন সবই ছিল আবছায়া রকমের; কতকটা যেন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পথ করার মতো। বিপ্লবী যুগের ঐ প্রদোষকালে ঐ কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে জুটেছিলেন—যতীন ব্যানার্জী, দেবব্রত বসু, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রভৃতি। বোধ হয় যতীন ব্যানার্জী অর্থাৎ পরবর্তী কালের নিরলম্ব স্বামী—অবিনাশ বাবুকে ধরে টানেন। অন্নদা কবিরাজের আড্ডা তখনকার দিনে একটি বিখ্যাত বিপ্লবী কেন্দ্র ছিল। এই আড্ডাতেই যতীন মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সখারাম গণেশ দেউস্করও ঐ আড্ডায় যাতায়াত করতেন।

অবিনাশবাবু ঐ সময় মুনসেফ হন। অস্থায়ী মুনসেফ হিসাবে তিনি প্রথম যান যশোহরের বনগাঁ মহকুমায়। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ তিনি বরাবরই বজায় রাখতেন। এই সময় যুগান্তর কাগজ বের করার আয়োজন হ'তে থাকে। বিভিন্ন লোকের নিকট হ'তে এর জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। পরবর্তী যুগের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, অবিনাশ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকেই এর জন্য টাকা দেন। আরও কিছুদিন পর যুগান্তর কাগজের জন্য একটা বড় প্রেস করা হয়; ৭০০০৲টাকা এর জন্য প্রয়োজন হয়। তখনও অবিনাশ বাবু কিছু টাকা দেন। বিপ্লবী কাজের জন্য অবিনাশ বাবু বরাবরই অর্থ সম্বন্ধে মুক্তহস্ত ছিলেন।

বনগাঁ থেকে কিছুদিন পর কলিকাতা আসেন। এখানে এসেই আবার বিপ্লবী দল গঠনে উৎসাহী হ'য়ে ওঠেন। কালিঘাটের হালদার বংশের হরিদাস হালদারের সহযোগিতায় এক স্বদেশী রামায়ণ পালা লেখাবার কাজে অবিনাশ বাবু মন দেন। অবিনাশ বাবু বরাবরই মনে করতেন বিরাট জনতাকে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে টানতে না পারলে বিপ্লব সম্ভব নয়। প্রথম মিত্র বা পিঃ মিত্রের সঙ্গে তিনি প্রায়ই এ নিয়ে তর্ক করতেন। মিত্র সাহেবের পরিচালিত অনুশীলন সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের যুবকদের মধ্যে শারীরিক চর্চা প্রবর্তন করা। অবশ্য তাদের নৈতিক চরিত্র গঠন করার দিকেও জোর দেওয়া হ'ত। অবিনাশ বাবু বলতেন—"ভদ্রলোক ছেলেদের Muscle বা মাংসপেশী পাকিয়েই দেশে বিপ্লব হ'বেনা।—দেশের চাষীদের এর মধ্যে আনতে হবে। আমি এক পাবনা জেলা থেকেই ৫০ হাজার চাষী দিতে পারব যারা বিপ্লবের সৈনিক হ'বে। রামায়ণ গানের ভিতর দিয়ে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করার উদ্দেশ্যেই তিনি নতুন করে রামায়ণের পালা রচনায় মন দেন।

অবিনাশ বাবুর পক্ষে একটা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় যে সেই যুগে তিনি জনসাধারণের কথা ভাবতেন। তিনি বলতেন শহরের শিক্ষিত যুবকগণ বিপ্লবের নায়ক হ'তে পারে; কিন্তু এর সৈন্য আনতে হ'বে বাংলার চাষী শ্রেণী হ'তে। মিত্র মহাশয়কে ও অন্যান্য সহযোগীদের তিনি বলতেন—এই সব বিপ্লবী কেন্দ্রে বিপ্লবের নায়ক তৈরী করো এবং অপর দিকে অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ কর। তার পর সাধারণ চাষী জনতা থেকে বিপ্লবের সৈন্য আহরণ বা সংগ্রহ করতে হবে। গণ-আন্দোলনের কথা তখনকার দিনে বিশেষ কেউ বলত না; অবিনাশ বাবুই বিশেষ ক'রে এ কথা বলতেন। রামায়ণ গানের মধ্যে "স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি"—গান ঢুকিয়ে দিয়ে ধর্ম-বুদ্ধির সাহায্যে তাদের মধ্যে জাতীয়-বুদ্ধি জাগানো যাবে এই ছিল অবিনাশ বাবুর আশা। এ কথা তখনও তাঁর মনে আসেনি যে ধর্ম-বুদ্ধির দোহাই এই বিষয়ে পর্যাপ্ত নয়। সেই সময়ে রাজনৈতিক চিন্তা এতটা গভীরতা প্রাপ্ত হয় নি যাতে ক'রে জনতাকে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনে টানবার মতো সামাজিক ও আর্থিক কার্যক্রমের কথা লোকের মনে আসবে।

এই সময় অবিনাশ বাবু মুনসেফী কার্যে ইস্তফা দিয়ে

আসেন। হাইকোর্টে ওকালতীর খাতায় নাম লিখিয়ে রাখলেন; কিন্তু কার্যত তিনি মন দিলেন বিপ্লবী দলের সংগঠনে। ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেই উপলক্ষে 'রাজা' সুবোধ মল্লিকের গৃহে বাংলার অনেক জমিদার অতিথি হন। এঁদের মধ্যে অনেকেই মনে মনে বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তর বঙ্গের ও ময়মনসিংহের জমিদারদের এক বৈঠকে অবিনাশ বাবু চেষ্টা করেন—বিপ্লবী কাজের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে। তাঁদের কাছে এই জন্য আবেদন ক'রে বিশেষ ফল পাননি; সামান্য টাকা উঠেছিল। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন সবাই তাঁর মতো অর্থ সম্বন্ধে উদার ও মুক্ত-হস্ত হবে।

এর পর এল ১৯০৮ সাল। মোজাফরপুরের বোমা ও আলিপুরের বোমার মামলা এই বছরে বাংলা দেশে বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু অপর দিকে বিপ্লবী-দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যতীন ব্যানার্জী ও অবিনাশবাবু তখন বিশেষ ভাবে মন দিলেন—ছত্রভঙ্গ বিপ্লবী দলকে পুনর্গঠন করার দিকে। এই কাজে যতীন মুখার্জী তাঁদের প্রধান সহায়ক হ'লেন। অবিনাশ বাবু ছিলেন মন্ত্রণা-দাতা;—নূতন কল্পনার বাহক; যতীন মুখার্জী ছিলেন কর্মী—চিন্তাকে কাজে ফলাবার প্রবোক্তক। এই বিপ্লবী সংগঠনের কাজে অবিনাশ বাবু ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলবাবু তাঁদের পিতার নিকট হতে প্রাপ্ত ৫০ হাজার টাকার কিছু অংশ যতীন মুখার্জীর হাতে দেন। এই সময় অনুশীলন দল বিশেষ ভাবে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ে। বিপ্লবী কর্মীদের মধ্যে বেশ একটা ভয়ের ভাবও দেখা দিয়েছিল। প্রায় সবাই বিপ্লবী সংসর্গ এড়িয়ে চলতে চাইত। অবিনাশ বাবু সবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে সভ্যদের নীতিজ্ঞান বা Morale ঠিক রাখতে চেষ্টা করতেন। তাঁরই চেষ্টায় ও প্রভাবে যতীন মুখার্জী পুনর্গঠিত দলের নেতা মনোনীত হন। এই সময় থেকেই প্রকৃত পক্ষে যুগান্তর দলের সৃষ্টি। কলিকাতা অনুশীলনের ও মুরারিপুকুরের অরবিন্দ চক্রের কর্মীদের সমবেত দল হ'ল—এই দল, যা পরে যুগান্তর নামে পরিচিত ও অভিহিত হ'তে থাকে। এ সব হ'ল ১৯০৮ সালের ব্যাপার। বাংলার বিপ্লবী দলের এক নতুন অধ্যায় এই সময় থেকে শুরু হয়।

লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকেই প্রায় অবিনাশ বাবু কাজকর্ম করতেন; তাই পুলিশ তাঁকে সহজে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পেত না। কিন্তু প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র উপলক্ষে, ব্যাপক ধর-পাকড়ের সুযোগ পুলিশ পেল ১৯১৫ সালে। ঐ সময় অবিনাশ বাবুও ধৃত হন। মেদিনীপুর জেলে আমরা তাঁর সঙ্গে ছিলাম। ১৮১৮ অব্দের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুসারে অনেক বিপ্লবী কর্মী তখন সেই জেলে রাজবন্দী ভাবে আবদ্ধ ছিল। কিছু দিন পরই আমি মেদিনীপুর জেল হ'তে বহরমপুর জেলে স্থানান্তরিত হই। এর পর অবিনাশ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় হাজারিবাগ জেলে। দুই বছরের বেশী তিনি ঐ জেলে ছিলেন।

জেলবাসের সময় অবিনাশ বাবুর চরিত্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়। যাঁর অন্তরে এতটা বিপ্লবী উদ্দীপনা ছিল, তিনি যে প্রকৃতিতে, আচরণে ও বাক্যে এত মৃদু ও এত নরম হতে পারেন, সে ধারণা করা লোকের পক্ষে কঠিন। মেদিনীপুর জেলে আমরা ছিলাম পশ্চিম দিকের ১০০ শত সেল (Hundred cells—West) নামে কুখ্যাত প্রায় অন্ধকার আলো-বাতাস বিহীন কুঠরিতে। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কদর্য ও কঠিন বাস-ব্যবস্থা আর কোন জেলে আমরা দেখিনি। পাশাপাশি ২৫টি কুঠরিতে আমরা ২৫ জন বাস করতাম;—একসঙ্গে ১২ ও ১৩ জন করে দু'ভাগে বেড়াতাম। কিন্তু আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ করার অনুমতি ছিল না। জেল বিধানের এই নিষেধ কোন মানবের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হ'ত না; এবং আমরা প্রকাশ্যত ও স্পর্দ্ধার সঙ্গেই ঐ নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে চলতাম। অবিনাশ বাবুর পক্ষে আমাদের যৌবন-সুলভ সর্ব প্রকার চাঞ্চল্যে যোগ দেওয়া বা সব কিছু সমর্থন করা সম্ভব নয়। তাঁর কোন প্রত্যক্ষ নিষেধ অগ্রাহ্য করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কোন প্রকারে জেনে নিতাম—"বুড়ো" কি বলেন—আমরা

সবাই নিজেদের মধ্যে তাঁকে বুড়ো বলেই অভিহিত করতাম।

আমাদের তখনকার মনোভাব হচ্ছে কঠোর জেল-বিধানকে অগ্রাহ্য ক'রে জেল-জীবনকে সহনীয় ক'রে নেওয়া;—তার জন্য ছুতার-নাতারও জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ লাগত। এর পরিণতি হ'ত শেষ পর্যন্ত প্রায়োপবেশন—hunger strike। একমাত্র অবিনাশ বাবুই ছিলেন বয়সে ও প্রকৃতিতে প্রবীণ। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের একটু সংযত করতে চেষ্টা করতেন।

এমনি ক'রে কাটল তাঁর চার বছর জেল জীবন। জেলে যাবার পূর্ব থেকে তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। জেল থেকে আসার পর তাঁর অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল। তিনি তাঁর সমস্ত সঞ্চয় দেশের কাজে অকাতরে দান করেছেন,—প্রৌঢ়ত্বে এসে তিনি পড়লেন আর্থিক অভাবের চরম দুর্গতিতে। এর পর তিনি ১৫।১৬ বছর জীবিত ছিলেন; এই কয় বছর তাঁর গিয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে। কিন্তু তবুও তিনি তাঁর দেশাত্মবোধ বর্জন করেন নি। তাঁর শেষ জীবন যে কি দারিদ্র্যে কেটেছে, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। বিপ্লবী বন্ধুদের আর্থিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তবু তিনি ঐ সব বিপ্লবী বন্ধুদের কাছ থেকে প্রায় ষোল আট আনা এক টাকা দু টাকা হাওলাত ক'রে সংসার চালাতেন। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একটি পুরাণো বাড়ীর প্রায় অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন কাটাতেন; তিল তিল ক'রে তিনি মৃত্যুর দিকে এগুচ্ছিলেন।

ঐ সময় তাঁর জীবন ছিল এক বিষাদময় ছবি। মাঝখানে দু' বছর একটু অর্থ সচ্ছলতা তিনি ভোগ করেছেন—যখন বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় দু'বছরের একটি কাজ পেয়েছিলেন। ঐ দু'বছর ছাড়া আর বাকি ১৩।১৪ বছরই তাঁর কেটেছে অর্থ কষ্টে ও অন্ন কষ্টে। আদর্শ-বাদী বিপ্লবীর হয়ত ঐ ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। শেষ দিকে তাঁর মন ও মত কতকটা যেন কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে গিয়েছিল—যেন কতকটা আকাশ কুসুম কল্পনা করতেই ভাল বাসতেন।

বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে—সামাজিক পদ গৌরবে তিনি জীবনের প্রেয় ও শ্রেয় সব কিছুই ভোগ করতে পারতেন,—তিনি সর্বহারা নিঃস্ব হয়ে জীবন শেষ করলেন একটা দূর স্বপ্নের ঘোরে। আজ দেশ স্বাধীন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ ১৩ বছর। তখন স্বাধীনতার কোন চিহ্নই তিনি দেখে যান নি। ভবিষ্যতের কোন আশা তাঁর ছিল না বর্তমান ছিল অন্ধকার। কিন্তু তবু দিক-চক্রবালের অন্তরালে যে ভবিষ্যৎ কালের জঠরে বাড়ছিল, তার প্রতিই ছিল অবিনাশ বাবুর দৃষ্টি। তাঁর সাধনা আজ সফল হয়েছে—দেশের স্বাধীনতা লাভে আজকার সাফল্য গঠিত হয়েছে তাঁর ব্যর্থ জীবনের বিনিময়ে। এমনি ব্যর্থ সব জীবনকে আজ আমাদের স্মরণ করতে হয়। *

কুন্তল চক্রবর্তী

[৪৪৯ পৃষ্ঠার পর]

শান্ত মানুষটি—প্রতি নিয়ত নিজের মনে বলছেন, মানুষ হ'তে পারবো তো? রোগশয্যাতেও প্রতি নিয়ত বন্ধুদের প্রশ্ন করছেন, এর পর কি করব? ডায়মণ্ড হারবারে যখন ছিলেন, নিকটবর্তী আবদালপুরে রসিকলাল দাস সত্যাশ্রমের শাখা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি প্রায় আসতেন, আমিও যেতাম, সঙ্গে ছিলেন সহকর্মী মণি বে, উপেন ভট্টাচার্য। তখন কুন্তল বুঝেছেন তাঁর শেষ অদূরে। হাতখানি ধ'রে আকুল প্রশ্ন করতেন, আর কি আমায় দিয়ে কিছু হবে না? বনের ফুল অজ্ঞাত, অখ্যাত শুকিয়ে যায়। সে-ও কি ঐ বেদনা নিয়েই এক সময়ে ঝ'রে পড়ে?

* + কলিকাতা কেতার ক্ষেত্রের সৌজন্যে।

গ্রামের কংগ্রেস

শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী

কংগ্রেস অফিসে কয়েকদিনের পর হাজির হয়েছি; পিছন এসে চ'খানা চিঠি হাতে দিলে। একখানা চিঠির হাতের লেখা দেখে বুকে নিলাম কার! আনন্দ লাগলো—কষ্টের দিনে অশ্বিনীদার চিঠি—আশীর্বপূর্ণ। ব্লাড-ডিসেন্ট্রিতে ভুগছি কয়েকদিন ধরে, শরীর দুর্বল করে দিয়েছে

বার বার চিঠিখানা পড়লাম। প্রতিটী ছত্রে কর্মক্লান্ত মানুষটার স্নেহের পরশ যেন পাচ্ছি। বিপদের দিনেই এই মানুষটীর চিঠি আমার কাছে এসে পৌঁছায়। চিঠি নিয়ে মন আছি

কংগ্রেস সম্পাদক বলাই। উনিশ বছর পূর্ব্বে দেখেছিলাম তের বছরের বালক। আজ প্রবীন বয়সে চলে—কংগ্রেসের সম্পাদক হয়েছে। রোগা সাধারণ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত পল্লীর বাঙালী জীবনে যা হয় আমাদের কংগ্রেস সম্পাদকের তাই চেহারা। ডাক্তার—রোগীদের ওষুধ দিতে দিতে—পল-ঘাট ইরিগেশন এস, ডি, ও র চিঠি-খানির কি উত্তর দেওয়া যায় তার জন্য উপদেশ চাইলো। এস. ডি, ও সাহেবকে জানানো হয়েছিল দুর্ব্বাচাটী খালের বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, বাঁধ মেরামত যাতে হয় তার বন্দোবস্ত করুন, কারণ এখন বন্যার সময়।

তার উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, স্থানীয় সেকসন্যাল অফিসারকে নির্দ্দেশ দিয়েছি; তাঁর সহযোগীতায় কাজ করে নিন। তবে বর্ষার সময় মাটীও পাওয়া যাবে না মজুরও পাওয়া যাবে না। অতএব যতদূর পারা যাবে কাজ করিয়ে নিন।

বলাইকে নির্দ্দেশ দিলাম—চিঠির উত্তর দাও—আপনি কাজের আদেশ দিন, এখনও মজুর পাওয়া যাবে। জঙ্গল কাটাই সম্পর্কে লেখা বলতে, কংগ্রেস পক্ষাগ্রে সভাপতি যজ্ঞেশ্বর বাবু বলেন, আর জঙ্গল কাটাই! দুঃশাসনপুর সাবকেলের ডাকবাংলার সামনেই যে জঙ্গল তাই সেকশন্যাল অফিসার কাটায় না—এ ধারে কী কাটাবে! এই কথাও নোটে উল্লেখ করতে বলে দিলাম।

পিছনে দেখি দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সেবাদল কর্মী নগেন; বেশ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা, গায়ের বর্ণ কালো। দুধের বাটি কাঁধে। ঘাটাল থেকে আসছে, গেছলো Court এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কম্যুনিষ্টদের একটী মামলায়। হ্যাঁ, এইবার শুনুন; ধৃত কবে থেকে রিলি করবেন নির্দ্দেশ দিন। তারপর Schoolএর মিটিংয়ে কবে যাচ্ছেন! কম্যুনিষ্টরা ১৫ই আগষ্ট জহরলালের কুশপুত্তলিকা দাহন করেছে শুনেছেন। বল্লাম, ওটা বড় ক্লান্ত। বৈকালে বাড়ীতে এসো।

অনন্ত দলুই পাশের গ্রামের রুগ্ন, হাঁপানিগ্রস্ত লোক। গলায় কণ্ঠি, ধান-চালের গোপন কারবার করতে রাজি কিন্তু কড়াকড়ির ফলে হতাশ হয়ে পড়েছে। জমি জায়গা নেই। বলছে, হ্যাঁ গোঁসাইদা আমাদের গরীবদের কাজ কারবার বন্ধ হোল—বাঁচি কিসে! কাল রাতে তেঘুরাণীর ঘাটে গোটা ভুঞ্যার চল্লিশ মন চাল বোঝাই নৌকা ধরে কুড়ি টাকা নেওয়া হয়েছে।

বল্লাম কেন লুকিয়ে চাল নামানোর চেষ্টা করা। গভর্ণমেণ্টের সাথে বন্দোবস্ত হয়েছে নৌকা পিছু ২০/০ মন করে ধান অথবা চাল দেওয়া হবে—তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা কেন?

একজন শিশি হাতে করে ওষুধের জন্য এলেন। বাবু তীব্রণ ম্যালেরিয়া, কালই তো ডাক্তারের মেয়েটা দুপুর থেকে রাত আটটা পর্য্যন্ত জ্বর ছাড়লো না। ডাক্তার নীরব। মনে কেমন যেন অশান্তি। তার ছাপ মুখের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। ডাবের প্রয়োজন, কোথায় এখন পাওয়া যায়। বল্লাম ওপারে আমার গাছ থেকে পেড়ে নাও না। ডাক্তার বল্লে যে লোক আছে আমাকে পাড়তে দেবে? আমারই জমির চাষ হচ্ছে claim করলো ৪ হাত জায়গা এগিয়ে এসেছে। মাথা খারাপ হয়ে যায় এই সব কীর্ত্তি দেখে।

আমাদের চেনা-শোনা একজন এসে ধরলেন কই, আমার তিরিশ মন ধান আনার অনুমতি দিলেন না। জমির ধান মুরারা বাবু আনার অনুমতি দিয়েছেন। ভাবছি দেশের সমস্যার বিষয়। গভর্ণমেণ্ট ধান পাচ্ছিল

না—কিনতে সুরু করলো। মজুতদারদের গোলা "সিজ" করতে লাগলো, জনসাধারণ সমস্বরে চীৎকার করলো, কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট সব নিয়ে চললো আমরা কি খাব। ওদের ঘরে থাকলে অসময়ে পেতাম তো! ইতিমধ্যে নদীও বাঁধ ভেঙ্গে সব ভাসিয়ে দিলে। ধানের আমদানী নেই। ছোট ছোট কারবারীরা উপর থেকে অর্থাৎ বাড়তি এলাকা থেকে ধান আমদানী করছে না। ভয়—গভর্ণমেণ্ট সব কিনে নেবেন।

গভর্ণমেণ্টের ধান্ত কেনা একদম বন্ধ। চালের আমদানি অত্যধিক। ক্রেতারও অন্ত নেই। গোপন ব্যবসাদারেরা চালের আমদানী করলো। কিন্তু দাম হলো বাইশ টাকা, যারা কিনে নিয়ে যাচ্ছে সবাই ব্যবসাদার। এক মন করে ধান নিয়ে হাঙড়ায় পার করবে—বারটী টাকা বাঁধা আয়। যারা কিনে খায় তারা বলছে চালের দাম এত কেন; দিন চলে কিসে! বৃটিশের আমলে এটা ছিল না।

একদিন সারারাত্রি ধরে কংগ্রেস-সভাপতি, সম্পাদক ও আমি তিনজন মিলে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করলাম, ধান্ত সিজ করা স্থগিত রাখার জন্ত। গভর্ণমেণ্ট আমাদের আবেদন গ্রহন করেন, কিন্তু যে জাতি নয় শত বৎসর পর স্বাধীন হয়েছে তার দুর্নীতি একদিনে ভাঙ্গা কি সম্ভব? প্রতিটী মানুষ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। যাঁরই মুখে শুনি চোরাকারবার বন্ধ করুন তিনিই একজন চোরাকারবারী। যাই হোক্ আশস্ত হয়েছিলাম এবার সাধারণ লোকে কিনে খেতে পারবে। কিন্তু কোথায়! মজুতদারেরা রাতা-রাতি গোলা খালি করে ধান বিক্রী করে দিলে।

একটী বিধবা তিনটী নাবালক নিয়ে দুঃখে কষ্টে দিন চালায়, বলে; বাবু! "গভরমেণ্ট" কিনে নিলে সাতটাকায় দিতে হোত; আমি মাত্র তিন মন ধান চাইলাম সাড়ে দশটাকা ধরে; বলে হবে না বার টাকা ধরে নিয়ে যাও। এই তো বাবু সিগরেটের শুল্ক, ধান "সিজ" করা বন্ধ করে বড় লোককে বড়লোক করলে। ধন্ত কংগ্রেস রাজত্ব।

শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। জনসাধারণের দাবী পূরণ করতে গিয়ে একদল স্বার্থান্বেষীর সুবিধা হোল, স্বার্থান্বেষীদের সুবিধা না দিলেই ঘোষনা করে কংগ্রেস রাজত্ব অন্যায়ের।

সত্যি বিধবার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। স্বাধীন জনসাধারণের জাতির প্রতি সুবিচার করার জ্ঞান না জন্মানোর জন্তই প্রতিপদে রাষ্ট্রকে দায়ি করে বসে। দুই বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রে তাদের কি কি অধিকার সে সম্পর্কে মিটিং করে বোঝাতে হোত এখন আর তা নেই। মানুষের অধিকার বুঝে নেওয়ার শক্তি যে জন্মেছে তার জন্ত আনন্দ।

মহিলাটীকে বল্লাম যাঁর কাছে ধানের জন্ত গেছলেন তিনি তো আমার চেয়ে আপনার বড় আপন: মুখের কথা টেনে নিয়ে কপালে হাত দু'টো রেখে বলতে লাগলো হা, আমার কপাল।

দুঃখের পৃথিবী, কষ্টের পৃথিবী চির দিনের: এর অবসান কামনা করা কি সম্ভব এক দিনে সবার কষ্ট একসাথে নিঃশেষ হওয়া কি সম্ভব! মানুষের সীমাহীন অন্তহীন চিন্তার কামনার পরিপুরণ কখনো কি হয়ে থাকে! মানুষের শত শত কামনার উচ্ছেদ কোন্ দিন হবে কে জানে!

তিনি অনেক অনুরোধ করলেন; বললেন সতি আমার জমির ধান। আচ্ছা দিলাম নামটা সাইন করে চেয়ারের পিছনে সতীশ সামন্ত। বয় তাড়া ছড়ো তার। মুখের দিকে তাকাতেই বলতে লাগলো, কেস কোর্টে ফাইল ক'রে এলাম। আমি কোলাঘাট যাচ্ছি কয়েকদিন পর ফিরবো। কয়েক পা এগেই ফিরে গিয়ে বলতে লাগলো সামাজিক দুর্নীতি দমনের জন্ত কিছু কি করবেন না?

স্বামী স্ত্রী, স্বামীর অবস্থা খারাপ। নিজের কিছু জমি আছে; তাতে সংসার চলেনা। অন্যের জমিতে খেটে স্ত্রী এবং দুইটী সন্তান সহ দিন চালায় স্বামী বোকা ধরণের: গ্রাম্য কৃষক; বয়স বছর পঞ্চাশ। স্ত্রীর বয়স বছর বাইশ। বয়সের গুণে গ্রাম্য কৃষক ছোঁড়াদের চোখে সুন্দরীর পর্য্যায় স্থান পেয়েছে। স্ত্রী দুই সন্তানের

জননী কচি বয়সের দশ দুঃখের সংসারকে প্রীতির চোখে দেখতে অপারক। প্রণয়ের নিবেদন অনেক যুবকের কাছ থেকে এসেছে; যে কোন প্রকারে হোক গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।

গ্রামের ছেলে মাধাই। আপদ বিপদের সময় বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে। সকাল সন্ধ্যার আসে পান, জল চায়; স্ত্রীর সাথে সহজ আতিথেয়তার আশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে উঠলো ঘনিষ্টতা।

মাধাই সুযোগ বুঝে স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রীর কাছে কথা পাড়লো; তাখ রাণী আমার সাথে চল—এত কষ্ট থাকবে না তোর ছেলের দুঃখ দেখতে পারিনা। আসবি যাবি—বাড়ী তোরই থাকবে। স্বামী তো তোর ঐ

মন গলে যায়। প্রায় দিন সাবান, তেলের বোতল, গোছভোর পান-সুপারি মাধাইয়ের কাছ থেকে পেয়েছে পিছল পৃথিবীর উপর সন্তর্পণে হাঁটতে না পেরে রাণী আছাড় খেল। বাড়ীতে পড়ে রইলো ক্রন্দন-রত দুই শিশু; নদী, মাঠ, জঙ্গল, ক্রোশের পর ক্রোশ রাস্তা পার হয়ে রাণী-মাধাই ভোরে কামার বাড়ীতে উঠলো। রাণীর অভাবের তাড়না প্রণয়ে রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা চূর্ণ করে দুর্নামের মালা গলায় পরতে দ্বিধা করলো না রাতের কষ্ট রাণীকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। বিশ্রামের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে কামার বাড়ীর প্রেম আতিথেয়তার সদ্ব্যবহার করে নিদ্রাচ্ছন্না হয়ে পড়লো।

মাধাইয়ের মনের শান্তি ফিরছে না। রাণীর অনুপস্থিতিতে তার দাম দস্তুর ঠিক হয়ে মাধাই দেড়শ টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

এদিকে দরিদ্র স্বামী সারাদিন মাঠে পরিশ্রমের পর বাড়ীতে ফিরে দেখে ক্রন্দনরত শিশুদ্বয়। শুধু এক কথা "মা "নেই—মাধাইয়ের হাত ধরে পথে বেরিয়েছে।

দরিদ্রের বিচারালয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের মহিলা বিভাগে কেস ফাইল করে দিয়েছে। কংগ্রেস মহিলা সাব কমিটির সভানেত্রী রাগের উপর মন্তব্য লিখেছেন: কংগ্রেস উপদেষ্টা সভাপতি ও সম্পাদক সামাজিক দুর্নিতি দূর করার জন্য কিছুই করিতেছেন না। সমাজের বুক হইতে এই সব দুর্নীতি দূর করিতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কংগ্রেসের কি কর্ত্তব্য নহে? কংগ্রেস উপদেষ্টার সর্ব্ব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

এই মন্তব্যের পর কর্ত্তব্য স্থির করা হোল। কংগ্রেস সেবাদল ক্যাপ্টেনকে নির্দ্দেশ দেওয়া হোল সাত দিনের মধ্যে মেয়ের অনুসন্ধান করে আনা চাই।

একদিন পর মেয়ে এনে উপস্থিত করলো। মেয়ে বল্লো সব ঘটনা। কামার মাধাইকে একটি মেয়ে জোগাড় করে এনে দিতে বলে। তাই মাধাই টাকার বিনিময়ে কৃষকের ঘরের বৌকে ঘুর দেশে কামারের ঘরে তুলে দিয়ে আসে।

গ্রামের থেকে রব উঠল, একি কাণ্ড! এর কি বিচার নেই। কংগ্রেস রাজত্ব হয়ে এই সব ঘটছে। তেলের দাম বাড়লো; লঙ্কা তিন টাকা সের; ভাবি! কথার সামঞ্জস্য। আর বামপন্থী শ্লোগান। সবই কংগ্রেসের দোষ। বেশ মনে জাগে বাঁধ ভাঙ্গার দিন। বাঁধ ছিন্ন হয়ে নদী থেকে জল বেরুচ্ছে। গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছে। বাঁধার জন্য লোকজনদের ঝোড়া কোদাল নিয়ে ডাকা হচ্ছে—সবাই বলছে মজুরী দেবে কত! যারা মজুরী চাচ্ছে যদি বাঁধ ভাঙে তাদেরই বাড়ী ঘর পড়বে। সেকশন্যাল অফিসার যেন বুক দিয়ে বাঁধ রক্ষা করবে। বাঁধ ভাঙ্গার পর কংগ্রেসের দোষ কংগ্রেস কিছুই করল না। দেশকে ডুবিয়ে দিলে।

সতীশকে বল্লাম—আচ্ছা যাও। 'জয়হিন্দ' অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিলে। বলাই বল্লে ধান চাল রপ্তানী বন্ধ করার কি ঠিক করা যায়। বল্লাম দেখ যদি "বানি-মিল" গুলি বন্ধ করা যায়, সব বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব বানি মিল বন্ধ করার জন্যে এ, আর, সি, পি,র নিকট লেখ।

কংগ্রেস অফিস থেকে উঠলাম। পথে শুনলাম ১৫ই আগষ্ট কম্যুনিষ্টরা জহরলালের কুশপুত্তলিকা দাহন করেছে। আরেকজন এসে বলছেন: বাবু ভদ্র মহিলা থাকে

কোথায় বলুন তো? ভদ্র মহিলার স্বামী কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকেন। স্বামীরা ছয় ভাই। কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ দোকানদার ইত্যাদি ধরণের। মোটের উপর বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার। স্বশুর বর্ত্তমান থাকতে দেবর ঘরেকজনই পৃথকান্ন হয়ে যায়। স্বশুর, স্বাশুড়ীর মৃত্যু পর্য্যন্ত সেবাশুশ্রূষা করেছেন ভদ্রমহিলা। স্বাশুড়ী মৃত্যু শয্যায়। স্বাশুড়ীর ছ'গাছা সোনার চুড়ী স্বাশুড়ী ছ'জনকে দিয়ে বল্লেন এই ঘরে এবার যা রইলো সব আমার সেবাশুশ্রূষাকারিণী বৌমার। স্বাশুড়ীর মৃত্যুর দেড় মাস পর এক দেবর ভদ্র মহিলাকে ঘর থেকে বের ক'রে তালা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। কংগ্রেস অফিস অগতির গতি। অফিস তদন্ত করে কোর্টে নথি পাঠিয়ে দিলে। সেই বিচার এখনো হয়নি। বাড়ীতে যেতে হোল।

ভদ্র মহিলার দুঃখের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী শুনলাম। কি করবো ভাব্‌ছি। সবার চিন্তা করছি আমি, কিন্তু আমার চিন্তা করে কে?

বাঁধের উপর এসেছি। চব্বিশ, পঁচিশ বছরের একটি বিধবা মেয়ে, বগলে থলে। আমাকে দেখে মাথার কাপড় টেনে দিলে। গায়ের রং কালো। চোখ দু'টো টানা। মেয়েটীর বাড়ী ওখান থেকে ছ' মাইল দূর। ঠোঁটে টানা হাসির রেখা। বল্লাম: কি গঙ্গা! তুমি না বলেছিলে আমি খাওয়ার জন্য চাল নিয়ে যাই; আর আজ। বাবু! আমরা বিধবারা কি করে খাই। তাগড়া তাগড়া পুরুষরা টাকার লোভে এই করছে।

বল্লাম: ধান কিনে ঢেকীতে ছেঁটে বিক্রী করনা কেন? আচ্ছা! বলতো সেদিন তোমার সাথে যে মেয়েটীকে ধরেছিলাম—তার সত্যি কে আছে?

বাবু! আমারই পোড়া বরাত। ঐ মাগী বলে আমার খাওয়ার চাল, মোটেই নয়। ঐ মেয়েটার দু'জন উপপতি রয়েছে। তিনজনে খালি চালের ব্যবসা করে। ঐ করেই তো গায়ে অত গয়না। আর সেদিন যে বুড়ীকে ধরেছিলেন—সেই বুড়ী গত বছর ভেক নিয়েছে। তিনবার বাবু গ্রামকে টাকা খাইয়ে প্রায়শ্চিত্য করে সমাজে চলছে বলেই দুখে আসল দিলে। তখন বুঝেনিলাম ঘটনা কি?

বাড়ীতে এসেছি, দেখছি দু'জন লোক বসে রয়েছে। উঠে প্রণাম করলো কি ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম। বলে দেখুন পুরোহিতের কাণ্ড।

মায়ের শ্রাদ্ধের সময় পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দেওয়া হোল। কিন্তু মিথ্যা করে বৌকে দিয়ে কোর্টে গিয়ে নালিশ করে এলো; ঐ ঠাকুর.....একদিন আমি ছিলাম ডান হাত; নিলাম আসবে শুনে—বাবুনের ভাত দুড়া ত্যাগ.....দু ভাই বুক দিয়ে সব জিনিষ সরিয়ে দিই..... আর আজ সেই ঠাকুরের ব্যাপার।

কি ঘটনা সত্য বলতো!

বাবু! আমরা মাঠে কাজ করছি, মনসা পুজো। মেয়েরা সব পুজোর যোগাড় করে বসে রয়েছে; ঠাকুরতো পুরোহিত। মেয়েরা ডাকতে গেল। ঠাকুর শ্রাদ্ধ করতে চলে গেছে। দুপুর অবধি মেয়েরা বসে। কি আর করবে শীতলা মায়ের পুকুরে দুধ ঢেলে দিয়ে এসে খেতে বসলো। এই শুনে বাবুনের বৌ বেরিয়ে এলো। তার পর মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া। এর পরিণতিতে দাঁড়ালো শ্লীলতা হানির অভিযোগ, বল্লাম: যাও সম্পাদকের কাছে।

গ্রামের একজন এসে বল্লে: বিধবা বিবাহ; স্ত্রী স্বাধীনতা চালু করলেন কিন্তু বাপ মেয়েকে জামাই বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিলে—এই ভাবে কি সমাজ চলবে!

বাবু! বাড়ীতে আছেন?
কেন

তিনটী ছাগল ধরে এনেছি। আপনারা কমল বাড়াও বলেন আর মুচীরা ছাগল ছেড়ে দিয়ে সব খাইয়ে দিচ্ছে। কি করবো ভেবে পাই না। এই কি কংগ্রেসের কাজ!

স্ত্রী চা তৈরী করছিলো। যত তোমাদের কাণ্ড, কার বৌ ঘর করে না, তার বিচার করবে কংগ্রেস; মারামারি করবে, তার বিচার করবে কংগ্রেস; চোরারা চুরি করে কেন চাল বিক্রী করবে সে ঘাটি পূরণ করবে কংগ্রেস; ছাগলের বিচার করবে কংগ্রেস; এখন বাকী রইলো

কুকুরের। বল্লাম, না: তাও সেদিন হয়ে গেছে।

দাঁড়াও তোমাদের কংগ্রেসের কাজের কথা লিখ্‌ছি। সত্যি কথা এত বাজে কাজ নিয়ে শক্তির অপব্যয়। ইতিমধ্যে একটী নালিশ এলো; বাবু! মা আমাকে কেন এভাবে গালাগাল দেয়। আর টিকতে পারি না। আমি বল্লাম কুত্তা ভাতারির বি!

স্ত্রী বলতে লাগলো: নাও এবার বিচার কর! ব'লেই হাসতে হাসতে চ'লে গেল কিছু সময় পর ফিরে এসে বল্লে—বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল এ বছর ধান হবে না। যাতে বোরো ধান হয়, তার জন্য বোরো বাঁধের জন্য লাগা উচিত।

ইতিহাস

শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

চুপি চুপি দুষ্টু আমার প্রিয়া
পালিয়ে গেছে একটি চুমু নিয়া।

কালের খাতায় যা কিছু সব ঘটে
ঐতিহাসিক লিখে রাখেন বটে।

কিন্তু, খুলি যবে ইতিহাসের পাতা
দেখি, তাতে আছে মেলাই মুণ্ডুমাথা।

কোথায় হোল মস্ত যুদ্ধ তাহার তারিখ সন
কে হারলো আর কে জিতলো সে তারি বিবরণ।

সবই লেখে সবিস্তারে, রাজারাজরার নাম,
ক'জন তাদের মন্ত্রী ছিল, কোথায় ছিলো ধাম।

কাহার গেল মুণ্ড কাটা, কাহার সিংহাসন,
গোপন পথে শত্রুরে কে করলো আমন্ত্রণ।

ষড়যন্ত্রের জাল ছড়ালো, দেশের সর্বনাশ—
এ রকম সব বড় কথার নাম তো ইতিহাস!
ইতিহাসের মানেই বুঝি ভয়-জাগানো কথা,
নিষ্যাচার আর নৃশংসতা ছলচাতুরীর গাথা?

নিরস লাগে এ ইতিহাস, তাইতো লিখি আজ
মিষ্টি কথা, সত্যি কথার নতুন ইতিহাস।
আমার প্রিয়ার চুমুর কথা লিখি প্রথম পাতে
পূর্ণ করো পরের পাতা, দিনু তোমার হাতে।

ইতিহাস

সন্তোষ কুমার অধিকারী

এই ইতিহাস
শ্যামল-শস্যের তলে রক্তলীন পঙ্গিল মেদিনী
অন্তর ধরিত্রী—তার জীর্ণ ইতিহাস
প্রত্যহের তীরে নিত্য ভগ্ন হয় ক্লিন্ন আবর্জনা,
বিচ্ছিন্ন বাসনা করে ভীড়;
নামহারা সহস্রের উত্তপ্ত রুধির
অধীর গর্জনে ঝরে
কঙ্কালের পঞ্জরে পঞ্জরে বাজে বীণ
পৃথিবীর পূর্ণ হ'লো আরও একদিন।
আরও একদিন,—
শ্যামল শস্যের নয়,
অনুর্বর দীন তপ্ত মরুভূর মত।
মারীক্ষত দুর্ভিক্ষ আকুল হাহাকারে
বারে বারে লোলুপ জিহ্বায় যাকে চেয়ে
সমর্থের পানপাত্র বেয়ে
ঝরে শুধু বুভুক্ষুর নিশ্বাস ভয়াল;
মহাকাল
অদৃশ্য কালির রেখা টানি'
রেখে গেলো যুগান্তের
পঞ্জরে অফুট ব্যথা হানি'
জিঘাংসু সর্পের বিষশ্বাস—
রক্তহীন ছিন্ন ধরিত্রীর
এই চির জীর্ণ ইতিহাস॥

বরণীয় তাঁরা স্মরণীয়

(৺সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীরসিক লাল দাস

আজ আপনাদের কাছে বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার যুবচিত্তের যে ক'টি নির্ভীক তেজস্বী যুবক ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন, দেশমাতৃকার ললাট থেকে দাসত্বের কলঙ্ককালিমা মুছে ফেলার দৃঢ় সংকল্প বুকে নিয়ে বিপ্লবের দুরূহ পথে পা বাড়িয়েছিলেন, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিঃশেষে নিজেদের বিলিয়ে দেবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, সাতকড়ি ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত মাহিনগর গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সাতকড়ির জন্ম। ছোট্ট গ্রাম, ছোট্ট তার পরিবেশ, আর সেখানকার নির্জীব মানুষগুলির গতানুগতিক সংকীর্ণ জীবনধারা। সেই প্রাণহীন পরিবেশের মধ্যেই সাতকড়ির বাল্যজীবন অতিবাহিত হ'ল। কিন্তু পরিবেশের অন্ধকার প্রভাব অতিক্রম ক'রে চিত্ত তাঁর আলোকের সন্ধানে ফিরতে লাগলো, প্রাণের গতি বৃহত্তের দিকে, মহতের দিকে উন্মুখ হয়ে উঠলো।

নিকটবর্তী হরিনাভি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি পড়েন। সেখানে নরেন ভট্টাচার্য্য (বর্ত্তমানে এম, এন রায়) ও হরিকুমার চক্রবর্তী তাঁর সহাধ্যায়ী। দেশে তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে। এঁদের যুবচিত্তে এসে তার ঢেউ লেগেছে। তিন বন্ধুতে মিলে স্কুলের মাঠে বসে দেশের কথা আলোচনা করেন, ইংরেজের দাসত্ব থেকে, পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সম্ভব অসম্ভব নানা পরিকল্পনা করেন, স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করার দুর্জয় সংকল্পে দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন।

কলকাতায় তখন ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের প্রেরণায় বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠেছে। সেই দলের সংস্পর্শে এসে সাতকড়ি ও তাঁর বন্ধুদ্বয় নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। একই ভাবের ভাবুক, একই পথের পথিকদের পেয়ে উৎসাহে তাঁরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিপ্লবের কল্পনা তাঁদের বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে আনন্দে তাঁরা অধীর হয়ে উঠলেন। সাতকড়ি লেগে গেলেন গ্রামের মধ্যে দলের কর্মী সংগ্রহের কাজে। তাঁর আন্তরিকতায় ও চরিত্রের মাধুর্যে বহু যুবক আকৃষ্ট হ'ল। গুপ্ত সমিতির সংগঠকরূপে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন।

বাল্যকালে সাতকড়ি একদিকে ছিলেন যেমন শান্ত প্রকৃতির, অপরদিকে ছিলেন তেমনি তেজস্বী। সহজে কারও সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতেন না, কিন্তু অন্যায় ও ভীরুতাকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। কোন অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'তে দেখলে তার প্রতিবাদের জন্য তিনি নির্ভীকপদে এগিয়ে যেতেন। সর্বদা স্বার্থহীন স্পষ্টভাষায় কথা বলতে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। এই সকল সদ্‌গুণ তিনি পিতা মন্মথনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন

মন্মথবাবু ই-বি রেলের কর্মচারী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় সাতকড়ি সেখানে একটি চাকরী পেলেন। দেশে তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য সভা শোভাযাত্রার সমারোহ চলছে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করলেই সরকারী পুলিশ লাঠিপেটা করছে। একদিন শিয়ালদা ষ্টেশনে এমনি একটি শোভাযাত্রা পুলিশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমন সময় ই-বি রেলের জেনারেল ম্যানেজার এসে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন —"কে এমন সাহসী আছে যে পুলিশের গুলী অগ্রাহ্য ক'রে আমার সামনে এসে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করে!" সমস্ত ষ্টেশন নীরব হঠাৎ ১৫।১৬ বছর বয়সের এক যুবক এগিয়ে এসে নির্ভীক কণ্ঠে বললো— "সাহেব, বন্দেমাতরম্।" সকলে সবিস্ময়ে দেখলো যুবক আর কেহ নয়, চাকরীতে নবনিযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অপরাধে সাতকড়ি ও তাঁর পিতার উভয়েরই চাকরী গেল। সাহেব বলেছিল, "মন্মথ, তুমি পুত্রের হয়ে মার্জনা ভিক্ষা কর, তোমার চাকরী

থাকবে।" সাতকড়ির পিতা দৃঢ়স্বরে জবাব দিয়েছিলেন, "আমার ছেলে কোনো অন্যায় করেনি, আমি মার্জনা চাইব না।" সাতকড়ি বরাবর এইভাবে পিতার কাছ থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সমর্থন ও প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এই সময়ে ইংরেজের গোলামখানা বর্জন অর্থাৎ স্কুল কলেজ বর্জন আন্দোলন পুরাদমে চলছে এবং জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাতকড়ি চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন এবং সেখান থেকে বি-এ পাস করলেন। কিন্তু চাকরী জীবনে বীতস্পৃহ হবার ফলে তিনি আর চাকরীর চেষ্টা না ক'রে বেঙ্গল এ্যানেক্স হোমিওপ্যাথিক কলেজে ভর্তি হ'লেন এবং সেখান থেকে পাস ক'রে ডাক্তারী ব্যবসায় শুরু করলেন।

একদিকে বিপ্লবী দলের কাজও তিনি পরিপূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গেই সম্পন্ন ক'রে চলেছেন। এমন সময় ১৯১৪ সালে ইউরোপে লাগলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরেজের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ সেখানে নিবদ্ধ। এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা তৎপর হয়ে উঠলেন। একমাত্র ঢাকার অনুশীলন সমিতি ব্যতীত বাংলার সমস্ত বিপ্লবী দলগুলি যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতে ইংরেজ শক্তির ভিত্তিমূলে একটা কঠোর আঘাত হানবার আয়োজনে ব্যাপৃত হ'ল। ইংরেজের শত্রু জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে তাদের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টার জন্য বিপ্লবীরা বিদেশে লোক পাঠালেন। নানা চেষ্টার পর স্থির হ'ল সাংহাইয়ের জার্মান কন্সাল জেনারেলের ব্যবস্থায় ব্যাটাভিয়া থেকে মাভেরিক নামক জাহাজে ৩০,০০০ রাইফেল আসবে এবং প্রত্যেক রাইফেলের সঙ্গে ৪০০ ক'রে গুলী থাকবে। স্থির হয়, এই অস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে কতক নামানো হবে হাতিয়া দ্বীপে, কতক সুন্দরবনের হরিণমারীতে এবং কতক বালেশ্বরে।

ভারতে বিপ্লবের কাজের জন্য আমেরিকা থেকে কিছু অস্ত্র নিয়ে গদর দলের ৩৫০ জন শিখ ও ২১ জন পাঞ্জাবী মুসলমান কোমাগাটামারু নামক একখানি চাটাই-করা জাপানী জাহাজে ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বজবজে এসে পৌঁছান। আগের থেকে খবর পেয়ে ইংরেজ এক স্পেশাল ট্রেনে ওঁদের সোজা পাঞ্জাবে নিয়ে বন্দী করার আয়োজন করেছিল। ওঁরা স্পেশাল ট্রেনে না উঠে কলকাতার দিকে মার্চ করার উদ্যোগ করতেই পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। তাতে গদর দলের ১৮ জন মারা যান, ৮০ জনকে ট্রেনে পোরা হয়, আর বাকীরা সব পালিয়ে যান। এই পালাতকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বিপ্লবী অধিনায়ক যতীন মুখার্জীর সঙ্গে, সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে এবং নরেন সেন মোরারে সাতকড়ি ব্যানার্জির মেসে যাদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করেন। এঁরা তাঁদের পাঞ্জাবে গিয়ে বিপ্লবোদ্যোগের জন্য কাজ করতে বলায় তাঁরা পাঞ্জাবে চলে যান।

বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বাংলা থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত একসঙ্গে সৈনিক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আয়োজন করতে থাকেন। বিপ্লবীরা উত্তর ভারতের ছাউনীতে ছাউনীতে গিয়ে অতি সংগোপনে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকেন, সৈনিক বিদ্রোহের আয়োজন করতে থাকেন। বিপ্লবীরা জানতেন, তাঁদের এই বুদ্ধিমেধ বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় দেশ হয়তো তখনই স্বাধীন করতে পারা যাবে না, কিন্তু বিদেশের ঐ অস্ত্রগুলি পাওয়া গেলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে খণ্ডযুদ্ধ ক'রে তাঁরা মরতে পারবেন, নিজেরা মরে মরে দেশকে জাগিয়ে যেতে পারবেন, মৃত দেশে প্রাণসঞ্চার ক'রে যেতে পারবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে যদি কোথাও কোথাও সৈনিক বিদ্রোহ ঘটানো যায় তবে সারা দেশ জুড়ে একটা প্রচণ্ড সাড়া পড়ে যাবে, মরণোন্মুখ জাতির মনে স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল বেগে জেগে উঠবে।

মাভেরিক জাহাজ সুন্দরবনের রায়মঙ্গলে পৌঁছাবার কথা ১৯১৫ সালের ১লা জুলাই। জাহাজ থেকে অস্ত্র নামিয়ে নেবার জন্য সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশ চক্রবর্তী, ডাঃ যতীন ঘোষাল প্রভৃতি কয়েকজন সেখানে উপস্থিত হন। গাছের উপরে মাচা অর্থাৎ টং প্রস্তুত ক'রে সেখানে তাঁরা মাভেরিকের জন্য

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন। কথা ছিল, রায়মঙ্গলের মুখে মাতেরিক জাহাজের উপরে সাতটি আলো পাশাপাশি জ্বলে উঠলে, এঁরাও সুন্দরবনের গাছের মাথায় পাশাপাশি সাতটি আলো জেলে দেবেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা ১০।১২ দিন অপেক্ষা করেও মাতেরিকের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে নিরাশ হয়ে তাঁরা কলকাতায় ফিরে এলেন।

আমেরিকায় অবস্থিত চেকোশ্লোভাক বিপ্লবীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের কথা, রায়মঙ্গলে অস্ত্র আমদানীর কথা এবং বাংলার বিপ্লবী নেতাদের কয়েকটি ঠিকানাও ইংরেজ সরকার জেনে যায়। তার ফলে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ভারতে পৌঁছবার পূর্বেই ধরা পড়ে গেল এবং এখানে বিপ্লবীদের সন্ধানে সর্বত্র খানাতল্লাসী ও ধড়পাকড় শুরু হয়ে গেল। পুলিশ লঞ্চ রায়মঙ্গলেও গেল, কিন্তু তার পূর্বেই সাতকড়ি ও তাঁর সঙ্গীরা সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। ইংরেজ সরকার তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রের খবর তারা পেয়েছে, কিন্তু বিপ্লবীদের মন্ত্রগুপ্তির দক্ষতায় হাতে-নাতে কাউকে ধরতে পারছে না, মামলায় জড়িয়ে ফাঁসি দ্বীপান্তর দিতে পারছেনা। তাই সন্দেহ মাত্রই তল্লাসী, গ্রেপ্তার, অন্তরীণ, Regulation III ও Defence Actএ বন্দী করার হিড়িক পড়ে গেল।

এই হিড়িকের মধ্যে ১৯১৫ সালে সাতকড়ি ধরা পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে না পারায় সরকার তাঁকে Regulation III তে বিনা বিচারে বন্দী ক'রে রাখলো। চার বছর জেলে বন্দী থাকার পর ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি পেলেন।

যুগান্তর দলের তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মুক্তির পর ১৯২০ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ক'রে গণজাগরণ ও গণসংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত তাঁরা গ্রহণ করলেন। সাতকড়ি কলকাতার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে এই সংগঠনের প্রোগ্রাম কার্যে পরিণত করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। কর্মী সংগ্রহ ও বিভিন্ন স্থানে জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন। তাঁরই প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় বহুস্থানে যুবসংঘ, ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরী, নৈশবিদ্যালয় ও সেবাসমিতি গড়ে উঠলো। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মারফৎ জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের কর্মসূচী অনুসৃত হ'তে থাকলো।

এদিকে সি, আর, দাসের স্বরাজ্য পার্টির প্রোগ্রামকে সফল ক'রে তুলবার জন্য যুগান্তর দলের নেতৃবৃন্দ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তার ফলে ১৯২৩ সালেই তাঁদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল এবং ১৯২৪ সালে তাঁদের বাকী সবাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য ব্যাপক আয়োজন চললো। সাতকড়িও এই সময়ে ধৃত হয়ে পুনরায় বন্দী-জীবন যাপন করতে লাগলেন। চার বৎসর বাদে ১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়ে আবার তিনি দলগঠনের কাজে ব্যাপৃত হ'লেন।

১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা পড়ার পর সাতকড়ি পুনরায় গ্রেপ্তার হ'লেন। কিছুকাল জেলে রাখার পর তাঁকে স্বগৃহে অন্তরীণাবদ্ধ করা হ'ল। তাঁর বিপ্লবী দল তখন ভারতে ইংরাজ শক্তিকে উপর্যুপরি আঘাতের পর আঘাত হেনে বিপর্যস্ত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সাতকড়ি স্বগৃহে অন্তরীণ থেকেও সেই কর্ম-সূচীকে বাস্তবে রূপদান করার আয়োজন অতি সঙ্গোপনে করে চলেছেন। মন্ত্রগুপ্তিতে ও বৈপ্লবিক গোপন কর্ম-পরিচালনায় তিনি এমনই দক্ষ ছিলেন যে, তাঁরই উৎসাহে ও প্রেরণায় কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠান হয়ে যাবার পূর্বে পুলিশের মনে কোনো সন্দেহই জাগেনি যে, তাদেরই নজরবন্দী থেকে তাদেরই চোখে ধূলি দিয়ে তিনি গোপনে গোপনে বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছেন। ১৯৩১ সালে আদালত কক্ষে কুখ্যাত বিচারক গালিক সাহেবকে হত্যার আয়োজন তাঁরই গোপন প্রচেষ্টার ফল। এই ঘটনার বিশেষত্ব ছিল এই যে, হত্যাকারী কানাই ভট্টাচার্য সফলতার সঙ্গে আপন কাজ সমাধা ক'রে আদালত কক্ষেই পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মবিলুপ্তির পথে বাড়ালো, তার নিজের

পরিচয়ের কোন নিদর্শন না রেখেই গোয়েন্দা পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টাতেও বহুকাল পর্যন্ত তার নাম ধাম পরিচয় আবিষ্কার করতে পারেনি। বিপ্লবের কাজে নিজেকে এমনিভাবে নিঃশেষে মুছে ফেলার শিক্ষাই সাতকড়ি দিতেন তাঁর দীক্ষিত শিষ্য ও অনুবর্তীদের।

দেশে যখন উপর্যুপরি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ড একটির পর একটি ঘটে চলেছে, তখন সাতকড়িকে পুনরায় জেলে নিয়ে বন্দী করা হ'ল। এই সময়ে প্রেসিডেন্সি জেলে অবস্থান কালে তিনি কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে যাদুজ্যোতিষের সমর্থক সাংবাদিক ওয়াটসন সাহেবকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেবার আয়োজন করেন।

অবশেষে বাংলার জেল থেকে তাঁকে রাজপুতনার বেউর বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত করা হ'ল। সেখানে নিউমোনিয়া ও জ্বরবোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৪৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

সাতকড়ির চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। নিজের কৃতিত্বের কথা, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের কথা বা আত্মপ্রচার বা নাম জাহির করার চেষ্টা কখনও তিনি করেননি। একান্ত অন্তরঙ্গ সহকর্মী ব্যতীত তাঁর কাজের পরিচয় কেউ কখনো জানতে পারেনি। তাঁর সঙ্গী ও অনুবর্তীগণ তাঁর তেজস্বিতা, সাহস ও কর্মতৎপরতার একাংশ পেয়েও সেখানে প্রশংসা অর্জন করেছে, নাম যশ লাভ করেছে, বিপ্লবী সমাজে বিখ্যাত হয়েছে, সাতকড়ি সেখানে নিতান্ত অপরিচিত।

বিপ্লবীর দৃঢ়তা, কঠোরতা ও নিয়মানুবর্তিতা যেন সাতকড়ির ভিতরে মূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। তাঁর কাছ থেকে কখনো কোনো বিবৃতি আদায় করা সম্ভব হয়নি। সারা জীবন প্রায় জেলে কাটিয়েও কখনো তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো কারণে কোনো দরখাস্তই করেননি। তাঁর নিজের ভিতরেও যেমন কোনো দুর্বলতা ছিলনা, তেমনি অপরের দুর্বলতাও তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। জেলখানায় কেউ মুক্তির সংবাদ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে শাসন করতেন—কারণ, এর প্রভাবে অপর বন্দীদের মনে হয়তো মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগবে, মুক্তির জন্য হয়তো তারা চেষ্টা করতে থাকবে এবং সে চেষ্টা হয়তো সরল ও পাপমুক্ত পথে না হওয়াই সম্ভব। এমনই ছিল তাঁর বিপ্লবীসুলভ আদর্শনিষ্ঠা ও চরিত্রের দৃঢ়তা। *

(* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।)

চিঠি

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়

আমাদের কথা রহিল গোপন, প্রকাশ তাহার কোন
ধরণীর মাঝে নহে,
মোদের জীবনে যত আনন্দ যত উল্লাস, শোন,
গোপনে গোপনে বহে।

সন্ধানী হিয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে,
চাহে অনন্ত প্রেম,
দোঁহার মাঝারে দোঁহারে দেখিনু প্রাণের পরশ ভরে,
পেয়েছি সে চারু হেম।
বুকের মাঝারে যত কথা আজো গোপনে রহিল হায়,
প্রকাশ হোলনা যাহা,
সে শুধু নীরবে বুঝিতে হইবে হৃদয়ের লালিমায়,
ভাষাতীত, হায়, তাহা।

সাংখ্যদর্শন ও সৃষ্টিরহস্য

শ্রীসংযুক্তা কর

জীবন ও জগৎকে গ্রহণ করিবার দুইটি বিশিষ্ট ধারা আছে। তাহার একটি অন্তরমুখী। অন্যটি বহির্মুখী। অন্তরমুখী যে ধারা তাহার পরিণতি দর্শনে এবং বহির্মুখী যে ধারা তাহার পরিণতি জড়বাদে। ভারতের আত্মা চিরকালই অন্তরমুখী। আর্য্য সভ্যতার প্রথম বিকাশের দিন হইতে ভারতের প্রাণময় সত্ত্বা বাহিরের সৌন্দর্য্য-বিলাসে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারে নাই। এই বাণী তাহার চিত্তের অন্তঃস্থল হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়াছে—"ভূমৈব সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি।" অর্থাৎ ভূমা বা বিরাটের জ্ঞানেই সুখ। আমরা অল্পেতে তৃপ্ত নহি। তাই বাহিরের সৌন্দর্য্য বিলাসে চিত্ত যতই মুগ্ধ, বিস্মিত হইয়াছে ততই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল সুরটি ধরিবার জন্য মন উৎসুক হইয়াছে। জাগতিক বাণীর অন্তরালে যে মহাজাগতিক বাণী, ইন্দ্রিয়লোকের মর্ম্মমূলে যে অতীন্দ্রিয় সত্য তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপনিষদের যুগ হইতে দেখা যায়—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে। (ঈঃ উঃ)

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের স্বরূপটি আবৃত আছে। হে তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটক! তুমি তাহাকে উন্মোচন কর। সত্যের মর্ম আমি গ্রহণ করিতে চাই।

এই তত্ত্বানুসন্ধান হইতেই দর্শনের আলোকদীপ্ত লোকের সূচনা। কেন না জীবন ও জগৎকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে অবশেষে সৃষ্টি রহস্যের মূলদেশে প্রবেশ করিয়া চরম সত্যের প্রকাশই দর্শনের লক্ষ্য। ঋগ্বেদের যুগ হইতে বিভিন্ন যুগে চিন্তাধারার বিপ্লবের মধ্য দিয়া ভারত এই সৃষ্টি রহস্যের মূল শক্তিকে জানিবার জন্য যে অধীর আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে ভারতের দার্শনিক ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়।

ঋগ্বেদে দেখি—"কো দদর্শ প্রথমং জায়মানমস্থন্ বন্তঃ যদনন্বা বিভর্ত্তি।" শ্রীমৎ সায়নাচার্য্য—প্রসিদ্ধ বেদভাষ্যকার—ইহার অর্থ করিয়াছেন—"এই শরীর জগৎকে যখন অনন্বা অর্থাৎ শরীর রহিতা নাম (বেদান্তপ্রসিদ্ধা) বা প্রকৃতি (সাংখ্য প্রসিদ্ধা) সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তাহাকে কে দেখিয়াছিল? অর্থাৎ কেহই দেখে নাই।" উপনিষদের বহুস্থানেও এই বিরাট জিজ্ঞাসার স্বরূপ পাওয়া যায়।

"কেনেষিতং পতন্তি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।"
(কেন. উপ.)

অথবা—"ভগবন্ কুত এষঃ প্রাণো জায়তে, কথমায়াত্যস্মিঞ্চ শরীরে আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে, কেনোৎক্রমতে, কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্?"

কিন্তু এই সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কেন? তাহাতে দার্শনিকরা বলেন—প্রধানতঃ দুইটি কারণে মানবের চিত্ত পরম সত্যকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়। প্রথমতঃ জগতের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতা। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ধীমান্ তিনি নশ্বর আপাতরমণীয় বাহ্য জগতে প্রলুব্ধ না হইয়া বাহ্য লোকের অন্তরালে যে গোপন অমৃতময় সত্য তাহাকে জানিবার জন্য উন্মুখ হন। উপনিষদের নচিকেতা আখ্যানে ইহা সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়তঃ—দুঃখের অভিঘাত। সাংখ্যাচার্য্য বলেন এ জগতে অবিরত নানা দুঃখতাপে মানব দগ্ধ হয়। এই দুঃখসমূহকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—আধ্যাত্মিক—যেমন রোগজন্য বা মানস পীড়াদি নিমিত্ত, আধিদৈবিক—অলৌকিক প্রভাববশতঃ এবং আধিভৌতিক—বাহ্যজগতের ব্যাঘ্রাদি, চৌরাদি এবং কণ্টকাদি নিমিত্ত। এই ত্রিতাপ হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। এই দুঃখসঙ্ঘাতের অভিঘাত হইতেই মুক্তিলাভ করিবার জন্য কোন চরম সত্যকে জানিতে চিত্ত ব্যাকুল হয় এবং সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা হইতে পরিণামে তাহার যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহাই তাহার দর্শন। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দার্শনিক তাই বিভিন্ন দর্শনালোকে তাঁহাদের নিজ নিজ সিদ্ধান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই

দার্শনিকরা প্রত্যেকেই জগতের মূলে কোন শক্তির লীলাকে স্বীকার করিয়াছেন : কেহ তাহাকে বলিয়াছেন অদ্বৈতশক্তি, কেহ বলিয়াছেন দ্বৈতশক্তি। সাংখ্যাচার্য্য কপিল ও দ্বৈতশক্তিবাদী।

সাংখ্য শাস্ত্র অতি সুপ্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারা। কিন্তু তথাপি ইহার মতবাদ অত্যন্ত সুষ্ঠু ও যৌক্তিক। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যখন তাঁহার অদ্বৈতবাদের রণভেরী লইয়া অন্য দার্শনিক মতগুলিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়াছিলেন তখন সাংখ্যকে বলিয়াছিলেন তাঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বা মল্ল।

সত্যান্বেষী ঋষিরা যখনই কোন কারণের মূলে যাইতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের ধারাকে অনুসরণ করিয়া যাইতে হইয়াছে। কেননা কার্য্যই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা প্রমাণ গ্রাহ্য। কারণ অতীন্দ্রিয়। কারণ কার্য্য হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। এই কার্য্য কারণের ধারাকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় :—নিমিত্তবাদ, পরিণামবাদ, স্বভাববাদ। সাংখ্য শাস্ত্রের মতে কার্য্য কারণের ক্রম পরিণামবাদী। কেন না বিজাতীয় পরিণাম বা তত্ত্বান্তর পরিণাম বলে কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই এঁদের মত। এই পরিণামবাদের ধারাকে অনুসরণ করিয়া করিয়া কার্য্যজগৎ হইতে ক্রমিক ধারায় কারণকে অনুসন্ধান করিতে করিতে সাংখ্যাচার্য্য এমন এক স্থানে উপনীত হইয়াছেন—যাহা তাহাদের মতে সমস্ত মূল এবং সমস্তজগতের মূল আদি কারণ। এবং সেই খানেই তাঁহাদের চিন্তার বিশ্রান্তি। এই মূলের আর মূলান্তর তাঁহারা কল্পনা করেন নাই। "মূলে মূলাভাবাদ্ অমূলং মূলম্" কল্পনা করিলে Regression Ad infinitum অনবস্থাশক্তিদোষ হইত। তাঁহারা বলিতেছেন —আমরা এখানে দেখিতেছি দুইটি শক্তির লীলা; তাহার একটি পুরুষ নামে অপরটি প্রকৃতি নামে পরিচিত। এই পুরুষ এবং প্রকৃতি জীবের অদৃষ্টভোগের জন্য এবং তার অপবর্গ সাধনের জন্য বিবিক্ত বা অবিবিক্ত রূপে লীলা করেন। সাংখ্যমতে এই দুই মৌলিক শক্তি ছাড়া জগৎসৃষ্টির মূলে আরও কতকগুলি উপাদান শক্তি আছে। যথা মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র এবং পঞ্চ মহাভূত, ও একাদশ ইন্দ্রিয়। (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও ও সর্ব্বার্থগামী মন:) এদের তিনটি শ্রেণীতে বা categoryতে ভাগ করা যায়। প্রথমে শুদ্ধ প্রকৃতি বিকৃতি নহে। তারপর প্রকৃতি এবং বিকৃতি উভয়স্বরূপ। যেমন পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার বুদ্ধি। শুদ্ধ বিকৃতি প্রকৃতি নহে। যেমন পঞ্চ মহাভূত। এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব লইয়াই সাংখ্য মতে সৃষ্টি এবং লয়। এবং এই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদার্থ লইয়া জ্ঞানের আলোচনা করে বলিয়াই এই শাস্ত্রের নাম সাংখ্য।

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে সাংখ্যাঃ, প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।
তত্ত্বানি চতুর্ব্বিংশৎ তেন সাংখ্যা ইতি স্মৃতাঃ।

সাংখ্য শাস্ত্রের এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব আপ্তবাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রমিত।

"পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চাপোমাত্রা চ তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশ মাত্রা চ".....ইত্যাদি ক্রমে প্রশ্নোপনিষদে জগতের মৌলিক উপাদানের বিভাগ আছে। কিন্তু ইহা ঠিক সাংখ্য শাস্ত্রেরই পূর্ব্বাভাষ নহে। কেন না এই বিভাগ পরে আরও শাস্ত্রান্তরে গৃহ্যমান হইয়াছে। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদেই সাংখ্য শাস্ত্রের নিশ্চিত আভাষ পাওয়া যায়।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।

এই স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপ অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মূলপ্রকৃতি অবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্ত, ষোড়শস্তু বিকারঃ, ন প্রকৃতিঃ ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ। —মৈত্রেয়োপনিষদ।

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রকৃতি ও পুরুষের কল্পনা এবং তদ্ব্যতীত অপর ত্রয়োবিংশতি মৌলিক পদার্থ শক্তি এবং

তাহাদের পরস্পর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অনুরূপ ভাবে কল্পিত হইয়াছে।

সাংখ্য পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—নিত্যশুদ্ধ—বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব। তিনি চিন্মাত্র বা চিতিশক্তি বা চৈতন্য মাত্র। তিনি নিত্য কেননা দেশ কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। শুদ্ধ কারণ সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত। বুদ্ধ কারণ অনুপ্ত চিদ্রূপ। মুক্ত কেন না বন্ধন বিহীন। পদ্ম পত্রের উপর জলের মত তিনি কূটস্থ, অসঙ্গ, নির্লিপ্ত। তিনি অপরিণামী। তিনি জ্ঞানাতীত। আমরা তাঁহার ব্যবহার এবং স্বরূপ প্রকৃতির ব্যবহার এবং স্বরূপ এর বিপরীত বলিয়া গ্রহণ করি বা অনুমান করি। "আত্মানং বা বিজ্ঞাতারং কো বা অরে বিজানীয়াৎ।" সাংখ্যমতে প্রকৃতি অর্থে যিনি জগৎসৃজনকারিণী। তিনি অচেতনা, জ্ঞানের বিষয় স্বরূপা, তাই বহুজনবেদ্যা। অকারণকা কেন না তিনিই সর্ব্বজগতের কারণ স্বরূপিনী। তিনি নিত্যা, বিভু এবং পরিণামিনী। তিনি ত্রিগুণাত্মিকা। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলিতে পারি পুরুষ এবং প্রকৃতি Pure and Absolute Subjectivism and Objectivism.

এই তিনটি গুণের সমবায়ই প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই তিনটি গুণ যখন সমপরিমাণে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া অবস্থান করে তখন সৃষ্টি হয় না। এবং সেই অবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি মূল কারণের একটি সংজ্ঞা মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যগণ ধর্ম এবং ধর্মীর পার্থক্য স্বীকার করেন না। এই সত্ত্ব অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং প্রকাশ-স্বভাব, রজঃ লঘু ও চলস্বভাব এবং তমঃ গুরু, তাই সবকিছুর বাধা বা check। যেমন প্রদীপের সলিতা আগুন এবং তৈল সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্মী হইলেও প্রদীপ শিখার জ্বলনের জন্য মিলিত হইয়া কার্য্য করে ঠিক অনুরূপ ভাবে পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ সাধনের জন্য এই পরস্পর বিরুদ্ধধর্মী গুণ মিলিত হইয়া প্রয়োজন নিষ্পাদনে পরস্পরের সহায়তা করে।" প্রদীপ শিখাবচ্চার্থতঃ বৃত্তিঃ"।

পুরুষ চিতি শক্তি। তাই তাহার পরিণাম স্বভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। প্রকৃতি জগৎ সৃজনকারিণী ক্ষমতা মাত্র। চৈতন্যের অভাবে তাহার কার্য্যে প্রবৃত্তি নাই। কিন্তু পরস্পরের মিলন এবং বিচ্ছেদের বেদনায় জগতের সৃষ্টি এবং লয়। তাই সাংখ্যাচার্য্য কপিল সমস্যার সমাধান করিলেন,—যেমন দুর্গম অরণ্য পার হইতে হইলে একজন খঞ্জ এবং একজন অন্ধ পরস্পরের সহায়তা করে অনুরূপ ভাবে প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পরের সহায়তা করিয়া পরমপুরুষার্থে সাধন করিয়া থাকেন।—"পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎ কৃতঃ সর্গঃ।"

আচার্য্য মনু বলেন জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থা তাহা প্রতর্ক্য নয়, চিন্তনীয় নয় এবং কোন প্রকার লক্ষণের দ্বারা বিশেষণের যোগ্য নয়। সে যুগ গভীর তমসাচ্ছন্ন এবং অব্যাকৃত। ঐতরেয় উপনিষদে আছে সৃষ্টির পূর্বক্ষণে কার্য্যজগৎ কারণ ব্রহ্মে লীন ছিল। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ"। কপিলাচার্য্যের মতেও সৃষ্টির পূর্ব্বে সমগ্র কার্য্যজগৎ প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত বা অনভিব্যক্ত রূপে বিদ্যমান ছিল। কেন না সাংখ্যমতে শূন্য হইতে কিছু সৃষ্ট হয় না। মূল বা আদির অবস্থাতে প্রকৃতির যে গুণত্রয় তাহারা পরস্পর সমতা রক্ষা করিয়া চলে বটে কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেতে নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলে। কারণ "পরিণামস্বভাবাঃ হি গুণাঃ নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবস্থাতুং শক্নুবন্তি"। গুণগুলির স্বভাবই পরিণাম। পরিণাম ভিন্ন মুহূর্ত্তকালও তাহারা অবস্থান করিতে পারে না। অতঃপর পুরুষার্থ অর্থাৎ ভোগ এবং অপবর্গসাধনের জন্য পুরুষ-চৈতন্যের সান্নিধ্যযোগ্যতাবশতঃই ছায়া পড়ে প্রকৃতির বক্ষে। এবং এই চিচ্ছায়াপাত অভিমানের ফলে প্রকৃতি আপনাকে চেতনা মনে করে। এই উভয়ের সংযোগঅভিমানবশতঃ প্রকৃতির বক্ষে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়। এই বিক্ষোভে প্রকৃতিগর্ভে সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করিয়া গুণগুলি প্রধানাপ্রধানরূপে পরস্পরে বিরাজ করে। রজঃ স্বভাবতঃই চল-স্বভাব। তাই তারই প্রথম প্রাধান্য হয়। এই রজের প্রবৃত্তিবশতঃই সৃষ্টির সূচনা। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইতে যে প্রথম সৃষ্টি তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টিবুদ্ধি বা Cosmic mind. প্রকৃতি

মহত্তত্ত্ব ইহাই বিশ্বের প্রথম কারণ। ইহাকে তাই হিরণ্যগর্ভ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই মহত্তত্ত্ব হইতে জন্ম নেয় অহঙ্কার, কারণ অহঙ্কার না হইলে জগৎসৃষ্টির প্রবৃত্তি হয় না। অহঙ্কার-ত্রিগুণাত্মকরূপে তাহা অসম্ভব। এই অহঙ্কার হইতে একদিকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন এবং অন্য দিকে পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্ট হয়। এই পঞ্চ তন্মাত্র জগতের ভৌতিক পদার্থের পাঁচটি মৌলিক রূপ। তাহাদের নাম যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ। ইহাদের কোন বিশেষ বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না। তাই ইহারা মাত্র তন্মাত্ররূপ বলিয়া তন্মাত্র নামে অভিহিত। এই পঞ্চ তন্মাত্রের ন্যূনাতিরিক্ত ভাবে পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় জগতের পাঁচটি ভৌতিক মৌলিক পদার্থ। তাহারা যথাক্রমে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চ মহাভূতই জগতের শেষ সৃষ্টি ইহা হইতে আর তত্ত্বান্তর পরিণাম হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে রূপের পরিবর্তন হয় মাত্র। যেমন স্বর্ণ হইতে অলঙ্কার, মৃত্তিকা। সর্গকালে যেমন ক্রমিক ধারায় সৃষ্টি হয়। প্রতিসর্গকালে তেমনি প্রতি কার্য্য স্বকারণে লীন হইতে হইতে ক্রমিক ধারায় অবশেষে মূল কারণে লীন হয়। সাংখ্যাচার্যগণ ধ্বংস বা নিরন্বয় নাশ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন "নাশঃ কারণলয়ঃ।"

এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা স্মরণে রাখিতে হইবে। এই যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ইহারা জীবের চরম লক্ষ্যকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া সৃষ্টি পথে চলিয়াছে। সৃষ্টির মূলে যে জীবনের চরম উদ্দেশ্য যাহাতে সাধিত হইতে পারে—এইরূপ একটা অভিপ্রায় আছে এ কথা পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও স্বীকার করেন। তাঁহারা ইহাকে বলেন "teleological purpose. প্রাচ্য দার্শনিকরা ইহাকে বলেন "ভোগাপবর্গ" অর্থাৎ ভোগের দ্বারা কর্মক্ষয় হইলে যখন আর এমন কোন কর্ম থাকিবে না যাহার ফলে পুনরায় জন্ম ও ভোগ হইতে পারে তখনই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হইয়া পুরুষের যে আত্মোপলব্ধি তাহাই তাহার মোক্ষ। ভোগ এবং পরিণামে মোক্ষ ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকৃতির সৃষ্টি লীলা। একান্ত নিবৃত্তি অর্থে জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্মের লয় হইলেও ভাব প্রাপ্তি। যাহাতে আর তাহা হইতে উৎপত্তি সম্ভাবনা না থাকে যেমন বৃক্ষের বিবৃদ্ধি নিমিত্ত মাতৃদুগ্ধ স্বতঃই নিঃসারিত হয় তদনুরূপ জীবনের এই চরম কল্যাণের জন্যই চিতিশক্তি ও জড়ের মিলন। এবং তাহা হইতে সৃষ্টি।

প্রশ্ন ওঠে জীব এক না বহু। সাংখ্যকার কপিলাচার্য্য বলেন জীব বহু। অন্যথা ভোগবৈচিত্র্য সম্ভব নয়। সকলেই যদি একই অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হয় তবে একের সুখ দুঃখ বহুতে বা সকলে ভোগ করে না কেন? যেহেতু প্রতিজীব একই কালে একই ভাবে একই সুখ-দুঃখ ভোগ করে না অতএব পুরুষ-বহুত্ব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। শ্রুতিতে যে অদ্বৈততত্ত্বের কথা আছে তাহার অর্থ জাত্যাদ্বৈতত্ব। অর্থাৎ পুরুষ একজাতীয়। প্রকৃতি কিন্তু এক। নিত্যা, সর্ব্বব্যাপিনী, অখণ্ড প্রকৃতির সহিত সংযোগঅভিমানবশতঃ চিতিশক্তি যখন দেহেন্দ্রিয় বিশিষ্ট রূপে অভিমানী হয় তখনই তাহার জীবত্ব প্রাপ্তি। যেমন একই বারিবিন্দু ভূমিতে উৎকর্ষ এবং বীজ তারতম্য নিবন্ধন বিভিন্ন সৃষ্টি করে ঠিক সেই রূপ সংযোগ বৈচিত্র্য এবং কর্মবীজ বশতঃ একই প্রকৃতির নানা সৃষ্টি হয়।

'সাংখ্যসার' প্রণেতা বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন প্রকৃতিও বহু। তাহা না হইলে আকাশ প্রভৃতির পরম মহৎ পরিমাণের এবং অণুর পরম সূক্ষ্ম পরিমাণের সৃষ্টি বৈচিত্র্য বোধাতীত হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে কপিলার্ষের রচিত কোন গ্রন্থাদি না থাকাতে মূল মত কি তাহা জানা যায় না। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ কপিলের সাক্ষাৎ শিষ্য পরম্পরার অন্তর্গত। তাই তাঁহার রচিত গ্রন্থই প্রমাণ স্বরূপ সুধী সমাজে গৃহীত। ইহাতে প্রকৃতির একত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত জীবের সংযোগবৈচিত্র্য বশতঃ সৃষ্টিবৈচিত্র্য হয় এ কল্পনা অনন্ত প্রকৃতি কল্পনা অপেক্ষা লঘু।

সাংখ্য এবং যোগদর্শন পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধে যুক্ত। জ্ঞানমার্গের পথে যে চরম লক্ষ্যের সন্ধান সাংখ্য দেয়

সাধনমার্গের দ্বারা তাহার প্রাপ্তির পথ যোগদর্শন নির্দেশ করে। এই উভয় দর্শনের মতবাদ তাই একই। যোগদর্শনে জন্মান্তর বাদের বিশদ আলোচনা আছে। জন্ম হইতে জন্মান্তরের মধ্য দিয়া জীব তাহার চরম লক্ষ্য অপবর্গ প্রাপ্তির সন্ধানে চলিয়াছে। পূর্ব জীবনে সে যে কর্ম করিয়া আসিয়াছে তাহার সবগুলিই তখন ফলপ্রদ হয় নাই। বর্তমান জীবনেও সে যে কর্ম করিতেছে তাহার সবগুলিই এখনই ফলপ্রদ হইবে না। এই পূর্বজীবন সঞ্চিত এবং বর্তমান জীবনে প্রারব্ধ কর্মগুলিই জীবের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল ভোগাভোগ প্রাপ্তিকে নিয়মিত করে। কর্ম হইতে বাসনা বা সংস্কার হয়। যেমন অক্ষসপ্রাবে চাঁপা ফুল রাখিয়া রাখিলে ঐ প্রাবে চাঁপার গন্ধে সুবাসিত হয়, সেইরূপ যে যেরূপ কর্ম করে তাহার চিত্ত তদনুরূপ ভাবে রঞ্জিত হয়। পরজীবনে ঐরূপ চিত্ত আপনার সংস্কারানুকূল কর্ম উদ্বুদ্ধ করিয়া জীবের তদনুরূপ ভোগের সহায়তা করে। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহ নশ্বর। ইহা কখনও ঐ সংস্কার বাহী হইতে পারে না। চার্বাকের মত আমরা জড়বাদীও নহি—যাহাতে আমরা এই বিশ্বাস পোষণ করিব যে—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" অতএব "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"। সুতরাং জন্মান্তর বাদে সব হিন্দু দার্শনিকই আস্থা স্থাপন করেন। উভয় সঙ্কট সেখা দেয়। সাংখ্যকার সঙ্কটের পরিত্রাণ নির্দেশ করেন। অতি স্পষ্ট এবং মনোগ্রাহী। তিনি বলেন শরীর তিনটি। সূক্ষ্ম, মহদাদি তন্মাত্র পর্যন্ত এবং ঘট্ কৌশিক স্থূল। এই সূক্ষ্ম শরীরের স্বয়ং ভোগ নাই কিন্তু ইহা মহদাদি শরীরের আশ্রয় স্বরূপ। এই মহদাদি শরীর জীবের কর্মসংস্কারবাহী। জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরালে সংস্কারবাহী শরীর এই সূক্ষ্ম শরীরকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। কেন না চিত্র যেমন আশ্রয় ছাড়া, ছায়া যেমন স্থাণু ছাড়া থাকিতে পারে না, তন্মাত্র সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত মহদাদি লিঙ্গ শরীর সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। পঞ্চ তন্মাত্র সৃষ্টির পরক্ষণেই পঞ্চ মহাভৌতিক দেহ এবং স্ব স্ব কর্মানুকূল জাতি, আয়ু ও ভোগ সৃষ্টি হয়। যেমন একই নট কখনও বৎসরাজ কখনও ভোজরাজ কখনও রামের চরিত্র অভিনয় করেন। কিন্তু ইহাতে তাহার নিজের কোন পরিবর্তন হয় না সেইরূপ সূক্ষ্মশরীর স্বয়ং সুখ বা দুঃখের ভোক্তা না হইয়াও লিঙ্গ শরীরকে স্থূল শরীরের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করাইয়া বিচিত্র জীবনের সৃষ্টি করে।

বর্তমানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের স্থূল অনুসন্ধান করিতে করিতে এমন এক প্রান্তদেশে উপনীত হইয়াছে, যে প্রত্যন্ত প্রদেশকে দর্শনলোকের তোরণদ্বার বলা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "আত্মা বা অরে শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে আজ মননের রাজ্যেই প্রবেশ করিয়াছে। তাই বর্তমান দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠরা দার্শনিক। এঁদের শীর্ষস্থানে আছেন আইন্‌ষ্টাইন। এর যে মতবাদ তাহাকে সরলভাষায় আধ্যাত্মিক বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না। যদিও ইনি নিজেকে সে আলোকে দেখেন না। Galloway তাঁহার History of Philosophy তে কবিত্ব করিয়া বলিয়াছেন—"The owl of Minerva does not take upon its flight till the evening twilight has begun to fall." চিন্তার গভীরতা যতই প্রান্তদেশে যাইবে ততই দর্শনলোকের বিচ্ছুরিত দীপ্তি দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিবে। আমরা যাহারা বিজ্ঞানে অনুরাগী তাহারা ভারতীয়শাস্ত্রকে উপহাস করিতেই গৌরব বোধ করি। অপরপক্ষে শুধুই শাস্ত্ররত যাঁহারা তাঁহারা বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছেন। ফলতঃ এই দুইয়ের মধ্যে যে নিকটতম আত্মীয়তার সূত্র প্রচ্ছন্ন আছে তাহা আমাদের নাগালের বাহিরে থাকিয়া যাইতেছে। এই উভয়ের মিলন সাধন বর্তমান চিন্তাজগতের যুগধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন বিজ্ঞান হইবে শাস্ত্র সম্মত এবং শাস্ত্র হইবে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উভয়ের মিলন-সঙ্গমেই জগতের ভাবী মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের ধারাকে অনুসরণ করিলেও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের অধুনাতম আলোক সম্পাতে প্রাচ্যদর্শনের বহু তথ্য অত্যন্ত

সত্যরূপে স্বীকৃত হইতে বাধা। সাংখ্যদর্শনের মতবাদও তাই বৈজ্ঞানিকরূপে আজ গৃহীত হইতেছে। তাই মনে হয় আমাদের ঋষিদের যে ক্রান্তদর্শী বা কবি বা ত্রিকালদর্শী বলা হইত তাহা অতি সার্থক। সুদূর অতীতের ধোঁয়া-তলে কপিলাচার্য্য যে চিন্তাধারা রাখিয়া গিয়াছেন আজ বহুশত শতাব্দী পরে তাহার যাথার্থ্য যদি বৈজ্ঞানিকভাবে গৃহীত হয় তাহা অত্যন্ত বিস্ময়ের এবং আনন্দের কথা। কিন্তু এ এক বিরাট অধ্যায়। যাঁহারা বিজ্ঞান এবং দর্শন উভয়ের সন্ধান রাখিতে উৎসুক এবং সক্ষম তাঁহাদের আহ্বান করি। তাঁহাদের প্রচেষ্টাতে ভারতের অপূর্ব্ব চিন্তারত্ন নূতন আলোকে ভাস্বর হইয়া উঠুক।

বহে চলে যেথা মন চায়

শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি দুর্বার, আমি হতে পারি যেন বন্যা
যেন বারবার করি বাঁধার প্রাচীর খানখান
যেন উদ্দাম কলকল্লোল সব প্রাণ মোর
ছোটে বন্‌বন্-ছোটে শন্‌শন্ ছোটে আঘ্রাণ।

যেথা তৃষাতুর মাটি চাতকের তৃষাকণ্ঠে
যেথা প্রখর রৌদ্র, খরতর যেথা উত্তাপ
আমি কলকল, মোর ছল ছল আঁখি দিক জল
আমি ছুড়াইতে চাই সে মাটির সব সন্তাপ।

যেথা ব্যর্থ প্রয়াস জীবনের শত সংশয়
যেথা একফোঁটা জল—সেই সে শেষের সম্বল
আমি ছুটে যাই সেথা—মৃত্যুকে যেথা করি জয়
আমি দুর্বার মোর দুবাহুতে সেকি কম বল!

আমি মৃত্যুঞ্জয়ী মৃত্যু আমার নেই কো
মোর ক্ষয় আছে তবু জয় আছে শেষ পন্থায়
আমি চঞ্চল তাই বলি চিরদিন চলচল
সব দুর্বার বেগে বহে চল যেথা মন চায়।

আশ্বিন ঃ ১৩৫৬

বেণু দত্তরায়

আমার ধূসর-মাঠ ভ'রে তুমি রমণীয়া এলে :
চপলতা ঢেউ তুলে, খুশিয়ালী গান গেয়ে গেয়ে ;
এলে তুমি হেসে হেসে, বাতাসের সনে খেলে খেলে
ধানী-রঙা শাড়ী পরে, ধরণীর দুধে-ধোয়া মেয়ে।
মাঠে মাঠে কতোদিন স্বপনেরে করেছি বপন :
প্রাণের আরতি জেলে কবিতার রচনা আমার—
শিষে শিষে মধু নিয়ে দেখা দেবে, ছিল তা গোপন :
তাই বুঝি কল্যাণী তুমি নারী কোনো মমতার।
যে-আমারে ডাক দেবে, সে-হারানো লাজে লাল বুঝি!
তারে নিয়ে তাই আজ আর এই ভরেনাতো বুক :
তাই বুঝি মন কাঁপে : আকাশের কাছে তাকে খুঁজি—
মন ফিরে নত হ'য়ে! পাখীদের ডানায় কি সুখ!
সে-সুখের শিহরের এতোটুকু পাওয়া গেলো ছোঁয়া ;
কতোদূর থেকে যেনো ভেসে আসে ফসলের ঘ্রাণ :
করুণার দান যেনো সবখার হাতে শাঁখা-নোয়া ;
ঘরে-ঘরে সাড়া কীযে! কল্লোলে মাতে সারা প্রাণ।
আমার ধূসর মাঠে—সারাদিন সকালে-বিকেলে—
আনমনা-যৌবনা ছায়া আর আলো নিয়ে খেলে।

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের গতি

বীরেন সেন গুপ্ত

মননশীলতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে কথা-সাহিত্যই মানুষের চিন্তাধারার পূর্ণ অভিব্যক্তি, কেবল মাত্র চিন্তা নয়, সমস্ত সমাজ, সম্পূর্ণ মানুষটা পর্য্যন্ত কথা-সাহিত্যের গোপনের মধ্যে থেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। প্রাত্যহিক সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার উচ্ছ্বসিত উচ্ছ্বসিত অনুভূতি সমন্বিত মননশীল সংবেদনশীল মানুষের এক একটা প্রাণবান মুহূর্ত্ত যে ভাবে কথা-সাহিত্যে বিকশিত হতে পারে, এমনটি আর কোথাও নয়। কারণ কথা সাহিত্যে মানুষ মুখ্য, বক্তব্য গৌণ। কেবলমাত্র বক্তব্য নয়, বক্তব্য ব্যক্তির পরিপূরক মাত্র। ঠিক এই কারণেই রসবিমুগ্ধ মনের কাছে কথা-সাহিত্যের সংবেদন অনেক বেশি; সমগ্র সম্পূর্ণ জীবনকে অনুভব করার উপজীব্য এই কথা-সাহিত্য।

এত বেশি অন্তরংগ, এত বেশী সংবেদনশীল হয়ে উঠবার ক্ষমতা কথা-সাহিত্যের এমন সহজ বলেই, কথা-সাহিত্য রচনা করা অনেক বেশি কঠিন, সময় সাপেক্ষ, অনুভূতি সাপেক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের বুদ্ধিদীপ্ত মন-ও কথা-সাহিত্য রচনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। অনুভূতির ঘনত্ব ও নিবিড়ত্ব জীবনের প্রতিদিনকার ঘাত প্রতিঘাতের উপর নির্ভর ক'রে প্রকাশিত হয় ব'লে জীবন এখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে, এবং জীবনকে তার প্রাপ্য সম্মান দিতেই হয়। ঘটনা বা অনুভূতির প্রকাশ ওদের নিজেদের জন্য নয়, কেবল গল্প বলার জন্য গল্প বানালে চলেনা, জীবনকে অথবা মানুষকে চিত্রিত করার জন্য গল্প বানাতে হয়। তার উপর বরাবরই অতি কথনের ভয় থাকে, কথাকে সংযত করতে হয়, ভাবকে করতে হয় সীমাবদ্ধ, মানুষ যাতে অতিমানুষ না হয়ে উঠতে পারে তার দিকে রাখতে হয় সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বস্তুতঃ কথাসাহিত্য রচনা করতে লেখককে যতখানি সচেতন থাকতে হয়, অন্য কোন রচনাতেই এতখানি সচেতনতার প্রয়োজন হয় না। কথা-সাহিত্যের কলেবরও নিতান্ত ছোট হবার কথা নয়, কারণ মানুষের জীবন কর্মদীর্ঘ নয়, বা এতে কম ঘটনা বৈচিত্র্যও থাকে না। দিনে দিনে, বছরে বছরে মানুষের সমবিকাশ, তার দেহে, মনে অদ্ভুত একটা বিভিন্নতা এনে দেয়। আজকের সকাল আর কালকের সকালের মধ্যে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টা পার্থক্য কিন্তু অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পার্থক্য আরও অনেক বেশি। মানসিক বিবর্ত্তনের এই ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে কথা সাহিত্যিককে সব সময়েই তার তুলি চালাতে হয়। চিত্রের পর চিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়, কোথাও একঘেয়ে হলে চলবে না, কোথাও শ্রান্তিতে এলিয়ে পড়লে সব মাটি হয়ে যাবে। এর পরের বিপদও কম নয়, পাঠকের রসসিক্ত মনে ঠিক সুরের ঝঙ্কার তুলতে হবে, তার মনকে বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে এবং সর্ব্বোপরি জীবন দিয়ে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে দিতে হবে, বিমুগ্ধ করে দিতে হবে; এবং এইটাই কথা সাহিত্যের সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব।

এই বিচার বোধ এবং দৃষ্টিকোণের সংগে মিশে থাকে লেখকের আদর্শ এবং চিন্তার বৈশিষ্ট, তাঁর বলার কায়-কার্য্য ও পরিবেশনের আঙ্গিক, তাঁর কথন ও প্রকাশের রীতি। ধরাবাঁধা কোন নিয়ম না থাকলেও, গল্প বলায় এবং বিষয় বস্তু নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকলেও লেখককে সব সময়ই একটা কঠিন নিয়মের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়, এতটুকু উচ্ছৃঙ্খল হবার উপায় নেই। কোথাও একটু বেশি রং লাগলে চলবে না, রং না লাগলে ছবি ফুটে উঠবে না। কথনে, পরিবেশনে লেখককে তাই অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে থাকতে হয়।

শরৎচন্দ্র ছিলেন এমনি কথক—লেখনে, কথনে, পরিবেশনে, বিষয় বস্তু নির্দ্ধারণে তাঁর দৃষ্টি ছিল জীবনের দিকে—জীবনের অমর্য্যাদা তিনি কখনো করেননি। তাঁর প্রত্যেকটি রচনায় তিনি তাঁর অনুভূতিকে জীবনের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, বুননে কোথাও অনাবশ্যক ফাঁক রাখেননি।

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও কম উপন্যাস লেখা হয়নি, ইংরেজী সাহিত্যের মতো এর কলেবর এত বড় না হলেও, গত বিশ পঁচিশ বছরে বাংলা দেশে বিভিন্ন বিষয় বস্তু নিয়ে বিভিন্ন ভংগীতে অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে। খ্যাতি, অখ্যাতি, নিন্দা, স্তুতি, লেখকদের ভাগ্যে যেমনই জুটুক না কেন, একটা রসগ্রাহী বুদ্ধিদীপ্ত মনের খোরাক জোগানোর পক্ষে তবু এই রচনা যথেষ্ট নয়. বহু দিকের স্বল্পালোক এরা এনেছে সত্যিই, কিন্তু সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা ও তাপরেখা তবু এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসে নামের অনেকগুলি বই অপাঠ্য এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অবাঞ্ছনীয়, খুব নামকরা লেখকেরও অনেকগুলি বই পড়তে বিরক্তি লাগে বিষয় বস্তুর নূতনত্ব অথবা পরিবেশনের কৃতিত্বের অভাবে, যে কোন লেখকের সব রচনাগুলি একই সংগে পড়তে গেলে চিন্তা এবং অনুভূতির দারিদ্র্য এত বেশী লক্ষ্য করা যায় যে মনে হয় লেখক যদি কেবল মাত্র একখানা বই লিখতেন তবেই সব দিক থেকে মানানসই হতো। বলিষ্ঠ প্রখরশক্তির অভাবে বা উন্নত জীবন মননের অভাব হেতু প্রায়ই রচনা অতিকথন দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভংগীতে কথা বলে রচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে হয়। সবটুকুর উপর চোখ বুলিয়ে নিশ্চেষ্ট পাঠক মন যখন কলেবর সমাপ্তির দিকে এগিয়ে আসে তখন অসহ্য বিরক্তিতে মনটা ভেংগে পড়তে চায়। মাত্র কয়েকটা উপন্যাস বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ বই সম্পর্কে এ'কথা দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হয়।

এর কারণ অনুসন্ধান করলে অনেকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। আশ্চর্য্য বলছি এই কারণে যে সাধারণ ভাবে আমরা কখনো এই দিকে দৃষ্টি দিই

প্রথমতঃ লেখককে বিপদে পড়তে হয় বিষয় বস্তু নির্ব্বাচনে বাঙ্গালীর জীবনে ঘটনা নেই, ঘটনা ঘটাবার অবকাশও বেশী নেই। বাংগালীরা স্বল্পায়ু, তদুপরি অতি অল্প বয়সে এরা যেমন জীবন আরম্ভ করে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। নাকখানে যা থাকে তা হলো আত্মগ্লানি অথবা আত্ম-পরাজয়ে ক্লিষ্ট পীড়িত জীবন, সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি একটানা খাটুনি—তারপর নিস্তেজ নিরানন্দ মনে পরের দিনের প্রতীক্ষা করা—এর মধ্যে ঘটনা কোথায়, জীবনটা কখনো সহজ স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারেনা, জীবন যেমন নির্জীব, মন ও অনুভূতিও তেমনি নিশ্চেতন। এই জীবন নিয়ে রচনা করতে গেলে এই নির্জীবতার আমেজ লেখকের মধ্যেও সংক্রামিত হতে বাধ্য। লেখককে তাই অগত্যা এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাকৃত কোন কিছু বর্ণনা করতে হয়। জীবনকে উপজীব্য করে বাংলা উপন্যাসের কলেবর বৃদ্ধি তাই সম্ভবপর হয়ে উঠে না। সংক্ষেপে দেখতে গেলে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসও খুব দীর্ঘদিনের নয়: উপন্যাসে একটা সময়ের প্রশ্ন থাকে সেটা একজনের জীবন কাল হোক্ বা কোন বিশেষ দিনের মানসিক অনুভূতিতে অন্যান্য অনেক ঘটনার স্মৃতি সমাবেশই হোক্। এই স্মৃতি সমাবেশে দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসটা অনেক সময় এসে পড়তে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ রোমা রোলার জাঁ ক্রিস্তফ্ বইটার উল্লেখ করা যেতে পারে। জাঁ ক্রিস্তফের জীবনকালটা জার্মান, ফরাসী এবং ইটালীর সংস্কৃতির গভীর ও পরস্পর সমন্বয়ের ইতিহাস, এই ক্ষেত্রে লেখকের সুবিধা ছিল এই তিনটি দেশের বিভিন্ন জীবন দর্শন ও রীতি নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য টেনে আনা। এনেছেনও তাই, জীবনের প্রত্যেকটা পরিবর্ত্তনের পটভূমিকায় এক একটা দেশের জীবনরীতির আত্ম-প্রবন ও সংবেদনশীল আলোচনা করেছেন লেখক। একটি জীবনের পটভূমিতে সীমাবদ্ধ বলে এই আলোচনা মননের বিষয় বস্তু না হয়ে রসগ্রাহী মনের সীমানায় এসে পড়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে প্রায় ষোল শ' পৃষ্ঠার বিরাট বই খানা পড়তে ও কোথাও এক বিন্দু বিরক্তি লাগে না, কোথাও মন একটুও পীড়িত হয়ে উঠে না। কথা-সাহিত্যের এইটাই সবচেয়ে বড় গুণ বলে আমার বিশ্বাস।

বাংলা সাহিত্যে ঘটনা বৈচিত্র্যকে উপজীব্য করে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে তারাশংকরের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। গ্রাম্য জীবনকে উপলক্ষ্য করে গ্রামের জনসাধারণের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কাহিনীগুলি তিনি লিখছেন—ঠিক যেমনটি দেখেছেন অনেকখানি তেমনি করে। তবু কাহিনীর বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণে অনেক সময় তাঁকে অবাস্তব কোন কিছুর উল্লেখ করতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম। অনেকগুলি মানুষের সংকীর্ণ জীবনাবর্তের মধ্যে একটি চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম্য জীবনের ভাঙন ও গঠনের চিত্র তিনি এঁকেছেন। এক একটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের কাঠামোর উপর বিশেষ করে কাহিনীর ভিত্তি। অনেক সময় এমন টুকরো ঘটনার ফল হিসাবে কাহিনীকে তিনি যেভাবে টেনেছেন তাতে অবাস্তবতার ছাপ যথেষ্ট। গ্রাম্য জমিদার এবং মহাজনদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির ইংগিতে যে সমস্ত হতভাগ্য গৃহহারা হতে পারে তারাই আবার সামান্য খাদ্যের টুকরার জন্য তাদের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয় এইটাই কাহিনীর চূড়ান্ত ট্রাজেডি। কাহিনীতে সবই আছে কিন্তু তবু যেন মন ভরে উঠে না—মনে হয় এর চেয়ে বলিষ্ঠতর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করতে লেখক চরিত্রগুলিকে ভাল ফুটাতে পারতেন। মূল চরিত্র দেবুর স্বাদেশিকতা ও পরার্থপরতা এত সীমাবদ্ধ এবং এমন সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচিত যে চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ সত্ত্বেও বিষয় বস্তুর পরিপূর্ণতা থাকেনা, তাই বহু ক্ষেত্রেই লেখককে টেনে টেনে দীর্ঘায়িত করতে হয়েছে; কাহিনীতে ঘটনা কম বলে সামান্য ঘটনার ফলাফলকে অনেকখানি বড় করে দেখাতে হয়েছে। যেমন জরিপের সামান্য গণ্ডগোল নিয়ে দেবুর পদের যাদের কারাদণ্ড। এমনি সাধারণতঃ হয় না, সামান্য কিছু অর্থদণ্ড হতে পারে। কিন্তু কাহিনীর পরিস্ফুটনের জন্য এটা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

তারাশংকর বাবুর অন্যান্য সব বইগুলি সম্পর্কে একথা খাটে। বিশেষ করে ওঁর সব বইগুলো একসংগে পড়লে আর একটা বিশেষ জিনিষ চোখে পড়তে বাধ্য সব বইয়ের ঘটনার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মিল এমনকি পার্শ্ব চরিত্রগুলি অনেকাংশে প্রায় একই রকমের। এতে রচনার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে কমে যায় এবং পুনরুক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠে। দ্বিতীয় প্রশ্ন আঞ্চলিক ও ভাষা সম্পর্কে তিনি যেন বরাবরই অচেতন, ভাষার কারুকার্য্য কোথাও নেই, উচ্ছ্বসিত মুহূর্ত্তগুলিও যেন ঝিনিয়ে পড়া নিস্তেজ কথার ভাঁজে আচ্ছন্ন থাকে। এদিকে এত উদাসীন চলে কথা সাহিত্যিকের চলে না। যেমনটি দেখেন বরাবরই তেমনটি বলার চেষ্টার ফল বোধ হয় এটা। অবাস্তবতার মত রচনাকে অতিবাস্তব করাটাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাই অনেক বড় পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্র পেয়েও তারাশংকর বাবু অনেক তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলেন, সামাজিক চেতনা আনলেন সত্যিই কিন্তু স্থায়ী কোন রেখাপাত করতে পারলেন না।

ঘটনা বৈচিত্র্যকে গৌণ করলে মনন ও মননের অনুশীলনই মুখ্য হয়ে উঠে। ঘটনার ফাঁকগুলি বিচিত্র মানসিকতার রক্তস্রোতের দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হয়; চিন্তা কাজ ও স্বপ্ন—এই তিনটার সমন্বয় সাধন করে একটা ভারসাম্য রক্ষা করে কথা বলতে হয়। এই ভারসাম্য রক্ষিত না হলেই অতি কথনের উৎপাতে পাঠকমন বিরক্ত হয়ে উঠবে। সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সৌন্দর্য্যোপলব্ধি এই সমস্ত ক্ষেত্রে রচনার উপজীব্যকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করে তোলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাচালি' বইটা এই রকম মন্তেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অপুর জীবনে ঘটনা ঘটেছে অল্প কিন্তু তার কল্পনা অসীম, অনন্ত। প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্য্যের নিবিড়তাকে আশ্রয় করে এই কল্পনা উড়ে চলেছে উড়ো পাখীর মতো। লেখকের মনস্তত্ত্ব ও বর্ণনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা সমগ্র উপন্যাসটির মধ্যে কোথাও একবিন্দু ফাঁক রাখেনি, শিশুমনের বিচিত্র জীবনীশক্তির আবেগময় প্রকাশে সমস্ত বইটা রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই পর্য্যন্তই।

লেখক এর পরেই ফুরিয়ে গেছেন। প্রকৃতিকে নায়ক করে লেখক এর পরও অনেকগুলি বই রচনা করেছেন কিন্তু বাংলা দেশে প্রকৃতি একটা বলেই এবং বড়জোর তার প্রকাশ কেবল ছয়রকম বলেই লেখককে বারবারই পুনরুক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে। 'পথের পাঁচালির' পরবর্ত্তী একটা রচনাও তাই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠবার ক্ষমতা লাভ করেনি—সবগুলিই পথের পাঁচালির ছায়া হ'য়ে পড়েছে। বিভূতি বাবুকে জানতে হলে তাই 'পথের পাঁচালি' পড়াই যথেষ্ট বলে মনে হয়। বিষয়বস্তু ও পরিবেশের অদল বদল করলে এই অপমৃত্যুর হাত থেকে তিনি রক্ষা পেতেন কিন্তু তা' তিনি পারেননি।

উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বিষয় বস্তুর পরিস্ফুটনের জন্য বিশেষ বিশেষ আঙ্গিকের প্রয়োজন। ইংরাজি অথবা ফরাসী সাহিত্যের যত নাম করা লেখকই বিষয় বস্তুর থেকে আংগিককে বেশি মূল্য দিয়েছেন কি বলছি তা' সাহিত্য নয়, কেমন করে বলছি তাই সাহিত্য। কথা ও ভাবকে রসোত্তীর্ণ করতে হলে তাকে আংগিকের বিশেষ পথে আসতে হবে। পূর্ব্বেই বলেছি তারাশংকর বাবু আংগিক থেকে বিষয় বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছেন—কেমন করে বলতে হবে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন হননি। এই সচেতনতার অভাব আরও অনেক লেখকের মধ্যে দেখা যায়। বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, সরজু ভট্টাচার্য্যের মতো ক্ষমতাশালী লেখকদের উপন্যাসগুলি আংগিকের অভাব হেতু নীরস ও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের পটভূমিতে একটা লোকের মানসিক দ্বন্দ্বসংঘাতের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময়ই খেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের লেখায় বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব আছে, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, অপ্রত্যাশিতের চমক আছে, নেই কেবল উদ্দীপ্ত প্রচণ্ড প্রাণশক্তি যার সংবেদনের প্রলেপে রচনা সাহিত্য হয়ে উঠবে। মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতা শিল্পি মনকে কতখানি ম্লান ও বিকৃত করে তুলতে পারে সুবোধ বাবু ও সরজুবাবুর উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ। বিখ্যাত ফরাসী লেখক হেনরি বারবুসির 'দি ইনফারনো' নামক উপন্যাস পনির একশ বারের বেশি সংস্করণ হয়েছে অথচ বিষয়বস্তুর দিক থেকে তেমন বিশেষ কিছু বইখানিতে নেই, যা আছে তা হলো প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গী। একটা লোক কোন হোটেলের একটি ছোট ঘরের দেয়ালে একটি ফুটো করে পাশের ঘরের মধ্যে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী লক্ষ্য করেছে। হোটেলের ঘরে আবাসিকের পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কেউ একদিন, কেউ বা দুদিন থাকে। এই একদিন কিংবা দুদিন একটি কিংবা দুটী নারী পুরুষের বিচিত্র জীবনের কাহিনী রচনা করেছেন লেখক। যেমন সহজ এই লেখা তেমনি বলিষ্ঠ তাঁর কথনের ভঙ্গী, হৃদয়ানুভূতির, চিরন্তন অন্ধকার রাজ্যে খুব জোরালো টর্চ্চের আলো ফেললেন যেন। যতটুকু আলোকিত হলো কোথাও একটুও অস্পষ্টতা রইলো না। তার বাইরের আরও অনেক রহস্যের সন্ধান পাবার আগ্রহ পর্য্যন্ত হলো না—এই আলোকিত পথে নিঃশঙ্কে নিঃসংকোচে এগিয়ে যাওয়া হলো। বইটার আর একটা বিশেষত্ব হ'ল যিনি দ্রষ্টা তার নিজস্ব কাহিনীটি নয়, তিনি যা দেখলেন মনের রং এর প্রলেপ দিয়ে তা' বললেন না যেমন দেখলেন বলে গেলেন। Subjective হয়েও সম্পূর্ণভাবে objective দ্রষ্টার উপস্থিতি তাই একটুও বিরক্তিজনক নয়। দ্রষ্টার আসনে অনায়াসে নিজেকে বসিয়ে দেওয়া চলে। আংগিকের বিশেষ গুণ হলো এই—পাঠকমনকে তা দেবে একটা নিরুদ্ধ স্বাধীনতা, আপন কল্পনা নিয়ে সেখানে বিচরণ করতে একটুও বাধা ঠেকবে না পড়বার জন্য বিশেষ সাজগোজের প্রয়োজন নেই।

বাংলা দেশে আংগিককে যারা প্রাধান্য দিয়েছেন তাদের সম্পর্কে বলতে গেলেও অনেক কথা বলতে হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'বনফুল' এরা প্রত্যেকেই আংগিক সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু অচিন্ত্যবাবুই যেন আংগিককে প্রাধান্য দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর লেখা অনেকগুলি উপন্যাসকে তিনি যেন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। প্রথম থেকে আরম্ভ

করে সর্বাধুনিক উপন্যাসেও তাঁর এই একদৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম হয়নি। চরিত্র চিত্রণে বলিষ্ঠতা, ভাষার স্বচ্ছতা ও ঋজুতা তাঁর কাহিনীকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে গেছে। কথার চলনে, ভাষার ব্যবহারে তিনি সাবধান, যেন মনবিলাসে তার আকর্ষণ নেই, আছে শুধু বিলাসে। এই ভাষার বিলাস কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে এতখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে শব্দের প্রাধান্য অনুপ্রাসে তিনি অনেক সময়ই অনুভূতিকে ক্ষুণ্ণ করেছেন, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবোদ্দীপক শব্দ সময়য়ে ভাবের সংশয্যা না করে ছাড়েননি। তাই বলিষ্ঠতা ও ঋজুতার সঙ্গে মিশেছে একটা বিশেষ কৃত্রিমতা—তিনি যেন রচনার বহুবাড়ম্বর দেখাবার জন্যই লিখে চলেছেন বিশেষ করে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলি পড়ে এই ধারণা না এসে পারে না। 'যে যাই বলুক,' 'প্রথম প্রেম' 'যার যদি যায়,' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি একদিকে যেমন অতিরিক্ত সচেতন মনোভঙ্গি ও মানুষের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ সম্পর্কে অন্তর্মুখীনতায় অনেকখানি অমার্জিত। আংগিককে ছাপিয়ে গেছে তার কথন এবং উপকথন—ভাষাকে রক্ষা করতে পারেননি। শুধু সাম্প্রতিক রচনা একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী তার ব্যতিক্রম। এখানে ভাষার এই কৃত্রিমতা ছাপিয়েও একটা সুস্থতা পাঠক মনকে আচ্ছন্ন করে।

'বনফুল' ছোট গল্পের আংগিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু উপন্যাসে পাঠক মনকে চমক লাগাবার জন্য তিনি এমন ঘটনা বিবৃত করেন যাতে পাঠক মন বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারে না। সম্পূর্ণ শিথিল তার গাঁথুনি, বক্তব্য তাই অপরিস্ফুট, টুকরো টুকরো চিত্রের আনন্দ দিতে পারে মাত্র কিন্তু একটি সামগ্রিক চেতনাবোধ করনো আনে না। বিশেষ করে ঘটনার বৈচিত্র্য ছুটাতে গিয়ে তিনি চরিত্রগুলোকে এমন অসম্ভব আর অবাস্তব পথে নিয়ে যান যে অনেক সময় তার মানসিক সুস্থতা সম্পর্কেও পাঠকমনে সন্দেহ আসা স্বাভাবিক। এর একটা কারণ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জীবনে ঘটনা নেই, যা আছে তা দিয়ে বড় বড় দু' একটা ছোট গল্প লেখা চলে, উপন্যাস চলে না। সুতরাং বড় কাহিনী লিখতে হলে অনেকগুলি মানুষকে টেনে এনে ঘোরার বসানো ছাড়া উপায় কি। ক্যামেরা দিয়ে বাজারের ফটো তোলার মতই হয়ে পড়ে এখানকার চরিত্র চিত্রণ, কাউকেই প্রায় সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা চলে না। 'বনফুল' এবং তার সমসাময়িক অনেকে তাই পারেননি।

আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আরও দু' একজনের কথা না বললে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সুখের কথা গত কয়েক বৎসরে বাঙালীর মানসিকতার এই অসুস্থতার আক্রমণ কিছুটা কমে এসেছে বলে মনে হয়। অন্ততঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে আমাদের এই দুঃস্বপ্ন কিনিয়ে পড়া জীবনেও বাঁচবার কিছুটা তাগিদ এসেছে। তাগিদ না এসে চলবে না ঠিক এমনি অবস্থায় এসেছে। অনেকদিন পরে হঠাৎ নিজেদের জীবনাদর্শের দিকে তাকাবার একটু অবকাশ যেন আমাদের হয়েছে। তাই কয়েক বৎসরের সাহিত্যে ও উদ্দীপ্ত প্রাণশক্তির আভাষ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা না বাড়লেও জীবন সম্পর্কে আমরা বেশি সচেতন হয়ে উঠেছি একথা বোধ হয় বলা চলে। এই নব-সচেতনতার বাহন হিসাবে নারায়ণ গংগোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ মিত্র এঁদের নাম করা চলে। এঁরা কেউ অসীম শক্তিশালী নন তাই এঁদের কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করাটা অন্যায় হবে। তবে তাঁদের জীবনাদর্শকে এরা নূতন ভাবে, নূতন রোমান্টিক দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন—জীবনের ঘটনার ফাঁক এরা কেউ ভরাট করতে চেয়েছেন নব উপলব্ধিত মানসিকতার সাহায্যে, কেউ বা নূতন জীবনাদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত রোমান্টিসিজম্-এর দ্বারা। এই দুই ধরণের নূতনত্বই প্রশংসার যোগ্য তবু এই শতাব্দীর পাঠকগণ এরও অনেক বেশি প্রত্যাশা করেন। নারায়ণ বাবুর রোমান্টিক অনুভূতি পাঠকদের ভাল লেগেছে, ইংরেজী গল্পের স্বাদ

তার মধ্যে কিছুটা পাওয়া যায় এ'কথা সত্যি। কিন্তু মূলতঃ উপন্যাস রচনায় তিনিও ব্যর্থ হয়েছেন উপনিবেশের কাহিনীতে অতি রোমান্স ছাড়া তার বক্তব্য কিছুই নেই, 'মিলালিলি' কাহিনীর দিক থেকে যেমন বৈচিত্র্যহীন চরিত্র চিত্রণেও তেমনি কোন বিশিষ্টতার ছাপ নেই। বাংলা দেশের জলবায়ুর গুণে কাহিনীকে কোন কিছুর মৌতাত না দিলে সে চলতে পারে না যেমন মানুষগুলোকে সব সময় উত্তেজিত অথবা বিরক্ত করে তুলতেই হবে, নইলে অলস মন ঝিমিয়ে পড়বেই। তাই নারায়ণ বাবুকে কোথাও দিতে হয়েছে রোমান্সের মৌতাত, কোথাও বা বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের। নরেনবাবু এমনি কিছু করেননি, তিনি মনের চিরন্তন রহস্য নিয়ে কারবার করেছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত পুরুষের স্বল্প আয় আর নারীর কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ বাঁচবার জন্য দিবারাত্রির পরিশ্রমের ফাঁকে ফাঁকে মানব-সুলভ ভালবাসার বাইরে তাঁর কিছু জানার নেই, চলারও নেই, কেবলমাত্র এটা নিয়ে লিখতে গেলে একঘেঁয়েমি আসতে বাধ্য, কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বুনন অনেকখানি আলগা আলগা হয়ে গেছে। মনের দরবারে তাই বেশি জায়গা জুড়তে তিনি পারেননি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশে উপন্যাসের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে। এই প্রসংগে আরও একটা বিশেষ বক্তব্য আছে, বাংলাদেশে কথা সাহিত্যিকেরা সমাজ অথবা বন্ধুমহলে আদরণীয় নন। লেখকতীতি বাংলাদেশে কম নয়, লেখকরা তাদের যোগ্য পারিশ্রমিক পান না, সহানুভূতিও পান না তেমন। তাঁরা অনেকখানি অপাংক্তেয়। আমরা সিনেমার অভিনেতা, ইন্সিওরেন্সের দালাল, চোরাকারবারে মুনাফাখোর, ছা-পোষা কেরানী, বাক্যবিদ রাজনীতিক সবাইকে সহ্য করতে পারি কেবল লেখককে পারিনা। তাই লেখা যাদের পেশা তাদের দুর্গতির শেষ নেই। সমাজে অপাংক্তেয় বলে সমাজ সম্পর্কে চূড়ান্ত সচেতনতাও তার পক্ষে পাওয়া দুর্লভ। এমনি অবস্থায় রসগ্রাহী সৎসাহিত্য রচনা করা কষ্ট সাধ্য নয় কি? এসত্ত্বেও যাঁরা সাহিত্যে আত্মনিয়োগ করে জীবনের অন্য দশটা বঞ্চনাকে মেনে নেন, তারা শ্রদ্ধার্হ। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সামাজিক এবং সর্বোপরি শিক্ষিত জনসাধারণের মানসিক পরিবর্তন না হলে কোন প্রকারের সৎ-সাহিত্য রচিত হওয়াই সম্ভব নয়।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

—'ভবঘুরে'

(দুই)

ভোরে উঠেই লটবহর বাঁধাবাঁধি ক'রে ফেললাম। আগে থেকেই সবাই ঠিক ক'রে এসেছি—চলার পথে যে যার জিনিষ ঘাড়ে ক'রেই নিয়ে যাব। নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চড়িয়ে অথবা তাকে দক্ষিণা দোব না। তাই আগে থেকেই 'ডাক ব্যাঙ্ক' এর থান কিনে এনে মিলিটারীদের 'হাভার ব্যাকের' অনুকরণে প্রত্যেকে একটা ক'রে ব্যাগও তৈরী করিয়ে নিয়েছিলাম।

ব্যাগের মধ্যে জিনিষপত্র ভরে সেটা পিঠে ঝুলিয়ে নেওয়া গেল। হাতে রইল এক একটা বিরাট লাঠি। পাহাড়ের পথে চলতে এটা অপরিহার্য্য—বিশেষ ক'রে আমাদের মত সমতলের লোকদের জন্য।

তখনও সূর্য্য উঠতে দেরী আছে। ভোরের আবছা আঁধারের মধ্যে অজানার উজানে পাড়ি জমালাম। তখনও মুসৌরীর দোকান পাট খোলে নি। দূরের গ্রাম থেকে যারা কাজকর্ম ক'রতে আসে—তাদেরই দু'চার জন এসে রাস্তায় মোড়ে ভিড় জমিয়েছে। আমাদের বেশভূষা দেখেই বোধহয় তারা আমাদের গন্তব্য স্থল বুঝে নিয়েছিল। "বদ্রী-বিশাল-লাল কী জয়" বলে তারা আমাদের শুভেচ্ছা জানাল।

ক্রমে মুসৌরীর সুরম্য কুটীরগুলি পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। লোকালয়ের চিহ্ন ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। পায়ের নীচে পিচ ঢালা মসৃণ রাস্তার সুখস্পর্শ এখন আর অনুভব করা যাচ্ছে না। কঠিন, প্রস্তরখণ্ডময়, পাহাড়ে রাস্তা এখন তার স্থান অধিকার ক'রেছে। মাঝে মাঝে ছুঁচল পাথরের গুটি কেড্‌স্ ভেদ ক'রে পায়ে এসে লাগছে। মুসৌরীর মতো এখন আর রাস্তার উপর নিরাপত্তা প্রাচীর (Safety wall) নাই। নীচের দিকে চাওয়া যায় না—কোন অতলে নেমে গেছে পাহাড়। নীচের দিকটা গাছপালায় ঢাকা আছে ব'লে ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না। তবু নীচের দিকে তাকাতে বুক দুরু দুরু ক'রে ওঠে। কোন রকমে একবার পাটা পিছ'লিয়ে গেলে আর রক্ষা নাই। টুকরো টুকরো হ'য়ে কোথায় গুঁড়িয়ে যাব। ভয়ে ভয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁসে এগিয়ে চললাম।

রাস্তার ধারে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে—বিরাট বিরাট গাছ। গাছের গায়ে গাছ ভিড় জমিয়ে ঘন বনের সৃষ্টি ক'রেছে। যুগ যুগান্তর ধ'রে কঠিন পাহাড়ের বুক থেকে রস সংগ্রহ করে এরা পুষ্টি লাভ করেছে। বংশবৃদ্ধি করেছে, গহন বনের সাথী—বন্য পশু পক্ষীকে আশ্রয় এবং আহার যুগিয়েছে—মানুষের নির্মম কুঠার আজও এদের নির্মূল ক'রতে পারে নি। নানা জাতের বল্লরতা দীর্ঘকায় বনস্পতিকে আশ্রয় ক'রে সূর্য্যালোকে পাতা মেলে ধরেছে। বনের বিরাট বিরাট গাছগুলোকে দেখে মনে হয়—এরা যেন পূর্বকালের জমিদার। এদেরই আশ্রয়ে আশ্রিতেরা নিরাপদে নির্ভয়ে জীবনটা উপভোগ ক'রে নিচ্ছে।

সকাল হ'য়ে গেছে। সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে থাকলেও নির্মল রশ্মিতে আলোকিত পাহাড়ের চূড়াগুলো তাঁর আগমনী ঘোষনা করছে। ছায়ায় ঘেরা কঙ্করময় বন্ধুর পথ ধ'রে এগিয়ে চলেছি আমরা পাঁচ জন। রাস্তার পাশে নীরব প্রহরীর মতো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে—সুদীর্ঘ বনস্পতিরা! বহু যুগ ধ'রে বহু যাত্রীর চলাচল এরা নীরবে লক্ষ্য ক'রে এসেছে—আজ আমাদের পাঁচজনেরও যাত্রাপথের নীরব সাথী হ'য়ে রইল এরা।

চারিদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ এসে বন্ধু বললেন—"ওহে, মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব মহাপ্রস্থানের পথে গেছলেন। আমরাও চলেছি পাঁচজন যাচ্ছিও মহাপ্রস্থানেরই পথেই—"

তাঁকে শেষ ক'রতে না দিয়ে আর একজন বল্লেন—"কলির পঞ্চ পাণ্ডব আর কি—আর একজন বললেন—"হাঁ, শুধু যা দ্রৌপদীই পিছনে পড়ে রইলেন" পূর্বোক্ত বন্ধুটী বিবাহিত। হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে তিনি বললেন—"দ্রৌপদী এখন বিরাট রাজার রাজধানীতে হেঁসেল সামলাতে ব্যস্ত।

মহাপ্রস্থানে যাবার কুলক্ষণ কৈ তাঁর?"

—"তা বটে"

ব্যাপারটা একটু রকম হ'ল। কিন্তু বিপদ বাধল—দুদিনকে নিয়ে। কলিন দুর্ধর্ষ্টোকে ভূতকালে অবতীর্ণ হ'তে দেখতেই নারাজ! মনের মধ্যে যখোজোই 'হুঁ'—তাঁকে কিছু বলতেই তিনি বললেন—

—"কেপেছ? এত তাড়াতাড়ি আবার আমার নাই।"

শেষে এক বন্ধু সমাধান করলেন—"তা হ'লে চল—সকলে মিলে একসঙ্গে না হয় নরকটাই গুলজার করা যাবে।"

নানা রসে রহস্যালাপ ক'রতে ক'রতে এগিয়ে চললাম। ঘণ্টাকয়েক হাঁটবার পর একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছালাম। একটা সঙ্গী সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—"ঐ দেখ, দেবাচন সহর।"

সামনের দিকে দৃষ্টি ফেরা গেল। বরফের স্তূপ এখানে নিজের রুক্ষ শরীর ঢাকা দিয়ে দূরে—বহু দূরে নেমে গেছে পাহাড়। তারপর আরম্ভ হয়েছে বিস্তীর্ণ মৌরস-বরফ, রুক্ষ সমতলভূমি। ভ্রূমণ্ডা ধরিত্রী যেন সন্ন্যাসিনীর বেশে সেজেছেন। তারই মধ্যে অবহেলা ভাবে জেগে উঠেছে দেবাচন সহর। ঘরবাড়ী গুলো দেখলাম ঘুঁটের মতো মনে হয়।

সূর্যালোকে উদ্ভাসিত দেবাচনের দৃশ্যকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চললাম। বন ক্রমশঃ নিবিড় হ'য়ে এল। এ অঞ্চলটা সরকারের সংরক্ষিত বন (reserve forest)। খানিকটা এগিয়ে আসার পর একটা চায়ের দোকান মিলল। এটাই নাকি এই রাস্তার শেষ আস্তানা। এর পর সাত মাইলের মধ্যে আর কোন বসতি নাই।

চায়ের দোকানে মিলল—এক কাপ করে চা, আর কুকনো, পুরানো পাইরুটির কয়েকটা টুকরো। গরম চায়ের কাপে চুবিয়ে রুটিটাকে একটু তাজা ক'রে নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। এবার রাস্তাটা বেশ খারাপ এবং ক্রমশঃ উঁচুর দিকে উঠে গেছে। রাস্তার উপরে আলগা ছুঁচালো পাথরগুলো যেন দাঁত বের করে ভেংচাচ্ছে। আলগা পাথরের টুকরোর উপর পা পড়লে বিপদ আছে—গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সাবধানে এগিয়ে চললাম।

ক্রমশঃ চারিদিক অস্বস্তিকর নির্জন মনে হ'তে লাগল। রাস্তাঘাটে লোকজন একেবারে নাই। একটা পশুপক্ষীর সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যায় না। লোকালয়ের মানুষ—এতখানি নির্জনতা কেমন যেন অস্বাভাবিক কৃত্রিম, বলে মনে হয়। দূরের বনে কোথায় যেন একটা পাখী ডাকছে। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে অদ্ভুত নীরব পরিবেশের মধ্যে ঐ পাখীর ডাকটা ঠিক তেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকছিল। আবার মনে হ'ল—প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া—যুগান্তরের উত্থান পতনের সাক্ষী—এই পর্বত শ্রেণী, এই ঝরনা উপবন, বন্য পাখীর এই মধুর কলকাকলী—এ সব কৃত্রিম—না ইট, কাঠ, পাথর দিয়ে গড়া—মানুষের সভ্যতাটা কৃত্রিম? কৃত্রিমতায় অভ্যস্ত চোখ আজ অকৃত্রিমকে চিনতেই পারছে না।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঝরাপোলী ব'লে একটা জায়গায় পৌঁছালাম। এখান থেকে একটা সোজা রাস্তা আছে—ধরাসু পর্যন্ত—মাত্র ১৪ মাইল। ঘোরা রাস্তায় প্রায় ৪০ মাইল ঘুরে ধরাসু যেতে হবে। কিন্তু এখান থেকে সোজা যে পথটা গেছে সেটা খুবই কঠিন। উঁচু চড়াই ভেঙে পাকদণ্ডীর পথে পাহাড় টপ করে এই পথে যেতে হবে। রাস্তায় আবার কোন লোকালয় নাই—খাবার ও কিছু মিলে না—সঙ্গে নিতে হয়। একমাত্র পাহাড়ীরা—পাহাড়ের বুকে যারা আজন্ম ছেলে থেকে বেড়িয়েছে, অথবা সাধু সন্ন্যাসীরা—যাদের আহার, আরামের বালাই নাই—তারাই এ পথে পা বাড়ায়। যাত্রীরা সাধারণতঃ ঘুরেই যায়।

আমরা একে পাহাড়ে নূতন। তারপর জনমানবহীন, সুবিস্তীর্ণ দীর্ঘ রাস্তা। অপেক্ষাকৃত ভাল রাস্তা ধরেই এগিয়ে চললাম।

চলেছি—তো চলেইছি। পিঠের বোঝাটা বিষম ভারী হ'য়ে চেপে বসেছে। কোথাও খানিকটা বসে

পড়ব না কি ভাবছি—এমন সময় অদূরে কয়েকটা ঘর দেখা গেল। ঐ বোধ হয় দেখা যায় জানতাম ধরমশালা।

একটু পরেই আলমোড়ায় এসে পৌঁছালাম। বেলা তখন প্রায় দশটা বাজে, এক খানেই দুপুরটা কাটান যাবে—এই রকম ঠিক ক'রেই ভোরে বেরিয়েছিলাম। কাজেই লটবহর নামিয়ে রেখে ধর্মশালার চৌকিদারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম।

ধর্মশালার ব্যবস্থাটা বেশ ভালই। কয়েকটা দেবী ফুলের গাছ, লম্বা গাছ, একটা ডালিম গাছও লাগিয়েছে দেখা গেল। কয়েকদিন পরে দেশের কতকটা গাছ দেখে আনন্দ হ'ল। মানুষ যখন মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে—তখনই বুঝি সে মাতৃভূমিকে ভাল ক'রে বুঝবার সুযোগ পায়—একমাত্র তখনই সে অনুভব করে মাতৃভূমির আকর্ষণ কত গভীর। মাতৃভূমির সামান্যতম স্মৃতি তখন তার মনে আনন্দের শিহরণ জাগায়, মাতৃভূমির চিন্তা তার অলস মুহূর্তগুলিকে মধুময় করে তোলে, মাতৃভূমির সুখে দুঃখে সে একাত্ম অনুভব করে, দেশের লোক দেখতে পেলে তার মনে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে—আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ পথের মধ্যে এটা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলাম। হিমালয়ের কত অতুলনীয় সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরে উপভোগ করেছি, কিন্তু এই দুঃসাহসিক অর্জিত, মালেরিয়া-প্রপীড়িত বাংলার স্নিগ্ধ, শ্যামল প্রকৃতির ক্রোড়ে একটি নাতির নীড় বার বার আমাদের হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কত দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়েছি, বন্ধুত্ব করেছি, তাদের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার বুঝবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তবু সারা রাস্তার মধ্যে একটি বাঙালীর মুখ দেখবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকতাম।

খানিকটা বিশ্রামের পর রান্নার জোগার করতে উঠে পড়লাম। ধর্মশালার নীচে চৌকিদারের একটা দোকান; সেখানে পাওয়া গেল—চাল, ডাল, আলু। শাক-সব্জি এদেশে পাওয়া যায় না। অগত্যা ভাত, ডাল, আলু সিদ্ধ রান্নার ব্যবস্থা হ'ল। রান্নার জন্য বাসন কোসন চৌকিদারের কাছেই পাওয়া গেল। এ দেশের রীতিই হচ্ছে দোকান থেকে চাইলে রান্নার বাসনও পাওয়া যায়। প্রত্যেক দোকানদার তাই কয়েক সেট বাসনপত্র রেখে দেয়। রান্নাবান্না ক'রে যাত্রীরা বাসন কোসন ধুয়ে আবার দোকানদারকে ফিরে যায়। এই ব্যবস্থার কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমতঃ দুরূহ, দুর্গম পথঘাট—বাসন-কোসন সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ রাস্তায় কোন হোটেল বা খাবারের দোকান মিলে না—এক চা বা চায়ের দোকান ছাড়া, তাও সর্বত্র মিলে না। তৃতীয় আর একটা পরোক্ষ কারণ আছে বলে আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে এদেশের লোক এবং যাত্রী সাধারণের ধর্মের গোঁড়ামি। জাতিভেদ প্রথা এদেশে অত্যন্ত প্রবল, কারুর কারও হাতের রান্না খাওয়া তো দূরের কথা—রান্না বা খাওয়ার সময় অপরিচিত কেউ পাশ দিয়ে গেলেই তার সঙ্গে কগড়া লেগে যায়। এ নিয়ে কতবার যে আমরা বিপদে পড়েছি তার ঠিক নেই। অবশ্য আড়ালে আবডালে এ ব্যবস্থার লঙ্ঘনও যে হয় নি—তা নয়। পরবর্তীকালে আমাদের এক কুলি জুটেছিল, ব্যাটা নাকি নেপালী ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমাদের মতো অব্রাহ্মণের হাতে খেতে তার বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখি নি। তবে দেশ-ওয়ালী ভাইদের দেখতে পেলেই যে মড়লা কুচকুচে কালো পেতে খাটটা কাঁধে তুলে নিয়েই রান্না ক'রতে লেগে যেত। তখন আমাদের কাছে ঘেঁষতে দিত না। মাছ মাংস খাওয়া এ দেশে নিষিদ্ধ। নিরামিষ আহার এদেশের ধর্মীয় আচরণেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ খেতে দেখা গেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

যাক জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে রান্নায় লেগে পড়লাম, কিন্তু আর একটা ফ্যাসাদ দেখা গেল—জল পাওয়া যায় না। জিগেস করে জানলাম আলমোড়ার নীচে একটা ঝরণা আছে। চৌকিদার জল বিক্রি ক'রছে শুনে তো আমাদের চক্ষুস্থির। এক মরুভূমির দেশ থেকে এসে পৌঁছালাম যে বাবা! সুজলা সুফলা বাঙলা মায়ের সন্তান—জলের অভাব কাকে বলে—এতদিন অনুভব করিনি। এখানে এসে বুঝলাম জলের জন্যও দাম দিতে হয়!

কিন্তু তখন ভাববার অবসর ছিল না—পেটের মধ্যে

রীতিমত তাণ্ডব সুরু হ'য়ে গেছে। চৌকিদারের কাছে নগদ দু'টী আনা পয়সা গুণে দিয়ে একটীন জল কিনলাম। ঢাপা খুলে দেখা গেল—তাও কি রকম একটা গন্ধ যেই হোক, তাই দিয়ে রান্না ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিলাম।

তারপর আরও একটা সমস্যা দেখা গেল—স্নানের। স্নান না ক'রে তো থাকা যাবে না! অগত্যা পালাক্রমে স্নান ক'রতে যাব ঠিক করা গেল। বন্ধুদের রান্না করতে দিয়ে আমরা দু'জনে একটা বালতি নিয়ে স্নান ক'রতে বেরোলাম। চৌকিদার পাহাড়ের নীচের দিকে দুটো গাছ দেখিয়ে বলল—"উঁহা পানি মিলেগা।" তার নির্দ্দেশ মত পাহাড় বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম, কোন রাস্তা নেই—এমনি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে নামতে হবে একবার পা কোনরকমে ফস্কাতে পারলে আর রক্ষা নাই।

নেমেছি—তো নেমেই চলেছি, পাহাড়ের এ অঞ্চলটায় গাছপালা নাই। রুক্ষ পাহাড়ের উপর শুকনো ঘাস মিট মিট ক'রে চেয়ে আছে—জলের চিহ্নমাত্র নাই।

অনেকটা নেমে যাওয়ার পর একটা গরুর গলার ঘণ্টার শব্দ শুনে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি—একটা জায়গায় পাহাড়ের গা বেয়ে জল পড়ছে—পাহাড়ী দুলালদের জন্য ধরিত্রীর স্তন নির্ঝর চুইয়ে আসছে যেন। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রচুর, যাই হোক, তাতেই কোন রকমে 'কাক-স্নান' সেরে বালতিতে জল ভরে নিয়ে ধর্মশালায় ফিরে এলাম। চৌকিদার কেন একটীন জলের দাম দু'আনা নিয়েছিল—সেটা সেদিন হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলাম।

ফিরে এসে দেখলাম—ইতিমধ্যে রান্না হ'য়ে গেছে, পথের অবস্থা শুনে বন্ধুরা আর গেলেন না—ওতেই কোন রকমে স্নানাদি সেব ক'রে নিলেন, খেতে বসে দেখলাম—ভাত যা হ'য়েছে—তা একেবারে পিণ্ড; আলুটা অবশ্য ভালই সিদ্ধ হ'য়েছে, তবে ডাল একেবারে সিদ্ধ হয় নি—পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। কিন্তু ক্ষুধাই নাকি সর্বোত্তম চাটনী। কাজেই ও সব দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়ার সময় ছিল না, পরিতৃপ্তির সঙ্গেই সেই স্বর্গীয় খাদ্য (পিণ্ড ?) গলধঃকরণ করে নিলাম।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চৌকিদারকে তার জিনিষপত্র বুঝিয়ে দিয়ে আবার পথে বেরিয়ে পড়লাম। তখনও বেশ রোদের তেজ, এ অঞ্চলটায় বন নাই একেবারে ক্বচিৎ পাহাড়ের উপর দু'একটা গাছপালা দেখা যায়, মনে হয় জলের অভাবই এর একমাত্র কারণ।

খাড়া পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে, এতক্ষণ তবু গাছপালা দৃষ্টি অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল—এখন একেবারে গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। রাস্তার একপাশে রুক্ষ পাহাড় নীচের দিকে কোথায় নেমে গেছে দেখা যায় না, একটু পা ফস্কালে কি অবস্থা হবে—কে জানে? আর একপাশে পাহাড়ের মাথা একেবারে আকাশে ঠেকেছে, চূড়ার দিকে চাইতেও ভয় হয়। সব সময়ই মনে হয়ে—এই বুঝি পড়ে গেলাম। পাহাড়ের গা ঘেঁসে আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম।

ক্রমশঃ ভয়াবহ উচ্চতার দিকে এগিয়ে চলেছি। দূরে পাহাড়ের মাথায় অবলীলাক্রমে গরু ঘোড়া চরে বেড়াচ্ছে—মনে হয় এই বুঝি পড়ল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম কিন্তু আমাদের উদ্বেগ ব্যর্থ করে দিয়ে তারা ইচ্ছামত চরে বেড়াতে লাগল। পরে বুঝেছিলাম—আমাদের আশঙ্কা অমূলক। পাহাড়েই এদের জন্ম—পাহাড়ের উপরেই এরা বড় হ'য়েছে, বংশানুক্রমে এরা এই পাহাড়ের বুকে ছুটা-ছুটি করে বেড়াচ্ছে—এত সহজে এদের পা ফস্কায় না। অবশ্য অঘটন যে একেবারে ঘটে না—তা নয়—তবে খুব ক্বচিৎ। সে ক্ষেত্রে নীচে গড়িয়ে পড়তে পড়তেই টুকরো টুকরো হ'য়ে যায়। আমাদের দীর্ঘভ্রমণ পথের মধ্যে মাত্র একবার তা দেখেছিলাম।

আগে পিছে চলছিলাম—আমরা। একটি বন্ধু এগিয়ে পাহাড়ের সামনের মোড়ে অদৃশ্য হ'য়েছেন। পিছনে দু'জন আসছেন-দেখলাম। হঠাৎ সামনের দিকে পাহাড়ের বাঁকে মেঘ গর্জনের মতো কি একটা শব্দ হ'ল। তার পরেই দুড় দুড় ক'রে কি যেন পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু ক'রতে লাগল। তাড়াতাড়ি

পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখি—সামনের বন্ধুটী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও আশঙ্কা করছিলেন—হয়ত বা..... আমাদের দেখতে পেয়ে তাঁর মুখে হাসি ফুটল। পিছনের দু'জনকে আমরা দেখেই এসেছি। কাজেই আমাদের কারও দুর্ভাগ্যে যে অঘটন ঘটে নি—এটা নিশ্চিত। কিন্তু ব্যাপারটা কি? হঠাৎ মাথার উপরে লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। একটু পরে কয়েকজনকে দেখাও গেল। জিগ্যেস করে জানলাম—টিহরি রাজ্যের রাজধানী টিহরি থেকে মুসৌরী পর্য্যন্ত ভাল ক'রে রাস্তা তৈরী হচ্ছে। তাই ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় ভেঙে নীচে ফেলাচ্ছে।

সকলে একত্র হ'য়ে এগিয়ে চললাম, পথে লোকজন নেই বললেই হয়। ক্বচিৎ দু'একজন পাহাড়ীকে দেখা যায়—পিঠের বোঝার ভারে নুয়ে নুয়ে এগিয়ে চলছে, আবার কখনও হয়তো দেখা যায়—একদল পাহাড়ী কতকগুলো খচ্চর বা গাধা তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই দুর্গম পাহাড়ী পথে গাধা, ঘোড়া বা খচ্চরই হচ্ছে একমাত্র বাহন। এরই সাহায্যে মালপত্র চলাচল হয়। আরও উপরের দিকে ভেড়ার পিঠে ছোট ছোট বস্তা করে মাল নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চলে।

ক্রমশঃ রুক্ষ প্রকৃতিতে সবুজের আভাস পাওয়া যেতে লাগল। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বন আরম্ভ হ'ল, আমাদের রাস্তাও চড়াই ছেড়ে সোজা হ'য়ে এল। প্রায় চার মাইল এগিয়ে এলে গাড়োয়াল রাজ্যের সীমানায় পৌঁছিলাম। এখানটায় একটা 'চৌন' অফিস আছে, শোনা গেল—আগেকার দিনে যাত্রীদের কাছে ট্যাক্স আদায় করা হ'ত। ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবস্থার অবসান ঘটেছে।

ক্রমশঃ বন গভীর হ'তে লাগল। এদিকে সূর্য্যদেব পাটে বসলেন। নীরব নির্জ্জন রাস্তা—মাঝে মাঝে দু'একটা বন্য মুরগী চকিতের জন্য দেখা দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। মাঝে মাঝে সোলাপ গাছের বন। ফুলগুলি আকারে খুব ছোট কিন্তু প্রচুর ফুটছে, এক একটা গাছ ফুলে ভরে উঠেছে।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'য়ে এল, তখনও কতদূর আছে কে জানে? অন্ধকারে টর্চ জেলে এগিয়ে চললাম। খানিকটা যাওয়ার পরেই ধনোল্টী চটীতে পৌঁছালাম। এখানেই আমাদের রাত্রিবাসের কথা। সাধু কালী কমলীওয়ালার একটা ধর্মশালা আছে এখানে; কালী কমলীর একটা 'পাতিরদারী' পত্র সঙ্গে ছিল। কিন্তু চৌকিদার বাড়ীতে ছিল না। পত্র দেখে চৌকিদারের নন্দন ঘর খুলে দিল—একটা সতরঞ্চিও এনে দিল

আস্তানা মিলল। কিন্তু খাবার কোথায়? রাত্রে রান্না ক'রবার মতো অবস্থা কারও নাই। সমস্ত গায়ে হাতে, পায় বেদনা। চড়াই হেঁটে আসতে পায় হাতে তখন রীতিমত যন্ত্রণা হচ্ছে—তারপর প্রচণ্ড শীত. খুঁজতে খুঁজতে একটা রুটীর দোকান মিলল। দোকানদার রুটী তৈরী ক'রে দিতে পারে—তবে আর কিছু মিলবে না, খোঁজখবর ক'রে খানিকটা দুধ পাওয়া গেল। আগুনের ধারে বসে—শুকনো রুটী চিবোতে চিবোতে দোকানদারের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম। হিন্দি এদেশের মাতৃভাষা না হ'লেও প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দি বোঝে, আমরা আমাদের অপূর্ব হিন্দিতে 'বাতচিত' ক'রতে লাগলাম। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু আটকাল না। লোকটা বেশ গল্পবাজ। কবে কোনদিন সে কোন রাজ্যের মহারাণীর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে দারোয়ান হয়েছিল; মহারাণী তাকে কিভাবে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন—ইত্যাদি ইত্যাদি চটকদার গল্প ব'লে আমাদের আনন্দ দিতে লাগল

এ কথা সে কথার পর রাস্তার কথা উঠল, মুসৌরী থেকে এসেছি শুনে সে বললে—"ক্যা মুসৌরী সে আয়া? ও তো বিলকুল সিধা রাস্তা—"

লোকটা বলে কি? চড়াই চড়তে চড়তেই আমাদের পায়ে ব্যাথা ধরে গেল—আর এ বলে বিলকুল সিধা রাস্তা?

লোকটাকে কথাটা বলতেই সে হো হো ক'রে হেসে উঠল—

—"হাম—পাহাড়ী লোগ তো ইসকো চরাই হি নেহি বোলতা—"

—"কাল যাত্ত! একে যাই চড়াই না বলে—তবে 'চড়াই' বলে জিনিষটা কি যে যাবে? দেখাই যাক!

বেশীক্ষণ আলাপ করা গেল না। অবসন্ন শরীর বিছানার আশ্রয় খুঁজছিল। তাই তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে নিয়ে ঘর্মশালায় এসে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম, ঘুম আসতেও দেরী হোল না।

পরের দিন ভোরে বন্ধুদের ডাকে যখন ঘুম ভাঙল—তখনও অন্ধকার আছে। রাতে শীতটা বেশ জাঁকিয়েছে। নরম কম্বলের গরম আশ্রয়টুকু ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু বন্ধুদের তাগাদায় আর থাকা গেল না। উঠে পড়ে জামা কাপড় গেটে নিয়ে কোলকুঁজি পিঠে চড়ালাম। কোলাটা আজ বেশ ভার লাগছে। হাতে, পায়, কাঁধে তখন বেশ ব্যথা, কিন্তু উপায় নাই—বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথমে ঘন পাইন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুদূর গেলাম। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে সাজান পাইন গাছ—মনে হয় যেন সাজান বাগান। কিন্তু অসম্ভব নির্জ্জন। দূরে কোথায় একটা পশু বা মহিষ চরে বেড়াচ্ছে—তার গলার ঘন্টাটা অবিশ্রান্তভাবে বেজে চলেছে। মাঝে মাঝে পাইন গাছের উপর দিয়ে সোঁ সোঁ ক'রে বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। রাস্তাঘাটে একটা মানুষের মুখ পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

আরও খানিকটা এগিয়ে এসে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একখানা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। হঠাৎ পাশের দিকে চোখ পড়তে দেখলাম—দূরে দেখা যায়—কত দূরের ঘড়ির পর্বতশৃঙ্গের উপর রোদ হাসছে। কালো পাহাড়ের গুপাশটায় যেন রাশি রাশি উজ্জ্বল তুষার জমা পড়েছে। কি সুন্দর! অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। পিছন থেকে সঙ্গী তাড়া দিলেন—"চল, ঐ খানেই তো আমাদের যেতে হবে।"

আবার চলতে সুরু ক'রলাম। তুষার-মৌলী পর্বতশৃঙ্গ পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বনও ক্রমশঃ খানিকটা পাতলা হয়ে এল। রাস্তার ধারে নানা রকম অজানা গাছে রং বেরং এর ফুল ফুটেছে। কোন কোনটার মৃদু, সুমিষ্ট একটা গন্ধ। আবার কোন কোনটায় কেমন যেন একটা বিশ্রী পচা গন্ধও আছে। এবার দু চার জন পাহাড়ী লোককে পথে দেখা যেতে লাগল। একটা মেয়ে পিঠে এক বুড়ি ঘাস নিয়ে যাচ্ছিল। বোঝার ভারে মেয়েটি নুয়ে পড়েছিল। এদেশের মেয়েরা খুব পরিশ্রমী।

এই ভাবে দেখতে দেখতে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে কালাতাল বলে একটা জায়গায় পৌঁছালাম। এখানেই আমাদের বিশ্রামের কথা। কালী কমলী ওয়ালার একটা ধর্মশালা আছে এখানে। সোজাসুজি ধর্মশালার উপরে উঠে গিয়ে দেখি—অগ্রগামী বন্ধুরা বারান্দায় কম্বল পেতে বসেছেন। কোলাটা কোন রকমে নামিয়ে দিয়ে ধড়াচূড়া পরেই সটান শুয়ে পড়লাম। পায়, হাতে কাঁধে অসহ্য বেদনা।

একটু পরে উঠে বসলাম। পেটের যাঁতাটা তখন বেশ চেপে উঠেছে। কিন্তু রান্না বান্না ক'রবার মতো উৎসাহ বা শারীরিক অবস্থা কারও নাই। অগত্যা চৌকিদারের শরণাপন্ন হ'লাম।

সেখানে গিয়ে দেখলাম—ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। চৌকীদার কিছুতেই রান্না ক'রে দিতে রাজী হচ্ছে না। চালের দাম এদেশে অপেক্ষাকৃত বেশী। কাজেই ভাত খাওয়াটা এদেশের লোকের ভাগ্যে কচিৎ কদাচিৎ ঘটে থাকে—বিশেষ ক'রে গরীবদের পক্ষে। সেই ভাত খাওয়ানোর লোভ দেখিয়েও তাকে রান্না করাতে রাজী করান যাচ্ছে না। খোঁজ নিয়ে জানলাম—সে একটু নীচু জাতের লোক। আমাদেরকে তার হাতের রান্না খাইয়ে পরিণামে অনন্ত নরক ভোগ করতে সে একেবারেই নারাজ। পূর্বেই বলেছি—এদেশে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত প্রবল—কাজেই সংস্কার প্রবলতর। আমরা যত বলি—যে নরক যদি নেহাতই ভোগ করতে হয়—তা হ'লে সেটা আমাদেরই পাওনা হবে—তার সেই এক কথা—"নেহি বাবু, আপলোগ কর লিজিয়ে—কোই দিক্কত নেহি হোগা—বিলকুল ঠিক হো জায়গা।"

'ঠিক হো জায় হো আয়গা' রে বাবা,—কিন্তু এখন নিজেদেরই ঠিক করে কে তারই ঠিক নেই। শেষে

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর সে রান্না করতে রাজী হ'ল। রান্নাও ক'রল—এক রকম ভালই। সেদিন আমাদেরকে নিজের হাতের রান্না খাইয়ে ধর্মের ভয়—নরকের ভয় স্বত্বেও তার মুখে যে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছিল—তা কখনও ভুলব না। সেদিন অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলাম—কবিগুরুর অমর বাণী—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

যুগ যুগ ধ'রে তথাকথিত উচ্চ জাতির অত্যাচারে, অবিচারে এদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। সে অত্যাচার যদি শুধু এদের শারীরিক নির্য্যাতনেই শেষ হ'ত—কিংবা যদি এদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেই ক্ষান্ত হ'ত—তবে হয়ত একদিন এরা সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু এরা এদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে—নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে! উচ্চ জাতির উচ্চতা বজায় রাখবার প্রয়োজনেই তারা পাপ পুণ্যের সৃষ্টি করেছে। ভগবানকে দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁকে স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে কাজে লাগিয়েছে; এই সব অজ্ঞ, অশিক্ষিতদের শাসন এবং শোষন করবার প্রয়োজনে এদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিয়েছে পূর্বজন্মের অলীক কাহিনী, এই দরিদ্রদের দিয়ে অমানুষিক কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে তাদের সামনে তুলে ধরেছে নন্দন কাননের সুখস্বপ্ন, অভয় দেখিয়ে তাদের পায়ের নীচে রাখবার প্রয়োজনে দেখিয়েছে—নরকের বীভৎস বিভীষিকা। দরিদ্র মূর্খের দল যুগ যুগ ধ'রে পুরুষানুক্রমে তাই বিশ্বাস ক'রে এসেছে; শত নির্য্যাতন মুখ বুজে সহ্য করেছে—ইহলোকের পেটের জ্বালায়। আর পরলোকের সৌভাগ্যের আশায়। এই ভাবেই তথাকথিত উচ্চ জাতির অত্যাচারে এরা পঙ্গু হ'য়ে সমাজে বাস করে এসেছে এদের নির্য্যাতন ভোগের সুদীর্ঘ বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে তাই বিদ্রোহের স্থান দেখা যায় না এরা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে—কিন্তু উচ্চ জাতির বিরুদ্ধে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়ায় নি। সেই সংস্কার কেড়ে ফেলতে কত যুগ যাবে—কে জানে, উচ্চ জাতির প্রায়শ্চিত্ত, কি ভাবে হ'বে—তাই বা কে বলবে?

ভোজন দক্ষিণার পরিতুষ্ট চৌকীদারের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা আবার রাস্তায় নামলাম। আর কখনও হয়ত তার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু তার কৃতজ্ঞ মুখখানা অনেকদিন মনে থাকবে। পথে বেরিয়ে তার কথা চিন্তা করতে করতেই এগিয়ে চলেছি। ছায়ায় ঘেরা বন্ধুর পথ। এই পথে প্রায় দুমাইল এগিয়ে একটা নিবিড় জঙ্গলের মতো জায়গায় এসে পৌছালাম। এখান থেকে মূল রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, আর একটা রাস্তা নীচে নেমে গেছে। কোন পথে যাব—ঠিক করতে না পেরে ভাবতে লাগলাম। কোন লোকজনও পাচ্ছি না—যে জিগ্যেস করব বন্ধুরা 'গাইড' দেখতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। ওপাশ থেকে এক সাধু এলেন—তিনিও রাস্তার কোন সন্ধান দিতে পারলেন না। নানারকম জল্পনা কল্পনা করছি—এমন সময় এক পিঠে বোঝাওয়ালা পাহাড়ী এসে হাজির হ'ল। তার কাছে পথের সন্ধান মিলল।

এবার আমাদের নীচে নামতে হবে। পাহাড়ীটাও ঐ পথেই যাবে। তার সঙ্গে পাকডাণ্ডী বেয়ে নামতে লাগলাম। পাকডাণ্ডী মানে পাহাড়ের পথে সোজা রাস্তা। পাহাড়ে রাস্তার দরকারই হচ্ছে—পাহাড়ের গায়ে পাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠেছে—বা নীচে নেমে গেছে। পাহাড়ী ছেলেরা—যারা মাত্র কোল থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পাহাড়ের বুকেই ছুটাছুটী করে বেড়ায়—তাদের এত ঘোরা রাস্তা পোষায় না। তারা নিজেদের ব্যবহারের জন্য সোজাসুজি একটা অল্পপরিসর রাস্তা বানিয়ে নেয় একেই বলে পাকডাণ্ডী। তবে পাহাড়ের পথে যারা চলতে অভ্যস্ত—তাঁরা পারতপক্ষে পাকডাণ্ডীর পথে পা বাড়ান না—কারণ পাকডাণ্ডী সোজা হ'লেও বিপজ্জনক।

সঙ্গের পাহাড়ীটী খানিকটা পাকডাণ্ডী বেয়ে নীচে নামল। তার দেখাদেখি আমরা কয়েকজনও পাকডাণ্ডীর পথে পা বাড়ালাম। আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে খানিকটা নেমে এসে বড় রাস্তায় পড়লাম। বন্ধুর পার্বত্যময় পথ—

পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নীচে গড়িয়ে পড়েছে। পথের উপরে পাথরের টুকরোগুলো যেন দাঁত উঁচিয়ে বসে আছে। পথের দুধারে গর্জন গাছের বন, এ দেশের লোক বলে—'চীড়', এই চীড় বা গর্জন গাছের আঠা থেকেই terpentine তৈরী হয়।

উৎরাই বেয়ে হুহু ক'রে নেমে চলেছি রাস্তার উপরে দাঁড়াবার উপায় নাই। কে যেন ঘাড়ে ধ'রে নীচে ঠেলে দিচ্ছে। দাঁড়াতে হ'লে কিছুক্ষণ ধ'রে রীতিমত চেষ্টা ক'রে দাঁড়াতে হয়। পথের উপর গর্জন গাছের শুকনো সরু কাঠির মতো পাতা ঝরে পড়ে সারা রাস্তাটা ঢেকে দিয়েছে। সে আবার আর এক বিপদ—কোন রকমে মসৃণ পাতাগুলোর উপর দিয়ে যদি পা'টা একবার কোন রকমে ফস্কে যায়—তো রক্ষা নাই।

দাঁড়াবার অবসর নাই—পাহাড়ীটী অনেকদূর এগিয়ে গেছে। আমরাও এগিয়ে চললাম; তার্পিনের গন্ধে বাতাস আমোদিত, দূর থেকে পাহাড়ী মেয়েদের সাঁওতালী ধরণের একটানা গানের সুর ভেসে আসছে। ঘোড়া চলেছে রাস্তা দিয়ে—পিঠের উপরে এক একটা বিরাট বোঝা নিয়ে। দু চার জন পাহাড়ী যাওয়া আসা করছে। এরই মধ্যে অবিরাম গতিতে নেমে চলেছি—আমরা।

আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। সেখান থেকে দেখা যায়—দূরে একটা সারা পাহাড় জুড়ে চাষ হয়েছে। ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রগুলি স্তরে স্তরে সমান্তরালভাবে পাহাড়ের চূড়া পর্য্যন্ত উঠে গেছে। সারা পাহাড়টা সবুজের আভায় ঝলমল করছে। এ পাশের পাহাড়টায় গম কেটে নেওয়া হয়েছে—কোথাও কোথাও বা পাকা গমের ক্ষেতে সোনালী রং ধরেছে। আবার কোন কোন পাহাড় সবুজ শস্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে—উপর থেকে দেখে মনে হয় যেন ছোট ছোট ছেলেমেয়ের খেলার ঘর—স্তরে স্তরে সাজানো—ছবির মত সুন্দর। গম কেটে নেওয়া ক্ষেতের উপর দিয়ে সরু পাহাড়ী মেঠো রাস্তা—দূর থেকে মনে হয় যেন ধূসর জমির উপর সাদা লম্বা একটা রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে।

আরও খানিকটা নীচে নেমে একটা গ্রামের কাছে এসে পৌঁছালাম। সবুজ গমের ক্ষেতের পাশ দিয়ে রাস্তা, পথের ধারে গোলাপ গাছের ঝোড়া, প্রচুর ফুল ফুটেছে—গাছগুলোতে ফুলের গন্ধে সারা পথটা মাতোয়ারা হ'য়ে উঠেছে।

একটু এগিয়ে এসে গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রামের পাশ দিয়েই রাস্তা, এখানটায় টিহরি গ্রামাঞ্চলের একটা অফিস আছে; কালীকমলীওয়ালার একটা ধর্মশালাও আছে দেখলাম। এই অঞ্চলের মধ্যে এটাতে একটা সমৃদ্ধশালী গ্রাম বলে মনে হয়। জায়গাটাকে দেখেই সুদূর বাংলার কথা মনে পড়ে গেল। রাস্তার পাশে কাঁটা গাছের ঝোপ, ধূলিধূসর পথ, মাঝে মাঝে অশ্বত্থ বটের গাছ—বাংলার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে।

বেলা বেশ আছে। আমাদের আরও চার মাইল এগিয়ে গিয়ে ভন্ডিয়ানাথ রাত্রিবাসের কথা, কাজেই গ্রামটায় বেশীক্ষণ অপেক্ষা না ক'রে এগিয়ে চললাম, খানিকটা এগিয়ে এসে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। একজন সঙ্গী অনেকখানি পিছনে পড়ে গেছেন—তাঁর জন্যও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল। দূরে একটা পাহাড়ের উপর কয়েকটা সাদা বাড়ী দেখা যাচ্ছে। একটী পাহাড়ীকে জিগ্যেস করে জানলাম ওটী প্রতাপগড়—টিহরি রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজাদের গ্রীষ্মাবাস। ভূতপূর্ব—বলছি কারণ টিহরির রাজতক্ত তখন শূন্য। মৃত রাজা নরেন্দ্র শাহের পুত্র রাজা বীরেন্দ্র শাহকে হারিয়ে দিয়ে টিহরি রাজ্যে প্রজামণ্ডল তখন শাসনযন্ত্র অধিকার করেছে (কিছুদিন আগে টিহরি রাজ্য যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—কিন্তু তখনও প্রজামণ্ডলই শাসন চালাচ্ছিল) নরেন্দ্র শাহের খুল্লতাত ছিলেন প্রতাপ শাহ; তাঁরই নামানুসারে গ্রীষ্মাবাসের নাম হয়েছে প্রতাপগড়।

একটু পরে বন্ধুটী এসে পৌঁছালেন, তিনিও ক্লান্ত। খানিকটা বসলেন। এমন সময় আমাদের পূর্বপরিচিত পাহাড়ীটীও এসে পৌঁছাল। সে মুসৌরী থেকে সকালে বেরিয়ে এই দীর্ঘপথ একটানা হেঁটে এসেছে। সে বলল—

তার সঙ্গে গেলে সে ভন্ডিয়ানা যাওয়ার একটা সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে—যাতে আমাদের দু মাইল রাস্তা কমে যাবে।

তার সঙ্গে উঠে পড়লাম। উৎরাইএর পথে খানিকটা নেমে এসে পাহাড়ের বাঁকে একটা মোড় ফিরলাম। পাহাড়ীটী নীচের দিকে নির্দ্দেশ ক'রে দেখাল—"ওটি ভন্ডিয়ানা" নীচের দিকে চেয়ে দেখলাম—অনেকটা নীচে সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে কয়েকটা টিনের ঘর। তার পাশ দিয়ে ক্ষীণধারা ফেনোচ্ছল, শুভ্রা গঙ্গা একটা বাঁক নিয়েছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে—যেন সুদৃশ্য রজতমেখলা কোন গর্ব্বিনী গ্রাম্যবালার ক্ষীণ কটিদেশ বেষ্টন করে পায়ের তালে তালে দোল খাচ্ছে।

আরও খানিকটা নেমে এলাম; একটা ছোট পাহাড়ী মেয়ে এক কলসী জল মাথায় বসিয়ে অবলীলাক্রমে উপরে উঠে আসছে। একটু পরে একটা গ্রামের পাশে এসে পাহাড়ীটী বলল—এই পথে পাকডাণ্ডী বেয়ে নেমে যান সোজা রাস্তায় গেলে চার মাইল হাঁটতে হবে পাকডাণ্ডীর পথে মাত্র দু'মাইল হেটে গেলে ভন্ডিয়ানায় পৌছাতে পারবেন। চোখে তখন আমাদের নূতন পথের রঙীন নেশা লেগেছে—তা ছাড়া দু'মাইল পথ কমে যাবে—এটাও কম লাভ নয়—পাকডাণ্ডীর পথে নেমে যাওয়াই সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু আমাদের পিছনে চলা বন্ধুটী তখন অনেক পিছনে পড়ে গেছেন। অগত্যা অন্যান্য বন্ধুদের এগিয়ে যেতে বলে আমি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ পরে বন্ধুটী এলেন। তখন সূর্য্যদেব পশ্চিমের পাহাড়টার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়েছেন। বন্ধুটীকে পথটা দেখিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নামতে লাগলাম। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে নীচে নেমে গেছে—পাকডাণ্ডির পথ। অনভ্যস্ত পদক্ষেপ—প্রায়ই করে যাওয়ার ভয় হয়, এদিকে অন্ধকারও ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। কোনরকমে গাছপালা ধরে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম। বহুদূরে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখা গেল। তাদের ইসারা ক'রে এগিয়ে যেতে বললাম। পিছনের বন্ধুটী তখন আরও পিছিয়ে পড়েছেন মাঝে মাঝে তাঁকে ডাক দিই—তিনি কোনবারে ডাক শোনেন—কোনবারে কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

কিছুক্ষণ একটানা পাহাড় বেয়ে নামবার পর খানিকটা সমতল ক্ষেত পাওয়া গেল। ধান কেটে নেওয়া হ'য়েছে—তার গোড়াগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সেখানে দাঁড়িয়ে পিছনের বন্ধুটীকে ডাক দিতে লাগলাম। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে দূরে পাহাড়ের গায়ে তিনি একবার দেখা দিয়েই কোথায় মিলিয়ে গেলেন। আর দেখতেও পাই না—কোনও সাড়াও পাই না। অগত্যা পিঠের ঝোলাটা নামিয়ে দিয়ে সেই ক্ষেতের উপরেই সটান শুয়ে পড়লাম।

চারিদিক নিস্তব্ধ—নির্জ্জন। ক্ষেতটার চারিপাশ বেড়ে খাড়া পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপরে শুক্লা পঞ্চমীর বাঁকা চাঁদ হাসি হাসছে, পাহাড়ের বুকে লম্বা লম্বা গাছের উপর পঞ্চমীর আবছা জ্যোৎস্না পড়ে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে—অদ্ভুত পরিবেশ! সেখানে শুয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল—এই জনমানবহীন নির্জ্জন প্রান্তরে, ঐ তারকা-খচিত নীল চাঁদোয়ার নীচে—এই ভূমিশয্যায় শুয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু কল্পনা বিলাস বেশিক্ষণ চলল না: বন্ধুটীর তখনও কোন সাড়া নাই। একটু ভয় হ'ল। সঙ্গে টাকা-কড়ি আছে—পাহাড়ের মধ্যে বন্য হিংস্রজন্তু থাকাও অসম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের বন্ধুটীকে হাঁকতে লাগলাম, অনেকক্ষণ পরে দূর থেকে তাঁর আওয়াজ ভেসে এল। যাক, আসছেন—তা হ'লে। অগত্যা আবার লম্বা দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বন্ধুবর এসে পৌছিলেন মেজাজ তখন তাঁর বিগড়ে গেছে। এসেই বললেন—"তোমরা যাও, আমি এখানেই রাত্রি কাটাব"—বলে বসে পড়লেন, তাঁর মেজাজ দেখে তাঁকে ঘাটাতে সাহস করলাম না। খানিকটা বিশ্রাম ক'রতে দিয়ে বড় টর্চটা বের ক'রে নিলাম, তারপর সঙ্গীটিকে বললাম চলুন আর কি, বসে থেকে লাভ নেই।

বকতে বকতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন টর্চ জেলে

এগিয়ে চললাম
গ্রামের লোকেরা
—এখনও একমাইল হেঁটে আমাদের
হেঁটে খুব কাছে বলে মনে হ'চ্ছে ছল—এখন আছে
—সেটা মোটেই কাছে নয়। গ্রামের আছে
রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে পড়লাম অপ্রশস্ত
প্রস্তরময় পথ—সামনে পিছনে উঁচু ঢেউ এবার
আস্তে আস্তে নামতে লাগলাম। পিছনের সঙ্গীটী খুবই
শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন। খানিকটা এসে মাঝে মাঝে
তিনি বসে পড়েন কখনও তাঁর হাত ধরে, কখনও
সামনে টর্চ জেলে পথটা দেখে নিয়ে পিছনে আলো ফেলতে
ফেলতে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় কিছুদূর থেকে অগ্রবর্ত্তী
সঙ্গীদের একজনার ডাক শোনা এবার——"

ভাবলাম আগের সঙ্গীরা নিশ্চয় ধর্মশালায়
গেছেন সেখানে জিনিষপত্র রেখে এসে আমাদের
খুঁজতে বেড়িয়েছেন সঙ্গীটী বললেন—"ঐ পথ দিয়ে
নেমে যান—একটু পরে ধর্মশালা পাবেন।"

তারপরে তাঁর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া
অগত্যা আমরা দু'জনে এগিয়ে চললাম কিছুক্ষণ পরে
বড় রাস্তায় এসে পৌছিলাম, টিহরি থেকে এই পথকে
চওড়া করে মোটর রাস্তা তৈরী হচ্ছে—তাই রাস্তার অবস্থা
মোটেই ভাল নয় কোথাও একেবারে রাস্তাই নাই—
কোথাও উঁচু ঢিপি—তবু যে পথে নেমে এলাম—তার
চেয়ে শতগুণে ভাল

মোড়ের মাথায় একটা করণা দিয়ে অজস্র ধারায়
জল পড়ছে, বন্ধুবর তো আকণ্ঠ ভরে জল খেয়ে নিলেন।
খুব তৃষ্ণা পেলেও ধর্মশালায় না পৌছান পর্য্যন্ত জল খাওয়ার
ইচ্ছা আমার ছিল না কাজেই তাঁর জল খাওয়া শেষ
হ'তেই আবার এগিয়ে চললাম।

একটু পরেই ভাঙ্গিরানায় এসে পৌছিলাম। ধর্মশালায়
লোকজন গিস গিস ক'রছে। এখনও বন্ধুলোক পিছনে
আসছে, সঙ্গী বন্ধুটী এসেই তো ধর্মশালার মেঝের উপর
ধপাস করে বসে পড়লেন। নড়ে বসবার মতো ক্ষমতা
তখন তাঁর ছিল না। এদিকে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাওয়ার
উপক্রম—তাঁকে সেখানে বসিয়ে বন্ধুদের খোঁজ ক'রতে
বেরোলাম

কিন্তু সারা ধর্মশালাটা তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজ ক'রেও
কারও টিকিরও নাগাল পেলাম না, যাত্রীদের জিগ্যেস
করলাম—তিনজন বাঙালী বাবু তো দূরের কথা—এক-
জনেরও সন্ধান তাঁদের কাছে পাওয়া গেল না। এদিকে
পিপাসায় কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে
যাত্রীরা রান্না খাওয়ার ব্যস্ত—অগত্যা তাদেরই কাছে একটু
জল চেয়ে খাব—বলে মনে করলাম।

ও হরি—পুস্তকাদী যাত্রীরা পুণ্যের (?) উগ্রপ্র কামনায়
অসাধ্য সাধন করতে চলেছেন বটে কিন্তু তৃষ্ণার্ত্তকে জল
দেওয়ার মতো উদারতাটুকু তাঁদের নাই, জানিনা, জল
দিলে জাত যাবে বা পাপ হবে—এরকম কিছু ভেবেছিলেন
কিনা—কিন্তু কেউ বরা করে এক গণ্ডুষ জল দিতে রাজী
হলেন না। কেউ তো কথাই বললে না, কারও কাছে
বা গম্ভীর গলায় 'নেহি মিলে গা' শুনে ফিরে এলাম, কেউ
বা ঐ কথাটাকেই একটু ঘোলাটে গোছের মিথ্যায় ঢেকে
বিদায় দিলেন।

সারা ধর্মশালাটার একপাশ থেকে আর এক পাশ
পর্য্যন্ত ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে টেনে নিয়ে ফিরে এলাম—
কেউ এক গণ্ডুষ জল দিল না। ধর্মশালার এককোণে
কতকগুলি কুলি কটী খাচ্ছিল। ভাবলাম—এদের বোধ
হয় পুণ্যজ্ঞানটা এখনও ততখানি উগ্র হ'য়ে উঠেনি—এদের
কাছে হয়ত জল মিললেও মিলতে পারে। মিলল ও।
তাদের কাছে গিয়ে একটু জল চাইতেই আনন্দে তারা
নিজেদের খাওয়ার জন্য রক্ষিত জলের লোটাটা এগিয়ে
দিল। সেদিন বুকের তীব্র জ্বালা দিয়ে অনুভব
করেছিলাম—মানুষের সমাজে আজও যদি মনুষ্যত্ব, ভ্রাতৃত্ব
বলে কিছু থাকে—তবে তা এই সব অজ্ঞ দরিদ্রের মধ্যে—
এই তথাকথিত নীচ জাতির মধ্যে—সভ্যতার রঙীন নেশায়
আজও যারা হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোকে গলাটিপে মারে
নি—তাদেরই মধ্যে বেঁচে আছে। মনুষ্যত্বের মহিমা নিয়ে
যারা বড়াই করে,—ভ্রাতৃত্ব, মহত্বের ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে
যারা চমক লাগায়—তাদের মধ্যে আর যাই থাক—ঐ
'দুর্বলতা' গুলো নাই।

পরিতৃপ্তির সঙ্গে জল খেয়ে বন্ধুদের খোঁজে বেরোলাম সঙ্গীটীতো একেবারে কুপোকাত অগত্যা তাঁর হেফাজতে জিনিষ পত্র দিয়ে বড় টর্চটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। সমস্ত দোকানপাট খুঁজে দেখলাম—সেখানেও কেউ নাই। অগত্যা আবার রাস্তা ধ'রে হাঁকাতে হাঁকাতে এগিয়ে চললাম। বেশ কিছুদূর গিয়ে বন্ধুদের সাড়া পেলাম। তখন একটী বন্ধু পাহাড়ীর কাঁধে চেপে পাহাড় থেকে নাবছেন। আর দুজন উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে গিয়ে ব্যাপার যা শুনলাম—তাঁরা আমাদের আগে এসে আমাদের জন্য গ্রামে অপেক্ষা করতে থাকেন ক্রমশঃ সন্ধ্যা হ'য়ে যাওয়ায় পথ অন্ধকার হ'য়ে যায় সঙ্গে আলো ছিল না—ছুটো আলোই আমার কাছে থেকে গেছে। তারপর কয়েকটী পাহাড়ী ছেলের ভুল পথ নির্দ্দেশে ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়েন। আমরা যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম—তখন আমাদের টর্চের আলো দেখতে পেয়ে উপর থেকেই তাঁরা হাঁক দিচ্ছিলেন। তারপর পথ হারিয়ে পাহাড়ীদের কাছে পাঁচটাকা দক্ষিণা কবুল করে তাদেরই সাহায্যে পাহাড় থেকে নেমেছেন

যা হওয়ার হ'য়েছে। সবাই যে নিরাপদে ফিরেছি—এই বেশ। পাকা ডাণ্ডীর পাকে পড়ে নগদ পঞ্চমুদ্রা আক্কেল সেলামী দিয়ে সবাই ধর্মশালায় ফিরে এলাম।

—ক্রমশঃ—

চীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেন গুপ্ত, এম, এ

চীনের জাতীয় বাহিনীর পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কোরতে গিয়ে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডীন এচিসন পরোক্ষভাবে বলতে চেয়েছেন যে এই পরাজয়ের প্রধান কারণ হচ্ছে রুশ সাহায্য। অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত হল এই যে রাশিয়ার কাছ থেকে সাহায্য না পেলে চীনের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় মার্কিণ সাহায্যপ্রাপ্ত জাতীয় বাহিনীকে পরাজিত করা চীনা কম্যুনিষ্টদের পক্ষে সম্ভবপর হতনা। কিন্তু সম্প্রতি যে মার্কিণ হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হয়েছে সে পেপারে স্বীকার করা হয়েছে যে চীনে এমন কতকগুলো শক্তি রয়েছে যেগুলোর উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রভাব বিস্তার কোরতে পারেননি তাছাড়া হোয়াইট পেপারে জাতীয় বাহিনীর ব্যর্থতার জন্য জাতীয় নেতাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে, কারণ তাঁরা কেবলমাত্র পদমর্য্যাদা এবং ক্ষমতার জন্য চেষ্টা কোরেছেন এবং নিজেদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সম্পূর্ণভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। মিঃ ডীন এচিসন কুয়োমিন্টাং সরকারকে সমালোচনা কোরতে গিয়ে বলেছেন, যে সরকার নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং যে সরকারের সৈন্য বাহিনীর মানসিক শক্তি বলে কিছু নেই সে সরকার বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না।

একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জাতীয় সরকারের ব্যর্থতার জন্য মার্কিণ সরকারেরও অনেকটা দায়িত্ব আছে, কারণ মার্কিণ সরকার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেভাবে কুয়োমিন্টাং সরকারকে সাহায্য কোরেছেন তাতে জাতীয় নেতারা জনসাধারণের সমর্থন লাভ কোরবার জন্য চেষ্টা করেননি। যুক্তরাষ্ট্র আশা কোরেছিলেন যে মার্কিণ সাহায্যের জোরে জাতীয় বাহিনী কম্যুনিষ্টদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু যখন সে আশা সফল হ'লনা তখন মার্কিণ সরকার সাহায্য বন্ধ কোরে দিলেন সম্প্রতি যে হোয়াইট পেপার প্রকাশিত হয়েছে সে পেপারে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, চীনের জাতীয় বাহিনীকে সাহায্য করা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে আর সমীচীন হবেনা। অবশ্য একথা ঠিক যে চীনের গৃহযুদ্ধে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ কোরবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী এবং সাধারণতন্ত্রী নেতারা মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরকে পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন, চীনের গৃহযুদ্ধ বর্ত্তমানে যে স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে যদিও তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমানে যদি

চীনে কেবলমাত্র সাহায্য পাঠানো হয় সে সাহায্য বিফল হতে বাধ্য। চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে মার্কিণ সাহায্য ব্যবহার কোরবার মত শক্তি জাতীয় নেতাদের নেই। যদি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনের গৃহযুদ্ধে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে চীনের পরিস্থিতির মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসা সম্ভবপর। বর্তমানে চীন যে শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তাতে চীনা কম্যুনিষ্টরা মার্কিণ বাহিনীর সাথে বেশীদিন যুদ্ধ চালান হয়ত সমীচীন মনে কোরবেন না। ফলে চীনা কম্যুনিষ্টদের সাথে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটা মীমাংসা হওয়া খুবই সম্ভবপর। যদি মীমাংসা হয়ে যায় তাহলে চীনে কিছুটা মার্কিণ স্বার্থ হয়ত অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে। তাছাড়া সম্প্রতি এই মর্মে একটা সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যে চীনা কম্যুনিষ্টরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিষ্টরা অর্থনৈতিক ব্যাপারে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাথে সহযোগিতা কোরতে ইচ্ছুক। কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত কম্যুনিষ্টরা সম্পূর্ণভাবে রুশ ব্লকে যোগদান কোরতে চাইছেন।

যদি চীনা কম্যুনিষ্টরা শেষ পর্যন্ত রুশ ব্লকে যোগদান কোরবার সিদ্ধান্ত করেন তাহলে রুশিয়াকে কতকগুলো জিনিষ ভেবে দেখতে হবে। আগেই বলা হয়েছে যে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। যদি কম্যুনিষ্ট চীনকে রুশ ব্লকের সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে চীনকে পুনর্গঠন কোরবার দায়িত্ব রুশিয়ার উপর এসে পড়বে। রুশিয়া বর্তমানে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হবেন কিনা বলা শক্ত, কারণ আগামী যুদ্ধের আশঙ্কায় রুশিয়া নিজের সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি কোরতে ব্যস্ত। তাছাড়া রুশিয়া ভালভাবেই জানে যে, চীনা কম্যুনিষ্টরা জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং চীন একটা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত কোরতে চাইছেন। তাই, মনে হচ্ছে চীনা কম্যুনিষ্টরা রুশিয়ার কাছ থেকে হয়ত আশানুরূপ সাহায্য পাবেন না, কারণ মার্শাল টিটোর সাম্প্রতিক কার্য্যাবলীর ফলে রুশিয়া বিদেশীয় কম্যুনিষ্টদের সাহায্য কোরবার আগে সব দিক বিবেচনা কোরছেন এবং যে সমস্ত বিদেশীয় কম্যুনিষ্ট সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ কোরবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কোরেছেন সে সব কম্যুনিষ্টদের অনেকটা সন্দেহের চোখে দেখছেন। অর্থাৎ চীনের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ কোরে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রী এবং সাধারণতন্ত্রী নেতারা আজ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে যদি মার্কিণ সরকার বর্তমানে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করেন তাহলে চীনের গৃহযুদ্ধ আর বেশিদিন চলবেনা এবং শীঘ্রই একটা মীমাংসা হয়ে যাবে।

কিছুদিন আগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কম্যুনিজমের অভিযান ঠেকিয়ে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহল হতে অতলান্তিক চুক্তির মত একটা আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদিত কোরবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছিল মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তর সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত কোরতে অনিচ্ছুক। এর কারণ খুবই সুস্পষ্ট। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভালভাবেই জানে যে, যে সব রাষ্ট্রকে নিয়ে অতলান্তিক চুক্তি সম্পাদিত করা হয়েছে সে সব রাষ্ট্রের মধ্যে নীতিগত, আদর্শগত, জাতিগত এবং কৃষ্টিগত ঐক্য বিদ্যমান। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র আশঙ্কা কোরছে, পূর্ব্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো এবং পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য স্থাপন করা সম্ভবপর হবেনা, কারণ শ্বেতজাতির বিরুদ্ধে এসিয়াবাসীর বিদ্বেষ খুবই তীব্র। তাই মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডীন একিসন প্রশান্ত মহাসাগরীয় চুক্তি সম্পাদিত কোরতে চাইছেন না, যদিও তিনি একটা কম্যুনিষ্টবিরোধী ফ্রন্টের প্রয়োজনীতা অনুভব কচ্ছেন। সম্প্রতি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট এল্‌পিডিও কুইরিণো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুয়োমিন্টাং সরকার ফিলিপাইন সরকার এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে যে কম্যুনিষ্টবিরোধী ফ্রন্ট তৈরী কোরবার জন্য আলোচনা হয়েছে সে ফ্রন্টকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা মার্কিণ স্বার্থের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সমীচীন হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে সব সংবাদ পাওয়া গেছে সে সব সংবাদ আলোচনা কোরলে মনে হয় ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট কুইরিণোর প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়েছেন।

মুক্তি

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়

কোথা আলো কোথা আলো
ক্লান্ত কণ্ঠে উঠিছে কাঁদিয়া
পিঞ্জরের বিহঙ্গম ;
স্বর্ণ সূত্র জাল তারে রেখেছে ঘিরিয়া,
প্রতিহত করিয়াছে মুকুলিত আশা
উদ্ভিন্ন যৌবন।
এই রূপ রস ভরা শ্যামলা ধরণী,
ওই গাঢ় নীলিমার উদাত্ত আহ্বান ;
দিগন্ত বিসারী ওই নীলাম্বু বারিধি—
পত্রে পত্রে আকুল মিনতি,
পুষ্পে পুষ্পে সুরভির নিত্য নিমন্ত্রণ
সবই ব্যর্থ বিহঙ্গম কাছে।
ব্যথা ভরা চিত্ত তার ফেলে দীর্ঘশ্বাস—
কারাগারে বন্দী সে যে স্বর্ণ পিঞ্জরে।
কর্মহীন অলস জীবন—
নাহি সেথা সংগ্রামের নিত্যবহমান্
উচ্ছল প্রাণের ধারা—
অবিচ্ছিন্ন এক সুরে একই কথা শুনি' প্রতিদিন
বিড়ম্বিত মনে হয় জীবনের ভার !
পক্ষ দু'টি নিষ্ফল আক্রোশে
মুক্তির লাগিয়া করে মত্ত বিধুনন !
প্রভাতের রবি জাগে
বিতরিয়া প্রেমের পরশ ;—
অনন্ত কিরণ মাঝে ;
বৃন্তে বৃন্তে সুরভি মদির
কুসুমের বুকে দেয় আলোর চুম্বন !
ক্লান্ত পক্ষ বিহঙ্গম—
স্বপ্নালস নেত্রে রহে একান্ত বিহ্বল—
এ আলোর নিমন্ত্রণে
তার লাগি' ছিল যে আহ্বান—
পিঞ্জরের স্বর্ণ আবেষ্টনে,
মূর্চ্ছাহত গিয়াছে ফিরিয়া—।
নিখিলের গীত কলরোল
পশিলনা শ্রবণে তাহার !
ব্যথাতুর বন্দী বিহঙ্গম—
জগতের মহাযজ্ঞে অংশ লভিবারে
কেঁদে মরে মৌন বেদনায়।

• • •

এ কী আলো সুষুপ্তির তীরে !
এ কী, তা'র পক্ষ যেন নূতন শক্তিতে
অকস্মাৎ উঠিল মাতিয়া
পিঞ্জরের দ্বার যেন ভাঙ্গিল সহসা—
বিহঙ্গে কহিল ডাকি'
ওই শোনো বাজে বাঁশী আকাশের কোলে
দেখ, নদীস্রোতোজলে মুক্তির মহিমা—
কী অনন্ত প্রেম জাগে বিশ্ব চরাচরে !
তোমারে ডাকিছে সবে—
এসো এসো আমাদের মাঝে !
আমরা তোমার প্রিয়, তুমি আমাদের ;—
আমরা মিশিতে চাই অনন্তের মাঝে—
তুমি-হারা সে গতির নিষ্ফল প্রয়াস !
জগতের মুক্তি জাগরণে
তোমারো যে অংশ আছে বিচিত্র বিরাট্ !
বিহঙ্গম ক্লান্ত আঁখি তুলে
আকাশের পানে চায় মুহূর্তের লাগি'—
তার পর—
তার পর পক্ষ বিস্তারিয়া
ছুটিল শূন্যের পানে !
পড়িয়া রহিল তার স্বর্ণ পিঞ্জর ;—
সযত্ন-সজ্জিত সেই নিত্য প্রয়োজন
মিটাবার বিপুল সম্ভার !
পশ্চাতে কাঁদিয়া মরে
বিচ্ছেদ বিধুর ম্লান তমিস্রা জড়িত
অজ্ঞানের ক্লান্ত পরিবেশ !

• •

কত হইল জগৎ
কত স্বপনের মেলা তারে দিল হাতছানি—
টানিয়া রাখিতে চাহে বিপুল বিক্রমে ;
বোঝিবারে গতি তার
হানে যত শক্তি আসুরিক,
ততই ভাসিয়া ওঠে অমৃতস্ত প্রাণ ; —
মর্ত্যের চাহিল না ফিরে—
সম্মুখে শুনিল শুধু আলোর আহ্বান।
ঊর্দ্ধে, আরো ঊর্দ্ধে
পক্ষ ঝাপটিয়া সেই মুক্ত বিহঙ্গম
চলিল ছুটিয়া—
আলো-ছায়া দেশ ছাড়ি'
লুটায়ে পড়িল গিয়া
অসীম, অনন্ত সেই জ্যোতি-পারাবারে !

মোদের বিবেকানন্দ

লক্ষ্মী দেবী

প্রকৃত-মানব তুমিই রাজাধিরাজ—
জ্ঞান-গরিমার তেজোময় উপলব্ধি
সমাজের নাকে করিয়া প্রতিষ্ঠিত—
ভগবান রূপে লভিয়াছ চির-সিদ্ধি
বোঝায়ে দিয়াছ ত্যাগের দীক্ষা,
শুনিয়াছ দীনে বাঁচার শিক্ষা,
সমতা তোমার মাটির ধূলায়
রচেছে-তীর্থ-সাম্য,
ত্যাগ-দীপ্ত-প্রতিভার রাগে—
রক্ত প্রগতি-কাম্য।
জন-স্রোতের কল-কোলাহলে—
রচেছ চলার-পথ,
তব নির্দ্দেশে গতি বেগে ছুটে—
চলেছে জীবন-রথ।
আত্মার-মূলে প্রেরণার ঘূর্ণি—
মালায়েছ তুমি-যোগী-মহাজ্ঞানী,
তোমরা গড়িলে আপনানন্দে—
নব নব জীবানন্দ,
প্রণমি তোমায় সৃষ্টি-স্রষ্টা—
হে শ্রীবিবেকানন্দ।

ঘুম

পারুল ঘোষ

সারা দেহে ঘুম আসে, ঘুম আসে শিরায় শিরায়,
ঘুম আসে বুকে, মুখে, ঘুম আসে চোখের পাতায়
মনের আকাশে মেঘ নামে, আলো ছায়া করে মিল্ মিল্,
চেতনা জড়ায়ে যায় মোর, দেখি লাখো ছবির মিছিল !
বধূর গলার মতো রং, রং যেন আল্পিতের ফুল,
বুকের পাথরে হায় ডুবু ডুবু কুঁড়ি স্বপনে আকুল !
কত গান বাজে কানে কানে, ঝিম ঝিম পিন পিন সুর,
তোমরা ফড়িং ডাকে যেন ঘাসে ঘাসে ব্যাকুল বিধুর !
দুনিয়া দামাল ছেলে ঘরে দোল খায় দোদুল দোদুল,
আকাশ ছড়ায়ে দেয় গায়ে মুঠা মুঠা হীরা তারা ফুল,
আয় ঘুম আয়রে আমার, মেহসিনী, দাওদার বাউ,
যেখানে রয়েছে জড়াজড়ি, গিরি-নদী ছুটেছে উধাও,
সেই দূর দুরাশার দেশ, সেখানের সব মায়া নিয়ে
নরম নিটোল দুটি হাতে চোখে মোর দিয়ে যা মাখিয়ে,
থেমেছে সকল কোলাহল, মনে বনে বাজে ঘুম বুমি.....
এখনি ঘুমায়ে যাবো আমি, চুপি চুপি কাছে এলো তুমি।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুষ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৫ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

কলিকাতার ময়দানের ফুটবলের মরসুম শেষ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা তথা ভারতের ক্রীড়া জগতে এত উত্তেজনা বা উদ্দীপনা আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই বৎসর কলিকাতা লীগ ও I. F. A. শীল্ড যাহা বাঙ্গলা ও ভারতের ফুটবল খেলার শ্রেষ্ঠ সম্মান বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তাহা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লাভ করিয়াছে। শুধু লীগ ও শীল্ড নহে বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ লাভ করিয়া তাহারা Triple crown লাভ করিয়া নিজেদের ভারতের শ্রেষ্ঠ দল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। কোন ভারতীয় দল আজ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয় নাই।

লীগ খেলায় তাহারা অধিক সংখ্যক গোল দিয়া, একটি খেলায় সর্ব্বাধিক গোল দিয়া, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মত শক্তিশালী দলকে ৮-১ গোলে পরাজিত করিয়া তাহারা কতগুলি নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে।

লীগ খেলায় দুইবার মোহনবাগানের নিকট পরাজিত হইয়া তাহারা I.F.A.র ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানকে ২-০ গোলে পরাজিত করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মানের বিজয় তিলক ধারণ করিয়াছে।

আমরা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং আশাকরি ভবিষ্যতে যেনো তাহারা আরো উচ্চাঙ্গের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালা তথা ভারতের ফুটবল খেলার মান আরো উচ্চ করিবার চেষ্টা করেন।

গত অলিম্পিক খেলায় ভারতীয় দল যে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছিল আগামী প্রতিযোগিতায় তাহারা যেন নিজেদের ভুল ত্রুটীর সংশোধন করিবার প্রয়াস লাভ করেন।

কলিকাতার লীগের শেষ খেলা গত ২২।৯।৪৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু লীগচ্যাম্পিয়ানসিপ ও রানার্স কাপ বহুদিন পূর্ব্বেই স্থির হইয়া যায়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব রানার্স কাপের গৌরব লাভ করে, এবং রেঞ্জার্স ক্লাব সবচাইতে কম পয়েন্ট লাভ করায় দ্বিতীয় ডিভিসনে নামিয়া যাইতে হয়।

দ্বিতীয় ডিভিসনের লীগ চ্যাম্পিয়ান B. N. R. Recreation ক্লাব ২৫পয়েন্ট লাভ করিয়া প্রথম ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। তাহারা ১৫টী খেলার মধ্যে ১১টীতে জয়লাভ করে। সালকিয়া স্পোর্টস মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানের জন্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

উয়াড়ী ক্লাব অপরাজিত ও একটি পয়েন্ট নষ্ট না করিয়া দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে।

বালীপ্রতিভা মাত্র একটি পয়েন্ট নষ্ট করিয়া তৃতীয় ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে

লীগ খেলায় কাহার কিরূপ স্থান

	খে	জ	ড্র	পরা	র	বি	পয়েন্টস্
ইষ্টবেঙ্গল—	২৬	২২	১	৩	৭৭	১০	৪৫
মহমডান স্পোর্টিং—	২৬	১৭	৫	৪	৪১	২০	৩৯
মোহনবাগান—	২৬	১৪	৬	৪	৩৭	১৬	৩৪
ই, আই, আর—	২৬	১৪	৪	৮	৬৩	৩৩	৩২
জর্জ টেলিগ্রাফ—	২৬	১১	৭	৮	৩১	৩৭	২৯
স্পোর্টিং ইউনিয়ন—	২৬	১২	৪	১০	২৪	৩৬	২৮
ভবানীপুর—	২৬	১১	৪	১১	৩১	৩২	২৬
কালীঘাট—	২৬	১১	৪	১১	২৬	২৪	২৬
রাজস্থান—	২৬	৮	৮	১০	২২	২৩	২৪
এরিয়ান—	২৬	৫	৯	১২	১১	২৬	১৯
ক্যালকাটা—	২৬	৮	১	১৭	২৪	৩৭	১৭
ডালহৌসী—	২৬	৬	৫	১৫	১৯	৪৩	১৭
রেঞ্জার্স—	২৬	৬	২	১৮	১৫	৪৯	১৪
ক্যাল্‌ ক্যারিয়ান—	২৬	৪	০	২১	২০	৭০	১০

লীগ খেলায় ক্রমপর্য্যায়ে গোলদাতাগণ :—

মেওয়ালাল	—৩২	এস, ঘোষ (ই,আই,আর)—	১০
আবিদ	—২৩	এ, ব্যানার্জি	—১০
ধনরাজ	—২১	ভেঙ্কটেশ	— ৯
আমেদ	—১৩	এস, ঘোষ (রাজস্থান)	— ৯
এন্টনি	—১২	এস, ভট্টাচার্য্য	— ৯
গোলাম মহম্মদ	—১০	রবসন্	— ৯

ক্রিকেট :—

বহু আলোচিত কমনওয়েলথ্‌ ক্রীকেট দল ভারত ভ্রমণে আসিয়াছে এবং তাহাদের খেলাও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রথম খেলায় তাহারা বোম্বাইতে ইউনিভার্সিটি একাদশের সহিত অমিমাংসিত ভাবে শেষ করিয়াছে। অত্যাধিক বর্ষার জন্য খেলাটী সম্পূর্ণভাবে হইবার সুযোগ পায় নাই।

আমেদাবাদে দ্বিতীয় খেলায় তাহারা পশ্চিম ভারত দলকে এক ইনিংসে ও ১২২ রাণে পরাজিত করিয়াছে। ১৭৭ রাণ পেছনে আসিয়া পশ্চিম ভারত দল ফলো অন করে ও দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ৫৫ রাণে শেষ করে। ব্যাটিং উইকেটে ট্রাইব, পেপার ও পোপের মারাত্মক বোলিংএর বিরুদ্ধে পশ্চিম ভারত দল দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না।

পশ্চিম ভারত একাদশ—১ম ইনিংস—১৭৭

„ ২য় — ৫৫

কমনওয়েলথ „ —১ম „ —৩৪৭

তৃতীয় খেলায় কমনওয়েলথ দল হোলকারের বিরুদ্ধে এক উইকেটে জয়ী হইয়াছে। খেলাটী তীব্র প্রতিযোগিতা-মূলক হয় এবং খেলা শেষ হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত খেলাটীর জয় পরাজয় সম্বন্ধে কেহ নিশ্চিত ছিলোনা। দ্বিতীয় ইনিংসে হোলকার দল আশাতীত ব্যাটিং নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। প্রাচীন ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কর্ণেল সি, কে, নাইডুর নেতৃত্বে খেলাটী বিশেষ উপভোগ্য হয়। প্রাচীন হইলেও এখনো তিনি যে ক্রীকেটে অল্পপযুক্ত হন নাই তাহা তিনি এ খেলাতে প্রমাণিত করিয়াছেন।

টেনিস :—

বাঙ্গলার টেনিস খেলোয়াড় দীলিপ বসু এই বৎসর ভারতীয় টেনিস পর্য্যায়ে ১ম স্থান লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী খেলোয়াড় হিসাবে ভারতীয় টেনিস খেলার এরূপ সম্মানের জন্য আমরা দীলিপ বসুকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং তিনি যেন এই সুনামের অধিকারী দীর্ঘদিন ধরিয়া থাকিতে সক্ষম হন সেজন্য উপযুক্ত অনুশীলন ও চেষ্টা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

বিজয়া :—

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী আমাদের পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি আমাদের শুভবিজয়ার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সামাজিক প্রথা স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে কোন বিচার না ক'রে চলতে থাকে। অনেক সময় হয়ত উৎসব ও অভিনন্দন উপহাস ব'লে প্রতীয়মান হয়। সামাজিক উৎসবের দিন যখন আসে তখনকার ব্যক্তিগত জীবনে কোন সুখ দুঃখের খেলা খেলে তার কোন হিসাব কেউ নেয় না। কিন্তু যখন সমস্ত সমাজ কোন বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তখনও প্রচলিত সামাজিক উৎসব যে চলতে থাকে তা অনেক সময় সামাজিক সত্তাকে আঘাত করে। বিভক্ত বাংলার নানা দৈব দুর্বিপাকের পর ঠিক পূজার মুখে মুঠা মূল্য হ্রাস নিয়ে যে আর্থিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে বাংলার উভয় অঞ্চলের অধিবাসীদের একটা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে ঠিক এই পূজার সময়ে।

সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রেও বাঙালী হিন্দু এই দুর্গোৎসবের সময় যে আনন্দ অনুভব করে তার হয়ত কোন সমষ্টিগত মূল্য জাতীর জীবনে আছে; একটা সাময়িক উত্তেজনার মত ঐ কয়েকটা দিনের জন্য তারা যে শক্তি নিজেদের মধ্যে অনুভব করে আশা করি তা তাদের জীবনে স্থায়ী করে তোলবার সংকল্প তারা বিজয়ার দিনে করেছে। পাপের ওপর ধর্মের জয়ের দিন হিসাবে এই বিজয়ার উৎসব পালিত হয়। ঐ দিন শক্তি সাধনার জয়ের দিন। বাঙালীর জীবনে শক্তি সঞ্চারিত হ'ক,—এই কামনা করি।

পশ্চিম বাংলা ও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব :—

জুলাই মাসের শেষ দিকে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি পশ্চিম বাংলা সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাশ করেছিলেন, কার্য্যত গত অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি তা প্রত্যাহার করেছেন। প্রথম প্রস্তাবে যা বলা হয়েছিল তার মর্মার্থ দাঁড়ায় বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্ত্তন হ'বে এবং ছ'মাস পরে নতুন নির্বাচন পর্যন্ত এক মধ্যকালিন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হ'বে। প্রস্তাবের ভাষার পিছনে এর মর্মার্থ যা প্রচ্ছন্ন ছিল তাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোন ইঙ্গিতে বা অনুরোধে পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় মন্ত্রীমণ্ডলীসহ তাঁর প্রধান মন্ত্রীত্বপদে ইস্তফা দেবেন। ওয়ার্কিং কমিটির ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব কার্যত ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলালের উপর ন্যস্ত ছিল ব'লে অনুমান করা যায়। পণ্ডিতজী নিজের প্রেরণায়ই বাংলায় যান এবং প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আসেন। তিনি যে রিপোর্ট ওয়ার্কিং কমিটির নিকট পেশ করেন তার ওপর নির্ভর ক'রেই ওয়ার্কিং কমিটি জুলাই মাসের ঐ প্রস্তাব পাশ করেন।

শোনা যায় ডাঃ রায় বিদেশ থেকে প্রথম এমন আভাস দিয়েছিলেন যে পণ্ডিতজী বা কংগ্রেস নেতৃবর্গের সামান্য ইঙ্গিতেই তিনি স'রে দাঁড়াবেন। কিন্তু পরে তিনি এই মত পরিবর্ত্তন করেন ব'লে অনুমান করা যায়। হয়ত তাঁর অন্যান্য সহযোগিদের পরামর্শে তিনি পরে মত পরিবর্ত্তন করেন।

পণ্ডিতজীর তরফ হ'তে বা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের তরফ হ'তে ডাঃ রায়কে বোধ হয় জানান হয়েছিল যে বিদেশ

থেকে তিনি যেন সরাসরি দিল্লীতে আসেন। ডাঃ রায় তা না এসে কলিকাতায় গিয়ে পরিষদে কংগ্রেসী দলের এক সভা আহ্বান করেন। তখন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ হ'তে তাঁকে জানান হয়েছিল যে ঐ সময় কংগ্রেসী দলের সভা বাতিল না করে তার পক্ষে দিল্লী এসে কথাবার্তা বলা দরকার। সে অনুরোধও ডাঃ রায় গ্রাহ্য না ক'রে পরিষদের কংগ্রেসী দলের সভায় তাঁর প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সামনে আসেন।

ওয়ার্কিং কমিটির এই শেষ বৈঠকের কিছুদিন পূর্বে মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষীয় একদল কংগ্রেসী হাওড়াতে এক সম্মিলন আহ্বান ক'রে ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ করে। ঐ সভায় ৬৭ জন মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন ও সভার কার্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পূর্ববর্তী এক বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটি এই সভার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ক'রে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শোনা যায়, এক উদ্যোক্তা মন্ত্রীর নিকট তাঁদের আচরণের কৈফিয়ৎ তলব ক'রে পণ্ডিতজীকে এক চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। ঐ প্রস্তাব ও ঐ চিঠির কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমরা জানিনা। বাংলার জনসাধারণও জানে না।

এ অবস্থায় পূর্ব প্রস্তাব প্রত্যাহার ও এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার হানি হবে ব'লে আমরা আশঙ্কা করি। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ও ওয়ার্কিং কমিটির ইঙ্গিত গ্রহণ না ক'রে ডাঃ রায় পরিষদের কংগ্রেসী দলের অধিকাংশের আস্থাজ্ঞাপক ভোটের উপর নির্ভর ক'রে যখন ওয়ার্কিং কমিটির সামনে নিয়মতান্ত্রিক দাবী নিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন পূর্বেকার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটি যে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। এটা আমরা মানতে রাজী যে একটা উভয় সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে ওয়ার্কিং কমিটি এই নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এই উভয় সঙ্কট সৃষ্টি করার দায়িত্ব ওয়ার্কিং কমিটি বা পণ্ডিতজীর নিজস্ব। এই মন্ত্রীমণ্ডলী বাংলার জনসাধারণের আস্থা উপভোগ করেনা এবং প্রদেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারেনা এটা অনুভব ক'রেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলাদেশে যান এবং নিজে সমস্ত অনুসন্ধান করেন। তাঁরই রিপোর্টের উপর নির্ভর ক'রে ওয়ার্কিং কমিটি প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বাংলার জনসাধারণ ও কংগ্রেস কর্মীদের একটা ভরসা দেন। তাছাড়া তিনমাস পর্যন্ত সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ও জনসাধারণের মনে একটা অনিশ্চয়তার ভাব তাঁরাই সৃষ্টি করেন। তিন মাস পর যথাপূর্ব ব্যবস্থা রেখে বাংলার জনসাধারণের কাছে ওয়ার্কিং কমিটি নিজেকে খেলো করেছেন। ওয়ার্কিং কমিটি যে অবস্থায় পড়েছিলেন তাতে এই নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া তাঁদের কোন গত্যন্তর ছিল না। আর যা তাঁরা করতে পারতেন তা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা। দলের অধিকাংশ সভ্যের আস্থাভাজন মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা খুব সহজ ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপার নয়; নানা দিকে, বিশেষ ক'রে বাংলা প্রদেশের ভিতর, এর কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারত তাও ওয়ার্কিং কমিটিকে ভাবতে হয়েছে। কিন্তু একথাও ভাবা উচিত ছিল—এই ভাবে শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যাপারে দুর্বলতা দেখিয়ে এবং পণ্ডিতজীর সুপারিশ অগ্রাহ্য করার উদ্ধত্য সহ্য ক'রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিতজীর মর্যাদার হানি করা হয়েছে।

অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে দলের অধিকাংশ সভ্যের সমর্থন কি ক'রে এ মন্ত্রীমণ্ডলীর পিছনে আছে। যে ৩৪ জন সভা দলীয় সভায় আস্থাসূচক প্রস্তাব সমর্থন করেছেন তার মধ্যে মন্ত্রী, পার্লামেন্টরী সভ্য ও অন্যান্য ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর সাথে জড়িত ও তদ্দ্বারা উপকৃত প্রায় সবাই। অবশ্য ওয়ার্কিং কমিটির নিকট ইহা অপরিজ্ঞাত নয়। কার্যত ইহা দুর্নীতির প্রশ্রয়দায়ক—এমনি সব কাজের ফলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভিতর দুর্নীতি প্রবেশ করছে, জনসাধারণের নিকট কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মর্যাদারও হানি হচ্ছে। ইহা একটা মৌলিক সমস্যা এবং

ওয়ার্কিং কমিটিকে অদূর ভবিষ্যতে এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিতে হ'বে।

কংগ্রেস ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক

ওয়ার্কিং কমিটির গত অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে তা নিয়ে কংগ্রেস মহলে প্রায় সর্ব্বত্রই অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবটিকে যে ভাবে সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার করা হয়েছে তার ফলে ঐ প্রস্তাবটীর প্রকৃত মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে লোকের মনে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ ঘটেছে। আমরা যতদূর জানি কোন একটী বিশেষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি হ'তে নিখিল ভারত কংগ্রেস অফিসে প্রশ্ন করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কোন সভ্য কংগ্রেসের সভ্যপ্রার্থী হ'লে তাকে কংগ্রেস সভ্য করা চলে কিনা। এটা নিতান্তই কংগ্রেসের গঠনতান্ত্রিক ও অফিসের ব্যাপার, নূতন কোন নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপার নয়। কংগ্রেসের ও রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের গঠনতন্ত্র অনুসারে সেবক সংঘের কোন কোন সভ্যের পক্ষে কংগ্রেসের সভ্য হ'তে কোন বাধা নাই। কারণ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কোন সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক পার্টি নয়।

এ পর্য্যন্ত তো নিতান্তই কংগ্রেসের অফিসিয়ল ব্যাপার। সে হিসাবে—নিখিল ভারত কংগ্রেসের দপ্তর হ'তে যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ঐ জবাব পাঠাত তাহলে ব্যাপারটা এমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠত না। কিন্তু তা না ক'রে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব হিসাবে একটা নতুন নীতি নির্দ্দেশকভাবে এটিকে প্রচার করা হয়েছে। গোলমাল বেধেছে সেখানেই। রাজনৈতিক ব্যাপারে কেবল বিধি বিধান হিসাব ক'রে চলা সঙ্গত নয়। জনসাধারণের মনে কোন কাজের ফলে কি প্রতিক্রিয়া হবে তারও হিসাব নেওয়া কর্ত্তব্য। সেদিক থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করা দরকার। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিতজী এই সংঘ সম্বন্ধে বেশ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং আমরা যতদূর জানি অধিকাংশ কর্ম্মী ও কংগ্রেস কমিটি এই বিষয়ে পণ্ডিতজীর মত সমর্থন করে।

এই সংঘের কার্যক্রম সুস্পষ্টভাবে ফাসিষ্টনীতির অনুসরণকারী। নিয়মতান্ত্রিক সূক্ষ্ম ছিদ্রের ফাঁক দিয়ে সুচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হবার চেষ্টা যে এই সংঘের কর্ম্মকর্ত্তাদের নেই এমন কথা বলা চলে না। উত্তর ভারতে তারা অনেক সময় প্রকাশ্যেই প্রচার চালাচ্ছে যে প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে রাষ্ট্র-ক্ষমতা স্বয়ংসেবক সংঘ অধিকার করবে। অবশ্য তাদের এই অভিলাষ হয়ত পঙ্গুর গিরি-লঙ্ঘনের মতই শেষ পর্য্যন্ত কল্পনার সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু বর্ত্তমানে জনসাধারণের মনোভাব কংগ্রেসের প্রতি খুব সুপ্রসন্ন নয় এবং কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিও আজ পর্য্যাপ্ত নেই। এই দুটি বিষয়ে বিবেচনা ক'রে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের চলা উচিত। আমরা আশা করি নিম্ন কংগ্রেস সমূহ হ'তে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে এই বিষয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ স্বয়ংসেবক সংঘ সম্বন্ধে সত্বরই সচেতন হবেন।

চিনি, লবণ, প্রভৃতি :

চিনির সরকার-নির্দ্ধারিত দাম অতিক্রম ক'রে দোকানদারগণ বেশীমূল্যে চিনি বিক্রয় করছিল; সরকারের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে বোধ হয় একটু ঘা লাগল। তাই তারা সাব্যস্ত করল সমস্ত চিনি সরকারের তরফ হ'তে নিজ আয়ত্বে আনবে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চিনি বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল। যেখানে খোলা বাজারে কম বেশী একটাকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চিনি পাওয়া যেত সেখানে চিনি দুর্ঘট হ'ল এবং দাম চ'ড়ে গেল ৩টাকা আড়াই টাকা পর্য্যন্ত। সরকারী কার্যক্ষমতার এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেশবাসী গত দু'বছরের মধ্যে বহুবার পেয়েছে। কিন্তু, বারবার এভাবে ব্যাহত হয়েও সরকারের যেন কোন চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। অবশ্য ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে Government has neither a body to be kicked at nor a soul to be moved"—সরকারের কোন-রক্ত-মাংসের অবয়ব নেই যাকে লাথি

মারা যায়, বা হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই ধর্মবুদ্ধির দোহাই দিয়ে যাকে নরম করা যায়। কিন্তু যতদিন সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে, কোন এক অদৃশ্য শক্তির স্পর্শে এখানকার নৈর্ব্যক্তিক আমলাতান্ত্রিক সরকার চালিত হ'ত, ততদিন ও কথা খুবই সত্য, আমরা অনুভব করতাম। আজ যখন এখানকারই জল-হাওয়ায় পুষ্ট ও রক্তমাংসের শরীর বিশিষ্ট মন্ত্রীদের দ্বারা সরকার গঠিত ও চালিত হয় তখন উপরোক্ত ইংরেজী উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

অথচ বার বারই সরকারী নীতি একদল অর্থলোভী রক্তশোষকের হাতে ব্যাহত হচ্ছে। চিনির পর হঠাৎ একদিন লবণ কলকাতার বাজার হ'তে উধাও হ'ল সহরে প্রচার পত্র ছড়ান হ'ল যে সরকার শীঘ্রই লবণের বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করবে। অতএব যে যার মত লবণ সংগ্রহ ক'রে নাও। একটি সুস্পষ্ট ষড়যন্ত্র এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দু'সাতটী লবণের পাইকারী কারবারী এর মধ্যে জড়িত। শোনা যায়, তাদের নামও সরকারের নিকট অপরিজ্ঞাত নয়। ঐ একদিনের ঠগী কারবারে নাকি ৪।৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করা হয়েছে।

যারা এইভাবে দরিদ্র জনতাকে প্রতারণা করেছে তাদের বিরুদ্ধে নাকি সরকারের দণ্ডবিধিতে কোন দণ্ডের ব্যবস্থা নেই। আরও বলা হয় যে আমাদের রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গঠিত; ব্যক্তি-স্বাধীনতা এই রাষ্ট্রের নাগরিকের মৌলিক অধিকার। অতএব কেবল সন্দেহের বশে অথবা প্রকৃত তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও দণ্ডবিধির উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে লোকের হাতে মাথা কাটা তো যায় না। কাজেই এ সব সমাজদ্রোহী, দুষ্কৃতিকারী ঠগী দস্যুদের বিরুদ্ধে করার কিছুই নেই; গতকাল চিনি, আজ লবণ, আগামীকাল কয়লা, কিছুদিন পূর্বে কাপড় এমনি নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য নিয়ে এরা লোকের রক্ত শুষে খেতে থাকবে, গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র ও আমাদের মন্ত্রীবর্গ নিরুপায় হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে! চমৎকার ব্যবস্থা!!

কেবল তাই নয়। এ ভাবে প্রতারিত ও উদ্বাস্তু সাধারণ জনতা যদি তাদের জীবন ধারণের দাবী নিয়ে চিনি, লবণ, কয়লা বা কাপড়ের দোকানের সামনে হল্লা করে, তবে আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদাও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে হ'বে। বোম্বাইতে এমনিভাবে জনতার উপর গুলি বর্ষিত হয়েছে; কিছু লোক নিহত ও আহত হয়েছে। এমনি ব্যাপারে ও এর চাইতেও ছোটখাট ব্যাপারে বাংলা সরকার বহুবার গুলি বর্ষণ করেছে। কিন্তু ইলাহিং কেন্দ্রিয় সরকার গুলিবর্ষণ সম্পর্কে মনে হয় বাংলা সরকারকে কিছু হুসিয়ার ক'রে দিয়েছে। কাজেই তারা বর্তমানে চিনি লবণের জন্য হল্লাকারীদের মৃদু যষ্টীস্পর্শ ও কাঁদুনে গ্যাস দিয়ে কাঁদিয়েই বাড়ী পাঠাচ্ছে।

কিন্তু এর প্রতিকার কি এবং যথোপযুক্ত সময়ে প্রতিকার না হ'লে এর পরিণতি কি তা বিশেষভাবে অনুধাবন করা উচিত। ভারতীয় দণ্ডবিধি এমন অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গ এ কথা জনসাধারণ বিশ্বাস করবে না; অথবা দণ্ডবিধির পুস্তকে কোন ত্রুটী থাকলে সরকার একদিনেই পশ্চাৎ প্রসারী কার্যকারীতা সমেত (With retrospective effect) নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারে না এ কথাও জনসাধারণ বিশ্বাস করবে না। আজ অবস্থা এমন গুরুতর স্তরে উঠেছে যে কেন্দ্রিয় বা প্রাদেশিক কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর নির্ভর না ক'রে এখন কংগ্রেসের উচ্চতম মহল থেকে এর জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। যদি কংগ্রেসী শাসনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ উপযুক্ত মূল্যে ও পরিমাণে তারা সরবরাহ করতে পারে না, অথচ আইন ও শৃঙ্খলার মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বই তাদের নিকট বড় হয়ে ওঠে তাহলে এই শাসন ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারনের আস্থা রাখা সম্ভব হবে না। সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত এর ওপর নির্ভর করছে। গণতন্ত্র বা ব্যক্তিস্বাধীনতার দোহাই দেওয়া এখানে সত্য অপলাপের প্রয়াস মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথ নাথ ব্যানার্জী পদত্যাগ করেছেন। তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ

ও তাঁর জ্যোতিষীর পুত্র গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছিল। ১০জন প্রধান পরীক্ষকের মধ্যে ৮জন এই তিনটি পরীক্ষার্থীর নম্বর অন্যায় ক'রে বাড়িয়ে দেন। 'লোকসেবক' কাগজে এই ব্যাপার প্রকাশিত হওয়ায় ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলার ডাঃ কাটজু এক তদন্ত কমিটি স্থাপন করতে বাধ্য হন এই কমিটির রিপোর্টে ঘটনার বিবরণ সত্য ব'লে নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু স্বয়ং ভাইস-চ্যান্সেলারের উপর তাঁদের বিবেচনায় প্রত্যক্ষভাবে কোন দোষ আরোপিত হয় নাই। কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁর অনেকটা দায়িত্ব এ ব্যাপারে আছে বলে কমিটি মনে করেছে।

এই তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যে কলঙ্ক হঠাৎ সরকারী ভাবে স্বীকৃত হ'তে বাধ্য হল তা ঠিক একদিনের ব্যাপার নয়, অন্ততঃ গত ৩০ বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে এমনি কাহিনী জনসাধারণে প্রচলিত ছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয় একটি বিশেষ পরিবারের প্রায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব'লে গণ্য হচ্ছিল অন্ততঃ ৩০।৩৫ বৎসর যাবৎ। আজ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এমন বহু ব্যক্তির ছাত্র-জীবনের অতি উজ্জ্বল সাফল্যের পিছনে অনেক কাহিনী লুক্কায়িত আছে ব'লে জনসাধারণের ধারণা; অন্তত এমনি কানাঘুষা অভিযোগ বহুদিন যাবৎ চলছিল। কোন কোন পরীক্ষায় কোন বিশেষ প্রার্থীকে উচ্চপদ দিতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কখন হঠাৎ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তার ফলে অনেকের পরীক্ষার ফল উপযুক্ততার চেয়ে অধিকতর সাফল্য-মণ্ডিত করতে হয়েছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এমনি অভিযোগ বাংলার পক্ষে ধিক্কারজনক ছিল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সব দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম বাংলার যুবকদের নৈতিক চরিত্রের অবনতির একটী প্রধান কারণ। ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দের প্রভাবে এবং স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙালী যুবকদের চরিত্রে যে দার্ঢ্য ও আদর্শ-নিষ্ঠা দেখা দিয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির এই প্রসারে তা স্বভাবতই ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

শ্রীযুক্ত বিশ্বাস বহুদিন যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এই সব অভিযোগের কথা তাঁর নিকট অপরিজ্ঞাত থাকতে পারে না। তিনি এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, তাঁর স্মরণ রাখা উচিত কলঙ্কজনক আচরণের উপর ধামাচাপা দিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে না। কিছুদিন পূর্বে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যেসব মনোভাব প্রকাশ করেছেন, তা'তে লোকের মনে এই আশঙ্কাই হবে যে তিনি সমস্ত কাহিনীর আনুপূর্বিক তদন্ত চান না। আরও গুরুতর কথা হ'ল এই যে, যে সব কর্ম্মচারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এই সব কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করেছেন, মিঃ বিশ্বাস তাঁদের প্রতি বেশ একটু শাসানির ভাষা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কথার ভাব যেন এই যে ঐ লোকগুলি যদি ঐসব তথ্য প্রকাশ না করত, তবে ত বিশ্ববিদ্যালয় তার সুনাম বজায় রেখেই চলতে পারত, ভিতরে গলদ যতই থাক না কেন। এই যদি নতুন ভাইসচ্যানসেলারের মনোভাব হয় তবে বিশ্ব-বিদ্যালয় কখনও কলঙ্কমুক্ত হবে না। মিঃ বিশ্বাস নিশ্চয়ই জানেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা বহুদিন যাবৎ বাজারে প্রচলিত আছে।

পরে আমরা সংবাদ পত্রে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডাঃ কাটজু এক ব্যাপক তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করেছেন। আশাকরি এই তদন্ত কমিটি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মুখ চেয়ে কারুর ব্যক্তিগত বা পরিবারগত সম্ভ্রম রক্ষার জন্য চেষ্টা না ক'রে সত্যিকার তদন্ত করবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বাদশ বর্ষ অগ্রহায়ণ—১৩৫৬ অষ্টম সংখ্যা

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(সপ্তম পরিচ্ছেদ)

আমার বাবার ডাক এল। আমায় মেদিনীপুর যেতে হবে। বাবার ডাক আমার কাছে চিরদিনই মিষ্টি। তিনি জীবনকে গতি সম্পন্ন করেন। এদেশে চল, ওদেশে চল, মানুষ দেখ, দেশ দেখ, ঘাঠ, শস্যক্ষেত্র, মানুষদের জীবন, তাদের পালি-পার্বন, রীতি-নীতি, জীবন যাত্রা প্রণালী দেখ। পাহাড়, বন-জঙ্গল, নদী দেখ। আশপাশে চোখ বুলিয়ে নাও। এ সবের মাঝে যে নির্বাক বাণি ছড়ান আছে তা পেলে কিনা? যদি পেয়ে থাক ত কি পেলে? সূত্রটি ধ'রে চিন্তা কর, ধ্যান কর, অনুধাবন কর।

লক্ষ্য করলাম কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় পাঁচ-জন একত্র হ'লে আলোচনা হচ্ছিল—"এসব কি? ব্যারাকপুর.....ডাক্তারকে গোরারা এমন মারল যে সে মরে গেল। চা-বাগানের কুলিদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী নানা দিক থেকে শোনা যায়। পিলে ফেটে যে কত লোক মরছিল তা আর কে গুণে দেখছে? এদেশে মানুষের মর্যাদা পাকার বোধ হয় আর জায়গা রইল না। নিজেদের দেশে যেন আমরা পরবাসী। মানুষের মত নয়, কুকুর-মরা হয়ে সেবটা আমাদের মরতে হবে? সাহেবের বুটের ঠোকরে প্রাণ দেওয়াই বিধিলিপি হয়ে দাঁড়ান? আইন, আদালতে আর বিচার প্রত্যাশা করা যায় না।" মানুষের মন ভেঙ্গে পড়তে লাগল। ভিক্টোরিয়ার ওপর যে বাস্তবিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা ও টান ছিল সেটা প্রতিদিন ক্ষয়িষ্ণু হয়ে আসতে লাগল। রাজভক্তি তর তর বেগে উবে যেতে লাগল। প্রাচীনরা খুব দুঃখ করতেন; রাষ্ট্রের হাল যাদের হাতে তাদের সঙ্কীর্ণতা, ঝাপসা দৃষ্টি, অসহানুভূতি, ভাব-কল্পনার অভাব একটা অনভিপ্রেত অনাসৃষ্টি টেনে আনছিল, দেখেও কেউ দেখছিল না। একটা ছাগল ভেড়ার যে ধাম আছে, সাদা-আদমির হাতে কালো আদমির তাও থাকছে না। "ইলবার্ট বিল" আন্দোলন এর কিছু আগে হয়ে গেছে। কালা হাকিমের কাছে ধলা আসামীর বিচার শ্বেতাঙ্গরা কিছুতেই সহ্য করবে না। বড়লাট রিপনকে 'ধলা'র কাছে অপ্রিয় হতে হয়েছে।

একদিকে এই অপমান, অনাচার, অবিচার লাঞ্ছনা ভারতবাসীর বুক ভেঙ্গে দিচ্ছিল। পাশ্চাত্যদের কাছে ভারতবাসী মনুষ্য-পংক্তির বাইরে পড়ে যাচ্ছিল। পল্লী-গ্রামের লোকেরা বলত—ষাঁড়ের গোবর ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে। পতনের চূড়ান্ত হয়েছিল; শুধু পশুবলের প্রাবল্যে এরকম একটা স্থায়ী হীনতার ছাপ দুঃসহ। আর একদিকে সেই সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন—প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। এঁদের দেখে বিদেশ শিখল ভারতকে

সম্মান করতে এঁরাই এ যুগে প্রথম দেখালেন—ভারত শুধু নেয় না, দেয়ও। বিজ্ঞানজগতে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র নিজেদের আবিষ্কার ও অনুসন্ধানের ফলে নতুন কিছু দিলেন দুনিয়াকে। তাঁরা বড় হয়ে ভারতকে বড় করলেন নিজেরা মান পেয়ে ভারতকে করলেন মানী। বিবেকানন্দও আপন জীবন দিয়ে করলেন তাই। দেশ ধন্য হ'ল। দেশবাসীরা হ'ল কৃত কৃতার্থ। কৃতজ্ঞ অন্তরে দেশমাতৃকার অকৃতী সন্তানরা মনের মন্দিরে তাঁদের পূজা করতে লাগল। বড় চরিত্রদের তুলনা-মূলক বিচার করতে নাই লোকে বলে। তবে এটুকু বললে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে—আচার্যদেব 'ইতর' ভারত, পতিত ভারতকে জগৎ-সমক্ষে তুলেছেন। পাশ্চাত্যদের কাছে গিয়ে তাঁরা বলেছেন—"তোমার শিক্ষিত বিদ্যা শিখাব তোমারে।" কৃতী শিষ্য, সম্পন্ন গুরুর কাছে নিয়েছেন। ছাত্রের সঙ্গে গুরুর মানও তেমনি বেড়েছে। একজন নেপোলিয়নকে বলেছিল তাঁর এক নিম্নস্তর সেনানায়ক অসাধারণ রণ-কুশলী হয়েছে; নেপোলিয়ন প্রসন্ন হ'লেন এবং মন্তব্য করলেন—This shows how well did we train our corporals—এতে প্রমাণ হচ্ছে কি সুন্দরভাবে আমরা সেনাবিভাগের চুনোপুঁটিদের তালিম দিয়েছি। প্রশংসার অনেকখানি গরীবের প্রাপ্য থেকে ধনীর ভাণ্ডারে চ'লে গেল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই ত ছাত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে কতবার বলেছেন—অস্ত্রত্র জয়ম্ বিচ্ছেৎ, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়। অস্ত্রত্র জয় চাইবে, কিন্তু পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজয় কামনা করতে হয়। শিষ্যের বড় হওয়ায় গুরুর গৌরব নিশ্চিত বাড়ে।

বিবেকানন্দ সম্পর্কে অন্য কথা খাটে। তিনি কৃতী শিষ্য হ'তে গুরুগৃহে যান নাই। গিয়েছিলেন একদম নিজস্ব জিনিষ নিয়ে আচার্য হয়ে। দেশের মান, গৌরব নিজের গুণে বাড়ান হয়েছে এঁতে। দেশের আত্মাভিমান মাথা চাড়া দিল। সত্যি প্রাণ খুলে দলে দলে লোক বেলুড়ে সংবেত হ'তে লাগল। স্বামীজীর উৎসব গাইতে গাইতে—"হে স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতে কর আনন্দ", আমরা তখন ধর্মচর্চা অতশত বুঝতাম না: বুঝতাম এই—ধার্ম্মিক পাশ্চাত্য জাতি ভারতীয়দের মানুষ ব'লে গণ্য করে না, বানর, বন-মানুষের সামিল ভাবে। তাদের উদ্ধত শির ভারতের পায়ে গুণে ও জ্ঞানে নত ক'রে ভারতকে যে বড় করেছে, সে আমাদের কাছে থাকবে অনেক বড়—বহু যুবকের মনোভাব এই ছিল।

'গোদা ধরে খা ভালার গল্প ছেলেরা বুড়োদের মুখে শুনত। কলকাতা হ'তে অল্প দূরে বারাসতে বাঁশের কেল্লা বানিয়ে তিতুমীর ইংরেজের দর্প চূর্ণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন। বেরিলীর এক মুসলমান মক্কায় যায় হজ করতে। সেখান থেকে বয়ে আনে স্বাধীনতার এক নতুন সন্দেশ। ওহাবী তাদের বলত। বাঙ্গলায় সে ভাব এসে দাঁড়াবার জায়গা পেল। বাঙ্গালী মুসলমানরা সংঘবদ্ধ হয়ে গুপ্তভাবে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে কাজ চালাতে লাগল। তাছাড়া চামড়ার ব্যবসার আড়ালে এদের সংবাদাদির আদান প্রদান চলত। ক্রমে দলন-নীতি অনুসৃত হল। কর্তৃপক্ষ বহু লোককে ধরে ধরে জেলে দিতে লাগলেন। তাদের জায়গা জমি বে-দখল ও বাজেয়াপ্ত করা হ'তে লাগল। সরকার পেছনে লাগায় বহু চাষী ভূমিহীন অবস্থায় ফৌত ও ফেরার হ'তে লাগল। তিতুমীর এইরকম চাষীদের সর্দার ছিলেন। তিনি একটা কিষাণ বিদ্রোহ জাগালেন। বাঁশের কেল্লা গুলিগোলার কাছে দাঁড়াতে পারল না। সাধারণ মুসলমান চাষী তিতুমীরের অলৌকিক ক্ষমতা কল্পনা করত। তিতু ইংরেজের গুলি ধরে খেয়ে হজম ক'রে ফেলবেন। তাঁর তিলার্ধ অনিষ্ট কেউ করতে পারবে না। এরকম বিশ্বাস তাঁর অনুচরদের ছিল। কার্যতঃ কিন্তু তা টিঁকল না। তিতুমীর গ্রেফতার হয়ে গেলেন। বহুলোক হতাহত হ'ল। বহুলোকের ফাঁসী ও দ্বীপান্তর হ'ল। এই প্রসঙ্গে দুটো অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের এক জজকে এক মুসলমান ছোরার আঘাতে হত্যা করে। ওহাবী সর্দার চামড়া ব্যবসায়ী আমির আলির বিচার ভারী রোমাঞ্চকর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। বিচারে মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে গুপ্ত সমিতির অনেক অজানা কথা

লোকেদের প্রথম জানা হয়ে যায়। এই মোকর্দমার আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্য বিলাত থেকে (কেউ বলে বোম্বাই থেকে), মহানামী ব্যারিষ্টার আনা হয়। তার নাম অ্যান্ষ্টি। তার আইনের জ্ঞানের কাছেও নির্ভীক সওয়াল জবাবে হাইকোর্টের জজ ও এড্ভোকেট জেনারেল ঘাবড়ে ওঠেন। আলীর আলীর শেষ পর্যন্ত সাজা হয়ে যায়। সাজাপ্রাপ্ত ওহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি সের খাঁ, বড়লাট মেয়ো আন্দামান পরিদর্শন করিতে গেলে তাঁকে হত্যা করে। মুসলমানদের প্রতি সরকার বিরূপ হন। তাদের খুবই সন্দেহের চক্ষে দেখতে থাকেন। গল্পে গল্পে ছেলেরা এসব কথা শুনত। ইংরেজের মনিপুর জয়ের ইতিহাস ও টিকেন্দ্রজিতের বীরত্ব কাহিনীতে লোকের মন সমবেদনায় গু'রে উঠত।

(ক্রমশঃ)

প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

শ্রীসুরেন্দ্র মোহন ঘোষ

যাঁর কাহিনী আপনাদের এখন বলব তিনি অগ্নিযুগের একজন বিপ্লবী। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের লোক তিনি। তাঁকে ভাল করে বুঝতে হ'লে তাঁর ও আপনাদের মাঝখানের সময়ের এই ব্যবধানটুকু মনে রাখা দরকার। আপনারা যাঁরা আজ এই কাহিনী শুনছেন, মনে গর্ব অনুভব করতে পারেন—নিশ্চয়ই ক'রেও থাকেন যে আজ আপনারা স্বাধীন দেশের মানুষ ; আমাদের দেশ ভারতবর্ষ আজ আর কারো গোলাম নয়, অন্য যে কোন দেশের লোকের মত জগৎসভায় আমরাও মাথা উঁচু করে বসতে পারি। কিন্তু প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী যখন তরুণ বয়সের ছাত্র ছিলেন, তিনি তখন দেশকে কি অবস্থায় দেখেছিলেন ? —এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ইংরাজ তখন দুর্দান্ত প্রতাপে এ দেশে রাজত্ব করেছে, দেশের লোকের এদেশে কোন সম্মান নেই, সম্মান দাবী করবার শক্তিও নেই। নিজের দেশে মাথা নীচু করে চলতে হয়, চোরের মত ভয়ে ভয়ে চলতে হয়। রেল গাড়ীতে সাহেবদের সঙ্গে এক কামরায় যাবার সাহস নেই—মেরে কখন গাড়ী থেকে ফেলে দেয় ; ফেলে দিলে তার কোন প্রতিকারও বিশেষ নেই ; ফুটবল খেলার মাঠে সাহেবদের ছেলেরা ভারতীয় ছেলেদের হামেশা পিটিয়ে দিচ্ছে, দেশের লোকে মার খাচ্ছে আর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করা ত দূরের কথা—'স্বাধীনতা' কথাটা উচ্চারণ করতেও লোকে ভয় করে, কী জানি যদি সাহেবরা কি পুলিশের লোকেরা শুনে ফেলে তবে শাস্তি দেবে।—এক কথায় আমাদের জাতির তখন একটা ঘোর দুর্দিন। এক দিকে বিদেশী শাসকদের উৎপীড়ন, আর একদিকে নিজের পৌরুষহীন ভীরুতা—এই দুয়ের চাপে তার মনটা নির্জীব হয়ে, নিষ্পেষিত হয়ে গেছে। মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে মানুষের মত করে বাঁচতে চাইবার কথা ভাবতেও তখন এ দেশের বেশীর ভাগ লোক ভুলে গেছে। কিন্তু সেই দুঃসহ লজ্জার মধ্যে এমন একদল তরুণ বীর এগিয়ে এলো জাতীয় জীবনের পুরোভাগে জাতির দৈন্য, ভীরুতা, অপমান যাদের প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়েছে। দেশের নৈরাশ্যময় অন্ধকারের মধ্যে তারা তাদের সেই আগুন ভরা প্রাণ জলন্ত মশালের মত তুলে ধরলো—যাতে সেই আলোয় লোকে পথ চিনে এগিয়ে যেতে পারে গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যতের দিকে, পূর্ণতর মনুষ্যত্বের দিকে। এই তরুণদের একজন প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী।

১৮৮৯ সালে রংপুরে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ৺ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ছিলেন সরকারী চাকুরিয়া। কিন্তু দেশকে তিনি ভালবেসেছিলেন, পরাধীনতার লজ্জা তিনি অনুভব করতেন। ১৯০৫ যখন বাংলাদেশকে কেটে দু-টুকরা করার সরকারী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য দেশময় আন্দোলন হয়, যাকে স্বদেশী আন্দোলন বলে—তখন রংপুরে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রফুল্ল

ও তাঁর ভাইরা তখন সরকার পরিচালিত স্কুলে পড়েন। ঈশানচন্দ্র ছেলেদের ডেকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার জন্য উৎসাহিত করেন। এর ফলে তাঁর চাকুরি যাবার মত হয়েছিল। কিন্তু তা'তে তিনি বিন্দুমাত্রও টলেন 'ন। তখনকার দিনে এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল ছিল। কিন্তু শুধু এইটুকুই নয়। এই সময় তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন হচ্ছে। কাউকে কিছু না জানতে দিয়ে বিনা আড়ম্বরে তিনি বন্দুক কিনে নিজের ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে তারা গুলি ছোড়া অভ্যাস করতে পারে। এর বছর তিনেক পরে ছেলের অপরাধে তাঁর চাকুরী যায় তাঁকে গ্রেপ্তার হ'তেও হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনের তেজ ও উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাঁটা পড়েনি। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করেন ঈশানচন্দ্র তখন সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং বাকী জীবন অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেসে কাজ করে গেছেন।

প্রফুল্ল স্বদেশী দলে যোগ দেবার প্রেরণা সরাসরি তাঁর বাপের কাছ থেকে না পেলেও তাঁর দিক থেকে বাধা কখনো পান নি, বরং স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা বহুল পরিমাণে পেয়েছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিপ্লবীদল গড়বার প্রেরণা তখন সবেমাত্র সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথে এই প্রেরণাও দ্রুতবেগে দেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই রংপুরে বিপ্লবীদের একটি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই কেন্দ্রের অন্য আর একজন বিপ্লবীর নাম আপনারা সবাই নিশ্চয়ই শুনেছেন—তিনি প্রফুল্ল চাকী—১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে তিনি এবং ক্ষুদিরাম অত্যাচারী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য বোমা ছুঁড়েছিলেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়, আর প্রফুল্ল চাকী পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত হওয়ামাত্র নিজের রিভলভার দিয়ে নিজের জীবন শেষ ক'রে দেন। প্রফুল্ল চাকী প্রফুল্ল চক্রবর্তীর বন্ধু ছিলেন। এবং অতি অল্পদিনের ব্যবধানেই এই দুই বন্ধু স্বাধীনতার বেদী মূলে নিজেদের প্রাণ বলি দেন।

আরো অনেক সহকর্মির মত প্রফুল্লরও জীবন কাহিনীর মধ্যে অধ্যায়িকার ভাগ তেমন বেশী নয়। এ জীবন সময়ের দিক থেকেও দীর্ঘ নয়। ঘটনার বৈচিত্রেও সমৃদ্ধ নয়। এ জীবনের যা কিছু বিশেষত্ব সে ছিল এর আবেগের গভীরতায়। এ যেন মেঘান্ধকার রাত্রে আকাশ পারের ক্ষীণ বিদ্যুৎ—তার দীপ্তি মাত্র একটি মুহূর্তের: কিন্তু সেই একটি মুহূর্তের মধ্যেই দীর্ঘ অন্ধকার পথের অনেকখানি সে উদ্ভাসিত ক'রে যায়। এই বিপ্লবীরা সে দিন বুঝেছিলেন যে দেশকে বাঁচাতে হ'লে দেশের কিছু লোককে মরতে হবে—দুর্ধর্ষ স্পর্ধায় দেশের শত্রুদের সঙ্গে লড়াই ক'রে বীরের মত মৃত্যু বরণ করতে হবে। সেই মুষ্টিমেয় লোকের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরাজ হেরে যাবে তা তাঁরা ভাবেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে এই মুষ্টিমেয় বিপ্লবীরাই মরবে। কিন্তু তাদের আত্মাহুতি দেশের জনসাধারণকে শিখিয়ে দেবে স্বাধীনতার জন্য কেমন ক'রে মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে হয়। এই বিপ্লবী জীবনের পথ তাই ঋষি দধীচির মত নীরব আত্মাহুতির পথ; এ জীবনে সাধনা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃতের সাধনা। সেই সাধনার ফল আমরা লাভ করেছি। দেশ আমাদের অবশেষে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়েছে। আজ আমাদের—অতীতের দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে একবার স্মরণ করা উচিত যে বৈপ্লবিক আত্মহুতির সেই দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম শহীদ তরুণ প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

আমি বলেছি যে স্বদেশ প্রেমের তীব্রতাই ছিল এই বিপ্লবী জীবনের প্রধান বিশেষত্ব। প্রফুল্ল যখন স্কুলের ছাত্র তখনই তাঁর মধ্যে এই বিশেষত্ব সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছিল। মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি: সেবার রংপুরে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রফুল্লর প্রবন্ধ প্রথম স্থান অধিকার করে। পারিতোষিক দেওয়া হবে। সভার অধিবেশন হয়েছে। সভাপতিত্ব করছেন সহরের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের খুব খোসামোদ ক'রে চলেন ব'লে

তাঁর একটু দুর্নাম ছিল। যথাসময়ে পারিতোষিক বিতরণের কাজ সুরু হলে প্রথমেই প্রফুল্লর ডাক পড়লো। কিন্তু সভা মঞ্চের ওপর উঠে প্রফুল্ল পারিতোষিক নেবার জন্য সভাপতির দিকে এগিয়ে গেলেন না, দর্শকদের দিকে চেয়ে দৃঢ়স্বরে বল্লেন, সাহেবদের খোসামোদ ক'রে যে দিন কাটার তার হাত থেকে আমি প্রাইজ নেবো না। ব'লেই সভা ছেড়ে তিনি চ'লে গেলেন। এ'তে কেউ তাঁর প্রশংসা করলো, অনেকে নিন্দাও করলো! কিন্তু তাঁর বিবেক তাঁকে কোন পথে নিয়ে চলেছে এই ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া গেল।

প্রফুল্ল স্কুল জীবনেই সহকর্মীদের সঙ্গে মিলে বুক চিরে রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন। রংপুরে তাঁদের বড় একটি দল গড়ে উঠেছিল। শরীর চর্চা, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে দলের অনেকেই বেশ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। প্রফুল্ল নিজে পড়াশুনায়ও খুব ভাল ছিলেন। ক্লাসে তিনি প্রত্যেক বার প্রথম স্থান অধিকার করতেন। ১৯০৭ সালে জাতীয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পাস ক'রে প্রফুল্ল কলকাতায় গেলেন কলেজে পড়তে। কলকাতায় তখন বারীন্দ্র কুমার ঘোষের নেতৃত্বে শক্তিশালী বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছে। এই দলের মুখপত্র হিসাবে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। আরো নানা রকম বৈপ্লবিক সাহিত্য গোপনে প্রকাশিত হচ্ছে; প্রফুল্লর সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ পূর্ব্ব থেকেই ছিল। এখন তিনি প্রত্যক্ষভাবে দলের সদস্য হিসাবে কাজে নামলেন। এবং এর অল্পদিন পরেই তাঁকে বিপ্লবী জীবনের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হোলো।

মাণিকতলার এক বাগান বাড়ীতে তখন বারীন বাবুরা বোমা তৈরীর কাজ সুরু করেছেন। এই বোমাই মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে মারবার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিছু বোমা তৈরার হওয়ার পর—বোমাগুলি কি রকমের হচ্ছে তা পরীক্ষা ক'রে দেখার দরকার হয়। স্থির হয় যে কয়েকটি বোমা দেওঘরের এক জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফাটিয়ে পরীক্ষা করা হবে। চারজন ছেলের ওপর এই পরীক্ষার ভার পড়ে। এঁদের একজন ছিলেন প্রফুল্ল। এঁরা সবাই জানতেন যে এ কাজের মধ্যে বিপদ আছে, এমন কি বোমা ফেটে এঁদের জীবনান্তও হ'তে পারে এবং সে ক্ষেত্রে সাহেব মেরে মরার মধ্যে যে গৌরব ও তৃপ্তি আছে এঁরা তাও পাবেন না। কিন্তু প্রফুল্ল ও তাঁর তিন সঙ্গী তবুও সানন্দে এই কাজের ভার নিয়ে বোমা সমেত দেওঘর গেলেন। নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষা হোলো। কিন্তু পরীক্ষার পর প্রফুল্লকে আর জীবিত পাওয়া গেল না। একটা বোমা বিস্ফোরণের সময় তার একটা টুকরা এসে বিঁধে যায় প্রফুল্লর মাথায়। তিনি অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে যান এবং সেই সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ কেউ সনাক্ত করতে না পারে তার ব্যবস্থা করে সঙ্গীরা কলকাতায় ফিরে আসেন।

এই ঘটনার কথা প্রফুল্লর আত্মীয়দের কাউকে জানানো হয় নি। বাড়ীর সকলে আশা করে ছিলেন প্রফুল্ল ফিরে আসবে। এর কিছুদিন পরে মাণিকতলায় যখন দলের অনেকে ধরা পড়লো আত্মীয়রা আশা করেছিলেন যে এর মধ্যে নিশ্চয় প্রফুল্ল আছে। কিন্তু সে যে আর নেই, সে যে দেশের জন্য চরম ত্যাগ ক'রে ইহলোক থেকে নীরবে বিদায় নিয়েছে সে কথা কেউ জানতে পারেন নি। জেনেছিলেন কেবল পিতা ঈশানচন্দ্র; কিন্তু তিনিও তাঁর বিদীর্ণ হৃদয়ের ব্যথা কাউকে জানান নি। পুত্রের অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের ভার তারই মত নীরবে নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিলেন এবং সারা জীবন সে ভার বহন ক'রে গেছেন।*

* (কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।)

পাথর

শ্রীমতী বিজনলতা দেবী—

এইমাত্র ট্রেণটা ছেড়ে গেলো। রাত বোধহয় বারোটা বেজে গিয়েছে। ষ্টেশনটাতেই যা একটু গোলমাল, চৈ চৈ, আলো। নইলে সারা সহরটাতো একেবারে নিঃসাড় নিঝুম্। দীপাকে ট্রেণে তুলে দিতে এসেছিলো পার্থ-সারথি। শীতের রাত, শাড়ীর উপর পুরুষ বড় লম্বা কোট পরে, দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। মাঝে মাঝে অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো, কে যেন চুপি চুপি কি বলছে। কয়েকবার পর্থ-সারথির কানে গিয়েছিলো, কথার টুকরোগুলো।—'পাথর—পাথর সমস্ত পাথর।' পার্থ হেসে উঠলো শুনতে পেয়ে। কি বক্‌বক্ করছো—? পাথুরে দেশ পাথর থাকবে না।—দীপা গম্ভীর হয়ে গেলো। আর কথা বলে নি। ট্রেণ এখানে মাত্র তিন মিনিট থামবে। সেই তিন মিনিটের মধ্যে দীপার বেডিং বাক্সেট, টিফিন ক্যারিয়ার, 'থার্মো-ফ্লাস্কে' গরম দুধ, সিঙ্গার মেসিন, এমন কি একটা লেডীস্ সাইকেল পর্যন্ত গাড়ীতে তুলে দিতে হবে। কাজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পার্থ সঙ্গে এসেছিলো। প্লাটফরমটা ভারী নীচু। গাড়ীর কামরার পাদানী থেকে কম্‌সে কম্ তিন চার হাত নীচু হবে। পার্থ সাহায্য না করলে দীপা সহজে উঠতেই পারতো না। গাড়ীর ভিতর মালপত্র সব গোছ গাছ করে দিয়ে পার্থ যখন নেমে আসছে, তখন দীপা ফস্ ক'রে তার একটা হাত ধরে ফেল্‌লো। বললো 'চলুন আপনিও কোলকাতায়—!' 'সে কি। আমি কেন যাবো—? আমার এখানে কাজ রয়েছে কত। স্কুল ভালো ভাবে না চললে নিজেকে ছুটী দেব কি করে—!' স্কুল—! ওঃ—!' হাতটা ছেড়ে দিয়ে দীপা সরে গিয়ে গুছিয়ে বসলো।

নেমে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে পার্থ লম্বা টান দিলো। কোটের কলার গুলো কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে বললো—'ভারী আশা ক'রে তোমায় ডেকে-ছিলাম—ভেবেছিলাম আমার স্কুলটা তোমার সাহায্য পেয়ে নিঃসন্দেহ টিকে যাবে। কিন্তু—!' দীপা মাথা দিয়ে কামরার ভিতর থেকে অসহিষ্ণু গলায় বললো—'অসম্ভব। কোনদিন ও স্কুল টিকবে বলে আমার ভরসা নেই। পাথরে কাঁচড় পড়েনা এটা জেনে রাখবেন।'—'থাক্‌গে—চলেই যাচ্ছ যখন—তখন আর কি হবে না হবে, ভেবে কষ্ট পে'ও না। আচ্ছা গুড্ নাইট্—!' টুপীটা তুলে পার্থ মাথাটা একটু নীচু করলো। কামরার ভিতর থেকেই উদাস গম্ভীর গলায় দীপা বললো '—শুভরাত্রি—!' ট্রেণটা তখন চলতে সুরু করেছে।

ফেরবার পথটা পার্থ হেঁটেই ফিরলো। এখানে গাড়ী ঘোড়ার বালাই নেই, যেখানেই যাও যে কোন দরকারেই যাওনা কেন হাঁটতে হবে এক যা পাওয়া যায় তা গরুর গাড়ী। তাও বহুকষ্টে আগে থাকতে বন্দোবস্ত করে রাখলে তবে। আপন মনে নির্জন পথে অন্ধকার রাত্রিতে নিঃশব্দে হেঁটে পথ চলার স্বতন্ত্র একটা দাম আছে বইকি। হরিণধুরুড়ীর পথটা ষ্টেশান থেকে কম্‌সে কম্ তিন মাইল হবে। জুতোর তলায় মস্ মস্ করে কাঁকর মাড়াতে মাড়াতে পার্থ চলতে লাগলো। রাত্রিটা চমৎকার বাস্তবিক। আকাশ ভরা ঝিকিমিকি তারার দল। চাঁদের বালাই নেই। চাঁদ না থাকলে অন্ধকার আকাশের তারাগুলোকে আরও চমৎকার আরও জল্ জলে লাগে। খাড়া পাহাড় দুপাশে, কদাচিৎ দু একটা পত্র বিরল বড় গাছ পথের ধারে। বিস্তৃত মাঠ একধারে ফাঁকা পড়ে আছে। অকেজো—না হয় চাষ আবাদ, না বসতি আছে লোকের। যদি চাষ আবাদ হ'তো—পার্থ স্কুল চালাবার চেষ্টা না করে, চাষের কাজেই তো মন দিতে পারতো। কিন্তু জমিতে তো মাটি নেই। সব যে পাথর। দেশ স্বাধীন হলো—'রিকিউজি' সমস্যায় প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্ট বিব্রত। এই সব ফাঁকা জায়গা কাজে লাগতো তাহলে।

আশ্চর্য রাত্রির মাদকতা। এতটা পথ, একলা হাঁটতে একটুও ক্লান্তি অনুভব করছে না পার্থ। দুবাহু বাড়িয়ে সমস্ত অন্ধকারটা যেন পৃথিবীকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছে। অন্ধকারের স্পর্শ অনুভব করলো পার্থ গালের

উপর। স্বাস্থ্য ভালো করবার পক্ষে জায়গাটার সুনাম আছে। এখানকার জমিদারীর মালিক ছিলেন তার বাবা। উত্তরাধিকারী সূত্রে এখন পার্থই সব ভোগ করছে। অবশ্য এখানকার জমিদারীর কিছু উল্লেখযোগ্য আয় নেই। ব্যাঙ্কে যদি না নগদ টাকা থাকতো, পার্থকে চাকরী করতে হতো নিশ্চয়। সারা জীবন ধরে নানা খেয়ালে কাটিয়ে দেওয়া সহজ হতো না তার। চিরকাল সে পড়ে এসেছে। প্রথমে স্কুল, তারপর কলেজ, কলেজের শেষ কটা ডিগ্রী সংগ্রহ করে, কিছুদিন একটা 'মেকানিক্যাল কার্মে'। তারপর কিছুদিন ল' কলেজ পর্যন্ত তার বাবার কথামত 'য়্যাটেণ্ড' করেছিলো। শেষটা সে ধরে বসেছিলো, ইয়োরোপ যাবে 'এগ্রিকালচার' শিখতে। গিয়েছিলো অবশ্য—তার বাবা তার কোন খেয়ালে কোনদিন বাধা দেন নি। মা মরা পার্থকে হয়তো একটু অতিরিক্তই আদর দিয়ে ফেলেছিলেন। নইলে ইউরোপ থেকে অসমাপ্ত বিদ্যা নিয়ে ফিরে আসতেও ক্ষুণ্ণ হন্ নি। দীপাকে বিয়ে না করায়ও রাগ করেন নি। দীপাকে বিয়ে ক'রে, সে সংসারী হোক এইটাই তার অন্তিম ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু পার্থ রাজী হয়নি। পার্থ ইয়োরোপ থেকে ফেরবার পর তার বাবা কয়েকটা মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন। যে গরীব মাসীর কাছ থেকে দীপাকে পার্থ সারথির বাবা পার্থর জন্যে চেয়ে এনেছিলেন, তার বাবা মারা যাবার পর দীপা আবার সেইখানেই চলে গিয়েছিলো।

পার্থর এতে কোন দোষ নেই। দীপাকে বিয়ে করতে সে প্রস্তুত না থাকলেও, তাকে বাড়ীতে থাকতে দেবেনা, এমন কথা তার মনের কোণেও ছিলো না। দীপা কিন্তু তাকে না জানিয়েই চলে গিয়েছিলো। পার্থ তখন সারাদিন ব্যস্ত থাকতো। নতুন একটা জিনিষ পড়বার ঝোঁক চেপেছিলো তার মাথায়। জ্যোতির্বিদ্যা শেখবার জন্য আকাশের নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার রাত কেটে যেতো। বিলাতী পণ্ডিতদের লেখা এক গাদা বই আনিয়ে ফেলেছিলো লাইব্রেরী ঘরে। দিনের অধিকাংশ লাইব্রেরী ঘরেই কাটতো তখন তার। আর এই লাইব্রেরী ঘরটা ছিলো দীপার দুচক্ষের বিষ। পার্থ মনে মনে হাসতো তার এই রকম ভাব সাব দেখে। একদিন স্পষ্টই বলেছিলো দীপাকে—'এ ঘরে কি আর করবে তুমি!—এখানে 'কেয়ারি টেল্‌স্' নেই। 'ঘরের ধন' 'আবার ঘরের ধনের' সন্ধান পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে এইটের সদ্ব্যবহার করো বরং সেই বেশী ভালো লাগবে।'—পকেট থেকে এককৌটা টফি বার করে দীপার হাতে তুলে দিয়েছিলো পার্থ। দীপা মুখ চোখ লাল করে, কৌটাটা হাতে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, আর আসেনি। তার চার পাঁচ দিন পরে, পার্থ জানতে পারে, দীপা বাড়ীতে নেই।

বিস্ময়কর জগৎ কিন্তু এই নক্ষত্র জগৎটা। চেনবার সুযোগ সকলকে পাওয়া যাক্ চাই না যাক্—অপূর্ব লাগে তাদের সম্বন্ধে জ্ঞানের তথ্য উদ্ঘাটন করতে। কয়েকটা বছর নাওয়া খাওয়া ভুলে এই নিয়েই তো মেতে ছিল সে। এখন অবশ্য সে ঝোঁক নেই. অনেক চেনা নক্ষত্রও ভুলতে বসেছে, তবু নেশাটা এখনও কাটেনি। মাথার উপর কালপুরুষ, ঐ অলজ্বলে ভেনাস্‌টা—ঐ তো। নাঃ—আর খাপছাড়া করে এসব চর্চা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি তার। আবার আরম্ভ করবে, বাড়ীর উঠানে বড় উঁচু বেদী তৈরী করিয়ে বড় 'টেলিস্কোপ' যন্ত্রটাকে বসাবে এবার। আকাশ নিয়ে কৌতুকটা, হঠাৎ একদিনে কমে গিয়েছিলো। বৈবাৎ হাতে এসেছিলো একদিন একখানা মেডিকেল জার্ণাল' সেইটায় মন এমন আকৃষ্ট হয়েছিলো, যে নতুন ক'রে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে পুরোপুরি ডাক্তার হবার সাধনায় অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েকটা বছর দিব্যি কাটিয়ে দিলো। আভাসে তখন যেন কানে এসেছিলো একবার —দীপাও খুব মন দিয়ে পড়ছে। তার গরীব মাসীমা মারা যাওয়ায় সে নাকি একজন ক্রীশ্চান মিশনারী মেম সাহেবের কাছে আশ্রয় পেয়েছে। হয়তো ক্রীশ্চান হয়ে যাবে মেয়েটা এইবার। একথা পার্থর মনে না হয়েছিলো তা নয়, কিন্তু হলোইবা ক্রীশ্চান! তাতে ক্ষতি কি আছে

পার্থের—? জাতি ভেদের সংকীর্ণতা পার্থর মনে কোন-দিন দাগ ফেলেনি

ডাক্তার হয়েছিলো বটে পার্থ সারথি। তবে ডাক্তারী করবার জন্ম নয়। কোনদিন প্র্যাক্‌টিস্ দূরের কথা কাউকে ওষুধ পর্যন্ত সে দিতে যায় নি। সেই সময় দেশে ভারী গোলমাল। আগষ্ট বিপ্লব সুরু হয়ে গিয়েছে। পার্থও সে সময় দেশের ঐ আন্দোলনে গা' বাঁচিয়ে চলেনি। তারও নামটা ঐ সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো বইকি। কি একটা গোলযোগে অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ে, পার্থ জেলে গেলো। জেল ফটকে বহু জনতার 'জয়হিন্দ্' ধ্বনির প্রত্যুত্তরে 'জয়হিন্দ্' বলতে বলতে যখন তারা ভিতরে ঢুকছে, অভিনন্দনের ফুলের মালায় গলা বোঝাই হয়ে উঠেছে সবার। তখন হঠাৎ চোখে পড়েছিলো পার্থর—দীপা আশ্চর্য দীপা দাঁড়িয়ে আছে, তারই কিছুটা দূরে ভিড়ের ভিতর। আর্ত বুঢ় চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছে সে।—অজান্‌তে কখন যে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে গালের উপর, হয়তো টেরও পায়নি মেয়েটা। কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল পার্থ দীপাকে—কিন্তু সুবিধে হয়নি। তখুনি তাদের জেলের ভিতর ঢুকে পড়তে হয়েছিলো।

কয়েকটা বছর জেলের ভিতর কাটলো। তখন সময় কাটতো 'ক্লাসফির' মোটা মোটা বইগুলি নিয়ে। মাঝে মাঝে মনে পড়তো—জেল ফটকের কাছে দীপার বুঢ় আর্ত দৃষ্টি—চোখের জল। অবাক্ লাগতো ভাবতে গেলে কে জানে দীপা কেন এসেছিলো সেখানে। জেল থেকে যখন বাইরে আসতে পেলো পার্থ, তখন দেশ স্বাধীন হয়েছে; পাকিস্তানরূপ চমৎকার একটা স্বপ্নে গড়া সাম্রাজ্যও রূপ ধারণ করেছে। পার্থর অটুট স্বাস্থ্যে অনেক অপচয় হয়ে গেছে। শরীরের মধ্যে অনেক রোগের বাসা। দাঁত বেদনা দিতে সুরু করেছে, কপালের চামড়ায় রেখা পড়েছে। মাথার অমন ঘনো চুলও শিথিল মূল হয়ে উঠে গিয়ে গিয়ে, ছোট্ট একটু টাক দেখা দিয়েছে কপালের দুপাশ দিয়ে। তা বয়েসও হয়েছে বইকি পার্থের—চল্লিশ হতে আর বাকিই বা কতদিন। সেই সময় পার্থ মনস্থির করলো, এবার সে দেশের কাজ করবে। প্রথমতঃ নিরক্ষরতা দূর করা, দ্বিতীয়তঃ আহার বাসস্থানের সমস্যা মেটানো। প্রথমটা নিয়েই তো এখন তার চেষ্টা চলছে দ্বিতীয়টা এখনও চোখে দেখা হয়নি। হরিণ খুরডাঙাতে তার বাবার একটা বাড়ী ছিলো বড় গোছের। সেই বাড়ীতেই তো আজকাল পার্থ এসে বাস করছে। প্রথমটা অবশ্য নিজের নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় সে এখানে এসেছিলো, এখন কিন্তু এইখানেই স্কুল খুলেছে। অবৈতনিক স্কুল। স্কুল তাকে জোর করে বলা হয়, নইলে তাকে পাঠশালা বলাই সঙ্গত হয়। রামখড়ি দিয়ে অ' আ' দাগ বুলানো আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ানো, এইতো মাত্র আরম্ভ হয়েছে সেখানে। মুস্কিল এই যে ছেলেরা কেউ আসতে চায় না। যদিও পড়তে মাইনে লাগবে না। আর বই, শ্লেট, বিনামূল্যে পাওয়া যাবে, বলে তাদের গুরুজনদের ছেলে পাঠাতে আপত্তি নেই। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ছেলেদের নিয়ম মত হাজিরা দেবার অভ্যাস নেই। খুশীমতো সময়ে তারা আসে অথবা আসে না। মাঠে মাঠে খেলাধূলা ফেলে, অধিকাংশই পাঠশালায় এসে রাম খড়ি দিয়ে দাগা বুলোতে নারাজ। কিন্তু গভীর ধৈর্যের সঙ্গে পার্থ চেষ্টা করছে, হাল ছেড়ে দেয় নি। প্রচুর পুরস্কার দিয়ে ছেলেদের মনে লোভ জাগাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবাই যেন কেমন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে বলে তার বিশ্বাস। পুরস্কার পেলে খুব খুশী মনেই তারা সেটা গ্রহণ করে বটে, কিন্তু পরের বছর ঐ 'গুড্ র‍্যাটনডেন্স্' এর প্রাইজ পাবার জন্ম কোন উৎসাহ সেই সব ছেলেদের মধ্যে দেখা যায় না। এত প্রাইজ পেয়েও তাদের মনে স্কুলের উপর এতটুকুও মোহ জেগেছে এও মনে হয় না পার্থ সারথির। নাঃ—দীপা অকারণে বলেনি যে 'পাথরে দাগ কাটা অত সহজ নয়।'—স্কুল বাড়ীর সাইন বোর্ডটা দেখা যায়। নিয়মিত ঘণ্টা বাজে। ক্লাসের দরজা খুলে মাষ্টার প্রতিদিন উপস্থিত থাকেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের চুলের টিকিরও দেখা পাওয়া যায় না। লজ্জার কথা তাতে

সন্দেহ নেই, তবু পার্থকেও ছেলেদের ঘরে আনবার জন্ত বহুবার মাঠে মাঠে ঘুরতে হয়েছে বই কি।

অবশেষে দীপাকে দরকার হলো পার্থর। দীপার এই একটা মস্তগুণ যে পার্থ-সারথি তাকে যখনই ডেকেছে, যে কাজেই ডেকেছে, সে চট করে না বলতে পারেনা। বরং পার্থর কাজ করতে তার যেন একটু উৎসাহই আছে বলে তার মনে হয়। কিন্তু দীপা চলে গেলো, এবং রাগ করেই চলে গেলো বলে মনে হয়। যাবার সময় পর্যন্ত বিড় বিড় করে বলতে বলতে গেলো, 'পাথর —সমস্ত পাথর—' হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে পার্থ সামলে নিলো। মস্তবড় একটা পাথর পথের উপর। কতকাল ধরে এই পাথরটা পথের উপর রয়েছে কে জানে। টর্চ জ্বেলে পথটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিলো পার্থের। এই পাথরটা দেখেইতো প্রথম দীপা বলেছিলো—যে দেশের লোকেরা অসংখ্য বার হোঁচট খেয়েও পথের পাথরটাকে তুলে ফেলেনি, তারা নিজেরাই পাথর। পাথরে আঁচড় কাটা অত সহজ নয়। সারাপথ কত কি তোলপাড় করতে করতে পার্থ যখন নিজের ডেরায় পৌঁছালো তখন একটা বেজে গিয়েছে। দুটো হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে, চাকর দারোয়ান নিয়ে তাকে খুঁজতে যাবার উদ্যোগ করছে। এত দেরী হলো আজ হাঁটতে তার? আশ্চার্য তো! অথচ ষ্টেশন থেকে হরিণধুবড়ীর সোজা একটানা রাস্তাটা সে বরাবর পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পার হয়েছে। চাকর দারোয়ানের এতটা মনিব প্রীতি পার্থকে অবাক্ করে দিলো। উনচল্লিশ বছর বয়সের জীবনে এটা একটা অভিনব ঘটনা বইকি তার। অবশ্য পার্থ এও বুঝতে পারছিলো এর সবটাই তাদের নিজস্ব মনিব প্রীতির পরিচয় নয়। বরং সবটাই দীপার এই কয়েক সপ্তাহের আদেশ উপদেশ ও অজস্র বকুনির ফল। নইলে এই শীতের রাতে, বিজন অন্ধকারে, সর্পভীতি সমাকুল পথে চাকর দারোয়ানরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের নীরিহ মনিবকে খুঁজতে বের হবে, এ কেউ আশা করে না। ঘরের ভিতর তার মশারি ফেলা খাটে বিছানা পাতা। একপাশে টেবিলের উপর খাবার ঢাকা দেওয়া, বরাবর যেমন থাকে। কিন্তু এত রাতে খাওয়ার চাইতে না খাওয়াই ভালো। পার্থ খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যেতে বলে জামা কাপড় ছাড়তে লাগলো। চাকরটা খাবার গুলো সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় নজর পড়লো পার্থের; অধিকাংশ খাবারই তার চাকরদের তৈরী নয়। এগুলি দীপার স্বহস্ত প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন। বরাবর মিষ্টি খাবারটা পার্থ ভারী ভালোবাসে বলে এ কয় সপ্তাহই দীপা তার জন্তে খাবার তৈরী করতো। কালই আবার স্কুলের জন্ত মাষ্টারের চেষ্টা করতে হবে পার্থকে। যতদিন না পাওয়া যায় পার্থকে নিজেকেই কাজ চালাতে হবে। ছোটদের অ আ পড়াবার ধৈর্য পার্থর নেই, এই তো হয়েছে—মুস্কিল কিনা। বিছানায় শুয়ে পড়ে লেপটা কান অবধি টেনে নিতে নিতে পার্থর মাথায় চমৎকার একটা ফন্দি গজিয়ে উঠলো। দীপা!—দীপাকেই যদি স্কুলটার মালিক করে দেওয়া যায়, স্কুলটা হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে তাহলে। ধরো– পার্থ যদি এখন লেখে –ভাবিয়া দেখিলাম, স্কুল লইয়া আমার মূল্যবান সময়কে অপচয় হইতে দেওয়া বুদ্ধিমানের পরিচয় নহে। আমার আকাশ জোড়া নক্ষত্র জগতের পরিচয় লওয়া হয় নাই। আধ খাপছাড়া করিয়া তাহার চর্চা বন্ধ করিয়াছি। তুমি যদি দয়া করিয়া ভার লও—আমি অনায়াসে ইত্যাদি—ইত্যাদি—। এ চিঠির দীপা অমর্যাদা করতে পারবে বলে মনে হয় না পার্থের। তার সামান্ততম কাজ করতে পেলে, দীপা বেঁচে যায়। নিশ্চয় সে চলে আসবে। বারবার করে ভাবতে ভাবতে পার্থের মনটা খুসী হয়ে উঠলো। শীতের রাতেও সে নরম লেপের মায়া কাটিয়ে রাত কাপড় পরেই উঠে পড়লো। ঘরের কোনে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা রাখা ছিলো টেবিলের উপর; লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে তার শিখাটাকে উজ্জ্বল করে দিয়ে, পার্থ চিঠি লিখতে লাগলো। চিঠি লেখা শেষ করে, চিঠিখানা খামের মধ্যে পুরে, ঠিকানা পর্যন্ত লিখে রাখলো পার্থ। কালকেই ভোরে উঠে নিজের হাতে চিঠিখানা পোষ্ট করে আসবে পার্থ। কিন্তু দীপা থাকতে

থাকতে যদি এ মতলবটা তার মাথায় আসতো—কি ভুলই হয়ে গেলো। কিংবা যদি দীপার—অনুরোধে দীপার সঙ্গেই সে ট্রেণে উঠে পড়তো, তাহলে মতলবটা মাথায় আসামাত্র চেন টেনে ট্রেণ থামিয়ে দীপাকে নিয়ে নেমে পড়তো। অবশ্য তার জন্যে ট্রেণ কোম্পানীকে কিছু টাকা ক্ষতি পূরণ দিতে হতো বটে, কিন্তু ব্যাপারটাতো সহজ উপায়ে চলতো এতদিন। পার্থসারথি এটা লক্ষ্য করেছিলো, দীপার একটা সহজ নৈপুণ্য আছে। দুনো ছাত্রের দল বেশ ক'দিন নিয়মিত হাজিরা দিয়েছিলো। দীপা যতদিন স্কুলের মাষ্টারী করেছিলো, এমন কোনদিন হয়নি যেদিন খালি স্কুলবাড়ী খাঁ খাঁ করছে। পার্থকে ছেলে ধরার জন্য মাঠে মাঠে খুঁজতে হয়েছে। যাকগে—কি আর হবে। দীপার চিঠি পাওয়া আর পাবার পর দিন দুই তাকে ভাবতে সময় দিলে অন্ততঃ দুটা কি সাতটা দিন পার্থকে স্কুল নিয়ে একটু ভুগতে হবে বটে। কিন্তু দীপা একবার এসে পড়লে—এবং দীপা আসবেই স্কুলটাই যখন তার নিজের হয়ে যাচ্ছে। নামটা পর্যন্ত বদলে দেওয়া হবে স্কুলের—দীপিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়—নামটা বেশ শোনাবে। না—দীপা আসবে না এমন কোন মতেই হওয়া সম্ভব

পার্থের ডাকে সে প্রত্যেকবার সাড়া দিয়েছে। এমন কি সে যখন আগষ্ট আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলো তখন তো দীপাও পুরোপুরি স্বদেশী আনা ধরেছিলো। খদ্দরের শাড়ী ব্লাউজ ছাড়া তার পরিচ্ছদে কোন বিলাসিতা ছিলো না তখন। অথচ সে খদ্দর পরুক—এমন অনুরোধ পার্থ কোনদিন করেনি দীপাকে। কিন্তু দেখতো ভারী ভুল হয়ে গেলো, দীপা থাকতে থাকতে এইসব মতলব তার মাথায় আসেনি কেন? এখন চিঠি কবে যাবে কবে দীপা আসবে! কবে এর উত্তর পাওয়া যাবে—? ভারী অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলো পার্থ। খানিকটা বিছানায় এপাশ ওপাশ করে, সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখলো। যেন এই স্কুলটা বিরাট এক বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। কতবড় বাড়ী—কত অসংখ্য বিভাগ। কত ছাত্র-ছাত্রী। পার্থ সারথি নিজেও একজন, বিখ্যাত প্রফেসার সেখানকার। তার সামনে ফিলসফির মোটা বই খুলে পড়া জেনে নিচ্ছে যে মেয়েটি সে দীপা। দীপার মুখে কথা নেই। অপলক দৃষ্টিতে সে পার্থ সারথির মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই আর্তযুঢ় দুই তার চোখে, দু ফোটা জল কখন অজান্তে গালের উপর গড়িয়ে পড়েছে, সে মুছে ফেলেনি। ঘুম ভাঙতেই পার্থের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে ভারী হাসী পেতে লাগলো। দীপা পড়বে ফিলসফি! এ শুধু স্বপ্নেই দেখা সম্ভব। সাল তারিখে দেওয়া নভেল পর্যন্ত দৈবাৎ তার হাতে এলে, সে ছুম ক'রে বইখানা ফেলে দেয়। তার বারণা সাল তারিখ দেওয়া থাকলেই সেটা হয় ইতিহাস। আর ইতিহাস মাত্রেই তার দুচক্ষের বিষ। ঘুম ভেঙ্গে উঠে পার্থ চা খাওয়া শেষ করে, নিজের হাতে চিঠিখানা ডাকে দিয়ে এলো।

সেদিন দিনটা ভারী মেঘলা করেছিলো। দীপাকে চিঠি পাঠাবার পর কয়েকটা সপ্তাহই কেটে গেছে। বুড়ো গোছের একজন মাষ্টার পাওয়া গিয়েছিলো। তারই উপর ছেলে পড়ানোর ভার দিয়ে পার্থ কোলের উপর মোটা একখানা ফিলসফির বই টেনে নিয়ে পায়ের উপর শালচাপা দিয়ে বেশ আরামেই আরাম চেয়ারে বসেছিলো। মাঝে মাঝে পাশের টীপয়ে রাখা ধূমায়মান চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলো। কিন্তু শান্তিভঙ্গ করলেন মাষ্টার মশায়। বেদম হয়ে কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকলেন। মিনিট তিনচার পর বিষম কাশি কাশবার পর দম টেনে নিতে নিতে তিনি বললেন—ছেলেরা তো কেউ এলো না। স্কুল কি আজকাল বন্ধ ক'রে দেবো তার—? বারটা বাজতে চললো।—সে কি! বন্ধ করে দেবেন কেন—? কারণ না দেখিয়ে কি স্কুল বন্ধ হয় কখন? অবাক হয়ে পার্থ মুখ তুললো। মাষ্টার মশায় বললেন কারণ? কারণ আর কি! ছেলেরা একজনও আসেনি, খালি ঘর খুলে রেখে কোনও তো লাভ নেই। কেউ আসেনি—? তেওয়ারী বাবু ডেকে আনুক। মাষ্টার বললেন তারা কেউ আসতে চাইছে না তার ঐতো ঐ মাঠটায় বল খেলছে তার। সেদিন আপনি

স্কুলের জন্য যে ফুটবলটা এনে দিয়েছেন, সেই টাই কখন সরিয়ে নিয়ে গেছে যে। না, না, তাহলে মাসের আর্দ্ধেকদিনের উপর যদি শুধু এই কারণেই স্কুল বন্ধ থাকে, তাহলে জন্মের মত বন্ধ হতে আর কত দেরী হবে? প্রাথমিক প্রচেষ্টাই তো সবচেয়ে শক্ত জিনিষ। এত সহজে হাল ছাড়লে হবে কেন? পার্থ বললো—আপনি যান—আমি নিজেই যাচ্ছি ছেলেদের ডেকে আনতে। স্কুল বন্ধ হবে না। যথারীতি তার কাজ চালান গিয়ে। বইখানা কোল থেকে নামিয়ে রেখে, ওভার কোটটা গায়ে লাগিয়ে নিয়ে পার্থকেই বাড়ীর বাইরে যেতে হলো। সামনের মাঠেই ছেলের দল হল্লা করে খেলছে দেখা গেলো। বাড়ীর কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে হাক দিলেও তাদের শুনতে পাবার কথা। কিন্তু হাঁক দিয়ে ডাকায় কোন লাভ নেই। মুহূর্তে যে যেদিক পারবে ছুটে পালিয়ে যাবে। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে ধরে আনবার জন্যই তাই পার্থ পা বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু বাড়ীর সামনেই তার গতি রোধ করে, ডাকপিয়ন তার হাতে একটা চিঠি দিলো। নিশ্চয়ই দীপা লিখেছে। হাতের লেখাটা তো তারই মনে হয়। আসছে হয়তো হয়তো আজকালের মধ্যে—তাড়াতাড়ি করে পার্থ চিঠিটা খুলে ফেললো। দীপাই চিঠি লিখেছে। দীপা লিখছে—

পূজনীয় মহাশয়,

আপনার চিঠি পাইয়াছি। বহুদিন আমা হইতে—নিঃসংশয়ে আপনার মনের মতো হইবার সাধনায় আমি জীবনের বহু মূল্যবান সময়গুলি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। হয়তো আপনার মনের মতো হইতে পারিলে আপনার জ্ঞানের তপস্যায় সঙ্গিনী হইতে পারিবো, এই আশা আমায় শিশুকাল হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছে। কিন্তু আজ সে মোহ হইতে আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি। আপনার হরিণ খুবড়ীর বাড়ীতে কয়েক সপ্তাহ বাস করিয়া আমার মনের কুয়াশা কাটিয়া গিয়াছে। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছি। আমি চলিয়া আসিবার সময় নিঃসন্দেহ বুঝিয়া আসিয়াছি আপনি পাথর। যুগ যুগ ধরিয়া যাহা একই জায়গায় অটল অনড় হইয়া কাটায়, সেই পাথরের পরিচয় আপনার ভিতর সুস্পষ্ট পাইয়া আসিলাম। বহু দুঃখের পরে, বহু অশ্রু সাগর উত্তীর্ণ হইয়া আজ আমার নব জন্ম হইলো। আপনার সিদ্ধান্তের জন্য বহু ধন্যবাদ। আজ আর আমার আপনার ডাকে সাড়া দিবার মতো মনের নাই—ইচ্ছাও নাই। আমি Indian foreign serviceএ একটা চাকরী পাইয়াছি। হয়তো ভাবিতেছেন, মূর্খ দীপা—ম্যাট্রিক মাত্র পাশ, তাহার এ ধরণের চাকরী পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু মিশনারী মেমসাহেবের দয়ায় কয়েকটা বৈদেশিক ভাষায় আমি অভিজ্ঞ হইয়াছিলাম, এ চাকরী তিনিই জুটাইয়া দিয়াছেন। এ চিঠি আপনি যখন পাইবেন তাহার দুই দিন আগে আমি আমার নতুন তিন প্রদেশীয় মনিবের সহিত আকাশ পথে ইউরোপ রওনা হইয়া গিয়াছি। প্রণাম লইবেন, ও মার্জনা করিবেন। পাথর ও প্রস্তরীভূত মানুষ আমি পছন্দ করি না। আমি বাংলার মেয়ে, আমার সজীব সবুজ প্রাণের স্পর্শের একান্ত প্রয়োজন ছিলো।

নিবেদন ইতি দীপা।

চিঠি পড়ে—পার্থ প্রথমটা চিঠিখানা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে গেলো। তারপর কি মনে করে সেটাকে পকেটেই পুরে ফেললো। ছেলেদের কোলাহল কানে আসছে তখনও—। নাঃ—ওদের আনন্দে বাধা দিয়ে কাজ নেই। খেলছে খেলুক ওরা—আজ স্কুল ছুটী দিয়ে দিক মাষ্টার। ফেরবার পথটায় লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলতে চলতে পার্থ মনে মনে বলতে লাগলো—আজ লোকজন লাগিয়ে পথের উপরকার ঐ পাথরের চাঁইটা সরাতে হবে। বাস্তবিক পাথরটা ভারী অসুবিধে করেছে সকলের। আজই ওটাকে সরাতে হবে।

বিপদের মুখে ভারতীয় আদর্শবাদ

রঞ্জন কুমার দত্ত

ভারতবর্ষ যে ইতিমধ্যেই সর্বনাশের পথে পা পেতেছে সে বিষয়ে আর দ্বিধা করবার কিছু নেই। মানুষের স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য তার শক্তিকে অতিক্রম কোরে গেছে। সংযম নেই, সাম্য নেই, নেই ন্যায়, বিবেক, নেই ধর্ম, বিনয়। অসন্তোষ ও উচ্ছৃংখলতার চরম। তাই জ্বালা ও দুঃখও তীব্রতম হয়ে উঠেছে।

মুক্তি পেয়েছে দেশ, কিন্তু শান্তি পায় নি। না পাবার হেতুও আছে। কল্যাণের পথে, শান্তি ও শুদ্ধ গণতন্ত্রের পথে গান্ধীজী আমাদের পরিচালিত করতে জীবনব্যাপি চেষ্টা করেছিলেন, সে পথে কতটুকু আমরা তাঁর সাথে অগ্রসর হতে পেরেছিলাম আজ তা খুব সত্য কোরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেবল যে প্রবঞ্চনা করেছি তাঁকে অর্থাৎ মিথ্যাচার করেছি তাঁর সাথে, সজ্ঞানে ও অজ্ঞানেতে এরই প্রমাণ আজ লোকের আচরণে মূর্ত হয়ে উঠেছে। মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতা, অপ্রেম, ঈর্ষা ও বর্বর মনোবৃত্তি আমাদের চতুর্দিকে পাহাড়-প্রমাণ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে সত্য অর্থাৎ ধর্ম আজ পদে পদে লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত ও অবমানিত, এ অবস্থায় শান্তির কামনা অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা মাত্র। প্রত্যেক শান্তিকামীর নিজের জীবনেই তো সদাচার ও নম্রতা আবশ্যক। তবে না অপরের কাছেও তদনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা চলে? কিন্তু এটারই আজ একান্ত অভাব। 'স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে' একথা কেবল আমাদের কবিগুরুই বলেন নি, আরও বহু মনীষী যুগে যুগে এসে বলে গেছেন। আমাদের চৈতন্য হয় না। হতভাগ্য আমরা!

"বিক্ষোভ কেন"?

স্বার্থে অসংযম, তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :—

"স্বার্থ যতো পূর্ণ হয়, লোভ-হুতাশন
ততো তার বেড়ে ওঠে বিশ্বধরাতল
আপনার শান্ত বলি'না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।"

'নৈবেদ্য'

বস্তুত স্বার্থের সংঘর্ষই আজ অসন্তোষ ও বিক্ষোভের মৌলিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণও একটা এবং সেটা একটা বড় সমস্যার বিষয় আছে। কিন্তু সে কারণের জন্য দায়ী কে, আর কে নয়—এ বিচার কে করবে? আর এই হেতুও তো আজকার নয়।

চিন্তায় মানুষ গঠন করে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যেরূপ চিন্তা করেন দেশ সেইরূপই সত্তা লাভ করে। কেন না জনসাধারণ সমাজের চিন্তাশীলদের ইঙ্গিত ও আচরণকেই অনুসরণ কোরে চলে। এখন এই চিন্তায় যদি অকল্যাণ বা অসংযম প্রবেশ করে অর্থাৎ পাপস্পর্শ ঘটে তবে তো গণবিক্ষোভ, গণ-অশান্তি অবশ্যম্ভাবী। এর নিবৃত্তি-সাধন হিংসাশ্রিত পথে নয়, ধর্ম ও কল্যাণাশ্রিত পথেই তা সম্ভব। এই আমরা বিশ্বাস করি। জনসাধারণকেও এতেই বিশ্বাস রাখতে বলি। বিশ্বকবি মনীষী রবীন্দ্রনাথও সেই উক্তিই দৃঢ়তার সাথে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এ তাঁর আপন হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি থেকে বলা হলেও আমাদের সকলের মনের কথাই, গণমনের কথাই তিনি বলেছেন,—এই ইঙ্গিত অসংযত-চিত্তের বাতুলতা বা চপলতা নয়, আমাদের এই ভারতের দারিদ্র-প্রপীড়িত জনগণের মনে সত্যিকার 'চাওয়া'কে তিনি কত সুন্দর বলিষ্ঠ ছন্দে গেথে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন—

"যাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লহো যতো লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব সভ্যতা, হে নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী,
যাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়া-রাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহা তত্ত্বগুলি। পাষাণ পিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব,
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,

বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন।"

"চৈতালি"

স্বাধীনতার অর্থ হওয়া উচিত গণতন্ত্র, স্বৈরাচার বা যথেচ্ছাচার নয়। স্বাধীনতার নামে আজ যা এদেশে চলছে অর্থাৎ যেসব ধ্বংসমূলক ও হিংসাত্মক ইতর কার্যকলাপ সাম্যবাদ বা অন্য কোন শোভনীয় বাদের বোতাই বা নামে স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা উদ্ভাবিত, প্ররোচিত ও অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে তো জঘন্য গুণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়। সে-সব কোনো স্বাধীন সভ্য দেশের, বিশেষত, গান্ধী-রবীন্দ্র নাথের ভারতবর্ষের মতো দেশের নাগরীকের যোগ্য কর্ম নয়। বুদ্ধ-চৈতন্য-বিবেকানন্দের ভারত ধর্মবর্জিত পাশ্চাত্যের রাজনীতি গ্রহণ করতে পারে না। পাশ্চাত্যের রাজনীতি আজ পৃথিবীতে অচল, ব্যর্থতা স্বীকার কোরে ভারতের দিকে তারাই তাকিয়ে আছে—পথ-প্রাপ্তির আশায়। সাম্যবাদ বা অন্য যে কোনো বাদের গর্ব করার মতো কিছু নেই। মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে রাশিয়ার সাম্যবাদ অনেক কিছু করতে চেষ্টা করেছে, জবরদস্তি ও নিষ্ঠুরতার চরমে গিয়েও তাকে হার মানতেই হয়েছে। তাকে মনুষ্য প্রকৃতির ছন্নমুক্তির কাছে নত হতে হয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্যবাদ ধর্মকে বা সত্যকে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি থেকে বিতাড়িত করার প্রচণ্ড চেষ্টা করেছিল এককালে। আর সেই উদ্দেশ্যে সাম্যবাদের সমর্থকেরা ধর্মপ্রাণ সদাচারী ব্যক্তিদের ওপর যে ভয়ংকর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর পীড়ন চালিয়েছিল তার তুলনা হয় না ইতিহাসে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে চিরতরে নির্বাসিত করার দানবিক চেষ্টা হয়েছিল। রুচি ও প্রকৃতিতে ধর্মের কোনো মর্যাদা বা স্থান ছিলনা। ধর্মস্থানগুলি, মন্দির ও মসজিদ ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তি ষ্টেটের নামে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম বা সদাচার শিক্ষাদান বন্ধ কোরে দেওয়া হয়েছিল। ধর্মকে ব্যঙ্গচিত্রের সাহায্যে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত করার চেষ্টাও হয়। কিন্তু ধর্মকে নির্মূল করতে পারা দূরে থাক সেখানে আরও দৃঢ়ভাবে স্থান কোরে নিতে পেরেছে। তথাকথিত জবরদস্তিমূলক সাম্যবাদকে প্রকৃতির কাছে, সত্য ও ধর্মের কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়েছে। না কোরে উপায় ছিল কি? ধর্মহীন রাজনীতি, ধর্মহীন অর্থনীতি, ধর্মহীন সমাজনীতি উষর শুষ্ক মরুভূমি-সদৃশ। ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের যেখানেই চেষ্টা করা হয়েছে তা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়েছে আমাদের ধারণায়, এবং ধর্মকেই আরো বেশী কোরে আশ্রয় করতে হয়েছে তাদের।

ষ্টেটই যদি সর্বস্ব হয় তবে তো ষ্টেটই ভগবান। ষ্টেটের কাছেই 'সর্বস্ব' সমর্পন করতে বলা হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা অর্থাৎ আর্য সভ্যতাও তো ধর্মকেই অর্থাৎ সত্যকেই, ঈশ্বরকেই সর্বস্ব জ্ঞানে পূজা কোরে এসেছে। তবে তফাৎটা কোথায়? এখন সেই কথাতেই আসি।

ভারতীয় সাম্যবাদ সর্বপুরাতন, ন্যায় ও ধর্মভিত্তিক অর্থাৎ সত্যের উপর, ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সদ্ধর্ম-বুদ্ধিজাত। এবং এমন পূর্ণাবয়বী সমাজ ও ধর্মবিজ্ঞান জগতে আর কোনো দেশেই রচিত, আবৃত ও আচরিত হয় নি। এর চাইতে শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদ পৃথিবীতে যে নেই একথা নিশ্চয়পূর্বক বলা চলে এবং হতে পারে না এও নিঃসংশয়ে বলা চলে। ধর্মবর্জিত বা নীতিবর্জিত ষ্টেটের জবর-শাসনের নিকট ব্যক্তিস্বাধীনতা যে অচল, সেখানে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেউই যে নিজের নয়, নিজেরই মতো সকলেই যে ষ্টেট-দানবের, নিজের রুচি, নিজের তৃপ্তি, নিজের খুশী বোলে যে কিছু নেই, ষ্টেট দানবের ইচ্ছার কাছে তার সমস্ত কিছুকেই যে সঁপে দিতে হবে এই ধারণাটা আজো কেন ভারতবাসীর, গান্ধী রবীন্দ্রনাথের দেশবাসীর কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে তা বুঝতে অক্ষম; এটা নয় ওটা নয়, এখন নয় তখন নয়—এ চলবে না, ঘাড়ে ধরে নিয়ে যন্ত্রের মতো খাটাবে, বাঁচো আর মরো, ষ্টেট তার বুক সম্পূর্ণ রূপে আদায় কোরে নেবে। না পার নির্বাসন বা অন্ধকার কারাপ্রাচীরে পচিয়ে মারা হবে ন্যায় কি, বিবেক কি, হৃদয় কি, ধর্ম কি এ ভাবনা ষ্টেট-

মানবের নেই ষ্টেট-দানবের কথা, আমিই সব, আমি ছাড়া কিছুই নেই জগতে, তোমরা সকলেই আমারই হুকুমে চলো, আমারই আশ্রয়ে আছ। অতএব আমারই সেবায় তোমাদের সর্বস্ব অর্পণ করা। আমার ওপরে কেউ নেই, ধর্ম, ন্যায়, নীতি, না হৃদয়, না স্বাধীনতা। অতএব আমিই অর্থাৎ ষ্টেটই ধর্ম, ষ্টেটই ঈশ্বর! আমাকে যদি না মানো, তবে তোমার ছায়া পর্যন্ত এ পৃথিবীতে মুক্ত থাকতে পারবে না। আমার রাজ্যে তোমার শেষ আশ্রয় কারাগার কিম্বা ফাঁসিমঞ্চ।

আর যারা এতাদৃশ সাম্যবাদ বা ঐ জাতীয় কোনো বাদের নামে 'ভিন্নীকা লাড্ডু'র পেছনে দিশেহারা হ'য়ে ছুটছে তাদেরকে অদূর ভবিষ্যতেই এমনভাবে পস্তাতে হবে যে তার কোনো সান্ত্বনা তারা খুঁজে পাবে না।

ষ্টেটবাদ বা তথাকথিত পাশ্চাত্যের সাম্যবাদ আজ যত নানা আকর্ষণীর ভাষায় বহুমুখে প্রচার করছে, ভারতবাসীর কাছে নতুন কিছু নয়। কেন না ভারতীয় সাম্যবাদ বা সমাজবাদ যে-ধর্মশাস্ত্র ও বিজ্ঞান গ্রন্থের মূল নীতিতে আশ্রয় কোরে গড়ে উঠেছে সেই বেদ সেই গীতা-উপনিষদ তার বহু শত বর্ষ পূর্বে যে সব উক্তি করেছেন, এসব তারই আংশিক বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিধ্বনি মাত্র পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির কাছে নতুন বটে। তাই অপরিণত ও অপরীক্ষিত বুদ্ধি-প্রসূত; তাই অসম্পূর্ণাঙ্গ ও ব্যভিচারাশ্রিত, তাই দম্ভ ও দানবীয় যথেচ্ছাচারিতা যতটুকু পাশ্চাত্যবাসী গ্রহণ করতে চাইছে ঠিক ততটুকুতে মুক্তি ও শান্তি নেই। সদ্ভাব, প্রেম, ন্যায় ও নম্রতা যা মানব মনের মুক্তি ও শান্তির মূলীভূত কারণ, ঠিক সেই সম্বলটুকুই পাশ্চাত্য সভ্যতাবাদী রাষ্ট্র ও দলগুলি বর্জন করেছে আসুরী সম্পদের অধিকার বলে তারা শান্তি ও মুক্তির কামনা করে। একে দুর্মতি ও দুরাশাই বলতে পারি কেন না, আসুরী সম্পদই মানুষের সকল বিনাশের মৌলিক উপাদান। শুনুন।

"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্॥
দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।"

[গীতা ৪-৫, ১৩]

অর্থাৎ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান এই-ই আসুরী সম্পদ। হে পার্থ! এ-ই বন্ধন ও দুঃখের হেতু! মুক্তি তথা শান্তি দৈবী সম্পদের অধিকারিত্বে। ভগবানের এই উক্তিতে অর্জুন কতক শংকার ভাব প্রকাশ করেন নিজের স্বভাব সম্পর্কেই তাঁর শংকা। তখন ভগবান তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন—

"মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব!"

অর্থাৎ হে পাণ্ডব, তুমি অনুশোচনা কোরো না, তুমি তো দৈবী সম্পদ নিয়েই জন্মেছ।

ভগবান তখন আসুরী সম্পদে সম্পন্ন উচ্ছৃংখলাচারীদের সম্পর্কে অর্জুনকে যে-কথা বলেন, আজ যারা আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমিতে অশান্তি ও দুঃখের কারণ সৃষ্টিতে প্রয়াসী এবং যে অগণিত জনসাধারণ তাদের তাণ্ডতায় প্রতারিত হ'য়ে, তারা গাছের যে ডালের ওপর আশ্রয় কোরে আছে তারই মূল কর্তন করতে উদ্যত হয়েছে তাদের নিজেদের চরিত্র বিশ্লেষণ কোরে দেখার নিমিত্ত, তা এখানে উদ্ধৃত করছি :—

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চজনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপস্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেক চিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ।"

[গীতা ৭—১৩, ১৬]

অর্থাৎ আসুরিক বৃত্তি-সম্পন্ন লোকের করণীয় অকরণীয়ের জ্ঞান থাকে না, শুদ্ধি, সদাচার ও সত্যের বিচারও তাদের নেই, তাদের কথা,—জগৎ মিথ্যা, জগতের কোনো অন্যায় আশ্রয় নেই, জগৎ ঈশ্বর শূন্য। সৃষ্টি স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক-জাত, অতএব কাম ভোগ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য জগতে স্বীকার্য নয়। উগ্রকর্মা মন্দমতি অসদাচারী মানুষের এতাদৃশ দুরাগ্রহ তাদের জগতের শত্রু কোরে তোলে, তাদের দ্বারা জগতের সর্বনাশ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? দু-পুর কামনাশ্রিত হয়ে দম্ভ, মান ও মদে অন্ধ হয়ে অশুভ সংকল্পে মন্দক্রিয় সাধনে প্রবৃত্ত হয়। 'ভোগেই সর্বস্ব' এইরূপ বিশ্বাসে তারা শত আশা-পাশে বন্ধনগ্রস্ত হয়। কাম ও বিষয় ভোগে তৃপ্তিলাভের জন্য অন্যায় পূর্বক অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্খায় তারা ঘাতে আজ এটা পেয়েছি, এই মনোরথ সিদ্ধ হল, এত আছে, এতো আরো ভাবিষ্যতে হবে, আজ এই শত্রুকে মেরেছি অপরকেও মারব, আমিই তো সর্বশক্তিমান, আমিই ভোগী, আমিই ঈশ্বর, আমি সুখী, ও ঐশ্বর্যশালী, আমি কুলীন, আমার মতো আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করবো, দান করবো, আনন্দ করবো। এমনি কোরে অজ্ঞানী লোক আসুরীক চিন্তায় মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে বিষয় ভোগে মত্ত হয়, অন্তে অশান্তি ও দুঃখদায়ক নরকে পতিত হয়।

দরিদ্রের মুখে দু মুঠো 'ডালভাত' দিতে সকলেই উদগ্রীব। কে যে নয়, তা বলা শক্ত। অথচ হিংসা, আর উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত কর্ম নেই কারো। মানব প্রেম নেই, আছে নির্লজ্জ ধান্ধিকতা। আছে কর্তৃত্বের অভিমান, দরিদ্রের কোনো হিতসাধন এদের দ্বারা সম্ভব হয় না, ও নামেই মাত্র।

গীতায় পাচ্ছি—

"আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধি পূর্বকম্॥"

[গীতা ১৭, ১৬,]

আমাদের এই দেশবাসীই নব্য-শিক্ষিত ও আধুনিকেরা যারা ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র নিরন্ন জনসাধারণকে পরম শ্রুতি সুখকর শ্লোগান দ্বারা বিভ্রান্ত করছে, বলবো বিপথে পরিচালিত করছে ও অবশ্যম্ভাবী মরণের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, তাদের নিজেদের চরিত্রে প্রেম কোথায়, অকপট সারলা কোথায়? সদাচার কোথায়? তার কোন উপাদানে গড়া, সর্বসাধারণের হিতার্থে যারা এত দরদী আজ? যারা রাজনৈতিক পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ভারতের মুক্তিদাতা সর্বকল্যাণকামী কংগ্রেসকে বরবাদ করতে উৎকট স্বাদেশিকতার দোহাই পাড়ছে?

এ কি নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বহি স্বার্থ তরী, গুপ্ত পর্বতের পানে?"

গান্ধীজী বলতেন—"কংগ্রেসই হিন্দুস্থানের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোককে একত্র করে তাদের মধ্যে স্বরাজ্যের ভাবনা জাগ্রত করেছে।.... কংগ্রেস বরাবরই এই দাবী জানিয়ে এসেছে যে যারা খাজনা দেয়, টাকা কি ভাবে ব্যয় হবে তা বলে দেওয়ার অধিকারও তাদের আছে ঐ অধিকার পাওয়া যাবে কিনা, বা পাওয়া উচিত কি অনুচিত, বা ও অপেক্ষা আরো ভালো কিছু আছে কিনা, সে কথা আলাদা। আসল কথা হচ্ছে এই, যে কংগ্রেসই দেশের লোককে স্বরাজ্যের আস্বাদ দিয়েছে। কংগ্রেসের এই কার্যের জন্য বাহাদুরী অপর কারোও নেওয়া কেবল অন্যায় নয় অযথা কৃতঘ্নতা।"

[হিন্দ্ স্বরাজ্য পৃঃ ৭]

ধর্মত, কংগ্রেসই ভারতের কোটি কোটি দরিদ্র নিরক্ষর জনসাধারণকে মুক্তির পথে পরিচালিত কোরেছে। তার এই পরিচালনার কংগ্রেস ১৯১৯ সাল থেকে গান্ধীজীকেই সার্থক নেতারূপে লাভ করে। যদিও গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার আদর্শ ও মন্ত্রে কংগ্রেস ও কংগ্রেসকর্মীরা দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু যতখানি তিনি তাদের কাছে

সহজভাবে আশা করেছিলেন, তারও পরিচয় তাঁরা দেখাতে পারেননি। ফলে কংগ্রেসের শক্তি বহুল পরিমাণে খর্ব হয়, কংগ্রেস অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস গান্ধীজীকে বর্জন কোরে চলতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি, আবার গান্ধীজীকেই সংকট কালে নেতৃত্বে বরণ করতে হয়েছে। গান্ধীজী কিন্তু কংগ্রেসকে সুবুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি। কংগ্রেসকে কতখানি মর্যাদা তিনি দিতেন, তা যদি লোকে অনুভব করতো তবে আজ কংগ্রেসের অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, তাকে সংশুদ্ধ কোরে শক্তিশালী করার দিকেই আমাদের বুদ্ধি চলত, এখন যা চলছে তা কংগ্রেসকে ধ্বংস করার চেষ্টাই মাত্র কংগ্রেসের ক্ষতি কৃতঘ্নতা নয়, নয় বিশ্বাসঘাতকতা।

সংগ্রাম ও দুঃখ নির্যাতন এবং আপোষ-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আমরা কংগ্রেসের শক্তিতে স্থায়ীনতা লাভ করেছি। শাসন হস্তান্তরের মুখেই এমন সব জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এদেশে, যা আর কোনো দেশের জীবনে ঘটেনি। এ অবস্থায় পুরাতনকে সংস্কার কোরে নতুন একটা রূপ দিতে হলে কিছু সময় লাগে। কিন্তু কয়েকটি স্বার্থদ্বেষী রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্ররোচিত ও প্রলুব্ধ হয়ে বাংলাদেশের নরনারী দিনদুপুরে পাগলামী শুরু করেছে একে পাগলামীই বলা চলে। চিন্তা নেই, বিবেক নেই, ন্যায় নেই, ধর্ম নেই, এ কি ক্ষেপামি নয়? এত অধৈর্য হলে চলে কি? দুশো বছর বা ততোধিক বছরের পাশ্চাত্য শাসনের প্রভাবে এদেশের প্রায় আমলা-তান্ত্রিক সরকারী কর্মচারীদের ও জনসাধারণের চরিত্রের এত নৈতিক অবনতি ঘটেছে সর্ববিষয়ে, যে তা থেকে সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে সুসংস্কৃত, সুসংগঠিত ও সুসমৃদ্ধ কোরে তুলতে হলে তার দশগুণ সময় বেশী লাগবে না? তাছাড়া যে সময় লেগেছিল গড়তে যে তার বহুগুণ অধিক সময়ের আবশ্যকতা আছে, এ কথাও সকলকে মনে করিয়ে দিতে হবে? নবলব্ধ স্বাধীনতাকে বানচাল কোরে দিয়ে দরিদ্র ভারতবাসীর কাঁধের উপর আবার নূতন কাম্বের জোয়াল চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছে —আমাদের পরম হিতকারী সেজে স্বার্থান্বেষীর দল?

বিশ্ব কবির ভাষায় দেশবাসীকে সম্বোধন কোরে আজ এই কথাই বলবো—তারা যেন ভুলে না যায় যে—

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয় মন্থন-ক্ষোভে
ভয়ংকরী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি'
পংকশয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি'
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

মহাপুরুষের এই ইঙ্গিত কাদের জন্য? আমাদের জন্যে নয় কি? ভারতবাসীর জন্যে নয় কি?

কংগ্রেসের উপর আজ যে বিদ্বেষাগ্নি—এ শুদ্ধ দলগত বা ব্যক্তিগত ঈর্ষা ও ক্ষমতা লোলুপতা মূলক, এর পেছনে সত্যিকার কোন হিতকাঙ্ক্ষিতা নেই। কংগ্রেস কে? লোকমতের সৃষ্টিই না কংগ্রেস? তেত্রিশ কোটি বা চল্লিশ কোটি ব্যক্তিকে নিয়েই না এই কংগ্রেস! ব্যক্তির হাতেই তো ক্ষমতা, তবে কেন ব্যক্তিতন্ত্র বা গণতন্ত্র একেই না বলা হবে? ব্যক্তির পাপাচারে, ব্যক্তিতন্ত্রও ক্ষুব্ধ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিসমষ্টি যে পর্যন্ত সত্য, ন্যায় ও ধর্ম-পথে কর্তব্য-পালনে অবিচলিত আছে সে-পর্যন্ত শংকিত বা বিক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ দেখি না। এমন ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিকেই অপসারণ করার আবশ্যকতা দেখা দেয়, যার ভেতর বাস্তবিক কোনো দুর্নীতি বাসা বেধেছে। কিন্তু আজ এধরণের আলোচনাতেও আবশ্যকতা কম। আজ কে যে অপরাধী, আর কে নয়, সেটা বুঝতে হয় আগে। কে গর্হিত আচরণ করছে, আর কে নয়, কে মুনাফাখোরীকের কর্তব্য পালন করছে, আর কে করছে না, কে কালোবাজারে মূলধন খাটাচ্ছে আর কে খাটাচ্ছে না—এ নির্ণয় করা সুকঠিন। কেননা, সরকার তথা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারে এমন নির্দোষ বা নিরপরাধী নিঃস্বার্থলোকের অভাব আজ খুবই। কেননা যারা বলতে পারে—

"অসত্যমত্র তিষ্ঠতি তে জগদাপুংনীশ্বরম্
অপক্ষপর সম্ভৃতং কিমনাৎ কামহৈতুকম্।"

তাদের পক্ষে বর্তমান কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা অশোভন ও দাম্ভিকতা ছাড়া কিছু নয়। আজ সকলকেই তাই আহ্বান কোরে এই কথাই বলবে যে, সুখ, সম্পদ, শান্তি ও স্বাধীনতা বা মুক্তি যদি বাস্তবিক লোকের কাম্য হয়, তবে দৈবী সম্পদের অধিকারী হতে হয় আগে। সকলকে অভয় হতে হয়, অন্তঃকরণে শুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, চাই নিরলস কর্ম-নিষ্ঠা, চাই দান, যজ্ঞ, চাই তপশ্চর্যা, সরলতা, চাই অহিংসা ও সত্যানুরাগ, চাই শান্তি ও অপৈশুন, সর্বভূতে প্রেম চাই, চাই বিনয়, নম্রতা ও ধৈর্য, তেজ ও ক্ষমা, চাই ধৃতি ও নিরভিমানিতা-এতসব সাত্ত্বিক গুণের অধিকারী হলে তবে না দৈবী সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়? তবেই না অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার জন্মে? অন্যথা সম্পূর্ণত অশোভন।

ভারতবর্ষের বিপদ তো আজ বাহিরে নয়, ঘরে। সে সোনার ভারত আর নেই। ভারতের জনসাধারণ আজ পেট ভরে খেতে পায় না, শাকান্নও জোটে না। রোগে ভুগে কষ্ট পায়, চিকিৎসার সম্বলহীন, অকালেই মরে। দেহাচ্ছাদনের অভাব। দারিদ্র সহস্ররূপে প্রকটিত হয়ে এ দেশকে কবলিত কোরেছে। তার উপর সাম্প্রদায়িক দাংগা, যাতে আরো দৈন্যগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এ দেশের লোক। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে উদ্বাস্তুর মতো দিশেহারা হয়ে পথে পথে ভিড় করে আছে বিক্ষুব্ধ জনতা।

সাম্যবাদ, না দিল্লীকা লাড্ডু?

আর দেশের লোকের এই দুর্দিনের সুযোগ নিয়ে দুর্মতলবী স্বার্থান্বেষীরা নানা চক্রান্ত ও মিথ্যা অজুহাতে স্বাধীন ভারতের প্রজাতন্ত্রাভিমুখীন শাসন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে হন্যে হয়ে লেগেছে। যারা শান্তি-প্রিয় অথচ বিপন্ন আজ, সেই সব জনসাধারণের অভাবিত বিপদকালের সুযোগ নিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত কোরে, পাশ্চাত্য শ্লোগানের মনমাতানো শব্দে বিমুগ্ধ কোরে, তাদেরকে বিপথে পরিচালিত করছে। শুধু তথাকথিত সাম্যবাদী কেন, কংগ্রেসী নেতৃত্বের উপর ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রোশ পোষণকারী অন্যান্য আরো কতিপয় রাজনৈতিক দলও এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দরিদ্রের মুখে দুমুঠো 'ডালভাত' দিতে সকলেই উদগ্রীব। সকলেই মুখে একরকম। কিন্তু 'ডালভাত' সংগ্রহ করা যে কত কঠিন, তা সকলেই বুঝতে পারেন। শ্লোগান চমকপ্রদ শব্দ ও ভঙ্গীতে আওড়ানো চলে, কিন্তু 'ডালভাত' সকলকে পাইয়ে দেওয়ার অমন চমকপ্রদ উপায় কারো হাতে নেই। কাজেই এই প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। হিটলারের জার্মানীতে বা ষ্টালিনের সোভিয়েট রাশিয়াতে এ অপরাধের কোন ক্ষমা ছিলনা। কংগ্রেসী শাসনে তা আছে। কাজেই আজো ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা, যদিও তার গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছিতে এখনো অনেক বাকী, যেখানটাতে আজ এসে দাঁড়িয়েছে সে-অবস্থাটাও পৃথিবীর অন্য যে কোনো রাষ্ট্রের তুলনায় মহিমাময়, একথা বলতে দ্বিধা করবো না। ন্যায়ত এ অস্বীকার করা চলে না। তাই বলি, এ দেশের শান্তিকামী নির্বোধ দরিদ্র জনসাধারণের মুখে 'দুমুঠো ডাল ভাত' দেবার নামে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য চক্রান্তে যারা লিপ্ত, তাদের ফাঁদে পা দিলে এদেশবাসীকে আরো নিঃস্ব বিপন্ন অবস্থায় পড়তে হবে।

পূর্বেই বলেছি যে কংগ্রেসের দোষ বা দুর্বলতা থাকতে পারে, আর সে দোষ বা দুর্বলতা কি আমাদেরই নয়? তথাকথিত সাম্যবাদের শ্লোগান চিত্তাকর্ষক হতে পারে, কিন্তু ওর স্বরূপ যে কি ভয়ঙ্কর পীড়াদায়ক, লোকের সে ধারণা নেই। পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ধর্মকে মান দেয় না। যেখানে ধর্ম নেই, সেখানে সুখ শান্তিও নেই। ভারতবাসীর কাছে পাশ্চাত্যের সাম্যবাদ 'দিল্লীকা লাড্ডু'র মতো। জো খায়া ওহ ভী পস্তায়া হ্যায়, জো নহী খায়া হ্যায় ওহ ভী পস্তায়া হ্যায়। ভারতবর্ষ এক বিশেষ সম্পদে সম্পদশালী। ভারতীয় সাম্যবাদ ভারতবাসীর জীবনে ভগবানের শ্রেষ্ঠতম দান বা আশীর্বাদ বলা চলে।

আজকাল সংবাদপত্রে দেখতে পাই, পাশ্চাত্য সাম্য-বাদীরা ধর্মকে 'ধনতন্ত্রের শেষ মোহ' বলে প্রচার করা হচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে ধর্ম কোন অন্যায়কে খাতির কোরে চলে না। যখন এমন কিছু ঘটে বা ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেয়,

তবেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' এবং শুধু তাই নয়, কর্মানুরূপ ফলও কৃতকার্যীকে ভোগ করতে হয়, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। হয়তো এমন হতে পারে যে ধর্মযাজকেরা অন্যায় বা অনাচারকারীকে প্রশ্রয় দিয়েছে অথবা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যায়ানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে বা করছে। কিন্তু যেখানে ধর্মযাজকদের অবস্থা ঐরূপ, সেখানে ধর্মের মর্যাদা থাকে কি? ধর্ম সেখানে থাকেনা, ধর্মযাজক সেস্থলে ধর্মথেকেই চ্যুত। যাজকের স্খলিতাচার যাজককেই নামায়, মর্যাদাহীন করে, ধর্মকে নয়। সাম্যবাদীদের এই যে মন্তব্য এও তাদের প্রচার চাতুর্য ব্যতীত কিছু নয়।

ভারতবর্ষের অবস্থা আজ দয়ার অবস্থা। এদেশের যা ছিল এবং যা আছে সে-সম্বন্ধে এদেশবাসীর যদি ধারণা বা জ্ঞান থাকত তবে 'দিল্লীকা লাড্ডু' তথাকথিত সাম্যবাদের মনোলোভন শ্লোগানের পশ্চাতে ছুটত না।

সাম্যবাদের প্রচারনার ভেতরে যে বাক্‌চাতুরীর খেলা আছে, ভারতের অশিক্ষিত, দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত জনসাধারণ তা বুঝতে অক্ষম। যাদের বোঝবার মতো শিক্ষা আছে, তারা পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত; তাদেরই ধর্ম বা ঈশ্বরকে তারা গ্রাহ্য করে না। ধর্ম বা সদাচারকে তারা কুসংস্কার বোলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কুসংস্কার তো নয়ই, ধর্মই মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠতম প্রগতিমূলক আদর্শ বা নীতি বিশেষ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বা বিংশ শতাব্দীর নবোদ্ভূত মতবাদগুলি, যা ধর্ম বা ধর্মপ্রাণতাকে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্র হতে বিতাড়িত করতে বিশ্বজোড়া উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার প্রশ্রয় দিচ্ছে, 'ডালভাতের' দোহাই পেড়ে, সেই সব মতবাদগুলিই যে এক একটি ধর্মদণ্ড হয়ে ধ্বংসকারী করছে, অশিক্ষিত বিবেকবিহীন ভারতের জনগণ তা বুঝতে অক্ষম। যে ধর্ম বিশ্বাস বা বিধানের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্য মতবাদের সমর্থনকারী প্রাচ্যের জেহাদ, সেই ধর্ম বিধানের মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও স্বাধীনতা আছে, কিন্তু যে-মতবাদগুলির পেছনে লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ বা পতঙ্গের মতো দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে, সে জগতে যে বাস্তবিকপক্ষে কোনো স্বাধীনতা বা শান্তি নেই, কেবল গোলামী ও জবরদস্তি আছে, তাদেরকে তা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করতে বলি।

কোন্ মূঢ় না বুঝে যে, যেখানেই থাকি না কেন, যে মতবাদেরই সমর্থক হই না কেন, কোনো একজন নেতা বা তার মতবাদের প্রতি আনুগত্য রাখতেই হবে, হবে। উচ্ছৃংখলতা বা যথেচ্ছাচার কোনো মতবাদই প্রশ্রয় দেবে না, দিতে পারে না। বিরুদ্ধবাদীকে অবশ্যই পিষ্ট বা দলিত কোরে বশ্যতা মানাতেই হবে। এ পন্থা পাশ্চাত্য মতবাদ গুলিরই। কিন্তু ভারতীয় আদর্শে এই জবরদস্তি ছিল না, নেইও।

(ক্রমশঃ)

পিয়াসী

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায়

মাটির পাখীরা যত ডানা মেলে আকাশেতে ওড়ে,
চিহ্নহীন স্বপ্নগুলি পেয়ে যদি যায় অকস্মাৎ,
বাসার ঠিকানা তারা ভুলে যাবে, যাবে অচিরাৎ—
নতুন গানের ঘর সুরে আর রঙে নেবে গড়ে।
বাতাসের নীল ঢেউ ডানায় এনেছে আশ্বাস,
স্বপ্নের তটরেখা যতদূরে হতে পারে হোক—
আশার সোনালি আলো ভরে আছে উৎসুক চোখ,
বুকের রক্তের তালে নেচে ওঠে দুরন্ত উল্লাস।
সেখানে নতুন করে স্বপ্নের ছোট ছোট নীড়
আলোর ছাওনি দিয়ে ঢেকে ঢেকে নিক পাখীগুলি,—
সেখানে না যেন থাকে ঝড়জল এলোমেলো ধূলি,
না থাকে নিষ্ঠুর রাত অন্ধকার আতঙ্কের ভিড়।
অনেক আশ্বিন আর চৈত্রের নিষ্ফল ডাক
ভোরের তারার মত অনাদরে ঝর ঝোক ক্ষীণ;
মাটীর কাঙাল প্রেম মাটীতেই থাকুক বিলীন,
পুরোণ মিনতিটুকু কাঁদে যদি, কেঁদে ফিরে যাক।

সহীদ সুশীল সেন

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সেন

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩)

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯০৫ ইংরেজীর জুন মাসে আমরা দুই ভাই সিলেটে পড়িতে যাই। সেখানে আমরা শ্রীহট্টের সিংহ ৺শশীন্দ্র চন্দ্র সিংহ মহাশয়ের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম। শ্রীহট্টে সাময়িকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন সম্ভবতঃ ৺ রাধানাথ চৌধুরী ও ৺ বিপিন চন্দ্র পাল, কিন্তু শ্রীহট্টের সাময়িকপত্র সমূহের যে স্বকীয় বিশিষ্ট মর্য্যাদা আছে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন ৺ শশীন্দ্র চন্দ্র সিংহ মহাশয়। ইঁহার সম্পাদিত Weekly Chronicle—বা সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ—সরকার, সরকারী কর্মচারী, ও সরকারী নীতির নির্ভীক সমালোচনার জন্য সমগ্র ভারতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। যে সময়ে মফঃস্বলের সাময়িকপত্র সমূহের কাজ ছিল নিলামী ইস্তাহার পরিবেশন, সে সময়ে Weekly Chronicle কে বাগে আনিবার ব্যর্থ প্রয়াসে সরকার উহাতে সকল প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। ভারতবর্ষের সকল খ্যাত ও অখ্যাত সংবাদপত্র উহার নিকট আশিত, এবং স্থানীয় সকল ব্যাপারেই তিনি একজন প্রধান অগ্রণী ছিলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সিলেট আসিলে সাধারণতঃ তাঁহার বাড়িতেই উঠিতেন, এবং আর্ত্ত ও নিপীড়িত জনগণ সকল সময়েই তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতে পারিতেন। জলি সাহেবের মামলা, উদয় পাটনীর ফাঁসী, জগৎসী আশ্রমে গুলি-বর্ষণ ইত্যাদি বিষয় লইয়া তিনি যে আন্দোলন করিয়াছিলেন তাহা আজ অতীতের কাহিনী। উদয় পাটনীর ব্যাপারে আসামের অবরদস্ত লাট ফুলার সাহেবকে অকালে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গদি ত্যাগ করিতে হয়। জগৎসীর ব্যাপারে তিনি তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করেন তাহাতে দেশের নিরুদ্ধ প্রতিবাদই ধ্বনিত হইয়াছিল। ভারত সরকার প্রকাশ্যভাবে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিলেও আসামের তদানীন্তন চিফ কমিশনার সার আর্চডেল আর্ল কঠোরভাবে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে। এই নির্ভীকতা এবং অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট নির্য্যাতন এবং চরম দারিদ্র্য বরণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই তিনি অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই।

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৯০৩ ইংরেজীতে। প্রথম হইতেই ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছিল, এবং এই প্রতিবাদ ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছিল। সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ১৯০৫ ইংরেজীর ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বাংলা দ্বিধা বিভক্ত হইল। ঘরে ঘরে চরকা চলিল, তাঁত চলিল, বাঙ্গালী ছেলে বিদেশী স্কুল কলেজ ছাড়িল, চারিদিকে স্বদেশী পণ্য প্রতিষ্ঠার ধুম পড়িল; বাঙ্গালী স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জন ব্রত গ্রহণ করিল; সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি ধরিল; 'বাংলার মাটী বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল' এবং 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দীক্ষা লইল; সর্বপ্রকার অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের প্রতিরোধ করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প লইয়া জাগিয়া উঠিল, এবং প্রতি বৎসর ৩০শে আশ্বিন অরন্ধন ও রক্ষাসূত্র বন্ধন সহ স্বদেশী সঙ্কল্প নূতন করিয়া গ্রহণের দিন ধার্য্য হইল।

সিলেটে আমরা সরকারী উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলাম। সেখানে ৺ জ্ঞানেন্দ্র নাথ ধর মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিচয় হয়। এই সর্বত্যাগী নীরব কর্মী আজীবন কঠোর দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া চলিয়াও কখনও আদর্শ-ভ্রষ্ট হন নাই, এবং যাহারাই তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই নিজের অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাদ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। ক্লাসে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা ইহাকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল, যে, কোনমতেই পড়াশোনায় মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। তাহা সত্ত্বেও ইনি, এবং উত্তর কালে শ্রীহট্ট জেলাস্কুলের হেডমাষ্টার মৌলবী মুফিজুর রহমান সাহেব, পরীক্ষায় সর্বদাই একযোগে প্রথম স্থান

অধিকার করিতেন। ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ ধর, ৺জিতেন্দ্র নাথ দে, শ্রীযুক্ত যামিনী মোহন দেব, ৺সুশীল কুমার সেন, ও লেখককে লইয়া একটি ছোট দল গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহারা সর্বদাই স্বাধীনতা লাভের জন্য তাহারা কি করিতে পারেন, সে বিষয়ে জল্পনা কল্পনা করিতেন। শ্রীহট্টের উকীল শ্রীযুক্ত ষতীন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী এবং অন্যান্য কয়েকজনও ক্রমে তাহাদের সহিত অল্পাধিক সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট মীরাবাজার মহল্লায় মৌলবী ইর্শাদ আলি সাহেব উহাদের অখড়ায় আমাদের ডন, বৈঠক, কুস্তি, লাঠিখেলা ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ১৯০৬ ইংরেজীতে যখন সিলেটে সুরমা উপত্যকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তখন স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র ইনিই এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ইনি সভা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলে বিপুল হর্ষধ্বনি-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। সুর্মা উপত্যকা সম্মেলনের অব্যবহিত পরে ময়মনসিংহ সুহৃৎ সমিতির শ্রীযুক্ত কেদার নাথ চক্রবর্ত্তী ও সুপারিশক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় শ্রীহট্টে ময়মনসিংহ সুহৃৎ সমিতির একটী শাখা স্থাপন করিলে আমরা উহাতে যোগদান করি। শ্রীহট্টের উকীল ৺অম্বিকাচরণ দাস মহাশয়ের বাসভবনে এই আখড়ার অধিবেশন হইত। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের অনুকরণে আমরা দুই ভাই পেঁয়াজি রংএর পাগ্‌ড়ি গ্রহণ করি। আমাদের এই পাগ্‌ড়ি এতই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিল, যে, আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকিলেও পাগ্‌ড়ি না দেখিলেই মাষ্টার মহাশয়েরা ধরিয়া লইতেন আমরা স্কুলে যাই নাই।

যুগান্তরের সহিত আমার পরিচয় হয় ৺শশীন্দ্র বাবুর বাসায়। শ্রীযুক্ত যামিনী বাবু দৈনিক 'সন্ধ্যা' গ্রহণ করিতেন, উহা হইতে আমরা সন্ধ্যার রসাল রচনার সহিত পরিচিত হই। দেশের ভিতরে কি হইতেছে, না হইতেছে, সে বিষয়ে গুরুত্বের অন্ত ছিল না। শিক্ষিত সন্ন্যাসী দেখিলেই ছদ্মবেশী বিপ্লবী বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিত। কালিবাড়িতে আগত অনেক সন্ন্যাসী ভিতরে ভিতরে বিপ্লবের কিরূপ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে এবং কিরূপ বিপুল-ভাবে অস্ত্র-শস্ত্রাদি সংগ্রহ হইতেছে তাহার এক চমকপ্রদ বিবরণ দিয়া আমাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছিলেন। একবার আমি, সুশীলকুমার, জ্ঞানবাবু, জিতেন্দ্র নাথ, এবং সম্ভবতঃ যামিনীবাবু রায়নগর রাজবাড়ির কালী-প্রতিমার নিকট দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম। ৺কুমার গোপিকারমনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহার সহিত পরিচয় না থাকিলেও তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, আমাদের এই ধারণা জন্মিয়াছিল।

(৪)

গোলামখানা বর্জ্জন

১৯০৬ ইংরেজীর পূজার কাছাকাছি সময়ে সিলেটে সুরমা উপত্যকা সম্মেলনের অধিবেশন হয়। রামপুর হাটের বিখ্যাত স্বদেশী গায়ক ৺রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ৺বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত সিলেট যান। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বন্দেমাতরম,' 'কোন দেশেতে তরুলতা', 'এসো কে কেঁদেছ নীরবে' এবং ব্রজেন্দ্র বাবুর 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে' প্রভৃতি গান যে কি বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। সুরমা উপত্যকা সম্মেলনে ছাত্রদের যাইতে দেওয়া হয় নাই। সম্মেলনের শেষে উহাদের জন্য একটী বিশেষ সভার আয়োজন হয়, সেই সভায় পাল মহাশয় ছাত্রদের গোলামখানা ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য আহ্বান জানান। রংপুর এবং অন্যান্য স্থানে এর পূর্বেই জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং কলিকাতায় 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ'এর পত্তন হইয়াছে। আমাদের সহাধ্যায়ী ৺সুরেন্দ্র কুমার দত্ত মহাশয় সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। অপর কেহ তাঁহার সঙ্গী না হইলেও আমি তাঁহার সঙ্গী হইব, প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তাঁহার মনে একটা আক্ষেপের ভাব আসিয়াছিল, উহা দেখিয়া আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ৺সুশীল কুমারও 'গোলামখানা' ত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে এই ব্যবস্থা হইল যে, আমি প্রথমে

কলিকাতা যাইব; আমার নিকট হইতে বিশদ বিবরণ পাইলে অন্যান্যেরা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। 'ষট্ কর্ণৈঃ মন্ত্র ভিদ্যতে' এই নীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থার কথা আর কাহাকেও জানান হইল না। অবশেষে একদিন আমি গেরুয়া পরিধান করিয়া শ্রীহট্ট হইতে চম্পট দিলাম। শ্রীমান সুশীল আমাকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া কলিকাতার টিকিট কাটিয়া দিয়া গেলেন। তখন সিলেট হইতে ষ্টীমারে ৩৸৵৩ ভাড়ায় কলিকাতায় আসা যাইত, সুতরাং খুব বেশি টাকার প্রয়োজন ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শ্রীশ কুমার সেন মহাশয় সঙ্গে ছিলেন না, এইটুকু হিসাব করিয়াই রওনা হইয়াছিলাম। যাইবার সময় একটী চিঠি রাখিয়া গিয়াছিলাম, উহা পাইয়া ৺শশীন্দ্র চন্দ্র সিংহ মহাশয় একটু ধোকায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষ ঠেঁটা হিসাবে সুনামগঞ্জের হেড মাষ্টার ৺লালা প্রসন্ন কুমার দে মহাশয়ের নিকট একটী টেলিগ্রাম করেন। ষ্টীমার সুনামগঞ্জে বেশ কিছু সময় দেরী করিত। এই অবসরে আমি বাড়ীতে মায়ের কাছে একখানা পত্র লিখিবার যোগাড় করিতেছিলাম, এরই মধ্যে লালাজী টেলিগ্রাম পাইয়া জাহাজে আসিয়া উপস্থিত। ১৪ বৎসর বয়স্ক সন্ন্যাসীকে চিঠি লিখিতে দেখিয়া স্বভাবতঃই তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এদিকে তাঁহাকে দেখিয়া আমিও কাগজপত্র গুটাইয়া লইবার উপক্রম করিতেছি। এমন সময় লালাজী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বমাল ধরা পড়িয়া 'নবীনানন্দ' স্বামীকে লালাজীর অনুগমন করিতে হইল। বকুনি যা খাইলাম সেটা আর বলিয়া কাজ নাই। তাৎকালীন Conservator of Forests ৺তারাকিশোর গুপ্ত মহাশয়ও সেদিনকার জাহাজে সহযাত্রী ছিলেন; সমস্ত বিষয় শুনিয়া তিনিও খুব প্রশংসা করিলেন না। একদিন কড়া পাহারায় থাকিবার পর আমার দাদা সংবাদ পাইয়া আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। সরকারী কার্য্যব্যপদেশে তিনি তখন ডাক বাংলোয় অবস্থান করিতেছিলেন, আমিও তাঁহার সহিত ডাক বাংলোয় চলিয়া গেলাম। সেই সময়ে আমাদের পরিবার নানাদিক দিয়াই বিব্রত; এমন সময়ে এই পন্থা গ্রহণ করায় তিনি অনুযোগ করিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় যাওয়ার মত দিলেন। এদিকে লালাজীর টেলিগ্রাম পাইয়াই সিংহ মহাশয় আসামীকে escort করিয়া লইয়া যাইবার জন্য শ্রীমান সুশীল কুমার, এবং অধুনা কাছাড়ের প্রবীন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র নন্দী মহাশয়কে পাঠাইলেন। শ্রীমান সুশীল কুমারের নিকট জানিলাম তিনি আমার ভাড়ার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, প্রয়োজন বোধে আমি কলিকাতা চলিয়া যাইতে পারি। কিন্তু তাহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। বাবাও এই ব্যাপারে খুব অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থায় আর কোন নড়চড় হইল না।

(৫)

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

১৯০৬ ইংরেজীর ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে কলিকাতা আসিয়া ১০ নং মলঙ্গা লেনে আমাদের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দে মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম, এবং 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদে' ভর্তি হইলাম। সেখানে শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল, দুর্গাচরণ ঘোষাল, বিভূতিভূষণ সরকার, সতীশচন্দ্র বীরু, দ্বিজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস প্রভৃতি আমাদের সহপাঠী ছিলেন। শ্রীযুক্ত পাল ব্যতীত সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুগান্তর দলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বীরু মহাশয়ের নিকট বিপ্লবীদলের কার্যকলাপ সম্পর্কে নানারূপ রহস্যের আভাষ পাইতাম। বিভূতি বাবু চাঁপাতলা যুগান্তর বোর্ডিং হাউসে থাকিতেন। এঁরা সকলেই অত্যন্ত চাপা ছিলেন। আমাদের নিজস্ব একটা গোপনীয় লিপিতে এই সকল গোপনীয় ব্যাপার সম্পর্কে সিলেটের সহকর্মিদের সহিত পত্রালাপ চলিত। আমাদের পত্রের বহর এবং দুর্বোধ্যতা দেখিয়া অভিভাবকদের কেহ কেহ যার-পর-নাই অস্বস্তি বোধ করিতেন, এবং বড়দার নিকট অনুযোগ করিতেন, কিন্তু আমরা গ্রেপ্তার না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কাহারও সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। এই চিঠিগুলির মধ্যে অনেকগুলি ধরা পড়ে, কিন্তু পুলিস অনেকদিন পর্যন্ত উহার পাঠোদ্ধার করিতে

সম্ভব হয় নাই। হাইকোর্টে যখন আমাদের আপীলের reference চলিতেছিল তখন মৌলবী সামসুল আলম উহার প্রত্যাহার করেন, এবং আমার দ্বীপান্তর দণ্ড বহাল থাকিবার উহা একটী প্রধান কারণ।

১৯০৭ ইংরেজীর গ্রীষ্মের বন্ধের পর শ্রীমান সুশীল কলিকাতা আসিয়া আমার সহিত যোগ দিলেন। দাদা ও (হেম বাবু) এই বৎসরেই কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলেন। আমরা এই সময়ে ১০ নং মলঙ্গা লেন হইতে ২৫নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে—বর্তমান ৮০ নং বাড়ি—উঠিয়া গিয়াছি। এখানেও আমরা আমাদের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের সঙ্গে থাকিতাম। ইনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ বিভাগের আরও দুইটী ছাত্রও—শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত রজনী মোহন আচার্য্য—এখানে থাকিতেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীদের ইতিহাস—নির্বাসনে এবং আত্মগোপন করিয়া উহারা দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, নীরবে কাজ করিয়া কিরূপে দেশকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহার ইতিহাস শুনাইতেন। কোথাও তাঁহার এতটুকু ফাঁকি ছিল না। এরূপ আদর্শনিষ্ঠ ও তেজস্বী পুরুষ খুব কম দেখা যায়। যখনই কোন কাজের আহ্বান আসিয়াছে, তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে তিনি অনেক ভাল কাজ পাইতে পারিতেন, কিন্তু নূতন আদর্শ লইয়া যখন দৌলতপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তিনি স্বল্প বেতনে উহাতে যোগদান করিলেন; সরকারী দলন-নীতির প্রতিবাদে যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন তিনি দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করিলেন; আলিপুর মামলার পরে সরকারী দমননীতির প্রচণ্ডতায় দেশ যখন বিহ্বল, সেই সময়ে তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ত্যাগ করিয়া নামমাত্র পারিশ্রমিকে হবিগঞ্জ জাতীয় বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন; আবার যখন আধ্যাত্মিক জীবনের ডাক আসিল, তখন তিনি সংসার-সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া ধর্মজীবন গ্রহণ করিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ এবং তত্ত্বাবধায়ক হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই এইরূপ একটা ত্যাগের ইতিহাস ছিল। শ্রীঅরবিন্দ, সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ, অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষ, কিশোরী মোহন গুপ্ত, বিনয় কুমার সরকার, শিল্পবিভাগের অধ্যক্ষ রানাডে—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব। এঁদের সাহচর্য্য ও সংস্রব জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর একটা সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল, এবং ছাত্রদের মধ্যেও অনেকেরই জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদানের একটা ইতিহাস ছিল।

আমি যখন কলিকাতায় আসি, তখন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ১৯১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। যতদূর মনে পড়ে এর অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গবাসী কলেজ এই বাড়িতে ছিল। ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগে জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ১৮৬ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটে—বর্তমান বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের—বাড়িতে উঠিয়া আসে। ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অধ্যাপনার এখানে একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল। আধুনিক প্রণালীতে জ্যামিতির শিক্ষাদান প্রথমে এখানেই আরম্ভ হয়। বর্তমানে alternative প্রশ্ন দিবার যে পদ্ধতি চলিত আছে তাহার সূত্রপাতও খুব সম্ভব এখানেই আরম্ভ হয়, এবং সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রশ্নপত্রে ইহার সূচনা করিয়াছিলেন। 'সম্ভবতঃ' বলিলাম এই জন্য, যে, ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে এই পদ্ধতির প্রচলন করিয়া থাকিতে পারেন। বিজ্ঞান ও হাতের কাজ একেবারে নিম্নশ্রেণী হইতেই শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উদ্ভিদ তত্ত্ব ও শরীর সংস্থান বিদ্যা, প্রাণীর তত্ত্ব, রসায়ন, ও প্রাকৃত বিজ্ঞান, এইগুলির জন্য কোন পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল না,—পাঠক্রম অনুযায়ী মূলসূত্রগুলি পরীক্ষাগারে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হইত। কারখানায় হাতে-কলমে কাঠের ও লোহার কাজ শেখান হইত। এ ছাড়া শরীর-চর্চার ব্যবস্থাও ছিল। এই বিভাগের ভার ছিল আত্মোন্নতি

সমিতির উপর। এখানে ডন, বৈঠক, কুস্তি, লাঠি ও ছোরা, বক্সিং ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। সুশীলের বক্সিংএ হাতে খড়ি হয় দেশে, উহার মেজদার কাছে, কিন্তু উহার পাকা শিক্ষা হয় শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের নিকট। সাকরেদ যে সাহেব ঠেঙাইয়াছে, শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট তাহা সর্বদাই একটা গর্বের বিষয় ছিল। •

(ক্রমশঃ)

* পূর্বাংশ ১৩৪৪ সালের মন্দিরা আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

চারণের গান

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিদ্যাবিনোদ

অনেক বিরোধ হ'ল ভাই
এবার তো বোধ কর,
কলহে কাল আর কতদিন
কাটবে এমনতর ?
বলতে পারো আজকে মোরে
লাভ হ'ল কি কৌরব ক'রে ;
অসম্পূর্ণ সকল কাজই
রইল হ'য়ে জড় ; —
লজ্জাবিহীন কলহে কাল
না যায় এমনতর।
ভাগ হ'য়েছে, বেশ হয়েছে
তবুও পাশে পাশে,
বাস করিতে হবে মোদের
ভবিষ্যতের আশে।
মুসলমান ও হিন্দুরা ভাই
দুই দেশেতে থাকবে সবাই ;
কাজ কিছু হোক, ঝগড়াটাকেই
আর ক'রো না বড় ;—
লোকহাসি ছিঃ নাই করিলে
আজও এমনতর।

শহীদ বন্দনা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আঁধার রাতের যাত্রী তারা দুঃসাহসীর দল,
দেদীপ্যমান প্রাণের শিখা তীব্র অচঞ্চল।
ঝঞ্ঝাবাদল বজ্র-মাদল তুচ্ছ করি সব,
বক্ষে নিয়া শৌর্য সাহাস, কণ্ঠে মাভৈঃ রব,
রক্ত-মশাল হস্তে ধরি সামনে তারা যায়
চলার পথে পিছন পানে বারেক নাহি চায়।
কঙ্করময় বক্র-পথে চললো অভিযান,
স্বাধীন ভারত স্মরণ করে তাদের অবদান।
চতুর্দিশি দুঃশাসনের মিথ্যা প্রতারণা
বিষিয়ে উঠে অত্যাচারে দেশের ধূলি-কণা।
জীবন্মৃত বন্দী মানুষ ব্যথায় কেঁদে উঠে,
তরুণ সেনার শোণিত কণা টগবগিয়ে ফুটে।
বুকের মাঝে গোপন ব্যথা বাজতো চিরদিন,
জীবন দিয়ে শুধতে হবে দেশ-মাতৃকার ঋণ।
পাগল হ'য়ে দিগ্বিদিকে ছুটলো চারিধার,
স্বাধীন ভারত বরণ করে তাদের বারেবার।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে মরণ-জয়ী বীর,
মুক্তি নিশান সামনে ধরি সমুন্নত শির,
অগ্র-পথিক চললো সবে তুচ্ছ করি ভয়,
কারার বেড়ি, ফাঁসির রশি মানলো পরাজয়।
জীবন দিয়ে করলো তারা নূতন জীবন-দান,
জ্বাললো জাগরণের বাতি ব্যর্থ দীপ্ত অনির্বাণ।
মায়ের চুমা, স্নেহের ধারা, ব্যর্থ হোল হায়,
স্বাধীন ভারত প্রণাম করে আজকে তাদের পায়।

আবির্ভাব

শ্রীপিনাকী রঞ্জন কর্ম্মকার, কবি-শ্রী

যে উদার বৈদিক ধর্ম্মের আলোকে ভারত ছিল চির উদ্ভাসিত, যার মহামহিমাময়ী গরিমা দেখে জগতবাসী একদিন শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করেছিলেন, সেই ধর্ম্ম যেদিন অন্তঃসারশূন্য আচার নিষ্ঠায় ও কেবল মাত্র যুক্তিহীন কৃচ্ছ্র সাধনেই পর্য্যবসিত হ'ল, সেদিন মানব অন্তরের শূন্যতা পরিপূরণার্থে আবির্ভূত হয়েছিলেন করুণাময় শ্রীভগবান তথাগত গৌতম বুদ্ধরূপে। সে আজ অনেক দিনের কথা সেদিন হিমালয় হ'তে কুমারীকা পর্য্যন্ত ভগবান তথাগতের বার্ত্তা প্রচারিত হয়েছিল দাবানল পরিব্যাপ্তির মত। দুঃখ-ক্লান্তের দুঃখ নিবৃত্তির অভিনব উপায় প্রাপ্ত হয়ে মানব আর জগত কৃতার্থ হয়েছিল। জগতবাসিগণ সে যুগে একবার বিস্মিত মুগ্ধ নেত্রে ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল কিন্তু কাল প্রভাবে মানবের কল্পনা-প্রসূত-চিত্ত মালিন্যে এবং তার শাখা উপশাখার সৃষ্টিতে বাহ্যাবরণ সার হয়ে সে ধর্ম্মও কিন্তু একদিন তার প্রভাব হারিয়ে ফেলেছিল। তাই সিদ্ধার্থের অন্তর্ধানের প্রায় সাড়ে বারশ শত বৎসর পরে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হলেন জ্ঞানদীশ্বর শঙ্করের সাক্ষাৎ অবতার আচার্য্য শঙ্কর। সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনে ভারতের বুকে আবার নতুন সুরে সকল হেসে উঠল। দিকে দিকে "সোঽহং" ধ্বনির প্লাবন বয়ে গেল। অদ্বৈত বাদের ফুল ফুটে উঠল। মোক্ষ লাভের বাগান নতুন গন্ধে ভরে গেল। মানব সমাজ পরমানন্দে আর জয়োল্লাসে মেতে উঠল—কিন্তু সে মত্ততাও সমভাবে অধিক দিন স্থায়ী হ'ল না।

জীবের স্বভাবসিদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ কালক্রমে সে ধর্ম্মেও বিভিন্ন মতবাদের বাহুল্যও অন্তঃসারশূন্য আচার নিষ্ঠার সংযোগ ঘটল। তারপর কত মহাজন আসলেন, কতই না যুক্তির বাণী প্রচারিত হ'ল। কিন্তু জগত যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেল। যে ধর্ম্মের দর্শন ছিল বন্ধন মোচনের সহায়ক এবং সন্দেহ নিরসন ক'রে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপক, সেই ধর্ম্মের দর্শন হ'ল নরীস, কুতর্ক মায়াজাল রচনার উপাদান। নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টির প্রকরণ স্বরূপ। পবিত্র ভারত ভূমের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও এল ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা ও ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তা। রাজ্যলিপ্সু বৈদেশিক পরাক্রমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিও ভারতের একেবারে লুপ্ত হ'ল, আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নৈতিক সাম্য ও মৈত্রীর অভাবে তারপর চলল ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অত্যাচার, মহাপুরুষের বাণী প্রচারিত হতে লাগল তরবারীর তীক্ষ্ণতায়। ফলে বেদ-ধর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অসহায় হয়ে পড়ল। হিন্দুর অস্তিত্ব হ'ল শুধু নামে, আর রইল শুধু শূন্য হাহাকার শুষ্ক তর্কের রূপ ধরে। হৃদয়ের সরলতা লুপ্ত হয়ে গেল। পারমার্থিক জগত এক বিরাট মরুকান্তারে পরিণত হ'ল। মায়া মরিচীকা ভ্রান্ত, পথহারা ক্লান্ত পথিকের তীব্র আর্ত্তনাদে ও আচার্য্য প্রভুর হুঙ্কারে বুঝিবা সেদিন বৈকুণ্ঠেশ্বরের সিংহাসনও কেঁপে উঠছিল। তাই তাঁরই শুভ প্রচেষ্টা ও সংকল্প পূরণ করবার জন্যে ত্রিতাপ তাপিত পৃথিবীর মরুময় বুকে চিরশ্যামল বঙ্গের শ্যামশোভান্বিত নবদ্বীপ ধামে গোলক হ'তে ভূ-লোকে অবতীর্ণ হলেন, আর বহিয়ে দিলেন প্রেম সুরধনীর ধারা। সে সুরধনী নিখিল বিশ্বের বক্ষ প্লাবিত ক'রে প্রবাহিত হচ্ছে। তার পূতস্বচ্ছ সলিল পানে ও স্পর্শে সকল প্রদেশের নরনারী আজ পরিতৃপ্ত ও স্নিগ্ধ। তার স্পর্শে ত্রিতাপ দগ্ধ জীবন হৃদয়ে নতুন চেতনার সঞ্চার হ'ল। নব জীবনের আনন্দে আত্মভোলা হয়ে নিখিল ভুবনে গগন ছেয়ে বিশ্ববাসী ব্রজ প্রেমভাবে মেতে উঠল আর সদানন্দ চিত্তে গেয়ে উঠল—"জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দের জয়।" বাঙলার তথা ভারতের হৃত সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার করতে ও বিকৃত ধর্ম্মের গ্লানি বিনাশের জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটলো। সার্ব্ব-জনীন প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকারী স্বর্ণকান্তি সেই মহা গৌরময় পুরুষকে দেখে কৃতার্থ নরনারী নাম দিল শ্রীগৌরাঙ্গ।—গৌর-হরি, নদীয়া-বিহারী, বিশ্বম্ভর, নিমাই। অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে তারা যে আরও কত কি নাম রেখে-ছিলেন তাঁর, কত প্রকারের নিকটতম সম্বন্ধই না স্থাপন

করেছিলেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। কেউ তাঁকে বলল 'প্রেমের ঠাকুর' কেউ বলল বা 'কাঙালের ঠাকুর'। যা'র প্রাণে যা' জাগল তারা তাই বলে সুখী হ'লেন।

যিনি প্রেম দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিলেন, তিনি ত' প্রাণেরই ধন, তাঁকে কি বলে তৃপ্তি হয় তা' কেউ কি বলতে পারে? তিনি শচী দুলাল বা জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন নন। আজ যে তিনি সকলেরই হৃদয়ের রতন।

ভারতের নির্ম্মল নীলিমায় যে কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হয়েছিল গৌরাঙ্গ চাঁদের উজ্জ্বল আলোক ছটায় পুনরায় তা' উদ্ভাসিত হ'ল। পুলকিত জীবগণ শুষ্ক তরুর মূলে প্রেমের সুধা পেল—গৌর আমা ঠাকুর ভদ্র, অভদ্র, উড়ে, মেড়ো, ইরাণী ও যবন সকলকেই তাঁর উদার বুকে স্থান দিয়েছিলেন এবং ইসলামীয় ভাব আর্য্য-ঋষি সন্তান-গণের বক্ষ হ'তে দূরীভূত করলেন অতি সঙ্গোপনে। জীবগণ তাঁকে প্রথমে ভণ্ড বলে উপহাস করেছিল। কিন্তু তিনি কি ক্ষুদ্র নিন্দায় বিচলিত হবেন? কোন দিনই না। দু'টী বাহু প্রসারিত করে নবদ্বীপের পথে পথে গেয়ে চললেন।

"কলি তিমিরাকুল অখিল লোক হেরি
গৌরচাঁদ পরকাশ
লোচনে রাধাপ্রেম থাক রস বরি ঝরে
মুখে সদা মধুহাস।"

গোরা রায় এই রূপে নবদ্বীপের প্রতি মানবের মন কৃষ্ণ-গুণ-গানে দীক্ষিত করেছিলেন এবং জীবগণের সাথে অশ্রুপ্লুত নয়নে আধেক ভাবে ঢল ঢল হয়ে চলেছেন নাস্তিক জীবগণের অন্তরে আলো দিতে! লোকেরাও তাই দেখে তখনই বলে ওঠে—ওকে যায়—!!

ওকে! ছল ছল আঁখি কারতে নিরখি
জনে জনে ডাকি' কয়রে।
ওরে গোলকের ধন অতুল রতন
নাম প্রেম নিধি আয়রে॥
দু'টী বাহু সুবলিত করি প্রসারিত
পতিতের পানে ধায় রে।
না করি বিচার জাতি কুলাচার
ধরিতে হিয়ারে চায়রে॥
না মানে কাহার দোষ ব্যবহার
নাঠেলে কাহারে পায়রে।
বলে হরি নাম বল অবিরাম
জীবনের বেলা যায় রে॥
এভব সংসারে দুখের পাথারে
ডুবিয়া রহিলি হায়রে।
না হ'ল পরশ প্রেম-সুধা-রস
মজি মোহ মদিরায় রে॥
হেরি কলিকাল ব্রজের দুলাল
অবতরি নদীয়ায় রে।
ভাসি' আঁখিনীরে তারিতে পামরে
না ভজিলি তোরা তায় রে॥
ওরে দীনহীন অভাগা মলিন
সুসময় আজি বয়রে।
গোরা দ্বীজ রাজে যেই জন ভজে
তার নাহি কোন ভয় রে॥
কহিছে নিতাই আপনা বিকাই
লুটাও ও রাঙা পায়রে।
পিনাকী রঞ্জন ভজনে খঞ্জন
কাতরে করুণা চায়রে॥

"যাত্রা"

সুব্রতা চৌধুরী

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি; বসন্তের সূচনাতেও শীতের জের তখনও মেটেনি। ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে দরজা খুলতেই পার্বত্য-ভূমির ঠাণ্ডা কনকনে ধমকা একটা হাওয়া এসে বিজয়ের চোখে মুখে যেন সূচ বিঁধিয়ে দিল। তবু বাইরে বেরিয়ে এল বিজয়। ভোরবেলার এ দৃশ্য তারী ভাল লাগে। ঘরের চালায় গাছের বিবর্ণ পাতায়, পাশেই জেলের বস্তির বাগানে শিশির জমে সাদা হয়ে আছে। বিজয়ের মনে হয় কোন এক বরফের রাজ্যে যেন চলে গেছে। সমস্ত উঠোনটা হেটে আসে একবার; জুতোর নিচটা মচ্ মচ্ শব্দ ক'রে উঠে। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না এ দৃশ্য। রোদের তাত লেগে জমা শিশির ঝরে ঝরে পড়ে, বাড়ীর চালা থেকে, গাছের উপর থেকে।

জেলের বাগানে কাজ সুরু হয়ে গেছে এর মধ্যেই। নাকে মুখে কাপড় বেঁধে করেদিরা বালতি বালতি ময়লা এনে চালছে কপি ক্ষেতের মধ্যে। জমির সঙ্গে ভাল ক'রে সার মিশিয়ে মাটিকে উর্বর ক'রে তোলে অনেকখানি; তাই পরিশ্রমের ফলে বাগান থেকে যা উঠে আসে, তা দেখে তাক লাগে সবারই। কিন্তু এ ফসল ভোগ করেন জেল কর্তারা, স্থানীয় সহরের ধনী লোকেরা। ফসল উৎপাদনে সাহায্য করে যারা তাদের পাতে বাঁধা কপির ঘন্ট, এবং মূলকপির এক টুকরাও পড়ে কিনা সন্দেহ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজয়ের এত সব ভাববার সময় কোথায় তবু চলে যেতে পারে না। এ পাহাড়ের দেশের সঙ্গে বিজয়ের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। এ পার্বত্য সৌন্দর্যের সঙ্গে তার যে স্বাভাবিক ও সহজাত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার মূল্য শুধু বোঝে সে নিজেই। এ বাড়ীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার কতদিনের কত স্মৃতি। দীর্ঘ বিশ বছর কেটেছে এখানে, কত পরিচিত আবাস, শুধু কি তাই? বাড়ীর পাশে ঐ যে কারাগার, সেটাও তো তার কম পরিচিত নয়! ছেলেবেলা রোজ একবার করে জেল গেটের কাছে এসে দাঁড়াতো। কত পুরানো বন্দী ছাড়া পেয়ে চলে যেতো; নতুন বন্দী এসে তাদের স্থান পূর্ণ করতো। একবার স্পষ্ট মনে আছে সৌম্য সুদর্শন বলিষ্ঠ এক যুবক জেলগেট থেকে বেরিয়ে বিজয়ের মাথাটা জোরে কাকড়িয়ে বলেছিল "কি দেখছ খোকন? আমার মত তুমিও একদিন আসবে এখানে।" বাড়ী ফিরে এসে বিজয় মার কাছে বায়না ধরে, তবে সে ঐ জেলে যাবে। মা হেসে বলতেন "ক্ষ্যাপা ছেলে জেলে যাবি কি করতে?" বিজয় উত্তর দেবার মত কোন যুক্তি খুঁজে পায় নাই, তবু সেই ভাললাগা যুবকের বলিষ্ঠ উজ্জ্বল চোখের মধ্যে এমন একটা জিনিষ দেখছিল যে এতটুকু ছেলে এইটুকু বুঝেছিল যে এরা চোরের জাত নয়, এদের জাত আলাদা। তারপর সব সমস্যার সমাধান করে দিল সেদিন গুইডলের নাগা-রাণীকে এখানে জেলে নিয়ে এল। চোদ্দ বছরের কিশোরী কি করে এই অশিক্ষিত নাগাবাহিনীকে সুসংবদ্ধ ক'রে সমস্ত বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন সে এক অভিনব ব্যাপার। আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ মারার সহজ কল তাদের জানা ছিল না। তীর ধনুকই তাদের পুঁজি ছিল একমাত্র। সামান্য তীর ধনুক নিয়ে সমস্ত ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পাগলামী যতটুকুই থাক না কেন, এই অশিক্ষিত দুর্দান্ত পর্বতবাসীর পরাধীনতার গ্লানি ও দেশপ্রেমের জলন্ত জ্বালা সেদিন উপেক্ষা করার উপায় ছিল না। তাই ব্রিটিশ সরকার নাগাদের সমরায়োজন দমন ক'রে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিল বন্দুকের ছিলা। নাগা পাহাড়ের আনাচে কানাচে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হলো। চোদ্দ বছরের কিশোরী এত বড় একটা শক্তিকে এমন ভাবেই বিব্রত ও বিচলিত ক'রে তুলেছিল সেদিন। ভারতের ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা। জনশ্রুতি শোনা যায় নাগাদের মধ্যে, স্বাধীন ভারতের কল্পনা তারা এঁকেছিল মহাত্মাজীকে একচ্ছত্র সম্রাট ও তাদের গুইডলের নাগা রাণীকে ভারতের সম্রাজ্ঞী করে। তাদের এ পরিকল্পনার ভিত্তি কিছু থাক বা না থাক কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন ও জলন্ত স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত বটে। নাগা রাণীর বিচার, প্রদেশপালকের উপর রেখে স্বস্তি মিলল না। তাই কেন্দ্রিয় সরকার স্বহস্তে

সে ভার তুলে নিল। বয়স অল্প, প্রাণদণ্ড দেওয়া চলে না, কিন্তু তার কঠোর অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ক'রে রায় বের হলো। তাকে রাখা হলো পৌঢ়াটী জেলে। অনভ্যস্ত, গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ওইডলের বীর কিশোরী। পণ্ডিতজীর কাছে আবেদন জানালেন ঠাণ্ডা কোন স্থান পরিবর্তনের জন্য।

দু'দিন খুব ঘটা করে জেলের ছোট্ট ঐ সেলটা তৈরী হলো। কারাগৃহ তো নয় অন্ধকূপেরই নামান্তর বলে চলে। প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত, উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বর্দ্ধিত, রাজকন্যা বন্দিনী হয়ে, দীর্ঘদিনের জন্য বাসর শয্যা পাতলেন এই ছোট্ট লৌহ বাসরে। বিজয়দের মত কয়েকটী ছেলের মনেও সে কি আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বিক্ষোভের কত দফায় দফায় অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ও জেলগেটের পাশ দিয়ে চিৎকার করে কতদিন গিয়েছে "ওইডলের রাণীর মুক্তি চাই"—"মুক্তি চাই,"আজো মুক্তি হয় নাই। যাবার আগে বিজয় দেখে যেতে পারল না। কে জানে কবে মুক্তি হবে।—

বিজয়রা যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসে, তখন সে বছরখানেকের শিশু। ওর বাবা ছিলেন একজন বড় কেমিষ্ট। ব্রহ্মদেশের কোন এক মফঃস্বল সহরে, এক ইউরোপীয়ান কারখানায় উচ্চপদস্থ এবং সম্মানিত কর্মচারী ছিলেন। শুধু তাই নয়, রসায়ন শাস্ত্রের এমন এক তত্ত্ব নিয়ে গবেষণায় রত ছিলেন যে ওঁকে সব কাজ অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় ফেলে রেখে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে ব্রহ্ম-দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। পিতার কষ্টলব্ধ অর্থে অর্জিত বিদ্যা; জীবনের উন্নতির মুখে এত বড় বাধা দিতেও ব্রিটিশ সরকার পিছপা হননি সেদিন। বিজয়ের মনে নেই সে সব কোন স্মৃতি। শুধু মার কাছে শুনেছিল সেসব দিনের। রাত নাই, দিন নাই, বাবা খাটতেন সেই গবেষণাগারে। রসায়ণ শাস্ত্রেরই কি একটা বিষয় নিয়ে পরীক্ষা ক'রে চলেছিলেন। কৃতকার্য হতে পারলে একসঙ্গে ৫০০০৲ টাকার পুরস্কার। উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন বিজয়ের বাবা, কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর মাসখানেকের মধ্যেই সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করবেন; সার্থক হবে তাঁর শ্রম ও সাধনা। উঁচু আশা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মানুষ মনে মনে অনেক নতুন কল্পনার জাল বুনেছিলেন; বিধাতা আড়ালে হেসে তাঁর ভাগ্য-ফলের চাবি ঘুড়িয়ে দিলেন অন্যদিকে।

১৯০৫ সাল। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন বাঙলার বুকে এক বিক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। বিজয়ের ঠাকুরদা ছিলেন সেই যুগেরই। স্বদেশী মন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিলেন; আঙুলে সূচ ফুটিয়ে, সেই রক্ত দিয়ে স্বদেশী মন্ত্রের প্রতিজ্ঞা পত্র লিখে। আজীবন তাঁরা পালন ক'রে গেছেন তাঁদের প্রতিজ্ঞা; তাই হাটুর উপর হাতে কাটা খদ্দরের ধুতি চাদর পরে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। সেই বাপেরই ছেলে বিজয়ের বাবা। বাপেরই মত তাঁর স্বদেশপ্রেম, বাপেরই মত তিনি তেজস্বী—তবে প্রকাশটা অন্যরকম।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। অথচ ব্যবসাটা বিদেশী সরকার নিজেদের একচেটিয়া করে নেয়। এ দেশ থেকে সস্তায় যায় কাঁচা মাল, ইউরোপ থেকে তা আসে পাকা হয়ে; এদেশ থেকে যায় হিমালয়ের উদ্ভিজ পদার্থ বিদেশ থেকে ঔষধ তৈরী হয়ে আসে, ভারতবাসী সেই বিলিতি ঔষধই তিন ডবল দামে কিনে নেয়। দেশীয় শিল্পের ও বাণিজ্যের এত বড় বিপর্যয় বিজয়ের বাবার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে দিল। তাই বড় বড় সরকারী চাকরীর আশা মন থেকে জলাঞ্জলি দিয়ে, আমেরিকার চিকাগো সহরে দীর্ঘ চার পাঁচ বছর রসায়ণশাস্ত্রে গবেষণা ক'রে দেশে ফিরে এলেন। কেমিষ্ট, বিশেষ করে বাঙালী কেমিষ্টের সংখ্যা তখন খুব কমই ছিল। কিন্তু থাকলে কি হবে? বিদেশী সরকারের কাছে মাথা নিচু করলেন না। রাজ খেতাবের মোহ, সব গৌরব ও যশকে উপেক্ষা করে "Drug Association" প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। বিদেশি ঔষধের উপর আস্থা নেই জনসাধারণের। এ লজ্জা দেশের লোকের যেমন, যাদের আস্থা নেই তাদেরও তেমনি। আস্থা নেই বলেই তো আস্থাহীন কাজ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। তরুণ কেমিষ্ট, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য

উৎসাহ নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। "ঈশ্বরে ভেজাল দেবে না। সৃষ্টি নিখুঁত এমন জিনিষ তৈরী চাই বিলিতি জিনিষের কাছে ভারতের উৎপন্ন জিনিষ যেন ম্লান না হয়।"—সেই সময় ডাক এল বর্মা থেকে, কেমিষ্ট্রির কি একটা গবেষণার ভার তাঁকে নিতে হবে। এ ডাককে উপেক্ষা করতে পারলেন না। রেঙ্গুন থেকে মাইল কয়েক দূরে মফঃস্বল সহরে তাঁরা থাকতেন। সহরের পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেছে ইরাবতী নদীর ছোট্ট একটা ফালি। বিজয়ের মনে নেই তার কিছুই; শুধু মার কাছে গল্প শুনেছে তাদের প্রথম জীবনের "সুখের ঘর কল্পারি।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে তখন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতির কাজ, এবং প্রত্যেক জীবন যাপন দু'ই সমান তালে চলেছে। যবনিকার অন্তরালে কত ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর আত্মবলী হয়েছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা নেই তাঁদের নাম; ক'জনের নামই বা থাকে লেখা! স্বাধীনতার বন্ধুর পথ তাঁরা রাঙিয়ে দিয়ে যান বুকের রক্ত দিয়ে। সেই পথ অনুসরণ ক'রে চলে স্বাধীনতাকামী তীর্থপথের যাত্রীরা। সারা ভারতে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান শুরু হয়েছে। বিপ্লবী অমল বোসকে পুলিশ ধাওয়া করে আনল বাঙলা থেকে সুদূর ব্রহ্মদেশে। ছদ্মবেশে অমল বোস এসে আশ্রয় নিলেন ব্রহ্মদেশের ছোট্ট

মফঃস্বল সহরে, বিজয়ের বাড়ীতে। বিজয়ের বাবা মা আশ্রয় দিলেন সেই কেরারী আসামীকে। পুলিশ এ খবর পেয়ে একদিন রাত ওটায় ঘিরে ফেলে বিজয়দের বাড়ী। শীতের অমাবস্যার রাত্রি; তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিঝুম নিশুত পল্লীর বুকে পুলিশের বুটের আওয়াজ এক তীব্র আর্তনাদের সৃষ্টি করল। অমল বোস চঠাৎ জেগে উঠলেন এ আওয়াজে, আন্দাজ করে নিলেন ব্যাপারটা। বিজয়ের মা বাবার কাছে বিদায় চেয়ে বল্লেন "আমি চললাম—ধরা দিতে পারি না পুলিশের কাছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না; হয় পালাব নয় মরব।" পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বাড়ীর পেছনের একটা রাস্তা দিয়ে চলে গেলেন অমল বোস। পরে খবর পাওয়া যায় পেগুর কাছাকাছিই কোন এক জঙ্গলে পুলিশের লোকের সঙ্গে গুলি বর্ষণের ফলে তাঁর প্রাণ যায়। এখানেই অমল বোসের জীবনের 'ইতি'। কিন্তু এই 'ইতি'র সঙ্গে সঙ্গে রাজরোষের ইতি হলো না। সেই যন্ত্রি এসে পুড়িয়ে ছাড়খার ক'রে দিল এই ছোট্ট সুখের সংসার। বৈজ্ঞানিকের সাধনা ও কল্পনা। বিজয়দের বাড়ী তল্লাস করে পুলিশ পায় নাই কিছুই, খানকতক কাগজপত্র ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, ভক্তি যোগের অশ্বিনী দত্তের উক্তি, আরো খানকতক রাজনৈতিক ব্যাপারে বন্ধুবান্ধবের চিঠিপত্র। কিন্তু যে সাম্রাজ্য এই লিখিত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশাল আয়তনে সে রাজত্বের বিস্তৃতি যত বড়ই হোক না কেন, প্রতি পদেই তার সূর্যাস্তের ভয়। তাই এত বড় সশস্ত্র রাজশক্তি কেবল খুঁজে বেড়ায় কাগজের উপর কালির আঁচড়।

চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশে বিজয়ের বাবা শুধু সে সহর নয়, ব্রহ্মদেশ ছেড়ে চলে যাবার আদেশ পেলেন। কোথায় পড়ে রইল বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরী, তাঁর গবেষণাগার; বৈজ্ঞানিক পত্নীর সাজানো সুন্দর সংসারের সব কিছুই রইল পড়ে। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ নেই। কার্গো (মাল জাহাজ) করে তিনটি শিশু সন্তান ও স্ত্রী সহ রওয়ানা হলেন। জীবনের সব সাধনা কামনা ও উন্নতির আকাঙ্খাকে সুদূর ব্রহ্মদেশে ফেলে রেখে গেলেন।

কলকাতার জেটিতে জাহাজ পৌঁছিবার আগেই বিজয়ের বাবাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। ছাড়া পেলেন মাস কয় পরে; কিন্তু বর্মার সেই বৈজ্ঞানিক আর ফিরে এলেন না। এক মুখ দাড়ি নিয়ে যিনি ফিরে এলেন তার আশা ক্ষুব্ধ অন্তরের মর্মান্তিক নৈরাশ্যই অবসন্ন চোখের চাহনিতে ফুটে উঠে। সরকারী চাকুরীতে উন্নতির পথ এখানেই তার শেষ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, রাজরোষের দাগী আসামীকে আমল দিল না বে-সরকারী অর্দ্ধ সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানই।

জীবনের উন্নতির মুখে এ বাধায় বিজয়ের বাবার মনেও যেন কেমন একটা অবসন্নতা এনে দিয়েছিল। কোথাও আর মাথা নোওয়াতে পারলেন না। এ ধরণের লোকদের সরস্বতীর কৃপা যতই থাক্ না কেন লক্ষ্মীর কৃপা হয় না। বিজয় ওরা পাঁচটী ভাই বোন। মা ব্যস্ত হয়ে উঠ্লেন। 'অর্থের অভাবে শেষকালে ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে না? সন্তানেরা বড় হলে ওদের কাছে এবং নিজের কাছেই বা কি জবাব দেবেন? সংসারে টেনে এনে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারা, মানুষ করতে না পারা,—সন্তানদের উপর শুধু যে অবিচার, তা নয়, এ নীতিমত পাপ।'

শেষকালে এসে কাজ নিলেন এই পার্বত্য ভূমির স্থানীয় একটা হাইস্কুলে। কিন্তু অভাব কি তাতেই মেটে? কি সংগ্রামই না করতে হয়েছে বিজয়ের মাকে। ঘরে বাইরে এক টানা বিশ্রাম হীন কর্ম; কিন্তু তবু সেই সদা হাস্যময়ী রমণীর সহজ স্বাভাবিক হৃদয়ের এতটুকু বিকৃতি হয়নি। এক ঘেয়ে কর্ম তার অন্তরে কোন অভাব অভিযোগের গ্লানি আন্তে পারে নাই। দুঃখের ভিতর দিয়া সংগ্রামের ভিতর দিয়া সমস্ত বিশ্বকে তিনি আপনার করে নিয়েছিলেন; তাই যেখানে যত ভাগ্যহীন নিরাশ্রয়, এসে আশ্রয় পেত তাঁর কাছে।

এশিয়ায় চীন জাপানে যুদ্ধ বেধেছে কিছুদিন যাবত বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের ইঙ্গিত হের হিটলারের বক্তৃতায়, ধর্মযাজক পোপের ঘোষনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খবরের কাগজ, গরম গরম খবর চারিদিকে পরিবেশন করে বেড়ায়। ঘরে ঘরে ভাবী সংগ্রামের আলোচনা, আসন্ন মহাসমরের আশঙ্কায় শান্তিপ্রিয় জনসমাজ আতঙ্কিত ও চঞ্চল হয়ে উঠেন। হঠাৎ আবার একদিন খবর বের হয়, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হের হিটলারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মিতালী পাতিয়েছেন; বিশ্ববাসী এ খবরে আশ্বস্ত, মহাসমরের পথে বাধা পড়্ল ভেবে। কিন্তু মহাশক্তি সঞ্চয় ক'রে বিজিত জার্মানের রুদ্ধ আক্রোশ থেকে থেকে গুমরিয়ে উঠ্তে লাগ্ল। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যেখানে শাসক এবং পোষক জাতির এতখানি আধিপত্য ও অবিচার, সেখানে শাসিত ও শোষিতের হৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনার গরল একদিন উপরে উঠে সমস্ত পৃথিবীতে প্লাবন এনে দেবে। নীলকণ্ঠের মত সে বিষ কণ্ঠস্থ করার শক্তি কারো নাই, সুতরাং ধ্বংস অনিবার্য। এদিকে ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াও খুব স্বচ্ছ নয়। মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযান, বিপ্লবীদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আন্দোলনের ধকার ধকার, দেশবাসী বিদেশী সরকারকে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিলেন যে আন্দোলন থামলেও তাদের দাবী থামবে না; তাই ১৯৩৫ সালের শাসন পদ্ধতি ভারতে প্রবর্তন ক'রে শাসক বর্গ অদূর ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাস দিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সাময়িক চাপা দিতে চাইলেন, কিন্তু নেতারা সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তাদের অভিমত, তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র চান, কিন্তু ব্রিটিশের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র নয়, সে রাষ্ট্রে প্রত্যেকটী দেশবাসীর স্বার্থকে স্বিতিকে স্বীকার করা হবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রই এ দেশের কাম্য। আসন্ন পৃথিবী সমরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের দাবীও মাথা তুলে দাঁড়াল। দেশের বিপ্লবী কর্মীরা বলে উঠলেন "লাগুক্ যুদ্ধ। রক্তের বদলেই ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আন্তে হবে।" শান্তিপ্রিয় জনসমাজও যেন অপেক্ষা করে আছে, বিরাট বর্ষণের পরে ভারতের স্বচ্ছ ভাগ্যাকাশে দেখতে পাবে স্বাধীনতার আলো।

.....

বিজয়ের মনেও সোয়াস্তি নেই, কোথায় কি যেন এক দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে মনে। মাকে মাঝে মাঝে বলে "মা আমি ও আমার এক বন্ধু পৃথিবী পর্যটনে বের হব।" মা জিজ্ঞেস করতেন "তোর কোথাকার বন্ধু"। "এমনি এক পরিচিত ছেলে আসবে ক'দিনের মধ্যে"। "বেশ তো আসুক, তখন দেখা যাবে।"

২০।২১ বছরের, নাম তার সুদর্শন ভদ্র, কাল ছিপছিপে চেহারার একটী ছেলে একদিন এসে হাজির। মার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগে উঠে, ছদ্মনামধারী কোন এক বিপ্লবী বলে। পরিবারে বর্দ্ধিত, মা বাপ ভাই বোনের স্বাভাবিক স্নেহে সিক্তিত এ ছেলে নয়।

অজানা আশঙ্কায় মার মন ভরে উঠে। বিজয়কে নিরালায় জিজ্ঞেস করলেন "হ্যারে সত্যি বলত ওর নাম কি সুদর্শন ভত্ত? আমার যেন কেমন সন্দেহ লাগছে, ছদ্মনামে কোন এক রাজ আসামী নয়তো? বিজয় প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল; হেসে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বল্লে, সাথে বলে :—

"সাত কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালা করে মানুষ করনি।"

বিজয়ের মাও হেসে ফেললেন; কিন্তু মনের মাঝে সন্দেহের একটা কাটা কেমন যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল। স্বাভাবিক জীবনের বাইরে যদি আজ তার পথ বিজয় বেছে নেয়, যাদা তিনি দেখেন না সত্যি, তাদের জয়যাত্রার সাফল্য কামনাই করে যাবেন, তবু তার অনেক দুঃখে ও কষ্টে মানুষ করা সন্তান তাঁর দেহের অণু পরমাণুতে গড়া, তাঁর মেহ মজ্জায় পুষ্ট, তাঁর নাড়ী কাটা ধন ওরা। তাই সহজ ও স্বাভাবিক জীবনে তাদের সুখীই হয়তো দেখতে চেয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রেই সুদর্শন বিজয়কে বল্লে "বিজয় আর সময় নষ্ট করা যায় না। কালই চল বেরিয়ে পড়ি।" "কাল? ছোট বোন রাণীর জন্মদিন। প্রতি বছর কত করে লেখে, একবারও থাকতে পারি না ভাই" মিনতির করুণ আবেদনের মতনই বেরিয়ে এল বিজয়ের এ কথাগুলি। চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বিজয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে গিদ্ধস্বরে সুদর্শন বল্ল "বন্ধু এ পথের পথিক যারা, তাদের এসব বাদ দিতে হয়। এমনি কত অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়েছিলাম বলেই, আজ আমার এ পথ এত সহজ ও স্বাভাবিক। কোন উৎসবকে উপলক্ষ্য করে অপেক্ষা করলে সময় আর মিলবে না ভাই সমস্ত জীবন ভরে কেবল অপেক্ষাই করতে হবে।"

.....আজ রাণীর জন্মদিন; এ কথাটা মনে হ'তেই ভোরের স্নিগ্ধ আবহাওয়া ও যেন বিজয়ের মনে বিষণ্ণতার আঁচড় কেটে দিল। আজই চলে যেতে হবে। মাকে জানানো যায় না কিছুই। মা আগেই বলে গেছেন "সুদর্শন যাবে যাবে করছে; আজকের দিনটা যেন থেকে যায়।" সে সব কথার কোন উত্তর দেয়নি বিজয়। মা আজ ব্যস্ত থাকবেন সারাদিন, এই সুযোগেই আজ তারা পালাবে। প্রথম যাবে চাটগাঁ, তারপর বর্মা, ব্যাঙ্কক, চীন ইত্যাদি স্থানে। নতুন মন্ত্রে বিজয় দীক্ষিত হবে, হাতে খড়ি হবে এই নতুন বিদ্যার।

বেলা ১২টার সময় বিজয় বাড়ী এল। মা গেছেন স্কুলে, ছোটবোন জন্মদিনে, স্কুল কামাই করে গেছে বন্ধুদের নেমন্তন্ন করতে। বাড়ীতে আছে শুধু নমিতা। রক্তের সম্পর্কে নমিতা তাদের কেউ নয়; কিন্তু বহু বছরের ঘনিষ্টতায় নমিতা এই পরিবারেরই সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। সে এই পরিবারেই মেয়ের মত মানুষ হয়েছে।

দুপুরে বিজয়ের কারখানা থেকে ফিরতে যখন দেরী হয়, নমিতাই এসে খেতে দেয়। বিজয়কে দেখেই নমিতা তাড়াতাড়ি উঠে এল, ভাত বাড়তে বাড়তে ব'ল্ল "কি ভয়ানক দেরী করেছ বিজয়; সব ঠাণ্ডা কড়কড়া হয়ে গেছে।" বিজয় হন্ত দন্ত হয়ে রান্না ঘরে নমিতার পেছন পেছন ঢুকে জিজ্ঞেস করল "তুমি আজ কলেজে গেলে না নমিতাদি?" নমিতা অবাক্ হয়ে বল্ল "তোর কি হয়েছে বলত? আমার সকালে কলেজ। দুপুরে কোনদিন আবার কলেজ থাকে?"

অপ্রস্তুত ভাবে বলে ওঠে বিজয় "ও তাইতো মনেও থাকে না কিছু। এক্ষুনি আমায় বের হতে হবে; তাড়াতাড়ি ভাত দাও।" স্নান না করেই বিজয় খেতে বসল। চুলগুলি উস্কো খুস্কো, কেমন একটা আনমনা ভাব। সমস্ত মুখে যেন বিষণ্ণতার একটা ছায়া নেমে এসেছে। খেতে খেতে টেবিল থেকে উঠে এল বার দুই। সুদর্শনের কাছে গোবার ঘরে গিয়ে কি যেন বলে এল। এমন একটা অস্থির চঞ্চল ভাব। নমিতার সন্দেহ হলো,—বিজয়ের কাছে গিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বল্ল "বলে ভাল করে খা বিজয়। এমন অস্থির ভাবে পায়চারী কেন করছিস্? কি হয়েছে?" জোর করে হেসে ব'ল্ল হবে আবার কি? খেয়ে এক্ষুনি বের হতে হবে। বসে

খাওয়ার সময় কোথায়?" বিজয়ের সে হাসি গূঢ় অভিসন্ধির ছদ্মবেশ ; কিন্তু অনভিজ্ঞ নমিতার চোখে ধরা পড়্‌ল না। নমিতা বল্ল "কেন এত দেরী করে খেতে এলি ; যাক্ আজ বিকেলে তাড়াতাড়ি আসিস্। স্বামীর জন্ম-দিন। খুব ভাল খাওয়া নিমন্ত্রণ করব আমি" বিজয় খুসীর ভান দেখিয়ে উত্তর দিল বিলক্ষণ ডান হাতের কাওটা খুব ভাল করে চালাব।" নমিতার পরীক্ষা সামনে—দেরী না করে পড়্‌তে চলে গেল তার এক সহপাঠীর কাছে। আসার সময় সুদর্শনের হাতে বাধা বিছানাটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আবার চলে এ'ল ভাব্‌তে ভাব্‌তে "আজ তো সুদর্শনের যাওয়ার কথা ছিল না।"—পড়্‌তে এসেও নমিতা পড়ায় আর কিছুতেই মন দিতে পার্‌ল না। সুদর্শনের আকস্মিক চলে যাওয়া কেমন যেন একটা সন্দেহের ডাল পালা গজাল তার মনে। বিজয়ের অস্থিরতা, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সব কিছু যেন তার কাছে এক অজানা না বলা আশঙ্কার সৃষ্টি করল। প্রতিদিন দুপুরে খেতে এসেই বিজয় যার খোঁজ করে। আজ কেন একবারও সে জিজ্ঞেস করল না?'

.....অন্য অন্য যাত্রীর সঙ্গে, সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, বিজয় ও সুদর্শন মোটরে উঠে বস্‌ল। পার্বত্যভূমি অতিক্রম করে যাত্রীবাস্ উৎরাই ও চড়াই পার হয়ে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। প্রকৃতির অঢেলো সৌন্দর্য বনভূমির চারপাশে নন্দন কাননের সৃষ্টি করেছে। বন্যফুলে আলো হয়ে রয়েছে বনভূমি। কোথাও গভীর নিবিড় পাইন বন। দিনের বেলা ও সূর্যের আলোকে চুরি করে ঢুক্‌তে হয় সে বনে। ফাল্গুনী হাওয়া পরশ বুলিয়ে দিয়েছে সেই পাইন অরণ্যে। তাই সরসর একটানা শব্দ কিছুতেই আর থাম্‌তে চায় না। মাঝে ঝর্ণার কলতান—উদ্দাম গতিতে বিদ্রোহী ঝর্ণা গান গেয়ে বয়ে চলেছে।

কতবার বিজয় এ রাস্তায় এসেছে যার সঙ্গে। প্রাণ ভরে পথের সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। আজও সামনের দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করবে যতবার ভাবে, পারে না, পেছনে ফেলে আসা দিনগুলি তাকে টেনে নিয়ে যায়। দু'চোখ বিজয়ের জলে ভরে আসে ; বাধা মানে না। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। খেয়াল হলে চোখ তাড়াতাড়ি ক'রে মুছে নেয়। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলেই যেন বলে উঠে :—"আমি বিপ্লবী ; এ 'যাত্রা' পথে, আমার কোন আকর্ষণই পেছনের দিকে থাকতে পারে না।

"তীরের সফল যা পড়ে থাক্ তীরে
তাকাস্ নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে।"

—আবাহন—

শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য

প্রিয়া, ধরণীর বুক ভরে গেছে হাহাকারে—
মনে জাগে লাজ সাজাতে তোমায়
কুসুম রতন হারে।
বাতাসে জাগিছে কত ব্যথিতের শ্বাস,
ভেঙ্গে যায় হায় কত সুখ কত আশ,
প্রেমের প্রদীপ নিভে নিভে যায়
গভীর অন্ধকারে।

তোমায় আমার আঙিনার তলে
ক্ষুধিত জনতা কাঁদে ;
কাঁদিছে জননী সন্তান বুকে
মা হওয়ার অপরাধে।
যেতে হবে মোরে খুলে নাও ফুলডোর,
বিদায় বেলায় ফেলিওনা আঁখিলোর,
পারো যদি তুমি এসো মোর সাথে
মিলন রাত্রি পারে।

শিক্ষার অর্থ

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

শিক্ষা বলিতে অধুনাতন কালে আমরা কি বুঝি কি আমাদের বোঝা কর্তব্য অর্থাৎ শিক্ষার কোন অর্থ গ্রহণ করিলে বর্তমান এবং ভাবী সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইবে তাহা একবার সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানের উপর ভবিষ্যৎ যে সর্বতোভাবেই নির্ভরশীল এ কথা অস্বীকার করিবার মত মূর্খতা কাহারও নাই। অতএব, ভবিষ্যৎ কালের জাতির জন্য গৌরবোজ্জ্বল জীবনই যদি আমাদের কাম্য হয় তবে তাহার জন্য বর্তমানেই আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এবং তাহা করিতে হইলে এমন ভাবে আমাদের জীবনের পদ্ধতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, জীবন চলার এমন পথ নির্বাচন করিতে হইবে যাহা আমাদের উত্তর পুরুষের জীবনকে প্রভাবিত করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ পথে চলিতে অনুপ্রাণিত করে।

জীবনে পথটিকে নির্বাচন করিয়া লওয়া সর্বাপেক্ষা দুষ্কর কার্য—কেননা একমাত্র ইহার উপরই আমাদের অতীতের পরিচয়, বর্তমানের পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য-বোধবিমণ্ডিত নির্লোভ কল্যাণকামী শুভবুদ্ধির প্রকাশ এবং অজ্ঞাত ভবিষ্যতের নিকট হইতে আমাদের পক্ষে যাহা শ্রেয় তাহাকেই গ্রহণ করিবার ক্ষমতার পরিচয় নির্ভর করিতেছে। এই পথটিকে নির্বাচন করিতে পারাতেই আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তি সমস্ত কিছু প্রতিফলিত হয়। অতএব যে শিক্ষা এই পথ নির্বাচন করিতে আমাদের দৃষ্টিকে সাহায্য করে, আমাদের চিত্তকে জাগ্রত করে, বৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে সচল রাখে সেই শিক্ষাকেই আমরা গ্রহণ করিব।

ইহা করিতে হইলে শিক্ষার তাৎপর্যটিকে বুঝিয়া লওয়া চাই। আজিকার দিনে আমরা—অর্থাৎ যাহারা আজ পর্যন্তও ছাত্র-জীবন অতিক্রম করিয়া যাই নাই তাহারা—যে ভাষায়, যে ভাবে কথাবার্তা বলিয়া থাকি তাহাতে আমরা যে শিক্ষিত তাহার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কিন্তু সেই আমাদের শিক্ষা যে কত অকিঞ্চিৎকর, আমাদের জীবনের প্রয়োজনের পক্ষে তাহা যে একেবারেই ব্যর্থ তখনই তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যখন সাংবাদিকতার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা-চালচলনে-বেওয়া শিক্ষার রূপকে একার্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ, আজিকার দিনে যে যত খবর বলিতে পারিবে সে-ই তত বেশী শিক্ষিত। সিনেমা জগতের নায়ক-নায়িকাদের হাবভাব হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় তুচ্ছ সংবাদ যাহার আয়ত্তে সে-ই প্রকৃত শিক্ষিত এবং তাহারই প্রতিভা নাকি সম্মানের যোগ্য এইরূপ এক অস্বাস্থ্যকর মনোভাব অধুনাতন ছাত্রসমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতাকে অস্বীকার না করিয়াও এই কথা বলার কোন অপরাধ নাই যে ইহা শিক্ষা নহে; বরং এই স্বীকৃতিতে নির্জলা সত্যেরই প্রকাশ আছে। আমরা শিক্ষাকে নির্দয়, নির্বীর্য অবহেলার দূরে ঠেলিয়া দিয়া এই অসার অশিক্ষাকেই গ্রহণ করিয়া যদি গর্ব বোধ করি তবে সৌভাগ্যলক্ষ্মী একদিন অবশ্যই আমাদের ঘর্মাক্ত ললাটে বঞ্চনার রূপালেখন আঁকিয়া দিবেন।

আমাদিগকে অতিশয় দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমরা—ছাত্ররা—যথেষ্ট পড়াশুনা করিবারই অবকাশ জুটাইতে পারি না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা আপন আপন দুঃখদুর্দশা দৈন্যের সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়া জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞান তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ রূপ ইতর বিশেষ করিতে পারে না। আবার যাঁহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে একেবারেই নিশ্চিন্ত তাঁহারা সংবাদ পত্রের দ্বারা, সিনেমা দ্বারা, বিভিন্ন মতবাদের দ্বারা এমন ভাবে প্রভাবিত যে তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক হইতে রস ও বস্তু আহরণ দ্বারা নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিবার অবকাশই পান না। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এবং খুব সম্ভবতঃ ছাত্র সমাজের একটা বড় অংশ—কোন রাজনৈতিক দলের খাতায় নিজের নাম লিখাইয়া সেই দলের মতকে নিজের মত বলিয়া প্রচার

করিতে পারিলেই নিজেকে যথার্থ সম্মানিত বলিয়া মনে করেন, বিপক্ষ দলের নেতার—তা সে গান্ধীজীই হোন্ আর যিনিই হোন—নিন্দায় ইহারা উমুখ এবং সেই উমুখীনতার দ্বারা ইহাদের দৃষ্টি এমন ভাবে আচ্ছন্ন যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র অনুকরণ বা অনুসরণ করিবার কল্পনা তাহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। অর্থাৎ শিক্ষার অর্থ আজ আর জ্ঞান অর্জন, জ্ঞানবিতরণ সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনার জীবন ও কর্মপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করা, চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন, সত্যপ্রিয়তা, সততা প্রভৃতি গুণাবলীদ্বারা আপন আপন চরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি সাধন—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; পরন্তু তাহা অপ্রয়োজনীয় বিলাসীতার অজস্র উপকরণে, অন্যায় অসত্য ভণ্ডামি, অকারণ মিথ্যা প্রচার, অন্যের নিকট শেখা বুলির যথাযথ গলধঃকরণ এবং উদ্গীরণ প্রভৃতি দ্বারা ভারাক্রান্ত হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে। আর আপনার রক্ত জল করিয়া ইহার মূল্য যাহারা বহন করিয়া আসিতেছে সেই অতি বৃহৎ অসহায় লোক সম্প্রদায় দুর্বহ দারিদ্রের অসহ্য চাপে মুহ্যমান হইয়া অচেতনবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের ক্ষুধার অন্ন নাই, রোগের চিকিৎসা নাই, লজ্জা নিবারণের যথেষ্ট বসন নাই, শিক্ষার কথা না হয় চাপাই থাকিল। এখন প্রশ্ন হইতেছে আমাদের শিক্ষার ইহা সার্থকতা না ব্যর্থতা?

আমাদের ভুল হইয়াছে একেবারে প্রারম্ভেই। প্রচলিত যে সমাজ ব্যবস্থা—তা সে ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, সৎলোক অথবা দুষ্টলোক যাহার দ্বারাই পরিচালিত হোক—তাহারই নিকট আত্মসমর্পণ করিবার নির্বীর্যতা আমাদের শিরে অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছে। যাহা অন্যায়, যাহা অসত্য, যাহা আমার এবং আর দশজনের পক্ষে নিশ্চিতরূপে অকল্যাণকর তাহার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার মত সজীবতা আজ আর কাহারো মধ্যে নাই। যে পথ আমাদের জীবনকে হাহাকারময় করিয়া দেয় আমরা প্রথমেই সেই পথ ধরিয়া যাত্রা আরম্ভ করি এবং উপযাচক হইয়া কেহ আমাদের ভুল ধরাইয়া দিলে এই কার্যে তাহার অধিকার সম্বন্ধে অতি মাত্রায় সচেতন হইয়া আমাদের পথ নির্বাচনের পক্ষে যুক্তি দিয়া যাই অর্থাৎ অযৌক্তিক যুক্তির চাপে আমাদের শ্রেয়স্কর পথকে দূরে সরাইয়া রাখি। এ যুক্তিও অবশ্য বিদেশ হইতে আমরা শিক্ষা করিয়াছি।

নোট পড়া বিদ্যায় ইহার অধিক আর কি করিতে পারি? জীবনের পথকেও আমরা মেড-ইজি করিয়া লইতে চাই, কোন রকমে শিওর-সাকসেস টিকেট লইয়া শর্ট কাট ধরিয়া জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হইতে চাই। তাই যেমন জ্ঞানের সঞ্চয় হইতে ফাঁকি পড়ি তেমনি জীবন সংগ্রামেও পিছাইয়া যাই এবং এই অকৃতার্থতার জন্য হয় গভর্ণমেণ্ট নতুবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের উপর গালিবর্ষণ করি। বঙ্গ-ভারতীয় যে দুই একজন সন্তান আপনার ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকেন সংখ্যায় তাঁহারা নগণ্য এবং তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল এ্যাসেম্বলি হাউস অথবা কোন পার্টির নেতৃত্বপদ অতিক্রম করিয়া সমগ্র দেশের সমগ্র লোক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে না। তবে আর কাহার নিকট আশা করিব, কাহার মুখ চাহিয়া আমরা অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে বুক বাঁধিয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিব? কে আমাদের জীবনের আদর্শকে আবার সজীব করিয়া তুলিবে?

আজ কি আর দেশের সমগ্র ছাত্রসম্প্রদায়ের সম্মুখে সেই শিক্ষা তুলিয়া ধরা যায় না যে শিক্ষা সমাজের কল্যাণ কামনায় আত্মোৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করে, তাহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিজের জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে আগ্রহশীল করিয়া তোলে, ত্যাগের পথে, দুঃখের পথে সহজেই তাহাদিগকে চলিতে উৎপ্রাণিত করে। কয়েকখানি নোটবই পড়িয়া পাশ করা অপেক্ষা নৈতিক জীবনের মান উন্নত করা অধিকতর সঙ্গত এই কথা কি চিরকালের জন্যই ভুলিয়া যাইবার?

কিন্তু নোটবই পড়ি কেন? সহজে পাশমার্ক পাইব বলিয়া? পাশ মার্ক লইয়া পাশ করিয়া কি হইবে? চাকুরি জুটিবে। এবং সেই চাকুরিদ্বারা পরিবার বর্গের ভরণ পোষণ করিব। আমরা বহুদিন যাবৎ দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করিয়াছি—

তাহাতে আমাদের শক্তির স্ফুরণে বাধা পড়িয়াছে সন্দেহ
[illegible]কে এই ভাবে স্বীকার করিয়া
লইয়া [illegible] করণ মানসিক দিয়া আমরা দুর্বল।
আমরা এত বেশী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি যে সারা জীবন
কেরানিগিরি করিতে করিতে নিজেদের নেকধও বাঁকা
করিয়া ফেলি এবং আমাদের দুর্বলতাকে অধস্তন কয়েক
পুরুষের রক্তে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া অসার্থক বঞ্চনাময়
জীবন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে মরিয়া যাই; তাই
আমাদের নিতাকার দারিদ্র্যকে পৌরুষের দ্বারা স্বীকার
করিয়া আপনার আদর্শকে প্রাত্যহিক গ্লানিমার উর্দ্ধে স্থাপন
করিয়া সমাজকে সেই পথে অগ্রসর হইতে আহ্বান
করিবার কথা ভাবিতেই পারি না বরং কেহ ভাবিতেছে
জানিতে পারিলে তাহাকে উপহাস করি অথবা তাহার
চিত্তৈর্য হইলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করিয়া
থাকি সত্য কথা বলিতে কি আমরা নৈতিক জীবনকে
অস্বীকার করিয়াছি বলিয়া চারিদিক হইতে এমন করিয়া
বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, জীবনের পাত্রে অমৃতের
সঞ্চয় তাই আজ আর উছলিয়া পড়ে না—সে পাত্র আজ
অপূর্ণতার অভিশাপে রিক্ত।

অতএব শিক্ষার রূপকে পরিবর্তন করা আশু প্রয়োজন ছাত্রসমাজের স্কন্ধ অসংখ্য গ্রন্থের অনাবশ্যক চাপ হইতে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া তাহাদের জীবনের আদর্শকে উন্নত করিয়া তুলিবার যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া সম্ভব কিনা, তাহাতে তাহার জীবিকার্জন একেবারেই অসম্ভব কিনা, তাহার ভবিষ্যৎ পুরুষের তাহার সেই আদর্শে কোন লাভ হইবে কিনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আছে বলিয়া মনে করি। গড্ডালিকা প্রবাহের মত সবাই একদিকে না চলিয়া প্রত্যেকেই যাহাতে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বৃত্তিলাভ করিবার সুযোগ পায় এবং সকলেরই লক্ষ্য যাহাতে সমাজকে ধারণা এবং চালনার পথে নির্দিষ্ট থাকে তাহারই ব্যবস্থা করা আজ অত্যাবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে বড় হইবার পথ কণ্টকের পথ, কুসুমের নহে; সে-পথে দুঃখ আসে নির্যাতন আসে, অপমান আসে, তবুও অবহেলার তাহাদিগকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়া আপন জীবনের সুমহৎ এবং অত্যুচ্চ আদর্শ লোকসম্প্রদায়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন তাঁহারা নমস্য। তাঁহাদিগের পথ আমাদিগকেও ধরিতে হইবে। তাঁহারা অবহেলার নহে, অবজ্ঞার নহে। আমাদের মত মিথ্যাকে ছাপাইয়া তাঁহাদের একটি সত্য চিরকালই উজ্জ্বল। তাঁহাদের মহত্বে আমরা মহৎ হইব, তাঁহাদের ত্যাগে ও তপস্যায় আমরা শুদ্ধ হইব।

শিক্ষার অর্থ তাহা হইলে কি হইতেছে? না, যে অনুশীলন অথবা অভ্যাস আমাদের দেহ ও মনকে সুসমঞ্জসরূপে পূর্ণতা দান করে, আমাদের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত করে, সত্যক্রিয়তা, ন্যায়পরতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী স্বীয় জীবনে প্রতিফলনে সহায়তা করে; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে শিরদাঁড়া সোজা মাথা উঁচু রাখিবার মত বল দান করে, যে অনুশীলন অথবা অভ্যাস জীবনের গতিকে সমাজমুখী করিয়া তোলে, দরিদ্র দেশবাসীর প্রতি অবজ্ঞা অবহেলার বিমুখ করিয়া তোলে না, পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করিব তবু কুকুরের মত জীবন যাপন করিব না—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার মত আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করে এবং জীবনসংগ্রামে একেবারেই পঙ্গু করিয়া দেয় না তাহাই শিক্ষা এবং এই শিক্ষাকেই আজ গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের দেশে শিক্ষার এই দিকটাকেই বড় করিয়া তুলিবার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র কয়েকজন কর্মীর কয়েকটি কেন্দ্রে আবদ্ধ পরীক্ষামূলক কার্যমাত্র হইলে চলিবে না। দেশবাসীকে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের প্রতিটি ব্যক্তি যাহাতে ইহারই আদর্শে জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ না করিয়াও স্বীয় জীবনে এই শিক্ষাকে আংশিকভাবেও প্রতিফলিত করিতে পারা যায় এই কথা উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই অংশটুকুর শক্তিও অবহেলার নহে।

অর্থাৎ জীবনের আদর্শ শিক্ষারম্ভের পূর্বেই স্থির করিয়া লইতে হইবে। এবং সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অক্লান্ত অধ্যাবসায়ের সঙ্গে ক্রমশঃ

অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন সুশৃঙ্খল হইবে—নতুবা কেবলি কি হইবে কি করিব—এইরূপ হতাশায় জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। একজন ভারতবাসীর জীবনের আদর্শ কি হইবে তাহাও যদি বলিয়া দিবার আবশ্যক থাকে তবে বুঝিতে হইবে আমাদের মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার কোন সম্ভাবনাই নাই। বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষ তাহার ধর্ম, তাহার জীবন চলার পদ্ধতি বহুবিধ অভিজ্ঞতার দ্বারা স্থির করিয়া লইয়াছে। আজ যদি তাহার কোন কিছুই আমাদের মনে রেখাপাত না করে এবং আদর্শ শব্দটি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পশ্চিমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ একেবারেই অত্যাবশ্যক হয় তবে আমাদের মরিয়া যাওয়াই ভাল। অন্ততঃ সে মৃত্যু আত্মসম্মানের জন্যই আবশ্যক। যাহা ধ্রুব, যাহা শত আঘাতেও বিচলিত হয় না, যাহা যৌনজীবন, যাহা সুন্দর কঠোর তাহাকে গ্রহণ করিবার দৃঢ়তা আমাদিগকে অর্জন করিতে হইবে—যথার্থ ভারতবাসী হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে। তবেই আমরা যথার্থ স্বাধীন, যথার্থ শিক্ষিত, যথার্থ সম্মানিত জাতি হইব—অন্যথা নহে।

অবলম্বন

লক্ষ্মীদেবী

এবার আপন ঘরে ডাক এসেছে
ওরে খেলার যাত্রী,
শেষ ক'রে নে পাওনা দেনা—
পথে নামে রাত্রি।
দু'দিনের এই খেলা ঘরে—
কতই খেলা খেলিলি রে,
আপন ভোলা মায়ায় ভুলে—
কর্‌লি স্থায়ী কল্পনা,
আপন পরের আদান প্রদান—
হিসাব নিকাশ অল্পনা।
স্নেহের বাঁধন বাঁধলি শুধুই—
মূল্য তাহার মিল্‌লো না,
দুয়ার খুলে সাধলি কতই
প্রেমের ঠাকুর শুন্‌লো না।

কত ফাগুন মধুর রাতে—
নবীন-জীবন স্বপ্নে মাতে,
বাদল ধারায়—কাঁদন সাথে—
কাঁদলিরে তুই পাগলা ভোলা,
সেই বিরহের কৃত্রিমতায়—
ভুল্‌লিরে তুই বিফল দোলা।
সত্য যাহা, মূর্ত যাহা—
সেই আসলে পিছন ফেলি,
পথে ক্ষণিক সুখের লাগি—
গড়লি কতই নকল পুলি!
অভিনয়ের রঙ্গালয়ে—
রাখ্‌লি গোপন যে ধন ভরে,
জেনেও যাহার অসীম রূপে।
সসীম দিয়ে রাখ্‌লি ঢেকে,
অবহেলার সেই নিধি আজ—
ভাগ্যে জয়ের টীকা আঁকে।

এপিঠ ওপিঠ

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

—চিত্র—

বাঙ্কলার চুরার্স থেকে ফিরছি। দেড়া মাশুলের একখানি ছোট কামরায় যাত্রী উঠেছে নির্দিষ্ট সংখ্যার দেড় গুণ বাঙ্ক বিছানার ওপর লোক যখন ছাপিয়ে উঠল, তখন কেউ দাঁড়িয়ে কেউ দরজার ওপরে কোনো রকমে ব'সে গভীর আগ্রহ সহকারে লালমণির হাট কখন পৌঁছিবে তার তীব্র আলোচনায় মত হ'য়ে উঠলেন।

বিতৃষ্ণ ভাবে এক ভদ্রলোক বললেন: কেন যে ছাই টাইম টেবল এরা আজকাল ছাপে না!

আর একজন বললেন: অথচ যখনই জিজ্ঞেস করুন, বলবে, একটু আগেই ছিল, এইমাত্র শেষ হ'য়ে গেল। ভাবটা এই রকম যে রোজই তারা টাইম টেবল ছাপচে আর রোজই ফুরিয়ে যাচ্ছে।

বাঙ্কের ওপর থেকে এক তৃতীয় ভদ্রলোক নিচে চতুর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন: আপনিতো মশাই রেলের লোক, কখন এই নরক যন্ত্রণার শেষ হবে বলতে পারেন না?

ভদ্রলোক তার মোটা ফাইল থেকে মুখখানা তুলে বললেন: হবে কোনো এক সময়।

সেই তৃতীয় ভদ্রলোক একটা ভেংচি কেটে বললেন: সেকি মশাই, রেলের চাকরি করেন, অথচ রেলের খবর রাখেন না!

বিরক্ত ভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: আপনার যুক্তি দেখছি সেই রকমের—বাবু যখন ভারত সরকারের কেরাণী, তখন জানা তার ভাই হ'য়ে কেন জানবেনা ভারত হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করবে কিনা!

ওপরের ভদ্রলোক পরাজয় স্বীকার করতে রাজি নন, বললেন: উপমাটি কি একই রকমের হ'ল?

উত্তর এল: তফাৎও বিশেষ নেই। আমি গ্রেনসপ অ্যাকাউন্টের টক ভেরিফায়ার, ট্রাফিকের আমি কি জানি মশাই?

বেড়া মাশুল দিয়ে বেড়া স্থান অধিকার ক'রে থাকার জন্য এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ আগেই আর পাঁচজনের সমালোচনার বস্তু হয়েছিলেন। শেষটায় এই দুর্মূল্যের বাজারেও তাঁর কলেবর বৃদ্ধিকে পরোক্ষে অবস্থিত এক বুদ্ধিহীন সৃষ্টি কর্তার ওপর অর্পণ ক'রে সবে পরিত্রাণ পেয়েছেন। নাকের ডগা অবধি মোটা কালো চশমা জোড়া নামিয়ে খবরের কাগজে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করছিলেন। এবারে কাগজখানা সরিয়ে একটা সন্ধি করবার চালে বললেন: আমাদের দোষ দিতে পারেন না, আমরা সাধারণ লোকে মনে করি রেলের লোক হ'লে যেন সব কথাই জানতে হবে।

ইন্‌স্পেক্টর সাহেব একটু নরম সুরে বললেন: তা জিজ্ঞেস করবারও একটা রকম আছে। ছেলেবেলায় পাঠশালায় নাম লিখিয়েছিলুম ব'লে যেন ধারাপাতখানা আজও মুখস্থ ক'রে রেখেছি।

ওপরের ভদ্রলোক বেশ একটা কড়া ধরণের জবাব দিতে যেয়েও থেমে গেলেন, একটা ষ্টেশনে এসে গাড়িখানা দাঁড়াচ্ছিল, জানালার সামনে একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখেই সবাই স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। ওপরের ভদ্রলোককে থামতে হ'ল নিচের লোকদের আকস্মিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে। সবার গায়ে যেন বিদ্যুৎ ছুইয়ে দেয়া হয়েছে।

প্লাটফর্মে একটি সাঁওতালি স্ত্রীলোককে বাঙ্গালী বেশে দেখা গেল। মেয়েদের বয়স ব্যাপারটা জন্মপত্রিকা না দেখে বলা শক্ত। এর বেলায় ত্রিশের কোঠায় আন্দাজ করা চলতে পারে। গায়ের রঙটা যদি সৌন্দর্যের একমাত্র মাপকাঠি না হয়, তা হ'লে একেও এদের আর পাঁচজনের মতো সুন্দরের পর্যায়ে ফেলা চলে। হাল্কা মদের রঙের একখানা রেশমি শাড়িতে শরীরটা ঢেকেছে। হাত গলা ও কানের সোনার গহনা কয়েক শ বছর আগের হিন্দু নারীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল।

একটা চামড়ার ব্যাগও আছে, সরু ফিতে দিয়ে কাঁধ থেকে ঝোলানো। পায়ে কালো জুতো, নিচু ব্রক করা গোড়ালি।

এরই সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটি সাহেব, বলিষ্ঠ দীর্ঘ পুরুষ, মাথার সোনালি চুল সাদা হ'তে এখনও শুরু করেনি, চোখের নীল মণি দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন স্থির ও ঘোলাটে, দৃষ্টি দিয়ে যেন নির্বাক কথা ক'য়ে চলছে।

যাত্রীরা যারা এগিয়ে গেছে তারা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, যারা পেছনে ছিল তারাও কী সন্দেহ ক'রে মুখ বার করল। আমরা এসে দাঁড়ালুম ঠিক তাদেরই সামনে। এই বগিখানারই শেষের অংশটা দ্বিতীয় শ্রেণী। কুলিরা মাঝখানের প্রথম শ্রেণীর কামরাটিতেই তৎপর ভাবে মালপত্র ওঠাতে লাগল।

সাহেবের আর্দালি যখন কুলির পয়সা মেটাচ্ছে, স্ত্রীলোকটির একখানা হাত তখন নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছে। মুখে যেমন তাদের কথা নেই, তেমনি সমস্ত যাত্রীর দৃষ্টি যে তাদের ওপর পড়েছে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। চমক ভাঙল গার্ড সাহেবের কথায়, ইংরিজিতে অভিবাদন ক'রে বললে: সময় হয়ে গেছে সাহেব।

ধ্যান ভাঙতেই সাহেব স্ত্রীলোকটির হাতখানা ছেড়ে দিল, মিনতির স্বরে জিজ্ঞাসা করল: আর এক মিনিট করতে পারনা গার্ড সাহেব?

মুখ থেকে বাঁশিটা সরিয়ে গার্ড উত্তর দিলে: রাইট ও।

কোটের ভেতর পকেট থেকে সাহেব তার টাকার থলি বার করলে। একশো টাকার নোটের একটা তাড়া থেকে একখানা দুখানা ক'রে দিতে দিতে একসময় সমস্তটাই দিয়ে দিলে। স্ত্রীলোকটির দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই একবার সাহেবের মুখের দিকে তাকাল, তারপর আন্দাজ ক'রে অর্ধেক ফিরিয়ে দিয়ে নিজেই সেই থলিটা সাহেবের বুক পকেটে গুঁজে দিল।

গার্ড সাহেবের বাঁশি বেজে উঠল। এবারে গার্ড সবুজ নিশান ওড়ালেন। ইঞ্জিনের ভাঙা গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর একপা দুপা ক'রে ট্রেণ চলতে শুরু করল।

সাহেবের মুখে তবু কথা যোগাল না, নিঃশব্দে চলতি গাড়িতে উঠে পড়ল। তার আর্দালিও দাঁড়িয়েছিল। এবারে সেও লাফিয়ে উঠল তাদের কামরায়। গার্ড সাহেব উঠলেন সকলের পরে, ঠেকার সাহেবকেও উঠতে দেখার পরে।

স্তব্ধ ভাবে স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে রইল প্লাটফর্মে, যতক্ষণ দেখা গেল সাহেব রুমাল নেড়ে নেড়ে তার শেষ কথাটি জানাতে লাগল।

প্যাসেঞ্জার ট্রেণ, সব স্টেশনে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই আসছে। কাজেই স্টেশনের নাম পড়বার বাসনাও কারও নেই, সৌন্দর্য উপভোগ করার ধৈর্যও সকলে হারিয়েছে। উপরের ভদ্রলোক তাই আমাদের আকস্মিক উদগ্রীবতায় ভেতরে ভেতরে জ্ব'লে উঠছিলেন। জানালার বাইরে থেকে মাথাগুলো ভেতরে আসতেই গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন বাঁদর নাচ হচ্ছিল বুঝি?

দৃশ্যটি অনেকের মনে দাগ কেটেছিল। দেশ ভাষা আচার ধর্ম—এরাই মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে ঠেলেছে। কিন্তু যে শাশ্বত শক্তি চিরকাল এদের পরাজিত করে এসেছে, সেই "প্রেমের" একটা খণ্ডরূপ দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলুম। ওপরের ভদ্রলোকের উক্তিটা তাই কারও ভাল লাগল ব'লে মনে হ'লনা।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা অসাড়তা সবাইকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল। এক সময় কোণের দিক থেকে এক ভদ্রলোক বললেন: সাহেবটি নাকি এক চা-বাগানের ম্যানেজার।

আরেকজন সমর্থন করে বললেন: কিন্তু আর দশটার মতো লম্পী-ছাড়া নয়।

প্রথম ভদ্রলোক তাঁর সংগৃহীত সংবাদের পলিটা একটু একটু ক'রে খুলতে লাগলেন, বললেন: আর্দালিটা বলছিল, তার সাহেব নাকি আসছে বিলিতি। যুদ্ধ বাধবার

পরে নাকি প্রকাশে এসেছে।

এধার থেকে এক ভদ্রলোক সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বললেন: তা লড়ায়ের দিনে চা বাগানে ঢুকল কেন?

এমন সাধারণ প্রশ্নের উত্তর প্রথম ভদ্রলোককে ভেবে বলতে হ'লনা: সাহেবের ছাটের গোলমালের জন্যে এরায় জোসেফি চাকরি ছাড়তে হয়।

প্রশ্ন কর্তা মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করলেন ছাটের গোলমালই বটে।

ওপরের ভদ্রলোক নিজের কথার জবাব না পেয়েও কিছুমাত্র দমেননি দেখা গেল বললেন: কোন সাহেবের কথা বলছেন? দাসধপাড়া টী-ষ্টেটের ম্যানেজার?

বাঙ্কের ওপর থেকে প্লাউকর্মের দৃশ্য যে তিনি কিছুই দেখতে পাননি, তাতে আর কারো সন্দেহ রইল না। কেউ উত্তর দেবার আগে নিজেই আবার বললেন: সেই সাধা সাহেবটাতো! একটা হতভাগা। প্রেমের অভিনয় ক'রে একদম একটা মেয়েকে পথে বসিয়েছে।

এধারের সেই ভদ্রলোক একটি সুখরোচক কাহিনী শোনবার প্রত্যাশায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন: বলেন কি মশাই?

উৎসাহ পেয়ে ওপরের ভদ্রলোক বললেন: তা নয়তো কোচ মেড গার্লো নাগা খাসিয়া দাঁওতাল কোল ভিল—কোনো কুল আর...

ওধার থেকে অত্যন্ত রুক্ষ গোছের এক ভদ্রলোক হুঙ্কার ছাড়লেন: কী জানেন মশাই, আপনি ও সাহেব সম্বন্ধে?

ওপরের ভদ্রলোক ছাড় মানবার পাত্র নন, কিছু একটা বলবার জন্যে মুখ হাঁ করতেই আবার একটা ধমক এল: স্পষ্ট বলেন নিকি: এবারে থামবেন কি দয়া করে?

মোট; ভদ্রলোক তাঁর খবরের কাগজখানা নামিয়ে অনুরোধ জানালেন: সত্যিই থামুননা আপনি। বলছেন বলুন উনি অতো ক'রে!

এরপর খানিকক্ষণ নীরবে কাটল।

কোণের ভদ্রলোকের কৌতূহলকে প্রশংসা করতে হয়। প্রতি ষ্টেশনে গাড়ির জানালা দিয়ে গ'লে নেমে প্রথম শ্রেণীর সাহেবকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ষ্টেশনে দুমিনিট দাঁড়ায়। সার্কাসের মতো কসরৎ ক'রে নামা ওঠাতেই এক মিনিটের বেশি যায়। বাকি সময়টুকুই তাঁর কাছে মূল্যবান।

অনেক ক'টা ষ্টেশন পেরবার পর ভদ্রলোক আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বললেন: সাহেবটার চোখ দিয়ে এখন জল পড়চে।

ওপরের ভদ্রলোক তৈরি হয়েই ছিলেন। উত্তর দিলেন: আর বোতলের জলও বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে পেটে যাচ্ছে।

ধরজার হাতল ধ'রে যে ভদ্রলোক চলেছেন, তাঁকে নিরপেক্ষ ব'লে মনে হ'ল, বললেন: হাঁ, তা খুলে বলেছে সত্যি।

উৎসাহ পেয়ে ওপরের ভদ্রলোক বললেন: আরে আমি জানিনা মশাই? ওর বাড়ির খবর আমার কাছে। আপনি গিয়ে একবার দেখুন না, কী প্রেম দেখায় ভারত-বাসীকে! পালিয়ে আসতে পথ পাবেন না, উঁচুকুল এমনি বাঘা।

সেই রুগ্ন ভদ্রলোক আবার খেঁকিয়ে উঠলেন: ওই ঘুপ্‌চির ভেতর ঘাড় কুজিয়ে তো বসে আছেন, কৌড়ন দিচ্ছেন ডালে কি তাতে তা ভেবে দেখেছেন কি?

প্রতিদ্বন্দ্বী একটা উল্টো ভেংচি কেটে বললেন: মশাইকে সাহেবের উকিল ব'লে মনে হচ্ছে যে! এইবারে দয়া ক'রে আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দেবেন কি?

তাঁর প্রশ্ন শোনবার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হলুম।

ভদ্রলোক বললেন: দেশ স্বাধীন হ'তে না হ'তেই সাহেবের তল্পি গোটাবার দরকারই বা হ'ল কেন, আর প্রেম যদি এতই গভীর তো শ্রীরাধাদের সঙ্গে নিলে কী ক্ষতি হ'ত।

রুগ্ন ভদ্রলোকের মেজাজটাও কিছু রুক্ষ, উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন: কারও ভালো শুনতে কি গায়ে এতই ছ্যাঁকা লাগে?

উত্তেজনায় ওপরের ভদ্রলোক সোজা হবার চেষ্টা

(শেষাংশ ৫৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

ক্রিকেট :—ভারতবর্ষ ও কমনওয়েলথ দলের বেসরকারী প্রথম টেষ্ট দিল্লীতে ফিরোজ শা কোটলা মাঠে ১৪ই নবেম্বর শেষ হইয়াছে এবং ভারতীয় দল ৯ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে।

কমনওয়েলথ দলের ভারত সফরের পূর্বে ভারতীয় ক্রিকেট জগতের দুচারজন আমির ওমরাহগণ কমনওয়েলথ দল সম্বন্ধে যে সব ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন তাহাতে মনে হইয়াছিল ব্যাটিএ শক্তিশালী ভারতীয় দল কমনওয়েলথ দলকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু খেলার ফলাফল এরূপ হইল কেন?

আজ এই প্রশ্ন আলোচনা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতীয় দল সত্যই কি এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে না কমনওয়েলথ দল ভারত অপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী?

এই কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই মনে আসে ভারতীয় দলের জঘন্য ফিল্ডিং এর কথা। জঘন্য ফিল্ডিংএর জন্য প্রথম দুটি ওল্ডফিল্ড ও লিভিংষ্টোন ১৪১ ও ১২৩ রাণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। কিন্তু উভয়েই ৫০ রাণ পূর্ণ হইবার পূর্বে অত্যন্ত সহজ ভাবে দুই দুইবার আউট হইবার সুযোগ দিয়াছেন। উদয় মার্চেন্ট, বিজয় মার্চেন্ট ও মোদী সর্বশাকুল্যে বোধহয় ১১টী ক্যাচ ধরিতে পারেন নাই। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংএর যদি কোন উন্নতি না হয় তবে ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ ৪টী টেষ্টের ফলাফল যে শুভ হইবে না একথা জোর করিয়া বলা চলে।

গত বৎসর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ভারতীয় দলের খেলার ফলাফল দেখিয়া ক্রিকেট বিধাতাদের নিদ্রার কোনরূপ যে ব্যাঘাত হয় নাই তাহার প্রমাণ আমরা প্রথম খেলাতেই পাইয়াছি।

ভারতীয় ক্রিকেট আজ পৃথিবীর মধ্যে একটী সম্মানজনক আসন লাভ করিয়া রহিয়াছে অথচ তাহার এই ক্রমাবনতি দেখিয়াও আজ যদি আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ না হয় তবে বেশীদিন যে সে সুনাম রক্ষিত হইবে না একথা জোর করিয়া বলা চলে।

অবশ্য ভারতীয় দলের বিপর্যয়ের আরো কতগুলি কারণ আছে, ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিজয় মার্চেন্ট আহত হইয়া খেলিতে পারেন নাই। তাহার মত একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের অভাব ভারতীয় দলে বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। উদয় মার্চেন্টও পায়ের পীড়ায় টান পড়ায় ভাল ভাবে খেলিতে পারেন নাই। মানকড় ও অমরনাথ অসুস্থতার জন্য খেলিতে পারেন নাই।

কিন্তু এত বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে কাদকার ও অধিকারী ও দ্বিতীয় ইনিংসে বিজয় হাজারে, অধিকারী ও উমরিগড় যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাহাদের যে কো প্রথম

শ্রেণীর খেলোয়াড় বলিয়া অভিহিত করা চলিতে পারে।

ইনিংস বিপর্যয়ের মাথায় বিজয় হাজারের ১৪০ রাণ ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে।

আগামী ১৬ই ডিসেম্বর হইতে বোম্বাইতে দ্বিতীয় টেষ্ট আরম্ভ হইতেছে। অধিনায়ক মার্চেন্ট ও মানকড় সুস্থ হইয়াছেন। অমরনাথ যদিও দ্বিতীয় টেষ্টেও খেলিতে সক্ষম হইবেন না তাহা হইলেও আশা করা যায় ভারতীয় দল তাহাদের প্রথম টেষ্টের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে। আমরা ভারতীয় দলের জয়লাভের কামনা করিতেছি।

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস :—

৮ উইকেটে ৬০৮ রাণ—

ওল্ডফিল্ড		১৫১	
লিন্ডসেটোন	—	১১৩	
এ্যাশে	—	৪৬	
ক্রিয়ার	—	৫১	
ওয়েল	—	৫৮	
হোল্‌ট	—	৩৩	
পেটিফোর্ড	—	৬৪	নট আউট
সি, পেপার	—	৩৮	
রে, স্মিথ	—	৩২	

কারকার	১৬৯ রাণে	৩ উইকেট
সি, এস, নাইডু	১৯৪	৩

ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস :—

১৯১ রাণ—

ডি, জি, ফাদকার—			
এইচ, অধিকারী	—	৭৪	
পি, উমরিগর	—	৩৪	নট আউট
আর, মোদী		২৪	
বিজয় হাজারে	—		

পেপার	৫৭ রাণে	৪ উইকেট
ক্রিয়ার	৩৯	
ল্যাম্বার্ট	৭৬	
ট্রাইব	৭৯	১

ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস :—

এম, কে, মন্ত্রী		৪৪	
উমরিগর	—	৫৫	
আর, এস, মোদী	—	৮	
বিজয় হাজারে	—	১৪০	
ডি, ফাদকার	—	৩	
অধিকারী	—	৪৪	নট আউট
সারভাতে			
সি, এস, নাইডু	—		
গাইকোয়াড়	—		
উদয় মার্চেন্ট	—		
অতিরিক্ত		৪	
		৩২৭	

পেপার	১৩৪ রাণে	৩ উইকেট
ট্রাইব	৪৯	৪

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংস :—

ওল্ডফিল্ড	—	৫ নট আউট
ফ্রিম্যান	—	
এ্যালে	—	৭
		১১

৯ উইকেটে বিজয়ী

ফুটবল :—আগামী ৩, ৪ ও ৬ই ডিসেম্বর সুইডেন হইতে বিখ্যাত হেলসিনবর্গ ফুটবল দল কলিকাতায় মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও পশ্চিমবঙ্গ লাট একাদশের সহিত কলিকাতা মাঠে খেলিবে। দলে ৮টী International খেলোয়াড় আসিতেছে। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান দেশ হইতে আগত ফুটবল দলটী যে বিশেষ শক্তিশালী দল হইবে একথা জোর করিয়া বলা চলে। আমরা আগামী বারে ইহাদের খেলাধূলা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

এপিঠ ওপিঠ

(৫৩৮ পৃষ্ঠার পর)

করতেই মাথাটা হাতের সঙ্গে ঠুকে গেল। নিচে থেকে দুয়েকজন আহা-হা ক'রে উঠলেন। মোটা ভদ্রলোক তাঁর খবরের কাগজ সামলাতে সামলাতে বললেন: কেন যে আপনারা থামতে চান না।

পাশখানির ভদ্রলোক হঠাৎ হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলেন। জানালা দিয়ে মুখ বার করতেই সবার ব্যস্ততা জেগে উঠল। ট্রেণখানা একটা প্রচুর আলোর মোহনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কেউ জুতার মধ্যে পা ঢোকালেন, কেউ হাত বাড়ালেন ঝোলানো কোটের দিকে, কেউ আবার 'উঠুনতো মশাই' ব'লে হন্তদন্ত ভাবে বিছানা টেনে বাঁধতে লাগলেন। মোটা ভদ্রলোক কোন রকমে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজখানা ভাঁজ ক'রেই 'আমার লাঠিটা, আমার লাঠিটা', করতে লাগলেন।

ভেতরে ও বাইরে তখন একই আওয়াজ উঠছে: কুলি, কই কুলি, তিন কুলি!

জাগৃহি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুঁকড়ে মরবে, প্রতিবাদ তবু করবে নাতো,
হিম হয়ে আসে মাংস-বিহীন শুকনো হাত।
পুরুষ তোমরা—কথাটা সত্যি 'যাৎ কা বাৎ', ও...
ভিক্ষার ক্যান তুলে নেবে, কেড়ে খাবেনা ভাত।
বিয়ে করেছিলে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘুরছো পথে,
পুত্র তোমার ডাষ্টবিন হ'তে অন্ন খোঁটে—।
পত্নীর ভার নিয়েছিলে তুমি বিয়ের-বর্তে
আজ সব কথা ভুলে গেছো মনে নেই কি মোটে?
মুখে কতদিন করেছো বড়াই পুরুষ বলে,
সন্তান তব মানসিক বল বুঝতে পেরে,
ঘৃণায় দুঃখে ঐ এক কোনে পড়লো চলে!
স্থাণুর মতন বসে তবু? ওঠো আসন ছেড়ে!
ক্ষীণ ধমনিতে যে-টুকু রক্ত প্রবাহমান,
নীর্ণ চোখের তারায় যেটুকু দৃষ্টি ভাসে,
কঙ্কাল দেহ আঁকড়িয়া আছে যে দীন প্রাণ,
সেইটুকু নিয়ে নালিশ জানাও ঊর্দ্ধাকাশে।
লাঞ্ছিত এই মাটির ধূলায়—হে ঈশ্বর!
নেমে এসো!—আজ পুঁথির পাতায় থেকনা আর
ধ্বনিকা টানো ব্যাভিচারে ভরা এ দুস্তর,
ধ্বংসোল্লাসে উড়ুক আকাশে সে বম্‌বার!

জাগতিকি

সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী

দুইটি মহাযুদ্ধ আজও ভবিষ্যতের অন্তরালে ঢাকা আছে। কিন্তু অতীতের সূত্র ধরিয়া বর্তমানে উপস্থিত হইলে দেখা যাইবে সেই আগামী মহাযুদ্ধের ভোরজোড়ের বিরাম নাই। এই ভাবী সংহার সংহরণ করা একমাত্র কোন miracle ছাড়া সম্ভব নহে।

লেকসাক্সেসে ইউ, এন, ওর সাধারণ অধিবেশন চলিতেছে। বিভিন্ন সমস্যা লইয়া সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলিতে বাক্‌বিতণ্ডা, পরস্পরকে তীব্র আক্রমণ ও গালাগাল সমানভাবেই চলিতেছে। তারপর বিপুল ভোটাধিক্যে পশ্চিমী রাষ্ট্র সমূহের সাধারণ প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইতেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে যে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয় এবং ইঙ্গ মার্কিণ প্রস্তাব অনুরূপ ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া উভয় পক্ষের যে তীব্র সমালোচনা পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় তাহা হইতেই ভাবী সংঘর্ষের আভাস পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঁ ভিশিনস্কি বলেন যে, বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রাক্তন জাতি সঙ্ঘের পথ ধরিয়া চলিয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘে চারিবার শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বারে বারে তাঁহারা ইঙ্গ মার্কিণ ভোটের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। মঁ ভিশিনস্কি আরও বলেন যে, আর একটি যুদ্ধের জন্য যাঁহারা উস্কানী দিতেছেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ তাঁহাদের প্রতিহত করিতে পারিতেছেন না,—আর এই কারণেই বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও পুরাতন জাতি-সঙ্ঘের অবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

মঁ ভিশিনস্কির বক্তৃতার উত্তরদান প্রসঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিঃ ওয়ারেন অষ্টিন সোভিয়েট ইউনিয়নকে নিছক সর্বাত্মক প্রচার কার্যের পরিবর্তে বিভিন্ন জাতির মূল বিভেদ দূরীকরণের চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানান এবং সাধারণের স্বার্থের কথা স্মরণ রাখিয়া পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন। অতঃপর মিঃ ওয়ারেন অষ্টিন বলেন—ইতিহাসে কখনও যেভাবে সমগ্র বিশ্ব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে ইতিপূর্বে আর কদাপি তাহা হয় নাই।

ক্লাসিংমেডোজের সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েট ইউনিয়ন পঞ্চ প্রধান রাষ্ট্রের শান্তি-চুক্তির যে প্রস্তাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে উত্থাপন করিয়াছিল সাধারণ পরিষদ উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহার স্থলে একটি ইঙ্গ মার্কিন পাল্টা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই পাল্টা প্রস্তাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদে লিপিবদ্ধ শান্তিনীতি অনুসরণ করিবার জন্য সমস্ত রাষ্ট্র সমূহের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে।

সোভিয়েট প্রস্তাবে আনবিক অস্ত্র ব্যবহার নিঃসর্তে নিষিদ্ধ করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহাও অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। ৩২টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে এবং ১৪টি রাষ্ট্র এই ভোটাভুটিতে কোন অংশই গ্রহণ করে নাই।

সোভিয়েট শান্তি প্রস্তাব বাতিল করিয়া তৎস্থলে যে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেশরক্ষার প্রয়োজনে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র রাখার যে আন্তর্জাতিক বিধি আছে তাহা মানিয়া চলিতে এবং গঠনমূলক কাজে আনবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমস্ত রাষ্ট্র-সমূহের সহযোগিতা দাবী করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শান্তিপরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রকে—বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও চীনকে—ভেটো প্রয়োগে সংযম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

যে প্রস্তাব গৃহীত হইল তাহার পেছনে যে কতটা আন্তরিকতা আছে এবং ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর উপর তাহার প্রভাব কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের শেষ নাই।

এদিকে পশ্চিম ইউরোপের সর্বাত্মক রক্ষা পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপদানের জন্য আতলান্তিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী ১২টী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবগণ প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ পরিকল্পনার বিবরণ সযত্নে গোপন রাখা হইয়াছে। চারঘণ্টা কালের অনধিক এক বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিণ এবং

অন্যান্য রাষ্ট্রের সামরিক বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।

এশিয়া

এইত গেল ইউরোপের কথা, এশিয়া খণ্ডেও কম্যুনিষ্ট বিরোধী ব্যূহ রচনার তোরজোর চলিতেছে। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট কুইরিণো ও থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী বিক্রম সংগ্রাম অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে আতলান্তিক চুক্তির অনুরূপ কোনও চুক্তি কার্যকরী করা যায়। কিন্তু তাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে অতি নগন্য ব্যক্তি; কাজেই তাহাদের চেষ্টা আজ পর্যন্ত ফলবতী হয় নাই। তাহা হইলেও বর্মী পররাষ্ট্র সচিব উ-ই-মঙ্গ সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অখণ্ডত্ব ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ফেব্রুয়ারী মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির এক সম্মেলন হইতে পারে। তিনি আরও বলেন "ইহা মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত যে সম্মেলনের নেতৃত্ব ভারতের উপর বর্তাইবে।

তিনি বলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে ভারত পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন যোগদান করিবে।

সম্প্রতি জাপানের সহিত সন্ধি প্রস্তাব সম্বন্ধেও অনেক আলোচনা চলিতেছে। আমেরিকা জাপানকে পশ্চিমী গণতন্ত্র সম্মত নীতি অনুযায়ী নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। পশ্চিম জার্মাণীতে 'বন' গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১১টী প্রদেশ লইয়া যে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর নীতি অনুযায়ী জার্মাণীর সমরোপযোগী শিল্প ব্যবস্থাকে চিরতরে ধ্বংস করিবার জন্য যে প্রস্তাব কার্যকরী করা হইতেছিল নব-প্রবর্তিত নীতি অনুসারে তাহা অধিকাংশ স্থলেই বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পশ্চিম জার্মাণী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং পশ্চিম ইউনিয়নে অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। এই নীতিতে গ্রেটবৃটেন ও ফরাসীদেশ গোড়া হইতেই আপত্তি করিয়া আসিতেছিল কিন্তু সম্প্রতি জার্মাণীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সবল জাতিতে পরিণত করার মার্কিণ নীতি জয়যুক্ত হইয়াছে।

জাপানেও এইরূপ মার্কিণ নীতির খেলা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু এই ব্যাপারেও ইংরেজ ও মার্কিণ নীতিতে বিরোধ সুস্পষ্ট। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে কূটনৈতিক ও সমরনৈতিক বিশেষজ্ঞগণের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। তাহাতে সমর ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় এবং ইহার সুপারিশগুলি বৃটিশ মন্ত্রীসভার নিকট জানানো হয় এবং সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে কমনওয়েলথ্ প্রধান মন্ত্রিগণের এক বৈঠক সিংহলের কলম্বো সহরে আগামী ফেব্রুয়ারীমাসে অনুষ্ঠিত হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মার্কিণ সামরিক ও কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞগণও বিভিন্ন বৈঠকে মিলিত হইতেছেন। এইসব সম্মেলনের ফলে যে ব্যবস্থা উদ্ভূত হইবে তাহাকে সোভিয়েট বিরোধী ব্যূহ বলিলে কি খুব মারাত্মক ভুল করা হইবে?

চীন

এদিকে কম্যুনিষ্ট বাহিনী প্রায় সমগ্র চীনদেশ দখল করিয়াছে। শেষ চীনা রাজধানী হইতেও কে, এম, টী সরকার তাড়িত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। য়ুনানের রাজধানী কুন্‌মিন্ হইতে হংকং আগত যাত্রীরা বলেন যে, য়ুনান প্রদেশও পক্ষকালের মধ্যে কম্যুনিষ্টগণ দখল করিয়া লইবে। বর্মা এবং ফরাসী ইন্দোচীনের সীমানাস্থিত এ প্রদেশের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হইয়া উঠিতেছে। চীনের মূল ভূখণ্ডে যে দুই প্রদেশ এখনও কম্যুনিষ্টগণ পুরা দখল করিয়া লয় নাই তন্মধ্যে য়ুনান প্রদেশ এক। ইন্দোচীনের সীমান্ত বরাবর ভিয়েৎনাম গেড়িলা তৎপরতার ফলে পলায়নপর কে, এম, টি সৈন্য ও সমরনায়কগণ যে আশা করিয়াছিলেন বাওদাই এর ইন্দোচীনে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ আশ্রয় পাইবেন তাহাদের সে আশা বিফল হইয়াছে এবং কম্যুনিষ্ট চীন ও হো-চি-মিনের সমর্থকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এদিকে ইংরেজ ও মার্কিণের ভেতর কম্যুনিষ্ট

(শেষাংশ ৫৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুস্তক পরিচয়

বাংলার পাখী—শ্রীসুধীন্দ্র লাল রায় এম. এ.

গঙ্গা পাবলিশার্স লিমিটেড। ৫২-৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২৪ পৃষ্ঠা,—মূল্য ৩৲ টাকা।

বাংলার বিভিন্ন পাখী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই পুস্তকে আছে। সাধারণত পরিচিত কাক, কোকিল থেকে সুরু করে চড়ুই, কিঙ্গে, বসন্ত বাউরী প্রভৃতি বহু পাখীর বিবরণ এই পুস্তকে আছে। কেবল যে পাখীদের আকৃতি ও চেহারার বিবরণ এই পুস্তকে আছে, তা নয়; —প্রত্যেক পাখীর স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়েও বিশদ আলোচনা এতে আছে। আমাদের পরিচিত পাখীরও কোনও আমরা প্রায়ই জানি না। কাক যে সমাজের কত উপকার করে, তা ভুলে গিয়ে আমরা কেবল তার কুৎসিৎ চেহারা ও আওয়াজ মনে করে রাখি।

পাখীদের জীবনযাত্রার অনেক কথা ও কাহিনী লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন;—কি ক'রে এরা সন্তান পালন করে, কি ক'রে খাদ্য আহরণ করে, কি ক'রে এরা পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া ও যুদ্ধ করে, এদের ছোট সংসার অল্পসময়ের জন্য কি ভাবে গড়ে ওঠে—প্রভৃতি বহু কথা এই পুস্তকে আছে।

লেখকের ভাষা সহজ, সরল ও সরস। নীরস বৈজ্ঞানিক কথাকে মনোজ্ঞ ক'রে বলার ক্ষমতা লেখকের আছে। বহু পাখীর ছবি এতে আছে। পুস্তকের দাম কিছু বেশী হ'য়েছে;—তাতে পুস্তকের বহুলপ্রচারের পক্ষেও অন্তরায় হবে।

এ যুগের সাহিত্য:

বিজয় ব্যানার্জি। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২২০ দাম—৩৷০

ধর্ম ব্যাপারে বিশ্বাস আর রস আস্বাদনের ব্যাপারে ভাল লাগা বা ভাল না লাগাকে বিচারের মাপকাঠি করলে তাতে বিচার ও রস আস্বাদন দু'এরই অপমৃত্যু অনিবার্য্য। অথচ একথাও ঠিক যে সাহিত্য বিচার শেষ পর্য্যন্ত যিনি বিচার করছেন তাঁর ব্যক্তিগত মতই। তবে এই খানেই সাহিত্য বিচারের শেষ কথা নয়। সাহিত্য বিচার রসপিপাসুর ব্যক্তিগত মত হলেও ওতে একটা নির্ব্বিশেষ ছাঁপ থাকে যাতে করে ব্যক্তির মনের কথা সমষ্টির বিচার হয়ে ওঠে।

সৃজনী প্রতিভার কোন মাপ কাঠি সম্ভব হয়—তা একান্তই দুজ্ঞেয়—তবে সমস্ত সাহিত্য বিচারেই যে এটা ঘটে থাকে এতে কোন সন্দেহ নেই। আমার ভাল লাগা বা আমার ভাল না লাগাকে সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি করতে গেলে—এই 'আমার' মনটীকে বিচার করা প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথমে। 'আমার' মন কি বিশ্বমনের ভাল লাগা বা না লাগাকে প্রতিফলিত করবার মত অনুশীলিত এই মনটির ওপরই সাহিত্য বিচারে প্রবিষ্ট হবার অধিকারীত্ব নির্ভর করে। সাহিত্য বিচারে অধিকারী ভেদ আছে। সকলেই যদি

সব সাহিত্য সম্বন্ধে মত দিতে থাকেন তা হলে সেটা রসজ্ঞের সাহিত্য বিচার না হয়ে আপ্তবাক্যের তালিকা হয়ে ওঠার আশঙ্কা আছে।

'এ যুগের সাহিত্য' পড়ে বার বার এই আশঙ্কার কথা মনে হয়েছে বলেই এত কথা বলতে হলো। অবশ্য গ্রন্থকার অনেক গ্রন্থের ও অনেক গ্রন্থকার সম্পর্কে তাঁর মত দিয়েছেন—কিন্তু সে মত অনেকক্ষেত্রেই রসপিপাসুর বিচার না হয়ে আপ্তবাক্য হয়ে উঠেছে—এবং এই কারণেই 'এ যুগের সাহিত্য' এ যুগের সাহিত্যের সত্যকারের পরিচিতি গ্রন্থ নয়—বা এ যুগের সাহিত্যের আত্মার পরশ এতে নেই। এটা নিতান্তই কতকগুলো নাম করা বই ও নাম করা গ্রন্থকারের নামের তালিকা এবং মাঝে মাঝে যেন ফুটনোটে যিনি তালিকা করেছেন তাঁর মতামত। তা ছাড়া সমস্ত বইটার মধ্যেই ইংরাজীতে যাকে বলে 'casualness' তার ছাপ এত বেশি যে তারফলে এ ধরণের সাহিত্যবিচারের গ্রন্থে যাতে এ যুগের সাহিত্যের পরিচিতি রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে—ততটা গাম্ভীর্য বা আন্তরিকতা থাকা উচিত তার একান্ত অভাব দেখতে পাই।

বাংলা সাহিত্য ও বাংলার আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ হলেও তবু ওরই মধ্যে খানিকটা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের লেখক বা গ্রন্থ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত অদ্ভুত হলেও তাঁর বলবার ভঙ্গীটা মন্দ নয়।

বইটাতে ছাপার ভুল আছে যথেষ্ট—এবং তাতে পাঠকের মনে বিরক্তি ও সংশয় সৃষ্টি করবেই। বর্তমানে যে আকারে বা যে প্রকারে 'এ যুগের সাহিত্য' আত্মপ্রকাশ করেছে তাতে গ্রন্থকারের চিন্তাশীল সার্থক সাহিত্য বিচারক হিসাবে যশ প্রতিষ্ঠা করবে না বলে আশঙ্কা হয়। অথচ এই গ্রন্থেরই জায়গায় জায়গায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা শক্ত নয় যে গ্রন্থকার একটু 'serious' হলেই 'এ যুগের সাহিত্য' আরও সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারত।

জাগতিকি

(৫৩৩ পৃষ্ঠার পর)

চীনের শাসনতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দান লইয়া মতবিরোধ চলিতেছে। মনে হয় ভারত সরকার অচিরে কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করা না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত-ভাবে গ্রহণ করিবে। ভারতের উপরে চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তিব্বত ও নেপালে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের প্রসারের সম্ভাবনা সর্বত্র উদ্বেগের সৃষ্টি করিতেছে।

.....ইউ, এন, ও, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিফল প্রযত্ন হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার সাফল্য দেখা গিয়াছে। বহু মতবিরোধ ও কলহের পর আফ্রিকাস্থ ইতালীয় কলোনীগুলির সম্বন্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। গত ২১ নভেম্বর ফ্লাসিংমেডোসে ইউ, এন, ও'র, সাধারণ পরিষদ ইতালীর প্রাক্তন উপনিবেশ সমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে যে, উত্তর আফ্রিকার বৃহৎ ভূখণ্ড লিবিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে।

পরিষদ আরও স্থির করেন যে, দশ বৎসরের জন্য ইতালীর হস্তে সোমালিল্যাণ্ডের অছিগিরির ভার দেওয়া হইবে এবং পূর্ব আফ্রিকায় ইতালীর প্রাচীনতম উপনিবেশ এরিত্রিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হইবে। লিবিয়ার তিনটি প্রদেশ ইথিওপিয়া, ত্রিপলিতানিয়া এবং ফেজ্জানকে নিজেদের শাসনতন্ত্র রচনায় এবং স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণ পরিষদ লিবিয়ার জন্য একজন রাষ্ট্রসঙ্ঘ কমিশনার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতালীয় উপনিবেশগুলির ব্যবস্থা সমালোচনার অতীত নহে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে একটা ব্যবস্থা হইল তাহাই আমাদের বক্তব্য। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি বলেন যে রাজনৈতিক কমিটির প্রস্তাব প্রকৃত পক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। ইতালী যে কোন উপায়ে প্রাক্তন উপনিবেশসমূহ ফেরত পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ইথিওপিয়ার পররাষ্ট্র সচিব বলেন, ইতালীর অছিগিরি প্রবর্তিত হইলে, পূর্ব আফ্রিকায় অশান্তি বৎসর ধরিয়া গোলযোগ চলিতে থাকিবে।

অধ্যাপক বিনয় কুমার

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ এমন একজন স্বদেশ ও শিক্ষা প্রেমিককে হারিয়েছে—যাঁর স্থান সহজে পূরণ হবার নয়। জাতির জীবনের বহু দিকে বিনয় কুমারের অক্লান্ত ও নীরব সেবার দান এত বড় যে, জাতির শিক্ষিত শ্রেণীরও অনেকে তাঁর খবর রাখেন না। একথা তাঁদের সামনেই স্বীকার করতে হয়। তাঁরতে বিপ্লবী রাজনীতির প্রচার ও প্রসারে যে সকল গুপ্ত সমিতি সাহায্য করেছে, তার ভিতর পরলোকগত সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "ডন সোসাইটির" নাম আজ জাতি প্রায় বিস্মৃত হ'তে বসেছে। এই সোসাইটির অনেকেই পরবর্তী জীবনে শিক্ষাব্রতী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন। বিনয় কুমার এঁদের অনেকের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন বিক্রমপুরের সাতিহাটি গ্রামে এঁর অনুস্থান, কিন্তু এঁর বাল্যজীবন কাটে রাজসাহীতে। ১৩ বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পাশ করার পর থেকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ ও ষ্টেট স্কলারশিপ দেবার প্রস্তাব হয়। দুই প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান ক'রে স্বদেশী যুগে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তিনি বিনা বেতনে কাজ করতে থাকেন। সেখান থেকে শিক্ষার জন্য বিদেশে দলে দলে ছাত্র প্রেরণের ব্যবস্থা প্রথম তাঁর উদ্যোগেই হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাধ্যমে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশে তাঁর কাছ থেকেই প্রথম প্রেরণা আসে। ইতিহাস, সাহিত্য অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ধরণে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার সুস্পষ্ট চেষ্টার এদেশে তাঁরি দান প্রচুর। তাঁর বহু ভাষাজ্ঞান, তাঁর অধ্যয়ন, গবেষণা এবং সর্বোপরি জাতির ভিতর বিবিধমুখী শিক্ষা প্রচারের চেষ্টার তাঁর বিশাল চিন্তা ধারা দেখলে মানুষটির শক্তি, সামর্থ ও উদ্যমের প্রাচুর্যে অবাক হ'তে হয়।

কত বড় আদর্শ-নিষ্ঠা যে এত অনলস উদ্যমের প্রেরণা যোগাতে পারে তা ভেবে পাওয়া শক্ত। গবেষণার দিকে গল্প-সাহিত্য থেকে শুরু ক'রে দেশের শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বীমা, প্রাচীন ভারতের দান—কোনো বিষয়ে তাঁর অভিনিবেশের অভাব ছিল না। দেশে জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে কত প্রতিষ্ঠান গড়বার মধ্যে যে তাঁর হাত ছিল, তার অল্প পরিচয়ই লোকে জানে। তার কয়েকটির নাম উল্লেখ যোগ্য : বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় ধন বিজ্ঞান পরিষদ, বঙ্গীয় এশিয়া পরিষদ, আন্তর্জাতিক বঙ্গ পরিষদ, বঙ্গীয় জার্মানবিদ্যা সংসদ, বঙ্গীয় শান্তি সভা ইত্যাদি। এসব কাজ তিনি করেছেন দেশে। অথচ তিনবারে জীবনের প্রায় ১৪।১৬ বৎসর তাঁর কেটেছে বিদেশে—ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মিশর প্রভৃতি বহু দেশের বহু স্থান তিনি বার বার পর্যটন করেছেন। এইসব দেশে ভারতের শিক্ষাদীক্ষার বার্তা নিয়ে গেছেন। আবার ঐসব দেশের শিক্ষা দীক্ষার বার্তা এদেশে বয়ে এনেছেন। সে কাহিনীর আংশিক আভাস তাঁর বিশাল গ্রন্থ "বর্তমান জগতে" পাওয়া যায়। এছাড়া, তিনি অন্য বহু সুপরিচিত গ্রন্থের প্রণেতা। শেষ জীবনেও তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এদেশের বাণী-মূর্তির রূপ প্রকাশেই নিয়োজিত ছিলেন—ওয়াশিংটন প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিষদের ব্যবস্থায়। তখন

কিন্তু তিনি স্বাধীন দেশের নাগরিক। এমন নাগরিককে স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষাদূত হিসাবে দেশ বিদেশে পর্যটন করতে দেখলে আমরা গৌরব ও আনন্দ অনুভব করতাম। কিন্তু বিদেশে চাসপাতালে শেষ জীবনে তাঁকে অর্থ কষ্টও পেতে হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর দুই ভাই অধ্যাপক বিনয় সরকার ও পরলোকগত ধীরেন সরকারের নামের উল্লেখ আমরা দেখতে পাই রাউলাট রিপোর্টে। সমস্ত দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা বিনয় কুমারের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানাই।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহান্তর ঘটেছে। কেদারনাথ পরিণত বয়সে ও পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যেই পরলোকে গমন করেছেন—তবু তাঁর মৃত্যু বাংলার পক্ষে এবং বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির পক্ষে মর্মান্তিক। বঙ্গ বাণীর দেউল আজ আকাশ ছুঁয়েছে—যাঁরা সমিধ সঞ্চয় করে, যাঁরা অরণিভায় দিয়ে বাংলার দেউলে জীবন যজ্ঞ সুরু করেছিলেন—আজ তাঁরা একে একে সবাই গতায়ু হচ্ছেন। বাংলার আজ বড় দুর্দিন। বাংলার মন্দিরে আজ 'একে একে নিভিছে দেউটী'।

কেদারনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক—প্রায় তাঁরই সম বয়সী—রবীন্দ্রনাথ থেকে মাত্র দেড় বছরের কনিষ্ঠ। কিশোর কাল থেকেই সাহিত্য সাধনা সুরু করলেও সাহিত্যক্ষেত্রে কেদার নাথের আবির্ভাব যেন কতকটা আকস্মিক—এবং সেই কারণেই অদ্ভুত দীপ্তিপূর্ণ। কেদারনাথ ছিলেন বহুদর্শী ও ভুবনের বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর অনুভূতিশীল মন ছিল সমৃদ্ধ। কেদারনাথ তাঁর অশ্রুসজল সুমধুর হাস্য রসের ভেতর দিয়ে আমরা 'কি ও কে' তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের হাসি ও কান্না নিবিড় ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। একচোখে জল অন্য চোখে হাসি—তবেই হাস্য রস সত্যকারের মাধুর্য্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। কেদারনাথের হাসি ছিল 'দুঃখের দেয়ালীর' হাসি—গলদশ্রু মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের হাসির মত। কেদারনাথের আই ছ্যাজ, কোষ্ঠীর ফলাফল, মা ফলেষু, ভাদুরী মশাই কবুলতি—সবগুলিতেই আছে আমরা কি ও কে'র ইঙ্গিত ও 'দুঃখের দেয়ালী'র স্বাক্ষর। প্রেমের দর্শনই পরিপূর্ণ দর্শন; জীবকে পরিপূর্ণ ভাবে, সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে প্রয়োজন প্রেমের, অনুভূতির। কেদারনাথ ছিলেন সেই মানব-দরদী যিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন—কজেই হৃদয় দিয়েই জীবনকে দেখতেন। হৃদয় দিয়ে জীবন দর্শন করেছিলেন বলেই তাঁর জীবন দর্শন এমন সম্পূর্ণ এবং এমন সার্থক হয়ে উঠেছে। জীবন উৎসব শেষে পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে কেদার নাথের এই মৃত্যু—শুধু আত্মার লোকান্তর নয়—গীতায় এমন মৃত্যুকেই বলা হয়েছে নিঃশ্রেয়স্‌এর পথে অভিযান। কেদার নাথের আত্মা সত্য, শিব, ও সুন্দরে লীন হৌক—এই প্রার্থনা করি।

আমাদের নূতন শাসন বিধান

ইংরাজরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করল—ভারতবর্ষ তারা সত্যই ছেড়ে যাবে। এই সিদ্ধান্তের কারণ তাদের ধর্মবুদ্ধি নয়,—তবে এটা ঠিকই, তাদের সুবুদ্ধির পরিচয় এতে পাওয়া যায়। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবার ক্ষমতা ইংরাজের বরাবরই দেখা গিয়েছে। ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ানকে দাবিয়েও, তারা বুঝতে পারল—ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই ওয়াটারলুর যুদ্ধের ১৪ বছর পর, তারা গণতান্ত্রিক নীতি মেনে নিয়ে তাদের শাসন সংস্কার গঠন করল,; বুয়ার যুদ্ধে জয় লাভের পর ৮।১০ বছরের মধ্যেই বুয়রদের স্বায়ত্তশাসন ইংরাজ দিল। ঘরের সামনে আয়র্ল্যাণ্ডের ব্যাপারেও আপোসের পথে গিয়ে আটকে গেল আলষ্টার নিয়ে;—আয়র্ল্যাণ্ড বিভক্ত হল—ফলে জাতীয়তাবাদী আইরিশগণ সন্তুষ্ট হল না। ভারতের বেলাও গত বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজ বুঝতে পারল এমনি করে পুলিশী শাসন নিয়ে ভারত, ব্রহ্ম বা সিংহল শাসন করা যাবে না। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড এই শিক্ষাই শিখতে দুতিন বছর সময় নিল।

ব্রিটেন সহজ ভাবেই বুঝতে পারল—এই ভাবে ভারত শাসন করা চলতে পারে না।

দেশের নূতন শাসন-বিধান গঠনের জন্য একটি বিধান পরিষদ করা হ'ল। এই বিধান-পরিষদ নিয়ে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিরূপ হল;—আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হল। এমন অবস্থার সৃষ্টি হল—যে কংগ্রেস তখন ভারত বিভাগ মানতে বাধ্য হল। দেশ বিভক্ত হল; ইংরাজের ভারত ত্যাগের তারিখ আরও এগিয়ে গিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট ইংরাজ করল। বিধান পরিষদের কাজও সেই থেকে সুরু হল—বলা চলে। এর পূর্বে যে কয়েক মাস বিধান পরিষদ চলেছে—তা প্রায় মুসলিম লীগের কেটে গিয়েছে। ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে প্রথম বিধান পরিষদ বসে; কিন্তু ভারত বিভাগ না হওয়া পর্যন্ত এর কোন কাজই প্রায় হয় নি। সেই হিসাবে প্রায় আড়াই বছর এই বিধান পরিষদের কার্যকাল চলছে। এর মধ্যে দেশের আইন সভা হিসাবেও এই পরিষদকে কাজ করতে হয়েছে। মোটের উপর বলা যায় যে আড়াই বছর পরিশ্রমের পর—পরিষদ ভারতের নূতন শাসন-তন্ত্র গঠন করল।

অন্যান্য দেশের হিসাবে ভারতের বিধান পরিষদ যে শাসনতন্ত্র গঠনে অতিরিক্ত সময় নিয়েছে—তা বলা যায় না। আমেরিকার বিধান পরিষদ শাসন-তন্ত্র গঠন করতে ৮ বছর সময় নিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার বিধান পরিষদও বছর সময় নিয়ে যে শাসন-তন্ত্র গঠন করল, তা চালু হবার প্রায় কোন সুযোগই পায় নি। রুষিয়ার বিধান পরিষদ ত' কম্যুনিষ্টগণ ক্ষমতা পাওয়ার পর ভেঙ্গেই দিল। ভারতের সংলগ্ন পাকিস্তানের বিধান পরিষদ এখনও কাজ শেষ করতে পারে নি। ৩৫ কোটি লোক এবং বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থিতি (entity) বহুসকল নিয়ে গঠিত দেশের শাসন-তন্ত্র তৈরি করা খুব সহজ কথা নয়। বিভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রদেশ, প্রায় ৬০০টি দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি এই দেশের অন্তর্গত ছিল, ধর্মের ও বর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বও ছিল। এই সব বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী-স্বার্থ ও বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষের সামঞ্জস্য সাধন ক'রে একটা শাসনতন্ত্র তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ। সেদিক থেকে ভারতের নেতৃবৃন্দের বিশেষ সুখ্যাতি করতে হয় যে আড়াই বছরে তাঁরা একটা শাসন-তন্ত্র দাঁড় করতে পেরেছেন।

শাসন-বিধানের মানদণ্ড

এ কথা বলতে চাই না যে—এই শাসন-তন্ত্র একটি নিখুঁৎ জিনিষ হয়েছে। মানুষের হাতের তৈরি মাল;—মানুষের প্রকৃতির দোষ-ত্রুটি তার মধ্যে কিছু পরিমানে থাকবেই। যে বিধান পরিষদ এই শাসন-তন্ত্র গঠন করেছে—তা একটি বিপ্লবের সন্তান;—সমগ্র জাতি যে বিপ্লব সাধনায় ক্ষিপ্ত—যে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে দেশ ও জাতি আজ চলছে—সেই বিপ্লবের ফলস্বরূপ এই বিধান পরিষদ জন্মলাভ করেছে। যে শাসন-বিধান এখানে গঠিত হ'ল—তার মূল্য নির্ণয় করার প্রধান মানদণ্ড হ'বে—এই বিপ্লব সাধনার পক্ষে এই শাসন-বিধান কতটা সহায়কারী হবে—অর্থাৎ বিপ্লবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে এই শাসন বিধান যতটা কার্যকরী হবে—এর সাফল্য ঠিক ততটা। পুরাতন থেকে নূতন সমাজ ব্যবস্থায় আমরা চলেছি; বহু অপূর্ণ আশা জাতির মনে আছে; বহু অদৃষ্ট শক্তি জাতির বক্ষে আলোড়িত হচ্ছে। এই সবটার সমতা ও পূর্ণতা সাধন ক'রে নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলন করাই এই শাসন বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সমাজের আবেগী শক্তিসমূহ মোটামুটি সাম্য অবস্থায় আছে, তার জন্য এক প্রকার শাসন-বিধি প্রয়োজন হয়,—আর যে সমাজের আবেগী শক্তিসমূহ সমতালাভের জন্য ছট-ফট করছে—সে সমাজের জন্য অন্য ধরণের শাসন-বিধি দরকার হয়। আমাদের নূতন শাসনতন্ত্র এই শেষোক্ত শ্রেণীর হওয়া দরকার। কারণ—আমরা একটা বিপ্লবের ভিতর দিয়ে চলছি,—যেখানে এই মুহূর্তের প্রচলিত সমুদায় ব্যবস্থা আগামী মুহূর্তেই অতীতের পদার্থ হবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। এই দ্রুত পরিবর্তনের উপযোগী ও অনুকূল

ব্যবস্থা দিতে না পারলে—সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা হবে এবং সমাজের গতি তখন অবাঞ্ছিত পথে প্রবাহিত হ'তে চাইবে।

এই অবস্থা জেনে স্বীকার করতেই হবে যে এই নূতন শাসনতন্ত্র বিপ্লবের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারে নি। যে দ্রুত পরিবর্তন সমাজের বুকে জমে আছে, তাকে মুক্ত করে বাস্তবে পরিণত করার মতো ব্যবস্থা এই শাসন-বিধিতে নেই। কেন নেই? জাতির যাঁরা নেতা—বিভিন্ন প্রদেশের বাছাই করা কংগ্রেস সেবীরা পরিষদে ব'সে এই শাসন-বিধি তৈরি করেছেন। তাঁরা কি বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন? অন্তত জ্ঞানত যে তা করেন নি এ কথা জোর ক'রেই বলতে পারি। শাসন-বিধিতে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে। একদিকে যেমন ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে হয়, তেমনি আবার অপরদিকে বাস্তবের বা বর্তমানের দাবীকেও স্বীকার করতে হয়।

আমাদের পথের বাধা

অন্যান্য বিপ্লবের পর সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়ন সুরু হয় একেবারে নতুন ক'রে;—পুরাতনের জের প্রায় থাকেই না। কিন্তু আমাদের পক্ষে পুরাতন যেন প্রবলভাবে বর্তমান রয়েছে। এর কারণ যে আমাদের বিপ্লব এখনও পূর্ণ হয়নি। এই পুরাতনের বন্ধন হতে আমরা অব্যাহতি পাই নি, তাই শাসন-ব্যবস্থায় সেই পুরাতনের জের টানতে হয়েছে। শাসন-যন্ত্রের কাঠামো বা সমাজ-ব্যবস্থা প্রণয়নে পুরাতনের জের না কাটা বিপ্লবের বা সমাজের ক্রমোন্নতির পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করে কেবল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে চলাও সম্ভব নয় এবং সুবিবেচনারও নয়। কাজেই এই নতুন শাসন-বিধির এই ত্রুটি কতকটা অনিবার্য। এ কথা ভুললে চলবে না:—জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর বহু ক্ষমতালোভী সমাজবিরোধী ও উৎপাতসৃষ্টিকারী দল, রাষ্ট্রক্ষমতা আহরণ করার চেষ্টা ও ফন্দি করে দলের শ্রীবৃদ্ধির মারফৎ ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত প্রাধান্য [illegible] করার চেষ্টা এই সময় অনেকেই করবে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে ও চীনে যা ঘটেছে, তা থেকেও আমাদের কিছু সতর্ক হওয়া দরকার। এই শাসনতন্ত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার অনেক আশা অপূর্ণ থাকার প্রধান কারণ এই বাস্তবের স্বীকৃতি। রুষিয়ার বিপ্লবের পর আজ ৩২ বছর অতীত হয়েছে;—এখনও লেনিনের স্বপ্ন অপূর্ণ রয়েছে। তাঁর আশা ছিল এমন রাষ্ট্র তিনি স্থাপন করবেন—যেখানে আমলা-তন্ত্র (bureaucracy), স্থায়ী সৈন্য (Standing Army) এবং পুলিশ রাখার দরকার হবে না। অথচ রুষিয়ার রাষ্ট্রে এই তিনটিই আজ প্রবল।

তবুও আমরা স্বীকার করতে দ্বিধা করছি না—আমাদের বিপ্লবের দাবী অনেকটা স্বীকার ক'রে এরই মধ্যে আমাদের শাসন-তন্ত্র গড়া সম্ভব হ'ত। যে বৈপ্লবিক সাহস নিয়ে আমাদের নেতারা স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন, স্বাধীনতা আসার পর শাসন-কার্যের সংস্পর্শে এসে যেন তাঁরা সেই বৈপ্লবিক সাহস হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা আজ বয়সে বৃদ্ধ বা প্রায় বৃদ্ধ; দীর্ঘ বৎসরের ত্যাগ ও কষ্ট বরণের পর তাঁরা আজ একটা সাফল্য পেয়েছেন। তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক এই সাফল্যের মোহে আবদ্ধ হওয়া; কিন্তু তাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জাতির ব'সে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যে শাসন-তন্ত্র আজ গঠিত হ'ল তা যদি আমাদের বিপ্লবের প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে অন্তরায় হয় তা হ'লে তা পরিবর্তন করার অধিকার এবং সুযোগ আমাদের আছে।

বর্তমান শাসনবিধির উপযোগিতা

এই শাসন তন্ত্রের ৩৬৮ ধারায় এর সংশোধনের ও পরিবর্তনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে অন্যান্য দেশের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের ব্যবস্থার তুলনায় অত্যন্ত সহজ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল একাধিকবার বলেছেন যে এই শাসনতন্ত্রই আমাদের পক্ষে চরম ও শেষ শাসনতন্ত্র নয়। এই শাসনতন্ত্র পেশ হবার সময় তিনি পরিষদে কিছুই বলেন নি এতে অনুমান করা যায়—যে পণ্ডিতজী-ও হয়ত মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে আমাদের

নতুন শাসন-তন্ত্র গঠন করতে হবে। আমরাও তা-ই মনে করি। ইতিমধ্যে এই শাসনতন্ত্রের সাহায্যে দেশে শাসন ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক দেশ—এই বোধ জনসাধারণের মধ্যে জাগাবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি দূর করার চেষ্টা-ও চলতে থাকবে। এই দুটি কাজের পক্ষে এই শাসনতন্ত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ আছে কি না—তাই এখন বিচার্য। অদূর ভবিষ্যতে এ দুটিরই বড় প্রয়োজন। সেই দিক থেকেই এখন আমরা এই শাসনতন্ত্রকে বিচার করব।

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধান অধিকার হল—জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। এই শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে—প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি একটি ভোটের মালিক হবে এবং তাদের ভোট নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র-কার্য পরিচালনা করবে। নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার পূর্ণ ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে নাগরিকদের এই অধিকার নেই; কারণ সেখানে কম্যুনিষ্ট দল ভিন্ন অপর কোন party বা দল থাকতে পারে না—এবং অপর কোন দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াতে পারে না। ইতালী ও জার্মাণীর ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র সম্বন্ধে-ও পরে এর অনুকরণ করা হয়। কিন্তু নাগরিকদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে আমাদের এই শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে।

তা ছাড়া নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বা Fundamental Rights যা এই শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে—তা-ও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। যে কোন গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। শিক্ষা, জীবিকা, ধর্মাচরণ, মতামত ব্যক্ত করা, সভা-সমিতি করা প্রভৃতির অধিকার প্রদত্ত হয়েছে আপাত উঠেছে—যে এর সঙ্গে সঙ্গে এমন সর্ত সব দেওয়া হয়েছে যা'তে ঐ সব অধিকার খর্ব করা চলবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার—যে একের অধিকার অপরের অধিকারের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না;—সেই হিসাবে প্রত্যেক অধিকারই সীমাবদ্ধ। ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করার অর্থ এই নয় যে ধর্মের নামে নরবলি —বা নর নৃত্য বা অন্য কোন প্রকার নিষ্ঠুর আচরণ ও ব্যভিচারের স্বাধীনতা-ও দিতে হবে। তেমনি বাক্যে স্বাধীনতা, মত-প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতিকে সমাজ-দ্রোহী আচরণে পর্যবসিত করলে, তাকে অধিকারের অপব্যবহার বলতে হবে এবং সেখানে তাকে বাধা দিতে হবে। নতুবা সমাজ ও সমাজবদ্ধ জীবন অসম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যে সামাজিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা দেয়—তা-ও মনে রাখা দরকার।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের মধ্যে আর-ও বলা হয়েছে—অস্পৃশ্যতা বা তৎসম্পর্কিত সর্ব প্রকারের আচরণ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হবে। ভারতীয় সমাজের একটা মস্ত বড় কলঙ্ক দূর করার ব্যবস্থা এই শাসন-বিধানে আছে। বিনা মজুরিতে কারো পরিশ্রম আদায় করা, যা আমাদের দেশে যা এক সময় 'বেগার' ব'লে চলত তা, মানুষের ক্রয়-বিক্রয়, অল্প বয়স্ক কিশোরদের কারখানায় বা খনিতে নিয়োজিত করা—দণ্ডনীয় হবে। আইনের ও রাষ্ট্রের নিকট প্রত্যেক মানুষ সমান, ধর্মের হিসাবে বা নর-নারী ভেদে কোন পার্থক্য ধরা হবে না। যখন ধর্মোন্মত্ততার ফলে দেশ বিভক্ত হ'ল—লক্ষ লক্ষ লোক বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাযাবর হ'ল—তখন-ও ভারতীয় শাসন-তন্ত্রে ধর্মের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার স্বীকার করা হয় নি; বা এমন কথা-ও বলা হয় নি যে, কোন বিশেষ ধর্মের রীতি বা অনুশাসন অনুসারে এই রাষ্ট্র চালিত হবে।

মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে—তা যে-কেউ আইনের বলে দাবী করতে পারবে;—আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেউ ইচ্ছা করলে নালিশ করতে পারবে—মৌলিক অধিকার দাবী ক'রে। তা ছাড়া আরও একটা অধ্যায় এই শাসন-বিধানে আছে—যাকে বলা হয়েছে পরিচালক মূলনীতি বা Directive Principles। তাতে রাষ্ট্র-পরিচালনার পক্ষে কয়েকটি মূলনীতি দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে—সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ন্যায়পরায়ণতা রাষ্ট্রের সর্বপ্রতিষ্ঠানের যাতে মূলনীতি হয়; প্রত্যেক নাগরিক যা'তে নিজে পর্যাপ্ত জীবিকার অধিকারী হ'তে পারে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যা'তে জাতীয় ধন-

সম্পত্তি গিয়ে জমা না হয়, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য যা'তে বজায় থাকে, যা'তে শিশুদের শৈশব নষ্ট না হয়, শৈশবে যা'তে শিশুদের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেষ্টন অনুকূল হয়, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ গঠন ক'রে যা'তে তারা স্বায়ত্ত-শাসনের উনত (unit) হিসাবে পর্যাপ্ত ক্ষমতা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষিক্ষেত্রের বা কারখানার শ্রমিক যা'তে জীবনধারণের মতো উপার্জন করতে পারে এবং যা'তে মোটামুটি ভদ্রভাবে বাস করতে পারে, দেশে সর্বশ্রেণীর নাগরিকের জন্য যা'তে একই দেওয়ানী আইন হয়, বিনা মূল্যে ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা যা'তে প্রচলিত হয়—ইত্যাদি সর্ববিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি রাখতে হবে। এ সব কার্যে পরিণত করার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠামো অনেকটা নির্ভর করে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংযুক্ত রাষ্ট্র

ভারতীয় রাষ্ট্র হল গণতন্ত্র, কোন রাজার প্রতি কোন আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকারের কোন প্রসঙ্গ এতে নেই। এই শাসন বিধানে বলা হ'য়েছে—এই রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীন গণতন্ত্র। এতে কোন বিশেষ ধর্মের কোন দাবী নেই, সব ধর্মাবলম্বীই এর নিকট সমান। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি এখানে ভোটাধিকারী। এই রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হ'লেন রাষ্ট্রপতি বা President। কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হ'বেন। সাধারণত শাসন কার্য চালাবেন প্রধান মন্ত্রী, কিন্তু কোন সঙ্কটজনক বা জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হ'লে রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে কর্তৃত্ব নিতে পারবেন। এই বিষয়ে আমাদের শাসন বিধানে কতকটা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী-মণ্ডলী প্রথা ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসন প্রথার সমন্বয় করা হ'য়েছে। এই রাষ্ট্র হ'ল একটি সংযুক্ত রাষ্ট্র বা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্র বা Federal State। কিন্তু সাধারণত সংযুক্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তি (Entity) বা অঙ্গ সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী থাকে; তারপর তারা নিজেদের কিছু ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ ক'রে সংযুক্ত রাষ্ট্রের সৃষ্টি ক'রে। যেমন হ'য়েছিল আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্র গঠনের সময়। তখন ১৩টি স্বাধীন রাষ্ট্র একসঙ্গে বসে নিজেদের সার্বভৌমক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় যুক্ত রাষ্ট্র গঠন করেছিল। কিন্তু ভারতের এই যুক্ত রাষ্ট্র হ'ল ঠিক উল্টো পথে,—অর্থাৎ উপরে যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তি আছে—তার হাতেই ছিল সমস্ত সার্বভৌমক্ষমতা। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র সেই ক্ষমতার কিছুটা দিয়ে নীচের খণ্ডরাষ্ট্র তৈরী করল। এই অবস্থায় নিম্নস্থ খণ্ড রাষ্ট্র কখনও পূর্ণ ক্ষমতা পেতে পারে না। ভারত বিভাগের পূর্বে মুসলিম লীগের দাবী ছিল নিম্নস্থ খণ্ড রাষ্ট্র বা তখনকার ভারার প্রদেশের ক্ষমতা বেশী রাখতে হবে। এই দাবীর বিরুদ্ধে জনমত খুব প্রবল ছিল, কিন্তু তবুও মুসলমানদের তুষ্টির জন্য এমনি একটা আপোষমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজী হ'য়েছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের পর আর ঐ দাবীর কোনই জোর রইল না। বরং এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নিম্নস্থ খণ্ড রাষ্ট্র সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করার দিকে ঝোঁক পড়ল। তবুও এই শাসন বিধানে নিম্নবর্তী খণ্ড রাষ্ট্র সমূহের (এখনকার প্রদেশ সমূহের) দৈনন্দিন কাজ চালাবার এবং জনসাধারণের উন্নয়নের যথেষ্ট ক্ষমতা ও সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে। প্রয়োজন হ'লে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে নিম্নবর্তী খণ্ড রাষ্ট্রের সরকারকে নিজ কব্জার মধ্যে আনতে পারে তার ব্যবস্থা এতে আছে। ভারত প্রকাণ্ড দেশ, পূর্ণ গণতন্ত্র এখানে প্রচলিত হ'ল। ২০।২২টি নিম্নস্থ খণ্ড রাষ্ট্র এখানে থাকবে;—যদি কোন অবাঞ্ছিত দল কোন খণ্ড রাষ্ট্রে নিজ অধিকার স্থাপন ক'রে উৎপাৎ সৃষ্টির চেষ্টা করে তাকে নিজ অধিকারে ফিরিয়ে আনার অধিকার কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র স্বভাবতই রাখবে। আমেরিকার শাসন বিধানে নীচস্থ খণ্ড রাষ্ট্র সমূহ এখনও অনেকটা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু যখন দাস-প্রথা রহিত করার বিরুদ্ধে দক্ষিণের খণ্ড রাষ্ট্র সমূহ বিদ্রোহ করল তখন কেন্দ্র তাদের সর্বভৌম ক্ষমতা জাহির করতে দেয় নি। কোন যুক্ত রাষ্ট্রই কার্যত তা দেবে না। কাজেই যা স্বাভাবিক ও অনিবার্য—তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত।

কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভার দুটি শাখা থাকবে—জনসভা ও রাষ্ট্রসভা। জনসভায় অনধিক ৫০০ জন

প্রতিনিধি থাকবে :—প্রত্যেক খণ্ড রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক ভোটে এই সব প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। সাধারণতঃ প্রত্যেক সাড়ে সাত (৭½) লাখ অধিবাসীর জন্য এক জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। ন্যূনপক্ষে ৫ লাখ লোকে একজন ক'রে প্রতিনিধি পাবে জন-সভার প্রতিনিধি কোন প্রদেশ বা খণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে হবে না।—হবে জন-সংখ্যা হিসাবে। কিন্তু রাষ্ট্র-সভার প্রতিনিধি হবে খণ্ড-রাষ্ট্র হিসাবে : এই সভার মোট সভ্য সংখ্যা

প্রত্যেক খণ্ড রাষ্ট্র ব্যবস্থাপরিষদ নিজ নিজ প্রদেশের নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে, তাছাড়া রাষ্ট্রপতি ১২ জন সভ্য মনোনীত করবেন : যাঁরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও জন-সেবায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন

এঁদের ভিতর থেকে এই ১২ জন মনোনীত

রাষ্ট্রসভার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। কর, শুল্ক

সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব বা খসড়া বা মুদ্রা-

ধিক bill) রাষ্ট্র-সভা আটকাতে পারে না,—যা তাদের বলার ১৪ দিনের মধ্যে বলে আবার জনসভায় পাঠাতে হ'বে জনসভা তখন রাষ্ট্র সভার কোন প্রস্তাব বা সংশোধনই গ্রহণ ক'রে বা না ক'রে ঐ খসড়া গ্রহণ করতে পারবে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রসভা ঐ খসড়া ফেরৎ না দেয় তবে যে অবস্থায় জন-সভা ঐ খসড়া রাষ্ট্র সভার নিকট পাঠিয়েছিল সেই অবস্থায়ই তা উভয় সভা কর্তৃক গৃহীত হ'ল বলে মনে করা হ'বে।

নিকটবর্তী খণ্ড রাষ্ট্রের (বর্তমানের প্রদেশের) গভর্ণর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। গভর্ণর হ'তে স্থানীয় দলাদলি কাড়াকাটির ঊর্দ্ধে থাকতে পারেন—তারজন্যই সেই উদ্দেশ্যেই এই নিয়োগ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। প্রত্যেক খণ্ড-রাষ্ট্রে একটি করে ব্যবস্থা-পরিষদ (Legislative Assembly) থাকবে,—কিন্তু বিহার, বোম্বাই, বাংলা, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে একটি ব্যবস্থা সভা (Legislative Council) থাকবে—কারণ এই সব প্রদেশ থেকে এই দাবী এসেছে। খণ্ড রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় জন-সভা যে কোন খণ্ড রাষ্ট্রে ব্যবস্থা সভা স্থাপন বা রহিত করতে পারবে। কেন্দ্রের ন্যায় অন্য রাষ্ট্রে-ও নিম্ন সভা (Lower House) বা ব্যবস্থা-পরিষদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা ; ব্যবস্থা-সভা কেবল বলতে পারবে—আর একবার ভেবে দেখো। কোন খসড়া বা প্রস্তাবই বাতিল ক'রে দেবার ক্ষমতা ঐ উচ্চ সভার (Upper House) নেই।

রাষ্ট্রের কার্য-কর্তাদের (Executive) প্রায় অবাধ ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতাকে খর্ব করার যা দরকার হ'লে রাশ টানবার ব্যবস্থাও রাখতে হয়। এই ব্যবস্থা হ'ল বিচার বিভাগ ও হিসাব বিভাগ। ভারতেই এই শাসনতন্ত্রে বিচার বিভাগের ও হিসাব বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখা হ'য়েছে। সমস্ত বিচার বিভাগ ও হিসাব পরীক্ষার বিভাগ মন্ত্রী, মন্ত্রী-মণ্ডলী ও আমলা বা কর্মচারীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে নির্বাচন কমিটি (Public Service Commission) হ'বে তাও ঐ প্রকারের স্বাধীন। অবশ্য এর পর সব নির্ভর করবে লোকের চরিত্রের উপর। পুস্তকের কোন বিধানই এমন হ'তে পারে না যাকে কোন প্রকার দুর্নীতিই সম্ভব নয়। চুরি করা দণ্ডনীয় এই ব্যবস্থা ফৌজদারী বিধানে থাকা সত্ত্বেও লোকে চুরি করে। তবুও শাসন-তন্ত্রের লিখিত বিধানের দিক দিয়ে যতটা সম্ভব ঐ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কার্য-কর্তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হ'য়েছে।

রাষ্ট্রভাষা

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ; বহু ভাষা এখানে প্রচলিত আছে। ছোট ছোট অনুন্নত ভাষার সংখ্যা ছেড়ে দিলেও ১৩।১৪টি প্রধান ও সাহিত্যিক ভাষা এখানে প্রচলিত আছে। অথচ এর একটা সাংস্কৃতিগত ঐক্য আছে এবং সেই ঐক্য ভাষা ও সাহিত্যের ভিতরেও প্রতিফলিত হয়েছে। এতদিন ইংরাজী ভাষা ছিল রাজকীয় ভাষা। স্বাধীন দেশে একটা বিদেশী ভাষায় রাষ্ট্রকার্য চলতে পারে না, জাতীয় অহং বুদ্ধি ছাড়াও রাষ্ট্রকার্যে তাহা যদি জনসাধারণের বোধগম্য না হয় তবে তা কখনও গণতান্ত্রিক হ'তে পারে না। ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে হিন্দি ভাষা সব চেয়ে বেশী

প্রচলিত এবং সব চেয়ে বেশী লোকের বোধগম্য। তাই হিন্দিকেই রাষ্ট্রীয় ভাষার গৌরব দেওয়া হ'য়েছে। এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক হ'য়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে সব চেয়ে বেশী বাধা ও প্রতিবাদ এসেছে হিন্দির গোড়া ভক্তদের কাছ থেকে। গান্ধীজী বরাবর বলেছেন দেবনাগরী ও আরবী হরফে লিখিত হিন্দুস্থানী হ'বে ভারতের জাতীয় ভাষা। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে যে বাস্তব ও মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে তা'তে গান্ধীজীর ঐ মত অনুযায়ী প্রস্তাব হওয়া সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া আমরা মনে করি একটা ভাষা যে যার পুঁথী দুই বর্ণমালায় ও দুই অক্ষরে লেখার ব্যবস্থায় অনাবশ্যক অর্থ ও শক্তি ক্ষয় হ'তে বাধ্য। ভারতীয় বর্ণমালা শব্দ বিজ্ঞানের (Phonetic) দিক হ'তে সব চেয়ে বিজ্ঞান সম্মত এবং আরবী বর্ণমালা দিক হ'তে অত্যন্ত দোষপূর্ণ। কাজেই ভারতীয় বর্ণমালা গ্রহণই সঙ্গত হয়েছে। লোক সংখ্যার অনুপাতেও ভারতীয় বর্ণমালার দাবী এখন অবিসম্বাদিত।

ভারতের ঐক্যের জন্য অন্যান্য ভাষা-ভাষী ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ নিজ নিজ ভাষার দাবী উত্থাপন না করে সবাই হিন্দিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হিন্দি আজ যা আছে ঠিক তা থাকবে না। সর্বভারতীয় উপযোগিতার দিক থেকে এর বিবর্তনের ব্যবস্থাও শাসন-তন্ত্রে করা হ'য়েছে। বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীর এদিকে নজর দেওয়া উচিত। হিন্দী শিখে এর ভবিষ্যৎ বিবর্তনে সহায়তা করার দায়িত্ব বাঙ্গালীর উপর অনেকখানি পড়েছে তাছাড়া সর্বভারতীয় ব্যাপারে নিজেদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করতে ও পেতে হ'লে বাঙ্গালীর উচিত হিন্দী শেখার চেষ্টা করা। অবশ্য শাসন-তন্ত্রে হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা করে সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থা-ও করেছে যা'তে ভারতের অন্যান্য সব ভাষা নিজ নিজ অঞ্চলে প্রসার লাভ করতে পারে।

শাসন-বিধানের মোটা-মুটি কথা এখানে বলা হয়েছে। শাসন-তন্ত্র কোন দেশেরই নিখুঁত নয়; আমাদেরটা-ও নয়। সমগ্র ভারত খণ্ডিত হলেও—আজ 'এক শাসন-তন্ত্রের অধীন এসেছে। ভারতের এতটা অংশ কোন দিনই এক শাসনের অধীনে এর পূর্বে আসেনি। ৩৫ কোটি লোকের গণতান্ত্রিক কোন শাসন-তন্ত্র আজ-ও দুনিয়ায় হয় নি। দু বছরের মধ্যে ছয় শত ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যকে লোপ করে—সমগ্র ভারতে এক শাসন-ক্ষমতা আজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল এবং তা পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক (Secular) ভিত্তিতে। অস্পৃশ্যতা বর্জিত হ'ল। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও কুটির উৎপাদন রাষ্ট্রের করণীয় কার্যের মধ্যে ধরা হল। বিচার বিভাগ ও হিসাব পরীক্ষা বিভাগ কার্যকর্তা (Executive) বিভাগ হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা হল। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি আজ ভোটের অধিকারী হ'ল। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসাবে—যা দেওয়া হয়েছে—তা খুব বেশী রাষ্ট্রে নেই; সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার অনেকটাই নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের স্বীকৃত হল। মোটা-মুটি এই শাসন-তন্ত্রে আমরা এই পেয়েছি।

নতুন রাষ্ট্র ও নতুন সমাজ গ'ড়ে তুলবার পক্ষে এটা খুব অপ্রচুর নয়। যে সব দোষ-ত্রুটি আছে—তা ক্রমে সংশোধন করা যাবে। গান্ধীজীর শিক্ষা—ধীরে চলো—কিন্তু পদক্ষেপ যেন সুস্থ ও সবল হয়। অধৈর্য হ'লে আমাদের চলবে না। আমরা বিপ্লবের সাধক যা পেয়েছি তা নিয়ে বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বিকেন্দ্রিত (decentralised) অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি আমরা প্রতিষ্ঠা করব বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে। আজ এই শাসন-বিধানে যা পেয়েছি—বিপ্লবকে গ'ড়ে তুলবার পক্ষে তা আমাদের পরিপন্থী হবে না—অনেকখানি সহায়ক হবে। প্রায় ১৮ কোটি লোক ভোটের অধিকারী হবে; এদের সচেতন করতে পারাই বিপ্লব সাধনের পক্ষে বারো আনা। এই দিক থেকে আমরা এই শাসন-বিধানকে গ্রহণ করেছি।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ।

শ্রীভারতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছোটদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে

—স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

কয় কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন। —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

ভারতবর্ষ

দ্বাদশ বর্ষ | পৌষ—১৩৫৬ | নবম সংখ্যা

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

—ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয়। প্রায় দশ বছর প্লেগ থাকে, জাপানী বোমা পড়ার ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে যে রকম দলে দলে লোক পালিয়ে কলকাতা খালি করেছিল, প্লেগের ভয়ে পলায়ন-বেগ এই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা চলতে পারে। দুইয়েতে কাজ করেছিল মৃত্যুভয়। সেদিন সেটা ছিল মারীভয়, এবারে হয়েছিল জাপানী বোমার ভয়।

প্রত্যহ বহু লোক মরত। কলকাতায়ও প্লেগের টিকা ও কোয়ারাণ্টাইন আইন জারী হয়। অজ্ঞ সাধারণ লোকেরা ভাবল প্লেগের বিষ শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধল। লর্ড এলগিন তখনকার বড়লাট, নিপুনভাবে এই অবস্থা প্রশমিত করেন।

এরই অল্প পূর্বে কলকাতার বুকের ওপর অরাজকতা দেখা দেয়। টালার এক মসজিদ উপলক্ষ ক'রে মুসলমানরা ক্ষেপে ওঠে। পুলিশ ও সশস্ত্র সৈন্য প্রয়োগে মুসলমানদের দমন করা হয়। তখন অনেক মুসলমান হিন্দু সেজে পুলিশের নজর এড়াবার চেষ্টা করে। "মুই হিঁদু" এই রকম মাস্তিক লেখ দিয়ে খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশ হত।

মোটের ওপর নানামুখী জাতীয় অভিমানে ঘা খাত পেয়ে দেশের ভেতর একটা প্রতিকারাকাঙ্ক্ষী প্রতিক্রিয়ার ভাব সঞ্চালিত হচ্ছিল। এদেশের লোক ধনধান্য নয়। অথচ এখানে খৃষ্টধর্ম পরিচালনার জন্য একটা ধর্মবিভাগ ক'রে যথেষ্ট প্রজার দেওয়া অর্থ ব্যয় হচ্ছিল। বড় বড় ব্যবসা এদেশের লোকের হাত থেকে চলে গিয়েছিল। কুটীর শিল্পকে ইংলণ্ডের যন্ত্রশিল্প গলাটিপে মেরে ফেলেছিল। লোকেরা বেকার হয়ে কৃষক বনে যেতে লাগল। জমির উপর যত বেশী লোক নির্ভর করতে লাগল, দারিদ্র্য তত বাড়তে লাগল। এদেশের কাপড় পৃথিবীতে সরবরাহ হত, এখন বিলাতী কলের কাপড় না এলে এরা নগ্ন থাকবে, ফরাসী ডাক্তার বর্ণিয়ে তাঁর হিন্দুস্থান ভ্রমণে লিখে গেছেন —ব্যবসা, বাণিজ্যে ভারত খুব লাভবান ছিল। এখানে কাঁচা মাল বেচে বিদেশী সওদাগররা হুগা ও রেশমের পাকা মাল নিয়ে যেত। অল্প লাভ তারা পেত, বেশী লাভ পেত ভারতীয়েরা। জগতের ভাণ্ডার থেকে বহু টাকা এখানে চলে আসত। ইনি আওরঙ্গজেবের সময়কার ভারতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন :

এখন ঠিক এর বিপরীত দশা। ভারতে সব সূতার কাপড় কলে বোনা আইন নিষিদ্ধ হয়েছিল। সব বিলাতী

সুতো কিনে তাঁতি হাতে কাপড় বুনতে পারত। তার ফলে দেশী কাপড় বিলাতী কলের কাপড়ের চেয়ে দুর্মূল্য হত এবং বিক্রীর বাজার ক্রমশঃ চাপাত।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের ভার নেয় তখন পাঠশালা, টোল ও মোক্তারের সাহায্যে বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন (Literate) লোকসংখ্যা ছিল শতকরা ৭০ জন। অধুনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল শতকরা পাঁচজন।

বিলাত ও ইউরোপে প্রতিবেষনীয় রোগ দমিত হয়ে মানুষ সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হচ্ছিল। ভারতে তার কিছুই হয় না। বসন্ত, কলেরা এদেশ থেকে নির্বাসিত হয়েছে। এখানে কে তা চিন্তা করে?

মফস্বলে ভাল জলাশয়ের অভাবে অস্বাস্থ্যকর জল পান ক'রে লোকেরা রোগের কবলে পড়ে। তারও ব্যবস্থা হয় না। রেলে, ট্রামে, ষ্টীমারে, হোটেলে, আমোদ প্রমোদের স্থলে, যেমন ইডেন গার্ডেনে, গঙ্গার পাশে কালার স্থান ছিল না। বর্ণ পার্থক্য ও তার জন্য হীনতার চাপ এদেশের লোকের মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এ জ্বালা শিক্ষিত সমাজের কাছে দিনের পর দিন উগ্র ও উৎকট প্রতিভাত হচ্ছিল। সরকারী প্রতিটি বিভাগ শ্বেতাঙ্গের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষিত ছিল। যে কোন শ্বেতাঙ্গ প্রত্যেক কৃষ্ণাঙ্গের—সে যত জ্ঞানী বা গুণী হোক না কেন, মাননীয় গুরু তাঁকে যেমন সম্মান দিতে হবে, সম্প্রতি উদ্বুদ্ধ সম্মান বোধের সঙ্গে এর লাগল ঠোকর। সেটা ক্রমশঃ আপনাকে ঘুলেমেলে প্রকাশ সুরু ক'রে দিচ্ছিল।

এরই পাল্টা জবাব হিসেবে, দেশী শিল্প প্রদর্শনী বা মোহন মেলা, দেশী ব্যাঙ্ক, আর্যমিশন, দেশাত্মবোধক হিন্দুমেলা, আর্য সমাজ ইতিমধ্যে দেশে মাথা তুলছিল। মেয়েদের মধ্যে জাতীয় আত্মাভিমান বাড়াবার জন্য মহাকালী পাঠশালার প্রচলন হয়। মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী ছিলেন এর অধিনায়িকা।

সামাজিক পরিস্থিতি থেকে দেখলে ধরা পড়বে—(১) পাশ্চাত্য সভ্যতার চোখ ধাঁধান নব বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির প্রচণ্ড আঘাত। এটা যেন হল ভাষাশাস্ত্রের "ঘাত" (২) "প্রতিঘাত" হল ভারতের সুপ্ত আত্মাভিমান। পুরাকালে আবিষ্কৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্কৃতি যে শেখাত জগতকে; গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ শাস্ত্র, আয়ুর্বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, চারু-কলা, সমাজ-বিন্যাস, সভ্যতা, এই আত্মরক্ষী বা প্রতিক্রিয়া শক্তি অস্ফুট, প্রচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ক্রমে সরব, পরিস্ফুট ও প্রকাশমান হয়ে আসছিল। (৩) একটা "সম্বাদে"র আগমনের সম্ভাবনা কোথাও কোথাও মনীষীদের মানস পটে ক্রমবিকাশের ছন্দে ধরা দিচ্ছিল। ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সাধনার একটা রূপান্তর আগন্তুকের আকারে বেদানা যোর জাগিয়ে তুলছিল। এ পরিবর্তনযুগের চিত্র কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষিত সম্প্রদায়, কৃষ্টির অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষের মধ্যে রূপায়িত হতে আরম্ভ করেছিল। কেউ এক জায়গায় থাকছিল না। মনোভাব দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছিল। প্রারম্ভে কে বলবে এটা একটা বিশাল বিপ্লবের সূচনা? সব আমূল পরিবর্তনের স্বপ্নে আরম্ভ, শেষ বিলাসিতায়। ভাষাশাস্ত্রের ভাষায় "প্রতিবাদের" দু একটা ক্ষুদ্র নমুনা প্রেক্ষণ করা যেতে পারে। কলকাতার বিডন উদ্যানে প্রতি সপ্তাহে পাদ্রী সাহেবরা ধর্ম প্রচার করতেন। দেশী ও বিলাতী উভয় প্রকারের প্রচারক সেখানে জড় হত। প্রথমে বিলাতী বাঁশী ও বেহালা বাজিয়ে মধুর তান ছড়ান হত। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অস্বীকার করা যায় না। তাছাড়া বিলাতী বাঁশী, বিলাতী রাগ রাগিণী আলাপ করছে—একটা অভিনবত্ব বটেই। কৌতূহলী লোকেরা একে একে চারপাশে জড় হয়ে গেলে দু একটা গান গেয়ে বাদ্য বন্ধ করা হত। ছাত্ররা বিকেলে এখানে খেলতে বা বেড়াতে আসত। নির্বিশেষ জনগণও সেখানে জুটত। দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে ছাত্র, অছাত্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত লোক থাকত। ভীড় দেখে "কাবুলী মটর"-ওলা, চানাচুর-ওলা, চানা-মেঠাই-ওলা এবং ফেরীওলারা এসে যেত।

গান বাজনা থামলে কোন এক পাদরী সাহেব উচ্চ বেদীর উপর উঠে ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতেন। তারপর দেশী খৃষ্টানরা বাংলায় বলতেন। সাহেবরা যখন বক্তৃতা করছেন সেই সময় ইংরেজী ও বাংলায়

ছাপা ছোট ছোট কাগজ (হ্যাণ্ডবিল) শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হত। তার মোদ্দা কথাটা থাকত সব ধর্ম যে-ঠিক, একমাত্র খৃষ্টীয় ধর্মই ঠিক। এক একদিন তর্ক লেগে যেত।

একজন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ধর্ম যে ঠিক এবং সত্য তার প্রমাণ কি?

সাহেব উত্তরে বললেন—যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সকলের পাপ নিজের ওপর তুলে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন। তিনদিন বাদে আবার পুনর্জীবিত হন। তিনি জীবনে অলৌকিক ক্রিয়া করেছেন—তনখানি রুটিতে শত শত লোককে খাইয়েছেন। তিনি প্রেমের অবতার। একগালে চড় মারলে দ্বিতীয় গাল পেতে দিতে বলেছেন।

প্রশ্নকর্তা উত্তর করলেন—এই যদি তোমার ধর্মের খুঁটিনাটির পরিচায়ক হয়, তাহলে তুমি হেরে বসে আছ। তোমার ঈশ্বর নবাব, ছেলেকে জমিদারী দেখতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্বর্গে বসে মৌজ করেন। আমার দেশে ভগবান নিজে বার বার অবতীর্ণ হন। পরের পাপের বোঝা যে তোমার প্রভু তুলে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন তাতো তোমাদের কাজ দেখে মনে হয় না। পাপ বেড়েই চলেছে, ধরণী ভারাক্রান্ত। তোমাদের ইতিহাস বর্বর ভাবে পরের দেশ ও ধন লুণ্ঠনে ভরা। তিনদিন বাদে পুনর্জীবিত হওয়ার কথা বলছ? ও জিনিষটা এত তুচ্ছ যে আমাদের অবতারের নিজের ওটা করবার প্রয়োজনই হয় নি। তাঁর ছোট ভাইএর ওপর দিয়ে পুনর্জীবিতের কাজ হয়ে গেছে। দুষ্ট লোকেরা তোমার অবতারকে মেরে দিলে। আমাদের অবতারের শক্তি কত জান? রামকে রাবণ কৈ মারতে পারল? লক্ষ্মণের বরং শক্তিশেল হয়েছিল এবং তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল। এইখানে তোমার হার খুব জোর। তোমরা মরে যাওয়াকে বল "Give up the ghost," আত্মা ত্যাগ; আমরা বলি দেহত্যাগ, আত্মা অমর। পরের জন্য দেহদান এদেশে মানুষেই করে। ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না, শিবি রাজা, জিমূত বাহন জীবজন্তুর জন্য নিজের দেহ দান করেছেন। এ ত্যাগ মানুষের জন্য তবু ত্যাগের চেয়ে কত বড়? প্রেমের অবতার? সেত আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ। বৈষ্ণবরা মাত চড়ে যা করে না। আর তোমরা? চড় মারাত দূরের কথা—বিনা চড়েই যে রকম সবুট পদাঘাতে আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ কর—তার তুলনা নাই। অপার তোমার ভগবানের নামের মহিমা। তোমার উপাস্যকে তবু তিনখানা রুটি খেতে হয়েছিল। আমাদের কৃষ্ণ একটু শাকের টুকরো খেয়ে শত শত লোকের এঁউ, ঢেউ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। গোবর্দ্ধন ধারণ তোমার উপাস্যত করতে পারেন নাই? অলৌকিক শক্তি কি আর দেখান হল?

এরূপ তুলনামূলক বিতণ্ডায় শ্রোতাদের মনের মধ্যে কোন ছাপ বা রাগ পড়ে তা অনুমান যোগ্য।

শুধু এইখানেই শেষ নয়। বক্তৃতা বিশ্বাদভাবে ভেঙ্গে গেলে পর যে যার কাজে বা মৌজে চলে যেত। বৃদ্ধরা দূরে কোন বেঞ্চিতে বসে নানারকম আলাপ-সালাপে প্রবৃত্ত থাকেন। ছেলেরা তাঁদের সামনে দিয়ে গেলে ডেকে বলতেন—ওখানে কি করতে গিয়েছিলে? ধর্ম শিখতে ওদের কাছে যাবার কোন দরকার আছে? আমাদের ধর্ম কেমন বিজ্ঞান সম্মত। শিব আর শক্তি, নেগেটিভ আর পজিটিভ ইলেকট্রিসিটি হুঙ্কার দিয়ে পরস্পরে মিলন করে। ওদের ধর্ম ইলেকট্রিকের নাম গন্ধ নাই ইত্যাদি। স্কুলে-পড়া ছেলেরা ও সময় পজিটিভ নেগেটিভ ইলেকট্রিসিটি বুঝতে পারত না। কিন্তু অতি বড় একটা কিছু ভেবে বিস্ময়ে তাদের মতই মাথা পেতে নিত। সাহেবদের আড্ডা ছাড়ত।

কেউ কেউ আবার বলতেন—রাজা রামমোহন রায় লিখে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে ওদের ধর্মে এখন আর ভগবান নাই। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনেই এক, একেই তিন। এখন সেই তিনের অবতারকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরে ফেলায় ভগবান মারা গেছেন। ওদের হিসাব মতে এখন ঈশ্বর নাই। সাহেবদের কাছে কি করতে আর যাওয়া?

ক্রমে সাহেবদের মত খণ্ডন করে তাদের প্রতিপক্ষরূপে সাহেবদের কলেজী ছাত্ররা মাত্র কয়েক

গাছ ঘুরে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করল, যত ভীড় সেখানে জমা হতে লাগল।

তমধ্যে ব্যবস্তার হাটে মিশনারীরা নতুন নতুন এসে প্রচার করতে গিয়েছিল। আরম্ভটা কলকাতার অনুরূপ। সাহেব দর্শন ও বেশে দুর্লভ ছিল, ইংরেজী বাজনা তার চেয়েও। লোকের ভীড় জমল বেশ। একজন দেশী খৃষ্টান বলতে লাগল—আমি যে কত পাপ করেছি, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার চেয়ে পাতক করেছি তা বলে আর কি জানাব? অনুতাপে জ্বলে জ্বলে মরণ সমান হয়ে গেল জীবন। কোথাও জুড়াতে পারি না, কত সাধু, মহন্ত, মৌলভী, মৌলানা, ঠাকুর, দেবতার কাছে গেলাম। প্রাণের জ্বালা বাড়ল বৈ কমল না। যখন আগুনের তাপে নরক-দহন আর সহ্য হতে চাইছিল না, আমি মিশনারীদের শরণাপন্ন হই। প্রভু যীশুর আশ্রয়ে এসে অনল জ্বালা জুড়িয়েছে। ভাইসকল, সে কি শান্তি, সে কি স্বস্তি! আপনারাও আসুন, খ্রীষ্ট ধর্মের সুশীতল ছায়ায় বসে ত্রিতাপ জ্বালা জুড়ান।

একজন বৃদ্ধ মনোযোগ সহকারে সব শুনছিল। সে উত্তর দিতে আরম্ভ করল—বোড়ো গলায় পাপ কচ্ছি, ব্রহ্ম-হত্যা কচ্ছি, গো-হত্যা কচ্ছি বলে কি বাহাদুরীটা হচ্ছে? পাপ কচ্ছ, প্যারচিন্তি কর, ফুরি গেল। তার্ত করলে নি। শেষটায় তমার খীষ্টানীকে ঘাবাটা খারাপ হোছে।

দর্শকগণ অতঃপর বৃদ্ধের রায়ে রায় মিলিয়ে ঘরে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

হারাণো তারা

মন্মথ রায়

ক্যালকাটা নভেলস কলিকাতার একটি বিশিষ্ট টকি কোম্পানী—অথবা টকী কোম্পানী বললে যে কোম্পানীর নাম সর্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে তার নাম হচ্ছে ক্যালকাটা নভেলস।

ক্যালকাটা নভেলস এর প্রডিউসার সুচিত্র রায় এবং ডিরেক্টর পার্থসারথি বোস তাঁদের আগামী অনবদ্য নিবেদন "পৃথিবীর প্রথম নারী" ছবিতে কয়েকটি ধরণ ঢাকা পাহাড়ের সট নিতে সদলবলে যাচ্ছেন দার্জিলিং—দার্জিলিং মেলে। একটি ফার্ষ্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে রায় এবং বোস, তাঁদের পাবলিসিটি অফিসার শঙ্খ সরকার এবং পৃথিবীর প্রথম নারীর ভূমিকায় ক্যালকাটা নভেলস এর দেশ বিখ্যাত ষ্টার উর্বশী দেবী—পৃথিবীর প্রথম নারীর মতোই রহস্যময়ী—অথচ এত ultra modern যে পৃথিবীর শেষ নারী নয় তো?—কেবলি মনে এই চিন্তিত্ব উপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কোম্পানীর আর আর আর্টিষ্টরা এবং টেকনিশিয়ানদের ভিড়. শীতের রাত। দুপুর রাত। ট্রেণের স্পীড ঘণ্টায় ষাট মাইল।

কিন্তু তখন প্রথম শ্রেণীর কামরাটিতে সুচিত্র রায়, পার্থসারথি বোস এবং শঙ্খ সরকারের কথাবার্ত্তার স্পীড কমে ঘণ্টায় দশ কি বারোতে দাঁড়িয়েছে। ওরা ঝিমিয়ে নিয়েছেন। হঠাৎ সবচেয়ে বড় জিনিষ হয়ে দাঁড়াল শঙ্খ সরকারের শঙ্খধ্বনি নয়, নাসিকা গর্জন—ঠিক যে জিনিষটি নারীরা একেবারে সইতে পারে না—অথবা সইতে পারলেও (আমি জানি ক্রমে ওদের সয়ে যায় যেমন ওদেরটা আমাদের সয়ে যায়) ওরা অবশ্য বলে থাকেন একেবারে একেবারে সইতে পারিনে—(এবং বিলেতে ঠিক এই জন্যই, বরং বলুন এই অজুহাতে কি বছরে ডজন খানেক ডাইভোর্স হয়ে থাকে)।

অতএব এক এই শঙ্খ সরকারই ভীষণ হয়ে দাঁড়ালেন—আমাদের পৃথিবীর প্রথম নারীর কাছে—(হবার কথা, কারণ আমরা আমাদের আগামী ছবির একটা শটে দেখিয়েছি পৃথিবীর প্রথম পুরুষের প্রথম নাসিকা গর্জন শুনে পৃথিবীর প্রথম নারী ভেবেছিল—কি ভেবেছিল সেটা ছবিতে দেখবেন—) অথবা যদি উর্বশী দেবীকে আপনি

পৃথিবীর শেষ নারী ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন—তবে আরো ভীষণ···কারণ পৃথিবীর শেষ নারীকে পাশে রেখে যে নাক ডেকে ঘুমোতে পারে—তাকে···উঃ. উর্বশী দেবীর মনের অবস্থাটা বুঝুন—এবং হঠাৎ যখন নাসিকা গর্জন ত্রিগুণ হয়ে উঠল মানে—রাত এবং বোসও—তখন উর্বশী দেবী—

"নাঃ এখানে impossible। পাশের গাড়ীতে যেতে হবে! ও গাড়ীতে প্রিয়তম মিত্র নিশ্চয়ই জেগে আছে—জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকার দেখছে মানে—উর্বশী জানে কি মানে। প্রিয়তম মিত্র কোম্পানীর ক্যামেরাম্যান—rather young cameraman, এবং very clever, সেটা নামেই প্রকাশ—বাপ মা foolishly হয়তো নাম রেখেছিলেন গোবরা নিবেন গোবর্দ্ধন, কিন্তু ও নাম নিয়েছে 'প্রিয়তম'—has befooled every girl—কি নামে ডাকবে বলুন—! প্রিয়তম? প্রিয়তম বাবু? প্রিয়? মেয়েরা রাঙা হয়ে ওঠে। ওর মা ওকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন—কে যেন রটিয়েছিল। মিষ্টার মিত্র বলে ডাকলে সবাই মুখ চেপে হাসে—এইজন্য—যে কি নামই নিয়েছে যে—সে—নামে ডাকতে না পেরে, তবে তো মিষ্টার মিত্র ব'লে ডাকছে!

এহেন প্রিয়তম মিত্র আজ কি করেছে, উর্বশীর তাও মনে পড়ল। সেয়ালদহতে আজ যখন গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে ও তখন একখানা "খেয়ালী" উর্বশীর হাতে গুঁজে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে পালিয়েছিল "ট্রেণে ঘুমোলে গেটে রাত হয়। বরং ম্যাগাজিন পড়ে রাত জাগা ভালো। "রজনীগন্ধা" গল্পটা wonderful!—পড়ে দেখবেন।"

ট্রেণ চলছে, কি করা যায়, উর্বশী সেই গল্পটা বের করে দেখে প্রথম পাতাতেই ছোটো লাইন লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া রয়েছে "রাত্রির গভীরতম অন্ধকারে প্রিয়তমের স্পর্শে সুন্দরতম যে ফুলটি ফোটে তার নাম রজনীগন্ধা। উষার আলোতে তাকে যখন দেখি—তাকেই আমি বলি উর্বশী।" কে লিখেছে এ গল্প! উর্বশী পাতা উল্টে দেখে "প্রিয়তম মিত্র"।

"নাঃ impossible এ গাড়ীতে আর এক মিনিট থাকাও impossible...এখানে নাক ডাকছে ওখানে প্রিয়তম ডাকছে··· এ গাড়ীতে আর কিছুতেই থাকা চলে না—হ্যাঁ এই যে গাড়ীর গতি কমে আসছে—ষ্টেশন আসছে—গাড়ী থামবে—এই যে থামল—ও মা··· এটা কি ষ্টেশন? আলো কই? উঃ কি ঘুর ঘুট্টে অন্ধকার—একটী বাতী নেই—একটী প্যাসেঞ্জার নেই—চাই গরম চা নেই—তা নাই বা থাকল—রাত্রির গভীরতম অন্ধকারে প্রিয়তমের স্পর্শে সুন্দরতম যে ফুলটি ফোটে—সেই ফুলটি.....উর্বশী নেমে পড়ল।

এই তো পাশের গাড়ী—উর্বশী দেখে জানলা দরজা সব বন্ধ—বন্ধ দরজায় উর্বশী করাঘাত কর্ত্তে লাগল—"খোল খোল" উর্বশী চীৎকার কর্ত্তে লাগল—গার্ড হুইসিল দিল—"মিষ্টার মিত্র, মিষ্টার মিত্র"—সাড়া নেই—উর্বশী জানে প্রিয়তম মিত্র সচরাচর মিষ্টার মিত্র বলে ডাকলে সাড়া দেয় না—"প্রিয় বাবু—প্রিয় বাবু—" তবু সাড়া নেই—উর্বশীর মনে পড়ল প্রিয়বাবু বললে প্রিয়তম কখনো খুশী হয় না—তাকে দেখছি আজ প্রিয়তমই বলতে হবে,—বেশ, "প্রিয়তম! প্রিয়তম!" গার্ড সবুজ বাতি দেখাচ্ছে—গাড়ী ছাড়ল—প্রিয়তমের সাড়া পেল না—উর্বশী তখন কি করতে পারে! অপ্রিয়তম গাড়ীর পানেই ছুটল—গাড়ী তখন তার চেয়ে বেশী বেগে ছুটছে—ছুটবার কথাও—কারণ এ ষ্টেশনটায় মেল কখনো থামে না—আজ চাকৃতির কি গোলমাল হয়ে যায়—তাই বাধ্য হয়ে মেল ট্রেণ থেমে গিয়েছিল—চাকৃতি পেয়েই—গাড়ী ছুটল—জনহীন ষ্টেশনে গভীরতম অন্ধকারে—পড়ে রইল উর্বশী! দিশেহারা উর্বশী!

উর্বশী এখন কি করতে পারে? একা! দিশেহারা! নির্জ্জন ষ্টেশন। অন্ধকার রাত্রি—নীরব নিথর—না-না প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরেই একসঙ্গে তিন তিনটে শেয়াল ডেকে উঠল! উর্বশী আঁৎকে উঠল—ছুটল—দেখল একটা ঘর থেকে একটু আলো বেরুচ্ছে—সেই দিকে ছুটল—গিয়ে দেখে সেটা ষ্টেশন ঘর—। ষ্টেশন ঘর যে ষ্টেশন ঘর তারও দরজা জানলা বন্ধ—কিরকম কনকনে শীত বুঝুন। থাক্ তবু তো ষ্টেশন! ভাগ্যিস একটা কাচের জানলা দিয়ে ঐ আলোটুকু দেখা যাচ্ছিল—নইলে..... ক্যালকাটা নভেলসএর বেশ বিখ্যাত ষ্টার রহস্যময়ী

উৎসী—যার জন্য তখন খানেক সুইসাইড তজন দুয়েক Riot হয়েছে—আজ তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে।... বৃন্দাবন ফিল্মস বা প্যারাসন পিকচার্স নয়—তিনটি শেয়াল।

উৎসী ষ্টেসন ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত সুরু করল। কনকনে শীত—কড়ো হাওয়াটা হু হু করে বইছে—উৎসী বুঝল তার হাড় আছে—এবং তা কাঁপছে। কাচের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে পেল ভেতরে জন দুই লোক আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ে 'দ' হয়ে ঘুমোচ্ছে—অথবা এই নিদারুণ শীতে উঠবে না ব'লে জেগে জেগে ঘুমুচ্ছে।

জীবনে এমন বিপদে উৎসী কখনো পড়ে নি। গভীরতম অন্ধকারে—নির্জনতম প্রান্তরে—ভীষণতম শীতে—নির্দয়তম কনকনে বাতাসে প্রিয়তমের ওপর গিয়ে পড়ল তার প্রচণ্ডতম রাগ। প্রিয়তম তাকে জেগে থাকতে বলে গিয়ে নিজে ঘুমিয়েছে, ওর গেটেবাত হোক্—।

প্রিয়তমের না হয় গেটেবাতই হবে, কিন্তু উৎসীর যে Cramp সুরু হল! হাতে পায়ে খিল ধরে আসছে। কি করা যায়! কি করা যায়! উৎসী চারদিকে তাকাতে লাগল। এতবড় একটা ষ্টার! মরতে তাকে একদিন হবেই সে জানে, কিন্তু এ ভাবে—এখানে—সে মরবে—Unknown—unhonoured—unsung! Bhoo! উৎসী ভেবে দেখেছে সে যখন মরবে—তখন উঃ সে কি প্রসেসন—সব সিনেমা—সব থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল—সবাই তার বাড়ীর দিকে ছুটছে—ট্রাফিক জাম্—খবরের কাগজগুলোর Extra ordinary Special Edition তার Last Photo এমন কি তার last কটোর জন্য কোন artistic pose মুখে নিয়ে উৎসী মরবে—সেও আয়নায় দু' একদিন practise করে দেখেছিল—সেই উৎসী... আজ মরবে—এখানে—এ ভাবে—! আজকাল লোকে বলে ভগবান নেই—সে কথা অতি সত্য—না—না—ঐ তো ষ্টেসনের পেছনের কম্পাউণ্ডে—একটু দূরে—একটা হারিকেনের আলো কাচের জানলা দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে না? হ্যাঁ.....তাই তো—! উৎসী আবার ছুটল—হোঁচট খেতে খেতে কোন রকমে গেট পার হয়ে—কোন রকমে আলোর দিকে ছুটে গিয়ে দেখে সেটা ষ্টেসনের Staff Quarters—হ্যাঁ, নিশ্চয়। ঐ তো ঘর—উৎসী ঘরের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াল—জানলা দিয়ে দেখতে পেল—My God এ লোক জেগে আছে—শুধু জেগে নেই খাচ্ছে—এবং মাংস খাচ্ছে—এবং যে মাংস গরম মাংস—এবং ইকমিক কুকারের রান্না—কুকারটা পাশেই রয়েছে—এবং সবচেয়ে যেটা বড় কথা সেটা হচ্ছে খেতে খেতে টেবিলের ওপরের বেবী পেট্রোমাক্সে হাত সেঁকে নিচ্ছে এবং খাচ্ছে ধোঁয়া উঠছে এমন গরম মাংস—গরম পরোটা আঃ! উৎসী কেবলই ভাবতে লাগল কে এ লোকটা! মুখ দেখা যাচ্ছে না পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু এ লোকটা কোন জন্মে নবাব বাদশা ছিল অথবা দেখেছে, আরাম কি জানে—ডাকি—ওকে ডাকি—কি বলে ডাকব! "ও মশাই" বলব? নাঃ নামটা কি? হবে একটা পাড়াগেঁয়ে নাম কিন্তু এই চরম বিপদে প্রিয়তম বলেই ডাকতে ইচ্ছা হচ্ছে আজ একে!... না-না বরং দরজায় ধাক্কা দি—হ্যাঁ সেই ভালো। উৎসী দরজায় করাঘাত করল। কে? রামটহল? আবার কি বাবা? বল না শালা—উৎসী হি-হি-হি করে উঠল—হেসে উঠল ভাবছেন না বাইরের কনকনে হাওয়ায় কেঁপে উঠল। সে দরজায় দ্বিগুণ জোরে করাঘাত করল।

ও লখিয়া বুঝি। ব্যাটা রামটহল মাল টেনে আজ আবার বুঝি তোকে ঠেঙ্গিয়েছে? দোর খুলে গেল।

উৎসী দেখল একটি ২৩।২৪ বছরের ছেলে—মুখে মুগির একটা ঠ্যাং—উৎসীকে দেখেই তার মুখ হাঁ হয়ে গেল—চোখ দুটো উঠল কপালে মুগির ঠ্যাংটা ভূপতিত হল—!

আপনি—আপনি—আপনি—কে? তোতলা কণ্ঠে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল। "হি - হি - হি" উৎসীর কণ্ঠ থেকে এর বেশী কিছু বেরুল না—এবং ছেলেটির মুখ থেকে অভ্যর্থনার কোন অপেক্ষা না করে উৎসী ঘরে ঢুকতে গেল—এবং ঢুকল—ছেলেটি ঘরের

ভিতর পিছিয়ে গেল—উর্বশী ঘরে ঢুকেই পেছন ফিরে দরজাটি অর্গলবদ্ধ করল—এবং তৎক্ষণাৎ হ্যারিকেন-টির কাছে ছুটে গিয়ে হ্যারিকেনের তাপে হাত সেঁকতে লাগল—। ছেলেটি মেয়েটির এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে অভিভূত হল না বলে, যদি বলি...ভীত হল তাহলেই সত্য বলা হবে—এবং নৈতিক ভয়ে ভীত হল বললে কিছুমাত্র মিথ্যা বলা হবে না।

প্রচণ্ড শীতে মেয়েটির মুখ থেকে ক্রমাগত বের হচ্ছিল একটা কম্পমান 'হি-হি-হি' শব্দ—! মেয়েটি হ্যারিকেনের তাপে হাত সেঁকছে—সে ঘরে যে আর কেউ আছে—এ খেয়াল যে তার রয়েছে তা মনে হচ্ছেনা—এবং সে কোন কথা কইছেনা ছেলেটির দিকে পেছন ফিরে 'হি-হি-হি' করছে!

ছেলেটি এই দারুণ শীতের মধ্যেও ঘেমে উঠল। এ কি ব্যাপার! এই গভীর রাতে সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে রয়েছে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো তার ঘরে কে এল এই নারী! অভিসার? না-না অভিসার একে কিছুতেই বলা যায় না—এটা ঝঞ্ঝার মত আক্রমণ—! না-না, কিছুতেই একে romance মনে হচ্ছে না—বরং রোমাঞ্চ হচ্ছে!

ছেলেটির চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—বাসার পেছনে দীঘির পারে তাল গাছ গুলো—তারি কিছু দূরে ঝাউ গাছগুলো—বাদের সন সন শব্দ তার কানে এখন স্পষ্ট ভেসে আসতে লাগল—এবং তার বাসার বেড়ার পাশে যে ন্যাওড়া গাছটা রয়েছে বেটা সে অনেক দিন কাটতে গিয়ে কাটেনি—কেন কাটেনি—তার কারণ সে কোন দিনই নিজেও ভালো করে বোঝেনি—আজ সেই ন্যাওড়া গাছটা থেকেই কি এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটল!

এ আবার কি! মেয়েটি ষ্টোভ ধরাচ্ছে! ষ্টোভ! কি ভীষণ! এতক্ষণে সে ব্যাপারটা চট্ করে বুঝতে পারল। গেল আশ্বিনে মালবাবুর স্ত্রী—চাখোর স্ত্রী—, ষ্টোভে চা করতে গিয়ে ষ্টোভ ফেটে অপঘাতে মারা গেছেন, তদ্দর লোক গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি তো দেনওনি—উপরন্তু এই ৪২ বৎসর বয়সে—আবার বিয়ে কর্ত্তে চাইছেন—এ তবে মালবাবুর—সেই চাখোর স্ত্রীর—হুঁ,.....বোঝা গেল হাঁা, ষ্টোভে ধরিয়েই চা করবে—

ছেলেটির ভীষণ ইচ্ছা হল বলে "দেখুন, আপনি বাড়ী ভুল করেছেন—মালবাবু হলধর হালদারের বাসা তাল দীঘির পুব পারে—কেন, আপনি কি ভুলে গেছেন? দেখুন—এটা হচ্ছে গিয়ে—আমার—সিগন্যালার বিষাণ বানার্জ্জির বাসা!—কিন্তু কিছুতেই সে এসব বলতে পারলেনা—তার গলা strike করেছে—। কি করবে! সে মনে মনে বললে—দুবার—তিনবার—চারবার বললে। কোন ফল হলনা। মেয়েটি তার দিকে ফিরেও চাইল না। পেছন ফিরে বসে বসে ষ্টোভ ধরাচ্ছে।

বিষাণ বানার্জ্জি বেশ বুঝল এর পরই মেয়েটি চারের সরঞ্জাম খুঁজবে এবং হাতের কাছে না পেলেই—কী মূর্ত্তি ধরবে কে জানে! তার চেয়ে বরং—বিষাণ এখান ওখান থেকে চারের সব সরঞ্জাম জড়ো করে মেয়েটির পেছনে রেখে দিতে লাগল।

ষ্টোভ ধরল। মেয়েটি ষ্টোভের তাপে হাত সেঁকতে লাগল। তার হি-হি-হি রব ক্রমশঃ কমে আসতে লাগল।

বিষাণ এতক্ষণে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছে। সে কয়েক বার ঢোক গিলে এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে—

"শুনুন—আপনি বাড়ী ভুল করেছেন। হলধর হালদারের বাসা তালদীঘির পুব পারে—আপনার তো ভুল হবার কথা নয়। আর শুনুন—হালদার মশাই আবার বিয়ে করবে বলে বেড়াচ্ছে। আপনি শুনে খুশী হবেন আমি এজন্য সেদিন তাকে সবার সামনে Brute মানে—জানোয়ার বলেছি,—তাতে তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন—আপনি তার কাছে না গিয়ে আমার এখানে এসে কেন ষ্টোভ ধরাচ্ছেন বলুন তো! আমি—আমি হচ্ছি গিয়ে বিষাণ বানার্জি—সিগন্যালার।"

মরিয়া হয়ে এক নিঃশ্বাসে বিষাণ বলে ফেলেই ভাবলে 'কেন ষ্টোভ ধরাচ্ছেন' একথাটা বলা ভালো হয়নি—তাই চারের সরঞ্জামগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বললে—তা

হবন এসেছেন, দয়া করে চা খেয়ে যান—এই যে সব সরঞ্জামই—আমি ready করে রেখেছি—

উষসী স্পষ্ট বুঝতে পারল—ছেলেটি তাকে কি ভেবেছে এবং কেমন ভয় পেয়েছে। উষসী হেসে উঠল—খিল খিল করে হেসে উঠল কিন্তু শীতের প্রকোপে হাসিটা স্বাভাবিক না হয়ে অস্বাভাবিক হওয়ায় বিষাণ বানার্জির পিলে যদি চমকায় উষসীর কি দোষ বলুন। উষসী উঠে দাঁড়াল এবং বিষাণ বানার্জির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল—দেখল বিষাণ একটা বিভীষিকা দেখবার মতো চোখমুখ নিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে—

"কিন্তু—হঠাৎ বিষাণের মনে হলো—এবে চেনা মুখ ভীষণ রকমের চেনা মুখ—হলধর হালদারের স্ত্রীর মুখ! নয়—এবে—এবে—

"আপনি—আপনি—উষসী দেবী?"

বিষাণ চেঁচিয়ে মতো বললে—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ওয়াল-ক্যালেণ্ডারটির দিকে চাইলে—হাঁ ঐ তো উষসী দেবীর ছবি—এবং অবিকল সেই মুখ!

উষসীও ওয়াল-ক্যালেণ্ডারে তার ছবি দেখলে। শুধু দেখলে না—দেখে ভারী খুশী হল। আপনিও হতেন। আরো বেশী খুশী হল উষসী এই দেখে, যে, সে ঘরে আর কোন নারীর ছবি নেই—রয়েছে শুধু তারই—মধ্যখানে—স্বল্প সম্মানে!

"না—না, সে কি করে হয়! উষসী দেবী—কলকাতার উষসী দেবী—সারা বাঙলার Sweet heart উষসী দেবী—লক্ষ লক্ষ লোকের স্বপ্নসুন্দরী উষসী দেবী—আকেলপুর ষ্টেসনের ৩০৲ টাকা মাইনের সিগন্যালের ঘরে—রাত্রি শেষ! সে কি করে হয়! আমি স্বপ্ন দেখছি—কিম্বা—

"বলুন—

"আমার মনের কথা জানতে পেরে—আপনি হলধর বাবুর স্ত্রী—ঐ মূর্ত্তিতেই এসেছেন!

মনের কথা! উষসী আরো খুশী হল।

"আপনি খাচ্ছিলেন, খেয়ে নিন—

"আর খাব! খেয়ে নাও!

উষসী মুখ টিপে হাসল।

"না—না খেয়ে নিন এর পর চা খেতে হবে।"

বলির আগে পাঁঠাকে কেন স্নান করানো হয়—কেন সিঁদুর পরানো হয়—কেন ঐ সমাদর—বিষাণ আজ বুঝল। বিষাণের কেবলি ভয় হতে লাগল এর পরই বলবে—স্নান করে আসুন।

"আমার কিন্তু ভারী খিদে পেয়েছে। আপনি না খেলে আমি খেতে পাচ্ছি নে।"—উষসী বললে।

"আপনি খাবেন তাতে বাধা দেবে কে? খান—কিন্তু দয়া করে একটা বিভীষিকা চেহারা ধরবেন না—বরং দয়া করে যে মূর্ত্তি ধরে এসেছেন—ঐ মূর্ত্তিই রাখবেন—" বিষাণ সকাতরে বললে।

উষসী আবার খিল খিল করে হেসে উঠলে।

"কি করে আমি আপনাকে বোঝাব যে আমি হলধর বাবুর পত্নী কিম্বা পেত্নী নই—আমি যে উষসী এ কথা আপনি কিছুতেই ভাবতে পারছেন না কেন বলুন তো?

"আপনি—আপনি—বাঙলাদেশের আট কোটি লোক ফেলে—এই শেষ রাত্রে একটা অজ পাড়া গাঁয়ে—একাকিনী—ত্রিশটাকা মাইনের সিগন্যালার—আমার ঘরে!

আমার মাথা খারাপ হয় নি তো?

না আপনার মাথা খারাপ হয়েছে?"

"ব্যাপারটাই শুনুন—বসুন। বলছি।"

দুজনে বসল। উষসী তার কাহিনী বলতে লাগল।

এই অবসরে আমরা দার্জ্জিলিং মেলের খবর একটু নি। দার্জ্জিলিং মেল তখন পার্ব্বতীপুর পৌঁছেছে। কুলিদের কলরবে এবং ষ্টেসনের গোলমালে ফার্ষ্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে সুচিত্রা রায়, পার্থ সারথি বোস, শঙ্খ সরকারের ঘুম ভেঙে গেল—জেগে উঠে দেখেন উষসী দেবী নেই। ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পড়বার কথাও।

শঙ্খ সরকার বললেন "হয়েছে। ল্যাভেটরিতে। সুচিত্রা রায় বললেন—"ঠিক্—তাই হবে।

পার্থ সারথি বললেন "দেখা উচিত।"—বলেই তিনি ল্যাভেটরির দিকে অগ্রসর হলেন।

শঙ্খ সরকার তার হাত চেপে ধরলেন—"কচ্ছেন কি! A lady in a lavatory! Peeping into her privacy!

পার্থ সারথি। তা বটে! তা বটে!

সুচিত্র রায়। তবে বাইরে থেকে ডাকো সাড়া পেলেই হ'ল।

শঙ্খ সরকার। That too will be an outrage on her modesty বরং আমি দোরে কাণ পেতে শুনি—[দোরে কাণ দিলেন]

পার্থ সারথি। কি হে? কিছু শুনছ?

শঙ্খ সরকার। [ঠোঁট কেটে ইসারা করলেন—] চুপ।

[পার্থ সারথি গিয়ে কাণ পাতলেন]

সুচিত্র। কি হে ব্যাপার কি? কিছু শুনছ?

পার্থ সারথি। উঁ-হুঁ.....

সুচিত্র। আমি আসছি।

Lavatoryর দোরে তিন জনেই কাণ পেতে রইলেন—থাকুন—আমরা আপাতঃ উর্বশী দেবীর কাছে যাচ্ছি।

উর্বশী দেবী ইতিমধ্যে তার কাহিনী বিষাণ বানার্জিকে বলেছে। ওরা দুজনে টেবিলের দুই পার্শ্বে একটি চেয়ার আর একটি ট্রাঙ্কের ওপর মুখোমুখী হয়ে বসে—খাচ্ছে—আর কথাবার্ত্তা কইছে।

বিষাণ। এখন? এখন দার্জিলিং মেল পৌঁছেচে দাঁড়ান দেখছি—[ঘড়ি দেখে] তিনটে ত্রিশ—পার্ব্বতীপুর। নিশ্চয়ই আপনার খোঁজ হচ্ছে—

উর্বশী। তা একটু হচ্ছে বই কি!

বিষাণ। উঃ না জানি কি হৈ চৈ হচ্ছে! দিকে দিকে লোক ছুটছে—দিকে দিকে টেলিগ্রাম ছুটছে—চারিদিকে হাহাকার উঠেছে—উর্বশী নেই—উর্বশী নেই—কোথায় উর্বশী—

উর্বশী। বাঃ আপনি শুধু সিগনালার নন, কবিও বটে!

বিষাণ। কোন কালেও ছিলুম না—কিন্তু আপনি এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে—আমার মাথা—আমার মন—সবই যেন কিরকম এলো মেলো হয়ে যাচ্ছে—ভালো ভালো কথা সব মুখে আসছে—ভালো ভালো সব কবিতা এক সঙ্গে মনে পড়ছে—আমার মাথার screw গুলো মনে হচ্ছে loose হয়ে যাচ্ছে—মনে হচ্ছে স্বপ্নের জীবন অথবা জীবনের স্বপ্ন!

উর্বশী। এই নিন—চা নিন—

বিষাণ। চা। দিচ্ছেন দিন—কিন্তু যাবার আগে একটা Certificate লিখে দিয়ে যেতে হবে—

উর্বশী। Certificate! কিসের?

বিষাণ। আপনি উর্বশী দেবী—আমায় চা করে খাওয়ালেন—এতটা রাত আপনি আমার অতিথি হয়েছিলেন—আমরা দুজনে এক টেবিলে খেয়েছি—এই সব!

উর্বশী। কেন বলুনতো?

বিষাণ। নইলে এ সব কথা লোককে বলে আমি মার খাব নাকি?

উর্বশী। বলতেই বা যাবেন কেন?

বিষাণ। বলব না! কেন বলব না! আপনি এত কাণ্ড করতে পারলেন আর আমি বলতে পারব না।

উর্বশী। বলুন। আপনার স্ত্রী যখন শুনবেন—দেখবেন এখন!

বিষাণ। আমার স্ত্রী! আছে নাকি! যদি থাকতো—তবে বুঝি আমি একা রাত কাটাতাম! যদি থাকতো—তবে বুঝি আপনি এমনি আমার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে পারতেন—? এই রাত দুপুরে?

উর্বশী। আমায় গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেন বুঝি?

বিষাণ। উহু। গলাধাক্কা খেতাম আমি। আপনারা দুজনে বসে গল্প করতেন; সারারাত!

ওদিকে পার্ব্বতীপুরে ওরা যখন বাথরুমের দরজায় কাণ পেতে থেকেও উর্বশীর কোন সাড়াশব্দ পেল না, তখন ওরা বাথরুমে ঢুকে দেখাই সাব্যস্ত করল—কি জানি

কি কিট্ হয়ে পড়ে থাকে—কিম্বা সুইসাইড নয় তো!

না, কিছু বলা যায় না, চোখ বুঁজে ঢোকা উচিত। তিন জনেই চোখ বুঁজে বাথরুমে ঢুকে 'উষসী উষসী' বলে ডাকতে ডাকতে—চারদিক হাতড়ে দেখতে লাগল! সে এক funny scene!

যখন ওরা বুঝল উষসী বাথরুমে নেই—রয়েছে শুধু নিজেরা তিনজন—তিনজনই ছুটে বেরুল—! উষসী missing! মহা হৈ চৈ পড়ে গেল!

এদিকে উষসী আর বিষাণ তখন খাওয়া খাওয়া সেরেছে। উষসী জানিয়েছে next train, Express-এ সেই রাত্রে সে দার্জিলিং রওনা হবে। এখনো রাত আছে। উষসী বড় ক্লান্ত বলল, একটু না শুয়ে আর পারছি না। কিন্তু একটা মাত্র খাট—একসেট বিছনা একটি ব্যাগ কে কোথায় শোবে—এই দাঁড়ালো মহা-সমস্যা।

বিষাণ। মনে করুননা আমি এখানে নেই, ধরুন আমি dead!

উষসী। dead!

বিষাণ। তাইতো—আচ্ছা আচ্ছা—

...যাহোক...চরিত্র ধর্ম এবং শালীনতা রক্ষার চেয়ে শীতের রাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর সমস্যাই যেখানে বড় সেখানে কোন রকমে একটা ব্যবস্থা হল—। ছেলেটির সুশ্রী চেহারায় এবং সরল কথা বার্ত্তায় যে সরলতা মাখা ছিল উষসী এর পূর্ব্বে আর কখনও দেখেনি। ছেলেটি চিত্রজগৎ সম্বন্ধে অভিনেত্রীদের বিশেষ উষসীর জীবন যাত্রা সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উষসীকে বিব্রত করে তুলল—শেষে উষসীকে একটা গান গাইতে অনুরোধ—চলেই তো যাচ্ছেন জীবনে আর তো দেখা হবে না—গান একটা গান ঐ একটা গান আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে রইবে। এর পরও উষসী কি করে বলে, না। উষসী ঘুমপাড়ানী গান সুরু করল - দুজনে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ জানে না।

এদিকে পার্ব্বতীপুরে যখন জানা গেল উষসী গাড়ীতে নেই, খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। টেলীগ্রাম টেলিফোন ইত্যাদি। ট্রেণ আধ ঘন্টা লেট হয়ে গেল। এরা রেলওয়ে পুলিসে খবর দিয়ে দার্জিলিং রওনা হলেন।

ভোর হয়েছে। উষসীর ঘুম ভেঙে গেল। যেতে হবে—ট্রেণের সময় হয়েছে। ভোরের আলো কাঁচের জানলা পথে বিষাণের মুখে পড়েছে—কি সুন্দর দেখাচ্ছে। উষসীর একে ছেড়ে যেতে মায়া হচ্ছে—শিশুর মত সরল সুন্দর মুখখানি—! বড় ক্লান্ত-শ্রান্ত অবসন্ন সে! চিরকাল কপট সমাজের মাঝে থেকে এ সরলতা তার এত ভাল লাগল যে একে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না।

এমন সময় ঘরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল। উষসী গিয়ে দোর খুলল। কি—ঠিকে কি—মোক্ষদা। মোক্ষদা উষসীকে দেখে অবাক। কে তুমি মা?

কেন? বাবু তোমাকে বলে নি?

আমি কাল রাত্রে এসেছি, আমার ভাই রেখে গেছে।

বৌমণি! দাদাবাবু বিয়ে করেছে নাকি! তবে না—বিয়ে করে নি!

তোমাদের বুঝি তাই বলেছে! কি ছেলে দেখেছ। উষসী বেমালুম বিষাণের বৌ বনে গেল: মোক্ষদার সেকি আনন্দ! সে তখনই উষসীকে বাড়ী ঘর দোর দেখিয়ে দিতে লাগল। উষসী তাকে বাজারের টাকা দিল চা খাবার—তরীতরকারী—সমস্ত ফর্দ্দদিয়ে তাকে বাজারে পাঠিয়ে গৃহকার্য্যে লেগে গেল।

এদিকে কলকাতায় তখন খবরের কাগজের হকাররা কাগজ বিক্রি করেছে চেঁচিয়ে—উষসী দেবী missing! উষসী দেবী missing! গরম কেকের মতো কাগজ কাটতে লাগল।

বিষাণকে ডেকে তুলেছে উষসী—বিষাণ জেগে দেখে—সদ্যস্নাতা উষসী—বধূমূর্ত্তি—হাতে খাবারের ডিস—মোক্ষদার হাতে চায়ের ট্রে। বিষাণকে কোন কথা কইবার সুযোগ না দিয়েই উষসী বললে "তুমি নাকি বলেছ তুমি বিয়েই করনি! কি ছেলে তুমি বলদেখি! এরপর হয়ত বলবে, আমি তোমার বউ নই—বল—বল—!" "তুমি—তুমি—" বিষাণ কোন কথা বলতে পারলে না—

বিস্ময়ে! "শীগগীর খেয়ে নাও। এক্সপ্রেসের ঘণ্টা হয়েছে যে!

বুঝতেই পাচ্ছেন উষসী থেকে গেল। প্রথম দিনেই উষসী যেতে উঠল। অভিনয় নয়, প্রাণে যেন কেমন একটা সাড়া পেল। ছোট খাটো সংসারটি—ছোট গ্রামটি—পল্লী বধূরা—দীঘিতে স্নান—তুলসী তলায় সন্ধ্যাদীপ—ওপাড়ায় জমিদার বাড়ী—ষ্টেসন—ট্রেন—গ্রাম্যপথ—বুড়োশিবের ভাঙ্গা মন্দির—সর্ব্বোপরি বিষাণ—উষসী যেতে উঠল। খুব ভালো লাগল তার এই সরল স্বচ্ছ অনাবিল জীবন যাত্রা! সে বধূ! আজ সে বধূ! পল্লীবধূ!

আর বিষাণ! তার জীবনে হঠাৎ যেন রূপ রসগান গন্ধের জন এসেছে! এ যেন তার স্বপ্নের জীবন! জীবনের স্বপ্ন!

অফিস ঘরেই পান আসছে চা আসছে—শুধু তারজন্য নয়—ওখানে যারা আছেন সবার জন্য! বিষাণ উচ্ছসিত হয়ে উঠ্‌ছে—কিন্তু মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন তাকে নিষ্প্রভ করে দিচ্ছে! কত দিন? আর কত দিন?

পরেরদিন সকালবেলা চা খেতে খেতে বিষাণ আনন্দ-বাজার খুলেই দেখে উষসীর অন্তর্দ্ধান নিয়ে একপাতা খবর বেরিয়েছে। কত ছবি! কত বর্ণনা কল্পনা! অবশেষে Calcutta Novels এর ১০০০৲ পুরস্কার ঘোষনা যে উষসীর সন্ধান দিতে পারবে—সে পাবে। পুলিশ তদন্ত হচ্ছে।

বিষাণ উষসীকে দেখাল। উষসী দেখেই তার জড়োয়া গয়না গুলো খুলতে লাগল—বিষাণের ট্রাঙ্ক খুলে তাতে রাখতে গিয়ে দেখে সেখানে একসেট্ সোনার গয়না!

কার?

আমার মার। মারা যাবার সময় ছেলের বৌর জন্য রেখে গেছেন।

ও! উষসী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। যেমন ছিল তেমনি তা রেখে দিয়ে—ট্রাঙ্ক বন্ধ কর্ল।

তুমি পরবে ওগুলো?

আমার সাধ্য!

মোক্ষদা ঘরে ঢুকল—কথা আর এগল না।

মোক্ষদা চলে যেতেই উষসী জিজ্ঞেস করল্—"তুমি বিয়ে করনি কেন?"

"কে বলল বিয়ে করিনি?"

"বিয়ে করেছ?"

"না করলে তুমি এলে কোত্থেকে?" কি কাজে মোক্ষদা আবার এল। মোক্ষদার জন্য এমনি সব Psychological moment এ নিয়ত এমনি দুর্ঘটনা ঘটছে। এবার যখন সে চলে গেল, বিষাণ বল্লে, ও গয়না তো তোমার। পরবে না?

উষসী কোন কথা কইতে পারলো না।

"স্বামী নয় জানি। তবু আমার মার। আমার কাছে ওর দাম আর আজ তোমার দাম—এক! কিন্তু তোমার কাছে তা নয় জানি। তাই আমার কোন জোর নাই।"

বিষাণের চোখে জল এল। উষসীও তার চোখের জল লুকোতে পারলো না।

"না—না, এ তোমার ভারী অন্যায় হচ্ছে। আমি আজই চলে যাব।" বলেই উষসী কথাবার্ত্তাটাকে সহজ করে তোলবার উদ্দেশ্যে মুখে হাসি এনে বললে...হাজার টাকা পুরস্কার—নাওনা। একটা পোষ্টকার্ড লিখে যাকে ছেড়ে দাও—উষসী এখানে—সঙ্গে সঙ্গে হাজারটি টাকা নিয়ে লোক আসবে।

বিষাণের বৌ আজেলপুর গ্রামে মস্ত একটা বলবার কইবার দেখবার মত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ বলছে অপরূপ—কেউ বলছে বিবিবৌ—কেউ বলছে লজ্জাসরম কম—কেউ বলছে চমৎকার! গ্রামের সকল বৌঝিদের সঙ্গেই তার আলাপ পরিচয় হয়েছে—যার জমিদার বাড়ীর সঙ্গে।

হঠাৎ একদিন সবাই দেখলো গ্রামের জাগ্রত দেবতা বুড়োশিবের মন্দিরে খুব জাঁক জমক করে পূজার আয়োজন হচ্ছে। বিষাণের বৌ পূজা দিচ্ছে। বিষাণও রয়েছে—পূজো হয়ে গেল—পুরোহিত আশীর্ব্বাদ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বল্লেন—এইবার স্বামীস্ত্রী তোমরা যাবার

কাছে তোমাদের কামনা জানাও—ভক্তিভরে যা চাইবে বাবা দেবেন—এমন জাগ্রত দেবতা আর নেই। বাবার সময় দুয়ার ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

ঠাকুরের সামনে দুজনে—দাঁড়িয়ে। কামনা!

আমার কামনা কি তুমি তো জানো ঠাকুর! বিষাণ ঠাকুর প্রণাম করলে।

উৎসীও পরম ভক্তিভরে ঠাকুর প্রণাম করে উঠল।

বিষাণ বললে, "তোমার যে আর কিছু কাম্য থাকতে পারে জানিনা যা কিছু পাবার—সবই তো পেয়েছ।"

"সে জানেন বুড়োশিব; তোমার তা জানবার কথা নয়—ইঙ্গিতভরে উৎসী বললে।

সেইদিন রাত্রে বিষাণ লক্ষ্য করলে উৎসী প্রায় নিরাভরণা। তার নিজের যা গয়না ছিল সে তা প্রথমদিনই খুলে বিষাণের ট্রাঙ্কে রেখে দিয়েছিল। বিষাণ দেখলে যা দু' একখানা গয়না ছিল আজ তাও তার গায়ে নেই—হাতে শুধু শাখা।

"গয়না কই? বিষাণ জিজ্ঞাসা করলে। না দিলে কোথায় পাব?"

আমি দেব—তবে তুমি পরবে! কেন তোমার কি কোন অভাব আছে!

এটা হচ্ছে না দেবার কথা। দেবে না—দেবে না, তা অত রুপ কেন?

উৎসী অভিমান করলে।

স্পষ্ট ইঙ্গিত। বিষাণ ট্রাঙ্ক খুলে তার মার সেই গয়নাগুলি উৎসীর হাতে দিল। এর পর আমরা যখন এদের দেখতে পেলাম তখন উৎসীর গায়ে সেই গয়নাগুলি—বিষাণ নিজে পরিয়ে দিয়েছে—উৎসী বিষাণকে প্রণাম করে উঠে বিষাণের মুখপানে চেয়ে বললে—বুড়োশিব ভারী জাগ্রত দেবতা। জানো?—বিষাণ উৎসীকে বুকে টেনে নিল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। এর মধ্যে সি-আই-ডি পুলিস ষ্টেসনে ষ্টেসনে উৎসীর খোঁজ করে যাচ্ছে—লাসটাস পাওয়া গেছে কিনা—এমন খোঁজও হচ্ছে। একদিন আজেলপুরের সি আই ডি পুলিসের জেরায় বিষাণের অবস্থা এমন কাহিল হয়ে পড়ল যে সে অনেক অসংলগ্ন কথা বলে ফেলল। সি আই ডি পুলিসের কেমন একটু খটকা লাগল। সেইদিন থেকে সে বিষাণের ওপর খুব তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখল।—বিষাণ প্রমাদ গণল। উৎসী বিষাণকে বলল আর তো কিছু ভাবি না—দুবৎসর কাজ করব—এগ্রিমেণ্ট রয়েছে—আইনের দড়ি গলায় দিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পারে বই কি। যদি নিয়ে যায়, কি হবে। কিছুদিন খুব সাবধানেই থাকতে হবে দেখছি। সেদিন থেকে উৎসী আর বাড়ীর বের হয় না—উৎসী বাগান করতে লেগে গেল—

বিষাণকে দিয়ে এখান থেকে ওখান থেকে কতরকম আনিয়ে নিজে হাতে ফুলের গাছ বাগান করল। ঘরে দুধ না হলে কি গেরস্থের সংসার হয়! উৎসী একটা গাই কিনল—। উৎসীর মনিব্যাগ যখন প্রায় খালি হয়ে এল তখন সে ভাবতে লাগল এর পর কি হবে।

"এর পর তুমি চলে যাবে—সে তো আমি জানি।"—বিষাণ বললে। উৎসী চটে গিয়ে বললে "কি স্বামী আমার! কি চমৎকার সব কথা!" উৎসীর হাজার দুয়েক টাকা ব্যাঙ্কে ছিল। দুবছর কাজ না করে—কোম্পানীকে যদি ক্ষতিপূরণই দিতে হয়—দিয়ে বাকি যা থাকবে—তা দিয়ে দুজনের ছোট্ট এই সংসারটি বেশ চলে যাবে—যাবে না? উৎসী ভাবে।—

পরদিন প্রাতে চা খেতে খেতে ওরা খবরের কাগজে দেখতে পেল—ক্যালকাটা নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে সেই দিন দার্জিলিং থেকে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হবে—Studio notesএ বিজ্ঞপ্তি রয়েছে। বিষাণ বললে "এক্সপ্রেসে যাবে। এক্সপ্রেস তো এ ষ্টেসনে যাবে! রাত্রি ১০।৫০টায় এখানে আসে। আজই তবে। তুমি দেখতে যাবে নাকি ওদের? লুকিয়ে? উৎসী ধীরভাবে বললে "ওর মধ্যে আর আমি নেই। ওসবের মধ্যে আর আমায় ডেকো না। যা ভুলে গেছি—তা ভুলেই গেছি—ওসবের মধ্যে আর নয়, এ আমি বেশ আছি।" সেইদিনকার কাগজেই ওরা বিজ্ঞাপন দেখল আজ বেলা তিনটায় কলকাতা, বগুড়া, রাজসাহী, রংপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি

কয়েকটি বারগায় Calcutta Novelsএর latest ছবি "অবিচার" একসঙ্গে খোলা হবে। এবং এই ছবির হীরো উৎপলা দেবী—উৎপলার পূর্ণ পৃষ্ঠা চিত্র দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে—এবং বিজ্ঞাপনে এও জানানো হয়েছে উৎপলা দেবীর শেষ চিত্র—কারণ এখনো তিনি নিরুদ্দেশ। অতএব—

এ সুযোগ হারাইবেন না—ইত্যাদি।

উৎপলা জানালো তার এ ছবি সে দেখে আসেনি—যখন Edit হচ্ছিল—তখনই ওরা দার্জিলিং রওনা হচ্ছিল। বিষাণ ধরে বসল তাহলে আজই বওড়া গিয়ে এ ছবি দেখে আসতে হবে—দু'জনেই যাবে। উৎপলা বলল,—"যেতে হয় তুমি যাও—আমি যাব না। ও যখন ছেড়েছি ওর মধ্যে আর যাবনা। এ আমি বেশ আছি—বেশ আছি।" বিষাণ কিছুতেই মানল না। সে বলতে লাগলো এ তোমার তোমাকে পাশে নিয়ে আমি দেখব—সুযোগ—এ সৌভাগ্য জীবনে হবে—এতো ভাবতেও পারিনি—এ আমি কিছুতেই ছাড়বনা—তোমাকে যেতেই হবে—। উৎপলা বলল, ও আমি যখন ভুলেছি—আর আমাকে ওসবের মধ্যে টেনো না। আমার ভয় হয়—কি জানি যদি ওসব দেখে মন আমার বিগড়ে যায়। না-না আমি যাবনা। কিন্তু বিষাণ কিছুতেই মানে না—ছেলেমি সুরু করে দিলে; বললে জীবনের একটা সখ তুমি পুরোবে না? তোমার পায়ে পড়ি উৎপলা তোমাকে যেতেই হবে। উৎপলাকে নিয়ে বিষাণ বওড়া যাবেই এবং গেলও। চট করে ষ্টেশনে গিয়ে রাত ৯টা পর্য্যন্ত ছুটির ব্যবস্থা করে দুজনে ট্রেনে উঠলো। উৎপলাকে নিয়ে বিষাণ উৎপলার ছবি দেখতে যাচ্ছে—এ যে কি গর্ব্ব কি আভিজাত্য সেটা সেদিন বিষাণকে দেখলে বোঝা যেত। বিষাণের হাঁটবার—কথা কইবার ধরণই বদলে গেছে—সে যেন বিষাণ নয় সে যেন চোলপুরের নবাব। তার সঞ্চিত যা টাকাছিল তার ওপরে মালবাবুর কাছ থেকে আরো ১০৲ টাকা ধার করেছে—আজ খরচ কর্ব্বে না তো কবে কর্ব্বে! জীবনের সব দিনের মধ্যে আজ এটি পরম দিন!

বিষাণ একটা বক্সই আজ রিজার্ভ করে ফেলল। বরাৎ করে সে ৮৲ আট টাকা ফেলে দিল। "বক্স—বক্স চাই আমার একটা"—এতটা জোর দিয়ে কথাটা সে বলল—যে বুকিং ক্লার্ক দস্তুর মত চমকে উঠল।

বিষাণের ভারী ইচ্ছা হচ্ছিল সবাই আজ জানুক তার সঙ্গে কে। উৎপলার পূর্ণায়তন ছবিগুলি চিত্র গৃহের এখানে ওখানে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে—দর্শকরা ভিড় করে তা দেখছে—বিষাণ উৎপলাকে সেগুলো দেখবার জন্য টানছে—"এসোনা.....উৎপলা দেবীকে দেখবে এস।" বিষাণ সস্মিত দৃষ্টিতে উৎপলাকে বার বার বলছে।

বিষাণকে একটা চিমটি কেটে উৎপলা বললে, "তুমি ভারী ইয়ে—।"

ওরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে বসেছে। ছবি সুরু হয়েছে। ছবিতে উৎপলার প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গেই ঘনঘন তালি পড়ল। বিষাণের করতালি আর থামে না। উৎপলা তাকে টেনে বলাল—"করছ কি"! তার কানে কানে উৎপলা বলল।

এই ছবিতে কুসুম নামে একটি মেয়ে উপনায়িকার part করছিল—সে ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেই এমন অভিনয় তুলল যে ইংরেজিতে বলবো—She took the auditorium by storm উৎপলা—তারকা উৎপলা—কোথায় গেল তলিয়ে—কুসুম উৎপলাকে একেবারে ডুবিয়ে দিল—কুসুমের কাছে উৎপলা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে গেল—এ কথা না বলে উপায় নেই।

উৎপলা ক্ষেপে উঠল—সে স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গেল—বলতে লাগল—"আমি তখনই জানতাম—এ রকম হবে—ডাইরেকটার আর কুসুমের মধ্যে যে ব্যাপার চলেছে—সে তো আমরা জানি—এ রকম যে হবে তখনই বুঝেছিলাম—এ দস্তুর মত অবিচার—" উত্তেজিত উৎপলা আত্মহারা হয়ে বলে যাচ্ছে, "শুনুন—আপনারা খুব হাততালি দিচ্ছেন—ও রকম নাচ আমরাও নাচতে জানি" বিষাণ তাকে থামতে বলছে—উৎপলা তখন ক্ষেপে উঠেছে—বিষাণকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উৎপলা চীৎকার করে বলতে লাগল—"এ অন্যায়—এ অবিচার—এ আমি কখনো সইব না—

পাশের seat থেকে লোকেরা বলতে লাগল—"কে এ? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

কে আমি? শুনবেন কে আমি?—উষসী বলতে গেল।

বিষাণ তার মুখ চেপে ধরে—জনান্তিকে বলছে—"চল—আমরা এখান থেকে চলে যাই—চল—চল—" একরকম জোর করেই বিষাণ উষসীকে অডিটোরিয়াম থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে—একটা ট্যাক্সিতে তুলেই হাঁকলো—ষ্টেসন! ট্যাক্সি ছুটল। টকি হাউসের ম্যানেজার অডিটোরিয়ামের গোলমাল থামিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন "একটি ভদ্র মহিলা—ছবি দেখতে দেখতে হিষ্টিরিয়া—বের করে দিলুম এ হাউসে মিষ্টার ঘনশ্যাম চক্কারভর্তি যতদিন ম্যানেজার আছে—ওসব চলবে না।—হাঁ।"

এদিকে উষসী কেবলই বিষাণকে বলছে—"এর আমি শোধ নেব—আমি যাচ্ছি কলকাতা—আমি দেখে নিচ্ছি—আমাকে কলকাতার টেণে তুলে দাও—" হঠাৎ বিষাণ দেখলে উষসীর ফিট্ হয়েছে। কোনও রকমে উষসীকে নিয়ে বিষাণ বাড়ী ফিরে এল।

"আমি যাব—আমি যাব—আমাকে যেতে হবে—গিয়ে দেখতে হবে কত বড় অবিচার আমার ওপর করা হয়েছে। এর পরের ছবিতে আমি এর শোধ তুলব—চৈতন্য অচৈতন্যে উষসীর শুধু এই এক কথা।

"তুমি চলে গেলে আমি কি করে থাকব—তুমি কি তা বুঝছ না উষসী? তুমি আমার সংসার গড়ে তুলেছ—আমার জীবন তুমি নতুন করে নিজ হাতে গড়েছ—এ সব ভেঙে চুরে দিয়ে তুমি চলে যাবে? তবে কেন এসেছিলে তুমি আমার জীবনে?—অবরুদ্ধ কণ্ঠে বিষাণ বললে।

আমি তো থাকতেই চেয়েছিলুম। তুমিই তো জোর করে আমায় এখান থেকে ঘুরে ঠেলে দিলে। যেতে তো আমি চেয়ে ছিলুম না—এই গৃহ—এই সংসার আমার বড় ভালো লেগেছিল—তুমি—তুমিই তা আমায় ভোগ করতে দিলে না—জোর করে নিয়ে গেলে আমাকে আমার পূর্ব্বের জীবনে। সেখানে গিয়ে যে অপমান আমি পেলুম—তা সইবার মেয়ে আমি নই। আমি যাব—আমাকে যেতেই হবে। আমি যাব—আমি যাব—

কি করে তুমি যাও? তোমার হাতের ফুলের গাছে—এখনো তাতে একটি ফুল ফোটে নি—তোমার বুকে কি এতটুকু মায়া নেই, মমতা নেই?—বিষাণের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

উষসী স্তব্ধ হয়ে রইল। এক্সপ্রেসের ঘণ্টা হল। রামটহল ছুটে এসে বিষাণকে বলল এক্সপ্রেসের ডাউন দেওয়া হয়েছে—শীগ্‌গীর বাবু—শীগ্‌গীর আসুন—বিষাণ উষসীকে দেখল অনেকটা শান্ত—বিষাণ না গিয়েও পারে না—বিষাণ বেরিয়ে গেল—ষ্টেসনে।

"এক্সপ্রেস! এক্সপ্রেসের ডাউন হয়েছে! এই গাড়ীতেই ওরা কলকাতা ফিরছে—আজই কাগজে বেরিয়েছে—। এই গাড়ীতেই—এই গাড়ীতেই" উষসী উঠল।

এক্সপ্রেস এল। বিষাণ নিয়ম মত কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে গার্ডের কাছে ছুটল—গার্ডকে দিয়ে সে সই করাচ্ছে বটে—কিন্তু তার চোখ রয়েছে গেটে—উষসী যদি চলে আসে—আশঙ্কাই সত্য হল—বিষাণ দেখতে পেল—উষসী গেট পার হয়ে ট্রেনের দিকে ছুটছে—

হঠাৎ ক্যালকাটা নভেলস এর পার্টি উষসীকে দেখেই সমস্বরে চীৎকার করে উঠল—একি! উষসা!

বিষাণ গার্ডের হাত থেকে কাগজপত্রগুলো তখন পেয়েছে—এই দেখে কোথায় রইল কাগজ আর কোথায় রইল পত্র—সেও ছুটল—আর্ত্তকণ্ঠে "উষসী! উষসা! শোন—শোন! যেয়োনা—তুমি যেয়ো না—" চীৎকার করতে করতে বিষাণ ছুটছে—!

কিন্তু ততক্ষণ উষসা ক্যালকাটা নভেলস এর কামরার কাছে পৌছে গেছে। ট্রেণ হুইসিল দিল। ওরা দোর খুলে উষসীকে গাড়ীতে তুলছে—সবাই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ব্যগ্র ভাবে উষসীকে দেখছিল—হঠাৎ এরা দেখতে পেল একটি লোক (বিষাণ) গাড়ীর দিকে উষসীকে ডাকতে ডাকতে ছুটছে। উষসা গাড়ীতে উঠতেই—বিষাণ এসে তার হাত চেপে ধরল—উষসী জোর করে

হাত ছিনিয়ে নিল। সবাই জিজ্ঞেস করল কে ও? ও কে? উষসী স্পষ্ট বলে দিল—মাথা খারাপ...

বিষাণ শুনল। মাথা খারাপ! সে দাঁড়িয়ে গেল। ট্রেন চলে গেল।

উষসীকে পাওয়ামাত্র সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাকে অস্থির করে তুলল—এখানে তুমি কি করে এলে! কোথায় ছিলে? আমরা ভেবে ছিলুম তুমি—ইত্যাদি। উষসী বলল—আপনারা স্থির হয়ে বসুন—আমি সব বলছি। কি করে উষসী ওখানে গিয়েছিল উষসী বলল—সবই বলল—শুধু বলল না বস্তুতাতে সিনেমা দেখার কথা। Boss সুচিত্র রায় মহোৎসাহে লাফিয়ে উঠে বললেন—সিনেমার গল্প—! এই গল্প এই গল্পই আমি ছবিতে তুলব। আর ঐ ছেলেটি চোখমুখ কী চমৎকার! আর উষসী উষসী—তুমি যেয়োনা—যেভাবে বলতে বলতে ছুটছিল—যে Expression তার চোখেমুখে ফুটে উঠছিল—চমৎকার! ঐ ছেলেই আমার এ ছবির Hero সাজবে! He is a find! জানুইন গোল্ড উইনরা এমনি করেই তো Star pick up করে নেয়। আমিও নিলুম।

ক্যালকাটা নভেলস্ এ উষসীর গল্প টকি হবে ঠিক হয়ে গেছে। উষসী দেবীকে ঘিরে গল্প লেখানো হচ্ছে—উষসী বলে যাচ্ছে—একজন লেখক লিখে যাচ্ছে। লেখকটি একটি কিশোর যুবক—মনটি ছন্দে ও উচ্ছ্বাসে ভরা—নাম গণেশ চক্রবর্তী। লিখতে লিখতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। ওঃ আঃ চমৎকার! wonderful! superb! কখনো বা স্বপ্ন দেখছে—উষসী কি বলছে খেয়াল নেই! একটি Type!

উষসীকে তো দেখছি—দেখছি জীবনে ঐ কয়েকটি স্বপ্নমধুর দিবসের স্মৃতি চঞ্চলা—কিন্তু বিষাণ? ঠিক উল্টো। চঞ্চলতা তার চলে গেছে। মৃগনাভি হরিণের মতো—মস্ত চঞ্চলতা সেই কয়েকটি দিন যা দেখেছি—আজ তা একেবারে নেই। তার দেহে মনে এসেছে আজ গাম্ভীর্য্য—বেদনা এনে দেয় যে গাম্ভীর্য্য—পরাজয়ে অবসাদে, আসে যে গাম্ভীর্য্য—প্রলয়ের পর আসে যে গাম্ভীর্য্য। একটা ঝড় বয়ে গেছে—তার পর যে শান্ত প্রকৃতি আমরা দেখি—বিষাণের মাঝে আজ সেই শান্ত. সমাহিত ভাব। লোকের বিদ্রূপ এবং টিটকারি আজ তাকে আর স্পর্শ করতে পারে না—আজ সে শুধু শান্ত নয়, সে নীরব। এবং এই শান্ত নীরবতা দেখে এ ভয় ও মনে হয়—হয়তো বা এ আবার কোন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস—ভেতরে ভেতরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে—আজ আমরা তা দেখতে পাচ্ছি না সত্য, স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা করুন, দেখুন কি হয়।

বিষাণ ছুটি নিয়েছে—তিন দিনের casual leave—তার জ্বর হয়েছে বলেছে, কিন্তু থার্মোমিটার দিন জ্বর উঠবে না। এ জ্বর দেহের নয়, মনের। বিষাণ শুয়ে আছে—তার সব চেয়ে বিপদ হয়েছে কি মোক্ষদাকে নিয়ে।—বৌ এর কি আক্কেল—শত ভাবে সহস্রবার মোক্ষদা তাকে শুনিয়েছে—শোনাচ্ছে—এবং তা তাকে নির্বিবাদে হজম করতে হচ্ছে—যেমন করতে হয়েছে ষ্টেসনশুদ্ধো লোকের—গ্রামশুদ্ধো লোকের হাসি টিটকারি। মোক্ষদার কথা স্বতন্ত্র—অন্য লোকে একটা খুব মুখ রোচক কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে—দেখে ভারী খুশী—মজলিসে বসে মন্তব্য করার মতো একটা ঘটনা পেয়ে খুশী—কিন্তু মোক্ষদা—যে বৌয়ের বাপান্ত করছে—সে পরম বেদনায়, বিশেষ আহত হয়ে। ছোট বাবুকে সে ছেলের মতো ভালবাসতো—আরো তিন বাড়ীতে সে ঠিকে কাজ করতো—কিন্তু তার প্রাণ পড়ে থাকতো ছোট বাবুর বাড়ীতে—ছোট বাবুর বৌ এল—সে তিন বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে ছোট বাবুর ঘর সংসার করতে এল—তার মনে হয়েছিল এ যেন তারই ছেলে বিয়ে করে বৌ আনল ঘরে—মনে হয়েছিল একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলের ঘরে লক্ষ্মী এলেন—মনে হয়েছিল ছন্দহীন সংসারে ছন্দ এল—তিনটী জীবন—বিষাণ উষসী এবং সঙ্গে সঙ্গে তার—তিনটি জীবনেই রূপ এল রস এল গান এল গন্ধ এল।

এহেন মোক্ষদা যখন তাকে বলে, ছোটবাবু তুমি মোকদ্দমা করে বৌ ঘরে ধরে আনো—বৌকে শায়েস্তা কর—কোথায় গেছে খোঁজ নাও—পুলিসে খবর দাও—মোক্ষদার আইন জ্ঞান—যখন যে কোন মোক্তারের থেকে অনেক উঁচুতে ওঠে—তখন বিষাণ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না—তাকে শাসন করতেও তার মন চায় না—কারণ বিষাণ জানে উষসীকে ঐ নারীটি মন প্রাণ দিয়ে কতখানি ভালো বেসেছিল—।

(ক্রমশঃ)

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম সরকার

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

বর্তমান বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্ম সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ছে। যদিও ব্রহ্মদেশ থেকে মাঝে মাঝে এই মর্মে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে যে বিদ্রোহীরা সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বিদ্রোহ চালাতে পাচ্ছেন না এবং কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা সরকারের সাথে একটা মীমাংসা সম্পাদিত করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তথাপি একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ব্রহ্ম সরকার বিদ্রোহীদের কার্যকলাপে এখনও পর্যন্ত খুব বিব্রত। ব্রহ্ম সরকার কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে দেখা যায়, বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ব্রহ্মসরকারকে সরকারী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে এমন কি যে অংশটুকুর উপর বর্তমান ব্রহ্মসরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রয়েছে সে অংশটুকুতে কেবলমাত্র শৃঙ্খলা স্থাপন করতে ব্রহ্মসরকার প্রায় তেইশ কোটি টাকা খরচ করেছেন। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, যদি আরো কিছুকাল বিদ্রোহ চলে তাহলে ব্রহ্ম সরকার একটা শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হবেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে বিদ্রোহ দমন করতে সরকার বদ্ধপরিকর। তাছাড়া যেহেতু ব্রহ্মের পরিস্থিতির উপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তন বিশেষভাবে নির্ভর করছে সেহেতু সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলো ব্রহ্ম সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন

ব্রহ্মদেশে বহু ভারতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠান সেখানে অনেকদিন থেকে ব্যবসা করে আসছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে ব্রহ্মের বিভিন্ন শিল্পে যে ভারতীয় মূলধন খাটান হচ্ছে সে মূলধনের পরিমাণ হবে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা। তাই মনে হচ্ছে, ভারত সরকার সম্প্রতি ব্রহ্ম সরকারকে সাহায্য করবার জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সে ইচ্ছার পিছনে রয়েছে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় মূলধন রক্ষা করবার প্রচেষ্টা, তাছাড়া ব্রহ্মদেশে বহু ভারতীয় রয়েছেন, তাঁদের স্বার্থ এবং আত্মসম্মান রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে সেজন্য ভারত সরকার ব্রহ্ম-সরকারের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করতে খুব আগ্রহশীল।

ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ভারত সরকারের কাছে এই মর্মে একটা দাবী জানিয়েছেন যে ব্রহ্মকে সাহায্য করবার আগে ব্রহ্ম সরকারের কাছ থেকে ভারত সরকারকে দুটো জিনিষ পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে হবে। প্রথম জিনিষটি হচ্ছে এই যে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্রহ্ম সরকার কতদূর রাজী আছেন। দ্বিতীয় জিনিষ হল, প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে কতখানি অধিকার লাভ করা সম্ভবপর।

এখানে ভারতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রশ্ন উঠা খুবই যুক্তিসঙ্গত, কারণ যেভাবে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়-বিদ্বেষ বেড়ে চলেছে এবং ব্রহ্ম সরকার যেভাবে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে ভারত সরকারের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করা বোধ হয় সমীচীন হবেনা। অবশ্যি একথা ঠিক যে বর্তমান বিদ্রোহের ফলে ব্রহ্ম সরকার ভারতীয় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং প্রবাসী ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযান চালাতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আজ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ব্রহ্ম সরকার ভারতীয়দের মোটেই প্রীতির চোখে দেখেন না। সুযোগ পেলেই ব্রহ্ম সরকার আবার ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে দেবেন। ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পূর্ব আফ্রিকার যে নির্য্যাতন ভোগ করেছেন সে নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে ভারত সরকার বিশ্বের দরবারে আবেদন করেছেন। আশা করা যাচ্ছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয় হবে। কিন্তু ভারত সরকার ব্রহ্মের বিরুদ্ধে এইরকম অভিযোগ জানান সমীচীন মনে করেন নি। এর পিছনে দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণটি হল, ব্রহ্ম হচ্ছে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, তাই ভারত সরকার অভিযোগের পরিবর্তে সহযোগিতার ভিতর দিয়ে ব্রহ্ম সরকারের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতে চাইছেন। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এবং কমনওয়েলথে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলো কমুনিষ্ট চীনের প্রতি সম্মিলিতভাবে একটা সাধারণ নীতি অনুসরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এই নীতি নির্দ্ধারণ করতে হলে ব্রহ্ম এবং ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা খুব দরকার।

বরণীয় তাঁরা স্মরণীয়

চারু ঘোষ

শ্রীরসিক লাল দাস

দাসত্বের পঙ্কে নিমজ্জিত জাতির মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি লোক ঠিক পঙ্কজের মতই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠেন। এঁরাই জাতির গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে যান। এঁরাই সাহসে, বীর্যে, মনুষ্যত্বে, ত্যাগে, দেশপ্রেমে প্রাণহীন পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়ান এবং গোটা জাতকে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াবার মন্ত্র শিখিয়ে যান। এঁরাই নৈরাশ্যের নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো জেলে দিয়ে যান। এঁরাই প্রাণপ্রাচুর্যের স্পর্শ দিয়ে মরা জাতকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলেন। এঁদেরই সাধনায়, এঁদেরই আত্মবলিদানে দেশমাতৃকার পায়ের দাসত্বের শৃঙ্খল খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

চারু ঘোষ

বাংলাদেশে গত শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে এই ধরনের বহু লোক জন্মেছিলেন, যাঁদের আদর্শনিষ্ঠ ত্যাগপূত জীবন দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে, যাঁদের মুক্তি-সাধনা দেশকে দাসত্ব মোচনের পথে এগিয়ে দিয়ে গেছে। বিদেশীর দাসত্ব থেকে মুক্ত স্বাধীন ভারতে আজ এঁদের স্মরণ না করলে, এঁদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন না করলে আমাদের কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। এমনি একজনের কথাই আজ আপনাদের কাছে বলছি। নাম তাঁর চারু ঘোষ। অখ্যাত, অজ্ঞাত, স্বল্পকালস্থায়ী জীবন—কিন্তু আদর্শে প্রোজ্জ্বল, প্রেরণায় দীপ্ত, মনুষ্যত্বে সার্থক। যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাঁরাই তাঁর অন্তরের মাধুর্যে, চিত্তের ঐশ্বর্যে ও কর্মের উদ্দীপনায় আকৃষ্ট হয়েছে, মুগ্ধ হয়েছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত সন্ন্যাসগাছা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯০৯।১০ সালের কথা। খুলনা জেলা স্কুলে তিনি পড়েন। তার কয়েক বছর পূর্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলনের প্লাবন বাংলার তরুণ চিত্তে স্বাদেশিকতার সমৃদ্ধি রেখে গেছে। তারই ফলে জেলায় জেলায় ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে ক্লাব গঠন ও লাঠি খেলা শিক্ষার ধুম পড়ে গেছে, দৃঢ় চরিত্র ও বলিষ্ঠ মন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে বরিশাল জেলার নাম তখন বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেছে এবং বরিশালের অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখার্জীর নাম তখন লোকের মুখে মুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে। তরুণ কিশোর চারুর মনে ইচ্ছা জাগলো—বরিশালে গিয়ে এই বহুজনশ্রদ্ধেয় অশ্বিনী দত্ত ও জগদীশ মুখার্জীকে একবার দেখতে হবে, তাঁদের কাছ থেকে মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার শিক্ষা নিতে হবে, আর সেখান থেকে লাঠি খেলাটাও ভাল ক'রে শিখে আসতে হবে। যেমনি সংকল্প তেমনি কাজ। হঠাৎ একদিন বাড়ীতে কাউকে কিছু না জানিয়ে চারু খুলনা ষ্টীমার ষ্টেশনে গিয়ে বরিশালের যাত্রী এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে পাকড়াও ক'রে বললো যে, তাকে বরিশাল নিয়ে যেতে হবে, সে তাঁর চাকরের মতো সমস্ত কাজকর্ম ক'রে যাবে। এইভাবে চারু বরিশালে গিয়ে হাজির হ'লেন। তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। কিশোর চারুর অসাধারণ উদ্যমশীলতা জয়যুক্ত হ'ল।

চারুর দাদা নগেন ঘোষ তখন বরিশাল কলেজে পড়েন। কোনো সূত্রে খবর পেয়ে খুঁজে খুঁজে তিনি চারুকে নিজের কাছে নিয়ে এলেন এবং কিছুদিন সেখানে রাখার পর বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

১৯১২ সালে চারুকে হুগলী জেলার সিঙ্গুর স্কুলে পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। চারুর দাদা নগেনবাবুর বন্ধু হেমন্ত মজুমদার তখন সেখানকার প্রধান শিক্ষক। আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার ব্রত নিয়েই হেমন্তবাবু শিক্ষকতার বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। চারুকে তাঁর হেপাজতে দিয়ে বাড়ীর লোকও নিশ্চিন্ত হ'লেন এবং চারুও তাঁর সংস্পর্শে এসে, তাঁর শিক্ষায় ও সাহচর্যে মহৎ আদর্শের সন্ধান পেয়ে আন্তরিক খুশী হয়ে উঠলেন। কিছুকাল বাদে হেমন্তবাবু সিঙ্গুর স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়ে হুগলীর জেলার বিনোদপুর স্কুলে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগদান করলেন। চারুও তাঁর সঙ্গে গিয়ে বিনোদপুর স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্র মহলে আধিপত্য বিস্তার ক'রে নিলেন। তাঁর অকপট ব্যবহারে, চিত্তের দাক্ষিণ্যে, বুদ্ধির প্রাখর্যে ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অতি স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ছাত্রসমাজের নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার-কাটা, লাঠি খেলা, বাগান-করা, রোগীর সেবা সর্ববিষয়েই তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য।

১৯১৪ সালে ম্যাট্রিক পাস ক'রে চারু দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হ'লেন। বিপ্লবী অধিনায়ক যতীন মুখার্জী তখন সেখানে যাতায়াত করছেন এবং একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতিও সেখানে গড়ে উঠেছে। বহু ভাল ভাল চরিত্রবান মেধাবী ছাত্র এই দলে যোগ দিয়েছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছে। অধুনা খ্যাতনামা ডাক্তার অমূল্য উকিল তখন এই কলেজের আবাসিক চিকিৎসক। তিনিও এই গুপ্ত সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া, প্রফেসর মণি সেঠ, প্রফেসর শরৎ ঘোষ ও হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শশীভূষণ রায়-চৌধুরীও এই বিপ্লবী দলের সভ্য। দলের নেতৃত্বভার ছিল কিন্তু এদেরই ছাত্র তরুণ যুবক ভূপেন্দ্র কুমার দত্তের উপর ন্যস্ত।

এঁদের সংস্পর্শে এসে চারু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, উৎসাহে উদ্দীপনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন, আত্মত্যাগের পথে জীবনকে সার্থক ক'রে তোলার পথ খুঁজে পেলেন—বিপ্লবের মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

এখানে এসেও চারু ছাত্রসমাজের সর্ববিষয়েই অগ্রণী হ'লেন। এই সময়ে দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের উদ্যোগে কলেজ কম্পাউণ্ডের ভিতরে কতকগুলি খেজুর গাছের মাঝখানে কয়েকখানা খড়ের কুটীরে 'খেজুর বাগান মেস' নামে দলের ছাত্রদের নিয়ে Commune systemএ, সাম্যের নীতিতে একটি মেস খোলা হ'ল। অবস্থাপন্ন ছাত্রদের বাড়ী থেকে মাসিক খরচের জন্য একটু বেশী পরিমাণ টাকাই আসতো, আর গরীবদের বাড়ী থেকে এত কম টাকা আসতো যাতে তাদের খরচ কুলিয়ে ওঠা কষ্টকর। স্থির হ'ল, দলের ছাত্রদের বাড়ী থেকে যার যত টাকাই আসুক তা একটি তহবিলে জমা হবে এবং তা দিয়ে এই মেসে সকলেরই সমান ভাবে খাওয়া, থাকা ও অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা হবে। চারু এই মেসের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন।

কিছুদিন যাবে কলেজের একটি নমশূদ্র ছাত্রের কোথাও থাকার জায়গা মিলছে না দেখে এঁরা তাকে এনে খেজুরবাগান মেসে রাখলেন। এতে সনাতনপন্থী কলেজ কর্তৃপক্ষ বিষম চটলেন। তাঁদেরই গোপন প্ররোচনায় মেসের চাকর একদিন ব'লে বসলো, নমশূদ্র ছাত্রটির থালাবাসন সে মাজবে না। চারু বললেন, ছাত্রটির থালাবাসন তিনি নিজেই মেজে দেবেন। যে কথা সেই কাজ—থালাবাসন তিনি মাজতে শুরু ক'রে দিলেন। এর পর ঐ একই গোপন প্ররোচনায় মেসের ঠাকুর বললো, নমশূদ্র ছেলেটি থাকলে সে রান্না করবে না। চারু বললেন, কুছ পারোয়া নেই, রান্না তাঁরা নিজেরাই করবেন। কয়েকজন ছাত্রবন্ধুকে নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেলেন তিনি পালা ক'রে রান্না করতে। পরাজয় তাঁরা মানবেন না, ধর্মের নামে

মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার ও অপমান তাঁর কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। তাঁদের দৃঢ়তা দেখে ঠাকুর চাকর শেষ পর্যন্ত হার মানলো, বিনা আপত্তিতে পুনরায় তারা কাজকর্ম শুরু করলো।

কলেজে তখন সপ্তাহে একটি ক'রে ধর্মের ক্লাস হ'ত। এই ক্লাসে একদিন পণ্ডিত মশাই বললেন, ধর্মকর্ম মানে না এমন সব ছেলে আছে খেজুরবাগান মেসে। তৎক্ষণাৎ চারু প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন,—"Don't particularise Sir, ধর্ম মানে না এমন ছেলে সব মেসেই আছে। তাছাড়া, খেজুরবাগান মেসের ছেলেরা ধর্ম মানে না এ কথা বলা অনুচিত। তারা ধর্ম মানে, কিন্তু ধর্মের নামে ভণ্ডামী ও অবিচার তারা মানে না।" পণ্ডিত মশাই হুকুম করলেন, এরূপ দুর্বিনীত কথার জন্য চারুকে ক্ষমা চাইতে হবে। চারু দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিলেন, ক্ষমা তিনি চাইবেন না। তাঁর দৃঢ়তাই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হ'ল—ক্ষমা তিনি চাইলেন না।

এদিকে তাঁর বিপ্লবী দল তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূলে একটা প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতির আয়োজন করছে। এই উদ্দেশ্যে দলের নেতারা নির্দেশ দিলেন, খুলনার মিলিটারী পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে যথাসময়ে যাতে তাদের সাহায্য পাওয়া যায় সেই চেষ্টা এখন থেকেই করতে হবে এবং খুলনা ঘাটে গিয়ে সারেঙ্গদের সঙ্গে ভাব ক'রে ষ্টীমার চালানো শিখতে হ'বে, যাতে বিপ্লবীরা প্রয়োজনের সময়ে ষ্টীমার অধিকার ক'রে নিজেরাই চালনা ক'রে বিপ্লবের কাজে লাগাতে পারেন। এই দু'টি কার্যেরই প্রধান দায়িত্ব নিলেন চারু ঘোষ এবং অল্পদিনের মধ্যেই এতে অনেকটা কৃতকার্যও হ'লেন। এছাড়া, মাঝে মাঝে তিনি দলবল নিয়ে মফঃস্বল অভিযানে যেতেন এবং সেখানে নির্জন স্থান খুঁজে নিয়ে signalling, অর্থাৎ সঙ্কেত দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদান অভ্যাস করতেন। এ সব কাজে তাঁর উৎসাহ ছিল অফুরন্ত।

এই সময়ে প্রফেসর মণি শেঠের ভাই বলাই শেঠ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে দেওঘরে আছেন। তাঁকে সেবাশুশ্রূষা করার লোক নেই। চারু কয়েকজন বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে পালা ক'রে দেওঘরে গিয়ে তাঁকে শুশ্রূষা করতে লাগলেন। এমনি একদিন শুশ্রূষাকালে রোগীর কাশি উঠলো এবং তার থুথু ছিটকে চারুর মুখের মধ্যে গিয়ে পড়লো। মুখ অবশ্যি তৎক্ষণাৎ তিনি যথাবিধিত ধুয়ে ফেললেন। কিন্তু সেই অবধি সর্দিকাশি তাঁর লেগেই রইলো।

আই-এ পাশ ক'রে চারু বাঁকুড়া কলেজে গিয়ে ভর্তি হ'লেন। ১৯১৭ সালে বিপ্লবের কাজের জন্য সেখান থেকে তিনি আত্মগোপন ক'রে কলকাতায় এলেন। ১৯১৭ সালের মে মাসে একটি বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানে গিয়ে তিনি পিঠে গুলীবিদ্ধ হন। গুলীটি গিয়ে মেরুদণ্ডের কাছে আটকে থাকে। এই অবস্থায় ডাক্তার ডাকা চলে না। তাঁর বন্ধুরা তখন দলভুক্ত মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র নরেন মিত্রকে ডেকে আনেন। কিন্তু তাঁর কাছে অস্ত্রোপচারের কোন সাজসরঞ্জাম নেই। অগত্যা একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি দিয়েই তিনি অস্ত্রোপচার শুরু করলেন। ভোঁতা ছুরিতে কাটতে চায় না, কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে তাই দিয়েই তিনি যথাসাধ্য শারীরিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে কুচিয়ে কুচিয়ে কাটতে লাগলেন। এই প্রক্রিয়া পনেরো মিনিট ধরে চললো! সেই অসহ্য যন্ত্রণা চারু নিঃশব্দে সহ্য করলেন—মুখে কোনো কাতরোক্তি নেই, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নেই, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই। বন্ধুরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই দৃশ্যে তাঁদের চোখের জল বাধা মানলো না। এমন কি নরেন বাবুরও হাতে ছুরি চলছে, চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাই দেখে হাসিমুখে চারু বললেন—"ছিঃ, নরেন দা!" এমন অতুলনীয় সহিষ্ণুতা আয়ত্ত করতে যে অসামান্য মানসিক শক্তির দরকার তা বিপ্লবীদের মধ্যেও বিরল।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে কেষ্ট সাহার স্বীকারোক্তিতে চারু ধরা পড়লেন। পুলিস চারুর কাছ থেকেও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অমানুষিক নির্যাতন

চালালো। কিন্তু সব নির্যাতনই বিফল হ'ল। এক্ষেত্রেও চারু অসাধারণ সহ্য শক্তির পরিচয় দিয়ে কোনরূপ স্বীকারোক্তি না ক'রেই সগৌরবে পুলিসের কবল থেকে বেরিয়ে এলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বিনাবিচারে বন্দী হ'লেন।

১৯২০ সালে জেল থেকে বেরিয়ে পুনরায় তিনি কলেজে ভর্তি হ'লেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়ে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, কুন্তল চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুর সঙ্গে মিলে নৌলতপুর সত্যাশ্রম গঠন করলেন। নৌলতপুর কলেজের নমশূদ্র ছাত্ররা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। চারু ও কুন্তলের প্রাণপণ প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলনে যোগদান করলেন।

অপরিমিত খাটুনি ও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে চারুর ভগ্নস্বাস্থ্যে যক্ষ্মারোগ দেখা দিল। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য তিনি চট্টগ্রাম গেলেন। সেখানে তিনি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের স্বনামখ্যাত নেতা সূর্য সেনের সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকেন। এখানে অবস্থান কালে সূর্য সেনের অনুবর্তীদের অনেকেরই সঙ্গে, বিশেষ ক'রে নির্মল সেনের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

কলকাতায় ফিরে আসার পর শরীর তাঁর দিন দিনই খারাপ হ'তে থাকে। এই সময়ে উত্তরপাড়া বিশ্রামগৃহে কিছুকাল তিনি অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য অনন্ত চক্রবর্তী, রাখাল দে প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই পরে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় ধরা পড়েন ও দণ্ডিত হন।

চারুর অবস্থা যখন আরও বেশী খারাপ হয়ে পড়লো, তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনরা তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আশেপাশের গ্রামের ছাত্র ও যুবকরা তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন, নানা বিষয়ে পরামর্শ করতেন, আলাপ আলোচনা করতেন। মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তাঁর শেষ মুহূর্তের বাণী হিসাবে চারু তাঁদের বললেন—"জীবনটা বৃথা নষ্ট করিস না, কিছু ক'রে মরিস।"

১৯২৪ সালের ১৯শে মে সেখানেই তাঁর জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হ'ল। একটি অমূল্য জীবন অকালেই ঝরে পড়লো। *

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের সৌজন্যে।

ডলার ষ্টার্লিং বিনিময় হার

শ্রীবীণাপাণি চক্রবর্ত্তী বি এ, বি টি

বিশ্বের সর্ব্বত্র ডলার সঙ্কট। ইংলণ্ড এই সঙ্কটে বিপন্ন হইয়া এতদিনে ষ্টার্লিং এর দাম কমাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু সঙ্কটটা কি এবং ষ্টার্লিং এর দাম কমাইয়া ইংলণ্ডের কি সুবিধা হইল?

ডলার আমেরিকার মুদ্রা। ইহা ইংলণ্ডে অচল। ইংরাজ ডলারের অভাবে বিপন্ন হইবে কেন? আর ডলারগুলি এতদিন কোথায় ছিল এখনই বা গেল কোথায়?

এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে আইন সম্মত অর্থ (legal tender) না হইতে পারে এবং এক হাত হইতে অন্য হাতে না চলিতে পারে কিন্তু একেবারে অচল হয় না। আমেরিকার ডলার স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময় (convertible) না হইতে পারে কিন্তু ডলারের যদি আমেরিকার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা (purchasing power) থাকে এবং আমেরিকার জিনিষপত্রের চাহিদা যদি অন্য দেশে থাকে তাহা হইলে অন্য দেশে ব্যবসায়ীদের নিকট ডলার অচল নহে। শুধু তাহাই নহে অন্য দেশে ডলারের দস্তুরমত চাহিদা থাকিবে এবং ইংলণ্ডে যে ডলার আছে তাহার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িবে। ইংলণ্ডের আসল অসুবিধা কতগুলি অত্যাবশ্যক জিনিষ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয় না এবং আমেরিকা হইতে তাহা না কিনিলে ইংলণ্ডের চলে না। যেমন গম, যব, চিনি, তুলা, তামাক, পেট্রল ইত্যাদি। এই সব জিনিষ ইংলণ্ডে হয় না এবং এই সব জিনিষ আমেরিকা হইতে কিনিতে হয়। সহজ অবস্থায় ইহাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নহে. এক দেশে সব জিনিষ হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাহা দেশে হয় না তাহা ভিন্ন দেশ হইতে কিনিলেই চলে। এই জন্যই বৈদেশিক বাণিজ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যে এক দেশ অন্য দেশের জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু বিদেশ হইতে জিনিষ কিনিতে হইলে পয়সার দরকার। এই পয়সা কোথা হইতে আসে? আমেরিকার প্রচুর জিনিষপত্র উৎপন্ন হয় এবং আমেরিকা তাহা বিদেশে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত কিন্তু তাহা কিনিতে হইলে ডলারের দরকার। বিশ্বের সর্ব্বত্র ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া মানে বিশ্বের সর্ব্বত্র আমেরিকাজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি।

বিদেশীর পক্ষে ডলার পাওয়ার একমাত্র উপায় আমেরিকাতে মালপত্র বিক্রয় করা। ইংলণ্ড যদি আমেরিকাতে মাল বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে ঐ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়া আমেরিকা হইতে জিনিষপত্র কিনিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত কোনও দেশের পক্ষে আমেরিকার ডলার সংগ্রহের ইহাই একমাত্র উপায়। অবশ্য আমেরিকাতেই যে মাল বিক্রয় করিতে হইবে এমন কোন কথা নহে। আমেরিকা যে দেশ হইতে মাল কিনিতে বাধ্য সে দেশে মাল বিক্রয় করিলেও চলে। যেমন ইংলণ্ড যদি পাকিস্থানে মাল বিক্রয় করিয়া পাকিস্তানী টাকা সংগ্রহ করে তাহা হইলে ঐ পাকিস্থানী টাকার বিনিময়ে আমেরিকা মাল বিক্রয় করিবে। কারণ আমেরিকা পাকিস্তানী টাকা দিয়া পাট কিনিতে পারিবে।

এক সময়ে ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মাল বিক্রয় করিত। বিলাতের মিলজাত দ্রব্যের চাহিদা সর্ব্বত্র ছিল এবং তদুপরি বিলাতী ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স, জাহাজী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কাজ করিয়া ইংরাজ প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহ করিত এবং ঐ বিদেশী মুদ্রায় খাদ্যদ্রব্য, মিলের জন্য কাঁচা মাল ও বিলাস উপকরণ বিদেশ হইতে ক্রয় করিত। তখন ইংরেজদের শিল্পবাণিজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ অন্যান্য দেশও শিল্পবাণিজ্যে উন্নত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকা শিল্পবাণিজ্যে এত উন্নতি করিয়াছে যে আমেরিকাতে মাল বিক্রয় ত অসম্ভবই, আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যান্য দেশেও ইংরাজের মাল কাটাতে চাহিতেছে না। আমেরিকার কৃষিজাত দ্রব্য এত হয় যে বাজার খারাপ হওয়ার ভয়ে তাহা নষ্ট করিতে হয়। খনিজ ও মিলজাতদ্রব্য অপরিসীম। ব্যাঙ্ক, ইনস্যুরেন্স, জাহাজী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। আনবিক বোমা, যুদ্ধ জাহাজ, মোটরকার বা সিনেমার কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। অতি সাধারণ জিনিষ যেমন আয়না, চিরুণী, টুথপেষ্ট, পাঠ্য বই, মাসিক পত্রিকা

প্রভৃতি পদার্থ সস্তায় সবত্র বিক্রীত হইতেছে। এইজন্য শুধু প্রকৃতির দান বিজ্ঞানে আমেরিকা এত উন্নত প্রতিনিয়ত আমেরিকা নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিতেছে। তাই জিনিষের পড়্তা (cost of production) খুব কম। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ কিন্তু তাহাতে প্রস্তুত জিনিষের পড়্তা বেশী। ভারতবর্ষের বাজার আমেরিকার মালে ছাইয়া গিয়াছে।

ইংলণ্ডকে যদি আমেরিকায় ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মালপত্র বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে বিলাতী মালের দাম কমাইতে হয়। দাম কমাইতে হইলে পড়্তা (cost of production) কমাইতে হয়। পড়্তা কমাইবার এক উপায় সকল জিনিষের দাম কমান। মুদ্রার সংখ্যা কমাইয়া জিনিষ পত্রের দাম কমান হয় কিন্তু তাহাতে ধন উৎপাদন কমিয়া যায় এবং বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ড এই নীতি (deflation) অবলম্বন করিয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ তাহা সমর্থন করিবে না। অন্য এক উপায় মজুরদের ভাতা কমান। মজুরদের ভাতা কমাইলে খরচ কম হইবে এবং বিলাতের উৎপাদনকারী কম দামে বিদেশে মাল বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার তাহাতে রাজী হইবে না। নূতন নূতন যন্ত্র বা ব্যবসার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াও জিনিষ পত্রের খরচ কমান যায় কিন্তু ইহা সময় সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ ইহা বিজ্ঞানের উন্নতির উপর নির্ভর করে। এই বিষয়েও ইংলণ্ড এখন আর জগতের শীর্ষস্থানে নয়।

সুতরাং দর কষিয়া যদি বিদেশে মাল বিক্রয় না করা যায় এবং বিদেশে বিক্রয় না করিতে পারিলে বিদেশীর মুদ্রা পাওয়া না যায় ও বিদেশ হইতে জিনিষ পত্র ইচ্ছামত ক্রয় না করা যায় তাহা হইলে এই অবস্থায় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্ত্তন করিয়া কি সুবিধা হইতে পারে?

মুদ্রার সত্যিকার দাম নির্ভর করে ঐ মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতার (purchasing power) উপর। ইহা দেশের ভিতর ও দেশের বাহির উভয়তঃ প্রযোজ্য। যদি এক পাউণ্ডে ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করা যায় এবং ঐ পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করিতে আমেরিকায় পাঁচ ডলারের দরকার হয় তাহা হইলে মোটামুটি উভয় মুদ্রার বিনিময় হার হইবে এক পাউণ্ড = পাঁচ ডলার অথবা এক ডলার = চার শিলিং। সময় সময় চাহিদা ও সরবরাহের সাধারণ নিয়মে এই হারের কিছুটা কম বেশী হইতে পারে। যেমন এক সময় ইংলণ্ডে লোকেরা বেশী আমেরিকার জিনিষ কিনিল। যাহারা আমেরিকা হইতে মাল কিনিয়াছে তাহারা ডলার চাহিবে। কারণ ডলার আমেরিকায় পাঠাইতে হইবে। যাহারা আমেরিকায় মাল বিক্রয় করিয়াছে তাহারা ডলার লইয়া বসিয়া আছে। ডলারের চাহিদা আসিতেছে আমদানীকারী হইতে আর ডলার সরবরাহ হইতেছে রপ্তানীকারী হইতে। আমদানী বেশী হইলে চাহিদা বেশী এবং চাহিদা বেশী হইলে দাম বেশী। সুতরাং ডলারের দাম বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ এক ডলারে পূর্বের হার চারি শিলিং না হইয়া পাঁচ শিলিং হইবে। সাধারণ জিনিষের দামও এই একই নীতিতে উঠা নামা করে। অন্য সময় রপ্তানীকারীর সংখ্যা অধিক হইলে ডলারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং ডলারের দাম কমিবে। ইংলণ্ডে এখন ক্রমাগত আমদানী বেশী হইতেছে এবং ডলারের দাম বাড়িতেছে অথবা পাউণ্ডের মূল্য কমিতেছে। পূর্বের তুলনায় এখন যদি

এক পাউণ্ড = চারি ডলার

অথবা এক ডলার = পাঁচ শিলিং

হয় তাহা হইলে বলিতে পারি ডলারের দাম বাড়িয়াছে অথবা পাউণ্ডের দাম কমিয়াছে। উভয়ই এক কথা। ইংলণ্ডে ক্রমাগত পাউণ্ডের দাম কমিতেছে মানে পূর্বের পরিমাণ ডলার ক্রয় করিতে এখন অধিক পাউণ্ডের দরকার। ইহাই হইল ডলারের অভাব বা ডলার সঙ্কট।

পাউণ্ডের দাম কমিলে ইংলণ্ডের ক্ষতি কি? প্রথম ক্ষতি মানসিক। যে দেশের মুদ্রার দাম ক্রমাগত কমিতে থাকে সে দেশের মুদ্রার উপর এবং ক্রমে সেই দেশের সরকারের উপর লোকের আস্থা কমিয়া যায়। গত ১৯১৪—১৮ সনের যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশে ইহা হইয়াছিল। দ্বিতীয় অসুবিধা বিদেশী মুদ্রার দাম বাড়িলে বিদেশী জিনিষের দামও বাড়িয়া যায়। এত অধিক দামে

আমেরিকার তামাক, তুলা, চিনি, পেট্রোল প্রভৃতি ইংরাজ পূর্বের মত ব্যবহার করিতে পারিবে না। যত সুখভোগে ইংরাজ অভ্যস্ত তাহা বজায় রাখা সম্ভব হইবে না। গরীবানা চালে চলিতে হইবে দেখিয়া ইংরাজ আজ বিপন্ন।

পাউণ্ডের মূল্য যখন সত্য সত্যই কমিয়েছিল তখন বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণনীতি (control) অবলম্বন করিয়া পাউণ্ডের দাম উঁচুতে রাখা হইয়াছিল। পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হওয়ার আসল কারণ মুদ্রাস্ফীতির জন্য জিনিষ পত্রের দাম বৃদ্ধি। গত যুদ্ধে সকল দেশেই কম বেশী মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে কিন্তু আমেরিকার তুলনায় ইংলণ্ডে মুদ্রাস্ফীতি অধিক হইয়াছে এবং ঠিক এইপরিমাণ পাউণ্ডের মূল্য বা দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা কমিয়াছে।

ধরা যাক্ যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় জিনিষ পত্রের গড় পরতা দাম (price level) ছিল এবং উভয় মুদ্রার বিনিময় হার ছিল এক পাউণ্ড = পাঁচ ডলার। যুদ্ধের পর গড় পরতা দাম ইংলণ্ডে হইল ২০০ এবং আমেরিকায় ২০০। অর্থাৎ পাউণ্ডের দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা আড়াইগুণ এবং ডলারের দুইগুণ কমিয়াছে। এই অনুপাতে এক পাউণ্ডের বিনিময় হার হওয়া উচিত ১ পাউণ্ড অর্থাৎ চারি ডলার। এই অবস্থায় যদি কৃত্রিম উপায়ে পাউণ্ডের দাম পূর্বের ন্যায় পাঁচ ডলার রাখা হয় তাহা হইলে পাউণ্ডের দেশের ভিতরকার দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা (internal purchasing power) ও বাহিরের মূল্য (external value in terms of the foreign currency) উভয়ের মধ্যে সমতা থাকে না। পাউণ্ডের দেশের ভিতর জিনিষ পত্র ক্রয়ের ক্ষমতা কমিয়াছে (যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হওয়ায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়াছে) অথচ পাউণ্ড পূর্বের হারে ডলার বিনিময় করিতেছে। ইহা চলিতে পারে না। হয় পাউণ্ডের দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা (internal purchasing power) বাড়াইতে হইবে নতুবা পাউণ্ডের ডলার বিনিময় হার (external value in terms of dollar) কমাইতে হইবে। প্রথমটি করিতে পারিলে ইংরাজের গৌরব হয়ত বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু দ্রব্যক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ জিনিষপত্রের দাম কমান (deflation) ইহাতে ধনোৎপাদন কমিয়া যায় এবং বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় উপায় বিনিময় হার (foreign rate of exchange) কমান। ইহাতে বিলাতী জিনিষের চাহিদা বিদেশে বৃদ্ধি পাইবে এবং আমেরিকাজাত দ্রব্যের চাহিদা বিলাতের বাজারে কমিবে।

এই নীতি মন্দের ভাল। বিলাতী জিনিষের দাম বিদেশে বিশেষ করিয়া আমেরিকায় কমিবে এবং বিলাতী উৎপাদনকারীরা অধিক উৎপাদন ও রপ্তানী করিতে পারিবে। কিন্তু আমেরিকার জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আমদানী কমিবে। তাহাতে ইংরাজ আমেরিকার জিনিষ কম ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।

এক সময় ইংলণ্ডের মুদ্রা স্বর্ণ নির্মিত ছিল। পরে কাগজের নোট প্রচলিত হইল কিন্তু ঐ কাগজের নোট স্বর্ণে বিনিময় (convertible into Gold) ছিল। তখন তাহাকে পাউণ্ড বলা হইত। ১৯৩১ সন হইতে ইহা স্বর্ণে বিনিময় নহে। ভারতবর্ষের টাকার ন্যায় ইংলণ্ডের মুদ্রা কাগজের নোট এবং কোনও ধাতুতে বিনিময় যোগ্য নয় (Inconvertible paper currency) সেই হইতে পাউণ্ডকে ষ্টার্লিং বলা হয়। ইহা ছাড়া পাউণ্ড ও ষ্টার্লিংএ কোন পার্থক্য নাই, উভয়ই এক বস্তু। এই প্রবন্ধে পাউণ্ড ও ষ্টার্লিং একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

তারাশঙ্করের রঞ্জন ও রাই-কমল।

—শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাশ বি. এস-সি।

রঞ্জন চায় মানুষ, রাই-কমল চায় ভগবান; রঞ্জন চায় রূপ, রাই-কমল চায় প্রেম। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য রঞ্জন শুধু রূপ খুঁজে বেড়ায়। যার রূপ যৌবনকে পাড়ি দিয়েছে, রঞ্জনের কাছে তার কোন মূল্য নেই। তাই তার প্রার্থিত রাই-কমলকে পেয়ে কিছু পর যখন সে দেখল, রাই-কমলিনীর রূপে ভাটন ধরেছে, তখন সে তাকে ঠেলে দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সে ত রাই-কমলকে চায় নাই কোন দিন, চেয়েছিল রাই-কমলের রূপ। তাই সে যখন দেখল, রাই-কমলের কমল আর কামগন্ধে হাসে না, তখন সে তাকে বিদায় করে দিয়ে অন্য রূপের আস্বাদনে মত্ত হলো। এই রূপের মোহেই একদিন সে পত্নীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল, এই রূপের মোহেই পিতামাতার মনে দুঃখ দিয়ে জাতি খুইয়ে সে বৈষ্ণব সেজেছিল। পত্নীর রূপ-যৌবনে মরিচা ধরল,—অপ্রত্যাশিতের মত রঞ্জন পেল রাই-কমলকে। কিন্তু রাই-কমলও গেল;—রঞ্জন চঞ্চল হয়ে ধরে নিয়ে আসল আর এক রূপধারী যুবতীকে। রঞ্জন প্রেমিক নয়, রঞ্জন উচ্ছৃঙ্খল। কমলিনী তা বুঝেছিল। রাই-কমলের স্বর্গীয় প্রেমে কামগন্ধের কলুষ ছিল না। মানুষের ভিতর দিয়ে সে ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করেছে। তার চোখে এই মানুষই নারায়ণ। ভগবানের চরণেই সে তার নিষ্কলুষ প্রেম নিবেদনের জন্যে সর্বাবস্থায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু সে বুঝে উঠতে পারছিল না, কার ভিতর দিয়ে সে এই অপার্থিব প্রেমের উপাসনা করবে। রঞ্জনকে যদিও সে কখন মনে মনে ভালবেসেছে, তথাপি রঞ্জনে সে ভগবানের মূর্ত্তির ধ্যান করেছে। মানুষের সমাজ যখন সেই রঞ্জনকে কেড়ে নিল, তখন সে স্থির করল, বিবাহ করবে না। কিন্তু তার মা ও রসিক দাসের তাড়নায় সে তার সঙ্কল্পে অটল থাকতে পারল না। মায়ের মৃত্যু শয্যায় সে কথা দিল, বিবাহ করবে। রসিক দাসের তাড়নায় শেষে হাতের কাছে পাওয়া রসিকদাসের গলায়ই মালা পরিয়ে দিল। রসিকদাস কিন্তু এ রকম আচরণের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার ইচ্ছা ছিল রাই-কমল নবীনচাঁদকেই মালা পরায়। রাই-কমলের ধ্যানে এই রসিকদাসও রসিকদাস নয়, ভগবান। কিন্তু বাউল রসিকদাসের শুষ্ক রস এই মালার স্পর্শে উথলে উঠল। পরে সে বুঝল যে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে; তার ভুল হয়েছে। ভগবানের মন্দিরে মুখ দেখাতে রসিকদাস লজ্জা অনুভব করল। ক্ষোভে, দুঃখে বোধ হয় প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই রসিকদাস কোথায় চলে গেল। যাবার আগে রাই-কমলের দেওয়া মালাখানি সে গোপনে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু এই মালার পরশে আজন্ম বাউল রসিক দাসের সংযমের বাঁধ শিথিল হলেও রাই-কমলের হয় নাই। রসিকদাস চলে গেলে রাই-কমল কিছুদিন ভগবানের মূর্ত্তির গলায় মালা পরিয়ে পূজা করেছে। কিন্তু পাষাণ মূর্ত্তি প্রতিদানে হাসল না;—রাই-কমল উতলা হয়ে জয়দেবে চলল। জ্যোৎস্নার গভীর রাত্রে একাকী অসহায় অবস্থায় পথে দেখা হল কৈশোরের সেই হারানো রঞ্জনের সাথে। রঞ্জনের কামতৃষ্ণা তখন বোধ হয় পত্নীর রূপ যৌবন হারিয়ে রাই-কমল অথবা অন্য কোন রূপবতী যুবতীকে খুঁজে ফিরছিল। রাই-কমল রঞ্জনের সাথে তার আশ্রমে ফিরে গেল। কিন্তু মনে কোন খারাপ উদ্দেশ্য তার ছিল কি? রাই-কমল নিজে উদারচেতা পরিণামদর্শী নারী। তাই পত্নীর বেদনা সে বুঝতে পেরেছিল। এই বলেই মার খেয়েও সে পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরেছে। ভগবানের নাম কীর্ত্তন না করলেও রঞ্জন ভগবানকে ভয় পেত। তাই তারও একটি গৌরাঙ্গ মন্দির ছিল।

রঞ্জন আর রাই-কমল শৈশবের সহযাত্রী হলেও দুজনে দুমুখো। রঞ্জন চায় রূপ, রাই-কমল চায় প্রেম। রাই-কমলের কাছে রঞ্জনের এই খুঁত ধরা পড়তেই সে তাকে ছেড়ে পথ সরল করে নিল। এই পথে পথে সে শুধু সেই প্রার্থিত ভগবানের চরণেই আত্ম নিবেদন করে চলেছে।

বিপদের মুখে ভারতীয় আদর্শবাদ

রঞ্জনকুমার দত্ত।

(পূর্বানুবৃত্তি)

পাশ্চাত্য ষ্টেটবাদ যে কথা নির্লজ্জ ধার্ষ্টিকতার সাথে, নিতান্ত অশ্রদ্ধার সাথে আজ বলে, সেই কথা গীতাশাস্ত্রেও আমরা পাই। কিন্তু সেখানে দম্ভ নেই, আছে অনুনয়, আবেদন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
[৬৪—৬৫, ১৮]

অর্থাৎ ভগবান বলছেন অর্জুনকে, তুমি ভেবো না, সকল ধর্ম ত্যাগ কোরে এক আমারই আশ্রয় লও, তা হলে সকল পাপ ও দুঃখ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করবো। তোমাকেও তো তেমনিভাবে আমার দিকে অগ্রসর হতে হবে। তোমাকেও তো আমার ভক্ত হতে হবে, আমার জন্যে কাজ করতে হবে, আমারই ধ্যানে তোমাকে লীন হতে হবে—তবে না তুমি আমাকে অর্থাৎ আমার আশ্রয় লাভ করবে।

ব্যক্তির—স্বাধীন বিচারের ওপরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—

"মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহংকারান্ন শ্রোষ্যসি বিনংক্ষ্যসি॥
[গীতা ৫৮, ১৮]

অর্থাৎ আমার ওপর যদি নির্ভর করো, তবে আমার প্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহে তুমি তরে যাবে, আর যদি অহংকার বশত আমার যুক্তি না মানো, বা সে মতে না চলো, তবে তুমিই নষ্ট পাবে। আমার কি? ভগবান বলছেন,—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে॥"

অর্থাৎ আমি কর্মও সৃষ্টি করিনি, কর্তৃত্বও না, কর্মফলের যোগ-সাধনও করি না। তবে কে করায় সব? তদুত্তরে বলছেন, প্রকৃতি করায়। এখানে কোনো জুলুম নেই, পীড়ন নেই। তবে আছে কি?

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।"

অর্থাৎ কর্মফল কৃতকারীর। ঈশ্বর বা ধর্ম পাপ বা পুণ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এখানে ব্যক্তি পূর্ণ-স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্যলাভ করছে। আবার যাতে নষ্ট না পায় সেজন্য সাবধানও করার চেষ্টা আছে। সমগ্র গীতাখানাই রাষ্ট্র বা সমাজ বা ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রনের বিধানাবলীতে পূর্ণ। এমন একখানা বিশ্বজনীন বিধান পুস্তক আজকার মানুষের মাথা থেকে দুর্লভ।

ভারতের বেদ-বেদান্ত, গীতা-মহাভারত, ভারতের সংহিতাদি ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে যেসব নিয়ম ও রাষ্ট্র-ধর্মের বিধানের উল্লেখ আছে, ভারতবাসীর কাছে তা অমূল্য সম্পদ। জনসাধারণ সে পরিচয় রাখে না, মন্দভাগ্য তারা। শক্তিও নেই, আর সকলের সে শক্তি থাকেও না। যেহেতু সমান যোগ্যতা বা শক্তি নিয়ে সকলে পৃথিবীতে আসে না। কম বেশীর তারতম্য থাকেই, থাকবেও; সাম্যবাদের গালভরা মনভোলানো শ্লোগান—শুধু ভাওতা মাত্র, ফাঁদে ফেলার কৌশল সে। বস্তুত পক্ষে সাম্যলাভ বা সাম্য-সৃষ্টি অসম্ভব কল্পনা। তবে ন্যায় রক্ষা করা বা বিষমতার সামঞ্জস্য বিধানই আবশ্যক, আর ও-ই করণীয়। এরই সিদ্ধিতে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভের অবসান যে সম্ভব, এটা আমরা মানি। কাজেই নিরীশ্বরবাদ বা ভোগবাদী সাম্যবাদে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, ভারতীয় সমাজদর্শনেই আমরা চাওয়ারও অতিরিক্ত পেয়ে আছি, আমাদের পূর্বীয়দের কাছ থেকে, ওকেই সত্য দৃষ্টিতে জানতে, বুঝতে ও আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে যথাযথ প্রয়োগ করতে শিখি। আমাদের মঙ্গল তাতে, বিশ্বেরও।

ব্রাহ্মণ কে?

ব্রাহ্মণ মানে সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রের উপদেষ্টা, নেতা বা পরিচালক (leader or guide of the time)। সাধু-উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিষ্ঠিত যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বা

দলের পরিচালক বা নেতাকেও এই নামে অভিহিত করা চলতে পারে। এই ব্যাখ্যা যদি মেনে নেওয়া হয় তখন প্রশ্ন আসতে পারে যে; তাহলে বংশপরম্পরায় কেন তবে সেই পরিবারের সকলকেই ব্রাহ্মণ বলা হবে? ঠিক, তা বলা চলে না। তবে যদি সেই পরিবারে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে সকলেই ব্রাহ্মণোচিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তবে তো তাদের 'ব্রাহ্মণ' বলতে কারো আপত্তি হবার কথা নয়?

বস্তুত ব্রাহ্মণের পরিবারে ব্রাহ্মণের জন্মটা অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত গুণধর্মলাভ যত স্বাভাবিক ও সহজ, সাধারণ কোনো গৃহস্থের ঘরে সে সম্ভাবনা খুবই কম; এ কারণ অনেক দূরদৃষ্টি সহকারে মানুষের স্বভাবধর্ম ও সমাজ বিজ্ঞানানুসারে এই নীতিই নির্ধারিত করা হয় যে ব্রাহ্মণকুলে যে জন্ম গ্রহণ করবে, সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়কুলে যে জন্মগ্রহণ করবে, সে ক্ষত্রিয়, এইরূপ বৈশ্য শূদ্রাদির বেলাতেও। কিন্তু এ নীতি যে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়, এ কথা সত্য হলেও, সমাজের অর্থনীতিক শৃঙ্খলাকে সুনিয়মিত ও সুনিশ্চিত করার জন্য এই কুলানুক্রমকে স্থায়ী বিধান হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। এই বিধানকে অপরিবর্তিত ও স্থায়ী বলে গ্রহণ করতে কারো আপত্তি করার বা ক্ষোভের কারণ থাকতো না যদি কুলানুক্রম ও গুণানুক্রম যুগপৎ সমান তালে চলতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কুলানুক্রমে ও গুণানুক্রমে অনুসৃত হয়নি, অথচ ব্রাহ্মণের যে ধর্ম মর্যাদা তার সুযোগ-সুবিধাটুকুও ব্রাহ্মণ-কুলে জাত অব্রাহ্মণোচিত আচরণকারীরা ছাড়তে প্রস্তুত নয়। এইজন্যই অব্রাহ্মণ কুলে জাত ব্রাহ্মণোচিত গুণধর্মী বিংশ শতাব্দীর নেতাদের চরিত্রে সমান গুণ, সমান যোগ্যতা, সমান জ্ঞানের ও প্রতিভার পরিচয় বা বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ সকলের স্মৃতি, ধৃতি, ও চরিত্র প্রভাবও এক নয়; স্থান, ও কাল ও সামাজিক বা রাষ্ট্রীক পরিস্থিতি অনুসারে কর্তৃক্ষমতারও এদিক ওদিক হয়। কিন্তু যে-কোনো কালের, যে-কোনো দেশের যে-কোনো পর্যায়ের ব্রাহ্মণ বা নেতা হোন না কেন, তাঁকে তো উপযুক্ত গুণের অধিকারী হতে হবে?

"শমো দমস্তপঃ শৌচং শান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥"

[গীতা ৪২, ১৮]

কিন্তু এই নীতি স্বীকৃতির ধার ধারেন না পাশ্চাত্য-মতবাদ সমর্থনকারী প্রাচ্যের ব্রাহ্মণ বা নেতারা। তাঁরা সরলতা, সংযমাদি সদ্‌গুণ বা সদ্‌ধর্মের আবশ্যকতা মানেন না আজ। এদিকে গান্ধীজী বলেছেন—

"বাস্তবিক পক্ষে আমাদের প্রত্যেকটি কার্য ধর্মবুদ্ধি-দ্বারা প্রনোদিত হওয়া আবশ্যক। এখানে ধর্মের অর্থ কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি অন্ধ অনুরাগ নহে। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সুশৃঙ্খল নৈতিক শাসনে বিশ্বাস।"

[হরিজন ১০, ২, ৪০]

"আমার কাছে ধর্মবর্জিত রাজনীতি চূড়ান্তরূপে অপরিচ্ছন্ন এবং সর্বদা তাহা পরিত্যাজ্য।"

[গান্ধীদর্শন পৃঃ, ২২]

এর পরেও কি আমাদের জ্ঞানোদয় হবে না? গান্ধীজী বলতেন যে তিনি একজন খাঁটি সাম্যবাদী এবং তাঁর সাম্যবাদে যন্ত্র-নীতি বা হিংসার স্থান নেই। ভারতবর্ষ সাত্ত্বিক জ্ঞান ও গুণের বিষয়ে পাশ্চাত্যের মতো দেউলিয়া (insolvent) নয়। সে দিতে জানে, তার দেবার আছে। ভারতবর্ষ বিশ্বের রাষ্ট্র-মণ্ডলের নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখে, কিন্তু আজ সে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পরানুকরণে মত্ত হয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতা হিংসার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সত্য ও অহিংসার ওপরে। এ কথা ভারতবাসী যেন না ভুলে। হিংসা বা উচ্ছৃঙ্খল অসংযম ও ভোগবাদ যে ভারতীয় সমাজ দর্শনের মৌলিক পদার্থ নয় সে সম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ইংগিত এখানে উদ্ধৃত করতে চাই—

"ভোগেরে বেঁধেছো তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছো উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছো মংগল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে॥

এ সত্ত্বেও যদি অহিংসা ও ন্যায়ের পথ ছেড়ে আমরা

হিংসাশ্রয়ে বিশ্বনেতৃত্বের কামনা করি, তবে সে হবে দুষ্টতা, সে হবে বাতুলতা বা পাগলামি। সে হবে ভারতবর্ষের আত্মহত্যার পথে অভিযাত্রা। এই আশঙ্কাতেই গান্ধীজী দেশবাসীকে খেদোক্তি কোরে একবা বলেছিলেন,—

"যদি ভারতবর্ষ তরবারির নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে, সে সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষ তাহলে আর আমার হৃদয়ের গর্বের বস্তু থাকবে না। ভারতের প্রতি আমার পূর্ণ অনুরক্তি। কারণ আমার সব কিছুর জন্যই আমি তার নিকট ঋণী। আমি ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের জগৎকে দেবার মতো একটি বাণী আছে। ইউরোপকে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে তার চলবে না।

[গান্ধী দর্শন পৃঃ ১৩]

ভারতের মহত্ত্ব ও সভ্যতা সম্পর্কে তার গর্ববোধ ও আশা আকাঙ্খার কি অন্ত ছিল? তিনি বলতেন,—

"আমি চাই, সারা ভারত উপলব্ধি করুক যে, তার আত্মার বিনাশ হতে পারে না,—তার আত্মা দুর্বলতার উর্দ্ধে সগর্বে দাঁড়াতে পারে এবং সমগ্র জগতের সমবেত শক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে।"

[ইয়ং ইণ্ডিয়া ৪, ৯, ১০]

"আমাদের সভ্যতা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের স্বরাজ, আমাদের অভাব-বৃত্তির ওপর, আত্মসুখপরায়ণতার ওপর নির্ভর করে না, পরন্তু আমাদের অভাব হ্রাস করার ওপর আত্মত্যাগের ওপর নির্ভর করে।"

[ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০, ২, ২১,]

অর্থনৈতিক সাম্যবাদের আদর্শ

বাস্তবিক, ভারতীয় অর্থনৈতিক সাম্যবাদের আদর্শ কি তা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—ভারতের এই দুই মহামানবের উল্লিখিত দুইটি উক্তিতেই সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ষ্টেটবাদের কাছে, আমি বলবো, ঈশ্বরবাদের কাছে সমগ্রভাবে আনুগত্য রাখার অর্থাৎ আত্মদর্শন করার ঐকান্তিক ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। 'সর্বজনহিতায়' এতখানি দিতে পারা রাষ্ট্রের পক্ষে, সমাজের পক্ষে তথা ব্যক্তির পক্ষে কতখানি কল্যাণজনক ও সার্থক, এবং কতখানি সম্ভব তা কি পাশ্চাত্যের ভাববাদীরা বা প্রাচ্যের তৎ-ভাববাদ সমর্থনকারীরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে, না তারা 'সর্বজনহিতায়' এতখানি দিতে পারবে?

এই আদর্শের মাপকাঠিতে যদি বিচার করি বা যাচাই করে দেখি, তবে দেখতে পাবো, তথাকথিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, স্বৈরতন্ত্র, বা রাজতন্ত্র বা আরো কোনো তন্ত্র-মন্ত্রের উদ্ভব হোক না কেন, কোনোটাতেই সুখ, শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই—যে পর্যন্ত না এই সব মতবাদীরা নিজেদের বা রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্য ও ধর্মকে আশ্রয় করছে, ন্যায় ও নিঃস্বার্থবাদী হচ্ছে। গান্ধীজীর রামরাজ সার্থক রাজতন্ত্র। রামের শাসন যদি প্রজার ইচ্ছানুগত হয়, প্রজার কাম্য হয় তবে সে রাজতন্ত্রকে 'প্রজাতন্ত্র' বলতেই বা আপত্তি কি? তেমনি সমাজতন্ত্র সাম্যবাদ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাদ্বারা যে-অবস্থা আমাদের কাম্য, তা যদি রাজতন্ত্রে বা প্রজাতন্ত্রে পেতে পারে জনসাধারণ, তবে অভিযোগের সত্যিকার কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু কার্য্যত তা পাওয়া যায় নি, সর্বদা ও সর্বক্ষেত্রে। আর এই জন্যই দেশব্যাপী অসন্তোষ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট বা অরাজকতা যা উভয় পক্ষকেই অসুখী ও পীড়িত করে তুলেছে। কিন্তু প্রতিকার পাবার জন্যে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, কালে কালে, বিভিন্ন নেতা বা ব্রাহ্মণদের দ্বারা, তা কার্যত সফল হয় নি বা হতে পারে নি। পারে নি এইজন্য যে, যারা প্রতিকার কামনায় বিরুদ্ধ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং নতুন কোন শাসন তন্ত্র প্রাগপ্রবর্তিত তন্ত্রের স্থলে চালু করেছে তারাও তাদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। প্রচলিত পুরাতনের বিরুদ্ধে অভিযাত্রাকালে যেসব আশাবাদ রচনা করেছিল তারা, কার্যক্ষেত্রে তারই বৈপরীত্য-সাধন তাদের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে। নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা নয় কি? সেই শোষণ, সেই পীড়ন, সেই পরস্বাপহরণার্থ, সেই পরস্তাপহরণার্থ সেই পূর্বতন তন্ত্রাধিপতির নীতিকেই অনুসরণ করে চলেছে। তবে আর প্রতিকার কেমন করে

হয়? তাই দুঃখের, আঘাতের নিবৃত্তি নেই, লোভের শান্তি নেই। রাশিয়া কি আজ অনেকাংশে সাম্রাজ্যবাদী নয়? পরন্তোৎসাধনবাদী নয়?

এইজন্যে বলি, ওদিকে প্রলুব্ধ হবার মত কিছু নেই ভারতের। সে বরং অন্বেষণে আরও অধিকতর সুখী, সমৃদ্ধ ও লাভবান হতে পারে।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস কোথায়? অতএব ধর্মবিশ্বাসেরই অভাব। ধর্ম বিশ্বাস মানে, নিজের আদর্শে বিশ্বাস ও নির্ভরতা। নিজের সে আদর্শ কি? নির্ভরতা কার ওপরে? ভারতীয় রাজধর্মে! সে রাজধর্ম কি? তাকে সাম্যবাদই বলো, প্রজাতন্ত্রবাদই বলো, আর সমাজতন্ত্রবাদই বলো, সে আমাদের ভারতীয় আদর্শবাদ, যাকে গান্ধীজী বলতেন, 'রামরাজের আদর্শ'। রামরাজের নামে ভয় পাবার কিছু নেই। রামরাজ কোনো সাম্প্রদায়িক আদর্শ-বাদ নয়। একে সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন আদর্শবাদ বললেই ওর যথার্থ ভাব বা মর্ম মূর্ত হয়। এই আদর্শবাদের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই।

গান্ধীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে রামরাজ বলতে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কুসংস্কারজাত বিরূপতা দেখা দিতে পারে। তাই তিনি সে পথও বন্ধ করে দিয়েছেন নিম্নোক্ত উক্তির দ্বারা।

"রামরাজ অর্থে আমি হিন্দুরাজ বুঝি না। রামরাজ অর্থে আমি স্বর্গীয় রাজ ভগবানের রাজ্য বুঝি। আমার কাছে রাম ও রহিম অভিন্ন। সত্য ও পবিত্রতা স্বরূপ ভগবান ছাড়া আমি অন্য কোনো ভগবান মানি না। আমার কল্পনার রাম পৃথিবীতে কোন দিন থাকিতে পারেন বা নাও থাকিতে পারেন, রামরাজের প্রাচীন আদর্শ নিঃসন্দেহে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্মত।"

[গান্ধী দর্শন পৃঃ ৬০]

এখন বলি, এই আদর্শবাদকে আমরা যেন ভুল না বুঝি। বিশ্বাস মানে আনুগত্য। এই আনুগত্য সকল রাজনৈতিক দলগুলিই প্রত্যেক অধিবাসী বা নাগরীকের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। কেউ স্বেচ্ছায় স্বীকার না করতে চাহিলে তার ওপর জবরদস্তি-পীড়ন দ্বারা শেষ পর্যন্ত তাকে আনুগত্য স্বীকার করতেই বাধ্য করা হয়, কিন্তু ভারতীয় আদর্শবাদে এই 'গুণ্ডামির' ব্যবহার নেই। এই এর বিশেষত্ব।

ধর্মের অনুশাসন তো ব্যাপক ব্যবহারিক অর্থে সামাজিক রাষ্ট্রীয় আইন বা গঠননীতি বা নিয়ম, যাকে ইংরেজীতে (constitution) বলতে পারি। এই constitution আজ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার দ্বারা দোষগ্রস্ত ও ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এর মূলে, নৈতিক পতন, ব্যক্তির শোষকস্পৃহা ব্যক্তির শোষণ-স্পৃহা ক্রমগত বা সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রীয় স্পৃহার পরিণত হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের গোড়া সেইখানে। এখন বাঁচতে হলে সেই জড়ে পৌছুতে হবে, জড়োৎপাটন করতে হবে অর্থাৎ পারস্পরিক শোষকস্পৃহা ত্যাগ করতে হবে। এই কথাই গান্ধীজী কতভাবে বলেছেন, কি সুন্দরভাবে বলেছেন,—

"লক্ষ লক্ষ লোক যাহা ভোগ করিতে পায় না, তাহা অর্জনের দৃঢ় অস্বীকৃতিই শ্রেষ্ঠতম বিধান।"

[ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪, ৬, ২৬]

"জগতের অনেক দারিদ্র্য অন্যের ভংগ করার জন্যই উৎপন্ন হইয়াছে।" [জীবনব্রত পৃঃ ২৪]

"সত্যের সাধক, প্রেমের বিধানের অনুসরণকারী আগামী কালের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিতে পারে না।"

এই ওটিকতক কথার ভেতর দিয়ে গান্ধীজী অর্থনীতি সম্পর্কে যে ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছেন তা আমরা তৎ-পরিকল্পিত একাদশব্রত মধ্যে অহিংসা, অস্তেয়, অস্বাদ ও অপরিগ্রহ:এই চতুর্বিধ ব্রত পালনের দ্বারা সার্থক কোরে তুলতে পারি। যে দুঃখ ক্লেশ জগতটাকে পীড়িত বিক্ষুব্ধ কোরে তুলেছে সে সমগ্র মানব জাতির কর্মদোষেই। দুনিয়ার অর্থনীতিতে ব্যাপক ব্যভিচার ও নীতিহীনতা প্রাধান্য পাওয়ার এই পরিণাম; কেবল ব্যক্তি বিশেষের নয়, সমগ্র দেশের, সমগ্র দুনিয়ার অর্থনীতিতে নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত পরিচয় চলছে। এই অর্থনৈতিক লেনদেনের মধ্যে বিনয় বা ভদ্রতার স্থানও নেই। ভারতের শুধু নয়, পৃথিবীর অর্থনীতি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গান্ধীজী বলেছেন—

"আমার অভিমত এই যে, ভারতের তথা পৃথিবীর অর্থনীতিক কাঠামো এরূপ হওয়া উচিত যে, তাহার ফলে কেহই অন্নবস্ত্রের অভাব ভোগ করিবে না। যেমন ভগবানের বাতাস ও জল সকলেই পায় অথবা সকলের পাওয়া উচিত, সেইরূপ এই সমস্ত জিনিষও সকলেরই লাভ করা উচিত, এই সব জিনিষ অপরের শোষণের উপায়-স্বরূপ হওয়া উচিত নয়।"

[গান্ধী দর্শন ৪৭ পৃঃ]

কিন্তু এই নীতি কোথাও মর্যাদিত হয়নি, আর সেই জন্যই দুনিয়ার আকাশ বাতাস আজ পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এরই সহায়ক হয়েছে যান্ত্রিক সভ্যতা—যাকে গান্ধীজী একটা রোগ ব'লে বলতেন। সত্য করে বলতে হলে বলতে হয় যান্ত্রিক সভ্যতাই পৃথিবীর অর্থনীতিতে ব্যভিচার সৃষ্টির জন্য দায়ী। আর আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতাবাদী বন্ধুরা, যতই কেন না গরীবের জন্য দরদ প্রকাশ করুন, সেই যান্ত্রিক সভ্যতারই একান্ত অনুরাগী সেবক। গান্ধীজী সবদিক বিবেচনা কোরেই এই অভিমত প্রকাশ কোরেছেন যে, অল্প কয়েকজনের হাতে গিয়ে সমস্ত অর্থ-সম্পদ জমা হোক, এ তাঁর ইচ্ছা নয়। তিনি চান সবার হাতেই, প্রত্যেকটি স্ত্রী পুরুষের হাতেই অর্থ-সম্পদ জমা হোক। কিন্তু যন্ত্র-দানব এই সংকল্পের প্রতিকূলধর্মী। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি যন্ত্রের সহায়তা নেবার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু এ কথাও সাথে সাথে জানিয়েছেন যে, এগুলিই তার চরম লক্ষ্য নয়। এদের অজুহাতে কোনোরূপ শোষণ সহ্য করা চলবে না। যন্ত্রের সীমাবদ্ধ সদ্ব্যবহারে তাঁর সম্মতি ছিল, কিন্তু যন্ত্রবাদ বলতে যা বুঝায় তার ধ্বংস-সাধনই তাঁর কাম্য ছিল। আজকার ধনিকতন্ত্র গান্ধীজীর মতে যন্ত্র-সভ্যতারই সৃষ্টি। আরও বলবো যে, বর্তমান অর্থনৈতিক অরাজকতা ও পাপাশ্রিত প্রতিযোগিতার মূলেও এই প্রেমশূন্য হৃদয়হীন যন্ত্রবাদ।

গান্ধীজীর কথা—"সত্যকার অর্থশাস্ত্র চরখায়।" কথা বোঝবার মতো জ্ঞান বা বুদ্ধি অর্থনীতিবিদদের নেই, এ নয়, কিন্তু বুঝবেন না এই তাদের ইচ্ছা। দুদিকের চিন্তাধারায় কত তফাৎ? গান্ধীজী বলেন, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার চাবি হচ্ছে চরখা, কেবল ভারতবর্ষের নয়, দুনিয়ার অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিই—এই চরখা অর্থাৎ চরখার মর্মবাণী (spirit)।

যে অর্থনীতি আজ বিষম পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে, জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, এদেশে আর সেদেশে, সে তো অর্থনীতি নয়, অনর্থ নীতি বা দুর্নীতি! ওটা কোনো নীতিই নয়। বিজ্ঞেরা বলেন, অর্থশাস্ত্র ন্যায়-বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ও কাম্য, লেনদেনের যে কোনো অবস্থায় নীতি বা ন্যায়ের মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে জনসাধারণকে সেই শিক্ষাই দেওয়া দরকার। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায় নেই, সত্য নেই তাকে কোনো নীতির পর্যায়ে গণ্য করা চলে না। সস্তা বা আক্রা বলে কোনো কথা অর্থ-নৈতিক বাজারে থাকা কাম্য নয়। কিন্তু যা কাম্য নয়, যা মানুষের কল্যাণানুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, আমাদের জনসাধারণের তো স্বভাব তাকেই সহর্ষে অর্বাচীনের ন্যায় অভিনন্দন জানান ও বিপন্ন হওয়া। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়-মূল্যের অমর্যাদা বা অনাদর যখন থেকে সুরু হয়েছে তখন থেকেই সকল দুঃখের সূত্রপাত। অদ্ভুত এই মনোবৃত্তি যে লোকে বাজারে যেয়ে সস্তায় পণ্য কেনার সন্ধানেই ঘোরে, যে গৃহস্থ মজুরকে কাজ দেয় সেও সস্তায় শ্রম কিনতে চেষ্টা করে, অথচ এই সস্তার পরিণতি আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। মজুরকে কম মজুরীতে নিয়োগের চেষ্টা হয় সেও ত খাটুনির বেলায় হিসাবের বেশী দিতে চাইবে না, কোথাও ফাঁকি সে রাখবেই, পণ্য কেনার বেলাতেও বিক্রেতার পক্ষে ক্রেতার সস্তায় পাওয়ার আগ্রহকে মেটাতে গিয়ে ফাঁকির কিকিরের চেষ্টা দেখতে হয়। বিষমতা এমনি কোরেই আজকার অবস্থায় এসে পঁহুছেচে। কালোবাজারের বর্তমান রূপ কেবল পণ্য কেনাবেচার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। জলপথে, স্থলপথে, বায়ুপথে অর্থাৎ রেলে, ষ্টীমারে, বিমানে, পথে-ঘাটে আদালতে, সর্বত্র—কি সরকারী মহলে কি বে-সরকারী মহলে, কালোবাজার চলছেই। এতাবৎ ডাকবিভাগটাকে কালোবাজার মুক্ত বলে আমরা জানতাম। এখন দেখছি

সেখানেও এই সংজ্ঞাবর্জিত এই কালোবাজারী-নীতি চালু হয়ে গেছে — না কোরে উপায় কি? কতদিন তারা এমন একটা সত্যের পথ থেকে দূরে সরে থাকবে?

তাহলে মূলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? পারস্পরিক সততার অভাব, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ন্যায়-ব্যবহারে অনাগ্রহ ও অপারগতা অর্থাৎ ন্যায় ও সততার নীতিভঙ্গ। বর্তমানের পৃথিবী-ব্যাপি অশান্তি ও দুঃখ-ক্লেশ দারিদ্র্য, আর এই সর্বগত, সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী কালোবাজারের কবল থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গান্ধীজীর নিম্নোক্ত চতুর্বিধ অর্থনৈতিক ব্রত-পালনের কথায় আসতে হয়। সর্বদুঃখ-বিমুক্ত রাষ্ট্রীয় জীবন লাভের জন্যই আমাদের অন্তরে এই ব্রত-পরায়ণতার আগ্রহ জাগা চাই এবং ধীরে ধীরে ওই আদর্শেই আমাদের জীবনকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারা চাই।

ভারতীয় সাম্যবাদের যে আদর্শ সমর্থনে এত কথার এখানে আলোচনা, সে-আদর্শ থেকে ভারতবর্ষ স্খলিত হওয়ায়, ভারতের সমাজবাদে আজ এই অসাম্য ও অরাজকতার শোচনীয় পরিনাম দেখা দিয়েছে। এ থেকে আমরা আবার সেই সুস্থ, সুখী ও সর্বজন-কাম্য সমাজবাদ বা সাম্যবাদ এই ভারতের বুকেই গড়ে তুলতে পারি, যদি ওই আদর্শে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বাস বা আনুগত্য রেখে ব্যক্তি বা সমাজ জীবনকে পরিচালিত করতে সর্বান্তঃকরণে চেষ্টা ও আগ্রহ রাখি। আধ খানা বা আংশিক চেষ্টা নয়, সমগ্রভাবে চেষ্টারত থাকা চাই।

অহিংসা, অস্তেয়, অস্বাদ ও অপরিগ্রহ—এইযে চতুর্বিধ অর্থনৈতিক মূলনীতি গান্ধীজীর ব্রতপরিকল্পনার মধ্যে আমরা পাই, এরই সমর্থক হিসাবে ভারতীয় সমাজবাদের আদর্শ, একে অর্থনৈতিক সমাজবাদও বলা চলে, গীতা থেকে উদ্ধৃত কোরে এখানে এই আলোচনা শেষ করতে চাই।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা পাই—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" অর্থাৎ ভগবান বলছেন, গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে আমি চারটি বর্ণের সৃষ্টি করেছি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। কিন্তু এর দ্বারা এমন বোঝায় না যে একটি অপরটি থেকে শ্রেয় বা অধিকতর মর্যাদাশীল। এই চারটি বর্ণের তথাকথিত গুণ ও তদনুরূপ বৃত্তির সমন্বয়েই মানব-সমাজ পূর্ণ-অবয়বী, একথা বলা যায়।

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে পাই,

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ!
কর্মানি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ!!"

অর্থাৎ স্বভাবত গুণের তারতম্য হেতুই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণের বিভাগ। এই গুণ তথা গুণানুবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্ত কেউই নয়, এই বিভাগ কেবল হিন্দুদের দ্বারাই স্বীকৃত বা হিন্দুদের ওপরই প্রযোজ্য, এমনও নয়। গীতাতেই তার উল্লেখ আছে—

"তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ॥"
[১০, ৪৮]

অর্থাৎ এমন কেউ নেই পৃথিবীতে বা স্বর্গের দেব সমাজে যে প্রকৃতিজাত এই গুণত্রয়ের প্রভাব থেকে বিমুক্ত। গুণত্রয় ও তৎপ্রভাবাধীন বৃত্তি আশ্রয়ে চারটি বর্ণের প্রকৃতি বা চরিত্র-ধর্ম কিরূপ তা গীতাতেই আমরা পাই। জগতের সমস্ত অধিবাসীই নিজ নিজ স্বভাব ও বৃত্তিভেদে এই চতুর্বর্ণের কোনো না কোনো শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

এই স্বভাব-গুণ ও বৃত্তি-ধর্মই বর্ণধর্ম বা সাম্যের ধর্ম। মানুষে মানুষে ছোট বড় বা অর্থনৈতিক অসাম্য-সাধনের উদ্দেশ্যে এর সৃষ্টি নয়, কিন্তু সাম্যের নীতি লংঘন করায় তার বিকৃত রূপটাই আজ আমাদের তথা জগতের চোখে কদর্য অসাম্যের রূপে প্রতিষ্ঠিত। বর্ণধর্মের নামে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যেমন পীড়াদায়ক ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হীনতা-ব্যঞ্জক আচরণও তেমনি পীড়াদায়ক। বর্ণধর্মাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ নিজকে অপর বর্ণের চাইতে কখনো শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারে না। সমাজের পক্ষে তার প্রয়োজনটা যতখানি অপরিহার্য অন্য বর্ণের প্রয়োজনটাও ঠিক ততখানিই অপরিহার্য—এ কথা যেন আমরা না ভুলি।

বস্তুত বর্ণ ধর্ম সকলকেই সমাজ সেবার সমান অবকাশ দিয়ে রেখেছে। সে-অবকাশটুকু অকুণ্ঠিত মনে গ্রহণ না করার ফলেই এত অসাম্য, অসদ্ভাব ও অশান্তি। স্বধর্ম পালনে অনাগ্রহ ও দুরাগ্রহ হেতু ভারতীয় সমাজবাদকে

এদেশের লোক জাতির চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারছেনা। যে পথের বা সাধনের সহিত আমাদের ব্যবহারিক এবং আত্মিক যোগ বা পরিচয় ছিল, সে সাধনকে অবলম্বন না করে যে সাধনের সহিত আমাদের কোন কালেই ভালো পরিচয় ছিলনা তাকেই অবলম্বন করতে যাওয়ার যে পরিনাম তা আমরা কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরিধান কোরে শিখী সমাজে স্থানলাভের চেষ্টার পরিনামের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অনুভব করতে পারি।

গীতার যে বর্ণধর্ম তা পরিপূর্ণ রূপে সাম্যবাদেরই ধর্ম এবং ভারতীয় সাম্যবাদেরই নামান্তর। বস্তুত ও-ই বিশ্ব সাম্যবাদের ভিত্তি। ভারতবর্ষ ওই নীতিকেই এক কালে বিশেষভাবে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আশ্রয় কোরে চলেছিল। তাই ভারতবাসী ওকে ভারতীয় সাম্যবাদ বলেই পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে থাকে। সাম্যবাদী সমাজ-গঠনই যদি আমাদের কাম্য হয় তবে সকলেই রাষ্ট্র বা সমাজের স্বার্থেই কাজ করতে হয় অর্থাৎ সমাজ স্বার্থেই কর্ম করা সকলের মুখ্য হয়, ব্যক্তিস্বার্থে কর্মকরা গৌন বিষয় হয়ে পড়ে। আর তাহলে কার কি বৃত্তি অবলম্বনীয় তা নিয়ে সংঘর্ষের বা অসন্তোষের প্রশ্নও থাকেনা। সমাজের পক্ষে বা রাষ্ট্রের পক্ষে যা শুভ, যা সর্বলোক কল্যানকর তা করতে হলে কাজের মধ্যে যা বৃত্তি ধর্মে ছোট বড় তুচ্ছ উচ্চ এ বিচার থাকে না তখন সকল কাজেরই যে সমান মর্যদা বা মহত্ত্ব একথা স্বীকৃত হয় আর এই জন্যই গীতায় ইংগিত আছে—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিব কিবষম্॥"

অর্থাৎ স্বধর্মই শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম বা পরবৃত্তি নিজের বৃত্তি অপেক্ষা সহজ-আচরনীয় হলেও স্বধর্ম ত্যাগ করতে নেই। সে পাপাচার অর্থাৎ সমাজে অনর্থসৃষ্টিকারী হয়। স্বভাব ও বর্ণ-নিয়মিত কর্মই নিষ্পাপ, এই কথাই গীতার ইংগিত। এই ইংগিত-অনুসারে সকল লোক আপন আপন কর্মে রত থেকে সমাজের প্রতি তাদের যথাকর্তব্য পালন করবে—এই-ই তো গীতার অনুশাসন এবং তবেই জনসাধারণ শান্তি ও স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে "স্বে স্বে কর্মণ্য-ভিরত সংসিদ্ধিং লভতে নর।" আর তা না করলে যা হয়, তা আজকার বিক্ষুব্ধ দুনিয়ার প্রতি তাকালে চোখে পড়ে।

আর এই স্বভাবজ গুণবৃত্তির সহজ বিকাশ ও পরিণতি সাধারণত বংশপরম্পরায় অর্থাৎ জন্ম ও পারিবারিক কর্মপ্রভাব দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত হয়। এ সম্পর্কে গ্রন্থের শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্তের অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "কে কোন কাজ করিবে ইহা কে নির্দিষ্ট করিয়া দেবে? নির্দিষ্ট করিয়া দিবে জন্ম? মানুষ যে পিতামাতার গুণাগুণ স্বভাবতই পায় ইহা তো প্রতিনিয়তই দেখিতেছি। কণ্ঠস্বর, গাত্রের বর্ণ এমন কি চুলের বিশেষ ভংগি অথবা নম্রতা বা ক্রোধপরায়নতা যে সন্তান অনেকটা পিতামাতার নিকট হইতে পায়—তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এই সকল গুনের জন্য বর্ণ-বিভাগ নহে। পিতা যে বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জন করেন, বর্ণ ধর্ম বলে সন্তানের সেই বৃত্তিই সহজাত। তাই সেই বৃত্তি সে সহজে আয়ত্ত করিয়া জীবিকার্জন করিতে পারে। বর্ণধর্মের আবিষ্কর্তা বাস্তবিক এই বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিচয় পাইয়া বর্ণ-ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতার বৃত্তি সন্তান স্বাভাবিক ভাবেই অবলম্বন করে, ইহা সত্য। যেখানে বর্ণধর্ম জানা নাই, বর্ণধর্মের বন্ধন নাই সেখানেও করে। ইংলণ্ড রাশিয়া বা যে কোনো দেশের লোক সমাজে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে পুত্র পিতার জীবিকা গ্রহণ করিতেছে। ট্যানারের ছেলে ট্যানার হইতেছে, কৃষকের ছেলে কৃষক হইতেছে ও বনিকের ছেলে বনিক হইতেছে। সর্বত্র এরূপ হইতেছে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।"

[ভারতীয় সাম্যবাদ পৃঃ ২৫]

বস্তুত জন্মই যে মানুষের গুণ ও বৃত্তি ধর্মের স্বাভাবিক কর্মনির্দেশক, এদেশে এ সত্য নানাভাবেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আর এই সত্যকে এ দেশে যত দিন মান ও মর্যাদা দিয়ে এসেছে ততদিন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের প্রভাব এ দেশের সমাজিক ও পারিবারিক

শৃংখলা, শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধিকে নষ্ট করতে পারেনি। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপন আদর্শে আপন গৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠিত ছিল এমন যে বর্ণ-ধর্ম তা মেনে চললে আমাদের দেশবাসীকে, পৃথিবীর লোককে এই বেদনাদায়ক স্মৃতির সম্মুখীন হতে হত না। "যজ্ঞার্থাচরত কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" অর্থাৎ সবদুঃখে নিবৃত্তি ঘটে যদি সকলেই আমরা যজ্ঞার্থে কর্ম করি অর্থাৎ নিজ নিজ জন্মগত ব্রত বা বৃত্তি ধরকে অবলম্বন কোরে জীবিকা নির্বাহ করি। এই ব্রতপরায়ণতাই স্বধর্ম-পালন। এই সমাজ বা রাষ্ট্র ধর্ম। জন্ম-অনুশাসিত ধর্ম-পালনেই ব্যক্তির ইষ্ট, পারিবারিক ইষ্ট, সামাজিক ইষ্ট। বর্ণধর্মের বর্তমানকালের অপপ্রয়োগ ও ব্যভিচার বন্ধ করতে হবে এবং তার সুপ্রয়োগ ও সদাচার আমাদের সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনে প্রভাবিত ও প্রবর্তিত করতে হবে, তাহলেই সকল ইষ্টসিদ্ধ ও সার্থক :—

"তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম।"

মহাত্মা শিশির কুমার

শ্রীরাধা গোবিন্দ নাথ, এম্-এ, বিদ্যাবাচস্পতি

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম আধ্যাত্মিক জগতের এক অপূর্ব-সম্পদ। বাঙ্গলাতেই এই ধর্মের উদ্ভব বলিয়া ইহা বাঙ্গালীর একটী বিশেষ গৌরবের বস্তু। ইহা বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে, অন্যান্য প্রদেশেও তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া সমগ্র ভারতের একটা সাংস্কৃতিক সংযোগের সূচনা করিয়াছে এবং বাঙ্গলার সাহিত্য ভাণ্ডারকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ধর্মের প্রাণবস্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণ এই ধর্মের বিশেষত্ব-সূচক যে সমস্ত গ্রন্থ জগতের কল্যাণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, নানা কারণে বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজ কর্তৃক তৎসমস্ত প্রায় উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। আমার মনে হয়, তাঁহার অমৃত-নিঃস্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত শ্রীশ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত এবং লর্ড-গৌরাঙ্গ প্রচার করিয়া গৌরচরণারবিন্দ-মধুপ মহাত্মা শিশির কুমারই সর্বপ্রথমে এই ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের এবং বাঙ্গলার এবং ভারতের বাহিরেও বহু শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সমাজ এবং একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবেনা—সমগ্র বাঙ্গালী সমাজই এই মহাত্মার নিকটে এজন্য চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে।

মহাত্মা শিশির কুমার ছিলেন পূর্বজন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত চিহ্নিত ভক্ত। কয়েকটী বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তই তিনি যেন জগতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিশেষ উদ্দেশ্যের মধ্যে আমার মতে যেটী প্রধানতম, তাহার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আনুষঙ্গিক ভাবে তিনি আরও যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তের জন্য বাঙ্গলা এবং কোনও কোনও বিষয়ে সমগ্র ভারত তাঁহার নিকট ঋণী।

সাধনার অগ্রগতির পথে পরাধীন জাতির চিত্তকে প্রতি পদেই নানাবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। সাধনে অগ্রসর হইতে হইলে মনের যে অবস্থার প্রয়োজন অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের পক্ষে সেই অবস্থা লাভ করা দুষ্কর। তাই বোধ হয় শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার এই চিহ্নিত ভক্তের হৃদয়ে অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে দেশকে মুক্ত করার উদ্যোগ-পর্বের প্রেরণা জাগাইলেন। ইহা যে ভগবানেরই প্রেরণা, তাহা হয়তো তিনি তখন সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; পারিয়া থাকুন, আর না-ই থাকুন, অদৃশ্য-শক্তির এই প্রেরণা কিন্তু তাঁহাকে চালিত করিয়া নিয়াছিল। পরাধীনতা-শৃঙ্খল-ছেদনের ইচ্ছাই জন্মিতে পারেনা—যদি দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত না হয়! শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেশাত্ম-বোধ জাগ্রত করার এবং তদনুকূল জনমত গঠন করার উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অধুনা-বিশ্ববিখ্যাত অমৃতবাজার

পত্রিকা প্রচার করেন। দেশাত্ম-বোধ উদ্বোধিত করার প্রয়াসে তিনিই ছিলেন অগ্রদূত। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে আমাদের জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠা। দেশের তৎকালীন অবস্থায় তাঁহার প্রয়াসের যতটুকু বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, ততটুকু বিকাশই লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুট হইয়া একটা চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিয়াছিল। জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিবেশের প্রয়োজন, মহাত্মা শিশির কুমারকে তাহার স্রষ্টা বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভগবৎ-কৃপায় দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন ভারতই মহাত্মা শিশির কুমারের যথার্থ মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সূতিকা-গৃহ এবং লীলাভূমি ভারতের পরতন্ত্রতা অপসারণের প্রয়াস ভগবৎ-কৃপা পুষ্ট মহাপুরুষ হইতে উদ্ভূত হওয়াই স্বাভাবিক। মহাত্মা শিশির কুমারই ছিলেন এই মহাপুরুষ। ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার প্রয়াস সফল হইয়াছে। যাঁহার কৃপা তাঁহার এই চেষ্টায় শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, নির্ভীক চিত্তে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাঁহার চিত্তে প্রেরণা জোগাইয়াছে, স্বাধীন ভারত সেই ভগবানের প্রতি অধিকতর উন্মুখ হইবে, ইহাই আশা করা যায় এবং তাহাতেই এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে সত্যিকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

মহাত্মা শিশির কুমারের সমস্ত প্রচেষ্টা অনুপ্রাণিত ছিল ভগবদ্‌ভাবের দ্বারা। তাঁহার কার্য্যকলাপের দ্বারা তিনি দেখাইয়াছেন—কি ব্যক্তিগত জীবনে, কি সামাজিক জীবনে, কি রাষ্ট্র-জীবনে, কোনও ব্যাপারেই কেবল জড়-বাদ শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ব্যবহারিক ব্যাপারের পটভূমিকায়ও যদি ভগবন্নিষ্ঠার প্রসূত আত্মিক শক্তি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলেই তাহা কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে জড়াত্মবাদ প্রায় সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; তাহারই ফলে প্রায় সর্ব্বত্রই ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টি জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের ছায়া পতিত হইয়াছে—সর্ব্বত্র অশান্তির বিভীষিকা। এইরূপ পরি-স্থিতিতে মহাত্মা শিশির কুমারের জীবনব্যাপী সাধনালব্ধ শিক্ষার অনুসরণেই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মহাত্মা শিশির কুমারের ন্যায় লোকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে।

ভগবৎ-কৃপা পুষ্ট মহাত্মা শিশির কুমারের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এবং সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়া আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার পুণ্যস্মৃতি জয়যুক্ত হউক।*

*মহাত্মা শিশিরকুমারের স্মৃতি বার্ষিক উৎসবে দিল্লি বৈকুণ্ঠ সম্মিলনীতে পঠিত। ১১।৬।৪৯

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

ইংরেজী গণনা অনুসারে এক বৎসর গত হইয়া গেল, আমরা এখন ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উপনীত হইয়াছি। যুদ্ধের পরে একটির পর একটি করিয়া বছর গড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে যে শান্তির সম্ভাবনা ও আশা মানুষের মনে দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া যাইতেছে। যুদ্ধের পূর্বে যে যে লক্ষণ দেখিয়া অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন আজ ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত লক্ষণগুলি নিঃসংশয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তখন যেমন জার্মানিকে কেন্দ্র করিয়া ফ্যাসিষ্ট শক্তি সংহত হইয়া উঠিয়াছিল তেমনই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে কেন্দ্র করিয়া তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। তখনকার দিনের যুদ্ধের কারণ ছিল মূলতঃ পুঁজিপতিদের পৃথিবীর কাঁচা মাল ও শিল্পজাত পণ্যের বাজার হিসাবে সমস্ত পৃথিবীকে দখল করিবার লড়াই। কিন্তু আজ সেই লড়াইয়ের রূপ বদলাইয়া যাইতেছে। একদিকে সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া নতুন গণতন্ত্রগুলি নতুন আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আগামি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহাদের কর্মপন্থা যতই হিংসাত্মক হউক না কেন তাহারা বলিতেছে যে তাহারাই শান্তিকামী; শুধু আমেরিকাই যুদ্ধের পরিপোষক মনোভাব লইয়া সোভিয়েট রাশিয়া ও তাহার সমধর্মী সহচরদের শান্তির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। আমেরিকার পাল্টা অভিযোগ যে রাশিয়া নিজের দেশে গণতন্ত্র বিরোধী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং পূর্ব ইউরোপকে হিংসাত্মক উপায়ে সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং তাহার শাসন প্রভাব ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই সমস্ত দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে লইয়া কমিনফর্ম গড়িয়া তুলিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু উচ্ছেদ করিতে সচেষ্ট। ইহার চেষ্টায় এই অঞ্চলের বহুযুগলব্ধ কৃষ্টি, ধর্ম, শিক্ষা ও সর্বপ্রকার অতীত ঐতিহ্য নিঃশেষে মুছিয়া যাইতেছে। প্রমাণস্বরূপ একদিকে যেমন বহু জনপ্রিয় পুরানো রাজনৈতিক নেতা হয় ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছে, আজীবন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। অপরদিকে তেমনই একদা বিশ্বস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান প্রধান কর্মিগণ কমিনফর্মের বিশ্বাস হারাইয়া পার্টির প্রতি ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিসাবে চরম দণ্ড লাভ করিতেছে। এই নীতি যাহাতে ইউরোপের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িতে না পারে, শুধু তাহাই নহে, যাহাতে উত্তর আতলান্তিকের দেশগুলিতে এই বিষ ছড়াইয়া পড়িতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে আতলান্তিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হইল স্বাক্ষরকারী দেশ সমূহের গণতন্ত্রসম্মত ব্যক্তি স্বাধীনতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য অটুট রাখা। এই উদ্দেশ্যে এবং বহিরাক্রমণ হইতে এই দেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য এই চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক একটি সামরিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। এই ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ নিজের দেশের সামরিক সংগঠনের সম্ভাবনাগুলি চূড়ান্তভাবে অনুশীলন করিবার পর সর্বাত্মক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যথাযোগ্য সামরিক সাহায্য পাইবে। এইভাবে আগামী যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট বিরোধী শক্তিপুঞ্জ ব্যূহ রচনা করিতেছে। এই গেল ইউরোপের কথা।

এশিয়াখণ্ডে বিরাট চীনদেশ কম্যুনিজমের আদর্শে গঠিত মাও-সে-তুংএর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট পার্টি সারা চীনদেশ দখল করিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রচুর রণসম্ভার আমেরিকা হইতে চীনদেশে আসিয়া মজুত হইয়াছিল। চুনীতিপরায়ণ কে, এম, টি, কর্মচারিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এই মাল প্রথম প্রথম জাপানীদের কাছে বিক্রয় করিয়াছে ও পরে যখন কে, এম, টি, কম্যুনিষ্ট বিরোধ আয়ত্ত হয় তখন পুরোনো যুদ্ধোপকরণ কম্যুনিষ্টদের কাছে বিক্রয় করিয়াছে। মার্কিণ সরকার কে, এম, টি, সরকারকে কম্যুনিষ্ট প্রতিরোধের জন্য প্রচুর অর্থ ও

যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করিয়াছে এবং ইউ, এন, আর, আর এর মারফৎ প্রচুর খাদ্যসম্ভার সরবরাহ করিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও মার্কিণ সরকার কে, এম, টি, আধিপত্য বজায় রাখিতে পারে নাই। মুকডেনের পতনের পর

মাও-সে-তুং

হইতে অতি দ্রুত গতিতে প্রায় বিনা বাধায় কম্যুনিষ্টগণ সমস্ত চীন অধিকার করিয়াছে এবং গত অক্টোবর মাসে স্থায়ী কম্যুনিষ্ট সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠার পরেই বিভিন্ন দেশের সহিত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা জানাইয়া চীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের উত্তরে প্রথমে ব্রহ্মদেশ ও পরে ভারতবর্ষ তাহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছার ভিতর দিয়া কম্যুনিষ্ট চীন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ সম্পর্কে ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে গত অক্টোবর মাসে চীনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বৈদেশিক দপ্তর হইতে ভারত সরকারের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ আসে। আঞ্চলিক সত্তা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার, সমতা ও পারস্পরিক স্বার্থরক্ষাই এই সম্পর্ক স্থাপনের মূল ভিত্তি হইবে। এই আবেদন ও অবস্থার ক্রমপরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার চীনের নূতন সরকারের এই ইচ্ছার অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের স্বীকার করিয়া লইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। চীন সরকারকে স্বীকার করার মূল নীতি হইতেছে চীন জাতির স্বতঃ উৎসারিত ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ সম্বন্ধে দ্বিমতের কোন স্থান নাই।

কিন্তু দ্বিমতের সম্ভাবনা সর্বত্রই বর্তমান। এক্ষেত্রেও তাহাই দেখা যাইতেছে। যদিও বৃটেন শীঘ্রই চীন সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবেন তথাপি মার্কিন সরকার অন্ততঃ আপাতত কিছুতেই তাহা করিবেন না।

মার্কিণ সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন অদ্য ওয়াশিংটন হইতে সংবাদ দিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও তাঁহার উপদেষ্টাগণ কম্যুনিষ্টদের ফরমোসা আক্রমণ প্রতিরোধ-কল্পে চিয়াংকাইশেককে অস্ত্রশস্ত্র, কামান, হার্ডটপার কামান এবং অন্যান্য সামরিক উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে মার্কিণ কংগ্রেসের গত অধিবেশনে চিয়াং গভর্নমেন্টকে যে সাড়ে সাত কোটী ডলার সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা হইতেই এইসব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান যে সুদূর প্রাচ্যের বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে যে সম্মেলন হয় তাহাতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

একদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যেমন চিয়াংকাইশেককে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি আবার নিউইয়র্কেরই জনৈক প্রকাশ যে রাশিয়া, বৃটেন, ভারত, মিশর, নরওয়ে, ফ্রান্স এবং যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি স্বস্তি পরিষদের সাতটি সদস্য রাষ্ট্র স্বস্তি পরিষদে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে হইতেছে।

ড্রু পিয়ারসন তাঁহার প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, হোয়াইট হাউসের উক্ত সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সভাপতিত্ব

করেন এবং তিনি ফরমোসা দ্বীপ রক্ষার জন্য কিছু একটা সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যাপারে মার্কিণ সমর-নায়কদের মতোই উদগ্রীব। মার্কিণ সেনানীমহলের অধিনায়ক জেনারেল ওমর ব্র্যাডলে এবং দেশরক্ষা দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ ফ্রীজ ইতিপূর্বে বলেন যে, জেনারেল ম্যাকআর্থার ফরমোসার ব্যাপার লইয়া ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষকে জরুরী তার প্রেরণ করিয়া এই সুপারিশ করেন যে, চীনা কম্যুনিষ্টদের ফরমোসা আক্রমণের পথ রোধ করিবার জন্য মার্কিণ নৌবহর ও সৈন্যবাহিনী দুই-ই নিয়োগ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে জেনারেল ব্র্যাডলে ম্যাক আর্থারের 'নোট'টি এই সম্মেলনে পাঠ করেন। এই নোটে জেনারেল ম্যাক আর্থার এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের ফরমোসার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া জাপানে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যের সাহায্যে উহার রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সম্পর্কে ম্যাক আর্থারের যুক্তি হইতেছে এই যে, এখনও যখন আজ পর্যন্ত চুক্তি সম্পাদিত হয় নাই তখন আইনতঃ মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপানী উপনিবেশ হিসাবে ফরমোসার উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে।

মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডিন একদিন অবশ্য এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, গ্রীসে ট্রুম্যানের নীতি যেরূপভাবে কম্যুনিজম দমনে সমর্থ হইয়াছে ফরমোসায় তেমনটি হয় নাই। তিনি ফরমোসা সম্পর্কে প্রাপ্ত বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠ করিয়া বলেন যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্রোহীতে ভর্তি এবং ফরমোসার অধিবাসীদের জাপ-বিদ্বেষের চেয়ে চিয়াং সরকারের প্রতি বিদ্বেষ অনেক বেশী। কারণ চিয়াং সরকার ১৯৪৫ সালে যখন ফরমোসা পুনরধিকার করে তখন তাহারা ফরমোসার অধিবাসীদের যে অত্যাচার করে হিটলারী অত্যাচারকেও হার মানায়। ডীন একিসনের মতে ফরমোসার এইরূপ বিক্ষুব্ধ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ যুক্তিযুক্ত হইবে না। তিনি চীনে মার্কিণ সমর বিশেষজ্ঞদের প্রেরণেরও বিরুদ্ধতা করেন। ইহার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বৃটেন সপ্তাহ খানেকের মধ্যে কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার করিয়া লইবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাহার প্রতি-নিধিত্বও সমর্থন করিবে। কম্যুনিষ্ট চীনে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রতিনিধির আসন লাভ করিলে সে এখন মার্কিণ গভর্ণ-মেণ্টের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের আক্রমণের অভিযোগ আনিতে পারে। ডীন একিসনের এই যুক্তি প্রদর্শনের পর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও তাঁহার উপদেষ্টাগণ ম্যাক আর্থারের প্রস্তাব অনুযায়ী ফরমোসার কর্তৃত্ব গ্রহণের পরিকল্পনা বর্জন করেন।

ইন্দোনেশিয়া

একদিকে যেমন নব চীনের জন্ম বিশ্ব রাজনীতিক্ষেত্রে বিরাট সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মও তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অবসানের আর একটি লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রায়

ডাঃ হাত'

চারিশত বৎসর ওলন্দাজ অধিকারে থাকিবার পর গত হেগ সহরের গোল টেবিল বৈঠকের ফলে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ ইন্দোনেশিয় ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে পরিগণিত হইল। এই রাষ্ট্র ভারতের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কান্বিত। ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার কৃষ্টিগত সংযোগ বহু যুগ স্থায়ী। আশা করা যায় এই দুই রাষ্ট্র বিশ্বশান্তির জন্য নিজেদের সকল শক্তি পণ করিবে।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

ফুটবল—মোহনবাগান ক্লাবের ইরক অবস্থাতে সুইডেনের হেলসিংবর্গস একাদশ আমন্ত্রিত হইয়া কলিকাতায় খেলিতে আসে। কলিকাতায় তাহারা মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল ও বাঙ্গলার একাদশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

হেলসিংবর্গসের অন্যান্য স্থানে প্রতিযোগিতার ফলাফল		হেলসিংবর্গসের কলিকাতায় প্রতিযোগিতার ফলাফল	
সাইগণ—	৫—০	মোহনবাগান—	
ডিয়েৎনাম—	২—১	ইষ্টবেঙ্গল—	২—০
হংকং—	৯—১		
চায়না—	৭—১		
হংকং—	৫—১		

ফুটবল খেলায় সুইডেন গত অলিম্পিকে বিজয়ী হইয়া শ্রেষ্ঠাসন লাভ করিয়াছে। সুতরাং সুইডেন হইতে আগত ফুটবল দল সম্বন্ধে ক্রিড়ামোদী ও জনসাধারণ অত্যন্ত ভরসা করিয়া নিরাশ হইয়াছে। একমাত্র গোলকিপার কার্লস্বেনসন, সেন্টার হাফ হোও এ্যাপলটফট্ ও ব্যাক হ্যারী জিগ্‌লার ব্যতীত কাহারো খেলা দর্শকগণের মনে রেখাপাত করিতে পারে নাই। গোলকিপার ও সেন্টার হাফ সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু ফরোয়ার্ডগণের গোলমুখে দুর্বল শট, সুযোগের অপব্যবহার ও নিজেদের উপর আস্থার অভাব সকলকেই বিশেষরূপে হতাশ করিয়াছে।

তিনদিনের খেলার মধ্যে প্রথমদিনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কেটস পায় দিয়া খেলিয়া মোটেই সুবিধা করিতে পারে নাই। দ্বিতীয় দিনে ইষ্টবেঙ্গলের সহিত বুট পায় দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইলেও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বহুলাংশে হেলসিংবর্গস্ অপেক্ষা ভালো খেলিতে সক্ষম হইয়াছে। একমাত্র দুর্বল ব্যাকের জন্য ও হেলসিংবর্গসের গোলকিপার ও সেন্টার হাফের অতুলনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজিত হইয়াছে সত্য; তবে ইষ্টবেঙ্গলের শ্রেষ্ঠত্ব হেলসিংবর্গস্‌ও স্বীকার করিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের আমেদ খাঁকে আটকাইবার মত কোনো খেলোয়াড় যে হেলসিংবর্গস দলে নাই ইহা আমেদখাঁ বহুবার মাঠে প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। তৃতীয় দিনে একাদশের সহিত হেলসিংবর্গস দল ভালো করিয়া খেলিয়া জয়লাভ করে।

টেনিস—এই বৎসর কলকাতায় প্রথম এশিয়ান টেনিস চ্যাম্পিয়ান শিপ অনুষ্ঠিত হইল। সাউথ ক্লাব বহু ব্যয় করিয়া বাহিরের খ্যাতিসম্পন্ন অনেক খেলোয়াড় আমদানী করিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের বিষয় ইহাই—যে ভারতীয় এক নম্বর খেলোয়াড় দিলীপবসু সিঙ্গিলসে ও একনম্বর ও দুইনম্বর খেলোয়াড় দিলীপবসু ও সুমন্ত মিশ্র ডবলসে জয়লাভ করিয়া এশিয়ার মধ্যে

ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। সিলিসের ফাইনালে দিলীপবসু সুরেন মিশ্রকে পর পর তিন গেমে হারাইয়া জামসেদপুরের পরাজয়ের গ্লানি ধৌত করিয়া শুধু ভারতের এক নম্বর নয় এশিয়ার এক নম্বর খেলোয়াড়রূপে নিজেকে প্রমাণিত করিয়াছেন। আমরা দিলীপ বসুকে ও মিশ্রকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাঁহারা আরো উন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন সে বিষয়ে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

ক্রিকেট :—গত ২৪, ২৬ ও ২৭শে ডিসেম্বর প্রদেশ-পালের একাদশ ও কমনওয়েলথ একাদশের মধ্যে খেলায় কমনওয়েলথ দল দশ উইকেটে জয়লাভ করে। প্রদেশ-পালের একাদশের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২২ রাণে শেষ হইয়া যায়। একমাত্র পি, রায় ও গিরিধারী ব্যতীত কোন খেলোয়াড়ই ট্রাইবের মারাত্মক বোলিংএর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হন নাই। অফব্রেকার ৫০ রাণে ৯টী উইকেট লাভ করেন এবং দুইবার দুইবার হ্যাট্‌ট্রীক লাভে বঞ্চিত হন। ভারত ভ্রমণে আসিয়া তাঁহার বোলিংএ এরূপ রেকর্ড পূর্ণ করিবার তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। তাঁহার ২৮ ওভার বলের মধ্যে ১০টী মেডেন ও ৯টী উইকেট লাভ করিয়া মাত্র ৫০ রাণ দেন।

কমনওয়েলথ একাদশ প্রথম ইনিংসে ৩০১ রাণ করে। তাহার মধ্যে লিভিংষ্টোনের ১১৬ ও লেংডনের ৫০ রাণ উল্লেখযোগ্য। ফুটে ব্যানার্জ্জি ১০২ রাণে ৬ উইকেট ও নষ্ট ব্যানার্জ্জি ৮২ রাণে ৪ উইকেট লাভ করেন।

প্রদেশপালের একাদশের দ্বিতীয় ইনিংস ১৯৮ রাণে শেষ হইয়া যায়। মুস্তাক্ ৬৮ রাণ ও গিরিধারী ৪১ রাণ ব্যতীত কেহই সেরূপ খেলিতে পারেন নাই। ট্রাইব ৫১ রাণে ৪ উইকেট ও পেটিফোর্ড ৬২ রাণে ৩ উইকেট লাভ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে কমনওয়েলথ দল কেহ আউট না হইয়া প্রদেশ পার্লের একাদশের রাণ সংখ্যা অতিক্রম করিয়া ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

তৃতীয় টেষ্ট :—ভারতীয় দল কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ৭ উইকেটে জয়লাভ করে। প্রথম টেষ্টে পরাজিত ও দ্বিতীয় টেষ্টে ড্র করিয়া তৃতীয় টেষ্টে জয়লাভ সত্যই প্রশংসার্হ। প্রথম দুইটী টেষ্টে বিজয়-মার্চেন্টের নেতৃত্বে টসে পরাজিত হইয়া বিজয় হাজারের নেতৃত্বে টসে জয়লাভ ও খেলায় জয়লাভ বিজয় হাজারের পক্ষে গৌরবজনক সন্দেহ নাই। বিজয় হাজারে শুধু বিজয়ের জয়তিলক ধারণ করেন নাই তিনি সত্যই নেতার মত প্রথম ইনিংসে ১৫৭ রাণ নট্ আউট ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩১ রাণে নট্ আউট থাকিয়া ক্যাপ্টেনোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ১৯৪৪-৪৬ সালে মাদ্রাজ অষ্ট্রেলিয়ান সার্ভিসিন একাদশকে ৬ উইকেটে পরাজিত করিবার পর ইহাই প্রথম জয়লাভ।

প্রথম ইনিংসে ভারতীয় দল ৪২২ রাণের মধ্যে বিজয় হাজারে, মানকড়, মুস্তাক্ ও কিষেণচাঁদের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। কিষেণচাঁদ খেলার ভাঙ্গন অবস্থায় আসিয়া নিপুনভাবে খেলিয়া ৪২ রাণ করিয়া খেলার গতি অনেক পরিবর্ত্তিত করেন এজন্য সত্যই তিনি ধন্যবাদার্হ। ভারতীয় দলে মুস্তাক্ আলীকে বাদ দিয়া প্রথম দুইটী টেষ্টে যে অন্যায় করিয়াছেন—তাহা বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

৪২২ রাণের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ দল ১৯০ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ফাদকার ও এন চৌধুরীর মারাত্মক বোলিংএর বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ দল দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না। এন চৌধুরী ৫৬ রাণে ৪ উইকেটে ও ফাদকার ৫৩ রাণে তিনটী উইকেট লাভ করেন।

কমনওয়েলথ দল ২৩২ রাণ পেছনে থাকিয়া ফলো অন করিতে বাধ্য হয় এবং ৩৪৮ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে; ওল্ডফিল্ডের ১১৮ রাণ ও লিভিংষ্টোনের ৫৯ রাণ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় দল ১১৬ রাণ পশ্চাতে থাকিয়া ব্যাট আরম্ভ করে এবং মধ্যাহ্নভোজের ৫৫ মিনিট পরে তিনটী উইকেটে হারাইয়া ১১৭ রাণ তুলিয়া দিয়া ৭ উইকেটে জয়লাভ করে।

ভারতীয় দল জয়লাভ করিলেও তাহাদের ফিল্ডিং যে কত জঘন্য তাহা প্রতিবারের মত এবারেও প্রমাণিত করিয়াছে। দীর্ঘ সমালোচনা ও জঘন্য পরিণাম দেখিয়াও যে ভারতীয় দলের বিন্দুমাত্র চৈতন্য হয় নাই ইহা দেখিয়া বাস্তবিকই ব্যথিত ও ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কিত হইতেছি। সহজ ক্যাচ ও বল ধরিবার ও ছুড়িবার ভুল পদ্ধতি যদি অচিরে পরিবর্তিত না হয় তবে ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যান বেশীদিন বোধ হয় হাল ধরিয়া রাখিতে সক্ষম হইবেন না।

আগামী ১৪ই হইতে ১৮ই জানুয়ারী কানপুরে ম্যাচিং উইকেটে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে। এবং সেই খেলার নিম্নলিখিত খেলোয়াড়েরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

বিজয়মার্চ্চেন্ট (ক্যাপ্টেন), মুস্তাক্ আলি, মোদী, হাজারে, কাদকার, অধিকারী, মানকড়, উমরিগর, মন্ত্রী, গাইকোয়াদ ও গোলাম আমেদ। পি, সি, যোশী স্বাদশ ব্যক্তি এবং এবং জি, কিবেচ্চাদ ও এন, চৌধুরী অতিরিক্তের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

টীম মনোনয়ন দেখিয়া প্রথমেই মনে হইতেছে মন্ত্রীর স্থান হইল কিরূপে? উইকেট কীপার হিসাবে তাহার উইকেট রক্ষা যে অত্যন্ত নিম্নস্তরের একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে তাহার রাণ সংখ্যা বোধ হয় সর্ব্বনিম্ন ইহা দেখিয়াও ভারতীয় গত দুই বৎসরের উইকেট রক্ষক পি, সেনকে যে কেন বাদ দেওয়া হইতেছে ইহার উত্তর মনোনয়ন কমিটী দিবেনকি? দ্বিতীয় কথা হইতেছে টীম হইতে এন, চৌধুরীকে বাদ দেওয়া। কলিকাতা টেষ্টে এন, চৌধুরীর মারাত্মক বোলিং ও পাঁচটী মূল্যবান্ উইকেট লাভ করা সত্বেও তাহাকে বাদ দেওয়া যে বিশেষ অন্যায় হইয়াছে একথা জোর করিয়া বলা চলে। ম্যাটিং উইকেটে এন, চৌধুরী দীর্ঘ দিন ধরিয়া বল করিতে অভ্যস্ত এবং তাহার বল ম্যাটিং উইকেটে আরো মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা অধিক।

টেবিল টেনিস—আন্ত-প্রাদেশিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা দল বোম্বাই দলকে পরাজিত করিয়াছে। বাঙ্গলা দলে কুমার ঘোষ, কে, জয়ন্ত ও ভাণ্ডারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ভারতীয় টেবিল টেনিস এ্যাসোসিয়েসান খেলোয়াড়দের ক্রম পর্য্যায়ের তালিকা বাহির করিয়াছেন।

উত্তম চন্দ্রনা (বোম্বাই)
আর ভাণ্ডারী (বাঙ্গলা)
সচিদানন্দ রাও (মাদ্রাজ)
জয়ন্ত (বাঙ্গলা)

মিস্ সুলতানা এবং মিসেস রাজগোপালন মহিলাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকার করিয়াছেন।

রূপ ও বাণী

শিল্পরসিক

মাস থেকে মন্দিরায়—"রূপ ও বাণী" বিভাগ খোলা হবে। এতে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সমালোচকের কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন ছবির সমালোচনা এবং সিনেমা সম্বন্ধে ছোটখাট প্রবন্ধ আহ্বান করছি। এবারে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একটি বিশদ সমালোচনা ছাড়াও ২।১টি ছবির সমালোচনা করা হল। আশা করি আগামীবার থেকে সমস্ত নতুন ছবির সমালোচনাই এতে থাকবে।

(সঃ মন্দিরা)

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের গতি

আমাদের কাগজে এতদিন চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোন রকম আলোচনা থাকত না, কিন্তু চলচ্চিত্রের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদেরও এগিয়ে যাওয়াই দরকার। কিন্তু আমাদের এই বিভাগে প্রধানতঃ চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেও অনুরূপ অন্যান্য প্রমোদানুষ্ঠানগুলিও আমাদের আলোচনা থেকে বাদ যাবে না।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে একটা চিন্তা সমালোচকের মনে উদয় হয় তা' হচ্ছে এদেশে চলচ্চিত্রশিল্পের দুরবস্থা, পৃথিবীর মধ্যে দর্শক সংখ্যার হিসাবে যে ক'টি দেশের ছবির বাজার যথেষ্ট বড় ভারতবর্ষ তার মধ্যে অন্যতম, ভারতীয় ছবিগুলি ভারতবর্ষের বিরাট সংখ্যক দর্শক ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে অনেক দর্শক পেয়ে থাকে, কিন্তু কলাকৌশল এবং আর্থিক সাফল্যের দিক থেকে ভারতীয় ছবি ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ বা ইতালিয়ান ছবিগুলির থেকে অনেক পেছনে, এদেশে চলচ্চিত্রের হিতকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনে এই একটা বেদনা কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করে।

ভারতের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ঠিক ভারতবর্ষেরই মত জনসাধারণের মনে সেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকদের সকল কিছুরই প্রতি একটা আন্তরিক বিরাগ এখনও বলবৎ রয়েছে, এ অবস্থায় ঐ সব দেশের নিজেদের নিতান্ত শিশু চলচ্চিত্রশিল্পের তুলনায় উৎকর্ষের দিক থেকে অধিকতর সম্পদশালী ভারতীয় ছবির চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট, ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীগণ যদি এ সুযোগটার ঠিকমত সদ্ব্যবহার করতে পারতেন তা হ'লে ভারতীয় ছবির পক্ষে সে একটা মস্ত আশার কথা হ'ত, কিন্তু লক্ষণ যা দেখা যাচ্ছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। পাশ্চাত্যদেশের ছবির নির্মাতাগণ নিজেদের ঘরে যুদ্ধোত্তর যুগের অর্থনৈতিক সঙ্কটকে হাল্কা করবার জন্যে আজ তাদের ছবির বাজার খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজেদের দেশের বাইরে, তাই আজকে আমরা এদেশেও দেখতে পাচ্ছি হলিউডের প্রখ্যাতনামা কলাকুশলিদের দ্বারা এখানকার ভাষায় এখানকারই মাটীতে ছবি তোলবার আয়োজন, "দি রিভার," "কিম্" প্রভৃতি যার সম্বন্ধে এত ঢাক পেটানো হচ্ছে—সে সব তারই অশুভ লক্ষণ, "বাগ্‌দাদ কি চোর" এর 'ডাব্' করা হিন্দী সংলাপ জুড়ে দেওয়া বিদেশী ছবিখানি যে পরিমাণ টাকা এদেশে অর্জন করে নিয়ে গেছে—তা দেখে অন্যান্যদের লোভ হবারই কথা, আমাদের চিত্র নির্মাতাদের তাই আজ ভেবে বের করতে হবে ছবির শুধু আর্থিক সাফল্যের দিকটাই নয়, কলাকৌশলেরও দিক থেকে ছবিকে সফল ক'রে তোলার চাবিকাঠিটি কোথায়।

এ বিষয়ে মাদ্রাজের জেমিনীর কর্ণধারদের প্রচেষ্টা দেখে মনে আশার সঞ্চার হচ্ছে। এঁরা এদের প্রথম ছবি **'চন্দ্রলেখা'**তে দর্শকদের যা দিয়েছিলেন, এঁদের দ্বিতীয় ছবিটিতে তার চাইতে আরো ভাল, আরো বেশী কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন এবং সে চেষ্টায় সফলও হয়েছেন বই কি! "নিশান" দেখে তাই বোম্বের চলচ্চিত্র সমালোচকগণ আনন্দে ও বিস্ময়ে হকচকিয়ে

গেলেন, একবাক্যে সকলে বললেন—মাদ্রাজের জেমিনী যা করতে পারছে, আমাদের স্থানীয় প্রযোজকরা তা কেন পারছে না! এই ছবিখানা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আর আমরা এখানে করতে পারছি না স্থানাভাব, আশা করা যায় পরের বারে তা পারব।

"নিশান"-এর প্রসঙ্গে যে কথাটা বোম্বের সমালোচকদের মনে জেগেছিল তাদের স্থানীয় ছবিগুলি সম্পর্কে, সেরূপ চিন্তা আমাদের ছবিগুলি সম্বন্ধে আমাদেরও মনে আসে বৈকি। জেমিনীর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যেমন ছবির ষ্ট্যাণ্ডার্ডকে ক্রমশঃই উন্নততর করবার জন্যে একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেল, আমাদের এখানকার প্রযোজকদের ভেতরেও সেরকমটা দেখতেই আশা করি। এই প্রসঙ্গে খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রচেষ্টার কথা প্রথমেই মনে জাগে। 'কালোছায়া'র ভেতরে তিনি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি কাহিনী প্রবর্তন ক'রে—প্রধানতঃ কাহিনীর বৈচিত্র্যপূর্ণতাজনিত স্বচ্ছন্দ গতিবেগের জন্যই দর্শকমনে একটা বড় রকমের ছাপ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে ছবিতে পরিচালকের দায়িত্ব ছিল অন্য লোকের হাতে। তাঁর দ্বিতীয় বই 'কুয়াশা'তে তিনি এই ফাঁকটুকু পূরণ ক'রে নিজেই পরিচালকেরও দায়িত্ব নিয়ে তাঁরই দৃষ্টিকে নিজের মনের মতনটি ক'রে গড়ে তুলেছেন। এদিক থেকে দেখতে গেলে 'কুয়াশা'—যা অল্পদিনের মধ্যেই এর স্বীয় অভিনবত্বের জোরে কলকাতার দর্শক মনকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছে—কলাকৌশলের দিক থেকে 'কালোছায়া' চাইতে উন্নত স্ট্যাণ্ডার্ডের ছবি হ'লেও, সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষের দিক থেকে এর পক্ষে আরো একটু উঁচুতে ওঠাই উচিত ছিল। আশা করি জেমিনীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রেমেনবাবু তাঁর পরবর্তী ছবিতে আরো ভাল আরো বেশী কিছু দেবার চেষ্টা করবেন।

সর্বশেষে এই একই প্রসঙ্গে ভ্যারাইটি পিক্‌চার্সের নামটি উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। তাঁদের প্রথম অবদান "রবীন মাষ্টারের" ভেতরে তাঁরা দেশবাসীর সামনে যা তুলে ধরেছেন তার মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীণ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ছ'একটি কাগজ যে দাবী করেছে তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করতে চাই যে এ ছবিখানাকে যে শুধু প্রমোদকর থেকে রেহাই দেওয়া হোক্ তাই নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব খাটিয়ে সরকার এই ছবিখানাকে প্রত্যেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী বা শিক্ষাব্রতী মাত্রেরই পক্ষে বাধ্যতামূলকভাবে দেখার ব্যবস্থা করুন। এই ছবিখানার মধ্যে প্রযোজকগণ যেমন নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, আমরা আশা করি আর্থিক দিক থেকে তাঁরা খুব উৎসাহজনক সাফল্যলাভ করতে না পারলেও (এদেশের রুচি অনুযায়ী এটাই বরং সম্ভব; এর চাইতে খিড়কি, সানাই বা চন্দ্রলেখা অনেক অনেক বেশী টাকা তুলেছে) তাঁদের পরবর্তী ছবিতে মাদ্রাজের জেমিনীরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আগে যা দিয়েছেন, তার চাইতে আরো ভাল, আরো বেশী কিছু দেবার চেষ্টা করবেন।

ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের এই পরম দুর্দিনে আশার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আসছেন যারা, তাঁদের চলার পথ যত নির্জন বা সঙ্গীহীনই হোক্ না কেন—এদেশের সত্যিকারের চলচ্চিত্রের হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে আগ্রহব্যাকুল অভিনন্দনই। জেমিনী, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ভ্যারাইটী পিক্‌চার্সের পরবর্তী উদ্যোগ দেখবার জন্যে তাই আমরা বুকভরা আশা ও আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা ক'রে আছি।

"শ্রীনারদ।"

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

শ্রীনির্মল চৌধুরী পরিচালিত, শ্রী এস, ডি, নারাং প্রযোজিত এবং বেঙ্গল স্যাশনাল ষ্টুডিও পরিবেশিত "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" কিছুদিন ধরে মিনার, বিজলী এবং ছায়াঘরে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিভিন্ন অংশে অভিনয় করেছেন-ভবেন মজুমদার, সৌভাগ্য মুখার্জী, দীপক মুখার্জী, সুনীল দাশগুপ্ত, ধনানী চৌধুরী, দীপ্তি রায় এবং আরও অনেকে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সমালোচনা করতে বলেছি; যারা নিরপেক্ষ সমালোচক তাদের দোষ

এবং ও নির্মলবাবুর সমালোচনা করাই উচিত, কিন্তু এই ছবিখানার এত ত্রুটী সত্ত্বেও পরের যে প্রশংসা করবার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

প্রথমেই পরিচালক নির্মল চৌধুরীর কথা ধরা যাক, ভদ্রলোকের চিত্রনাট্য এবং সিনেমা টেকনিক সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও আছে বলে মনে হয়না, তার ফলে ছবিখানি হয়েছে অত্যন্ত দীর্ঘ, একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর, ছবিখানি দেখতে দেখে শুধু বারবার মনে হয়েছে "আর পারি না, কখন এ অত্যাচার শেষ হবে"। টেকনিকে এত ভুল আছে, যে তা পুরোপুরি লিখতে গেলে একখানা দীর্ঘ বই লিখতে হয়।

তারপর অভিনয়, বিপ্লবী বীর সূর্য্য সেনের ভূমিকায় ভবেন মজুমদারকে দেখে ক্রোধ, ঘৃণা ও অপমানের একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছিল, ভবেনবাবুকে এই ভূমিকায় নামিয়ে স্বর্গগত বিপ্লবী বীরের আত্মার প্রতি দারুন অপমান করা হয়েছে, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নাগরিকের এর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করা উচিত। তবে ভবেনবাবুর চোখ দুটী বড় সুন্দর, সলজ্জ বধূর ভীরু চাহনি, যে চোখে একদিন বিদ্রোহের আগুন জ্বলত তার বদলে দেখেছি ভীরু চাহনি, হায়রে! এ বোধ হয় আমাদের এই অভিশপ্ত দেশেই সম্ভব।

অনন্ত সিংহের ভূমিকায় সুনীল দাশগুপ্তকে দেখে কান্না পাচ্ছিল, তার চেয়ে দেখেছি রাস্তায় বিড়িটানা একটী 'মাইরি' বোম্বের ছোকরা, বেশিনি দৃপ্ত, তেজোময় ও বলবান অনন্ত সিংকে যিনি শুধু হাত দিয়ে শক্ত লোহার সিক বেঁকিয়ে ফেলতে পারতেন। লোকনাথ বলের ভূমিকায় দীপক মুখার্জী এবং নির্মল সেনের ভূমিকায় গৌতম মুখার্জীর অভিনয় একেবারে নিখুঁৎ না হলেও, বেশ প্রশংসনীয়, অন্ততঃ তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীমা এদের অভিনয়ে কিছুটা দেখেছি, অন্য ভূমিকাগুলির বিষয়ে কিছু লিখতেই ইচ্ছে করেনা।

সূর্য্য সেনের স্ত্রীর ভূমিকায় বনানী চৌধুরী প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন, তবে এ ভূমিকাটার জন্য এত হিন্দি অপচর করা প্রয়োজন বলে মনে করি না, প্রীতিলতার সঙ্গে দীপ্তি রায়ের কোন মিলই খুঁজে পেলাম না, তাঁর বাচনভঙ্গী সত্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য। তার ত্রিচেস ও শার্ট পরার দৃশ্যটী বড়ই দৃষ্টিকটু।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দৃশ্যটী মনে কোনই রেখাপাত করেনা, বারবার বন্দুকের আওয়াজ করিয়েও 'বন্দেমাতরম্' বলে চেঁচিয়েও পরিচালকমশাই দৃশ্যটী জীবন্ত করে তুলতে পারেননি, ইউরোপীয়ান ক্লাবে বলনাচ, কালাপাহাড় পুলিসের সঙ্গে লড়াই এবং সূর্য্য সেনের ফাঁসীর দৃশ্যটী বেশ হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

এই ছবির বিরুদ্ধে আর একটী প্রধান অভিযোগ যে কোন একটী রাজনৈতিক দলকে ছোট করে অন্য একটী দলকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, আমি এসব দলাদলির খবর রাখি না তবে এটুকু বলতে পারি চলচ্চিত্র পরিচালকের কোন দলাদলিতে না যাওয়াই উচিত।

ফটোগ্রাফী মোটামুটী ভালই, সঙ্গীতগ্রহণ ত্রুটীপূর্ণ প্রত্যেকটী গানই বেশ সুগীত হয়েছে, তবে আবহ সঙ্গীত আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল, ছবির আরম্ভটী অত্যন্ত ক্লান্তিকর।

শুনতে পেলাম 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের' নাকি হিন্দী সংস্করণ হচ্ছে, প্রযোজক নারাং সাহেবকে এবং পরিচালক চৌধুরীমশাইকে আমি করজোরে অনুরোধ কচ্ছি তারা যেন এ প্রচেষ্টা থেকে ক্ষান্ত হন, কারণ বাংলার এ কলঙ্ক বাংলাতেই থাক, বাংলার বাইরে দেশের গৌরবময় অধ্যায়ের এ লোচনীয় দৃশ্য দেখিয়ে বাংলাকে যেন তারা হাস্যাস্পদ না করেন। (শিল্পরসিক)

'দেসা'র চিত্র "ছিন্নমূল" শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। বহুদিক থেকেই চিত্রখানি গতানুগতিকতার পথ ত্যাগ করেছে বাস্তুহারাদের জীবন নিয়ে এই ছবিখানি বাস্তবতার সহিত যতটা সম্ভব সম্পর্ক রাখবার সকল প্রকার চেষ্টা করেছে। স্টুডিওর বাঁধাধরা 'ফ্লাট'এর বাইরেই এর বেশীর ভাগ চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ছবিখানির কথোপকথনে আগাগোড়া পূর্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করায় ছবিখানির উৎকর্ষতা সাধিত হবে বলেই আমাদের ধারণা। কারণ পদ্মাপারের এক অখ্যাত গ্রামের এক দল কামার, কুমোর ও ছুতোরের মুখে কলকাতার নাটকীয় ভাষা বেমানান হত বলেই আমাদের ধারণা।

সব শেষে ছবির মালিক ছবিটীর লাভের শতকরা দশভাগ বাস্তুহারা ছাত্রদের জন্য ব্যয় করবেন বলে ঘোষণা করে বাংলাদেশের প্রযোজকদের কাছে আদর্শ স্থাপন করেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি।

দ্বীপময় ভারত।

ভারতের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড ভূখণ্ড আছে—অনেকগুলি দ্বীপমালার সমষ্টি। বহু প্রাচীন কাল হ'তে এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব আজও ওখানে সুস্পষ্ট আছে যদিও ৪।৬ শত বৎসর যাবৎ এই দেশের অধিবাসীরা মুসলমান। কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বলি দ্বীপে এখনও কিছু হিন্দু ধর্ম প্রচলিত আছে। এই দেশ আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে, এর রাষ্ট্রপতির (বা President) নাম হ'ল সুকর্ণ, ভারতে তাদের যে রাষ্ট্রদূত আছে তাঁর নাম হ'ল সুদর্শন। এ অবশ্য সংস্কৃত শব্দ, ঐ দেশে গিয়ে একটু বিকৃত হয়েছে—আমাদের হিন্দী বা বাংলাতেও এমন বিকৃত সংস্কৃত শব্দ বহু প্রচলিত আছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে বরবদুর ভারতীয় স্থাপত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসাবে এখনও জাভাতে আছে। এই বিরাটকায় মন্দির এখনও বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করছে। প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করতে চাই না। এই দ্বীপময় দেশের নব জাগরণ এসিয়ার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে এসিয়ার বিভিন্ন দেশে এক নব জাগরণের সূচনা দেখা দেয়। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভ, বঙ্গ-বিভাগকে উপলক্ষ করে ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন, নব্য তুরস্কের (Young Turks) নেতৃত্বে তুরস্কে নূতন জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে প্রায় একই সময় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও জাতীয় জাগরণ দেখা দেয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর এই আন্দোলন বেশ তীব্র হ'য়ে ওঠে। ভারতে ১৯১৯ সালে নূতন শাসন সংস্কার দেওয়ার মতো ঐ দেশেও প্রায় একই সময় (১৯২০) নূতন শাসন সংস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু এই প্রকার সামান্য সংস্কারে ওখানকার অশান্ত জনতা শান্ত হয় নি। সামান্য কিছু সংস্কার, বেশ কিছু অত্যাচার আরও অধিক জাতীয় দাবী—এমনি করে বছরের পর বছর চলছিল। ইতিমধ্যে এল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। হল্যাণ্ড জার্মাণীর অধিকৃত হ'ল ; কিন্তু এই দ্বীপপুঞ্জ তখনও হল্যাণ্ডের অধিকারেই রইল। ব্রিটেন ও আমেরিকা এই সময় ওলন্দাজ সরকারকে ঐ সব দ্বীপে তাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই জাপান ঐ সব দ্বীপ দখল করল। ছোট বড় প্রায় দুই সহস্র দ্বীপ ২ ৩ মাসের মধ্যে জাপান দখল করল। জল ও স্থল যুদ্ধে তখন জাপান যে নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রতার পরিচয় দিয়েছে, তা সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করেছে।

প্রায় তিন বছর এই দ্বীপময় দেশে জাপানী শাসন চলল। জাপান সমগ্র এসিয়ার নেতৃত্ব দাবী করে ঐ যুদ্ধে বহু ভাল ভাল কথা বলেছে। ইন্দোনেশীয় লোকদের বহু আশা ও ভরসা দিয়েছে এবং কার্যত শাসনকার্যে কিছু অধিকার দিয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বহু। এর ফলে জনসাধারণের মনে আরও নূতন আশা ও আকাঙ্খা জাগ্রত হল। যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর জাতীয় আন্দোলন তীব্র হ'ল। যুদ্ধের সময় জনসাধারণের হাতে বহু অস্ত্র-শস্ত্র গিয়ে পড়েছে। যখন বিজয়ী মিত্রপক্ষ আবার সেই পলায়িত ওলন্দাজ সরকারকে এনে বসাতে চেষ্টা করল, তখন জাতীয়তাবাদীদল সেইসব অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ওলন্দাজদের বাধা দিতে লাগল। দ্বীপময় ভারতের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা অহিংস পন্থায় চালিত হয়নি।

৩৪ বছর সংগ্রামের পর ভারত-দ্বীপ-বাসীদের স্বাধীনতা

প্রচেষ্টা সফল হল। ওলন্দাজরা এতদিন পর বুঝল যে ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যিক শাসনের দিন অতীত হয়েছে; জনগণের সক্রিয় প্রতিরোধ ও বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে, কোন বৈদেশিক শাসন চলতে পারে না। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম কয়েক মাস পূর্বে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে ওলন্দাজ সরকার নূতন সৈন্য আমদানী করে জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান সুরু করে। ডাঃ সুকর্ণ প্রভৃতি নেতারা অতর্কিতভাবে ওলন্দাজদের হাতে বন্দী হন। কিন্তু তাতে জাতীয় বাহিনীর উৎসাহ বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। এই সময় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে দিল্লীতে এশিয়ার জাতি সমূহের এক সম্মেলন হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হতে প্রতিনিধি এসে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত-দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেছে। এইসব কারণে ওলন্দাজ সরকার বুঝতে পারে যে এই যুদ্ধ অভিযানের ফলে বিশ্ব রাজনৈতিক দরবারে তারা কোন সমর্থন পাবে না। তাই জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে তাদের সংগে আপোষ করতে ওলন্দাজ সরকার বাধ্য হয়েছে।

গত তিন চার বছর যাবৎ ভারতবর্ষ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি নানা ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। দ্বীপময় ভারতের নেতৃবর্গ বহু বিষয়ে ভারতীয় সরকার বিশেষ করে এর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলালের সংগে পরামর্শ করে কাজ করেছে। ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাতা বহুবার ভারতে এসেছেন এবং বরাবরই স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

আমরা আশাকরি এশিয়ার নব অভ্যুত্থানে ভারত ও দ্বীপময় ভারত গভীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। এই দুই দেশের মধ্যে প্রাচীনকালে যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ছিল তা আবার ফিরে আসবে ইহা আমাদের প্রার্থনা। আমরা নূতন স্বাধীনতালব্ধ আমাদের প্রতিবেশী জাতিকে আমাদের গভীর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ভিয়েৎনাম

অল্প কিছুদিন পূর্বে এশিয়ার আর একটি দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যিক শাসন হতে মুক্ত হয়েছে। সেই দেশেরই বর্তমান নাম ভিয়েৎনাম। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত এই ভূখণ্ড ইন্দোচীন নামে পরিচিত ছিল। এই ভূখণ্ড ঠিক একটি দেশ নয় বা একটি জাতির অধিবাস স্থান নয়; এর শাসন ব্যবস্থারও বিভিন্ন অংশে পার্থক্য ছিল। এর মধ্যে কোচিন চীন সর্বপ্রথম ফরাসী অধিকারে এসে একটি খাস ফরাসী অধিকৃত উপনিবেশ হিসাবে শাসিত হত। টংকিন, আনাম ও কম্বোডিয়া এবং লাওস ফরাসী রক্ষিত দেশীয় রাজ্য (protectorate)। আনামে একটি সম্রাট নামধারী শাসনকর্তা বরাবর ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ সিকি হিস্যায় এই সব দেশ ফরাসী অধিকারে যায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান এই সমস্ত দেশ অধিকার করে। জাপানের পরাজয়ের পর মিত্র শক্তির সাহায্যে ফরাসী অধিকার এই সব দেশে পুনরায় স্থাপিত হয়। ব্রহ্মদেশের ও দ্বীপময় ভারতের মতো এই দেশেও তীব্র জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়। বৈদেশিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান আরম্ভ হল।

আনামের জাতীয়তাবাদী দল দেশের প্রাচীন নাম ভিয়েট-নাম চালু করল এবং জাতীয়বাদী দলের নাম হল ভিয়েট-মিন। এই দলের নেতা হলেন ডাঃ হো-চি-মিন। এর জীবনী আশ্বিন '৫৬ মাসের 'অগ্নিযুগ'তে প্রকাশ করা হয়েছে। ফরাসী সরকার ইন্দো-চীনের উপর নিজেদের ক্ষমতা রহিত করার সময় ব্রিটেন ও হল্যাণ্ডের পন্থা অনুসরণ করে নি। ব্রিটেন ভারতে ক্ষমতা ছেড়ে দিল কংগ্রেসের হাতে; হল্যাণ্ড ভারত দ্বীপপুঞ্জে ক্ষমতা হস্তান্তর করল জাতীয়তাবাদী নেতা সুকর্ণ ও হাতার নিকট। কিন্তু ফ্রান্স ইন্দো-চীনে নিজের ক্ষমতা দিয়ে বসল আনামের ভূতপূর্ব সম্রাট বাও-দাইকে। তাঁরই হাতে ভিয়েট নামের শাসন ক্ষমতা ফ্রান্স ছেড়ে দিল। বাও-দাইর নেতৃত্বে যে ভিয়েৎনাম সরকার স্থাপিত হল, সেই সরকার এখন কাম্বোডিয়া, কোচীন-চীন প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলের সহিত এক মীমাংসা করে সমগ্র ইন্দো-চীনে এক নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করবে।

যদিও ইন্দোচীনে শাসন ক্ষমতা জাতীয়তাবাদী দলের হাতে দেওয়া হয় নি, যদিও ক্ষমতা হস্তান্তর করার সময় ফ্রান্স খুব সহজ মনে ও বিনা দ্বিধায় তা করছে না, তবু আমরা আশা করি বৈদেশিক শাসন হতে মুক্ত হয়ে ইন্দোচীনের অধিবাসীরা নিজেদের জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আমরা এই নূতন স্বাধীন দেশের জনতাকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কুচবিহারের পশ্চিম বঙ্গ ভুক্তি

ভারতের আনুমানিক ৬০০ দেশীয় রাজ্য স্বাধীনতা লাভের দেড় বছরের মধ্যে লোপ পেয়েছে। জাতীয় সরকারের পক্ষে ইহা খুবই কৃতিত্বের কথা। ঐ সব দেশীয় রাজ্য কতক এক সঙ্গে মিলে এক একটি শাসনিক ক্ষেত্র গঠন করেছে, কতক পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে মিলিত হয়েছে,—বড় বড় ৫।৬টি এখনও স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে ভারতীয় রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে আছে। এই ভাবে, সব চেয়ে বেশী পারমাণ ভূখণ্ড বোম্বাই, যুক্ত প্রদেশ ও উড়িষ্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। পশ্চিম বাংলার এই বিষয়ে সব চেয়ে দুর্ভাগ্য। পুরানো বাংলা খণ্ডিত হয়ে দুই তৃতীয়াংশ গিয়েছে পাকিস্তানে। অপর এক তৃতীয়াংশ পশ্চিম বঙ্গ নামে ভারতবর্ষে আছে। ভারতের মধ্যে এই প্রদেশে সব চেয়ে ঘন বসতি,—প্রতি বর্গ মাইলে আট-শতের উপর লোকের বাস। তাছাড়া পূর্ব বাংলা হ'তে প্রায় ২০।২৫ লক্ষ হিন্দু এই প্রদেশে এসেছে। কাজেই এই প্রদেশে সব চেয়ে বেশী স্থানের অভাব এবং এই প্রদেশের পক্ষে সবচেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে পরিসর বৃদ্ধির।

বিহারের কতক অংশ বাংলাভাষী অঞ্চল। কিন্তু আজ সেখানে চেষ্টা চলছে বাংলা ভাষা উচ্ছেদ করার। ঐ অঞ্চল পুনরায় বাংলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী আছে। পূর্বাঞ্চলের বহু দেশীয় রাজ্য উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে মযূরভঞ্জ বাংলার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারত। ওখানে বাংলাভাষী অধিবাসী অনেক আছে, ওখানকার সংস্কৃতি বহুলাংশে বাংলার সঙ্গে জড়িত। লোক বসতির উপযুক্ত বাড়তি জমিও প্রচুর আছে। বিহারের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেরাইকেল্লা। এখানেও বাংলাভাষী অধিবাসী প্রচুর আছে। এই রাজ্যও বাংলার সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সব অঞ্চল পাবার কোন চেষ্টাই করে নি, এমন কি ঐ সব অঞ্চল সম্বন্ধে দাবীও তেমন ভাবে করা হয় নি। অবশ্য এমন কথা আমরা বলতে চাই না যে ঐ দুই রাজ্য সম্বন্ধে বাংলার দাবীই সর্বাগ্র-গণ্য, তবে খণ্ডিত বাংলা স্থান সমস্যা ও জন সমস্যার বিষয় চিন্তা করেই পশ্চিম বাংলার দাবী আমরা উল্লেখ করেছি।

এর পর থাকে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর। কুচবিহার বাংলার সংলগ্ন এবং অধিবাসী সবই বাংলাভাষী, ত্রিপুরা রাজ্যেও বহু বছর যাবৎ বাংলা ভাষাই সরকারী ভাষা এবং মোটা মোটি বাংলা ভাষাই তথাকার লোকেদের কথিত ভাষা। তথাকার সংস্কৃতি ও সম্পূর্ণ রূপে বাংলার সঙ্গে এক। মণিপুরে ও বাংলায় ভাষার পার্থক্য আছে; কিন্তু তবুও সাংস্কৃতিক যোগ একমাত্র বাংলার সঙ্গেই মণিপুরের আছে। ত্রিপুরা ও মণিপুর পশ্চিম বাংলার সঙ্গে সংলগ্ন নয়। তাই হয়ত এই দুই রাজ্যকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করার কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু কুচবিহার সম্বন্ধে কোনই আপত্তি বা বাধা থাকতে পারে না। ১৭৭৩ সালে যখন ইংরাজরা কুচবিহার জয় করে, তখন কুচবিহারের রাজার সঙ্গে যে সন্ধি হয় তাতেও উল্লেখ ছিল যে যদি কোন দিন এই রাজ্যে স্বতন্ত্র সত্তা নষ্ট হয়, তবে এই রাজ্য বাংলার সঙ্গে যুক্ত হবে। বরাবরই কুচবিহার বাংলার মারফৎ ভারত সরকারের সঙ্গে যোগা-যোগ রাখত।

কিন্তু রাজ্যের কিছু স্বার্থান্বেষী লোক এই স্বাভাবিক পরিণতির পক্ষে নানা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। স্থানীয় কিছু লোক এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রায় আড়াই বছর পূর্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। ২।৩ বার স্থানীয় ব্যাপারের তদন্ত ক'রে প্রাদেশিক কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করে যে কুচবিহারে একটি নিয়মিত কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করতে হবে। প্রাদে-শিক কংগ্রেসের নির্দেশে শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ কুচবিহার গিয়ে

সব বিষয়ে তদন্ত করেন। তাঁর রিপোর্টের ফলে কুচবিহারে একটি কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হয়। তখন রাজাও তাঁর মন্ত্রিবর্গ সেখানে শাসন চালাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় যে সব উৎসাহী যুবক কুচবিহারে কংগ্রেস পরিচালনা করার দায়িত্ব নেন, তাঁদের সংসাহসের সুখ্যাতি করতে হয়।

এত সব বাধা অতিক্রম করে আজ কুচবিহার তার স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করল—অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হল। ভাব, আচার-প্রথা, অর্থ নীতি, ভূগোল সব দিক দিয়াই কুচবিহার পশ্চিম বাংলার অঙ্গ ও অংশ। তাই আমরা আশা করি কুচবিহারের সাধারণ অধিবাসীদের পক্ষে এই মিলন সুফলপ্রসূ হবে।

কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ—

বহুদিন যাবৎ পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিষ্ট পার্টি বে-আইনী বলে ঘোষিত হ'য়েছে। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের বহু প্রতিষ্ঠান বেনামীতে ঐ দলের কর্মপদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছিল। ঐ রাজনৈতিক দলের স্পষ্ট উদ্দেশ্য হল যে কোন উপলক্ষ নিয়ে কংগ্রেস ও বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে জনতার মধ্যে বিক্ষোভ ও বিরূপতার সৃষ্টি করা, কংগ্রেসী সরকারকে লোকের চোখে হেয় প্রতিপন্ন করা এবং সর্বোপরি নানা প্রকার উৎপাত সৃষ্টি করে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা যাতে একটা অরাজকতার অবস্থার উদ্ভব হয়। এমনি দলকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা ভিন্ন অপর কোন পন্থাই থাকতে পারে না। সে হিসাবে কম্যুনিষ্ট দলকে বে-আইনী ঘোষণা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঐ দলকে বে-আইনী ঘোষণা করে, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঐ দলের কর্মপদ্ধতি চালাবার সুযোগ দেওয়ার একমাত্র অর্থ হয় যে মূল দলকে বে-আইনী ঘোষণা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়

অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতদিন ধরে ঠিক ঐ কাজই করছিল। কম্যুনিষ্টরা নিজে যে কর্মপন্থা অনুসরণ করত, তা অনুসরণ করাচ্ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ছাত্র ফেডারেশন, পিপলস্ রিলিফ সোসাইটি (Peoples Relief Society) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে। কাগজে খবর বের হ'ত—"কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত এই এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই এই উৎপাত আজ হয়েছে... অর্থাৎ সরকারও জানত, জনসাধারণও জানত, কম্যুনিষ্টরাই ঐ সব প্রতিষ্ঠানের নামে এরূপ উৎপাত সৃষ্টি করছে। কিন্তু তবুও সরকার ঐ সব প্রতিষ্ঠানের গায়ে হাত দেয় নি।

এর পিছনে যে কি যুক্তি থাকতে পারে আমরা বুঝি না। কেউ কেউ মনে করেন কোন কোন উচ্চ কর্মচারীর বা কোন কোন মন্ত্রীর আত্মীয়া বা আত্মীয় ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে, ঐ সব প্রতিষ্ঠান এত দিন পর্যন্ত সরকারী দৃষ্টির ও বিবেচনার বাইরে থাকতে পেরেছে। আশাকরি এই সন্দেহ নিতান্তই অমূলক। কারণ যা ই হ'ক এত দিন পর্যন্ত ঐ সব কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান যে সরকারী দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেয়েছে—তা সকলের নিকটই রহস্যময় বিবেচিত হবে। এতদিন পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষনা করেছে। যে কাজ বহুদিন পূর্বে করা উচিত ছিল, সে কাজ যে এত দিন পর-ও যে করা হল, এটা অন্তত মন্দের ভালো।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হ'তে বলা হচ্ছে যে কলিকাতার ও সমগ্র পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিষ্টদের উৎপাতের তীব্রতা কমেছে। এখানে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার সাংবাদিক বৈঠকে প্রথম এই কথা বলেন; পরে মাদ্রাজে গৃহ-মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জীও ঐ একই মন্তব্য করেছেন। এবং এঁদের রিপোর্ট মতে পণ্ডিত জওহরলালও ঐ মত প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতে কম্যুনিষ্ট উৎপাতের দিক থেকে কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলার অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভাল হচ্ছে।

আমরা মনে করি এমনি ধারণা একটি বিপজ্জনক আত্ম-প্রতারণা। অথবা তার চেয়েও গুরুতর অপরাধ সঠিক সংবাদ না রাখার ফলে—বিপজ্জনক অজ্ঞতা। যে কোন সাধারণ লোক মনে করবে, কলিকাতায় ও পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিষ্ট উৎপাত বেড়েছে। সরকারও প্রকারান্তরে একথা স্বীকার করেছে। যদি অবস্থার উন্নতিই হ'তে থাকবে, তবে নূতন করে সাতটি প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করার কি প্রয়োজন এল? এত দিন যে

প্রতিষ্ঠানগুলিকে চলতে দেওয়া হয়েছে, তাদের আজ হঠাৎ বন্ধ করা হ'ল কেন? এতেই প্রমাণ হয় যে অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে সরকারী মহলের উক্তি ভিত্তিহীন—হয় আত্ম-প্রতারণামূলক, নয় ত' অজ্ঞানতা-প্রসূত! আমরা আশা করি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা সরকার তরফ হ'তে উপযুক্ত ভাবে করা হ'বে

কয়েক দিন পূর্বে পশ্চিম বাংলা সরকার এক ইস্তাহার দ্বারা সাধারণকে জানিয়েছে যে কম্যুনিষ্ট উৎপাতের জন্য দুটি বাস (Bus) নির্দিষ্ট রাস্তা পরিত্যাগ করে অন্য রাস্তায় চলবে। আমরা মনে করি সরকারের পক্ষে এই প্রকার দুর্বলতা প্রকাশকরা অন্যায় হয়েছে। এমনি ক'রে এক এক রাস্তায় ওরা উৎপাৎ সৃষ্টি করবে আর এমনি করে সরকারী 'বাস' এক একটি রাস্তা এড়িয়ে চলবে—এই কি সরকারের উদ্দেশ্য? বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে ও অবস্থায় এই প্রকার দুর্বলতা সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে বিপ্লবের পর ৩০ বছর অতীত হলেও ফ্রান্সে একটি রাজনৈতিক দল ভিন্ন অপর দলকে কাজ করতে বা নির্বাচনে দাঁড়াতে দেওয়া হয় না। কংগ্রেসী সরকারের ছোট খাটো এবং কতকটা অনিবার্য বোঝকট নিয়ে যারা এত হৈ চৈ করছে, তারা যেন একবার বিপ্লবী রুষিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে। প্রচলিত সরকারের ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত কেউ করতে পারে না; তেমনি দুঃসাহস যদি কারোর হয়, তবে তা দ্বিতীয়বার ঘটার অবকাশ তার হয় না। ভারত সেখানে পূর্ণ গণ-তান্ত্রিক অধিকার সবাইকে দিচ্ছে। কংগ্রেসী সরকারের তীব্র সমালোচনা অবাধে চলেছে; সরকার তাতে বাধা দেয় না। কিন্তু যারা ক্রমাগত উৎপাৎ সৃষ্টি ও সন্ত্রাস প্রচার করছে, তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে—জনসাধারণের প্রতি কর্তব্যের অপলাপ করা হবে।

পশ্চিম বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন

গত বছর জুলাই মাসে পণ্ডিত জওহরলাল এখানে এসেছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেস পার্টির পরাজয় এর অব্যবহিত পূর্বে ঘটে। ঠিক ঐ সময় কম্যুনিষ্ট দল পর পর কতকগুলির উৎপাত সৃষ্টি করে। এই সব কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বা কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। তাই পণ্ডিতজী বাংলায় এসে সব অনুসন্ধান করেন এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির নিকট তাঁর রিপোর্ট দাখিল করেন। এই রিপোর্টে তিনি বলেন বর্তমান ব্যবস্থা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন নির্বাচন করতে হবে। এই এখানে যখন আলোচনা হয় তখন বোধ হয় যে বাংলার প্রায় প্রত্যেক মহল হতে আপত্তি জানানো হয়। পশ্চিম বঙ্গীয় কংগ্রেসের তরফ হতে যাঁরা পণ্ডিতজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তাঁরা সবাই এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। পণ্ডিতজীর বক্তব্য ছিল এই যে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসীরা নানা ভাবে বর্তমান পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতি তাদের অনাস্থা জানিয়েছে অতএব গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে ভোটারদের মত নূতন করে জানাবার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর এই বিশ্লেষণ ও এই সমাধান উভয়েরই আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর সুপারিস মতে এক দীর্ঘ প্রস্তাব পাশ করে।

পণ্ডিতজীর এই মূল সুপারিসের আনুসঙ্গিক আরও দুটা সুপারিস ছিল। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী ও বঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্যকরি সমিতির-ও পরিবর্তন তিনি প্রস্তাব করেছিলেন। মন্ত্রী মণ্ডলীকে ভেঙ্গে নির্বাচনের জন্য এক নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করা এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির কিছু অদল বদল তিনি সুপারিস করেছিলেন। মন্ত্রী মণ্ডলীর পরিবর্তন ডাঃ রায়ের বিদেশ হতে প্রত্যাগমন সাপেক্ষ মুলতবী রইল এবং ডাঃ রায় বিদেশ থেকে ফিরতে অনেক দেরী করলেন। ইতিমধ্যে এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ যে সব নির্দেশ দিয়েছিল তার প্রায় সবগুলিই উপেক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির যে অদল বদল প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা ছিল প্রধানত আপেক্ষিক এবং কতকটা যেন পক্ষপাতিত্বের দোষারূপ হতে বাঁচাবার সাফাই। এর মাত্র মাস খানেক পূর্বে নূতন কার্যকরি সমিতি গঠিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপবাদ বা বিচ্যুতির অভিযোগ হবারই সুযোগ তখন পর্যন্ত ছিল না

কিন্তু মন্ত্রী মণ্ডলীর সঙ্গে নূতন কার্যকরী সমিতির মত-বিরোধের কথা সবই জানত। একটাকে ভেঙ্গে অপরটাকে অটুট রাখলে হয়ত পক্ষপাতিত্ব হতে পারে, এই আশঙ্কাতেই পণ্ডিতজী কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিরও অদল বদল সুপারিশ করেছিলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের নূতন কর্মকর্তাগণ ঐ সুপারিস অনুযায়ী কার্যকরী সমিতির অদল বদল করতে প্রস্তুত ছিলেন এবং এই উপলক্ষে নানা প্রকার চেষ্টা করেও মন্ত্রী পক্ষীয় কংগ্রেসী মহল হতে কোন সাড়া পান না। এই জন্য উভয় পক্ষকে দিল্লীতে ডেকে নিয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকদ্বয়ও চেষ্টা করেন। কিন্তু মন্ত্রী পক্ষীয় দল তাঁদের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর আর এক অধিবেশনে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্বর্তী-কালীন মন্ত্রীসভা গঠন এবং তদপেক্ষায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অদল বদল করার প্রস্তাব বাতিল করে, নূতন নির্বাচন সম্বন্ধে তখনও বলেন যে যত সত্বর সম্ভব নূতন নির্বাচন হওয়া দরকার। কয়েক দিন হল পণ্ডিতজী এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে নির্বাচন প্রস্তাবকেও বাতিল করলেন। অবশ্য আমরা যথারীতিই জানতাম যখন প্রথম ধাক্কা ডাঃ রায় সামলিয়ে নিয়েছেন তখন যাতে আর নির্বাচন না হয় তার ব্যবস্থা ডাঃ রায় করতে পারবেন। তবুও অনেকের মনে ধারণা ছিল নির্বাচন হবে এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান ঘটেছে এবং আজ বাংলার অধিবাসীরা জেনেছে যে এখন আর কোন নির্বাচন হবেনা। অনিশ্চয়তার অবস্থার চেয়ে ইহা ভাল। সেই হিসাবে পণ্ডিতজীর এই বিবৃতিতে আমরা সুখী হয়েছি।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলবার আছে। কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান থেকে যে প্রস্তাব করা হয়—তার প্রতি দেশবাসী একটা গুরুত্ব আরোপ করে,—তারা স্বভাবতই মনে করে—সব দিক বিবেচনা করে ঐ প্রস্তাব করা হয়েছে। আজ পণ্ডিতজী যে সব যুক্তি দেখিয়ে এই নির্বাচন প্রস্তাব বাতিল করলেন, তা প্রায় সবই তাঁর সামনে এখানে উপস্থিত করা হয়েছিল এবং তার সবই তাঁর ও ওয়ার্কিং কমিটির পূর্বেই অনুধাবন করা উচিত ছিল। পশ্চিম বাংলার গভর্ণরের নাম-ও পণ্ডিতজী এই প্রসঙ্গে এনেছেন। তাঁরও পূর্বাহ্নেই উচিত ছিল—সব দিক বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁর মতামত জানানো। এ সব হয় করা হয় নি, না হয়, এসব যুক্তি তখন উপেক্ষা করা হয়েছিল। তার ফলে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্রীয় সরকার আজ জনসাধারণের নিকট খেলো হয়েছে। আজ যদি লোকে এই ধারণা করে যে অত্যন্ত অপ্রিয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর নেতা ডাঃ রায় প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি;—নিজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছেন—তবে সাধারণ লোকদের দোষ দেওয়া যায় না। যে সব যুক্তি দিয়ে পণ্ডিতজী নির্বাচন প্রস্তাব বাতিল করলেন, সে সব যুক্তি এতই স্পষ্ট যে ঐ সব যুক্তি জেনে-শুনে-ও তাঁরা ঐ প্রস্তাব করেছিলেন।

এর ফলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মর্যাদা বাংলা দেশে কিছু খেলো হ'বে বলে আমরা আশঙ্কা করি। প্রদেশের কংগ্রেস কর্মীদের কাছে আমাদের নিবেদন যে অসুবিধা ও বাধার ভিতর দিয়েই তাদের কাজ করতে হ'বে। উৎসাহের আধিক্যে পণ্ডিতজীর গণতান্ত্রিক মন কতকগুলি বিষয় উপেক্ষা করেই চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎসাহের চেয়ে প্রতিবন্ধক বড় হ'য়ে দাঁড়ালো। হয় ত এটা অদূরদর্শিতার পরিচায়ক; কিন্তু এতে কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক আগ্রহ ও মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅনন্তনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্ত্রিসভা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

অলকা

দ্বাদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৫৬ | দশম সংখ্যা

রক্ত কমল

শ্রীঅরুণ চন্দ্রগুহ

তক্ষশীলার রাজপথের ধারে শিল্পী রঞ্জন বাস করে, তরুণ শিল্পী ; দেহ ও মনে যৌবন ভরপুর, তার উপর আছে শিল্পীর স্বপ্নময় দৃষ্টি, রাজধানীর কোলাহলে সে তখনও হারিয়ে যায় নি, নিজের গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে দেখে পাহাড়ের উপর পাহাড় উঠেছে, মাটির স্বর্গ যেন তারা এড়িয়ে যেতে চায়, মেঘ এসে তাদের শিরে পরাচ্ছে কিরীট—ক্ষণে ক্ষণে যার রঙ্ বাচ্ছে বদলে, রঞ্জন চেয়ে থাকে ঐ মেঘ-কিরীটী পর্বত-শিখরের দিকে ;—আর অবাক হ'য়ে ভাবে, এই রঙের লুকোচুরি খেলার নায়কটি কে, এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড আকাশের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে ;—সে-ই ত' এই বিচিত্র রঙের খেলা খেলছে। যে রঙের খেলা তার নিজের অবয়বে দেখা যায় না—তাই গিয়ে ধরা দিচ্ছে ঐ মেঘের আলিঙ্গনে, নব নব মিলনে নব নব রঙে রাঙ্গিয়ে তুলছে নিজের প্রিয়াকে, আর নিজের দীপ্তিকেও ; কিন্তু নিজে থাকছে অবিকৃত—সেই জলন্ত অগ্নিপিণ্ড, সূর্য ও মেঘের এই বিচিত্র মিলন, রঞ্জনের মনে রঙের তুলি বুলিয়ে যায়।

তাই ত'—তার মনও এমনি ক'রে রাঙ্গিয়ে তুলবে তার প্রিয়াকে নিজের মিলন-আলিঙ্গন দিয়ে।

শিল্পের সাধনায়, যৌবন ছিল ঘুমিয়ে ; সে চেয়ে দেখত না পারিপার্শ্বিক পৃথিবীর দিকে, একদিন যৌবন নিজের দাবী নিয়ে হাজির হ'ল তার মনের দরজায়,...

অস্তায়মান সূর্যের আভা পড়ছে রাস্তার চলতি জনতার উপর, সেই আভায় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল একটি চলতি মূর্তি —মনে হ'ল বিশ্বের দিকে দিকে থেকে সৌন্দর্যের কণা কণা সংগ্রহ ক'রে তৈরী হয়েছে ঐ মূর্তি, চলতি জনতার মাঝে ঘুরিয়ে গেল সেই চলমান যুবতী মূর্তি, শুনেছিল তিল তিল ক'রে সৌন্দর্য আহরণ ক'রে দেবতারা সৃষ্টি করেছিল —তিলোত্তমাকে—অসুরদের মোহিত করবার জন্য, আর শুনেছিল এক যুনানী শিল্পী হেলেনার মূর্তি গড়েছিল কয়েকজন নিরুপম সুন্দরীর এক একটি অবয়ব চয়ন করে। মনে হ'ল—এই মূর্তিও যেন তাই, হয়ত পূর্বেও এই যুবতীর মূর্তি দেখেছে, হয়ত এর চেয়েও সুন্দরী সে দেখেছে ; কিন্তু তার যৌবন সজাগ হয়ে উঠল এই যুবতীকে আশ্রয় করে, তাই তার চোখে সে দেখল জগতের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য সমাচ্ছন্ন হয়েছে ঐ দেহে।

একটা বিদ্যুতের ঝলক খেলে গেল তার মনে, কিন্তু রাত্রির নিদ্রা ও দিনের কর্মকোলাহলে মন যেন সেই বিদ্যুৎ স্পর্শ হ'তে কতকটা মুক্ত হয়েছে। তবুও থেকে থেকে যেন কি একটা প্রতীক্ষার কথা স্মরণে পড়ছে—আর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, আজও আবার তেমনি ক'রে

চলে গেল—সেই যুবতী মূর্তি, আবার তার পর দিন পরদিন। এমনি ক'রে চলল

তখন তার মনে হ'ল—এর আগে হয়ত রোজই ঐ দিয়ে গিয়েছে। ব্যর্থ গিয়েছে ঐ দিনগুলি, বৃথাই তার দৃষ্টি ঘুরে বেড়িয়েছে—ঐ দিনগুলিতে,—যখন ঐ চলমান শ্রী-প্রতিমাকে তার দৃষ্টি ধরতে পারে নি।

দিনের পর দিন গবাক্ষ খুলে সে বসে থাকে একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়, এমনি ক'রে একদিন উভয়ের দৃষ্টির মিলন ঘটল, প্রথমদিন সে যুবতী বুঝতে পারে নি—গবাক্ষপথ দিয়ে যে দৃষ্টি এল সে আকস্মিক কি প্রতীক্ষমান, পরের দিনও এমনি দৃষ্টির মিলন হল;—রাজপথের কোলাহলের মাঝে দুটি দৃষ্টির গোপন অভিসার হ'য়ে গেল। পরদিন সে যুবতী দিয়ে গেল দৃষ্টির আমন্ত্রণ।

আজ সে এসে দাঁড়াল রাস্তার পাশে;—মুগ্ধ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল নারীর মুখের উপর, কিন্তু,...তার দৃষ্টির আলিঙ্গনে ত ঐ মুখে রঙের খেলা ফুটে উঠল না! রঞ্জন একটু আহত হ'ল—কোথায় যেন বেদনা পেয়ে তার দৃষ্টি ফিরে এল, রবিরশ্মির স্পর্শে মেঘ যেমন রঙীন হ'য়ে ওঠে, তার দৃষ্টির স্পর্শে ত' ঐ যুবতীর মুখ রঙীন হ'য়ে উঠল না।

পরদিন সে অনুসরণ করল সেই যুবতীকে। রাজপথ বেয়ে চলছে—শিল্পী তার অভিসারে; আগে আগে চলছে তার প্রিয়া রাস্তার পর রাস্তা পেরিয়ে চলল; এল তারা নগর প্রান্তে। হঠাৎ চমক ভাঙল রঞ্জনের—কোথায় সে এসেছে! এ কে? সে থমকে দাঁড়াল। নারী ফিরে তাকিয়ে স্মিত দৃষ্টি দিয়ে তাকে আহ্বান করল।

বেদনাহত কণ্ঠে রঞ্জন বলল—"কে তুমি, এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে?"

যুবতী হেসে উঠল—সে বলল—"রাজধানীতে বাস করে চেন না আমায়? আমি বিভাবা,

রঞ্জন বলল—"তুমি বিভাবা, নগরের বিখ্যাত গণিকা!"

বিভাবা আবার হেসে উঠল; সে বলল—"এস বন্ধু—এই ত' আমার দীন কুটীর!

ঐ হাসির সঙ্গে ঝরে পড়ল একরাশি শীতল অপমান, রঞ্জনের মুখের উপর, চোখের উপর।

সন্ধ্যার গোধূলি অন্ধকার নেমে এসেছে; তার মধ্যে রঞ্জন চলল নগরের প্রান্ত পার হ'য়ে। আর বিভাবা ফিরে গেল নিজের বিলাস ভবনে। সে গিয়ে ভেসে পড়ল তার নিত্যকার তরল বিলাস স্রোতে; সেই স্রোতের মুখে রঞ্জনের স্মৃতি কোথায় ডুবে গেল।...ঘুরে ফিরে রঞ্জন তার নির্জন নিবাসে গেল, তখন রাত অনেকটা হয়েছে। রাত তার কাটল, একটা দুঃস্বপ্নের মত। প্রভাত এল; রোজই সে নবীন,—নিয়ে আসে ক্লান্ত বিশ্বের জন্য নবীনতার অর্ঘ্য, আজ তার মন নবীন প্রভাতের অর্ঘ্য যেন গ্রহণ করতে পারল না, গ্লানিতে মন ভরে আছে—কিছুতেই যেন মনকে মুক্ত করতে পারছে না, আজ আবার তার মনে পড়ল তার দৃষ্টির স্পর্শে ঐ নারীর মুখ রঙীন হ'য়ে ওঠে নি।

মেঘ সুন্দর, রবিরশ্মিও সুন্দর। তাই উভয়ের মিলনে উভয়ের রঙীন রূপ ফুটে ওঠে। বিভাবার অন্তরে সৌন্দর্য নেই; তাই উভয়ের দৃষ্টির মিলন হ'লেও তাতে রঙের খেলা ফুটে উঠল না। কিন্তু এই সান্ত্বনা দিয়ে ত' সে নিজের মনের তৃষ্টি ফিরে পেল না। এক অস্বোরাত্তির মধ্যে দিন তার কাটছিল। কয়দিন পর বসল সে ছবি আঁকতে; কিন্তু মন বসল না। আবার সে বেরিয়ে পড়ল রাজপথে। ঘুরতে ঘুরতে ভগবান তথাগতের অস্থির ধর্মরাজিকা স্তূপের ছায়ায় সে আশ্রয় নিল; বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বদের জীবনীর পূত কাহিনী মন্দির, মূর্তি ও প্রাচীর চিত্র হতে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই স্নিগ্ধ ছায়ায় নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করল। বোধিসত্ত্ব বেস্সান্তর পুত্র, কন্যাকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন; এবার দেবরাজ শক্র এসে তাঁর স্ত্রী মদ্রীকে প্রার্থনা করলেন। বোধিসত্ত্ব যেন একটু ইতস্তত: করছেন;—সাধ্বী মদ্রী অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন পতির দিকে, একটা পুণ্য প্রভা তাঁর দৃষ্টি থেকে বের হচ্ছে—তার সঙ্গে মিশে আছে—ব্যথার নিবেদন। পতির নির্দেশ হ'ল, চললেন তিনি ব্রাহ্মণবেশী দেবরাজের সঙ্গে,

তাঁর দৃষ্টির পুণ্য-প্রভাও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—অপর দিকে একটা ব্যথার করুণাও ক'রে পড়ছে—আরও তীব্রভাবে।

কিন্তু মন্ত্রী কে? বোধিসত্ত্বের স্ত্রী—তাই ত' তিনি পুণ্যময়ী হয়েছেন বোধিসত্ত্বের সংসর্গে, জনমে জনমে কত জীবন পুণ্য করেছেন বোধিসত্ত্ব! রঞ্জনের জীবনের স্পর্শে কি কারুর জীবনে পুণ্যের আলো জ্বলতে পারে না। অন্তর হ'তে প্রত্যাদেশ এল—পারে।

আবার গেল সে বিভাষার ভবনে—এবার আর বারণা থেকে ফিরল না। বিলাসের উপকরণে সজ্জিত বিলাসিনীর গৃহ, তীক্ষ্ণ পদক্ষেপে সে গিয়ে দাঁড়াল। বিভাষা তাকে দেখে আবার তেমনি হেসে উঠল: বলল—"এসেছ, বন্ধু! আসবে তুমি জানতাম।"

রঞ্জন—"কি ক'রে জানতে যে আসব?"

বিভাষা—"কত দেখেছি তোমার মতো। কাজেই বুঝতে ত' আমার কষ্ট হয় না!"

রঞ্জন—"আর-ও যারা এসেছে। আমি তাদের মত আসি নি। এসেছি—তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। চলো আমার সঙ্গে,—আমি ছবি আঁকব,—মূর্তি গড়ব—আর তুমি ছবির রেশমী পটে ফুটিয়ে তুলবে নানা চিত্র—আর গান দিয়ে বন্দনা করবে ভগবান বুদ্ধের, আর নৃত্য দিয়ে নিবেদন করবে—প্রভুর পায়—অন্তরের সব গ্লানি।

বিভাষা—"আমার এই অবয়ব, এই বাহু, এই অঙ্গুলি কি ঐ সব নিকৃষ্ট সূচি কাজের জন্য?.....তার চেয়ে তুমি এসো আমার সঙ্গে—তোমার যৌবন আছে, সুন্দর দেহ-গঠন আছে; আর আমার আছে অর্থ—আরও অর্থ আমার আসবে—মাসে মাসেই আসবে; তোমায় আমি রাখব আমার অন্তরের বন্ধু ক'রে, বাহিরের বন্ধু যারা আসে তাদের দেখাব তোমার ঐ নব-নীরদ-শ্যাম রূপ, ঐ সুদূর পিয়াসী উদাস চোখ, ঐ তমাল বাহু, ঐ চম্পক অঙ্গুলি;—আর বিনিময়ে পাবে আমার যৌবন, আমার সুন্দর দেহলতা"—ব'লে বিদ্রূপের হাসি হাসল। সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচারিকারাও হেসে উঠল। রঞ্জন বলল—"নারী, তুমি আমায় উপহাস করছ। আমি শিল্পী—আমি সৌন্দর্যের উপাসক। কামাতুর হ'য়ে তোমার কাছে আসি নি;—আমি এসেছি সুন্দরের যিনি শ্রেষ্ঠ, সকল সৌন্দর্যের যিনি উৎস—তাঁর পদপ্রান্তে তোমায় সমর্পণ ক'রে, তোমার অন্তরের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলব।

.....আজ তোমার উপহাস নিয়েই আমি যাচ্ছি।"

বিভাষা—"তুমি সুন্দরের উপাসক,—আমার দেহে কি তোমার দেবতার আবাস নেই! আমি রূপোপজীবিনী,—কি বেসাত নিয়ে আমি বেসাতী করছি, তার কিছু আভাস আমার আছে। আমার এক ভক্ত একদিন বলেছিল—

"অধরং কিসলয়রাগঃ কোমল বিটপানুকারিণৌ বাহু।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবন মঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।"

—আমার নাকি নব পল্লবের মত অধর, নূতন তরুর মত বাহু, কুসুমের মত লোভনীয় যৌবন নাকি সর্বাঙ্গ দিয়ে আছে,—মিলিয়ে দেখ না শিল্পী!"

আবার বিভাষা হেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচারিকাও বিদ্রূপের হাসি হাসল।

রঞ্জন এসেছে বুদ্ধাস্থির স্তূপ থেকে; সেখানে বুদ্ধের জীবনের স্পর্শ পেয়েছে। বিভাষা তার চোখে এসেছিল, যৌবনের মাদকতার আবরণে। প্রথম রাত্রির আঘাতেই তার সেই মাদকতার আবরণে ছিদ্র হয়েছিল। কয়দিন তার কেটেছে বিষাদে ও বিশ্লেষণে। তারপর সে আশ্রয় নেয় ধর্মরাজিকার শান্ত ছায়ায়। সব কিছু সে সমর্পণ ক'রে এসেছে বুদ্ধের পদতলে। তাই বারবণিতার এই অপমান তাকে স্পর্শ করতে পারল না।

রঞ্জন একটু থেমে বলল—"বিভাষা, যে ভক্ত তোমার ঐ রূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি সত্যই বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আরও বলতে পারতেন—"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈর নাবিদ্ধং

রত্নং যদু নবঘনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপম্ অনঘং....."

কিন্তু তা' বলেন নি—কারণ তুমি পুষ্প—কিন্তু অনাঘ্রাত নও, কিসলয়—কিন্তু কর্কশ-কর-স্পর্শে বিদ্ধ হয়েছ, নবরস তোমার মধ্যে আছে, কিন্তু অনাস্বাদিত নয়, অখণ্ড পুণ্যের ফলস্বরূপ, নিষ্পাপ রূপ তোমার নেই। পাপস্পর্শ থেকে মুক্ত যে রূপ নয়, তা রূপই না। তোমার

মনে আলোর স্পর্শ এসেছে অন্তরের সৌন্দর্য তোমার নেই তাই আজও তুমি আমার উপহাস করতে পারলে। তা নিয়েই আমি যাচ্ছি—বিভাবা।"

সে চলে গেল।

সে রাত্রে বিভাবার গৃহের বিলাস-মজলিস যেন তেমন জমল না কোথায় যেন গানের মাঝে একটা সুর কেটে যাচ্ছিল, নূপুরের তাল যেন কিসে বেতালা হ'য়ে যাচ্ছিল।

কয়দিন পর আবার রঞ্জন বিভাবার গৃহে গেল, দিনের আলো তখন-ও নিভে যায় নি। রাত্রির আলোর সজ্জা তখন ও গৃহে জ্বলে নি। এই আলো-আঁধারের সংগমে রঞ্জন বিভাবার গৃহে উপস্থিত হ'ল। সে বলল—"আবার এসেছি, বিভাবা আবার তোমাকে ডাকতে এসেছি।"

বিভাবা একটু হেসে বলল—"বলো।"

নিবিষ্ট আসনে বসে রঞ্জন বলল—"বিভাবা, আর কত দেরী? কবে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

বিভাবা বলল—"আমি ত' যাব না; তুমি কবে আসছ আমার কাছে?"

রঞ্জন—"আমি ত' তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছি বিভাবা! যেদিন তোমার অন্তরের সৌন্দর্য ফুটে উঠবে, সেদিন তোমার হাত ধরে নিয়ে যাব প্রভুর পদপ্রান্তে।"

বিভাবা—"এই যে অন্তরের সৌন্দর্যের কথা বলছ—তুমি দেখেছ একে কখনও? যা চোখে দেখা যায় না, তা নিয়ে তুমি এত ব্যস্ত, আর যে দেহের সৌন্দর্য আমার আছে, তাকে তুমি করছ উপেক্ষা।"

রঞ্জন—"বায়ু দেখেছ, বিভাবা?"

বিভাবা—"না।"

রঞ্জন—"অথচ, বায়ুর স্পর্শ দেহকে শীতল করে, তা অনুভব করতে পার, বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ কানে শুনতে পাও, বায়ুর পা নেই, কিন্তু তার দ্রুত গমনের পদক্ষেপ লুকতে দেরী হয় না, অন্তরের সৌন্দর্যও তাই; দেখা যায় না, অনুভব করা যায়।"

বিভাবা—"তুমি পার তা' আমার অন্তরে ফুটিয়ে তুলতে?"

রঞ্জন—"যদি আমার অন্তরে কোন সাধনা থাকে—শিল্পের হ'ক, প্রেমের হ'ক বা ধর্মের হ'ক—কোন সাধনাই যদি থাকে, তবে তোমার অন্তরের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবই।"

বিভাবা—"কি দিয়ে তা করবে?"

রঞ্জন—"ঐ দেখছ, পশ্চিম গগনে পাহাড়ের গায় মেঘের সঙ্গে সূর্য-রশ্মির আলিঙ্গন হচ্ছে; মিলনের আবেগে উভয়ে রঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। রবি-রশ্মির অন্তরের আবেগে, মেঘগুলোও রঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। এমনি আমার অন্তরের আবেগ দিয়ে তোমার অন্তরকে রঙ্গীন ক'রে তুলব, তোমার অন্তরে নেই রঙের লেশ, সব রঙ্ই রয়েছে দেহে, আমার অন্তর চিরে রঙ্ বের করব; সেই রঙে রাঙিয়ে তুলব তোমার অন্তর।···আগে তা, ফুটিয়ে তুলব পটে; পরে সেই পটের প্রতিবিম্ব পড়বে তোমার অন্তরে।"

বিভাবা—"যে দিন তা' তুমি পারবে, সেদিন তোমার হাত ধরে বের হব—যেথায় তুমি নিয়ে যাবে।"

রঞ্জন—"বেশ, আগামী পূর্ণিমার দিন এই সময় তুমি আমার গৃহে যাবে; সেখানে পটে পাবে তোমার সত্যিকার রূপ, যে রূপ ফুটে উঠবে তোমার অন্তরে।"

বিভাবা—"বেশ তাই হবে।"

* * *

পটের উপর চলছে তুলির লেখা। আদিম মনের আদিম লিখন পদ্ধতি হ'ল চিত্র। যে কথা ভাষায় ফোটে না, তা ফুটে ওঠে তুলির লিখনে, এই লিখন যেমনি আদিম, তেমনি সার্বভৌম;—লিপির লেখার মতো গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশ কালের অতীত সেই লিপি।

সেই লিখনে সে লিখতে লাগল নিজের অন্তরের কথা—সে কথা ফুটিয়ে তুলতে চায় বিভাবার অন্তরে, শিশু শাক্য মাতৃহারা; মহাপ্রজাপতি মাতৃহারা শিশুকে সামনে শুইয়ে রেখেছেন—একটি প্রস্ফুটিত কমলে; আর মুগ্ধ নেত্রে দেখছেন। বিভাবার চিত্র দিয়ে শিল্পী মহাপ্রজাপতির ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন; নিজের অন্তরের রক্তকমলে যেন শুইয়ে রেখেছেন শিশু গৌতমকে।

চিত্রী ধীরে ধীরে আঁকছেন; আজ ত্রয়োদশী। ছবির অবয়ব ও বর্ণরেখা সব হয়েছে, বাকী আছে কেবল বর্ণচ্ছটা,

কমলকে করতে হবে রক্তরঙ্গীন, আর সেই রঙের প্রতিবিম্ব পড়বে গিয়ে বিভাষার মুখে, চোখে, বুকে—যা ক্রমে সঞ্চারিত হবে অন্তরের অন্তঃস্থলে।

নিজের ধমনী কেটে রক্ত বের কর'ল শিল্পী; তাই দিয়ে রঙ্গীন করল কমলকে, সেই রক্ত-রঙ্গীন কমলের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে বিভাষার মুখ মুখে, চোখে ও বুকে, রঙের পর রঙ্ বুলিয়ে যাচ্ছে। অস্তগামী সূর্যের আভা ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দৃশ্য পটে—কেবল ত' বিভাষার মুখে নয়! পদ্মের মধ্যে গৌতমের যে আলো নিহিত আছে, সে আলো বিস্তৃত হয়েছে বিশ্বময়—ওং মণিপদ্মেহুং। সেই পদ্মের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে ছবির সমস্ত পট ভূমিকায়,—যা বিশ্বের প্রতীক হ'য়ে উঠেছে।

চতুর্দশী গেল এমনি ক'রে, এল পূর্ণিমা, ধমনী থেকে আরও রক্ত চাই। পটের পাদমূল ভেসে গেল রক্তে, তার মধ্যে পড়ে আছে শিল্পীর অর্দ্ধচেতন দেহ—হাতে তখনও তুলি ধরা আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনও আসে নি, বিভাষা শিল্পীর ভবনে এসে উপস্থিত হল। তার সেই উদ্ধত গতি আর নেই, এসে সে দাঁড়াল নিজের চিত্রের সামনে। ছবি থেকে মন একটু আলগা হ'তেই, দেখল পায়ের কাছে প'ড়ে আছে শিল্পীর দেহ, হাতে তার তুলি; ধমনী-ক্ষরিত রক্তে সে জড়িয়ে আছে।

রঞ্জন মৃদুস্বরে বলল—"এসেছ বিভাষা?"

শিল্পীর পদপ্রান্তে বসে প'ড়ে সে কেঁদে উঠল, ক্রন্দন-রুদ্ধ কণ্ঠে বিভাষা বলল—"হ্যাঁ, আমি ত' এসেছি; তুমি যে আমাকে ফেলে চললে!"

রঞ্জন—"আমার সাধনা সার্থক হ'য়েছে বিভাষা; তোমার অন্তরকে জাগিয়েছি। তোমায় চেয়েছিলাম আমার নিজের জন্য; পেয়েছি প্রভু বুদ্ধের জন্য। বিভাষা—তোমার মুখের দীপ্তি আমি দেখতে পাচ্ছি; আর আমার কোন দুঃখ নেই। প্রভু বুদ্ধের পায় তোমাকে সমর্পণ ক'রে গেলাম, বিদায় বিভাষা, বিদায় সখী, ঐ দেখ রক্ত-কমল ফুটে উঠেছে দিকে দিকে—প্রভু বুদ্ধের দীপ্তিতে ঐ দেখ, তোমার অন্তর—মুখ, চোখ, বুক—সব রঙ্গীন হ'য়ে উঠেছে। ওং মণিপদ্মেহুং।"

• •

পরদিন তক্ষশীলার বিলাসী ধনী সমাজ স্তম্ভিত হ'ল যখন তারা শুনল নগরের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বিভাষা শ্রমনী সংঘে যোগ দিতে চলে গেছে ধর্মরাজিকা বিহারে।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(অষ্টম পরিচ্ছেদ)

তখন বুয়োর যুদ্ধ চলছিল। প্রধান সেনাপতি লেড্‌ভার্স্‌বুলার সুবিধা করতে পারছিলেন না। লেডী স্মিথ্ অবরুদ্ধ। সেনাপতি হোয়াইট আটক পড়েছিলেন। ইংরেজের পরাজয়ে ভারতীয়দের মনে আনন্দ হচ্ছিল। বুয়ার সেনানী ডিওয়েট চকিতে আক্রমণ ও হঠাৎ নিরাপদ জায়গায় সরে পড়ার যুদ্ধকৌশলে নিজেকে অসাধারণ নিপুন প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড রবার্টস্ প্রধান সেনাপতি পদে গিয়ে যুদ্ধের অবস্থা বদলাতে সমর্থ হন। বুয়ার সেনানায়ক ক্রুগী আত্মসমর্পণ করায় ভারতবাসীরা ভারী মুহ্যমান হন। বিষের জ্বালায় যে ভুগেছে সে চায়না আর কেউ সে জ্বালায় ভোগে। পরাধীনতার খোঁচা ভারতবাসীরা বোধ করছিল বলেই তাদের সহানুভূতি ছিল দুর্বলের দিকে। ইংরেজকে জয়টিকা দিতে এদের মন চাইত না। ওদের জয়টা যেকি ধরণের প্রতিপন্ন করতে বলত। বুয়ারদের জনসংখ্যা যত, তার চাইতে বেশী সংখ্যক সেনা নিয়ে গিয়ে এরা জিতেছে। তবু তিন বছর লড়াই চালাতে পারায় বুয়োরদের বাহাদুরী সপ্রমাণ হচ্ছে। যেমন পূর্বযুগে নেপোলিয়ন ছিলেন ভারতবাসীর কাছে বীরশ্রেষ্ঠ, ওয়েলিংটন নয়, তেমনি এখন হল ডিওয়েট, লর্ড রবার্টস্ নয়।

বুয়োর যুদ্ধ মিটতে না মিটতে চীনে বক্সার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯০০ সালে চীনকে আফিং খাওয়ানোর যে যুদ্ধ আগে হয়েছিল, এটা ছিল এক রকম, তারই জের, চীনকে সপ্তশক্তি ঘেরল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মাণ, ইতালী, রুষ, মার্কিন সবাই তার ওপর হাত সাফ করল। চীনেরা উপদ্রুত হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। শ্বেতাঙ্গরা একযোগে বেচারীর টুঁটী টিপে জব্দ করে দিল। তার মাথায় চাপাল পূর্বত পরিমাণ জরিমানা।

তার আরও জায়গা কেড়ে নিল। ১৯২০ সালে জাপানী ও চীনে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। তাতেও চীন হারে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের কড়া চাপে জাপান বেশী জায়গা নিতে পারল না শুধু ফরমোসা নিয়ে নিল। পোর্ট আর্থার কেড়ে নিল।

এই যে সব যুদ্ধ এধার ওধারে হচ্ছিল তার একটা প্রভাব ভারতবাসীর মনে পড়ছিল। সূক্ষ্মভাবে তার আরম্ভ, ফুলে ক্রমশঃ তার প্রকাশ। এটা যেন অভিনয়ের পূর্বে সাজ-ঘরের সাড়া-শব্দ।

আমি মেদিনীপুর রওনা হলাম। মেদিনীপুর পর্যন্ত রেল তখনও খোলে নি। ষ্টীমার কলকাতা থেকে মেদিনীপুর যেত। আমি নৌকায় আগে আগে মেদিনীপুর

এবার গেলাম ষ্টীমারে। কলকাতার আরমানী ঘাট থেকে ষ্টীমার উলুবেড়ে অবধি গিয়ে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিত সেচ্ বিভাগের লক্-গেট-ওলা খালে জন্য ষ্টীমারে চড়তে হত।

উলুবেড়েয় নেমে ষ্টীমার পরিবর্তন করে বসতে না বসতে খাবার-ওলারা খাবার বেচতে এল। লোক কিনে কিনে খেতে লাগল। এরপর এল একটি লোক, সে আমাকে বলল—বাবু, কলকাতা থেকে এসেছেন, বড্ড গরম হয়েছে, একটি ডাব খান। ডাব নিলাম, ভাবলাম ষ্টীমার কোম্পানী কত ভদ্র! কি সুন্দর ব্যবস্থা! গরমে প্যাসেঞ্জারের কষ্ট নিবারণের জন্য ডাবের বন্দোবস্ত রেখেছে।

যে লোকটি ডাব বিতরণ করছিল সে বেছে বেছে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কয়েকজনকে ডাব বিলিয়ে চলে গেল। কি সুন্দর তার বলার ধরণ! কি মিষ্টি তার আওয়াজ! ঠিক যেন মাসীমাটি! বোনপোরা রোদে পুড়ে হয়রাণ হয়ে এসেছে, তাদের তদ্বির যেমনটি করতে হয় ঠিক তেমনটি করে গেল।

তারপর একটি অন্ধ এল, সে গান ধরল—"কত রঙ্গ জানো তুমি কালী গো, কারো দুধে চিনি দাও মা, কারো চোকে বালি গো!" লোকে হয়রাণ হয়ে এক আধটা পয়সা দিয়ে তাকে বিদায় করল।

একটি মাত্র বয়সী লোক একটি পুঁটলী খুলে জলখাবার বার করল। খান কতক রুটী ও চারটি চিনির মুড়কী। যত মুড়কি ছিল তার চতুর্গুণ পিঁপড়ে তাতে ভরে রয়েছে। বেচারী ফুঁ দিয়ে দিয়ে ঝাড়তে লাগল আর বলতে লাগল—"ঐ শালা, অন্ধের কর্ম, এইগুলি চালান করে দিয়ে গেছে। ওর নাম গান, না, বান মারা! গলা দিয়ে রক্ত বার করার যন্ত্র বেড়েছে। কচু করবে, আমার কচু করবে। আমিও হাড়ী কী, চণ্ডীর আজ্ঞায় এদের তাড়াব। থাক এখন সব। চুলোয় যাক্। ওর মুণ্ড পাত করে তবে মুখে জল দেব।" মুড়কি ও রুটির পুঁটলীটি আছড়ে জমীতে রাখল। নিজের প্রায় তলাহীন জুতোর চামড়া থেকে ধুলোমাটি কিছু সংগ্রহ করে চোখ বুঁজে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে অন্ধ যে জায়গাটিতে বসে ছিল জোরে তার উপর ছুড়ে মারল। তারপর গম্ভীর ভাবে বলল—দাঁত ভেঙ্গে পেটে সেঁধিয়ে যাবে। আর গান গাইতে হবে না:

সবাই উদ্ব্যস্ত হল ব্যাপারখানা কি জানবার জন্য। সে লোকটি বলল ওদের গুষ্টিটাই এমনি। সেদিন আমাদের তিন একটা ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, উলুবেড়ের ইলিশ, বিখ্যাত, একদম গঙ্গার চাটকা। আঁশ চক্‌চক্ করছে। যেন নতুন দু'আনি ছিটকে পড়ছে। তখন ছোট ছোট রুপোর দু-আনি ছিল। ল্যাজটা দশাই বেঁকে আছে। যেন এইমাত্র রাজা রামচন্দ্র নৌকো থেকে নেমে গেলেন। তাঁর আশীর্বাদ উঁচিয়ে রয়েছে। মাথাটি যেমন হতে হয়, কানচের ফাঁকে লাল টক্‌টকে জবার মত সব দেখা যাচ্ছে। কচু শাকের ডাটা দিয়ে কি চমৎকার ঘণ্ট হবে। মাছ দেখে, কচুশাক হাতে নিয়ে আমার দিদি

শাশুরী আগে মাছ আইবে, না কচুশাক কুইবে, ঠিক করতে না পেরে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে গেল। তার সাতাশ বছর বয়সে অষ্টম গর্ভের সন্তান, মশাই, তিন মাসে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অঙ্গ সব গড়ে উঠেছিল। কি সুন্দর চোখ! নাকটি একটু চেপা, তার শোক উথলে উঠল। বেচারী গাই চেঁচানো চেঁচাতে লাগল—"ওরে চ্যাপারে, তুই যদি সময়ে জন্মাতিস বাবা, আজ ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুশাকের ঘন্ট খেতিস্।" তাকে সামলান যায়। হাজার হোক পুত্রের শোক তো! কাঁদবেনা? অষ্টম গর্ভের সন্তান।

এই বিবৃতির আনুপূর্বিক সঙ্গতি সকলের বোধগম্য বোধ হয় হল না। কে একজন জিজ্ঞেস করলেন তাতে অন্ধ বেচারীর কি দোষ হল?

'কি দোষ হল?' বলে লোকটা খিচিয়ে উঠল। "কোন গুণটা হল শুনি? ওর মা কান্না শুনে ছুটে গেল, এ কানা, সে আবার খোনা," কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—"ও গঙ্গাজল, কেঁদে আর নাকের জল চেখের জল এক করিস নি।" লোকটি একটু দম নিল। তারপর বলল—"ঢেঁটি বেটী নিজের নাক ঝেড়ে আমার দিদি শাশুড়ীর কাপড়ে হাত মুছে নিল। তারপর মশাই সে মাছ যে খেয়েছে, তারই ওলাউঠা, দিদি শাশুরী আমার মারা গেছে।"

লোকটির মর্মবেদনা এতক্ষণে যাত্রীরা বুঝল। এইবার জাহাজ ছাড়বে। প্রথম সিটি বাজল। "হাপুর, হাপুর" করে ইঞ্জিন আওয়াজ করতে লাগল। এমন সময় সেই ডাব-ওলাটি এসে হাত পাততে আরম্ভ করল। ডাবের দাম। আমি দাম দিলাম। বোধ হয় বিরক্ত হয়ে দাম লোকে দিল। সে চলে গেলে ষ্টীমার ছেড়ে দিল। একজন বলল, "কি মারাত্মক এ লোকটা! মেরে মানুষের কান কেটে দেয়।" আর একজন বলল—আমরা ভেবেছিলাম ষ্টীমার কোম্পানীর লোক খাতির করছে। বেটা চোট লোক।"

জাহাজ চলল, এটা এক্সপ্রেস। তাড়াতাড়ি যায়। আর একটা ছাড়ে অর্ডিনারি, দেরীতে পৌছায়। এটার ভাড়া একটু বেশী। ফুলবেড়ের লক্-গেট পৌছবার আগে দামোদর নদী পার হওয়া গেল। বড় আঁসটে গন্ধ আসছিল। লোকে বলাবলি করছিল এখানে ভারী কুমীরের ভয়। ক্রমে ফুলবেড়ের লক্-গেটে ষ্টীমার ঢুকল। দুটো জব্বর দরজা গেটে থাকে। একটা দিয়ে ঢুকতে হয়, অপরটা দিয়ে বেরুতে হয়। কলকাতার দিক থেকে ক্রমশঃ উপরে ওঠা হচ্ছে এপথে গেলে বেশ বুঝা যায়। দুই ফাটকের মধ্যে জল উঁচু লেভেলে আটকান থাকে। প্রথম মুখের দরজা একেবারে খোলা নিয়ম নয়। চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটা একটা করে কাঠের পাটাতন দরজার মাপ থেকে ওপরে তোলা হয়। প্রতি পাটাতন দরজার থেকে গা ঘেঁসে হুড়কে ওপরে ওঠার সঙ্গে দরজার গায়ে ফাঁক হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে খুব জোরে শব্দ করতে করতে জল বেরিয়ে আসে। ক্রমে চারটা পর্যন্ত পাটাতন সম্মুখের দুটো দরজা থেকে তোলা হয়। ভিতরের ধরা জল বেরিয়ে এসে ষ্টীমার বা নৌকো যে নীচু লেভেলে আছে তার লেভেল গেটের ভিতরের জল প্রাপ্ত হয়। তখন ঘরের দরজার মত দুটো দরজার পাট লক্ খালাসীরা ঠেলে খোলে! ষ্টীমার প্রভৃতি ভিতরে যায়। এ মুখের দরজার দুপাঠ আবার বন্ধ করা হয়। উঠানো পাটাতন নামিয়ে ছিদ্র বন্ধ করা হয়। লকের মধ্যে ষ্টীমার বা নৌকো যেন পাতালে আছে মনে হয়। তারপর অপর মুখের দরজার পাটাতন পূর্বমত তোলা হয়। কেনিল হয়ে অতি জোরে এবং প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ওধারের জলধারা লকের মধ্যে প্রবেশ করে। ক্রমশঃ ষ্টীমারাদি উঁচুতে উঠতে থাকে। তারপর যখন লকের ভিতরের জলের লেভেল বাইরের জলের উচ্চতার সমানতা লাভ করে তখন দরজার দুপাঠ খোলা হয়। ষ্টীমারাদি বাইরে চলে যায়। গেটের কপাট বন্ধ করা হয়। নতুন নতুন এই বারিপ্রপাত দেখতে, তার গর্জন শুনতে, প্রবলবেগে বারিপতনে এক অবিরাম উত্তেজনা ও আনন্দের অনুভূতি হয়। এখানে টোল অফিসও আছে। পারাপারের মাশুল এখানে আদায় হয়। সেটা সরকারী তহবিলে যায়।

(ক্রমশঃ)

হারাণো তারা

মন্মথ রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিষাণ বুঝল এ বাড়ীতে তার থাকা চলে না—এ বাড়ীর প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে উর্বশীর স্মৃতি ভেদে বেড়াচ্ছে—এবং তাকে পীড়া দিচ্ছে। সাতটি দিনে সাতটি রাতে আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ঐন্দ্রজালিক দীপ্তি দিয়ে তার দেহমনে সে যে রঙ ধরিয়ে গিয়েছিল—সে চলে গেছে—কিন্তু সে রংএর রেশ যায় না তো! তার গৃহ ছিল না—সংসার ছিল না—হঠাৎ এসে রচনা করল সে সেই গৃহ—ছটি পাখীর মতো ছোট্ট একখানি নীড়—ছবির মতো একটি সংসার—কে বলেছিল তাকে এসব করতে! তার মন নিয়ে সাতটা দিন ছিনিমিনি খেলে সে ছদ্মহীন অভিনেত্রীর মতোই অভিনয় করে চলে গেল! আগুন জ্বেলে দিয়ে সকৌতুকে চলে গেল সে—কিন্তু পুড়ে মরছি আমি! আর টিকতে পার্ছি না—এই গৃহে সর্ব্বত্র তার স্মৃতি—চার দিকেই উর্বশী—সবখানেই তার চিহ্ন—কিন্তু সবই—সবই তাকে ব্যঙ্গ করছে,—কেবলি মনে হচ্ছে চারদিক থেকেই সেই ছদ্মহীনা অভিনেত্রী সকৌতুকে বলছে—"আপাখারাপ আপাখারাপ—লোকটার মাথা খারাপ—" হঠাৎ জানলা-পথে বিষাণের চোখে পড়ল মোক্ষদা কুলের চারা গাছে জল দিচ্ছে—উর্বশী যা পুতে গেছে—"কেন দিচ্ছ জল ওসব আগাছায়?—বিষাণ গর্জ্জে উঠল।

এমনি করে দিন যাচ্ছে—বিষাণ লম্বা ছুটির জন্য দরখাস্ত লিখেছে—চলে যাবে—সে চলে যাবে—কোথায় যাবে সে জানে না—কিন্তু এখানে সে থাকবে না—ছুটি তার চাই-ই চাই—সে দরখাস্ত লিখেছে—এমন সময় হাতে একটি সুটকেশ পরণে সুট এক আধাবয়সী ভদ্রলোককে নিয়ে মোক্ষদা এসে দাঁড়ালো—

"কলকাতা থেকে বাবু এসেছেন—মোক্ষদা বলল। বাবুটি একটি কার্ড—বিষাণকে দিলেন—

দেখা গেল তাতে লেখা—

মিষ্টার মাণিক জহুরী—

ক্যালকাটা নভেলস—

ক্যালকাটা।

মিষ্টার মাণিক জহুরী প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিলে সত্যই তার পূর্ব্বপুরুষ জহুরী ছিল—রতন চিনতো—এখনও অবশ্য সেই ব্যবসাই তার—তবে ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। ক্যালকাটা নভেলস এর প্রস্তাব সে বিষাণ বাবাজির কাছে—সোৎসাহে উত্থাপন করে বলল—"চলুন"।

বিষাণ তাকে জানিয়ে দিলে—স্পষ্ট জানিয়ে দিলে "মাপ করুন। উর্বশী দেবী আমাকে যথেষ্ট বাঁদর নাচিয়ে গেছেন, এমন নাচ নাচিয়েছেন যে খোঁড়া হয়ে পড়েছি। চলবার ক্ষমতা আর নেই।

মিষ্টার জহুরী বললেন "আজ্ঞে, আপনার এ অভিমান হতেই পারে। কিন্তু আপনাদের প্রেম নিয়ে তিনি গল্প রচনা করেছেন। সেই বই টকি হচ্ছে, এবং আপনিই আপনার ভূমিকায় নামবেন—এবং রাতারাতি ষ্টার হচ্ছেন—এবং বেতনও হচ্ছে ৩০০৲—

উঠুন—চলুন—"

"বরং আপনি উঠুন। এবং গিয়ে বলুন—উর্বশী দেবীকে আমি খুব চিনেছি—তাঁর সঙ্গে আর নয়। তিনি আমার—গল্প আমার হলেও ক্ষতি ছিল না—স্বর্গে আমার যে মা রয়েছেন—আমার সেই মার—যে অপমান করেছেন—যদি আমি তাকে কোনদিন পাই—"

"আর কেন অভিমান কর্ছেন! যদি তাকে কোনদিন পাই কেন আজই পাচ্ছেন। আপনি উঠলেই হয়!"

মিষ্টার জহুরী চোখের একটা খেলা খেলে বললে—।

আপনি উঠুন—

উঠুন—

"Get out—"বিষাণ গর্জ্জে উঠল—।

"কামড়াবে নাকি!" সভয়ে মিষ্টার জহুরী ছুটলেন

—সোজা ষ্টেশনে—এবং একটা খাবারের দোকানে উঠে—প্রথমেই চাইলেন একগ্লাস জল—জল খেয়ে—তাঁর প্রথম কথাই হল "একেবারে ক্ষেপেছে তোমাদের ছোট বাবু ওকে ধরে পাগলা গারদে পাঠাও—নইলে কোন দিন কামড়াবে যে।"

এদিকে উষসী কিন্তু পরম আগ্রহে বিষাণের প্রতীক্ষা করছে—খুব ভোরে সে উঠেছে—আজ নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসেই সে আসবে—সে নিশ্চয়ই তার এখানে এসেই উঠবে—হ্যাঁ মিষ্টার জহুরীর কাছে সে ঐ কথাই বলবে—"না মশাই, হোটেল নয় আমার বাড়ীই রয়েছে—জানেন না তো উষসী আমার কে।" সঙ্গে সঙ্গে উষসী তার হাতের বালাজোড়ার পানে চাইলে—। উষসী তার সহচরী দাসী মালতীকে ডেকে বলে দিয়েছে আজ আমার এক পরম বন্ধু আসছে—তার জন্য ঐ ঘরটা—না—নঃ—ছাদের ওপরকার ঐ ঘরটা—সাজিয়ে রাখবি—তাকে সাজিয়ে রাখতে বলেছে বটে—কিন্তু তাকে কিছুই করতে না দিয়ে সাজিয়েছে সে নিজে। উষসী জানে বিষাণ কি খেতে ভালোবাসে—কাল থেকে তা যোগাড় হচ্ছে—মালতী আর কখনো উষসীকে এমন ব্যস্ত এমন চঞ্চল দেখে নি।

উষসী ঘড়ির পানে তাকিয়ে রয়েছে—এক্সপ্রেস এল তার পর একঘণ্টা—দুঘণ্টা কেটে গেল বিষাণ এল না।

উষসী স্পষ্ট বুঝলে এ তার অভিমান—তাই সে উষসীর এখানে উঠল না! অভিমান! অভিমান উষসীও করতে জানে। সে তো বিষাণকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চেয়েছিল কেন সে জোর করে তাকে টকিতে নিয়ে গেল। সে তো যেতে চায়নি! কিন্তু গিয়ে যদি দেখে তাকে অপমান করা হয়েছে—সে দেশবিখ্যাত ষ্টার—কী ক'রে সে ঐ অপমান হজম করে! কিন্তু আজ যখন তার হৃতমান লুণ্ঠিত সম্মান সে পুনরুদ্ধার করতে যাচ্ছে বিষাণেরই গল্পের মধ্য দিয়ে—বিষাণ কেন আসবে না! উষসী ভেবে দেখেছে এ ছবিতে সে যা করবে কারো কোন দিন সাধ্য হবে না তা করে। নিজের ছবি, নিজের গল্প, নিজের প্রেম সে রূপ দিচ্ছে যাকে তার ভাল লেগেছে, যাকে তার জীবনের সাথী করেছে তাকে নিয়ে তার সঙ্গে এ ছবিতে। এই একটি ছবিতে উষসী বাংলোপ্রোপ জগতকে দেখিয়ে দেবে—উষসী কত বড়! উষসী কত বড়। এবং তা দেখিয়ে দিয়েই আর নয়—আর নয়—আর কোন ছবি নয়—আর কোন অভিনয় নয়—অভিনয়ে অভিনয়ে ক্লান্ত সে—শ্রান্ত সে—অভিনয়কে সেলাম ঠুকে—বিষাণের হাত ধরে সে চলে যাবে মধুপুরের এক পাহাড়ের ধারে কোনো ঝর্ণার পার্শে ছোট্ট একখানি বাংলো বেঁধে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে—বিষাণ আর সে। সে যা সঙ্কল্প করেছে দুজনের স্বচ্ছন্দে চলে যাবে—বিষাণকে দিয়ে সে কবিতা লেখাবে, বিষাণকে দিয়ে সে ফলের চাষ করাবে—উষসী দেখে এসেছে ফুলের গাছের ওপর ফুলের ওপর বিষাণের কি ঝোঁক। সঙ্গে সঙ্গে উষসীর মনে পড়ল ক্রিসেন্থিমামের চারাগুলো সে যা বিষাণের আঙ্গিনায় লাগিয়ে এসেছে আজ কি তাতে ফুল ফুটেছে? সেই কাজলী আর শ্যামলী গাই দুটি সে যা কিনে রেখে এসেছে, যাদের নিজে হাতে খাইয়েছে, দুধ দুয়েছে—কী ভালোই লেগেছিল ঐ গাই দুটি আজ সেই গাই দুটিকে খেতে দিচ্ছে কে? তাদের দুধ বিষাণ খাচ্ছে তো?

কত কথা—কত কথা। আর কত কথা উষসীর মনে পড়ছে। এমন সময় খাতাপত্র হাতে গণেশবাবু এলেন। শুনেছেন বিষাণ আসে নি। এবং আসে নি কেন, তা শুনেছেন?

কেন? কেন? উষসী কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—

"আপনি তাকে অপমান করে চলে এসেছেন।"

"অপমান!"

"হ্যাঁ, অপমান।

আপনার মুখ সে আর দেখবে না—জীবনে দেখবে না—তার জীবনে আপনার কাহিনীতে সে ইতি লিখে দিয়েছে। জহুরীর কাছে শুনলুম।"

"ইতি।" উষসী হেসে উঠল। "ইতি না সবে হল সুরু! এখনি ইতি!.....আসবে না বলেছে! হাঃ হাঃ হাঃ আমি একখানা চিঠি পাঠালেই next train এই, বুঝেছেন গণেশবাবু আর যদি আমি নিজে যাই—না না—

সে একটা দুর্ঘটনাতে উর্বশী বিস্ময়ের মতো বলল।

তো! আপনার একটা প্রেস্টিজ আছে তো! যে সব কাণ্ড আপনি ঐ তিরিশ টাকা মাইনের সিগ-ন্যালারটির সঙ্গে করে এসেছেন—কি করে যে করলেন আমি ভেবে পাই নে উর্বশী দেবী!"

"স্রেফ অভিনয়। অভিনেত্রীদের অনেক কিছুই করতে হয়েছিলাম বলেই তো এমন সুন্দর একটা আমার হয়ত সে সব হয়েছে অভিনয়—কিন্তু তাকে যা কিছু দেখেছি—সে যা কিছু করেছে—যা কিছু বলেছে—সে তো আর অভিনয় নয়। এবং তা নয় বলেই আমি জানি—সে আসবে—তাকে আসতেই হবে—সে এল বলে! আমি ষ্টুডিয়োতে গিয়ে ওদের বলছি সে না এসে পারে না—আমি এনে দিচ্ছি।

উর্বশী ষ্টুডিয়োতে গিয়ে শোনে বড় সাহেবের ঘরে কি জরুরী মিটিং হচ্ছে—ডাইরেক্টার প্রোডিউসার—ম্যানেজার—সবাই সেখানে।

উর্বশী দেখল কুসুম আসছে—কুসুমের আজকাল বেশ একটু চাল হয়েছে, উর্বশীকে যেন দেখেও দেখেনি—এই ভাবে কুসুম চলে যাচ্ছিল—তার পিছে পিছে চার পাঁচটি ছেলে ছুটছে—উর্বশী দেখেই বুঝল ওরা স্কুল কলেজের ছেলে—অটোগ্রাফ হান্টারস্—

উর্বশী ইচ্ছা করেই একটু এগিয়ে দাঁড়াল।

"এই যে কুসুম—খবর কি?"

"এরা আমার life miserable করে তুলেছেন।"

"অটোগ্রাফ?" মৃদু হেসে উর্বশী বললে।

"অটোগ্রাফ দিয়েছি, এখন চাইছেন ফটোগ্রাফ। ভালোকথা, আপনারা এঁকে চেনেন?—উর্বশী দেবী—আপনাদের হীরো—এর ফটো নিন না—" "বেশ তো, নেব আপনার ফটো চাই-ই।"

"আপনারা আমার মেরে ফেলবেন দেখছি—"কুসুম আবার ছুটল—পেছনে পেছনে উৎসাহী ছেলেরাও ছুটল।

উর্বশী চমকে উঠল।

মিষ্টার জহুরীর সঙ্গে দেখা—উর্বশী লক্ষ্য করল—জহুরী যেন তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে—ভারী ব্যস্ত সমস্ত হয়ে—

মিঃ জহুরী! মিঃ জহুরী! উর্বশী ডাকলো।

ও—আপনি! জহুরী কাছে এসেই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল "কিসব অপমান আপনি সেই ছোকড়াটিকে করেছেন আপনি জানেন—কিন্তু এখন ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাকে। আনতে গিয়েছিলাম—আমায় কামড়াতে এল—বলে রেখেছিল আপনার উর্বশী। উর্বশী তো নয়, সাক্ষাৎ রাক্ষসী—তার সঙ্গে করব পার্ট—মাপ করুন। দেখলুম একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ফিরে এলুম। কর্তাদের মিটিং হল—হুকুম হল আবার যাও—তাই যাচ্ছি—এখনি আসাম মেলে—

"গিয়ে আর লাভ কি! ভীষ্মের যখন প্রতিজ্ঞা—আপনারা বরং একটা অর্জুন টর্জুন ধরে আনুন—"

"হ্যাঁ, একটা কিছু করতে হবে—একটা কিছু করতে হবে—আচ্ছা আসি—নমস্কার—"

"চললেন যে!"

"হুকুম। কড়া হুকুম। আসাম মেলেই ছুটতে হচ্ছে—আক্কেলপুর—"

"দেখছি আক্কেল এখনো হয়নি।"

"না"—জহুরী ছুটে চলে গেল।

উর্বশী কিন্তু খুশীই হল। এরা আবার লোক পাঠাচ্ছে। এবার সে নিশ্চয়ই আসবে।—

উর্বশী ভাবলে বাড়ী ফিরে সে বিষাণকে একটা wire কর্ব্বে। একটা romantic wire "পথ চেয়ে বসে আছি" এমনি একটা কিছু।—ভাবতে ভাবতে ঘরে গিয়ে গোপনে সে টেলিগ্রামের খসড়া করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার টেলিগ্রাম করা আর হল না। "আমি টেলিগ্রাম করে তাকে ডেকে আনব—তবে সে আসবে।" কেন, আমি কি এতই তুচ্ছ! করব না আমি টেলিগ্রাম। দেখি সে আসে কি না।"

আসাম মেলে মিষ্টার জহুরী আবার বিষাণের ওখানে গিয়ে উপস্থিত।

"নিন, এইবার উঠুন।—না না—আপনি আগেই ক্ষেপবেন না—উর্বশীর ভূমিকা উর্বশী দেবীকে না দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কুসুম রায়কে। নিন, হল তো?

কোন কুসুম? যে মেয়েটির Second Lead ছিল—চমৎকার নাচে চমৎকার গায়—এবং দেখতেও আপনাদের অনেক নাম করা হীরের চেয়ে ঢের ভালো—সেই কুসুম?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আমি যাব। নিশ্চয় যাব। উর্বশী দেবী দেখুন—তাকে বাদ দিয়েও জীবন চলে, চলতে পারে।

চলুন—হোটেলে চলুন—সেখানে খেয়ে—এক্সপ্রেসেই—আসুন—জহুরীকে হাতধরে টেনে নিয়ে বিষাণ বেরিয়ে গেল।—

ষ্টুডিয়োতে টেলিগ্রাম, কালই টেলিগ্রাম এসে গেছে—বিষাণকে নিয়ে জহুরী আসছে।

আজ ষ্টুডিয়োতে বৈকাল ৪টাতে মিটিং। কর্তৃপক্ষ বিষাণ বানার্জীকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন—এবং নতুন বইএর Casting announce করে পার্ট দিয়ে দেওয়া হবে। এই মর্মে সব অভিনেতা অভিনেত্রী এবং অন্যান্য শিল্পীদের পত্র দেওয়া হয়েছে।

উর্বশী আজ সকালেও আশা করেছিল বিষাণ এসে হয়তো তার এখানেই উঠবে—

ট্রেণের সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে সে ষ্টুডিয়োতে প্রিয়তমকে ফোণে ডেকে যখন জানলো বিষাণ এসেছে এবং হোটেলে উঠেছে—সে প্রিয়তমকে বললে আমার বাড়ীর পথ ভুলে গেছেন দেখছি। কই, এদিকে আর আসেন নাতো! আপনার রজনীগন্ধা বুঝি আর ফুটছে না? কি? গাছই মরে গেছে? আসুন না একবার,—সব শুনব এখন।

উর্বশী আজ অসম্ভব রকম প্রসাধন করলে। খুব দামী শাড়ী পড়লে। একটু বেশী রকম গয়না পরলে। আয়নাতে বারে বারে চেয়ে দেখতে লাগল—হ্যাঁ, চলবে।

বিজয়িনীর মতো উর্বশী বেরিয়ে গেল—গেল ষ্টুডিয়োতে।

উর্বশী গিয়ে দেখে লনে (Lawn) পার্টির ব্যবস্থা হয়েছে সবাই বসেছে। চার দিকে একবার চেয়ে দেখল—বিষাণ নেই। প্রিয়তমের সঙ্গে দেখা হল। অন্যান্য আলাপের পর প্রিয়তম বললে "না, গেরো ভূতটিকে এখনো দেখি নি। শুনলাম Bossএর ঘরে—Bossএর সঙ্গে আলাপ কর্ছে। লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখে হেসে বাঁচিনে—স্পষ্ট বলেছে তোমার সঙ্গে play করতে হলে সে play করবে না। আমি হলে কেঁটিয়ে বিদায় কর্তেম।

উর্বশীকে আরো অনেকে এ কথা জানালো—।

উর্বশী দেখল এ কথা সবাই জানে। "আমার সঙ্গে play করতে হলে সে play করবে না—"এমন অসম্ভব কথা, এমন আস্পর্দ্ধার কথা জীবনে সে শোনে নি হয় তো এ তার অভিমান—কিন্তু তবু—লোকে তো তা বুঝবে না।

উর্বশীর মনে পড়তে লাগল তার সঙ্গে play করবার জন্য কে কি রকম তপস্যা করেছে—ঐ অর্জুন রায়—ঐ প্রবীর চৌধুরী—ঐ কুনু বোস—ঐ মায়াতরু মিত্র—মায়াতরু তো মুইসাইডই কর্তে গিয়েছিল—আজ তারা কি ভাবছে!

যা ইচ্ছা ভাবুক। ইংরেজীতে একটা কথা আছে He laughs best who laughs last. সবার শেষে উর্বশীই হাসবে—যখন সবাই দেখবে বিষাণ বানার্জি তার জন্য কেমন পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। "পার্ট করবে না—আমি play করলে বিষাণ part করবে না!" উর্বশীর ইচ্ছা হচ্ছিল—সে সবার সামনে এখনি চেঁচিয়ে বলে "দেখবে এখন, part করে কিনা। বরং আমি যদি বলি part করবো না—নামিয়ো দেখি তাকে - এই বই এ!"

উর্বশী চেঁচিয়ে না বলুক—এ কথা সে হেসে—গর্ব্বদৃপ্ত ভঙ্গীতে দুচার জনকে না বলে পারল না!

একথাটার ওপর বিশেষ কোন মন্তব্য না করে এরা সকলে বিশেষ করে যে জিনিষটা উর্বশীর কাছে সন্দিগ্ধ মুখে উল্লেখ করল—সেটা হচ্ছে উর্বশীর অসাধারণ সাজ সজ্জা—আজ। "ব্যাপার কি? রুজ—লিপষ্টিক্—পাউডার এত বেশী দিয়েছ যে—বড্ড চোখে লাগছে—কেন বলত? কুসুম তো স্পষ্ট মুখের ওপর শোনালে। হঠাৎ বিশেষ বাদ্য ধ্বনি Bossএর আগমনী ঘোষণা করল। Boss এলেন—সঙ্গে বিষাণ বানার্জি—। সকলে ঘন ঘন করতালি করতে

লাগল। কিন্তু উৎসী না—। উৎসী শুধু একবার চেয়ে দেখল।

"বন্ধুগণ—" Boss সুচিত্র রায় সুরু করলেন—"ইনি বিষাণ বানার্জি—" ইত্যাদি। এবং একে একে সবার টেবিলের কাছে নিয়ে তাদের সঙ্গে বিষাণকে পরিচয় করে দিতে লাগলেন। ক্রমে উৎসীর টেবিলে এসে তাঁরা

"আশা করি এর সঙ্গে আপনার আর পরিচয় করে দিতে হবে না—" সুচিত্র রায় হাসতে লাগলেন।

"না, ধন্যবাদ—ওঁকে আমি ভালো করেই চিনি।"—বিষাণ অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে।

"যাক্ তাহলে উনি অবশেষে আমাদের মধ্যে এলেন! উৎসী যেন মিষ্টার রায়কেই বললে।

কিন্তু জবাব দিল বিষাণ—

হারাণো লোক—এরা ধরে নিয়ে এলেন।"

"আপনি এটাকে asylum বলবেন না!" উৎসী হেসে বললে।

asylumএ মিথ্যা কিছু নেই। এর আগা গোড়াই মিথ্যা!"—একটু শ্লেষের সঙ্গেই বিষাণ উত্তর দিল।

মিঃ সুচিত্র রায় চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন—"আগা গোড়াই মিথ্যা! মানে?"

"কারণ আগা গোড়াই অভিনয়।"—বিষাণ চকিতে উৎসীর দিকে একটা তীব্র দৃষ্টি হেনে বলল।

"ও—হা—তা বটে!" হাসতে হাসতে মিষ্টার রায় বিষাণকে নিয়ে অন্য টেবিলে চলে গেলেন।

উৎসব শেষে আজই নতুন বই এর casting বিতরণ হচ্ছে।—সবাই হলঘরে এসে বসেছেন।—মিষ্টার সুচিত্র রায় ঘোষণা করলেন—আপনারা জানেন এছবির উৎপত্তি হচ্ছে কেন। বিখ্যাত অভিনেত্রী উৎসী দেবীর আকস্মিক অন্তর্ধানে সারা দেশে যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল—যেরূপ রোমাঞ্চকর জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি হচ্ছিল—তাঁর অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারেও তা কিছুমাত্র না কমে বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাচ্ছে। টেলিগ্রাম টেলিফোনের তো অন্তই নেই—চাজারেরও ওপর চিঠি এসেছে তাঁর এই অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাবের কাহিনী জানবার জন্য। আমরা উৎসী দেবীর সঙ্গে এই ব্যবস্থা করেছি—তাঁর এই রোমাঞ্চকর কাহিনী জনসাধারণে বা সংবাদপত্রে প্রকাশ না করে—সত্য সত্য যে রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছিল—চিত্রের পর্দায় তা হুবহু দেখাব। এই মর্মে আমরা সংবাদপত্রেও ঘোষণা করেছি। আজ সর্ব্ব প্রথমেই আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি উৎসী দেবীকে। তাঁর রহস্যময় জীবনের বিচিত্র এই কাহিনীটি তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করে আমাদের দিয়েছেন—তাঁরই কল্যাণে আমরা এই বহু আকাঙ্ক্ষিত কাহিনীটি আজ দেশকে নিবেদন করতে পারছি। উৎসী দেবীর স্থান আজ ত্রিজগতে কোথায় তা নির্দ্দেশ করবার আবশ্যকতা নেই—এবার তিনি বিভিন্ন রূপে কলারসিকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করছেন—আশা করি তাঁর আত্মজীবনীর এই কয়েকটি পাতা সাহিত্য হিসাবেও হবে অত্যন্ত মনোজ্ঞ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আমরা উৎসী দেবীর দীর্ঘজীবন কামনা করি—এবং এই আশা করি—যে অভিনয় জগতের শীর্ষদেশে যেমন তিনি একদা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন—সাহিত্যের কল্পলোকেও তিনি একদিন সেই স্থান করে নিতে পারবেন।

[ঘন ঘন করতালি।]

এই প্রোডাকসনটির নাম হবে "হারাণো তারা।"

কথা ও কাহিনী—উৎসী দেবী।
পরিচালনা—পার্থসারথি বোস।
শব্দযন্ত্র—মেঘনাদ চৌধুরী।
আলোক চিত্র—প্রিয়তম মিত্র। ইত্যাদি।

ভূমিকায়—

বিষাণ বানার্জি—বিষাণ বানার্জি
সুচিত্র রায়—সুচিত্র রায়
পার্থ সারথি বোস—পার্থ সারথি বোস
শঙ্খ সরকার—শঙ্খ সরকার
প্রিয়তম মিত্র—প্রিয়তম মিত্র
গোলোক দাস—হলধর হালদার
হরিহর চাটার্জি—জমিদার
সুবল দাস—মন্দিরের পূজারী
সবিতা দেবী—জমিদার পত্নী
নিলীমা দেবী—মোক্ষদা
মৃণালিনী দেবী
তরঙ্গিণী দেবী } গ্রাম্য বধূগণ
ঊর্ম্মিলা দেবী
উৎসী দেবী—কুসুম রায়।

বজ্রপাত হলেও বা সবাই এমন চমকাতো না—যেমন চমকালো যখন উষসী দেবীর ভূমিকায় কুসুম রায় ঘোষিত হল।

উষসী কি বলতে উঠেই—তা না বলে বিষাণের মুখের দিকে চাইল।

মিষ্টার রায় বললেন এই ভূমিকা বন্টন আমরা বিশেষ ধীরভাবে আলোচনা করে করেছি। একমাত্র নতুন লোক হচ্ছেন বিষাণ ব্যানার্জি—কিন্তু আমার আশা আছে তিনি তাঁর ভূমিকায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হবেন।

"আপনাদের শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। ৩০৲ বেতনের একটি দরিদ্র সিগন্যালার আমুদোসেনের মতো কেমন সাতটি দিন হঠাৎ বাদশাহি পেয়েছিল—তা দেখবার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ। আমি এই চিত্রের সাফল্যের জন্য প্রাণপণ কর্ব্ব।"

উষসীর মনে হতে লাগল পৃথিবীটা ঘুরছে—সে তা স্পষ্ট অনুভব করছে—মনে হল সে পড়ে যাবে। সে উঠে দাঁড়াল—সে কি এই জন্য বিষাণের ঘর সংসার ছেড়ে এসেছিল? তার ইচ্ছা হতে লাগল সে চেঁচিয়ে বলে 'না—এসব চলবে না—' কিন্তু—দুঃখে ক্ষোভে তার কণ্ঠরুদ্ধ—কথা বলবার শক্তি তার আছে বলে মনে হল না। সে চলতে লাগল—কোথায় সে জানে না—সে দেখতে পেল সবাই গিয়ে কুসুম ও বিষাণকে অভিনন্দিত কর্ছে—তাকে লক্ষ্য করবার জন্য আজ কেউ আছে বলে তার মনে হল না—সে চলতে লাগল—চারদিক থেকে জনতার গুঞ্জন তার কানে ভেসে আসতে লাগল "বেশ হয়েছে।—একজন লোকই যে চিরকাল রাজত্ব করবে—তার কি মানে আছে! —কুসুম রায় উষসী দেবীর চেয়ে ঢের বেশী popular... Exhibitorরা কুসুমকে Star করে ছবি তোলবার জন্য ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে—তাই এরা···সবাইকেই chance দিতে হয়—একজনই যে চিরকাল heroine থাকবেন তার কি মানে আছে!···আমি দেখছি rise and fall of stars!...ঠিক বলেছ উষসীর দিন চলে গেছে—ওঁকে আর এখন কেউ চায় না।—দেখেছ, এর মধ্যেই কুসুম বিষাণের সঙ্গে কেমন জমে উঠেছে—একি ওরা দুজনে এক সঙ্গে গাড়ীতে উঠল দেখছি···ভয়ে সেদিকে চাইতে পার্ল না—উষসী লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটে চলেছে, হঠাৎ সে থামল—ফিরে দাঁড়ালো—দেখল একটু দূরেই ম্যানেজারের ঘর—সে নিজকে যথাসম্ভব সংযত করে—আত্মস্থ হয়ে সোজা গিয়ে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল।

ম্যানেজার মিঃ সর্ব্বাধিকারী হেসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। বসুন।

আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলুন—

আমি ছুটি চাই না, আমি resign কর্ছি—

"আপনার agreement অনুসারে আপনি এখানে আরো এক বছর থাকতে বাধ্য।"

উষসী কোন কথা কইতে পারল না।

ম্যানেজার খুব গম্ভীর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন I feel for you, Ushashi Debi!

উষসী ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। করিডর (corridor) দিয়ে যেতে—পথে দেখা হল ডাইরেক্টার পার্থসারথি বোসের সঙ্গে।

নমস্কার উষসী দেবী!

নমস্কার।—আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো!—শ্লেষ দিয়ে উষসী বললে।

সে কি! সে কি উষসী দেবী?

"কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে এ ছবি তোলবার আশা আপনাদের দুরাশা—" উষসী একরূপ ঘোষণাই করলে।

তাই না কি! তা হলে Bossকে এখনি এ কথা জানানো ভালো—চোখে একটা ব্যঙ্গাত্মক ঝিলিক খেলে বোস বললে।

উষসী এগিয়ে চলল—

ঘর থেকে Boss মিষ্টার সুচিত্র রায় বেরিয়ে আসতেই উষসী ঠিক তার সম্মুখে পড়ল—

"আমাকে বাদ দিয়ে এ ছবি তোলবার আশা আপনাদের দুরাশা—"

উষসী বলেই—যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলল—

"তার মানে—?" মিষ্টার রায় রাগের সঙ্গে যেন চেঁচিয়েই উঠলেন।

"আমাকে বাদ দিয়ে এ ছবি তোলবার আশা দুরাশা—দুরাশা—" উত্তেজিত উষসী বলতে বলতে ছুটছে।

তার পেছনে ক্রমশঃই লোক জমতে লাগল—সবাই কনিডরের দুধারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

কি বলছে?—কি বলছে? জনতা থেকে জিজ্ঞাসা হতে লাগল—

কি বলছি? আমি লিখে দিচ্ছি—আমাকে বাদ দিয়ে এ ছবি কিছুতেই তোলা হতে পারে না—

—একটা Black board (notice board)এ চক দিয়ে উষসী লিখেই সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল।—

Studio Executive কাউন্সিলে বসেছেন।

"ডাক্তার বলেছে—purely hysteric"—মিষ্টার রায়

"আজ কেমন আছে—খবর পেয়েছেন—?" ডাইরেক্টার বোস জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি সেখান থেকেই ফিরছি। Quite normal. কালকের ঘটনা ওর কিছু মনে আছে বলে মনে হল না। আমি দু একটা কথা তুলে মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু মনে করতে পারল না—" প্রচার বিভাগের কর্তা শঙ্খ সরকার জানালেন।

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন "ওকে বাদ দিয়ে এ ছবি তোলা হতে পারবে না—এ কথা কি সাহসে উষসী বলে? আমার লোকেরা কি strike করবে?

"ছেড়ে দিন—ও কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। Exhibitors দের চিঠিগুলো তো দেখেছেন? লোকে আর ওকে চায় না। সত্যি কথা হচ্ছে এই—ওকে আর heroine এর পার্টে একেবারেই মানায় না। She is a falling star" ডাইরেকটার বোস স্পষ্ট কথা কইবার ভঙ্গীতে বললেন।

"কিন্তু ওকে নিয়েই গল্পটা—কাজেই ওকেই হয়তো লোকে Expect করবে—" শঙ্খ সরকার বললে।

"মোটেই না। ঐতিহাসিক ছবিতে কি হয়? ইতিহাসে বলে রাণী দুর্গাবতী সুন্দরী ছিলেন না—কিন্তু করুন দেখি সেই ছবি একটি অসুন্দরী মেয়ে দিয়ে! টিন ছুঁড়ে পর্দ্দাই ছিঁড়ে দেবে। ডাইরেক্টার বোস অভিজ্ঞতা-পূর্ণ কণ্ঠে বললেন।

"বিষাণ ব্যানার্জি বেঁকে বসবে না তো?" সংশয়-দোলায়িত চিত্তে মিষ্টার রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"উষসীর সঙ্গে সে playই করবে না—তার প্রতিজ্ঞা—উষসীকে বাদ দিয়ে তবে তো তাকে পেয়েছি—সেটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? ডাইরেক্টার বোস বললেন।

"তাহলে Start. এখন কোন change করা indiscipline হবে। ছবি তুলতেই হবে—এই মাসের মধ্যে। Mind the contract—রায় বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। কা উল্লাস ভাঙলো।

উষসীর ওখানে তখন কি হচ্ছে—দেখা যাক্।

উষসীর ওখানেও তখন এক সভা। একদল কপট স্তাবক জুটেছে। তারা উষসীকে খুসী করবার জন্য যা নয় তাই বলছে, বলছে—উষসীকে বাদ দিয়ে এ ছবি হতেই পারে না—কখনো হতে পারে না। হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক হয়?—হবে দক্ষযজ্ঞ—এ আমি বলে দিলাম, দেখো।—উষসীর কাছে ঐ কুসুম—সেদিনের মেয়ে—কখনো দাঁড়াতে পারে!—ভেতরকার রহস্যটা কি সে তো আমরা জানি—কুসুম আর বোস—থাক্ আর বললাম না—কিন্তু কেলেঙ্কারিটা আগে ছিল private এখন দাঁড়িয়েছে খবরকাগজের মতো public—না বলেও তো পারি না!

...তা বাবা কুসুম মেয়েটিও কম নয়। দেখলে না—কাল বিষাণ ব্যানার্জিকে কেমন করে গ্রাস করল—নিজে ড্রাইভ্ করে ওর হোটেলে পৌছে দিল! এক দিনের তো আলাপ!—

এমনি সব গল্প গুজব চলছে। পূর্ব্বের দিন হলে উষসী এর প্রত্যেকটি কথা যে নিছক স্তাবকতা তা বুঝতে পারতো—কিন্তু আজ তার মনে হতে লাগল এদের প্রত্যেকটি কথা সত্যি। সে খবরমতো খুশী হয়ে উঠল চা কফি—কেক্ খাবার—যার যেমন রুচি—খবরমত আনিয়ে এদের পরিবেশন করালো—। উৎসাহ পেয়ে

স্তাবকের দল উৎসী বাঙলার গ্রেটা গার্বো কি মার্লিন ডিয়েট্রিশ এই নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়ে দিল।

এরি ফাঁকে কয়েকজন 'বড় ঠেকে পড়েছি' অতি গোপনে উৎসীকে জানিয়ে—কিছু কিছু টাকাও আদায় করে নিয়ে গেল—এবং উৎসী এই সব বন্ধুদের টাকা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দুঃখ বোধ করল না—! বরং তাঁরা ঘন ঘন কেন আসে না অনুযোগ জানিয়ে আসবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করে দিল।—সবাইকে। উৎসীর জয়গান করে সবাই যখন চলে গেল—উৎসীর কিন্তু কেবলি মনে হতে লাগল—সে হেরে গেল—হেরে গেছে—। সে বুঝল তাকে বাদ দিয়ে ওরা এছবি করলে তার যে পরাজয় হবে—সে পরাজয় হবে চরম—তাকে মৃত্যুও বলা যায়। অবশ্য তার দৃঢ় বিশ্বাস আছে—তাকে বাদ দিয়ে এ ছবি কিছুতেই হতে পারে না—ঐ বিষাণ—ঐ বিষাণই তাকে ছাড়া অন্য কাউকে উৎসীর ভূমিকায় পেয়ে—গ্লে করতে পারবে না—বিষাণকে সে যদি চিনে থাকে—এ না হয়ে যায় না—। বিষাণকে সে চিনেছে—জেনেছে—মানুষের মন বুঝতে সে কখনো ভুল করে নি—এখানে তো ভুল হতেই পারে না—। বিষাণ—যার মধ্যে এতটুকু কুটিলতা নেই—ছলনা নেই—আধুনিক সভ্য সমাজের কপটতা নেই—যে নিতান্তই স্বচ্ছ—সরল—আবিলতা মুক্ত—তাকে সে কিছুতেই ভুল বোঝে নি—স্পষ্ট সে বুঝে এসেছে—সে তার মনে যে রং ধরিয়ে এসেছে, সে পাকা রং—সে রং উঠবে না—কখনো না—সে তাকে মনে প্রাণে শুধু ভালোবাসে নয়, পূজা করে—সেই বিষাণ—এখন যা করেছে—করছে- সে শুধু অভিমানে। আজই যদি সে তাকে এখানে ডেকে পাঠায়—সে ছুটে আসবে—ছুটে এসে তার বুকে পড়বে—পায়ে পড়তেও পারে। কিন্তু আমি তা ডাকবো না। অভিমান কি আমার নেই! যে কুসুমের জন্য আমি হয়েছি হতমান সেই কুসুমকে নিয়ে সে play করছে!—এতটুকু প্রতিবাদ করল না!

ছবি তোলা সুরু হয়েছে। বিষাণ কুসুমকে বলেছে "কিছু ভাববেন না আপনি। সংসারে অভিনয়ই যদি বড় জিনিষ হয়, সত্যিকার ভালোবাসা—প্রেম—এ সবের যদি কোন মূল্যই না থাকে—উৎসীর চেয়ে আপনিই ভালো করবেন—কারণ উৎসীর চেয়ে আপনি বড় অভিনেত্রী!

উৎসীকে Rehearsalএ উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। Rehearsal হচ্ছে—উৎসীর হাতে তার পুথির এক copy রয়েছে।

হঠাৎ এক জায়গায় বিষাণ চেঁচিয়ে উঠল—"একথা আমি বলি নি। বলতে পারি না।"

ডাইরেক্টার পার্থসারথি বললেন—"Script এ কিন্তু তাই আছে আপনি কি বলেন উৎসী দেবী?

উৎসী বলে "আমি কিছু বলব না। আমার যা বলবার সে তো আমি লিখেই দিয়েছি।

বিষাণ বলে "তাহলে ওটা অন্যায় লেখা হয়েছে। ওকথা আমি বলি নি—বরং উনি বলেছিলেন ঐ কথা—আমিই তাতে রাগ করে দুঘণ্টা ওর সঙ্গে কথা বলিনি। জিজ্ঞেস করুন সত্যি কি না!

এমনি সব funny situationএর মধ্য দিয়ে rehearsal চলছে—কিন্তু এগুতে পারছে না!

বিষাণ হয়ত তার পার্ট বলছে—বলতে বলতে তার পার্টের চেয়েও অনেক বেশী কথা বলে ফেলছে, আবেগে। পার্থসারথি scriptএ সে সব কথা পাচ্ছেন না। দেখেন উৎসী মৃদু মৃদু হাসছে।

কোন সময় বা বিষাণ উৎসীকে, খোঁচা দিয়ে, পার্ট বলবার ছলে, এমন সব কথা বলছে—যাতে উৎসী ক্ষেপে গিয়ে বলছে—এসব আমার বইয়ে নেই—এসব বলা চলবে না—চলবে না। সে তীব্র ভাবে প্রতিবাদ জানায়।

এমনি করে Rehearsal এর মধ্য দিয়ে বিষাণ ও উৎসীর বোঝাপড়া চলছে।

কুসুম চালাক মেয়ে। সে ব্যাপারটা বুঝল। বুঝল এরা পরস্পর কথা না বললেও এই rehearsal এর মধ্য দিয়ে যা হচ্ছে—তাতে কথা বলার চেয়ে ঢের বেশী বলা হচ্ছে। সে আরো বুঝল এদের ভেতর বিশেষ কোন মনোমালিন্য নেই—যা আছে সে হচ্ছে পুঞ্জীভূত মানাভিমান!

কুসুম দেখল বিষাণ তার সঙ্গে যে পরম প্রীতির ভাব

দেখাচ্ছে—সেটা অনেকটা অভিনয়—শুধু উর্বশীকেই জাগ্রত করার জন্য।

কুসুম স্থির করল বিষাণকে জয় করতে হবে সে লেগে গেল।

বলা বাহুল্য এসব উর্বশীর পক্ষে সহ্য করা দুরূহ হয়ে উঠল।

উর্বশীও বুঝল বিষাণকে আঘাত করতে হবে—তা না করলে সে জাগবে না।

সে প্রিয়তম মিত্রকে নিয়ে মেতে উঠল।

প্রিয়তম চমকে উঠল! এ কি ব্যাপার! এই উর্বশীকে এক সময় কত করে হাজার প্রেমপত্র লিখেছে—কোন সাড়া পায়নি। সাড়া না পেয়ে পেয়ে সে তার প্রীতিস্নেহ অন্তত সমর্পণ করেছিল। অন্তত মানে কুসুম

উর্বশী প্রিয়তমকে নিয়ে তার লুপ্ত গরিমাকে পুনরায় উদ্ভাসিত করতে চেষ্টা করল।

একদিন প্রিয়তমকে সে মার্কেটে নিয়ে গিয়ে সব চেয়ে দামী ফুল কিনে উপহার দিল।

প্রিয়তম সেই ফুল নিয়েই গেল ষ্টুডিয়োতে।

কুসুমের সঙ্গে নির্জনে দেখা।

প্রিয়তম কুসুমকে সেই ফুল উপহার দিল।

কুসুম আবার সেই ফুলই উপহার দিল বিষাণকে!

Rehearsalএর সময় উর্বশী দেখল বিষাণের Button holeএ সেই ফুল।

প্রিয়তমও সেখানে ছিল।

ব্যাপারটা সবাই বুঝল।

সে দিন Rehearsalই হল না! পার্থসারথি ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে Bossএর কাছে গিয়ে report করল—

নাটকের ভিতর নাটক চলেছে। ব্যাপারটা আমি ঠিক্ বুঝতে পাচ্ছিনা।

"কোন triangle?" বস্ সুচিত্র রায় জিজ্ঞেস করলেন।

"যেন। rectangle কি square!"

বিষাণ তার ট্রাঙ্ক খুলে হঠাৎ দেখে উর্বশীর অড়োয়া গয়নাগুলো সে যেমন করে রেখেছিল তেমনি রয়েছে!

সে ভেবে দেখল ভারী অন্যায় হয়ে গেছে—এগুলো এলেই তাকে ফেরত পাঠানো উচিত ছিল।

সে তার বেয়ারার হাতে গয়নাগুলো উর্বশীকে ফেরৎ পাঠালো।

উর্বশী গয়নাগুলো ফেরত পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। তার মনে হল বিষাণ তার জীবন থেকে আজই তাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিল।

বেয়ারারকে অপেক্ষা করতে বলে—সে বিষাণের দেওয়া—বিষাণের মায়ের গয়নাগুলি হাত থেকে খুলতে গেল—ফেরত দিতে! আজ এর পর এ গয়না পরবার আর কোন অধিকার আছে কি তার!

বালা জোড়া হাত থেকে খুলতে গিয়ে উর্বশী খুলতে পারল না। সে কাঁদতে লাগল।

বাচ্চা বেয়ারা বিষাণকে গিয়ে সব বলল।

বিষাণের মনে হল উর্বশীর জীবনে এখনো তার স্থান রয়েছে।

সে উর্বশীকে ফোন করা স্থির করল।

উর্বশী তাকে চিনতে না পারে এমনি একটা অস্বাভাবিক গলা করে সে উর্বশীর সঙ্গে আলাপ সুরু করল। জানাল.....সে তার এক অনুরাগী ভক্ত।

"আসুন না—উর্বশী বলল

"না। আমার এমন কোন যোগ্যতা নেই যে আপনার সঙ্গে দেখা করি। আমি অতি সামান্য লোক—কিন্তু আপনাকে বহুকাল থেকে পূজা করি বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমি অবশ্য জানি আপনার এমন অখ্যাত অজ্ঞাত ভক্ত হাজার হাজার আছে এবং আমি তাদেরই একজন।

কথায় কথায় উর্বশী এটুকু বের করে নিল তার এই অখ্যাত, অজ্ঞাত ভক্ত ষ্টুডিয়োরই লোক—এবং উর্বশীকে সব সময়ই লক্ষ্য করে।

"আপনি আসুন না!"

"না। আমার যাবার সময় হয় নি। যেদিন সময় হবে—আমাকে ডাকতে হবে না। আমি নিজেই যাব।"

• • •

এইরূপে ফোনের মধ্য দিয়ে প্রায় প্রত্যহই এই দুইটি লোকের ব্যথা ও বেদনা প্রকাশ পেতে লাগল। উষসী এই অজ্ঞাত বন্ধুটির কাছে তার মনের দুয়ার খুলে দিল। অজ্ঞাত বন্ধুটি উষসীকে Test করবার জন্য নানা প্রলোভন দেখায়—কিন্তু উষসী শুধু বিষাণের জন্যই কাঁদে। উষসী বলে "বন্ধু! তুমি জানো না জন্মজন্মান্তরের বন্ধন যে কি বন্ধন তুমি হয়ত জানো না! সেই বাঁধনে আমি ওর কাছে বাঁধা।"

উষসীর জন্মদিন এল। গেল বছর এই দিনে সে কী উৎসব হয়েছিল!

উষসী স্থির করল উৎসব করবে না। জন্মদিনের কথা সে কাউকে জানালোই না।

জন্মদিনের প্রভাতে উষসীকে তার অজ্ঞাত বন্ধু ডাকল।

"আজ আপনার জন্মদিনে আমার শুভেচ্ছা নিন।

আপনার টেবিলে আমার উপহার রয়েছে কি—

"কি?

"হাসনুহানা!

এ কি! কখন পাঠালেন! কী করে জানলেন আমি ঐ ফুলই সব চেয়ে ভালোবাসি?

"আমি জানি।

উষসীর মনে পড়ল বিষাণের বাসায় এই হাসনুহানা গাছ লাগাতে গিয়ে বিষাণের সঙ্গে কী ঝগড়া। বিষাণ বলে ওতে সাপ আসে। উষসী বলেছিল আসুক। তবু ও ফুলের গাছ আমার শিয়রে থাকবে।

উষসীর মনে হতে লাগল আজ কি সেই হাসনুহানা গাছে ফুল ফুটছে?

আপনি আসুন! আপনি আসুন সানুনয়ে উষসী বলল।

"এখনো সময় হয়নি। সময় যেদিন হবে আমি যাব" ফোনে উত্তর এল।

সেই রাত্রে উষসী তার Diaryতে লিখল...

"কালই হারাণো তারা'র প্রথম shooting! বিকেল তিনটায় shooting আরম্ভ হবে। আমি খুব দম্ভ করে Black Boardএ সবাইকে লিখে জানিয়ে ছিলুম "আমাকে বাদ দিয়ে এ ছবি তোলা হবে না—হতে পারবে না।"

বিষাণকে আমি বুঝেছিলাম বলে আমার বিশ্বাস হয়েছিল। বুঝেছিলাম সে মনপ্রাণ দিয়ে আমাকেই চেয়েছিল পেয়েছিল এবং চিরদিনই চাইবে।

আজ দেখছি আমারই হয়ত ভুল।

জীবনে এই একটি ছেলেকেই আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালো বাসতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ...এই একটি গেঁয়ো ছেলেকে!

সেই জায়গাতেই কি আমি ঠকলাম!

কাল তিনটায় প্রথম Shooting! শুটিং এর সময় লোকে হাসবে! আমার কথা মনে করে হাসবে! আমাকে দেখে হাসবে! বিষাণ হাসবে! কুসুম হাসবে! ডাইরেক্টার হাসবে! Boss হাসবে! বিশ্বশুদ্ধ লোক হাসবে!

তার আগেই আমাকে বিদায় নিতে হবে।

লোকে বলে আমি setting sun। লোকে বলে আমার তারা অস্ত গেছে!

বিষাণকে যদি আমি হারাই সে কথা সত্য। অন্তই তবে আমি যাব।

তাই আমি দেখব— কাল বিকেল তিনটা পর্য্যন্ত আমি দেখব! বাড়ীতে বসে দেখব! বেলা তিনটা! ঢং ঢং ঢং তিনবার বাজবে—তারি সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে যাবে—আমার প্রেম—তার প্রেম...সত্য কি মিথ্যা!

মিথ্যা হলে...আকাশের বুক থেকে খসে যাবে... আমার তারা!

উষসী লিখেছে—

লিখে পড়ছে—এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল!

সেই বন্ধু!

"আমার একমাত্র বন্ধু! দেখাতো তোমার পেলাম না!

"আরে—যেদিন সময় হবে, পাবে।

"হবে আর এ জীবনে হলনা।

কেন?

"শোনো:—

উৎসী তার ডায়ারী পড়ল।

•

আজ shooting distributor রা এসেছেন। studio executive present.

Taking হচ্ছে।

হঠাৎ director বলে উঠলেন। Stop! Stop!

—"আপনার আজ কিছু হচ্ছে না বিষাণবাবু! এমনি করে আপনি acting কর্ব্বেন! life কই? বারবার আপনার ভুল হচ্ছে—কিছু হচ্ছে না!

—"Life! Soul! কোথা থেকে আসবে!

[কুন্দনকে ফেলিয়ে]

ওরই কি কিছু হচ্ছে! কিছু হচ্ছে না! উনি কর্ছেন অভিনয়! আমার কেবলি মনে হচ্ছে উনি অভিনয় কর্ছেন!

—"অভিনয় কর্ব্বেন না তো কি করবেন? ডাইরেকটার জিজ্ঞেস করলেন—ক্ষেপে।

—"অভিনয় আমি ঘৃণা করি। অভিনয় আমি ঘৃণা করি।

আমি আর অভিনয় করতে পারি না। পার্ব না"

বিষাণ বলে পড়ল।

মহাবিপদ!

চায়ের ঘণ্টা হল!

Shooting বন্ধ রইল।

Directorকে Boss ডেকে নিয়ে বললেন—আজই shooting শেষ করতে হবে। কাল থেকে আমার এ floorএ অন্য কোম্পানী কাজ করবে—তারা ভাড়া নিয়েছে। এক মাসের মধ্যে আর Studio মিলবে না। ওদিকে ছবি আসছে শনিবার Release হবে—Announce হয়ে গেছে Advance বুকিং সুরু হয়েছে—জানেন তো?

"কিছু ভাববেন না—সে হয়ে যাবে' খন। আমি গিয়ে সব ঠিক করে নিচ্ছি।"

এদিকে উৎসী ঘড়ির দিকে চেয়ে আছে। তার হাতে রয়েছে ডায়রিখানা। তিনটা বাজল—তবু বিষাণ এল না। ফোন করে উৎসী জানলো—শেষ Taking সুরু হয়েছে।

উৎসী ভেঙে পড়ল। তার maid মালতী ছুটে এল—এসেই দেখে উৎসী sinking! বিড় বিড় করে উৎসী বলছে "সে এলনা! সে এলনা!"

মালতী ভয়ে চীৎকার করে উঠল—সে flatএর ম্যানেজারের কাছে ছুটল।—"ডাক্তার! ডাক্তার! ম্যানেজার, ডাক্তার ডাকুন!"

এদিকে Studioতে বিষম চাঞ্চল্য—চায়ের পর shooting সুরু হতে গিয়ে দেখা গেল বিষাণ নেই! বিষাণকে পাওয়া যাচ্ছে না!

খোঁজ! খোঁজ!

এদিকে Flatএর ম্যানেজার লোকজন এনে বললেন আমার বাড়ীতে চিকিৎসার সুবিধে হবে না। হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

অচৈতন্য উৎসীকে হাসপাতালে নেবার জন্য stretcherএ করে নামানো হল।

এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল।

মটর থেকে নেমেই বিষাণ ছুটে এল উৎসীর কাছে।

"উৎসী। উৎসী!" বিষাণ ডাকতে লাগল।

উৎসী চোখ মেলে বিষাণকে দেখল।

"এসেছ! কেন এলে!"

আজই আমার আসবার সময় হয়েছে উৎসী চল—

কোথায়?

আমার বাড়ীতে—আমার ঘরে!

কে মশাই আপনি! কাকে আপনি কোথায় নিচ্ছেন? ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল।

আমার স্ত্রী। আমার সঙ্গে রাগ করে—

এর পরই দেখা গেল মটরে বিষাণের বুকে উৎসী!

কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভা

শঙ্কর

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসের দুটো রূপ বা কার্যপদ্ধতি ছিল। একটা ছিল তার সংগ্রামের রূপ বা কার্যপদ্ধতি এবং আর একটা ছিল তার সেবার রূপ বা কার্যপদ্ধতি। প্রথমটার জন্য ছিল সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য, দ্বিতীয়টার জন্য ছিল গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি। এই যে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-রূপ, এটা কংগ্রেসের একটা বিশেষত্ব। সাধারণতঃ বিপ্লবী দলে কেবল বিপ্লবী সংগঠন ও বিপ্লব পরিচালনাই করে,—কোন সামাজিক গঠনমূলক কাজে হাত দেয় না। কারণ বিপ্লব হল ধ্বংস মূলক ;—এর সঙ্গে সঙ্গে গঠনের কাজ চলতে পারে—এটা একটু অসামঞ্জস্য বলে মনে হবে। এটা গান্ধীজীর প্রতিভার বিশেষ দান—যে ধ্বংসমূলক বিপ্লবের সঙ্গে গঠনমূলক কাজও চলতে পারে। গঠনমূলক কাজকে যদি কেউ কেবল বিপ্লবের প্রস্তুতি বলে মনে করে, তবে খুবই ভুল করা হবে। গঠন-মূলক কাজ দিয়ে বিপ্লবোত্তর ভাবী সমাজের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে ;—তার বনিয়াদ গড়া হয়েছে। যে কোন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এটা বিশেষ কৃতিত্বের।

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ; ভারতের শাসন-দায়িত্ব আজ কংগ্রেসের হাতে পড়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠেছে— একটি স্বতন্ত্র গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্ন লোকের মনে বিশেষ করে আসছে—বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে সংঘর্ষের ফলে। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে বিরোধ আছে। তাই আজ বিচার করা দরকার একটা গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস থাকার প্রয়োজন আছে কি না। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দল থাকে প্রধানত ব্যাবস্থাপক দল (বা Parliamentary Party) হিসাবে। নির্বাচন পরিচালনার জন্য এর একটা কাঠামো বাইরে রাখা হয় ; কিন্তু এর প্রধান কাজ হ'ল দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করা। ঐ সব দলের কোন প্রাত্যহিক কর্ম-তালিকা থাকে না এবং কোন দেশ-ব্যাপী শাখা প্রশাখাও থাকে না। কিন্তু কংগ্রেসের তা আছে ; কয়েক কোটি লোক এর প্রাথমিক সভ্য হয়েছে ; কয়েক লক্ষ লোক এর উপযুক্ত (qualified) সভ্য হয়েছে। সমস্ত দেশময় প্রায় লাখ খানেক প্রাথমিক পঞ্চায়েৎ এর নিম্নতম উনত (unit) হিসাবে গঠিত হয়েছে। এর একটা নিত্যকার কার্যতালিকা আছে। দেশের ক্ষুদ্রতম অংশ হ'তে কেন্দ্র পর্যন্ত স্তরে স্তরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান আছে।

পূর্বে কংগ্রেসের দুটো রূপ ছিল—সংঘর্ষমূলক ও গঠনমূলক। এখনও কংগ্রেসের দুটো রূপ আছে—শাসন-মূলক ও সেবা-মূলক। এক দিকে কংগ্রেস সমগ্র দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেছে ও চালাচ্ছে, অপর দিকে এর বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখার মারফৎ দেশের সর্বত্র সেবার কাজ চালাবার দায়িত্ব নিয়েছে। অনেকে বলছেন—সেবার দ্বারা জাতিকে গঠন করার কাজ আজ কংগ্রেসের সমর্থিত মন্ত্রীমণ্ডলী নিয়েছে—কাজেই বে-সরকারী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দিয়ে এসব কাজ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁরা আরও বলছেন এমনি একটা সর্বব্যাপী ও সর্বক্ষণের বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান থাকার ফলেই, মন্ত্রী-সভার সঙ্গে সর্বত্র একটা বিরোধের ভাব দেখা দিয়েছে। অতএব—তাঁদের কথা হল—কংগ্রেসের এই বেসরকারী রূপ ও কার্যতালিকা রহিত ক'রে দেওয়া উচিত।

কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থাপক দলের (Parliamentary Party) থেকে কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনেকটা আলাদা—যার জন্য কংগ্রেসের ঐ বেসরকারী গণসংযোগ ও সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান রাখা দরকার। পূর্বে বলেছি, স্বাধীনতা লাভের পূর্বে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রস্তুতি ব'লে মনে করলে ভুল করা হবে ; প্রকৃত পক্ষে গঠনমূলক কাজ হ'ল বিপ্লবোত্তর সমাজের

ভিত্তি স্থাপন যে সমাজের কল্পনা নিয়ে কংগ্রেস বিপ্লবের সাধনা করছে, সে সমাজ আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি; যে বিপ্লব সাধন কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল, সে বিপ্লব আজও সাধিত হয় নি। সে বিপ্লব সাধন ও সে বিপ্লবোত্তর সমাজ প্রতিষ্ঠা সরকারী প্রচেষ্টার চেয়ে বেশী পরিমাণে নির্ভর করে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর। কংগ্রেসের বিপ্লবী আদর্শ প্রধানত গান্ধীজীর কাছ থেকে এসেছে; তিনিই কংগ্রেসকে বিপ্লবী গণ-প্রতিষ্ঠান রূপে দাঁড় করিয়েছেন; তিনিই এর আধিক ও সামাজিক রূপ গড়ে তুলেছেন।

গান্ধীজীর মত ছিল যে রাষ্ট্র সব চেয়ে কম শাসন করে, সেই রাষ্ট্রই সব চেয়ে ভাল (The Government which governs the least is the best)। এই আদর্শকে অনেকে নৈরাষ্ট্রবাদ (anarchism) ব'লে মনে

কিন্তু তা ঠিক নয়; গান্ধীজী নৈরাষ্ট্রিক বা (anarchist) ছিলেন না। নৈরাষ্ট্রবাদে কোন প্রকার রাষ্ট্রই স্বীকার করা হয় না; কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব (central authority) সে ব্যবস্থায় থাকবে না। কিন্তু গান্ধিজীর ঠিক সে আদর্শ নয়। গান্ধিজী মনে করতেন—স্বয়ং-প্রণোদিত এবং স্বয়ং-চালিত আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সব ব্যাপার চালিত করবে, কিন্তু এই সবটার যোগাযোগ রক্ষা ও সমবায়িক সংহতি রক্ষা করবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব

জাতির ও সমাজের বনিয়াদ গড়বে সাধারণ মানুষ—নিজ নিজ অঞ্চলে ও আবেষ্টনে। কাজেই সেই সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করা ও দায়িত্বশীল করার জন্য তাদের মধ্যে সেবাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। পূর্বে বলেছি গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাপক দল হিসাবেই কাজ করে। কিন্তু এক-তান্ত্রিক বা স্বেচ্ছা-তান্ত্রিক (dictatorial) দেশ সমূহে যে দলের হাতে শাসন ভার থাকে, সে দল ব্যাপক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভাবে কাজ করে;—কিন্তু ঐ সব দেশে সে দল রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে একান্ত ভাবে রাষ্ট্রের অনুগামী হয়। সোভিয়েট রুষিয়াতে, নাজি জার্মেনীতে ও ফ্যাসিষ্ট ইটালীতে আমরা রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলের এই একাত্মতা দেখতে পাই। ঐ সব দেশে ঐ সব রাজনৈতিক দলের একমাত্র কাজ হয়—রাষ্ট্রের অনুশাসন মতো দেশের লোককে চালিত করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাইরে সমষ্টিগত হিসাবে জাতির ও ব্যক্তি-গত ভাবে ব্যক্তির কোন সত্তা যাতে না থাকে তার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র সেখানে সর্বাত্মক (totalitarian-); কাজেই কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন স্বাধীন সত্তা বা রূপ সেখানে থাকতে পারে না।

কিন্তু যে সমাজের আদর্শ হ'ল রাষ্ট্রাতিরিক্ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা—সে সমাজে সব কিছু রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে এটা নিতান্তই অযৌক্তিক প্রস্তাব। কংগ্রেসের সভ্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম হ'ল সাধারণ সভ্য; যে কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকই এই সভ্য হ'তে পারে। দ্বিতীয় হ'ল উপযুক্ত (qualified) সভ্য;—যাদের আচরণে কংগ্রেসী আদর্শের কিছুটা অন্তত ছাপ আছে, তারাই এই শ্রেণীর সভ্য হ'তে পারে। তৃতীয় হ'ল—সক্রিয় সভ্য;—যারা কংগ্রেসের আদর্শকে কাজে পরিণত করছে—অন্তত কিছুটা সময় যারা ঐ কাজে নিয়োজিত করে, কেবল তারাই এই শ্রেণীর সভ্য হ'তে পারে। সভ্যদের তিন শ্রেণীতে ভাগ নিতান্তই খেয়ালের বশে করা হয় নি; এর একটা তাৎপর্য আছে। এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য হ'ল—স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজ প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ সৃষ্টি করা। প্রত্যেক ৫০০০ লোকের এক একটি অঞ্চল নিয়ে একটি কংগ্রেসী পঞ্চায়েৎ গঠন করা হচ্ছে। ৫০০০ লোকের মধ্যে ২৫০০ লোকের মতো হবে প্রাপ্ত বয়স্ক। এই আড়াই হাজার লোকের এক একটি উনতকে (unit) নিয়ে এই পঞ্চায়েৎ গঠন করার উদ্দেশ্য এই যে ঐ পঞ্চায়েৎ ঐ লোকদের সত্যিকার ও নিত্যকার সেবার ও শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হবে। স্বয়ং স্বাধীন সমাজের এটা হবে নিম্নতম উনত (unit)। পরিচালক হবে উপযুক্ত সভ্য; এদের নির্বাচন করবে সাধারণ বা প্রাথমিক সভ্যগণ। এর পর স্তরে স্তরে থানা, মহকুমা, জেলা ও প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হবে। ঐ সব কমিটির কর্মকর্তা হবে সক্রিয় সভ্য—অর্থাৎ যারা কংগ্রেসের

উদ্দেশ্য ও আদর্শকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করে। এই ভাবে রাষ্ট্রের অতিরিক্ত একটা স্বয়ং-স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলবার চেষ্টা করবে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান।

রুষ বিপ্লবের পূর্বে লেনিন বলেছিলেন—সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মুখে রাষ্ট্র একদিন ঝ'রে পড়বে—withering away of the state সত্বর এক দিন ঘটবে। লেনিনের সে আশা একেবারেই সফল হয় নি। বরং সেখানে গ'ড়ে উঠেছে এক সর্বাত্মক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রকে দিয়ে রাষ্ট্র লোপ করানো—বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাস করানো—খুব সহজ কাজ নয়। কোন রাষ্ট্রই আত্ম-বিলোপ বা নিজ ক্ষমতা হ্রাস করতে রাজী হবে না। রাষ্ট্রের একটা স্বগত-গতি আছে; সেই গতির বলে রাষ্ট্র ক্রম শতই ক্ষমতা নিজ আয়ত্বে আনবার ব্যবস্থা করে। তাই গান্ধীজীর পরিকল্পনায় রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ ব্যক্তি ও সমাজ গড়বার দায়িত্ব নিতে হবে বেসরকারী বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের। যে বিপ্লব কংগ্রেস সুরু করেছে এবং যে বিপ্লবের ভিতর দিয়ে দেশ এগিয়ে চলছে, সে বিপ্লবের পরিপূর্ণতা হবে এই প্রচেষ্টায়। তাই একটি ব্যাপক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান রাখার প্রয়োজন আছে।

এর পর প্রশ্ন আসে—কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর সঙ্গে এই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক কি হবে? একথা অবশ্য স্বীকার্য যে মন্ত্রী-সভা ও কংগ্রেস সংগঠন একই সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দুটো অংশ;—একথাও স্বীকার করতে হয় যে—সে হিসাবে এই উভয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা ও রাখা দরকার। একে অপরের পরিপূরক;—উভয়ের উদ্দেশ্য একই—কেবল কর্মক্ষেত্র একটু আলাদা। খুব স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত অবস্থায় এই দুটির মধ্যে বেশ একটা সহযোগিতা থাকা উচিৎ। যদি মন্ত্রী-সভা পুরো-পুরি দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মেনে চলে, তবে এই দ্বন্দ্বতা ও সহযোগিতা সম্ভব। অপর দিকে বাইরের দল যদি একান্তভাবে সরকারের বা মন্ত্রী-সভার বশংবদ হয়ে চলে, তবে ঐ দ্বন্দ্বতা ও সহযোগিতা সম্ভব। এক-তান্ত্রিক (dictatorial) রাষ্ট্রে এই বশংবদ ভাব দেখা যায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনের দাবী বাইরের দল নির্মমভাবে পূরণ করে। নাজী জার্মেণী ও কম্যুনিষ্ট রুষিয়াতে এই প্রকার সহযোগিতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একে ঠিক সহযোগিতা না ব'লে—বলা উচিত অনুবর্তিতা। এটা খুব সুস্থ বা স্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিচায়ক নয়। যে-ই রাষ্ট্র অধিকারে যাবে, সে-ই দাবী করবে যে সব কিছুই রাষ্ট্রের অনুবর্তী হবে। রাজনৈতিক দল যদি এই দাবীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তবে রাষ্ট্রই হবে প্রবল—আদর্শ তার পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে যাবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার বা মন্ত্রীসভার সঙ্গে বেসরকারী রাজনৈতিক দলের একটা সংঘর্ষ স্বভাবতই থাকে। বিশ্বের একটা পরিবর্তনের যুগে এই সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য। আজ ব্রিটেনে একটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব চলছে;—ব্রিটেনের পক্ষে এটা বিরাট পরিবর্তনের যুগ। যদিও সেখানকার শ্রমিক দল (Labour Party) ভারতীয় কংগ্রেসের মতো একটা ব্যাপক রাজনৈতিক দল নয়—তবুও সেখানে আজ দল ও মন্ত্রীসভার মধ্যে একটা বিরোধ আছে। মন্ত্রী-সভার অনেক কাজের প্রতিকূল সমালোচনা শ্রমিক দলের সাধারণ অধিবেশনে হয়। মন্ত্রী-সভা বা সরকার প্রায়শই আদর্শবাদী কোন রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। কারণ আদর্শের প্রতি-বন্ধক প্রাকৃত অবস্থা (material conditions)—অনেক সময় এমন প্রবল হয় যে আদর্শ কখনও হুবহু কার্যে পরিণত হ'তে পারে না। এক দিন পরিষদের দলীয় আলোচনায় পণ্ডিত জওহরলাল বলেছিলেন—"সরকারী আবেষ্টনের ফলে তাঁদের মনে স্বভাবতই একটা সরকারী (official) দৃষ্টিকোণ গ'ড়ে উঠছে; সে হিসাবে দলের সমালোচনা তাঁরা পছন্দ করেন।"

আজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রী-সভার মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা যাচ্ছে। অনেকে এতে খুব দুঃখ বোধ করেন। যে গভর্ণমেণ্টের পরিচালক জওহরলাল ও বল্লভভাই, সে গভর্ণমেণ্ট যদি জন-সাধারণকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে স্বভাবতই ধরে নিতে হবে—অবস্থার চাপ এমনি যে কিছুতেই তাঁরা তাঁদের আদর্শ কার্যে পরিণত করতে পারেন না। হয়ত প্রতিকূল বাস্তবকে অতিক্রম করার মতো

সংঘে তাঁরা থাকছেন না,—বা প্রতিকূল বাস্তবকে মেনে নেবার মতো একটা নরম মনোভাব তাঁদের এসেছে। এরপর নিঃসংশয়ে বলা যায় যে কোন ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি থেকে তাঁরা তাঁদের সমস্ত জীবনের আদর্শ থেকে বিচলিত হবেন না।

দীর্ঘ সংগ্রামে প্রথম জয়লাভের ফলে যে মানসিক ক্লান্তি-বোধ এসেছে;—অথবা যে মানসিক অস্বস্তিবোধ তাঁদের এত দিন তীব্র হতে তীব্রতর সংগ্রামের পথে চালিত করেছে, আজ তার অনুভূতি তাঁদের মন থেকে গিয়েছে। এই সব কারণে একটা ঢিলা ভাব আসা খুব স্বাভাবিক, সব জিনিষকে এখন সহজ ভাবে গ্রহণ ক'রে ঢিলে ঢালে চলবার প্রবৃত্তি তাঁদের মনে আসতে পারে।

দেশের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত গুরুতর হবে। জনতার সুপ্ত মনকে কংগ্রেস জাগিয়ে তুলেছে; এই বিরাট চিত্ত জনকে কংগ্রেস রক্তের স্বাদ দিয়েছে। আজ সে নিজের দাবী সম্বন্ধে সচেতন। দেশের বর্তমান বাস্তব অবস্থায় সে দাবী পূরণ করা, কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়; কংগ্রেস সরকারও তা পারছে না। যে দাবীর কথা এত বড়ো ক'রে তুমিই তাদের শিখিয়েছ, সে দাবী যদি আজ তুমি পূরণ করতে না পার, তবে জনতার কাছে কোন মার্জনা পাবে না। বরং তোমার এই ত্রুটি ও বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দল জনতাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। সরকারের বা মন্ত্রী-সভার বিচ্যুতি ও জনতার দাবীর মধ্যে যে ফাঁক (lacuna) থাকে, তা পূরণ করা হচ্ছে বেসরকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ফাঁক এত বড় হয় না এবং দলের আদর্শ রাজনৈতিক অবস্থাকে এতটা অতিক্রম ক'রে যায় না। আমরা আজ একটা বিপ্লবের মুখে—একটা দ্রুত সামাজিক পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছে বহুদূর;—আমাদের মন প্রতিকূল বাস্তবের প্রতি অসহিষ্ণু হয়ে আছে। এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা, এই অসহিষ্ণুতা কংগ্রেসই জাতির মনে জাগিয়েছে। একে সামাল দিতে হবে আজ কংগ্রেসেরই।

আজ যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রী সভার বিরোধ এটা জনতার মনের ঐ আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঐ অসহিষ্ণুতাকে সামাল দেবারই চেষ্টার ফল। পূর্বে যা বলেছি তাতে এটা স্পষ্ট হয় যে মন্ত্রী-সভা দেখে সরকারী দিক থেকে;—জনতার মনোভাবের দিক থেকে তাদের দেখবার সুযোগ হয় না। আফিসের দপ্তর, ফাইল (file), নথি, রিপোর্ট—এই হল মন্ত্রীদের চোখ ও কান। তার বাইরে যে একটা বিরাট চঞ্চল জগৎ আছে—তা নথি কাগজে ও অফিসের রিপোর্টে ধরা পড়ে না—তা তাদের মনোগোচর কদাচিৎ হয়;—তা যখন হয়, তা হয় দলের দাবী থেকে। ছোট গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ থেকে সুরু ক'রে স্তরে স্তরে জন-মনের সঙ্গে দলের প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। প্রায়ই দেখা যায়—মন্ত্রীরা দলের কথার চেয়ে—সরকারী কর্মচারীদের রিপোর্টের উপর বেশী নির্ভর করেন। দলের দাবী তাঁদের কাছে একটা অস্বস্তিকর স্মৃতি বলে মনে হয়;—এই অস্বস্তিকর ও অপ্রীতিকর জিনিষকে তাঁরা এড়িয়ে চলতে চান!

দল যদি সেখানে একটু চেঁচা-মিচি করে—দলের সঙ্গে যে জনপ্রতিষ্ঠান আছে, তা যদি একটু উচ্চস্বরে তাদের এতদিনের দাবী ও আদর্শের কথা বলে, মন্ত্রীদের তাতে বিরূপ হওয়া অন্যায়। দল ও প্রতিষ্ঠান যদি ঐ কাজ ঐ চেঁচা-মিচি এবং পুরাণো দাবী ও আদর্শের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে না দেয়, তবে দল ও প্রতিষ্ঠান নিজের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবে এবং মন্ত্রীসভারও ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে। সরকারী আবেষ্টনের একটা বিষাক্ত আবহাওয়া আছে; তা মনকে শিথিল ও ম্লথ ক'রে দেয়। এই বিষাক্ত আবহাওয়ার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে বেসরকারী রাজনৈতিক দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতি। দল থেকে বার বার মন্ত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন আছে—কি আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতি নিয়ে তাঁরা মন্ত্রী হয়েছেন। এতে যদি মন্ত্রিরা ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত হন, তবে তা তাঁদের পক্ষে দলের প্রতি আনুগত্যের অভাব ব'লে মনে করতে হবে। অবশ্য প্রায়ই দেখা যায়, মন্ত্রী-সভা এটা পছন্দ করে না। তারা মনে করে—মন্ত্রী-সভার বাইরে যারা আছে,

তাঁদের সেই সব সহকর্মীরা তাঁদের অসুবিধার ও প্রতিকূল অবস্থার কথা বিবেচনা না ক'রে কেবল লম্বা লম্বা ফরমাস দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক বুদ্ধি ও সততা জাহির করতে চায়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়, হয়ত বাস্তব অবস্থার পূর্ণ বিবেচনা তাতে করা হয় না। তার জন্যও প্রধানত দায়ী মন্ত্রী-সভা। যদি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্রী-সভা বরাবর যোগাযোগ রাখে বা যদি শাসন-ঘটিত (administrative) প্রধান প্রধান ব্যাপার মন্ত্রী-সভা কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করে, তা হলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান জানতে পারে, বাস্তব অবস্থা কি, কোথায় কতটুকু অসুবিধা আছে বা না আছে। কিন্তু তা না ক'রে মন্ত্রী-সভা বরং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলে—যেন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান তাদের মন্ত্রিত্বের গদি কেড়ে নিতে চায়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে তারা তাদের সম্ভাবিত প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে দেখতে চায়। ২।৩ বছর পূর্বে যাদের সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর খেলা একসঙ্গে খেলেছিলেন, যাদের সঙ্গে মিলে প্রবল প্রতাপ বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, আজ তাদের উপর মন্ত্রীরা আস্থা রাখতে পারেন না; আজ তাদের দায়িত্ব-জ্ঞান, তাদের দেশাত্ম-বুদ্ধি, তাদের বিশ্বাস-রক্ষার ক্ষমতার উপর মন্ত্রীদের আস্থা নেই। ক্রীড়ারত একপাল কুকুরের মধ্যে একটি কুকুর যখন একখানা হাড় পায়, তখন সে কিছু সতর্কতার সঙ্গে তার সঙ্গীদের থেকে সে হাড় খণ্ড নিয়ে ঘুরে সরে দাঁড়ায়, বর্তমানে মন্ত্রীদের মনোভাব যেন কতকটা সেই রকম।

যদি কখন-ও এমন হয় যে বাইরের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান মন্ত্রীদের গদির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দিচ্ছে, তা হ'লে মন্ত্রীদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে শোভন এবং মর্যাদাজ্ঞাপক কাজ হবে কংগ্রেসের আস্থা ও অনাস্থার উপর নিজেদের মন্ত্রী-সভাকে ছেড়ে দেওয়া। যদি তাঁরা এই ভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে দেখাতে পারেন, যে মন্ত্রিত্বের জন্য তারা পরোয়া করেন না, তা হলে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও তাঁর দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হবে। আজ যা চলছে, তাকে, বলা যায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। বর্তমানে ক্ষমতার অধিকারী হ'ল মন্ত্রী সভা; কাজেই তাদের তরফ থেকে প্রথম ইঙ্গিত আসা উচিৎ যে কংগ্রেসের এতটুকু অনাস্থার পরিচয় পেয়েও তারা মন্ত্রিত্ব আকড়ে থাকতে চায় না। দলের মধ্যে উপদল গঠন, কংগ্রেস কর্মীদের দৈন্য ও নৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া, রাজনৈতিক আদর্শবাদিতাকে উপহাস করা—এমনি সব নানা অশোভন পন্থা—অনেক সময়ই মন্ত্রীরা অবলম্বন করেন—কেবল নিজেদের গদি ঠিক রাখার জন্য। আজ প্রত্যেক প্রদেশেই কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি;—তার প্ররোচনা আসছে প্রধানত মন্ত্রীদের আচরণ ও মনোভাব হ'তে।

অপর দিকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরও উচিৎ নিজেদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্বন্ধে সংবিৎ ফিরিয়ে আনা। একথা তাদের জানা থাকা দরকার যে যদি-ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হ'ল কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার ঊর্দ্ধতন সংস্থা এবং কংগ্রেসের সব শাখা প্রশাখার মূল, তবু-ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান আজ প্রধানতঃ জন-সেবার প্রতিষ্ঠান,—ক্ষমতার কাড়াকাড়ির স্থান ওটা নয়। তাদের আর-ও মনে রাখা দরকার—যদি জন-সেবার দ্বারা জনতার আস্থা ও বিশ্বাস তারা অর্জন করতে পারে, তবে মন্ত্রী-সভা-নিরপেক্ষ-ও তারা ক্ষমতার সত্যিকার অধিকারী হবে। আদর্শের কথা, কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের কথা—অবশ্যই তারা বলবে; প্রয়োজন মতো মন্ত্রী-সভার ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচনা-ও তারা করবে; কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠান-গত দায়িত্ব ও মর্যাদার হানি না ক'রে। ক্ষমতার লোলুপতা যেন তাদের বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ না পায়।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য—মন্ত্রী সভা ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায় এটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সবলতা ও আদর্শবাদিতারই পরিচায়ক। একান্তভাবে সরকার ও মন্ত্রী-সভার অনুগত হয়ে যদি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান চালিত হয়—তবে কংগ্রেস তার লোক-সেবার আদর্শ হারিয়ে সরকারের একটি প্রত্যঙ্গে

কথিত হবে :—মন্ত্রী-সভা ও কংগ্রেস একযোগে দেশে একটি ডিক্টেটর, গণতন্ত্র-বিরোধী রাষ্ট্র স্থাপনের পথ হবে। অথবা জনতার কাছে কংগ্রেস হেয় ও অপ্রিয় হবার ফলে, উৎপাত সৃষ্টিকারী বিভিন্ন দল, জনতার মন অধিকার ক'রে রাষ্ট্র-ক্ষমতা-ও ক্রমে অধিকার করবে। তা হবে দেশের পক্ষে চরম দুর্দিন। আমরা মনে করি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি বা ক্ষমতা-লিপ্সাদ্বারা প্রণোদিত না হ'য়ে তার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আরও সচেতন ও সজাগ হওয়া উচিত।

জমিদারী প্রথা লোপ করা, কুটির উৎপাদন প্রথা বা বি-কেন্দ্রিক অর্থনীতি (decentralised economy) প্রভৃতি কংগ্রেসের মৌলিক নীতির মধ্যে গণ্য। বছরের পর বছর জনতাকে আমরা এ সব কথা বলেছি। আজ যদি ২।৩ বছরেও কংগ্রেস এই সবটায় হাত দিতে না পারে, তা হলে জনতা কংগ্রেসকে এর জন্য মার্জনা করবে

কোন ধনিকের বা কোন জমিদারের কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হবে এবং কি পরিমাণ ক্ষতি পূরণ এর জন্য করতে হবে—এই বিতর্কে জনতার কোনই আগ্রহ নেই। এমন লোক দেশে আছে, যারা অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে জনতাকে বলবে—রুষিয়া ও চীনে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতে তা সম্ভব হ'বে না কেন? অর্থনীতির হিসাব বা ন্যায়-শাস্ত্রের কচ-কচি জনতা শুনতে বা বুঝতে চায় না। তারা চায়, যে প্রতিশ্রুতি তাদের কাছে বছর বছর দেওয়া হয়েছে—তার পূরণ। হঠাৎ একদিন বাজার থেকে চিনি উধাও হয়ে গেল, হঠাৎ কাপড় দুর্লভ পদার্থে পরিণত হ'ল, হঠাৎ এক দিন লবণ পাওয়া গেল না। এমনি সব ঘটনার তদন্ত চলল; ছ' মাস বা এক বছর অনুসন্ধান ও তদন্ত করার পর সব কিছুই চাপা পড়ল। কারোর গায়ে আঁচড় লাগল না; কারোর পকেট থেকে একটি পয়সা-ও বের হ'ল না। মন্ত্রীরা সবাই বললেন এ সব ঠগবাজী, ঠগী কারবার···ইত্যাদি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল বাক্যই রইল—আর কিছুই হ'ল না। জনতাকে আঙুল দিয়ে অন্য লোক বুঝিয়ে দিচ্ছে—সরকার হয় কিছু করতে চায় না বা করতে পারছে না। এই যুগ-সন্ধিক্ষণে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এই দুটি খ্যাতিই মারাত্মক।

কংগ্রেস এতকাল যে সব সরকারী কর্ম, নীতি, পদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেছে, আজ যদি কংগ্রেসই তা করতে থাকে, তবে জনতার আস্থা কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা রাখতে পারবে না। কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার ত্রুটি-বিচ্যুতির পূরণ করতে হ'বে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে। এর ফলে সংঘর্ষ ও বিরোধ আসবে, কারণ মন্ত্রী-সভা ও সরকার কখন-ও সমালোচনাকে ভাল চোখে দেখে না,—যে কোন প্রকার সমালোচনা সম্বন্ধেই তারা অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মন্ত্রী-সভার বিরাগ ভাজন হ'তে হবে ব'লে যদি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিজের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে অবচেতন হয়—যদি বার বার সে কথা জনতার সামনে ও মন্ত্রী-সভার সামনে না ধরে, তবে কংগ্রেস নিজের প্রতি, নিজের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি, দেশের প্রতি ও জনতার প্রতি কর্তব্যের উপেক্ষার অপরাধী হবে।

খেদ

শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পেয়েছি অনেক কিছু
হারায়েছি পেয়ে
নিষ্ফল বিয়োগ ব্যথা, রুদ্ধ আঁখি বেয়ে
ঝরে না দুফোঁটা অশ্রু!
বাঁধ ভাংগে—বাঁধা তবু থাকে,
করিতে চাহে যে বৃষ্টি হারায় তা রুদ্ধ ঘূর্ণিপাকে।
যখনি পেয়েছি ব্যথা
তারই ঢেউ লাগে দুনয়নে।
ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, শুষ্ক আঁখি কেন অকারণে
জানি না কাঁদিয়া ফেরে,
রুদ্ধ আঁখি বিদ্ধ করিবারে
আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তিক্ত হাহাকারে।

———

শিল্পী

রেণুকা বিশ্বাস

শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনে একটা বৈচিত্র্যের সুর এনে দিল পায়রা জোড়া। বিরাট ক্যানভাসের গায়ে তুলির পোঁচ পড়ছে। শিল্পীর চোখে স্বপ্ন। সাদায়, কালো, সবুজে কালোর একটা চিত্র ধীরে ধীরে ক্যানভাসের গায়ে ফুটে উঠতে লাগল—সামনে সবুজ ঘাসের ছোট্ট লন—একটা একতলা বাড়ী হাল ফ্যাসানের, বাড়ীটার পাশ দিয়ে চালা ছাড়িয়ে উঠেছে একটা সাদা বকফুলের গাছ—ধবধবে সাদা ফুলগুলো যেন গুচ্ছ তুলে আছে। তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে একটা শিউলির গাছ—গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলভারে নত। শরতের নবে-জাগা রোদ আবছা কুহেলী ভেদ ক'রে এসে পড়েছে শিউলি গাছটার উপর—বাড়ীর কার্ণিশের উপর। সেই রোদটুকুতে পরম নিশ্চিন্তে বসে দু'টি সাদা পায়রা—ছবিটা হল এই। শিল্পী তন্ময় হ'য়ে আঁকছেন আর মাঝে মাঝে পরম তৃপ্তিতে চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

ঘরে এসে ঢোকে অসিত। শিল্পীর ধ্যানভঙ্গ হয়—"কিরে তুই হঠাৎ কোথা থেকে?"—একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে চিত্রী সোমনাথ বল্লেন।

"বারে! দাদাকে দেখতে আসতে নেই বুঝি? সত্যি কদ্দিন বাদে এলাম সোমদা।"—

দুজনের আলাপ গাঢ় হ'য়ে আসে।

* * *

অখ্যাতনামা শিল্পী—সোমনাথ মিত্র, তাঁর প্রতিভা ছিল, স্বপ্ন ছিল কিন্তু নামের মোহ ছিল না। তিনি ছিলেন একান্তভাবে স্বাধীন মানুষ। কোন এক প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি দেখে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ তাকে সমাদরে ডেকে নিয়েছিলেন—শিল্পী চিনতে পেরেছিলেন শিল্প প্রতিভাকে।

সোমনাথ বেরুলেন আর্টস্কুল থেকে পাশ করে। সরকারী কাজও জুটে গেল একটা। কিন্তু সরস্বতীর সোনার শেকলও তাঁকে বাঁধতে পারল না। বাঁধাধরা কাজ তাঁর মন ধরল না।.....এর পর থেকে সোমনাথের জীবনে আরম্ভ হয় নূতন জীবনযাত্রা। বেছে বেছে কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে গ্রামের দিকে ছোট্ট একটা একতলা বাড়ী ভাড়া নিয়ে তাঁর শিল্পী জীবন সুরু করলেন। বাড়াটার খুব বিশেষত্ব ছিল, তা নয়—শুধু সহর থেকে দূরে প্রকৃতির সহজ আবেষ্টনীর জন্যই সোমনাথ বাড়ীটা মনোনিত করেছিলেন। এই আবাস-টুকুর সঙ্গে পরিচয় ছিল শুধু অসিতের। অসিত বন্ধু হ'লেও তাদের দুজনের ভাব গড়ে ওঠে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রীতি ঘিরেই।

* * *

একরাশ হাসি ছড়িয়ে সোমনাথ বলেন—"জানিস, অসি, আমি একটা ছবি আঁকছি। আমার সমস্ত শিল্পী-বোধের পরিচয় থাকবে এ ছবির মধ্যে। একটি ছবিতেই আমার পরিচয়টুকু দিয়ে যাবো।"—ক্যানভাসের উপর পর্দা দিয়ে ঢাকা ছবি। সোমনাথ পর্দাটা তুলে ফেলেন। ছবির দিকে তাকিয়ে অসিতের চোখ আর সরে না—সমগ্র চিত্রের মধ্যে যেন একটা প্রাণের বিচিত্র স্পন্দন, সে দেখতেই থাকে।

—"ছবির আর সব ঠিক হলেও পায়রার পাখা দুটি যেন ঠিক মনে ধরছে না,"—অনেকক্ষণ নিজের ছবির দিকে তাকিয়ে শিল্পী মন্তব্য করলেন।

—"কেন?"—আসিত জিজ্ঞেস করে, "চমৎকারইতো হয়েছে তোমার ছবি।"

—"আর না, না! তুই কি করে ধরতে পারবি কোথায় আমার ভুল। এই ভাখ—ভালো করে চেয়ে ভাখ—পাখা দুটো যেন সত্যিকারের পাখা হয় নি। মনে হচ্ছে জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি যেন।"—

—সোমনাথ আবার রঙ তুলি নিয়ে কাজ সুরু করলেন। অসিত বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখে। কারো মুখে সাড়াশব্দ নেই। অসিতের ইচ্ছে হলনা সোমনাথকে ঘিরে কথা বলায়। নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

দু তিন মাস কেটে গেছে। অসিত নানা কাজে ব্যস্ত থাকাতে সোমনাথের কাছে যেতে পারেনি। পর পর কয়েক দিন ছুটী পেয়ে সে টিকেট কেটে উঠে পড়ে শেয়ালদায়—সোমনাথের বাড়ীর উদ্দেশ্যে।.....

সোমনাথ ওটিসুটি মেরে ইজি চেয়ারে শুয়েছিলেন। ইতের সকাল। আটটা নয়টা হবে। সবে ওঠা রোদের আমেজটুকু বেশ লাগছিল তাঁর। চুপচাপ বসে আছেন—এমন সময় অসিত এসে পাশে বসে—সোমনাথ নিস্পৃহ ভাবে বলেন—"ভালো আছিস তো? কদিন দেখিনি তোকে।"

—"ভীষণ কাজ ছিল যে!"—অসিত বলে।

—"তোকেই খুঁজছিলাম রে! জানিস, জীবনটায় আমি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কোথায় যেন অভাব, কি যেন নেই।"—

অসিত চুপ করে শোনে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোমনাথ বললেন—"হ্যারে তুই কি করবি ঠিক করলি? আমি তো পারলাম না। কিছু হলনা, যা করতে চাই সব যেন পণ্ডে যাচ্ছে। কোন কাজে আর ভাল লাগছেনা। কেমন যেন Inspiration পাচ্ছি না।"

অসিত কেবল শোনে কথাগুলো; আর ভাবে তার এই আত্মভোলা দাদাটির কথা। কি যে চান তিনি তা সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ তার চোখ যায় পায়রার ছবিটার দিকে। ছবিটা বেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সে দেখল পাখী দুটো আর বাড়ীর ছাতের কার্নিশে বসে নেই, মাটীতে নেমেছে। সবুজ ঘাসের উপর বসে দুটো পাখী। অসিতের কিন্তু মন আরোগ্য হয়ে গেল। বাড়ীটার নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-স্বর্গের সঙ্গে এরের যে মিলটুকু ছিল তা যেন হারিয়ে গেছে।

সোমনাথ অসিতের মুখের ভাব লক্ষ্য করলেন।—তারপর উদ্ধত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলেন—"জানিস, আমার মনের কোথায় যেন সোজাসিধে বার হয়ে গেল—দেখলাম ঠিক সহজ হ'তে, স্বাভাবিক হ'তে পারিনি। একদিন দেখি পাখীগুলোর সৌন্দর্য ঐ কৃত্রিম ইটকাঠের দালানের সঙ্গে বেখাপ্পা দেখাচ্ছে। ওদের তাই মাটীতে নাবিয়ে দিয়েছি, ভালো করিনি?"

পাছে দুঃখ পান সোমদা তাঁর বিরুদ্ধ মনে, তাই অসিত মাথা নেড়ে বলে "হ্যাঁ মাটীতেই ওদের দুটোকে বেশ লাগছে।"—"কিন্তু কেউ বোঝেনারে আমার ছবি। কেউ বলে খেয়ালী। আমি প্রায়ই ভাবি অসি, আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টি কেন অমন কাপসা। এমন দেশের মাটীতে জন্মে কি করে আমরা শিল্পরুচি হারাই বলতো? দেখিস্, পাশ্চাত্য দেশের ওটি একটি মস্তো গুণ—সাধারণ ঘরের লোকেরাও কিছু কিছু ছবি বোঝে—তার খবর রাখে। আর আমাদের দেশের সহজ পাওয়া তথাকথিত শিল্পে রুচি সম্পন্ন লোকেরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায় বাজে যত ছবি। তাই কোথাও আমার ছবি পাঠাতে ইচ্ছে করে না।"—

ঘরের আবহাওয়াটা কেমন গুমট হয়ে ওঠে। সোমনাথের কথায় ঢালা বেদনার সুর যেন চারদিকে। অসিত তাকে হালকা করে নেবার জন্য বলল—"তুমিই রুচিটা বদলে দেবার ভার নাও না কেন! আমরা হয়ে যাই শিষ্য।"

সোমনাথ মৃদু হাসেন।

• • •

বেশ কিছুদিন পরে সোমনাথের চিঠি পেয়ে অসিত এসে হাজির। দেখলে সোমদা বড্ড রোগা হয়ে গেছেন।

—"সোমদা, অমন ভাইএর হঠাৎ ডাক পড়ল কেন বলতো?" অসিত জিজ্ঞেস করে।

—"ডেকেছি? হ্যাঁ ডেকেছি আমার সেই ছবিটা দেখাবো বলে।"—বলেই সোমনাথ ছবিটাকে পাশের ঘর থেকে নিয়ে এলেন—দেখা গেল ছবিটাতে বাড়ীর নাম গন্ধও নেই সুন্দর সবুজ একখানি জমিতে বসে আছে পায়রা জোড়া। পায়রা দুটো যেন গলা মোটা করে বকম্ বকম্ সুরু করেছে। অসিতের খুব ভাল লাগল—ভাবে কি এক খেয়াল। একই ছবির বিচিত্র পরিবর্তন।—"তুমি দেখছি আজকাল বেশ খুসিতে আছো সোমদা," —হেসে বলে অসিত, তাই পায়রাও আনন্দে নাচছে। সোমনাথও হাসেন—; গল্প গুজবে সময় কেটে যায়, বাড়ীর কর্ত্রী শিল্পীপত্নীও এসে যোগ দেন।

• • • •

সোমনাথের কিন্তু শান্তি নেই! আজকাল আর কোন ছবি তিনি আঁকেন না। শুধু মনে হয় কি যেন এক গভীর

চিন্তায় মগ্ন। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যায় ষ্টুডিওতে—সেই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে। ছবিতে রঙ ফলানো হচ্ছে। পায়রা একবার পুচ্ছ তুলে নাচে, কেকার অনুসরণ করতে চায় আর কখনও বা ঘুরে ঘুরে বেড়ায় সবুজ মাঠের চারদিকে।

—"নাঃ, নাঃ নাঃ, কিছুতেই হচ্ছে না।"—রঙ ও তুলিটা ফেলে রেখে ইজিচেয়ারে বসে যান সোমনাথ। মুখে হাত দিয়ে উপুর হয়ে বসে থাকেন। যে কেউ দেখলে ভাববে লোকটা পাগল। অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে পড়েন সোমনাথ, তুলি আর রঙ আবার তুলে নেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। শিল্পীর খেয়াল নেই—ঘড়ির কাঁটা কখন ঘুরল, গৃহিণী বার কয়েক ডেকে ফিরে যান। ষ্টুডিওর বন্ধ ঘরের দরজা খোলে না। শিল্পীপত্নী অবস্থা বুঝে চুপ করে রইলেন। স্বামীর স্বভাব সম্বন্ধে তাঁর কিছু অজানা নেই।

সারাদিন চলে।

রাতও শেষ হয়ে আসে।

নূতন প্রভাতের প্রারম্ভে শিল্পীর ছবি আঁকা সমাপ্ত হল। একটা গভীর পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোমনাথ আস্তে আস্তে রঙ তুলি রেখে দেন। ছবির দিকে তাকিয়ে তাঁর দুটো চোখ যেন জ্বলে উঠে।

প্রভাতের আলো ঘরে এসে পড়েছে। শিল্পীর চেতনা হয়—যে বহুক্ষণ ধরে তিনি ঘরে বন্ধ হয়ে আছেন। এমনি সময়ে দরজায় টোকা পড়ল, অতি পরিচিত পায়ের শব্দ। সোমনাথ দরজা খুলে দেন। অসিত ঘরে ঢুকলো, সামনের ক্যানভাসের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বিস্ময়ে সে চেয়ে থাকে—

"সত্যি অপরূপ এঁকেছে সোমদা! তোমার ঘোড়া পাখী শেষটায় আকাশে উড়লো?"

"হ্যারে আকাশেই মেলে উড়লো।"

"তাদের যাত্রা কোথায় বলতো?"

এক ঝলক খুশীর আলো ছড়িয়ে সোমনাথ উত্তর দিলেন—"যাত্রা কোথায় ঠিক জানি না। তবে অনির্দিষ্টের অভিমুখে তারা উড়ে চলেছে, তাদের চলার কোন সীমা নেই।"—একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বলেন—"জানিস, আমি চেয়েছিলাম শিল্পের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে দিতে। কিন্তু এতদিন পারিনি তো! টেকনিক, টেকনিক করে ঘুরে মরেছি। নিজের গোড়া মতটাকে আকড়ে থাকতে চেয়েছি, হয়রাণ হ'য়ে পড়েছিলাম মনে মনে। ছবির ধর্মটা ঠিক যেন বুঝতে পারিনি, যেদিন ভাব এসে শিরে ধরা দিল সেদিনই যেন ছবিটা প্রাণ পেল। পাখী কি আর বসে থাকে!—তাই উড়ে চলল।... জানিস সে এক বিচিত্র অনুভূতি, একটা অপূর্ব আনন্দ!... তোকে ঠিক বোঝাতে পারছিনারে—আমি যেন সব কিছুর অর্থ খুঁজে পেলাম।...পাখী দুটোর যাত্রা কোথায়? হ্যা—অচিন্তিতের দিকে অভাবিতের দিকে। সত্যি আমি যেন প্রাণ পেয়েছি, ছাক ছেড়ে বেঁচেছি। এই একটি ছবিই আমাকে পথ বলে দিলে। শিল্পের মুক্তি দিতে হবে, কোন সংস্কার কোন বন্ধনেই একে প্রাণ দিতে পারে না রে, যেদিন সে আপনা থেকেই ধরা দেয়—সে দিনই হয় সে সার্থক।—সেদিন শিল্পীও আর অভিন্ন হয়ে থাকে না—শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও সার্থক হয়।"

—অসিত ভাবে শিল্পীর খেয়াল বটে।

বন্যা-স্মরণে

শ্রীজয়ন্তী ঘোষ

হে বিশ্বনাথ! ভগীরথ যবে
আনে ডাকি গঙ্গারে
কেন গরজনে কাঁপে চারিদিক
ধরা কাঁদে হাহাকারে।
সে বিরাট বেগে তুমি সংহর,
দিলে পাতি' শির ভোলানাথ! হর!
সব গরজন কোথা গেল লয়,
তোমার জটায় পড়ি'
ভাগীরথী নাচি চলে কল্লোলে
যাত্রা পথের পরি'।
হে শিব! তোমার মঙ্গলময়
শুভাশীষ দিলে আনি'
ধুয়ে, মুছে গেল সগর সুতের
যত পাপ, তাপ, গ্লানি।
জাহ্নবী চলে দু'ধারে তাহার,
ঢালি' দিয়া যায় করুণা অপার!
শ্যামল-স্বর্ণ শস্য-ক্ষেত্র, উর্বরা-মরুভূমি,
অদ্রি-দুহিতা সাগরের পানে
ছুটীছে পাষাণ চুমি'।
কল্যাণময়ী! মাতার মতন
স্নেহধারা দিয়ে দিয়ে,
পুষ্ট ক'রেছো রুক্ষ মাটিরে,
কোমল ক'রেছো হিয়ে।
উচ্ছলতায় ভাসাইয়া দিক
আপনি চলেছো একা, অনিমিখ!
লুটায় তোমার কনকাঞ্চল
নীল দিগন্ত ছুঁয়ে,
দুটী তীরে তব বন-শিশু দল
দু'হাত বাড়ায়ে ছুয়ে।
যুগ, যুগ পরে আজি, জাহ্নবী
সাজিয়াছ রণ-সাজে,
প্রলয় নিনাদে ঐ শুনা যায়
রুদ্র ডমরু বাজে।
মানব-সুতের শত, শত পাপ,
পুঞ্জিত যত গ্লানি, অভিশাপ!
ভগীরথ ডাকে তাই কি আসিছ
উন্মাদ কলরবে?
লক্ষ শোষিত মানবাত্মার
মুক্তি এবার হবে?
হে দেবী! আজিকে তোমায় শুধাই
এ তব যাত্রা-পথে
কোন শঙ্কর পাতি' দিবে শির?
কার জটাজুট হ'তে
আসিবে নামিয়া আবার শ্রাবণ?
আসিবে নামিয়া দানের প্লাবন?
শত বরষের শত স্মৃতি মাখা
কলুষের অবসান?
ভীত, আর্ত মূঢ় জনগণে
হাহাকারি' চাহে ত্রাণ।
এসো হে পিণাকি! এস, এস ত্বরা
পাতো তব মহাশির!
আর্যাবর্ত সলিল প্লাবিত!
এস মহাযোগী, স্থির!
কত গ্রাম গেল বন্যায় ভাসি,'
কত মানবের প্রাণ দিল নাশি'!
গৃহে, গৃহে শুনি ক্রন্দন-ধ্বনি
ধ্বংসেরে কর রোধ;
আপন ভাগ্য-বিধাতা মানব
এ কি তারি প্রতিশোধ?
জাহ্নবী! তব পুণ্য-পরশে
একদা করেছ ত্রাণ!
শত উদ্ধত রাজকুমারের
অপমান অবসান।
আজিও কি তব পুণ্য পরশে
লক্ষ পরাণ বাঁচিবে ধরবে?
হবে কি পতিত, মূক জীবনের
বেদনার সমাপন?
জোড় করে আজি প্রশ্ন শুধাই
আসিবে কি শুভক্ষণ?

আচার্য বিনয় কুমার সরকার

শ্রীবাসুদেব দত্তরায়।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় এসিয়ার নব-জাগরণ বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহা যে কেবল রাজনৈতিক জাগরণ তাহাই নহে। এখানে এসিয়ার চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এসিয়া যেন নূতন করিয়া নিজকে আবিষ্কার করিতে লাগিল। ফলে কয়েক সহস্র বৎসরের পুরাতন মানব সভ্যতার অভিজ্ঞতার সহিত নূতন রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিল। এসিয়ার নব জন্ম হইল।

এসিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লব সুরু হয়—সূচনা করে রুশ-জাপান যুদ্ধ। এসিয়ার জাপান—ইউরোপের বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ রাশিয়াকে এসিয়ার বুকে পরাজিত করে। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এসিয়ার চিন্তাধারার রূপ বদলাইয়া দেয়। বিশ্ব শক্তির সদ্ব্যবহার—ইহাই হইল রুশ-জাপান যুদ্ধের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় পাশ্চাত্য দেশ সমূহ অগ্রগামী। এসিয়ার রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলসূত্র—আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার অভাব।—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাপান ইহা অনুভব করিয়াছিল। দ্রুততর বেগে জাপান আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা লাভ করিল।

বিশ্ব-শক্তির সদ্ব্যবহার—ইহার অর্থ শুধু আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া—ইহাই মাত্র নহে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রশক্তিগুলির আপন আপন স্বার্থের যোগ বিয়োগের খেলা—ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও প্রয়োগ করা—বিশ্ব শক্তি সদ্ব্যবহারের অন্যতম উপাদান। জাপান বুঝিয়াছিল স্বীয় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ—এই বিশ্ব শক্তির সদ্ব্যবহার।

রুশ জাপান যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা এসিয়ার রাজনীতি ও চিন্তাধারায় প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। এসিয়া তথা ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নে বিভোর আচার্য বিনয় কুমার সরকার—ইহা গভীর ভাবে উপলব্ধি করিলেন। বিশ্ব শক্তির সদ্ব্যবহার—স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার অন্যতম বিশিষ্ট উপায় এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে দেশে বিদেশে বিনয় কুমার রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারায় বিপ্লব আনয়ন করিলেন। বিশ্ব শক্তির সমাবেশে স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা সম্ভব। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করিল—তাহা বিশ্ব-শক্তি সমাবেশ ও সদ্ব্যবহারের বাস্তব ফল।

ভারতের পক্ষে এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কি? কেহ কেহ ইহাকে স্বাধীনতা বলেন—কেহ কেহ ইহাকে স্বাধীনতা বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বাধীনতা কি? বিনয়কুমার বলিতে লাগিলেন—স্বাধীনতা রকমারি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করিল—উহা স্বাধীনতা। কিন্তু উহা হাজার রকম স্বাধীনতার এক বিশেষ রূপ। স্বাধীনতা আপেক্ষিক। ইহা কালহীন ও স্থানহীন কোন বস্তু নহে। মামুলী ইতিহাসে আমরা পড়ি—১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারত স্বাধীনতা হারাইল। বিনয় কুমার বলিলেন—ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের নরনারী স্বাধীনতা পাইল। সাধারণ ইংরেজ নরনারীর নিকট স্বাধীনতার যে রাজনৈতিক অর্থ—পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতের নরনারী—ইংরেজ নরনারীর স্বাধীনতা পাঠশালায় অ আ ক খ পড়িতে আরম্ভ করিল। মোগল আমলের স্বাধীনতা শব্দের অর্থ ১৭৫৭ সালের ভারতের নরনারীর স্বাধীনতা শব্দের অর্থ হইতে মূলতঃ ভিন্ন। মোগল আমলে—সাধারণ হিন্দু নরনারীর—সাধারণ মুসলমান নরনারীর না ছিল কোন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা ও নিরাপত্তা। উহা ছিল আমির, ওমরাহ, সুবেদার, মনসবদার শেঠজী ও সামন্ত রাজদের স্বাধীনতার যুগ। সাধারণ ভারতীয় নরনারীর সহিত মোগল আমলের স্বাধীনতার সহিত কোন নাড়ীর যোগ ছিল না। ইংরেজ আমলে ভারতের সাধারণ নরনারী—ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাচ্ছন্দতা ও নিরাপত্তা লাভ করিল। রাজদ্বারে আইনের চোখে সব মানুষ সমান—ইহা স্বীকৃত হইল। ইহা স্বাধীনতা বৈকি। ভারতের ইংরেজ যুগও—হাজার রকম

স্বাধীনতার একেরকম রূপ সাধারণ মানুষের জীবনের অর্থ নূতনরূপে দেখা দিল।

পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজ যুগেও স্বাধীনতার ক্রমবিকাশ হইতে লাগিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন—ভারত—স্বাধীনতার ইংরেজ প্রদত্ত নূতন সনদ। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী—পেশোয়ার হইতে চট্টগ্রাম—এক যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা হইবে—এই রাষ্ট্রে ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহ যুক্তরাষ্ট্রের অংগীভূত হইবে। ইহা নূতন স্বাধীনতার পরিকল্পনা। ছিন্ন-ভিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত এক যুক্তরাষ্ট্র হইবে—ভারতের দীর্ঘ বিচিত্র ইতিহাসে ইহা নূতন অভিজ্ঞতা। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সম্পন্ন যৌথ যুক্তরাষ্ট্রের সনদ স্বাধীনতা বটে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের ভারতের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা স্বাধীনতার আরও অগ্রবর্তী আর এক বিশেষ রূপ। কিন্তু ইহাই স্বাধীনতার শেষ নহে। স্বাধীনতা রকমারী।

প্রতিটি মানুষ বিশিষ্ট। আপন আপন চিন্তা, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার গৌরবে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র ও উজ্জ্বল। রাম আপন অভিজ্ঞতার ও চিন্তার বিশিষ্ট। রহিমও তাহাই। যদু ও এন্টনীর ক্ষেত্রে ইহাও ঠিক। রামের ভিতর রহিমকে ঠিক মত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রহিমকে দিয়া এন্টনীকে সঠিক বিচার করা যায় না। রাম, রহিম, যদু, এন্টনী—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র—অথচ প্রত্যেকেই কতগুলি সাধারণ গুণাবলীর সমষ্টি—কারণ তাহারা মানুষ। প্রত্যেকে বিভিন্ন—অথচ এক সাধারণ একতার ঐক্যতানে পরস্পর বাঁধা। আন্তর্মানবিক সম্পর্ক জ্যামিতিক। এক দৈত ব্যক্তিত্বের দোলায় মানব জীবন প্রবাহমান। মানব সভ্যতার মূলসূত্র এইখানে পাওয়া যায়।

মানব সমাজ অগ্রসর হইতেছে। সমাজের বিকাশ লাভ হইতেছে। ইহা সভ্যতার অভিব্যক্তি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলগত কোন প্রভেদ নাই। মানব সভ্যতার বিকাশের পথে—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার রূপ—মাত্র আকার প্রকারের ভিন্নতা মাত্র। মূলতঃ মানব সভ্যতার ধারা এক। ইহার মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা বলিয়া মূলগত কোন পার্থক্যের রেখা টানা যায় না। মানব-সভ্যতার এই রূপ উদার ও মানবিক ব্যাখ্যা দিয়া বিনয় কুমার আমাদের চিন্তাধারার আলোড়ন উপস্থিত করেন।

বিনয় কুমার আশাশীল প্রগতিবাদী। আমরা আগাইয়া চলিতেছি। মানব সমাজ অগ্রসর হইতেছে। ভারতবর্ষ তথা বাংলা দেশও অগ্রসর হইতেছে। তরুণ-তরুণীর কর্মশক্তির উপর বিনয় কুমারের ছিল অসীম আশা ও আস্থা। দেশের বিজ্ঞান যখন তরুণ তরুণীর কর্মশক্তি সম্বন্ধে আশংকা প্রকাশ করেন—বিনয় কুমার তখন তারুণ্যে জয়ধ্বনি করেন। ত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশে কয়জন বৈজ্ঞানিক ছিল? আজ অনেক। কয়জন বাংগালী জীবন বীমার অর্থ বুঝিত? কতজন বাংগালী সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিত? আজ অনেক বাংগালী তরুণ তরুণী এই সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছে। কতজন তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত? আজ শত শত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার অধ্যাপনা ও বাংগালী তরুণী করিতেছে।

বাংলা তথা ভারতের মরা গাংগে বিংশ শতাব্দীতে জোয়ার আসিয়াছে। এই স্রোতবেগের রূপরেখা যাহারা দিয়াছেন—আচার্য বিনয় কুমার সরকার তাহাদের অন্যতম।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

—'ভবঘুরে'—

(তিন)

পরের দিন ভোরে যখন ঘুম ভাঙল—তখন সকলেরই অবস্থা কাহিল। সমস্ত শরীরে—হাতে, পায়, কাঁধে অসম্ভব ব্যাথা। পুরো ন'ঘণ্টা বিশ্রামের পরেও শরীরের অবসাদ দূর হয় নি। যাত্রীদের কোলাহলে যখন ঘুমটা ছেড়ে পালাল—তখন তো একেবারে 'পি—পু—কি—দু'র অবস্থা। ঘুম ভেঙে গেলেও তাই বিছানা ছাড়বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না—কারুরই। সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা ভোরেই শয্যাটা ত্যাগ করে ফেলেন—আজ তাঁদেরও ত্যাগের উৎসাহ বিশেষ দেখা গেল না। আর আমরা তো তাঁদেরই তাড়ায় উঠি। কিন্তু আজ তাড়া দেওয়ারই লোকের অভাব।

সেই রাত থেকে উঠে লোটা কম্বল বেঁধে যাত্রীরা রওনা হ'তে আরম্ভ করেছে। রাত থেকেই তাদের কথাবার্তায়, জিনিষপত্র বাঁধাবাঁধির শব্দে, কুলির হাঁকডাকে সারা ধর্মশালা মুখর হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকেরই যেন লক্ষ্যে পৌছাবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে—শুধু আমরাই কয়েকজন নির্জীবের মতো চুপ করে শুয়ে আছি—যেন কোন কাজ নাই, কোন উদ্বেগ নাই, কোন আগ্রহ নাই—চোখে যে ঘুমের ঘোর আছে—তাও নাই।

আগের দিন রাতে এক পঞ্জাবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক দারোগাগিরিতে চুল পাকিয়েছেন। শেষ বয়সে 'পেন্সন' নিয়ে ঘর সংসারে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু মন বসল না। 'ঘর' আগেই ছেড়ে গেছেন। সংসারেও তাই বোধ হয় পোষাল না। বীতস্পৃহ হ'য়ে নিরুদ্দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। খেয়াল হওয়ায় হিমালয়ের পথ ধরেছেন। ভোরে যাওয়ার পথে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি বলে গেলেন—"আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম করে শরীরটাকে একটু চাংগা করে নিন। তার পর একটা কুলি ঠিক ক'রে নিয়ে আসুন—পথে দেখা হবে।"

আজ যে এখান থেকে নড়ব না—এটা কাল রাতে শোয়ার আগেই প্রায় ঠিক করে নিয়েছিলাম। কিন্তু কুলি! আসবার আগে সবাইকে বড় গলায় বলে এসেছি—কুলির—আমাদের—প্রয়োজন হবে না। আজকে আবার কুলি ক'রতে যাই কোন মুখে? আবার এগিয়ে না গিয়ে ফিরে গিয়েই বা বলব কি? বিশেষ করে ঐ ঊর্দ্ধ-পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিটী যদি এগিয়ে যেতে পারেন—তবে তাঁর বয়সের অর্ধেকটা পর্যন্তও না পেরিয়ে আমরাই বা পিছিয়ে যাব কোন লজ্জায়? কিন্তু ঐ বোঝা? বোঝার কথা মনে হ'লেই তো সব উৎসাহ ফুৎকারে নিভে যায়। উভয় সমস্যায় পড়ে আকাশ পাতাল ভাবছি—এমন সময় একটী সঙ্গী উঠে পড়ে বলল—"দেখুন, কুলি যদি করেন তো আমি আপনাদের দলে আছি—না হ'লে এখান থেকেই হিমালয়কে নমস্কার করে আমি বিদায় নিচ্ছি।"

আঃ, বাঁচালে, ভাই,—সমস্যার সমাধান করে উঠে বসলাম। সঙ্গীটী সবে মাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই আমাদের সঙ্গে ঝুলে পড়েছিল। প্রথম থেকেই সে কুলি নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু আমাদের উৎসাহের বন্যায় তখন তার সে প্রস্তাব ভেসে গেছল। এখন সুযোগ বুঝে সে তার প্রস্তাব আবার পেশ করল—আর আমাদেরও মুখ রক্ষা করল। অন্ততঃ একটা কৈফিয়ৎ তো জোগাড় হ'ল।

উঠে বসে বললাম—"তাই কি হয়? একসঙ্গে এসেছি—" সমর্থনের জন্য অন্যান্য বন্ধুদের মুখের দিকে তাকালাম। তাঁরা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার আমাদের তরুণ বন্ধুটীর দিকে চেয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, তাতো বটেই, ওকে ছেড়ে তো যাওয়া যায় না—তাহ'লে কুলির চেষ্টা ক'রতে হয়।"

কুলি করা হবে ঠিক হয়ে গেল। তখন বিছানা ছেড়ে বাইরে এলাম। আগের দিন এমন সময় শীতে হাত বেঁকে যাচ্ছিল। আজ বাইরে এসে দেখলাম—বেশ গরম। এক বন্ধু বল্লেন—"প্রায় বেরাছনের সমতলে নেমে এসেছি।"

তা হবে বোধ হয়। নেমেছিও তো কম নয়। প্রায় সাত মাইল একটানা নেমে এসেছি। যাই হোক,

হোটেল ভাল ক'রে দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

ভন্ডিয়ানা জায়গাটা মন্দ নয়। ছোট্ট জায়গাটুকু ঘিরে চারি পাশ দিয়ে উঠে গেছে সুউচ্চ পাহাড়ের সারি। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ক্ষীণধারা ভাগীরথী, তার ফেনোচ্ছল শুভ্র তরঙ্গ পাথরের টুকরার আলিঙ্গনে কলরব-মুখর হ'য়ে উঠেছে। দিনরাত একটা একটানা শব্দ কানে বাজছে। এই পরিবেশের মাঝখানে একটী ধর্মশালা এবং কয়েকটী দোকান নিয়েই ভন্ডিয়ানা। ও পাশে টিহরি থেকে যে পুরাণো সড়কটা ধরাসু হ'য়ে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে চলে গেছে—সেটাকে এখন আরও চওড়া ক'রে মোটর রাস্তা তৈরী হচ্ছে। দু' এক বছরের মধ্যে মোটর চলাচল ক'রবে মনে হয়।

চার পাশ ঘুরে আবার ধর্মশালায় ফিরে এসে রান্নায় মন দিলাম। কাল থেকে খাওয়া হয় নি—ভালরকম। ক্ষুধাও বেশ পেয়েছিল। কাজেই আর দেরী করা সমীচিন মনে হ'ল না। স্বপাক রন্ধন—কাজেই খারাপ হ'লেও কাউকে বলবার নাই। তবে বিশেষ খারাপ ক'রতে পারা গেল না—অন্ততঃ পক্ষে গলাঃকরণ ক'রতে বিশেষ অসুবিধা হ'ল না। অথচ ভগবান জানেন—আমরা চেষ্টার ত্রুটী করি নি।

খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বিশ্রামের আশায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানে মোর কার সাধ্য!—প্রচণ্ড মাছি। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে গুণ গুণ ক'রে গান জুড়ে দিল—শুধু গান শুনিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, হাতে, পায় সুড়সুড়ি দিতে লাগল—দু' চারটা কামড়ও যে না দিল—তা নয়। হঠাৎ বাংলার রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটা কবিতা মনে পড়ে গেল—"দিনে পা পড়িবামাত্র, বসে মাছি সর্ব গাত্র.....প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত।" লিখবার আগে কবি বোধ হয় হিমালয়ে এসেছিলেন। এখানে মাছির জ্বালায় অতিষ্ঠ হ'য়ে ফিরে গিয়ে মাছির উপরে একহাত নিয়েছেন।

বিশ্রামের আশা বৃথা। কাজেই বিছনা ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলাম।

বিকালে পাশের একটা ঝরণার ধারে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় দেখলাম—একটী পাহাড়ী লোক কলসী নিয়ে জল ভরছে। লোকটা কেমন যেন একটু অদ্ভুত প্রকৃতির—মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল—কোমরে জড়িয়ে একটা ছোট কাপড়—দীর্ঘ দিনের মহলার ভারে তার রং ফিকে গেছে; চোখের দৃষ্টিটাও কেমন যেন উদাস। কুলির চেষ্টায় ছিলাম। ভাবলাম—লোকটা হয়ত বেকার কুলি হ'তে পারে। এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—"তুম্ ক্যা করতো হো?"

—"হাম 'বোকী' হুঁ"—

'বোকী'? 'বোকী' কি রে বাবা? আমাদের হিন্দিজ্ঞান তখনও 'বোকী' পর্যন্ত এসে পৌছায় নি। সমাধানের আশায় বন্ধুদের মুখের দিকে তাকালাম। তাঁদের অবস্থাও তথৈবচ। অগত্যা পাল্টে প্রশ্ন করলাম—

—"ক্যা,—'বোকী'—ক্যা"

—"কুলি—সেঠজি—কুলি"

একটী বন্ধু ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে বললেন—'বোক' (বোকা) শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ঈ প্রত্যয় করে হয়েছে 'বোকী'

আর একটী বন্ধু প্রতিবাদ করলেন—"উঁহু, 'অস্ত্যর্থে' নয় এখানে 'বহত্যর্থে'

—"তাই হবে বোধ হয়"

যাই হোক—সে সব সুখ দিয়ে আমাদের কৃতার্থ ক'রতে রাজী হল। কথাবার্তা পাকা করবার জন্য তাকে ধর্মশালায় ডেকে নিয়ে গেলাম। সেও তার দু' চার জন 'জাত ভাইয়া'কে ডেকে নিয়ে এল। কথাবার্তাও ঠিক হয়ে গেল। সে আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে একমণ জিনিষ নিয়ে যাবে। দক্ষিণা স্বরূপ আমাদের দিতে হবে একশ' ষাট টাকা, আর খোরাকী, তবে সে রান্না করে দিতে রাজী আছে।

কথায় কথায় প্রকাশ পেল—লোকটা নাকি আবার নেপালী ব্রাহ্মণ। শোনা যায় ব্রহ্মপদ লাভের জন্য বিশ্বামিত্র কয়েক যুগ ধরে তপস্যা করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণত্বের নমুনা যদি এই হয়—তা হ'লে যাতে এটা ঘাড়ে না চেপে বসে—তার জন্য বিশ্বামিত্রের চেয়েও কঠোর তপস্যা করতে আমি রাজী আছি।

কিন্তু ওরট হাতে খেতে হবে? বন্ধুদের কথাটা বলতেই একজন বল্লেন—"নিজেদের সাবান খরচ ক'রে ওকে একটু সংস্কৃত করে নিতে হবে আর কি? আর তাছাড়া ওকে বাদ দিলে অন্য লোক পাবে বা কোথায়?"

—"তা তো বটে, কিন্তু···"

—"মা ভৈষী। ওর ব্রহ্মপদের ঐ ধ্বংসাবশেষটুকু না যুচান পর্যন্ত নিজেরাই হাত পুড়িয়ে খেতে পারব।"

কথা বলতে বলতে অন্ধকার হ'য়ে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি—ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, পাহাড়ের মাথায় শুক্লা ষষ্ঠীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। কিন্তু আকাশ এখানে বড় সীমাবদ্ধ। মনে হয় যেন—সামনের ঐ পাহাড়টার ওপাশেই আকাশের সীমা শেষ হ'য়ে গেছে। ছোট ঐ অনুদার আকাশটুকুর মধ্যেই কয়েকটা তারা আর চাঁদ দেখা যাচ্ছে। তারা গুলোও অত্যন্ত অপ্রচুর—যেন হাতে গুণে ফেলা যায়।

আকাশটা দেখে সন্তুষ্ট হওয়া গেল না। এ যেন কোন বন্দীশালায় এসে হাজির হয়েছি। সুউচ্চ তার দেওয়াল —চারিদিকে প্রহরী—উদ্ধারের কোন আশা নেই—পালাবারও কোন পথ নেই।

ধর্মশালায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন ভোরেই ভল্ডিয়ানা ছাড়লাম। পূর্ব পরিচিত কুলি দেবতাটী আগের দিন রাত থেকেই আমাদের সঙ্গ নিয়েছেন। লটবহরের বেশীর ভাগ গুরুত্ব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে লঘুভার হ'য়ে বেরিয়ে পড়লাম।

লছমীরাম (আমাদের কুলিটীর নাম) বেশ ভার বইতে পারে দেখলাম। প্রায় মণখানেক ভার নিয়ে সে বেশ নির্বিবাদে হেঁটে চলে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম —পাহাড়ীদের শরীরের চেয়েও পায়ের গঠনটা খুব মজবুত শরীরটা সাধারণতঃ একটু বেঁটে হ'লেও পায়ের মাংসপেশীগুলো বেশ মোটা এবং সুগঠিত। মেয়ে পুরু সকলেরই এই রকম দেখা যায়। পুরুষানুক্রমে পাহাড়ের বুকে ঘোরা ফেরার ফলেই বোধ হয় পাহাড়ের পথে চলবার উপযুক্ত করেই এদের হাত পা—শরীর গঠিত হ'য়েছে।

লছমীরামকে খানিকটা এগিয়ে দিলাম। পাহাড়ের বাঁকে সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। একটু ভয়ও হ'ল। হয়ত বা ভারী বোঝা বইতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে দেখে ভূভারহারী মধুসূদন লছমীরামকে পাঠিয়ে আমাদের কিছু ভার হরণ করলেন। তবে শুনেছি—এদেশের কুলিরা খুব বিশ্বস্ত। ঐ বিশ্বাসটুকু সম্বল ক'রেই এগিয়ে চললাম।

গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর পথে হৃষিকেশ থেকে টিহরি পর্যন্ত মোটর রাস্তা আছে। সেই রাস্তাটাকেই ধরাসু পর্যন্ত বিস্তৃত করবার কাজ চলছে। পুরাতন সড়কটাকেই কেটে ছেঁটে নূতন পাকা সড়ক তৈরী হচ্ছে। সড়ক ধ'রে যাওয়ার উপায় নাই। কাজেই ভবিষ্যৎ যাত্রীদের কল্যাণ কামনায় আমাদের পাকা সড়কের আশা ছাড়তে হ'ল। পাকডাণ্ডীর চড়াই উৎরাইময় পথে পাক খেতে লাগলাম।

পাকডাণ্ডী মানে সাধারণতঃ সোজা রাস্তা। কিন্তু এখানে পাকডাণ্ডী মানে ঘোরা রাস্তা। সড়ক ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপর গর্জন গাছের বনের ভিতর দিয়ে সরু এক কালি পথ। কখনও বোঁ বোঁ ক'রে উপরে উঠে যাচ্ছি—আবার কখনও সোঁ সোঁ ক'রে নীচে নেমে যাচ্ছি। কুলি ব্যাটা কোন পথ দিয়ে গেছে—কে জানে? শুধু তাকে গন্তব্য স্থানটা বলে দিয়েছি।

পাহাড়ের পর পাহাড় পিছনে ফেলে চলেছি। এক জায়গায় দেখলাম—একটা জীর্ণ কুটীর—পাশে কয়েকটা ছাগল ভেড়া চরছে—পাশাপাশি আর কোন কুটীর বা জনমানব নাই। কৌতুহল হ'ল. এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—কুটীরের অধিবাসী—স্বামী, স্ত্রী, তাদের কয়েকটী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে— সকলেই তাদের কুটীরটীরই প্রতিচ্ছবি, —কাঠামোটা জীর্ণ শীর্ণ—যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে, আর আচ্ছাদনটা ছাটা, ফুটো—জোড়াতালি দিতে দিতে মূল জিনিষটারই পাত্তা হারিয়ে গেছে।

এখানে একটা জিনিষ দেখলাম—কম্বল বোনা হচ্ছে, ভেড়ার লোম থেকে এরা নিজেরাই আগুনের তকলীতে সুতা তৈরী ক'রে নেয়। তাই থেকেই কম্বল জাতীয় একটা বস্ত্র তৈরী হয়। তাঁতটা এবং বুনবার পদ্ধতি—

আমাদের দেশের হাত তাঁত—বা ইংরাজীতে যাকে 'pit loom' বলে—সেই ধরণের। এই লোম দিয়ে মোটা যে কাপড় তৈরী হয়—সেইটাই এদেশের মেয়ে পুরুষের একমাত্র পরিধেয়—বিশেষ ক'রে মেয়েদের। তারা ঐ মোটা কম্বলের মতো কাপড় দিয়ে 'ঘাঘরা' জাতীয় একটা পরিচ্ছদ বানিয়ে নেয়। গায়ে সাধারণতঃ এক বা একাধিক জামা থাকে। এইটাই এদেশের মেয়েদের 'জাতীয় পোষাক' বলা যেতে পারে। শীত, গ্রীষ্মের বালাই নাই—ঐ একই পোষাক। কঠোর শীতে—যেখানে আমরা—কোট, সোয়েটার, মোজা, মাফলার চড়িয়েও হি হি ক'রে কাঁপতে থাকি—সেখানে তাদের ঐ পোষাকেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখি, আবার চরম গ্রীষ্মে যেখানে গায়ে কাপড় রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়ে—সেখানেও তারা ঐ মোটা কম্বলকে গায়ে রাখতে অসুবিধা বোধ করে না। এদেশের লোকের অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য এবং অন্যান্য বস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই বোধ হয় মূল কারণ।

কুটীরবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চললাম। একটুপরে নামতে নামতে একেবারে অনেকটা নীচে নেমে এলাম। এখানে একটা বড় ঝরণা পেরোতে হবে। ঝরণার জল পেরোবার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম—ছোট একটা কুঁড়ে ঘর থেকে একটা ঘর ঘর আওয়াজ ভেসে আসছে। ঝরণাটা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম—ব্যাপার কাণ্ড—একেবারে বৈজ্ঞানিক ব্যাপার! খরস্রোতা ঝরণার একটা ছোট স্রোতকে বাগিয়ে নিয়ে এসে কয়েকটা কাঠের পাখার উপর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে পাখা গুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরের যাঁতাটা ঘুরে গম পেষা হচ্ছে। হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরের মধ্যে বিজ্ঞানের এই কেরামতি দেখব এতটা আশা করি নি। পরে দেখেছি—এটা অতি-সাধারণ ব্যাপার—হামেশাই দেখা যায়। প্রায় প্রতি গ্রামেই একটা, দুটো বা ততোধিক কল থাকে। গ্রামবাসীরা প্রয়োজনমত যাঁতা চালিয়ে নিজেদের গম পিষিয়ে নিয়ে আসে।

ঝরণাটা পেরিয়ে গিয়ে দেখি—কুলি অবতার লছমীরাম বসে আছেন। আমাদের দেখেই সে দাঁত বের ক'রে হেসে বলল—"হাম তো সিধা রাস্তামে জলদী আ গয়ে, শেঠজী।"

হঠাৎ দেখছি—শেঠজী বনে গেছি। কুলি ডাকে—'শেঠজী', দোকানদার সম্বোধন জানায় 'শেঠজী' বলে, রাস্তায় চলতে চলতে ছেলেমেয়েরা কুর্নিশ করতে করতে বলে—"গঙ্গাজীকি জয়—একঠো পাই পয়সা দিলা দো শেঠজী"। এদের বোধ হয় ধারণা—যে বড় বড় শেঠ আড়তী ছাড়া আর কেউ এ পথে পা বাড়ায় না। এত পয়সাই বা আর কার হবে—আর খানিকটা পুণ্য (?) কিনে নিয়ে পাপের ভারসাম্য বজায় রাখবার প্রয়োজনই বা আর কার হবে—অবশ্য পয়সা বিহীন সাধু সন্ন্যাসীরাও যেতে পারে—কিন্তু তাদের তো আর জামা কাপড়ের চাকচিক্য নাই। তাঁরা তো এদেশে 'মহাত্মা' নামে পরিচিত। বাকী যারা ফর্সা জামা কাপড় পরে, তাদেরই যেন ভাইয়াদের পিঠে বোঝা চাপিয়ে পথ চলেন—তারা 'শেঠজি' না হ'য়ে যায় কোথা? তাই বোধ হয় এরা আমাদেরকে জগৎ শেঠ বা শ্রেষ্ঠী ধনবানের অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোছের ধরে নেয়।

এদের ধারণা অবশ্য একেবারে অমূলক নয়। যুগ যুগ ধ'রে এরা এই-ই দেখে এসেছে। নিছক দেশ দেখবার প্রয়োজনে কেউ এত কষ্ট স্বীকার ক'রে তাদের দেশে যেতে পারে—এটা তারা কল্পনাও ক'রে নি।

কিছুক্ষণ চলবার পর মোট পাঁচ মাইল হেঁটে এসে একটা গ্রামে পৌঁছালাম। গ্রামটার নাম—'ছাম', এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা। একটী ধর্মশালা এবং কয়েকটী দোকানও আছে—এখানে। ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ধর্মশালাটী নেপালের রাজ-মন্ত্রী রাণা সমসের জঙ্গ বাহাদুর মহারাণীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরী ক'রে দিয়েছেন।

ধর্মশালার দ্বিতলে গিয়ে দেখলাম—ছোট একটী পাঠশালা বসেছে। একজন অবসর প্রাপ্ত সৈনিক গুরু গিরি করছেন। পরণে তারকা চিহ্নিত খাস সৈনিকের পোষাক—হাতে একটা বেত। সৈনিক জীবনের শেখা মানুষ-পিটান বিদ্যাটা এখন ছাত্রদের উপরে প্রয়োগ করে পুরাতন অভ্যাসটা বজায় রাখছেন—বোধ হয়।

(ক্রমশঃ)

ফুলটুসি

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

পুকুর ধারে বড়ে নুইয়ে পড়া কদম গাছটার ডাল ধ'রে সাঁতার কাটে—না, সাতার কাটে না—সাঁতার দেখে দত্ত বাড়ীর ফুলটুসি। বর্ষায় ফুলে ওঠা পুকুরের কালো জলে চোখ দু'টো ডুবিয়ে দিয়ে পা দু'টো জলের উপর আছড়ে ফেলে মনে করে সাঁতার কেটে না জানি কত দূরেই চ'লে গিয়েছে সে। তা'র এলিয়ে পড়া মিশ্‌মিশে কালো চুল-গুলো ছোট ছোট ঢেউ-এর সঙ্গে দুলতে থাকে জলের উপর। এক একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখে গভীর জলের দিকে। ওরে বাবা! নীচের মাটী যে একটুও দেখা যায় না। ভয় হয় ফুলটুসির। আরো ক'ষে ধরে ডালটা। কি জানি যদি বা তলিয়েই যায়!

উপর থেকে চেঁচিয়ে বলে ভুতো "উঠে আয় ফুলি, শীগ্‌গীর উঠে আয়, তোর মা আস্‌ছে লাঠী নিয়ে।"

ডুবে যাওয়া আঁচলখানা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ফুলটুসি তাড়াতাড়ি উঠে আসে। ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে এদিক ওদিক। তারপর গুম্ ক'রে ভুতোর পীঠে এক কিল্ বসিয়ে দিয়ে বলে "মিথ্যা কথা বল্‌বি কখনো?"

চম্‌কে ওঠে ভুতো। চেয়ে থাকে জলে ভেজা এলো-চুলে ঢেকে যাওয়া ফুলটুসির মুখের পানে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে যায় অন্যদিকে।

পিছন থেকে ডেকে বলে ফুলটুসি "যাস্‌নি ভুতো, ফিরে আয়।"

কিন্তু দাঁড়ায় না সে। আস্তে আস্তে যেতে থাকে সবুজ রং-এর ঘাসগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে।

দৌড়ে গিয়ে ভুতোর হাত ধরে ফুলটুসি। বলে "রাগ করেছিস্? একটুতেই বুঝি রাগ করতে হয়?"

ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলে ভুতো। জল-ভরা চোখে আর একবার চেয়ে দেখে ফুলটুসির মুখের দিকে। বলে "তুই আমায় মারলি কেন?"

ভুতোর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ফুলটুসি বলে "মেরেছি বেশ করেছি। মিথ্যা কথা বল্‌লি কেন তুই? মিথ্যা বল্‌লে কি হয় জানিস?"

কোন উত্তর দেয় না ভুতো।

ফুলটুসি আবার বলে "জিভে ঘা হয়, দাঁতে পোকা ধরে।"

হা করে জিভ আর দাঁত দেখিয়ে বলে "কৈ—ঘা হ'য়েছে? পোকায় ধ'রেছে? এ্যাঁ...আমি যেন একাই মিথ্যা কথা বলি।"

হেসে ওঠে ফুলটুসি। বলে "এখন কি! দু'দিন পরে টের পাবি।"

রেগে ওঠে ভুতো। আস্তে আস্তে যেতে থাকে ফুলটুসিদের বাড়ীর দিকে। বলে "তোর মাকে বলে দেবো সব। দেখ্‌বি তখন মজাটা।

সামনে গিয়ে আগ্‌লে দাঁড়ায় ফুলটুসি। বলে "সত্যি মাকে বল্‌বি ভুতো?"

ভুতো বলে "হ্যাঁ, বল্‌ব!"

"তা' হ'লে মা যে আমায় বড্ড মারবে!"

"বেশ হ'বে, আমি দাঁড়িয়ে দেখব আর হাসব।"

"পারবি?"

"খুব পারব।"

হঠাৎ পিছন ফিরে পীঠ পেতে দেয় ফুলটুসি। বলে "তোকে আমি মেরেছি, তুইও না হয় আমায় এক ঘা মেরে যে, তবু যেন মাকে বলিস্‌নি ভুতো।"

হাত তুলে ফুলটুসির পীঠে কিল মারতে যায় ভুতো। কিন্তু পারে না। হাত নামিয়ে নিয়ে বলে "তোকে মারতে আমি পারব না ফুলি!"

"কেন?"

"তা' হ'লে তোর বড্ড লাগবে যে!"

"মা মারলে বুঝি লাগ্‌বে না?"

"তোর মাকেও কিছু বল্‌ব না।"

"সত্যি বলছিস্ ভুতো?"

"হ্যাঁ।"

হাসির রেখা ফুটে ওঠে ফুলটুসির মুখে। বলে "আমিও তোকে আর মারব না কোনদিন।"

ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ে মুষলধারে। মাঠ, ঘাট ভেসে যায়

বর্ষার জলে পাড় ছাপিয়ে মাঠের জল এসে পড়ে পুকুরে জলের কলরোলে মেতে ওঠে পুকুরের ছোট ছোট মাছগুলো। উজান বেয়ে যেতে চায় পুরণো আবাস ছেড়ে অজানা নূতনের দিকে। কিন্তু প্রবল স্রোতে ক্ষীন হ'য়ে আসে ওদের ক্ষুদ্র শক্তি, পিছিয়ে গিয়ে পড়ে আবার পুকুরেই

ফুলটুসি আর ভুতো চুপ ক'রে বসে থাকে সেই স্রোতের পাশে, মাছ ধরবে বলে। স্রোত বেয়ে উঠতে না পেরে দু'একটা পুঁটী মাছ লাফিয়ে এসে পড়ে ঘাসের ওপর। ভুতো বলে "নড়িস্‌নি ফুলি। দেখ্‌তে পেলে মাছগুলো সব পালিয়ে যাবে।"

ফুলটুসি বলে "যাঃ, মাছে বুঝি এত দূর থেকে দেখ্‌তে পায়?"

বলে "তুই থাম্ ফুলি! ঐ ভাখ, তোর কাছে একটা লাফিয়ে এসে পড়ল। টপ ক'রে ধ'রে ফ্যাল ওটাকে।"

কিন্তু ধরতে পারে না ফুলটুসি। মাছটা লাফিয়ে গিয়ে পড়ে পুকুরের জলে।

ধমক দিয়ে ভুতো বলে "কোন কাজের না তুই। আমি হ'লে ঠিক ধ'রে ফেলতাম।" তারপর কাপড়টা কোমরে বেঁধে নিয়ে আবার বলে "চল্ ফুলি, বাড়ী চল্। আজ আর মাছ উঠ্‌বে না।"

ফুলটুসি বলে "কেন?"

"মাছটা পালিয়ে গিয়ে আর সব মাছকে বলে দেবে।"

হেসে বলে ফুলটুসি "ধ্যুর্ বোকা, মাছে বুঝি কথা বল্‌তে পারে!"

ভুতো বলে "ওসব তুই বুঝ্‌বি না। ক'টা মাছ ধরেছিস্ দেখি?"

"একটাও না।"

"আমি তিনটে ধরেছি। তোকে একটাও দেব না।"

"আচ্ছা! কাল যখন আমি অনেকগুলো ধরব তখন আমিও তোকে দেব না।"

এমন সময় শুনা যায় দু'জনের কণ্ঠস্বর। এ'পাড় থেকে ফুলটুসির মা ডেকে বলে "ফুলি বাড়ী আয়।"

ওপাড় থেকে ভুতোর মা ডেকে বলে "ভুতো বাড়ী আয়!"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলটুসি।

ভুতো বলে "কি, দাঁড়িয়ে রইলি যে?"

"যাচ্ছি!"

"নে, এই মাছ তিনটে তুই-ই নিয়ে যা।"

বাড়ীর দিকে যেতে যেতে ফুলটুসি বলে "তোর মাছ-আমি নেবো না ভুতো।"

"কেন?"

"তুই যে বল্‌লি দিবি না!"

"কখন বল্‌লাম?"

"এই ত এখন!"

"তা হোক, তুই নিয়ে যা, ভেজে খাবি।"

"তুই এত কষ্ট ক'রে ধরলি, তুই খাবি না আর আমি ভেজে খাব? সে হয় না ভুতো!"

"খুব হয়। ওকি! তুই কাঁপছিস্ ফুলি?"

"হ্যাঁ, বড্ড শীত পাচ্ছে।"

"আমারও শীত পাচ্ছে খুব। ভাখ্, হাত পা কিরকম থরথর্ করছে।"

ভুতোর গায়ে হাত দিয়ে দেখে ফুলটুসি। বলে তাই ত! উনানের পাশে গিয়ে বসে থাক্, কাঁপুনি কমে যাবে। "তারপর পুঁটী মাছ তিনটা হাতে নিয়ে বলে "একটা কথা বল্‌ব ভুতো?"

"কি?"

"তোর নেমন্তন্ন!"

"কোথায়?"

"আমাদের বাড়ীতে। আমি মাছ ভাজব তারপর তুই আর আমি দু'জনে খাব।"

"তোর মা কিছু বলবে না?"

"আমি মাকে বলে নেব।"

"আচ্ছা, এখন তবে যাচ্ছি, দেরী হ'লে মা বকবে।"

তারপর দু'জন দু'দিকে চলে যায়। বাড়ী গিয়ে ফুলটুসি ওর মাকে বলে "ভুতোকে আমি নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি মা! আমাদের এখানে ও খাবে।"

ভুতো ওর মাকে বলে "আজ আমি ঘরে খাব না মা। কুলি আমায় নেমন্তন্ন ক'রেছে।"

বেলা বেড়ে যায় আস্তে আস্তে। রান্না ঘর থেকে কুলটুসির মা ডেকে বলে "ভুতোকে ডেকে নিয়ে আয় কুলি, রান্না হয়ে গেছে।"

ঘরের বাইরে আসে কুলটুসি, পা দু'টো ওর টল্‌তে থাকে। চেষ্টা ক'রেও দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। শরীরটা যেন ঝুঁকে পড়তে চায় সামনের দিকে। চোখের সামনে অন্ধকার হ'য়ে আসে সব।

রান্নাঘর থেকে দেখ্‌তে পেয়ে দৌড়ে আসে কুলটুসির মা। কুলটুসিকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার ক'রে বলে "কুলি ...অ-কুলি, কি হ'ল তোর? এমন কর্‌ছিস্ কেন মা?"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কুলটুসি। বলতে পারে না কিছুই। বুঝি বা শুনতেও পায় না কিছু।

কুলটুসির মা আবার বলে "ওমা, গা যে পুড়ে যাচ্ছে! এত জ্বর নিয়ে উঠে এলি কেন মা? ভাগ্গিস্ দেখেছিলাম, নইলে এখনই ত মাথা ঘুরে প'ড়ে যেতিস্! "তারপর বেশ ক'রে মাথা নুইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে "চুপ্ ক'রে শুয়ে থাক্, আমি ভুতোকে ডেকে নিয়ে আস্‌ছি।"

অনেকটা সুস্থ হয় কুলটুসি। বলে "ভুতোকে ডাক্‌তে যাচ্ছ মা? আমি আর ভুতো একসঙ্গে পুঁটী মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাব।"

কুলটুসির মা বলে "এত জ্বরে কি ভাত খেতে আছে মা? ভাল হ'য়ে ওঠ, তারপর আর একদিন ভুতোকে নেমন্তন্ন করে দু'জনে একসঙ্গে খেও।"

জেদ ক'রে বলে কুলটুসি "না মা, আমি ভাতই খাব। তা' না হ'লে ভুতো খাবে না। "আমায় একটু রান্না ঘরে নিয়ে চল মা। তুমি ভুতোকে নিয়ে আসতে আসতে আমি মাছ ক'টা ভেজে ফেলব।"

কুলটুসির মা বলে "তোর পুঁটী মাছ আমি ফেলে দিয়েছি।"

"ফেলে দিয়েছ মা?" মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠে কুলটুসির। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বলে "ফেলে দিলে কেন মা? ভুতো কত কষ্ট ক'রে ধরেছে···আমি যে ওকে পুঁটী মাছের জন্যই নেমন্তন্ন করেছি!"

ওসব কথায় কান না দিয়ে উঠে এসে ভুতোকে ডাকতে যায় কুলটুসির মা। পুকুর পাড়ে দেখা হয় ভুতোর মায়ের সঙ্গে। বলে "তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম ভুতোর মা! কুলির খুব জ্বর, তাই আস্‌তে পারল না। ভুতোকে এখনই পাঠিয়ে দিও।"

ভুতোর মা বলে "আমিও তোমারই কাছে যাচ্ছিলাম দিদি। ভুতোরও খুব জ্বর এসেছে। জ্বর নিয়েই উঠে আস্‌ছিল। ভাগ্গিস্ আমি ধ'রে ফেলেছিলাম। নইলে উঠানেই মাথা ঘুরে পড়ে যেত।

বাড়ী গিয়ে কুলটুসির মা বলে "ভুতোর জ্বর হ'য়েছে কুলি! আস্‌তে পারবে না।"

চোখ দু'টো বড় বড় ক'রে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কুলটুসি বলে "ভুতোরও জ্বর হ'য়েছে মা?"

কুলটুসির মা বলে "হ্যাঁ, ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, দু'জনকেই দেখে যাবে।"

ভুতোর মা বাড়ী গিয়ে বলে "কুলির জ্বর হ'য়েছে বাবা! বিছানা থেকে উঠ্‌তে পারে না।"

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে ভুতো। তারপর আস্তে আস্তে বলে "কুলিরও জ্বর হ'য়েছে মা?"

ভুতোর মা বলে "হ্যাঁ।"

একটু পরে ডাক্তার আস্‌তেই কুলটুসি বলে "ভুতুকে দেখে এসেছ ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার বলে "না। যাবার সময় দেখে যাব।"

কুলটুসি বলে "কাল যখন আস্‌বে তখন আগে ভুতোকে দেখে তারপর আমায় দেখতে এসো।"

স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক আর পীঠ ভালরূপ পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার বলে "ডবল নিউমোনিয়া। পেনিসিলিন ইনজেক্‌শন দিতে হবে।"

কুলটুসির মা বলে "বিকেলে এসে ইনজেক্‌শনটা দিয়ে যেও ডাক্তার বাবু।"

ডাক্তার বলে "আচ্ছা।"

তারপর ভুতোকে দেখতে যায় ডাক্তার।

"ফুলিকে দেখে এসেছ ডাক্তার বাবু ?"

ডাক্তার বলে "হ্যাঁ"। তারপর ভুতোর বুক আর পীঠ ভালরূপ পরীক্ষা ক'রে দেখে বলে "এরও দেখছি ডবল নিউমোনিয়া। একেও পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে হ'বে।"

ভুতোর মা বলে "বিকেলে এসে ইনজেকশনটা দিয়ে যেও ডাক্তার বাবু!"

"আচ্ছা"—বলে ডাক্তার চলে যায়।

বিকালের দিকে জ্বর বেড়ে যায় দু'জনেরই। প্রলাপও বকে দু'জনে। বিছানা থেকে উঠে আসতে চায় ফুলটুসি। জোর ক'রে বিছানায় শুইয়ে দেয় ফুলটুসির মা, বলে "উঠিস্‌নি মা, মাথা ঘুরে প'ড়ে যাবি।"

মায়ের কথা শুনতে পায় না ফুলটুসি। এলোমেলো ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে বলে "মিথ্যা কথা বললি কেন তুই ?"

ফুলটুসির মা বলে "কৈ, আমি ত কিছু বলিনি মা!"

ফুলটুসি নিজের মনেই বলে যেতে থাকে "আমিও তোকে মারব না কোন দিন।" কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার বলে "ফেলে দিলে কেন মা ? কত কষ্ট ক'রে....." ফুলটুসির স্বর ক্ষীণ হ'য়ে আসে, বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি বলে কিছুই বুঝা যায় না।

ছলছল্‌ চোখে ফুলটুসির মা চেয়ে থাকে ফুলটুসির মুখের দিকে। বুঝতে পারে যে ফুলটুসি ভুল বকছে। উঠে গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেয় ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আসতে।

কপালের জল-পটিটা আর একবার ভিজিয়ে দিয়ে ভুতোর মাথায় হাওয়া করতে থাকে ভুতোর মা। হঠাৎ ভুতো ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বলে "তুই আমায় মারলি কেন ?"

ভুতোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে ভুতোর মা বলে "কৈ, আমি ত তোমায় মারিনি বাবা!"

ভুতো নিজের মনেই বলে যেতে থাকে "তোর মাকেও কিছু বলব না।"

ভুতোর মা বলে "এ'সব কি বলছিস্‌ বাবা ?"

মায়ের কথার কোন উত্তর দেয় না ভুতো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে "তুই নিয়ে যা', ভেঙ্গে যাবি।"

ভুতোর কথা ক্রমেই অস্পষ্ট হ'য়ে আসে, কি বলে বোঝা যায় না। ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে ভুতো। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বুকের মধ্যে ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ করতে থাকে মাথার বালিশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়, বিছানার চাদরটা টেনে কামড়ে ধরে, মাথার চুল ধ'রে টানে, নিজের আঙ্গুল নিজে কামড়ায়। হাত সরিয়ে দিয়ে ভুতোর মা বলে "এমন কচ্ছিস্‌ কেন বাবা ?

দু'হাতে ভর দিয়ে বিছানায় উঠে বলে ভুতো, বলে "এখন তবে যাচ্ছি।"

চেষ্টা করেও ভুতোকে বিছানায় শুইয়ে দিতে পারে না ভুতোর মা। ভুতোর গায়ে যেন পাঁচ হাতীর জোর। শুধু খাট থেকে নীচে নেমে যেতে চায়। বলে "যাচ্ছি..... এখন তবে....."

ভুতোকে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে ভুতোর মা "ওগো শীগ্‌গীর এস.....ভুতো আমার কি রকম করছে।"

দুজনে জড়াজড়ি ক'রে খাট থেকে নীচে প'ড়ে যায়। প'ড়ে গিয়ে ভুতো আর একবার বলে "যাচ্ছি....."

ভুতোকে কোলে তুলে নেয় ভুতোর মা। বলে "ভুতো··· অ-ভুতো···বাপ্‌ আমার···"

কোন সাড়া দেয় না ভুতো।

ঠিক এমনি সময় হঠাৎ ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানায় উঠে বসে ফুলটুসি। চেঁচিয়ে বলে "যাস্‌নি ভুতো···ফিরে আয়!"

সসব্যস্তে ফুলটুসিকে ধরতে যায় ফুলটুসির মা। কিন্তু ধরে ফেলবার আগেই ফুলটুসি খাট থেকে লাফিয়ে নীচে প'ড়ে যায়। প'ড়ে গিয়ে আবার বলে···"ফিরে আয় ভুতো···ফিরে আয়···"

তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিয়ে ফুলটুসির মা বলে "ফুলি···মা আমার···এ'কি করলি মা ?"

কোন সাড়া দেয় না ফুলটুসি।

ডাক্তার আসে পেনিসিলিন নিয়ে। পুকুর পাড়ে আসতেই একই সঙ্গে শুনতে পায় দুই জনের বুকভাঙা আর্তনাদ।

এপাড় থেকে ঝুলটুসির মা কাঁদে—"ঝুলি···মা আমার··· কোথা গেলি মা···ফিরে আয়।"

ওপাড় থেকে ভুতোর মা কাঁদে—"ভুতো··· আমার···কোথা গেলি বাবা...ফিরে আয়!"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে চলে যায় ডাক্তার।

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক

[১]

তব ভৈরব উদ্ধ নিনাদে
জাগায়ে বঙ্গভূমি।
স্বদেশ প্রেমিক হে কবি উদাসী
আজিকে ঘুমাও তুমি।
জননী তোমার বঙ্গ তোমার কবি
স্বাধীন প্রভাতে হেরেছে স্বাধীন রবি
সোনার কমল কণাতে মহিছ
নব বায়ু মৌসুমী।
কবি কই কোথা তুমি?

[২]

অধঃপতিত জাতিকে বলিলে
"আবার মানুষ হ"
হীনতায় গেল শতাব্দী কাটি'
সময় সুদীর্ঘ॥
দেখ এসে তারা মানুষ হয়েছে কিনা?
আছে কিনা তার বৈশিষ্ট্যের চিনা?
নিকটে না এসে সরে গেল কিনা
তোমার সে স্বর্গ?

[৩]

এসো ব্রাহ্মণ, হে স্মিত বদন
এসো হে শক্তিধর।
গৌরবময় জাতিরে তোমার
করহে জাতিস্মর।
দাও তাহাদের নয়নে জ্ঞানাঞ্জন
হাজার বছর আগেকার সেই মন
আত্ম শক্তি ভগবানে দাও
অনন্ত নির্ভর॥

[৪]

তুমি সুধাকর, সুধা লয়ে, তব
কারবার চিরদিন।
স্নেহে বিঁধে তুমি দেশকে জাগালে
কে শুধিবে তব ঋণ॥
তুমি হাসায়েছ ওহে দ্বিজ রাজ
তোমার লাগিয়া মোরা কাঁদি আজ
পুণ্য শুভ্র মূর্তি তোমার
রবে চির অমলিন॥

মুক্ত হইল মহাজীবনের দ্বার

মলিনা দেবী

তোমারি আঁধার রেখেছে আলোকে ঢাকি,
তুমি বিনা বল কেবা পারে প্রকাশিতে।
তুমি পার শুধু জাগাইতে আজ আঁখি
তিমির গরল লভিয়া তোমার চিতে।
সে প্রভাত স্মরি উঠিয়াছে আজি ডাকি
আমার প্রাণের পরম পিয়াসী পাখী
তোমার চরণে আপন সমর্পিতে॥
জীবন তটিনী উর্দ্ধ চেতনা হতে
চাহিবে অসীম উদার উৎস ধারা।
অবগাহি আজি দিব্য আলোর স্রোতে,
সীমার অর্ঘ্য হয়েছে আত্মহারা।
হে বিরাট তব গভীর মৌন ভাষা
আমার মাঝারে জাগায় একোন্ আশা,
আকাশে আমার উঠিয়াছে ধ্রুব তারা॥
লক্ষ্য আমার বক্ষ বিদরি কোটে
আকুল অন্ধ তমসা রজনী মাঝে,
তিমির বিনাশি দীপ্ত সূর্য্য ওঠে—
গভীরে কাহার নীরব রাগিনী বাজে।
মূর্ত্ত আজিকে কার প্রেরণায় আমি
চলেছি একেলা অনন্ত দিবা যামী,
হৃদয়ে আমার কোন্ বৈভব রাজে॥
জন্ম মৃত্যু যাহার অঙ্কে দোলে
যাহা কিছু ছিল রাখিনু চরণে তার।
জীবন আমার সকল বাসনা ভোলে
লভিয়া অসীম সত্তার ঝঙ্কার।
আজিকে আমার নিরাশার অবসান,
কণ্ঠে ধ্বনিছে অপূর্ব্ব কোন গান,
মুক্ত হইল মহাজীবনের দ্বার॥

হে মোর বৃদ্ধ

শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায়

একি লীলা তব হে মোর বৃদ্ধ
কীর্ত্তি তোমার আবরণে রহে ঢাকা
যে পথে চালাতে চাহি আপনারে
তারি বিপরীতে ঘোরে জীবনের চাকা।

হৃদয় নিঙাড়ি সব প্রেম দিয়ে
যাহারে নিত্য বাসিবারে চাই ভালো,
চরম আঘাত সেই হানে বুকে,
নিভাইয়া দেয় জীবনের সব আলো।

অমৃত চাহিয়া হাত পাতি আমি,
বন্ধুরা যত বিষ ঢালি দেয় হাতে,
বৃদ্ধ, তোমার অভিনব খেলা,
কৌতুক একি চিরদিন মোর সাথে!

আপন ভাবিয়া যার পানে চাই,
আমি দৃষ্টি দেখি যে তাহারি চোখে,
কৌতুক সম হানে সে বজ্র,
যার আসা যাওয়া আমার স্বপন লোকে।

এমনি করিয়া আমার সঙ্গে
অকারণে করো অর্থ বিহীন খেলা,
রহ আনন্দে করিয়া ধ্বংস
আমার সকালটুআমার সন্ধ্যা বেলা।

সংগ্রাম ও শান্তি

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী

তিনে আর চারে বিশ্বশান্তি পরিকল্পনা বেশ
পরমানন্দে উদর পুরায়ে তোমরা করিছ শেষ ;
পৃথিবীর কোন প্রান্তে কাহার কতটা রয়েছে বিত্ত,
সে সব হিসাব পাকাপাকি করি' দিয়িছ পুলকচিত্ত।
পশ্চিম আজি পূর্বে তাকাও, শোন পরোয়ানা তার—
তব অংকের পংক্তিল পথে মোরা চলিবনা আর।
বল কে শেখাল এ কথা ভাবিতে, এ আইন করিতে পাশ—
তোমরা বিশ্বে বিশ্বকর্মা, যুগ যুগ মোরা দাস ?
পৃথিবী করিতে উর্বর তব কর ফোটা ঘাম ঝরে
আমাদের ঢালা রক্তের সাথে দেখ পরিমাপ ক'রে।
শান্তিরে মোরা জিয়াইয়া রাখি জীবনের বিনিময়ে,
তোমরা আনিছ মহাসংগ্রাম শক্তির পরিচয়ে।
মরে হিটলার, ডুবেছে জাপান, সংগ্রাম শেষ হল,
এ বিরাট ধ্বংসে যুদ্ধের থেকে পৃথিবী কিইবা পেল ?
যুদ্ধ বাড়াল স্বার্থপুষ্ট হিংসোদ্ধত ক্ষত—,
বলিল বিশ্ব পাবেনা শান্তি তোমাদের ধারক্ষং।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা সবে লভিলে এ দুনিয়া
বিশ্বশান্তি আসিবে, লইবে বুদ্ধ চির বিদায়।
কত শ্বাশুর, কত যে নালিশ, কত মানুষের ব্যথা,
অংকুর দিল মুক্তিযুদ্ধে গোলামের দেশ যেথা।
তাদের মুক্তি পূর্ণ করিবে শান্তি এ দুনিয়ায়,
উপনিবেশের মালিকের দল, হও সবে হুঁশিয়ার !
নিষ্ঠুর পরতন্ত্রের 'পরে বিদ্রোহী ঐ কোরিয়া,
ওলন্দাজের নিষ্পেষনেই জ্বলিছে ইন্দোনেশিয়া।
জাগে তার সাথে ঘানা, সুনাত্রা, মালয়, ইন্দোচীন ;
উপনিবেশীর ষড়যন্ত্রের রোধিছে প্যালেষ্টিন্।
মহাচীনে আজ ভাঙ্গিছে পড়িছে ডিপ্লোম্যাসির ঘর,
এ সবার সাথে ভারতবর্ষ দিল নিজ স্বাক্ষর।
এ বিদ্রোহের বন্যা ধাইবে পৃথিবীসীমান্তে,
পর্বতে, বনে, মরুতে, সাগরে, বেলে ও দেশান্তে।
বিশ্বশান্তি আনিবে না কভু অস্ত্রের সম্ভার ;
সাম্যের বান অতীব ভীষণ, মালিকেরা হুঁশিয়ার।

একটা স্বপ্ন

শ্রীঅতীন কুমার

ঝন্ ঝন্ বাজে তরোয়াল আজ পলাশীর প্রান্তরে !
মোহনলালের পদাঘাতে মরে মীরজাফরের দল ;—
থেমে গেছে হোপা' গাঢ় আঁধিয়ারে ক্লাইভের কূট-ছল :
উল্লাসে ঘন বিজয়ী-নবাব সিরাজের হাসি ঝরে !—
মদন-বাঁশরে তারই সাথে ঘুমে আম্র বুকুল পড়ে।

ভাঙা-তরী নিয়ে ইংরাজ চলে সাত সাগরের পারে,—
যুদ্ধের-শেষে আর্মাডা যেন স্পেনিস চলছে হায় !

এ ধারেতে কারা বঙ্গ-নবাব সিরাজের ঘর গায় :
ক্লাইভের কাণে ভেসে আসে কীণ সুর তারই বারে বারে ;—
দম্ভের বাতি নিভে' গেছে ওর পাঁজরের হাড়ে হাড়ে।

গন্ধে ও ধূপে প্রাসাদ-কক্ষ মুখরিত ভরপুর।—
শিঞ্জিরে-শিঞ্জিরে উৎসব চলে নৃত্যের তালে-তালে,
"আরো, আরও দাও—" সৈনিক হেঁকে পেয়ালায় সুরা ঢালে ;
"বাহাবা,-বাহাবা,—আহা, কিবা মিঠে হীরে বাইজীর সুর !
ওধারে-তখন পোড়া বাঁশী থামে দ্বীপ কোন্ বহুদূর।

জীবন-রঙ্গমঞ্চে

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

All the world's a stage,
And all the men and women players,
They have their exits and entrances.

—শেক্সপীয়ার।

মানুষের জীবন লইয়াই নাটক। নাটকে সেই মানুষ ও অতিমানব হইয়াছে, কোথাও তাহাকে বিশিষ্ট রূপ দেওয়া হইয়াছে, আবার জীবনের কোন ঘটনা নাটকের রূপ পাইয়াছে যাহাতে তাহা রসের বস্তু হইয়া দর্শকের চিত্তকে অধিকার করিতে পারে। নাটক পড়িবার জন্য নয়, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক সত্য—নাটক একই সঙ্গে দেখিবার ও শুনিবার। দর্শন ও শ্রবণের যুগ্ম প্রয়োগেই নাট্যরসের সম্পূর্ণ উপভোগ সম্ভব। মানুষের জীবনে যাহা বিস্তৃতভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে, তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া তাহা হইতে অনাবশ্যক সমস্ত কিছু বর্জন করিয়া একটা সুপরিকল্পিত পরিণতিকে লক্ষ্য করিয়া নাটকের ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। দিন, মাস, বর্ষ বা যুগের সুদীর্ঘ সময়কে ব্যাপ্ত করিয়া যে জীবন, তাহাকেই সঙ্কুচিত কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া একটি ক্ষুদ্র ফ্রেম ও কয়েকটি দৃশ্যসজ্জার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত করা হইয়া থাকে। পৃথিবী যেমন বৃহৎ এবং একটি ক্ষুদ্র ভূগোলক যেমন পৃথিবীর আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা ও জ্ঞান জন্মায়, তাহাতে পৃথিবীর অনেক কিছুই থাকে না, সমগ্র জীবন বা তাহার অংশকে তেমনি স্বল্প পরিধির গণ্ডীতে টানিয়া আনিয়াই নাটকের সৃষ্টি। কোন এক সমালোচকের ভাষায়, Drama is life in miniature। মানুষের, নিজের জীবন সম্বন্ধে বিরাট কৌতূহল রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে জীবনকে অখণ্ডরূপে দেখিবার দৃষ্টি তাহার নাই—জীবনের কোন বিশেষ দিক সম্বন্ধেও তাহার সংসারী মন উদাসীন। অথচ জীবনকে সে পাইতে চায়, তাহাকে জানিয়া তৃপ্তি পাইবার লোভও তাহার আছে। সেখানেই নাট্যকার অগ্রসর হইয়া আসেন সীমাবদ্ধ স্থান, কাল ও পাত্রের কাঠামোয় জীবনকে খাড়া করিয়া দর্শকমনের জিজ্ঞাসাকে চরিতার্থ করিতে। নাটকে যাহা ঘটে দর্শকের ব্যক্তিগত জীবনে অনেকেরই হয়তো তাহা ঘটে না, তাহাতে ক্ষতি নাই। দর্শক ইহাতেই তৃপ্ত যে চরিত্র ও ঘটনাগুলি তাহাদের—সমাজের মধ্য হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে; চরিত্রগুলির অনেককেই সে চেনে; যাহাদের সে চেনেনা বা জানেনা তাহারা সাধারণের চেয়ে ভিন্ন, কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? বিভিন্ন ধাঁচ, বিভিন্ন প্রকৃতি ও আদর্শের মানুষ লইয়াই ত সংসার। জীবনে যাহার সাক্ষাৎ হয়তো সহজে মেলেনা, সেই পরমক্ষণগুলি নাটকের মাধ্যমে ভোগলিপ্সু দর্শকের দৃষ্টির দুয়ারে উপস্থিত করিয়া কৃতিত্বলাভের ইচ্ছা কোন্ নাট্যকারের না হয়?

উপন্যাস নাটক নয়, কিন্তু উপন্যাসের অন্তরেই নাটক সংগুপ্ত রহিয়াছে। উপন্যাসে লেখক বন কথা, নাটকে নাট্যকারের কথা সবাই ভুলিয়া যায়, নাটকের চরিত্রগুলিই সেখানে মুখর, তাহারাই জীবন্ত সত্য। উপন্যাস যাহা জীবনের ফোটোগ্রাফ, নাটকে তাহাই সরল পটে আঁকা ছবি। মানুষ ফোটোগ্রাফ ও প্রোট্রেট দুইই দেখিতে ভালবাসে, কিন্তু শেষের দেখাটি হইতেছে নাটকীয় দেখা। জীবনকে যাহারা নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিবার শক্তি অর্জন করিয়াছে, নাটক দেখিয়া প্রকৃত আনন্দ পাইবার কথা তাহাদেরই।

কিন্তু নাটক যাহাদের শিল্পরুচিকে তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দান করে এরূপ রসিকের সংখ্যা কতজন? তাহারাও ত জীবনকে নাট্যরসে সিক্তিত করিয়া মঞ্চে উপস্থাপিত করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা নাটকে আনন্দ পান। জীবন তাঁহাদের নাটকীয় হইয়া ওঠে মঞ্চের উপরেই, প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে আসিলে তাঁহাদের চোখে বাস্তব জীবন ও নাটকের পার্থক্যটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক নাট্যকারদের অবশ্য চেষ্টা আছে জীবনে ও নাট্যের আত্মীয়তা যথাসম্ভব নিবিড় করার—কিন্তু নাটক নাটকই। নাট্যকার সম্বন্ধে আমার আপাতত বলার

কিছু নাই, আমার বক্তব্য আমা
কাছে।

বিভিন্ন ধরণের মানুষ লইয়া আমাদের সমাজ। সাধারণ মানুষ যাহারা তাহারা সমাজের ভিড়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া আছে, আর সকলের নিকট হইতে আলাদা করিয়া আমরা তাহাকে দেখি না, সে নিজেও তাহাকে সেভাবে কখনও চিন্তা করে নাই। হাজার, লক্ষ মানুষের ভিড়ের মধ্যে এমন দু'একজন আবার আমাদের চোখে পড়ে যাঁহারা সমাজের মধ্যে থাকিয়াও নিজস্ব একটা ভিন্ন সত্তা লইয়া সচেতন ভাবে অবস্থান করিতেছেন—তাঁহারা সমাজেরই একজন হইয়াও সমাজ হইতে কমবেশী দূরে অবস্থান করেন। ইঁহারা এত বিশিষ্ট যে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমাদের নাটকের প্রধান চরিত্র ইঁহারাই—ইঁহাদের জীবনলীলাই মঞ্চস্থ হইয়া শিল্পের মর্যাদা পায়। ইঁহাদেরই স্বগোত্রীয় দু'একজন আবার এতই অনন্য যাহার ফলে তাঁহাদের কাহাকেও দেখি ইতিহাসের নায়করূপে—ইতিহাসের বিরাট পুরুষ-রূপে। ইঁহাদের জীবন কথা ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে—কারণ তাঁহাদের জীবনে স্বভাবতঃই নাটকীয়, এমন কি অতিনাটকীয় উপাদান প্রচুর পরিমাণে ছড়াইয়া থাকে। ইহা ছাড়া নাট্যকার ও দর্শকের অনুকূল কল্পনাশক্তির আবেগে তাহা আরও নাট্যরসাশ্রিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়। দর্শকরা নাটক কহিতে ইহা বুঝিতেই অভ্যস্ত এবং বোধ হয় তাহাদের রসোপলব্ধি এই ধারাকেই চিরন্তন প্রচলন হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু আমি আপনাদের যে নাটকের কথা বলিব, তাহা কোনদিন মঞ্চস্থ হইবেনা, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সে নাটক অহরহঃ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, অথচ আমরা কেহই তাহা দেখিতে পাইনা, দেখিতে অভ্যস্ত নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ, সমাজের আর পাঁচ জনের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া আছি। কিন্তু যদি ভালভাবে আমার মনকে যাচাই করিয়া দেখি, তাহা হইলে কি দেখিব না, সমাজ হইতে ভিন্ন আর এক আলাদা জগৎ সেখানে বিরাজ করিতেছে—পৃথিবী সম্বন্ধে, সমাজ মানুষ ও জীবন সম্বন্ধে আমার একটি বিশিষ্ট অনন্য ধারণা বা দর্শন আছে! জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত নিজের জীবনের সবটা যদি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করি, তাহা হইলে নাটকীয় কিছুই কি পাইবনা? সমগ্র জীবনটাইতো একটা ক্রমপ্রবহমান অখণ্ড নাটক—। সমাজের বাহিরে আমার যে পৃথক সত্তা রহিয়াছে তাহা সত্য, সেইরূপ সমাজের পাঁচজনের মধ্যেও আমার যথোপযুক্ত আসন তেমনি সত্য—প্রকৃত একের সহিত অপরের একটি গোপন সংযোগ রহিয়াছে এবং পরস্পর পরস্পরকে নিয়তই প্রভাবান্বিত করিতেছে। আমার পাশের মানুষটিকে আমিত প্রতিদিনই দেখিতেছি—ক্রোধ, মোহ, লোভ, দ্বেষ, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার জড়ানো একটি আটপৌরে মানুষ। কিন্তু তাহার জীবনের গভীরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার কোন চেষ্টা কি করিয়াছি? আমি ত জানিতাম না, দরিদ্র এক বস্তীপাড়ার আলো-বাতাসহীন অন্ধগৃহে যেখানে তার বহু যক্ষ্মারোগে নিশ্চিত মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গণিয়া চলিয়াছে তাহার মৃত্যুর পর তাহার পরিবারের কি উপায় হইবে সে চিন্তা সে ছাড়িয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে, পাড়ার সকলে যখন শান্ত সুষুপ্তির আবেশে আচ্ছন্ন, তখন সেই নোংরা গৃহে কালো দেয়ালের গায়ে প্রতিফলিত কেরোসিনের লাল আলোর রহস্যময় এক পরিবেশে যখন আমার পরিচিত সাধারণ মানুষটিকে দেখি মৃত্যুপথযাত্রী রোগক্লান্ত বন্ধুর মুখের পানে ব্যাকুল আগ্রহে তাকাইয়া আছে—তখন তাহাকে দেখিয়া কি মনে হয়না, এমন জীবন্ত নাটক থাকিতে ষ্টেজের নাটক কোন ছার! কোন্ নাট্যকারের কলমের আঁচড়ে সে চিত্র কবে প্রত্যক্ষ স্পষ্ট হইয়া উঠিবে? সাধারণ একজন অফিসের কেরাণী, দশটা পাঁচটা অফিস করে, যাহা তাহার আয়, সংসারে প্রয়োজন তাহার দ্বিগুণ। বাঁচিবার আগ্রহে মরণের সহিত তাহার যে প্রাণপণ সংগ্রাম সেকি কম রোমাঞ্চকর? তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া যদি নিদ্রা আচ্ছন্ন হয় তাহা হইলে নিদ্রাগমন পর্যন্ত এই সারাদিনের ইতিহাসে প্রতিদিন যে নূতন নূতন বৈচিত্র্যের আবির্ভাব তাহাকে অনুধাবন করিয়া

উপর হইতেই প্রচুর উপভোগের বস্তু খুঁজিয়া বাহির
কি অধিক সন্তানোৎপত্তির প্রয়োজন? কিন্তু
কেবা তাহা জানেনা—তাহার জীবনটা সত্যই কী

শুভ্র পল্লীতে প্রকৃতির অরূপণ শ্যামলিমার কোড়ে উঁচু এক জমির উপরে যে ছোট কুঁড়ে ঘরে এক দরিদ্র চাষী বাস করে তাহার জীবনটা মোটামুটি একটা ছকে বাঁধা। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহার ব্যতিক্রম কদাচিৎ। তাহার নিজের মনে নাই, কিন্তু আমি জানি, দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ সে দুর্বল রমণীকে প্রসবের সময় অশেষ যন্ত্রণা দিয়া সে জন্ম লইয়াছিল. কোন ডাক্তার নার্স ওষুধ, হাসপাতালের ভীড়ের চাপে এই পুরাতন জীর্ণ পৃথিবীরও সীমাবদ্ধ পরিসর আরও সীমাবদ্ধ হইয়া ওঠে নাই। জন্মিয়াই কিন্তু সে তারস্বরে তাহার চাষাড়ে গলার জোর জগৎ সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিল। বৃদ্ধ ঠাকুরদা রসিকতা করিয়া বলিয়াছিল, আমার যেমন হাত পাগুলো হয়েছে হাতীর মত, গলার জোরটাও তেমনি, জোয়ান হয়ে ঠাকুমাকে নিয়ে না ভাগলে হয়; বলিয়া পাশেই কিমাইয়া পড়া দুর্বলচিত্ত ঠাকুরমার দিকে তাকাইয়া চোখও ঠারিয়াছিল নিশ্চয়ই। সেই জন্মের পর হইতে বাপির জল খাইয়া বড় হওয়া এবং বড় হইতে হইতে দীর্ঘতর হওয়া, ম্যালেরিয়া, বিবাহ, মামলা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। ইহাতে আমরা সকলেই জানি ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছু

চাষীর জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকিলেও আধুনিক ও 'প্রগতি' সাহিত্যিকদের কৃপায় কূপমণ্ডুক শহরবাসীরাও তাহাদের সম্বন্ধে দুকলম প্রবন্ধ লিখিয়া দিবার জ্ঞান অর্জন করিয়াছে। কিন্তু চাষীর গতানুগতিক জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যে যে মানুষ উন্মুক্ত মন ও চোখ লইয়া দিনের পর দিন কাটাইয়া দিয়াছে, সে কখনও কিছু না পাইয়া, খালি হাতে ফেরে নাই, দিনগুলি তাহারও ব্যর্থ যায় নাই; উপন্যাসের পাতা বা নাটকের নাটমঞ্চে দেখা জীবনের মত সেই স্মৃতি পলাপত্রেই ঝিকে হইয়া আসিবেনা। নাটকের দৃশ্যে যে সমস্যার কথায় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তম্ভিত, বাস্তব জীবনের সেই বন্ধ্যা সংকোচের কবলে পড়িয়া অনমনীয় সঙ্কল্প ও দুর্জয় সাহস লইয়া লড়িয়া যাইতেছি। প্রতি মুহূর্তে সেখানে নৌকাডুবির আশঙ্কা, কিন্তু পলকের তরেও তাহা আমাকে বিচলিত করিতেছেনা। হয়তো নৌকাডুবি হইয়া মাঝ দরিয়ার উত্তাল তরঙ্গের কোলে পড়িলাম, কিন্তু তখনও শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তীর লক্ষ্য করিয়া সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছি। তবে আপশোষ এই, এমন একটি ক্ষণ আমার জীবনে আসিয়া চলিয়া গেল যাহা হয়তো আর কোনদিন ফিরিয়া পাইবনা। তাহাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া লইবার কথা আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই।

কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা কেন। বৃহত্তর পটভূমিকার সামাজিক ব্যাপকতার বিরাট মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া আমরা যে অভিনয় করিয়া চলিয়াছি, তাহা কেবলমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই নহে, পরন্তু সমগ্র জাতি এমনকি সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পত্র, পত্রিকার মারফৎ আমরা যে রাজনৈতিক মতামত গ্রহণ করিতেছি—তাহা আমার তথা বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের ভাগ্যলিপি রচনা করিয়া চলিয়াছি। লক্ষ লক্ষ জনসমাবেশের সম্মুখে কোন রাজনৈতিক নেতার সামান্য কথাকেই অসামান্য গুরুত্ব দিয়া আমরা আমাদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার অধিনায়ক হইতেছি—তাহাই আজ হউক বা দুদিন পরে হউক সমগ্র জাতি এবং সেই সাথে সাথে আমারও ললাটের লেখা অনুরূপ করিয়া দিবে। কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্যও হয়তো সচেতন নই যে একটা বিরাট নাটকের চরিত্রমাত্র আমরা অভিনয় করিয়া চলিয়াছি। যে উত্তেজনা, উৎসাহ, আনন্দের অভিজ্ঞতা আমরা রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া লাভ করিয়া থাকি, তাহার সম্বন্ধে যদি আমরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকি, তাহা হইলে রাজনীতি কেবলমাত্র বেরসিক পণ্ডিতদের কারবার না হইয়া আমাদের নিজস্ব বস্তুরূপে পরিগণিত হইতে পারিত।

গোড়াতেই বলিয়াছি, নাটকের মূল উদ্দেশ্য হইল দর্শকমনকে আনন্দ দেওয়া, তাহাদের শিল্পরুচিকে তৃপ্তি

দেওয়া, তাহাদের সুস্থ জীবনবোধকে জাগ্রত করা। সবার মূলে রহিয়াছে আনন্দ,—কারণ আনন্দই হইতেছে শিল্পের মূলধন—দুঃখ নহে। আমাদের নিত্যকার জীবনে যে নাট্যাভিনয় নিয়ত চলিয়াছে তাহার কোন একক রচয়িতা থাকিবেনা, ব্যক্তি ও সমষ্টিতে মিলিয়া তাহার রচয়িতা আমরা নিজেরা। কোন পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী ও নাই, এই নাটকের অভিনেতৃবর্গও আমরাই। মঞ্চের নাটক নিছক অভিনয়, আমাদের জীবন সত্য—বাস্তব অভিনয়। মঞ্চের অভিনয়ে সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা সবই আছে কিন্তু তাহা মিথ্যা—আমাদের জীবন সত্য। মিথ্যার অভিনয় দেখিয়া আমরা যদি আনন্দ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে বাস্তব জীবনের রূঢ় সত্যসমূহকে স্বীকার করিয়াই যাহা প্রকৃতই সত্য তাহার মধ্যে আনন্দের উৎস খুঁজিয়া লইবার শিক্ষা আমরা পাইব না কেন? জীবনকে ভোগ করিবার প্রচলিত প্রথা পদ্ধতি ভাল ভাবে বিচার করিয়াই আমি একথা বলিতে সাহসী হইয়াছি। Escapeism বা পলায়নবাদের সমর্থন করিয়া আমার যুক্তির অবতারণা নয়। কাহারও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক মতবাদ সম্বন্ধেও আমার বলার কিছুই নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেও আমি কাহাকেও বলিতেছিনা—পৃথিবী, সমাজ ও অন্য সব কিছুই বার বার নিজ ধারা অনুসরণ করিয়া চলুক। রুক্ষ বন্ধুর জীবনাচরণের পরম কঠোরতার মাঝেও অচেতন আত্মবিস্মৃত হইয়া দুঃখের কাছে আত্মসমর্পণ করার বিরুদ্ধেই আমার প্রতিবাদ। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানা—দুঃখকেই সত্য বলিয়া জানার বিরুদ্ধেই আমার আপত্তি—কারণ চরম দুঃখের গোপন গুহাতেই পরম আনন্দের মণিটি রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের জাতির ইতিহাস একটি অখণ্ড চিত্র রূপে আমাদের মনে ভাসিয়া উঠিলেই—একথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিব। একথা যদি সত্য না হইত তাহা হইলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বহুকাল আগেই লোপ হইয়া যাইত। ঝড়ের পর ঝড়, আঘাতের পর আঘাত, বিপদের পর বিপদ আসিয়া আমাদের জাতির দীর্ঘ ইতিহাসকে বহুবার আলোড়িত করিয়াছে—কিন্তু সাধক উহারই মধ্যে আনন্দের প্রদীপটি পরম সাধনায় জ্বালাইয়া রাখিয়া জাতিকে পথহারা হইতে দেয় নাই। বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তরঙ্গের আলোকবিচ্ছুরণের মত আমরা দুর্যোগের মধ্য হইতে 'পরম'কে বরণ করিয়া লইয়াছি। তাহাতে আমাদের সংগ্রামী শক্তি হ্রাস পায় নাই—আমাদের বাঁচার মত বাঁচিয়া থাকার প্রেরণা যোগাইয়াছে। আজ জাতি তথা সমগ্র বিশ্ব যে পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাইতেছে তাহাতে এই কথাই বার বার স্মরণ করি। আমাদের জাতি চরম দুর্দিনেও আনন্দের সন্ধান করুক—প্রেক্ষাগৃহে, মদের দোকানে বা দার্জিলিংএর সুন্দর পাহাড়ী উপত্যকায় নয়, তাহার নিত্যকার জীবনযাত্রায়, দৈনন্দিন পরিবেশ, হাসিকান্না সুখ দুঃখের মধ্যেই। নাটককে জীবনেরই প্রতিচ্ছবি জানিয়া যদি বলি—drama is life in miniature, জীবনকে রঙ্গমঞ্চ রূপে স্বীকার করিয়া লইবার সাহস ও বুদ্ধি কেন আমাদের থাকিবে না!

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

কলিকাতার ক্রীকেট মরশুম হইতে বসন্তের হাওয়া মাঠে মাঠে হকি অনুশীলনের পড়িতে আরম্ভ কলিকাতার শ্রেষ্ঠ হকি দলগুলি খেলোয়াড় যোগাড়ের দায়িত্বভার ব্যস্ত। ফুটবল খেলোয়াড়েরাও ছাই ঝাড়িয়া প্রস্তুত হইতেছে। ময়দানের আবহাওয়া ক্রমশই চঞ্চল হইতে থাকিবে ও দর্শকগণের সেই অনুযায়ী ক্রেশ বহনের মত এবছরেও সহ্য করিতে হইবে।

ষ্টেডিয়াম :—ভারত ও কমনওয়েলথ দলের ক্রীকেট টেষ্ট মধ্যে মাঠে শুনিতে পাইলাম যে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট ইডেনগার্ডেনে একটী ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ক্রিকেট এসোসিয়েশনের অর্থ যেরূপ সাহায্যের ব্যবস্থাপনার ভার পাইয়াছেন। আমরা কলিকাতার মাঠে ষ্টেডিয়াম সম্বন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছি। কলিকাতায় ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম হইতে ফুটবল ষ্টেডিয়াম যে অধিক প্রয়োজনীয় একথা বোধ সকল খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকই স্বীকার করিবেন। যা হউক তবুও যে কলিকাতায় ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম হইতে চলিয়াছে ইহা তবুও 'নেই মামা হইতে কানা মামা ভালো'। তবে সাথে সাথে আমরা পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট, ও ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনকে এ বিষয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতেছি এবং সাথে সাথে ইহাও অনুরোধ করিতেছি, যে ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামের পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যাহাতে অচিরেই গঠিত হয় সে বিষয়ে যেন যত্নবান হন।

ক্রিকেট :—গত ১৮ই জানুয়ারী কানপুরে ভারত ও কমনওয়েলথ দলের চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ অমিমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। গত চারিটি টেষ্টের মধ্যে ২টী অমিমাংসিত এবং একটীতে ভারত ও অপরটীতে কমনওয়েলথ দল জয়ী হইয়াছে। সুতরাং মাদ্রাজের দীপক মাঠে পঞ্চম টেষ্টের উপরেই সকল ফলাফলই নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ভারতীয় ক্রীকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নিকট আমাদের অনুরোধ যে তাঁহারা যেন ভারতের সম্মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নিস্বার্থ ভাবে টীম মনোনয়ন করেন।

কলিকাতার গত তৃতীয় টেষ্টের মত মার্চেণ্ট সাহেব খেলার কয়েকদিন পূর্বে এক ঘোষণা জারী করিলেন যে তিনি অসুস্থ সুতরাং খেলিতে সক্ষম হইবেন না। গত ২ মাস পূর্বে দিল্লীর টেষ্টে আহত হওয়ার পর বোম্বাইতে ২য় টেষ্টে খেলিতে সক্ষম হইয়া তাহার পর পর এই দুইটী টেষ্টে না খেলার যে শারিরীক ওজুহাত তিনি হাজির করিয়াছেন তাহা সত্যই অযৌক্তিক। অথচ আশ্চর্যের বিষয় সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড পুনঃ পুনঃ অধিনায়করূপে মনোনয়ন করিতেছেন। আমাদের বক্তব্য যে বাস্তবিকই তিনি সুস্থ ও খেলিতে সক্ষম হইবেন কি না জানিয়া এবার যেন তাঁহার নাম ঘোষণা করা হয়। ভারতের অধিনায়কত্ব করিবার ক্ষমতা যে বিজয় হাজারের আছে একথা তিনি

গত দুইটী টেষ্টে প্রমাণিত করিয়াছেন।

ফলাফল :—কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংসে—৪৪৮ ফাষ্ণওয়েল নট আউট—২২৩, জর্জ টুাইব—৬১, জন্ লিভিংষ্টোন—৮০, হাজারে ৫৯ রাণে ৩টী, গাইকোয়াড ১১২ রাণে ৩টি ও গোলাম আমেদ ১২৯ রাণে ৩টি উইকেট লাভ করেন।

ভারত প্রথম ইনিংস :—৩৮১। মুস্তাক্ আলী ১২৯, মানকড়—২৭, মোদী—১০, হাজারে—৬, ফাদকার—৬৪, অধিকারী—৬১, কিষেণ চাঁদ—৩৯, উমিরিগর—২৯, মহী—১, হীরালাল—৭, আমেদ—১, অতিরিক্ত—১২

কমনওয়েলথ দ্বিতীয় ইনিংসে তিন উইকেটে—২৩৭।

ওল্ড ফিল্ড—১৩, প্লেস—২, লিভিংষ্টোন—৮১, ওয়েল—৮৩ নট আউট, এ্যালে—৪৮ নট আউট—

ভারত ২য় ইনিংস :—৮৪। মুস্তাক্—২, মানকড়—০, মোদী—৮, হাজারে নট আউট—৪০, ফাদকার—৩, অধিকারী নট আউট—২৩, অতিরিক্ত—৮

কমনওয়েলথ দলের ফ্রাঙ্ক ওয়েল ক্রিকেট জগতের একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। কিন্তু ভারতের এযাবৎ কোনো খেলাতেই তিনি তাঁহার পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু চতুর্থ টেষ্টে তাহার বিপদের মুখে নট আউট ২২৩ ও ৮৩ যে কমনওয়েলথ দলকে অধিমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করিতে সহায়তা করিয়াছে একথা জোর করিয়া বলা চলে।

ভারতীয় দলে মুস্তাক্ আলীর কোন সুযোগ না দিয়া ১২৯ রাণ, খন্দকার অধিকারী ও কিষেন চাঁদের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং সত্যই উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের ১৮ রাণের মাথায় পর পর ৪টী মূল্যবান উইকেট পড়িয়া যাওয়ায় সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু হাজারে ও অধিকারীর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং ভারতকে অল্প উইকেট পতন হইতে রক্ষা করে।

এই খেলা সম্বন্ধে ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার যে সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন ভারতীয় দল কতকগুলি মূল্যবান ক্যাচ নষ্ট করিয়া নিশ্চিত জয়লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সত্য সত্যই যদি লিভিংষ্টোন ও ওয়েলকে প্রথম সুযোগেই আউট করা যাইত তবে জয়ীর জয়মালা যে অবধারিত ছিল ইহা নিঃসন্দেহ। লিভিংষ্টোনও স্বীকার করিয়াছেন একমাত্র কপাল জোরেই তাহাদের এই ফলাফল হইয়াছে। কমনওয়েলথ দলের এই টেষ্টের মত এ দুর্বল টীম পূর্বে কোনো খেলাতেই ছিল না। সুতরাং ভারতীয় দলের অযথা কিল্ডিং এর জন্যই এই পরিণতি। এ বিষয়ে আমরা গত তিন মাস ধরিয়া পুনঃ পুনঃ সমালোচনা করিয়াছি কিন্তু আমাদের এ দুর্বল কণ্ঠের আহ্বানে যে নিদ্রা ভাঙ্গে নাই তাহা আমরা প্রতি খেলাতেই দেখিতে পাইতেছি।

ফুটবল :—

ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন বিলাত হইতে ১৯ বৎসরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় অভিজ্ঞ ও খেলা শিক্ষা দিবার বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী জর্জ আন্সালকে কলিকাতায় খেলা শিক্ষা দিবার জন্য আনিয়াছেন। বাঙ্গলার ফুটবল আজ যে পর্য্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে এবং বহিরাগত খেলোয়াড় আমদানিতে বাঙ্গলার খেলোয়াড়দের ভবিষ্যত যে ভাবে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহাতে এই প্রকার শুভ প্রচেষ্টায় আমাদের আন্তরিক সমর্থন জানাইতেছি। শুধু কোচ্ আমদানি করিলে চলিবে না যাহাতে খেলোয়াড়রা সত্য সত্যই খেলা শিখিতে পারে এবং উদিয়মান খেলোয়াড়েরা যাহাতে এই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করে সে বিষয়ে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শ্রীদাদু

তুমি কেবল স্মরণ রেখো
তরুণ প্রাণের আশার কথা
কণ্ঠে মম যে গান জাগে
মিলুক তা'তে তোমার বাণী
সে গান যেন ক্ষণেক তরে
হৃদয় তব উদাস করে
আমার গানের মধু সুরে
হৃদয় তব উঠুক মাতি।

—শ্রীহরীন ভট্টাচার্য এম, এ,

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবারকানাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ,

+ পা জ্ঞা মা পা মা	ঞ্জা সা	+ মা রে	ঁমা নি
		এ টি	
পা নি ই	মা জ্ঞা	মা	। ।
ঁমা মা			ধি
গ	মা গা	রে গা মা ধা পা	মা গা
ব ধু	কু লে	গ ন্ধ	আ নে
নি সা রে গা মা	রে সানি ধা	নি সা	নি ই সা
বা ল	ধি	উ	তি
রে রে জ্ঞা মা	জ্ঞা	রে	পা ধা সা নি ধা পা
আ			বা ণী

পা পা ধা পা মা | মা মা পা মা গা | গা মা রে গা ঋা পা | ঋা পা |
তো মা র | কা ছে • | দি • লে ম | আ নি

পা মা পা নি | পা ঞ্জা | মা রে ণি | রে এ সা |
দি লে ম | আ মা | অ শ্রু | ধা

মা পা . ধা | ণি ই ই | সা ধা নি | ণি ই সা |
ছি | যা মো র | স্ব | বী

মা পা | নি ই ই | নি ই সা | নি সা |
তু মি | কে ব ল | র | খো

নি ই সা | গা | পা ঋা গা | মা গা |
রু | প্রা | আ শা | ক থা

গা মা পা | নি ই সা | নি পা মা গা | মা গা |
ক ণ্ঠে | | বে গা ন | ভা

+
মা রে মা পা ণি | পা ঞ্জা | মা ণি | রে |
দি নু ক | তা তে | আ |

রে রে ঞ্জা মা | ঞ্জা রে সা | রে মা | পা ধা সা নি ধা পা |
গা | বে | ক ক | ত

পা পা ধা পা মা | মা মা পা মা গা | গা মা রে গা ঋা পা | মা পা |
হ ৃ দ য় | ত ব | উ ধা • | ক

মা পা ণি | পা ঞ্জা | মা রে ণি | রে সা |
মা | গা নে | ম ধু | মু রে

মা পা ধা | ণি ই • ই | সা ধা ণি | ণি ই স |
ব | | • ঊ ষ্ | ভি

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

যেই দিন যাইতেছে তৃতীয় মহাযুদ্ধ ততই অবশ্যম্ভাবী-রূপে দেখা দিতেছে। ইউরোপের গ্রীস ও বার্লিন যেমন জগতের রাষ্ট্রমণ্ডলীর শক্তি পরীক্ষাকেন্দ্ররূপে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, এশিয়া মহাদেশে তেমনই কোরিয়াও সেইরূপ একটি কেন্দ্ররূপে বিরাজ করিতেছিল। সোভিয়েট কর্তৃক হো-চি-মিন সরকারের স্বীকৃতির ফলে এশিয়া খণ্ডে আর একটি নূতন অনুরূপ কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল।

ভিয়েৎনাম ঃ—কিছুদিন পূর্বে ফরাসী সরকার ইন্দোচীনের পলাতক রাজা বাও-দাইকে কেন্দ্র করিয়া একটি নূতন স্বায়ত্ত শাসনশীল রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিল। এই রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছিল, গণতন্ত্র সম্মত সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি প্রচলিত করা হইয়াছিল। আইন সভা, সাধারণ নির্বাচন, সভাপতি ও আইন অনুমত মন্ত্রীসভা কিছুরই অভাব ছিল না; অভাব ছিল শুধু জনসমর্থনের। কিন্তু এই জনসমর্থনের অভাব পূরণ করিতেছিল ফরাসী সরকারের রণসম্ভার ও সৈন্যবাহিনী। কিছুদিন হইতে পরাজিত ও পলাতক কে, এম, টি সৈন্য এই রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। খবর রটিয়াছিল এই আশ্রয়প্রাপ্ত সৈন্যগণকে লইয়া একটি কম্যুনিষ্ট বিরোধী সুসংহত সৈন্যবাহিনী গঠন করা হইবে। কিন্তু ফরাসী ও বাও-দাই সরকার এই গুজব অস্বীকার করেন এবং আশ্রয় প্রাপ্ত কে, এম, টি সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বন্দী-শিবিরে অন্তরীণ করে।

তাহা হইলেও ফিলিপাইন, দঃ কোরিয়া ও ভিয়েৎনামের কর্তৃপক্ষগণ আতলান্তিক চুক্তির অনুরূপ একটি কম্যুনিষ্ট বিরোধী ব্যূহ রচনার সাহায্যকল্পে প্রকাশ্যে ও পরোক্ষভাবে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছিলেন না।

এই অবস্থায় গত জানুয়ারী মাসে কমনওয়েলথের পররাষ্ট্র সচিবগণ কলম্বো নগরীতে ভিয়েৎনামের অবস্থা লইয়া আলোচনা করেন। এই আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত বাও-দাই সরকারকে স্বীকার করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে। ভারতের মতে বাও-দাইর জনসমর্থন নাই। এই কারণেই তাহার কূটনৈতিক স্বীকৃতি ও সমর্থন অনৈতিক ও নীতি হিসাবে অগ্রাহ্য এবং এই জনসমর্থন চূড়ান্তভাবে লাভ করিয়াই কম্যুনিষ্ট চীন, ফরাসীদেশ ও মার্কিণ রাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর আর সব অংশেরই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের এই যুক্তিপূর্ণ অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ বাও-দাইকে স্বীকার করিবার পক্ষেই মত দিয়াছে। স্বাধীনতা লাভ করিবার বহু পূর্বে ইন্দোচীনের সর্বজনসম্মত, সর্বজনপ্রিয় নেতারূপে হো-চি-মিন ভারতের শ্রদ্ধা ও নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার অক্লান্ত সংগ্রাম তাঁহাকে আরও বিরাট ও মহানরূপে প্রতিভাত করিতেছে।

কলম্বো অধিবেশনের পর হইতে মার্কিণ ও ইংরেজ সরকার অচিরে বাও-দাই সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার জল্পনা করনা করিতেছিলেন ঠিক এমনই সময় প্রথমে নবীন চীন ও তাহার অব্যবহিত পরে সোভিয়েট সরকার বাও-দাই এর প্রতিদ্বন্দ্বি হো-চি-মিনের সরকারকে ন্যায়ানুমোদিত রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের স্বীকৃতি প্রার্থনা করিয়া গত ১৯শে জানুয়ারী ডাঃ হো-চি-মিন তাঁহার ব্যাঙ্ককস্থিত প্রতিনিধি মারফৎ তথাকার সোভিয়েট দূতের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট গত ৩০শে জানুয়ারী এই পত্রের উত্তর দিয়াছেন। সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আন্দ্রে ভিসিনিস্কি স্বাক্ষরিত এই পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভিয়েৎনামের গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ডাঃ হো-চি-মিনের গভর্ণমেণ্টের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও দূত বিনিময়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কারণ ডাঃ হো-চি-মিনের গভর্ণমেণ্ট যে ভিয়েৎনামের অধিক সংখ্যক অধিবাসীর প্রতিনিধি, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই বাস্তব সত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান এবং সেই কারণে ইহাকে স্বীকার করিয়া লইতে আগ্রহশীল।

ডাঃ হো-চি-মিন গত ১৪ই জানুয়ারী বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের নিকট তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইবার অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই অনুরোধলিপিতে তিনি বলিয়াছেন যে, একাধিকবার আপোষ মীমাংসায় চুক্তি করা সত্ত্বেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিপ্রিয় ফরাসী অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে এবং এই সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম সম্বন্ধে বহির্বিশ্বকে ধোঁকা দিবার জন্য বাও-দাইকে দিয়া তাঁবেদার গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করাইয়াছে।

সোভিয়েট সরকারের হো-চি-মিন স্বীকৃতির বিরুদ্ধে ফরাসী সরকার এক প্রতিবাদলিপি পেশ করেন। কিন্তু রুশ প্রতিনিধি এইরূপ প্রতিবাদপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। লিখিত পত্র প্রত্যাখ্যানের পর সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ও অস্থায়ী ফরাসী পররাষ্ট্র সচিবের ভেতরে অল্পক্ষণের জন্য আলোচনা হয়। প্রতিবাদ লিপির সারমর্ম মৌখিক ভাবে বিজ্ঞাপিত করিয়া ফরাসী পক্ষ হইতে রাষ্ট্রদূতকে জানানো হয় যে ফরাসী সরকার সোভিয়েটের এই স্বীকৃতি কার্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। লণ্ডনের ফরাসী রাষ্ট্রদূত বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্তাদের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অনেকে মনে করিতেছেন যে, সোভিয়েটের এই নীতির ফলে হয়ত ফ্রান্স ও সোভিয়েটের কূটনৈতিক সম্পর্কই ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। তবে বৃটেন এইরূপ সম্পর্কচ্ছেদ না করিবারই উপদেশ দিবেন বলিয়া পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষ হইতে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে তাহা লইয়া যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। ভারত হয়ত হো-চি-মিন সরকারকেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে। কমনওয়েলথ দেশ সমূহের সঙ্গে দঃ আফ্রিকার জাতি বৈরমূলক কার্যকলাপের ফলে কমনওয়েলথ মহলে পূর্ব হইতেই মন কষাকষি চলিতেছে। ভারতের কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকারও সর্বক্ষেত্রে সমর্থন লাভ করে নাই। এর উপর যদি আজ হো-চি-মিনকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ চক্র ব্যূহ হইতে ভারতের বহিষ্কারই হয়ত শেষ পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে গৃহীত হইবে। ভারতের সম্মুখে এক চরম আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

রণসম্ভার ঃ—যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে নূতন করিয়া গড়িবার সঙ্কল্প লইয়া মার্শাল সাহায্যের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। এই সাহায্য আর্থিক খাতে দেওয়া হইতেছিল। এই সব অঞ্চলে বহিরাক্রমণের সম্ভাবনা বর্তমান আছে এই অজুহাতে উত্তর আতলান্তিক অঞ্চলের দেশগুলিকে লইয়া আতলান্তিক চুক্তি সাধিত হয়। এই চুক্তির বিশেষ বিশেষ ধারা অনুযায়ী চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহকে সর্ত সাপেক্ষ সামরিক সাহায্য দানের দায়িত্ব মার্কিণ সরকার গ্রহণ করে। মার্কিণ সরকারের এই দায়িত্ব গ্রহণ কংগ্রেসের সমর্থন সম্প্রতি লাভ করিয়াছে। এই গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী একশত কোটী ডলার বিভিন্ন দেশগুলির ভেতর প্রয়োজনানুযায়ী ভাগ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ফরাসীদেশ সবচেয়ে বেশী অংশ লাভ করিয়াছে। তাহার ভাগে পড়িয়াছে ৩০ কোটী ডলার। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে ইউরোপীয় আক্রমণের ব্যাপারে ফরাসীদেশের সামরিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই রণসম্ভার হইতে কিছু অংশ ইন্দোচীনে সরবরাহ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি সেখানকার অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এই রণসম্ভার সরবরাহ ও বিতরণের ব্যাপারে আর এক নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। গত ৩০শে জানুয়ারী রাত্রে ইতালীর লেগহর্ণ বন্দরের ডক শ্রমিকদের বৈঠকে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ইতালী ও ইউরোপের অন্যান্য বন্দরের ডক শ্রমিকদের ন্যায় তাহারা "আতলান্তিক চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত সমরোপকরণ কদাপি বোঝাই অথবা খালাস করিবে না।" জেনোয়া, ন্যাপলেজিয়া ও অ্যানসেনার ডক শ্রমিকগণও ইতিপূর্বে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ফ্রান্সের ডক শ্রমিকগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত সমরোপকরণ এবং ইন্দোচীনের জন্য প্রেরিত সমরসম্ভার বোঝাই ও খালাস করিবে না বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ-

করিয়াছে। বেলজিয়াম ও ইতালীতেও অনুরূপ আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে।

নবোদ্ভূত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য চারটি দেশে ব্যাপকভাবে পুলিশ ও সামরিক প্রহরার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। কারণ ডক, রেল শ্রমিক এবং নাবিকগণ কর্তৃক পরিচালিত এই আন্দোলনের ফলে আতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের সামরিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন।

নবতম মারণাস্ত্র :—তৃতীয় মহাযুদ্ধের ব্যূহ রচনার কাজ দ্রুত গতিতেই চলিতেছে। উদ্যোগপর্বের আর একটি দিক অস্ত্র রচনা। এতদিন ধারণা ছিল হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যে আণবিক বোমা ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং পরে যে বোমা এনিওয়েটকে পরীক্ষিত হইয়াছিল তাহাই মানবের হিংসার চরম পরিণতি। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা নামক আর একটি নূতন অস্ত্র আবিষ্কারের খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক ডাঃ থারারিং ১৯৪৬ সালেই—অর্থাৎ জাপানে আণবিক বোমা বর্ষিত হইবার এক বৎসর পরেই—হাইড্রোজেন লিথিয়াম বোমা উৎপাদনের মূল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ যে মার্কিণ আণবিক বিশেষজ্ঞগণ ১৯৪১ সালে কিম্বা তাহার পূর্বেই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মহাশক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

বিপ্লবী শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত
প্রগতিশীল জাতীয় সাপ্তাহিক

"ফরওয়ার্ড"

নিয়মিত পাঠ করুন

ফরওয়ার্ড হাউস
৩২, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা—৯

ফোন—বি. বি. ২৬৬০ গ্রাম—ডরক

রঙ্গবার্তা

শিল্পরসিক

জোয়ান অব্ আর্ক :—

ভিক্টর ফ্লেমিংএর যুগান্তকারী অবদান 'জোয়ান অব্ আর্ক' যার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন প্রতিভাবতী অভিনেত্রী ইন্‌গ্রিড্ বার্গম্যান এবং কাহিনীর অভিনবত্বে, প্রাণস্পর্শী অভিনয় আর সর্বোপরি, পরিবেশের বিরাটত্বের গুণে যে ছবিখানি সমসাময়িক যুগের একখানা স্মরণীয় চিত্র বলে পরিগণিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে, কিছুদিন থেকে কলকাতার লাইটহাউস চিত্রগৃহটিতে সেটি প্রদর্শিত হচ্ছে।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিককার ঘটনা নিয়ে এর বিষয়বস্তু। ইংলণ্ডের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্যস্ত ফ্রান্সের দুর্বল শাসন ব্যবস্থা ও দুর্বলতর রাজচরিত্র যখন সাধারণ লোকের ঘাড়ে চরম অভিশাপের মত চেপে বসেছে—আর যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশের জনসাধারণের—সৈন্য ও ধর্মযাজকদের ভিতরেও বিরাজ করছে সর্বব্যাপী নৈতিক শৈথিল্য, সেই সময়ে ফ্রান্সের এক অখ্যাত গ্রাম্য বালিকার মনে জাগল দেশের দুরবস্থা দূর করবার জন্যে আকুল আগ্রহ। সর্বদা তার একমাত্র চিন্তা কি করে ফ্রান্সকে রক্ষা করা যায়। এই আগ্রহের অধীরতায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে মেয়েটি নানা বাধাবিঘ্নকে তুচ্ছ ক'রে এগিয়ে গেল রাজার সঙ্গে দেখা করতে;—উদ্দেশ্য ফরাসী সৈন্যদলের নেতৃত্ব ক'রে তাদের জয়ী করা। তারপর সেকাজে সে আংশিক সফলতাও লাভ করল বটে, সৈন্যদের ভেতর থেকে বহুদিনকার প্রচলিত কুপ্রথাগুলি দূর করে আর নিজে সাহস ক'রে আগে আগে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে তাদের উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলে জোয়ান পেল ওরলিয়নের যুদ্ধে বিজয়। কিন্তু দেশমাতা তাঁর এই একুশ বছরের সন্তানটির কাছ থেকে চাইলেন আরো অনেক বড় ত্যাগস্বীকার। দেশকে জাগাবার জন্যে—দেশবাসীর কুসংস্কার ও অজ্ঞতাকে দূরীভূত ক'রবার জন্যে প্রয়োজন ছিল দেশবাসীর প্রাণে এক প্রবল আলোড়ন তোলার। জোয়ানের হত্যাকাণ্ড—তা সে যতই নৃশংস চক্রান্তজাত হোক্ না কেন, এদিক থেকে তা বরং সার্থকই হয়েছে বলতে হবে।

শহীদ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ইতিপূর্বেও বহু চিত্রে দেবার প্রচেষ্টা হয়েছে সন্দেহ নেই। সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে ওঠে তখনই যখন দর্শকের মন পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবার অনুপ্রেরণা পায় চিত্রে বর্ণিত ও প্রদর্শিত শহীদ-জীবনের বাস্তব আলেখ্যটিকে দেখে। এদিক থেকে দেখতে গেলে এ ছবিখানির সফলতা সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। এর জন্যে সর্বপ্রধান কৃতিত্ব অবশ্য নায়িকার ভূমিকায় ইন্‌গ্রিড বার্গম্যানের জোড়াহীন অভিনয়; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নিকটে প্রদত্ত জোয়ানের ভাষণের মধ্যে সেনাপতি ও নেতা সুলভ তেজস্বিতা বার্গম্যানের কণ্ঠে যেমন ফুটে উঠেছে, তা অন্য কোন মেয়ের ভেতর পাওয়া যেত কি-না সন্দেহ।

কয়েকটি দৃশ্যের অভিনবত্ব ও মর্মস্পর্শিতার জন্যে এ ছবিখানি বিশেষভাবে সমৃদ্ধ; যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য; পশ্চাদপসরণরত ফরাসী সৈন্যদের জোয়ানের ডাকে পুনরায় আক্রমণোদ্যোগ; জোয়ানের বিচার দৃশ্য ও জোয়ানের মৃত্যুদৃশ্যের ছাপ দর্শকমনে বহুক্ষণ ধ'রে থেকে যায়।

এ ছবিখানি সম্বন্ধে সবচাইতে প্রশংসার কথা হচ্ছে এই যে ইংরেজী ছবির চিরাচরিত নিয়মভঙ্গ ক'রে এই ছবিখানার মধ্যে পরিচালক একটি মাত্রও শৃঙ্গার-রসাত্মক দৃশ্যের অবতারণা করেন নি; যার ফলে মা-বোনকে নিয়ে এ ছবি অনায়াসে উপভোগ করা চলে একযোগে।—শ্রীনারদ

মানদণ্ড :—

এ. বি. পিকচার্সের প্রযোজিত এবং রতন চাটার্জী পরিচালিত বাংলা ছবি 'মানদণ্ড' একযোগে মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করেছে। রাধামোহন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, বীরেশ্বর সেন, চন্দ্রাবতী দেবী, অনুভা গুপ্তা, প্রীতিধারা এবং পদ্মা দেবী প্রধান ভূমিকা-গুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

প্রথমেই বলে রাখি ছবিখানা আমার মন্দ লাগেনি। "ভালো লাগা" এবং "মন্দ লাগেনি" এই দুইয়ের তফাৎ বোঝবার মত বুদ্ধি আমাদের দেশের দর্শকবৃন্দের আছে বলেই মনে করি। বনফুল রচিত মানদণ্ডের গল্পাংশ নিয়ে রাজনৈতিক দলাদলি ও তর্ক বিতর্ক হবার সম্ভাবনা আছে। একদল বনফুলকে পুঁজীবাদীদের ভাড়াটে লেখক বলে আখ্যা দেবেন এবং অন্য দল বলবেন "বনফুলকে পুঁজীবাদী ও জমিদারদের তরফ থেকে Letter of appreciation দেওয়া উচিত। আমি এই ঘৃণ্য দলাদলির ভেতর মাথা গলাতে চাই না। তবে এটুকু বলতে পারি যে সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা নায়ক নায়িকা শুরু করলেন তার কোন সমাধান খুঁজে পেলাম না; শেষ পর্যন্ত উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়লেন, ব্যস্ মধুরেন সমাপয়েৎ।

এর পর অভিনয়। প্রথমেই নাম করতে হয় ছবিবাবুর। অনবদ্য অভিনয় করেছেন তিনি এ ছবিখানিতে। গত তিন বছরের মধ্যে ছবিবাবু আর কোন ছবিতে এত সুন্দর অভিনয় করেছেন বলে মনে পড়ে না। তাঁর অভিনয় এ ছবির একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারপরে নাম ক'রতে হয় বীরেশ্বর সেনের। একটু মফস্বেষা হলেও তাঁর অভিনয় চমৎকার হয়েছে। এই ধরণের চরিত্রে অভিনয় ক'রে ভবিষ্যতে সুনাম করতে পারবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু হিরণ্যগর্ভের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্য আমাদের হতাশ করেছেন। তাঁর অভিনয় অত্যন্ত আড়ষ্ট, যেন কোন প্রাণ নেই। হিরণ্যগর্ভ যে একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার তা তাঁর প্রাণহীন অভিনয়ে এবং বোকা চেহারায় একবারও ফুটে ওঠেনি।

তুঙ্গশ্রীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী দেবীও আমাদের আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারেননি। এই ভূমিকায় তাঁকে মোটেই মানায়নি। আমার মনে হয় চরিত্রটিকে তিনি সম্যকভাবে বুঝতে পারেননি। বেটা আমার কাছে সবচেয়ে দৃষ্টিকটু লেগেছে তা হচ্ছে তিনি যেন জমিদার হিরণ্যগর্ভের সঙ্গে flirt ক'রবার জন্য ষ্টেশন থেকেই তৈরী হয়েছিলেন।

শিখরিণীর ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা সুন্দর অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁকে তাঁর দেহের দিকে অবহিত হতে বলবো, এভাবে মেদাধিক্য ঘটলে শীঘ্রই তাঁকে চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে।

বিন্নুর ভূমিকায় প্রীতিধারা সু অভিনয় করেছেন। তবে তাঁর এবং অন্যদিপ্রসাদের নাচ মোটেই মনোজ্ঞ হয়নি। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অচল।

তুঙ্গশ্রী ও হিরণ্যগর্ভ যখন বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তখন মাঝে মাঝে তাঁদের সংলাপ দীর্ঘ হওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্তিকর লাগছিল। এ দিকে আমি পরিচালক রতনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাছাড়া তাঁর পরিচালনা ভালই হয়েছে।

ছোট ছোট ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরা সবাই সু অভিনয় করেছেন, যেমন. ভানু বানার্জী (ছোট), খগেন বোস, খগেশ চক্রবর্তী, অনাদিপ্রসাদ, সিতাংশু, ইত্যাদি।

হীরাবাঈএর ভূমিকায় পদ্মাদেবীর অভিনয় ভালই হয়েছে। সন্ধ্যা মুখার্জীর গানের সঙ্গে তার ওষ্ঠ সঞ্চালন বেশ সুন্দর হয়েছে, তবে শেষ গানের সময় তানপুরা হাতে তাঁর বসার ভঙ্গী বড় বিশ্রী হয়েছে।

অনিল বাগচীর সঙ্গীত পরিচালনা সুন্দর, ফটোগ্রাফিতে বিশুবাবু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, শব্দগ্রহণ ত্রুটীপূর্ণ।

জনসমাগম দেখে মনে হয় এই ছবি দিয়ে প্রযোজক মশাই বেশ লাভবান হবেন।—শিল্পরসিক

সর্বোদয়

আজ মনে পড়ে, দু'বছর পূর্বে এমনই দিনে আমাদের জাতির, জগতের সকল পতিত, নির্যাতিত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী ঘাতকের হস্তে নিহত হন। দাসের জাত—দাসত্ব রয়েছে তার মজ্জায়, মেদের কণায় কণায় জড়িয়ে, স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলো তার চোখে সইবে কেন? এক ফুৎকারে সে আলোকে সে নিভিয়ে দিল।

কয়েক সহস্র বৎসরের প্রাচীন কৃষ্টি সভ্যতা যেখানে এসে নবীন বিশ্বসভ্যতার ও কৃষ্টির ধারায় মিলেছে, সেই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মহাত্মা গান্ধী। অভি-ব্যক্তির মুখে প্রাচীন দৈন্য ঘুচে গিয়ে বিশ্বমানব প্রাচুর্যের সন্ধান পেয়েছে। দৈন্যের দিনে দাসত্বের যে সমাজব্যাপী প্রয়োজন ছিল, সে প্রয়োজনের অবসান ঘটেছে। তবু প্রাচীন সমাজ থেকে অভিজাতের, ধনীর আর প্রভা-পান্বিতের, প্রভুত্বের যে সংস্কার ছিল, সেই সংস্কার কাটেনি। গান্ধীজি চেয়েছিলেন সেই সংস্কার কাটিয়ে সর্বমানবের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে। মুষ্টিমেয়ের বিরুদ্ধে সমাজের অধিকাংশ মানুষের এই দ্বন্দ্বে হিংসা শুধু নিরর্থক নয়, হিংসা মুষ্টিমেয়ের হাতে পাশুপত অস্ত্র। তাই তিনি চেয়েছিলেন সকল মানুষকে—পতিত, নির্যাতিত মানুষকে সমাজে তার স্থান ও অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তাকে মানবত্বের মর্যাদার শক্তিতে, সত্যিকার শক্তিতে বলীয়ান ক'রে তুলতে। মুষ্টিমেয়ের প্রভুত্বের অনুচর তাঁকে আঘাত হান্‌লো—বিশ্বমানবের মুক্তির পুরোহিতের তিরোধান ঘট্‌লো।

সে পুরোহিত আজ নেই, তাঁর আদর্শ রয়েছে তাঁর জাতের সামনে। সেই আদর্শ সর্বোদয়ের আদর্শ। মানুষকে তার পরিপূর্ণ মুক্তি আর পরিণতিতে বিকশিত ক'রে তোলা, আর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নয়, পরস্পরের সহযোগিতায় মুক্ত-মানুষের সমাজ পরিচালনা আর সেই সমাজে ব্যক্তির বিচিত্র বিকাশই সর্বোদয়। প্রাচীন দৈন্যের দিন থেকে প্রাচীনতর পশু-প্রকৃতির প্রভাবে পরস্পরকে ঠেলে ফেলে মানুষ বড়ো হ'তে চাইছে। এখানেই যেমন মানুষের সামাজিক দাসত্বের মূল, তেমনি সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহেরও মূল। এবং এরই ফলে যেমন মানুষের চরিত্রের, তেমনি মানুষের সমাজের পূর্ণতার লক্ষ্যে যাত্রার ব্যাঘাত ঘট্‌ছে। মানুষ কেবল খেয়ে বাঁচে না, আবার খাওয়ার না হ'লেও তার জীবন বরং না। মানুষের এই খাদ্যের সংস্থান, আর তার পর মানুষের সর্বাঙ্গীন পরিণতি আগামী সমাজের মুক্ত-মানুষ করবে পরস্পরের সহযোগিতায়। এই আদর্শের দীপ্ত আলোক বিশ্বমানবের সামনে রেখে গেছেন মহাত্মা গান্ধী। আজ তিনি আলো ধ'রে নেই, কিন্তু আলো জ্বলছে। প্রাচীনের ধ্বংসস্তূপের আর সেই ধ্বংসের ধূলিধোঁয়ার অন্ধকার পথে আজ কি দু'পাঁচটি মানুষও জুটবে না যাঁরা সেই আলোতে পথ দেখে বিশ্বমানবের জন্য পথ ক'রে চলবেন?

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণ রাষ্ট্র।—

২৬শে জানুয়ারি ভারতবর্ষের পক্ষে অতি স্মরণীয় দিন। ১৯২৯ ও ৩০ সালের সন্ধিক্ষণে রাভী নদীর কূলে লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুসারে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংকল্প বাণী গ্রহণ করত। ১৯৩০ সাল থেকে এই বিশ বছর অবশ্য বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সংকল্প বছর বছর গ্রহণ করেছে এবং বছর বছর কঠিনতর সংগ্রামের

ও সাহসে বরণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এমনি ক'রে বিশ বছর অতীত হয়েছে। সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা ও সাধনার ভিতর দিয়ে জাতি তার স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়েছে।

একটা জাতির জীবনের পক্ষে ২০ বছর খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু যে অধীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার সঙ্গে জাতি তার মুক্তির প্রতীক্ষা করছিল, তাতে এক একটি বছর তার নিকট এক একটি যুগ ব'লে প্রতীয়মান হ'ত। কত আশার বাণী প্রতি বছর এই ২৬শে জানুয়ারী জাতি শুনেছে; কত আকাঙ্ক্ষা তার মনে জেগেছে; কত উৎসাহ ও সাহস এক বছরের পাথেয় হিসাবে সে ঐ দিন সঞ্চয় করেছে।

এই কয় বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে জাতির স্বপ্নকে কার্যে সফল করবার প্রয়াস হিসাবে। উদ্ধত বিদেশী রাজশক্তির অনিচ্ছুক হাত হ'তে স্বাধীনতা কেড়ে আনতে হবে—এই সংকল্প গ্রহণের জন্য প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হ'ত। আজ জাতির সাধনা পূর্ণ হয়েছে; আজ স্বাধীনতা তার করায়ত্ত হয়েছে। এত দিনের স্বাধীনতা দিবস পালনের চেয়ে আজকে স্বাধীনতা দিবস পালন সেই হিসাবে অনেকখানি স্বতন্ত্র। আজকের উৎসব সাফল্যের উৎসব, জাতীয় সাধনার চরিতার্থতার উৎসব। আজ জাতি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসাবে বিশ্বের দরবারে স্থান গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বিধান পরিষদ যে শাসন-বিধান প্রণয়ন করেছে, আজ থেকে তা চালু হ'ল। এ শাসন-বিধান অন্য দেশ বা জাতির অনুমোদন সাপেক্ষ নয়; ইহা একান্ত ভাবে ভারতবাসীর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত; প্রয়োজন মতো এর ভবিষ্যত পরিবর্তন ও প্রত্যাহার সব কিছুই ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের দ্বারা সাধিত হ'বে।

কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ প্রমাণ করতে চায় যে আমাদের স্বাধীনতা ভুয়ো স্বাধীনতা। অনেকে বলতে চায় যে আজ-ও ভারতবর্ষ ইংরেজের তাঁবেদার রাষ্ট্র। উপরে যা বলেছি তাতে কি এসব উক্তির অসত্যতা প্রমাণিত হয় না? যে শাসন-বিধানে ভারতবর্ষ শাসিত হ'বে তার গঠনে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনে কোন বিদেশী রাষ্ট্র শক্তির কোনই এক্তিয়ার থাকবে না। সার্বভৌম স্বাধীনতার ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দ্বিতীয় আপত্তি কেউ কেউ তুলছে—এই শাসন-বিধানের স্বরূপ নিয়ে। এই শাসন-বিধানে পূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী এক একটি ভোটের অধিকারী হ'বে। তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালিত হ'বে। জনসাধারণের স্বাধীনতার সব চেয়ে বড় লক্ষণ হ'লো এই। যে সব দেশের উদাহরণ দেখিয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দল এখানে আস্ফালন করে, তাদের অনেক দেশেই সাধারণ মানুষের এত খানি রাষ্ট্রীয় অধিকার সহজে স্বীকৃত হয় নি। এখানে মনে রাখা দরকার এক বিদেশী বা স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন থেকে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'বার মুখে ক্ষমতা-লিপ্সু বহু দল ও স্বার্থ মাথা গজিয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ত্যাগ করার কয়েক বছর পূর্বেই দেশবাসী জানত যে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ শাসনের অবসান হবে। সেই সময় থেকে দেশের সর্বত্র একটা কেন্দ্র-বিমুখীন মনোভাব গ'ড়ে উঠেছিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তীব্র বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত ব্যাপক গৃহ-যুদ্ধে (Civil War) পরিণত হয়েছিল। তার ফলে ভারতবর্ষের এক অংশ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র রূপে পাকিস্থান গঠন করেছে। প্রদেশে প্রদেশে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বেশ প্রকট হ'য়ে উঠেছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে কেন্দ্রের প্রতি অতি সামান্য আনুগত্য রেখে তারা প্রায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতো থাকতে পারবে। জাতীয় সত্তাকে ধর্ম ও বর্ণ হিসাবে টুকরা টুকরা করা হয়েছিল; পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের মনোভাবকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছিল—যাতে জাতীয় সত্তা ব'লে কিছু না থাকে। এ ছাড়া তাঁবেদারী রাজনৈতিক দল বামপন্থার নামে সুবিধাবাদের পন্থা নিয়ে জাতির মনকে বিভ্রান্ত

করার সুযোগ পাচ্ছিল। সর্বোপরি আনুমানিক ছয় শত দেশীয় রাজ্যকে যাবার মুখে ইংরেজ ব'লে দিয়ে গেল—তারা সবাই স্ব-স্ব প্রধান, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র।

বিভেদ-সৃষ্টির পক্ষে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও অবস্থা যখন সুপক্ক তখন ইংরেজের হাত হ'তে শাসন-ক্ষমতা এসেছে জাতির প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের হাতে। খুব বেশী দিনের কথা নয়;—সে মাত্র আড়াই বছর পূর্বের কথা। তখনকার অবস্থা মানুষের ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়; তবু-ও যেন দুঃখ-দৈন্যের চাপে ও স্বার্থদুষ্ট অপপ্রচারের ফলে দেশের জনসাধারণ সেদিনকার কথা ভুলে গিয়েছে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ব'লে কিছু ছিল না। বড় বড় সহর থেকে সুরু ক'রে পল্লীগ্রামে পর্যন্ত নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করা সম্ভব ছিল না। কলিকাতার রাস্তা দিনের বেলা-ও প্রেতপুরীর মতো পরিত্যক্ত মনে হ'ত। সহরের কর্মচাঞ্চল্য যেন মৃত্যু-স্পর্শের আশঙ্কায় আত্মগোপন করেছিল। ভারতের প্রায় সর্বত্র এই অবস্থাই ছিল। আজ দেশের শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপিত হয়েছে। এর মর্যাদা যে দেশবাসী অনুভব করে না, এমন কথা আমরা বিশ্বাস করি না।

আড়াই বছর পূর্বে সমগ্র ভারত ব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর তার তুলনায় হয়তো নগণ্য বিবেচিত হ'ত;—এমন একটা দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা তখন সবাই করেছিল। তেমনি একটা সঙ্কট সময়ে কংগ্রেস দেশের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করে; এবং তাদেরই সুব্যবস্থায় সেই আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষ প্রতিহত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়, ১৯১৭ সালে রুশিয়াতে কম্যুনিষ্ট দলের হাতে ক্ষমতা আসার পর সমস্ত রুশীয়াব্যাপী কি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চলেছিল। ভারতবর্ষের তুলনায় তখনকার রুশীয়ার লোক সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ এবং জমির আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় তিন গুণ। কৃষি সম্পদের ও কৃষির উপযুক্ত জমির প্রাচুর্যের জন্য রুশিয়া খ্যাত; ভারতবর্ষ সেই হিসাবে অনেকটা ভাগ্যলাঞ্ছিত। তবুও কম্যুনিষ্ট শাসিত রুশিয়ার মতো ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় নি।

আজ স্বাধীন গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনে গত আড়াই বছরের খতিয়ান নেওয়া উচিৎ। তাই এসব কথার উল্লেখ ও স্মরণ করা আজ প্রয়োজন। অতীতের অন্ধকারময় দুর্যোগের দিন অপেক্ষাকৃত সহজে অতীত হয়ে এসেছিল ব'লে সে দিন গুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কিত আপদের কথা ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। **ভবিষ্যতের কথা—**

ভারতবর্ষ স্বাধীন গণতান্ত্রিক বা লোকায়ত্ত সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বিশ্বের দরবারে আসন গ্রহণ করল। এখানে বিচার করা দরকার এই নূতন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রূপ কি হ'বে।

পূর্বে যা বলেছি তা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে নতুন রাষ্ট্র জনসাধারণের ভোটের উপর নির্ভর করবে। রাজনৈতিক দিক্ থেকে এই রাষ্ট্র পূর্ণরূপে লোকায়ত্ত হ'তে বাধ্য। এ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপ কি হ'বে তাই বিশেষভাবে এখানে বিচার্য। শাসন-বিধানে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশ আছে। বিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়, ব্যক্তিগত মত ও আচরণের স্বাধীনতা, মর্যাদা ও আত্ম-বিকাশ-সুযোগের সমতা এবং সমস্ত নাগরিকদের ব্যক্তিগত পরিমার উপর প্রতিষ্ঠিত সৌহার্দ্য—এই চারটী মূল নীতির উপর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এই প্রস্তাবনায় রাষ্ট্রের সামাজিক ও আর্থিক বনিয়াদের যে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা থেকে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গতি অনুমান করা সম্ভব। এখানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে সামাজিক ও আর্থিক ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এই রাষ্ট্রের একটা বিশেষ দায়িত্ব হ'বে। রাষ্ট্রের নির্দেশক নীতি (Directive Principles) ও মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) নামক দুই অধ্যায়ে ব্যক্তির সামাজিক ও আর্থিক অধিকার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বে (অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) করেছি।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছে শাসন-বিধানে যে সব কথা বলা হ'য়েছে তা কার্যে পরিণত করা হ'বে এমন নিশ্চয়তা নেই। কংগ্রেসের এতকালের ঐতিহ্য ও কার্যপদ্ধতি থেকে

এমন কোন সন্দেহের কারণ আছে ব'লে মনে করি না। তা' ছাড়া সংপ্রতি কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি আর্থিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তা'তেও কংগ্রেসের দৃষ্টিকোণের একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সমবায় ও বিকেন্দ্রীকরণ-নীতি, সকলের সমান সুযোগ, সকলের জীবন যাত্রার পর্যাপ্ত উপায়, সকলকে যথোপযুক্ত কাজে নিয়োগ করা এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিকাশের পূর্ণ সুযোগ—এই সব নীতি অবলম্বন ক'রে তাদেরই সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে। সাধারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সঙ্গে সামাজিক ও আর্থিক অধিকারের যে সূচনা এ প্রস্তাবে করা হয়েছে তা প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পরিচায়ক

কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এই প্রস্তাব একটা নতুন সমাজের পরিকল্পনা করে। কংগ্রেস এত বছর যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আদর্শকে জনসাধারণের সামনে ধরেছে তাকে কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব কংগ্রেস কখনও অস্বীকার করতে পারে না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পর আড়াই বছর লেগেছে স্বাধীন ভারতের নতুন শাসন-বিধান গঠন করতে। অন্যান্য দেশের ইতিহাসের তুলনায় একথা স্বীকার করতেই হ'বে যে এত বৈচিত্র্যময় পরিধি কোটি লোকের বাসভূমি ভারতের শাসন-বিধান গঠন বরং খুব সত্বরই সংসাধিত হয়েছে। শাসন-বিধান গঠন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস তার সামাজিক ও আর্থিক আদর্শকে কার্যে পরিণত করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি, কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এই প্রস্তাব একান্তই সময়োপযোগী ও কংগ্রেসের আন্তরিকতার পরিচায়ক।

স্বার্থ-দুষ্ট, ক্ষমতালিপ্সু বিভিন্ন দল কংগ্রেসের ত্রুটী বিচ্যুতিকে ফলাও ক'রে জনসাধারণের মনকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করছি আড়াই বছরের কংগ্রেসী শাসন জনসাধারণের আশায় ও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি দিতে পারে নি। অবশ্যম্ভাবিক অনিবার্য কারণ, শাসন কার্যে পূর্বের অভিজ্ঞতার অভাব এবং হয়তো কতক পরিমাণে ব্যক্তিগত ত্রুটী বিচ্যুতি এর জন্য দায়ী। কিন্তু শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার অব্যবহিত পরে কোন দেশে নতুন শাসন-কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করতে পারেনি। কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার ইতিহাসের মানদণ্ডেই করতে হয়। সেই মানদণ্ড দিয়ে হিসাব করলে, সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষে কংগ্রেসের এই আড়াই বছরের শাসন-কার্য খুব নিন্দার যোগ্য নয়। এর ত্রুটী বিচ্যুতির তীব্র সমালোচনা আমরা পূর্বেও করেছি, ভবিষ্যতেও করব; কারণ যেটুকু সাফল্য হয়েছে তাতে তৃপ্ত থাকা বিপ্লব-বিরোধী ব'লে আমরা মনে করি। ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নেতৃত্বেই জাতি তার আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবকে পূর্ণ করতে পারবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। কার্যকরী সমিতির গত অধিবেশনের প্রস্তাব আমাদের সেই বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছে।

সরদারজীর বাংলা পরিদর্শন

পশ্চিম বাংলা ব্যবস্থা পরিষদের অন্তঃকালবর্তী নির্বাচন স্থগিত হওয়ার পর হঠাৎ খবর এল সরদারজী কলিকাতায় আসছেন। স্বভাবতঃই লোকের মনে আশা জাগল—নির্বাচন প্রস্তাব প্রত্যাহার ক'রে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ বাংলার সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার জন্যই সরদারজী কলিকাতায় আসছেন। রাজনৈতিক সমস্যাকে বাস্তব ও কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখবার ও তার সমাধান করবার ক্ষমতা আছে ব'লে সরদারজীর একটা বিশেষ খ্যাতি ছিল। সেই হিসাবে সরদারজীর আগমনকে বিশেষ গুরুত্বসূচক ব'লে সবাই মনে করেছিল।

কিন্তু জনসাধারণের সে আশা পূর্ণ হয় নি। সরদারজী বাংলায় এসেছেন যেন কংগ্রেসের নেতা হিসাবে নয়—কেন্দ্রীয় সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মাত্র। সর্ব ব্যাপারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে উপেক্ষা ক'রে সরদারজীর অবস্থান কালে চার দিনের কার্য তালিকা গঠিত হয়েছিল। দমদম হাওয়াই বন্দর ক্ষেত্রে তাঁর অবতরণ

সময় হ'তে এবং ঐ হ'ওয়াই বন্দর হ'তেই তাঁর বিদায় নেওয়ার সময় পর্যন্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে কোন যোগই রক্ষা করা হয় নি। জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক এবং নামকরা কংগ্রেস কর্মীদের (Important Congressmen) সঙ্গে সরদারজীর ঘরোয়া বৈঠক হয়। এই বৈঠকের উদ্যোগ-আয়োজন থেকে সুরু ক'রে এই বৈঠকে যোগদানের নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে কোনই সম্পর্ক রাখা হয় নাই। মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ হ'তে জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তাদের এক সুবিধামত তালিকা তৈরী করা হয়েছিল; সত্যিকার পদাধিকারীদের বাদ দিয়ে পছন্দমত ব্যক্তিকে কোন কোন জিলা কংগ্রেসের পদাধিকারী ব'লে ঐ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। নামকরা কংগ্রেস কর্মী হিসাবে কংগ্রেস মহলের অনেক কুখ্যাত ব্যক্তিকে পর্যন্ত ঐ বৈঠকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

অবশ্য এ সব কোনটাই হয়তো সরদারজীর জ্ঞাতসারে হয় নি। কিন্তু আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় সরকার বা কংগ্রেস কমিটি হ'তে বিশেষ নির্দেশ থাকা উচিৎ যে পণ্ডিতজী বা সরদারজী বা এমনি কোন খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা যদিও মন্ত্রী হিসাবে কোথাও যান, তবু স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে তাঁদের কার্যতালিকা নির্ধারণ করা উচিৎ। সরদার বল্লভভাই প্যাটেল দমদম হাওয়াই নগরে অবতরণ করলেন; তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য সরকারী মহলের কর্মচারীরা নিমন্ত্রিত হলো। কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বা জেলা কংগ্রেস কমিটির কোন প্রতিনিধির স্থান সেখানে হয় নি। কংগ্রেস মন্ত্রীদের একথা স্মরণ রাখা দরকার যে তাঁদের নেতৃত্ব ও মন্ত্রীত্ব গড়ে তুলেছে ও বজায় রেখেছে কংগ্রেস কর্মীরা—সরকারী কর্মচারীরা নয়।

হয়তো অন্যান্য প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে এমনি ভাবে খেলো করবার প্রচলন নেই। হয়তো বা বাংলা মন্ত্রীসভার এটা বিশেষ মনোভাবের পরিচয়। বাংলার মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে কংগ্রেসের উচ্চতম মহলে মনোভাব কি তা' বাংলার জনসাধারণ আজও বুঝতে পারে নি। তবে এই মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে বাংলার জনসাধারণের মনোভাব কি তা কংগ্রেসের উর্ধতম কর্তৃপক্ষের নিকটে হয়তো অজ্ঞাত নয়। এই মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রসাদ-পুষ্ট কতিপয় স্বার্থ-পুষ্ট লোক ভিন্ন বাংলার কোথাও এই মন্ত্রীসভার সপক্ষে কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে না: শহরের নামকরা নাগরিক হিসাবে কয়েকজন নরমপন্থী বৃদ্ধ প্রতিষ্ঠাপন্ন লোককে প্রধান মন্ত্রীর যাছাইমত উপস্থিত করা হয়েছিল। হয়তো প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের আশা ছিল যে এঁরা অন্ততঃ তাঁর মন্ত্রীসভার সপক্ষে সরদারজীর নিকট সুপারিশ করবেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তা' থেকে বলতে পারি, এই সব বিশিষ্ট নাগরিকগণ পর্যন্ত এই মন্ত্রীমণ্ডলীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই মত দিয়েছেন। আমরা শুনেছি, তাঁদের মতে বাংলার বর্তমান শাসনকে বা মন্ত্রীমণ্ডলীকে জনপ্রিয় (popular) বলা যায় না; ইংরেজ আমলের চেয়েও নাকি এটা আরও বেশী ক'রে আমলাতান্ত্রিক (bureaucratic)। আরও শুনেছি তাঁদের মতে ইংরেজ আমলের আমলাতন্ত্রের মধ্যে যে পরিমাণ কর্মদক্ষতা (efficiency) বা সততা ছিল বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে তা পর্যন্ত নেই।

আমরা আশা করেছিলাম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার সমস্যা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা ক'রে সরদারজীকে পাঠিয়েছে: পণ্ডিতজী বাংলায় এলেন; তিন চার দিন বহু লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; চ'লে গেলেন; কিন্তু বাংলার অবস্থার ক্রমঃ অবনতির রোধ করতে পারলেন না: সরদারজী এলেন; তিন চার দিন ব'সে বহু আলাপ-আলোচনা করলেন; চ'লে গেলেন; বাংলার অবস্থার অবনতি তেমনি চলতে থাকল। তাঁরা হয়তো জানেন না গত দেড় বছরের ভিতর পশ্চিম বাংলার জেলাবোর্ডের বা মিউনিসিপালটীর কোন নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হ'তে পারে নি। বহু ক্ষেত্রেই কংগ্রেস এই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সাহস পায় নি। এই মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান আড্ডা, হুগলী, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলার এই দেড় বছরের নির্বাচনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ অবস্থার কতকটা পরিচয় পাবেন। অথচ বাংলার জনসাধারণ বরাবর

কংগ্রেস অনুরক্ত, আজও তারা কংগ্রেস অনুরক্ত কিন্তু কংগ্রেসের ছাপ দিয়ে যে কোন লোককে প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রী ক'রে দিলেই সে শাসনকে লোকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে না। আজ এ কথা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের জানা দরকার যে পশ্চিম বাংলার লোক এ মন্ত্রীসভাকে চায় না এবং পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্মীরা এ মন্ত্রীসভাকে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা ব'লে মনে করে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে যারা কংগ্রেসকর্মী ছিল তাদের ভিতর অনেকে আজ ক্ষমতার স্পর্শে কংগ্রেসের কলঙ্ক হ'য়ে উঠেছে। তাদের দিয়ে যদি পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের পরিচয় আজও রাখতে হয়, তবে পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের নামই থাকবে, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা থাকবে না। চীনের কুয়োমিনটাং শাসনের মতো পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসী শাসন একদিন হয়তো দেখবে, তার পায়ের নীচের দাঁড়াবার জমি দূরে স'রে গেছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এখানে ব'লে রাখতে চাই। '৪৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন হয়। তার পর '৫০ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আর কোন অধিবেশন ডাকার প্রয়োজন মনে হয় নি। যে মন্ত্রীমণ্ডলী নিজের ব্যবস্থা পরিষদকে এতখানি ভয়ের চক্ষে দেখে তার জনপ্রিয়তা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

সরদারজী কলিকাতায় এসে চার দিন অবস্থান করলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন নয় যে—যে-কোন উপলক্ষে বিমান যোগে তাঁর পক্ষে যাতায়াত করা সঙ্গত। তা সত্ত্বেও তিনি কলিকাতা এসেছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে নিজের স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি এ বিপদ স্বীকার ক'রে তিনি বৃথাই কলিকাতা এসেছিলেন। তাঁর কলিকাতা আগমনের উদ্দেশ্য সফল হ'লে আমরা সত্যই সুখী হ'তাম।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

—পরিচয়—

দ্বাদশ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৫৬ | একাদশ সংখ্যা

রাজসাহী জেলে তিন বৎসর

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

ছুটো দিন বাইরের হাওয়ায় ঘুরে নেওয়া গেল। ব্যাণ্ডেল এবং হুগলি ঘাট ষ্টেশন দিয়ে যখন যাই, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি, পুরোনো স্মৃতি সব মনে জাগছে। ঐ তো, একটু পথ যদি চ'লে যেতে পারি, চন্দননগরে পৌঁছে যাব—পলাতক জীবনে ওখানে কতো দিন কাটিয়েছি। আজও গেলেই আমার আশ্রয়ের অভাব হবে না—সহকর্মীরা কে ধরা পড়েছেন, না পড়েছেন—এই কয় মাসের খবর জানিনে, তবুও আমার স্থান আমি ক'রে নিতে পারবই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, প্রহরীরা সতর্ক হয়েই পাহারা দিচ্ছে—শরীর দুর্ব্বল, বেশী ছুটতে পারব না। মনের কামনা মনেই মিলিয়ে যায়।

ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আমার পুরানো পরিচিত রেল কর্ম্মচারীটির দেখা পাই কিনা—ঘুরে ঘুরে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। পুলিশ পেছনেই ঘুরছে। অনর্থক ভদ্রলোককে বিপন্ন করব ভয়ে আর কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করাও হ'ল না।

ক্রমে রাত হ'ল—নৈহাটী, শ্যামনগরও ছেড়ে গেলাম। কয়েক ঘণ্টার স্বপ্নও ফুরিয়ে গেল। কয়েক ঘণ্টা যেন পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গেই কাটালো—অতুলদা, কুন্তল, চারু। তখনও জানিনে যে কুন্তল আর চারু মাস তিনেক আগেই ধরা প'ড়ে গেছেন।

জেলেই তো যাচ্ছি, তবু পরদিন মনে হ'তে লাগলো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছাব। ঘর বাড়ী ছাড়া জীবন—নিকট আত্মীয় হয়ে উঠেছেন সহকর্মীরাই। আলিপুর জেলে থাকতে শুনেছিলাম, পূর্বপরিচিতদের মধ্যে রাজসাহীতে আছেন যতীন শেঠ, পূর্ণ দাস এবং নামশোনাদের মধ্যে আছেন প্রভাস দে, হরিপদ সিকদার, গিরীন ব্যানার্জী এবং আরও কেউ কেউ। ভাবছি, কতক্ষণে এঁদের সঙ্গে দেখা হবে।

জেলগেটে ঢুকতেই ইউরোপীয়ান ইনস্পেক্টারটি অতি ম্লান মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানালো। অফিসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা—পূর্বপরিচিত অ্যাশ সাহেব। ফরিদপুরে যখন পড়ি, তখন সেখানকার সিভিল সার্জন ছিলেন, ভাল ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হিসাবেও নাম ছিল। আমার দিদির চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে চেয়ে করেলা ভাজা দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন। সে কথা মনে আছে। কিন্তু ভালো খেলোয়াড় এবং ভালো ডাক্তার হ'লেই যে জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও ভালো হবে, এমন কোনো কথা নেই—সে পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া গেল। তাছাড়া, বুড়ো হয়ে মেজাজটাও গেছে খিট্‌খিটে হয়ে।

আমার জেলারের ঘরে বসিয়ে দু'জনে মিলে আমার কাগজ পত্র দেখ্‌লো। হয়তো তারই ফলে আমার মাল পত্র বা দেহের আর তল্লাসি হ'ল না। নরেন মল্লিক ব'লে

একজন এ্যাসিষ্টেন্ট জেলার সঙ্গে নিয়ে জেলের ভিতর ঘেটে ঘেটে জিজ্ঞেস করলে, "কতদিন হাজার ষ্ট্রাইক ক'রে ছিলেন ?"

"আটাত্তর দিন।"

"বাবা, এ যে একেবারে বাঘ!"

কথাটা বন্ধুদের কানে গেল। সেই থেকে জেলের বন্ধুমহলে নাম হ'ল "বাঘা" বা "বাঘা দা"।

কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রায় অনুরূপ উপায়ে আর এক বন্ধুর নামকরণ হয়েছে "মৌলভী সাহেব।"

জেলের একেবারে শেষ প্রান্তে জেলের বাইরের দিক্‌কার উঁচু দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে ফাঁসি কাঠের সংলগ্ন কুড়িটী সেল। এরই তেরটাতে আমাদের ষ্টেট্-প্রিজনারদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি আসবার সপ্তাহখানিক আগে আগ্রা জেল থেকে নিয়ে এসেছে সুরেশ দাসকে। আগ্রা জেলের কয়েক মাসে সুরেশবাবু মাথার লম্বা লম্বা বাবরি গোছের চুল গজিয়েছেন, মুখময়ের খানিকটা দাড়ি রেখেছেন, জেলে ঢুকেছেন ধুতিটাকে লুঙ্গির মতো ক'রে প'রে।

সুরেশ বাবু চন্দননগরে ধরা পড়াতে Foreigners' Ordinance and Ingress into India Act-এর বন্দী। তাঁকে X class করবে কি Y class করবে, Regulation III র বন্দীদের সঙ্গে মিশতে দেবে কি না দেবে, এই সব ভেবে চিন্তে বোধ হয় তাঁকে সেলে পৌঁছে দিয়ে নরেন মল্লিক সেলের বাইরের কাঠের দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিতে যাচ্ছিলেন।

সুরেশ বাবু বললেন, "ও মশয়, দরজা বন্ধ করেন ক্যান ?"

"তা-ই নিয়ম।"

"কিসের নিয়ম মশয় দিনের বেলায় দরজা বন্ধ করার ?" ব'লে, সুরেশ বাবুতো এক হ্যাঁচ্‌কা টানে দরজাটা খুলে নিলেন। নরেন মল্লিক হেসে চ'লে গেল।

পাশের ঘরে ঘুমেছিলেন বন্ধুরা। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন, "মৌলভীর তো তেজ আছে!"

এই থেকে হয়ে গেল সুরেশ বাবুর নাম "মৌলভী সাহেব।"

আমার সেলগুলোর সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, প্রথমেই চোখে পড়লেন পূর্ণ দাস। কিন্তু বাইরের পরিচিত যাঁরা, সে কালের সংস্কার ছিল, অফিসারদের সামনে তাঁদের সঙ্গে সে পরিচয় স্বীকার না করা। তাঁর পাশেই ছিলেন মণি চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আগে পাশাপাশি-সেলে থেকে এসেছি প্রেসিডেন্সি জেলে। এ ক্ষেত্রে পরিচয় অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। বললাম, এ লোকটীকেতো চিনি! তিনি হেসে ফেললেন। কিন্তু পূর্ণ দা মনে করলেন আমি বোধ হয় তাঁর কথাই বলছি, তিনিও হেসে এসে হাতখানা ধরলেন। পরে বুঝলাম, নরেন মল্লিককে অত সন্দেহ করবারও বিশেষ কিছু নেই—একটু ভ্যানতাড়া গোছের লোক, তাকে চিনি বলেছি, তা আফিসে পৌঁছাবার মধ্যে ভুলে যাবে। আর পুলিসে খবর দেবার মতো অতোখানি উৎসাহ ও সারা জীবন কুড়িয়েও পাবে না।

বন্ধুদের মধ্যে আমার নতুন নামকরণটি ক'রে তো নরেন মল্লিক স'রে পড়লো। তখন শুরু হ'ল পরিচয়ের পালা। শুনলাম, হাজারিবাগে ষ্টেট প্রিজনারদের জন্য নতুন জেল খোলা হয়েছে। এবং রাজসাহী থেকে যতীন দা, প্রভাস বাবু, হরিশ বাবু, আরও দু'চার জন সেখানে চ'লে গেছেন। একটু নিরাশ হ'লাম। কিন্তু নতুন পেলাম কলিকাতা মালাঙ্গা লেনের গিরীন ব্যানার্জীকে ও ময়মনসিং বাজিতপুরের নরেশ চৌধুরীকে। তাছাড়া ছিলেন টাঙ্গাইলের রসিক সরকার ও ঢাকা মহেশ্বরদি পরগণার সতীশ পাকড়াশি। ইনি এসেছেন আমি ওখানে পৌঁছাবার এক দিন আগেই।

রাজসাহী জেলের পুরোনো কাহিনী সব একে একে শুনলাম। এখানেই জ্যোতিষ ঘোষ পাগল হয়ে যান। সে কথা ধরা পড়বার আগেই শুনেছিলাম। অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখে এবং শুনে মনে হ'ল, আরও লোক পাগল হয়নি কেন!

নরেনদার চেহারাটী ক্যাকাশে—প্রায় হলদে হয়ে গেছে। ওখানকার ওঁরা যা ব্যবহার পেয়েছেন, তার

ফ্লাফলের নরেশ দা প্রায় প্রতিমূর্তি। যে তেরটা সেল আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছে, তারই শেষ প্রান্তে ২০নং সেল, ফাঁসির আসামীর জন্য। অন্য সেলগুলিও অনুরূপ, একটুখানি পার্থক্য এই—সব গুলো সেলেরই অ্যাটিসেলের সামনে পাঁচ ছয় হাত দূর দিয়ে আর একটা দেয়াল, এই দেয়ালের গা থেকে কয়েকটা ক'রে সেল অন্তর অন্তর অ্যাটিসেলের দেয়ালের গা পর্যন্ত আর একটা ক'রে দেয়াল, মাঝে একটা ক'রে লোহার গরাদে দেওয়া দরজা—এইভাবে যে ঘেরা, তা'তে ফাঁসির সেলের এলাকা ঐ একটা সেলেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দিকে ৭নং থেকে ১০নং পর্যন্ত চারটী সেল, ১১ নং থেকে ১৩ নং পর্যন্ত ৩টী সেল, ১৪ থেকে ১৬ পর্যন্ত ৩টী এবং ১৭ থেকে ১৯ পর্যন্ত ৩টী এক একটা আলাদা, আলাদা এলাকা। প্রেসিডেন্সি জেলের চুরাশিশ ডিগ্রী যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু সেখানে অ্যাটিসেলের পরে জেলের আসল দেয়ালের আগে আর দেয়াল নেই, এবং সেলইয়ার্ড ২২টা ক'রে সেলের সামনে একটা, এখানকার মতো তিন চারটে সেলের জন্য আলাদা আলাদা নয়।

রাজসাহী জেলে প্রথমটা নরেশদাদের ২৪ ঘণ্টাই সেলে বন্ধ থাকতে হ'ত, স্নান এবং পায়খানা যাবার জন্য অ্যাটিসেলে সকাল বিকাল কয়েক মিনিটের জন্য বের ক'রে সামনের কাঠের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিত। লোহার থালায় ক'রে খাবারটা সেলের লোহার দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিত। কয়েক মাস এই ভাবে দিন রাত ধ'রে সেলের ভিতর কাটাবার পর জ্যোতিষ বাবু পাগল হন। এদিকেও অন্য সব জেলে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক শুরু হ'ল। তখন দয়া ক'রে ওঁদের সকালে পনের মিনিট ও বিকেলে পনের মিনিটের জন্য অ্যাটিসেলের সামনে যে, ঐ স্বল্পপরিসর জায়গাটুকু, তার ভিতর "exercise"-এর জন্য বের করতো। এখানে ব'লে রাখা ভাল, ঐ যে ৭ থেকে ১০ নং এর এলাকা, ওর ভিতর এক জন ক'রে মাত্র ষ্টেটপ্রিজনার রাখতো। এবং ঐ প্রত্যেক আলাদা আলাদা এলাকার এক জনের বেশী ষ্টেটপ্রিজনার রাখতো না—যেন কারও গলার আওয়াজ কারও কাছে না পৌছায়। পরবর্তী উন্নত আবহাওয়ায় যখন "exercise" এর জন্য সকাল বিকাল বের করতো, তখন এলাকাগুলোর মাঝখানে যে লোহার দরজা, তার উপর দিয়ে এক এক খানা কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে এলাকা গুলির পরস্পরের ভিতর আড়াল সৃষ্টি ক'রে দিত। তা স্বত্বেও প্রথম এলাকার অধিবাসী যখন "এক্সারসাইজ" এর জন্য বের হবেন, তখন দ্বিতীয় এলাকার অধিবাসী বের হবেন না, হবেন তৃতীয় এলাকার অধিবাসী। এই উপায়ে পরস্পরের এবং মানুষের সংস্পর্শ বাঁচাবার যত রকম বিধিবিধান হ'তে পারে, তার বিন্দুমাত্র ত্রুটী হয়নি।

রাতের বেলায় ষ্টেট প্রিজনারদের পাশের খালি সেলগুলিতে রাজী করেদিদের এনে ভরতি করতো। ভাতের সঙ্গে ডাল, লাউয়ের ঘ্যাঁট এবং এক টুকরো ক'রে মাছের সঙ্গে প্রচুর ঝোল এই ছিল খাদ্য—অধিকাংশ দিনই পোড়া ডাল, যতো কদর্য চাল পাওয়া যায় তার আধাসিদ্ধ ভাত—সবটাই অত্যন্ত নোংরা—ঘুরে ঘেরে করেদিদের ইয়ার্ড থেকে রান্না হয়ে আসতো।

কাপড় জামা চাইলে বলতো বাড়ীতে লেখ। চিঠি, বই, খবরের কাগজ—এসব ছিল ষ্টেট প্রিজনারদের পক্ষে দুর্লভ বিলাস দ্রব্য।

এই জীবন যাপন ক'রে, এই খাদ্য খেয়ে যা হ'তে পারে, ওঁদের তা-ই হ'তে থাকলো। নরেশ দাকে অল্পমূলে ধরলো। সারাদিন বন্ধ সেলের মধ্যে ব'সে শুয়ে কি আর করবেন? ওঁর মনে দ্বন্দ্ব উঠ্‌লো, ভগবান আছেন কি নেই? ভাবতে ভাবতে মনটা যখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন ওঁর চোখে পড়লো, সেলের একেবারে উপরের দিকে জানলা নামক যে একটি পদার্থ আছে, তাতে মাকড়সার জাল জমেছে—একটা পোকা তাতে আটকা প'ড়ে গেছে, পোকাটা বার বার চেষ্টা করছে উপরে উঠে জানলার মুখে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু জালটা এমনি তৈরী যে, ও বহু চেষ্টায় এক একবার কোনো মতে উপরের দিকে ওঠে, আবার ধাঁ ক'রে নীচে পড়ে যায়। নরেশ দা বার বার এটা লক্ষ্য ক'রে স্থির করলেন যদি পোকাটি বেরিয়ে যেতে পারে, তা হ'লে বুঝব, ভগবান আছেন, নয় তো নেই। এক একবার পোকাটি যখন প্রায় বেরুবার মুখে

ওঁর মনস্তত্ত্বের যন্ত্রগুলো যেন বলতে থাকে এই... এই... দিনের পর দিন ওঁর মনের যন্ত্রের স্নায়ুর তীব্র, একাগ্র দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এক একবার পেণ্ডুলামটা নিস্তেজ হয়ে কিমিয়ে প'ড়ে থাকে—উনিও হাত পা ছড়িয়ে নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়েন।

চিরবৈচিত্র্যে ঘেরা মানুষের মনকে ফুলের মতো ছিঁড়ে নিয়ে অমনি বন্ধ ক'রে রাখলে যা হয়, জ্যোতিষ বাবুর একদিন তাই হ'ল। নরেশদাকে ওর সীমা পর্যন্ত গিয়ে নেহাৎ মানুষ জোরে বেঁচে গেলেন। ইতিমধ্যে একটা পাশের সেলেই জ্যোতিষ বাবুর কি হ'ল, তা ওঁরা টেরও পেলেন না। সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে ছুটো ছেলে প্রভাস দে আর চণ্ডি মিত্তিরের দু'জন আবোল্য বন্ধু ছয় মাস কাটিয়ে গেলেন—পরস্পর জানতেও পেলেন না।

এর ভিতর কোড়ো হাওয়া চুকলো—গিরীন দা, পূর্ণ দা, যতীন দা—ওঁরা সব মেদিনীপুরের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের পর ওখানে গিয়ে ওঁদের টেনে টেনে বের করতে লাগলেন। কিন্তু সেলে বন্ধ থেকে থেকে এমন অবস্থা হয়ে গেছে নরেশ দা বাইরের আলো সইতে পারেন না, ধ'রে নিয়ে বাইরে বসিয়ে দিলে চোখ চেপে ঘরে ফিরে আসেন। শুনতে শুনতে Tale of Two Cities-এর ডাঃ ম্যানেতের কাহিনী মনে পড়ে।

আমি রাজসাহীতে যাবার আগেই অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কিন্তু তবু গিয়ে সব যা কাহিনী শুনলাম, তা'তে হাসব কি কাঁদব ভেবে পাইনে। তখনও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অ্যাশ সাহেব, আর জেলার এক ব্যক্তি—তার নাম রায় সাহেব গুরুচরণ দত্ত।

মেদিনীপুরের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক থেকে যাঁরা গেছেন, তাঁদের একটু ভয়ও করতো। এদিকে আলিপুরের হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের পর সরকারী হুকুমও গেছে ভাল ব্যবহার করবার। ভাল ব্যবহারের অঙ্গ হিসেবে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়েছে, রোজ প্রত্যেক ষ্টেটপ্রিজনারকে আধ সের ক'রে দুধ দিতে। প্রথম দিন ঠিক এল। তার পর দিন থেকে জন প্রতি এক ছটাক হিসেবে কমতে থাকলো। জেলার জানে, যে-দিন ওটা ক'মে পাঁচ ছটাকে দাঁড়াবে, সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে নালিশ হবে। সেদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নিয়ে জেলার আর রাজবন্দীদের ওয়ুধো হ'ত না। ব'লে দিত, ওরা ভালই আছে, ওদের কোন নালিশ নেই।

কিন্তু এঁদের তখন পৃথক পৃথক ভাবে জেলের ভিতর এদিকে ওদিকে বেড়াতে দিত। ওঁরা তাঁকে তাকে থেকে রাস্তার ভিতরই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ধরতেন। জেলারকে জিজ্ঞেস করলে ব'লে দিত, কেউ কোনো ভুল করেছে—ও দেখবে আর যাতে ওরকম না হয়।

গুদাম পচা চালের ভাত দেয়। কয়েকবার নালিশ করেছেন। কয়েকদিন পর পরই আবার পচা চালের ভাত আসে। একদিন ধরতে জেলার বলে, কে জানে সার, কে ঐ চাল দিয়েছে!

প্রভাস বাবু গর্জে উঠে বললেন, "Do you mean to say that it was surreptitiously introduced into the godown?"

"Surreptitious" কথাটার মতো কড়া ইংরেজি বুঝবার বিদ্যা বোধ হয় রায় সাহেবের ছিল না—ব'লে বসলো, "Yes sir, yes sir"।

এর পর কয়েকদিন চাল ভালই এল। আবার একদিন অমনি পচা চাল। খেতে ব'সে গন্ধ পেয়েই তো যতীন সেঠ থালা ধ'রে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ডেকেছেন, "জমাদার, জেলার কাঁহা হ্যায়? বোলাও উস্কো।"

পূর্ণ দাস বললেন, নিয়ে এস শা...কে। ওকে কুচি কুচি ক'রে কেটে পদ্মায় ভাসাব, তার পর না হয় ফাঁসি যাব।

এর পর মিনিট পনের না যেতে থালা সরু চালের ভাত কয়েক রকমের তরকারী আর গরম গরম চপ শুদ্ধ পরিষ্কার বড়ো বড়ো থালায় ক'রে কয়েদিরা বয়ে নিয়ে এল। বলা বাহুল্য, এর পর থেকে আর কোন দিন গুদাম পচা চাল ষ্টেটপ্রিজনারদের কাছে আসে নাই।

কয়েকজন একাদশী করতেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হুকুম দিলেন, তাঁদের ফল যদি ভাল পাওয়া না যায়, কিসমিস পেস্তা প্রভৃতি শুখনো ফল যেন দেওয়া হয়।

রায়সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন বেশ একটু স্থূলকায়া, এবং অফিসের উপরে দোতলা থেকে তিনি যে কণ্ঠে কথা বলতেন, জেলের ভিতরে কয়েদিরা শুনতে পেয়ে তাঁর নাম দিয়েছিল "রায়বাঘিনী"। কয়েদিরাই রাজবন্দীদের খবর দিল, একাদশীর ফলাহারের ব্যবস্থা স্বামীর মুখে জেনে তিনি মন্তব্য করেছেন, "ভাগচন্দ্রের ব্যাটারা! কিশমিশ প্যান্তা খাবেন!"

আমি রাজসাহীতে গিয়ে রায় সাহেবের দর্শন পাই নাই। তার জায়গায় এসেছে উপেন মুখার্জি ব'লে একজন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৪ সালে যখন পূর্ণ দাস তাঁর দল বল নিয়ে ফরিদপুর জেলে বিচারাধীন বন্দী, উপেন মুখার্জি তখন সেখানকার জেলার। চিত্ত-প্রিয়ের বারো বছরের ভাই কান্তিপ্রিয়ের প্রতি জেলে দুর্ব্যবহারের জন্য একদিন জেলারকে মার দেবার বন্দোবস্ত করছিলেন পূর্ণদা, সন্তোষ দত্ত এবং আরও দুএকজন। রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উপেন মুখার্জি দরজার বাইরে থেকে ওঁদের আলাপ আলোচনা শুনে ফেলে। তার পর দিন থেকে ফরিদপুর জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা ফিরে গেল।

তার পর, হুগলী জেল হয়ে উপেন মুখার্জি রাজসাহীর জেলার হয়ে এসেছে। পূর্ণদাও সেখানে রয়েছেন। সরকারী হুকুম ইদানীং একটু রাশ ঢিলা দিয়েছে, তার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যদি বলে একগুণ জেলার করে দশগুণ। তাছাড়া, অন্য বুদ্ধিও উপেন মুখার্জির ছিল। সে জানে, রাজবন্দীদের পেছনে যদি দশ টাকা খরচ করে, উপরি পাওনা না হয় এক টাকা হ'তে পারে; কিন্তু ত্রিশ টাকা খরচ করলে চাই কি, পাঁচ টাকাও হ'তে পারে। আর টাকা তো গৌরী সেনের। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞেস করলে অনায়াসে বলা চলে, সার, না দিলেই রাজবন্দীরা গোলমাল করবে। সে নিজেই এসে রাজবন্দীদের বলে, "এখানে এমন ভাল ভাল ছোট মাছ পাওয়া যায়, আপনারা রোজই রুই মাছ খাচ্ছেন কেন? আমি কালই ব্যবস্থা করছি।"

আড়াই সের যদি রুই মাছ আসতো, তার পর দিন থেকে তার সঙ্গে আরও এক সের ক'রে পাবদা বা বাটা মাছ আসতে শুরু করলো। তার পর একদিন ভালো কই মাছ বাজারে উঠলো, সে দিন থেকে তা-ও-আর দু'সের ক'রে আসতে রইল। এমনি—যেমন মাছ, তরকারী, ফল, তেমনি কাপড়, জামা, জুতো, তেল, সাবান। চাল, ডাল, আটা, ঘি, চিনি তো গুদামে স্লিপ পাঠাইলেই হ'ল।

অবস্থা এই দিকে যখন ঘুরছে, তখন আমি রাজসাহী পৌছালাম। পৌছাবার পর দিনই ম্যানেজারির মীট্‌সেফ ইত্যাদি পূর্ণদা আমার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানে তখন ম্যানেজারি করা মানে আর কিছু নয়—কোনো জিনিষ কখনও কোন কারণে দিতে অস্বীকার করলে ধমক দিয়ে আদায় করা। অত দিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক ক'রে, গেছি—কথা তারে কাটে অনেকখানি।

রাজবন্দীদের সব জায়গায় যে অবস্থায় রেখেছে, আমাদেরও জিদ্ চেপে গেল, অস্বীকার কোনো জিনিষে করতে দেব না। গিন্নীদের আমাদের মধ্যে বয়সেও সবার চেয়ে বড়ো ছিলেন, এবং তাঁর আপন-ভোলা স্বভাবের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধাও করতাম। মুখফোড় লোক—ঝগড়া-কাটিও তিনিই এগিয়ে গিয়ে করেন। তাঁর একটি নীতি আমারা মেনে নিয়েছিলাম—কোনো কিছু চাইবার আগে ভেবে চিন্তে চাইব। কিন্তু যা চাইব, তা যেমন ক'রে হোক আদায় করতে হবে। জেলখানার আগাগোড়া-কার জীবনে এই নীতিটি পালন ক'রে এসেছি।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন রাজবন্দী একে একে ওখানে গেলেন—এঁরা সবাই অনুশীলনের লোক—প্রবোধ দাস গুপ্ত, যোগেশ চাটার্জি, প্রতুল গাঙ্গুলি। প্রবোধ নতুন ধরা প'ড়ে এসেছেন। যোগেশ প্রেসিডেন্সি জেলের রাজবন্দীদের প্রতি ব্যবহারের বিরুদ্ধে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেছিলেন, চার দিন হাঙ্গার ষ্ট্রাইক হয়ে যাবার পর রাজসাহীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ওখানে দুর্ব্যবহারের প্রশ্ন নেই। যেদিন গেলেন, সেই দিন থেকেই খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন। প্রতুলবাবু আমাদের সঙ্গেই আলিপুরে হাঙ্গার ষ্ট্রাইক করেন, এবং একসঙ্গেই আমরা মধ্যপ্রদেশে যাই—আমি বিলাসপুরে, প্রতুল বাবু রাইপুরে। এখন মধ্য প্রদেশ থেকে সব আবার বাংলায় অথবা

হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিল।

সুরেশ বাবু আগ্রাতে যে ওয়ার্ডার ছিলেন, শুধু দুধ খেয়ে থাকতেন রোজ পাঁচ সের। এখানেও তাই চালালেন, যে সঙ্গে কিছু কিছু ফল খেতেন। তার পর, আমিই এক দিন বললাম, এতে লাভ কি? স্বাভাবিক মতোই খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু জেলারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁর দুধের পরিমাণ পাঁচ সেরই বজায় রইলো। আমাদের সকলের খাওয়ার উপর এই পরিমাণটায় আমাদের রোজ ক্ষীর, সর, মিঠাই খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিকই আছে। রান্নাঘরেও রোজ আমাদের এক একজন ম্যানেজারী করতে যান—কে কত ভাল করাতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা চলে। একটি বাঙালী মহিলা কয়েদি রান্না করে—উত্তরবঙ্গের রাজবংশী তিন চারটি কয়েদি তাকে সাহায্য করে। এক একদিন সাতে এগারটা বারোটার ভিতর বাবুদের সকালের জল খাবার খাইয়ে কুড়ি বাইশ পদ রান্না নামিয়ে দেয়। এই হিন্দুস্থানিটিও যেমন রান্নায় ওস্তাদ, রাজবংশীরাও তেমনি হাসিমুখে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। এমন সৎ আর সরল এদের প্রকৃতি—কেন যে দলে দলে এদের জেলে এনে পুরেছে ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

পাই এত, রান্না হয় এত—অথচ খাবার বেলায় অনেক দিন আমাদের মাছ তরকারিও থাকে না। যত দিন যায়, জেলের ভিতর স্বাধীনতা যতো বাড়ে, ততো চোখে পড়ে, চারদিকে কতো বুভুক্ষু লোককে রেখে আমরা খাই! আমরা খাই চর্ব্য চোষ্য, তারা খায় মানুষের অখাদ্য ডাল আর তরকারি, আর মোটা মোটা ভাত। ক্রমে এমন হয়ে পড়লো এক একদিন পঞ্চাশ ষাট জন পর্যন্ত করেদির কাইল ক'রে বসিয়ে তাদের লুচি, মাংস আর মিষ্টি খাওয়াই। অবশ্য এ অবস্থা একদিনে আসে নাই। সে পরের কাহিনী পরে বলা যাবে।

কাপড়, জামাজুতো, তেল সাবানের দিকেও অবস্থা পৃথক নয়। এদিকে আমাদের বাক্সে প্যাটরায় এক একটি প্রকাণ্ড কোবর বোঝাই দিয়েছিল—

খবরের কাগজ ওরা দেবে না। কিন্তু খবরের কাগজ না পড়লে আমাদেরও চলে না। কাজেই কাগজ যোগাড় হয়,—জেলের ছোটবড় কর্মচারীর মারফত। অনেক আপদ বিপদ ঘাড়ে নিয়ে তাঁদের এই কাজ করতে হয়। তাঁদের কিছু দেওয়া—কর্ত্তব্য হিসাবেই আমরা দিই, কাগজের মূল্য হিসাবে নয়। তাছাড়া, সিপাই জমাদারদের খুব বিপক্ষে রেখে এসব কাজ করা চলে না। তারা আমাদের পেছনে লেগে থাকবে না, এই অবস্থাটা আনতে গেলে আমরা খুব ভালো লোক ব'লে তাদের কাছে পরিচয় হওয়া চাই। তাই ঘি, তেল, চিনি, ময়দা থেকে শুরু ক'রে কাপড়, জামা, জুতো, তেল, সাবান—এমন কি গামলা ডেকচি পর্যন্তও এই পথে উড়ে যেত। জেলখানার অত কড়াকড়ির ভিতর কি ক'রে ওরা নিত এসব? আমারও এক সময় আশ্চর্য্য লাগতো—বিশেষ ক'রে যখন একজন সিপাই একদিন একটা ডেকচি চাইলো। আমি জিজ্ঞেস করতে সে বললো, বাবুজি, জেলের কেবল দেওয়ালটাই নিয়ে যাওয়া চলে না, আর কিছুই আটকায় না।

সকাল বেলা কাগজ আসে। একজন একটা সেলের ভিতর ব'সে সেটা প'ড়ে নোট করেন, আর একজন দরজার সাম্‌নে এবং সেলের ইয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেন—কারণ, সেটা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসবার সময়। দু'পুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা একটা ঘরে জমায়েৎ হই—সেটা আমাদের বৈঠকখানা, সেখানে পাখা টানতো, আর ফরাস বিছানো ছিল। প্রথমে খবরগুলো শোনা হয়, কারও ভালো বক্তৃতা বা প্রবন্ধ থাকলে তা পড়া হয়। তার পর তাস বা পাশা খেলা। যাঁরা ওতে রস পান তাঁরা খেলেন, নয়তো নিজের নিজের ঘরে বা গাছতলায় ব'সে পড়াশুনো করেন। বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলা হয়। তার পর হাত পা ধুয়ে কিছু সময় একটা খোলা মাঠে সবাই মিলে বসি। এমনই গরম সেলগুলো যে যতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে যাওয়া যায়।

আমি ব'সে থাকি—নরেশ দা আমার কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়েন। কোনো কোনো দিন মনিন্দা অথবা রসিক। আমি বলি, ময়মনসিংএর লোকরা

শুতে ভালবাসে। নরেশদা আমার একটা ঘুড়ি মেরে বলেন, তুলোর চিবি। হাজার ষ্ট্রাইকের পরে নতুন ক'রে শরীর গ'ড়ে উঠছে—গায়ে প্রচুর মেদ জমছে। দেখি, লক্ষণ ভালো নয়। ভোরে উঠে মাঠের চার দিকে ছিসেব ক'রে দেড় মাইল থেকে দুই মাইল পর্যন্ত দৌড়াই, ডিকেলে ডাম্বেল বা ডেভেলপার নিয়ে ব্যায়াম করি, শরীর আবার শক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

এর ভিতর একদিন নরেশদাকে নিয়ে চ'লে গেল আলিপুর জেলে চিকিৎসার জন্ত। উদার, সরল, অমায়িক নরেশদার সঙ্গের মাধুর্য, আর রাজসাহী জেলের ঐ এক বছরে তাঁর যা অবস্থা হয়েছে—সবে মিলে তিনি যখন চ'লে গেলেন, আমাদের জীবন থেকে যেন অনেকখানি খ'সে গেল। এঁরা দুই ভাই রমেশ আর নরেশ ছিলেন দুই পৃথক দলে। দু'জনের চরিত্রের পার্থক্যও যে-কোনো লোকের চোখে পড়তো। সখারাম গণেশ দেউস্কর যখন "দেশের কথা" লেখেন, সে কাজে সখারামের উপদেশ মতো নরেশদা অনেকভাবে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স অল্প। সেই থেকে নরেশদার পড়াশুনোর প্রতিও বেশ একটা ঝোঁক গ'ড়ে উঠেছিল। রাজসাহী জেলে পরে পড়াশুনোর যে একটা আবহাওয়া গ'ড়ে উঠেছিল, তাতে নরেশদার দান সামান্ত নয়।

দিনটা আমাদের এক রকম কাটে। আর সব ব্যবস্থাই মোটামুটি ভালো। কিন্তু রাত যেন আর কাটতে চায় না। এপ্রিল মে মাসে রাজসাহী জেলের ঐ সেল গুলো যেন এক একটী টীমারের বয়লারের পাশের জায়গাটির মতো হয়ে থাকতো। না পারা যেত পড়তে, না পারা যেত শুতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শীতলপাটি আর হাতপাখা পর্যন্ত কিনে দিতে পারে, কিন্তু "A State Prisoner shall be confined in a cell"—এই ছিল তখনকার আইন—সে সেল মানুষের বাসের মতো অযোগ্যই হোক না কেন। কি আর করা যাবে? শীতলপাটিটা সেলের দরজার গোড়ায় মেজেতে বিছিয়ে নিতাম, কুজোর জলে গামছা ভিজিয়ে বার বার শীতলপাটিতে লাগাতাম, আর ঘুমোতে চেষ্টা করতাম। ঘুম যখন আসতো না, তখন শুরু হ'ত সবাই মিলে এ সেল ও সেল থেকে চীৎকার, আর মণিদার উদাম সঙ্গীত, সঙ্গে সঙ্গে স্প্রিংয়ের খাটে উঠে নৃত্য। সুরেশ বাবু শুরু ক'রে দিতেন যাত্রার দলের পাঠ বলা—"ডাক্, ডাক্ তব পিতামহকে।" "ডাক্", "ডাক্" দুটী আওয়াজ যখন করতেন, তখন মনে হ'ত, বাজ প'ড়ে বুঝি সেলের ছাত ভেঙ্গে গেল। জেলের অপর প্রান্ত থেকে জমাদার ছুটে আসত কি কাণ্ড হ'ল দেখবার জন্ত। ধরখাস্তের পর ধরখাস্ত পড়তে লাগলো—সেল বাস থেকে মুক্তির জন্ত। ফল কিছু হ'ল না। এর ভিতর এক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটলো।

রসিক সরকার ছিলেন অনুশীলনের লোক। কিন্তু পূর্ণদার সঙ্গেও এক সময়ে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল। বয়সে রসিক আমাদের সমবয়সীই হবেন, কিন্তু ঐ বয়সেই তাঁর মাথার চুল অনেক পরিমাণে পেকে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে রসিক খুব স্ফূর্তি করেন। কয়েদিদের সঙ্গে গল্প ক'রে তাদের দুঃখদৈন্তের কথা শোনেন। কখনও কখনও বা তাদের কথা শুনতে শুনতে ঘরে এসে খাওয়া খাওয়ার বা অন্ত জিনিষ যা পান দিয়ে দেন। আবার এক এক সময় ভয়ানক গম্ভীর হয়ে মাঠের ভিতর একা চুপ্ চাপ্ ব'সে থাকেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দেন।

কোনো কোনো দিন খেলার মাঠে যান না। কোনো কোনো দিন খুব স্ফূর্তি হৈ চৈ ক'রে খেলাধুলো করেন। আমারই মতো ব্যাডমিণ্টন ভাল খেলতে পারতেন না। সুরেশ বাবু ছিলেন সব চেয়ে ভালো খেলোয়াড়, কাজেই কোনো দিন আমাকে, কোনো দিন রসিককে সুরেশ বাবুর খাড়া হ'তে হ'ত। খেলায় এক একটা ভুল করলে সুরেশ বাবু আসতেন র‍্যাকেট নিয়ে তাড়া ক'রে, রসিকও র‍্যাকেট তুলে রুখে দাঁড়াতেন। তখন শুরু হ'ত দু'জনে মাঠ জুড়ে নটরাজের নৃত্য। হাসতে হাসতে আমাদের পেটের নাড়ী ছিঁড়তো।

সেদিন রসিক সব চেয়ে বেশী ক'রে নৃত্য করেছেন। তার পর খেলাধুলোর পর রোজকার মতো যে যার ঘরে বন্ধ হয়ে গেছি। শেষ রাতের দিকে কি একটা গোলমাল

ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। ডাকলুম, সিপাই, সিপাই, কি হ'ল ? সে কি জবাব দিল, আমি শুনলাম "সাপ" মনে করলাম বুঝি কোনো সেলে সাপ ঢুকেছে। তখন ক'রে সিপাই থাকতো রাতের বেলা আমাদের পাহারা দেবার জন্য, বেলায় তিন জন। এদের এক জন ছিল ওর সামনের ঘরে গলার আওয়াজে আমি শুনলাম "সাপ", সেটি গুর্খা।

আর ইস্তিনতো হিন্দুস্থানী সিপাইটীর গলা শুনছি, সেলের পেছনে হাসপাতালের কাছে। তার গলা দিয়ে আওয়াজ বের হচ্ছে না—বলছে, "চাবি লাও", "চাবি লাও।"

সে বোধ হয় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, বিপদে সংকেত ধ্বনি করবার জন্য তার পকেটে হুইস্‌ল্ ছিল, সে কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। হাসপাতালের সিপাই তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, সিটী বাজাও না! তৎক্ষণাৎ নিয়মানুযায়ী এক হুইস্‌লের সঙ্গে চার দিকে হুইস্‌ল্ এবং গেটে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো।

তারপর সেলব্লকের এক প্রান্ত থেকে কি সব আওয়াজ হ'ল, আমরা অপর প্রান্ত থেকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারলাম না।

হুইস্‌ল্ ও ঘণ্টা বাজা বন্ধ হওয়ার অনেকটা পরে এক জন সিপাই আমাদের সেলের দিকে এল। তাকে অ্যান্টিসেলের ভিতর ডাকতে সে প্রথমটা তো সাহসই পায় না। অনেক ইতস্ততঃর পর চার দিক তাকিয়ে যখন ভিতরে এল, তখন তার মুখে শুনলাম, ১০নং বাবু নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন—সে খবর ও বলতে পারলো না বা বললো না।

১০ নং সেলে থাকতেন রসিক।

আর আমি গুর্খার যে আওয়াজটী শুনেছিলাম, সেটা "সাপ" নয়, "আগ"

ভোর পর্যন্ত পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে আর বিশেষ খবরও পেলাম না। আর, ডাকাডাকির উৎসাহও ছিল না।

ভোরে খুলে দিতে যা শুনলাম ও দেখলাম, তা'তে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম—

রাত প্রায় পর্যন্ত ৮ ও ৯ নং ঘরে প্রফুল্ল বাবু ও গিরীনদা পরস্পরকে ডাকাডাকি ক'রে গল্প করেছেন। একটু অসহিষ্ণু হয়ে ১০নং ঘর থেকে রসিক গিরীনদাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, গিরীনদা, রাত যে ১২টা বাজে, আপনারা ঘুমোবেন না?

এর পর ওঁরা গুছগাছ ক'রে শুয়ে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়েছেন। রসিক তখন খাটে মশারি খুলিয়ে দিয়ে খাটখানাকে ঠেলে সেলের দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দিয়েছেন। তারপর কয়েকখানা কাপড় দিয়ে নিজের আপাদমস্তক জড়িয়েছেন। কিছু দিন ধ'রে হারিকেন থেকে তেল ঢেলে রেখে খাটের তলায় মগে জমিয়ে রেখেছিলেন। সেই তেল সর্বাঙ্গে ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। আগুন দেখে গুর্খাটি দরজার বাইরে থেকে টেনে মশারি ছিঁড়েছে আর হিন্দুস্থানী সিপাইকে বলেছে, যাও, চাবি লাও। আর, নিজে অ্যান্টিসেলের ভিতর চৌবাচ্চায় যে জল ছিল মগে ক'রে সেই জল নিয়েছে, আর সেলের গরাদের ফাঁক দিয়ে ছিটিয়ে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছে।

উপেন মুখার্জি জেলার রাত্তের বেলায় প্রায় প্রকৃতিস্থ থাকতো না। তার উপর যখন শুনেছে, একজন ষ্টেট্ প্রিজনার নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, তখন সে পথেই পড়িয়ে পড়েছে—তার হাতে চাবির গোছা। যতীন গুহ ডাক্তার তখন দৌড়ে ভেতরে ঢুকছিলেন, দেখেন, জেলার রাস্তার পাশে প'ড়ে রয়েছে। তাঁকে দেখে উপেন মুখার্জি বলে, আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তার বাবু, এই নিন চাবি, আমায় বাঁচান।

যতীন বাবু এসে যখন সেল খুলে খাট ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, রসিক তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ছেন, আগুন সিপাইর ছিটানো জলে প্রায় নিভে এসেছে। যতীন বাবু যখন তাঁর হাত ধরলেন, তখনই কেবল একটা গোঙানির শব্দ ক'রে প'ড়ে গেলেন। তাঁকে ধরাধরি ক'রে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর প্রাণ বিয়োগ হয়।

আমরা ভোর বেলায় লক্ষ্য ক'রে দেখার সুযোগ পেলাম। সেলের পিছন দিকে একেবারে উপরে যে একটী ছোট জানালা থাকে, তার ঠিক নীচে কাপড় ঝুলাবার একটি ব্রাকেট। তা'তে চারটি পেগে জামা কাপড় ঝুলছিল। যতক্ষণ ধ'রে পুড়েছেন, ততক্ষণ ধ'রে এমনই সোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন যে, চারটী পেগের মাঝের দুটীতে ঝোলানো কাপড় পুড়ে গেছে, কিন্তু পাশের দুটীর জামা কাপড় যেমনকে তেমনই রয়ে গেছে—বোঝা যায় কী শক্ত মন নিয়ে ঐ আগুনে পুড়বার যন্ত্রণাটি তিনি সয়েছেন।

পর দিন আমরা সকলে মিলে অনেক গবেষণা করলাম, কেন রসিক এই কাজ করলেন। বলতে গেলে আমরা কোনো কারণই স্থির করতে পারিনি। পূর্ণদা যা যা জানতেন, বললেন। পূর্ণদার সঙ্গে বাইরে পরিচয় ছিল এবং সে-পরিচয় ঘনিষ্ঠই।

তাঁর মতে রসিক একটী পুলিশ কর্মচারীর হত্যায় লিপ্ত ছিলেন। সেই কর্মচারিটীকে যখন গুলী করা হয় তার কোলে একটী ছেলে ছিল, সেই ছেলেটীও সেই সঙ্গে মারা যায়। রসিক নাকি পূর্ণদাকে কয়েকবার বলেছেন, সেই ছেলেটি যেন মাঝে মাঝে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

রসিক রাজসাহী জেলে আসবার পূর্বে ছিলেন হুগলি জেলে। সে কালের রাজবন্দীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করার জন্য চারটী জেল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল—প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ফরিদপুর ও হুগলি জেল। হুগলিতে জেলের চার কোণে চারটি সেলে রাজবন্দীদের রাখতো। প্রত্যেক সেলের সামনে খানিকটা ক'রে জায়গা চট দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল। রাজবন্দী ওর বাইরে মুখ গলাতে পারবেন না, আর বাইরের কোনো লোকও ওর ভিতর উঁকি মারতে পারবে না।

রসিক ঐ অবস্থায় প্রায় এক বৎসর ছিলেন। পূর্ণদা বলেন, তার কিছুদিন পূর্বেও বাইরে রসিকের সঙ্গে ওঁর দেখা হয়েছে—বেশ সুস্থ, সতেজ যুবক। এখন মাথার অর্ধেকের উপর চুল পেকে গেছে। মাঝে মাঝে বেশ স্ফূর্তিতে থাকেন, মাঝে মাঝে বেজায় গম্ভীর হয়ে পড়েন।

পূর্ণদাকে রসিক বলেছেন, উপেন মুখার্জি হুগলি জেলে যাবার পর, মাঝে মাঝে রাত্রে গোপনে বে-আইনী ভাবে রসিককে সেল খুলে জেলারের বাসায় নিয়ে যেত, সেখানে ভাল ভাল খাবার খাওয়াতো। একজন পুলিশ কর্মচারী সেখানে যেত, ওঁকে নানারকম ভয় দেখাত, প্রলোভন দেখাত।

এখন রসিক আত্মহত্যা করবার পর পূর্ণদার মুখে এই সব কথা শুনে একবার আমাদের মনে সন্দেহ জাগলো, ঐ অবস্থায় পুলিশের কাছে রসিক কিছু ব'লে ফেলেছেন কিনা এবং তারই অনুতাপে আত্মহত্যা করলেন কিনা।

সে যুগে বিপ্লবীরা যে-শিক্ষা ও দীক্ষা পেতেন, তা'তে সেরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। মুহূর্তের দুর্বলতায় অনেকে, ক্ষতি না হ'তে পারে, এমন কিছু বলেছেন, তার পর সারা জীবন নিদারুণ অনুতাপে জ্বলে' মরেছেন, অনেকে পুড়ে পুড়ে নতুন মানুষ হয়ে গড়ে' উঠেছেন, আবার অনেকে প্রতি মুহূর্তের এই যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা ক'রে জুড়িয়েছেন—এরকম দৃষ্টান্ত কম নয়।

কিন্তু ভেবে ও আলোচনা ক'রে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, রসিকের ক্ষেত্রে এরকম সম্ভব নয়। সে মানুষের ধরণই আলাদা। এবং রসিক এমন প্রকৃতির যে, ওরকম কিছু হ'লে তা অন্ততঃ পূর্ণদার কাছে গোপন করতেন না। যে ঘৃণা তিনি পুলিশ কর্মচারিটির ও উপেন মুখার্জির মুখের উপর প্রকাশ করেছেন ব'লে পূর্ণদাকে বলেছেন, সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করবার বিন্দুমাত্র হেতু নেই। এবং তারই ফলে তাঁকে রাজসাহী জেলে এনেছে। পরবর্তী সব ঘটনা থেকেও রসিকের প্রতি তাঁর সহকর্মীরা কোনো সন্দেহ পোষণ করেন নাই।

সব দেখে শুনে আমাদের ধারণা হ'লো, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সয়ে সয়ে মনটা এমনই কোমল হয়ে উঠেছিল যে সেই অবকাশে সেই পুলিশ কর্মচারীটির নিরপরাধ শিশু সন্তানের স্মৃতি ওঁকে পীড়া দিত। যে উদার, কোমল মন আমরা রসিকের ভিতর দেখেছিলাম তা'তে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে নিজের উপর নির্মম

প্রতিশোধ নেবার এইটিই হেতু।

স্নেহলতার করুণ কাহিনী বাঙ্গালী জাতের ভুলে যাবার কথা নয়। সে ঘটনা এরই কিছুকাল আগে ঘটে। পরে আমরা জানতে পেলাম, স্নেহলতার কথা রসিক কয়েকদিনের সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতেন। এবং সেই উপলক্ষ্যে পুড়ে মরতে শরীরের কোন্ অংশ বিশেষ ক'রে জখম হয় এই সব প্রশ্নও করতেন।

কি তাঁর মনে হ'ত সব অনুমান করা শক্ত। অনেক দিন গল্প করতে করতে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যেতেন। পরে দেখা যেত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠের ভিতর চুপচাপ ব'সে আছেন। কোনো দিন বা একখানা চক্ নিয়ে সব ঘরের দরজায় লিখেছেন, "চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ সাধিত হয় না!" কোনো দিন বা এমন কথা লিখেছেন যা'তে আমাদের অদ্ভুত জাতিদের প্রতি তাঁর দরদ প্রকাশ পায়।

ম্যাজিষ্ট্রেট এল অনুসন্ধান করতে। কয়েক দিন আগে রসিকের বাড়ী থেকে একখানা চিঠি এসেছিল—তা'তে অর্থাভাবে বাড়ীর লোকের কষ্টের কাহিনী ছিল। আমাদের ভিতর যে দু'এক জনের জবানবন্দী নিল, তাঁরা এই চিঠির উপরই জোর দিলেন। এটা আমরা পরামর্শ ক'রে স্থির করেছিলাম।

—চলবে—

বসন্ত

মতিয়র রহমান চৌধুরী

কুঙ্কুম রাঙ্গা রক্ত করবী পুলিয়াছে বাতায়ন
মধু মালতীর লাবণ্যে আজি জাগে নব গীতায়ন
লীলা বিতানের মাধবী রচিত করোকার বাসরে
গোলাপ-বাসরসজ্জাধীর কপোল রাঙ্গিছে লজ্জা ভরে
ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কারি ওঠে নূপুরের নিক্কন
গানে গানে আজি ধরণী মুখর, আবেশে অধীর মন
কাননে কাননে স্বরূপ সুষমা—লীলায়িত বনবীথি
লতায় পাতায় রঙীন গুচ্ছ—কত মধু কলগীতি
বেণু-কুঞ্জের ছন্দ লীলায়—নদীর কলস্বনে
কুহুরের কুহু কুহু ধ্বনি—ঐ ভ্রমর গুঞ্জরনে
বনে বনে জেগে উঠিছে অধীর সুখ মধু-শিহরণ
সোনার স্বপন-ঘেরা মধুময় রঙ্গীন যৌবন
পাখীর কাকলী বিধুলি কূজন—কপোতের বিধুনন
এঁকে যেন স্মৃতি-মাধুরী কত যে,—কত রূপ রূপায়ণ
অস্ত তোরণে গোধূলি মায়ার হিরণ-লালীমা ফোটে
সেই রং এসে পরশ বুলায় পলাশের রাঙ্গা ঠোঁটে
যৌবনে চলে মধু-হোলি-খেলা—কুল রেণু ঝরে যায়
মধুপেরা সব কেরেডালে ডালে আজি বন বীথিকায়
ফাগুন ফাগুণে বনানী বালর আলোময় উজ্জ্বল
এল বসন্ত ওগ বনান্ত সৌরভে বিহ্বল।

কবি কুমুদ রঞ্জন

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"কাউন্টের" দ্বিতীয় খণ্ড, "গেটের" শেষ দান্—
বার্ধক্যের বলিহারি, অতুল প্রমাণ।
আজো মোরা মানি সেটা—অবনত শিরে
সসম্মানে নমি সেই কবি শ্রেষ্ঠ বীরে।
অসম্ভব সম্ভবিলে যশ তার পাছে
দেখিবে আপনি আসি' বাসা বেঁধে আছে।
কিছু দিন হ'তে বন্ধু ভাবছি তোমার কথা—
বার্ধক্যে "যৌবন-জরী" তোমারও ক্ষমতা।
প্রতিভা হারায় শক্তি যে বয়সে আসি'—
তাকে বন্দী করি' তুমি করিয়াছ দাসী!
নির্বাক বিস্ময়ে শুনি সে সু-স্বর তার
দিনে দিনে তব বীণে দিলে যে ঝংকার
দিন গতে' তোমারও এ অসম্ভব দান,—
গর্বভরে শুনি যাহা শুদ্ধ হয় প্রাণ্!
মোদের আপন তুমি, বংগের বৈভব—
দূর দূর হ'তে লভে তোমার সৌরভ।
কল্যাণে কুশলে থাকো হে বন্ধু আমার,
"যাত্রা-পথ" হতে, আমি করি নমস্কার।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

কোন কোন লক্‌গেটে আহার্য পাওয়া যায়, রাতে লোকে তাই কিনে খায়।

ডুলবেড়ের লক্‌গেট থেকে রূপনারায়ণ পার হওয়া গেল। বি, এন, রেল সম্প্রতি পোল বেঁধেছে। ওপারে রেলের ষ্টেশনের নাম কোলাঘাট। লক্‌গেটের নাম ঘেনান। আমার অনেক পূর্ব স্মৃতি জেগে উঠল এই দিকটায় এসে। তমলুক সাবডিভিসনে এগুলি অবস্থিত। রূপনারায়ণের পূর্বপার হাওড়া জেলার সীমানা; পশ্চিম পার মেদিনীপুরে পড়ে। ষ্টিমার ক্রমে পাঁশকুড়ায় এল। এখানেও একটা লক্‌গেট। এটা পার হয়ে কাঁসাই নদী। কাঁসাই পার হয়ে আবার লক্‌গেট ও ক্যানাল বা সেচ্‌ বিভাগের খাল। এই খালের জলে চু-কাজ হচ্ছে। চুধারের শস্যক্ষেত্রে চাষের সুবিধা এবং এদেশে ওদেশে যাতায়াতের পথ। গরলাগেড়ে, বুরোমুলো, বালিচক, মোহনপুর—এগুলি লক্‌গেট। মোহনপুর শেষ গেট। এরপর আবার কাঁসাই নদী। অপরপারে মেদিনীপুর সহর। মোহনপুরে পৌঁছতে সকাল হয়ে যায়। এখানে এলেই মানুষ অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠে। বাড়ীর ঘোরে এসে গেল কিনা। এবার তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে প্রিয়জনের মুখ দেখার তাড়া। এখন এই প্রিয়জনের মানে যে যা করে নিতে পারে। এনিকাট, জলবাঁধার পাথরের ব্যবস্থা এপারে ওপারকে ধরে এনে দিয়েছে। কি মন ভুলান ভাব সে জাগাত!

মেদিনীপুরে পৌঁছে আমি একখানি পোষ্টকার্ড কলকাতার ঠিকানায় পাঠালাম—"আমি ভালয় ভালয় এসে পৌঁছেছি।" মনে মনে ভাবলাম—"কাগজের বাঁধন কি ভালবাসার বাঁধনের চেয়ে শক্ত? চিঠি লোকে লেখে কেন? দূরকে কাছে কি চিঠিতে এনে দিতে পারে?" প্রাণের টানে মানুষ দ্রুত ছুটতে চায়। পাখা থাকলে উড়ে যেত। এই আকাঙ্খা যত দ্রুত-গামী যান আবিষ্কারের কারণ। গরুর চেয়ে ঘোড়া দ্রুতগামী। গরুর গাড়ীর চেয়ে ঘোড়ার গাড়ীও তাই। মোটর, রেল আবার তার চাইতেও দ্রুতগামী। নৌকার চেয়ে ষ্টিমার দ্রুতগামী। ক্রমে নতুনতর যন্ত্র আবিষ্কার হয়ে—আজকের দ্রুতগামী কালকের জিনিষের কাছে হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিতান্ত ঢিমে তেতালা। জলযানের চেয়ে স্থল-যান দ্রুতগামী। স্থল-যানের চেয়ে বায়ু-যান আরও দ্রুতগামী। গতিবেগ বাড়তে বাড়তে মানুষ বিধাতার দূরত্ব ও কালকে জয় ক'রে ফেলল। এ দুটোকে এক রকম উড়িয়ে দিয়েছে বললেই হয়। তবু একথা মানতে হবে যে চিঠি লেখার প্রয়োজনকে ওড়াতে পারে নাই। চিঠি তুমি ধন্য। কাছে কাছে থেকেও তোমায় এড়িয়ে চলা চলে না।

(নবম পরিচ্ছেদ)

আমি নতুন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এলাম। বাড়ীতে আমি ও আমার পিতা ছাড়া ছিল বামুন ও চাকর। প্রথম প্রথম কয়েকদিন বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ার কথা খুব মনে পড়ত। প্রায়ই সীতারামের বাড়ীর ঘটনা, বড়ু বৈরাগী, সচী এবং পুকুর ধারের সেই ঘটনাটির কথা ভাবতাম। কর্মকারকে মনে করত সে কর্মকার, আসার সময় কয়েকটা বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিল। সে বলে দিয়েছিল কি রকম লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। এবং কেমন লোকের ত্রিসীমানায় যাওয়া হবে না। সে বলেছিল বয়লোক জানবে তাদের যারা ছোটছেলেদের খেলা দেখতে পারে না। খেলা থেকে ডেকে বলে বানান কর—প্রতিদ্বন্দ্বি, মুহূর্তান্তিক, etiquette। যারা বলবে বানান কর—character, জানবে তাদের চরিত্র ভাল নয়। একটা না একটা কিছু দোষ আছেই। অথবা যারা সেরেস্তায় বসে লেখাপড়া করতে করতে খাতা বা বই থেকে চোখ তুলে চুপিসাড়ে চশমার ফ্রেমের ওপর দিয়ে দেখে, কিম্বা যাকে দেখবে ঐ নতুন মাষ্টারটার মত সবাই সপ্তমে চড়ে আছে, মুখ দেখলে মনে হয় আজকের দিনটা ভালমত কাটবে না। কানের পর্দার বাইরে যে উপদেশ থেকে যায়, তার দশা পরহস্তগত পুঁথির মত হয়। চোখের উপর দৃষ্টি হয়ে এগুলি বিরাজ করলে তবে না কাজের হবে? সে অবস্থায় কি করে আসা যায়, হল সমস্যা।

লেখাপড়ার চাপ এখানেও ছিল না। আমার বাবা বিজ্ঞান চর্চা করতেন আমাকে তাঁর সহায়ক বললে ঠিক হবে না, খেলার সাথী ক'রে নিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের বাহন হারমোনিয়ামের মত সোজা কিছু না থাকায় সঙ্গীত প্রচারে বাধা হচ্ছিল। অথচ হারমোনিয়ামে ভারতীয় সঙ্গীত ঠিক ঠিক ভাবে তোলা যায় না। চব্বিশটি শ্রুতি সাতটি সুরের মধ্যে ছড়ান আছে। তা তারের যন্ত্রে ওঠে; কিন্তু হারমোনিয়ামে নয়। সেই অভাব দূর করার জন্য তিনি একটা যন্ত্র তৈরী করেছিলেন যা পিয়ানোর থেকে তফাৎ, হারমোনিয়ামের থেকে একদম তফাৎ। বাজত তারে, কিন্তু বাজান ছিল সহজ। সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক পাথুরেঘাটার রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেটিকে পরীক্ষা করেন এবং পরে মহারাজ জ্যোতীন্দ্র মোহন ঠাকুরকে সেটি উপহার দেওয়া হয়।

তারপর তিনি পরীক্ষা করছিলেন এমন কিছু উপায়ে উদ্ভাবন করতে যাতে এক জায়গায় থাকবে গায়ক বা গান বাজনার ব্যবস্থা, অন্য জায়গায়, দূরে, থাকবে শ্রোতারা। সঙ্গীত সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে যন্ত্রের সাহায্যে। তখনও গ্রামোফোন বা রেডিওর নাম পর্যন্ত এখানে শোনা যায় নাই। তাঁর পরীক্ষা প্রণালী এই রকমের ছিল। একটি চাওয়া পরবা বা তুম্বীর (বাঁয়া তবলার বাঁয়া) ওপর কয়েক সাইজের তারের ঘোঁড়া (বন্দুকের ঘোঁড়ার মতন কতকটা দেখতে) বসান থাকত। ইলেকট্রিকের তার সেই তুম্বী থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হত। সেই তার একটা ঘোড়ার খুরের মত লোহার ম্যাগনেটের চারদিকে জড়ান হত। সেইখান থেকে তারটি ফিরে এসে কড়ির জারের ব্যাটারীর কার্বনের পোলে লাগত। ব্যাটারীর জিঙ্ক পোলের তারটা আর দিক দিয়ে এসে তুম্বীর আর এক জায়গায় লাগা থাকত। তুম্বীর ওপর আ-আ করে গাইলে সেই সুরে পর্দাটা কেঁপে উঠত। তার ফলে তারের ঘোঁড়াগুলি নড়ে নড়ে ওঠা নামা করত। ইলেকট্রিক সার্কিটে make & break ঘটত। এইরূপে ঘোঁড়াগুলি ইলেকট্রিক চক্রে সংলগ্ন ও অসংলগ্ন হওয়ায় লোহার টুকরোটী প্রকৃত ম্যাগনেটে পরিণত হত। সেই ম্যাগনেটের সামনে একটী টীনের ক্যানেস্তার রাখা থাকত। ইলেকট্রিক চক্র সংলগ্ন অবস্থায় টীনকে ম্যাগনেটের দিকে টানত এবং অসংলগ্ন হলে আকর্ষণ ছেড়ে দিতে। তার ফলে টীনের গায়ে কম্পন আরম্ভ হত। তার থেকে টীনের অন্তবর্তী বায়ুমণ্ডলে কম্পন চালিত হত। ফলে গায়কের গলার আওয়াজ এখানে পুনরাবৃত্ত হত। বাড়ীর একঘর থেকে অন্য ঘরে বসে গাওয়া গান শুনে আনন্দ পেতেন। এটা তিনি অনেক আগে থেকে শুরু করেছিলেন।

তিনি আর একটা পরখ এই সময় করছিলেন। এটা ১৯০০ সালের গোড়াকার কথা। এদেশে ইলেকট্রিক ফ্যান তখনও প্রচলিত হয় নাই। ইলেকট্রিসিটীতে পাখা চালানর পরিকল্পনা নিয়ে তিনি খাটতেন। একটা চৌপল কাঠের দুই প্রান্তে লোহার গর্তখিল ছিল; তার ওপর কাঠটা ঘুরতে পারত। কাঠটার চারটে পলে চারটে লোহার টুকরো লাগান ছিল। এই কাঠের গায়ে লাটাইয়ের মত ক'রে পাতলা চারটে কাঠের টুকরো লাগান ছিল। বাকিটা সেই ম্যাগনেটের কাজ। তখনকার দিনে ইলেকট্রিসিটি নিজের ঘরে তৈরী করে নিতে হত। কারেন্ট-বিক্রীকারী কোন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কারেন্ট চললে বাকীটা ঘুরত। লাটাইটাও কাজে কাজেই ঘুরত। সেইজন্য হাওয়া হত।

সস্তায় কারেন্ট ও ইন্সুলেটেড্ তার তৈরী করার জন্য কিছু সময় তিনি দিয়েছিলেন। এই কাজে আমার পরিশ্রম তিনি নিয়েছিলেন। আমার বুদ্ধি খাটাবার মত কিছু ছিল না। শুধু কথামত খেটে যেতাম। বাবা ধূমহীন কেরোসিনের লম্ফ আবিষ্কার করার পেছনে কিছুদিন লেগেছিলেন। বহুবিধ পরীক্ষার পর এটিতে কৃতকার্য হন। মেদিনীপুর শিল্প প্রদর্শনীতে লম্ফটী দেখান হয়। তিনি একটা সার্টিফিকেটও পেয়েছিলেন। এই সব কাজে আমার খানিকটা সময় বেশ কাটত। বাকী সময়টা স্নান, আহার, ব্যায়াম, ভ্রমণ ও মানসিক আবহ কাটায় যেত।

(ক্রমশঃ)

একখানি পত্র

শ্রীপথিক

প্রিয়.....,

আপনার চিঠিটার জবাব দিতে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ দেরি হোলো। আরো হওয়া সঙ্গত হবে না মনে করে আজ লিখতে বসলাম। এবারে দেরির প্রধান কারণ আলস্য নয়। লেখ্য বিষয়ের জটিলতা। আজ মনে হচ্ছে যে জটিলতা লক্ষ লোকে সমাধান করতে পারলো না। তা না পারার জন্য আমার আর বাড়তি কোন অকৃতার্থতার পরিচয় হবে না। অতএব যা হোক দু কথা লেখা যাক।

আপনি চেয়েছিলেন 'গণদীপায়নের' লিখিত রূপ। সেটা ভেবে যা হয় পরে করব। তার অলিখিত রূপটার কথাই আপাততঃ ভাবছি। তার বহু কিছু অবশ্য আপনিও ভাবছেন, দেখছেন এবং লিখছেন। গড়ে তোলবার কাজে হাত লাগাতে কেউ আসছে না বলে অসহিষ্ণুতাও প্রকাশ করেছেন। অন্তরের বৈরাগীটার আভাষও কিঞ্চিৎ দিয়েছেন। আপাততঃ তার কথাটাই ধরা যাক—'চুত্তোর' বলে বেরিয়ে পড়া সহজ। এমন কি মাঝে মাঝে আর কিছুই এর চেয়ে সহজতর হয় না। তবুও আমার আন্দাজ আমাদের চরিত্রের মধ্যে এই বৈরাগীটার আসন খুব পাকা পোক্ত রকমের নয়। ওর প্রতিপত্তিটা মাঝে মাঝে এক একটি ক্লান্ত, ক্ষুব্ধ, উদাস মুহূর্তের। কিন্তু মনের মধ্যে সারাক্ষণ আধিপত্য জাহির ক'রে চলেছে যে লোকটা সে হচ্ছে বিশ্ব মোড়ল জাতের মানুষ—বিশ্ব কল্যাণের জন্য সে দিনে ঘণ্টা বোলো জেগে থাকে এবং বাকী আট ঘণ্টাও ঐ বিষয়েরই স্বপ্ন দেখে। সে যে দিকটা না দেখবে, বিশ্ব কল্যাণের সেই দিকটাই হঠাৎ থেমে যাবে—এই হচ্ছে তার প্রতি মুহূর্তের অতন্দ্র আশঙ্কা। অতএব 'চুত্তোর' বলে কাজ নেই। কেঁচে গণ্ডুষ করতে ফিরে আসতে হ'লে সেটাও কম হাঙ্গামার নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এমন হয় যে Returning is as tedious as going o'er—তখন কি করা? বলতেই হচ্ছে—That is the question.

যতটা দেখতে পাচ্ছি, নতুন কিছু হচ্ছে না। হচ্ছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। একদা বুদ্ধদেবকে দেখে কয়েক জন লোক মুগ্ধ হোলো, তাঁর মধ্যে জীবনের একটা নতুন অর্থ পেল, আশ্বাস পেল, লক্ষ্য পেল। তারা প্রণাম ক'রে বলল—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

কিন্তু সবাইত আর বুদ্ধকে দেখতে পেল না। মুখে মুখে কথা রটলো। লোকের আগ্রহ বাড়লো, উৎসুক্য বাড়লো, অনুসন্ধিৎসা বাড়লো। সে সব মেটাবার জন্য ফরমুলা তৈয়ার করতে হলো—ধর্ম শাস্ত্র। তাতেও বহু লোকের তৃপ্তি হোলো। তারা খুসী হয়ে বলল—ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

এতেও মানুষ প্রেরণা পেল যথেষ্ট। সমাজে শক্তি এলো। শিল্প হোলো সাম্রাজ্য হোলো সমৃদ্ধি হলো—নীতি বাক্যের স্তূপের সমান মাথা তুলে দাঁড়ালো কীর্তির স্তূপ। কিন্তু যার দ্বারা 'প্রাণঃ প্রথম যৈতি যুক্তঃ'—তার রং ফিকে হতে হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল। অবলম্বন আর কিছু হাতের কাছে বা জীভের ডগায় রইল না। অথচ নিরালম্ব হয়ে বহু লোকের কারবার চলেই বা কি করে? 'গণদীপায়ণ' তখন প্রায় হবো হবো হয়ে এসেছে। পারের তলায় মাটীটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য মুণ্ডিতেরা তখন বুদ্ধি করে বললো—সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—যার আধুনিকতম অনুবাদ হচ্ছে All power to the Congress। এতেও অবশ্য নতুন উৎসাহ কিছু হোলো না তা নয়। সঙ্ঘ হোলো বহু। কিন্তু বেশমর অসংখ্য সঙ্ঘরামের দীপাধার উজ্জ্বল রাখতে গণদীপায়ণের তেল নিঃশেষিত হোলো। 'গণের' সঙ্গে 'সঙ্ঘের' যদি সংঘাত বাধে, তার ফল সাংঘাতিক হবেই।

সাহায্য করতে কেউ যে এগিয়ে আসছে না এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক, অর্থাৎ ঐতিহাসিক। দেশ জুড়ে এখন আমরা 'সংঘং শরণং গচ্ছামি'। সব ইতিহাসের অর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যা আছে। এটার একটা অনর্থ-নৈতিক ব্যাখ্যাও আছে।—গণদীপায়নীদের হাতে অর্থ নেই, এই অর্থে নয়। তার চেয়েও গুরুতর অনর্থের আশঙ্কা আছে। অবশ্য অনর্থ ঘটবেই এমন ভবিষ্যদ্বাণী করছি না। নাও

ঘটতে পারে সন্ধ্যা পূজার অবসান নানা উপায়ে ঘটতে পারে তবে বড় একটা পরিবর্তন যে প্রয়োজন এতে সন্দেহ নেই। নইলে গণদীপ জ্বলবে না।

এখন আগের প্রশ্নে ফিরে আসা যেতে পারে—returning বা going o'er ?—যে দুই এক জন এমন আছে যাদের মধ্যে বৈরাগীটা এবং ঘোড়লটা একটা মোটা-মুটি সন্তোষজনক সর্তে আপোষ করে একত্র ঘর সংসার করছে তাদের পক্ষে বোধ হয় কেরা এবং চলার মাঝা-মাঝি, অর্থাৎ বসা-গোছের একটা ভঙ্গীমা নেওয়া মন্দ নয়। মানে, সাদা কথায়, দীপ একটা জেলে বসে যাওয়া। সে দীপে 'গণের' বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হবে এমন বিশ্বাস মনে সৃষ্টি করতে পারছি নে। সে দীপের আলো এতই ক্ষীণ হতে বাধ্য যে তাতে দীপায়ণ হবে না। তবে সে আলোয় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত একটা থেকে যেতে পারে, এই মাত্র।—নিছক দর্শক হিসাবে এই পর্যন্ত বলা

সুতরাং এখন প্রশ্ন হতে পারে আমি নিজে বসছি নে কেন ? অন্ততঃ বসার একটা লিখিত রূপ দাখিল করছি নে কেন ?

আসল উত্তর হচ্ছে, আমার মনে সন্দেহ আছে। একটু সন্দেহ আগেও ছিল। এখন আরো জোরালো হোয়েছে। গণদীপায়ণের চেষ্টা বহু শতাব্দী থেকেই হয়ে আসছে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে 'যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে।' তা হলে কি লোকে আর চেষ্টা করবে না ? তা নয়। চেষ্টা কোন্ পথে করবে সেইটা ধরতে পারছি নে।—আমাদের যেটা সমস্যা—অর্থাৎ 'কংগ্রেস করতে' গিয়ে কংগ্রেসের কাজ করবার আর সময় পাচ্ছি নে—এটাকে নিতান্তই সাময়িক ক্যাপামি বলে ধরা যাক। শক্তির নেশায় বিভোর হয়ে একটা গোটা জাতের নিশ্চয় চিরকাল চলতে পারে না। আজ হোক, কাল হোক,—কাজে আবার হাত দিতেই হবে। কিন্তু সেটা কি ভাবে ? খুব পষ্টাপষ্টি কথায়, জিজ্ঞাসাটা হচ্ছে এই যে গাঁয়ে এখন রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলবে, না ইলেকট্রিক বাল্‌ব্ ফিট্ করতে হবে ?—প্রথমেই জানা দরকার 'গণ'—মানে, লোকেরা কি চায় ? তারা তেলের পিদিম চায় বলে আমার এখন আর বিশ্বাস হচ্ছে না। শ্রেয় আর প্রেয়র দ্বন্দ্ব চিরকালই চলছে। এক একটা যুগের এক একটা বড় আইডিয়া থাকে—সেই রকম আইডিয়ার প্রভাবে মানুষ মানুষের চেতনা একেবারে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তেলের প্রদীপ শ্রেয় হতে পারে। কিন্তু এ যুগে ওটা শ্রেয় নয়।

কিছুদিন আগে আমেরিকার ইতিহাস পড়তে পড়তে আমার বিশ্বাসের একটা সমর্থন পেলাম। স্বাধীনতার পরে জর্জ ওয়াশিংটন জাতি ও রাষ্ট্র গড়ে তোলবার ভার নিলেন। তাঁর দুখানা হাত দুজন মানুষ—আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন আর টমাস জেফারসন—এই শেষোক্ত ব্যক্তিটিকে আমেরিকার লোক আজও তাদের জাতির অন্যতম জনক বলে মনে করে। কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁর সঙ্গে নেহরুর তুলনা করেছে তারা। ঐতিহাসিক কি লিখছেন শুনুন :—

"The two men were utterly different from each other in every respect, yet oddly enough no other pair opposed to one another have ever in our history influenced so permanently, both of them, our thought and practice as a nation. Hamilton, a West Indian boy probably of illegitimate descent, had landed in New York with his fortune to make. A lawyer, with an extraordinary brilliant mind and attractive personality, he won his way, married into a wealthy family and became a leading figure in the State. Jefferson had been born on the Virginia frontier. Hamilton, living his life among the moneyed class in New York, with its intensely corrupt politics, *had no belief whatever in the capacity of the common man* to govern himself or others. Jefferson, influenced by French philosophers to some extent,

and living among the yeomanry of one of the best frontier sections of the country, *had complete faith* in the ordinary citizen, so long at least, *as the nation might remain agricultural.* Hamilton was a realist in politics; Jefferson an idealist, *although he proved* a *better party leader and organiser* than his opponent.. Hamilton belived in a strongly centralised Government, deriving its main *support from the moneyed class.* Jefferson belived in Government performing the *minimum* of functions, in *decentralisation,* and in reliance upon the farmers. At first the two men succeeded in working together in the cabinet in moderate harmony, but their philosophers were too antagonistic, and it was not long before the inevitable dislike and mutual lack of confidence began to show itself. Hamilton stood for *strength, wealth and power*; Jefferson for the *American dream...*"

সংগঠক হিসাবে জেফারসনের সুবিধা অনেক বেশী ছিল। আরো লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে যে অল্পদিন পরেই হ্যামিলটন এক duel লড়তে গিয়ে নিহত হন—অর্থাৎ জেফারসনের পথ বাধামুক্ত হোলো। কিন্তু তা সত্বেও, গত দেড়শো বছর যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ রাষ্ট্রের জনক বলে নমস্কার করেছে জেফারসনকে, কিন্তু জীবনে অনুসরণ করেছে হ্যামিলটনের পথ। তিন বছর আগে এই প্যারাটা পড়লে আমি বুঝতে পারতাম না। আপনিও পারতেন কি না সন্দেহ। আজ কিন্তু ব্যাখ্যা স্পষ্ট। ওরা নেহেরুর সঙ্গে কেন তুলনা করলো জানি নে। কিন্তু সত্যি তুলনা চলে গান্ধীজীর সঙ্গে—অবশ্য গান্ধীজী আরো বড় বিরাট, সার্বিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে points of comparison লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁরও বিশ্বাস সাধারণ মানুষের শক্তিতে, কৃষি সভ্যতায়, রাষ্ট্রের ন্যূনতম কর্তৃত্বে, বিকেন্দ্রীকরণে, তাঁরও ছিল Indian dream—রামরাজ্য—লঘিষ্ঠ পরিমাণ বিষয় ভোগের সঙ্গে গরিষ্ঠতম আত্মিক ঔজ্জ্বল্য। আমরা মুগ্ধ হ'লাম, তাঁর চিত্তাভয় দেশে দেশে বিতরণ করেছি। তাঁর ধর্ম দিক্ বিদিকে প্রচার করেছি—এ ধর্মের চেয়ে বড়তর আর কিছু হয় না একথা বিদেশীদের বোঝাবার জন্য আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই। কিন্তু আমরা চলেছি—? একশো কোটি টাকা দামের এক-একটা multi purpose scheme—Army, Navy, Air force, সাতটা পয়লা নম্বরের লোহার কারখানা এবং আধুনিক আরো যা যা লাগে। টাকার অভাবে এ সবের অনেক কিছু টিমিয়ে চলেছে সেটা অবশ্য অন্য কথা, সেটা সাময়িক। টাকা গেলেও Rolls Royce কিনব না একথা আমরা কেউ বলছি? বেচারা চাষীরা কি অপরাধ করলো যে তারাই শুধু তেলের পিদিম জ্বালাবে, বিজলী বাতি না জ্বালিয়ে? যদি আমরা তেলের বাতি নিয়ে আজ তাদের কাছে যেতেও পারি, তারা শুনবে কথা?—American dream বা Indian dream যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা যত বড় ব্যক্তিত্বই হোন, গোটা সমাজের চলার ছন্দ যে নিয়ন্ত্রিত করছে সে আরো বড়তর ব্যক্তিত্ব। কারণ সে কোন ব্যক্তি নয়। সে হচ্ছে সমষ্টি প্রাণের অভিব্যক্তি। গণবীপায়ন আমরা কোন্‌খানে করব?

একটা খুচরা অসুবিধার কথা বলে আজ শেষ করি। এই ছন্দে যে গান বাজছে সেটা ওস্তাদী ধামার ধ্রুপদ। মেঠো ভাটিয়ালি বাউল নয়। 'গহনা: কর্মণো গতি'—নতুন কর্মের কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। দিল্লিতে সারের কারখানা হয়েছে—গোটা এশিয়ায় সার রপ্তানী করা হবে। গোবর সার নয়, chemical fertiliser—food office এ ওস্তাদ গাইয়েরা বসে আছেন, তাঁরা দেখিয়ে দিচ্ছেন কি পরিমাণ জমিতে কি পরিমাণ chemical দিতে হবে। একজনের দেখিয়ে দেওয়া পরিমাণে আমাদের এক বন্ধুর সাধের ফুল বাগিচা আট দশদিনের মধ্যে গবি সাহারা বনে গেছে। সমস্যাটা তা হলে হচ্ছে এই যে বাউল ভাটিয়াল বেশী শিক্ষা করতে হোতো না। গলার জোর কিঞ্চিৎ ভাবের আর্দ্রতা থাকলেই কাজ চলে যেতো। স্বাধীনতার আগে শুধু গলার জোর এবং দেশপ্রীতির জোরে কংগ্রেস কর্মিরা যে যেখানে যা পেরেছে করেছে। আজ নতুন আবহাওয়ায় শুধু patriotism আর যথেষ্ট নয়। Specialisation অপরিহার্য্য। এই specialised knowledge এবং skill এর রাজত্বে আমরা রেড়ির তেলের দীপবর্তিকা নিয়ে কোন্‌খানে ঢুকবো?.....

আবেদন

শ্রীঅরন্তী ঘোষ

আপাততঃ যাহা করিতে এসেছি, হেথা
আর যাহা হোক্ তাহা
কাব্য কিছুতে নয়;

ললিতকলার বীণাপাণি সনে, জানি
বিরোধ বাধারে চলে
বিশ্ব-বিদ্যালয়।

তাইতো তাহার বিরাট প্রাসাদ মাঝে,
নিশান গুমরি মরে
পদ্ম-আসনা বাণী;

বিদ্যালয়ের রত্ন যাহারা, তারা
ভাণ্ডারে তাঁর সবে
রত্ন দেয়না আনি।

অরটীকা সে তো আঁকে নাই ঘোর ভালে,
উপাধি বা মানপত্রে—
রত্ন নহি কো আমি—

হাজার হাজার অন্তেবাসীর মাঝে,
দিন আমি-সেবি তবু,
ভারতীরে দিবাযামী।

কত আসে, যায়! কেহ ইচ্ছায় শুধু,
কেহ গুরুজন ভরে
কেহ বা বিলাস-ভরে!

কেহ বা খুঁজিছে ডিগ্রী; অথবা
সময় কাটায় কেহ
কেহ বা চাকুরী তরে!

তবু তা'রি মাঝে, জানি কয় জনা আজো
আছে, আছে নিশ্চয়;
জ্ঞান মন্দির তলে

ঊর্দ্ধমুখীন ফুলের মতন যা'রা
আকুল নয়ন মেলি'
খুঁজে ফেরে সতলে।

তাহাদের-ই দিন কাটে দুখে, মেঘে মেঘে
অন্ধ-কক্ষ মাঝে,
ছেঁড়া মাদুরের পরে—

রেঁস্তোরা আর সিনেমার সাথে তা'রা
নহে, নহে পরিচিত
নারী পিছে নাহি ফিরে।

মহান্ কর্মে চাইতো সাধনা বড়
নহিলে হবেনা জানি,
ব্রতের উদযাপন—

মলিন কুটীরে জ্ঞানের আলোক জ্বালি'
ধীরে, ধীরে হও বড়
হে জ্ঞান পিয়াসী মন।

তাহারে চিনিবে বিশ্ববিদ্যালয়
আসিবে সে দিন কবে?
যোগ্যের সম্মান,

আপনার হাতে আনি দাও, দাও আজ
এই প্রার্থনা মম
জাগো, করো অবধান।

সাধ্য কি মোর তোমারে জাগাব, বলো!
আপনি মহান্! জাগো,
তব গৌরব রাখো

যোগ্য যে জন! খুঁজি তা'রে চারিধারে
তোমারি' দীপ্ত টীকা
তাহারি ললাটে আঁকো।

ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্ম

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

তিরিশ বছর পূর্বে লাহোর কংগ্রেসে প্রথম স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ স্বাধীনতালাভ ব'লে ঘোষিত হ'ল। সেই-থেকে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতার সংকল্প গৃহীত হ'ত এবং ঐ দিন স্বাধীনতা দিবস ব'লে পালিত হ'ত। তার পূর্বে ১৯২৭ সালে সাধারণভাবে মাদ্রাস কংগ্রেসে স্বাধীনতা দাবী ক'রে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ প্রস্তাবের পর ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-গঠন সম্বন্ধে এক খসড়া তৈয়ার করার জন্য কংগ্রেস থেকে এক সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ব'লে, নেহরু কমিটি নামে ইহা সাধারণে অভিহিত হয়েছিল। এই নেহরু কমিটির রিপোর্টে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন (Dominion Status) দাবী করা হয়েছিল।

১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তার সভাপতি ছিলেন। সেখানে নেহরু কমিটির সুপারিশ মতো ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হবার কথা হয়। গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি বড় বড় নেতারা সবাই ঐ মতের। তাঁদের মতের কাছে তরুণ নেতা জওহরলাল ও সুভাষ চন্দ্র পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হ'লেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে (Subjects Committee) ঐ মতে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র তা মেনে নিতে রাজী বা বাধ্য হন। বাংলার রাজনীতির পক্ষে সেটা ছিল একটা সংকট সময়। যুগান্তর ও অনুশীলন দল এক যোগে কাজ করার সংকল্প নিয়ে '২৭ সালের শেষ ভাগে ও ২৮' সালের প্রথমে জেল থেকে খালাস হয়। কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে এসে ঐ মিলন-আগ্রহ অনেকটা কমে যায়। কলিকাতা কংগ্রেসের পূর্বেই বিভিন্ন স্থলে পুরাণো বিরোধের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ঐ কংগ্রেসের সময় তা আরও প্রকট হ'য়ে ওঠে। অপর দিকে আর একটা রাজনৈতিক বিবাদ-ও ঐ সময় প্রচ্ছন্ন আকারে দেখা দেয়—যতীন্দ্র, মোহন ও সুভাষ চন্দ্রের বিরোধ।

যুগান্তর দল সুভাষকে সমর্থন করছিল—কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে মত ভেদ সত্ত্বেও, সুভাষের রাজনীতির মধ্যে যে কর্ম প্রেরণা ও বাস্তবপন্থী ভাব ছিল, তা যতীন্দ্র মোহনের রাজনীতিতে ছিল না। অনুশীলন সমর্থন করছিল যতীন্দ্র মোহনকে। কলিকাতা কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সভার সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে যুগান্তর দলের কয়েকজন কর্মী বিশেষ ক্ষুব্ধ হ'লেন। তাঁরা বিভিন্ন জেলার ও প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা ক'রে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত গঠন করতে লাগলেন। অবশ্য ভারতের মাত্র সব নেতাদের বিরুদ্ধে তাঁরা স্বাধীনতার দাবী প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন—এমন ভরসা তাঁদের ছিল না। কিন্তু কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনে মাদ্রাজে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবকে উপেক্ষা ক'রে ঔপনিবেশিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'বে—বিনা বাধায়—এটা তাঁরা সহ্য করতে রাজী হ'লেন না। শেষ পর্যন্ত এঁদের চেষ্টায় ও উদ্যোগে স্বাধীনতা প্রস্তাবের পক্ষে বেশ একটা মত দাঁড়িয়ে গেল। বাংলার প্রতিনিধিদের সভায় যখন বেশ উত্তেজনাময় আলোচনা চলছে—তখন যুগান্তর দলের কোন কোন বন্ধু সুভাষ বাবুকে খবর পাঠালেন—বাংলার নেতৃত্ব করতে হ'লে বাংলার প্রতিনিধিদের এই মতকে উপেক্ষা করা চলে না। তখন সুভাষচন্দ্র সেই সভায় রাত ৯টা ১০ টার সময় এসে বললেন—"বাংলার প্রতিনিধিদের যা মত—তা আমার নিকট তাঁদের আদেশ, কাজেই তাঁদের মত অনুসারেই আমি চলব।"

পর দিন কংগ্রেসে স্বাধীনতা বনাম উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নিয়ে তীব্র বিতর্ক হ'ল। দুপুর রাতে ভোট গ্রহণ করা হ'ল। ভোটে আমরা পরাজিত হলাম; কিন্তু আশাতীত ভোট পেয়েছিলাম। মোট ভোটের দু-তৃতীয়াংশের কিছু কম ছিল স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষে এক-তৃতীয়াংশের কিছু উপরে ছিল স্বাধীনতার পক্ষে। গান্ধীজী এটা বুঝলেন যে তাঁদের ব্যক্তিত্বের জোরে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব করা চলে, কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করা চলে না। ঐ দিন প্রকাশ্য কংগ্রেসে তিনি ঘোষণা করলেন—১৯২৯ সালের মধ্যে যদি

যেন পাওয়া যায়, তবে আগামী কংগ্রেসে স্বাধীনতাকে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষণা করবেন এবং তা লাভ করার জন্য সংগ্রাম সুরু করবেন।

সেই অনুসারে পর বৎসর লাহোর কংগ্রেসে ঘোষণা হ'ল—পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। আরও ঘোষণা করা হ'ল, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে শীঘ্রই সংগ্রাম সুরু করা হবে। অবশ্য কংগ্রেসের সংগ্রাম বরাবরই অহিংস। অহিংস সংগ্রামও যে ফলপ্রসূ এবং তাও যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী—সে বিষয়ে আজ কোন রাজনৈতিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির মনে সংশয় নেই। ১৯৩০ সালের মার্চ মাস থেকে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবণ সত্যাগ্রহ সুরু হ'ল। কিন্তু কলিকাতা কংগ্রেসের পর হ'তেই যুগান্তর দল বাংলায় ব্যাপক বৈপ্লবিক কর্মপন্থার জন্য তৈরি হ'তে লাগল। তাঁদের ইচ্ছা ছিল, অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষ যে নির্মম অত্যাচার ও নিষ্পেষন সুরু করবে, তার জবাব জাতির পক্ষ থেকে গোপন বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় দিতে হ'বে। তাই তারা এক দিকে কংগ্রেসের সঙ্গে রেখে প্রকাশ্য অহিংস আন্দোলনের জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে লাগল। অপর দিকে গোপন বৈপ্লবিক আয়োজন করতে লাগল—অত্যাচারী বিদেশী শাসকদের যোগ্যভাবে তাদের জবাব দেবার জন্য। প্রতিপক্ষী রাজনৈতিক দল তখন এই উভয় প্রচেষ্টা থেকে দূরে থেকে দল গঠনের চেষ্টায় ছিল। "স্বাধীনতা" নামক সাপ্তাহিক কাগজ ছিল যুগান্তর দলের এই দ্বৈত কর্মপন্থার বাহক ও প্রচারক।

এই আবেষ্টনের মধ্যে বাংলায় আইন আন্দোলন সুরু হ'ল। সমস্ত ভারতের পক্ষে সে একটা চরম মুহূর্ত। সবরমতী আশ্রম হ'তে গান্ধীজী বের হ'লেন ডাণ্ডী অভিযানে—ইংরেজদের লবণ আইন ভাঙতে। তিনি ব'লে গেলেন—ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলেই তিনি ঐ আশ্রমে ফিরে যাবেন, নতুবা নয়। সমগ্র ভারত থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গিয়েছেন—গান্ধীজীর এই সমর অভিযান দেখতে। মতিলাল নেহেরু, জওহরলাল প্রভৃতি সব নেতারা পর্যন্ত এই অপূর্ব সমর সজ্জার সঙ্গে চলেছেন। বাংলা থেকেও দুজন গিয়েছিলেন, তার মধ্যে একজন শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত। তাঁর ঐ দৃশ্যের অভিজ্ঞতা "মুসাফিরের ডায়েরী"—নাম দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে দুই সংখ্যায় স্বাধীনতায় বের হয়।

এর পর সুরু হ'ল বাংলায় দ্বিমুখী আন্দোলন—একের পরিপূরক অপর। যুগান্তর দলের বিশিষ্ট কর্মীরা একের পর এক প্রাদেশিক কংগ্রেসের দায়িত্ব নিয়ে আইন অমান্য বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাতে লাগলেন। অপর দিকে সুরু হ'ল তাঁদের বৈপ্লবিক কর্মপন্থা। এর প্রথম অভিব্যক্তি হ'ল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে এবং এর পর টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপে। এই সব ঘটনা পরম্পরার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন এখানে নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিব্যক্তি দেখানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তার ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময় হয়ত আজো আসেনি।

সমস্ত ভারতের উপর অহিংস বিপ্লবের তরঙ্গ খেলে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল ইংরেজের নিষ্পেষন এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন। ১৯৩১ সালের প্রথম দিকে গান্ধী-আরুইন আপোস স্বাক্ষরিত হল,—সমস্ত কংগ্রেসী বন্দী মুক্ত হ'ল। কিন্তু সহিংস আন্দোলনে দণ্ডিত বা ঐ সন্দেহে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হ'ল না। ১৯৩১ সালের করাচী কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎসিং প্রভৃতির ফাঁসী হ'ল; গান্ধী-আরুইন চুক্তির ওখানেই শেষ হ'ল—বলা চলে। গান্ধী-আরুইন চুক্তির পর সহিংস বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলায় সাময়িক ভাবে বন্ধ করা হ'য়েছিল। কিন্তু ভগৎসিংহের ফাঁসীর পর আবার তার রুদ্ধ বেগ মুক্ত হ'ল। বাঙ্গালী যুবক যেন প্রাণ দেবার জন্য অস্থির হ'য়ে উঠল। হিসাবী বুদ্ধি যাকে বলবে—খামকা আত্মহত্যা করা—বাঙ্গালী যুবক যেন তারই জন্য পাগল হ'য়ে উঠল।

ঐ সব গুপ্ত বৈপ্লবিক কাজকে সাধারণ ভাষায় terrorism বা সন্ত্রাসবাদ বলা হয়। যদিও এই আখ্যা খুব ঠিক নয়, তবুও এর মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

আমরা কখন-ও আশা করি নি যে ঐ প্রকার গুপ্ত কাজ কর্ম দিয়ে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে;—আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—এই সব গুপ্ত কাজের ফলে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। তাই—ঐ সব কাজ বৈপ্লবিক কর্ম-পদ্ধতির। অবশ্য কিন্তু এ কথা-ও অস্বীকার করা যায় না যে ঐ সব কাজের একটা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী শাসকদের মনে সন্ত্রাসের সঞ্চার করা। এটা কেবল দু'চার জনের ব্যক্তিগত জীবনহানি করার ব্যাপার নয়;—বিদেশী শাসক জাতির মধ্যে একটা ব্যাপক ধারণা জন্মানো যে—এই পরাধীন জাতি স্বাধীনতার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে শাসক শ্রেণীর কয়টি লোক আহত বা নিহত হ'ল—সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হ'ল—পরাধীন লোকদের বে-হিসাবী সাহস ও আত্মদান দিয়ে শাসক জাতির মনে চমক ও ত্রাস লাগানো। যুগান্তর দলের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মাহুতির জন্য যে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল—জাতির ইতিহাসে তা চিরকাল গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করা হবে। এর সঙ্গে অপর দিকে আবার সুরু হ'ল আইন অমান্যের দ্বিতীয় অভিযান। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে বিলাতে ভারতীয় শাসন-সংস্কার যখন আলোচিত হয়, তখন ভারতবর্ষ লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে উন্মত্ত। ইংরেজ বুঝল—কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের মাটি দখল ক'রে কিছু দিন ব'সে থাকা যায়; কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মা কংগ্রেসের সঙ্গে। তাই গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল;—কংগ্রেসকে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করা হল। কিন্তু ইতিমধ্যে শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড (Mac. Donald) রক্ষণশীল দলের হাতে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছেন—বিশেষ ক'রে ভারতীয় ব্যাপারে। ভারত সচীব স্যামুয়েল হোর (Sir Samuel Hore) তখন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। কাজেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধীজী ফিরলেন নিরাশ হয়ে ও রিক্তহস্তে।

ইতি মধ্যে বাংলার চট্টগ্রামে, ঢাকায় ও হিজলী বন্দী শিবিরে ইংরাজ শাসনের চরম বর্বর রূপ ফুটে উঠল; যুক্ত প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে-ও ওদের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। বোম্বাইতে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠকে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হ'ল। গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গ আর কেউ বোম্বাই থেকে নিজ নিজ গৃহে বা কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন নি;—হয় বোম্বাইতে—না হয় পথে সবাই বন্দী হ'লেন।

এমনি ক'রে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত চলল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন দুদিক থেকে জাতিকে ভাঙবার চেষ্টা করছিল। বিলাতে নতুন শাসন-বিধান তৈরি হচ্ছিল; তাতে জাতিকে টুকরা টুকরা ক'রে ভাগ করা হ'ল। অপর দিকে চলছিল নির্মম অত্যাচার এবং এর এক বিশেষ রূপ দেখা দিয়েছিল বাংলায়। ১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী শিবিরে প্রায় বিনা প্ররোচনায় বন্দীদের উপর গুলি করা হ'ল। দুজন রাজবন্দী গুলিতে নিহত হন এবং বহু বন্দী আহত হন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে ইংরেজ সরকারের পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় এক নতুন ধরণের গুণ্ডামীর পরিচয় পাওয়া গেল। রুষ ইতিহাসে ১৯০৫ সালের বিপ্লব প্রচেষ্টার পর pogrom—প্রোগ্রোম নামে যে গুণ্ডামী ও নিষ্পেষন দেখা দিয়েছিল, বাংলায় তার প্রবর্তন হ'ল। এর চরম রূপ দেখতে পাই এণ্ডারসনের আমলে। এণ্ডারসনকে বিশেষ ক'রে বাংলার গভর্ণর ক'রে আনা হয়—আয়র্ল্যাণ্ডে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সমর ও অব্যবহিত পরে ব্যাপক ও নির্মম অত্যাচারের জন্য যে খ্যাতি ইনি অর্জন করেন—তারই জন্য।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে জয়লাভ করে। ইংরেজ মনে করেছিল, চার বছরের অত্যাচারে দেশবাসীর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আর তারা কংগ্রেসকে ভোট দেবে না। কিন্তু তাদের সেই আশা সম্পূর্ণরূপে বিফল হ'ল। ১৯৩৫ সালে নতুন শাসন-সংস্কার ও শাসন-বিধান বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট থেকে পাশ করে। ১৯৩৭ সালে নতুন শাসন-বিধান অনুযায়ী নির্বাচন হয়। এবার-ও কংগ্রেস জয়ী হ'ল সর্বত্র। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু ভিন্ন আর সব প্রদেশেই কংগ্রেসী

মন্ত্রীমণ্ডলী স্থাপিত হ'ল। প্রাদেশিক সব শাসনকর্তা বা গভর্নরদের তরফ হ'তে বড়লাট প্রতিশ্রুতি দিলেন—নিতান্তকার কাজে প্রাদেশিক গভর্নরগণ মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শের অতিরিক্ত কিছু করবে না। যদিও এই প্রতিশ্রুতি খুব পুরোপুরি মান্য করা হয় নি, তবু-ও গভর্নর ও মন্ত্রী-মণ্ডলী সব প্রদেশেই এক প্রকার পুষিয়ে চলছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হ'ল। ব্রিটিশ সরকার দাবী করল ঐ যুদ্ধ বিশ্ব-গণতন্ত্রের ও বিশ্ব-স্বাধীনতার যুদ্ধ; কাজেই ভারতকে ঐ যুদ্ধে সাহায্য করতে হবে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ঘোষণা করল—বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারত যুদ্ধ করতে রাজী আছে; কিন্তু তার পূর্বে জানা দরকার—স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের নীতি ভারতের পক্ষে কতটা প্রযোজ্য হবে। ইংরেজ সরকার এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব এড়িয়ে যেতে লাগল,—কিন্তু কংগ্রেসও সহজে ঐ মৌলিক প্রশ্ন ছাড়তে রাজী নয়। অতএব কিছু দিনের মধ্যে রামগড় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সব কংগ্রেসী মন্ত্রী-মণ্ডলী কাজে ইস্তাফা দিল। কিছু দিন পর গান্ধীজী সুরু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ। বাছা-বাছা কংগ্রেস কর্মীকে অনুমতি দেওয়া হ'তে লাগল;—তাঁরা ধীর শান্ত ভাবে জনতাকে বলবেন—এই যুদ্ধে একটি পয়সা বা একটি লোক দেওয়া পাপ। তথাকথিত বাম পন্থীরা বিদ্রূপ করতে লাগল,—ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে তারা তুষ্ট নয়। কিন্তু গান্ধীর কর্ম-পন্থার মধ্যে একটা সঙ্গতি ও পারম্পর্যের ভাব বরাবর থাকত। যে কোন সংঘর্ষমূলক কর্ম পদ্ধতির পূর্বে তার জন্য জনতাকে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা গান্ধীজী কখনও ভুলেননি। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ছিল তেমনি ব্যাপক জন-সংগ্রামের প্রস্তুতি।

এর পর এল ক্রিপস্ মিশন (Cripps Mission)। তাদের প্রস্তাব, যতই দিন যেতে লাগল, ততই রূপ বদলাতে লাগল। ক্রিপস্ সাহেব নিজের খ্যাতি খুইয়ে এখান থেকে ব্যর্থ হ'য়ে চ'লে গেলেন।—গান্ধীজী তাঁর প্রস্তাবকে প্রথম থেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন; হয়ত গান্ধীজীর বিরূপতা এমন তীব্র না হ'লে, অন্যান্য নেতারা ক্রিপস্ প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। ক্রিপস্ সাহেব চ'লে যাওয়ার পর থেকে গান্ধীজী সুরু করলেন—ইংরাজের ভারত-ত্যাগ দাবী। অন্যান্য নেতারা বরং গান্ধীজীর ঐ দাবীর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা ও পণ্ডিত জওহরলাল প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেন—যখন ভারতে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুই আক্রমণকারী বিদেশী সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়ে আছে, তখন এই সব গণ-আন্দোলনের কথা কল্পনাও করা চলে না। এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে গান্ধীজীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হল। ইংরেজের পুলিশ এলাহাবাদের কংগ্রেস অফিস তল্লাসী ক'রে এই কাগজ পত্র নিয়ে যায় এবং বিদেশে গান্ধীজীর ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালায়। বামপন্থীর নাম নিয়ে কম্যুনিষ্ট দল তখন ইংরেজের সঙ্গে এই যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য প্রচার চালাচ্ছিল। অথচ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের সময় তারাই সবচেয়ে বেশী চীৎকার করেছে ব্যাপক সংঘর্ষমূলক আন্দোলন সুরু করার জন্য।

ইংরাজ তখন তাদের যুদ্ধের প্রয়োজনে এমন সব নীতি অবলম্বন করছিল, যার ফলে দেশবাসীর দুঃখ-দৈন্যের সীমা ছিল না। তদুপরি দেশবাসীর নৈতিক চরিত্র ব্যাপক-ভাবে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রও চলছিল। বঞ্চনা (Denial) নীতি, পোড়ামাটি (Scorched Earth) নীতি, প্রভৃতি একদিকে সৃষ্টি করল দুর্ভিক্ষ ও অপর দিকে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ (control) উৎপাদন করল ব্যাপক অসততা। এই সব কাজেই কম্যুনিষ্টদল ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছে। দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি ও জাতীয় চরিত্রে অসততার প্রভাব—এ দুটাই ইংরাজের যুদ্ধ-নীতির প্রত্যক্ষ ফল এবং এই দুই কাজেই কম্যুনিষ্ট দল সরকারের হয়েছে।

যুদ্ধের চাপ যখন দেশবাসীর উপর চরম এবং যখন যুদ্ধের গতি-ও চরম অবস্থায় উঠেছে—তখন কংগ্রেস দাবী তুলল—ইংরেজ ভারত ছাড়ো (Quit India)। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঐ দাবীর সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্‌তার করা হ'ল এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। সমস্ত ভারতময় বিপ্লবের বহ্নি জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের অত্যাচারের রথ-ও খর বেগে চলল। তার যুদ্ধ-প্রয়োজনে যে বঞ্চনা নীতি (Denial Policy), ও পোড়ামাটি নীতি (Scorched Earth Policy) পূর্বেই সুরু হয়েছিল, তা আরও তীব্র ও ব্যাপক করা হল। এই সময় দুর্ভিক্ষ ও ব্যাপক অসততার সৃষ্টি ও প্রসার করার নীতি-ও আর-ও জোরের সঙ্গে চালানো হ'তে লাগল। কম্যুনিষ্ট দল ব্রিটিশ সরকারের সহকারী হ'ল। কিন্তু শত অত্যাচার সত্ত্বেও- জাতি তার দাবী ত্যাগ করল না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধে ইংরেজের জয় হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্বাচন হ'ল। ভারত-বিরোধী চার্চিল ও তাঁর রক্ষণশীল দল পরাজিত হ'ল। শ্রমিকদল বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিল,—অর্থাৎ তারা স্বীকার করল অহিংস স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত জয়ী হ'য়েছে। ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এটলী সাহেব ঘোষণা করলেন—ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবী আর অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। সেই দাবী স্বীকার ক'রে তিনি ভারত-সচীব ও অন্য কয়েকজন সভ্যকে এখানে পাঠালেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর স্থির হল—ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করবে। কংগ্রেস দাবী করেছিল—ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে হবে; ৫ বছর নিষ্পেষণ ক'রে-ও যখন ভারতকে দাবাতে পারল না, তখন ইংরেজ ঐ দাবী মেনে নিল। পার্লামেণ্টে এটলীর বক্তৃতায় বেশ পরিষ্কার ক'রে বলা হ'য়েছে—ইংরেজের পক্ষে আর ভারতবর্ষ শাসন করা সম্ভব নয়। ইংরেজ ধর্ম-বুদ্ধি থেকে বা বৈরাগ্য বোধ থেকে যায় নি, কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে হার স্বীকার ক'রে সে চলে গিয়েছে।

১৫ই মার্চের ভাষণে এটলী বলেছিলেন—সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনোভাব তারা জানে; ঐ লোকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে—কিন্তু তা ব'লে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যা-পরিষ্ঠদের অগ্রগতি বন্ধ ক'রে রাখতে পারে না। (We can not allow a minority to place a veto on the advance of the majority.) কিন্তু তদকালীন বড়লাট রক্ষণশীল দলের পাণ্ডা লর্ড ওয়াভেল এই মত যেন পছন্দ করলেন না;—এমন ভাবে তখন সব ব্যবস্থা করা হচ্ছিল যা'তে সহজেই মনে করা যেত যে লর্ড ওয়াভেল মুসলিম লীগকে সর্ব প্রকারে উসকানী দিচ্ছিলেন।

এর পর সুরু হ'ল লীগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পালা। কলিকাতা হত্যাকাণ্ড ইতিহাসে চির স্মরণীয় কাহিনী হ'য়ে থাকবে। তার পর নোয়াখালী, বিহার, মীরাট ও সর্বশেষ পাঞ্জাব। ওয়াভেল এমনি মনোভাবের পরিচয় দিলেন যে মুসলিম লীগের দাবী পূরণ না হ'লে আর তিনি অগ্রসর হ'তে পারেন না। এর পর ঐ সব নৃশংস হত্যাকাণ্ড এল; কংগ্রেস অগত্যা ভারত বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। ১৯৪৬ সালে ভারত-সচীব ও তাঁর সহযোগীরা এসে ১৬ই মে যে ঘোষণা করেন, তাতে বলা হয়েছিল—"দুটি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপনের পরামর্শ আমরা দিতে পারি না। (We are therefore unable to advise the British Government that the power should be handed over to two entirely separate sovereign states) কিন্তু ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত করল—ভারতকে বিখণ্ডিত ক'রে ভারত ও পাকিস্থান দুটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। এই সিদ্ধান্তের কারণ হ'ল মুসলিম লীগের বিরোধিতা।

কংগ্রেস নেতৃবর্গ বরাবরই ভারত বিভাগের বিরোধী ছিল। কিন্তু দুটা কারণে তারা এতে সম্মত হ'ল। প্রথমতঃ —দেখা যাচ্ছিল ইংরাজ যত দিন ভারতে থাকছে ততই সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হ'তে জটিলতর হচ্ছে। কাজেই ইংরেজকে বিদায় করাই তখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়তঃ—কংগ্রেস বরাবরই গণতন্ত্রে ও গণমতে বিশ্বাসী। আজ যে-অংশ পাকিস্থানের অন্তর্গত তার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। তার ত' সবাই ভারত

বিভাগ চাচ্ছিলেই এমনকি হিন্দু ও শিখ অধিবাসীরাও ভারত বিভাগ চাচ্ছিল। পূর্ব বাংলার হিন্দুরা ভারত ও বাংলা বিভাগের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে আমরা পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় গিয়েছি; ভারত ও বাংলা বিভাগ সমর্থন করিনি ব'লে—আমরা যথেষ্ট তিরস্কার ভোগ করেছি। তা' ছাড়া অখণ্ড বাংলার কর্ণধার যারা বলেছে—তারা মীরজাফর, উমিচাঁদের সঙ্গে উপমিত হ'ত। বাংলা বিভাগ দাবী করে হাজার হাজার চিঠি ও টেলিগ্রাম পূর্ব বাংলা থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অফিসে গিয়েছে। জনমতের দাবী শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মেনে নেয়। আজ সে সব কথা অনেকে হয়তো ভুলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ও মহাত্মা গান্ধী এর বিরোধী ছিলেন।

আজ সে বিতর্ক তুলে লাভ নেই। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারত খণ্ডিত হ'ল এবং ভারত ও পাকিস্থান দুটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হ'ল। তারপর থেকেই ভারতের শাসন-বিধান গঠনের কাজ প্রকৃত পক্ষে সুরু হ'ল এবং ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের ২৬শে শাসন বিধান-গঠনের কাজ শেষ হ'ল। লোকায়ত্ত স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত তার নূতন রাষ্ট্রীয় জীবন সুরু করল।

ভারতের স্বাধীনতা আজ কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কংগ্রেসের আদর্শ ও মতবাদ অনুসারে এই স্বাধীনতাকে সমাজে ও অর্থনীতিতে বিস্তৃত করার দায়িত্ব এখনও অপূর্ণ আছে। ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার মুখে রাষ্ট্র পরিচালকদের প্রধান কাজ হয় রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সংহতি রক্ষা করা। এর পর আসে নতুন সমাজ গড়বার কাজ। প্রথম কাজ সম্পন্ন হবার পরই কংগ্রেস প্রস্তাব করেছে—নতুন সমাজের গঠন করার জন্য—এক পরিকল্পনা কমিটি (Planing Committee) স্থাপন করতে হ'বে। বিশ বছরের অবিশ্রাম সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করা গিয়েছে—তাকে আজ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে হ'বে। সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে এই বিপ্লবের পরিণতি—যেখানে ব্যক্তি তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে সাম্যবাদিক সমাজ গঠন করবে;—যেখানে অধিকারের সাম্য, ও সুযোগের সাম্য সকল নাগরিকের থাকবে—যেখানে ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে সমাজ গড়া হবে,—যেখানে সকলের পক্ষে শিক্ষার, জীবিকার, বিশ্রামের অধিকার থাকবে। যে পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) স্থাপনের ব্যবস্থা চলছে—আমরা আশা করি, কংগ্রেসের বিপ্লব প্রচেষ্টাকে তা পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যাবে।

সৈনিক

জগদীন্দ্র মণ্ডল

আমি সৈনিক,
আমি চলি পা ফেলে, তালে তালে—
দুর্দান্ত, উদ্দাম পথিক;
যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে আমি চলি:
চলি দিগ্ দিগন্ত পেরিয়ে,
দুরন্ত কাল-বৈশাখীর মত।
আমার চোখে বুভুক্ষার নিষ্ঠুর হুতাশন
পদ-তলে মৃত কঙ্কাল কোটি কোটী
তবু চলি—শুধু চলি।

আমার পদ-চিহ্ন ইতিহাসের পাতায় পাতায়
পিছের পদ-চিহ্ন কত লুপ্ত হয়ে যায়—
লুপ্ত হয়ে যায় শীতের শিশির কোঁটার মত
তবু স্মৃতি হয়ে থাকে। বেঁচে থাকে
মনের আনাচে কানাচে—বড় সুন্দর বড় ভয়ঙ্কর,
সেই স্মৃতি-ভরা বুকে, আমি চলি—
আমার চলার ছন্দ চির-চঞ্চল
আমি চলি—শুধু চলি।

বর্ত্তমানে কাজ কী ?

শ্রীকাননবিহারী গোস্বামী

ছন্নছাড়া জীবনের ইতিহাস সামাজিক পরিবেশে পড়ে কখনো রূপ নেয় মাধুর্য্যের,—কখনো রূপ নেয় গ্লানির। নিজ জীবন-দেবতার পূজা নিজেই দিয়ে থাকে মানুষ—অন্যে নয়। যখনই ছন্নছাড়া জীবনের চলার পথ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তিতিক্ষার প্রশ্ন উঠে পড়ে জীবন ঘিরে। চিন্তারাজ্যে বিচরণ করে "এবার জীবনের মোড়" ঘুরাতে হবে।

যাযাবর মনোবৃত্তি গড়ে ওঠে এক যায়াবরেরই। তার সংশোধন কে আর করবে! হ্যাঁ—এই বার ঘুরে আসি বলার কথায়।

মন-ক্ষুণ্ণ হ'য়ে কলকাতা থেকে ফিরলাম। প্রতিজ্ঞা করলাম : আর নয়—স্বদেশীর নাম গন্ধ পর্য্যন্ত নয়। ষোল মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ী পৌছানো হ'লো। ক্লান্ত··· পরিশ্রান্ত। মনখানা ভার···।

স্ত্রীর খাতির আপ্যায়ণ' যে আছে এই বিষয় আমার নিকট-ই "এ্যাপ্রক্সিমেটলি ট্রুথ।" চা-পান শেষ করা হ'লো। হ্যাঁ-গা-অশ্বিনীদার সংবাদ—কেমন আছেন!... সুধীর বাবু.....অরুণদা·····। ওনাদের নাম ভুলে যাও। প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি আর রাজনীতির নাম-গন্ধ করবো না। চেয়ারের হাতলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। ভাবলাম আর ছন্নছাড়া জীবন নয়। এবার বাড়ী জমি জায়গা দোকান সব দেখার দিকে মন দোব! আকাশ কুসুম কল্পনা করে ফেল্লাম পলকের মধ্যে। দরকার নেই ভগবান বি, পি সি সির কথা ভেবে। যে আসবে রাজনীতির কথা—আলোচনা নিয়ে অমনি বিতাড়িত করবো

কংগ্রেস সেবাদল কর্ম্মী সতীনের স্ত্রী আমার কাছেই রয়েছে। নাম শোভা। মুখে কেমন এক পারিবারিক-জীবনের অশান্তির ছাপ। হাতে দু'গাছা করে কপোর চুড়ি। চায়ের "কাপ" এনে টেবিলে ধরে দিলে।

স্ত্রীর ভাবনা : তৎক্ষণাৎ বলে বসলো : এই প্রতিজ্ঞার পরমায়ু কতদিনের আমিও দেখে নোব। স্ত্রী রান্না-খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে চলে গেল।

গরম চা কণ্ঠস্থ হয়েই' গুন ধরেছে···। রমা—রমা··· উত্তর এলো, কেন? শুনে যাও! বলো···।···কেউ খোঁজ করতে এসেছিল···চিঠি পত্তর '···কিছু আসেনি···।

টেবিলে একটী ঘুড়ীর ডিস রেখে বলতে লাগলো : তুমি ত' দিনে দু'বার ক'রে রাজনীতি ছাড়ছো। টেবিলের কোনে হাত রেখে বলতে লাগলো : চেহারা যা হচ্ছে; খালি টৈ টৈ। যতরাজ্যের বদনাম···কেউ বলছে ঘুষ খোর···কেউ বলছে···মন্ত্রীদের দালাল : কেউ বলছে···। কেন···এই সব কাজে থাকা।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। তাড়াতাড়ি স্ত্রী বেরিয়ে পড়লো। ভয় কম্যুনিষ্টরা এলো নাকি? কারণ কিছুদিন আগে হ্যাণ্ডবিল দিয়েছে খুব সতর্ক থাকুন।

কে···?···আমি···নয়হরি মাল্লা। কি প্রয়োজন? ···বাবু আছেন কী? হ্যাঁ ···এইমাত্র এলেন। দেখতে দেখতে হারিকেন হাতে কানাই মাঝি এসে হাজির হোল।

চা পান শেষ করে বাইরে এলাম। স্ত্রীর আর সহ্য হ'লো না। এই না প্রতিজ্ঞা করেছিলে!...তবু এখনো চিঠিগুলো দেওয়া হয়নি।

মেদিনীপুর কেন গেছলেন—এই প্রশ্ন। কম্যুনিষ্ট activity র বিষয় শুনালো। বেশ নীত পড়েছে। হ্যাঁ... দেখুন...ঘরটায় টীন চাপান। বল্লাম : টীন চাপাই এটা আমারও ইচ্ছা কিন্তু অর্থ কোথায়? দু'বেলা ভাল ভাত জোটে না। দেখছেন না জানালা গুলো তৈরী করতে পারি নি। হরিবাবু বল্লেন : শুনছি আপনার পাকা বাড়ী গভর্ণমেণ্ট তৈরী করে দিয়েছে। খালি হাসলাম। বল্লাম আমিও শুনব শুনি আমাকে কত টাকা গভর্ণমেণ্ট দিয়েছে; এই সেদিন কম্যুনিষ্টরা প্রচার চালিয়েছে আমার নাকি কুঁড়ে ঘর ছিল এখন ডাক বাংলো তৈরী করেছি। বহুটাকা ঘুষ খাচ্ছি। জনসাধারণ বোঝে না হরিদা। লোকে বলে বেড়ায় সরকার কোন কিছু করতে চায় না কিন্তু আমি

দেখি কর্মী নাই। সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যেককে দেখি আমার বন্ধু। তাঁরা আসেন কর্মীদের সহযোগিতা নিয়ে কিছু কাজ করতে কিন্তু কেউই আসে না সহযোগিতা করতে! আমরা কর্মী দিতে পারি নাই। এই ত গেল দেশের অবস্থা। সারতে পাটি কয়েক দিন ধাবৎ এসে বসে রয়েছে অথচ কর্মী নাই। সাপে নুরবে। সবই মন্ত্রীর দোষ, কংগ্রেসের দোষ।

স্ত্রী এসে ধমকালো: এখন খেয়ে দেয়ে ঘুমাও:... মানুষ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখে, তোমার তা নেই বলেই ক্রন্দনরত স্বরে বলে চলে গেল।

তারপর হরিদা! সংবাদ কি?

যে কেন বলেন! আমার সেই মিলের লাইসেন্স।

কর্মীরা যদি লাইসেন্স না পাই...তবে কাজ করা যা টাকা পয়সা লাগে দোব। আপনারা দেশের এই কাজটুকু করবেন না! বল্লাম: সবাইকে তো কর্মী দেখছি। কেউ এলেন কেন আমাকে ধান বিক্রী করতে দেবে না...আমরা কর্মী। কেউ বল্লেন: আমরা কংগ্রেস কর্মী আমাদের গভর্ণমেণ্টকে সাড়ে সাত টাকা মণ ধান দিতে হবে। আমার কথা; সবাই যদি কর্মী তবে কাজের সময় কাউকে দেখি না কেন? বড় মজার ব্যাপার হয় কংগ্রেস পঞ্চায়েৎ গঠন করার সময়। সবাই পঞ্চায়েতের সভ্য হতে চায়, অনেকে হয়েছেও কিন্তু সবাই ভাগজে কলমে। আমার সম্পাদক.....সে.....থাক্, তার কথা বলে আর কাজ নেই। দেখুন আমার কাছে কেউ-ই কাজ নিয়ে আসে না। আসে ব্যবসাদারী বুদ্ধি নিয়ে।

সে দিন বসে রয়েছি...মিলের একজন মালিক এলেন। কি ব্যাপার! দেখুন না আই, এর ব্যবহার। আমার মিল ধরে—পারমিট দিচ্ছে না। চাই টাকা...খালি ঘুষ...।

মিল মালিকের বয়স ষাট বছরের কাছাকাছি। গায়ে একখানি চাদর। নগ্ন পা। ক্ষীণ চেহারা। চোখের দৃষ্টি কৌটিল্যের প্রতীক। বড় বিনয়ী। বিনয়ের ছাপ অন্তরের নয় এটা লোকটীকে দেখলে বোঝা যায়।

ইয়া...বাবু.. মিলটর পারমিট করিয়ে দিন। বল্লাম আমি তো পারমিট দেওয়ার মালিক নই। তা ছাড়া... আপনার মিলের বিরুদ্ধে জনসাধারণের দুরন্ত অভিযোগ।

দেখুন...সেদিন একটি মেয়ে বলে: বাবু ধন্য আপনাদের কংগ্রেস আর সিগারেটের গুণ। অমুকের কলে ধান ভানাতে গেলাম...বাড়ীতে কচি দুধের ছেলে... কর্ত্তা মাঠে...। কখন গেছি...দুপুর থাকতে।" কোটাল্কি-দের ধান ভানছে...বল্লাম...বাড়ীতে দুধের ছেলে...সন্ধ্যে হ'য়ে এলো...আমারটা আগে ভানিয়ে দিন্ না। বলে কি জানেন...এত যদি দুধ খাওয়ানোর তাড়া বাড়ীতে দুধ খুলে রেখে আস্‌তে পারনি।

এক কাজ করুন. সেই মেয়েটির কাছে মাপ চান। আমি আই, এ কে, বলে দোব। ভদ্রলোক ধনী হয়েছেন। ধনের আভিজাত্য নির্বনীর ঘরণীর মর্যাদা বোঝে না। ভাবলাম আশ্চর্য গ্রন্থিরা। যেদিন শুনেছিলাম সেদিন রাগে স্থির থাকতে পারিনি। আজ সুযোগ মিলেছে।

মিল মালিক গরীবের কাছে মাপানত করতে ঘৃণাবোধ করলো। কিছু সময় পর বলে বসলো: বাবু, পান খাওয়ার জন্য পাঁচটী টাকা। বৃদ্ধ কি বলা যায়। অতি বিনয়ের ভান করে বল্লাম: পাঁচ টাকায় কি হবে!..... আজ্ঞে...এখন মিলে আগের মত আয় নেই; ঘরটী... বল্লাম: পান খেতে লাগে এক পয়সা...।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কয়েকজন বল্লেন "এতে কি হয় একটী শ"...। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ বল্লেন: তা হলে আমার সব কাজ হ'য়ে যাবে?

ভাবলাম এ কি ব্যাপার। সামান্য পারমিটের জন্য এক'শ টাকা দেবে! এক'শ টাকার মূল্য কি কিছুই নয়! মেয়েটীর কাছে মাপ চাইলেই তো চুকে যেত। এখন তামাসা দেখা যাক্। বল্লাম: এক'শতে হবে না। এক ভদ্রলোক বল্লেন: দেড়'শর কমে হয় না। বহু কষ্টে বল্লে: আচ্ছা।" বল্লাম: যখন দেড়'শ টাকা দিতে পারেন তখন আড়াই'শ টাকা দিতে পারেন। না হয়ত কংগ্রেসকে পান খেতে "মটর বাইক" দিন্...আরে ধনী ব্যক্তি আপনি।

তখন রেগে উঠলেন : বল্লেন : মশায় টাকায় কি না হয়, কয়দিনের ব্যাপার। বল্লাম : টাকা যখন আপনার আছে তখন—দুই হাজার টাকা লাগবে। ভদ্রলোক রেগে উঠে গেলেন। সবাই হাসলাম। ভাবলাম একটু নতি স্বীকার কিছুতেই করবেন না। কয়েকদিন পর শোনা গেল ভদ্রলোক রাষ্ট্র করেছেন—আমি বাইক ঘুষ চেয়েছি। ভাবলাম ভগবান এঁদের অর্থ দিয়েছেন কিন্তু শিক্ষাদান করেন নি। তাই হরিদ্বা। চারিধারে কলের এক ব্যাধি ধরেছে। ধান কল ছাড়া কি আর কোন কারখানা করা যায় না। ছুঁচ তৈরীর কারখানা করুক না কেন? ধান কলের অন্ত কোটাস্তির ব্যবসা বেশী চল্‌ছে। আমার কথাবার্ত্তা শুনে হরিদার মন ভেঙ্গে গেল।

রাত্রি এগারোটা। খাওয়ার বন্দোবস্ত হলো। স্ত্রী পাশে বসে ..ভাত, কপির তরকারী, মাছের ঝোল, সীম আলু সেদ্ধ বড়ি ভাজা...মাছ ভাজা...। এক মনে খেয়ে চলেছি...। হ্যাঁগা তরকারী কেমন হয়েছে...?... ভাল...। হ্যাঁ...অশ্বিনী বা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি!

কি মূর্খ...। কথার সামঞ্জস্য নেই। স্ত্রী রাগত ভাবে বল্লে কি বল্লে!...দাঁড়াও লিখ্‌ছি...একটু খোঁজ নিতে অপরাধ।

ফট্ করে বলে বসলাম...মূর্খ তুমি নাকি দোকানদার...।.. কেন দোকানদার কিসে...?

বল্লাম : যে কাপড়খানা এনেছি···সেখানা তোমাকে মানাবে না। অমনি আনন্দ...। বল্লে ..তোমার আতপ চালের ভাত—ভাল লাগে নিশ্চয়। হ্যাঁ তারপর কি বল্লে?

রক্ষা পেলাম। এইবার সৌন্দর্য্যের অধিকার সব দাম চাপা দিতে চায়। দোকানদার বল্লে : মশায় আজ কাল এই ধরণের কাপড় একচার চলেছে।...বেশীর ভাগ... কলেজের মেয়েরা!

স্বামীর মুখে স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের বর্ণনা শুনে আরো উল্লাস ...বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না। বল্লাম : মশায়—কলেজ গার্ল নয়...আমার গ্রামের ঘরের স্ত্রী—তা ছাড়া গায়ের বর্ণ "quink"—permanent. এখন কাপড় মানাবে তো।

রেগে আগুন। আমি যদি সুন্দর নয় কেন যে করা... চাও কলেজের মেয়ে বে' করতে। তুমি আমাকে দেখতে পার না।

এখন "উল্‌টো বুঝ্‌লি রাম। যাই হোক্ তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠলাম। পারিবারিক জীবনের কলহের অবসান ঘটলো আহারান্তে।

এসেই বিছানায় আশ্রয় নিলাম। রাতে গভীর নিদ্রা সরস্বতী প্রেস...। রসিকদা বলছেন আর কেন, এবার ছাড় সব। বি, পি, সি, সির গোলমাল কিছুতেই মিট্‌বে না। পঞ্চায়েৎ কমিটি গঠনের List নিয়ে মন্মথ বাবু হাজির। মন্মথ বাবু...আমার List—List নয়, আসল কর্ম্মিদের নিয়ে কংগ্রেস করছেন তো! দেখা যাবে...কি ভবাণী বাবু ...আমার বাড়ীর ডাক্তার···সেই ভাগ্য তার জামাতাকে নবীন বাপুরার মিটিংয়ে প্রধান অতিথি করেছি। ...রাম বাবু...নীরব কর্ম্মী.. তবু তাঁর আসন হলো না.. হরেন বাবু তো ব্যাঘ্র ক্ষত্রিয় সমিতির সভাপতি অতএব তিনি communal. বলিহারী communalism এর ব্যাখ্যা আপনার...। ভবাণী বাবু...আমার বাড়ীর ডাক্তার... দেখা যাবে হাসপুরে কাদের আসন...আমাদের কর্ম্মিদের না...আপনার বলেই...টেবিলে চাপড়...। উহঃ হাতে ভীষণ লাগলো। স্ত্রী তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। কি যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলো : কি হোল?···কেন...টেবিলের বাতি উল্‌টে গেছে। দেশলাই টা চুলোয় গেল বুঝি··· হত আপদ···।

বাতি জ্বাললো। রাগের চোটে টেবিলের সব উল্‌টিয়ে দিয়েছি। হাতের ছাল উঠেছে। কি ব্যাপার...। বল্লাম—সব ঘটনা।

রাগে অস্থির। বল্লে : এবার তুমি কলকাতা যাওয়ার নাম ক'রো দেখি কখনো! যত বলি...সব ছেড়ে দাও। রাতে ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। আমাকে জ্বালালে। অসুখে পড়লে তুই মর।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। স্ত্রী বল্লে : তোমার স্বদেশীর জ্বালায় অস্থির। সকালে উঠেই একটু ঘোরাঘুরি। মাঠে ধান পড়ে। লাভের বন্দোবস্ত রাখতে হবে। দেশের

কাজ শেষের কাজ ক'রে নিজের ঘরবস্তা। কফি ক্ষেতের ধারে ঝুপরা, এসে হাজির। দু'জনে মিলে কফি ও আখু লাগিয়েছি। গ্রামেই বাড়ী। বড় পরিশ্রমী এবং স্পষ্ট বক্তা। বল্লে: এ বছর কফির দাম পোষাবে না। চা পান করে বসেছি ...গ্রামের ধান ঝাড়তে সুরু করেছে। সেবাদল কর্মি সতীশ এক বস্তা ধান এনে হাজির করলো। সাথে রয়েছে একটী যুবক। পাশের গ্রামে বাড়ী। বয়স বছর আঠারো। লম্বা চওড়া...স্বাস্থ্য অটুট। মাথার চুল গুলি ওল্টানো। চোখ দুল্ দুল্ করছে।

বলতে লাগলো বাবু! কাল রাতে পূর্ণ মাঝী ভরত পাইন এবং অন্যান্য কয়েকজন কর্ম্মি রাতে গিয়ে আমাকে মেরেছে এবং একটী মেয়েকে পিটেছে; তার গহনা ছিনিয়ে নিয়েছে। সারারাত আট্‌কে রেখেছিল। বল্লে: সেবাদলের লোক কাল বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন বাবু আমরা থানায় যেতে চাই।

দেখতে দেখতে একটী পঁচত্রিশ ছত্রিশ বছরের মেয়ে হাজির হলো। পরনে পেড়ে কাপড় ..বিধবা...হাতে চুড়ি গায়ের রং কালো...। পান দোক্তায় দাঁত গুলোকে ঝিঙ্গে বীচি করে ফেলেছে।

এসেই কেঁদে ফেল্লে: বাবু! আমাকে মেরে রাখেনি। কেন মেরেছে!...মনে মনে দুঃখ হ'লো...পাষণ্ডের দল মেয়েটাকে মেরেছে কেন?

পাইনের বড় ভাই আমাকে কলকাতায় নিয়ে রাখে। সেখান থেকে এনে পাঁচ বছর ধরে বাড়ীতে রাখে। সেদিন মারা গেল। বাড়ীতে রয়েছি তার ভাইও থাকে। এই লোকটী আমাদের বাড়ীতে থাকে! হঠাৎ পূর্ণ মাঝী গিয়ে মার ধোর করে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলে: এর বিচার চাই।

নিশ্চয় বিচার করবো। আচ্ছা আজই notice করছি।

শ্যামদা বল্লে: ঠিক করেছে। ঐ মেয়েটা ঐ ছেলেটাকে রেখেছে। মেয়েটা পাইনের সংসার নষ্ট করে দিবে। কত ছেলের সর্ব্বনাশ করেছে বলা যায় না। ঐরূপ চরিত্রের শাস্তি হওয়া কর্ত্তব্য।

ভাবলাম: আমাদের ধন্দ কাজ। যত রাজ্যের আপদ এইখানে। স্ত্রী এসে বল্লে: তোমার কাজের বলিহারি। গ্রামে গ্রামে মদ চোলাই হচ্ছে। সবাই মরণের ছুচ্ছে—এর জন্য চাই শিক্ষা। তা দূর করার চেষ্টা কর। নিজের কাজে যাব ভাবছি: বাবু আছেন। স্ত্রী বলে আছেন। দেখুন: আমি যে করবো না। ছোট ভাই কলকাতায় হোটেল করত। মাড়োয়ারীর টাকা চুরি করলো। হ'লো বড় লোক। অনেক জেরা-জেরি...কি বলবো...। গ্রামের মাথা মাথা লোক বললো...ঠিক করলো স্ত্রীর নামে বিঘা-আড়াই জমি দেবে। সেই ভাবে যে...। প্রতি বছর মোটা ধান দেয়। আজ গিয়ে বল্লাম সব ধান যে...। অমনি...আপন ছোট ভাই...গালাগালি ...তার...এই দেখুন না মার...বলেই কেঁদে ফেল্লে। গায়ের জামা খুলে মারের দাগ দেখালে। গেলাম বলাই বাবুর কাছে তিনি বল্লেন: কোটে যান। গরীবের জন্য কংগ্রেস কিন্তু দেখছি তা নয়। বিরক্ত লাগলো: এর বিচার কি করবো। বুঝিয়ে দিলাম: আচ্ছা শীঘ্র বিচার হবে।

হ্যাঁ! বাবু বড় লোক সে ভুল করুক...কিন্তু আমার পাঁচ কাঠা জমি...যাবে কেন? একটী বৃদ্ধার অভিযোগ। আচ্ছা কাণ্ড! আমি তার কি করবো!... যাঃ...আপনারা করবেন না...। বল্লাম বলে দোব।

...বাবুর কাছে এলাম, বলেই এক বৃদ্ধ প্রণাম করলো। বল্লাম: বাঁচাতে আপনাকে গেলাম...কত টাকা ঘুষ আমাকে দিয়েছেন...এরূপ প্রচার করেছেন।

ঘড়্‌ঘড় করে বলতে লাগলো...না বাবু...না। আমি ঠাট্টা করেছি। আপনার পায়ের তলায় রয়েছি। কি নির্বোধ এরা। চালের কারবার করতো ধরা পড়েছে... আর আমাদের দোষ।

নিজের গ্রামে বেরুনো হ'লো। পৈতৃক ভিটার ভগ্ন স্তূপের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। বাল্যের বহু স্মৃতি হু-হু করে মনে পড়ে যায়। স্নান বাঁধানো ঘাট—ঘাট সারাবার অযোগ্য। বড় পুকুর কচুরীপানায় ভর্ত্তি জ্ঞাতিরা সেই পুকুরে স্নান করে তবু জ্ঞাতি বিরোধের জন্য পানা তুলবে না। বাগান খানা গাছে ভর্ত্তি। নারকেল গাছ গুলোতে

ডাব নেই। পাড়ার লোক সমস্ত বুঝে এদার ওদার করেছে।

আম গাছের ডগায় বৌমাছির গুঞ্জন। মাঝে মাঝে কাঠ ঠুক্‌রো পাখীর রব আর ঘু-ঘুর ডাক। পুকুরে পান কৌটি ডুব মারছে···আর তার কোন শত্রু এলো কিনা ইতস্ততঃ চারদিক দেখে নিচ্ছে। বাগানের মাঝ দিয়ে মাঠে নামার রাস্তায় এসে পড়েছি...দূরে মায়ের চিতা লক্ষ্য পড়লো···ঐ খানে আমার গুরুজনেরা সবাই রয়েছেন। আমি ওঁদের শ্মশানে স্থান পাবো না হয়ত। ধীর স্থির চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলাম।...আজ আমি কার জানি অভি-শাপের ফলে বাস্তুহারা। আজ যে বাস্তুহারা তার জন্য কেউ তো সাহায্য করছে না অথচ অন্যের চিন্তায় আমি ব্যস্ত। আমার গুরুজনদের শ্মশান। চোখে জল এলো। প্রত্যেকের সমাধিকে প্রণাম করতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বকুল গাছ থেকে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। শীতের বেলায় ঘামের পেলাম না। শ্মশান ছাড়তে ইচ্ছে করছে না।

মেজ খুড়ী.. এসে বল্লেন: এখানে! হ্যাঁ, দেখ্‌ছি শ্মশান গুলো। মেজ খুড়ীর বগল দাবায় এক বোঝা আলানি কাঠ। মনের কথা ধরে নিয়েছে। বলতে লাগলো: উহু! কেউ রইলো না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস আপনা হ'তে বেরিয়ে এলো। খালি অন্তরবেদনা আমি প্রচুর অভাবের মাঝে রয়েছি। ছাড়লো না বাড়ীতে এনে বসালে।

দেখছি বাবা জামাইয়ের আচার। বিয়ে অবধি এক খানা কাপড় দেয়নি মেয়েকে···। ঘর জামাই করলাম আমাকে চারটি খেতে দেবে...সব ভুয়ো।

ধন্ত মনের দুঃখের কাহিনী শুনতে মন চাহিল না। উঠে পড়লাম মাঠে নেমেছি কাটা ধানের নাড়া গুলো ছুতোয় লেগে পট্‌ পট করছে। শীতের বেলায় পরমায়ু দীর্ঘ মনে হচ্ছে। রোদে যেন বিকট তেজ। এক মনে হাটছি—এক ঝাঁক শামঘোল সামনে এসে বসলো—ভয়ই করলো না।

বসন্তপুর গ্রামে এসে পড়লাম। এই জায়গায় স্কুল ছিল। সামনে বংশাবতী নদীর কোল ঘেঁষে শিব মন্দিরের নাটমন্দির প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ধাক্কা সহ্য করতে পারেনি।

নদীর বাঁধে উঠলাম। শীতে নদীতে জল থাকে না। এক হাঁটু জল। দেখছি—সতীশ, ডাক্তার বলাই পাত্র, কানাই মাঝি, হেলথ অফিসার নদীর জলে দৌড়া-দৌড়ি করছে।

আমাকে দেখেই—বল্লে: তিন মাইল ধরে নদীর জলে পাউডার দেয়া হোল।—বহু মরেছে। আর পোড়ানো যাচ্ছে না—এমন কলেরা কখন দেখিনি।

সব ভুলে গেলাম। ডাক্তার বলাই পাত্র ছাড়বে না। মন যেতে চায় না। অবসাদ—অবসর চাই বলাই। বলাইয়ের মন যে ভেঙ্গে পড়লো কথা শুনে।

আবার আহ্বান—চল বলাই। গিয়ে দেখি একটী রোগী ছট্‌পট্‌ করছে। হাত-পায়ে আলা—খালি একটানা কান্না—বাঁচান ডাক্তার বাবু! বেলা তখন তিনটে। বলাই "স্যেলাইন" দিলে। কি করা যায়! রোগ যন্ত্রণা দেখে চোখে জল এলো। লোকটী বাঁচতে চায়—অথচ কি ক'রে বাঁচানো যায়—।

হঠাৎ পাশের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠ্‌লো। তাড়াতাড়ি গেলাম—সব শেষ। দেখতে দেখতে তিনটী খতম হোল। তিনটীর সৎকার করতে হবে। পাড়ার কেউ লাগবে না। অগত্যাদ্য নিজেরা পুঁতে দিলাম। রাত্রি আটটায় ফির্‌ছি—কংগ্রেস অফিসের কাছে কান্নার রোল। এসে দেখলাম—একটী গরীব স্বর্ণকার মারা গেছে। তার স্বজাতি পোড়াবে না। কংগ্রেস সেবাদল অগতির গতি। আনন্দ হোল। বল্লাম: বলাই ভাই—এইবার পার্বতীপুরে বাঁধ ভাঙ্গার জন্য যাদের ঘর বাড়ী পড়েছিল তাদের সাহায্যের বিষয় ডি, এম কে লেখা যাক। বলাই বসে রয়েছে। চা এসে হাজির।

একজন গ্রামের লোক এসে বল্লে: কি গো তোমরা খুব টাকা রোজগার করছো-ধান চাল ধরে। বলাই বেগে উত্তর দিলে বেশ করেছি; দেখছেন দেশের কাজ। ধন্য কংগ্রেসের কাজ। যত বদনাম আসুক—আমরা লেগে থাকবই।

চীন ও তিব্বতের রাজনৈতিক বিবর্তন

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

স্মরণ থাকতে পারে, বিগত ১৯১১ খৃষ্টাব্দে চীনে যখন জাতীয় বিপ্লব সুরু হয়েছিল তখন তিব্বত সুস্পষ্টভাবে নিজের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। বিপ্লবী চীনা সরকার কিন্তু তিব্বতের স্বাধীন মর্য্যাদা স্বীকার করতে কিছুতেই রাজী হলেন না।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বত সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটেন এবং চীনের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। সিমলায় চীনা এবং বৃটিশ প্রতিনিধিবর্গের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই চুক্তিটি সেই সম্মেলনেরই প্রত্যক্ষ ফল এই চুক্তিতে তিব্বতের স্বায়ত্ত-শাসনকে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তিব্বত চীনের অন্যতম প্রদেশ হিসাবে গণ্য হবে কিনা সেটা চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি সেহেতু চীনা সরকার চুক্তিটি অনুমোদন করা সমীচীন মনে করেননি। অর্থাৎ চীন কিছুতে তিব্বতের উপর নিজের সার্বভৌম অধিকার পরিত্যাগ করতে রাজী নয়। যতদিন পর্যন্ত কুয়োমিটাং সরকারের কর্তৃত্ব বজায় ছিল ততদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চীন তিব্বতের উপর কর্তৃত্ব করে এসেছে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে যদিও চীনা সরকার কর্তৃক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের চুক্তি অনুমোদিত হয়নি তথাপি বৃটেন তিব্বতের উপর চীনের প্রভুত্বের বিরোধিতা করেনি। বরঞ্চ বৃটেন প্রকৃতপক্ষে এই প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে।

লাসা থেকে বিগত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে একটা বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল। সে বিবৃতিতে দেখা যায়, তিব্বত সমস্ত বিদেশীয়দের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তিব্বত আগামী বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। সুতরাং বিদেশীরা যদি তিব্বতে প্রবেশ করে অথবা বিদেশীয়দের যদি তিব্বতে বসবাস করবার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে তিব্বত আগামী বিশ্বযুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পাবে না। তাই তিব্বত সরকার বিদেশীয়দের জন্য তিব্বত বন্ধ করে দেওয়া সমীচীন মনে করেছেন। ফলে কুয়োমিটাং সরকার তিব্বতে যে মিশন পাঠিয়েছিলেন সে মিশনের উপর বহিষ্কার আদেশ জারী করা হয়েছিল। তিব্বতে চীন-বিরোধী মনোভাব খুব প্রবল। এমনকি তিব্বতের কোন কোন রাজনৈতিক মহল এই রকম অভিমতও প্রকাশ করেছেন যে তিব্বতের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে যোগদান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু রাশিয়া চীন-তিব্বত বিরোধে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রয়েছে। তাছাড়া চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে রাশিয়া কোন নীতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়, কারণ চীনা কম্যুনিষ্টদের কাছ থেকে রাশিয়া সিংকিয়াং প্রবেশে কতকগুলো সুবিধা লাভ করেছে।

চিটাই কাংসু এলাকায় প্রায় একলক্ষ তিব্বতবাসী আছে। চীনের কম্যুনিষ্ট প্রভাবান্বিত সেন্ট্রাল পিপলস্ গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিল চিটাই—কাংসু প্রদেশে এই সব তিব্বতবাসীদের নিয়ে একটা দালাই-লামা বিরোধী সরকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন। এখানে একটি জিনিষ বিবেচনা করবার আছে। সে জিনিষটি হচ্ছে, চীনা কম্যুনিষ্টরা তিব্বতের স্বায়ত্ত-শাসনকে স্বীকার করে নিতে কখনই অনিচ্ছা প্রকাশ করেননি। তবে তাঁরা যে জিনিষটির উপর জোর দিচ্ছেন সে জিনিষটি হল এই যে তিব্বতকে চীনের অন্যতম প্রদেশ হিসাবে গণ্য করতে হবে। বিগত ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিকিং এ যে পিপলস্ পলিটিক্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে কনফারেন্সে এই মর্মে একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে তিব্বতকে চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। শুধু তাই নয়। আজ সেন্ট্রাল পিপলস্ গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিল এমন একটা পরিকল্পনা তৈরী করেছেন যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল দালাই লামার কর্তৃত্বের অবসান করা।

ঝড়ের পরে

আর্নিষ্ট হেমিঙওয়ে

অনুবাদক—শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ কিছু নয়, সামান্য মদ মিশানোর কথা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। আমি পিছলে পড়ি, আর সে আমার বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ব'সে দুহাত দিয়ে আমার গলা টিপে ধরে। আমাকে সে যেন খুন ক'রতে চায়। আমি কিন্তু পকেট থেকে ছুরিখানা বার ক'রতে সারাক্ষণ চেষ্টা করি। তাকে ছুরি মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাই। প্রত্যেকে এত বেশী মাতাল যে আমাকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার মত ধরে কেউ নেই। সে আমার গলা টিপে ধ'রে মাথাটাকে কেবল মেঝের উপর ঠুকে যায়। আমি কোনো রকমে ছুরিটা বার ক'রে খুলে ফেলি এবং তার হাতের মাংস-পেশীর উপরে ছুরি মারি। তার হাত কেটে দুফাঁক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সে ছেড়ে দেয়। ইচ্ছা থাকলেও আর সে আমাকে ধ'রে রাখতে পারতো না। তারপর সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে এবং হাত ধ'রে কাঁদতে সুরু করে।

"অমন ক'রে আমার গলা টিপে ধ'রেছিলি কেন হতভাগা?"—

তাকে হয়ত আমি খুনই ক'রে ফেলতাম। তারপর এক সপ্তাহ ধ'রে চোক্ গিলতে পর্যন্ত পারিনি। আমার গলায় ভীষণ চোট লেগেছিল।

উঠেই আড্ডার বাহিরে পালিয়ে আসি। তার সঙ্গে তখন অনেক লোক, তাদের মধ্যে কেউ আবার আমাকে তাড়া করে। একটা মোড় ফিরেই আমি ডকের রাস্তায় পৌছাই। পথে একটা লোক চেঁচিয়ে বলে, রাস্তার ওদিকে কে কাকে খুন ক'রেছে।

"কে খুন ক'রেছে?"—জিজ্ঞাসা করি।

জানিনা কে ক'রেছে। তবে লোকটা একেবারে মরে গিয়েছে।" তখন আঁধার ঘনিয়ে এসেছে এবং রাস্তার উপর বৃষ্টির জল জমে আছে। আলো নাই। কোথাও একটা জানালাও খোলা নাই। সহরের মধ্যে নৌকা ঢুকে পড়েছে। গাছপালা সব উপ্‌ড়ে পুড়ে আছে, ঝড়ে সব কিছু উলটে পালটে গিয়েছে। একটা ছোট ডিঙি পাই এবং সেখানায় চ'ড়ে ম্যাঙ্গো-টি-তে আমার নৌকায় পৌছাই। আমার নৌকার কিছুই হয়নি বটে, তবে নৌকাখান জলে ভরতি। জল ফেলতে আরম্ভ করি, নানাভাবে জল ছেঁকে ফেলি। চাঁদ দেখা দেয় মেঘের আড়াল থেকে। আবহাওয়া তখনও ভালো না থাকলেও আমি নৌকা ভাসিয়ে দিই এবং ভোর হ'লে বেশি যে আমি ইষ্টার্ণ হারবার ছাড়িয়ে এসেছি।

ঝড় বেশ ভালই হয়েছিল, তাই। আমার নৌকাই প্রথম বাহির গাঙে আসে। আর এ রকম জলের চেহারা তোমরা কখনও দেখনি। চুণ-জলের মত সাদা তার রঙ্। তাছাড়া জলের কিনারা কোথায় তোমরা তা ঠিক ধরতে পারতে না। বালু-বেলার উপর দিয়ে একটা খাল চ'লে গিয়েছে। গাছপালা আরো কত কি ঝড়ে এসে প'ড়েছে এবং বালির উপর স্রোত সবেগে ব'য়ে যাচ্ছে। জলের রঙ্ যেন খড়ি-গোলা। তা ছাড়া সেই স্রোতে নাই কি? আস্তগাছ, ভাঙা ডালপালা, মরা পাখী সব ভেসে যাচ্ছে। পেলিক্যানগুলো গিয়ে ডাঙায় ভিড় জমিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে আরো কত রকম পাখী যে আছে তার ঠিক নেই। ঝড় আসার মুখেই নিশ্চয় তারা ডাঙার দিকে পালিয়ে এসেছিল।

সারাটা দিন সাউথ-ওয়েষ্টকীতেই কাটিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু কেউ আমার খোঁজে আসেনি। আমার নৌকাই সকলের আগে এদিকে এসেছিল। দূরে একটা মাস্তুলের কাঠ দেখে বুঝলাম, কোনো জাহাজ ডুবেছে। সেই দিকেই এগিয়ে যাই। জাহাজটা খুঁজে পেলাম। একটা তিন মাস্তুলওলা ছোট্ট জাহাজ। মাস্তুলের গোড়াটা জলের উপর থেকে দেখা যায়। গভীর জলে ডুবেছিল ব'লে, তার কাছাকাছি কিছুই আমি দেখতে পেলাম না। চারিপাশে খুব খানিকটা খুঁজি। ঘুরে ফিরে দেখি, পাওয়ার মত কিছু আছে কিনা। আর থাকলে তা আমারই পাওয়া উচিত। সেখান থেকে চড়ার দিকে এগিয়ে যাই। অনেক-

খানি দিয়েও কিছু চোখে পড়ে না। চোরা বালির কাছা-কাছি এসেও কিছু দেখতে পাই না। তার পর দূরে রেকের লাইট চোখে পড়তেই অনেকগুলি পাখীকে উড়তে দেখি। পাখীগুলো যেন কিছু খুঁজছে আর চেঁচাচ্ছে। সেই দিকে কি আছে দেখতে এগিয়ে যাই। পাখীগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সেখানেও মাস্তুলের কাঠের মত একটা কিছু আমার চোখে পড়ে। কাছে যাওয়া মাত্র পাখীগুলো উড়তে থাকে। আমাকে ঘিরে চেঁচামেচি করে। জল পরিষ্কার এবং জলের উপর একটা মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। আরো কাছে এসে জলের মধ্যে কিছু দেখতে পাই না। তারপর ঠিক তার উপরে উঠে দেখি একখান প্রকাণ্ড বড় জাহাজ ডুবে আছে। নৌকায় তার উপর দিয়ে ভেসে যাই। মাথাটা জলের নীচে ডুবে থাকলেও জাহাজখান এক পাশে কাত হ'য়ে ছিল। পোর্ট হোল্ সব বন্ধ, গোল কাঁচ-গুলো আমার চোখের সামনে চক চক ক'রে উঠে। আমার জীবনে এত বড় জাহাজ দেখিনি কখনও। জাহাজটার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে যাই এবং নোঙর দেখি। সেটা জাহাজের ডেক-এর উপর পড়ে। তারপর লগি মেরে এগিয়ে যাই আরো খানিকটা। পাখী গুলো তখনও আমাকে ঘিরে উড়ে বেড়ায়।

সমস্ত পোর্ট হোল্ বন্ধ; জাহাজ খানার উপর দিয়ে যতদূর যাই—একটাও খোলা দেখি না। তবে উলটো দিকে নিশ্চয় কোথাও ফাঁক আছে, যার মধ্য দিয়ে নানা রকম জিনিষ বেরিয়ে জলে ভেসে যাচ্ছে। কি সব জিনিষ সেগুলি বলা কঠিন। কারণ একটাও সম্পূর্ণ নয়, সব ভেঙে টুকরো হ'য়ে গেছে। আর সেইগুলির খোঁজেই পাখী জুটেছে এত। একসঙ্গে এত পাখীও কখনো দেখা যায় না। তারা পাগলের মত চেঁচিয়ে আমাকে ঘিরে ধ'রেছে।

এইবার সব পরিষ্কার দেখতে পাই। জাহাজখানা কোথায় শেষ হ'য়েছে বুঝতে পারি। জাহাজটা দেখে জলের নীচে মাইলটাক লম্বা মনে হয়। পরিষ্কার সাদা বালির উপর কাত হ'য়ে সেখানা ডুবেছে এবং মাস্তুলটা জাহাজের সামনের মাস্তুল কিম্বা ওই ধরণের কিছু একটা হতে পারে। তার মাথাটা জলের বেশী নীচে ছিল না। জাহাজের নাম যেখানে লেখা আছে, তার উপর দাঁড়ালে এক গলা জল হবে। কিন্তু তার পাশের পোর্ট হোল্‌টা প্রায় বারো ফুট জলের নীচে আছে। লগি দিয়ে সেটা কোনো রকমে ছোঁওয়া যায়। আমি তা সত্ত্বেও সেই কাঁচ খান ভাঙতে চেষ্টা করি। কিন্তু কাঁচখান বড় শক্ত। নৌকা থেকে একখানা বেঞ্চ এনে লগিতে বাঁধি। তবুও কাঁচ ভাঙে না। আমিই প্রথম এই জলমগ্ন জাহাজখান দেখেছি, সকলের আগে আমিই এর কাছে এসেছি। কিন্তু আমি কিছুতেই জাহাজের নীচে ঢুকতে পারছি না। এই জাহাজের মধ্যে কম করেও পঞ্চাশ লাখ ডলারের মালপত্র আছে, আমি ঠিক জানি।

কত টাকার মাল এই জাহাজে থাকতে পারে, ভেবে কূল কিনারা পাইনা। পোর্ট হোলের কাছে একটা কিছু দেখতে পেলেও কাঁচের মধ্য দিয়ে ঠিক বুঝতে পারি না। লগি দিয়েও কোনো কাজ হয় না। কাপড় চোপড় খুলিয়ে রেখে আমি অবশেষে ডুব দিই। হাতে বেঞ্চখান নিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে জাহাজের কাছে যাই। পোর্ট হোলের কিনারা চেপে ধ'রে কাঁচের ওপাশে একটা মেয়ে মানুষকে ভাসতে দেখতে পাই; তার চুল চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি ঠিক কাঁচের নীচে ভাসছে। বেঞ্চ দিয়ে কাঁচের উপর জোরে জোরে আঘাত করি। শব্দটা কানে বাজে বটে, কিন্তু কাঁচ ভাঙে না। শেষে ভেসে উঠতে বাধ্য হই।

ডিঙিটার পাশ ধ'রে জলের উপরে এসে হাঁফ ছাড়ি, খানিকটা দম নিয়ে আবার ডুব দিই। ডুব সাঁতার দিয়ে পোর্ট হোলের কাছে যাই এবং হাত দিয়ে তার কিনারা চেপে ধরি। তার পর আমার সব শক্তি যুগিয়ে বেঞ্চ দিয়ে কাঁচের উপর আঘাত ক'রতে থাকি। কাঁচের ভিতর দিয়ে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই,—মেয়েটা একেবারে ওপাশে ভাসছে। তার মাথার চুল খোঁপাই ছিল হয়ত, কিন্তু এখন জলের নীচে চুল ছড়িয়ে গেছে। তার হাতের আঙুলে কয়েকটা আংটি দেখতে পাই। ঠিক কাঁচটার ওপিঠে

মেরেটা ভাসছে। আবার রেক বাগিয়ে কাঁচের উপর ঠুকতে থাকি; কিন্তু কাঁচখান একটু কাটেও না। উপরে ভেসে উঠতে উঠতে মনে হয়, আর বুঝি হলো না। দম এসেছে ফুরিয়ে তাই তাড়াতাড়ি জলের উপরে ভেসে উঠি।

আবার একবার কাঁচটা ভাঙতে চেষ্টা করি। জোরে জোরে কয়েকটা আঘাতের পর কাঁচটা মাত্র একটু ফেটে যায়। উপরে ভেসে উঠে দেখি, নাক দিয়ে খুব রক্ত পড়ছে। জাহাজটার মাথায় দাঁড়িয়ে কোনো ক্রমে জলের উপর মাথাটা তুলি পায়ের নীচে জাহাজের নামের অক্ষরগুলো পড়ে। খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে, সোজা মাস্তুলটার দিকে সাঁতরে যাই। মাথার তখন ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। সেই মাস্তুলে ব'সে ব'সে একটু আরাম করি এবং জলের নীচে কাঁচটার দিকে চেয়ে থাকি। এত রক্তপাত হয় যে বার বার নাকটা ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপর চিতপাত হ'য়ে মাস্তুলটার উপর শুয়ে পড়ি এবং রক্ত বন্ধ করার জন্যে আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরি। সামনে আকাশের দিকে চাইতেই কম করেও লাখ খানেক পাখী দেখতে পাই। পাখীগুলো তখনও একইভাবে উড়ছে আর চেঁচাচ্ছে।

রক্ত বন্ধ হলে আর একবার কাঁচটা দেখে নিই। নৌকায় উঠে রেকের চেয়ে ভারী একটা কিছু খুঁজি বটে, কিন্তু পাই না। কিছুই নাই, একটা স্প্রিং তোলা আঁকশী পর্যন্ত নাই। ফিরে যাই আবার। জল কাঁচের মত পরিষ্কার এবং শান্ত। বালির উপর যা কিছু আছে সব পরিষ্কার দেখা যায়। আশে পাশে হাঙর জুটেছে কিনা খুঁজতে চেষ্টা করি। কিন্তু একটাও চোখে পড়ে না। হাঙর এসে থাকলে দূর থেকেই বুঝতে পারা যায়। জলও যেমন পরিষ্কার, নীচের বালিও তেমনি সাদা ঝিকঝিকে। নোঙর ফেলার জন্যে একটা ভার বাঁধা ছিল ভাঙা মাস্তুলটায়। সেটা কেটে নিয়ে জলে ডু'খতেই চট ক'রে পোর্ট হোলের কাছে এসে পড়ি। কিছু একটা পেচপে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই এবং ভারের টানে জলের আরও নীচে নামতে থাকি। জাহাজের ঢালু পাশ্ দিয়ে আমার পা স'রকে যেতে থাকে। ভারটা হাত থেকে ছেড়ে দিতেই সেটা কোথাও যেন ধাক্কা খায়। জলের নীচ থেকে উপরে আসতে আমার বেশ খানিকটা সময় লাগে। জলের উপরে ভাঙা মাস্তুলটাও চোখে পড়ে না। জোয়ারের টানে সেটা কোথায় ভেসে গেছে। ডুবো জাহাজের উপর দিয়ে সাঁতরে যাওয়ার সময় নাক দিয়ে আবার রক্ত প'ড়তে থাকে। কাছাকাছি হাঙর না দেখতে পেয়ে মনে মনে খুসী হই বটে, কিন্তু ভীষণ শ্রান্ত হ'য়ে পড়ি।

মাথা আমার যেন যন্ত্রণায় ফেটে পড়ে; কোনো রকমে ভাঙা মাস্তুলটা ধরে একটু জিরিয়ে নিই। বিকেল বেলাও প্রায় ফুরিয়ে আসে। আর এক বার রেকখান্ নিয়ে ডুবে নীচে যাই। কিন্তু এবারেও কোনো কাজ হয় না। জলের নীচে রেকটা আরও পাতলা মনে হয়। কাজেই একটা বড় হাতুড়ী না নিয়ে বারে বারে ডুবে কোনো লাভ হবে না জেনে, দড়িতে রেকটা বেঁধে আর একবার চেষ্টা করি। কাঁচটার উপর যত জোরে সম্ভব মারতে থাকি। হঠাৎ রেকখান্ খুলে যায় এবং সেটা কিভাবে নীচে চোরাবালির উপর পড়ে, কাঁচের মত পরিষ্কার জলের মধ্যে, তা স্পষ্ট দেখতে পাই। চোরা বালিতে রেকটা হারিয়ে যায়। আর কি করবো? রেকখান্ গেলো, ভারটাও গেছে। কাজেই নৌকাতে ফিরে না আসা ছাড়া কোনো উপায় নাই আর। মাস্তুলটা আনার মত শক্তি আমার নাই। তা ছাড়া সূর্য্য ওদিকে পাটে ব'সছেন। পাখীগুলোও সব ডুবো জাহাজ ছেড়ে স'রে প'ড়ছে। মাস্তুলটা বেঁধে নিয়ে সামনের পাখীদের সঙ্গে আমিও নৌকা ছেড়ে দিই। ভীষণ পরিশ্রান্ত হ'য়েছি।

রাত্রে আবার ঝড় আরম্ভ হয় এবং পুরো সপ্তাহ ধরে জোর বাতাস বইতে থাকে। ডুবো জাহাজের কথা ভুলতে পারি না। সহর থেকে লোক এসে খবর দেয়, যে লোকটাকে সেদিন মেরেছি, তার হাতখান্ কাটা ছাড়া আর কিছু হয়নি। সহরে ফিরতেই তারা আমাকে দিয়ে পাঁচশো ডলারের জামিন মুচলেকা লিখিয়ে নেয়। এই যথেষ্ট! কারণ আমার বন্ধু বান্ধবদের মুখে শুনতে পাই

একখানা টাঙি নিয়ে আমাকে অনেক। ডুবো জাহাজ থেকে এখানে ফিরে পর গ্রীকেরা জাহাজটা দেখতে পেয়েছে এবং ডুবো জাহাজ ভেঙে ঢুকে সব কিছু নিয়েও গেছে। তারা জাহাজের লোহার সিন্দুকটা পর্যন্ত ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। কত টাকার মাল তারা সেই জাহাজে পেয়েছে, কেউ বলতে পারে না। তবে জাহাজে যা ছিল, সেটা তাদেরই হাতে প'ড়েছে। তারা একেবারে সব সাফ ক'রে দিয়েছে। অথচ ভাঙা ডুবন্ত জাহাজখানা সকলের আগে আমিই দেখেছিলাম। দুর্ভাগ্য ক্রমে তার জন্যে আমার একটা তামার পয়সাও লাভ হয় নি।

যাই হোক, ব্যাপারটা সত্যিই খুব খারাপ। লোকের মুখে শুনলুম, জাহাজটা হাবানা পোতাশ্রয়ের কাছাকাছি ছিল, এমন সময় প্রচণ্ড হারিকেন্ এসে পড়ে। ঝড়ের মুখে জাহাজখানা কোনো রকমেই আর বন্দরে ঢুকতে পারে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন চেয়েছিল ঝড় থেকে জাহাজকে বাঁচাতে; কিন্তু জাহাজের মালিক তাকে তা ক'রতে দেয়নি। কাজেই জাহাজখান ঝড়ের মুখে প'ড়ে বেশী জলে চ'লে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এসে এই চোরা-বালিতে আটকে যায়। হয়ত জাহাজের হালখানা ভেঙে গিয়েছিল। হয়ত ক্যাপ্টেন জাহাজখানকে সামলে নিতে পারেনি। তবে একথা সত্যি যে তারা চোরাবালির খোঁজ রাখতো না। কাজেই বালিতে ধাক্কা খেতে দেখে ক্যাপ্টেন জাহাজে জল প্রবেশের ব্যবস্থা করেছিল, ভেবেছিল তা হ'লে জাহাজখান সোজা ডুবে যাবে। কিন্তু চোরাবালির জন্যে জাহাজটা কাত হ'য়ে ডুবে যায়, আর ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্কে জল ঢুকবার ফলে তাড়াতাড়ি উলটে যায়। জাহাজে নাবিকরা ছাড়াও নাকি সাড়ে চার শো যাত্রী ছিল। আমার মনে হয়, আমি যে সময়ে জাহাজটা দেখেছিলাম, তখন তারা সকলেই জলের মধ্যে ছিল। ট্যাঙ্কগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজখানা উলটে গিয়েছিল। কেউ যে বেরিয়ে আসতে পারেনি, একথা আমি হলফ ক'রে ব'লতে পারি। বয়লারে জল ঢুকলে আর ফাটতে দেরী হয়? ওই যে সব ভাঙা-চুরা জিনিষ পত্র ভেসে উঠছিল জাহাজের ওপাশ থেকে, বয়লার ফাটাই তার একমাত্র কারণ। কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হচ্ছি যে একটাও হাঙ্গর কাছাকাছি আসে নি। একটা মাছ পর্য্যন্ত দেখিনি তখন। অমন পরিষ্কার সাদা বালির উপর মাছ থাকলে নিশ্চয় দেখতে পেতাম।

এখন কত রকম ছোট বড় মাছ সেখানে জুটেছে। জাহাজটার বেশীর ভাগ চোরাবালির নীচে পড়লেও মাছগুলো তার মধ্যে ঢুকে পড়ছে। কত রকম বড় বড় মাছ। এক একটার ওজন দু তিনশো পাউণ্ডের কম নয়, এত বড় মাছ জুটেছে। সময় মত আমরা গিয়ে কয়েকটা মেরে আনবো। জাহাজখান যেখানে ডুবেছে সেখান থেকে রেবেকার আলো দেখা যায়। তা ছাড়া তারা একটা বয়া বেঁধে দিয়েছে। সমুদ্রের নীচে ঠিক চোরাবালির শেষ প্রান্তে জাহাজটা ডুবে আছে। আর মাত্র একশো গজ এগিয়ে ডুবলে অথই জলে তলিয়ে যেত। আঁধারে ঝড়ের মধ্যে প'ড়েও কি ভাবে যে বেঁচে গেলো বলা কঠিন। তা ছাড়া বড় বৃষ্টির জন্যে তারা যে রেবেকার লাইট হাউস দেখতে পায় নি সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ। এ ধরণের ব্যাপার তারা আশা করতে পারেনি। তা ছাড়া কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেন এ দিক দিয়ে জাহাজ নিয়েও যায় না। তাদের পথ পৃথক। তাদের জাহাজে কম্পাস থাকে শুনেছি এবং কম্পাস দেখে দেখে তারা জাহাজ চালায়। সে রাত্রে হয়ত তারা বুঝতে পারে নি, ঝড়ে তাদের কোথায় টেনে এনেছে। আর এমন ভীষণ ঝড়ে পড়লে ঠিক ঠিক ক'রে জাহাজ চালানো কার ক্ষমতা? তবে তারা প্রায় ঠিক পথ ধরেছিল। জাহাজের হাল ভাঙলে ক'রবেই বা কি? তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। বাধ্য হ'য়েই ক্যাপ্টেন ব্যালাষ্ট ট্যাঙ্ক খুলতে হুকুম দিয়েছিল। ঝড়ের ঝাপটে জাহাজ চড়ে ঠেকার পর তাদের অন্য উপায় ছিল না।

তা ছাড়া অমন বড় বৃষ্টিতে জাহাজের ডেকের উপর কোনো প্যাসেঞ্জার নিশ্চয় আসে নি। তারা ডেকের

উপর দাঁড়াতেও পারতো না। জাহাজটা কাত হ'য়ে যাওয়ার সময় জাহাজের মধ্যে নিশ্চয় কান্নাকাটি হৈ চৈ প'ড়ে গিয়েছিল। বালির উপর আমার রেফখান পা'ড়তে দেখলাম। ক্যাপ্টেন আগে থেকে না জানলে এই চোরা-বালির সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ পর্য্যন্ত ক'রতে পারতো না। সে হয়ত ভেবেছিল, তার জাহাজ পাহাড়ে ধাক্কা খায়নি, বালির চড়ে আটকে গেছে। ব্রিজ থেকে সে সব দেখেও থাকতে পারে। জাহাজটা কেন ধাক্কা খেয়েছে, তা বুঝতে তার দেরী হয় নি। বুঝতে পারি না, উল্টাতে কতক্ষণ সময় লেগেছিল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে জাহাজের মেট্ ছিল কিনা কে জানে? আপনারা কি মনে করেন। তারা ব্রিজে দাঁড়িয়ে ছিল না ডেকের উপর এসেছিল? আমার পরে যারা আসে, তারা একটাও মৃতদেহ দেখতে পায়নি। একটা মানুষও ভিতরে ছিল না। কাছাকাছি কোনো মৃতদেহ ভাসতেও তারা দেখেনি। লাইফ বেল্ট প'রলে মানুষ অনেকক্ষণ ধরে ভেসে থাকতে পারে। তারা নিশ্চয় সব মৃতদেহ জাহাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে!

যাই হোক, গ্রীকেরা মালপত্র টাকাকড়ি সব পেয়েছিল। তারা খবর পেয়েই ছুটে এসেছিল নিশ্চয়। জাহাজ থেকে পরিষ্কার সব চেঁছেপুঁছে তারা নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে আসে পাখীগুলো, তারপর আসি আমি। আমার পরে আসে গ্রীক লোকগুলো। কিন্তু পাখীগুলোও আমার চেয়ে বেশী পেয়েছে এই জাহাজ থেকে।

ভারতবর্ষ

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

এই ভারতের কীর্ত্তি-কাহিনী হয়ত কখনো শুনেছ' তুমি
লক্ষ তড়াগ-হ্রদে আবৃত বিশ্বের মহাতীর্থ ভূমি।
পর্ব্বতমালা উন্নত শির, গরজে সিন্ধু চরণ চুমি,
তাওারে ফলে চারুশিলা যার, সুজলা সুফলা মাতৃভূমি।
সার্থক এই নিখিল ভারত, শান্তির ঠাঁই কোথায় আর,
জীবনে-মরণে যুগে যুগে এর চরণে জানাও নমস্কার।

অন্তরে কোথা স্বর্গ-সুষমা ঝরে পড়ে চির অসহ সুখে,
পাখী কোথা গায় মুক্তকণ্ঠে পুরি অমৃত বুকে ও মুখে।
নিত্য সুকল রৌদ্র-বৃষ্টি বিশ্বের প্রাণ যোগায় এ যে,
নহিলে জগত ফিরে যেত বুঝি মৃত্যু-শয়নে পরাণ ভোজে।
বিপুল বীর্য্য অর্য্যের দেশ, এঠাঁই হেলার নহেক' জানি,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিধাতৃ এর চির পবিত্র আঙিনাখানি।
অন্তরে কত আলোকের স্পৃহা, শিল্প-কলায় সে পুরোভাগে,
ইহারি অন্নে জন্মপালিত দাঁড়াবে বিশ্ব ফেলিয়া রাগে!
ইহারি শুভ্র-ধারা পিয়ে পিয়ে করিবে ইহার নিন্দা-গ্লানি,
দেবতা-চোক্ষে সহিবে কি তাহা?
যুগে যুগে কভু হ'বে না জানি।
আচার বিচার কত যে শুভ্র, নাহিক' হিংসা, নাহিক দ্বেষ,
পিতৃভূমি মাতৃভূমি, বল এ মোদের হৃদয় দেশ।
একদা ইহারে নমে যে বিশ্ব প্রাণ-ঢালা পূজা-অর্ঘ্য দানে
দিল সন্মান দেবতার চেয়ে ভালবাসা দিল মহৎ জ্ঞানে।
স্বর্গ সহসা আসিল নামিয়া সব ঋষিদের যজ্ঞ-ধূমে,
এইখানেতেই জন্ম লভিল বিশ্বের রাজা ব্রজভূমে।
এই খানেতেই নিমাই-নিতাই ছুটা'ল প্রেমের বন্যা-ধারা,
ক'জন ভক্ত মেতেছে এমন, বিশ্বে কোথায় দিয়েছে সাড়া!
পবিত্র এর ধূলি-কণা মাঝে কত পবিত্র দিবস রাজে,
তারি' অপরূপ ছায়া-স্মৃতি আজ নয়নে ফুটিছে মহিমা সাজে।
শক্তি সাধক কোথা বাল্মীকি, কোথা ব্যাসরথি ধনঞ্জয়ী,
শক্তিতে যা'র জয়াধিপতি নিল মৃত্যুর বিদায় বাঁশী।
কোথা ধন্বিক, কোথা দুর্ব্বাসা, কোথা সে মহৎ দধীচি হায়!
অসুর কি তাই কসুর পেলনা ইন্দ্রজিতের বন্ধুটায়!
কৃষ্ণের হাতে কবে সে বংশ ধ্বংস হয়েছে চিরতরে,
দেবতা-দৈত্যে চলিয়াছে রণ এই সে মোদের ভারত পরে।
ধন্য হেথায় সতী সাবিত্রী ধৈর্য্য ধরিতে এত কি পারে,
দক্ষ-কন্যা প্রাণ ত্যাগ করে পতির নিন্দা সহিতে নারে।
সাম-স্তোত্রের গাহিয়াছে গান ব্রাহ্মণ মুনি-ঋষিরা শত,
মুক্তি এনেছে স্বর্গ গঙ্গা, শক্তি ধরেছে মূর্ত্তি কত।
সার্থক এই ভারতবর্ষ, এ বীরা জননী, জগন্মাতা,
কোটি কল্পের আকাশে ছোটায়ে গাহ এরি চির বিজয় গাথা
শুনুক বিশ্ব বিস্মিত মনে ভুলি জীবনের দুঃখ-শোক,
অপূর্ব্ব এর পুণ্য কাহিনী আনিয়া পুণ্য হোক।

ক্ষতি

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

অত্যন্ত পরিষ্কার বিছানাটা, ধবধবে শাদা, কোথাও এতটুকু ময়লা খুঁজে পাওয়া যাবে না- মোটা মোটা তাকিয়াগুলো ঠিক ঠিক করতে থাকে দেখে মনে হয় না এরা কারও স্পর্শ পেয়েছে অনেক দিন।

সকালে সূর্য উঠবার আগেই শিউপ্রসাদ বাবু একবার নেমে আসেন গদিতে। ৬৯নিসের এদিকে বয়স যেন বাঁধা পড়ে আছে অনেকদিন থেকেই কোন প্রকারের পরিবর্তন হয়নি শিউপ্রসাদ বাবুর চেহারার—লাল টকটকে মুখের উপর অত্যন্ত সযত্নে রক্ষিত সরু গোঁফের রেখা—খুব পাতলা একটি চশমা পরি রয়েছে মুখের উপর, অনেকখানি কমনীয় মনে হয় চেহারাটা। মুখে সব সময়ে দামী সিগারেট। পোষাকটা নিতান্ত সাদাসিধে—পাতলা ধুতীর উপর আরও পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী।

ভোর বেলা এসেই চাকরকে দিয়ে গদিটা পরিষ্কার করাবেন। চাদরগুলো পালটে দিয়ে, তাকিয়াগুলোতে পরিষ্কার ওয়ার লাগাতে হবে। কোথাও এতটুকু ময়লা সহ্য হয় না শিউপ্রসাদ বাবুর—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেন।

বিছানাটা ছাড়া আর কিছুই তেমন দ্রষ্টব্য নয় ঘরের ভিতরের। একপাশে একটা মোটা কাঠের বাক্স তার উপরে খান দুই তিন মোটা মোটা বাঁধানো খাতা—উপরে লাল কাপড়ের মলাট। তার কাছেই কয়েকটা কাটা কাপড়ের টুকরা খদ্দেরকে দেখাবার নমুনা—কাটা কাপড়ের সামান্য ব্যবসা করেন শিউপ্রসাদ বাবু।

গদিটা পরিষ্কার করিয়ে আবার উপরে চলে যান শিউপ্রসাদ বাবু। সাড়ে আটটার আগে আর নামেন না। ইতিমধ্যে নীচে বেশ কাজ কারবার সুরু হয়ে যায়। সাতটার মধ্যেই এসে পড়েন দীনেশ বাবু—গদির বাঙ্গালী কেরাণি। অল্প বয়স, মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক—চার তিন বছর আগে বি, এ, পাশ করেছে। শিউপ্রসাদের কাছে অনেকখানি সম্মান দীনেশ বাবুর—বয়সের পার্থক্যটা শিউপ্রসাদকে দূরে সরিয়ে রাখেনা—এমন কি অর্থের অনৈক্যটাকেও কাটিয়ে মাঝে মাঝে অনেকখানি এগিয়ে আসেন তিনি। দীনেশকে বলেন—তোমার জন্যই এই বাজারেও কারবারটা টিকে আছে—নইলে এতদিনে পথে নামতে হতো।

সাড়ে আটটার সময় নেমে আসেন শিউপ্রসাদ বাবু গদিটার একপাশে একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসে পড়েন—খদ্দের আসে দু'একজন ফিস্ ফিস্ করে কথাবার্তা হয়। একটা দরদস্তুর ছাড়া যেন আরও অনেককিছু। অনেক গুপ্ত আলোচনা হয়ে যায়। দীনেশ কিছু খেয়াল করে না কলমটা কানিতে চুঁবিয়ে আস্তে আস্তে মোটা খাতাগুলোতে দাগ কাটতে থাকে।

একটু পরেই শিউপ্রসাদ বাবু বলেন যাও ত দীনেশ, বাবুজীকে গুদাম থেকে কিছু মাল দিয়ে এসো।

গুদাম গুলো একেবারে আরেক পাড়ায় বড়বাজারের গিঞ্জি গলীতে। দিনের বেলায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে পচা ভ্যাপসা একটা গন্ধ ছড়ায় আর গায়ের উপর দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে মোটা মোটা ইঁদুর।

পর পর তিনখানা গুদাম সামনে দেখে মনে হয় বস্তী বুঝি সাধারণ মানুষেরও বসবাসের অযোগ্য কিন্তু ভিতরটা কাপড়ে ঠাসা—নূতন কাপড়ের বিচিত্র একটা গন্ধে ভরপুর—বোম্বাই মিলের ধুতি, শাড়ী ও শার্টিংএ কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই—যত বেরিয়ে যায় তার চেয়ে বেশী এসে জমা হয়।

কেবলমাত্র দীনেশ জানে এ'খবর, আর কেউ নয়, শিউপ্রসাদ বাবু বিশ্বাস করেন না কাউকে এমন কি যারা বাইরে দাঁড়িয়ে গুদাম গুলোকে পাহারা দিচ্ছে তারা পর্যন্ত আঁচ করতে পারে না ভিতরে কি আছে—কারও ধারণা বস্তা—কারও ধারণা আটা ময়দা।

হুড্ খোলা দু' তিনটা ট্যাক্সি আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ে দীনেশের পিছন পিছন—দরজার কাছে এসে থেমে যায়। দীনেশ ভিতরে ঢুকে খদ্দেরের হাত থেকে স্লিপটা টেনে নেয়—তারপর জিনিষ দেয়—পাঁচ প্যাকেট আদ্দি, তিনশ' গজ কোটের কাপড়—দু'শ পিস্ ধুতী ইত্যাদি।

মোটর তিনটা বোঝাই হয়ে যায়। যেন কারও ঘরের আসবাব পত্র যাচ্ছে—মোড়ের পুলিশের হাতে পড়ে চকচকে একটা ৫'টাকার নোট—দীনেশের নিকট লম্বা সেলাম জানিয়ে পকেট থেকে একটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট অঙ্গার করে পদ্মের বিদায় নেয়।

এগারটা নাগাদ আবার গদিতে ফিরে আসে দীনেশ। শিউপ্রসাদ বাবু তেমনি বসে বসে সিগারেট টানছেন—হয়তো পাশের গদির কেউ এসেছেন তার সঙ্গে গল্প চলছে। দীনেশ এসে স্লিপটা টুকে রাখে অন্য একটা খাতায় যেটা থাকে ওপরে শিউপ্রসাদ বাবুর ঘরে।

আরও আধঘণ্টা পরে উঠে পড়ে দীনেশ—বাসায় খেতে যেতে হবে। শিউপ্রসাদ বাবু হাসেন—বিগলিত হরষভরা হাসি। বলেন আজ হাজার তিনেক টাকা পাওয়া গেছে দীনেশ—আজ আর ব্যবসা না করলে চলে।

—অত লাভ হলো? ওরটা যেন বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না দীনেশের।

—কত কম দামে কেনা ছিল জানো। একেবারে জলের দামে। হাসিটা আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে—শিউপ্রসাদের।

—কৈ, তোমার বাসায় ত নেমন্তন্ন করলে না, কতদিন থেকে বলছি।

কাঁচুমাচু করতে থাকে দীনেশ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউপ্রসাদ বাবু ধোঁয়ার কুণ্ডলী সৃষ্টি করতে থাকেন। আজ্ঞে আমরা গরীব মানুষ, আপনাদের ডাকতে...

ভরসা হয় না—এই বলছো তো। কিন্তু আমরা কি মানুষ নই? বলেই বাক্স খুলে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে দেন—বলেন ধরো আজকের লাভের একটা অংশ তোমাকে বকশিস দিলুম কিন্তু রাত্রে নেমন্তন্ন খাওয়াতে, হবে বলছি। হাত টেনে টাকা কয়টি নিলো দীনেশ। এমনি উপরি পাওনা জোটে মাসে প্রায় শ'খানেক টাকা। নইলে মাইনে ত মাসে ষাট টাকা মাত্র। ভাগ্যিস শিউপ্রসাদের এখানে চাকরী করে—নইলে বাড়ীর সবাইকে উপোস করে মরতে হতো।

কৃতজ্ঞতায় গদ্ গদ্ হয়ে উঠে দীনেশ। পশ্চিমের অতি শুভ্র বাঙ্গালী মনটি ভিজে যায়। গলায় হঠাৎ কথা আটকে যায় দীনেশের। কি বলবে ঠিক করতে পারে না।

তোমাদের এই ভাবটাই পছন্দ হয় না আমার। কেন তুমি উপকার করনি আমার। আমার ওষুধের খবর তুমি ছাড়া আর কে জানে। তোমাকে যদি লাভের একটা অংশ দিই তাতে ত আমারই লাভ, বলেই বাক্স থেকে আরও চল্লিশটি টাকা বের করে গদির উপর রাখেন। বলেন—এগুলিও নাও. আজকে আমাকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে ত।

তারপর সস্নেহে পিঠ চাপড়িয়ে দেন দীনেশের। বলেন—কুছ পরোয়া নেই ভায়া, আমি থাকতে তোমার কোন চিন্তা নেই।

একেবারে যেন উড়ে চলে আসে দীনেশ। এক মাসের বেতন একদিনে বকশিস পেয়ে গেছে। আশাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দেওয়া যাবে আজকে। সরল সুন্দর মুখের অপূর্ব হাসিটা মনে মনে যেন দেখতে পায় দীনেশ। একখানি মুখ—জীবন দিয়ে, যৌবন দিয়ে যে মুখকে ভালবাসা যায়—মনে হয় অপূর্ব তৃপ্তিতে শরীর মন ভরে উঠছে।

রাস্তার পাশের একটা জুয়েলারীর দোকানে ঢুকে পড়ে দীনেশ। একটি আংটি কিনতে হবে—চমৎকার পাথর বসানো। অনেক দিন থেকেই আশার শখ—আজ তা' মেটাতে পারবে দীনেশ।

একেবারে চুপি চুপি রান্নাঘরে চলে এলো দীনেশ—আশা অন্যমনস্ক ভাবে কি যেন ভাবছে। চট্ করে সামনে এসে দীনেশ বলে খেতে দাও।

—ওমা তুমি কখন এলে? আমি ত বুঝতেই পারিনি বড় বড় চোখ দু'টী বিস্মিত হয়ে যায়।

দীনেশ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। এই সে চেয়েছিল—এমনি বিস্মিত দৃষ্টির অভিনন্দন। মুহূর্তের মধ্যে একটি রাজ্যের সম্রাটের পদে যেন অভিষিক্ত হয়ে গেল—যেখানে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার গদির উপর তার

[illegible] প্রতিষ্ঠিত—

[illegible]র জন্ত কি এনেছি বলো ত।

—কি এনেছো? কিছু আনোনি।

কেবলই আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

—বিশ্বাস করো আজ সত্যিই এনেছি। কিন্তু তার [illegible]মাকে দিতে হবে জানো।

রোজ রোজ ফাঁকি দিয়ে দিয়ে কেবল আদায় করা। আমি জিনিষ হাতে না পেলে কিছুতে ছুঁচ্ছি না।

পকেট থেকেই আংটির বাক্সটা বের করে দীনেশ। খুসীতে চোখ দুটী উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আশার। কি মধুর আর কি অপূর্ব ওর চোখের দৃষ্টি। দীনেশ আংটী দেওয়ার কথা ভুলে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো।

—কি দেখছো এমন করে।

—আংটির মালিককে। আংটিটি পরিয়ে দিলো তার আঙুলে। তারপর ওকে কাছে টেনে নিলো।

টেবিলের দিকে আবার গদিতে গেলো দীনেশ। কি কি রাঁধতে হবে আশাকে বলে এসেছে। জানে এর বেশি আরও কিছু করবে আশা। শিউপ্রসাদ ত কেবল উপলক্ষ্য, আসলে আশা আজ তার সমস্ত যত্ন দিয়ে খাওয়াবে তাকে—সমস্ত পরিশ্রম মুক্তার মতো সার্থক হয়ে উঠবে। প্রতিদিনকার অভাব, অভিযোগের মধ্যে এই একমাত্র সান্ত্বনা—একটা নারীর প্রেম আর ভালবাসার নৈবেদ্য পাওয়া।

আজকে উপরের ঘরে ডাক পড়লো দীনেশের—শিউ-প্রসাদবাবু কাউকে কখনো ডাকেন না তার নিজের ঘরে—আশ্চার্য্য হয়ে গেলো দীনেশ। কেন এতখানি অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছেন শিউপ্রসাদ বাবু। কি প্রয়োজন এর?

মোটা গদি, আঁটা একটি ইজিচেয়ারে বসেছেন শিউ-প্রসাদ বাবু। পাশের চেয়ারে একটি মেয়ে। অসাধারণ ভাবে লজ্জিতা—গালের রং ছাই ছাই হয়ে গেছে পাউডারের প্রলেপে চোখের দৃষ্টি কেমন রুক্ষ মেয়েটার। কেমন একেবারে বুণ।

এঁকে চিনলে না—পরিচয় করিয়ে দেন শিউপ্রসাদ বাবু। ইনি হলেন আমার মাসতুতো বোন মাঝে মাঝে আমার এখানে বেড়াতে আসেন।

হাত তুলে নমস্কার জানালো দীনেশ। মেয়েটিও প্রতি নমস্কার করে একটু হাসলো।

—তুমি একটা গান গাও নমিতা। দীনেশ আমার গদিতে কাজ করলেও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওর কাছে তোমার সংকোচের কারণ নেই।

মেয়েটি গাইল। ভাল লাগছে না দীনেশের। গলায় সুরের লেশমাত্র নেই। কেমন ভাংগা ভাংগা-কর্কশ কণ্ঠ। তবু চুপ করে বসে রইল।

গান শেষ হলে মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো, বল্লে—আজ আমি যাই।

—আচ্ছা—এসো, একটুখানি হাসলেন শিউপ্রসাদ।

—তোমাকে ডেকেছি একটা বিশেষ কাজে। এখনি একবার হাওড়া ষ্টেশনে যেতে হবে তোমাকে। কিছু মালপত্র আসছে। সংগে অবশ্ত যিনি আছেন তিনি স্বয়ং সরকারী অফিসার—কাজেই পুলিশ ঠাণ্ডা থাকবে। তবে এই বাজারে কাউকে বিশ্বাস নেই একটু সাবধান থাকা ভাল—কি বলো?

—হা, তাতো বটেই স্যার।

পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে দীনেশের হাতে দিলেন শিউপ্রসাদ বাবু, বল্লেন—এটা দেখালেই উনি তোমাকে চিনতে পারবেন।

উঠে দাঁড়ালো দীনেশ। নিবেদনের ভঙ্গীতে বললো—আজ যাচ্ছেন ত আমার বাসায়।

—ও! তাইত! একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। বুড়ো হয়ে গেছি, কিছুই মনে রাখতে পারি না। আচ্ছা, যাবো। গোকে তা দিতে লাগলেন তিনি।

মাল পত্র নিয়ে যখন গদিতে এসেছে তখন রাত আটটা। সরকারী অফিসারটি সংগে এসেছেন, বড় গম্ভীর ভদ্রলোক, বেশী কথা বার্তা বলেন না। এসেই বল্লেন—আপনার বাবুকে খবর দিন, আমার সময় বেশী নেই।

নেমে এলেন শিউপ্রসাদ বাবু। বিগলিত ভাবে বল্লেন—আসুন, আসুন, আমার কি সৌভাগ্য বলুন ত?

তাকিয়াটাতে হেলান দিয়ে বসলেন অফিসারটি, এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন—যা দেবার তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন। আবার কে কোথায় ঘুপটি মেরে বসে আছে কে জানে—তাহলে চাকরিটি যাবে।

—আরে সে ভয় নেই। এখন শিউপ্রসাদের সংগে কারবার করছেন। এই পাড়াতে কাক পক্ষীও তার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাবে না। দীনেশকে বল্লেন—ওহে বাবুজীকে একহাজার টাকা দাও।

দীনেশ টাকা গুনছে। অফিসারটী ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন—আজ্ঞে বড়বাবুকেও ত এর ভাগ দিতে হবে, তিনি সব জানেন কিনা।

—তাতে আর কি! ওহে আরও দু'শ টাকা বেশী দাও।

অফিসারটী চলে গেছে। খানিক বাদে রাস্তার পাহারারত পুলিশটি এলো। শিউপ্রসাদ বল্লেন—কিহে রামজীবন কি খবর।

আজ্ঞে, ওরা রাত দশটার মধ্যে আসবে। আজকেই পাকিস্থানে রওনা হবে। নইলে ধরা পড়ার আশংকা আছে।

—কুছ পরোয়া নেই। তুমি থাকবে এখানে। আমি একটু কাজে বেরোব। তাদের সবই বুঝিয়ে দিও। মাল পত্র সব পাশের ঘরে আছে।

—জী হুজুর।

—ওর বকশিসটা দিয়ে যাও দীনেশ. ওর আবার ডিউটি আছে। হাসলেন শিউপ্রসাদ বাবু!

দশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে পলকের মধ্যেই রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালো পুলিশটি।

—আপনার নামটি কি? বেশ ভদ্র ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন শিউপ্রসাদ বাবু।

—আশা! নমিত চোখে উত্তর করে আশা। বাইরের অপরিচিত কারো সংগে আলাপে অভ্যস্থ নয় সে। গ্রামের মেয়ে—সহজ লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারে না।

—আশা? একেবারে খাসা নাম তো। বেশ বেশ। জোরে জোরে সিগারেট টানতে থাকেন শিউপ্রসাদ বাবু। আড় চোখে একবার আশা আর একবার দীনেশের চোখের দিকে তাক ন।

কোলের উপর একটা প্যাকেট ছিল তাঁর, আস্তে আস্তে খুললেন সেটা। তার মধ্যে থেকে বেরোল দামী একটা সিল্কের শাড়ি – তাকালে চোখ ঝলসে যায়। আর —আর একটা সরু হার—লকেটের উপর একটি মুক্তা বসানো, আশা আর দীনেশ দু'জনেই বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে গেলো।

—তোমাকে সামান্য উপহার দিলাম।
কণ্ঠেই বললেন শিউপ্রসাদ বাবু।

—এসব আবার কেন করতে গেলেন স্যার?

—কি করি বলো ত! আত্মীয় স্বজন ত আমার কেউ নেই, একেবারে একা একা থাকি। তাই নূতন কারো সংগে বন্ধুত্ব হলে ভারী আনন্দিত হই আমি, ভারী ভাল লাগে।

আশা আর দীনেশের বিস্ময় কাটে না। অর্থলোভী চোরা কারবারী লোকটার মধ্যেও হৃদয়টি এখনো বেঁচে আছে।

বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে। দৈনন্দিন হিসাব করছিল দীনেশ গদিতে বসে। শিউপ্রসাদ বাবু নেমে এলেন। আনন্দে জ্বল্ জ্বল্ করছে চোখের তারা। বল্লেন —লাখ দেড়েক টাকা পেয়ে গেলাম হে। পাকিস্থানের মিশনটা সাকসেসফুল।

—তাই নাকি! দীনেশ আনন্দিত হবার ভান করলো।

—হ্যা, মনটা আজকে খুশিতে আছে। কিন্তু তোমাকে আজ আর একটা কাজ করতে হবে। গঙ্গার ধারে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে রাত এগারটা অবধি। সামান্য মালপত্র আসবে একটা নৌকায়। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। আমার সিভারলেট গাড়ীখানা নিয়ে যাও।

—[illegible] কাকুমাকু করতে লাগলো দীনেশ।

—কিছু বলার আছে।

—আজ বাড়ীতে একটু অসুখ। আশার জ্বর হয়েছে একটু।

কুছ পরোয়া নেই। আমি ব্যবস্থা করছি।

ধাত ঠিক আটটার সময় ঝকঝকে ষ্টুডিবেকারটা দীনেশের বাসার সামনে। আশা উদ্বিগ্ন ভাবে শুয়েছিল। শরীরটা দুর্বল, মাথা ধরাটা এখনো রয়েছে—দীনেশ অপেক্ষা করছিল—এত দেরীত দীনেশ করে না কোনদিন।

মোটরের শব্দ শুনে হঠাৎ উৎস্রাস্ত হয়ে উঠলো একটু পরেই দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন

—একি! হঠাৎ আপনি? সসংকোচে উঠে দাঁড়ালো

তুমি বসো। দীনেশকে হঠাৎ একটা খবর পাঠাতে হলো কিনা, অথচ দীনেশ বললো যে তোমার অসুখ, তাই একবার না এসে আর পারলাম না!

—অসুখ এমন বেশি কিছু নয়। একটু একটু...

—বেশি যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করাই উচিত। তোমার সংকোচের কোন কারণ নেই, যাবার সময় আমি একজন পরিচিত ডাক্তারকে খবর দিয়ে যাচ্ছি।

—না, তার কিছুই দরকার নেই, উনি এলেই সব ব্যবস্থা হবে আপনি এত ব্যস্ত হবেন না।

আরও মিনিট পনের গল্প করে বিদায় নিলেন শিউ প্রসাদ বাবু। যাবার সময় একতাড়া নোট বের করলেন পকেট থেকে। বল্লেন—তোমার অসুখের চিকিৎসার জন্য এটা খরচ করো।

—না, না, টাকার কোন প্রয়োজন নেই। সংকোচে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলো আশা।

—দীনেশকে হলেও আমি এমনি করে দিতাম। একটু থেমে বল্লেন—আচ্ছা, টাকা নিয়ে কি করবো বলো ত, গত কয়েক বৎসরে আমার এত টাকা জমেছে যে তুমি ধারনাও করতে পারবে না। আমার কাছে এর কোন দাম নেই।

চলে গেলেন তিনি। মোটরের শব্দ হওয়া পর্য্যন্ত একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইলো আশা। তারপর আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

দিন কয়েক পরের কথা। আজও অনেক টাকা এসে জমেছে শিউপ্রসাদের তহবিলে, গুপ্ত কোন পথ দিয়ে টাকার আদান প্রদান হয় দীনেশ তার ধারনা করতে পারে না। রাতের বেলায় কারবার শিউপ্রসাদ বাবুর। দীনেশ কিছু বুঝতে পারে না—কেবল গোপন একটা লেজার বইতে বড় বড় অংকগুলো লিখতে গিয়ে চমকে উঠে।

আজ ও ঠিক সাড়ে আটটায় নেমে এলেন শিউপ্রসাদ বাবু। আজ অনেক প্রফুল্ল দেখাচ্ছে তাঁকে, জল্ জল্ করছে সারা মুখটা। বল্লেন—আজ সন্ধ্যায় একটু উৎসবের আয়োজন করেছি ভাই।

—কিসের উৎসব?

—এমনি! নমিতা আর তার বান্ধবীরা আসবেন। তোমাকেও আসতে হবে কিন্তু। আর আশাকেও নিয়ে এসো।

—আচ্ছা। দীনেশ শুধু বললো।

গদির চাদরগুলো বদলিয়ে আরও পরিষ্কার চাদর পাতা হয়েছে। তাকিয়াগুলোর উপরে ঝকঝকে সিল্কের কাপড়। ঘরের বড় বড় সেজ বাতিগুলো জলছে। একদিকে তাকিয়া হেলান দিয়ে চুপ করে সিগারেট টানছেন শিউ-প্রসাদ বাবু। মাঝখানে নমিতা আর তার বান্ধবীর দল। সেতার, হারমোনিয়ম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। উৎসবের আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই।

দীনেশ আর আশা প্রবেশ করতেই সবাই সকলকণ্ঠে অভ্যর্থনা জানালো—আসুন—দীনেশ বাবু।

উৎসব চলছে, নমিতা আর তার বান্ধবীর দল নাচছে, গাইছে! খানসামা খাবার দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে। কেবল খাচ্ছেন না শিউপ্রসাদ বাবু। কেমন গম্ভীর আর বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাঁকে।

হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। চোখের ইসারায় ডাকলেন দীনেশকে। ফিস্ ফিস্ করে বললেন একটা ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে দীনেশ, লাখ খানেক টাকার মাল আসার কথা আছে আজকে। তোমায় একবার যেতে হচ্ছে।

ইসারায় জানিয়ে দিলেন কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে। পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বের করে দিলেন, বললেন—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে।

আরও অনেকগুলি মুহূর্ত। আশার ভাল লাগছে না অথচ বসে না থেকেও উপায় নেই। খানসামা এক এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেলো তাকে। শিউপ্রসাদ বাবু বললেন—খাও তুমি, আমি আসছি।

শিউপ্রসাদের বেরোবার সংগে সংগেই নমিতার ঘর উঠে পড়লো। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার আগে শিউপ্রসাদ বললেন—ভাগো এবার, আজ আর দরকার নেই।

—আমাদের বুঝি মনে ধরলো না, ঘিলোল কটাকে তাকালো নমিতা।

—যা, যা, তোরা তো অনেক টাকাই নিলি এ পর্যন্ত। এবার রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াগে।

পকেট থেকে কয়েকটা টাকা ছড়িয়ে দিলেন তিনি। তাই নিয়ে সরে পড়লো রূপোপজীবিনীর দল।

আরও কয়েক মিনিট পরে নেবে এলেন শিউপ্রসাদ। দেখলেন আশা ঠিক তেমনি করে বসে আছে, বললেন—সরবৎটা খাওনি?

না, একটু খেয়ে দেখলাম—বড় বেশি মিষ্টি।

—ও! সাকচিনির রস একটু বেশী দেওয়া হয়েছে। তা তুমি খাও, বেশ আরাম লাগবে। বেয়ারাকে ডেকে নিজেও এক গ্লাস নিলেন।

আচ্ছন্ন হয়ে আসছে আশার সংজ্ঞাচেতন। জোর করে ও চোখ দু'টী খুলে রাখতে পারছে না। কি যেন হয়েছে তার, কিছুই ভাবতে পারছে না, কেবল ঘুম পাচ্ছে।

দীনেশ এসে দেখলো শিউপ্রসাদের আলিঙ্গনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে আশা। দু'জনের কারো—চেতনা নেই।

মাথায় আগুন ধরে গেলো দীনেশের। হাতের কাছে ছুঁড়ে মারবার কিছুই পেলো না। মনে হলো দু'হাতে গলাটা চেপে ধরে মুহূর্তের মধ্যেই শেষ করে দেয়—লালসায় উন্মত্ত এই অজগরটাকে। কিন্তু তা' সে পারলো না। হাত পা কেবল কাঁপতে লাগলো তার।

একটু পরেই চোখ মেলে তাকালেন শিউপ্রসাদ। দীনেশকে দেখে একটু চমকে উঠলেন পরক্ষণেই সামলে নিলেন, বললেন—ভালই হলো আশার মারফৎ তোমার আমার সম্পর্কটা ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো। এবার আধাআধি বখরা।

চাই না আপনার বখরা। মিছে এমন ক্ষতি আপনি করলেন কেন।

—ক্ষতি করলাম, না তোমার লাভ হলো? বেশ, ক্ষতির পরিমাণ টাকা নিয়ে যাও। একটু থেমে বললেন—তা' আমাকে তোমার নিয়ে যাবার ইচ্ছা না থাকলে এখানে রেখে যেতে পারো। অবশ্য তা'তে কোন লাভ হবে না। নমিতার বদলে আর একজন বাড়বে শুধু।

—ওসব কথা শুনতে চাই না—চীৎকার করে উঠলো দীনেশ। এই ক্ষতির জন্য আপনাকে খেসারৎ দিতে হবে। চোখে তার আগুন জ্বলছে, হাত পা কাঁপছে তার।

—বেশি চেঁচিও না। জানো, পাড়ার পুলিসকে অনেকদিন থেকে কিনে রেখেছি। আর একবার চীৎকার করলে টাকা ছুরির ঘায়ে ধরিয়ে দেবো। খেটে আসবে কয়েক বৎসর। তার চেয়ে বলো—টাকা নেবে কিনা?

চুপ করে রইলো দীনেশ। মরার মত আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে—আশা। এর কোন দোষ নেই, এর হাত থেকে ওর মুক্তিরও কোন উপায় নেই টাকার জোরে এরা কিনে নিয়েছে পৃথিবীকে, সব নারীই এদের কাছে পণ্য।

—আচ্ছা টাকা দিন।

—আর একে? অঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শিউপ্রসাদ।

—আমার স্ত্রীকে আমিই নিয়ে যাবো।

খুব মন দিয়ে দিলেন একখানা নোট।

দুপদাপ করে' উপরের ঘরে উঠে গেলেন শিউপ্রসাদ।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ট্যাক্সি চলছে। আশার মাথাটা আলতোভাবে কোলের উপর নিয়েছে ধীরেশ। একহাত জড়িয়ে আছে ওর গলা। সারা অন্তরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। হাত দু'টো নিস্পিস্ করে। আশার নরম তুলতুলে গলায় জোরে বসিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তেই ওর যবনিকা টেনে দিতে পারে সে। গলার কাছাকাছি হাত দু'টো পৌঁছে গেছে।

কিন্তু চাপ দিতে সে পারলো না। আঙুলগুলোকে নড়াবার শক্তি নেই তার। ভিতরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে গেছে।

উপায়

শ্রীপ্রভাত রায়

পাঁচ বছর থেকে তপতীর এ' এক কামেলা।

দু'টি দাঁতী পায় পায় খোকন মনি ঘরে-বাইরে ছুটবে। বই পত্র ছড়িয়ে একাকার, আলনার শাড়ী-কাপড় টেনে ছিঁড়ে লণ্ড-ভণ্ড। নাক, মুখে আর বুকে কাদামাটী মাখবে ঠিক ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শব্দে তাড়া হড়ায় অফিসে যাবার মুখে এক পাটী জুতাই হয়তো খুঁজে পাবে না শৈলেন। ধলটায় অফিস। অগত্যা খালি পায়ে। অবশ্য যাবার আগে রুক্ষ কণ্ঠে তপতীর অসাবধানতার শ্রাদ্ধও করে তবে যাবে।

ঐ এতটুকু খোকন...এত শয়তান, তপতী সামলাতে পারে না মোটে।

শৈলেনের মেজাজটা অবশ্যি একটু খিট খিটে। ওর জন্যে দোষ দেয়া যায় না তাকে; যথেষ্ট সংগত কারণ আছে এর পেছনে। দশটা পাঁচটা অফিস করতে হয়। সন্ধ্যে দু'টার ট্যুইশানি। বিশ্রামের অবকাশ পরিমিত। এত কোরেও মাস শেষে শুনা গুন্তির যে সত্তরটা টাকা হাতে আসে ক্যালেন্ডারের পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রবেশ কোরবার আগেই তা'র নিঃশেষিত। বাড়ীভাড়া, রেশন দ্রব্য দোকার দুধ, ঠিকাঝি হেন-তেন কত কি!

ঠিকা ঝির' একান্ত প্রয়োজন না হলে তপতী আপত্তি তুলতো। তপতী আর কি আপত্তি তুলতো—শৈলেন নিজে থেকেই বন্ধ কোরে দিতো। সংসার যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যাবার জন্য তা', বিভিন্ন কৌশল আর কসরৎ কোরে এমন এক স্থান থেকে উদ্ধার কোরতে হয়, যেখানে তপতীর যাওয়ার চাইতে রাস্তার গাউন পরে ঘুরা ভালো।

ফ্ল্যাট বাড়ী।

তপতীরা থাকে তেতালায় আর জলের কল নীচতলায়। নীচতলায় আবার মেয়ে-ছেলের নাম গন্ধ নেই। তিনটে ক্লাশ নিয়ে বয়েকজন একটা মেস কোরে আছে আর বাকী সব ঘরে কেরানীকুলের একচ্ছত্র আধিকার। ওরা সব মিলে মিশে আছে। ধলবে নীচতলাটা একটা মেসই।

সুতরাং ঐ ব্যূহ ভেদ কোরে জল আনতে যাওয়া কষ্ট কল্পিত ব্যাপার।

ঠিকা ঝিরা পারে। দরকার হলে কোমরে কাপড় এটে দু'একটা কথা শোনিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না একটু। হোক না অফিসের বাবু; এমন অনেক বাবু দেখা আছে। ভোর হতেই অফিসের বাবুরা বিঁড়ি টেনে পায়খানায় ঢুকে; কাধে গামছা নিয়ে ঘাতন করে কলের পা' ঘেষে। ঝি'দের তিরিক্তি কথাগুলো আত্মমর্য্যাদায় ঘা দিলে চোখ কপালে তুলে সচীৎকারে ঝগড়া করে।

অনেকেই মাথা ঘামায় না ওসব ব্যাপারে। সয়ে গেছে।

শৈলেন তাই কি নিয়োগ করেছে। কতইবা নেয় ঝি। মাস শেষে চার টাকা। ঘরের খুটী নাটী কাজও একটু করে। চার টাকা কি আর কম! শৈলেন এ' হিসাবও করে। সত্তর থেকে চার গেলে ছেষট্টি। হাড়ভাংগা খাটুনীর টাকা। আবুকরের সংসে শরীরের রক্ত মাংসতো টাকা গুলার গায়ে লেপ্টে আছে প্রায়। সংসারটা ছোট হলেও টেনে হিচড়ে আয়ের ঘর খাটো করা যায় না।

পাঁচ বছর আগে যে বাচ্চা ছেলেটা এসেছে ওর খরচই বা কম কিসে!

দুধ, সাগু, বার্লি সাজাতে হয়েছে ঘরের ছোট্ট তাকে। কিডিং বোতলও একটা এনেছে শৈলেন। তপতীর অনুনয় আর মৃদু অভিমানের তাড়ায় কয়েকটা খেলনাও জমে গেছে।

সেবার শক্ত ব্যারাম হলো। বাঁচে কি বাঁচে না। পারে প্রণামীর টাকা ঢেলে ডাক্তার ডাকো, ভালো ডাক্তার। নইলে তপতীর কান্না আর বিরক্তিকর আফসোস থামে না। কোবরেজে ওর বিশ্বাস হয় না। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারেও নয়। ওদের গাঁয়ের সরলা পিসির ছেলেকে নাকি এক হাতুড়ে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার মেরে ফেলেছিলো; অথচ ছেলেটার রোগ তেমন কিছু শক্ত ছিলো না। এ' কথা তপতী প্রায়ই বলে।

সুতরাং ভালো ডাক্তারের প্রেশক্রপশান আর পথ্য যুগিয়ে শৈলেনকে বেহিসেবী ঋণ কোরতে হয়েছিলো সেবার।

ঘুম থেকে উঠে নিয়মিত টাকা ঋণ শোধ আর এক-টানা অফিস কোরে টাইপানি কোরে, শৈলেনের মনের ভাজে ভাজে উগ্র-তিক্ত রস জমে গেছে।

আট বছর আগে সে অবন্তি খোকনকে কামনা কোরে-ছিলো ক্লান্ত দেহটা বিছানার উপর এলিয়ে। তুল তুলে দেহ আর ছোট্ট ছোট্ট হাত পায়ের মিষ্টি দৌরাত্মের কথাও ভেবেছিলো।

কল্পনায় শুনেছিলো অস্ফুট কণ্ঠে পিতৃসম্বোধন। আরো কত কি!

এক সন্ধ্যায় লজ্জায় রাঙা হয়ে তপতী যখন খোকনের আগমন সম্ভাবনার কথা জ্ঞাপন কোরল; তখন শৈলেনের সমস্ত গা বেয়ে এক অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ বয়ে পড়েছিলো।

কিন্তু শৈলেন আজ অবসন্ন।

কারণ সেদিন সে পুত্রসুখের প্রথম অধ্যায়ের কথা ভাবছিলো। আজ সে তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে এমন কি তৃতীয় পর্যন্ত। ছেলের ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ শৈলেনের কাছে কাপসা ঠেকে। টাকার বিনিময়ে তার যান্ত্রিক কাজের অবসরে যতটুকু সময় সে হাতে পায় ওরই ফাকে ফাকে তৃতীয় অধ্যায়ের একটা সুন্দর ছবি আঁকতে চেষ্টা করে শৈলেন। কিন্তু লেপ্টে যায় সব। লাল, নীল, সবুজ। তুলির ডগায় রংএর পর রংএর উৎসাহ কিন্তু সত্তরের পর আর একশো—দু'শো টাকা হয় না।...

বিপর্যস্ত শৈলেন বিরক্ত। মেজাজটা তাই খিটখিটে।

আজ অফিসে যাবার জন্যে একটা কাপড় কিকে দিয়ে কাচিয়ে রেখেছিলো তপতী। কিন্তু খোকন এক কাণ্ড কোরে বসেছে। কোত্থেকে এক দোয়াত কালি এনে লেপ্টে দিয়েছে কাপড়টার গায়ে। তপতী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে শিউরে উঠলো খোকনের কাণ্ড দেখে। স্বামীর স্বরাগ মূর্তি চিন্তা কোরে স্তব্ধ হলো।

খোকন মাকে দেখে অকারণ চীৎকার সুরু কোরেছে।

রাগের মাথায় ছেলের পিঠে দু'তিন ঘা বসিয়ে দিলো তপতী।

চীৎকার এতে বাড়লো বই কমলো না।

বেচারা! চোখ ঠেলে কান্না আসে তপতীর। এ'এক জ্বালা হয়েছে তার।

রংচটা টেবিল ঘড়িটার দশটা প্রায় বাজে।

সেই কোন সকালে শৈলেন গেছে রেশনের ব্যাগ নিয়ে। এখনো ফেরেনি। এসেইতো তাড়াহুড়ো একশেষ কোরবে। অকারণে বিরক্ত হয়ে উঠবে। প্রতিটি খুটি-নাটি ব্যাপারে স্বামীর মন যুগিয়ে চলতে চলতে তপতী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ক্রন্দনরত ছেলের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না কোরে ভারাক্রান্ত মনে শৈলেনের আসনপিঁড়ি পেতে জলটা ঢাকা দিয়ে রাখলো তপতী। চানের তেল গামছাটাও এগিয়ে রাখলো।

তারপর কিন্তিৎ বোতলে দুধ ভরে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসলো সস্নেহে।

খোকন প্রহার বেদনা ভুলে চুক চুক শব্দ তুলে পরমানন্দে দুধে মনোনিবেশ কোরল মায়ের কোলে শুয়ে শুয়ে। দুঃখ হলো তপতীর। এইটুকুন ছেলে কিইবা বোঝে। অব্যক্ত ব্যথায় তপতী ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর কোরল। লক্ষ্মী বাবু আমার কেন একটু শান্ত হয়নে।...

বোতলের সবটুকু দুধ নিঃশেষিত কোরে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো খোকন।

খোকনকে শুইয়ে রেখে তপতী উঠে দাঁড়াতেই ঘর্মাক্ত দেহে শৈলেন এসে ঘরে ঢুকলো।

ঘড়ীর দিকে চেয়ে তপতী বললে, অফিসে যাবে আজ?

রেশনের অর্ধপুষ্ট ব্যাগটা ধুপ শব্দে মেঝের উপর রাখলো শৈলেন।

অফিস কামাই দিলে খাবে কি?

তপতী তেল আর গামছাটা এগিয়ে দিলো নিঃশব্দে।

নাঃ। চান আজ কপালে নেই। মাথাটা ঘুরে আসি তুমি ভাতের যোগাড় দেখ।

রান্নাঘরে ঢুকলো তপতী।

শৈলেন মাথা ঘুরে এসে বললে, কাপড়টা কোথায় গেলো?

এতক্ষণ মনেই ছিলো না ওকথা। ভয়ে ভয়ে তপতী বললে ওটা নষ্ট করে ফেলেছে খোকা।

শৈলেন রেগে উঠলে, এখন কি কোরে যাই অফিসে! এ' কাপড় পরে কোন ভদ্র সমাজে যাওয়া যায় না কি? ধেৎতেরি না ছাই।

অভুক্ত অবস্থায়ই অফিসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো সে।

তপতী অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে শৈলেনের হাতটা চেপে ধরলো, না খেয়ে যাওতো আমার মাথা খাও।

শৈলেনের অন্তরটা ধিকি ধিকি জ্বলছে। তবু কি মনে করে বসলো পিঁড়িতে।

তপতী তাড়াতাড়ি খাবারটা এনে দিলে।

ত্বরিৎ হাতে ভাত খেতে গিয়ে দম বন্ধ হবার যোগাড়। হঠাৎ ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি পরতেই শৈলেন চমকে উঠলো। দশটা পাঁচ! আর খাওয়া হলো না।—

ট্রাম বাসের চাপে বিপর্যস্ত হয়ে শৈলেন যখন অফিসে এসে পৌঁছালো তখন দশটা বেজে সতেরো।

চশমার পুরু কাচ ভেদ কোরে রেজিষ্টার বুকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে বড় বাবু বললেন, অত্যন্ত অনুচিত—সত্যি অত্যন্ত অনুচিত শৈলেন বাবু। রোজ রোজ এভাবে দেরী কোরে আসলে অফিস চলবে কি কোরে।

শৈলেন নিজের চেয়ারটা টেনে নীরবেই বড়বাবুর প্রচ্ছন্ন রূঢ় কথাগুলো সয়ে গেলো। স্তূপীকৃত কাজ জমে আছে সামনে।

শৈলেন ঘাড় গুজলো টেবিলের উপর। এত তাড়াহুড়া করে এসেও একটু স্বস্তি নেই। আজ ঘুম থেকে উঠতে দেরীই হয়ে গেছে। ঘড়ির কাটাটা যেন হিড় হিড় কোরে টেনে নেয় শৈলেনকে। প্রাণে হাঁফ ধরে যায়। ঘুম থেকে উঠতে একটু এদিক-ওদিক হলো কি আর উপায় নেই। নির্ঘাত সময়ের বানচাল। প্রাণে, চাকরীতে টানাটানি।

উঃ! কি গরম। ভাগ্যিস মাথার উপর ফ্যানটা ঘুরছে ক্যাচ ক্যাচ শব্দে।

কি বিরাট অফিস! কত কেরানী খাটছে। ঠিক দুপুরে গম্ভীর নিস্তব্ধ আবহাওয়া টেনে অফিস ঘরটা ঝিমুতে থাকে যেন। মাঝে মাঝে জুতা খুট্ খাট্—ম্যাচ্ ম্যাচ্ শব্দ আর সিলিং ফ্যানটার অস্তিত্ব জ্ঞাপক ধ্বনি। চৈত্রের দুপুরে শরীরটা ভারী হয়ে ঝিমিয়ে আসে চেয়ারের উপর। কলমটা আলগ্ হয়ে যায় হাত থেকে। বেশ ভারী ভারী মিষ্টি আমেজ লাগে একটা। ঘুমুতে পারলে বাঁচে শৈলেন।

কমিশনারের দোর আগলে বেয়ারাটা টুলের উপর আর বসে থাকতে পারে না। চোখ দুটো টেনে আসে। মাঝে মাঝে কলিং বেলের শব্দে লাফিয়ে উঠে। উর্দ্দি-কোর্ত্তা সংযত কোরে সেলাম ঠুকে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের সামনে।

দুই ঠোঁটের ফাঁক থেকে সিগারের পাতলা ধুয়া ছাড়তে ছাড়তে কমিশনার ফাইল এগিয়ে দেয় একটা—চার নম্বর ডিষ্ট্রিক্টে যে যাও।

বড়বাবু কিন্তু অদ্ভুত লোক। ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে যথানিয়মে অফিসে আসবেন। সেব দুর্বিপাকে কোনদিন একটু দেরী হয়ে গেল; সহকর্মীদের কাছে লজ্জিত হয়ে উঠেন। বড়বাবু লোক ভালো। কিন্তু বেশ ভারিক্কি চালে একটু গম্ভীর হয়ে থাকবার চেষ্টা করেন। অবশ্য থাকা উচিৎ। একটু গম্ভীর না হলে আজ কাল ছেলে-ছোকরার কেরানাগুষ্টি মানবে কেন!...

শৈলেনবাবু, এ'ফাইলগুলো কোপায় যাবে একটু এ্যারেঞ্জ কোরে দিন না।

শৈলেনবাবু, মুখ তুলে চাইলো। একতাড়া ফাইল নিয়ে হাজীর হয়েছে কল্যাণ। বেশ ছেলে। শৈলেনের ভারী ভালো লাগে। সুন্দর স্বাস্থ্য। একটু চঞ্চল। কর্মক্ষমতা যেন গা বেয়ে উপচে পড়ছে। নূতন এ্যাপয়েন্ট-মেন্ট। শৈলেনের চাইতে অনেক ছোট বয়সে। কল্যাণের মত যদি ছেলেটা হতো শৈলেনের! বড় হয়ে ঠিক ওরই মত কর্মক্ষম-চঞ্চল। মাসে অন্তত রোজগার কোরবে দুশো টাকা। কিন্তু ঐ রোগা-প্যাকাটি ছেলে কি আর কল্যাণের মত হয়ে উঠতে পারবে!

শৈলেন কল্যাণের ফাইলগুলো গুছিয়ে দিলো।...
পাঁচটায় অফিস ছুটি।

শৈলেন গায়ের আড়মোড় ভেংগে উঠ্‌লো। এখন আর বাড়ী ফেরা নয়। ডালহৌসি স্কোয়ারে খোট্টার দোকানে এক কাপ চা খেয়ে সোজা ট্যুইশানি। ওখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ী ঘন্টাখানেক আড্ডা দেমরে বাসায়। ট্যুইশানির পর আর ক্লান্তির বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। গেলেই তো ফ্ল্যাট বাড়ীর বিশ্রী হৈ-চৈ। বাচ্চাটার যে ট্যা ট্যা স্বরূপ। তপতীর বিষণ্ণ মুখ। ও সবকিছুর আড়ালে সংসারের অভাব অভিযোগের ভাবনা ওকে পাগল করে তোলে।

শৈলেন বাবু!

হাতের পোড়া বিড়িটা ফেলে ফুটপাথের একপাশে দাঁড়ালো শৈলেন। সেই কল্যাণ ছোড়াটা। সমস্তদিন অফিসের খাটুনী খেটে একটু ক্লান্তি নেই মুখে।

নূতন চাকরী উৎসাহও কম নয়।

বাড়ী যাচ্ছেন বুঝি?

বাড়ী নয়, বাসা। শৈলেন ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, কিন্তু এখন ফিরছিনে। দোকানে ঢুকে একটু চা খেয়ে একটা ট্যুইশানি সেরে ফিরব একেবারে।

চা খাবেন? কল্যাণ বললে, আসুন না আমিও খাবো ভাবছি।

কল্যাণ মাঝে মাঝে খাওয়ায় শৈলেনকে। কোনদিন পকেটে পয়সা না থাকলে ঠিক চা চাওয়ার সময়টাতে ছাত্রের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত থাকে শৈলেন। পৌঁছতে দেরী হলে বিকেল বেলাটা অভুক্ত থাকতে হয়। যেয়ো কুকুরের মত চা খাওয়ার লালসায় ছাত্রের বাড়ীতে ছুটে যাওয়া! শৈলেনের মনটা ক্লেদাক্ত হয়ে উঠতো প্রথমে। কিন্তু এখন সয়ে গেছে অনেকটা।...

একটা রেস্তোরাতে ঢুকলো কল্যাণ। অর্ডার দিলো, কাটলেট মাখনরুটী আর চা।

মিছামিছি কেন এত খরচ কোরচ? শুধু চা-রুটী হলেই চল'বে। শৈলেন বিব্রত হয়ে বলে।

খান না এমন আর কি? সারাটা দিন খেটে খুটে ঐতো আবার ছুটছেন ছাত্র ঠেংগাতে। একটু আত্মীয়তার সুর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে কল্যাণের কণ্ঠে, সত্যি! আপনার পরিশ্রম কিন্তু অদ্ভুত!

শৈলেন হাসবার চেষ্টা করলে, বাচতে হবে তো সংসার নিয়ে। পেটে বিদ্যে নেই তেমন। আর বেশী বিদ্যে থেকেই বা কি হবে? কত বি, এ,—এম, এ, ঘুরছে আজ কাল! বড় বড় অফিসের নিকট অথবা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় থাকা চাই।

'কথাটা' মোটে চায়ে চুমুকরত কল্যাণের আক্রোশ যে হয়ো না তা নয়। একটু কৌতুকও অনুভব কোরল সে।

শৈলেন কিন্তু গভীর ভাবেই কথাগুলো বলেছে।

চা' পান সমাপন করে ওরা উঠলো।

ফুটপাথে নেমে শৈলেন একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে, ঐ ষ্টপেজ থেকে উঠবো আমি।

কল্যাণ বিদায় নিলো।

ষ্টপেজে দাড়িয়ে দাড়িয়ে শৈলেন ভাবে, এক কথায় এত খরচ কোরতে পারে কল্যাণ! আর সে কিনা রিক্ত! পকেটে বিড়ির হিসেব পর্যন্ত রাখে! পয়সার অভাবে ছাত্র পড়াতে গিয়ে চা খায়! কল্যাণ কি তার হীনতা সম্বন্ধে কিছু ভাবে।.....

ট্রাম এসে গেছে।

দুপুরের অবসরে খোকনকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছিলো তপতী। একটা সুন্দর স্বপ্নের মাঝখানে তার ঘুমটা ভেংগে গেলো। পড়ন্ত রোদের আলোয় ঘরটা ঘোলাটে হয়ে গেছে। বারান্দার ফাকে একটুকরা আকাশ দেখা যায়। অলস দৃষ্টি মেলে তপতী চেয়ে রইলো ওদিকে।...

শৈলেনের বেন পদোন্নতি হয়েছে। মাইনে চারশো!

তপতীরা এঁদর ছেড়ে আলাদা বাড়ী করেছে একটা।

শৈলেন তপতীকে নিয়ে সিনেমায় যায়। হাজারো বই কিনে দেয় খোকাকে। তপতীর জন্যে শাড়ী—অলঙ্কার! শৈলেনের বেশ-ভূষায় যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। ট্যুইশানি আর করে না সে। অফিস থেকে সোজা বাড়ী এসে চা খায়। খেয়াল হলে বেড়াতে বেরোয়। ওবের ঠিকা ঝিটা সংগে যায় খোকাকে কোলে নিয়ে। ঠিক পাশের বাড়ীর মিত্তিরদের মত ওবেরও উদ্বিপরা খানসামা আছে। নিতান্ত সখ না হলে তপতী আর চা' করে না; শৈলেনের সংগে চায়ের টেবিলটা জমিয়ে বসে। শৈলেন পোড়া সিগারেটটা আংগুলের ফাকে রেখে কি একটা বইএ জানি মনোনিবেশ কোরে থাকে। তপতীর অভিমান হয়। শৈলেন বইটা বন্ধ করে মুচকি হাসে। আরো বেন কি!...

কিন্তু স্বপ্নভংগের পর সেই ঘর; আলনার সেই আধ-ময়লা ঝুলন্ত কাপড়। আসবাব পত্রের হীনতা।

তপতীর দেহটা অবসাদে ভারী হয়ে আসে।

খোকাটা কেঁদে উঠলো।

একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে পরম আদরে তাকে জড়িয়ে ধরলো তপতী। কণ্ঠটা রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বউমা! ঘোড়গোড়ায় দাড়িয়ে কি ডাকে।

আনমনা হয়ে তপতী শুধু বললে, 'হুঁ'।

জল তুলে দিয়েছি। উনুন ধরাব?

জল তুলেছ?

সেই কখন! আপনি ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে।

উনুনটাও জ্বালো।

ঘুমটা ভয়ানক বেয়াড়া হয়েছে আজ। এত ঘুমায় না সে। কত কাজ জমে আছে। তপতীর তবু উঠে বসতে ইচ্ছে হলো না খানিকক্ষণ। খোকাকে বুকে জড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে।

স্বপ্ন কি সত্যি হয় না?...

দুর্ঘটনাটা ঘটলো ছাত্র পড়িয়ে ফেরবার পথে।

হাজারো চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো শৈলেনের মাথায়। ছাত্রের বাবা কোলকাতা ছেড়ে বদলি হয়ে যাচ্ছে। মাস শেষে পনেরোটা টাকার পথ বন্ধ হলো শৈলেনের। বাকী থাকলো অফিসের পয়ষট্টি টাকা। বাড়ীভাড়া, পাওনা-দারের হিসেব, রেশনদ্রব্য, ঠিকা ঝি...পনেরো টাকার ঘা কম নয়!

সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলবার জন্যে শৈলেন বিড়ি ধরালো একটা। কিন্তু এ চিন্তা যাবার নয়। প্রাণ নিয়ে বেচে থাকার সমস্যা! বন্ধুটীর সংগে পরামর্শ কোরতে হবে আজ। কি করা যায়? ঝট করে আর একটা ট্যুইশানি পাওয়া যায় না। কল্যাণকে সব কথা খুলে বললে কি হয়? অনেক বন্ধু বান্ধব আছে তার। ছেলেটিও ভালো। নিশ্চয়ই একটা সুরাহা হয়ে যাবে শৈলেনের। বাড়ীর ঠিকানাটা জানা নেই নইলে আজ এখুনি সে যেতো কল্যাণের বাড়ী। রাতটা সে কাটবে কি কোরে। শৈলেন পথ চলতে জোর পাচ্ছেনা পায়ে।

এ্যাসপ্লেনেড !

কলমলে দোকান পাট···গাড়ী-ঘোড়া ! ঝিলমিলে নিয়োন লাইটের উপচে পড়া হাসি।...মেট্রো সিনেমার সামনে একসারি ট্যাক্সী।

চারিদিকে কত ঐশ্বর্য্য ! সৈলেন কি একটা চাকরী পেতে পারে না এখানে ?···

একটা সোরগোল উঠলো হঠাৎ।

পেছনের ছুটন্ত ট্যাক্সীটার ধাক্কায় পাশের একটা পোষ্টের গায়ে ছিটকে পড়েছে সৈলেন।.....

ভারতের জাতীয় পতাকা ও অশোকের ধর্ম্মচক্র

শ্রীবীণাপাণি চক্রবর্তী

ভারতের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও নূতন রাষ্ট্রীয় ঝাণ্ডা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে আইনতঃ রাষ্ট্রের নাম ইণ্ডিয়া অথবা ভারত। যদিও ভারত নাম যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তথাপি ইণ্ডিয়া নামই মুখ্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। এই ইণ্ডিয়া (India) নাম কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেরই ধারণা এই ইণ্ডিয়া শব্দটি আমাদের নহে। ইহা বিদেশীর দেওয়া নাম। নিজের নাম যাহাই থাকুক অন্যের নিকট যে নামে পরিচিত এবং অন্যে যে নাম ব্যবহার করে কার্যতঃ তাহাই সিদ্ধ। নামের ব্যবহার পরের জন্য। নিজের জন্য নহে। এই কারণে পরের দেওয়া নাম ব্যবহারে আপত্তি থাকিতে পারে না এবং অনেকস্থলেই বিদেশে দেশের নাম ভিন্ন হইতে দেখা যায়। ইংলণ্ডকে আমরা বলি বিলাত; আমেরিকাকে কোন কোন দেশে বলে ইউ, এস, এ (U. S. A.) কোথাও বা উসা (Usa); জাপানকে জাপানীরা বলে নিপ্পন। এই কারণে যদি আমাদের দেশের নাম দেশের লোকের ভিতর এক রকম এবং দেশের বাহিরে অন্য রকম হয় তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কোন কিছু নাই। কিন্তু ইণ্ডিয়া শব্দটি আসলে ভারতীয়। দ্রাবিড়ী ভাষায় সিন্ধ্ শব্দের অর্থ জলস্রোত। বড় নদীকে দ্রাবিড়ী ভাষায় বলা হইত সিন্ধ। ক্রমে উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে চন্দ্র বিন্দু যুক্ত হইয়া শব্দটি দাঁড়াইল সিঁন্ধ বা সমুদ্র। আর্য্যগণ পাঞ্জাবে আসিয়া বড় নদী, জলাশয় বা সমুদ্রকে সিন্ধু বলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী-কালে সিন্ধু বলিতে একটি বিশেষ নদী বুঝাইত। কিন্তু গোড়াতে সিন্ধু অর্থ নদী এবং আর্য্যগণ সাত নদী বিশিষ্ট যে দেশে বাস করিত তাহার নাম দিল সপ্তসিন্ধবঃ। পারসিকগণ স এর উচ্চারণ হ এর মত করিত। অন্যান্য ভাষাতেও ইহা প্রচলিত আছে। যেমন পূর্ববঙ্গে শালাকে বলে হালা, সকলকে বলে হকল। গুজরাটেরা সহরকে বলে হহর, সুরাটকে বলে হুরাট। এই ভাবে সংস্কৃত সিন্ধু পারসিক ভাষায় হইল হিন্দু এবং পরবর্ত্তী কালে আরবদের নিকট হইল হিন্দ্ (Hind) ক্রমে উচ্চারণের দোষে অনেকস্থলে হিন্দ্ এর হ দাঁড়াইল ইন্দ্ (Ind)। রোমান ভাষায় দেশ শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যোগ হয়। সুতরাং Ind শব্দের সঙ্গে ইয়া প্রত্যয় যুক্ত হইয়া হইল ইণ্ডিয়া (India); ইংরাজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের নাম ইণ্ডিয়া সর্বত্র ছড়াইল কিন্তু আসলে শব্দটি আমাদের দেশেরই যদিও দেশের লোকেরা এই শব্দ ব্যবহার কমই করে। লিখিত অবস্থায় এই শব্দটীর ব্যবহার প্রথম পাওয়া যায় পারস্যের বেহিস্তন শিলালিপিতে। খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট দারিয়াস (Daruis) পারস্যের বেহিস্তন নামক স্থানে এক প্রস্তর খণ্ডে পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির নাম খোদাই করেন। তাহাতে হিন্দু দেশের উল্লেখ আছে। লিখিত অবস্থায় ইহাই প্রাচীনতম।

নূতন রাষ্ট্রের প্রতীক হিসাবে রাজার মুকুট বসাইয়া আশোক স্তম্ভের সিংহ মূর্তি (lion capital) গৃহীত

হইয়াছে এবং জাতীয় পতাকায় অশোকের ধর্মচক্র বসান হইয়াছে। এই সম্বন্ধেও অনেকেরই কৌতূহল আছে। কিম্বদন্তী আছে যে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে জড়িত সকল স্থানে স্মারকস্তম্ভ স্থাপন করেন এবং প্রায় আট হাজার স্তম্ভ প্রস্তুত করান। প্রায় ভাল অবস্থায় পঞ্চাশটী স্তম্ভ এখনও বর্তমান আছে। কাশী হইতে ছয় মাইল দূরে সারনাথে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। তথায় এক বিরাট স্তম্ভ প্রস্তুত করা হয় এবং তাহার নিকটে এক প্রস্তরস্তম্ভ দাঁড় করান হয়। স্থাপত্যহিসাবে এই প্রকার এক একটী স্তম্ভ বিস্ময়ের বস্তু। পাহাড়ের গা হইতে কাটিয়া একটি বিরাট স্তম্ভ বাহির করা হয়। কোন কোনটির ওজন প্রায় পঞ্চাশ টন (৫০ × ২৮ = ১৪০০ মন) একটির উচ্চতা ৩২ ফুট ৯½ ইঞ্চি এবং নীচের ব্যাস ৩২½ ইঞ্চি ও উপরের ব্যাস ২২ ইঞ্চি। আগাগোড়া গোলাকার এবং আয়নার মত মসৃণ। এই প্রকার পাথরের স্তম্ভ (monolithic pillar) পাহাড়ের গা কাটিয়া বাহির করা, কয়েক শ মাইল দূরে বহন করা, ঘষিয়া মসৃণ করা এবং দাঁড় করান সেই যুগের এক বিস্ময়কর বস্তু। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে মৌর্যযুগের শিল্পী ও ইঞ্জিনীয়ারগণ গ্রীস বা অন্য যে কোন দেশের শিল্পী ও ইঞ্জিনীয়ারদের তুলনায় কম ছিল না। দুঃখের বিষয় এই প্রকার একটী শিল্প পৃথিবী হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব ২৪২ হইতে খৃষ্ট পূর্ব ২৩২ সালে ইহা নির্মিত হয়।

স্তম্ভের উপরে সাধারণতঃ একটী মূর্তি থাকে। এই মূর্তিকে ক্যাপিটল (Capital) বলে। সারনাথে যে স্তম্ভটি ছিল তাহার উপর গায়ে গায়ে সংলগ্ন চারিমুখ বিশিষ্ট সিংহ মূর্তি আছে। ইহাই বিখ্যাত lion capital। স্থাপত্য ও সৌন্দর্যের দিক হইতে প্রাচীন ভারতের ইহাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই সিংহ মূর্তি একটী গোলাকার পাথরের উপর বসান হইয়াছে। গোলাকার পাথরটীকে বলা হয় Abacus। তাহার নীচে পাথরে নির্মিত এক পদ্ম। পদ্মের পাপড়ি গুলি নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়া। Abacusএর মধ্য ভাগে একটী চক্র। চক্রের এক দিকে একটী ষাঁড় অন্যদিকে একটী অশ্ব। বুদ্ধদেব প্রবর্তিত এবং অশোক কর্তৃক প্রচারিত নূতন ধর্মের প্রতীক এই চক্র। বর্তমানে এই চক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় শোভা পাইতেছে।

প্রাচীন বৌদ্ধযুগের শিল্পে বুদ্ধদেবের কোনও মূর্তি দেখা যায় না। প্রথম দিকে বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিত না। শিল্পে ধর্মের প্রতীক হিসাবে চক্র, ফুল, হাতি, পাদুকা প্রভৃতি ব্যবহার করা হইত। ধর্মের প্রতীক হিসাবে চক্রের একটা বিশেষ অর্থ রহিয়াছে। প্রাচীন যুগে ধর্ম শব্দের ভিন্ন অর্থ ছিল। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতির মতবাদকে আমরা বর্তমানে ধর্ম (religion বা creed) হিসাবে ব্যবহার করি। পূর্বে এই অর্থে ধর্ম শব্দের ব্যবহার ছিল না। যে সকল নিয়ম সকল ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য এবং যাহা কোন সময়েই অন্যরূপ হইতে পারে না তাহাই ধর্ম। যেমন আগুনের ধর্ম জ্বালা, জলের ধর্ম শৈত্য। সত্য কথা বলা সকলের সমানভাবে প্রযোজ্য—ইহা ব্রাহ্মণের এক রকম আর চণ্ডালের অন্য রকম হইতে পারে না। যে কাজ রাজার করা উচিত এবং প্রচারও করা উচিত—নিজের সুবিধা হইলে করণীয় অসুবিধা হইলেও বরণীয় এইরূপ কর্মই ধর্ম। এই অর্থে বুদ্ধদেব জগতবাসীকে যে নূতন সত্য দেখাইয়াছেন এবং যাহা সকলের উপর সর্বকালে সমান ভাবে প্রযোজ্য তাহাই বুদ্ধদেবের ধর্ম। ধর্ম ইহা চক্রের মত সমানভাবে ঘুরিবে এবং একবার আরম্ভ হইলে ইহা চলিতে থাকিবে। কেহ ইহার গতিরোধ করিতে পারিবে না।

বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্রের ইহাই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আদর্শ সর্বকালে সমান ভাবে পালিত হয় নাই। ভারতের শাস্ত্রকারগণ অনেক সময় ব্রাহ্মণের জন্য এক ব্যবস্থা আর চণ্ডালের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম অনুসারে বিধর্মীদের হত্যা করায় পাপ নাই। বরং পুণ্য হয়। বর্তমানে ভারতীয় রাষ্ট্র অশোক ধর্মচক্রের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহা পালিত হইবে কিনা বলা যায় না। কিন্তু আদর্শ হিসাবে যে ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা ভারতের গৌরবের বস্তু।

কে তুমি ?

মন্টু দাশগুপ্ত।

—কে তুমি ?

—কে আমি ? আমায় চিন্‌তে পারছেন না ? মাথাটা তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আমি শুধু বলিলাম।

—না, তো ? মুখ হইতে অলস্ত সিগারেটটি হাতে নামাইয়া সে বলিল,—তুমি অভিরামের কেউ হও নাকি ?

অভিরাম ? চিনিলাম না তাহাকে। বুঝিলাম ইহাদের কোন চাকর-বাকর হইবে। লোকটার বোধহয় অসুখ, কিম্বা সে মারা গিয়াছে। ইহাও তো হইতে পারে যে অভিরাম বলিয়া সে কাহাকেও চেনে না, আমাকে এড়াইবার জন্তে সে উহা বলিতেছে। আমি শুধু বলিলাম,—না।

—তবে কে তুমি ?

আমি কাঁপিয়া উঠিলাম। ইহারা আমাকে চিনিতে পারিতেছে না ? আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, বলিলাম,—আমায় যখন চিন্‌তে পারছেন না, তখন আর আমি বলবো না।

চলিয়া আসিলাম। মুণ্ডিত মস্তকে, আমার সর্ব্বস্ব একটা পুঁটলিতে বাঁধিয়া আমার সব আত্মীয়দের কাছে ঘুরিয়াছি। কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই। ইচ্ছা করিয়াই আমাকে চেনে নাই।

অথচ একদিন ইহারা আমাকে চিনিত। আমাকে কতো আদর করিয়াছে ইহারা। আমার মন পাইবার জন্তে আমাকে কতো খাবার কিনিয়া দিয়াছে। পালা করিয়া আমাকে লইয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর আমার সে দিন নাই। বাবা মারা গিয়াছেন, তাহার সমস্ত সম্পত্তি এই অল্প সময়ের মধ্যে লোকে লুটিয়াছে। আজ আমি ভিখারী। তাই কেহই আমাকে চিনিতে পারিল না।

এখনও আমার মনে পড়ে আমাদের প্রাসাদের ছবি। তিন মহলা বাড়ীর চারিদিকে আমি ঘুরিয়া বেড়াইতাম, লাফাইতাম, খেলিতাম। যাহারা আমাকে আজ চিনিতে পারিল না, তাহারা অনেকেই আমাদের বাড়ীর ভাত খাইয়া মানুষ হইয়াছে। তাহাদের পড়াশুনার সব খরচও দিয়াছেন আমার বাবা। আর সেই জন্তেই আমাকে ভালবাসিত, আদর করিত।

এখনও মনে আছে আমার, আজ যে লোকটা আমাকে না চিনিবার ভান করিল—সেই আমাকে লইয়া নোয়াখালী বেড়াইতে গিয়াছিল। কতো সাধ্যসাধনা করিয়া বাবার নিকট হইতে অনুমতি আদায় করিয়াছিল। বাবা আমাকে চোখের আড়াল করেন নাই, কেননা শৈশবেই আমি মাতৃ-হীন। আজিকার আত্মীয়টির অনুরোধ না এড়াইতে পারিয়া আমাকে পাঠাইলেন, সঙ্গে দুজন বরকন্দাজ দিলেন। তাহাও লইতে আজিকার আত্মীয়টি অসম্মতি জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—মেসোমহাশয়, আমিতো আছিই। কুনাল শত হইলেও আমার ভাইতো ? ভাই বলিয়া সেদিন আমাকে যে লোক গ্রহণ করিয়াছিল, আজ আমাকে সে চিনিতেও পারিল না। চার বছরের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন হয় কি করিয়া ?

আজ ওরা এক একজন বড় চাকুরে, বড় ব্যবসাদার। বাবার নিকট হইতে টাকা লইয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

যাউক্, ও সব কথা এখন মনে করিয়া লাভ নাই, আমাকে এখন বর্ত্তমান আর ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে হইবে।

কয়েকদিন অনাহারে, ফুটপাতে আশ্রয় লইয়া কাটিল। ভগবানকে দোষারোপ করিলাম না। করিয়া লাভ কি ? শুনিয়াছি চিরদিন নাকি কাহারো সমান যায় না। আজ যে রাজা কাল সে ভিখারী। আমিও একদিন ছিলাম রাজা, বিশাল জমিদারীর ভাবী উত্তরাধিকারী। কিন্তু আজ আমি ভিখারী। আবার আমার হয়তো এমন দিন থাকিবে না ; আমি হয়তো আবার রাজা হইব।

কয়েকদিন ঘুরিয়া সরকারী অফিসে একটা কাজ পাইলাম। বাবু বলিয়া যাহার খ্যাতি তাহাদের টেবিল ঝাড়িয়া মুছিয়া রাখিতে হয়। ফাইল পত্র আগাইয়া দিতে হয়। আবার ক্রিং ক্রিং করিয়া বেলের শব্দ উঠিলেই ছুটিয়া যাইতে হয়, হুকুম তামিল করিতে। বাবুদের জল-

খাওয়াই ঈশ্বরের গ্রাস করিয়া। লোকে যে আমাকে সম্ভ্রম করিত তাহা বাধ্য হইয়াই ভুলিয়াছি। ভুলিয়াছি নিজের অভিজাত্যকে।

আরো কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

—বুদ্ধ লাগিয়াছে। ভগবানের উপর নির্ভর আমি কোনদিন করি নাই,—আজিও করিলাম না, আমার এই আঠারো বছরের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। মিলিটারির কন্ট্রাক্ট লইয়া আসামের দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটিয়া কাঠ সরবরাহ করিলাম।

আবার রাজা হইলাম। কলিকাতার বাগীগন্ধে দুর্মূল্য জায়গা কিনিয়া বাড়ী করিয়াছি। তিনমহলা বাড়ী আমাদের ছিল, তাহাই করিয়াছি। দু'খানা ট্যাক্সি কিনিয়াছি ম্যাসিনারীর দোকান পাতিয়াছি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। মাসে আজ আমার প্রায় দশ হাজার টাকা আয়।

বিবাহ করি নাই কিন্তু বিবাহ করিবার বয়স উত্তীর্ণ হয় নাই বহু দিন আসিতেছে। তবে ঠিক করিয়াছি করিব না। করিয়া কি হইবে? মানুষের উপর আমার বিশ্বাস ভাঙ্গিয়াছে। মানুষকে ঘৃণা হয় আমার। বিবাহ করিলেই ছেলে পিলে হইবে। যেদিন আমার অর্থ থাকিবে না সেদিন আবার উহারা বলিবে,—খাওয়াতেই যদি না পারিবে তবে অন্ধকার হইতে আমাদের মুক্তি দিলে কেন? পুত্র যে পিতাকে এ কথা বলিতে পারে তাহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু যদি এমন হয়?—ভয়, আমার অসম্ভব ভয়।

কিন্তু বিবাহ না করিয়া পারিলাম না।

লেকে বেড়াইতে গিয়াছিলাম একদিন। কেন যেন আমার ইচ্ছা হইল আজ হাঁটিয়াই বাড়ী ফিরিব। তাই ড্রাইভারকে গাড়ী লইয়া যাইতে বলিলাম।

রাত্রি নয়টার সময় বাড়ী ফিরিতে লাগিলাম। রাস্তা আলোকে উদ্ভাসিত। সেই উদ্ভাসিত আলোক যেন আমার কেমন লাগিল। চক্ষু ধাঁ ধাঁ লাগিয়া গেল। বাধ্য হইয়া গলিপথ ধরিলাম।

চলিতে চলিতে একটা স্বর শুনিলাম। পুরুষের গলা, —কে বলিতেছে কাহাকে যেন উদ্দেশ করিয়া,—আরে, এখানে শুয়ে কেরে?

—আমি গরীব মানুষ বাবু। নারী কণ্ঠ আসিয়া আমার কানে বাজিল।

—এখানে কেন? আমার বাড়ীতে চল।

—খেতে দেবেন?

—হাঁ দেবো। লোকটা আগাইয়া আসিয়া মেয়েটির হাত ধরিল। তাহার পর হাত ছাড়িয়া বুক।

অন্ধকার হইলেও আমি দেখিলাম, শিহরিয়া উঠিলাম।

মেয়েটিও বুঝি শিহরিয়া উঠিল। সভয়ে সরিয়া গিয়া বলিল,—আমি যাবো না।

—কেন? লোকটা হাসিয়া উঠিল পৈশাচিক হাসি।

—গরীব হলেও আমরা পতিতা নই।

সামান্য উত্তর। আশ্চর্য্য হইলাম আমি। দারিদ্র্যকে কি ভীষণ ভাবে সহ্য করিতে পারে ইহারা!

—টাকা দেবো। লোকটি আবার বলিল,—কাল ভোরে আবার চলে আসবি। কতো নিবি? পাঁচ?

—না।

—দশ?

—আমি যাবো না। তোমার বাবু বলতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। গরীব হলেও আমরা ভদ্রঘরেরই ছিলাম এক কালে! আজ দিন কাটাচ্ছি রাস্তায়।

—চলো, চলো, রাগ করো না। আমার ঘরে চলো।

মেয়েটি একটা ধাক্কা মারিল লোকটাকে। টাল সামলাইয়া সে ধরিতে গেল মেয়েটিকে। অন্ধকারে দেখিলাম মেয়েটি সভয়ে পিছাইতেছে।

হাতের টর্চ্চ জ্বালিলাম। আলোর রশ্মি উহাদের গায়ের উপরে গিয়া পড়িল। দেখিলাম লোকটি ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইতেছে।

আস্তে আস্তে মেয়েটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

—কে তুমি? হঠাৎ মা করিয়া সে প্রশ্ন করিয়া বসিল।

আবার সেই প্রশ্ন? বছর চারেক আগেকার কথা মনে আসিল আমার। কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্যে। মেয়েটি আমাকে তুমি বলিল বলিয়া রাগ করি নাই। মানুষকে সে আজ আমার যতই বিশ্বাস করে না, করিতে চায় না।

নিজের কুমারীত্বকে বজায় রাখিবার আগ্রহ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম আরও। বলিলাম,—তোমার কোন ভয় নাই। কোথায় তুমি থাকো?

—রাস্তায়। উত্তর আসিল।

—তোমার কি কেউ নেই?

—না।

—স্বামী? হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম।

—বিয়ে হয় নি আমার। বড় গরীব আমরা।

—বাড়ী কোথায়?

—নেই। কিছুই নেই আমার। আত্মীয় স্বজনও নেই।

বুঝিলাম মেয়েটি নিরাশ্রয়া। মহানগরীর পথের ধূলা আর ময়লার ছোঁয়াচের মধ্যে অনেকদিন কাটাইয়াছে সে। কিন্তু দেখিলাম মনে তার কোন ময়লা নাই। তাই বড় ভাল লাগিল মেয়েটিকে। তাহাকে বাসায় নিয়া আসিলাম সম্মতি লইয়াই বিবাহ করিলাম, আগুনকে সাক্ষী করিয়া। প্রতিজ্ঞা করিলাম জীবনে উহাকে ত্যাগ করিব না। কি জাত আর কি গোত্র জানিবার অবসরও ছিল না, প্রয়োজনও বোধ করি নাই।

স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী। সত্যই লক্ষ্মীই বটে। গরীব হইলেও ইহারা ছোটলোক নয়। ধূলার মানুষ হইলেও ইহার মনে কোন কালিমা নাই। আমার ঘরখানি সে সুন্দর করিয়া গুছাইল। সারাদিন কাজকর্ম্ম লইয়া সে ব্যস্ত থাকে। তাহার তখনকার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠি। কে বলিবে এখন এই মেয়েটি দু'দিন আগে ফুটপাতে কাটাইয়াছে, নোংরা খাইয়া মানুষ হইয়াছে? আমার লক্ষ্মী নিতান্তই পল্লীবধূ। রোজ সন্ধ্যায় সে ঠাকুর ঘরে গিয়া প্রণাম করে, সন্ধ্যারতি করে, শাঁখে ফুঁ দেয়! আমি কোন দেবতার মূর্ত্তিই কিনিয়া দেই নাই। বুঝিলাম সে নিজেই কিনাইয়া আনিয়াছে।... তাহাকে সর্ব্ব রকমে স্বাধীনতাই আমি দিয়াছি!

এক বছর না ঘুরিতেই লক্ষ্মীর কোল জুড়িয়া সুন্দর সন্তান আসিল। আনন্দ পাইলাম খুব, প্রথম সৃষ্টিকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। উহার মঙ্গলার্থে জীবন বীমা করিলাম।

আনন্দের মধ্য দিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

এমনি সময়েই লোক মুখে শুনিতে পাইলাম, আমার দেশের সেই তিন-মহলা বাড়ী নাকি নিলামে বিক্রয় হইবে। তাই আবার দেশে ফিরিলাম। গ্রামবাসীদের সিগারেটের ধোঁয়ায় অস্থির করিয়া তুলিলাম। সর্ব্বোচ্চ ডাকে বাড়ী খরিদ করিলাম।

সব দিক দিয়াই আমি সুখী, মাত্র এক দিক ছাড়া। আমি পিতৃহীন হইয়া যাহাদের দারস্থ হইয়াছিলাম সাহায্যের জন্যে তাহারা আমার এই উন্নতির কথা জানে কি? কে জানে? তাহাদের জানাইতে হইবে; সেদিনকার অপমানের গ্লানিতে আজ আমি কাটিয়া যাইব বুঝি!

তাহাদের প্রত্যেককে এক এক করিয়া চিঠি লিখিলাম! আমার ঠিকানা দিলাম।

এক এক করিয়া তাহারা আসিতে লাগিল।

গেটের নিকট হইতেই একজন আমাকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—আরে কৃপাল,...তা অনেকদিন পরে দেখা। বাড়ীর খবর কি?—মেসো কেমন আছেন?

বুঝিলাম, সব জানিয়াও ইহারা না জানিবার ভান করিতেছে। আজ আমার প্রচুর অর্থ আছে বলিয়াই ইহারা আসিয়াছে। তেলো মাথায় তেল দিতে সকলেই পারে।

লক্ষ্মী পুত্রকে লইয়া পাশে দাঁড়াইয়া। আগন্তুক আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল,—তোমার ছেলে বুঝি কৃপাল? বা বা কেমন সুন্দর ছেলে। দাও আমার কোলে দাও বৌমা।

এতদিন ধরিয়া আমার বুকে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহা দ্বিগুন আকার ধারণ করিল। বজ্র গম্ভীর স্বরে তাহাকে সচকিত করিয়া কহিলাম,—দাঁড়াও। অচেনা হ'য়ে কি করে তুমি আমার ছেলেকে কোলে নিতে চাইছো?

—সে কি? অজ্ঞান হইয়া গেছে লোকটা।

—কে তুমি? আমি প্রশ্ন করিলাম।

—আমায় চিনতে পারছো না কৃপাল?

—না, চলে যাও? আদেশ করিলাম।

প্রতিশোধ লইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিতেছে লোকটা। নিজের বাড়ীতে ডাকাইয়া আমার অর্থের প্রাচুর্য্য দেখাইয়া তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলাম।

সে চলিয়া গেল। আমি তাহাকে চিনি। কিন্তু না চিনিবার ভান করিলাম। যাহারা আমাকে চিনিয়াও একদিন না চিনিবার ভান করিয়াছিল, আমিও তাহাদের আজ চিনিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে তুমি?

পাশাপাশি

বেলা দাশ গুপ্তা।

দোতলার ঘর, নীচতলার কনে। দুদিন হয় ওরা পালিয়েছিলো, আজ রাতে ফিরে এলো। নব বধূর বেশে বর চঞ্চলের পিছন পিছন কনে টুপু নীচের ঘরের সামনে দিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি হোলোনা, বর-বধূকে কেউ বরণ করে ঘরে তুললো না, চারিদিকে একটা থমথমে আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে উপরে উঠে আসতেই বারান্দার মার সাথে দেখা হ'লো। পাশ কাটিয়ে মা চলে গেলেন পাশের ঘরে। আর কেউ কোথাও নেই। নববধূ সেখানেই চুপটি করে দাঁড়িয়ে চঞ্চল সোজা চলে গেল মাঝের ঘরে।

এই ঘরটাই এ বাড়ীর প্রধান ঘর। এই ঘরে চঞ্চল-রা তিন ভাই শোয়। সব পালাপার্ব্বণ এই ঘরেই হয়। এই তো কিছুদিন হ'লো ছোট বোন মুকুলের বিবাহ উপলক্ষে এই ঘরটা কত সাজিয়ে ছিল চঞ্চল লোক ভাড়া করে এনে। এই ঘরেই হ'য়েছিল ওদের বাসর শয্যা।

চঞ্চল ঘরে এসে প্রাত্যহিক প্রথা মত জামা কাপড় বদলে নিল। নিতান্ত অনাবশ্যক একবার পরিপাটি মাথার চুলে পাঁচ অঙ্গুলি সঞ্চালন করে নিয়ে রাস্তার দিকের মুক্ত বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়াল।

অনতিদূরে কোণের বাড়ি থেকে সানাইর রাগিণী ভেসে আসছে, ঐ বাড়িটার আজ একজোড়া বরবধূর বিয়ে। সানাইর সুরের মাদকতায় চঞ্চলকে বিহ্বল করে ফেলল। সে সুর মধুর কি বিষাদ চঞ্চল তা অনুভব করতে পারল না। কিন্তু সে সুর চঞ্চলকে আকুল করে তুললো। পার্টিশনের ওপাশে দুনম্বর ঘরে সদ্য টাইপন ফেরৎ কুল মাষ্টার অনুকূলবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। বিষাদে বিরস ম্লানমুখো মেয়ে শচী—যার তিন মাস পূর্ব্বে বিয়ে হয়ে বিয়ের আঠের দিন পরে স্বামী মরেছে—এগিয়ে এলো পিতার পোষাক বদলাতে সাহায্য করতে। পিতার পরিত্যক্ত পোষাক নিয়ে সযত্নে যথাস্থানে রেখে দিল। হাতল ভাঙ্গা চেয়ারটা এগিয়ে দিল বসতে। অন্য একটা আধ ভাঙ্গা লোহার চেয়ার এনে সামনে রাখতেই শ্রান্ত অনুকূলবাবু ক্লান্ত পা জোড়া তুলে দিলেন। অদূরে সযত্নে রক্ষিত চাপা দেওয়া জল খাবারের থালা এবং জলের গ্লাস হাতে নিয়ে শচী এসে দাঁড়াল।

উৎসবমুখর কোণের বাড়িতে সানাইর একটানা সুর বেজে চলেছে।

অন্যমনস্ক চঞ্চল আর একবার পেরাল শূন্য তাকে মাথায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে জানালার কাছ থেকে সরে গেল। রেডিওর চাবীটা খুলে দিল, অসময়ে উত্যক্ত রেডিও বিরক্তভরে কুর কুর করে উঠল, চঞ্চল আবার চাবী বন্ধ করে দিলে।

বাইরে শীতের হিমেল হাওয়া কন কন করে বয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণা তিথির পাণ্ডুর চাঁদ অস্বচ্ছ জোৎস্না ছড়িয়ে দিয়ে আকাশের বুকে বসে আছে সে দিকে তাকিয়ে

তাকিয়ে সময়ের প্রবাহ গড়িয়ে চলছে। দেখতে দেখতে অনেকটা সময় চলে গেল। টুলু একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের ঘর থেকে ভেসে আসে ছোট ভাইটির ক্রন্দন ধ্বনি—"দিদির কাছে যাব," মায়ের হুঙ্কার এবং বিরাশী দশ ভরি ওজনের চপেটাঘাতের সাথে সাথে সব চুপচাপ হয়ে গেল। অবোধ বালক এ শাসনের অর্থ বুঝল না। কিন্তু আর জিদ ধরতেও সাহস পেল না। টুলুর অন্তরবাসী নিরুপায় দিদি ভয়ে কেঁদে উঠল। অবাধ্য চোখের ভারী পাতা বেয়ে দুফোঁটা উষ্ণ অশ্রু নেমে এলো।

জন কোলাহল মুখরিত বিয়েবাড়ি হতে অনাহূত শব্দছটা ছিটকে এসে ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় নীরবতার ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে যায়।

পার্টিশনের ওপাশে চুনঘর ঘরে হতভাগ্য শচী কুলুঙ্গি থেকে লেপ তোষক নামাচ্ছে আর একের পর এক বিছানা করে যাচ্ছে।

চকলের ছোট বোন মুকুলের হাত ধরে নূতন বৌ টুলু মায়ের ঘরে এলো। ন'মাস পূর্ব্বে এই মুকুলের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পরে স্বামী পরিত্যাগ করে চলে এসেছে। এই ঘরেই মহাসমারোহে হয়েছিল ওর বাসর-শয্যা। দেখতে দেখতে ন'টা মাস কেটে গেল, মনে হয় সেদিনের কথা। নূতন বৌকে নিয়ে ঘরে এসে স্বল্পভাষিণী মুকুল যেন সব কথা হারিয়ে ফেলল। পাশাপাশি দুজনে নিশ্চুপ বসে রইল, চকল বসে বসে রেডিওর চাবি খুঁটে চলছে।

চকলের ছোট ভাই সদানন্দ মিন্টু এসে ঘরে প্রবেশ করলে। এতক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এইমাত্র বাড়ি ফিরে ঝিয়ের কাছে সব শুনেছে। নীচতলার মেয়েটা টুলু কেমন সিঁদুর পরে ঘোমটা দিয়ে বৌ হয়ে ছোড়দির পাশে চুপটি করে বসে আছে দুপটি গুঁজে। গলার আওয়াজটাকে বিকৃত করে বলল—এই যে বেশ হয়েছে দেখতে। কিন্তু স্তব্ধ গম্ভীর আবহাওয়ায় সে রসিকতা জমল না। তখন স্বাভাবিক ভঙ্গীতে চকলকে জিজ্ঞেস করল—কখন এলে মেজদা? আগে একটা খবর দিলে না কেন?

চকল চেষ্টা করে একটু হাসল, এর জবাব আর সে কি দেবে।

৮ নম্বর ঘরে বিষাদিনী শচী রজনীর আড়ালে নিজকে খুলে ধরল। যতদূর দৃষ্টি চলে—আশা ভরসাহীন নিষুপ্ত নিরাশা। নিজের এমন কোন যোগ্যতা নেই যা নিয়ে দিন কাটান চলে।

সুপ্তিমগ্ন গৃহকোণে অস্পষ্ট নীল আলোকে তিন মাস পূর্ব্বের পনের দিনের স্বামীর একখানা ফটোগ্রাফ নিয়ে নিশি প্রহরিণী শুচিস্নাতা শচী ধ্যানে বসল।

অদূরে বিয়ে বাড়িতে মিলনের বাঁশী বেজে চলছে।

কোণের বাড়ির কোণের ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ফুলে ফুলে সুসজ্জিত বর বধূর বাসর কক্ষ বিচিত্র বর্ণের আলোর ধারায় স্নাত। বাসর জাগার সাথী বিভিন্ন বয়সের একপাল মেয়ে সমভিব্যাহারে বরবধূ গৃহে প্রবেশ করল।

ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে ক্লান্ত টুলু উন্মুক্ত বাতায়নে চকলের পাশে এসে দাঁড়াল। ফুলের বাসর তাদের জন্য নয়। দিগন্তের শেষ প্রান্তে নিশাচর পক্ষীদম্পতী ডানা ছড়িয়ে উড়ে গেল। নিম গাছের পাতায় দোল দিয়ে ঝির ঝির করে শীতল বায়ু বয়ে যায়। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ফিরিয়ে চকল টুলুর পানে তাকাল টুলুর শীতল হস্ত নিজের হাতে টেনে নিয়ে আবার সীমান্তে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল।

নিরালা ঘরে নিঃশব্দে এসে মুকুল কখন বিছানা করে রেখে গেছে। পাশে একখানা থালায় রয়েছে ঈষৎ শুষ্ক দুগাছা বাসি ফুলের মালা। সদ্য কর্তিত গুচ্ছ কয়েক চন্দ্র মল্লিকা ফুল,—হয়ত ছাদের টব থেকে তুলে এনেছে;—এক শিশি এসেন্স। বিছানার উপর রয়েছে অমর প্রেমের প্রতীক একখানা "মেঘদূত"।

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

ক্রিকেট

ভারতীয়দল চীপক মাঠে পঞ্চম ও শেষ বেসরকারী টেষ্ট খেলায় কমনওয়েলথ্ দলকে ৩ উইকেটে পরাজিত করিয়া রাবার লাভের সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে। ইহার পূর্বে দিল্লীতে ভারতীয় দল প্রথম টেষ্টে পরাজয় বরণ করে, বম্বে ও কানপুরে অমিমাংসিতভাবে খেলা শেষ হয় এবং কলিকাতায় তৃতীয় টেষ্টে ও মাদ্রাজে পঞ্চম টেষ্টে জয়লাভ করিয়া রাবার লাভে সমর্থ হয়।

বেসরকারী টেষ্টে ভারতীয় দলের ইহা সপ্তম জয়লাভ হইলেও সরকারী টেষ্টে আজ পর্যন্ত ভারতীয় দল কখনই জয়লাভে সমর্থ হয় নাই।

মাদ্রাজের চীপক মাঠে ভারতীয় দলকে বহু শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছে। এই মাঠেই অষ্ট্রেলিয়ান টীম, লর্ড টেনিসনের টীম এবং হ্যামেণ্ডের নেতৃত্বে শক্তিশালী সার্ভিসেস টীম পরাজয় বরণ করিয়া গিয়াছে।

ভারতীয়দলের এই সপ্তম জয়লাভে প্রথমেই ভারতীয় দলের অধিনায়ককে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। খেলার দলাদলি ও রাজনীতি হইতে মুক্ত, নম্র ও অমায়িক বিজয় হাজারে ভারতকে বিজয়ীর জয়টীকা পরাইয়াছেন এবং সাথে সাথে প্রমাণিত করিয়াছেন ভারতীয় দলকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত করিবার মত খেলোয়াড় এখনো ভারতে বর্ত্তমান।

পঞ্চম টেষ্টে এই জয়লাভের জন্য প্রথমেই অধিনায়কের নাম করিতে হয়। উভয় ইনিংসে তিনি ৭৭ ও ৮৪ রাণ ও সুন্দর ভাবে বল করিয়া ভারতীয় দলের শক্তির মেরুদণ্ডের কাজ করিয়াছেন। প্রথম ইনিংসে কিবেশচাঁদ ও দ্বিতীয় ইনিংসে পোলি উমরিগর ও মুস্তাক্ আলীর ব্যাটিং সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। দ্বিতীয় ইনিংসে ভয় আঙ্গুলে ১৭ মিনিট পূর্বে মুস্তাক্ যখন মাঠে নামেন তখনও ভারতীয় দলকে জয়ী করিতে ৪ রানের প্রয়োজন অথচ নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান আর নাই এই অবস্থাতেই মু ক্ ৫ মিনিট হাতে থাকিতেই তাহার কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করেন। ভারতীয় দলকে জয়ী করিবার রাণ তাহার শেষ বাউণ্ডারী দিয়েই লাভ হয়।

বোলিং-এ ডি, কাদকার, এন, চৌধুরী, মানকড, সি, এস নাইডু সকল সময়েই সুন্দরভাবে বল করিয়া প্রতিপক্ষের বিপদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভারতীয় দল জয় লাভ করিলেও আজ দলগঠন ও খেলাধুলা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। গত বৎসর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সহিত খেলার প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে মুস্তাক্ আলীকে রাণ দেওয়া হয় এবং তৃতীয় টেষ্টে তাহাকে দলে লইবার পর হইতেই প্রতিবারেই ভারতীয় দলকে যথেষ্ট রাণ দিয়া সাহায্য করেন। গর্ডাড তাহার বিদায়ী ভাষণে বলিয়াছেন যে, Mustaq is of versatile genius' অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় সেই পুরাতন ইতিহাসকে এবারেও পুনরাবৃত্তি করানো হইয়াছে। আজ এ কথা

জোর করিয়া বলা চলে দিল্লী ও বম্বে টেষ্টে মুস্তাক্ থাকলে ফল অন্যরূপ হতে পারতো। চতুর্থ টেষ্টে সি, এস, নাইডু ও এন চৌধুরীকে বাদ দেওয়া এবং ঘোরীর অসাফল্য দেখিয়া পুনঃ পুনঃ দলে গ্রহণ করিয়া ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন।

সব চাইতে দুঃখের বিষয় মন্ত্রীকে পর পর ৪টী টেষ্টে উইকেট কিপার হিসাবে মনোনয়ন করা। মন্ত্রী একজন তৃতীয় শ্রেণীর উইকেট রক্ষক; ব্যাটস্‌ম্যান হিসাবে তাহাকে কোনোরূপেই গ্রহণ করা চলিতে পারে না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার অসাফল্য ও অসামর্থ দেখিয়াও পুনঃ পুনঃ তাহাকে মনোনয়ন করা হইয়াছে এবং ঘোরীকে ঘোড়ার ন্যায় এখান হইতে ওখানে দৌড় করানো হইয়াছে। পঞ্চম টেষ্টে ঘোরী প্রমাণিত করিয়াছেন যে তাহার উইকেট রক্ষা মন্ত্রী হইতে অনেক সুষ্ঠু এবং সুন্দর।

তাই আজ এ কথা বলিলে নিশ্চই অন্যায় করা হবে না যে ভারতীয় দল মনোনয়নে প্রতিবারেই বোর্ড দুর্বলতার ও পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। যদি তাহারা এগুলি হইতে মুক্ত হইয়া দল গঠন করিতে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে ফল আরো শুভ হইতো একথা জোর করিয়া বলা চলে। আজ ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে আমরা আশা করি রাষ্ট্রিকশীল পদে অধিষ্ঠিত সকল ব্যক্তিই জাতির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সামান্য স্বার্থ বা সম্মানের প্রশ্ন ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতে অগ্রসর হইবেন।

ফলাফল :—

কমনওয়েলথ—প্রথম ইনিংসে—৩২৪ (ওরেল ১৬১)
দ্বিতীয় —২৪৭ (হোল্ট ৮৪)

ভারতীয়দল—
প্রথম ইনিংসে —৩১৩ (হাজারে ৭৭, কিবেন ৭২)
দ্বিতীয় " —২৬১ (হাজারে ৮৪, উমরিগর ৫৯, মুস্তাক্ নট্ আউট ৪২)
(৭ উইকেটে)

পূর্ব্বের টেষ্টগুলির ফলাফল :—

১ম টেষ্ট—ভারতীয়দল ৯ উইকেটে পরাজিত
" ২৯১ এবং ৩২৭
কমনওয়েলথ—৬০৮ এবং ১জন আউট হইয়া ১২
২য় টেষ্ট—ভারতীয়দল ২৮৯ এবং ৪৩০
কমনওয়েলথ—৪৪৮ এবং ১১৬। ফলাফল ড্র
৩য় টেষ্ট—ভারতীয়দল ৭ উইকেটে জয়ী
" ৪২২ ও ১১৭ তিনজন আউট হইয়া
কমনওয়েলথ—১৯০ এবং ৩৪৮ ফলাফল ড্র।
৪র্থ টেষ্ট—কমনওয়েলথ ৪৪৮ এবং ২৩৭
ভারতীয়দল—৩৮৬ এবং ৮৪ ফলাফল ড্র।

ইন্টারে রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমিফাইন্যাল খেলায় পশ্চিম বাংলা দল হোলকারের সহিত খেলিয়া ১৩১ রাণে পরাজিত হইয়াছে। চতুর্থ দিনের সূচনায় পশ্চিম বাংলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৪৭ রাণ দেখিয়া সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে খেলাটী অমিমাংসিতভাবে শেষ হইবে। কিন্তু খেলা আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস ২৪১ রাণে শেষ হয়।

হোলকার—প্রথম ইনিংসে—৯৪
দ্বিতীয় ইনিংসে—৫১৯ (মুস্তাক্ ১৯১, সারভাতে ১১৫)
পশ্চিম বাঙ্গলা—প্রথম ইনিংসে—১৪১ (এন চ্যাটার্জি ৩২, ব্রাড—৩৩
দ্বিতীয় ইনিংসে—২৪১ (এ রায়গুপ্ত—৭৬)

হকি—

কলিকাতার হকি খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং প্রতিবারের মত এবারেও পূর্বেকার সকল দলই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। গতবৎসরের লীগ-বিজয়ী পোর্টকমিসনার্স দল এ বৎসরে তাহাদের দল সেরূপ শক্তিশালী করিয়া গড়িতে সমর্থ হয় নাই। অ্যানসেন্ ব্রুডিয়ার্স, কেশবদত্ত এবং জি, সিংএর মত ৪টী অলিম্পিক খেলোয়াড় তাহারা হারাইয়াছে। লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মোহনবাগান দলও ফরোয়ার্ড লাইনের কুশলী সকল খেলোয়াড়কে হারাইয়াছে তবে কেশবদত্ত দলে আসায় পিছনদিকের শক্তি কিছুটা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। দল হিসাবে বিচার করিলে এ বৎসরে কাষ্টমস দলই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। মোহনবাগান, পাঞ্জাব স্পোর্টস, পোর্ট, ভবানীপুর, শ্রীরাম প্রভৃতি দলের মধ্যে বিশেষ প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক আগামী বারে প্রথম ডিভিসান হকি লীগের খেলার বিস্তারিত আলোচনা করিবার অভিলাষ রহিল।

ভারতীয় গণতন্ত্র—

...সন বিধান অনুসারে এই বছরের ২৬শে ভারতীয় রাষ্ট্র লোকায়ত্ত গণতন্ত্র বলে ঘোষিত ...ে হতে ১৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা ...লিত হচ্ছে। এত দিন স্বাধীনতা দিবস ...লিত হত—স্বরাজ গ্রহণের জন্য—স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবর্তিত জন্য। সে অধ্যায় ভারত পেরিয়ে এসেছে ;—আজ ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং স্বাধীন ভারতের ...সন-বিধান প্রণয়ন ক'রেছে। এটা একটা এমনি সময়ে শাসন-বিধান প্রণয়ন করাতেই এতদিনের পালিত স্বাধীনতা দিবসে এই নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

এই রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে—সার্বভৌম লোকায়ত্ত গণতন্ত্র। সার্বভৌম (Sovereign) শব্দের অর্থ হ'ল—এই রাষ্ট্র সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রশ্ন উঠেছে—ইংরাজের জাতিসংঘে বা Commonwealthএ অন্তর্গত থাকতে ভারত যখন রাজী হ'য়েছে, তখন আর ভারত সার্বভৌম নয়। এ কথা অত্যন্ত ভুল। ভারতের শাসন বিধানে ঐ জাতিসংঘের কোন উল্লেখ-ই নেই ;—এ শাসন-বিধান একান্তভাবে ভারতের প্রতিনিধিগণই প্রণয়ন করেছে এবং দরকার হ'লে—তারাই এর পরিবর্তন করতে পারবে। এর জন্য ভারতের বাইরের কোন কর্তৃত্বের (authority) নিকট যেতে হবে না। জাতিসংঘে বা commonwealthএ থাকা বা না থাকা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সরকারের ইচ্ছাধীন এবং এর জন্য শাসন বিধানের কোন পরিবর্তন দরকার হবে না। ব্রিটেনের সঙ্গে কতকটা সন্ধি ব্যবস্থার মতো হ'ল—এই জাতিসংঘে থাকার সিদ্ধান্ত। কাজেই এই রাষ্ট্র সার্বভৌম।

এর পর এল—লোকায়ত্ত (democratic)। নূতন শাসন-বিধানে বলা হয়েছে—প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি একটি ভোটের অধিকারী হ'বে। তাদের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের শাসনভার চালাবে। এর পর আরও বলা হ'য়েছে—গ্রাম পঞ্চায়েৎকে শাসন-ব্যবস্থার নিম্নতম উনত (unit) হিসাবে গঠন করা হ'বে। এই রাষ্ট্রে সব নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে ;—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের শিক্ষার, জীবিকার ও অবসরের অধিকার থাকবে। ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রী এই রাষ্ট্রের মূল নীতি হবে। কাজেই এই রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ লোকায়ত্ত রাষ্ট্র বলাই উচিত।

এর পর এল গণতন্ত্র (republic)। সাধারণের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন এই রাষ্ট্রের কর্ণধার। কোন বংশানুগতিক অধিকার বলে কেউ এই রাষ্ট্রের পরিচালক হ'বে না। কোন রাজা বা সম্রাট, নবাব বা সুলতান এই রাষ্ট্রে থাকবে না। তাই এই রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রই বলতে হবে।

সার্বভৌম, লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিকরূপে ভারত—এক নূতন জীবন যাত্রা সুরু করল। আমরা আশা করি জাতির জনক গান্ধীজীর বাণী ও আদর্শ এই রাষ্ট্র পালন ক'রে চলবে।

—•—

পরিকল্পনা কমিশন।

ভারতের শাসন বিধান প্রণীত হবার পরই কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি (Working Committee) প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—ভারতের নূতন সমাজের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠার জন্য এক পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) স্থাপন করতে হবে। এই কমিশন কি করবে—তার

একটা আভাস-ও ঐ প্রস্তাবে দেওয়া হ'য়েছে। রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে পেয়ে সর্বপ্রথম দায়িত্ব হ'ল রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সংহতি বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সংহতি বজায় রাখতে না পারলে—কোন নূতন ব্যবস্থা কার জন্য এবং কোথায় স্থাপন করা হ'বে? কংগ্রেস প্রথম দেড়-দুই বছরে ঐ কাজ সুসম্পন্ন করেছে। অবশ্য ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ই ভারতের কতক অংশ আলাদা হ'য়ে পাকিস্থান রাষ্ট্র স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট অংশ-ও আকারে, বিচিত্রতায়, ধর্মে, ভাষায়—এক বিরাট দেশ। এর মধ্যে আবার প্রায় ছয় শ দেশীয় রাজ্য ছিল; ইংরাজ যাবার সময় এদের সবাইকে যথেচ্ছ আচরণের অধিকার দিয়ে গিয়েছিল। ঐ ৬০০ রাজ্যের বিলোপ সাধন ক'রে ভারতের বিশাল অঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, প্রদেশে প্রদেশে—বহুপ্রকারের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ছিল। এদের প্রত্যেকের আলাদা সত্তা মেনে নেওয়া হয়েছিল। আজ তা সবই অতীতের ব্যাপার। রাষ্ট্রের স্থায়ীত্ব ও সংহতি পুনঃস্থাপন ও রক্ষার বিষয়ে—এই দু'বছরে আমরা অনেকটা সফল হ'য়েছি। রাষ্ট্রের শাসন-বিধান-ও গঠিত হয়েছে।

তাই আজ দায়িত্ব আসছে—নূতন সমাজের পত্তন করা। এই দায়িত্ব পূরণের জন্যই এই পরিকল্পনা কমিশনের (Planning Commission) কথা উঠেছে। এই কমিশনের কাজ কংগ্রেসের আর্থিক ও সামাজিক আদর্শকে কাজে পরিণত করা। কংগ্রেস এত কাল জনতাকে বহু আশা দিয়েছে। জনতা আজ যেন অধৈর্য হ'য়ে উঠেছে;—সে সব আশা ও ভরসা পূরণ হ'বে কিনা এই সন্দেহ তাদের মনে আসছে। জনতার এই মনো-ভাবের সুযোগ নিচ্ছে ক্ষমতা-লিপ্সু অন্যান্য রাজনৈতিক দল। ইতিহাসের শিক্ষা সাধারণ জনতা জানে না; দুঃখ-দৈন্যের চাপে তারা অস্থির হ'য়ে উঠেছে;—কার্য-কারণ যোগাযোগ সহজে তারা বুঝতে রাজী নয়। তার উপর ঐসব দল জনমনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলছে,—কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষ্যাপিয়ে তুলছে। তাই এটা খুবই জরুরী প্রয়োজন যে কংগ্রেস তার আর্থিক ও সামাজিক আদর্শকে কার্যে পরিণত করে। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির এই সিদ্ধান্তকে তাই আমরা অভিনন্দিত করছি।

—০—

পরিকল্পনা কমিশনের গঠন ও কাজ—

এই কমিশনের কি রূপ হ'বে এবং ক্ষমতা ও দায়িত্ব কতকটা এর উপর এই কমিশনের সাফল্য নির্ভর করবে। রুষ বিপ্লবের পর বহু বছর পর্যন্ত ওখানকার লোকদের প্রাক-বিপ্লব অবস্থার চেয়ে-ও অনেক বেশী দুঃখ-দৈন্য গিয়েছে। বলশেভিক সরকার একটার পর একটা কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করেছে; আবার কিছুদিন পর তা বর্জন করেছে। অবশেষে তারা গ্রহণ করল "পাঁচ বছরের পরিকল্পনা (Five Years' Plan) এই পরিকল্পনার জন্য যে পরিষদ তারা করেছিল—নূতন সমাজ গঠন করার মতো ক্ষমতা ও দায়িত্ব সেই পরিষদের ছিল। অবশ্য রুষিয়ার পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনা আলাদা ধরণের; কিন্তু যে ধরণের-ই হ'ক, তার হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা না থাকলে এবং ঠিক দৃষ্টি-কোণ বিশিষ্ট লোক দিয়ে তা গঠিত না হ'লে—এই পরিকল্পনা পরিষদ দিয়ে আমাদের বিপ্লব পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'বে না।

এর জন্য দরকার কংগ্রেসের আর্থিক ও সামাজিক আদর্শে বিশ্বাসবান লোক দিয়ে ঐ পরিষদ গঠন করা। কংগ্রেস যে বিপ্লব পরিচালনা করছে—তার মূল কথা, এই ভাবে বলা চলে—সাধারণ মানুষ এক একটি আলাদা ব্যক্তি হিসাবে সামবায়িক সংগঠনের ভিতর দিয়ে উৎপাদন বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে একদিকে নিজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে, অপরদিকে বি-কেন্দ্রিত (decentralised) সমাজ গঠন করবে। আজ যা সমাজ—তাতে রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষমতা শীর্ষে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কেবল আমাদের দেশে নয়—সর্বত্রই এই ব্যবস্থা ও অবস্থা। স্তম্ভের নীচে যারা আছে, তাদের দায়িত্ব হ'ল কেবল ঐ স্তম্ভের ভার বহন করা। এই সমাজের পরিবর্তে গান্ধীজী চেয়েছিলেন বি-কেন্দ্রিত অর্থনীতির ভিত্তিতে সমাজ—যেখানে সামাজিক ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকবে।

পরিষদের প্রস্তাব হ'য়েছে, তার প্রধান বিকেন্দ্রিত (decentralised) সমাজ এই সামাজিক আদর্শে ও মতবাদে বিশ্বাসবান কে ভিন্ন অপরের ঐ সামাজিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার আওতায় হ'তে পারে না। যে যাতে বিশ্বাস করে না, তাকে সে কাজ করানো খুবই কঠিন। কাজেই এই পরিকল্পনা পরিষদের গঠনের উপর, আমাদের বিপ্লবের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।

তা ভিন্ন, এই পরিষদের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া দরকার যাতে নিজের পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করার অধিকার ও ক্ষমতা এই পরিষদের থাকা দরকার।

কেবল কি করা উচিৎ—এই অভিমত দেওয়াই এর কাজ হয়, তারে অন্যান্য বহু অনুসন্ধান কমিটির মতোই এর রিপোর্ট ধূলার নীচে চাপা পড়বে। আর্থিক ব্যবস্থার জন্য একে বহু মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর নির্ভর করতে হয়—তবে এই পরিষদের সার্থকতা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হ'বে। একটি বিশেষ আইনের (statute) বলে এই পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা দরকার,—কেবল কর্তৃপক্ষের এক হুকুমে একে প্রতিষ্ঠা করলে, এই ক্ষমতা স্বভাবতই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হ'বে। Statutory body—ব্যবস্থায়ক সংস্থা হিসাবে এর একটা আলাদা মর্যাদা ও অধিকার থাকা দরকার—যাতে পদে পদে মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর একে নির্ভর করতে না হয়।

পশ্চিম বাংলার বাজেট

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার আগামী (১৯৫০-৫১) বৎসরের বাজেট পেশ করেছেন। রাজস্ব খাতে আয় ব্যয়ের হিসাবে আগামী বৎসর ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ঘাটতি হ'বে বলে দেখা যাচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর মতে উন্নয়ন পরিকল্পনার খাতে ভারত গভর্ণমেণ্টের সাহায্য যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে না যেত তা হ'লে আগামী বৎসরেও ঘাটতি না হয়ে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যেত। চলতি বছরের ১৯৪৯-৫০ সালের সংশোধিত বাজেট অনুসারে যদিও রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে, চলতি বৎসরে রাজস্বের বাইরে থেকে ও ব্যয়ের খাতে (Expenditure outside Revenue account) প্রায় ৮ কোটী ১২ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে। এই বিরাট ঘাটতির কিছুটা পূরণ করা হ'বে চলতি বৎসরের রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে, আর বাকীটা পূরণ করা হ'বে গত বছরের (১৯৪৮-৪৯) উদ্বৃত্ত থেকে পাওয়া জমা অর্থ ভাণ্ডার (opening balance) থেকে। এই সমস্ত হিসাব নিকাশের পরে দেখা যাচ্ছে আগামী বৎসরের বাজেট এই বৎসরের উদ্বৃত্ত ৩ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা নিয়ে সুরু হবে। এ-থেকে মনে হ'তে পারে এই ৩ কোটী টাকা থেকে আগামী বৎসরের রাজস্ব খাতে ঘাটতি ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা বাদ দিলেও কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আগামী বৎসরে রাজস্ব থেকে ব্যয়ের বাইরেও যা খরচ হবে তাতে সেই খাতে প্রায় ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে। তাই সবটা মিলিয়ে মোটামুটি যা দাঁড়াল—অর্থাৎ রাজস্ব থেকে ব্যয় এবং রাজস্বের বাইরে ব্যয়—তাতে শেষ পর্যন্ত আগামী বৎসর প্রায় ২ কোটী ৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে।

একটা কথা এখানে মনে রাখা প্রয়োজন। ঘাটতি বাজেটে আশঙ্কিত হ'বার এমনি কোন কারণ নেই। ঘাটতি হ'ল এটা বড় কথা নয়, আসল কথা ঘাটতি কেন হ'ল, এটা পরিষ্কার ক'রে বোঝা। অর্থনীতির বিচারে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কোন ব্যয় সাময়িক ভাবে ব্যয়ের অঙ্কটাকে ভারী ক'রে তুলেছে মনে হ'লেও তার সবটাই শেষ পর্যন্ত শুধু অপচয়ের পর্যায়ে পড়ে না, বরং অবস্থা বিশেষে ভবিষ্যতে অনেকখানি আয়ের সূত্রপাত করে। গত মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এমনিই বাংলার আর্থিক কাঠামোর ওপর ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। তারপর বঙ্গভঙ্গ এবং তৎপরবর্তী ঘটনাসমূহ পশ্চিম বাংলার আর্থিক অবস্থার ওপর যে চরম দুর্গতি টেনে এনেছে একটা বলিষ্ঠ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীই তা থেকে বাংলাকে বাঁচাতে পারত ; এবং তাকে কার্যকরী ক'রে তোলার চেষ্টায় যদি ঘাটতি বাজেটের সমুদীন হ'তে হ'ত—তাতে আশঙ্কিত হ'বার কিছুই ছিল না। কিন্তু আগামী বৎসরের বাজেটে আমরা সেই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব পুরোপুরিভাবে লক্ষ করছি। যে কল্পনা থাকলে একটা পরিবর্তনের সূচনা বাজেটের আয় ব্যয়ের

পরিকল্পনায় স্পষ্ট হয়ে উঠত তার কোন লক্ষণই আমরা দেখতে পাই না। চিরাচরিত প্রথায় কোনরকমে আয়-ব্যয়ের হিসাবটাকে মেলাবার আপ্রাণ চেষ্টাতেই যেন বাজেট শেষ হয়েছে। তাই ভবিষ্যতকে গড়ে তোলবার, এমন কি নিতান্ত আশু প্রয়োজন হিসাবে পূর্ব বাংলা থেকে যে সমস্ত নিঃস্ব, নিঃসহায় মানুষ পশ্চিম বাংলায় চ'লে আসতে বাধ্য হয়েছে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করে তাদের সুস্থ, সবল, রাষ্ট্রসেবী নাগরিক হিসাবে গ'ড়ে তোলবার কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত আমরা পাই না। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর বিচার করার প্রচেষ্টার আছে অবশ্য অপ্রয়োজনীয় বাক্য-বিন্যাস, কিন্তু বাংলার সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় তার অর্থ-নৈতিক এবং সামাজিক শক্তিগুলোকে কি ভাবে কাজে লাগান যায় সে দিকে মনোযোগের একান্ত অভাব। বাজেটে ব্যয়ের হিসাবটাকে একটু লক্ষ করে দেখলে এ কথাটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়ে উঠবে।

১৯৪০-৪১ সালের মোটামুটি আয় ব্যয়ের অঙ্ক হচ্ছে যথাক্রমে ৩৩ কোটি ৮৯ লক্ষ এবং ৩৫ কোটী ২২ লক্ষ। পুলিশ, জনসংভরণ, নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য বিভাগ বা থেকে কোন আয় হয় না—তা চালু রাখতেই আয়ের একটা মোটা অংশ ব্যয় হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার যে বঙ্গ-ভঙ্গের পর পশ্চিম বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু তবুও পুলিশ খাতে পূর্বেকার বৎসরের মত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫ কোটি ৭৬।০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সমস্ত আয়ের শতকরা ১৯·৭ ভাগ; জনসংভরণ বিভাগ খরচ করবে প্রায় ১০ ভাগ এবং শাসন বিভাগ প্রায় ১০ ভাগ। এর তুলনায় উন্নয়ন খাতে এবং বাস্তুত্যাগী পুনর্বসতির খাতে ব্যয়ের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আশাপ্রদ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিভাগও অর্থমন্ত্রীর বিশেষ কৃপালাভ করতে পারেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভাষণের শেষ দিকে ধনাধিকারীদের পক্ষ টেনে অর্থমন্ত্রী যে সহানুভূতি সূচক মন্তব্য পেশ করেছেন তা অনেকটা অহেতুক উমেদারীর মত মনে হয়, এবং মাননীয় সরকার যে ঐ শ্রেণীরই একজন তা স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দেয়।

পরিশেষে একটা কথা এখানে বলা প্রয়োজন। আয়কর থেকে প্রদেশগুলোর যা প্রাপ্য তার শতকরা মোটে ১২ ভাগ বাংলাকে দেওয়া হয়েছিল। অথচ অবিভক্ত বাংলা পেত শতকরা ২০ ভাগ। কোন অঙ্ক থেকে কত আয়কর আদায় হয় সেই মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে বাংলা ভাগের পর পশ্চিম বাংলার প্রাপ্য থেকে শতকরা ৮ ভাগ কমিয়ে দেবার পেছনে কোন সঙ্গত কারণ নেই। দেশমুখ সিদ্ধান্তে যদিও বাংলার প্রাপ্য অংশ ১২ ভাগ থেকে বাড়িয়ে ১৩।০ ভাগ করা হয়েছে, তা'তে বাংলার প্রতি পুরোপুরি সুবিচার করা হয়েছে ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, সংগ্রহের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে পশ্চিম বাংলা এখনও ২০ ভাগেরও বেশী দাবী করতে পারে। যাই হোক, আমরা আশা করি, ফাইনান্স কমিশন ভবিষ্যতে এই প্রশ্নটাকে বিচার করবার সময় বাংলার বিশেষ সমস্যা গুলোর কথা মনে রেখে তার প্রতি সুবিচার করবেন।

দুর্গত বাংলা

পূর্ব বাংলায় ব্যাপক দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর সমস্ত ভারতকে চঞ্চল করে তুলেছে। যে সব খবর সেখান থেকে আসছে তা অত্যন্ত গুরুতর এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পশ্চিম বাংলায় মুসলমানদের উপর কিছু কিছু উৎপাত ও উপদ্রব হয়েছে। ভারতবর্ষের ও বাংলার বিভাগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ আমাদের স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছিল। তখন কংগ্রেস ও লীগ নিজ নিজ রাষ্ট্রের অন্তর্গত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং নাগরিক অধিকার প্রদানের দায়িত্ব নিয়েছিল। সেই পারস্পরিক দায়িত্বের ভিত্তিতেই দেশ বিভাগ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুতে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ওপর হামলা সুরু হল। তার ফলে পশ্চিম পাকিস্থান ও পূর্ব-পঞ্জাবের কার্যত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনতার অদল-বদল হয়ে গিয়েছিল।

বাঙালী হয়ত একটু আশাবাদী : হয়ত তারা কিছুটা ভাবপ্রবণও এবং সর্বোপরি বাঙালী হিন্দু বা মুসলমানের

মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কখনও খুব প্রবল ছিল না। তাই স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান এর পূর্বের এক বছরের তিক্ততা ও বৈরীভাব ভুলে আবার মৈত্রীর পথ অবলম্বন করেছিল। পশ্চিম বাংলার মুসলমানরা সহজ ও স্বাভাবিক জীবন পূর্বের মতই যাপন করছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম-কর্ম, শিক্ষা-দীক্ষা প্রায় পূর্বের ন্যায় অব্যাহতই চলছিল। আমরা জানি, দুষ্ট-বুদ্ধি লোক পশ্চিম বাংলারও যে একেবারেই নেই তা নয়। গো-কোরবানি, মহরম প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে দু'এক স্থলে মুসলমানদের ওপর কিছু নির্যাতন হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলার জনতা ও সরকার সাধারণ ভাবে ঐ সব দুষ্টবুদ্ধি লোকদের কখনও প্রশ্রয় দেয় নি; কোন ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

কিন্তু পূর্ব বাংলার ব্যবস্থা ও অবস্থা ক্রমেই যেন বিপরীত মুখে চলছিল। রাষ্ট্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলে বা অর্থনীতির স্বাভাবিক সূত্র অনুসারে যখনই জনসাধারণের যে কোন দুঃখ দৈন্য পূর্ব বাংলায় হয়েছে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ ও রাষ্ট্রের মুখপত্র ও মুখপাত্র বরাবরই জনতাকে বলেছে, তাদের এই সব দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী হিন্দুদের রাষ্ট্র 'হিন্দুস্থান' (প্রায়ই তারা এই দেশকে "ভারত" না ব'লে 'হিন্দুস্থান' ব'লে অভিহিত করে)। সঙ্গে সঙ্গে এমন ভাবও প্রচার করা হয়েছে যে পূর্ব বাংলার অধিবাসী হিন্দুগণ হিন্দুরাষ্ট্র হিন্দুস্থানের চর হিসাবেই ওখানে বাস করছে। হিংসা ও বিদ্বেষের বাতা প্রচার করেই এই আড়াই বছর পর্যন্ত জনতার মনকে তারা বিষিয়ে তুলেছে। এমন কথাও আমরা বলতে পারি যে বিদ্বেষ ও বিষ প্রচারের কাজে পূর্ব বাংলার সরকার কতকটা ক্রীড়নকের মতো উপরের হুকুম মেনে চলেছে। যে বিষ-বৃক্ষের বীজ তারা বপন করেছে সে বিষ-বৃক্ষ আজ বিষ ফল প্রদান করছে।

পূর্ব বাংলায় এবার যে দাঙ্গাহাঙ্গামা, অশান্তি ও উপদ্রব দেখা যাচ্ছে তার শুরু খুলনা ও বরিশালের কয়েকটী গ্রামে। উভয় ক্ষেত্রেই হিন্দুগণ নির্যাতিত হয়েছিল সাধারণ মুসলমান জনতার হাতে নয়, সরকারী পুলিস ও "আনসার" বাহিনীর হাতে। তারপর যে ব্যাপক হাঙ্গামার কথা আজ আমরা শুনছি তা প্রায় সর্বত্র শুরু হয়েছিল ১২ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে। ঢাকায় শুরু হয় ১০ই। তারপর, সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, ফেণী, বরিশাল, যশোর, খুলনা—সর্বত্রই কম বেশী—১১ই ফেব্রুয়ারী রাত হ'তে ১৫ইএর ভিতর হাঙ্গামাহাঙ্গামা ও উপদ্রব শুরু হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই তারিখে হাঙ্গামা-হাঙ্গামা হওয়া একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত করে। এই ব্যাপক ষড়যন্ত্রের খবর সরকার কিছুই জানত না—এটা সরকারের পক্ষে খুব সুখ্যাতির নয়। পাকিস্থানের সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদ পত্র দিনের পর দিন—হিন্দু ও ভারতের প্রতি বিষ উদ্গার করছিল, চট্টগ্রামের দুখানা কাগজও এই বিষয়ে 'আজাদের' অনুকরণ করছিল। অথচ পূর্ব বাংলা সরকার ঐ সব কাগজের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি।

আজ লক্ষ লক্ষ হিন্দু গৃহ হারা ও নিঃস্ব হয়ে পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে বের হয়েছে এবং আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু বের হবার উপক্রম করছে। যারা এমনি ক'রে বের হচ্ছে, মাঝ পথে তাদের আটকাবার চেষ্টা হচ্ছে, তার ফলে এদের দুর্গতি ও দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গৃহহারা নিঃস্ব লক্ষ লক্ষ লোকের বুকে যে আগুনের স্ফুলিঙ্গ পুঞ্জীভূত আছে, তা থেকে সমস্ত দেশে আগুন জ্বলবার সম্ভাবনা আছে। যদি সেই আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে জ্বলে-পুড়ে মরবে উভয় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান। এই হাঙ্গামা-হাঙ্গামা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে;—এই সম্পত্তিও বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের—ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে।

অথচ ভারতের অন্যান্য বহু প্রদেশের চেয়ে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান অনেক কম সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন। গ্রামে গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান পারস্পরিক সৌহার্দ্যে বরাবর বাস করেছে। এই হিংস্র উত্তেজনার মধ্যে বহু ঘটনা আমরা শুনেছি—যেখানে মুসলমান নিজের জীবন বিপন্ন করে হিন্দুকে আশ্রয় দিয়েছে এবং হিন্দু বিপন্ন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছে। আমরা স্বয়ং সাংসারিক

বুদ্ধিহীন আশাবাদী,—কিন্তু আমরা মনে করি, আজও বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সব হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই—যারা আজ দাঙ্গা ও ও উৎপাৎ সৃষ্টি করছে বা তাতে উসকানী দিচ্ছে—তাদের মধ্যে নয়। বাংলা বিভাগের পূর্বে ও পরে আমরা বহুবার পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করেছি। আমরা বরাবরই মনে করেছি—এই বিভাগ অস্বাভাবিক এবং একটা অস্বাভাবিক মনোভাবের প্রতিক্রিয়া। আমরা এও মনে করেছি—এই বিভাগ সত্ত্বেও বাংলার এই দুই অংশ ও দুই সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি মৈত্রীভাব নিয়ে বাস করতে পারবে।

বর্তমানের অবস্থায় সে আশা পোষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী সুদূরে দৃষ্টি রেখে চলতে পারে—এই বিশ্বাস আমাদের আছে। আজকার ঘটনায় তার সুদূরের দৃষ্টিকে সে পর্ব করবে ব'লে মনে করি না। আজ যা চলছে—তা জনসাধারণের কলহ নয়; তা কার্যত দুই রাষ্ট্রের কলহ। ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল এই সমস্যা মিটাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। কোন্ উপায়ে বা কোন্ পন্থায় তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন করবেন, সে ভাবনা পণ্ডিতজীর ও তাঁর মন্ত্রী-মণ্ডলীর। সাধারণ নাগরিক যদি নিজেদের তরফ চ'তে পাল্টা-পাল্টি দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু করে, তার ফলে নিরীহ জনসাধারণেরই দুঃখ কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। পণ্ডিত জওহরলাল এ কথাও স্বীকার করেছেন যে পূর্ব বাংলার সমস্যা আজ সব চেয়ে গুরুতর এবং এর সমাধান অবিলম্বে হওয়া দরকার। পণ্ডিতজীর এই উক্তির পর—ভারতের জাতীয় সরকারের উপর আমাদের নির্ভর করা উচিত; শুধু তাই নয়, ভারতের অভ্যন্তরে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে—ভারত সরকারের নৈতিক ও বাস্তব শক্তি বৃদ্ধি ক'রে তাকে সাহায্য করা উচিত।

আজ এই চরম বিপদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের যেন বুদ্ধি ভ্রংশ না হয়;—গীতা বলেছেন বুদ্ধি-ভ্রংশ হ'তেই বিনাশ। বাংলা বিভক্ত হ'লেও বাঙ্গালী আজও অবিভক্ত। হিন্দু বা মুসলমান যে কোন বাঙ্গালী যেখানে যা থাক, তাতে বাঙ্গালীর মন-প্রাণই নষ্ট হচ্ছে।

স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র বসু—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শরৎচন্দ্র বসু দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দিন অসুস্থ শরীর নিয়ে দীর্ঘ সময় ব'সে তিনি তাঁর দৈনিক কাগজ Nationএর জন্য এক প্রবন্ধ মুখে বলে যান;—কেরাণী তা লিখে নেয়। হয়ত ঐ প্রবন্ধ রচনা করার শ্রম তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিরিক্ত হয়েছিল এবং হয়ত তারই ফলে প্রবন্ধ শেষ করার অল্প পরেই তিনি বিশেষ অসুস্থ বোধ করেন এবং দু ঘণ্টার মধ্যে তাঁর জীবনী শক্তি ফুরিয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এক সময় ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তিনি ছিলেন সাংসারিক লোক; প্রধানত দেশবন্ধুর আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে এবং কনিষ্ঠ সুভাষচন্দ্রের প্রতি স্নেহের বশে তিনি রাজনীতির আবর্তে এসে পড়েন। সুভাষচন্দ্রের প্রতি তাঁর ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী বসুর স্নেহ ছিল অসাধারণ। আমরা জানি, সুভাষচন্দ্রের কত ছোট খাটো অত্যাচার ও দাবী তাঁর মেজদা শরৎ বাবু ও তাঁর মেজ বৌদি হাসিমুখে সহ্য করেছেন।

ঐ দুই আকর্ষণে রাজনীতির মধ্যে এসে পড়ে—শরৎ চন্দ্র তাঁর স্বাভাবিক বেহিসাবী ও উদার মনোভাব নিয়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশ স্বাধীন হয়েছে; আজ ক্ষমতার কাড়াকাড়ির মধ্যে শরৎচন্দ্র আসেন নি। কংগ্রেসের সঙ্গে ইচ্ছা করলে থাকতে পারতেন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে, বাংলায় বা কেন্দ্রে তাঁর জন্য উচ্চ ও সম্মান জনক স্থান নির্দিষ্ট থাকত। কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন—নিজের স্বাধীন মতের জন্য কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে ক্ষমতাহীন রাজনীতি। তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের মতের পার্থক্য বহুবার হয়েছে; তাঁর মতের তীব্র সমালোচনা আমরা বহু সময়ে করেছি। কিন্তু তাঁর স্বাধীন-চিত্ত ও উদার ভাবকে আমরা বরাবর শ্রদ্ধা করেছি। ঘনিষ্ট সংস্পর্শে এসে তাঁকে ভালভাবে জানবার সুযোগ

আমাদের হয়েছে। তাঁর সহৃদয়তা, পরোপকার স্পৃহা, দেশের জন্য ও মতের জন্য লাঞ্ছনা বরণের ক্ষমতা, তাঁর দেশপ্রেম সাধারণের নিকট সুপরিচিত।

বাংলার এই সঙ্কট সময়ে শরৎচন্দ্রের তিরোভাব আরও বিশেষ ক'রে বিষাদের। বাংলার এই সমস্যা নিয়ে তিনি গভীর ভাবে চিন্তিত ছিলেন এবং এই সমস্যার সমাধান নির্বিরোধ চেষ্টাতে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত কেটেছে। তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অশোককে তাঁর কৈশোর হ'তে আমরা জানি। আজকার তাঁর পিতৃ-বিয়োগের দিনে আমরা বিশেষ ক'রে তাঁকে স্মরণ করছি।

স্বর্গীয় হরেন ঘোষ—

হাওড়ার হরেন ঘোষ—এই ছিল তাঁর পরিচয়। গত কয় বছর যাবৎ তাঁর সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক মতের পার্থক্য হয়েছে। কিন্তু তবু-ও তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের স্মৃতি মুছে যায় নি। সজ্জন, দেশসেবী, অমায়িক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। সর্বোপরি ব্যক্তিগত ভাবে তিনি আমাদের বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু সংবাদে আকস্মিক বন্ধু-বিয়োগের বেদনা আমরা অনুভব করছি। এই সর্বত্যাগী দেশ-সেবীর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি;—পরলোকগামী বন্ধুর প্রতি আমাদের প্রীতির কথা-ও স্মরণ করছি।

আগামী বাৎসরিক সংখ্যা

—ঃ মন্দিরা ঃ—

বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া

১৫ই বৈশাখ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

পরিচয়

দ্বাদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৫৬ | দ্বাদশ সংখ্যা

নান্নার সাথী

(দুর্ভিক্ষের গল্প)

উৎপল

মোবারক বলল—"এখন চাউল ছেড়ে দিলে, পরে মুস্কিলে পড়তে হ'বে, অথচ সরকারের দালাল এসেছে-দারোগা বেটা-ও বলছে চাউল ছেড়ে দিতে হ'বে। ত' অনেক ভাল ভাল কথা বলছে।"

নিধি বলল—"সরকারের দালাল যখন এসেছে—আর থানার দারোগা তার সঙ্গে মিলেছে তখন চাউল দিতেই হবে। ভাল হবে কি মন্দ হবে সে কথা বিচার ক'রে লাভ নেই।"

করিম বলল—"আমাদের মেহনতের ফসল; এসে বলল, আর অমনি ছেড়ে দেব, তা হয় না। গতরের রক্ত জল ক'রে এই ধান পয়দা করেছি; দুষ্মন গ্রাম পরের হাতে ছেড়ে দিও না ভাই; পরে পস্তাতে হবে।"

বাবর বলল—"কিন্তু রাখব কি ক'রে। সরকার জোর ক'রে কেড়ে নিলেই বা কি করতে? এ ত' তবু দিচ্ছে।"

এই আলোচনার মধ্যে এসে উপস্থিত হ'ল হীরালাল তাকে দেখে সকলেই একটু সঙ্কুচিত হ'ল। হীরালাল তরুণ যুবক; দিবসের কর্ম-ক্লান্তির ছাপ তার অঙ্গে ও বসনে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে কলেজের ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পর এসেছে গ্রামে। দিন রাত সে এ গ্রাম থেকে ও-গ্রামে ঘুরছে

"করিম, তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। বলল—এখানে তোমরা সবাই আছ পেয়েছি—ভালই হ'ল।"

বাবর বলল—"আমরা একটু নিজেদের আলাপ করছিলাম আপনার কি এখন..

হীরালাল—"আমি-ও ত' বলতে এসেছি। 'মিনিট' আমি বলছি—তারপর না হয় আমি চ'লে যাব। তোমাদের নিজেদের আলোচনার ব্যাঘাত করব না।"

করিম বলল—"না, আপনার কথা আগে শুনি। আপনাকে শুনতে হবে।"

হীরালাল এদের সঙ্গে মাদুরে ব'সে বলল—"সরকারের দালাল এসেছে—চাউল কিনে নিতে। এতদিন আমরা তোমাদের সকলের কাছে যা বলেছি—সরকারের মতলব হ'ল ঠিক তার উল্টো। আমরা যা বলেছি, তা আমাদের নিজেদের কথা নয়—আর কেবল তোমাদের এই গ্রামের জন্ত-ও নয়। লক্ষ গ্রাম আছে আমাদের এই ভারতবর্ষে —আমাদের এই দেশে এর প্রত্যেক গ্রামের চাষী, মজুর,

ভদ্র সবাইকেই ঐ একই কথা বলা হয়েছে—প্রত্যেক গ্রাম থেকে, ঘরে ও আত্মরক্ষায় স্বাবলম্বী হও। আজ সরকারের বারণ এসেছে—তোমাদের ঘরের সব চাউল কিনে নেবে।"

কাবর বলল—"আমরা তা ঠেকাব কি করে?"—থানার দারোগা পুলিশ সবই ত' এই সঙ্গে আছে। তার উপর আপনাদের ভদ্রলোকেরাও এর সঙ্গে যোগ দিবে। এখন-ই ত' ওপাড়ার রাখাল বাবু বলছে—এই যুদ্ধে সরকারের মদৎ করতে— সরকারের হাতে চাউল ছেড়ে দিতে বলছে—নইলে নাকি জাপানীরা এসে সব কেড়ে নেবে।"

হীরালাল বলল—"জাপানীরা এলে হয়ত চাউল কেড়ে নেবে;—জানিনা তারা কি করবে। জাপানীরা কবে আসবে, মোটে-ও আসবে কিনা, জানিনা। কিন্তু তারা আসবার আগেই যে চাউল ছেড়ে দিচ্ছ, এটা কোন্ বুদ্ধিমানের কাজ!"

এমনি সময় ঘরের মধ্যে চুকল হল-বল সহ দারোগা। সে হীরালালকে বলল—"জেলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, হীরালাল বাবু। D. I. R. অনুসারে আপনাকে গ্রেফতার করা হ'ল। মোহন সিং, ছাদির আলি, এই বাবুকে নিয়ে গারদে রেখে দাও; আমি এদের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসছি ..."

মোহন সিং ও ছাদির আলি কনেষ্টবল হীরালালকে গ্রেফতার করল; দারোগার কথা শেষ হ'লে, হীরালাল বলল—"দারোগা বাবু—জেলে যাবার ভয় দেখাচ্ছেন, পরাধীন দেশে যখন জন্মেছি, তখন আর জেলের ভয় করলে আমার চলবে কেন!... ...তবে আমার কথা আমি এদের বলেছি;—আপনার সামনেও আবার তার পুনরাবৃত্তি করছি—চাউল তোমরা ছেড়ে যদি দাও, তবে ভুল করবে; জাপানী কবে আসবে জানিনা;—কিন্তু দুর্ভিক্ষ তোমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে।...নিজের সম্বল ও শক্তির উপর নির্ভর ক'রে গ্রামে গ্রামে তোমরা সংঘবদ্ধ হও—আর..."

দারোগা বন্দুক দিয়ে বলল—"থামুন আপনি।... মোহন সিং...

মোহন সিং হীরালালের হাত ধ'রে বলল—চলুন বাবু।"

হীরালাল—"হাঁ, চলব বৈকি—ভাইগণ, তোমরা কংগ্রেসের কথা শুনে চলতে চেষ্টা করো। আর কেউ তোমাদের বন্ধু নেই।... আর যারা তোমাদের কাছে আসবে—তারা সবাই সরকারের চর—তোমাদের বন্ধু নয়। চাউল তোমরা ছেড়ো না।... চল মোহন সিং..."

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন দারোগা আবার সমবেত কৃষকদের সম্বোধন ক'রে বলতে লাগল—"তারপর দেখ হে, সরকার তোমাদের ভালর জন্যই এ ব্যবস্থা করছে—সরকারের হাতে চাউল ছেড়ে দিলে, তবু ত' চাউল দেশেই থাকবে, তোমাদের দরকারের সময় পাবে। কবে জাপানীরা এসে সব চাউল নিয়ে যাবে, তখন ত' মাথা কপাল চুকলেও এক মুঠা চাউল পাবে না।"

করিম বলল—"জাপানীরা কি আসবেই, দারোগা বাবু? হীরালাল বাবু ত' বলছেন—জাপানীরা যে আসবেই তার স্থিরতা নেই, যদি সকলে মিলে বাধা দেই, তবে হয়ত না-ও আসতে পারে।"

দারোগা—"দু মাসের মধ্যে কতগুলি দেশ জয় ক'রে চলে এল—কত বড় ইংরাজ রাজই তাকে রুখতে পারলনা;—ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, আমেরিকা সবাই মিলে তাকে রুখতে পারল না। এখন বাকি আছে তোদের হীরালাল।...ওসব তর্ক ছেড়ে দে, এবার শ্রীঘরে গিয়ে সে জাপানীদের সঙ্গে লড়াই করুক।...চাউল কবে দিচ্ছিস, তাই বল।"

মোবারক বলল—"হুজুর, চাউল দিলে খাব কি?"

দারোগা—"ঐ হীরালাল ছোকড়া তোদের সকলের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। রাখাল বাবুকে চিনিস ত'?—সে-ও ত' স্বদেশীওয়ালা; সেই বাবু তোদের কি বলেছে? ওহে কুঞ্জ রাখাল বাবুকে ডেকেছিলে?—কখন আসবেন?"

কুঞ্জ বলল—"তাকে বাড়িতে পাই নি; বলে এসেছি আপনার কথা।"

নিধি বলল—"তিনি ত' বলেন—সরকারই আমাদের খাওয়াবে। তিনি বলেন—আমাদের ঘরে চাউল না

থাকলে, জাপানীরা এসে-ও খাবার না পেয়ে ফিরে যাবে।"

করিম—"কিন্তু দেশে যদি খাবার না থাকে, তবে জাপানীরা ত' যেন ফিরে গেল; কিন্তু আমরা খাব কি—করবই বা কি?"

দারোগা ক্রুদ্ধ স্বরে বলল—"করিম, তোমার জন্য-ও কি হীরালাল ছোকরার মতো ব্যবস্থা করতে লাগবে? ভাল কথায় বলছি তাতে যদি কাজ না হয়, তবে সরকারের কাজ আটকে থাকবে না—তা মনে রেখো। কথায় যা হবে না—লাঠিতে তা হবে। তবে সরকার সেই পথ নিতে চায় না!... কেমন, তবে কালই সকলে চাউল দিচ্ছ, তাই ত?"

নিধিরাম বলল—"হুজুরের হুকুম যা কথা কি কখনও অমান্য করতে পারি। কালই চাউল দিয়ে দেব;—এই ত' সকলের মত, তাই না?"

বাবর—"তা ছাড়া আর কি হবে; কিন্তু হুজুর দেখবেন—আমরা যেন না খেয়ে মরি না।"

দারোগা উচ্চ হাস্য সহকারে বলল—"তোরা ক্ষেপেছিস—ইংরাজ রাজত্বে কেউ না খেয়ে মরে—দেখেছিস কখনও? সে ভয় নাই তোদের।...তবে সকলের-ই ত' এই মত!—কি বল করিম, কি বল বাবর?"

বাবর বলল—"সকলের মত হ'লে আমারও মত।"

করিম বলিল—"আপনার যখন এই হুকুম, তখন আর উপায় কি?"

•

বর্ষার প্লাবন সুরু হয়েছে। করিম ছিল একাধারে চাষী ও মজুর! চাষে যা পেত, দিন-মজুরী ক'রে তার চেয়ে কম পেত না। হরেক রকমের দিন-মজুরী ই সে করত। গরার দিনে, সে কখনও ঘরামী, কখন-ও মেঠেল, কখন-ও বাগানী—যখন যে কাজ জুটত, তাই সে করত। বর্ষার দিনে চাষের কাজের পর যে সময় পেত, তখন নৌকা চালাত। ছোট্ট তার ডিঙ্গী; নদী, খাল, বিল—কোথাও তার গতির বাধা ছিল না। আজ তার সেই ডিঙ্গী নেই; জাপানীরা আসবে—ডিঙ্গী কেড়ে নিয়ে দেশের এখানে—ওখানে চলাচল করবে, তাই আগে-ভাগেই সব ডিঙ্গী সরকার সরিয়ে নিয়েছে।

করিম ঘরের দাওয়ায় ব'সে আছে; হাতে হুকো। কখন তার তামাক পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে। ঘরে খাবার নেই। বাইরে কাজ নেই। করিমের বৃদ্ধ পিতা রহিম ঘরের ভিতর আছে। উপর থেকে যেমন বর্ষার জল পড়ছে, তেমনি নদীর জল বেড়ে বাড়ির উঠান পর্যন্ত এসেছে। বৃদ্ধ রহিম বলল—"করিম, নৌকা কি আর পাওয়া যাবে না রে?"

করিম বলল—"যদি ফেরৎ-ই দেবে, তবে তারা নিয়ে গেল কেন, বাপজান?"

রহিমের দুর্বল পঞ্জর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হল; সে চুপ ক'রে রইল। কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল—"করিম, জাপানীরা আসবে, আসবে যে সবাই বলছিল, তারা তবে আসবে রে?"

করিম—"ও কথা বলো না, বাপজান।"

রহিম—"কেন বলব না, করিম? ওরা-ই ত' বলছে—জাপানীরা আসিবে—চাল নিয়ে যায়, নৌকা নিয়ে যায়! সবই নিয়ে গেল—ঐ জাপানীদের নাম ক'রে। কিন্তু জাপানীরা ত' এল না। এলে পর দেখতাম—কি তারা করে—করিম, আবার যে জ্বর আসছে।...ঐ কাপাটা আমার গায় দিয়ে দে।"

ঘরে আহার নেই, ঔষধ নেই, পথ্য নেই দেহে শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, সামর্থ্য নেই; মনে শান্তি নেই, সন্তোষ নেই, আত্মবিশ্বাস নেই। এমনি ক'রে তাদের দিন চলছিল। আধ পেটা খেয়ে—কখনও বা না খেয়ে, কখন-ও বা ভিক্ষায়, কখনও বা ভ্রমে, কখন-ও বা দেনায়, তাদের দিন কাটছিল। তাদ্রের খন্দের শস্য সামান্যই পেয়েছে। এখন আর দিন চলে না।

সে দিন নবীন চক্রবর্তী এল। যে গৃহস্থ নিজেরাই খেতে পায় না, তার ঘরের গাভী বা ষাঁড় বা কোন গৃহ-পালিত জন্তু ত' খেতে পাবেই না। রহিমের হালের বলদটা বাড়ীর বাইরে প'ড়ে আছে। নবীন ঠাকুর বলল—"আরে রহিম। এই ষাঁড়টার এই অবস্থা করছিস;—আচ্ছা পাবও ত' তুই; বোবা জন্তু বলে কি এমনি না

খাইয়ে মারতে আছে ?"

রহিম বলল—"কি করব, ঠাকুর মশায় নিজেরাই খেতে পাই না, ওকে কি খেতে দেব ?"

নবীন—"নিজেরা খেতে না পেলে-ও গৃহস্থঘরের জন্তু জানোয়ারকে কেউ উপোস করিয়ে রাখে না ; আর এ ত, ছ'শ তোর হালের বলদ। খেতে দিতে না পারিস, বেচে ফেল না।"

রহিম—"এটা হ'ল আমার নাল্লা ; কোন পরাণে একে বেচব ! কত বছর আমার ঘরে আছে ? ওরে আমার সঙ্গে কথা কয়, দাদা ঠাকুর !"

রহিম এগিয়ে গিয়ে বলদটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলাতে লাগল। বলদটা লেজ-ও শিং নেড়ে তার আনন্দ প্রকাশ করল। রহিম বলল—"ঠাকুর মশায়—কত বছর এটা আমাদের বাড়ি আছে ! সবাই একে নাল্লা ব'লে ডাকি—নাল্লা, নাল্লা....."বলদটা উঠে দাঁড়াল ; আজ সে বৃদ্ধ হয়েছে, তার উপর চলছে অনাহার। অস্থি-চর্মসার রুগ্ন কদাকার চেহারা নিয়েই সে লেজ নাড়তে লাগল ; জিভ দিয়ে রহিমের গা'র এখানে-ওখানে চাটতে লাগল।

নবীন বলল—"এই বুড়ো রোগা বলদটা রেখে কি করবে, এটাকে বেচে ফেলো। বেচবে ?"

রহিম—"না, ঠাকুর মশায়, তা পারব না। এত বছর এর লেজনতের রোজগার খেয়েছি, আজ একে বেচে দেব—তা পারব না।..."

নবীন—"এই ত' তোদের দোষ, অবস্থা বুঝবিনা। মাটি কামড়ে পড়ে থাকবি। তার ফলে-ই ত' আজ না খেয়ে মরছিস।...এই আধমরা বলদটা দিয়ে কি কাজ তোর হবে ? লাভের মধ্যে—নিজেরাও খেতে পারছিস না, এটাকে-ও না খাইয়ে মারছিস। একদিন এর গলা জড়িয়ে ধ'রে ম'রে থাকবি !.....ভাল কথা বললাম—শুনলি না ; স্বয়ং খোদা এলেও তোদের ভাল কেউ করতে পারবে না।..."

নবীন ঠাকুর চলে গেল ; কিন্তু রহিমের দিন আর চলে না। তাই কয়েক দিন পর ১৫৲ টাকার বিনিময়ে বলদটা নবীন ঠাকুরের খোয়াড়ে গেল।

আর-ও এক মাস কেটে গেল। শ্যামচাঁদ-লক্ষ্মী আর শুভাগমন ক'রে এলেন এবং চলে-ও গেলেন। কিন্তু বাংলার পল্লীর হাল ফিরল না ; ভাটার টানে তার সুখ-সম্ভোগ সবই নেমে গেল। জীবনের তলানি টুকু-ই কেবল বাকী আছে। করিম ও রহিমের দিন আর চলে না। করিমের দেহে তখন-ও যৌবনের শক্তি রয়েছে ; তাই সে তখন-ও কিছু শক্ত আছে ; কাজ কর্মের ধান্দায় ও তাকে কিছু ঘুরতে হয়। কিন্তু বৃদ্ধ রহিমের অবস্থা খারাপ। খাবার জোটার চেয়ে না জোটার দিনই বেশী ; ম্যালেরিয়া প্রায় নিত্য-সঙ্গী হয়েছে। এমনি সময় একদিন করিম এসে বলল—নবীন চক্রবর্তী নাল্লাকে মাস খানেক খাইয়ে তাগড়া করেছিল ; তারপর তাকে পল্টনী ঠিকাদারদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করেছে। ঠিকাদার নাল্লাকে আজ নিয়ে যাবে।

(শেষাংশ ৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী

(পূর্বানুবৃত্তি)

সকালে শচী কেমন নিবিষ্টভাবে ছেলেদের ঘুম থেকে ডেকে দিত। তারা তৈরী হয়ে এলে তাঁত বুনতে লেগে যেত। দুপুরে খেয়ে দেয়ে খানিকটা বিশ্রাম ক'রে আবার তাঁতে বসত। সন্ধ্যায় একটু হরিনাম করত। তারপর আবার তাঁত চালাত। রাত্রে আহার করে শুত।

সকালে বৌরা উঠে ঘরবাড়ী নেপাপোছা ক'রে তক্-তকে ক'রে রাখত। বাসনগুলি ঘাটে নিয়ে গিয়ে মেজে নিয়ে আসত; শচী মুড়ী ভেজে সবাইকে জলযোগ করাত। মেয়েরা রান্নায় লাগত। শচী আহ্নিক সেরে গিয়ে বউদের ছেড়ে দিত। নিজে রান্নার কাজে লেগে যেত। কেমন চমৎকার শচীর কথাগুলি।

সীতারামের বাড়ীতে মেয়েরা নিজেদের মাথার চুল দিয়ে পরের পা মোছাতে দ্বিধা করে না। সীতারাম বলে কিভাবে কখন ভগবান আসেন তা কে বলতে পারে? শ্রদ্ধায় সব অতিথির সেবা করে গেলে ঠকতে হবে না। ভগবানের দেখা কি এমনি পাওয়া যায়। ভাগ্য চাই। অতিথির ছেলে বুড়ো বাছতে নেই। তিনি কোনরূপ না ধারণ করতে পারেন? রাধা মাধব, রাধা মাধব।

গোপাল নগরের রজনীর কথাও তার মনে পড়ে। সে একটু অন্য ধরণের। আমি মাংস, ডিম এসব তখনও পর্যন্ত ছুঁতাম না। মায়ের কাছ থেকে ভাতে ভাত রাঁধা শিখে নিয়েছিলাম। সেই ভরসায় বিদেশে বেরিয়ে পড়েছিলাম। রজনীর বউ আমাকে সব সময় কাছে কাছে রাখত। সকাল থেকে রাত্রে যে পর্যন্ত না আমি ঘুমিয়ে পড়তাম বউটি আমাকে নিয়ে একটা না একটা কিছু করত। সকালে মুখ ধোবার জন্য জল ও ঘুঁটের ছাই দিয়ে যেত। মুখ ধোয়া হলেই গুড়, মুড়ি ও দুধ এনে দিত। বউটির যত্ন অতি অমায়িক। ওদিকে রান্না ঘরের কাজ তাকে নিজেকে করতে হত। রজনীও সকালে উঠে গরু ও লাঙ্গল নিয়ে মাঠে চলে যেত। বেলা আন্দাজ আটটার সময় তাকে মাঠেই সদ্য ভাজা মুড়ি পাটিয়ে দেওয়া হত। রজনী দুপুরে বাড়ী এসে তেল মেখে স্নান ক'রে আসত। তারপর যা কিছু রান্না হয়েছে তাই খেয়ে একটু বিশ্রাম করত। বিকেলে তার কিছু কাজ থাকত না সে মাঠে দেখতে যেত কিম্বা অপর কারুর বাড়ী চলে যেত। রজনী অপুত্রক।

বউটি আমায় রান্না ঘরে বসিয়ে গল্প করত। আমাদের বাড়ীতে কে কে আছে; কটি ভাই, কটি বোন। বোনেদের কার কার বিবাহ হয়েছে, কোথায় হয়েছে; তাদের ছেলে পেলে কি—ইত্যাদি। তরকারী রাঁধতে রাঁধতে কড়াইয়ের উপর ঠন্ ঠন্ শব্দে পুন্তি নাড়তে নাড়তে গাইত—"আমার কেয়ো ধানের ভাত গো দিদি, সোজনা শাক ভাজব"।

রজনী দুপুরে বাড়ী আসার আগে বউটি আমাকে তেল মাখাতে বসে যেত। অজস্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমায় নিজের হাতে তেল মাখতে দিত না। তারপর আমায় পুকুরে সঙ্গে ক'রে নিয়ে নিজ হাতে গাত্র মার্জনা করে দিত। সে নিজে ডুব দিলে আমার ডুব দেওয়া হয় না বলেই সেটুকু আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। পুকুরে কিছু লাল শালুক, সাদা শালুক, সুঁদি শালুক ছিল। এগুলি ছিল অদূরে। বেশী দূরে ছিল শ্বেত পদ্ম। আমার জন্য নিজে সাঁতরে গিয়ে পদ্ম এনে দিত। আমি সাঁতার জানা সত্ত্বেও সে কিছুতেই আমাকে গলা-জলের ওধারে যেতে দিত না।

বউটির আমাকে এত যত্ন, এত স্নেহ! দুপুরে আমি ঘুমিয়ে উঠলে কাঁচা আম এনে, ছুলে, কেটে নুন দিয়ে জড়িয়ে নিজ হাতে খাওয়াত। বউটি রান্নাঘরে আর আমি যদি কোন রকমে বাইরে থাকতাম রাখাল ছাসের ডিম ঘুরে থেকে দেখিয়ে আমাকে চটাত। রাখালের বাড়ীতে হাঁস ছিল। পিছনে ফিরে দেখে নিত বউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না, তখন কাছে এসে বলত—"এই জিনিসটি কি বল দেখি? এ এক রকম আলু। একে বলে ব্রজের আলু। গোয়ালার বাড়ীতে এটি না জোটায় দুঃখে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গিয়েছিল, জানলে?"

আমি বিরক্ত হয়ে "যাও এখান থেকে বলছি" বলে চেঁচিয়ে উঠলে বউ ছুটে আসত, আর তাড়াতাড়ি রজনী সেখান থেকে পালিয়ে যেত। "যেমন কপাল! ঘরে বালকের রব নাই। যদি বা ভগবান দিলেন একজনকে এনে, তা তাকেও তাড়া করছে, লজ্জা লাগে না?" "তুমি এস আমার সঙ্গে, মানিক আমার" বলে আমার হাতটি ধরে রান্নাঘরে নিয়ে যেত। একটা চট্ কিম্বা গামছা বিছিয়ে দিত বসতে। আমাকে অনেক কাকুতি মিনতি ক'রে বলত—"বল আমার কাছে থাকবে? বল চলে যাবে না?"

একদিন রজনী আমাকে বলল—"ওপাড়ীতে থিয়েটার হবে, যাবে?" আমি থিয়েটারের নাম শুনেছি, কখনও দেখিনি, সে লোভ সামলাতে পারলাম না।

রজনী নির্দিষ্ট রাতে আহারাদির পর কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে আমাকেও নিয়ে চলল। আমি যথাস্থানে পৌঁছালে দেখলাম মাঠে কয়েকটা খুঁটো পুতে তার মাথায় একটা চটের চাঁদোয়া করা হয়েছে। আলো বা আসরের তখন কিছু নাই। খানিক বসে বসে চুলতে লাগলাম। লোকেরা বলাবলি করছিল। গেলবারে ধান ভাল হয় নাই। হস্তা, না কোন নক্ষত্রের জলটা মোটেই পাওয়া গেল না। রোহিণীর জলই হয়েছিল কম। রোয়ার কাজ তেমন দুরমত হতে পারে নি। "রোহিনীর জল, মৃগশিরার তাপ, আর্দ্রার ভেজামাটি, তবে ধান হয় পরিপাটি।" এ বছর ভগবান করেন যেন, সুবৃষ্টি পাওয়া যায়। আউসের আশা রাখতেই হবে। তাতটা হলে তবুকারী কোন রকমে জুটে যাবে। "নোটে খেটে আড়ায়ে, সজনে বারমাস।" কিছু না হ'ক সজনে শাক দিয়ে ভাত উঠে যাবে। তারপর হল নানা রকম খাজনার কথা, দেনার কথা। চাষীর দেনার জন্ম, দেনায় মৃত্যু। এঁয়ো রোগে হালদারদের গোয়াল খালি হয়ে গেল। কি করে কি হবে? ঘুমে আমার ঘাড় লটকে আসছিল। রজনী আমায় জাগিয়ে রাখার জন্য বলল—"শুধু ভাত খাও, তাই এত ঘুম। এখুনি থিয়েটার আরম্ভ হবে। ঘুমালে দেখবে কি করে?" এ ঔষধে বেশী কাজ হল না। আরও তীব্র ঔষধের প্রয়োজন। সে বলল "কত বলেছি ঠাকুর, ব্রজের আলু খাও। তা কিছুতেই বা করবে না', যদি গোল আলুই খাও ত ব্রজের আলু কি দোষটা করল?"

এবার ঔষধ ধরল। আমি রেগে উঠলাম। ঘুম চটে গেল। কিন্তু সেও ক্ষণিক। বেগতিক দেখে রজনী নিজের গামছাখানি পেতে তাতে আমাকে শোয়াল। আমি শোবার সময় অনুরোধ জানালাম থিয়েটার আরম্ভ হলে আমাকে যেন জাগান হয়। রজনী কথা দিল।

কত রাত হয়ে গেছে বলা যায় না। আমাকে রজনী ডেকে তুলল। অতি লোভনীয় থিয়েটার দেখতে কতখানি এসেছি। মাঠের মাঝখানে গামছা পেতে শুয়েছি। সমস্ত মনপ্রাণ আমার চোখ আর কানে এসে মজুত হল। চোখে দেখলাম মশাল জ্বলছে। একজন, বোধ হয় রাধিকা হবে, রাখাল বালক সেজে একটি নেকড়ার বাছুর কোলে নিয়ে পায়ে পায়ে ত্রিভঙ্গ হ'তে হ'তে চলেছে। কানে শুনলাম সুবল, সুবল ডাক। "সুবলরে সুবলরে" বলে নেচে নেচে 'সাখিয়ানার' তলাটায় সে ঘুরেছে। রাগে ও ঘেন্নায় আমার আপাদ মস্তক জ্বলে গেল। এত থিয়েটার নয়। এ রকম আগেও ঢের দেখেছি। একে বলে কেষ্ট যাত্রা; তাও নিরেট রকমের। কেষ্ট যাত্রা ছেলেদের ভাল লাগে না। এতে না আছে যুদ্ধ, না আছে ভীমের বক্তৃতা, খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ী বুক্ত, মুখে নাকে নখ, কানে মাকড়ী, বেটা ছেলে বৃন্দে সেজে ঘাড় নেড়ে গায় "বৃন্দে দূতী, নাম ধরি, অঘটন ঘটাতে পারি।" একেবারে অসহ্য।

রজনীকে "বাড়ী চল, বাড়ী চল" ব'লে তাড়া দিতে লাগলাম। একটু পরেই ভোর হয়ে গেল। সবাই যে যার বাড়ী চলল। আমি সাঁয়াটা পথ নিষ্ফল আক্রোশে রজনীকে ধিক্কার দিতে দিতে এসেছি। মনে মনে ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম ফিরে গিয়ে দিদিকে সব বলে দেব। রজনীর বউ আমার দিদি হয়েছিল।

রাগ হবে না? একেত "ব্রজের আলু" দেখিয়ে ঠকিয়েছে। তার ওপর থিয়েটার দেখবার নাম করে ঠকিয়েছে।

দিন কাহারও পড়ে থাকে না। এক রকম ক'রে কেটে যাচ্ছিল। আমার দিন অবশ্য তার চাইতে ভাল ভাবে কাটছিল।

মেদিনীপুরে এসে আমার মন বেঁচে থাকত ওস্তাদজী তসদিক্ হোসেন ও আমার পিতার বন্ধু ডাক্তার রূপনারায়ণ বসুকে নিয়ে। আমাদের বাসায় প্রায়ই গান বাজনা লেগে থাকত। কত লোক আসত শুনতে। মধুরভঞ্জের যদু রায়ের ভাইপো আশুবাবু এবং কর্ণেল গোলার রাখাল ভকত আসতেন ঘোড়ায় চড়িয়ে শুনিয়ে নিতে! সুবিখ্যাত গায়ক বাবু সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার এখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকতেই আমার পিতার কাছ থেকে কিছু সঙ্গীত সংগ্রহ করতেন। পরে তমলুকে তিনি বদলী হয়ে যান। সেখানে এই সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। সুগায়ক গোপাল সিং এবং রঘুনাথ ওস্তাদও নিয়মিত শিখতে আসতেন।

তসদিক হোসেনের মামাতাই খাঁ ছিলেন নেপাল দরবারের গাইয়ে। এঁদের "ঘরওয়ানা" শোনার জিনিষ ছিল। মিঞা তানসেনের বংশে ছড়িয়ে পড়েছে, কিছু বিশেষ তান, আশ্চর্যজনক গিটকিরি ও চাল বা গাইয়ের ঢং এঁরা বংশগত ক'রে গেছেন। সে জিনিষ শুধু হিন্দু সঙ্গীতের ব্যাকরণ জেনে শেখবার বা জোটাবার উপায় নেই। ওস্তাদদের মুখে শুনে শুনে শিখতে হয়।

মেদিনীপুরে এসে আমি বিষ্ণুপুরের নামী সঙ্গীতজ্ঞের মধ্যে গোপেশ্বর বাবুর পিতা অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনি এবং অনন্ত মুখুয্যের পাখোয়াজ বাজান শুনি। রাধিকা গোঁসাই আমাদের কলকাতার বাড়ীতে কতবার গেয়েছেন। কলকাতার আর একজন খুব নামী গায়ক আমাদের বাড়ী আসতেন। তিনি অঘোর চক্রবর্তী। তাঁর একটী কথা বড় মজার বলে আমার মনে হয়েছিল। তিনি বলতেন—"পেটে পালক না পড়লে গান হয় না।" পরে বুঝেছিলাম শরীর বলিষ্ঠ না থাকলে ভাল করে বেশী দিন গাওয়া যায় না। মুরগী খেয়ে খাঁ সাহেবেরা তাদের প্রধানত্ব রেখে যাচ্ছেন। অবাঙ্গালীদের মধ্যে গোয়ালিয়র দরবারের গুরুজী লালাজী, বিশ্বনাথ রাও, জোয়ালা প্রসাদ প্রভৃতির গান কলকাতার বাড়ীতে শুনেছি।

গানবিদ্যা নিয়ে তসদিক হোসেনকে আমার যত না ভাল লেগেছিল, তার চাইতে অনেক বেশী ভাল লেগেছিল তার কাছ থেকে শোনা নেপালের গল্পগুলি। নেপাল স্বাধীন রাজ্য। সেখানে ইংরেজের পুলিশ নেই, জজ নেই, ম্যাজিষ্ট্রেট নেই। ইংরেজের আইন সেখানে চলে না। নেপাল ইংরেজ দখল করতে চেয়েছিল। যুদ্ধও ঘোরতর হয়েছিল। কিন্তু দখল করতে পারে নি। প্রথমটাত কিছুই করতে পারে নি। পরে সেনাপতি অক্টারলোনি গিয়ে তাদের পানীয় জল সৈন্য দিয়ে আটকে ফেলে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে। নেপালী মেয়েরা কি অদ্ভুত সাহসী! নেপালীদের কেল্লার প্রাচীর ইংরেজরা তোপদিয়ে ভেঙ্গে দেয়। মেয়েরা কাতারে কাতারে এসে দাঁড়াল জীবন্ত প্রাচীর হয়ে। পুরুষরা প্রাচীরের আড় থেকে যুদ্ধ চালাতে লাগল। নৃশংস তোপে ঘাতু জাতির দেহ চুর চুর হয়ে উড়ে যেতে লাগল। রক্তে নদী বয়ে যেতে লাগল। তবু নেপালী স্ত্রী পুরুষ স্বাধীনতা সমর ছাড়ে নি। অবশেষে তৃষ্ণার জলের অভাবে নেপালীদের হার স্বীকার করতে হয়। তাদের কাছ থেকে মুসুরীর পাহাড়, দার্জিলিং প্রভৃতি কেড়ে নেওয়া হয়। কলকাতার গড়ের মাঠে যাকে মনুমেন্ট বলে সে হচ্ছে এই অক্টারলোনীর স্মৃতিস্তম্ভ।

তসদিক হোসেন আরও বলতেন বাঁচতে হলে নরকের মত বাঁচা দরকার। সব গিয়ে যদি একটুখানি কুঁড়ে বাঁধার জায়গা স্বাধীন স্থানে থাকে তাহলে সেইটুকুই স্বর্গের চেয়ে মহত্তর। (ক্রমশঃ)

হার্ট যদি থেমে যায়

সন্তোষ কুমার অধিকারী

চরিত্র পরিচয়

ডক্টর মিত্র—বৈজ্ঞানিক

বিমলেন্দু—ডক্টর মিত্রের পুত্র

মহেন্দ্র ভূষণ বসু—মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার

ডাঃ সরকার—ডক্টর মিত্রের গৃহচিকিৎসক ও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

ছোট্ট একটি ঘরের একাংশ। ঘরটি সুসজ্জিত। দেয়ালে নীল ছায়া। মেজে থেকে প্রায় দেয়ালের মাঝামাঝি উঠে গেছে একটি তৈলচিত্র এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বকে যেন চোখে আর সেই তৈলচিত্রের মধ্যে। ঘরের ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি টেবিল। পেতলের ফুলদানীতে রজনীগন্ধার তোড়া। টেবিলের দুই পাশে সামনাসামনি দু'জন ব্যক্তিকে দেখা গেলো। একজন একটু বয়স্ক, চোখে তাঁর পুরু লেন্সের চশমা, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার মহেন্দ্রভূষণ বসু। অপর ব্যক্তির সুগঠিত দীর্ঘ অবয়বে এখনও কৈশোরের ছাপ লেগে আছে। অত্যন্ত করুণ অথচ সপ্রতিভ মুখ; নাম বিমলেন্দু।

মহেন্দ্রবাবু—তারপর?

বিমলেন্দু—চুপ! একটু আস্তে কথা বলুন। বাবা কোন রকমে যদি জানতে পারেন.....

মহেন্দ্রবাবু—না, আমার গলা আর আপনি ছাড়া কেউ শুনতে পাবেনা।

বিমলেন্দু—হ্যাঁ যা বলছিলাম,—আমার ঠাকুরদাদার মাথায়ও একটু দোষ ছিলো। অবশ্য সেটা ধরা পড়ে একেবারে শেষ বয়সে। কেমন যেন একটা ম্যানিয়া ছিলো তাঁর। দিন রাত একটা সশঙ্কিত ভাব। সদাই যেন কে তাঁকে মারতে আসছে—এই ধরনের আতঙ্ক। নিজের হাতে বাড়ীর দরজাগুলি আগাগোড়া বন্ধ করতেন রোজ। সন্ধ্যে হ'লেই বাড়ীর বাইরে আনাগোনা একেবারে বন্ধ। আর তার ওপরে খাওয়াদাওয়া অবধি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভয়—কে যুঝি বিষ মিশিয়ে দিয়েছে খাবারে।

মহেন্দ্রবাবু—আচ্ছা, প্রথম বয়সে তাঁর কোন অসুখ ছিলো কিনা বলতে পারেন?

বিমলেন্দু—আমি যতদূর জানি তার কোন অসুখই ছিলো না।

মহেন্দ্রবাবু—আশ্চর্য্য ত! থাক্ তারপর?

বিমলেন্দু—ঠাকুরদাদা বাবার ওপরে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ বাবা নাস্তিক। তার ওপর বিজ্ঞানের সাধনাকেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ ক'রেছিলেন। শেষে রিসার্চের জন্যে বাবা যখন অজস্র খরচ করতে আরম্ভ করলেন তখন ঠাকুরদাদা ভীত হ'য়ে সমস্ত সম্পত্তি মায়ের নামে উইল ক'রে দিলেন। এ'তে বাবা অত্যন্ত আঘাত পান। অবশ্য ঐ সব অনেকদিন আগেকার কথা।

মহেন্দ্রবাবু—কিন্তু আমরা অপেক্ষা করছিলাম আপনার বাবার সাফল্যের জন্য। অতবড় একটা রিচার্চ স্কলার; তিনি কি একটা বিষয়ে যেন গভীর গবেষণায়—

বিমলেন্দু—হ্যাঁ অনেকগুলি ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন। প্রোটোপ্লাজমের shell উদ্ভিদজীবনে এমনকি ইঁট পাথর এসবের মধ্যেও আছে কিনা, ও কি ভাবে আছে—এই ধরনের সব চিন্তাধারাই ছিলো তাঁর আলোচনার বিষয়। তাঁর রিসার্চের ফলাফল নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষিদের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত ছেড়ে দিয়ে তিনি একটি বিষয়েই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

মহেন্দ্রবাবু—সেটা কি?

বিমলেন্দু—মানুষের হৃৎপিণ্ড চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় অনেক সময়ে। ধরুণ হার্ট ফেলিওর।

মহেন্দ্রবাবু—হ্যাঁ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কোন গতিকে একবার বন্ধ হ'লেই মৃত্যু। এ'র চেয়ে সোজা আর কি হ'তে পারে?

বিমলেন্দু—অন্য কোন ত্রুটি যদি না থাকে, ধরুণ আকস্মিক একটা ভয়ে কি আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো। বাবার সাধনা এই হৃৎপিণ্ডকে আবার

চালানো যায় কিনা। অর্থাৎ হার্টফেলিওরের রুগী আবার বেঁচে উঠ্‌তে পারে কিনা।

মহেন্দ্রবাবু—মরা মানুষকে বাঁচানো—ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং বটে।

বিমলেন্দু—কিন্তু এই প্রচেষ্টার পেছনে আর একটু করুণ ইতিহাস আছে। আপনি মনস্তত্ত্ব বিচার ক'রে চিকিৎসা করেন, সেই জন্যেই আপনাকে ডাকা, আর শুধু এইজন্যেই আমার পরিবারের সমস্ত ইতিহাস আমি আপনাকে খুলে বলছি।

মহেন্দ্রবাবু—সমস্ত ইতিহাস আপনি বলছেন বটে, কিন্তু এখনও ত' বুঝে উঠতে পারিনি, কাকে চিকিৎসা করতে হ'বে। কি তার অসুখ?

বিমলেন্দু—আমার বাবাকেই চিকিৎসা করতে হ'বে?

মহেন্দ্র বাবু—(সবিস্ময়ে) ডক্টর মিত্রকে?

বিমলেন্দু—হ্যাঁ, এতদিন যা' সন্দেহ ছিলো, আস্তে আস্তে তা' দৃঢ় ধারণায় পরিণত হয়েছে। বাবার মাথায় অনেকদিন আগেই কিছু দোষ দেখা দিয়েছিলো, আস্তে আস্তে সেটা—এ' আবার আমাদের বংশানুক্রমিক রোগ কিনা!

[বিমলেন্দুর মুখে একটু করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিলো]

মহেন্দ্রবাবু—আপনার ঠাকুর্দা যখন মারা যান, তখন তিনি কি—

বিমলেন্দু—তখন তিনি পুরোদস্তুর পাগল।

মহেন্দ্রবাবু—থাক, কি যেন বলছিলেন আপনি—সেই ডক্টর মিত্রের জীবনের করুণ ইতিহাস একটু—

বিমলেন্দু—হ্যাঁ সেইটাই বলি। আমার বাবা যাতে ইচ্ছেমত টাকা নষ্ট করতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে ঠাকুর দাদা মৃত্যুর আগে আমাদের সম্পত্তি উইল ক'রে মাকে দিয়ে যান। এই ঘটনাতে বাবার আত্মসম্মানে তীব্র আঘাত লাগে। আমার মাও কখনও কোন কাজ বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে করেন নি। কিন্তু শুধু এই একবার—যখন বাবার হঠাৎ অনেক টাকার দরকার পড়লো তখন মা বাবাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। কেন যে করলেন সেটাও বোঝা খুব শক্ত নয়; ব্যাপারটা মানে একটু—

মহেন্দ্রবাবু—চিকিৎসকের কাছে কোন কিছু গোপন করা উচিত নয়। আমাকে আপনি বন্ধু হিসাবে না নিয়ে পুরোপুরি চিকিৎসক ভাবুন, তাহলে বলতে বাধা থাকবেনা কিছু।

বিমলেন্দু—বাবার একজন বন্ধু ছিলেন। ছিলেন, না এখনও আছেন। তাঁকে আপনিও চেনেন। তিনি আমাদের গৃহচিকিৎসক ডাঃ অধ্যক্ষ সরকার। তাঁর বন্ধুত্ব বাবার জীবনে শুভ হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।

মহেন্দ্রবাবু—ডাঃ সরকারের দুর্নাম আছে সমাজে... অনেক কারণে, সাবধানে আপনি বলে যান।

বিমলেন্দু—আপনি ত' জানেন ডাঃ সরকারের একটু পানদোষ আছে।

মহেন্দ্রবাবু—মাতাল নাম তাঁর ভালোভাবেই আছে। আপনি অত রেখে ঢেকে বলছেন কেন?

বিমলেন্দু—এই ডাঃ অধ্যক্ষ সরকার কেমন ক'রে জানিনা, বাবাকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে চিরকাল। আমাদের সকলেরই বিশ্বাস বাবার যে মধ্যে মধ্যে এই প্রচণ্ড টাকার খাঁকতি পড়তো—সেটা তাঁর গবেষণার জন্যে নয়, ঐ ডাঃ সরকারের মুঠোতেই যেতো সে টাকা। কাজেই মা অস্বীকার করেন টাকা দিতে। সেই অস্বীকারে বাবার আত্মসম্মানে প্রচণ্ড আঘাত লাগে। তিনি তখনই মায়ের সঙ্গে প্রায় সবরকম সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু মা ত' তা চাননি। টাকাপয়সার ওপর মায়ের সত্যি সত্যি কোন মোহ ছিলো না। কাজেই মা এ' অবস্থায় একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। একদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি শরীর অত্যন্ত খারাপ করছে ব'লে শুয়ে পড়েন। সকালে উঠে দেখি মা আমার.....ডাক্তারে বললে হঠাৎ হার্টফেল ক'রে মা মারা গেছেন।

মহেন্দ্রবাবু—ট্র্যাজিক ডেথ।

বিমলেন্দু—এইবারে বাবা পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। সংসারের সমস্ত কিছু সংস্রব থেকে আলাদা হ'য়ে তিনি কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। কিছুদিন পরে সব ছেড়ে ছুড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদিন নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে এলেন ও নতুন একটা গবেষণায় বসলেন—

হাঁটু চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে কি ক'রে তাকে পুনর্বার চালু করা যায়। আর আগে যে সব বিষয়ে রিসার্চ করে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি যে কি হলো কোন খানে গিয়ে দাঁড়ালো তা' আর জানতে পারলাম না। যাক্ আসল কথায় আসা যাক, কিছুদিন থেকেই দেখছি বাবার কেমন একটা ভয়ব্যাকুল ভাব। চোখের সামনে যেন ছায়ামূর্তি দেখছেন সব সময়ে; কে যেন তাঁকে আক্রমণ করতে আসছে—সেই ঠাকুরদার মতই ব্যাপারটা।

মহেন্দ্রবাবু—মানুষের মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একান্ত ভাবে নির্জনতা বাসের ফলেও এরকমটা হওয়া সম্ভব।

বিমলেন্দু—কিন্তু আমার আতঙ্ক জন্মে গেছে। রাত্রে যখন ঘুমোতে যাই বাবা চিৎকার করে ওঠেন। চুপ ক'রে বসে থাকলেও তাই শুনি; সেই সময়ে কেউ সামনে থাকলে তাকেই লক্ষ্য করে বকুনি ক'রে নেন। মধ্যে মধ্যে আবার নিজেই নিজের এই অবস্থা বুঝতে পারেন। তখন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে পড়েন। আমার ভয় হচ্ছে এমনি ভাবেই বাবা হয়ত একদিন পাগল হ'য়ে যাবেন। ঐ শুনুন—

[শোনা গেলো, পাশের কক্ষে ডাঃ মিত্রের উত্তেজিত

মিত্র (নেপথ্যে)—না না তুমি পারবে না, তুমি তুমি পারবে না। কিন্তু.....(কণ্ঠস্বর করুণ হ'য়ে উঠলো) কেন তুমি মরে গেলে সাবিত্রী? কেন...?

বিমলেন্দু—সাবিত্রী আমার মায়ের নাম।

মিত্র (নেপথ্যে)—(কণ্ঠস্বর প্রায় রোদনের মত) কিন্তু আমি যে আর পারছিনা। আমায় বাঁচাও তুমি। আমায় বাঁচাও.....

বিমলেন্দু—শুনছেন মহেন্দ্রবাবু কখনও এই ধরনের আকুতি কখনও ভাঙা পশুর মত আর্তনাদ। আপনি আমার বাবাকে বাঁচান, যা টাকা লাগে—

ডাঃ মিত্র (নেপথ্যে)—একটা থেমে যাওয়া হৃৎপিণ্ড ফিরে পাবো সাবিত্রী? একটা মানুষ—যার হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ থেমে গেছে, রক্তের ধারা শিরায় শিরায় জমাট বেঁধে উঠেছে। আমি নতুন উত্তাপে রক্তের মধ্যে চাপ সৃষ্টি ক'রে সেই জমাট হৃৎপিণ্ডটাকে সক্রিয় করে তুলবো। কিন্তু তুমি.....কেন মরে গেলে সাবিত্রী?

বিমলেন্দু—মহেন্দ্রবাবু...

হঠাৎ ডাঃ মিত্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো—অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে—

ডাঃ মিত্র—পেয়েছি, পেয়েছি আমি। কিরণ, বিমল...

[বেগে প্রবেশ করলেন ঘরে। সমস্ত মুখ তাঁর উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে]

ডাঃ মিত্র—বিমল...ও এইযে তুমি..... কি...কি বলছিলাম.....হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। হৃদযন্ত্র বিকল হয়েও আবার চলতে পারে। তার উপায় আবিষ্কার করেছি। জীবনে এতবড় কাজ করতে পারবো—কখনও ভাবিনি। উঃ আজ সার্থক আমি।

বিমল ও মহেন্দ্র বাবু—(একত্রে ও উৎসুক আগ্রহে) কই কেমন করে তা হয়। মরা মানুষ বেঁচে উঠবে। পৃথিবী যে তোলপাড় হ'য়ে যাবে এ' আবিষ্কারে।

মহেন্দ্রবাবু—বৈজ্ঞানিক ডক্টর মিত্রকে অভিনন্দিত করছি তাঁর দেশবাসীর পক্ষ থেকে।

ডক্টর মিত্র—(খানিকটা আত্মগত ভাবে) মানুষ চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় যেমন পেণ্ডুলাম আটকে গেলে ঘড়ি বন্ধ হয়। অথচ পৃথিবীতে তার অসমাপ্ত জীবনের কত স্বপ্ন আদর্শের কত সংঘাত.....তার সংসার, তার প্রিয়তম আত্মীয় স্বজন.....সাজানো পৃথিবী..... কেউ ছুরত চায়নি, কেউ প্রত্যাশাও করেনি এই আকস্মিক মৃত্যু। তবুও মানুষ এ' সমস্তের মায়া থেকে মুহূর্তের মধ্যে চলে যায়.. কতদূরে...

বিমলেন্দু—(অস্ফুট কণ্ঠে) মহেন্দ্রবাবু, বাবাকে দেখছেন, কিরকম হ'য়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে।

ডক্টর সরকার—কত দূরে.....কত দূরে তুমি সাবিত্রী? এ'পৃথিবী ছাড়িয়ে? কেন চলে গেলে? কেন...কেন?

(ডাঃ অরুণাক্ষ সরকারের প্রবেশ)

অরুণাক্ষ—'কেন'র উত্তর তুমিই ত' ভালো জানো

মিত্র। তারপর কি ব্যাপার আজ? মহেন্দ্রবাবু, আপনি এখানে?

বিমলেন্দু—হ্যাঁ উনি আমার বন্ধু। (মহেন্দ্রকে) চলুন আমরা ওদিকের ঘরে যাই।

—প্রস্থান—

ডক্টর মিত্র—অমূল্যাক্ষ, এই মুহূর্তে তুমি আসবে তা' ভাবিনি। হ্যাঁ শোন, আমার সাধনা আজ সফল। এতদিন ধরে.....

অমূল্যাক্ষ—চমৎকার! আমার অভিনন্দন জানিয়ে রাখছি। এবার টাকা ও নাম দুই-ই পাবে। ভুলে যেয়োনা আমাকে। হ্যাঁ কিছু টাকা আছে?

ডক্টর মিত্র—(কঠিন ভাবে) না।

অমূল্যাক্ষ—ভয়ঙ্কর দরকার আমার। শ' দুই টাকা আজ চাই-ই। না থাকে ত' বিমলের কাছ থেকে চেয়ে দাও।

ডক্টর মিত্র—না।

অমূল্যাক্ষ—তার মানে? আমায় ভিখিরী ঠাওরে নিলে নাকি? যাক্ বড় আবিষ্কার করেছো কি একটা শুনছি; বড় হবার পথ পেয়ে গেলে। আমায় ভুললে ত চলবেনা। হ্যাঁ, সাবিত্রীর নাম ধরে এত চীৎকার করছিলে কেন, একটু আগে? এত শোকোচ্ছ্বাস...ধাগগে রাগ করোনা, কিছু টাকা দাও আমি চলে যাই।

ডক্টর মিত্র—(ঘাড় ঘুরে) তুমি এখনই চলে যাও।

অমূল্যাক্ষ—(ঘাড় ছাড়িয়ে নিয়ে) উঃ দেখ ত' আঙুল গুলো তোমার লোহার তৈরী; আমার শরীরে সইবে কেন?

ডক্টর মিত্র—তুমি চলে যাও।

অমূল্যাক্ষ—ওঃ...আচ্ছা যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ শোন, বাড়ীতে আজ পুরোণো চিঠিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তিনি খানা চিঠি পেলাম—সবই সাবিত্রীর লেখা, আর তোমার অনেক খবর আছে তাতে। ওগুলো বরং বিমলের কাছেই পাঠিয়ে দিইগে। কেমন?

ডক্টর মিত্র—তুমি একটা শয়তান।

অমূল্যাক্ষ—(এক মুহূর্তে তার চেহারার পরিবর্তন ঘটে গেলো। এক বিশৃঙ্খল উদ্ধত মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো যেন। রাগে ফেটে পড়লো সে)—শয়তান—নিজের স্ত্রীকে যে হত্যা করতে পারে, নির্দোষ ফুলের মত সুন্দর স্ত্রীকে—তাকে আমি কুকুরের মত ঘৃণা করি। তোমার জন্যে কোন দয়া আমার নেই।

ডক্টর মিত্র—(স্তম্ভিত ভাবে) নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছি...আমি?

অমূল্যাক্ষ—হ্যাঁ তুমি। স্ত্রী সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ায় মনে এক তীব্র আত্মাভিমান জেগেছিলো। অথচ স্ত্রী জানতো যে স্বামী তার চরিত্রহীন—

ডক্টর মিত্র—চরিত্রহীন?

অমূল্যাক্ষ—তাই সবকিছুর সঙ্গে বিষ খাইয়ে সে স্ত্রীকে হত্যা করে.....আমার সার্টিফিকেটের জোরে বাঁচিয়ে-ছিলাম তোমাকে। কিন্তু অন্যায় করেছিলাম।

ডক্টর মিত্র—সবকিছুর সঙ্গে বিষ...কে মিশিয়েছিলো, আমি...? তুমি কি বলছো?

অমূল্যাক্ষ—আমার বলা আর আজ তোমাকে নয়; তোমার ছেলেকে বলতে চাই সাবিত্রী কেমন করে মারা গেছে।

ডক্টর মিত্র—.....(নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে নামছে)। না, না আমি নয়, তুমি মিথ্যা কথা বলছো আমি নয়। আমি সাবিত্রীকে .....তার বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছিলো কবে কোন্ এক রাত্রে। ডাক্তার বললে...মানে...তুমিইতো বললে—হার্ট ফেলিওর। হৃৎপিণ্ডটা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়েছে। তারপর কতদিন ধ'রে সেই সাধনাই ক'রে চলেছি—কেমন ক'রে হৃৎপিণ্ডটাকে আবার চালানো যায়। কতরাত্রে নিজের হার্টটাকে চেপে ধরেছি—হৃদি থেমে যায়.....কিন্তু হার্ট থেমে গেলেও থেমে যায় না। আমি খুঁজে বের করেছি তার শক্তি সঙ্গে সঙ্গে করে যায় না, তাকে আবার চালানো যায়। জীবনের সুখসুপ্ত মানুষের পঞ্জরাস্থি বেষ্টিত রক্তাভ পরিমণ্ডলের বাঁধনে রাখা রক্তাধার—নতুন উত্তাপ দিয়ে তার মধ্যে চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই সে আবার চলতে সুরু করে...মানুষ বেঁচে ওঠে...

অমুজাক্ষ—মিত্র শোনো। তুমি আমার অসুস্থ হ'য়ে পড়েছো।

ডক্টর মিত্র—কিন্তু সাবিত্রী কেন ফিরলোনা? কেন··· কেন?

অমুজাক্ষ—(মৃদুস্বরে) তুমি তাকে হত্যা করেছো?

ডক্টর মিত্র—তুমি শয়তান, পিশাচ—তুমি চলে যাও এখান থেকে।

অমুজাক্ষ—তার মানে?

ডক্টর মিত্র—(ধাক্কা দিতে দিতে) যাও বেরিয়ে যাও You get out.

চিৎকারে আকৃষ্ট হ'য়ে বিমলেন্দু ছুটে এলো। পরক্ষণেই অমুজাক্ষের হাত ধ'রে সেও চিৎকার করে উঠ্‌লো—

বিমলেন্দু—শুনতে পাচ্ছেন না বাবার কথা? যান্ বেরিয়ে যান বাড়ী থেকে। অনেক সহ্য করেছি। আর না, বেরিয়ে যান এবার।

ডক্টর মিত্র—(কাঁপতে কাঁপতে) Get out.

অমুজাক্ষ—(ধাক্কা সামলিয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো) হাঁ যাচ্ছি কিন্তু বিমল, তোমায় একটা সুসংবাদ দিয়ে যাই তোমার মা···

ডক্টর মিত্র—না না···মিথ্যা কথা, ও মিথ্যে কথা বলছে···

অমুজাক্ষ—তোমার মায়ের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তোমার বাবা···

(ডক্টর মিত্র নিমেষে বিমলকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে দরজার খিল তুলে দিলেন। তারপর অমুজাক্ষের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে)

ডক্টর মিত্র—চুপ, চুপ করো বলছি—

(বিমল দরজায় ধাক্কা দিলো—বাবা দরজা খোলো)

চুপ করো, একটি কথাও না আর!

অমুজাক্ষ—(চিৎকার করে) তোমার বাবা তাঁকে হত্যা করেছেন।

সহসা বাঘের মত লাফিয়ে প'ড়ে ডক্টর মিত্র দুই হাতে অমুজাক্ষের কণ্ঠরোধ করলেন। বিহ্বল অমুজাক্ষ গলা ছাড়াবার চেষ্টা করলো। তার কণ্ঠ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। কিন্তু ডক্টর মিত্র উন্মাদের মতই দুইহাতে তার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করতে করতে বলে চললেন—চুপ... চুপ.....

(তাঁর সবল হাতের চাপে দেখতে দেখতে অমুজাক্ষের মাথা বুকের ওপর নেমে এলো। দেহটা অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়লো আস্তে আস্তে)

ডক্টর মিত্র—চুপ করেছে...এইবারে চুপ করেছে।

সহসা পাগলের মত হেসে উঠলেন হিঃ হিঃ হিঃ

বিমল—(দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে) বাবা দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি।

ডক্টর তেমনি অস্বাভাবিক কণ্ঠে হেসে চললেন—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ.....

হো-চি-মিন ও ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার যুদ্ধ

শ্রীআদিত্য প্রসাদ সেনগুপ্ত এম, এ

জাপানী সৈন্যবাহিনীর কাছে ফরাসী বাহিনীর আত্ম-সমর্পণের ফলে বিগত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ তারিখে ভিয়েৎনামের উপর জাপানীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভিয়েৎনামের জনসাধারণ বিশ্বাস করতেন, জাপানীরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবেন। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভিয়েৎনামে জাপানী শাসনের ভিত্তি দুর্বল করবার জন্য ভিয়েৎনামের অধিবাসীরা খুব সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে ফরাসী সাধারণতন্ত্রীরা তাঁদের সাহায্য করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের আশা বিফল হয়ে গিয়েছিল। তবু ভিয়েৎনামবাসীরা জাপানীদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চালাতে লাগলেন; অবশ্যি একথা ঠিক যে এঁরা মিত্রশক্তি-বর্গের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু অবশ্য তাদের তুলনায় সে সাহায্য একেবারে তুচ্ছ ছিল।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে উত্তর ভিয়েৎনামের ছয়টি প্রদেশ ভিয়েৎনামবাসীরা জাপানী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন এবং এইসব প্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঠিক এই সময়ে ভিয়েৎনাম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের একটা সম্মেলন আহ্বান করেন।

স্মরণ থাকতে পারে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কৃষক, ছাত্র, শ্রমিক এবং কম্যুনিষ্টরা এই লীগের সভ্য হবার অধিকার লাভ করেছিলেন। ভিয়েৎনামের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করাই হল এই লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। যখন মিত্রশক্তিবর্গ জাপানীদের পরাজিত করতে লাগলেন তখন ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা লীগের মুক্তি-ফৌজ উত্তর টংকিং অধিকার করেছিলেন।

ভিয়েৎমিন লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি জনসাধারণের প্রতিনিধিবর্গের যে সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সেই সম্মেলনে একটা অল্ ভিয়েৎনাম লিবারেশন কমিটি গঠন করবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। বিগত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে এই সুপারিশ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

উক্ত ভিয়েৎনামের এক অখ্যাত গ্রামে আহূত এক জনসভায় ডাঃ হো-চি-মিন অল ভিয়েৎনাম লিবারেশন কমিটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। প্রকৃত-পক্ষে এখানেই ভিয়েৎনাম রিপাব্লিকের জন্ম হয়েছিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ভিয়েৎনামবাসীরা

ডাঃ হো-চি-মিন

স্বাধীনতার অধিকার করলেন। ভিয়েৎনামবাসীদের এই সাফল্যের ফলে সমস্ত ভিয়েৎনামে এমন একটা বিপ্লব সুরু হয়ে গেল যার ফলে বাওদাই শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামের অধিবাসীরা রিপাব্লিক ঘোষণা করলেন। তাই ভিয়েৎনামের ইতিহাসের ২রা সেপ্টেম্বর "রিপাব্লিক দিবস" হিসাবে খ্যাত হয়ে আছে।

কয়েক মাস আগে যাওদাই আবার ফিরে এসেছেন এবং [illegible] ও সহযোগিতার ফলে তিয়েনসিনে একটি শাসনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে চো-চি-মিনের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁকেই ব্যবহার করতে চাইলেন।

ডাঃ হো-চি-মিন বহুবার বলেছেন, তিনি সমস্ত এশিয়ার জন্য স্বাধীনতা চাইছেন এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি এশিয়ার যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

আজ কম্যুনিষ্ট পোলাণ্ড বুলগেরিয়া, উত্তর কোরিয়া, এবং কম্যুনিষ্ট চীন তিয়েনসিন রিপাব্লিককে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে যাওদাই এবং ফরাসী সরকার খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি যাওদাই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, তিয়েনসিন রিপাব্লিক [illegible] হওয়ার ফলে একটি জিনিষ খুব [illegible] উঠেছে। সে জিনিষটি হচ্ছে, ডাঃ হো-চি-মিন কেবল মাত্র [illegible] কার্যে পরিণত করতে চাইছেন কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাইরের কোন রাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে কাজ করতে ডাঃ হো-চি-মিন মোটেই ইচ্ছুক নন্। তিনি যে জিনিষটির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন সে জিনিষটি হল এই যে, সমস্ত এশিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান হওয়া দরকার। তাই তাঁর নেতৃত্বে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যবাহিনী ফরাসী প্রভাবান্বিত যাওদাই সরকারের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাওদাই সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। স্মরণ থাকতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহল প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় অতলান্তিক চুক্তির মত একটা আঞ্চলিক চুক্তি সম্পাদিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। যদিও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রেসিডেন্ট এলপিডিও কুইরিনো, চিয়াং কাইসেক এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তথাপি এই চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন এবং কম্যুনিষ্ট অভিযানের বিরুদ্ধে যাওদাই সরকারকে ব্যবহার করতে চাইলেন।

আসার আশা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

উঁচু গলায় শাঁখ বাজিয়ে তোমায় কথা বলব না
বলব কথা নীরব চুপি সাড়ে
চোখ বাঁধানো দৃষ্টি জেলে তোমায় পথে চলব না
চলব জেলে প্রদীপ আঁধিয়ারে।

নদী যেমন কুলকুলিয়ে সাগর পানে ধায়
পাতা যেমন মর্মরিয়ে ঝড়ের আগে চলে
বাদল ধারা ঝর্ঝরিয়ে বর্ষা কাঁদে হায়!
তালের ডিঙি-তরতরিয়ে যাচ্ছে স্রোতের জলে।

ভিড় করেনা পড়শীরা আর ভিড়ের আছে হাট
দরাদরির দস্তরি সব সরদা করা কাজে
আজকে ছেড়ে সব ধরেছি একলা চলার বাট
মুখ নামিয়ে একলা চলি সর্বহারা লাজে।

নেইকো কারো ভুলুম আরি নেইকো কোনো ভিড়
অন্ধকারে দৃষ্টি নাহি চলে
আকাশ পানে দৃষ্টি মেলে বেঁধেছি এই নীড়
রাত্রি বাড়ে ভাসি চোখের জলে।

নিশুত হ'লে নিশীথ রাতে নিথর হলে সাড়া
বুকের ধ্বনি যখন বাজে কানে
তখন তোমার সুরের বাঁশী বাজে পরাণ কাড়া
হয়তো কাছে আসার আশা আনে।

মানুষ

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

তারা আজো বেঁচে আছে ইতিহাসে নামহীন হয়ে,
তাতোই অক্ষয় হয়, যতো যায় ক্ষয়ে
তাহাদের নাম।
অতীতের অন্ধকার পায়না বিশ্রাম।

যেথা এই পৃথিবীর দিগন্ত ধূসর
সেথা তারা রেখে এল অস্পষ্ট স্বাক্ষর,
কহিলো না কথা।
বিস্মৃতির নিবিড় স্তব্ধতা
অসহিষ্ণু মুহূর্ত্তগুলিরে
তমিস্রায় ঘিরে,
চাহিলো করিয়া দিতে লুপ্ত বার বার।
তবু আসে সমুদ্রে জোয়ার,
ফেনিল তরঙ্গে কাঁপে উদ্দাম আবেগ।
কুটীল উদ্বেগ—
আকাশে ঘনায়ে ওঠে! ক্রমে বিপর্য্যয়।
তারা যে রয়েছে বেঁচে পাওয়া যায় তার পরিচয়

জীবন্ত আগ্নেয়গিরি কতোবার হয়েছে চঞ্চল,
ভূমিকম্পে পৃথিবীর মর্ম্মকোষে জেগেছে ফাটল,
ছুটন্ত দাবার স্রোত, অনল প্রবাহ,
শ্যামল ধরিত্রী বুকে জাগায়েছে দাহ।
সেই দাহে, অবজ্ঞাত অন্ধকার হতে
তারা সব ছুটে আসে পথে।

ধ্বংসের শ্মশানে জাগে সৃষ্টির প্রার্থনা—
শ্রম আর বুদ্ধির সাধনা!
মরুভূমি করেছে উর্ব্বর,
পর্ব্বতের দুর্গম শিখর
তারা করে জয়।
চিত্তে নিয়ে কঠিন প্রত্যয়।

ইতিহাস ভুলেছে তাদের,
অতীত কালের
যাত্রার অনন্ত পথে অন্ধকার করিছে ইসারা।
উপেক্ষিত তারা।
সৃষ্টির প্রভাত হতে রক্ত দিয়ে গড়েছে যাহারে,
সেই সৃষ্টি তাহাদের পরিহাস করে বারে বারে।

মৃত্যুর উন্মাদ তৃষ্ণা আর হাহাকার,
আজ মৃত্তিকার
সঙ্কুচিত বুকে
ভীতির শিহর আনে নিদুর কৌতুকে।
অরণ্য নিশ্বাস ফেলে সৃষ্টির নির্জ্জনে,
ইতিহাস অতীতের পদধ্বনি শোনে!
তবু দেখি, স্পন্দিত হৃদয়ে
আবার আসিছে তারা অগ্রসর হয়ে—
বুকে নিয়ে দুরন্ত দুরাশা।
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভবিষ্যের অস্ফুট প্রত্যাশা।

নান্নার সাথী

(৭২৬ পৃষ্ঠার পর)

রহিম শুম্ভিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করল—"নান্না কি তবে কসাইর হাতে গিয়েছে? নবীন চক্রবর্তি বামুন হ'য়ে এই কাজ করল?

করিম—"এদের কি আর বামুন বা শুদ্দুর কোন জাত আছে! এরা চার টাকা বিচার মধ্যে রেখে দিলে জিভ দিয়ে চেটে তুলবে।

রহিম—"আমি নবীন ঠাকুরের ওখানে যাব—কেন সে নিয়ে গেল আমার নান্নাকে; নিয়ে দিল কসাইর হাতে!"

করিম—"বাপজান, খেতে না পেয়ে, পেটেরদায়ে ওকে বেচেছি। কবে হয়ত মাগ-ছেলে বেচতে হবে; ওসব ছেড়ে দাও।"

কিন্তু বৃদ্ধ শুনল না; সে বলল—"করিম, বছরের পর বছর কি খাটুনিটাই নান্না আমাদের জন্ত করেছে।... আজ তাকে পাঠালাম কসাইর হাতে!"

করিম চ'লে গেল কাজের ধান্দায়; বুড়ো ব'সে রইল সেখানে। কিছুক্ষণ পরে সে উঠল একবার শেষ চেষ্টা করবে তার নান্নাকে বাঁচাবার। সে চলল নবীন চক্রবর্তির গৃহের দিকে।

দুর্বল দেহ; স্খলিত চরণে সে চলছে। পাশের গ্রামে নবীন চক্রবর্তির গৃহ, সেখানে যাচ্ছে সে নান্নাকে দেখবার জন্ত। দুপুর বেলা সে গিয়ে উপস্থিত হ'ল নবীন ঠাকুরের গৃহে। ২০।২২ টা গরু বের হচ্ছে নবীন ঠাকুরের খোয়াড় থেকে। তার মধ্যে তার নান্না-ও আছে। সে দৌড়ে গিয়ে নান্নার গলা জড়িয়ে ধরল; চীৎকার ক'রে উঠল—"নান্না, নান্না—কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তোকে?"

নবীন ঠাকুর যেন তাকে দেখে নাই, এমনি ভাব ক'রে ঠিকাদারের লোককে বলল—"এবার তোমার মাল নিয়ে যাও; আবার সামনে মাসে দিতে পারব।"

রহিম গিয়ে নবীনের পায়ের উপর প'ড়ে বলল—"ঠাকুর মশায়—কসাইর হাতে গরুগুলিকে দিলেন—আপনি না বামুন!"

নবীন বলল—"তোমার ঐ মরা বলদটা কিনেছিলাম কি দুধ খাওয়ার জন্ত। হাত পেতে টাকাগুলি ভুগে নিয়েছিলে যখন, তখন মনে ছিল না। তুমি বাপু মুসলমানের ছেলে—এ ত' গো-ভক্ত হ'লে ঘুষে খেকে। চৌদ্দ পুরুষ ত' গোমাংস খাচ্ছ—আর আজ এসেছ নান্নার গলা ধ'রে মায়া-কান্না কাঁদতে।"

রহিম সরে দাঁড়াল, ছিন্ন মলিন বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে চোখ মুছে নান্নার দিকে তাকাল; দেখল নান্নার চোখের কোনে-ও জল চক-চক করছে। সে আর নান্নার দিকে তাকাতে পারল না। ঠিকাদার গরুর পাল নিয়ে চ'লে গেল। রহিমের দেহে যে টুকু শক্তি ছিল; ফিরবার সময় যেন সেটুকু-ও রইল না। ধীর, মন্থর গতিতে সে গৃহের দিকে চলল।

দুপুর চ'লে গেছে; অপরাহ্ণ এল। করিম ব্যস্ত হয়েছে—বৃদ্ধ পিতার জন্ত। কিছু সময় হয়েছে, সে কাজ থেকে ফিরেছে। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ এখন বিশ্রাম চায়। নূতন ধান কিছু কিছু উঠছে। প্রথম কাটা এক গোছা ধান আজ উঠানে এনে ফেলেছে; তাই মনটা একটু প্রসন্ন ছিল; কিন্তু পিতার জন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠছিল।

এমনি সময় একজন লোক এসে খবর দিল গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মাঠের ধারে রহিমের মৃত দেহ প'ড়ে আছে।

থানার খাতায় রিপোর্ট লেখা হ'ল—রহিম শেখ—বয়স ৫৭—মৃত্যুর কারণ সর্দিগর্মি (sunstroke)। ডোমার মৃত তার খাতায় মৃত্যুর কারণ লিখল—অনাহার, দারিদ্র্য—আর অনাহার জনিত রোগ—সর্বোপরি—দারিদ্র্যের অপমান।

মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস

রবীন্দ্রনাথ মহামানব:—মহামানবদের মৃত্যু নেই, তাঁদের জন্মকে বলা হয় আবির্ভাব ও ঐহিক জীবনের অবসানকে তিরোভাব। মহামানবদের তিরোভাব উৎসব পালনের কি সার্থকতা, তা কারও অজানা নয়।* যিনি রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আজ আর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন না, তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আমরা মানব মনের সত্যানুরাগ ও গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিই এবং প্রেরণা লাভ করি। কবিদের জাত নেই, পৃথিবীর সব কবিই একজাতের।

রবীন্দ্রনাথ

প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' এই বাণীকেই চিরকালের কবিরা তাঁদের কবি-জীবনের সত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তোলেন; কাজেই তাঁরা মানুষ, সর্ব যুগে এই তাঁদের সবচেয়ে বড় পরিচয়। সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে যে মহান আদর্শ, তাঁরা সেই আদর্শের উপাসক। রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী কবি। সত্য জিনিষটা চিরন্তন;—মানব মনের অনুভূতির তারতম্যানুসারে একই সত্য বিভিন্ন কালে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। সত্যোপাসক রবীন্দ্রনাথ কত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জীবনের নানা দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন ও এর সত্য উদ্ঘাটন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা বিদ্যাসাগরের ধরার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁর অভাব জগত অনুভব করে, কিন্তু তিনি নেই একথা Rhetoric এর ভাষায় সত্য হয় না; কেননা, অলৌকিক সৃজনী প্রতিভার চিরস্মরণীয় গৌরবে বিশ্বজয়ী রূপেই তিনি কল্পনান্ত কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে রইবেন। যে মৃত্যুর ভয়ে জগদ্বাসী সন্ত্রস্ত, সেই মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিল, সেই নিয়েই আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করব।

গীতার মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা, বিজ্ঞানে Conservation of Energyর যে বিশ্লেষণ, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে-ও মৃত্যু সম্বন্ধে সেই একই সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। জগতের আনন্দ যজ্ঞে তাঁর নিমন্ত্রণ, সেই যজ্ঞের তিনি প্রধান পুরোহিত। তাঁর নিকট সংসারের কোন জিনিষই আনন্দহীন বলে প্রতিভাত হয়নি। মৃত্যুকে তিনি দেখেছেন অভয় মূর্তিতে; মৃত্যুর বিভীষিকা মোচন করে তাকে চুম্বনের মত অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করেছেন। ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে মৃত্যুকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন,—

—"মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

জীবনের শেষ দিনেও তিনি গেয়ে গেছেন,—

"সমুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

কারণ মৃত্যুতে সব সন্তাপ দূরীভূত হয়। মৃত্যু ব'লে প্রতীয়মান অবস্থা জীবনেরই রূপান্তর মাত্র। সম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের উপায় ও সহায় মরণ। তাই কবি গান গেয়েছেন,—

—"জীবনে যত পূজা হয়নি সারা
জানিরে জানি তাও হয় নি হারা।"

রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পাহাড় থেকে সাগর অবধি

আবর্তন বিবর্তনের মত জীবন-মরণও লোক-লোকান্তরের একটি সহজ ঘটনা। এই মরণ যাত্রায় সঙ্গে ও সোত বিচ্ছেদ হয় না, কেননা সকলেই মরণ-যাত্রী, কেহ আগে আর কেহ পিছনে চলেছে মাত্র। মহাজীবন থেকে উৎপন্ন ব্যক্তি জীবন ঠিক যেন অগ্নিজ্বালা থেকে নির্গত একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উৎস থেকে উৎসে প্রত্যাবর্তন ও বিলোপ, এই এর সার্থকতা।

"স্ফুলিঙ্গ তার পাবার পেলে ক্ষণকালের ছন্দ
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তারি আনন্দ।"

ব্যক্তি জীবনের অবসানেই মহাজীবনের সমাপ্তি নয়। জীবন মরণেই সৃষ্টি, মরণ মহাজীবনের যাত্রা পথে গতি ছিন্দের বিরাম, পুনর্যাত্রার মহাসংকেত। পরিবর্তনই হচ্ছে প্রকৃতির প্রবল নিয়ম। দেহের ক্রমাবর্তনে শৈশব থেকে কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্দ্ধক্য ও সর্বশেষে দেহান্তর এই একই মৃত্যুর সুন্দর পরম্পরা। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি!"

রবীন্দ্রনাথ বলেন,—ইহলোক ও পরলোক, দুই বিশ্ব-মাতার অমৃত পূর্ণ স্তন, আর মৃত্যু—

"সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি"—

নিজের মতন তাই প্রিয়জনের মৃত্যুতেও কোন দুঃখ বোধ করার কারণ থাকে না। তবু মানুষ প্রিয়জনের বিচ্ছেদে ভেঙ্গে পড়ে কেন? এর উত্তরও রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন,—

"অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায়, তাহা যায়
ক্ষণটুকু যদি হারায় তা হলে
প্রাণ করে হায় হায়।"

মৃত্যুকে মানুষ ভয় করে কারণ মৃত্যুর আহ্বানে তাকে প্রিয়জন প্রিয়সান্নিধ্যকে পশ্চাতে ফেলে রেখে যেতে হয়। কিন্তু সে তো চির একাকী এবং নব নব পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা। রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু-ভীতিকে নাবোঢ়ার প্রথম-ভীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রণয়ী যুগলের অপরিচয়ের প্রথম সঙ্কোচের অবসান হলেই সেখানে যেমন পূর্ণানন্দের প্রভাত হয়, ঠিক তেমনি অজ্ঞাত মৃত্যুর অজানা বিভীষিকার শেষে আত্মার সঙ্গে পরিচয় হয় তার একাত্মীয়তার নিবিড়তায়।

"প্রথম-মিলন-ভীতি ভেঙ্গেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহ-বাঁশি উঠিতেছে বাজি
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

জন্মের আগে এই দেহ ও সংসার আমাদের অজ্ঞাত থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ামাত্র

—"নিমেষেই মনে হল যাদুবশ সম
একান্তই পরিচিত একান্তই মম।"

তেমনি মৃত্যুও অজ্ঞাত :—

—"জীবন আমার
এত ভালবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভাল বাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলেনিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।"

মৃত্যুকে জানেনা বলেই তাকে মানুষ ভয় করে। কিন্তু দেহ ও আত্মা দুইই তো এখানে নানা আকারে থেকেই যায়। তাই 'শিশু'তে রবীন্দ্রনাথের 'খোকা' তার মাকে বলিতেছে,—

—"মাসী যদি শুধায় তারে—
খোকা তোমার কোথায় গেল চলে।
বলিস্,—খোকা সেকি হারায়;
আছে,আমার চোখের তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকের কোলে।"

রবীন্দ্রনাথ কত গভীর ও বিচিত্র ভাবে মৃত্যুকে আনন্দানুভূতির আস্বাদে গ্রহণ করছেন, তার অন্ত নেই। 'ছবি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন'—প্রিয়জন যখন প্রিয়দেহে মাটীর উপর বর্তমান থাকে না, তখনও সে থাকে নয়নের মণিতে, স্মৃতির কোষাগারে।

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;

আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।"

অতীতের দুঃখ বেদনাকে মানুষ ভুলে যেতেই চেষ্টা করে; এই ভুলে-যাওয়া মানুষের স্বভাব না হলে স্মৃতি নামক শব্দটি, কোন কালেই গড়ে উঠতনা। মানুষ এই স্মৃতির মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যুর পরেও চায় নিজের বংশ কিংবা উত্তরাধিকারীর মধ্য দিয়ে নিজের অতীত গৌরবের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। দিগ্বিজয়ের নেশায় মানুষ তাই আশৈশব উন্মত্ত; কালের স্রোতকে সে রোধ করতে পারে না বলে নিষ্ফল ক্রোধে দিকে দিকে সে গড়ে তুলে দিগ্বিজয়ের মিনার-চিহ্ন। একদিন এই দুনিয়াতে মরদেহে আমি যখন বর্তমান থাকবনা, তখনও ঠিক তেমনি আজকের মতন পৃথিবীর বুকে অরুণোদয় ও সন্ধ্যারাগের পটপরিবর্তন চলতেই থাকবে। তখনও আমি থাকব; কিন্তু অন্যরূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাহিনী'তে বলেছেন,—

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকাল বেলার করবে খেলা এই আমি।
নূতন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নূতন বাহু-ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।"

মৃত্যুতে মমতাজ সাহজাহানের নিকট শুধু তাজমহলেই আবদ্ধ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বব্যাপিনী। কবি পঞ্চভূতে লিখেছেন'—

"জগৎ রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা, তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি অবিকৃত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিষ্ফলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগতকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যে দিকে মৃত্যু, সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্তপ্রসারিণীর দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্মতত্ত্ব, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্র-পার-গামী পক্ষীর মত নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে।—একে, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্তমান তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত, তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না। তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত যে ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত; মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?

মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোনো মর্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎশুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী—সেই জন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের অমরতা, সব সেইখানে। যে-সব জিনিষ আমাদের এত প্রিয়, কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারিনা; সে গুলি মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই—সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়,—সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে—জগতের যে সীমায় মৃত্যু, সেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানে আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী,—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতন।

জগতের নশ্বরতাই জগতকে সুন্দর করিয়াছে। এই জন্য মানুষের দেবলোকেও মৃত্যুর কল্পনা,—সতীর দেহত্যাগ

বরন-ডালা ইত্যাদি।"

"জীবনকে সত্যরূপে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের প্রতি তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায়নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়,—যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়—সে জীবন।"

মৃত্যু যে অবসান ও শেষ নহে, কবি একথা বারংবার বলেছেন। মৃত্যু হচ্ছে জীবনের পরিণতি। কবি কীটস্‌ও বলেছেন,—

"Death is Life's high mud.
Death is the crown of life."

আমরা পূর্ণাঙ্গার অংশ মাত্র। যার অংশ, তার মধ্যেই পুনরাবর্তন; যেখান থেকে আসি, সেখানেই ফিরে যাই, কাজেই বিচ্ছেদে কোথাও কোন বিনাশ কিংবা ক্ষতি নেই।

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা।"

মৃত্যুর কষ্টি পাথরে যাচাই করেই মানব-জীবনের পরীক্ষা নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকের অন্তরের কথাও এই।

"মৃত্যুকে যে ভয় করে, মৃত্যু তারেই টানে
মৃত্যুকে যে বুকপেতে নেয় বাঁচতে তারাই জানে।"

মানব-জীবন অনন্তকালের যাত্রাপথ। মৃত্যু সেই পথের milestone. Milestone এর পদাঘাতে মানুষ জীবনের বিশ্রাম বিরতি লাভ করে বলেই স্বাভাবিক অবসানের পরে চির পুরাতনের মধ্যেও ক্লান্ত না হয়ে জীবনকে ফিরে ফিরে চির নূতনতার স্বাদে আস্বাদ করে।

"বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
"নূতন চলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।"
"কেবলে, "যাও যাও"
—আমার যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুটবে আগল্ বারে বারে
তোমার দ্বারে
লাগবে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া
• •
পথিক আমি পথেই বাসা,
আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোকনা হারা,
আবার জাগবে সাঁঝে আঁধার মাঝে
তারি নীরব চাওয়া।"

কবি এক জায়গায় রঙ্গ করে বলেছিলেন যে,—

"পরজন্ম সত্য হলে
কি ঘটে মোর সেটা জানি
আবার আমায় টানবে ধরে
বাংলা দেশের এ রাজধানী।"

কিন্তু কবি পরজন্মে স্থির বিশ্বাস করেন; তাই আবার বলেছেন,—

"আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
সুখ দুঃখের ঢেউ খেলানো
এই সাগরের তীরে।"

জীব তার জীবনের আন্তর অনুভব করে পরিবর্তন পরম্পরার মধ্য দিয়ে এবং সেই পরিবর্তনের নামান্তরই হচ্ছে মৃত্যু। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃগর্ভে অবস্থান করবার সময় মাতাকে চেনেনা; কিন্তু মাতৃক্রোড়ে জন্মলাভ করেই তাঁকে সর্বাপেক্ষা আত্মীয় ও চির আপনার জন বলে জেনে লয়। তেমনি আমরা চিনিনা বলে মৃত্যুকে বৃথা ভয় করি; মৃত্যু আত্মার পরম প্রণয়ী। মৃত্যুকে যারা ভাল করে চিনে উঠতে পারে নাই, তারা তাকে ভীষণ মনে করে; কিন্তু যার সঙ্গে মৃত্যুর মনোমিলন ঘটে, সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার জন্যে সমুৎসুক হয়েই থাকে। মৃত্যুর সিংহদ্বার পেরিয়ে নব জীবনের আহ্বান আমাদের নিকট নিরন্তর আসে, জীবন-বধূ মৃত্যুকে বরণ করে নেবার জন্যে

নিয়ত মিলনোৎসুক হয়ে থাকে। কবির কাছে মৃত্যু মিলন খেলা; ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে দোল খাওয়া। তাই মৃত্যুর অজানা ভয়ের বিরুদ্ধে আশ্বাস দিয়ে কবি আমাদের বলিতেছেন,—

—"অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠবে জীবন ভরে।
জানি জানি আমার চেনা,
কোন কালেই ফুরাবেনা
চিরহারা পথে আমার টানবে অচিন্ ডোরে।
ছিল আমার যা অচেনা, নিল আমার কোলে
সকল প্রেমেই অচেনা গো, তাই তো
হৃদয় দোলে।"

জগতের কোন কিছুরই শেষ হয় না। রবীন্দ্রনাথ শরৎ ঋতু সম্বন্ধে বলেছেন,—

"আমাদের শরতে বিচ্ছেদ বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, যারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায়, সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।"

"ডাকঘর" নাটকের অন্তরের কথাও এই :—

"বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল দৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি। আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চ'লে চ'লে না যেতো, তা হলে কি কোন মাধুরী চোখে পড়ত। চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত, তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে, তাই যৌবনকে সহজ দেখি। জগৎটা কেবল 'পাবো' 'পাবো'ই বলছেনা,—সঙ্গে সঙ্গেই বলছে ছাড়বো ছাড়বো। সৃষ্টির গোধূলি লগ্নে "পাবোর" সঙ্গে "ছাড়বোর" বিয়ে হয়ে গেছেরে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথের মতে স্বর্গ কোন অপার্থিব প্রলোভনময় স্থান নহে, স্বর্গ সেত আমাদেরই আনন্দের মাঝখানে। আনন্দবাদী কবি মৃত্যু ভয়কে জয় করেছিলেন। মৃত্যু যে জন্মান্তরের সূচনা করিতেছে, তাকে ভয় কি? তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কবি, তিনি চিরন্তন। জীবন ও মৃত্যুকে তিনি যে কত সীমাহীন রূপে উপলব্ধি করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। পূর্বের মধ্যে অংশের নিশ্চিত আশ্রয় জেনে কবি সকল সংশয় অতিক্রম করেছেন। যতক্ষণ ভয়ের স্বরূপ জানা না যায়, ততক্ষণই আশঙ্কা থাকে, কিন্তু মৃত্যু এসে উপস্থিত হলে তাঁকে আর ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় না। মৃত্যুতে আমরা প্রিয়জনদের সাথে পুনর্মিলিত হতে পারি, কেননা জীবন-মৃত্যুর মহাযাত্রা পথে আবার লোক লোকান্তরে পরস্পরের সাথে পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটে যাওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ জীবন-মরণ বিধাতার স্বরূপ অনুভব করেছিলেন। বিধাতা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে মানব-মনের পরীক্ষা করেন, কিন্তু যে মানব হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে, তখন সে বিধাতার মৃত্যুভয় দেখানোকে ভয় করে স্বয়ং বিধাতার উপরও জয়ী হয়। রবীন্দ্রনাথ হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন :—

"যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড় বলে নিয়েছিনু মানি
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
দেখা মোর আপনার ভূমি।
ছোট হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড় হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি তার চেয়ে বড়, এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।"

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার অন্ত নেই, দুনিয়াতে রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোথাও হয় না। তিনি আমাদের হৃদয়ের কবি, তিনি আমাদের মুখপাত্র। তিনি ধ্রুবতারার মত একক, তিনি দুনিয়ার একটা miracle, পৃথিবীর ইতিহাসের একটা Solitary Example, ব্রহ্মার মত স্বয়ং সম্পূর্ণ, the greatest philosopher of life. এই কবির আবির্ভাবে বিশ্ববাসী যে কতদিক দিয়ে লাভবান হয়েছে, তা বলে শেষ করা দুঃসাধ্য। ইহকাল ও পরকালে আনন্দময় বলে যিনি আমাদের অভয় আশ্বাসবাণী শুনিয়ে গেছেন, তাঁর আশীর্বাদে আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন সুন্দর ও সার্থক হোক।

উত্তরাপথ ভ্রমণ

ভবঘুরে

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছাত্ররা কখন খেতে বসেছে—গুরুমহাশয়ের জন্যও একটী কখল রক্ষিত। তবে তাঁকে ছাত্রদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেই দেখলাম। পাঠশালায় তখন পরীক্ষা চলছে। পণ্ডিতজীর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম—পাঠশালায় ষষ্ঠ (Class VI) পর্যন্ত পড়ান হয়—তবে বীজ-গণিত পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। এটা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

এদেশের শিক্ষার মান অত্যন্ত অল্প—অধিকাংশের কাছেই 'ক' অক্ষর গোমাংস'। স্কুল কলেজ দূরের কথা, এরকম পাঠশালাও খুব বেশী নাই। দু' একটা আছে তাদেরও ছাত্র শিক্ষক সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই অঞ্চলের আশে পাশের বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যে এই একটীমাত্র পাঠশালা। এখানে এই গুটি দশেক অপোগণ্ড নিয়েই এই মিলিটারী গুরুমশায়ের কারবার—এবং তিনিই একমাত্র শিক্ষক—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—সেই শিশু শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান। এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে হাজার করা যে দু'চার জন জড়তা কাটিয়ে একটু আধটু উঁকি ঝুঁকি মেরে—তারাও ঐ খানেই শেষ করতে বাধ্য হয়। কারণ এর বেশী অগ্রসর হ'তে হ'লে তাকে বহুদূর যেতে হবে। সেই টিহরিতে একটা কলেজ আছে—না হয় সেই সুদূর দেরাদুন। এই দরিদ্র দেশে সেটা আর ক'জনের সামর্থ্যে কুলায়?

যাই হোক, গুরুমশায়টী মিলিটারী হ'লেও তাঁর মেজাজটা মিলিটারী নয়—বেশ আলাপী লোক। সৈনিক জীবনে কিছুদিন বাংলার মেদিনীপুরে কাটিয়েছেন। খড়্গপুর, মেদিনীপুর, হাওড়া প্রভৃতি জায়গার নামও প্রমাণ স্বরূপ বলে গেলেন। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারেন। ১৯৩২ সালে নাকি মেদিনীপুর জেলে কিছুদিন কয়েদী-দেরও চরিয়ে এসেছেন।

পাঠশালা ছুটী দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প সল্প করার পর পণ্ডিতজীও যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর বাড়ী এখান থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। তবে এই গ্রামেই তাঁর বর্ত্তমান আস্তানা।

খাওয়া দাওয়া এবং বিশ্রাম সেরে প্রায় ছটো নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম। পথটা প্রায় সমতল—অনেকটা আমাদের দেশের মতই। বাংলার মতোই গরম আব-হাওয়া—সেই রকমই সাদা, মেটে, ধূলিধূসর পথ; পথের দুধারে সবুজ গাছপালা, পায়ের নীচে দুর্ব্বার কোমল স্পর্শ—বেশ ভাল লাগল পথটা। মাঝে মাঝে সড়ক ছেড়ে দিয়ে পাকডাণ্ডীর পথ ধরতে হয়—ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় কেটে পথ তৈরী হচ্ছে। অদূরে দেখা যাচ্ছে গঙ্গার ক্ষীণ ধারা। নদী পেরোবার জন্য কয়েকটা ঝুলা পুল দেখা যাচ্ছে। নদীর উপর দিয়ে একই সাইজের কাঠ ভেসে যাচ্ছে। কোথায় কে ভাসিয়েছে কে জানে—কিন্তু একটার পর একটা অবিরাম ভেসেই চলেছে—যেন পৃথিবীর বুকে মানুষের স্রোত—অনাদি অনন্ত কাল ধ'রে ভেসেই চলেছে—এক যায়—আর আসে—এর আদি নাই, অন্ত নাই। যাত্রা পথে কেউ বা অনুকূল স্রোতে গা ভাসিয়ে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যায় আবার কেউ বা মধ্য পথে ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ঘুরে মরতে থাকে—অনুকূল স্রোতের অপেক্ষায়।

যেতে যেতে কয়েকদিন পরে বেতোড় বলে একটা জায়গায় একটা পোষ্টাফিস দেখলাম। মুদৌরী ছাড়বার পর এই ৪০ মাইলের মধ্যে আর কোন ডাকঘর চোখে পড়ে নি। বেতোড় ছাড়িয়ে নগুণ বলে একটা জায়গায় এসে পৌছালাম। এখানে গঙ্গার ধারে কয়েকটী পুরাতন মন্দির এবং কয়েকটী গ্রামবাসীর ঘর আছে। প্রয়োজন হ'লে মন্দিরের পূজক মশায় নিজের পর্ণকুটীরটীতে যাত্রীদের আশ্রয় দিয়ে থাকেন।

আমাদের আরও এগিয়ে গিয়ে ধরাসুতে রাত্রিবাসের কথা, তখন বেলাও আছে। কাজেই নগুণের ভগ্ন কুটীরটীর আতিথ্যের মায়া ত্যাগ ক'রে এগিয়ে চললাম। এবার লছমীর (কুলি) সঙ্গে সড়ক ধ'রেই এগিয়ে চলেছি। পথের দু'ধারে গাঁজা বা সিদ্ধি গাছের বন—বাংলা দেশের পথের ধারে কাল কাসুন্দা, বনলঙ্কা প্রভৃতি অযত্নবর্দ্ধিত

গাছের মতো অজস্র গাছ হ'য়ে আছে। শুনেছি—আমাদের দেশের গঞ্জিকা-রসিকরা কখনও লুকিয়ে চুরিয়ে একটা আধটা গাছের চাষ করে থাকেন—তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবগারী পুলিশের সন্ধানী চোখকে ফাঁকি দিতে পারেন না। কিন্তু সমস্ত আবগারী বিভাগ একত্রে চেষ্টা ক'রলেও হিমালয়ের গঞ্জিকা চাষকে নির্ব্বাসনে পাঠাতে পারবেন না!

হবেই না বা কেন? গাড়োয়ালীরা নিজেদের দেশকে 'তপোভূমি' বলে বড়াই করে। একবার গঙ্গোত্রীর এক পাণ্ডা আমাদের অনুর্ব্বর মনে খানিকটা ভক্তি রসের সঞ্চার করবার মানসে উপদেশামৃত বর্ষণ করছিলেন—"ইয়ে হিমালয়—ইয়ে হ্যায় তপোভূমি—ইসকে নীচে হ্যায় কর্ম্ম-ভূমি"। এ হেন যে তপোভূমি হিমালয়—সেটা যে দেবাদিদেব—মহাদেবেরই খাস মহল। তাঁর রাজধানী কৈলাস ও হিমালয়েরই একটা অংশ। তাঁর তো ও দুটো জিনিষ না হ'লে চলবে না। এবং ঐ দুটী প্রিয় জিনিষ সমধামন্বিক জুগিয়ে দেওয়ার জন্যই তিনি দু' দুটী খাস খানসামা বহাল রেখেছেন। তবে জপতপের সঙ্গে সিদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানি না—উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা গবেষণা ক'রে দেখতে পারেন।

সিদ্ধির বন ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্তাচলে অদৃশ্য হ'য়েছেন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারও ঘনিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললাম। ধরাসু পৌঁছাতে আর সামান্য মাত্র বাকী—এমন সময় এক কঠিন দুর্গম রাস্তার সামনে পড়লাম। নূতন করে পথ তৈরী ক'রতে গিয়ে পুরাতন সড়কটা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে কেটে দিয়েছে। উপর দিয়ে যাওয়ারও উপায় নাই—সেখান থেকে ঝরে পড়ছে পাথরের টুকরা আর গুঁড়া। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি—কি ক'রে পেরোব—দেখি আমাদের লছমীরাম পিঠে ঐ বিরাট বোঝাটা নিয়ে পাথরের টুকরো ধরে অবলীলাক্রমে ও পাশে গিয়ে হাজির হল। তারপর ওপাশে গিয়ে পুঁটলীটা নামিয়ে রেখে বলল—"শেঠজী, ঠার যাইয়ে, হাম যাতে হেঁ"।

অগ্রবর্ত্তী বন্ধুটী উত্তর দিলেন—"হাঁ, আ যাও, ভাই, নেহি তো হামকো 'ফিরে' জানে হোগা"।

রাস্তার উপরে একটা গাছ ছিল। সেই গাছটা ধ'রে লছমীর সাহায্যে কোনরকমে ওপাশে পৌঁছালাম। ৬টী সঙ্গী পিছনে পড়েছেন। তাঁরা কি ক'রে পার হবেন—ভেবে পেলাম না। ডাকাডাকি ক'রেও তাঁদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে লছমীরামকেই বড় টর্চটা নিয়ে খুঁজতে পাঠালাম। এদিকে নিজেরা রান্নার ব্যবস্থায় লেগে পড়লাম। সেই আলু, ডাল আর 'চাউল' তবে এখানে একটা জিনিষ পাওয়া গেল—সেটা হ'ল—পেঁয়াজ। যাক তবু খানিকটা মুখ বদলানো যাবে।

ইতিমধ্যে লছমীরাম এসে নিবেদন করল—"বাবু, শেঠজিয়েঁ কোঈ নেহি মিলা।"

—"কাঁ নেহি মিলা রে, বাবু, কাঁহা গয়া উয়ে লোগ্—?"

—"হাঁ, শেঠজি নেহি মিলা—সব যাত্রীলোগ আ গয়া—লেকিন উনহোনে নেহি আয়া।"

রান্না ছেড়েছুড়ে দিয়ে খুঁজতে বেরোব কি না ভাবছি—এমন সময় সঙ্গীরা এসে হাজির হলেন। যাক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম, শুনলাম—রাস্তার ভাঙনের কথা তাঁরা আগেই শুনেছিলেন—সেইজন্য পাকডাণ্ডী ঘুরে পাহাড়ের উপর দিয়ে এসেছেন।

ধরাসু জায়গাটা খুব সুন্দর। ফেনোচ্ছল কলনাদিনী গঙ্গার ধারেই ধর্ম্মশালা—পাশাপাশি কয়েকটা দোকান, ভাগীরথী এখানে ক্ষীণকায়া—কিন্তু খরস্রোতা। কুলু কুলু শব্দে উপল খণ্ডের উপর তরঙ্গ আছড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে গেছে। জোয়ার ভাটার বালাই নাই। আর জলটাও বেশ ঠাণ্ডা।

পরের দিন ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। ধরাসু থেকে রাস্তাটা দুটো ভাগ হয়ে গেছে—একটা উত্তর কাশী হ'য়ে গঙ্গোত্রীর পথে গেছে, আর একটা যমুনোত্রীর দিকে এগিয়েছে। আমরা যমুনোত্রীর পথটা ঠিক ক'রে নিয়ে এগিয়ে চললাম। যমুনোত্রী এখান থেকে ৪৮ মাইল।

চড়াই—উৎরাই-ময় পথ—পাহাড়ীদের ভাষায় বলা

হেঁটে পথে—"বিলকুল সিধা রাস্তা"। পিঠে ঝুড়ি অথবা কোঁচা দিয়ে অথবা মাথায় জলের কলসী চাপিয়ে পাহাড়ী মেয়েরা চলেছে। কাপড় চোপড় কি নোংরা—গায়ে ইঞ্চিখানেক ময়লা জমে আছে—কিন্তু নারী জাতির শাশ্বত অলঙ্কার-প্রীতিটুকু ঠিক আছে। নাকে একটা বিরাট নথ—চিবুক পেরিয়ে ঝুলে পড়েছে, গলায় মোটা মোটা হাঁসুলী, অলঙ্কারের ভারে কাণ ঝুলে পড়েছে—কারও বা একেবারে ছিঁড়ে গেছে—কিন্তু কাণ ছিঁড়তে পারে—তা বলে গহনা ছাড়া যায় না, সেখানে ছাকড়ার নকল কাণ বানিয়ে অলঙ্কারকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মানুষের সৌন্দর্য্যের অনুভূতিটা কিছুটা আপেক্ষিক। যুগে যুগে—দেশ, কাল, পাত্র ভেদে এর পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে। এই যেমন এই দেশের মেয়েরা মরলা শরীরের উপর অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে নিজেদেরকে সুন্দরী বানাতে চেয়েছে যুগের লোকের চক্ষে হয়ত সুন্দরীই মেয়েছে—কিন্তু আমাদের মনে হয় এতে তাদের সৌন্দর্য্যের হানিই হ'য়েছে; অথচ পাহাড়ী মেয়েরা স্বাধারণতঃ দেখতে খুব সুন্দরীই। চীনদেশের মেয়েরা সৌন্দর্য্যের সাধনায় কৃত্রিম উপায়ে পায়ের পাতা ছোট ক'রতে গিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে নেয়; পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মেয়েদের লম্বা গলা সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। তাই জন্মের পর থেকেই সে দেশের মেয়েরা গলায় লোহার বা পিতলের বালা জড়িয়ে জড়িয়ে গলাটাকে যথাসাধ্য লম্বা করবার চেষ্টা করেন। অতদূরেই বা যাই কেন—আমাদের খাস বাংলার কথাই ধরি না—আমাদেরই ঠাকুরমারা নাকের কাঁদি নথ নাড়া দিয়ে ঠাকুরদাদাদের মনে রং ধরিয়ে দিতেন—আমাদের 'মা'রা শাঁখা সিন্দুর পরে গৃহলক্ষ্মীর স্থান উজ্জ্বল করে গেছেন, আর আজকাল আমাদের বোনরা তো নথ, শাঁখা, সিন্দুরকে অসভ্যতার পর্য্যায়ে ঠেলে দিয়েছেন—'অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি'—তা ভগবানই জানেন। তারপর ইংরেজ ছহিতা যখন হাঁটুর উপরে গাউন তুলিয়ে 'চাই হিল' পরে সিগারেট টানতে টানতে নেংচিয়ে নেংচিয়ে রাস্তায় চলেন—তখন সেটাকে অস্বাভাবিক মনে হয় না, কিন্তু যদি কোন ভারতীয় ললনা ঐ বেশে পথ হাঁটেন—তখন চোখ দুটো যেন কর কর ক'রতে থাকে। বিলাতী যুবকরা নীল চোখ আর কটা চুলের মোহে পড়ে হৃদয় হারিয়ে বসেন—কিন্তু আমাদের দেশের সৌন্দর্য্য-রসিক যুবকদের কাজল কালো চোখ আর মেঘবরণ চুল না হলে মন উঠে না।

কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়—সৌন্দর্য্যের চর্চ্চাটা নারী জাতীরই চিরন্তন। সেখানে ইংরেজ, বাঙালী, চীনা বা সাঁওতালীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নিরাভরণা সাঁওতাল গৃহিনীও খোঁপায় ফুল গুঁজতে ভালবাসেন। কোথায় যেন পড়েছিলাম—কটক অঞ্চলের বন্য প্রদেশে একদল বন্য জাতি বাস করত। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত তারা বস্ত্রের ব্যবহার জানত না। বদলে সপত্র শাখা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। কিন্তু তাদের মধ্যেও মেয়েরা বিচিত্র শামুক ইত্যাদি পেলে তা মাথায় বা গলায় পরত। এ কাহিনীকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আজ পর্য্যন্ত আমাদের মা বোনদের হাত উজ্জ্বল ক'রে যে কারু কার্য্যময় শাঁখা দেখা যায়—তাতে আমাদের প্রপিতামহীদের শামুক জাতীয় অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণই সূচিত করে না কি? আজিকার কারুকার্য্যময় শাঁখা তো তারই পরিমার্জিত সংস্করণ।

যাই হোক, অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ নারী জাতির আদি এবং অকৃত্রিম প্রবৃত্তি। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ? কিসের জন্য এই প্রয়াস? জীবজগতের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়—ময়ূরের সুন্দর পুচ্ছ—ময়ূরীর মনো-রঞ্জনেই তো তার সার্থকতা, পশুরাজ সিংহের কেশর—সেও তো পশুরাজ মহিষীর হৃদয় জয় করবার জন্যই, প্রিয়াকে আকৃষ্ট করবার জন্যই প্রজাপতির সুন্দর পাখা; এমন কি ফুল যে তার সৌন্দর্য্য মেলে ধরে সুভাস ছড়ায়—তাও তো পতঙ্গের সঙ্গে ইপ্সিত মিলনের আকাঙ্খা। নরের হৃদয় জয় ক'রবার জন্যই কি তবে নারীর এই সৌন্দর্য্য পিপাসা? অবশ্য নারীরা এটা স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। না করুন, কিন্তু আদিম মানবীর অলঙ্কার প্রীতির মধ্যে এই প্রয়াসই প্রচ্ছন্ন ছিল। আজও হয়ত তাঁরা

উত্তরাধিকার সূত্রে সেই স্পৃহাটাই বহন ক'রে আসছেন। প্রিয়তম বা প্রিয়াকে ঘিরেই বোধ হয় পৃথিবীর আদিম মানুষের সৌন্দর্য্যের প্রথম অনুভূতির সঞ্চার হ'য়েছিল এবং মানবী সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রথম প্রয়াস পেয়েছিল।

নানারকম ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। পথ খুব দুর্গম নয়। মাঝে মাঝে ঝির ঝির ক'রে ঝরণা ঝরে চলেছে। পথের ধারে নানা জাতের অজানা গাছ। মাইল চারেক এসে কল্যাণ বলে একটা জায়গায় ভাল ঝরণার জল দেখে ঝরণার ধারে, বসেই জলযোগ সেরে নিলাম। তারপর আবার যাত্রা সুরু—এ এক যাযাবর জীবন আরম্ভ হ'য়েছে আমাদের। পথের মাঝেই বসে পড়ে খেয়ে নেওয়া, পথেই আস্তানা পেতে পাথর সাজিয়ে কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে রান্না করা, গাছতলায় বিশ্রাম—তারপর আবার চলা সুরু—যেন চলাটাই লক্ষ্য—পথটাই সত্য—আর সব কিছু মিথ্যা।

কল্যাণ থেকে পাঁচ মাইল এগিয়ে এসে ব্রহ্মখালা নামে একটা চটীতে পৌছালাম। এখানটায় কোন ধর্ম্মশালা নাই, দোকানদারের একটা যাত্রী নিবাস আছে। সেখানেই উঠলাম। এখানটায় ভাল একটা ঝরণা দেখে কাপড় চোপড়ে সাবান দিতে লেগে গেলাম। প্রত্যেকেই দেখি নিজের সাবানগুলো আগে খরচ করিয়ে নিতে চায়—তার লাঘবের আশায়। ত্যাগের মহিমা যে কি—তা এই পথে এলে ভাল করে বুঝা যায়। একটী সঙ্গী মন্তব্য করলেন,—"জানো, পূর্ব্বকালে আমাদের পিতৃপুরুষরা পঞ্চাশোর্দ্ধে যখন হিমালয়ে তপস্যা ক'রতে আসতেন—তার আগে সংসারটা ত্যাগ করে আসতেন কেন জানো? সেও ঐ ভার লাঘবের আশায়।"

আর একটী বন্ধু টিপ্পনি কাটলেন—"হাঁ, তাইতো মহাপুরুষরা বলে গেছেন—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'—মানে ভোগ যদি ক'রতে চাও—তো ঐ বাজে জিনিষগুলো ত্যাগ ক'রে দাও।"

যাই হোক—রান্না, খাওয়া কোনরকমে শেষ হ'ল, কিন্তু মাছির জ্বালায় বিশ্রাম আর জুটল না। মাছিটা বোধ হয় হিমালয়ের নিজস্ব সম্পদ। বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে, গাছে—যেখানে যাও—আর কিছু না থাকে, উত্যক্ত করবার জন্য মাছি আছেই। ভার লাঘবের আশায় বই টই কিছু নিয়ে আসি নি। আনলেও বোধ হয় পড়তে পারতাম না। মাছির ঝাঁকে সব অক্ষর চাপা পড়ে যেত। সময় কাটাবার জন্য দেরাদুনে এক জোড়া তাস কিনেছিলাম অগত্যা তারই শরণাপন্ন হ'লাম।

হঠাৎ আবিষ্কার ক'রলাম—আমাদের সেই গুন্ডিয়ালীর দেখা বাঙালী বৃদ্ধটীও এখানেই আছেন। তিনি খাওয়া দাওয়া বহু পূর্ব্বেই সেরে নিয়েছিলেন—এবার বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর যাওয়ার পর আমরা বসে বসে একহাত তাস পিটে নিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে ফেললাম।

আবার সেই পথ। তবে পথের ভয়টা অনেকখানি কেটে গেছে। চলতে চলতে এখন আর প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ে যাওয়ার ভয়ে বুক গুরু গুরু করে না। নীচের দিকে চাইলেও আর আত্মারাম খাঁচা ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করেন না। খানিকটা অভ্যস্ত হ'য়ে এসেছে।

পথের চারিদিকে গর্জন গাছের বন। গর্জন গাছের শুকনো পাতা ঝরে রাস্তার উপর বিছিয়ে পড়েছে—যেন ভেলভেটে ঢাকা পথ। কিন্তু অসাবধান হ'লেই 'পর্পাত' হওয়ার ভয় আছে। পাতাগুলো খুব মসৃণ—হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। আর গর্জন গাছের শুকনো পাতাগুলো ভয়ানক দাহ—চট ক'রে আগুন ধরে যায়।

দূরের পাহাড়ে বন চুঁড়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া উঠছে। ওখানটায় কোন রকমে আগুন লেগে গেছে বোধ হয়। বনে আগুন লাগলে নেবান সহজ নয় বলে শুনেছি—মনের আগুনেরই প্রতিচ্ছবি আর কি? শুকনো পাতা—ডাল পালা দীর্ঘদিন থেকে মাটীর বুকে পড়ে জমা হ'তে থাকে—তারপর হঠাৎ কোন রকমে একটু স্ফুলিঙ্গের স্পর্শ পেলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

সূর্য্যদেব ধোঁয়ার আড়ালে আত্মগোপন করলেন। তাঁর বিদায়কালীন ক্ষীয়মান আভায় পথ দেখে চলতে লাগলাম, ক্রমে তাও অস্পষ্ট হ'য়ে এল। একেবারে অন্ধকার হওয়ার আগেই আমরা পাঁচ মাইল দূরে সিঙ্কিয়ারা চটীতে পৌছালাম।

—ক্রমশঃ—

লংকায় বিভীষণ
নোয়াখালিতে গান্ধীক্যাম্প

রঞ্জন কুমার দত্ত

রামায়ণে আমরা বিভীষণের কথা পাই। বিভীষণের চরিত্র শ্রেষ্ঠ ধার্মিকের, শ্রেষ্ঠ ভক্তের গুণসমৃদ্ধ। কিন্তু আমাদের কাছে, বিশেষ করে বাংলার নরনারীর কাছে বিভীষণ 'কুখ্যাত বিভীষণ' বলেই পরিচিত। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ'—এ কথা তো বাংলাদেশের বালক বালিকাদের মুখেও শুনতে পাওয়া যায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় থেকে ইংরেজী 'ফিফথ কলামিষ্ট' এর বাংলা তর্জমাতে 'পঞ্চম বাহিনী' বা 'বিভীষণ বাহিনী' —এইরূপ একটা উক্তি শুনে আসছি। গৃহশত্রুকেই ইংরেজীতে 'ফিফথ কলামিষ্ট' বা পঞ্চম বাহিনী বা বিভীষণ বাহিনী বলা চলছে অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতককে। পুণ্যশ্লোক বিভীষণের নামটা—এইরূপ একটি কদর্থ অর্থে প্রয়োগ করা প্রশংসাজনক নয় কখনোই!

আর বাংলাদেশের বাঙালীর দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। কেন না, বাংলা আজ কালাপাহাড়ী-বিদ্বেষ বশে সকল শ্রেষ্ঠ মার্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেই 'কোমর বেঁধে' লেগেছে। এর মধ্যে অনেকখানি অভিমানও আছে। এ সেই 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের' অবস্থা আর কি!

সেই যাই হোক, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' এই উক্তি বাংলাদেশের মুখে বাংলা ভাষায় প্রচলিত হলেও, আজকের সারা ভারতের কেবল নয়, সারা দুনিয়ার রাজনীতিবিদ্‌দের, মুখের বুলি নয় কেবল, কাজের নীতি বা কলা হয়েছে।

বস্তুত এটা বিভীষণ সম্পর্কে ন্যায় প্রয়োগ হয়নি, কোনক্রমেই, ন্যায় প্রয়োগে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' স্থলে 'ঘরের মিত্র বিভীষণ'—এইরূপই দাঁড়াতো। আজ যদি আমরা ভেবে দেখি তবে দেখতে পাবো, আমাদের সকল দুঃখের মূলে আজ এই নীতিই কাজ করছে। বিভীষণ সম্পর্কে এই অন্যায় প্রয়োগ বা ধারণা যতদিন না লোকের মন থেকে দূর হচ্ছে এবং যতদিন না ঘরে ঘরে মানুষের জীবনে বিভীষণের চরিত্রভাব সমাদৃত ও প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাচ্ছি ততদিন এই দেশব্যাপি দুঃখ কষ্টের অন্ত হওয়া সম্ভব নয়।

দেবতার প্রসাদে অমিত সম্পদ, শক্তি ও পরাক্রমের অধিকারী হয়ে রাবণ সেই শক্তির যথেচ্ছ ব্যবহার দ্বারা সুর নর সকলকে উৎপীড়িত উত্যক্ত করে তোলে। তার স্বার্থ-কলুষে দাম্ভিকতা, তামসিকতা, অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চরম পরিচয় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মপ্রাণ ন্যায়নিষ্ঠ বিভীষণের ধৃতরাষ্ট্রকে তাপিত ব্যথিত করে। আসুরিক শক্তির অধম উন্মাদনায় ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারবোধ হারিয়ে পর দার হরণ করা ও বলপ্রয়োগে তা ভোগ করা—এই যে তার ব্যভিচার, বিভীষণের কাছে এ আরো পীড়াদায়ক ও অসহনীয় হয়ে পড়ে। তিনি অনেক সহ্য করেছিলেন, অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, বোঝাতে যেয়ে তিরস্কৃত ও অসম্মানিত হয়েছেন বহুবার, তবুও একটা আশার একটা সীমা ও ক্ষণ পর্যন্ত বিভীষণ অপেক্ষা করে-ছিলেন। সব গ্লানি ও অসম্মান, সব অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য কোরেও সত্যধর্মে অবিচলিত ছিলেন—'রামনাম' অর্থাৎ সত্যধর্ম ছাড়েন নাই। নিজের মতো নিজেরই মধ্যে সেই সত্যের আরাধনাতে আত্মপ্রতি অনুভব করছিলেন।

লংকার সেই প্রতিবেশে বিভীষণ-রত্নপতী ছাড়া আর সকলেই অযো গুণাক্রান্ত হয়ে আসুরিক নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থে নিরত ছিল। ন্যায়, নীতি, ধর্ম ও সত্যের কোনো প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব তাদের মধ্যে ছিলই না। স্বয়ং লংকাধিপতি যেখানে স্বৈরাচার ও ব্যভিচার আদি দুষ্কর্মদোষে দুষ্ট সেখানে প্রজাদের সম্পর্কে 'কা কথা'। নাগাযুক্ত অশ্বের ন্যায় তারাও যথেচ্ছাচারে আসক্ত, উন্মত্ত হয়।

ধর্মপরায়ণ বিভীষণ যখন এই পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করছিলেন তখন সীতার অন্বেষণে ভগবান রামচন্দ্রের দূত হনুমান ঘুরতে ঘুরতে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হন। লংকাপুরীর সমস্ত বাড়ী একের পর এক ঘুরে ঘুরে হনুমান দেখেন কিন্তু সীতার খোঁজ পান না। রাবণের বাড়ীতে খোঁজেন, পান না। হনুমান চিন্তিত হন। এ বাড়ী সে

বাড়ী খুঁজে ফিরছেন, এমন সময় তিনি রামায়ুধ-অংকিত একটি বিষ্ণু মন্দির দেখতে পেলেন, দেখলেন মন্দিরটি যেন সবথেকে কিছু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কোরে আছে, দেখলেন সেখানে তুলসী গাছের সারি যেন সযত্নে প্রতিপালিত হচ্ছে। হনুমানের হৃদয়ে আনন্দ ও আশার আলো দেখা দেয়। ওই রাক্ষসপুরীতে সজ্জনের বাড়ী—এ তাকে বিস্ময়াভিভূত ও আনন্দাপ্লুত করে। হনুমান ভাবছেন, কে এই সজ্জন, কোথা হতে ইনি এলেন, কেমন কোরে এলেন ইত্যাদি, ঠিক এমনি সময় বিভীষণ নিদ্রোত্থিত হয়ে পরম নিষ্ঠার সহিত রাম নাম গেয়ে ওঠেন।

"রাম রাম তেহি সুমিরন কীন্হা
হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হা"

[রামচরিত মানস, সুন্দর—৫]

হনুমান জানলেন হাঁ, রাম ভক্তই বটে। তার অনুমান মিথ্যা নয়। তাঁর হৃদয় পুলকিত হয়ে উঠলো। বিভীষণের সহিত হনুমান সাক্ষাৎ করলেন। কথাপ্রসংগে বিভীষণ তখন হনুমানকে যে কথা বলেছিলেন তা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করছি—এই নোয়াখালির মাটিতে।

"সুনহ পবন সুত রহনি হমারী।
জিমি দসনন্হি মহুঁ জীভ বিচারী।"

[সুন্দর—৬]

অর্থাৎ হে পবন নন্দন হনুমান, আমি কি ভাবে যে আছি সে কি জানো, দাঁতের গণ্ডী মধ্যে জীভ যেমন সংকোচে, সত্রাসে থাকে, আমিও ঠিক তেমনি ভাবে কাল কাটাচ্ছি।

দাঁতের মধ্যে জীভ কিভাবে থাকে পাঠকেরা তা উপলব্ধি কোরে থাকবেন। রাবণের লংকাপুরীতে বিভীষণের যে অবস্থা হয়েছিল, নোয়াখালিতে গান্ধী-ক্যাম্পের সত্য ও অহিংসাব্রতী কর্মীদের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। উপমার যোগ্য বটে। কিন্তু বিভীষণের সকল কল্যাণচেষ্টা যখন রাবণের দুর্মতির পরিবর্তনে ব্যর্থকাম হয়, পক্ষান্তরে রাবণ কর্তৃক তিনি সর্বসমক্ষে পদাহত, অসম্মানিত ও বিতাড়িত হন তখন তিনি রাবণের সংগ ও পুরী পরিত্যাগ করে সমুদ্রপারে রামের শরণাপন্ন হন। যাবার কালে বলে যান—

"রামু সত্যসংকল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥"

[রামচরিত মানস সুন্দর—৪১]

অর্থাৎ প্রভু রামচন্দ্র তো সত্যসংকল্প। তিনি যা ইচ্ছা করবেন তা-ই সম্পন্ন করবেন। আপনার মন্ত্রণা সভা কালের বশ দেখা যাচ্ছে। আমি এখন রঘুবীরের আশ্রয় নিতে যাচ্ছি, পরে যেন আমাতে দোষ না দেওয়া হয়।

বিভীষণ রাবণকে অনেক ভাবে অনুরোধের পর স্থান-ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু গান্ধীক্যাম্প স্থানত্যাগ করবে না, কেননা দুনিয়ার সর্বত্র আজ রাবণের চণ্ডনীতি, দুর্নীতি ও দুর্মতির উচ্ছৃংখল মাতলামি চলছে। সমগ্র দুনিয়া আজ রাবণের লংকাপুরীতে পরিণত হয়েছে। এমন পরিবেশে রামের শরণ আজ বাহিরে পাওয়া দুষ্কর, অন্তরে তাকে খুঁজতে হবে, জানতে হবে, বাইরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই কর্তব্য পালনে গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরা আজ ব্রতী। যে গান গেয়ে গেয়ে বাপু নোয়াখালীর গ্রামের মাঠে ও পথে, হিন্দু মুসলমানের বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরেছিলেন, দুই ভাইকে একই রাখী বন্ধনে মিলিত করতে জীবনপণ করেছিলেন, সেই অনুপম সংগীত কবিগুরুর সেই অপূর্ব রচনা যা বাপুর কাছে অতি বড় প্রিয় ছিল, সেই গানই আজ গান্ধীক্যাম্পের কর্মীদের একমাত্র সম্বল ও অবলম্বন হয়েছে

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে,
সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে',
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা,

একলা চলো রে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি গহন পথে যাবার কালে
কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে
একলা চলো রে ॥
যদি আলো না ধরে—
(ওরে ওরে ও অভাগা !)
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে—
দুয়ার দেয় ঘরে
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে
একলা জ্বলো রে ॥

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে...)'

ইংরেজী ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালিতে যে সাম্প্রদায়িক দাংগা সংঘটিত হয়েছিল এবং যাতে হিন্দুদের ওপরই মুসলমানদের একতরফা ব্যাপক ও বীভৎস অত্যাচারের অভিযান চলেছিল তার অধিনায়কত্ব নিয়েছিলেন এই জেলারই রামগঞ্জ থানার অধীনস্থ গ্রাম শ্যামপুরের মিঞা গোলাম সারোয়ার। এই দাংগার ফলে এতদঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বিরাট অংশ পশ্চিম বংগের মাঠে ঘাটে, পার্কে ও ষ্টেশনে ইতস্ততঃ আশ্রয় নিতে থাকে, নেয়। সর্বত্র, যেমন পূর্ববংগে তেমনি পশ্চিম বংগে, একটা অস্বাভাবিক, সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

শান্তি ও অহিংসার অবতার মহাত্মা গান্ধীর নিকট যখন এই বার্তা পৌঁছছিল, তখন তিনি অবিলম্বে নোয়াখালির ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবার প্রয়োজন অনুভব করেন। নবেম্বরের প্রথম ভাগে, একদল নিঃস্বার্থ অহিংস-সেবক সাথে কোরে দাংগাবিধ্বস্ত এলেকায় এসে বসলেন, স্থানে স্থানে ক্যাম্প কোরে কর্মীদের বসতে নির্দেশ দিলেন। তাঁদের কাজ হল সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুদের মনে সাহস ও আস্থা পুনরুদ্ধার করা। নিজেও গ্রামে গ্রামে পায়ে হেঁটে পরিক্রমা শুরু করেন ও দুই সম্প্রদায়ে মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে প্রায় চার মাসকাল তিনি নোয়াখালির পল্লী পথে পুরুষদের হৃদয়ের কাছে নিজেকে দীনের দীন সেবক রূপে বিলিয়ে দেন। অদ্ভুত সে মনোভাব, সে নম্রতা। কিন্তু নোয়াখালির মানুষের সে কঠিন হৃদয়ের পরিবর্তন বাহ্যত কতক অনুকূল মনে হলেও আজ যে পরিচয় পাচ্ছি তাতে বলতে হয় 'যথাপূর্বম্ তথাপরম্', 'পাষাণে কর্ম নাস্তি'।

ইতি মধ্যে বিহারে গান্ধীজীর উপস্থিতি একান্ত আবশ্যক হওয়ায় তিনি আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে নোয়াখালি ছাড়তে বাধ্য হন। যাবার প্রাক্কালে 'সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে আবার আসছি' এই কথা বলে যান। তিনি মার্চ মাসের প্রথমেই নোয়াখালি ছাড়েন।

নোয়াখালির রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর ও বেগমগঞ্জ এই চারটি থানাই দাংগায় বিশেষ ভাবে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইগুলির মধ্যে আবার রামগঞ্জ থানার হিন্দুরা সর্বাধিক উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইখানকার হিন্দুরা যে কখনো মুসলমানদের এই অমানুষিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারের কথা ভুলতে পারবে তা কল্পনাতীত ছিল। গান্ধীক্যাম্প ছাড়া আর কোনো অরাজনৈতিক সেবা প্রতিষ্ঠান বা মিশনকে গান্ধীজীর নোয়াখালী ত্যাগের পর এখানে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে দেখা যায় নি। গান্ধীজীর নির্দেশে এক গান্ধীক্যাম্পই পড়ে আছেন নোয়াখালির মাটিতে, নোয়াখালির জনকল্যাণে সেই পূর্বের ব্যাপকস্বরূপে। আর তাঁহাদেরই প্রাণপণ শুভ চেষ্টায়, অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা গুণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার মৈত্রী ও ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। হিন্দুরা সেই অবিস্মরণীয় ক্ষত আবার বিস্মৃত হয়ে মিলনের হস্ত প্রসারিত করে, মুসলমানরাও অনুশোচনা করে, হাত বাড়িয়ে দেয় হিন্দুর দিকে। সবিনয়ে জানায় যে দাংগার অপরাধে তারা অপরাধী নয়, তারা প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে সর্বতোভাবে বলাশক্তি সম্মানের সহিত বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। এবং সেজন্য তারা গৌরবও বোধ করে। বাস্তবিক, অনেকেই তা করেছে, না করবেই বা কেন, মানুষের

হৃদয় তো! মুসলমান বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, তারা মানুষ।

নোয়াখালির হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের মানসিক অবস্থা যখন এইরূপ একটা পরিবেশের আকার গ্রহণ করছিল এবং গান্ধীজীর নোয়াখালি ত্যাগের পরেই, যখন তিনি কাশ্মীরে অবস্থান করছেন ঠিক সেই সময় গোলাম সারোয়ার মিঞার কতিপয় দুষ্ট অভিচারী মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে আবার মুসলমান জনসাধারণকে উত্তেজিত ও বিদ্বেষ-দুষ্ট কোরে তোলে। যে ক্ষত ভুলতে বসেছিল হিন্দুরা, তাকে আবার বিভীষিকার রূপে হিন্দুদের সম্মুখে তুলে ধরলে এই দুষ্টিমের চক্রান্তকারীর দল। গোলাম সারোয়ার তখনও কারারুদ্ধ—দাংগার প্রধান আসামী।

গান্ধীজীর কর্ণগোচর হল এই দুঃসংবাদ। তিনি বিচলিত হলেন নোয়াখালির জন্য। কাল বিলম্ব না কোরে তিনি নোয়াখালি অভিমুখে রওনা হন। ইতিমধ্যে যখন তিনি নোয়াখালির পথে সোদপুরে এসে পৌঁছিলেন তখন কলকাতায় শুরু হল আবার দাঙ্গা। সে আর এক ভয়ংকর পরিস্থিতি। কলকাতায় তাঁকে দাঁড়াতেই হয়। হিন্দুরা মানব-প্রেমিক বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মার বিরুদ্ধে সাক্ষাৎ আক্রমণ শুরু করে। গান্ধীজীর অপরাধ কলকাতার মুসলমানের বিরুদ্ধেই হিন্দুর অভিযান চলছিল, গান্ধীজী তাতে বাঁধ সাধেন। এই ঘটনায় গোলাম সারোয়ারের দলের মনোভাব এদিকে কিছু নরম হয়, নোয়াখালিতে তাদের জঘন্য ছুরাপ্রহ তাই কতক প্রশমিত হয় বলে মনে হয়।

কলকাতার অশান্তি গান্ধীজীর অনশন গ্রহণে শান্ত হয় বটে, কিন্তু দিল্লীতে সেই বহ্নি আবার জ্বলে ওঠে। মুসলমানদের ধনপ্রাণ স্বার্থ রক্ষা করতে তিনি দিল্লী যান—আর তাঁর আসা হয় না, আমাদের ভাগ্যেও তাঁর ঐহিক সংগ চিরতরে শেষ হয়। প্রার্থনা সভায় যাবার পথে ৩০শে (১৯৪৮) জানুয়ারী অপরাহ্নে জনৈক হিন্দু আততায়ীর গুলীতে তাঁর অমূল্য জীবনের অবসান ঘটে। সমস্ত জগৎ কেঁদে ওঠে, দুঃখ-বিলাপে, হাহাকার কোরে বেড়ায়।

এই এতবড় ত্যাগের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ নোয়াখালিতে আমরা অনুভব করলাম, যেন গোলাম সারোয়ার-পরিচালিত চক্রান্তিপরায়ণ মুসলমানদের মনোভাব কিছু নম্র হয়েছে, যেন কিছু অনুকূলে চলছে। বাস্তবিক নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব তখন আবার কিছু উদার হয় ও উন্নতি লাভ করে। বিদ্বেষ অনেক কম।

এইরূপ মুহূর্তে নোয়াখালি হাঙ্গার সমস্ত আসামী সহ গোলাম সারোয়ার হাজত থেকে ছাড়া পেলেন। পরিবেশ আবার গরম হয়ে উঠল। তাদের অপরাধ সম্পর্কে কোনো ন্যায় বিচার বা অনুসন্ধানও হয় না। এতে চক্রান্তকারীদের স্পর্ধা ও আস্ফালন আরো বহুগুণ বেড়ে যায়।

গোলাম সারোয়ার বাইরে এসে অনুভব করলেন যে গান্ধীক্যাম্প তাঁদের আন্তরিকতা প্রেম ও সেবার দ্বারা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের হৃদয় কতক আস্থা ও প্রতিষ্ঠা স্থাপন করে ফেলেছেন। তাঁর নিজের প্রতিপত্তিও তাতে কতক ক্ষুণ্ন হয়েছে: তখন তাঁর সমস্ত আক্রোশ এসে দাঁড়ালো গান্ধীক্যাম্পের প্রতিকূলে। সমাজের অনিষ্টকারী দলগুলিকে সেই হতে তিনি গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করতে প্রবল প্রয়াস পেতে থাকেন। নিজের প্রতিপত্তি পুনর্লাভের আশায় তিনি অধীর উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। যেসব সধর্মিক মুসলমান গান্ধীক্যাম্পের সদানুষ্ঠান ও সৎপ্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করে আসছিলেন এতাবৎ তাদের ওপরেও তিনি খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। প্রকাশ্যে সভা ও বৈঠকে গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও জঘন্য বিদ্বেষমূলক প্রচারকার্য চালাতে থাকেন, কর্মীদের পুলিশদ্বারা গ্রেফতার করাবার হুমকী ও ভয় দেখাতে চেষ্টা করেন।

এই অপচেষ্টা ব্যাপক ও গুরুতরভাব ধারণ করে। গান্ধীক্যাম্পের কর্তব্য হয় সত্যানুসরণ ও স্থানীয় সরকারকে জানানো। তাঁরা জানান, কিন্তু কোনো ফল হয় না। পক্ষান্তরে গান্ধীক্যাম্পের প্রতি অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন কতক স্থানীয় কর্মী ও ভালো লোককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনাবিচারে আটক করে রাখেন এর প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, সাধু সজ্জন হিন্দু মুসলমান যাঁরা গান্ধীক্যাম্পের

সহিত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরা স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে যান, অপরদিকে গোলাম সারোয়ার ও তাঁহার দুষ্কৃতকারীদের গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধতা করার দুঃসাহস অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়। গোলাম সারোয়ার প্রকাশ্যে প্রচার করতে থাকেন যে তিনি যা বলবেন, নোয়াখালীর ব্যাপারে সরকার তা-ই করতে বাধ্য এবং তাই হচ্ছে, এই কথা তিনি প্রকারান্তরে প্রচার করতে থাকেন। বস্তুত একদল সরকারী কর্মচারীও এই অসৎ-কার্যে তাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট হন। আর সেইজন্যই গোলাম সারোয়ার অতিরিক্ত আস্পর্ধা পান।

গান্ধীজীর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীপ্যারেলালজী ভাটিয়ালপুর ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন। কিন্তু তিনিও এই অসত্যের কবল থেকে রেহাই পাননি। একটা গুজব চলতে থাকে বেশ প্রবলভাবে যে কেমন কোরে গান্ধীক্যাম্পকে নোয়াখালী থেকে উঠিয়ে দেওয়া যায়। আর এই অপচেষ্টার স্বার্থান্বেষী দুশ্চরিত্র হিন্দুরাও যোগদান করে হয়তো বা মিয়াসাহেবের ভয়েই। এখানকার হিন্দুরা বাংলার পর এমনভাবে মুসলমানকে ভয় করতে থাকে যে তাকে জলাতংকের ন্যায় মুসলমানাতংক বললে অত্যুক্তি হয় না।

মিথ্যা গুজবে প্যারেলালজীকে কেবল নয়, গান্ধী-ক্যাম্পের সমস্ত প্রধান প্রধান কর্মীকে অন্য আইনে আটক করার গুরুতর চেষ্টা চলে। গান্ধীক্যাম্প পূর্বাহ্নেই এই খবর জানতে পারেন এবং স্থানীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে এবিষয়ে সংগে সংগে অবগত করান। শেষ পর্যন্ত ঘটেও তাই।

গান্ধীক্যাম্পের কতকগুলি কেন্দ্র একযোগে পুলিস কর্তৃক খানাতল্লাসী করা হয়। ভাটিয়ালপুর ক্যাম্পে কতিপয় বেআইনী অস্ত্র গোপনে রেখে তা এইভাবে উদ্ধার কোরে প্রমাণের চেষ্টা চলে যে গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরা নিরস্ত্র নয়, অহিংস নয়—তাঁরা ছদ্মবেশে এ রাষ্ট্রের (পাকিস্তানের) ধ্বংসসাধনে এখানে অবস্থান করছেন।

বস্তুত গোলাম সারোয়ারএর মুক্তির পর সমাজের প্রতিক্রিয়াসাধক দলগুলি খুব জোর অন্তরাম্ফালনে প্রবৃত্ত হয়। সৎ মুসলমানরা এতে ব্যথিত হন, পীড়া বোধ করেন। কিন্তু গোলাম সারোয়ারের ও তাঁর দলের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধতা করার মতো সাহসিকতা ও সুদৃঢ় মনোবল তাঁদের ছিলনা। কেননা তাঁরা সরকারের কর্ম-পদ্ধতির থেকে এইরূপই অনুভব করছিলেন যে সরকার গোলাম সারোয়ারের কর্মপ্রবৃত্তিকেই সহায়তা করতে চান। ফলে তাঁরা বেহাল ও হতাশ হয়ে পড়েন, ক্যাম্পের সদানুষ্ঠান থেকে ভয়ে বাধ্য হয়ে দূরে থাকতে লাগলেন। অন্যায় অত্যাচারের সম্মুখীন হবার সাহস যে তাঁদের ছিল না। তাই দূরে থাকাটাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন।

ধাক্কার অব্যবহিত পরেই যেসব কর্তৃপক্ষের হাতে নোয়াখালীর শাসনব্যবস্থা ছিল তাঁরা বরাবরই গান্ধী-ক্যাম্পের কর্মব্যবস্থার সহিত যোগাযোগ ও সহযোগিতা রক্ষা কোরে এসেছেন। এবং তাঁদের কর্মে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল যে, গান্ধী-ক্যাম্পের সহিত যে সব সরকারী কর্মচারী সদ্ভাব ও সহযোগিতা রক্ষা করার আগ্রহ দেখিয়েছেন প্রাদেশিক সরকার তাঁদেরই ধীরে ধীরে স্থানান্তরে পাঠিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে এমন কতকগুলি কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষ এসে জোটেন যাঁরা গান্ধীক্যাম্পকে আর সুনজরে দেখতে পারেন না। গান্ধীক্যাম্পের লোকপ্রিয়তা ও কর্মক্ষমতা এবং সত্যাগ্রহের স্পিরিট (ভাবধর্ম) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঈর্ষার আক্রোশের বিষয় হয়ে পড়ে। তখন গান্ধীক্যাম্পের কর্মব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি করার প্রবল অপচেষ্টা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ করছেন, এইরূপ অনুভব করা গেল। তার প্রতিক্রিয়া স্থানীয় হিন্দুমুসলমান জনসাধারণের মধ্যেও দেখা দিল। যারা এতাবৎ গান্ধীক্যাম্পের চরিত্র প্রভাবে সাহসী, নির্ভীক, নীতি ও সেবাপরায়ণ হয়ে উঠছিল তারা এখন সন্ত্রস্ত হয়ে পিছিয়ে পড়ল, দমে গেল।

সত্যের পথেও চলতে ভয়। কিসের ভয়? মিথ্যার মারের ভয়। সইবার ক্ষমতার অভাব। সত্যাশ্রয়ই বিপন্ন হচ্ছে, সাজা পাচ্ছে, কাজেই দুর্বলমতি নিজের কোনোমতে টেনে-নিয়ে-চলা জীবনকে কঠিন আঘাতের

মধ্যে ফেলতে ভয় পায়। সাহসে কুলায় না।

দালালবাজারের কর্মীপ্রধান সর্দার জীবনসিংজীকে বিতাড়িত করার জন্য অপর আর একটি ষড়যন্ত্র চলে। একটি জঘন্য মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় এবং সেই একটা অজুহাতে সর্দারজীকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। এক হিন্দু স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সংগঠিত করা হয় যে সর্দারজী ধর্ষণাভিপ্রায়ে এই রমনীকে হরণ করতে একদল যুবক প্রেরণ করেন। তারা যখন এই কার্যসাধনে স্ত্রীলোকটির স্বামীর বাড়ীতে মধ্যরাত্রিকালে প্রবেশ করে এবং তাকে বলপ্রয়োগে ধরতে চেষ্টা হয় তখন সে চীৎকার কোরে ওঠে ও এই যুবকদল পলায়ন করে ইত্যাদি। ঘটনাটি একটি অদ্ভুত তৈরী রূপকথার মতো এবং সত্যিই তাই। নোয়াখালিতে এই ধরনের মিথ্যা ঘটনা সৃষ্টি করা ও মামলা করা গান্ধীক্যাম্পের কর্মীদের কাছে নূতন মনে হলেও, এই জেলার এ একটা বিশেষ পরিচয়ের বিষয়।

এখানকার স্থানীয় জনসাধারণের মুখে, সরকারী ও পুলিশ কর্মচারীদের মুখেও শুনতে পাই যে এ জেলার কোর্টে যেসব মামলা মোকদ্দমা বিচারের জন্য উপস্থিত করা হয় তার পনর আনাই মিথ্যা ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এজন্য সাক্ষীরও অভাব হয় না এ অঞ্চলে। ঘটতলার ন্যায় টাকা খরচ করলে এখানেও সাক্ষী খুব সুলভ। অদ্ভুত এই দেশ, তার মধ্যে আরো অদ্ভুত এই [illegible] লোকগুলি! দুষ্কৃতিতে রামগংজের ঘোসর নাকি পার নাই! হবেও বা।

গোলাম সারোয়ার এবং তদ্দলীয় লোকেরা গান্ধী-ক্যাম্পের মতো একটি অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ সৎ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেসব জঘন্য মিথ্যা প্রচার করছিল তার পেছনে যে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের উস্কানি আছে তা যখন বুঝতে পারা গেল এবং গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে গোলাম সারোয়ারের ধ্বংসমূলক কর্মপ্রবৃত্তি যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখা গেল, তখন পূর্ববংগের প্রাদেশিক কর্তৃ-পক্ষের গোচরে আদ্যান্ত বিষয়টা উপস্থিত করা হয়। ফলে একজন মন্ত্রী কর্তৃক সমস্ত বিষয়টার অনুসন্ধান করা হয়। এবং গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে যে সব জঘন্য অভিযোগ গোলাম সারোয়ার এবং তৎপ্রভাবিত কতক হিন্দু ও মুসলমান উপস্থিত করেছিল তা সকলই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, পক্ষান্তরে গোলাম সারোয়ারের দুষ্কীর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এতে তিনি অধিকতর প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠেন, কেমন কোরে কত দ্রুত গান্ধীক্যাম্পকে উঠিয়ে দেওয়া যায়, উৎসাদিত করা যায় সেই ফিকিরে উঠে পড়ে লাগলেন। তিনি যত্রতত্র প্রকাশ্যে সভা করে জনসাধারণকে ক্যাম্পের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললেন। সভায় বৈঠকে ঘোষণা করতে লাগলেন যে গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরা ভয়ংকর, তারা গুণ্ডা ও মানুষ হত্যা করতে সুকৌশলী। তাদের রাস্তায় পেলে গুলি কোরে হত্যা করা উচিত। তারা আমাকে (গোলাম সারোয়ারকে) হত্যা করতে চেষ্টা করছে ইত্যাদি।

এই সব মিথ্যা উক্তি ও উত্তেজনাপূর্ণ বিদ্বেষমূলক প্রচারের কথা যথাসময়ে জেলাকর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়। কিন্তু কোনো ফলোদয় লক্ষ্যে পড়ে না। কেননা, গোলাম সারোয়ারকে সংযত হওয়া দূরে থাক উত্তরোত্তর ক্রূর হয়ে উঠতে দেখা যায়—পাল্টা, ক্যাম্প কর্মীদের বিরুদ্ধেই তিনি মিথ্যা এজাহার দায়ের করেন যে ক্যাম্পের কর্মীরাই তাকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন ইত্যাদি।

এইরূপ চলছে। ইতিমধ্যে গোলাম সারোয়ারের অনুগত ও দলভুক্ত জনৈক হিন্দু, আততায়ী কর্তৃক নিহত হয়। আনুপূর্বিক ঘটনা থেকে এই অনুমানই সত্য বলে লোকে বলে যে এই সুযোগ গোলাম সারোয়ারেরই সৃষ্টি! কিন্তু কার্যত তার উল্টোটাই ঘটে। গান্ধীক্যাম্পের দুইজন বিশিষ্ট কর্মীকে (বিশ্বরঞ্জন সেন ও ষতীশ চক্রবর্তী) এবং গান্ধীক্যাম্পের অনুরক্তস্থানীয় কতিপয় সৎ হিন্দু-মুসলমানকে এই হত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোরে গোলাম সারোয়ার পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার করান। ৬ মাসের ওপর অতিবাহিত হয় তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ অদ্যাবধি কোনো চার্জ সংগঠিত করতে পারেনি। চেষ্টা খুবই চলছে—

মিথ্যার জাল সৃষ্টি কোরে তাতে জড়িয়ে ফেলার। ঈশ্বর জানেন সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার আঘাত কতদিন চলবে, অন্ধ দৃষ্টিই বা তা কতদিন সইবেন।

মুসলিম গান্ধীক্যাম্পের ছেড কোয়ার্টার কাজিরখিলের ওপরও অনেকগুলি আক্রমণ চলে, ক্যাম্পের কর্মী ও শিক্ষকদের ওপর দিনদুপুরে দস্যুবৃত্তি চলল। মারপিট কোরে টাকা পয়সা কেড়ে নেওয়া, সাইকেল ছিনিয়ে নেওয়া, দুরন্ত অস্বাভাবিক আচরণ প্রদর্শন করা এই সব অভদ্র ব্যবহারের ক্রিয়া কলাপের পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। মিথ্যা গুজব প্রচার ও সাম্প্রদায়িক-ভীতি মানুষের মনকে এমন ভাবে সংকুচিত কোরে ফেলে যে, যে গান্ধীক্যাম্পের কর্মীদের ও কর্ম প্রচেষ্টাকে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ অত্যন্ত প্রীতির চোখে দেখত, ভরসা দিয়ে ভালোবাসত, সেই ক্যাম্পের কর্মীর ওপর দিনের আলোয় হাটে বাজারে পথে বহুলোকের মধ্যে অপমান লুণ্ঠন ও নির্যাতন চলছে—তার সাহায্যে বা রক্ষার্থে একটি লোকও এগিয়ে আসে না, প্রতিপক্ষের ভয়ে বা বিদ্বেষে প্রমাণের বেলায় একজনকেও সাক্ষী রূপে পাওয়া যায় না—এত ভয়, এমন সংকোচ ও সন্ত্রাস। কিন্তু অপর পক্ষে মিথ্যা বলার জন্য সাক্ষীর অভাব হয় নাই, এই বা বৈশিষ্ট্য—এই অঞ্চলের অধিবাসীদের।

সৎ মুসলমান কি নাই—আছে, বহু। কিন্তু অসতের ভয়কে ভয় করে যে! মনুষ্যত্বের এই অবমাননা দেখে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে; তিনি কী কাতর প্রার্থনাই না জানিয়েছেন—তাঁর এই দুটি কথায়—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে, হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোক ভয়, রাজ ভয়, মৃত্যুভয় আর।
হীন প্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চির-পেষণ যন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অপমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নত শিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার—
এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ-আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গল প্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"
(নৈবেদ্য)

গান্ধীক্যাম্পের কর্মীরা তো এই পথ, এই আদর্শ সম্মুখে রেখে জন-সেবার কাজ করে যাচ্ছেন। অকুণ্ঠ মনে অকপট ভঙ্গীতে তাঁরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে যেতে, পরস্পরের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষ-ভাব ও বিশ্বাসহীনতা অপনোদন করতে পরম নিষ্ঠার সহিত নোয়াখালির মাটি ও মানুষ আঁকড়ে পড়ে আছেন। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কেবল আঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতাই পুরস্কার স্বরূপ তারা পেয়ে এসেছেন।

এখানে এইরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করবো।

আংরাপাড়া একটি গ্রাম, কাজিরখিল গান্ধীক্যাম্পের ঠিক দক্ষিণে—পাঁচ মিনিটের পথ। গান্ধীক্যাম্প পরিচালক ব্রহ্মের শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত নানা দিক থেকে এই গ্রামটি একটি আদর্শ স্বাবলম্বী গ্রামসংগঠনের ক্ষেত্র হতে পারে এইরূপ মনে করেন ও একে ধীরে ধীরে সংগঠিত করার ব্যবস্থা করেন। গ্রামস্থিত হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রকার শিল্পী ও শ্রমিক শ্রেণীর লোক যেমন চাষী, সুতার, কামার, জেলে, তাঁতি প্রভৃতি বাস করে।

গ্রাম সংগঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রিলিফ বা দান করা সাধারণ ভাবে গান্ধীক্যাম্পের নীতি-বিরুদ্ধ। কাজেই তারা চেষ্টা করেন গ্রামের লোকের আর্থিক ও নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করতে। স্থানীয় শক্তি সঞ্চয়ণ দ্বারা আয়ের ব্যবস্থা কোরে সেই আয়লব্ধ অর্থ গ্রামসেবার কাজে নিয়োগ করার কথা তাঁরা ভাবতে পারেন।

এমন সময় গ্রামের জমিদারদের একটি প্রকাণ্ড দিঘী গান্ধীক্যাম্পের হাতে আসে। জমিদারস্বেচ্ছায় বড় আগ্রহ

কোরে দিঘীর আর থেকে গ্রাম সেবার কাজ হতে পারবে এই বিবেচনায় গান্ধীক্যাম্পের হাতে দিঘীটা দেন। দিঘীর পাড়েই উক্ত গ্রামের জনৈক কৃষকের এক টুকরা উঁচু জমি ছিল। উক্ত কৃষকমহাশয় ঐ জমিটুকু একটি বনিয়াদি বিদ্যালয় বা আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য ক্যাম্পকে দান করেন। গান্ধীক্যাম্প এই ভাবে নোয়াখালির দাংগাবিধ্বস্ত এলাকার স্থানে স্থানে লোকের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত জমি ও বাড়ী পেয়ে সেখানে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করে গ্রাম সংগঠনের কাজ করে আসছেন। এখানেও গান্ধীক্যাম্প খুব ধীরে ধীরে লোক-সংগঠন ও পল্লীমঙ্গল কাজে অগ্রসর হতে থাকেন। দুর্মূল্যের বাজারে লোককে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাল দেবার ব্যবস্থায় গ্রামের কতক রাস্তা নির্মাণ কার্য হাতে নেওয়া হয়। ঠিক হয়, চালের পরিমাণ সামান্য বলে কেবল দরিদ্রেরাই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সুযোগটা গ্রহণ করবে, ধনীরা স্বেচ্ছায় এই কাজ করলেও, চালের দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি রাখবে না। সবাই এতে রাজী হয়। কাজ চলতে থাকে। অনেকটা কার্য সম্পন্ন হবার পর কাজে যখন গ্রামবাসী রস উপলব্ধি করতে আরম্ভ কোরেছে, তখন গ্রামের স্বার্থদুষ্ট ও পরশ্রীকাতর বৈষয়িক লোকদের তা অসহ্য হল। নানা অজিলায় তারা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। এবং শেষে এমন ঘোরতর জটিলতার সূচনা দেখা দিল যে কাজ সেইখানে এসে থেমেই গেল। চক্র আর চলে না।

দিঘীটা কচুরী পানাতে সম্পূর্ণ আবৃত ছিল। সেটা পরিষ্কার করার কাজে হাত দেওয়া হয়। দৈনিক ৪০।৫০ জন করে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত ভাবে পেটে এটা পরিষ্কার করে ফেলে। একদিনে কাজটা শেষ করতে হলে প্রায় পাঁচশত শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল। সামষ্টিক ভাবে নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা হিসাবে এই কাজটি সম্পন্ন হওয়া কম কথা নয়। তারপর দিঘীর মাছ বিক্রী করে, নূতন মাছের চারা ফেলে ও দীঘির পাড়ের নীচু জমিতে ধান চাষ দ্বারা ভবিষ্যৎ আয়ের পরিকল্পনা করা হয়। সেই আয় গ্রামেরই কাজে ব্যয় করা হবে এইরূপ স্থির হয়

দিঘীর পাড়ের উঁচু জমিটিতে একটি বিদ্যালয় বসাবার আয়োজন হয়। কাজিরগিল ক্যাম্পের একটি বনিয়াদি বিদ্যালয় ছিল, সেখানে ছাত্র কম এবং কতক ছেলে মেয়ে আংরাপাড়া থেকেই যাতায়াত করত। আংরাপাড়ার হিন্দুমুসলমান ছেলেমেয়ে অনেক আছে যারা যাতায়াত করতে পারে না। বিদ্যালয়টি আংরাপাড়াতে স্থানান্তরিত করলে সকল রকমেই ভালো হবে—এই উদ্দেশ্যে এবং দিঘীর আয়েই ওর ভবিষ্যত পরিচালনা ব্যয় সুনির্বাহিত হতে পারবে, দিঘীতে কৃষি ও মৎস্য চাষ এই দুয়ের মিলা কেমন কোরে একে অন্যের উপজাত বা সহজাত শিল্প হিসাবে বর্ধিত হতে পারে তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি ছাত্রেরা হাতে কলমে শেখবার অবকাশ পাবে—এই সব চিন্তা কোরে বিদ্যালয়টিকে আংরাপাড়াতেই স্থানান্তরিত করা হয়। কাজিরগিল ক্যাম্প থেকেই বিদ্যালয়ের একটি তৈরী ঘর নিয়ে সেখানে বসানো হয় স্থানান্তর হওয়াতে কয়েক দিন পরেই আরেকটি তৈরী টিনের ঘর সেখানে নেওয়া হয়। স্বার্থান্বেষী দুষ্টচরিত্র পর-পীড়কদের মনে এতে একটা আতংক দেখা দেয়। এমন একটি সৎ প্রতিষ্ঠান গ্রামের বুকের ওপর বসে থাকলে এবং তাদের কর্মপ্রভাব লোকের মনে প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের পক্ষে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর দরিদ্র জনসাধারণকে ঠকিয়ে রোজগার করা যে আর চলবে না, এই ভয়েই তারা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে বড় বেশী ও তাদের বহু পুরাতন অসদুপায়ে রোজগারের পথে যে একটা প্রতিবন্ধক গড়ে উঠেছে, এটা অচিরেই যাতে বিনষ্ট করতে পারা যায় এজন্য তারা নিরুপায় হ'য়ে গোলাম সারোয়ারের শরণাপন্ন হয়। গোলাম সারোয়ারও এমনই একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। গান্ধীক্যাম্পের প্রধান কর্মকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়কে কেমন কোরে যুগপৎ আক্রমণ দ্বারা নিষ্ক্রিয় ও বিনষ্ট কোরে তোলা যায়—সেই ষড়যন্ত্রে তিনি মত্ত ছিলেন আংরাপাড়া গ্রামের দুর্বৃত্ত দল তাঁর সাথে যুক্ত হওয়ায় দুপক্ষেরই স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—এইরূপ সকলে মনে করে। গোলাম সারোয়ার তাঁর দলের লোকদ্বারা আংরাপাড়াতে গান্ধীক্যাম্পের সকল সৎপ্রচেষ্টাকে আঘাত হানতে আরম্ভ করে। দিঘীর নিম্ন ঢালাটে যেখানে ঝোপ হয়েছিল তা

দুর্বিনীত পূর্বক জোর কোরে উঠিয়ে ফেলা হয়, নষ্ট করে ফেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিদ্যালয় গৃহটি দুর্বৃত্তেরা জোর করে বে-বরল করে ও বলে যে সে ঘর তারাই নির্মাণ কোরেছে এবং তাদেরই একজন ওর মাসিক বলে দাবী করে। অথচ ঘরটি ক্যাম্পের একটি পুরাতন তৈরী চালা, কাজিরখিলের একটি ঘর ভেংগে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। আশ্চর্য যে—যে সব মুসলমান মজুরকে এই ঘরটি স্থানান্তরে ও নির্মাণে নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা মজুরী নেবার পর দুর্বৃত্তদলেই যোগদান করে ও দিবালোকে সকল-সাক্ষাতে সাক্ষ্য দেয় যে ঘর ক্যাম্পের নয়, ঘর তাদেরই। এমন কি ঘর নির্মাণার্থে যে সব বল্লারি সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সে গুলিও তারা তাদের বলে দাবী করে ও নিজ বাড়ীতে নিয়ে যায়।

এতবড় মিথ্যাচার ও প্রতারণার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় লেখকের জীবনে এই প্রথম। ঘটনাটি থানায় গোচরে যায়। থানার দারোগা সাহেব ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন ও বিশেষ ভাবে তদন্তক্রমে এই মিথ্যা ও প্রতারণার আবরণ ভেদ কোরে সত্য আবিষ্কার করেন ও গান্ধীক্যাম্পকে ঘরটির দখল দেন এবং বেদখলকারীকে গ্রেপ্তার করেন। জামিনে সে অব্যাহতি পায়। পরদিনই সে আক্রোশ ও প্রতিহিংসাবশত গৃহটির ঠিক প্রবেশ পথেই দরজার সম্মুখে একটি চালা নির্মাণ কোরে প্রবেশ পথটি বন্ধ কোরে দেয়। এই অবস্থায় বিদ্যালয় বন্ধ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জেলার ডেপুটি পুলিশ সাহেব সহ গোলাম সারোয়ার পূর্ব গোপন ব্যবস্থা মতো একদিন সকালে ও আংরোপাড়া গ্রামে এসে হাজির হন ও যে বিদ্যালয় গৃহটি পূর্বে গোলাম সারোয়ারের দলের লোকেরা জোর পূর্বক বেদখল করে ও থানার দারোগা স্বয়ং সরজমিনে তদন্ত কোরে যার দখল গান্ধী-ক্যাম্পকে দেন ও বেদখলকারীকে গ্রেপ্তার করেন সেই গৃহটি এখন ডি, এস, পি সাহেব এসে পূর্বের বেদখলকারী দুর্বৃত্তকে দখল দেন ও গান্ধীক্যাম্পের পাহারারত দুইজন কর্মীকে (মাখন লাল চক্রবর্তী ও রমেশ চন্দ্র মজুমদার) গ্রেপ্তার করেন। ডি, এস, পি সাহেবের এই যে তদন্ত, দশমিনিটের পথ গান্ধীক্যাম্প, তাদের না জানিয়ে বা তাঁদের অসাক্ষাতে এমনভাবে এই ব্যবস্থা অবলম্বন কখনোই পক্ষপাত দোষদুষ্ট হয়নি। এর ভেতরের পরিপূর্ণ বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতার মনোভাব প্রকাশ পায়।

ডি, এস, পি সাহেবের সাক্ষাৎ সহযোগিতায় ও প্ররোচনায় গোলাম সারোয়ার আরো৮টি ষড়যন্ত্রমূলক কাল্পনিক ঘটনার সৃষ্টি করেন। গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে গ্রামের সেই সব স্বার্থান্বেষী দুর্বৃত্তদের দ্বারা। ডি, এস, পি সাহেবের তদন্ত কালীন দুএকটি উক্তি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ থেকেই পরিষ্কার হবে যে গোলাম সারোয়ার প্রমুখ দুর্বৃত্তদল গান্ধীক্যাম্পের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগতে কেন এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। ডি, এস, পি সাহেবের তদন্ত একটি প্রহসন বললেই হয়।

তিনি তদন্তকালে উপস্থিত মুসলমানদের সম্বোধন কোরে বলেন এখানকার মুসলমানেরা শেয়াল কুকুরেরও অধম বলতে হয়। সেইজন্যই গান্ধীক্যাম্প এখানে থাকতে পারছে। আর সেইজন্যই দারোগা সাহেব গান্ধীক্যাম্পকে ঘরের দখল দিতে সাহসী হতে পেরেছে। তিনি আরো বলেন, 'আর কী আপনারা আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চান?' এই সময়ে গোলাম সারোয়ার বলেন—'দারোগা সাহেবের জন্য কিছুই করা যাবে না।' অবসর বুঝে মুসলিম জনতা চীৎকার কোরে বোলে ওঠে দারোগা সাহেব গান্ধী-ক্যাম্পের নিকট থেকে ঘুষ খেয়ে একজন মুসলমানকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তাদেরকে ঘরের দখল দিয়েছেন। ডি, এস, পি সাহেব তখন স্পর্ধা ভরে বলেন—'আপনারা শান্ত থাকুন। এই দেখুন না যে দারোগা খালেককে (দুর্বৃত্তদলের একজন) বের করে দিয়ে গান্ধীক্যাম্পকে দখল দিয়েছে—তাকে দিয়েই আবার উল্টোটি করাচ্ছি।'

এই ঘটনার সমাপ্তির সাথে সাথে, জনৈক দুর্বৃত্ত সরদার ৩টি পঞ্চাশোর্ধ্ব-ধোপা শ্রেণীর বিধবাকে ডি, এস, পি. সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করে ও তাদের দ্বারা ক্যাম্পের ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্র কুমার দাস ও জনৈক স্থানীয় রাজ-নৈতিক কর্মী শ্রীনলিনী চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে একটি নারী

ধরণের (abduction) অভিযোগ আনা হয়। একজন এইরূপ মিথ্যা অভিযোগের বাদী হতে অস্বীকার করে। অপরটিকে নানারূপে প্রলুব্ধ করা হয়। ডি, এস, পি, সাহেবও তাকে এই বলে উৎসাহ দেন যে এজন্য তার কোনো লোকসান নেই বরং লাভই আছে ইত্যাদি।

কয়েকদিন পরেই আরেকটি ষড়যন্ত্রমূলক বিশ্বাস ভংগের (Defalcation of public money) অভিযোগে ক্যাম্পের ব্যবস্থাপক শ্রীচারু ভূষণ চৌধুরী, সহকারী ব্যবস্থাপক রঞ্জন কুমার দত্ত ও আংরাপাড়া গ্রামের সেই কৃষক কর্মী (যিনি গান্ধীক্যাম্পকে বিদ্যালয় গৃহের জন্য জমি দান করেছিলেন) শ্রীবৈকুণ্ঠ রঞ্জন পালকে অভিযুক্ত করা হয়।

আর এই সব অভিযোগের পক্ষে সাক্ষীর অভাব হয় নাই। অদ্ভুত মিথ্যা সাক্ষ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। সাক্ষীদের ভালোবাসা গান্ধীক্যাম্প পেয়েছেন, কিন্তু তারা তো ভয়মুক্ত হতে পারে নি। প্রাণ ভয়ে তাদেরকে মিথ্যার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হয়েছে—জিজ্ঞাসা করলে বলে, "কি করবো, মিথ্যা না বললে কি উপায় আছে? এখানে তবে থাকবো কি কোরে; এদের কৃপা দৃষ্টির দিকে চেয়ে পড়ে আছি! এরা যা বলে, চোখ কান বুজে তাই-ই বলি, তাই-ই করি।"

থানার ওপর নির্ভরতা নেই। কেন না তাঁরা কিছু করে না। যদি কিছু করে আর কারো কিছু করেও তবে যে তাদের পকেট ভারি উৎকোচ দিতে পারে তাদেরই জন্য কিছু করে। গরীবের কোনো কূল নেই। বলিষ্ঠ যারা, ধনশালী অত্যাচারকারী জুলুমবাজ যারা, থানার কর্মচারীরা তাদেরই বশে থাকে—আছেও। দরিদ্রের পিতামাতা নেই সুহৃদ নেই।

১৯৪৬ এর দাংগার অব্যবহিত কাল থেকেই গান্ধীজীর প্রতিষ্ঠিত গান্ধীক্যাম্পের নিঃস্বার্থ ও মানব সেবায় উৎসর্গীকৃত-জীবন কর্মীরা হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই নিরলসভাবে মানবতার পরম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা করে এসেছেন। সকলের হৃদয়ে অকপট বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্কের পরম সুখস্পর্শ ও গৌরব অনুপ্রেরিত করতে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দুদের পাকিস্তানেই, নিজ নিজ পৈত্রিক বাস্তুভিটেই স্বগৌরবে স্বপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য সৎসাহস ও সদনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছেন, আর এই কাজে তাঁরা স্থানীয় হিন্দু মুসলমান শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্ব সাধারণেরই আন্তরিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে কামনা করে এসেছেন। অনেক ক্ষেত্রে তা পেয়েছেনও।

গোলাম সারোয়ার প্রমুখ গ্রাম-প্রধানদের সহযোগিতা সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা কামনা করেছেন। কিন্তু সে আশায় ব্যর্থকাম হয়েছেন বার বার। বস্তুত গোলাম সারোয়ার প্রমুখ স্থানীয় নেতা ও গ্রাম প্রধানেরা তাঁদের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোভাব বশত কোনোও কুকর্ম থেকে সম্পূর্ণত বিরত হয়ে গান্ধীক্যাম্পের ন্যায় একটি শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িকতাবাদী মানবসেবী প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা করলে নোয়াখালির সামাজিক পরিবেশ, নোয়াখালির হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক, এখানকার অর্থ-নৈতিক কাঠামো একটা বিশেষ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতো, সারা পূর্ববংগে নোয়াখালি একটা গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত। নোয়াখালি পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ গৌরব অর্জনের অধিকারী হতে পারত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সহযোগিতা ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া দূরে থাক্ কেবল একের পর এক অন্তরায়ই সৃষ্টি করে এসেছেন এখানকার গ্রাম প্রধানেরা। নিরীহ নিরক্ষর দরিদ্র হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে ঘনিষ্ট প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রয়ত্ন চলছিল, গোলাম সারোয়ার প্রমুখ লোকেরা কোনো না কোনো একটা অজুহাত সৃষ্টি কোরে, লোকের মনে ভয় ও উত্তেজনার সৃষ্টি কোরে, তা নষ্ট করতেই বরাবর চেষ্টা করেছেন এবং এই ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনর্গঠিত সদ্ভাব ও আন্তরিক ঐক্যবোধ পুনঃ পুনঃ শিথিল ও নষ্ট করা হয়েছে। হিন্দুরা পাকিস্থানে থাকতে পারে না, বা পারবে না, এমনই একটা ধারণা গোলাম সারোয়ার ও তদ্রূপীয় লোকেরা পুনঃপুনঃ এখানকার হিন্দু মুসলমানের মনে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন এবং একরূপ গায়ের জোরেই ও ভীতি-

প্রদর্শনের দ্বারাই ভ্রাতৃত্বের যে প্রীতিসৌধ গান্ধীক্যাম্প উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি কষ্টে, অতি যত্নে ও ধৈর্যের সহিত, অতি প্রেমের সহিত ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন তাকে পুনঃপুন ভূমিসাৎ করা হয়েছে, লোকের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কলহের প্ররোচনা দ্বারা।

"গান্ধী ক্যাম্পের কর্মীরা কোনো রাজনৈতিক সংস্থার লোক নহেন, সম্পূর্ণভাবেই তাঁরা গান্ধীজীর আদর্শ, সত্য ও অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি বা দল নিরপেক্ষ জনসেবক মাত্র। গান্ধীজীর আদর্শে, সমগ্র দেশে শান্তি, ঐক্য ও রাষ্ট্রানুগত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা, গঠনমূলক গ্রাম শিল্পের উদ্ভাবন, প্রবর্তন ও উন্নয়ন দ্বারা গ্রাম স্বাশ্রয় গড়ে তোলাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। গান্ধীক্যাম্পের কর্মীদের জীবন-নীতি যে এই কর্মনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা সর্বজনবিদিত। নোয়াখালিতেই তাঁরা জীবনে এই প্রথম পরীক্ষায় নেমেছে এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। এঁদের অনেকেই বহু পরীক্ষিত সন্ন্যাসী সজ্জন। নিন্দা বা প্রশংসার অপেক্ষা এঁরা রাখেন না। লোকচিত্তে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে 'হোম' কোরে দিতেই এঁরা অভ্যস্ত আর তাতেই এঁরা নিজেদেরকে সার্থক মনে করেন। এমন একটি সংস্থা এবং তাঁর কর্মীদের সঙ্গ ও কর্মপ্রেরণা লাভ করা যে কোনো দেশের পক্ষে 'মহা ভাগ্য' বলতে হয়। কোনো সজ্জন বা গুণী ব্যক্তি বা কোনো সুশীল রাষ্ট্র বা সমাজ এঁদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবা পেলে কি তা ছাড়তে চায়? চায় না। কিন্তু পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণকারী মুসলমানেরা গান্ধীক্যাম্পের উপস্থিতিকে আর মুহূর্তের জন্যও যেন সহ্য করতে পারছে না। গান্ধীক্যাম্প এখানে আর কি জন্যে আছে? এখন তো সর্বত্র শান্তি ও ঐক্য বিদ্যমান'! একদল হিন্দুও তাদের দ্বারা ভয় প্রভাবিত হয়ে অনুরূপ উক্তি করছে। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে গান্ধীক্যাম্পের এখানে থাকার এখনো 'বিশেষ' আবশ্যকতা আছে। আমার মতে, গান্ধীক্যাম্প যদি এমনই একটা অসাম্প্রদায়িক জনহিতকর সংস্থা, সত্য ও অহিংসার আদর্শ লোক ও সমাজ-সেবাই যাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁদেরকে পাওয়া যেখানে, সৌভাগ্যের কথা, সেখানে তাঁদেরকে বিতাড়িত করার জন্য এই যে বাস্তুতা এ কখনোই সন্তাবের ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব-সূচক নয়। এই জন্যই বলবো যে নোয়াখালিতে গান্ধীক্যাম্পের প্রয়োজন সত্য সত্যই সেইদিন শেষ হবে, যেদিন এদেশের প্রত্যেকটা হিন্দু ও মুসলমান, সরকারী কর্মচারী, ও সরকার সাগ্রহে সানন্দে সাদরে ও আন্তরিকভাবে গান্ধীক্যাম্পকে এখানে থাকবার জন্যই অনুরোধ করবে, যেতে দিতে চাইবে না। গান্ধীক্যাম্পের প্রস্থানের উদ্যোগে তারা সত্য সত্যই বেদনা অনুভব করবে।

আজ গান্ধীক্যাম্প যদি নোয়াখালী থেকে প্রস্থান করে তবে এদেশে হিন্দুদের বাস করা নিশ্চিতরূপে অসম্ভব হয়ে উঠবে। দুষ্কৃতকারীর দল তাদের ওপর যথেচ্ছ ও অকারণ উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেবে, হিন্দুরাও ভীত সন্ত্রস্ত হয়েই ইতস্তত ধাবিত হবে—আশ্রয়প্রার্থী হবে। একটা অস্বাভাবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে। কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে এ অবস্থা কি শুভকর, না গৌরবের? কাজেই বলতে হয়, এখানে গান্ধী ক্যাম্পের অবস্থান ও এঁদের অকপট অনলস সেবা ও কর্মপ্রেরণা এদেশের সর্বসাধারণের ও ষ্টেটের পক্ষে সর্বতোভাবেই কল্যাণকর ও আদরণীয়। আর গান্ধী ক্যাম্প তো সর্বদাই জনগণের ও ষ্টেটের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও উন্নতি কামনায় তাদের সকলকারই সহানুভূতি ও সহযোগিতা আন্তরিক ভাবেই আশা করে এসেছেন। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ, বিশেষ কোরে এ জেলার স্থানীয় নেতা ও গ্রাম প্রধানেরা তাদের সানন্দচিত্ত—সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলে গান্ধীক্যাম্প এ জেলার সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতিসাধনে কর্ম করবার প্রচুর অবকাশ পেতে পারেন, যা এতাবৎ পাওয়া যায়নি।

গান্ধীক্যাম্প আজও আশা করে এবং ভবিষ্যতেও আশা করতে থাকবে যে গান্ধীক্যাম্প তাঁদের মানবদেবামূলক কর্ম প্রবৃত্তিতে এখানকার সকল হিন্দুমুসলমান জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে একদিন সফলকাম হবেই। এঁরা হতাশা জানেন না। অনন্ত আশাবাদী এই নোয়াখালিতেই তারা সত্যাশ্রম অর্থাৎ রামাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান। এখানকার এই বিরোধীদের হৃদয়ই তাঁরা

জয় করতে চান। তাদের সাথে অকপট প্রেমের সম্পর্কই গড়ে তুলতে চান গোলাম সারোয়ার প্রমুখ গ্রাম প্রধানদের তাঁরা সহকর্মীরূপে পেতে আশা রাখেন। এ আশা কি নিরর্থক? এ দেশ যথার্থ পাকিস্তানের মর্যাদা সেইদিনই নিঃসংশয়ে লাভ করবে যেদিন গান্ধীক্যাম্পের ন্যায় একটি সার্ব দেশিক খ্যাতি সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সংস্থাকে এ দেশের শাসন কর্তৃপক্ষ তথা দেশবাসী জনসাধারণ সমানভাবে শ্রদ্ধা ও আদর করতে অভ্যস্ত হবে, যেদিন এখানকার সরকার ও জনসাধারণ মনে প্রাণে এই বিশ্বাসই পোষণ করবে যে গান্ধীক্যাম্পের অবস্থান ও সেবাধর্ম এদেশেরই কল্যাণে একান্ত কাম্য ও অনুপেক্ষনীয়। কিন্তু আজকার নোয়াখালি সংস্কারই দেশের বলে নিজেকে প্রমাণিত করছে—কাজে ও ব্যবহারে। রাবণের লংকা বিভীষণের 'রামরাজ্যে' রূপান্তরিত হয়েছিল—বিভীষণের তপশ্চর্যায়। নোয়াখালীকেও গান্ধীক্যাম্প 'পাকিস্তান' বলতে যে পুণ্যস্থানের কথা মনে হয় সেই রাজ্যে অর্থাৎ রামরাজ্যে (ধর্ম রাজ্যে) পরিণত করতে আশা রাখে, তাদের ত্যাগ সেবা ও প্রেমের দ্বারা।

যেথায় তুমি

শ্রীপান্থ

বেথা গড়িয়া উঠেছে বিলাস কুঞ্জ
কৃত্রিম ঘষা মাজা।
সেথা তোমার ছলনা ভক্তি প্রণাম
কুঁজিছ কারা-সাজা।
বেথা ভা'য়ে ভা'য়ে শুধু করিতে ধ্বস
স্বার্থের কল রোল।
শুধু বিবিধ রূপেতে করিছে বিচার
করিয়া গণ্ডগোল।
তুমি সূক্ষ্ম তর্কে যুক্তির জাল
তোমায় বেড়িতে চায়,
সেথা ফাঁকে ফাঁকে তুমি সরে সরে যাও
পিছে পিছে থাক ছা'য়।
লাভ লুকানে ধূলা ঝাড়ি ফেলি
রাখিছে শুচিতা নিয়ে।
সেথা ধূলা মাখে তুমি দূরে সরে যাও
পরশ করনা চিত্ত।
সেথা যোড়শোপচারে সাজায়ে অর্ঘ্য
করিছে নিত্য পূজা,
তুমি আড়ম্বরেতে থাকনা যে কভু
সে কক্ষ শূন্য বুঝা।
বেথা অবহেলা করি প্রাণের ঠাকুরে
তোমায় করিছে বরণ।
সেথা অপমানে ফেরে ফিরে যাও তুমি
পিছনে ফেলিয়া চরণ।
কর্মেরে ভাবি অর্থ মূল
ত্যাজি যায় গৃহপুর
সে ফেরে ঘরে ঘরে
তোমারি আর্ত সুর
ভূর্ণ পরাণে ভিক্ত তুলিতে
ক্লিষ্ট ভিখারী একা
সেথা নয়নের জল ঢাকে মরমেরে
কোথা আছ ওগো দেখা।
সেথা আঁধার নিশীথে শ্রাবণ গগন
ফেলেছে অশ্রু জল।
তোমার বারতা বহে নিয়ে আসে
বিশ্বাস কমল।
সেথা অবোধ শিশুটী আধো আধো ভাষে
ডাকিছে আচার মাতা।
সেথা শিশু মুখে সেই ভাষহীন ভাষে
শুনেছি তোমার কথা।

পাহাড়তলীর কাব্য

শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

সাঁওতাল পরগণার নগণ্য এক গ্রামে বদলি হ'য়ে এসেছি অফিসের কাজে, পাহাড় কেটে পথ তৈরী করতে হবে, কিন্তু তা দু'এক দিনের কাজ নয়, থাকতে হবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য। তাই ভাবু না ফেলে একটা ঘরই ভাড়া করলুম দেখে শুনে।

ছোট ঘর, মাটি থেকে প্রায় দু'তিন হাত উঁচু করে তৈরী কাঠের ঘর। কিন্তু কাঠের হলে কি হয় ভারী অন্ধকারময়, চারদিকে চারটি জানালা, আশে পাশে ঘন হয়ে কোন বাড়ী দাঁড়িয়ে নেই, তাই হাওয়া অপর্যাপ্ত। ইচ্ছে করলে ঘরটিকে স্থানচ্যুত করে অন্যত্র নিয়ে যাবারও অসুবিধে

কিন্তু ভয়ের কারণও কম নেই বাঘিনে নাকি বুনো শুয়োরের উৎপাত হয়। মাঝে মাঝে ডাকাতের আক্রমণও বিচিত্র নয় তা'ও আবার দুইহুটে চাঁদিনী রাতে, প্রথমটা তাই একটু ভয় ভয়ো দৈকি। তবে ভরসা এই যে কুড়িয়ালো সাথে আছে, আর আছে দু'দু'টো গাধা বন্দুক।

যাই হোক, মনে সাহস আর বিশ্বাস সঞ্চয় ক'রে আসবাব পত্রে ঘর গুছিয়ে নিলুম, আর না গুছিয়েই বা উপায় কি! থাকতে যখন হ'বেই তখন তো আর ভয় করলে চলবে না। চাকুরী করতে গেলে জীবনের প্রতি এত সদয় ব্যবহার করলে চলবে কেন? আর তা মানবেই বা কে?

কিন্তু দিন দুয়েক যেতেই ব্যাপারটা বেশ ভালো লেগে গেল। চেনা পরিচয়ও হয়ে গেল গুটি কয়েক লোকের সাথে। ভারী মিষ্টি গুদের স্বভাব। যেমন মধুর তেমনি অনাবিল

ভোর বেলা বেরুবার পূর্বেই একটি মেয়ে এসে দুধ দিয়ে যায়। এখানকার সর্দার বাহানীই তাকে ঠিক ক'রে দিয়েছে। বেশ মেয়েটি। নিটোল দেহ, ভাসা চোখ, ঘাড় পর্যন্ত নেবে আসা বাবড়ি বাবড়ি এক গুচ্ছ চুল। চলায়, বলায় একটা মধুর ছন্দ আর সুর যেন সর্বদাই লেগে আছে। কিন্তু তার চেয়েও মধুর স্বভাবটি। একটু চঞ্চল বটে, কিন্তু সলজ্জ এবং নম্র। নামটিও ভারী মিষ্টি পাহাড়ী।

এর মধ্যেই তার সাথে আমার দু'এক কথায় বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে, প্রথমে একটু লজ্জা করতো, এখন আর তা' করেনা, বেশ প্রাণ খুলেই কথা বলে। কত কথা, বাড়ীর কথা, পাড়ার কথা, সইএর কথা, আরও কত কি। বলতে বলতে সে যেন তন্ময় হয়ে যেতো

হঠাৎ একসময়ে কিছু একটা মনে পড়তেই "উঠে যাই বাবু" বলে চঞ্চল পদে এঁকেবেঁকে একটা সাড়া জাগিয়ে চলে যেতো।

প্রথমে রান্না-বান্না করতো আমার আজন্ম সহচর উৎকল নিবাসী সনাতন। কিন্তু এখন পাহাড়ীই করে। কারণ সনাতনের তৈরী খাদ্য মুখে দেওয়া মানে স্বইচ্ছায় নিজের গালে চড় খাওয়া। কথাটা একদিন পাহাড়ীর সামনে বলার জন্যেই অবশ্য এ ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য এক সর্তে। তার বদলে তাকে রোজ একছড়া মালা কিনবার পয়সা দিতে হবে। এ আর এমন কি কথা। দু'চার পয়সা তো দাম। অতি সহজেই রাজী হলুম। সেই থেকে সেই আমার রান্না করে।

বেশ রাঁধে মেয়েটি। হালে তাই খাওয়াটা মন্দ হচ্ছে না। ওদের রান্নার মধ্যে কোথায় যেন একটু মধুর স্বাদের মাদকতা রয়ে গিয়েছে।

মাঝে মাঝে বুনো হাঁস আর বুরগীর মাংস হয়। বড় চমৎকার তৈরী করে পাহাড়ী।

একদিন সন্ধ্যের পর কাজ থেকে ফিরেই দেখি সিঁড়িতে বসে পাহাড়ী। সামনে যেতেই নিঃসংকোচে আমার হাতটা ধরে বললো "চল্ দাদা বাবু, আমার উৎসব দেখার লাগি।"

উৎসব? বেশ একটু বিস্ময় জাগে আমার মনে।

"কেন্ জানিস না? আজ যে ভরা চাঁদের উৎসব। বাঁশী বাজবে, মাদল বাজবে, সঙ্গে চলবে মহুয়া, সব্বাই সাজ-গোজ করবে আজ। দেখবি কেমন সব সাজে। তোদের বাংলা মুলুকের লোকেরাও অমনসুন্দর সাজতে পারে না।

কেমন সব বেল ফুলের মালা আর রাঙা পলাশের হার গলায় দোলাবে, কেউ চুলে জড়াবে। চল্ চল্—" আনন্দে যেন সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। চোখে যেন টিকটিকে জৌলুস জেগে দীপ্তি ফোটে। চঞ্চল হয়ে ওঠে তার হাবভাব অকারণেই।

অগত্যা রাজী হতে হলো। প্যান্ট কোট ছেড়ে পাজামা-আর পঞ্জাবী চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম তার সাথে।

হাঁটতে হাঁটতে প্রায় পাহাড়তলীর শেষে গিয়ে দেখি বহুরা বনের ফাঁকে ফাঁকে ঝিলি মিলি করছে আলোরচ্ছটা।

পাহাড়ী আনন্দে নেচে উঠে বললে "ঐ যে উইখানেই আমাদের নাচ হবে," এর পরই এক প্রকার হাওয়ার ভর ক'রে ছুটতে ছুটতে আমাকে টেনে নিয়ে চললো আসর মুখো।

সবাই আদর করে বসালো আমায়। একটু বাদেই আরম্ভ হোলো নাচ, সঙ্গে মাদল ও বাঁশী সহযোগে সঙ্গীতের বিচিত্র সুরচর্চা। সত্যি বড় বিচিত্র, বড় মাদকতা পূর্ণ তাদের নাচ আর গান। যেন মোহ জাগিয়ে দেয়, সাজ সজ্জায় কোন বহুমূল্যের প্রাচুর্য নেই, চাকচিক্য বলতেও সে রকম কিছু নেই। শুধু হরেক রঙের ফুলের বাহার। দেহের প্রায় সর্বত্রই তারা ভ'রে ফেলেছে ফুলের পর ফুলের স্তবকে, মাথায় আর কোমরে তাল খেজুরের বা দেবদারু পাতার চূড়া আর ঘুংচি।

মাঝে বৃত্তাকারে নাচছে নর আর নারীর দল। এক দল পুরুষ তাদের ঘিরে মেয়েদের পায়ের ঘুঙুরের তালে তালে মাদল আর বাঁশী বাজাচ্ছে।

পুরুষ নাচছে বাহুবেষ্টন করে, মেয়েরা নাচছে সম্মিলিত গতিতে। অতি ক্ষিপ্ত অথচ মন মাতানো সে নাচ। বিস্ময়ে যেন খানিক সময় সম্মোহিত হয়ে ছিলুম তাদের আনন্দ উৎসবে

এক দল নাচ শেষ ক'রে বিদায় নিচ্ছে, আরেক দল এসে শুরু করছে নাচ। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছে মহুয়ার সদ্ব্যবহার। নেই কোন ক্লান্তি, নেই কোন ছন্দপতন, আজ যেন তাদের দেহে উথলে ওঠা যৌবন চির বসন্তের ক্লান্তিহীন আনন্দে আর উন্মাদনায় ভরে উঠেছে। আজ যেন তারা নিঃশেষে পান করতে চায় রসময় যৌবনের সুধা।

কতক্ষণ তন্ময় হয়েছিলুম স্মরণ নেই; হঠাৎ দাদাবাবু ডাকে চমকে ফিরে চাইতেই দেখি সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী, পাশে একটি নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল যুবক।

"উ আমার বন্ধু। আসছে ফাগে উয়ার গলায় মালা দিব। তু—" পরিচয় দান অসমাপ্ত রেখেই যুবকটির প্রতি এক নজর চেয়ে মুচকি হেসে মুখ নিচু কোরলো।

"যাঃ তাই নাকি? বেশ বেশ তারী সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু তোমাদের দু'টীতে"। তাদের লজ্জা কাটাবার জন্যে আনন্দের তান করি আমি।

যুবকটী পাহাড়ীকে হেসে বলে "দেখছিস বাবু কি কইছে। আর তুই বলিস কিনা—" আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয় তারা উচ্ছল দু'টী কণ্ঠের হাসি; আমিও যোগ না দিয়ে পারি না। ত্রি কণ্ঠের সহযোগে পরিচয়টা আরও গভীর হয়ে ওঠে।

ছেলেটীর নাম মৈনাল। সমজাই এবং কর্মঠ, সবল। ভয় ডরটা তার একটু কমই আছে। আর যা সে অশোভন মনে করবে তার বিনাশ না করে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না।

এক সময় বিদায় নিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছি, হঠাৎ পাহাড়ীর গলা শুনে থমকে দাঁড়াই "ও দাদাবাবু একটা কথা! শোন্ শোন্—" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করি "কি করবে।"

কানের কাছে মুখ এনে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে "তুই বিয়া করবি?" বিয়ে?—চমকে এবং অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে তাকাই তার মুখের পানে। "তোরে খুব পছন্দ হইছে পিয়ারীর। উথারেও খুব সুন্দর লাগবে।" পাহাড়ী বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করে আমাকে।

মনে অবিশ্বাস এবং সন্দেহের দ্বন্দ্ব জাগে। কি আশ্চর্য। এই অশিক্ষিত মানুষেরাও পলকের নজরে ভাল-বাসতে পারে? এরাও কামনা জানায়, নিঃসঙ্কোচে ভালো-বাসা জানায়? শুধু তাই নয়। এক দৃষ্টিতেই উতলা হয়ে ওঠে বিয়ে করবার জন্যে! আশ্চর্য!

তাছাড়া যে বিয়ের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে

দেশ ছেড়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসনের গ্রহণ করলুম। সেই বিয়ে সেই মন দেওয়া নেওয়ার খেলা? এখানেও তার পুনরাবৃত্তি! প্রেম আর বিয়ের ফাঁদ কি ভুবন জুড়ে আছে?

প্রকৃতিস্থ হয়ে বললুম ভির পাগলী আমার বিয়ে করবে কি? আমি দেখা পড়া শিখেছি এখানে ওখানে ঘুরে পয়সা উপার্জনের আশায় বিয়ে বা ভালোবাসবার সময় কৈ! আজ আছি কাল নেই! বরং তোদের দেশেইতো কত সুন্দর সুন্দর ছেলে আছে তাদেরই কাউকে—

তোরে পছন্দ করলো যে—কথায় বাধা দিয়ে পাহাড়ী পেশ করে তার অভ্রান্ততা—আমায় পছন্দ করেছে? বেশ বিস্মিত হই আমি।

হ্যাঁ তোর বরাৎ ভালো আছে বাবু! নইলে জানিস আমার দেশের মেয়ে ছেলে কভি পর পুরুষের পছন্দও করে না। বিয়াতো একদম না।

আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। সাময়িক একটা মন ভুলানো প্রবোধ বাক্য ঝাড়িয়ে ফিরে আসি বাড়ীতে। কিন্তু সেই চিন্তাটা যেন আমায় পেয়ে বসে। কত ছুনকো কত বড় ছেলেমানুষী এই ব্যাপারটা তবুও নিশ্চিন্তে মন থেকে ফেড়ে ফেলতে পারি না তাকে। বারে বারে অসতর্কিৎসুক মনের ফাঁকে ফুটে ওঠে সন্ধ্যে বেলাকার সেই নরনারীর নাচের ফাঁকে গোপন দৃষ্টা। মনে পড়ে হ্যাঁ, একটা মেয়ে বার বার আমায় লক্ষ করছিল বটে। রূপ আছে আর আছে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে বিলিয়ে দেবার দুর্লভ স্পর্দ্ধা, এক নজরেই সঙ্গ লাভের একটা ইচ্ছা জাগে মনে, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও—সামান্য তৃপ্তিলাভের ছলে একটা ভরা যৌবনা মেয়ের ভবিষ্যতকে অসহায় ক'রে দেওয়া কি উচিত! আমার শিক্ষিত মন যেন কিছুতেই সায় দিতে চাইলোনা এ মোহকে।

না পাহাড়ীকে স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দেওয়াই ভাল যে এ সব যেমন শোভনীয় নয় তেমনি এ বয়সের সঠিক ধর্মও নয়। ধর্মের নামে অধর্মে আর যেই উৎসুক হোক, মন কিছুতেই হবেনা। তাছাড়া এখানে কদিনই বা আছি। দেশে তো আর বৌ করে নিয়ে যেতে পারবোনা; এ কদিনের জন্যে এ ছেলে খেলা করে লাভ কি? তবু একটা আশা ভরা যৌবনে উন্মনা মেয়ের ভবিষ্যতই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

দেশে আমার সমাজের শিরস্তী বাবা দাদারা আছেন। তারাতো একটা ভিন্ন দেশীয় অশিক্ষিত অবোধ্য ভাষাভাষীর মেয়েকে সম্মান দিয়ে ঘরে তুলে নেবে না। যত বড় সুন্দরীই সে হোক না কেন! বাংলার অস্থি মজ্জায় মিশ্রিত অন্ধ সমাজটার চোখেও কি নিরপেক্ষ প্রেম আর একত্ব মমতা বোধ বড়? অসম্ভব।

এক সময় নিজের কাছেই নিজেই লজ্জিত হই। শেষে উপহাস ভেবে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টায় ঘুমোবার ভান করি। কিন্তু অস্বস্তি যেন আরও বাড়ে আরও বেশী করে দৃষ্টি পথে ফুটে ওঠে মেয়েটার স্পর্দ্ধার কথা।

একটু লোভও হয় বটে। নিঃসঙ্গ জীবন, তবু একটা অবলম্বন হবে। কিন্তু কি লাভই বা তাতে। মনের মিল তো হবে না। শিক্ষা আর অশিক্ষার মাঝে যে একটা দুস্তর ব্যবধান।...সভ্য সমাজের নারীকে সত্যি করে যাচিত রুচির মন নিয়ে ভালোবেসেই পেলেম না, এ তো সরল অশিক্ষিত এক গ্রাম্য নারী। প্রেমের এ মোহে কতটুকু?

ভোরবেলা কিন্তু ভুল ভেঙ্গে গেল পাহাড়ীর কথায়। "জানিস বাবু আমার দেশের মাইয়ারা যাকে একবার মন ক'রে মন দিয়ে ভালো বাসবে, তাকেই সারা জীবনের মত বেঁধে রাখবে। এই নিয়ম। তাইতো এদেশে ভালোবেসে বিয়ে হয়। ভালো না বাসলে বিয়ের রেয়াজই নেই এদেশে। সত্যি বলছি আমি। কখনও একথা মিথ্যা পাবি না।"

মনে মনে বিস্মিত হই আমাদের সভ্য সমাজটার সাথে নিরপেক্ষ তুলনা দিয়ে বিচার ক'রে। লজ্জায় এবং শ্রদ্ধায় আপনি মাথা নীচু হয়ে আসে। কিন্তু তবুও, সংস্কারী মনটা বিদ্রোহ ক'রে উঠে "কিন্তু পাহাড়ী বিয়ে হলেই হোলোনা।" রাখতে হবে সারা জীবন পাশে পাশে, কিন্তু আমাদের সমাজ, আমাদের সভ্যতা তো তা বরদাস্ত করবে না।

হঠাৎ যেন পাহাড়ী বিবর্ণ হয়ে যায়। বোধ করি

কোন স্মৃতি কথা স্মরণ হতেই মাথা নীচু করে। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে "ঠিক কইছিস তুই বাবু।"

সহানুভূতির সাথে কৌতূহলও জাগে আমার মনে। অধীর হয়ে প্রশ্ন করি "কেন রে পাহাড়ী।"

একবার তো শিক্ষা হইলো। কিন্তু ও সব করা দুষমনের কাজ!

তার কথা অনুধাবন করার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে, অস্ফুট প্রশ্ন করি "শিকা?"

হাঁ। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পাহাড়ী উত্তর দেয়।

বলবি আমায়? আমার মন যেন নিঃশেষে ছেঁকে নিতে চায় পাহাড়ীর মনের খবর, কথায় বেড়ে।

ওতো বিশ্বাস করবার মেয়ে নয়। বলে শুভা কি! পাহাড়ী একটা পূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেয়।

তবুও—বল! আমি শুনবো। আবেগে তার হাত দুটি জড়িয়ে ধরি। একবার আমার আবদ্ধ হাতের প্রতি চেয়ে মুচকি হেসে বলে পাহাড়ী "তোরা এত 'রং' দিয়ে ভালোবাসতে পারিস। কিন্তুক তা রাখতে নারিস কেনে!"

আমি স্তব্ধ। ভাষা যেন আমার মুখে ফুরিয়ে গিয়েছে। শুধু মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকি তার মুখের পানে।

কোন ভূমিকা না ক'রে পাহাড়ী একবার আমার মুখের পানে চেয়ে শুরু করে তার গোপন ব্যথায় গড়া জানা ইতিহাস "শোন বাবু।" পলাশ তলীর পথে দুই মেঠোর বাঁকে ঝিক ঝিক গাড়ীর লাইনের পাশে একটা বুড়িকে দেখেছিস তো? ঐ বুড়িরও একদিন রূপ ছিল। মনে রং ছিল; ভারী সুন্দর ছিল সে দেখতে। পাড়ার জোয়ানরা বলতো ওকে ছাড়া নাকি আর কাউকে বিয়েই করবে না। সে নিয়ে তাদের মধ্যে কত ছড়, কত বিবাদ।

কিন্তু ঐ বুড়ি এক বাঙ্গালী বাবুকে দেখে মজে যায়। ঠিক তোর মতন সুন্দর ছিল সেও। অবশ্য বুড়িই বলে সে নাকি খুব সুন্দর ছিল। ইয়া টানা টানা চোখ, দুঁ চোলো নাক, বাবরী বাবরী চুল, আর রং কি যেন পলাশ ফুলও হার মানে তার কাছে।

মজে গেল বুড়ি তার রূপে। একদিন মন খুলে, কইলো তোকে আমি ভালোবাসি। বাবুটীরও ভালো লেগেছিল তাকে। তাই সহজেই বিয়েও হয়ে গেল একদিন। লোকে গান গাইলো "ওরে বাঁধন থাকবেনা। ওরা যাযাবর। রস চুসে পালিয়ে যায়।"

সুন্দরী হাসে। ওদের বাপা খারাপ আছে। হিংসেয় ওরা ফেটে পড়ছে দেখ।

কিন্তু সত্যি ওকে পাগল করে দিয়ে বাবুটী একদিন চলে যায়। অকারণে বজ্রপাত, ও যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। তবে বাবুটী পালিয়ে যায় নি। যাবার সময় বলে গিয়েছিল। "আমি আবার আসবো। অফিসের কাজে যাচ্ছি তো। তুই কিচ্ছু ভাবিস না।" বন সাফ করবার বাবু ছিল সে।

ঐ যেখানটায় বুড়ি লাইনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐখান থেকেই বাবু বিদায় নিয়েছিল। সেই থেকে বুড়ি রোজ সন্ধ্যে বেলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবু তো ঐ পথ দিয়েই আসবে। কিন্তু আসেন নাই আজো।

যতই দিন যায় বুড়ি হয়ে ওঠে ততই উন্মাদ পাগল। এক সময় বুঝতে পারে বাবুটীর ছলনা। সেই থেকে ভাবনায়, চিন্তায় আর দুঃখে মাথাটাও খারাপ হয়ে যায়। বাড়ী আর কিসের ফেরেনা রাত দিন ওর আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সন্ধ্যে বেলা ঠিক ঐ পথের মোড়ে দাঁড়ায়। প্রশ্ন করলে বলে "সজনী বলেছে সুন্দরী তুই ঐখানে আমার অপেক্ষা করিস, আমি আবার এই পথেই ফিরে আসবো। তাই তো সারা দিন এখানে থাকি যদি এসে না পেয়ে ফিরে যায়; আমার বুঝি তাতে দুঃখ লাগেনা মনে। জানিস ওকে আমি ক-ত ভালোবাসি। ও আমার দেবতা!"

কাহিনীটা শেষ করে চোখের জল মোছে পাহাড়ী। একটু সচেতন হয়ে বলে জানিস বাবু বুড়ি কত ভালো বাসতো সেই বাবুকে। কিন্তু বাবু তা বুঝলো না। পালিয়ে গিয়ে হয়তো বা আরেক বিয়া করে ঘর করছে। ভুলেই গেছে সুন্দরী বুড়ির কথা। কেনে বাবু তোরা এমন করে ইচ্ছে করে মানুষকে ভুলে যাস। আমরা তো পারি না।

তোরা এখন চমৎকার রং রেখেছিস। ভালো বাসতে পারিস তবুও—কথা আর শেষ হয় না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে পাহাড়ী মুখ লুকায় আমার বুকে। লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা ও নেই—নিশ্চিন্তে সে বেহটা এলিয়ে দিল আমার স্নেহের উপর।

আমার বিক্ষিপ্ত মনটা অসামাজিকতায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিই মনে। মন আর বিবেক ভিন্ন বিচার বুদ্ধি নিয়ে সজাগ হয়ে ওঠে। পাহাড়ীর পূর্ণ যৌবন ভরা বুকের কোমল স্পর্শে আমার বুকে যেন হঠাৎ একটা অনাস্বাদিত মাদকতা জেগে ওঠে। তবুও নিজেকে সংযত করে প্রবোধ দি তাকে। আপন জনের মতন মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দি নিঃসঙ্কোচে।

এর পর বেশ কিছু দিন কেটে গিয়েছে। স্তিমিত হয়ে এসেছে মনের ছেলেমানুষী ভরা চঞ্চলতা। সহজ, স্বচ্ছ হয়ে এসেছে জীবন ধারা।

একদিন সবে কাজ থেকে ফিরে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ পাহাড়ী এসে উপস্থিত। সঙ্গে সেই মেয়েটী। প্রায় চমকে উঠি আমি তাকে দেখে। এত রূপ! পূর্বে মেয়েটীকে দূর থেকে কয়েকবার দেখেছি বটে। কিন্তু মেয়ে এত সুন্দর, এত মধুর, তা কল্পনাও করতে পারিনি! শ্যাম। কিন্তু কি গড়ন, কি চোখের চাহনি ভগবান কি তাকে রূপের ডালি উজাড় করে সাজিয়ে দিয়েছেন? নইলে সে এত রূপ পেলো কোথায়। পাহাড়ীর মত সুন্দরীও তার কাছে ম্লান। যেমন চাঁদের কাছে তারকা।

পাহাড়ী হাসে। মেয়েটি বার কয়েক চকিত দৃষ্টি হেনে আখি নত করে দাঁড়ায়। সেকি দৃষ্টি—ওর চোখ দু'টি যেন কথা কইবার ছলে কথা কেড়ে নিতে চায়। চঞ্চল বাহু দু'টি যেন তার সর্বদা প্রস্তুত অভ্যর্থনায়। চলার সঙ্কোচের সাথে একটা গভীর অথচ মধুর ছন্দ। প্রতিটি পদক্ষেপে যেন সে রেখে যেতে চায় মধুক্ষরা প্রেমের সাক্ষী। মাথায় পাহাড়ের মত উঁচু নিচু চুলের ঢেউ, মাঝে ইতস্তত অথচ সু-নিপুন ভাবে সাজানো ফুলের স্তবক। যেন ফুল রাত্রীদের মেলা।

প্রথম দিবা দর্শনে সত্যি আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম বিস্ময়ের অতল তলে। চমক ভাঙলো পাহাড়ীর ডাকে।

বললো দাদাবাবু। এ কে! কথার সাথে তার ঠোটে ফুটে উঠে একটা দুষ্টুমী ভরা হাসি!

প্রথমটা কথা কইতে পারিনা। আমি সুস্থ মানুষ আমারও একটা সঙ্কোচ আগে—লজ্জা আর দুর্বলতায় রঙিন হয়ে ওঠে মনটা, পিয়ালী গো পিয়ালী! আনন্দে আর দুষ্টুমীতে যেন ফেটে পড়ে পাহাড়ী।

ও! আমি যেন খেই পাই। কিন্তু এই রাত্তির বেলা কি মনে করে?

এই আলাম পিয়ালী কইলো—কথা শেষ হবার পূর্বেই সে "উঃ" করে এক লাফে এক পাশে সরে দাঁড়ায়।

বিস্মিত হয়ে পিয়ালীর পানে চাইতেই দেখি লজ্জায় ডালিম রাঙা মুখটী তুলে নীরব ভাষায় পাহাড়ীকে সাবধান করে দিচ্ছে। ওরে সজনী এমন দিমটী কাটতে হয়। উঃ—ব্যথা করে না?

গর্ব ভরে হাসে পিয়ালী। অর্থাৎ কেন আর বলবে মিথ্যে কথা? হঠাৎ পাহাড়ী খিল খিল্ করে অঝোরে ঝর্ণাধারার মত হেসে ওঠে পিয়ালীর হাত দু'টো ধরে ঘন ঘন পাক খায়।

আমি একটু অস্বোয়াস্তি অনুভব করি। এই রাত্তির বেলা, একটা নিঃসঙ্গ কুমারের ঘরে দু'টী যৌবনোচ্ছল কুমারী মেয়ে—যদি কোন লোক দেখে ফেলে? একটা অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণাও বিচিত্র নয়।

একটু ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করি "এসেছো তো কিন্তু ভয় করছেনা? যদি কেহ দেখে ফেলে!

ভা-রী হবে। ঠোট উল্টে তাচ্ছিল্য ভ'রে উত্তর দেয় পাহাড়ী।

কি আশ্চর্য! লাজ, ভয়, কলঙ্ক বলে কি এদের কোন চিন্তাই নেই? এই নিরালা বাড়ীতে একাকি একটী পুরুষের বাস জেনেও হাসি রঙ্গ করা যে কি দুস্তর অপরাধ তা কি অবোধ বালিকা দু'টির খেয়ালই নেই?

একটু দুর্বলতা আসে মনে। শত হলেও বাংলা

দেশের মানুষ আমরা। আমাদের ঘরে এত নির্মল স্বচ্ছতা এত বিশ্বাস যেমন শোভা পায় না, তেমনি সম্ভবও নয়। তা'ছাড়া লোভ, ভয়, বিশ্বাসঘাতকতা তো আছেই। অথচ এদের—তবে কি এরা মনে প্রাণে এত সরল, এত উদার বলেই বিচারের উর্দ্ধে থেকে সহজ ভাবে বিচরণ করে?

দরজাটা ভেজিয়ে দিতে সঙ্কোচ জাগে ভয়ও জাগে বৈ কি! কি জানি হঠাৎ যদি কোন অঘটন ঘটে যায়? এদেশের লোকের সরলতা টুকুই জানা আছে, কঠোরতা টুকুতো আর জানা নেই! বিশ্বাস কি, কাদা মাটির নিচেও যে কঠিন মাটিই লুকিয়ে থাকে।

পাহাড়ী কিন্তু আমার তীক্ষ্ণ চিন্তা ধারাকে হাসি আর উচ্ছলতার তোড়ে, বড়ে উড়িয়ে দেওয়ার মত নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবার চেষ্টা করে। হেসে গা'য়ে গা ঠেকিয়ে সোহাগ ভরে বলে বলনা বাবু। পিয়ালীরে সাদ দিবা? বলনা, বলনা কেনে—! চোখে সেই দুষ্টামিভরা চাহনি।

আমি যেন স্তব্ধ, বোবা বনে যাই। আমার শিক্ষিত মনটা জেনে শুনেও পাহাড়ীর চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়।

হঠাৎ কার কণ্ঠ জেগে ওঠে বাইরে ও সারা দোয়ারে খুঁজি খুঁজি মৈনাম। আর তু কিনা ইখানে হাচস্।

চমকে উঠি আমি। ব্যস্ততার শিহরণ জাগে আমার মোহাবিষ্ট মনে। যদি আগন্তুক সন্দেহ করে?

পাহাড়ী কিন্তু দমে না। বরং আরও বেশী আনন্দের ভাব প্রকাশ করে। দৌড়ে বাইরে গিয়ে বলে পিয়ালীকে নিয়ে আলাম, দাদাবাবুর ল'গে।

পিয়ালীও ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায়। "আমি যাই" ভাব প্রদর্শন করে এক নজর চোরা চাহনি হেনে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে সলাজ পদে।

ওরা তুহারে আইতি ক'লো কে। কি ল'জ লাজ ভাব রে। ও সই হেইতো লাজ তুয়ার ছিল কোথা লো! কথার রেশ টেনেই খিল খিল ক'রে হাসে পাহাড়ী। যেন কোন্ ক্ষুদ্র নদীর কুলুকুলু ধারার এগিয়ে চলার ছন্দ ভেসে আসে দূর থেকে।

হঠাৎ মৈনাম এসে ঘরে ঢোকে। এক পলক আমার প্রতি চোখের সন্দেহ আর রোষ মাখা দৃষ্টি ফেলে আবার বেরিয়ে যায় সেই ঘর থেকে ঝড়ের বেগে। যেন মার্চ লাইটের সন্ধানী দৃষ্টির সাথে কাপুরুষের চোখাচোখি হয়ে গেল এক পলকের জন্যে।

আমি বিস্মিত হয়ে চেয়ে রই। তার চেয়েও বেশী করে অনুভব করি অনিশ্চিত ভয়ের আশঙ্কা। ত্বরিতে বাইরে বেরিয়ে দেখি পাহাড়ীকে মৈনাম জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ীর কণ্ঠে অস্ফুট প্রতিবাদ শব্দ। আর তার পিছে পিছে ধীর শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে পিয়ালী।

মনে সন্দেহের গাঢ়ো ছায়া পড়ে। তার সাথে জাগে ঝড়ের অসুর আগমনী ধ্বনি বুকের দুক্ দুকানির সাথে তাল রেখে।

পর দিন আর পাহাড়ী দুধ দিতে আসে না। তার পরের দিনও নয়। একটা অজানিত আশঙ্কা, একটা বদ্ধমূল চিন্তা ভর করে মনে। কি জানি, শেষে কি কাণ্ড হয়ে যাবে। নিজের ওপর অভিমান হয়। কেন মরতে গেলাম পিয়ালীকে এত প্রশ্রয় দিয়ে।

আর থাকতে পারলুম না ঘরে। কাজের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়ে উঠলুম পাহাড়ীদের বাড়ী। কিন্তু বলতে বলা দূরে থাক কেউ একটা কথা পর্যন্ত কইলো না। সবার চোখে মুখেই যেন একটা জমাট রাগ আর উপেক্ষিত ঘৃণার ভাব। পাহাড়ীর বাপ একবার আমার প্রতি কটাক্ষ হেনে দাওয়ায় উঠে তীর ধনুকটা নাবিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

উঠানের মাঝে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ভয় চকিত দৃষ্টিপাত করতে দেখি পটাপট আশ পাশের জানালা দরজা থেকে মুখ গুলো সরে গিয়ে আগল বন্ধ করে দিল।

দুরুদুরু বুকে ফিরে চলেছি হঠাৎ একটা ঘরের আড়ালে যেতেই একটা জানালা খুলে গিয়ে তা থেকে ভেসে এলো পাহাড়ীর কণ্ঠস্বর। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী কাঁদছে।

সাবধানে চারিদিক দেখে নিয়ে সামনে যেতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো পাহাড়ী। আমি কিন্তু স্তব্ধ

সান্ত্বনা দেবার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি।

এবারে আমার দুপের প্রতি চেয়ে কান্না জড়িত স্বরে বলে পাহাড়ী "মৈনাল মিথ্যা কথা কইলো বাবুর কাছে। তাই কইয়ে ঘরে বন্ধ রাখলো। তাই ওষ দিতে নারলাম তোরে। তুই রাগ করিস নাইতো বাবু।"

না না। ছিঃ তোর ওপর রাগ কোরবো কেন। তুই তো কোনো দোষ করিস নি। সান্ত্বনা দেবার ছলে হাতটা বাড়িয়ে দিতেও আবার সভয়ে টেনে নিয়ে আসি। একেই তো আমার ওপর গুলা ক্ষেপছে। তার ওপর যদি কেউ দেখে ফেলে তবে তো আর কথাই নেই এইখানেই জীবনের সমাপ্তি টানতে হবে নিষ্ঠুরভাবে। এক লহমা চিন্তা ভয়ে ভয়ে সিউরে উঠি।

কিন্তু পাহাড়ীর চোখে জলের যেন খেই নেই, ঝরেই চলেছে দীর্ণ দুই ক্ষীণ স্রোতা কর্ণা ধারার মত। আর ধৈর্য থাকেনা আমার। পকেট থেকে রুমাল বের করে আবার করে মুছিয়ে দি তার ব্যথার অশ্রু, কিন্তু আবার ছুটে ওঠে।

পাহাড়ী একটু উদাস হয়ে, বোধ করি কোন অব্যক্ত, অসহ্য ব্যথা লুকোবার চেষ্টা করে আবার বলে "পিয়ালী তোর তরে কতো জানলো, কেন করি কইলো বাঙালী বাবুদের বড় বেশাক্। হাঁ বাবু?—কেন অমন ধারা করিস বাবু তোরা। আমরা পরদেশী মাইয়া ছেলে তো তোদের কাছে কোন দোষ করি নাই। শুধু চাহলাম ভালবাসতে—'হুং' লাগে যে।" আবেগে থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে পাহাড়ীর পাতলা ঠোঁট দু'টি। কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে, নেমে আসে বাধা ভরা অশ্রুধারা চ'পণ্ড বেয়ে।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে মুখটা তুলে কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে পাহাড়ী "বাবু, পালা পালা! মৈনাল তোকে তীর মারবে! চোখ্যা বোহা তীর ও লাগলে আর বাঁচবি না, পালা, পালা।"

কিন্তু পালাবার আর সময় পাইনা। পাহাড়ীর কথা শেষ হবার পূর্বেই একটা তীর ছুটে এসে বিঁধে যায় আমার পায়ে "আমুর, বেদনায় চিৎকার করে পড়ে যাই আমি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা যেন এক লহমায় আমাকে ঘিরে ঘুরতে আরম্ভ করে দেয় বোঁ বোঁ করে।

ভিতরে পাহাড়া উন্মাদের মত চিৎকার করে ওঠে "তুহার কি হলো রে বাবু।" পরমুহূর্তে গায়ের জোরে জানালার কাঠের গরাদ ছুটিয়ে বেরিয়ে এলো সে। নিচু হয়ে বসে পড়ে ত্রস্তে পা থেকে তীরটা টেনে তুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে "আমার গায়ে ভড় করি পালায়ে চল বাবু, উঠ্ উঠ্—"

পালাবার আর সময় হলো না। কোথা থেকে ছুটে এসে পাষাণের মত পথ রোধ করে দাঁড়ায় মৈনাল। চোখে মুখে তার হিংসা আর হিংস্র ভাবের প্রকটতা।

কিন্তু তা'ও এক মুহূর্ত, পরক্ষণেই আমাকে ছেড়ে পাথরের ভারী একটা চাক তুলে তার কপাল লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে পাহাড়ী।

আচমকা আক্রমণে চিৎকার ক'রে টলতে টলতে পিছিয়ে যায় মৈনাল। শেষে আর টাল সামলাতে না পেরে আছড়ে পড়ে একটা পাথরের ওপর।

কিন্তু পাহাড়ী নিবৃত্ত হয়না। তার প্রাণে যেন জেগে ওঠে কোন এক প্রতিজ্ঞাকর প্রতিহিংসার দৃঢ়তা। চোখে যেন ফুটে ওঠে আগুনের সুতীব্র ঝলকি ধারা। মুখটাকে কঠিন করে মৈনালের প্রতি একবার ঘৃণা ভরে চেয়ে আমার পাশ থেকে ত্যক্ত তীরটা তুলে নিয়ে ছুটে যায় তার প্রতি।

আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠি। ক্ষণিকের জন্য ভুলে যাই আমার ব্যথার কথা। উঠে বাধা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না, পায়ের ব্যথাটাই আমায় বসিয়ে দেয়।

হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে আসে পাহাড়ীর বাপ। সঙ্গে আরও কয়েকজন যোয়ান বৃদ্ধ। কিন্তু পাহাড়ীকে ধরবার পূর্বেই সে উন্মাদের মত, তীর নিয়ে আক্রমণ করে মৈনালকে। কিন্তু পারেনা। মৈনালের শক্তির কাছে তাকে হার মানতে হয়। তবুও আবার জেগে ওঠে শক্তি পাহাড়ীর দেহে। আপ্রাণ চেষ্টায় সে তীরটা বিদ্ধ করে দিতে চায় মৈনালের স্ফীত বুকে আমূল।

আমি প্রাণের ভয়ে একটু একটু করে পিছিয়ে নিজেকে আড়াল করে রাখি একটা দেবদারু আর মহুয়া গাছের

ছিড়ে। আমাকে তো এরা আর বাঁচতেই দেবে না। মৃত্যু অনিবার্য।

পাহাড়ীর বাবা ভূটন গিয়ে দুজনকে টেনে ছাড়িয়ে দিতেই মৈনাল ফিরে দুবার দিয়ে রুখে দাঁড়ালো, "বিচ্ছা বেটা, গেল কুথা শালা—"

সবাই তার কথায় ফিরে চাইলো চারিদিক। না দেখতে পেয়ে বন্যার জলের মত সব এদিক ওদিক চড়িয়ে পড়লো এলোমেলো ভাবে।

পাহাড়ী ক্লান্ত হয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলে খুঁজতে লাগলো আমাকে। স্পষ্ট দেখলুম, সে আমার জন্যে ভয়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। আমি আর দেরী না করে উঠে পড়লুম একটা কাকালো দেবদারু গাছে। সেই মাথায় উঠে, নিজেকে ডাল পাতায় আড়াল করে দেখতে লাগলুম নিচের ব্যস্ত বাগিশ মানবদের ব্যর্থ গলাবাজি আর অস্থির আস্ফালনের অভিনয়।

হঠাৎ পা'য়ের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি, সর্বনাশ! তীরে কাটা স্থানটা আরও বিকৃত ভাবে হাঁ করে আছে। আর তা' থেকে তখনও দু'চার ফোঁটা রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছে। কি আশ্চর্য! এতক্ষণ এর কিছুই তো উপলব্ধি করিনি। মনের মধ্যে তাণ্ডবের চল কলার দেহের ব্যথাও কি ভুলে থাকতে পারলুম এতক্ষণ?

তাড়াতাড়ি সস্তা ছিন্ন কাপড়টার একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে কোনপ্রকারে বেঁধে রাখি ক্ষত স্থানটা। দু'এক স্তর জড়ানোতেও রক্ত বন্ধ হয় না। পর পর বেশ কিছুটা মোটা করে বাঁধতে হয়।...নিচে ততক্ষণ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে এসেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে! ধীরে ধীরে আমি নেমে আসি গাছ থেকে। এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করি, কান পাতি। কিন্তু সবই যেন ম্লান, নিস্তব্ধ মনে হয়, অথচ অন্য দিন, এতক্ষণে মহুয়ার মৌতাত চড়িয়ে সবাই আমোদ প্রমোদে মেতে ওঠে! এই রাত্রিই তাদের জীবনের স্মরণীয় ক্ষণ, কিন্তু আজ যেন কোথাও তার সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলি বাড়ীর দিকে। যাব পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াই একটা বহু কণ্ঠ মিশ্রিত ক্ষীণ আওয়াজ শুনে। পলাশ তলীর পথের পাশের লাইনটার ওপারে কারা, যেন সব খুব হৈ চৈ করছে। আর একটু এগিয়ে যেতে স্পষ্ট কানে আসে তাদের কথা।

সুকরী বুড়িটা মারা গেছে। অমনি নয়। কে নাকি বাঙালীকে বুড়ি ভালোবাসতো বলে এক তীরে শেষ করে রেখে গেছে। চমকে উঠি আমি। মনটা ছুটে যাবার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখবার সাহস হয় না। দূর থেকেই চেয়ে দেখি, ঠিক লাইনের ওপারে একটা লাশ পড়ে আছে। নিশ্চিত এটা বুড়ির মৃতদেহ।

হঠাৎ মেটে পড়া ব্যথাটাকে কোন প্রকারে রোধ ক'রে চঞ্চল হয়ে ফিরে চলি নিজের আস্তানার দিকে।

প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি এসে আশ্চর্য হয়ে যাই আগুন দেখে। ভালো করে চেয়ে দেখি আমারই কাটের ছোট্ট বাড়ীটা দাউ দাউ করে জ্বলছে।

হঠাৎ যেন নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে মন চায়না। সত্যি কি আমার বাড়ীটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে? পরে বিশ্বাস করতে হয়, সত্যি তা আমারই বাড়ী। অসহায় হয়ে চিন্তিত মনে মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়ি আমি। পায়ের ব্যথাটা যেন আবার অসহ্য হয়ে ওঠে। বসেও স্থির থাকতে পারিনা, উঠে এগিয়ে যাবো, হঠাৎ পাশের বন ঝাড়ের ঠেলে একটা মূর্তি এসে উপস্থিত ঠিক আমার সামনে। চমকে পিছনে ফিরতে যাবো, হঠাৎ মূর্তিটা আমার হাত ধরে বললো "আমি পিয়ালী, বাবু ভয় করিস না। তু আর উধারে যাস না। উহারা তুরে যাবার তরে তীর ধনুক লয়ে মহুয়া বনে চুপচাপ আছে। গেলেই মরে যাবি। বুঝতেও নারবি কোথা দিয়া তীর আইলো।...তু আমার সাথে আয়।"

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনা পিয়ালীর কথা। বিশ্বাস কি যদি কিন্তু—

পিয়ালী বোধ করি মনের কথা বুঝতে পারে আমার। অভয় দিয়ে বলে তুহার কোন ডর নাই। আমার লগে আয়! তুহার লাগি মনটা যে আমার আঁচু পাঁচু করে;—" তুহারে আমি মন দিছি, 'রং' আছে আমার মনে, তু

অসহায় বন্ধু, সরলা—আর, আর বাবু, অন্ধ দহন ক'রে আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে চলে পিয়ালী।

প্রতি একটা অবাক্ত প্রহার আর অসীম যন্ত্রণায় মনটা ভরে উঠ্‌লো আমার। চলতে চলতে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম "আমায় কোথায় নিয়ে চললে পিয়ালী।"

ইস্‌টিশনে। রেল গাড়ীতে পালাবি! ধরা গলায় উত্তর দেয় পিয়ালী।

আর কোন প্রশ্ন করি না। আহত পা'টাকে টেনে টেনে চলহীন পদক্ষেপে এগিয়ে চলি গন্তব্য পথে পিয়ালীর কাঁধে ভর করে। চলতে চলতে স্পষ্ট অনুভব করি পিয়ালীর কান্না। গোপন করবার যতই সে আপ্রাণ চেষ্টা করে ততই বেশী করে তা' প্রকাশ হয়ে পড়ে। এক ফাঁকে এক নজর চাই তার প্রতি চুরি করে, দেখি দু'টি টলটল চোখের নীচে অশ্রুধারা অন্ধকারেও চিক চিক করে জলে যাবার সাক্ষী দিচ্ছে!

চলতি পথ ছেড়ে বন বাদাড় ভেঙেও আমরা বেশ তাড়াতাড়িই ষ্টেশনে উপস্থিত হই। নিরিবিলি ষ্টেশন। একটা ক্ষীণ দিগন্তালের বাতি ছাড়া আলো বলতেও কিছুই নেই। জন মানুষেরও সাড়া নেই কোথাও। তবু ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের আলোর এক ফালি এসে বাইরে পড়েছে। আর ভেতর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ তারার হিস্ হিস্ শব্দ। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অফিস ঘরের মুখে গিয়ে হঠাৎ দু'জনেই দেখি, ছোট মাষ্টারের সাথে মুখ নিচু করে ফিসফিসিয়ে কি কথা বলছে বৈনাল। অস্পষ্ট আলোতেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না।

কান খাড়া হয়ে ওঠে দু'জনের। স্পষ্ট ভেসে আসে তাদের গোপন দুই আলোচনা। চমকে উঠি "সর্বনাশ! আমাকে শেষ করে দেবার জন্যেই এত গভীর আর কঠোর গোপন আলোচনা।"

ছিনাল ব্যাটা! পিয়ালীর চাপা কণ্ঠ গর্জন ক'রে ওঠে ঘৃণায়।

ফিরে চেয়ে দেখি তার হাতে ছোট একটা ধারালো ছুরি ক্ষণে ক্ষণে আস্পর্ধায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে। হাত চেপে ধরে বলি "ওকি করছো পিয়ালী। ওটা—"

খুন করবো উহাকে। কণ্ঠে তার প্রতিহিংসায় স্থির ভাষা।

অনেক করে বুঝিয়ে নিবৃত্ত করি তাকে। টেনে নিয়ে আসি ষ্টেশনের শেষ মাথার অন্ধকার স্থানটাতে! বুঝিয়ে বলি "কি হবে খুন করে। যা হবার তা' তো হয়েই গিয়েছে। তাছাড়া আমাকে মেরে যদি ও—"

হঠাৎ একটা তীব্র আলো ফেলে দূর থেকে সিটি দিতে দিতে এগিয়ে আসে একটা ট্রেন। পরমুহূর্তে ঝড়ের মত অফিস থেকে বেরিয়ে সম্মুখের ঘন জঙ্গলের আঁধারে মিশে যায় বৈনাল। পিঠে তার তীর ধনুক, হাতে তার তীক্ষ্ণ চকচকে ছোরা।

পিয়ালী ছুটে যেতে চায়। আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে জড়িয়ে ধরে বলি "কোন প্রয়োজন নেই পিয়ালী, ওতে আওন আরো বেশী করে জলে উঠ্‌বে। আমার সামান্য একটা ভুলের জন্যে সারাটা পাহাড়তলী আর পলাশ পাড়া ধ্বংস হয়ে যাক, এতো আমি হতে দেবোনা পিয়ালী।

একটু একটু করে স্থির হয় সে। তারপর হঠাৎ এক সময় আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আদর করে আরও জোরে চেপে ধরি তাকে আমার সঙ্কীর্ণ বুকের মাঝে। কৃতজ্ঞতায় আর বিশ্বাসে আমার চোখ ফেটে ঝর ঝর করে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে তার শিরে।

পিয়ালী নীরবে চোখ দু'টো বুজে মুখটা তুলে ধরে আমার মুখের কাছে। মনে একটা মাদকতা, হঠাৎ চমক দিয়ে সন্ধিধান ক'রে তোলে আমাকে বিবেক, কি চায় পিয়ালী? ভালোবাসার প্রথম আর শেষ দানের কি পরিচয় নিয়ে রাখতে চায় সে? আমিও তবে ওকে সত্যি ভালোবাসি?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন আমায় উতলা করে তোলে, আর স্থির থাকতে পারিনা। ঝুঁকিতে একটা স্নেহ চুম্বন এঁকে দেই তার মুখে। পিয়ালীর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে একটা নিশ্চিন্ততার হাসিরেখা। নাক মুখ ভেদ ক'রে বেরিয়ে আসে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

ট্রেন আসে, পিয়ালীর 'হং' আর চোখের জলকে সাথী

হয়ে উপেক্ষা করে উঠে পরি তার একটা নির্জন কামরায়। ক্ষণিক বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে, সেও ছুটে এসে বসে আমার পাশে। বলে "আমিও যাবো তোর সাথে বাবু। তুয়ারে ছাড়ি হামি থাকতে নারবো।

অনেক করে বুঝিয়ে, প্রবোধ দিয়ে, আশা দিয়ে নিরস্ত করি তাকে। ছেড়ে দেয় ট্রেনটা খুব জোরে একটা ঝাঁকানির সাথে শিটি দিয়ে। পিয়ালীকে ফেলে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলে ট্রেন। ট্রেনের পাশে পাশে ছুটে আসতে আসতে পিয়ালী কাঁদতে কাঁদতে বলে "তু আমায় ভুলিস না বাবু, আমি তোরে, সত্যি—" আর শোনা যায় না তার কথা। ট্রেনের হুরন্ত বিলীন ক'রে দেয় তার শেষ কথা কটি। ফিরে দেখি আছাড় খেয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে সে।

হঠাৎ ঘুরে জেগে ওঠে একটা ভয়াবহ বিচিত্র কোলাহল। ব্যস্ত হয়ে ঘুরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখি ওটি কয়েক লোক ষ্টেশনের দিকে ছুটে আসছে, এক হাতে তাদের মশাল আর হাতে অস্ত্র। বুঝতে পারি, ওরা সব আমাদের কুলি।

কিন্তু আমি তখন অসহায়। ঝাঁপিয়ে পড়বার ও উপায় নেই, তাই ব্যর্থ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি তাদের প্রতি। এক সময় ট্রেন তাদের বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় আগামী পথে।

তিনটে ষ্টেশন পরে জংশন আছে একটা। হাস-পাতালের আশায় সেখানেই নেমে পড়ি। ক্ষতটায় বড় যন্ত্রণা করছে।

ষ্টেশন মাষ্টারকে অবস্থার কথা বলে সরকারী হাস-পাতালের খোঁজটা নিয়ে গিয়ে উঠি সেখানে, সেই রাত্রেই।

ডাক্তাররা দেখে শুনে সব ব্যবস্থা করে যেন। এমনকি হেড অফিসে একটা 'ট্রাঙ্কল' পর্যন্ত।

বেডে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করছি, হঠাৎ দেখি আরও কতকগুলি আহত ব্যক্তিকে কুলিরা ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। পুরুষ, নারী দুই'ই আছে তাদের মধ্যে।

একটু বিস্মিত হই আমি। এরা সব, পাহাড়তলী আর পলাশ পাড়া থেকে আসেনি তো? হঠাৎ আমার নাম ধরে ডাক শুনেই আরও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে সুমুখে চেয়ে দেখি পিয়ালী। বেড থেকে পড়ে যেতে যেতেও সামলেনি নিজেকে। অস্ফুটে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "কে পিয়ালী?—একি এ অবস্থা কি করে হলো?"

হেঁচড়ে হেঁচড়ে টানতে টানতে কাছে এনে অস্ফুটে বললে "প্রতিশোধ নিতে গিছলাম, তাই আমারও মাথায় লাগলো।"

—প্রতিশোধ! চমকে উঠি আমি।

—হ্যাঁ প্রতিশোধ।—আমি মৈনালকে খুন করেছি।

—খুন? বিস্ময় আর চিন্তা একই সাথে ছুটে ওঠে আমার চোখে মুখে।

—হ্যাঁ, তু' চলি যাবার পরেই মৈনাল রাতের আধারে ঘরে ঢুকে পাহাড়ী আর তার বাপীকে জখম করি আইছিল হামারে বিহা করতে। তাই—"

চমকে উঠি আমি। পাহাড়ী মারা গেছে? একি স্বপ্ন না সত্য! মৈনাল তাকে পারলো নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে? এই কি ভালোবাসার রূপ না হিংসার কাছে তাও ম্লান! হায়রে ভালোবাসা।

কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনা। পাহাড়ীর মৃত্যু যেন আমায় হঠাৎ পাগল করে দিল। অশ্রু গোপন করতে পারিনা, দু' চোখ ছাপিয়ে নেমে আসে তারা, উপল খণ্ড ডুবিয়ে নেমে আসা ঝর্ণা ধারার মত। হু হু করে ওঠে বুকের ভিতরটা পাহাড়ীর জন্যে।

প্রকিতিস্থ হয়ে প্রশ্ন করি "পাহাড়ীকে মারলো কেন মৈনাল?"

—সন্দেহ হইছিল তুহার সঙ্গে ও 'রং' করিছে;—তাই মন টিকলোনা—হ্যাঁ বাবু, তু উয়ারে ভালোবাসতিস?

—আমি? ভালোবাসতাম? ও—হ্যাঁ হ্যাঁ—তবে আমার ছোট বোনের মত। অকপটে আমি স্বীকার করি আমার মনের কথা।

—হামি জানে বাবু তু উয়ারে খুন ভাবিস। তাই আমি জানা শুনা করে পির থাকতে নারলাম। রাতের আঁধারে পেয়ে গুপ্তি দিয়ে একেবারে চোখা করে দিলিম।

—বেটা বিছা, পাহাড়ীর উপর রাগ হেনে হামার কাছে আইছিল, হামারে ভালোবেসে বিছা করতে। হু হু—কথা শেষ করেই ঘন ঘন হাঁপায় আর রাগে থর থর করে কাঁপতে থাকে পিয়ানী।

আমি নীরবে তার মাথার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা জানাই। হঠাৎ পিয়ানী কাশতে কাশতে বুকে হাত দিয়ে শুয়ে পড়ে এক দিকে। ব্যস্ত হয়ে তাকে চেপে ধরে প্রশ্ন করি "খুব কষ্ট হচ্ছে পিয়ানী?"

বার দু'য়েক আরো কেশে উত্তর করে আমার কথার "বড় কষ্ট বাবু। মাথায় চোট লাগলো, তা' ফিন্—"

—তাছাড়া? অধৈর্য হয়ে উঠি আমি।

—তা' ফিন্, তু আবার পর, হামার জীবনটা বীতরাগ মনে হোলো, তাই ঘর ফিরে চুরি করে বিষ খাইলাম। দেওতো, বড় লাগছে হামার—কিন্তু কষ্ট পাইলাম, মরলাম তো না,—সেই থেকে একটা যন্ত্রণা শুরু করলো। মা রাতে কইলো, তোমার মরণ আইছে লো, বটেই মরণ আইছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বার দুয়েক কেশে শুয়ে পড়ে পিয়ানী।

ডাক্তার দেখে নিরাশ হয়। বলে একে বাঁচানো অসম্ভব। একে মাথায় চোট লেগেছে, তার ওপর হিঙ্গল আর চোঁড়া বিচির বিষাক্ত রস সারা দেহে সংক্রামিত হয়ে গিয়েছে। ব্রেনেও শির কেটে গিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

সঙ্কিত মনে সারাটা রাত নিজের ব্যথা যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়ে বসে রইলাম তার শিয়রে। এক সময় শুনলাম পাহাড়ীর বাপও আহত হয়ে হাসপাতালে এসেছিল। এই একটু আগে সে মারা গেছে।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে হঠাৎ পিয়ানী একটু একটু করে কুঁকড়ে যেতে আরম্ভ করলো। ছুটে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম। সে এসে দেখে বললো, একে বাঁচানো অসম্ভব, নিশ্চিত মৃত্যু এর।

হোলোও তাই। একটু বাদেই সে বড় বড় চোখ করে একবার মাত্র আমার পাণ্ডুর মুখের পানে চেয়ে শেষ নিশ্বাস ফেললো।

অনেক ব্যথা মনের মধ্যে আকুলি বিকুলি করে শেষে বেরিয়ে এলো কয়েক ফোঁটা জল চোখে। মুখে কিন্তু ভাষা নেই আমার। মৌন হয়ে গিয়েছে আমার মুখরতা, অবিশ্বাসী দৃষ্টি আমার খুঁজে বেড়াতে লাগলো পিয়ানীর জীবনের অস্তিত্ব, অনুভূতি। তাই কাঁদতে পারলুম না প্রথমটা, অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলুম পিয়ানীর সরল, বিশ্বাসী, মুখের পানে। দেখতে দেখতে সহসা এক সময় আমার চোখের সামনে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মাঝে ফুটে উঠলো গত মাত্র একটি রাতের অবিশ্বাস্য ঘটনাবহুল দৃশ্য গুলি ছায়া-ছবির মত স্পষ্ট হয়ে।

আর সহ্য করতে পারলুম না। পিয়ানীর দেহের ওপর মাথা রেখে অশ্রুতে অশ্রুতে ভিজিয়ে দিলুম তার বক্ষের শিথিল জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড।

এর পরে ভাল হয়েই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

দান

শ্রীমতী মায়া ঘোষ

শুধুতো পড়া বলা নয়, কবিতা মুখস্ত নয়, কবিতার মর্ম সেদিন মনের মধ্যে গাঁথা হোয়ে গিয়েছিল। মাষ্টার মহাশয় ছিলেন বিপ্লবীদলের লোক, বেছে বেছে কবিতা মুখস্ত করিয়ে ছিলেন, মানে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দীর্ঘদিন অতীত হোয়েছে কিন্তু কবিতার সেই চারিটি লাইন আজও ভুলতে পারিনি,—

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার, কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনমভূমি, মা আমার মা আমার

হাসবার, কাঁদবার অবসর নেই একথা বলতে পারিনা। কিন্তু দুঃখিনী জনমভূমির দুঃখ মোচনের জন্য উৎসর্গ করা জীবনকে সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঁচু করবার চেষ্টা কোরেছি বইকি? তবু মানুষ তো! তাই মানুষের মতনই আমাদের মন! সুখ দুঃখের অনুভূতি আছে সেই মনে! আছে সুখের হাসি, দুঃখের কান্না; আছে মনে অপমানের জ্বালা, সফলতার আনন্দ, ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। রাগ, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বা, দ্বন্দ্ব সব কিছুই আছে, মনকে নাড়া দেয় তারা। তবু মনের সঙ্গে সংগ্রাম চলে বই কি? সব কিছুকে জয় করবার ব্যর্থ প্রয়াস কোরতে হয় বই কি? দেশমাতৃকার চরণধূলে উৎসর্গ করা জীবন যে আমাদের। কিন্তু মন মানে কই?

• • • •

বড় বিশ্বাদ লাগছে আজ! প্রতিদিনকার জীবন যাত্রার মধ্যে আজকে কোথায় ছেদ পড়েছে, ছন্দ পতন হোয়েছে, যেন ভাল লাগছে না কিছুই! কিন্তু না—ভালো লাগারওতো কথা নয়। বহুদিন পরে একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হোয়েছে। এতদিনের অসাক্ষাতের পর, অনেক দিনের কাহিনী একটানা অনেকক্ষণ বলে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে! সেখানেতে কোন কারণ ঘটেনি। পরিষ্কার নির্মল আকাশ, তারার মালা সাজানো রয়েছে, এদিকে গরমও খুব বেশী নয়। আজকের আবহাওয়াটাই ঠাণ্ডা। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে তার ঠাণ্ডা স্পর্শ গ্রীষ্মকালে স্নেহ পরশের মতই মধুর। তবু কেন মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করে? কোথায় অস্বস্তি মনের গহনে কারণ খুঁজতে যাই। বেশী দূর যেতে হয়না। নোয়াখালীতে কাজ করতেন ডাঃ পালিত রামগঞ্জীতে Relief centre এর ডাক্তার ছিলেন তিনি। কলেরায় তাঁর মৃত্যু হোয়েছে। তিনটি ছোট্ট মেয়ে, বিধবা স্ত্রী এবং ষোল বছরের নাবালক ছেলে এবং চতুর্দিকে ঋণ রেখে গিয়েছেন তিনি! অশোকদি বলেছিলেন কিছু টাকা তুলে পাঠাই যেন। এক মাসের বেশী হোলো এসেছি, আজ পর্যন্ত টাকা পাঠাতে পারিনি। কেন পারিনি তার কৈফিয়ৎ নিজেকেই অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি। Public worker আমরা, Social work, Political work যা কিছু কোরতে যাই, জনসাধারণের কাছে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়। লজ্জা এবং মনে অপমানের জ্বালা যার প্রচুর, চাঁদা আদায় ব্যাপারে সে ব্যক্তি নেহাৎই অপটু একথা কে না জানে? মনে অপমানের মানদণ্ড বহুদিন উঠে গিয়েছে। যা কিছু কোরতে যাই, আগে দেখা দেয় টাকার প্রশ্ন বড় কোরে। যশোহর, বর্ধমান বন্যার ভেসে গিয়েছে, তোল টাকা, কাপড় চোপড় আদায় করো। সাইক্লোনে ভোলা বিধ্বস্ত টাকা তুলতে হবে। গান্ধীজী আসবেন রামগড়হাটে, উপহার দেওয়া হবে টাকার তোড়া—একুশ হাজার, ঘোরো বাড়ী বাড়ী! নোয়াখালী দাঙ্গাবিধ্বস্ত, চাঁদা তুলতে হবে বই কি Relief work এর জন্য। শুধু কি তাই? স্থানীয় কাজের জন্য টাকার দরকার হয় না? কে দেবে এত টাকা এক সঙ্গে? সেই বাড়ী বাড়ীই ঘুরতে হবে তো! কিন্তু টাকা তোলা কি সহজ? চাঁদা দিতে হবে শুনলে অতি পরিচিত লোকের মুখখানাও যেন কেমন ভার হোয়ে যায়। সত্যিই ভার হয়, না, আমারই নিজের মনের কল্পনা? কল্পনাই বা বলি কি কোরে?

বড় লোক নামকরা বড়লোকের বাড়ীর বৌ সে! প্রায়ই গল্প শুনি দুই ভায়ের পুতুলের

কর চৈ লোকজন
ু ঃর শেষ বোনের বাড়ীতে
ডাঃ পালিতের পরিবারবর্গের সাহায্যের
বড়লোকের বাড়ী, সমস্ত প্রহরী
মোতায়েন মেহেরের সুবিধা (Privilege)

কিছুটা আছে স্বীকার কোরতেই হবে। পুরুষ হলে হয়ত ডাকার অনুমতি মিলতো না। ঢিল ছুড়তে! বোনের নাম করাতে, চেতলার ঘরে বোনের কাছে নিয়ে গিয়ে ছাড় করলো! বোন ভগ্নীপতি বেড়াতে গেছে! সঙ্গে ছিলেন আর দুটি বন্ধু। বোন তার ঐশ্বর্য্য দেখাতে ব্যস্ত। নূতন refrigerator এসেছে, ঠাণ্ডা সরবৎ, আম লিচু খাওয়াবে আমাদের। বোনের গরবে আমিও গরবিনী, আতিথ্যের আতিশয্যে মনটাও চাঁদার সম্বন্ধে উৎকুল্ল হোয়ে উঠেছে! ডাঃ পালিতের কাহিনী বলে সাহায্যের কথা বলে বসি! সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলে যায় বোন ভগ্নীপতি দুইজনেরই! ভগ্নীপতি নীচে নেমে যান! বোনেরও উচ্ছ্বাস সহসা স্তব্ধ হোয়ে যায় যেন! নিজেও কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করি ওদের ভাব দেখে! বন্ধুদেরও মনোভাব তদনুরূপ! ভগ্নীপতি একটু পরে ফিরে আসেন। পাঁচটা টাকা হাতে! মাত্র পাঁচ টাকা; শ্বেত পাথরের সেকাবীতে আম, লিচু বড় বড় সন্দেশের পুরো সদ্গতি হয়নি তখনও! এ গুলো ক' টাকার কে জানে? সন্দেশটা গলায় আটকে যায় যেন! পুতুলের বিয়েতে যারা রাত্রাখান দেয়, লোক নিমন্ত্রণ কোরে খাওয়ায়, মৃত ডাঃ পালিতের পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য পাঁচ টাকার বেশী দেওয়া চলে কি? টাকাটা নির্বিবাদে হাতে তুলে নিই! আশা যেখানে বেশী, ধাবী যেখানে অন্যায় নয়, ভাষা যেখানে স্তব্ধ হোয়ে যায়। ওরা নিজের লোক নাহোলে আরও বেশী চাইতে পারতাম, প্রতিবাদ জানাতাম হয়তো কিন্তু ওখানে শুকনো হাসি হেসে টাকাটা নিয়ে চলে এলাম। বার বার মনে হোতে লাগলো না গেলেই হোত ওদের বাড়ী! কিন্তু ভিক্ষুকের কি এ অভিমান সাজে? পাঁচ টাকা কেন? পাঁচ পয়সা দিলেও তো নিতে হোত!

অনেকক্ষণ, অনেক সময়, পল, অনুপল, বিপল কেটে গিয়েছে তারপর! দুপুরের চাঁদা আদায়ের কাহিনীটা ভুলেই গিয়েছিলাম কিন্তু মনের অবচেতন থেকে সেটা মিলিয়ে যায়নি তাই আজকের এই অস্বস্তি। কারণ খোঁজা শেষ হলো। আবার মনে হোল কেন গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে? বড় লোক ওরা, পার্টি দেয়, সিনেমা যায়, দুবেলা গাড়ী হাঁকায়! এক গ্লাসের প্রমোদে ইচ্ছা হলে হাজার হাজার টাকা ওরা খরচ কোরতে পারে। দানের কিই বা প্রয়োজন? যদি বা দান করে, বেছে বেছে জায়গা বিশেষে করে যেখানে নামের আশা আছে, অন্য কিছুর প্রত্যাশা আছে। দানটাতো বিলাস ওদের কাছে। যেখানে খেয়াল হয় দেয়। যেখানে হয় না দেয়না। দিলেও অতিমাত্রায় সচেতন ওরা, পাঁচটা টাকা দিয়েছে আমাকে অনাদরে, অবহেলায়। ডাঃ পালিতের পরিবার-বর্গের প্রতি সহানুভূতিতে নয়। সত্যিই তো, কত লোককেই বা রোজ দাক্ষিণ্য করা যায়, যেখানে অধিকাংশ লোকেরই অবস্থা এই! এই হোল ওদের মনোবৃত্তি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, মনোবৃত্তির আর একটা দিকও আছে, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে যারা বেরিয়েছে তাদের জানা আছে বোধ হয়, অথবা ভাগ্যবান আমিই!——আরেকটা দিনের ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাইশটি টাকা মাইনে হাতে নিয়ে গুরুমা সামনে এসে দাঁড়ান—"নোয়াখালীর জন্য আপনি নাকি চাঁদা তুলছেন? আমাদের কাছে চাইলেন না যে বড়? আমাদের কি দিতে ইচ্ছা হয় না? গুরুমা একটি টাকা হাতে তুলে দেন। মিসেস দাস এগিয়ে আসেন দু'টী টাকা হাতে নিয়ে—"আমার কাছ থেকে নেবেন না? বত্রিশ টাকা সেইমাত্র তিনি মাস কাবারে পেয়েছেন!——আজকের সমস্ত অস্বস্তি দূর হোয়ে যায়! গুরুমা ও মিসেস দাসের সেই দিনকার দানের স্মৃতি যেন ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দেয়! এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসে, ভারী সুন্দর! ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসছে! রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই পড়েছিলাম না—

"পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে
দেবে তারে মেলে॥

খেলাধুলা

শ্রীখেলোয়াড়।

হকি—কলিকাতার হকি লীগ প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হইতে চলিল। এ বৎসরের প্রথম বিভাগে দলগুলির মধ্যে কাষ্টমস দলই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। কোনো খেলায় তাহারা এখনো পর্য্যন্ত একটী পয়েন্টও নষ্ট করে নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিয়া মনে হয় এ বৎসরে লীগ বিজয়ের সম্মান সম্ভবতঃ তাহারাই লাভ করিবে। কাষ্টমস দলের শক্তি এবৎসরে ইন্দ্রজিত, রামকাপুর, রবি দেও, ক্লডিয়াস প্রভৃতি বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড়দের যোগদানে বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে লীগের পরবর্ত্তি স্থান অধিকার লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হইবে। তবে ভবানীপুর ও মোহনবাগান ক্লাব এই দুই দলের মধ্যে কাহারা যে লীগের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে ইহা বলা সত্যই কঠিন। তবে ভবানীপুর দলের লীগে রানার্স হইবার সম্ভাবনা অধিক। ভবানীপুর ক্লাবে এই বৎসরে ঘোষেরপ্ত, দুবে, গুরু প্রভৃতি কুশলী খেলোয়াড় লাভ করিয়া যে ভাবে প্রতিযোগিতা চালাইয়া যাইতেছে তাহাতে জনসাধারণ তাহাদের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করে।

মোহনবাগান ক্লাব এ বৎসরে তাহাদের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দিগকে দল হইতে হারাইয়াছে। আক্রমণ ভাগের শক্তি যাহা মোহনবাগান ক্লাবকে গত বৎসরে বিশেষ ভাবে খেলাতে জয়লাভে সমর্থ করাইয়াছে সে শক্তি এ বৎসরে অত্যন্ত দুর্ব্বল। তবে রক্ষণ ভাগে যোগদান করায় রক্ষণ ভাগের শক্তি কিছুটা পূর্ব্ববৎ আছে।

গত বৎসরের রাইটন্ কাপে ফাইন্যালে পরাজিত পাঞ্জাব স্পোর্টস দলের শক্তি পূর্ব্ববৎ থাকলেও বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের অনেকাংশে নিকৃষ্ট হইয়াছে। পাঞ্জাব দলে অজিত সিং নামে একটি শক্তিশালী খেলোয়াড় যোগদান করিলেও তাহাদের খেলা এবৎসরে গায়ের জোর এবং অখেলোয়াড়োচিত ভাবে ঠিক চালনার অভ্যাস অত্যধিক পরিলক্ষিত হইতেছে। অখেলোয়াড়োচিত নীতি বিরুদ্ধ ভাবে খেলার জন্য পাঞ্জাব দলের সংখ্যা এবং কমিয়া এই বৎসরের জন্য রেফারেণ্ড হইয়াছে এবং তাহাদের খেলার রীতি যদি পরিবর্ত্তিত না হয় তবে পাঞ্জাব দলের ভবিষ্যত যে অন্ধকার একথা জোর করিয়া বলা চলে।

মেদার্স গ্রীয়ার এবং আর্থেনিয়ান্স দল যে ভাবে এ বৎসরে প্রতিযোগিতা চালাইতেছে তাহাতে তাহারাও লীগ তালিকার উচ্চস্তরে স্থান লাভ করিবে একথাও জোর করিয়া বলা চলে।

গত বৎসরের লীগ বিজয়ী ও বাঙ্গলার শক্তিশালী হকি দল পোর্টকমিশনার্স এ বৎসরে তাহাদের দলের একমাত্র জ্যামসেন ব্যতীত, তাহাদের শ্রেষ্ঠ ও অভিজ্ঞ পরিত্যক্ত জ্যামসেন, কেলবহুল, ক্লাডিয়াস ও গ্রাহামকে সিং এবং মত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দিগকে হারাইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে তাহাদের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করিবার কোনো কারণ নাই।

লীগের সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী ভি প্রেস দল এবৎসরে কাবে খেলিতেছে এবং ফলাফল যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বোধ হয় আগামী বৎসরে তাহারা প্রথম বিভাগে খেলিবার যোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

বর্তমান বৎসরে হকি লীগে কাহার কিরূপ স্থান—

(১৩৫০ পর্যন্ত)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	পয়েন্ট
কাস্টমস স্পোর্টস	১৭		৬				২৮
কাস্টমস							২৬
পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট	১৬				৯		২৫
মোহনবাগান					৬		২৪
ভবানীপুর					৮		২২

আন্তরাজ্য হকি প্রতিযোগিতা :—

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা এবৎসরে আন্তরাজ্য হকি প্রতিযোগিতা নাম দিয়া ভূপালে অনুষ্ঠিত হইতেছে। বাঙ্গলা দল প্রথম খেলাতেই ভূপালের নিকট পরাজিত হইয়া সুবোধ বালকের মত ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাঙ্গলা দল গঠনের যে তোড়জোড় আমরা কতকগুলি ট্রায়াল খেলার মধ্য দিয়া দেখিলাম এবং বাঙ্গলার দল গঠন শেষ পর্যন্ত ভোটের জোরে যে ভাবে গঠিত হইল ও গঠিত দলের প্রাক্‌টিস্ ম্যাচ দেখিয়া খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন ও সমঝদার ব্যক্তিরা বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বাঙ্গলা দলের বর্তমান বৎসরে শক্তি বাঙ্গলা দলকে সম্মান হইতে বঞ্চিত করিবে।

প্রথম খেলাতেই পরাজিত হইবার দুর্ভাগ্য বাঙ্গলা দলের ভাগ্যে পূর্ব কমই ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দলের ব্যাকে ডি ব্যানার্জি ও লেফট আউটে পি রাওকে নির্বাচন লইয়া সকলেই তাহাদের আপত্তি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য বাঙ্গলা দল ভূপালে খেলিবার সময় রবি বসুকে ব্যাকে খেলিতে দিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

কেশবদত্তকে বাঙ্গলা দলের অধিনায়ক নির্বাচন করিয়া হকি পরিচালকেরা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন নাই। কেশবদত্ত গত বৎসর হইতে বাঙ্গলায় খেলিতেছেন। তাহার অলিম্পিক সীল ও দায়িত্বপূর্ণ স্থানে খেলা প্রশংসনীয় হইলেও দলের অধিনায়ক নির্বাচনে পুরাতন খেলোয়াড়দিগকেই সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। ব্লাকেনও অলিম্পিক প্রত্যাগত এবং কেশবদত্ত হইতে বাঙ্গলায় পুরাতন খেলোয়াড় তাহাকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার ন্যায্য কারণ কি থাকিতে পারে আমরা জানি না। শোনা যায় ব্লাকেন অধিনায়ক নির্বাচিত না হওয়ার জন্যই বোধ হয় বাঙ্গলা দলের সহিত খেলিতে যান নাই। যদি বাস্তবিকই ইহা সত্য হয় তবে পরিচালক মণ্ডলীর অন্যায় নির্বাচনের জন্যে যে বাঙ্গলা দলের পুরোভাগের শক্তি বেশ কিছুটা বাহত হইয়াছে একথাও বলা চলে।

নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম :—

গুরুদ (কালিকাটা), ডি ব্যানার্জি ও ডি পাল (মোহনবাগান); ক্লাডিয়াস, কেশবদত্ত (কাষ্টমস্) বংশোবন্ত; এস গুরুব (ভবানীপুর) ইন্দ্রজিৎ রাই (কাষ্টমস্), ব্লাকেন (পার্ট), রাজকাপুর (কাষ্টমস্), পি রাও (মোহনবাগান)।

অতিরিক্ত— মেণ্ডিস (পুলিশ), এস ধর্মিক, কীনদয়াল (গ্রীন্নার), রবিদেও (কাষ্টমস্), ভাপুজ (মেরার্স) ও জি নীস্ (গ্রীন্নার)।

আন্তরাজ্য হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পূর্ব পাঞ্জাব দল এ বৎসরেও মহীশূর দলকে ৪—২ গোলে পরাজিত করিয়া বিজয়ী হইবার সম্মান লাভ করিয়াছে।

ক্রিকেট :—বরোদা ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বরোদা দল হোলকার দলকে পরাজিত করিয়া এই বৎসরে বিজয়ী হইবার সম্মান লাভ করিয়াছে।

রূপ ও বাণী

শিল্পরসিক

জিপসী মেয়ে :—

নিউ ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের ছবি, প্রযোজক সরোজ মুখার্জ্জী, পরিচালক বিনয় বানার্জ্জী। মীনার, বিজলী ও ছবিঘরে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরেশ বানার্জ্জী, গুরুদাস, জহর, রমলা, স্মৃতিরেখা, ছায়াদেবী এবং আরও অনেকে অভিনয় করেছেন।

ছবিখানি দেখে যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বের হই তখন গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শুধু এই কথাই মনে হয়েছে "ভগবান! এ কুৎসিৎ জিনিষ আর কতদিন সইতে হবে।" ছবিখানি আগাগোড়া দেখে প্রশংসা করবার মত কিছুই পেলাম না। নায়কের ভূমিকায় পরেশ বানার্জ্জীর অভিনয় শুধু নিম্নস্তরের নয়, অসহ্য, জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয় করেছেন, নায়কের পিতার ভূমিকায় গুরুদাস অচল, রমলা ও স্মৃতিরেখার অভিনয়ে চটুল দিকটা বেশ সুন্দর ফুটে উঠেছে, নায়কের মায়ের ভূমিকায় ছায়া দেবী ভাল। কাবুলীওয়ালার ভূমিকায় প্রীতি মজুমদারের অভিনয় বেশ সুন্দর। রামচন্দ্র পালের সঙ্গীত পরিচালনা আকর্ষণীয় হয়েছে, চিত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রী বেশ ভালো কাজ করেছেন।

এই ছবির প্রচার বিভাগের দিকে দেশের দর্শকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ও লাটন কবিতা লিখে এরা প্রচার করেছেন—

"ঘাঘরা ঘোরে ওড়না ওড়ে হৃদয় নাচে তার
দিল দরদী জিপসী মেয়ে ওইতো নেচে যায়;

এই ধরনের কবিতা সমাজের কোন স্তরে চলে তা আমাদের দেশের দর্শকেরাই বিচার করবেন। সবশেষে বলতে পারি এ ধরণের ছবি যত কম ওঠে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

তথাপী :—

ছবি ও বাণী লিমিটেডের প্রথম ছবি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিমল রায় এবং পরিচালনা করেছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। সুনীল দাশগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, প্রভাতি ঘোষ, শোভা সেন, শান্তা সেন প্রভৃতি অভিনয় করেছেন রূপবাণী, অরুণা এবং ইন্দিরাতে একযোগে প্রদর্শিত হচ্ছে।

নানা ভুল ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি আমার ভালো লেগেছে। গতানুগতিক ধরণে না গিয়ে নূতন ধরনের কাহিনীর জন্য স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্যকে ধন্যবাদ জানাই, মূক ও বধির একটী মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প রচনা বাংলা ছবিতে এই প্রথম এবং প্রভাতি ঘোষ তার স্বল্প অভিনয়ে বোবা মেয়ের রূপটী বেশ সুন্দর ফুটিয়ে তার চালচলনে বাঙ্গালী ঘরের বধূর রূপটী বেশ ভালো ভাবে ফুটে উঠেছে শেষ দৃশ্যে তার অভিনয় বেশ মর্মস্পর্শী।

নায়কের ভূমিকায় সুনীল দাশগুপ্ত অন্য ছবির তুলনায় অনেক ভাল অভিনয় করেছেন, বিজন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় আড়ষ্ট। অন্য ভূমিকা চলনসই, চিত্রশিল্পী ও শব্দযন্ত্রীর মধ্যে যেন প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছিল কে কত খারাপ কাজ করতে পারে মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে যা সচরাচর আ প্রব। সঙ্গীত পরিচালনা মোটেই তৃপ্তিকর নয়, সুজাতার ভূমিকায় সুদীপ্তা রায়ের অভিনয় অচল। হারমোনিয়াম নিয়ে তার গান গাইবার সত্যান্ত কুৎসিৎ, নানা ভুল ত্রুটি সত্ত্বেও ছবিখানি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

ইন্দিরা :—

বেঙ্গল ফিল্মসের ছবি "ইন্দিরা" পরিচালনায়—অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জী। বীণা ও বসুশ্রীতে একসঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে সুনন্দা

নায়ক নায়িকার ভূমিকায় দীপক মুখার্জী এবং সন্ধ্যা- অভিনয় অবশ্য মনে কোনই রেখাপাত ...ী ও কমল মিত্র সুন্দর অভিনয় বেশ চমৎকার আর

চরিত্রানুযায়ী সুন্দর অভিনয় করেছেন।

গোকুলের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় চমৎকার, শেষ দৃশ্যে মকবেশে অভিনয় হলেও দর্শকদের মনে তিনি রেখাপাত করতে পেরেছেন। বিনোদের ভূমিকায় বিকাশ রায় ঠিক তাল রেখে চলতে পারেননি। অন্য সকলের তুলনায় তিনি যেন নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন, অবশ্য চেহারাই তার ব্যর্থতার প্রধান কারণ। মার ভূমিকায় মলিনা দেবী স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। গোকুলের স্ত্রীর ভূমিকায় রেণুকা রায় মুখরা স্ত্রীর রূপটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোকুলের পিতার ভূমিকায় কণী বিদ্যাবিনোদ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্রবর্তী, প্রভা দেবী প্রত্যেকেই সু-অভিনয় করেছেন। বারবণিতার ভূমিকায় নিলীমা দাসের অভিনয় অত্যন্ত প্রাণহীন, কালীপদ সেন সঙ্গীত পরিচালনায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ সুন্দর, এ বছরের সেরা ছবিগুলির মধ্যে "বৈকুণ্ঠের উইল" যে অন্যতম তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

আমরা জানতে পারলাম আই, এন, এ পিকচার্সের বাংলা চিত্র "মাইকেল মধুসূদন" মধু বোসের পরিচালনায় কালিকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে, নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন শিক্ষিত নবাগত উৎপল দত্ত, নায়িকার ভূমিকায় আছেন উষা খান, অন্য ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, বাণীব্রত মুখার্জী, বিপিন মুখার্জী, শ্রীপতি চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি, চিত্রগ্রহণ করছেন মিঃ মেহতা এবং শব্দ গ্রহণ করছেন বাণী দত্ত, সঙ্গীত পরিচালনা করছেন চিত্ত রায়, শিল্প নির্দেশনার ভার নিয়েছেন খ্যাতনামা শিল্পী চারু রায়, আমরা চিত্রটীর সাফল্য কামনা করি।

বৈকুণ্ঠের উইল :—

ইণ্ডিয়া ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের চিত্র "বৈকুণ্ঠের ...পরিচালক—মধু বোস সঙ্গীত পরিচালনা—কালীপদ —প্রধান ভূমিকাগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছেন জহর বিকাশ রায়, তুলসী চক্রবর্তী, সন্তোষ সিংহ, মলিনা, রেণুকা রায় প্রভৃতি।

পরিচালক বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে চমৎকারভাবে এই কাহিনীটিকে ছবিতে রূপায়িত করেছেন চিত্রটি দীর্ঘ হলেও কোথাও ক্লান্তিকর মনে হয়নি। এই চিত্রের আর একটী প্রধান গুণ হল যে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী

জাগতিকি

সুধীর রায় চৌধুরী

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া :—

পূর্ব পশ্চিমের শৈত্য যুদ্ধ প্রশমিত হইবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তবে এই বৈরভাবের ভারকেন্দ্র ক্রমশ ইউরোপ হইতে এশিয়াখণ্ডে স্থানান্তরিত হইয়াছে। তাই পশ্চিমি মহলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ব্যাপার লইয়া জোর আলোচনা ও সামরিক প্রস্তুতির তোড়জোর চলিতেছে। কোরিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ; কিন্তু তাহাকেই বিখণ্ডিত করিয়া রুশ মার্কিণ বিরোধের ব্যূহরূপে ব্যবহার করা হইতেছে। মার্কিণ আইন সভায় যে বিপুল ব্যয়ভার বরাদ্দ হইয়াছে তাহার একটা মোটা অংশ কোরিয়ার মার্কিণ ঘাটিকে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিবার জন্য ব্যয়িত হইবে। আসল চীন হইতে বিতাড়িত হইয়া যে কে, এম, টি ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্যও আমেরিকার অর্থাভাব হইবে না। যদিও আমেরিকা খোলাখুলিভাবে পিকিং সরকারের বিরুদ্ধতা করিতে বিরত রহিয়াছেন তথাপি তাহাকে কূটনৈতিক ভাবে স্বীকার না করা এবং ইউ, এন, ও, স্থলে পরিবর্তে কে, এম, টি, প্রতিনিধির বদলে পিকিং প্রতিনিধির স্থান গ্রহণে বাধা জন্মাইয়া আন্তর্জাতিক সমস্যা ঘোরালো করিয়াই রাখা হইতেছে। এদিকে কথা উঠিয়াছে জাপানের সহিত সন্ধিস্থাপন জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। এই সন্ধি আলোচনা অচিরেই প্রবর্তিত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে সোভিয়েটকে সঙ্গে রাখিতে হইবে আর যদি একান্তই তাহা সম্ভব না হয় তবে তাহাকে বাদ দিয়াই এই সন্ধি ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে। ইন্দোচীনে ফরাসী অধিকার প্রকাশ্যভাবে বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় ফরাসী সরকার এই পরিবর্তিত অবস্থা মানিয়া লইয়াছেন এবং একদা বিতাড়িত ইন্দোচীনরাজ বাওদাইকে কেন্দ্র করিয়া এক তথাকথিত স্বাধীন ভিয়েৎনাম রাজ্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ভিয়েৎনাম ও লেয়স্ এই দুইটি রাষ্ট্র ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত দুইটী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আইনতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। এই রাষ্ট্রগোষ্টির নিরাপত্তার জন্য ফরাসী সরকার নিজেকে দায়ি মনে করিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, এদিকে কম্যুনিষ্ট চীন সরকার ফরাসী আধিপত্য বিরোধী স্বাধীন ভিয়েৎমিন প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সংকল্প সর্বজনপ্রিয় সর্ববাদীসম্মত জাতীয় নেতা হো-চি-মিনের সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকারও অনুরূপ স্বীকৃতিদান করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং অনতিবিলম্বে সোভিয়েট প্রভাবিত বহু রাষ্ট্র তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছেন। এই স্বীকৃতির ফলে মনে করা হইতেছে ইন্দোচীনে সীমাবদ্ধ স্থানীয় বিরোধ আন্তর্জাতিক বিরোধে পরিণত হইবার আর একটী রোগকেন্দ্র গড়িয়া উঠিতেছে। কিছুদিন পূর্বে খবর পাওয়া গিয়াছিল নতুন বলে বলীয়ান হইয়া কে, এম, টী, সৈন্য চীনের নিজ ভূখণ্ডে অবতরণ করিয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটী ঘাটী দখল করিয়াছে। কে, এম, টী, সৈন্যবাহিনীর পক্ষ হইতে নাকি একজন পদস্থ সেনানায়ক ভিয়েৎনামে অন্তরীণ কে, এম, টী, সৈন্যদের মুক্তির জন্য আবেদন জানাইয়াছেন এবং এই সমস্যা লইয়া ফরাসী ও বাওদাই সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে ফরাসী সৈন্যরা ভিয়েৎনাম বাহিনীর সহযোগিতায় যে কোন মুহূর্তে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য রক্ষার সর্বপ্রথম সংগ্রাম বিলম্বিত করার হেতুকে লিপ্ত হইতে পারে। এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট পরিচালিত ভিয়েৎমিন বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যেই প্রচুর গোলাবারুদ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং আনাম সীমান্তে একদিনের মধ্যেই সাতলক্ষ চীনা কম্যুনিষ্ট সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। খাস সাইগন সহরে ভিয়েৎমিন সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ফরাসী সামরিক কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা রক্ষায় সৈন্য বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। হানয় প্রদেশে চীনের সীমান্তবর্তী গেরিলা অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সৈন্য বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

এই গুরুতর সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়া ফরাসী সরকার বহু পূর্ব হইতেই আমেরিকার নিকট হইতে সমর সম্ভার

সংগঠন গড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আতলান্তিক চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ সাহায্য ইন্দোচীন ব্যাপারে ব্যবহার করা বিতর্কমূলক হইলেও আমেরিকার সাহায্য পাইতে বাধা হয় নাই। এই মার্কিন সাহায্য গ্রহণ লইয়া ইন্দোচীনের সাইগন সরকারে বিপুল বিরোধ চলিতেছে। প্রথমে ভিয়েৎমিন গেরিলাগণ সাইগন নৌ-অঞ্চলে উপস্থিত মার্কিন ট্রাক্টরগুলির উপর গোলাবর্ষণ করে। পরে বহু সহস্র ছাত্র সোচ্চার হইয়া ঐ অঞ্চলে বিক্ষোভ প্রকাশ করে এবং পুলিশ ও সরকারী সৈন্যের আক্রমণে চট্টগ্রাম আহত বা অগ্নিসংযোগ করে। এই ঘটনা ও তৎসংশ্লিষ্ট সরকারী অত্যাচারের ফলে তথায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে।

সংগঠনে গত ১৯শে মার্চের বিক্ষোভ ও গ্রেফতারের পর যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে তাহা এখনও অব্যাহত ভাবে চলিতেছে। প্রতিদিনই "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পয়লা নম্বর শত্রু" "মার্কিন সাহায্য বন্ধ কর," "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কাইদেককে সাহায্য করিয়াছিল" ইত্যাদি বিলি করা হইতেছে। এছাড়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং তাহার তাঁবেদার বাওদাই-ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্ত হইতে দেশকে মুক্ত করিবার জন্য দেশপ্রেমিক ছাত্র, শ্রমিক ও নাগরিকদের আহ্বান জানাইয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত ছত্রিশখানি ভিয়েৎনামী পত্রিকা কয়েকদিন পূর্বে গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে গত ১৮শে মার্চ তারিখে মাত্র তিনখানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু এই পত্রিকাও ছাপিয়া বাহির করিয়াছে পত্রিকার মালিকরা স্বয়ং। কারণ এইসব কাগজের মুদ্রাকরগণও ধর্মঘট করিয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার দাবীতে সাংবাদিকগণ যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করার জন্য পুলিশ গত ২৭শে মার্চ তারিখে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ডোচীন চীনের গভর্নর হুমকি দিয়াছেন যে, ভিয়েৎমিন বিদ্রোহীদের আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য তিনি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

যে বিরোধের বহিঃপ্রকাশ এই দাঙ্গা এবং পরবর্তী দমন ও দলন নীতি তাহা পররাষ্ট্র ব্যাপারে প্রধান রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ। যে কোন ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যাইবে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণে সর্বাপেক্ষা উর্বর এবং এই উর্বরতাহেতু এই অঞ্চলের লোকসংখ্যা সর্বাধিক। কাঁচা মাল ও খনিজ সুযোগের লোভে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এই অঞ্চলে তাহাদের অবাধ ব্যবসা চালাইয়াছে। কিন্তু গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চল ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতরের রূপটা তাহাদের সামনে উদ্ঘাটিত করিয়াছে। তাই একদিকে যেমন তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়াছে অন্যদিকে তেমনি এই অঞ্চলের অধিবাসিদের রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। তাহারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযান ঘোষণা করিয়াছে। হো-চি-মিন ইন্দোচীন অঞ্চলে এই জনগণের প্রতিনিধি। কিন্তু সমস্ত এশিয়া-বাসির পক্ষ হইতে আমেরিকার প্রতি যে সাবধান বাণী উচ্চারিত হইয়াছে তাহার বক্তা স্বাধীন কম্যুনিষ্ট চীনের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ চৌ এন লাই। তিনি এশিয়া সম্পর্কে মিঃ ডিন একিসনের সাম্প্রতিক বক্তৃতার উত্তরে বলেন যে, এশিয়ার সকল কার্য ও সমস্যা এশিয়াবাসীরাই সমাধান করিবেন। ইহাতে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

মিঃ লাই আরও বলেন, একিসন চীনকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, চীন যেন এশিয়ার ব্যাপারে মাথা না ঘামায়। তাঁহারা যদি এই কাজ করেন তাহা হইলে তাহারা শুধু চীনাদের ও এশিয়াবাসীদের ঐতিহ্য ও স্বার্থ-ই ক্ষুণ্ণ করিবেন না তাহারা সমগ্র স্বাধীন জাতি, আমেরিকাবাসী ও রাষ্ট্রসংঘের সনদের ক্ষতি সাধন করিবেন।

মিঃ লাই বলেন, এশিয়ার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাষ্ট্রের তরফ হইতে আমি একিসনকে জানাইতে চাই যে তাহার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে।

মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া দেখুন। বর্তমানে এশিয়াবাসীরা এশিয়ার সমস্যার সমাধান করিবেন। একদিন কোম্পানীর মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রশান্ত মহাসাগরের অপরদিকে যেন কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে।

•

চৌ এন লাই এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ দখল করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃত্বভার অধিকার করেন। এখন তাহারা চীন, ইন্দোনেশীয়া, ভিয়েৎনাম, শ্যাম, ব্রহ্ম ও ভারতের উপর কর্তৃত্বের চেষ্টা করিতেছেন।

চীনা পররাষ্ট্রসচিব মিঃ লাই বলেন, সমগ্র বিশ্ব একথা জানেন যে, যুক্তরাষ্ট্র চীনকে দখল করিবার চেষ্টায় চিয়াং কাইসেককে গৃহযুদ্ধে সাহায্য করিয়াছে। চীনাদের স্বাধীনতা সকল প্রকার অধিকার এবং শান্তিতে বসবাস করিতে দিবার সুযোগ পর্যন্ত হরণ করিয়াছে।

মিঃ লাই আরও জানান যে, চীনের প্রধান ভূভাগে বোমাবর্ষণের জন্য মার্কিণ সরকার চিয়াং কাইসেকের সৈন্যদের বিমান সরবরাহ করিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্র বাঙ্গাই এর তাঁবেদার সরকার সিংম্যান রি ও কুইরিণোকে ভিয়েৎনাম দক্ষিণ কোরিয়া ফিলিপাইন-এর গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য অনুরূপ সাহায্য করিতেছেন।

আমেরিকা এশিয়াকে যে সাহায্য দিয়াছেন তাহার নিন্দা প্রসঙ্গে মিঃ চৌ এন লাই বলেন যে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে চীনারা তথাকথিত মার্কিণ সাহায্যের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার অর্থ হইল লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু, জাতীয় স্বাধীনতা ও অধিকারের বিনাশ। সমগ্র বিশ্বের পক্ষে ইহা শিক্ষা স্বরূপ, বিশেষতঃ যে সকল উপনিবেশ বা দেশকে সাহায্য দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহারা যেন এই কথা মনে রাখেন।

ভারতের বাজেট—

ভারতের অর্থ-সচীব ডাঃ জন মাথাই ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টের সাধারণ বাজেট উপস্থিত করেছেন। বাজেট প্রস্তাব একবার পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করা হ'লে—তার বিশেষ অদল-বদল সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে—যে সব ট্যাক্স বা কর বসানো বা বর্দ্ধিত করার প্রস্তাব হয়—তার পরিবর্ত্তন করা যায় না;—সামান্য একটু আধটু পরিবর্ত্তন অবশ্য হ'তে পারে। বাজেট উপস্থিত করার পূর্বে তা অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে রাখা হয়;—এমন কি মন্ত্রী-মণ্ডলী পর্যন্ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বাজেট প্রস্তাব জানতে পারে। কাজেই বাজেট সম্বন্ধে পার্লিয়ামেণ্টে বা পার্লিয়ামেণ্টে আলোচনা হয়, কার্যকরী মূল্য (practical value) খুব বেশী থাকে না।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতের সর্বপ্রথম বাজেট উপস্থিত করার সৌভাগ্য পেয়েছেন ব'লে তাঁর ভাষণে ডাঃ মাথাই খুব বোধ করেছেন। তবুও যে কোন লোকের পক্ষেই এটা গৌরবের হ'তে পারত। মাথাই ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে কোন দিনই খুব ব্যস্ত ছিলেন না;—কোন দিনই এর জন্য কোন ত্যাগ বা সাধনা বরণ তিনি করেন নি। স্বাধীন ভারত যে তাঁর ব্যক্তিগত যোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছে, এতে তিনি তুষ্ট হবেন এবং এই সৌভাগ্যের জন্য গৌরব বোধ করবেন—এ ত' স্বাভাবিক।

কিন্তু তাঁর বাজেট-প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা পার্লিয়ামেণ্টে হয়েছে। তিন পর্যন্ত সভার পর সভা উঠে বসে সমালোচনা করেছেন। তবুও ২৩৩টি সভ্য কতকটা আংশিক ভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করেছেন। আজ ভারতের যে অবস্থা তাতে কোন অর্থ-মন্ত্রীই জন-সাধারণকে বা কংগ্রেসকে তুষ্ট করতে পারেন নি; একমাত্র এর জন্য তাঁকে দোষ দেবার নেই। কিন্তু এখানে বিচার্য হ'ল—ভারতের অর্থনীতির গতি কোন দিকে, তার সূচনা পাওয়া যায় কি না;—এই বাজেট কোন দিকে গতির ইঙ্গিত করছে।

কংগ্রেসের একটা বিশেষ অর্থনীতির কথা এত দিন বলে এসেছে। অন্য কথায় বলা যায়—এই অর্থনীতি হ'ল—বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি (decentralised economy)—যার ফলে দেশের ও জাতির উৎপাদন শক্তি, উৎপন্ন সম্পদের ভোগ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বিস্তৃত জনতার অধিকারে আসতে পারে। এ জন্যই কংগ্রেস ও গান্ধীজী বরাবর কুটির উদ্যোগের (cottage industry) কথা বলেছেন। বড় বড় কারখানায় শ্রমিক হয়—মজুর—বা মাইনের দাস। কিন্তু কুটির উদ্যোগে শ্রমিক হয় উৎপাদন প্রথার ও উৎপন্ন সম্পদের মালিক। গান্ধীজী ও কংগ্রেসের অর্থনীতির অন্য একটা রূপ হ'ল—জনসাধারণকে আর্থিক স্বাধীনতা দেওয়া। ডাঃ মাথাইর বর্তমান বাজেটে এই দুই দিকের কোন ইঙ্গিত নেই;—বরং ইঙ্গিত আছে—ঠিক এর উল্টো দিকের।

এই বছর ১৪ কোটি টাকা ট্যাক্স মাপ করা হ'য়েছে এবং তা সবই ধনীদের বিভিন্ন প্রকার আয়ের উপর যে ট্যাক্স ছিল—তার-ই আংশিক হ্রাস করার ফলে। এই বিষয়ে ডাঃ মাথাইর যুক্তি হ'ল এই:—দেশে আজ সব চেয়ে দরকারী হ'ল উৎপাদন বাড়ানো—খাদ্য দ্রব্য এবং উদ্যোগ-উৎপন্ন (industrial) প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচানো। এই উৎপাদন কাজের প্রধান অন্তরায় হ'ল—পর্যাপ্ত মূলধন উৎপাদন কাজে আসছে না; কারণ দেশে

ট্যাক্স এমন উঁচু স্তরে আছে যে কারোরই আর হয় না এবং উৎপাদনের মূলধন গড়বার মতো সঞ্চয় কারোরই হয় না। কাজেই ট্যাক্স কিছু মকুব ক'রে মূলধন গড়তে (formation of capital) সাহায্য করা দরকার। এই নীতি ধরেই ডাঃ মাথাই তাঁর বাজেট প্রণয়ন করেছেন।

এই প্রকার বিচার যে একেবারে অযৌক্তিক তা বলা যায় না। এই বিচারের সঙ্গে একটা কথা মেনে নিতে হয়—ধনীদের হাতে যে সঞ্চয় হবে, তা তারা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করবে। গত দুই বছরেও ট্যাক্সের ব্যাপারে ধনীদের কিছুটা স্বস্তি (relief) দেওয়া হ'য়েছে;—কিন্তু ধনীরা যে উৎপাদনের কাজে তাদের শক্তি ও অর্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে নিয়োজিত করেছে, এমন সাক্ষ্য পেশ করা হয় নি। একথা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা একাধিকবার বলেছেন। তাছাড়া ধনীদের উপর যে আস্থা ও আশা পোষণ করা হচ্ছে—তা কতটা সফল হবে, তা বলা কঠিন। তাছাড়া ডাঃ মাথাইর অপর যুক্তি হ'ল—মধ্যবিত্তদের জন্য গত বছর কিছুটা ট্যাক্স মাপ করা হয়েছে এবং বর্তমানে তাদের উপর যে ট্যাক্স আছে, তা প্রাক যুদ্ধ সময়ের ট্যাক্সের চেয়ে কম;—কিন্তু ধনীদের উপর আজ যে ট্যাক্স আছে, তা এই হ্রাসের পর-ও যথেষ্ট উঁচু স্তরে আছে এবং প্রাক যুদ্ধের চেয়ে বেশ অনেকটা উঁচু। অবশ্য এর উত্তরে বলা যায়—ধনীদের আয়ের পরিমাণ-ও প্রাক-যুদ্ধ সময়ের চেয়ে বেড়েছে।

আজ ভারতের আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্কটময় অবস্থায় এসেছে যে কোন সহজ ও নিশ্চিত রাস্তা কেউ নির্দেশ করতে পারবে না। ধনী ও ধনপতিদের হাতে দেশ অনেকটা আটকা আছে। তারা-ও তা জানে এবং এর যথেষ্ট সুযোগ তারা আদায় করছে। একেবারে কম ক'রে এদের বিত্তপতা আহ্বান করা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা—বলা যায় না। এরা যদি আজ হরতাল বা ধর্মঘট ক'রে উৎপাদন কাজ আটকে দেয়—তবে সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার এমন উলোট-পালোট ঘটতে পারে, যাতে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট বহু পরিমাণে বেড়ে যেতে পারে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ২।৩ বছর পর্যন্ত রুশিয়াতে দুর্ভিক্ষ চলেছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের মূলে যে সব কারণ ছিল, তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল বলশেভিক দলের অর্থনীতি ও কৃষি-নীতি। আজ কম্যুনিষ্ট চীনে-ও নাকি দুর্ভিক্ষ সুরু হ'য়েছে;—জানি না এর-ও মূলে কম্যুনিষ্ট চীনা সরকারের অর্থনীতি আছে কিনা। কংগ্রেস যখন ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করে, তখন ভারতে-ও এক ব্যাপক ও ভীষণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা সর্বাই করেছিল। সেই দুর্ভিক্ষ থেকে ভারত রক্ষা পেয়েছে—এটা এই ভারত সরকারের বিশেষ কৃতিত্ব। এমনি সব নানা কারণে ভারত সরকারকে খুব সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে—এ কথা আমরা মানছি।

ডাঃ মাথাই নিজে-ও স্বীকার করেছেন যে অর্থনৈতিক বিচারের বশবর্তী হয়ে তিনি এই বাজেট প্রণয়ন করেছেন তা অনেকটা পরীক্ষামূলক: এই পথে যে ভারতের আর্থিক সমস্যা খুব হবেই তেমন কথা তিনি জোর করে বলতে পারেন না। তার নিজের বিচার বুদ্ধিমত যে পন্থা ভাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে সেই পন্থা অবলম্বন ক'রে তিনি চলেছেন। তিন চার বছরের মধ্যে এই অর্থনৈতিক পন্থার পূর্ণ বিচার হবে ব'লে, তিনি আশা করেন। ডাঃ মাথাইর ব্যক্তিগত সততা ও বিচক্ষণতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। অপরদিকে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে অপর কোন অর্থনৈতিক পন্থার উপযোগিতা সম্বন্ধে জোর করে বলবার মতো কোন পন্থা-ও বলা কঠিন। তাই ডাঃ মাথাইর অনুসৃত অর্থনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও একে যাচাই করে দেখার জন্য আমরা গ্রহণ করছি।

তবুও জনসাধারণের দিক থেকে এ বাজেট সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি করার কারণ আছে। যে মৌলিক অর্থনীতি অবলম্বন ক'রে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে—তার ব্যতিক্রম না করেও জনসাধারণের জন্য কিছুটা করের ভার লাঘবের ও চেতাইর ব্যবস্থা ডাঃ মাথাই করতে পারতেন। পরিষদের সমালোচনার পর—সে দিকে তিনি কিছু পরিবর্তন করেছেন কিন্তু একদিকে তা যেমন পর্যাপ্ত নয়—অপর দিকে পরিষদ সদস্যদের সঙ্গে

নেহেরুর পরে ঐ পরিবর্তন করা হয়েছে বলে জনসাধারণের নিকট এর মূল্য অনেক কমে গিয়েছে; পরিষদ সদস্যদের তীব্র সমালোচনা পূর্বাহ্নেই তাঁর অনুমান করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রসভার সাথে পরিষদের কংগ্রেসীদলের সদস্যদের যোগাযোগের অভাবই এতে সূচিত হয়।

বাজেটের মোটা হিসাব—

১৯৪০-৪১ সালের সম্ভাবিত রাজস্ব ৩৮৭ কোটী টাকা। তন্মধ্যে যে সমস্ত কর মাপ করা হয়েছে বা যার পরিমাণ হ্রাস করা হয়েছে—তাতে ৮ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা কম আদায় হবে। তা বাদ দিয়ে আগামী বছরের রাজস্বের পরিমাণ ৩৩৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মত দাঁড়ায়। তন্মধ্যে আগামী বছরের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৩৭ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। মোট উদ্বৃত্ত থাকবে ১ কোটির কিছু বেশী। এ বছরে নূতন কোন কর ধার্য করা হয়নি। উপরের দিকে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ কর (Direct Tax) বসং মাপ করা হয়েছে। এবং নীচের দিকে তিন হাজার হতে তিন হাজার ছয় শত টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর যে কর ছিল তা মাপ করা হয়েছে। গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী এতে কিছুটা উপকৃত হবে।

ব্যয়ের খাতে সবচেয়ে মোটা অংশ হলো দেশরক্ষা। ১৬৮ কোটি ৯ লক্ষ টাকা সামরিক হিসাবে খরচ হবে; অর্থাৎ মোট খরচের প্রায় অর্দ্ধাংশ দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করা হবে। ১৯৪৯-৪০ সালে ভারতের রাজস্ব ছিল ৩৩৭ কোটি টাকা; তার মধ্যে সামরিক ব্যয় ছিল ১৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট আয়ের অর্দ্ধাংশের বেশী ছিল সামরিক ব্যয়। গত বছর থেকে এ বছর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ খাতাপত্রে মাত্র ২ কোটি টাকা কম। কিন্তু কার্যতঃ গত বছরের চেয়ে এ বছর সামরিক ব্যয় ১০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। কারণ অধুনালুপ্ত দেশীয় রাজ্য সমূহের সৈন্যবাহিনীর বাবদ প্রতি বছর ৮ কোটি টাকা খরচ করা হতো; এবারকার ১৬৮ কোটি টাকার ভিতর সেই ৮ কোটি টাকাও ধরা হয়েছে। যদিও ভারত ও পাকিস্তানের বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কে ভারতের পক্ষে সামরিক ব্যয় হ্রাস করা খুবই কঠিন। তবুও নিজের শান্তিপ্রিয়তার নিদর্শন হিসাবে সামরিক ব্যয় ১০ কোটি টাকা হ্রাস করেছে। এ সম্পর্কে আরও স্মরণ রাখা দরকার যে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পর টাকার ক্রয়-শক্তি কমে গেছে। সেই হিসাবে দেখতে গেলে সামরিক খাতে খরচ সত্যিকার ভাবে অন্ততঃ ১২।১৩ কোটি টাকা কমেছে।

আগামী বছরের ব্যয়ের বরাদ্দের মধ্যে উদ্বাস্তুদের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে মাত্র ৬ কোটী; এই বছর এ' বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৩ কোটী। আগামী বছরের বাজেটের হিসাব যখন প্রস্তুত করা হয় তখন পর্যন্ত পূর্ব বাংলার সমস্যা তেমনভাবে দেখা দেয় নি;—অবশ্য পার্লিয়ামেন্টে বাজেট পেশ করার সময় পূর্ব-বাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই অর্থ সচিব বলেছেন—দরকার হ'লে এ বাবদ টাকার বরাদ্দ পরে করা হবে। আজ এটা সর্ব-জন স্বীকৃত যে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন হবে—কারণ তাদের পুনর্বসতির দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করেছে।

খাদ্য শস্য বিদেশ হ'তে আমদানী করা বাবদ ভারত সরকার গত বছর ব্যয় করেছে প্রায় ৩০ কোটী টাকা আগামী বছরে এই বাবদ ধরা হয়েছে ২১ কোটী টাকা। বিদেশ হ'তে যে উঁচু দরে খাদ্য শস্য কেনা হয় সে দরে এখানে তা বিক্রয় করলে জনসাধারণের খুব বেশী কষ্ট হবে; তাই সরকার প্রতি বছর বহু কোটী টাকা এই বাবদ লোকসান দেয়। এখন ভারত সরকার স্থির করেছে ভারতকে ২।১ বছরের মধ্যে খাদ্য শস্য বিষয়ে স্ব-পর্যাপ্ত (self sufficient) করতে হ'বে। অধিক খাদ্য ফলাও যোজনাতে ও প্রচেষ্টায় ভারতের খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে; —তাই আগামী বছরে কিছু কম খাদ্য-শস্য আমদানী করতে হবে। তাই এই বাবদ লোকসানের পরিমাণ কম ধরা হয়েছে।

আগামী বছরে ও এই বছরে শিক্ষার জন্য ব্যয় প্রায় সমানই রয়েছে—পৌনে পাঁচ কোটী টাকার কিছু উপরে। শিক্ষা হ'ল প্রাদেশিক-শাসনের অন্তর্গত; কেন্দ্রীয় সরকার কেবল তথ্যাবক করবে, চালনা করবে সংযোজনা

(co-ordination) করবে এবং কোন কোন বিশেষ শিক্ষাকেন্দ্রকে সাহায্য করবে। তাছাড়া কাশী, আলিগড় ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ এক্তিয়ারের অন্তর্গত। জন-স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব পরোক্ষ। এই বিভাগেও এ বছর ও আগামী বছরের ব্যয় প্রায় একই আছে—সোয়া দু কোটী টাকা। জাতি গঠন বিভাগে ভারত সরকার ব্যয় বিশেষ হ্রাস করেনি। কিন্তু সরকারী আফিসের খরচ অর্থাৎ কর্মচারীর সংখ্যা ও তাদের অতিরিক্ত বেতন প্রভৃতি ব্যাপারে যে পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে তা নিয়ে অসন্তোষের যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের এটা গরীব দেশ, বিশেষ করে এখন দেশ একটা সঙ্কটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। এই সময় জাকজমক ও আদম্বর কায়দার দিকে বেশী নজর না দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থায় শাসন কার্য চালিয়ে, দেশের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের দিকে বেশী করে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল।

এবার বাজেটের একটা বৈশিষ্ট হল—নূতন নিয়ম অনুসারে যে পরিমাণ মূলধন ভারতীয় রেলে নিয়োজিত করা হয়েছে, রেল বিভাগ প্রতি বছর ঐ মূলধনের উপর শতকরা ৪৲ হারে লাভ্যাংশ (dividend) সাধারণ রাজস্বকে দেবে। সে হিসাবে রেল বিভাগ হ'তে ৩১,৮৪৯৮০০০—অর্থাৎ প্রায় ৩২ কোটি টাকা সাধারণ রাজস্ব এ বছর পেয়েছে। এই টাকা দেবার পরও রেল বিভাগে ১৪ কোটি টাকার মতো উদ্বৃত্ত রয়েছে ঐ ৩২ কোটী টাকা থেকে প্রায় সাড়ে পঁচিশ কোটী হাবে শুদ্ধ বাবদ ; সাধারণ রাজস্ব মোট পাবে ৮৩৭০০০০০৲ টাকা। এই বছর বাণিজ্য শুল্কে (customs) ভারতের রাজস্ব ছিল ১২০ কোটী, আগামী বছরে তা ক'মে দাঁড়াচ্ছে ১০৬ কোটী টাকা। এর কারণ হ'ল আমদানী নিয়ন্ত্রণ ; মুদ্রার মূল্য হ্রাসের পর রপ্তানি কিছু বেড়েছে—কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির জন্য আমদানী কমাতে হয়েছে। আবকর কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও এই বছরের ১১৮ কোটি টাকার স্থলে ১৭৮ কোটী টাকা আগামী বছরে পাওয়া যাবে বলে আশা করছে। ডাক ও তার বিভাগ হ'তে এই বছর পাওয়া গিয়েছে পৌনে চার কোটী টাকা, আগামী বছর আশা করা যাচ্ছে চার কোটীর উপরে।

এ সব হিসাব থেকে বলা যায় যে ভারতের রাজস্ব ও আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভাল। একটা নূতন রাষ্ট্রের পক্ষে এই আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাবে শ্লাঘ্য। কিন্তু তবুও বিপদের আশঙ্কা যা আছে সে সম্বন্ধে আমাদের অ-চেতন থাকা উচিত নয়। দ্রব্যের মূল্য জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের তুলনায় অনেক বেশী, এর প্রধান কারণ হল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ;—কিন্তু এতে ফল দাঁড়াচ্ছে মুদ্রা-স্ফীতির। আবার তার সঙ্গে এসেছে মুদ্রার অনটন। দেশে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকছে না,—যা আয় হচ্ছে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতেই তা ব্যয় হয়ে যায়। সঞ্চয় হয় না,—তাই মূলধন জমছে (capital formation) না। মূলধন জমছে না বলে নূতন নূতন উৎপাদন প্রচেষ্টা হচ্ছে না,—তার ফলে প্রয়োজনের তুলনায় দ্রব্যের ঘাটতি দূর হচ্ছেনা। এবং তাতেই দ্রব্যের মূল্য আয়ের তুলনায় অনেক বেশী হচ্ছে। এই বিষচক্র (vicious circle) থেকে বের হবার প্রধান উপায় হ'ল ব্যয় সংক্ষেপ ক'রে প্রত্যেক নাগরিকেরই সঞ্চয় করানো এবং ঐ-সঞ্চিত অর্থ উৎপাদন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা।

ভারত ও পাকিস্তানের রাজস্বের তুলনা

ভারতের মোট রাজস্বের হিসাব করতে হ'লে সাধারণ রাজস্বের সঙ্গে রেলের রাজস্ব যোগ দিতে হয়। তাতে ভারতের মোট রাজস্ব হয় প্রায় ৯০০ কোটী টাকা। তার মধ্যে সামরিক ব্যয় হ'ল ১৬৮ কোটী টাকা। তাছাড়া আরও একটা কথা হিসাব করার দরকার আছে। ভারত সংযুক্ত রাষ্ট্র ; তা না হয়ে ব্রিটেনের মতো ভারত যদি কেন্দ্রিত (unitary) রাষ্ট্র হ'ত তবে বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বও ভারতের কেন্দ্র রাজস্বের সঙ্গে যোগ হত। তার পরিমাণ অন্যূন ৬০০ কোটী টাকা হ'ত। কাজেই কার্যত ১২০০ কোটী টাকার রাজস্বের মধ্যে মাত্র ১৬৮ কোটী টাকা সামরিক ব্যয়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব হ'ল ১১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে রেল রাজস্ব হ'ল ৪০ কোটি

৩৬ লক্ষ সাহায্যে রাজস্ব বাকি রইল ৭৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা কোটী টাকা হ'ল সাময়িক তাড়াতাড়ি চলতি তহবিল (capital fund) হতে আরও ৯৫ কোটি টাকা সাময়িক খাতে ব্যয় করা হবে। অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের মোট সাধারণ রাজস্ব হ'ল ৭৩ কোটী টাকা, সেখানে কেবল সাময়িক বাবদ ব্যয় করা হবে ৭৫ কোটী টাকা।

পাকিস্থানের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বের হিসাব করলে পাকিস্থানের মোট রাজস্ব ২০০ কোটী টাকার বেশী হবে না। এর মধ্যে ৭৫ কোটী টাকা সাময়িক ব্যয়। সমস্ত প্রদেশ নিয়ে হিসাব করলে মোট রাজস্বের মাত্র অর্দ্ধাংশের মতো ভারত সাময়িক বাবদ ব্যয় করছে, আর পাকিস্থান ব্যয় করছে আড়াই ভাগের একটু কম। উদ্বাস্তুদের বাবদ ভারত হিসাবে দেখেছে কোটী : পাকিস্থান ঐ বাবদ দেখেছে মাত্র ১৮ লক্ষ। অথচ বাংলার হিসাব ছাড়া উদ্বাস্তুর সংখ্যা উভয় রাষ্ট্রে সমান।

বাজেটের এই হিসাব থেকে উভয় রাষ্ট্রের মৌলিক সঙ্গতি ও মতিগতির পরিচয় পাওয়া যাবে।

—•—

ভারত ও ব্রিটেন

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ভারতের আদর্শ ছিল ব্রিটীশ কমনওয়েল্থ্ (commonwealth)—বা জাতি-গোষ্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার।—অর্থাৎ ইংরাজের সঙ্গে কোন যোগ রাখবে না—এই ছিল ভারতের দাবী। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর পুরাতন বিদ্বেষ ও বৈরী ভাব ভুলে ভারত সিদ্ধান্ত করল—ব্রিটীশ জাতিগোষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল এই যে শত বেড়শত বৎসরের যোগাযোগের ফলে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে বহু সমস্বার্থের ব্যাপার আছে; অর্থ-নৈতিক, সামরিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি ব্যাপারে উভয় দেশের স্বার্থ অনেকটা জড়িত। ১৯৭৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী এটলী ঘোষণা করেন যে অতি সত্বর ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। ঐ ঘোষণার সময় তিনি বলেছিলেন—রাষ্ট্র বাধ্যবাধ্য এই পরিবর্তন সত্ত্বেও এই দ্বীপের সবাই আশা করবে যে ব্রিটেন ও ভারতের পারস্পরিক সম্পর্ক এখানেই শেষ হবে না; বরং আমরা সবাই ভারতের সর্বপ্রকার মঙ্গল সাধনের জন্য চেষ্টা করব। (It will be the wish of everyone in these islands that notwithstanding constitutional changes, the association of the British & Indian peoples should not be brought to an end, and they will wish continue today all that is in their power to further the well being of India.)

ভারতও মনে করেছিল পুরাতন ঝগড়া বিবাদ ভুলে ব্রিটেন সত্যই ভারতের সৌহার্দ্য কামনা করবে। সে এই বিশ্বাসে এবং সমস্বার্থের প্রেরণায় বৃটিশ জাতিগোষ্টির সংগে থাকার সিদ্ধান্ত ভারত গ্রহণ করেছিল গত আড়াই বছর ব্রিটেন ভারতের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে ভারতের সেই আশা ও সমস্বার্থবোধের প্রেরণা আজ প্রায় লুপ্ত হয়েছে। লর্ড মাউনব্যাটেন (Lord Mountbatten) ভারতবর্ষে এসে ভারতের মিত্রতার আবরণে ভারত বিভাগ রূপ বৈরী আচরণ করেই কেবল ক্ষান্ত হননি; যতদিন তিনি ভারতের বড়লাট রূপে এখানে ছিলেন নানাপ্রকার ভারতের শ্রীবৃদ্ধির ও শক্তিবৃদ্ধির পক্ষে তিনি বাধাই সৃষ্টি করেছেন। ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে আজ যে বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে তার জন্য ব্রিটেনের কূটনীতি অনেক পরিমানে দায়ী। ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্তের প্রথম ঘোষণায় ব্রিটেন ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছিল। কিন্তু, বৎসর অতীত হবার পূর্বেই ব্রিটেন ভারত-বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এই মত পরিবর্তন নিতান্তই আকস্মিক নয়; এর পিছনে ইংরাজের কূট-রাজনীতি ছিল।

সেই কূটনীতি অনুসরণ করার ফলেই গত আড়াই বৎসর ব্রিটেন ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে। বৈদেশিক বিভাগের সহকারী মন্ত্রী ডাঃ কেন্সকার সেদিন পার্লামেণ্টে সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা প্রকাশ করেছেন। ব্রিটেনের সংবাদপত্রসমূহ এবং বেতার কেন্দ্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে কসুর করেনি। আন্তর্জাতিক

সম্মেলনে ব্রিটেন প্রায় কখনও ভারতের স্বার্থ ক্ষু
করেনি।

ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ জাতি গোষ্ঠির সাথে আসতে সম্মত হয়েছে, তা একতরফা-সং-নয়; উভয় দেশেরই এই ব্যাপারে সমান ভাবে দায় ও দায়িত্ব আছে। ব্রিটেন যদি মনে করে ভারতের মিত্রতা লাভের প্রয়াস করার কোন প্রয়োজন তার নেই, তবে ভারতের পক্ষেই বা এমনকি দায় পড়েছে যে সেই মিত্রতার জন্য কাঙ্গালপনা করতে হবে! তাঃ কেনকার সরকারী মুখপত্র হিসাবে পার্লামেন্টে যা বলেছেন আশা করি সরকারী মহল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটেনকে সেই কথা জানান হয়েছে। ভারতের শক্তি সামর্থ্য যা আছে তাতে নিজের মর্যাদা নিয়ে চলবার ক্ষমতা তার থাকা উচিত। ব্রিটেন যদি মনে করে যে ভারতের চেয়ে অপর কোন দেশের মিত্রতা তার নিকট বেশী কাম্য তবে সে তার পছন্দ এবং সুবিধা অনুযায়ী যেমন চলতে পারে ভারতের পক্ষেও তাকে জানিয়ে দেওয়া স্বাভাবিক যে ভারতও নিজের সুবিধা অনুযায়ী তার মিত্র বেছে নিতে পারে।

বাংলা

গত সংখ্যায় বাংলার বর্তমান দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা প্রকাশ করেছি। তারপর অবস্থার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি। আজও বাংলার বাঙালীর দুঃখ কষ্টের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলেছে। পূর্ব বাংলার দাঙ্গাহাঙ্গামা আপাতত শান্ত হয়েছে বলা চলে, যদিও এখনও সেখানে হিন্দু সংখ্যা-লঘিষ্ঠের মান, প্রাণ, ধন, সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। এর পর সুরু হয়েছে পশ্চিম বাংলার কোন কোন অংশে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অশান্তি। যথেষ্ট উত্তেজনা সত্ত্বেও পশ্চিম বাংলা মোটামুটি শান্ত ছিল। কিন্তু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কয়েকটি অবাঞ্ছিত কথায় পশ্চিম বাংলার হিন্দুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ১৭ই মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি পর্যালোচনা উপলক্ষে পণ্ডিতজী নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে বলেছিলেন পূর্ব বাংলা হতে আগত আশ্রয় প্রার্থীগণ বর্তমানে তাদের মালপত্র নিয়ে আসতে পারছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু অলঙ্কারও এনেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও যা বলেন তাতে লোকে মনে করতে পারে যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা দাঙ্গাহাঙ্গামা ও উপদ্রব সৃষ্টির অপরাধে প্রায় একই পর্যায়ের।

তাঁর এমনি সব উক্তির বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র বিক্ষোভ দেখা দেয়; এই বিক্ষোভই পশ্চিম বাংলায় রূপ নিয়েছে কোন কোন স্থলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও উপদ্রব সৃষ্টিতে। এই দাঙ্গাহাঙ্গামা দমন করার জন্য সামরিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে পশ্চিম বাংলার সরকার তাকে বলেছেন martial law বা সামরিক আইন জারী, এবং ভারত সরকার তাকে বলেছেন—না, ঠিক সামরিক আইন নয়। উভয় সরকারের ব্যাখ্যার এই পার্থক্য ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

আমরা মনে করি পূর্ব হতেই পণ্ডিতজীর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল; তাঁর বোঝা উচিত ছিল তাঁর ঐসব অনর্থক উক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে কিছু গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেই সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলে আজ সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন বিধানে পরিচালিত জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে কথায় কথায় পুলিশ বা পল্টন ডেকে জনতাকে সায়েস্তা রাখা বুদ্ধিমানের বা কর্মপটুর পরিচায়ক নয়।

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ঘর ছাড়া; আশ্রয়হারা বিত্তহারা ও স্বজন-হারা হয়ে—চরম দুঃখের মধ্যে যখন ছুটে চলছে, তখন সরকারী তরফ থেকে তাদের শান্তি ও স্বস্তি দেবার ব্যবস্থা করাই প্রধান কর্তব্য। এই উত্তেজনার সময় কার্য-কারণ বিচার করে অপরাধী ও অপরাধের গুরুত্ব নির্ণয় করতে হবে। সরকারী তরফে সে দৃষ্টির অভাব দেখে আমরা দুঃখিত।

উভয় বাংলার জনতার কাছে আমাদের বক্তব্য, অপরের দোষ অনুসন্ধান না করে নিজের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য যেন তারা আত্মবলীয়ান হন। দুঃখ ও দুর্গতি

বাংলা আজ আত্মঘাতের রাস্তা গ্রহণ করেছে। এই পথ থেকে ফিরে আত্মপ্রতিষ্ঠার রাস্তা তাকে গ্রহণ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বা ভারতীয় সরকারের কোন ত্রুটি প্রতিকার হিসাবে প্রতিবেশী মুসলমানকে আঘাত করতে হবে এই বুদ্ধির পিছনে না আছে যুক্তি, না আছে দেশ ও জাতির স্বার্থবুদ্ধি।

আজ উভয় বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান উদ্বাস্তু হয়ে এ অঞ্চল থেকে ও অঞ্চলে ছুটে যাচ্ছে। বাঙালী আর্থিক সম্বন্ধে স্বভাবতই দরিদ্র; তার উপর শস্তের হিসাবে উভয় বাংলাই ঘাটতি প্রদেশ। তার উপর যে বিত্তনাশ ও জীবননাশের পালা বাংলায় চলছে তাতে সমগ্র বাঙালী জাতির পরিণাম বিষাদময় হয়ে উঠছে। পূর্ব বাংলার পাঞ্জাবী ও বিহারী মুসলমানদের আধিপত্য আজ ক্ষুব্ধ বাঙালী মুসলমানের মনকে এই অপ্রীতিকর পরিণতি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যই হয়ত পূর্ব বাংলায় ধাক্কা-হাঙ্গামার সৃষ্টির পরিকল্পনা হয়। এই ধাক্কার ফলে পূর্ব বাংলা হতে বাঙালীর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য অনেকখানি ছাস পাবে। বাঙালী মুসলমানদের পক্ষে এটা ভেবে দেখা উচিত।

এই অবস্থায় আমরা আশা করি বাংলা নিজের স্বরূপ ও দায়িত্ব উপলব্ধি করে মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে ত্রুটি করবে না। বাংলার কবি চণ্ডীদাস গেয়েছিলেন—

"শুনরে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলারোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—

ছেলেমেয়েদের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৷৷০

ডাক্তারের দিগ্বিজয় ২৷৷০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসনে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৸০

গল্প হিসাবে এর কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে। —স্বরাজ

—তারাপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩৲

রুশ কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক সম্পদ ক্লাসিক পর্য্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্থায়ী অভাব পূরণ করিলেন —আনন্দবাজার

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৷৷০

অমৃতবাজার, প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত।

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বিশাল বাঙ্গলা ১৲

—নগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক নীতি ২৲

—অরুণচন্দ্র গুহ—

কংগ্রেসের পথ ১৷৷০

সৃষ্টি ও সভ্যতা ১৷৷০

(ছোটদের বই)

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন—

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

(৮ম সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ সি ১৮-১৯ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট (দ্বিতল) কলিকাতা

লিলি

বিস্কুট

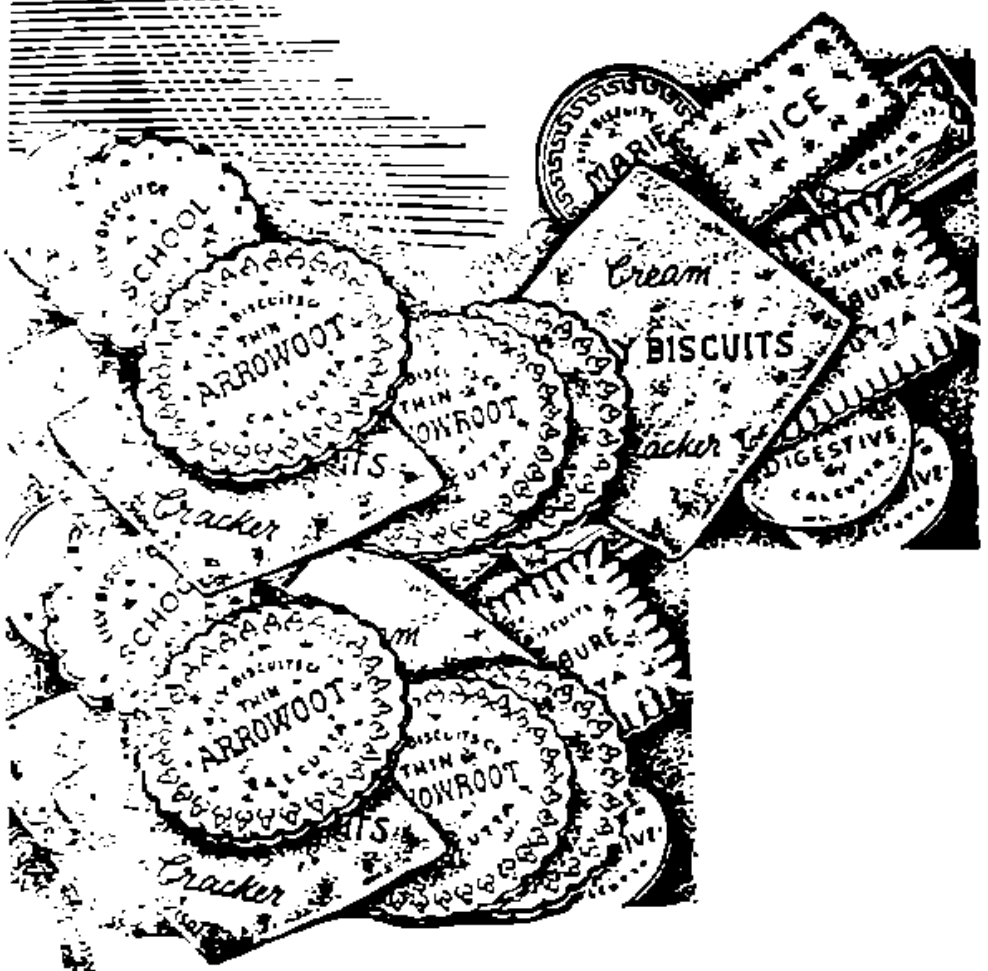

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ কলিকাতা